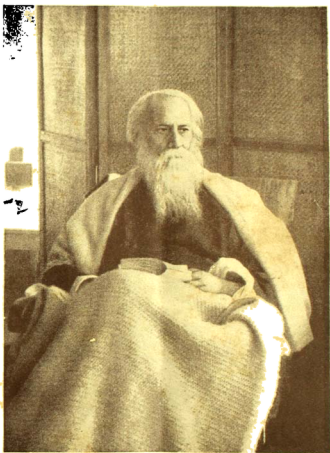


ସମ୍ମିତ୍ରା-ବୈଷାଖ-୧୩୫୩



ବ୍ରହ୍ମନାଥ ଶାସ୍ତ୍ରୀ

বর্ষ - ২৫
সংখ্যা - ১-১২



সন্দিগ্ধ

পঞ্চদশ বর্ষ

বৈশাখ - ১৩৫২

756.3

প্রথম সংখ্যা

012/8

রবীন্দ্রনাথ

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলা দেশের লোক আমরা আগামী বর্ষে বৈশাখ তারিখে সাড়বরে রবীন্দ্র জন্মতিথির আয়োজন করব। যে মহাপুরুষকে আমরা আমাদের আত্মার আত্মীয় বলে মনে করি, যে মহাপুরুষের দ্বারা ঘরে বাইরে আমাদের গৌরব বহুগুণিত হয়েছে, একটি বিশেষ দিনকে উপলক্ষ্য করে তাঁর পূজা। নাম স্বরণ বতাই আমাদের অবগত করণীয় কাজ; কিন্তু সেই আয়োজন যেন সাংসদিক একটি আচার হাত্রে পর্যবসিত না হয় সেটি দেখা দরকার। নতুন বছর ঘুরে ঘুরে আসবে আর নতুন বছরের সূচনা কালীন একটি নির্ধারিত দিনে কতিকে আমরা স্বপ্ন করব এইটে বাছানীর বটে কিন্তু কতিকে আমাদের মধ্যে ঘরে রাখবার এইটে সর্বাধিক কলপ্রদ উপায় নয়, এমন কি অস্তিত্ব কলপ্রদ উপায়ও নয়। একটি উৎসব দিনে বাহুবলকে স্বরণ করে তার পর যদি গোটা বছর তাঁকে ভুলে থাকি, তা হলে সেই আনুষ্ঠানিক স্মৃতিচারণের বিশেষ অর্থ হয় না। আমাদের দেশের অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক উৎসবের পরিণাম এই জাতীয় বিশৃঙ্খলিত বরণ করে কি না তা তেবে প্রমাণের সময় হয়েছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের বেলায় এই আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আরও বেশি। কেন সেটা বলি।

বাংলা দেশ আজ নানা ছুযোগে ভরা। আজও তার মধ্যে সব চেয়ে বড়ো যে ছুযোগ, সে হল সাংসদিক ছুযোগ। বাঙালীর জীবনে সংস্কারের অবকাশ এমন মর্মান্তিক হয়ে আর কখনও দেখা দেয় নি। সংস্কারের অর্থ হয় বর্তমান শুদ্ধ মতি শির সাহিত্যের মানের অপকর্ষই বোঝায় না, আচার আচরণ রুচি বিশ্বাস চিন্তা ও কর্ম নিয়ে আমাদের যে গোটা জীবনযাত্রা তার নিঃসংশয়িত বোঝায়। বাঙালীর আচরণে দিনের জীবনযাত্রার দিকে তাকালে এই অপকর্ষ অতিরিক্তই বরা পড়বে। রাস্তা ও সামাজিক নানা রকম বিপত্তির ফলে আমাদের রুচি বিকৃত, আদর্শবাদ ধূল্যাবলুপ্তিত বনকোপীনা সকল কোলিতের উপর মাথা চাড়ি দিয়ে উঠেছে। সবপ্রকার গণিত আচরণের প্রতি আলোক্ত কৃষ্টিটাই একটা মস্ত বড়ো শব্দের কথা; সেই শব্দ ভাষা আচরণে, তার চাইতেও যা তরোত কথা, গণিত আচরণ সম্পর্কে আচরণকারীর মনে কৃষ্টিবোধ প্রাণ অনুপ্রায়িত বললেই চলে। মহৎ কৃষ্টিবোধ শুল্লির প্রতি আমাদের আচরণ কত দুর্বল আর স্তিমিত হয়ে গেছে তা এই সর্বব্যাপী বিবেকচেতনতার অভাবজ্ঞতা চিন্তা করলেই বুঝা যায়।

এই নিরতিশয় হতাশাস অবস্থা থেকে যিনি আ

যে 'উল্লেখ' টেনে তুলতে পারেন তিনি—স্বাধীনতার।
অপর সময়ে অপর অবস্থায়, অল্প কোন বস্তুপুস্তকসমূহের
আবশ্যমুতরপে প্রয়োজন আমাদের পক্ষে হয়তো
এমনি একাত্তরই দেখা দিত, কিন্তু আজকের দিনে
স্বাধীনতাগেঁথে প্রয়োজন আমাদের সব চাইতে বেশি।
জাতির মন বহন পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অচেতন হবার উপক্রম
হয় তখন মনোবাক্যের বিনিময় অসম্ভব, মনের উপর ধীর
ক্রিমা বিদ্যমানরূপে স্পষ্ট, তাকে সজাগ করা
পা। আমাদের দেশে বহু প্রকারে প্রচেষ্টা করা হয়েছে ও
করানোরকে অব্যাহত রয়েছে। উারা আমাদের মনকে।
জাতির আত্মপ্রত্যয়ে সমাজ বহুভাবে উপকৃত হয়েছে।
কিন্তু আজকে বৈঠক সমাজের পক্ষে মূল প্রয়োজন তা
বর্ষের পুনরুজ্জীবন নয়, এমন কি কর্মক্ষেত্রের উৎসাহও
নয়। প্রয়োজন সব চাইতে বেশি সৌন্দর্যবাহুত্বের
উৎসাহের। আর সেই সৌন্দর্যবাহুত্বের ভিত্তিই কবি-
শ্রেষ্ঠকে আমাদের জীবনে একান্তভাবে বরণ করে
লভা প্রয়োজন। সৌন্দর্যবাহুত্বের সঙ্গে মনের প্রেক্ষণ,
স্বাধীনতা, মনোবাক্য, মনোবাক্য, মনোবাক্য, মনোবাক্য
আচরণ এবং অস্বাভাবিকতা। এ সমস্তের আভাস
প্রয়োজন এমন যোগ্য কবি আর কোন কিছুই নয়।
সত্যিকার স্বাধীনতার ভাষ্যরূপে যোগ্য বিজ্ঞা, মনোবাক্য
আর মনের পুনরুজ্জীবন সম্ভাবনা। বৈঠক আছে সত্য,
কিন্তু নানা কারণে বর্ষের সাহায্য নিতে আজ ভর করে।
ইতিহাসের দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার দেখা গেছে, অতি
সম্প্রসূত্রে প্রণোদিত বর্ষও শেষ পর্যন্ত আত্মসমীক্ষিত বর্ষে
রূপান্তরিত হয়ে এক সম্ভাবনার সঙ্গে অপর সম্ভাবনার
বিত্তের কারণ সৃষ্টি করে। বিত্তের কলে অসহিষ্ণুতা;
অসহিষ্ণুতার সল দীর্ঘ ও বিধেব। বর্ষের ভ্রমের এই
দুই বিষয় সল কী পরিমাণ অনর্থের কারক হতে পারে
সেই নীতির ভিত্তি হতে বাবার প্রকার নেই; সাম্প্রতিক
ভারতের ইতিহাসই তার প্রকট সাক্ষী।

জাতি হিসাবে বাঙালীর ভিত্তর কর্মক্ষেত্রের আশ্রয়
প্রদান নয়। এটাকে বাঙালী চরিত্রের অন্তর্ভুক্ত করা

জান করা হয় এবং এই ভিত্তর ভিত্তর বিবর্তিত হয়।
আমাদের মধ্যে ধারা কর্মক্ষেত্রের ভিত্তর কণা হল
কর্মক্ষেত্রের মধ্যে বাঙালী জাতির স্বাধীনতার ভিত্তর
নিহিত; এভাবে অন্তর ভিত্তর পথে আমরা অভিব্যক্তি
করেছি, সে অভিব্যক্তি আর নয়, একগুণে সম্ভাবনা কর্ম-
ক্ষেত্রের আশ্রয়কে অগ্রসার করে দিতে হবে এবং সেই
মূল প্রয়োজনের নিকট আর সব প্রয়োজন বাটো করতে
হবে।

কথাটা শুনে ভালো। তবে মূল্যবোধ এই যে,
এক একটা জাতি বা জনগণের এক একটা বিশেষ
দিকে প্রবণতা কিংবা বিশুদ্ধতা থাকে। এই প্রবণতা
বা বিশুদ্ধতার দ্বারা সাধারণতঃ জাতীয় প্রতিভার বিচার
করা হয়। বাঙালীর ভিত্তর কর্মক্ষেত্রের প্রবণতা কখনো
দুর্বল বটে, তবে তার ভিত্তর আশ্রয়ের কারণ বেশি না।
বাঙালীর আশ্রয়কে কর্মক্ষেত্রের ভিত্তর ভিত্তর
স্বল্প রয়েছে তার স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্রের ভিত্তর
প্রবণতা। সারা চোখে এ দুই ভিত্তর স্বাধীনতা
নিরপিত না হওয়াই স্বাভাবিক কিন্তু একটা জাতির
অগ্রগতির ইতিহাসে মানসিক ভিত্তর ভিত্তর
বিশেষতঃ, মিল সংগতির দ্বারা মূলতঃ সত্যতার
পরিচয়, এ দ্বারা মনে করেন জাতির নিকট এই ভিত্তর
অবিসংখ্য। তাই আগে কর্ম পরে। এই কারণে জাতি
বটেই, পক্ষান্তরে ভিত্তর স্বাভাবিক প্রবণতার ভিত্তর
বটে, বাঙালী জাতি সত্যতার মূল ভিত্তরকেই আশ্রয়
করেছে বলা যায়। স্বাধীনতা বাঙালী চরিত্রের
সাম্প্রতিক দ্বারা প্রকট বাঙালী স্বাধীনতার
জাতীয় প্রতিভাও তিনি প্রকট প্রতিভা। স্বাধীনতাকে
বিশুদ্ধ স্বল্প বা মনে আশ্রয়িত স্বল্প, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের
চেতনা দ্বারা। সেই অস্বাভাবিক সম্ভাবনা সর্বসাধা
উপায় প্রতিষ্ঠিত হোক।

অন্য ঠিক এই বিশুদ্ধতা আজ ভিত্তর আকারে দেখা
দিয়েছে। আমরা আমাদের স্বাভাবিক সাধনার প্রতিষ্ঠা
মূলতঃ বসেছি। আমাদের সাম্প্রতিক স্বাধীনতা এ ভিত্তর

নর যে আনন্ধ্য কবিত্বের ক্ষেত্রে আশ্রয় লুপ্ত হইল
 করিতে পারি নি; আনন্দের স্বর্ণা এজ্ঞে যে আনন্ধ্য
 আনন্দের স্বভাবসুলভ মননশীলতা ও করুণা প্রায়তার
 সংসার থেকে ক্রমবিক্রম হইতে পড়ি। অকিঞ্চিৎকর
 মূল্যবোধ আনন্দের সহৎ মূল্যবোধগুলির স্থলাভিষিক্ত
 হইবে আনন্দের বিপর্যয়ী করিতে বসেছে। সহজ-
 জীবন থেকে আজ কটির শালীনতা, আচরণের শালীনতা
 সহজপ্রায় ও সহজতা, সহজবোধ প্রকৃতি বিশিষ্ট মানসিক
 সহজগতমুহু অক্ষত হইয়া উপক্রম। যে কারণের
 সম্বন্ধেই এই অস্বস্তি ঘটে নাকি, এটা অতি প্রত্যক্ষ
 যে, এই মূল্যবোধগুলি সম্পর্কে চেতনার অগাধতা
 ফলে বাঙালী সমাজের মূল্যভিত্তি বিপর্যয় হইয়া উপক্রম
 হয়েছে। এই চরম জাতীয় দুর্গতির দিনে যিনি
 আনন্দের সার্বিকভাবে রক্ষা করিতে পারেন তিনি
 কর্তব্য নন; অর্থনৈতিক দৈত্য নন, ধর্মবাহক নন,
 তিনি অবশ্যতাই একজন সংস্কৃতিরক্ষক এবং শেখোক্ত
 ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথই যে আনন্দের সর্বপ্রধান, তরলার
 মূল্য বলে যোগ্যতার প্রয়োজন নাই।

রবীন্দ্রনাথ বসিও লুপ্ত; কবি, তিনি কবি নাত
 ছিলেন না। তাঁর প্রতিভার যে আশ্রয় সললতা ছিল
 সেই মানবতার দ্বারা তিনি সংস্কৃতির প্রায় সকল
 বিভাগকে ঘেঁষে করেছিলেন। সংস্কৃতির যিনি পুরোহিত,
 জাতীয় প্রতিভার যিনি বৃহৎ বিশেষজ্ঞ, তাঁর নাকে এই
 সত্যসত্যিই একমাত্র উপযুক্ত ভূমিকা এবং সেইটাই
 তাঁর কাজ থেকে একমাত্র প্রত্যাশিত ভূমিকা। দ্বারা
 শিল্প সাহিত্যের এক একটি বস্তু বিভাগ নিয়ে আসেন
 তাঁরা; সংস্কৃতির পুরোহিত, কিন্তু নিজ নিজ ক্ষেত্রে অশেষ
 উজ্জী হওয়া সত্ত্বেও সেই ব্যক্তিগত কখনও তাঁদের
 অধিনয়্য নর যে ব্যক্তিগত একমাত্র সত্যসত্যি নির্দ্বার
 দ্বারা এই আরও হওয়া সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ এই সত্যসত্যিদের
 মধ্যে ছিলেন প্রধান পুরুষ। তিনি শুধু সংস্কৃতির পুরোহিত
 ছিলেন না, তিনি ছিলেন সংস্কৃতির চালক। ভারতীয়
 সংস্কৃতি তাঁর মননবোধোৎপাদিনী প্রতিভা ও ব্যক্তির

লক্ষণে বিভিন্দ্ৰভাবে সমৃদ্ধ হইতে উঠেছিল। একদিকে
 কবিত্ব মধ্যে ছিল সৃষ্টির অপার সৌন্দর্য, অল্প দিকে
 সৃষ্টির অপরিমিত প্রাচুর্য। প্রাচুর্য বস্তুটি কাহিন্য কাহিন্য
 হতে কাহা বিচারের ক্ষেত্রে অবর্তন্য; যোটেই তা নর।
 সৃষ্টির প্রাচুর্য সৃষ্টির গভীর আকৃতির একটি প্রত্যক্ষ
 প্রমাণ। যে মন তাৎপর্যমুহু তাঁর বহিঃপ্রকাশ প্রাচুর্য
 লক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত হতে বাধ্য। ওয়ার্ডসওয়ার্থ ভীষনে
 অনেকানেক কবিতা লিখেছেন যা কালের বিচারে
 অপ্রায়, কিন্তু তিনি যে একাধিক ভালো কবিতার সঙ্গে
 এই অকিঞ্চিৎকর কবিতাগুলিও লিখেছিলেন তাহলেই
 প্রমাণ হয় যে, তাঁর সৃষ্টিশীল মন একশ চাকলের
 দ্বারা নিয়ন্ত্রণ পূর্ণ ছিল। সে চাকলা নিত্য-নতুন কবিতার
 আকারে অভিব্যক্ত হয়েছে। মনস্কৃতির চকুদিক বৈদ্য
 ক'রে ত্বণশেষের জগৎ মনস্কৃতিরই ভূমিকা।

কবির কাব্যসত্তার বিশেষণ করল আনন্ধ্য; সেখানে
 পাব তাঁর ভিতর এক আবারে দুটি মূল্য তার শাখাশাখি
 বিবৃত ছিল।—ভারতীয় ঐতিহ্যের প্রতি গভীর অধ্যয়ন,
 অল্প পক্ষে নিত্য নব নব বৈচিত্র্যপ্রকাশ। বৈচিত্র্যের
 প্রতি এই একান্ত উৎসাহ কবির দৃষ্টিকে সত্যিকার ঐশ্বর্য
 আর আধুনিকতার লক্ষণ দ্বারা মণ্ডিত করেছে।
 অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল তাঁর অসীম, কিন্তু সেই শ্রদ্ধা
 তাঁকে কখনও বর্তমানের প্রতি পরাধীন করে নি। যে
 মন দিয়ে তিনি ভারতের অতীত ইতিহাস সংস্কৃতি ও
 শিল্প সংস্কারকে ভালোবেসেছেন সেই একই মন দিয়ে
 তিনি আন্তর্জাতিকতার আশ্রয় আশ্রয় করেছিলেন।
 উপনিষদের মূল্যবোধ তার সমুদ্রের দ্বারা সমৃদ্ধ ভিত্তি
 তিনি প্রগতির সেবার নিহুত করেছিলেন। অতীতকে
 তত্ত্ব করিতে গিয়ে তিনি অতীতবাদী হয়ে ওঠেন নি
 এটা তাঁর প্রথম মানসিক সললতারই ফল।

দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে প্রধানতঃ অধ্যাত্মবাদী কবি মনে
 করেন তাঁরা অধ্যাত্মবাদের প্রতিও সুবিচার করেন না,
 কবির প্রতিও সুবিচার করেন না। 'নির্ভরের অপ্রভব'
 'জীবনদেবতা' নীরব কিছু কবিতা ও গান, গীতাঞ্জলি

আমার সাহিত্য জীবন

ভারতবর্ষের বঙ্গোপাখ্যায়

[প্রবাসস্থিতি]

যশ বাসের শীতের মধ্যে বৈশাখ বেলার পাঙ্কতলায় বসে বেলা গল্পটি রচনা করেছিলেন। রাত্রি তিনটে অবধি বেলার পথে ঘুরেছি, জুয়ার আসরের পাশে গাড়িতে জুয়াড়ীদের—জুয়ার-উন্নত বাহুবলের লক্ষ্য করেছি, পাশপাশি একান্ত বেস্তা-বাখ্যারের মধ্যে গাড়ির বাহুবলের পানব উন্নততা লক্ষ্য করেছি; রাত্রি হ'লে জিরে এসে পাঙ্কতলায় থকে বিছানার উপর বসে লঠনের শিখা বাড়িরে ঘিরে খাতা পেন্সিল নিয়ে লিখতে বসেছি। বেলায় ছিলাম দু' দিন। দুদিনের পর বৈশাখ বেলার আর ব্যাক্য কঠকর। পুঙ্কবের জল কাদা হয়ে ওঠে, মাঠ খাট আসপাশ পঙ্কিল হয়ে ওঠে। বাতাস জারী হয়ে ওঠে। তবুও এই বেলা থাকে এক মাস। আনিও আরও দু' চার দিন থাকতাম কিন্তু উপায় ছিল না। ঠ তিন দিন পরেই আমার বড় ছেলের উপনয়নের দিন সেই কারণেই কিরতে হ'ল।

বেলা গল্পের প্রথম পাণ্ডুলিপি বোধ করি আজও আছে। তখন লিখতাম একসারসাইজ বুকে, কপিং: পেন্সিলে একসারসাইজ কইয়ের ৪৬ কি ৬০ পৃষ্ঠা হয়েছিল প্রথম খসড়াটি। বাড়ী ফিরে এলাম। ছেলের শৈতে হয়ে গেল। তারপর খাতাটা নিয়ে আমার বঙ্গলায়। এবার হ'ল ৪০ পৃষ্ঠা। সে আমলে আমি প্রতিটি গল্পই অন্ততঃ দু'বার ক'রে লিখেছি, প্রয়োজন হ'লে তিনবার চারবারও লিখেছি। ওরূপে বরচনা উন্নত করবার প্রস্তই লিখেছি তা নয়, কোর্নি পাণ্ডুলিপিতে হাতের লেখা খাতাপ হ'লে বললেছি, কাটাকুটি হ'লে বলছি। শৈলজ্ঞানবের হাতের লুকায় মত হতাকরে লুকায় সাখানো পাণ্ডুলিপি, অভিভাব্যবহারে চোখ জুড়ানো পাণ্ডুলিপি, টিক এলি লুকায় পাণ্ডুলিপি রচনার উপর খুব একটা কৌকও ছিল আমার। পেন্সিলে লেখা খাতা থেকে আমার বাল্যকালের সেই পুরানো নিব সাপানো

কলমে লিখতাম।' কেউইক নিব ছিল আমার প্রিয় নিব। কলমটি আমার ব্যাটিক পতীকা দেওয়া কলম। কলমটি কেটে গেল শেখটার; তাতেও তাকে ছাড়ি নি। এক ইকতো রূপার পাতের বাধন দিয়ে ব্যবহার করেছি। সেটি আজও আছে। প্রথম কাউন্টেন্ট পেন কিনেছিলাম ১৯৩৮ সালে।

বেলা গল্প লেখা হ'ল, পড়ে থাকল। কোথায় পাঠাব? তারতবর্ষে ডাইনীরা বাণী রয়েছে। বঙ্গপ্রী সম্পাদক চ' মাসের আগে লেখা চাপবেন না। কল্লোল কালি-কলম উঠে গেছে। প্রবাসীতে পাঠাতে তরনা নেই, সেখানে দের বহুর ধরে লেখা সম্পাদকের বিবেচনা-বীন থাকে। তার উপর এই গল্পটিতে মেলার পটভূমিতে উল্লাস ও উচ্ছ্বলতার উন্নত বাহুবলের অরমিত প্রবৃতি যে নয় বৃত্তিতে আচ্ছন্নকাল করেছে, তাতে প্রবাসীর পৃষ্ঠার এ গল্পের স্থান হতেই পারে না। হঠাৎ একটা কাকের ডেউ এসে টান মিলে। কাছাকাছি করেকখানি গ্রামে লাগল মহাবারী। গলার জলের বোতল ওদুপের খোলা নিরে বেরিয়ে গেলাম। কাঙ্কল গেল চৈত্রেরও করেকদিন কেটে গেল এমই মধ্যে। তারপর আমার বেকার। আমারের সম্পত্তিটুকু বোখা-স্তনার তার তখন ছোট ভাইয়ের উপর দিয়েছি। মেজ ভাই বাড়ীতেই প্রেসটা নিয়ে গোধপাহ করছে। আমি নিত্যন্ত বেকার। মাঠে মাঠে দিনে দুপুরে বেরিয়ে পড়ি, বেকারত্ব অসহ্য হয়ে উঠলে। তখন আরও একটা প্রবল আকর্ষণ আমার টানছিল। আমার বেরে দুপুর বৃত্তি আমাকে পরলোক গহকের প্রতি আকর্ষণ ক'রে তুলছিল। অশ্বানে গিরে বসে থাকতাম। রাত্রে বিছানা ছেড়ে উঠে দুপুর বেলায় স্থানগুলির অদূরে নীরবে গাড়িরে থাকতাম। বার্ষ প্রতীকার শেষ রাত্রি পর্বত গাড়িরে থেকে আমার নিশেবে এসে বিছানার বেহ এলিরে দিতাম।

এরই মধ্যে একথা বঙ্গী আপিস থেকে ফিরে
চিঠি এল, কয়েকটা। মানুষী কথার পরই সে লিখেছে,
'কই ভারতবর্ষে তোমার ডাইনীরা বাণী বের হ'ল কই ?
এত ঘেরী করছে কেন ? তার চেয়ে যদি হুজুম তর,
তবে ভারতবর্ষে আপিস থেকে ওটা ফিরে এনে বঙ্গীতে
বৈশাখেরই বের করে দি। সজনীবার উৎসুক হয়ে
আছেন।'

সেরিম আরও একখানি পত্র ছিল। রিগ্লাই কার্ডে
ভারতবর্ষে পত্র লিখেছিলেন, সেই রিগ্লাই কার্ড এনেছে
বঙ্গীর অলঙ্কার দাসের সংবাদ বহন করে 'ভাষা ভোমার
গল্প বৈশাখেরই বের হচ্ছে।'

ফিরণকে পত্র লিখে দিলাম—ডাইনীরা বাণী
বৈশাখের ভারতবর্ষে বের হচ্ছে। ভোমারের ভক্ত নতুন
গল্প দিতে পারি। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর গেলাম—আজই
ডাকে বাও। ডাকে না দিলে নিজেই রওনা হলাম
কলকাতা। কলকাতার পৌছে তৃতীয়বার গল্পটি
লিখলাম। বঙ্গী আপিসে বেতেই ফিরণ হাত পাতলে
আনছিল ? হে।

ফিরণ নানা জেলার ভাষা জানত।

লেখা দিলাম। ফিরণ পড়লে, পড়ে মুখ তার করে
বললে—এ যে ভয়ানক কাণ্ড করেছে! তোর সাহস
তো খুব। শনিবারের চিঠির সম্পাদক সজনী দাসের
হাতে এই লেখা দিবি ?

সম্পাদক নিজেই দেখা দিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে
এসে আমাকে দেখেই বোটা নাকটা ফুলিয়ে বদলেন—
কই লেখা ? এইটে নাকি ? বললি তুলে নিয়ে চলে
গেলেন ঘরের মধ্যে। আমি পলিয়েন করলাম। সন্ধ্যার
পর বাস-বস্ত্রের বাড়ীতে ফিরেই গুনলাম টেলিফোনে
কেউ আমাকে ডেকেছিল। কে তা অবশ্য ঠিকানা
বিজ্ঞাসা করেন নি। তবে সংবাদ আছে আমি যেন
সন্ধ্যার পর বাড়ীতে থাকি।

সন্ধ্যার পর ফিরণ এল। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে—
সজনীকান্ত বললে কি আদিস ?

উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—আগে বল গল্প কেন
দিলে কি না।

—ভাষা হচ্ছে। প্রেসে চলে গেছে। কিন্তু এইটে
আর কি কথা। আসল কথাটা শোন। সজনী দাস
বললে—এই লোকটির বাঙলা সাহিত্যে অনেক কথা—
এ যুগের লেখকদের সকলের চেয়ে বেশী কথা বলতে
এগেছে। এর খুঁজি অনেক। এনেছে অনেক।

বেলা গল্পের শেষ একটি প্যারা সজনীকান্ত বার
দিলেন। গ্রন্থটা যন খুঁতখুঁত করেছিল। কিন্তু ভাষা
হওয়ার পর পড়ে সজনীকান্তের শিরবোনের পরিচয়
পেরে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। বৈশাখেরই (১০৩৮) ভারতবর্ষে
এবং বঙ্গীতে ডাইনীরা বাণী এবং বেলা একসঙ্গে
প্রকাশিত হ'ল। ছুটি গল্পই প্রসংগিত হ'ল। বেলা
গল্পের বাস্তব শট্‌ফুন্সের ভিত্তি সম্পর্কে অনেক উচ্ছ্বসিত
প্রশংসা করলেন।

এর পরই লিখে ফেললাম একটি গল্প। 'হাতা হানী
ও প্রমাণ'। গল্পটি একটি মিষ্ট গল্প। সুখপাঠ্যও বটে।
কিন্তু বেলা বা ডাইনীরা বাণীর মত নয়। সজনীকান্ত
গুনলেন, প্রশংসা করলেন, কিন্তু বললেন—এখন আর
বঙ্গীতে পুজোর আগে লেখা নিতে পারব না। দমে
গেলাম। তবে আর ভাল লিখেই বা কল কি ? এই
সম্বন্ধকার একটি ঘটনা মনে পড়ছে। গল্পটি পকেটে
নিয়ে গেলাম শৈলজ্ঞানেশ্বর বাড়ী। অপরাহ্ন বেলা,
শৈলজ্ঞানেশ্বর বের হচ্ছেন। আমাকে দেখেই বললেন—
একটু কাজে ব্যক্তি ভাই। সেখান থেকে বেরিয়ে পলে
পথে ঘুরছি—হঠাৎ দেখা হ'ল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের
গল্প। পবিত্রকে গল্পটি শোনবার জন্তে বরলাম। পবিত্র
বললেন—এখন তো একটি সন্ধ্যা ব্যক্তি ভাই। বাগ-
বাঝারে কর্মব্যোগী রাসের বাড়ীতে সাহিত্য সেবক
সমিতির বৈঠক। সেখান থেকে ফিরে গুনব। চলুন না
সেখান দিয়ে একসঙ্গে ফিরব।

অনিবৃত্তিত হয়ে বাস ? মনটা খুঁতখুঁত করে উঠল।
পর দুহুর্ভেই সে খুঁতখুঁতনি কেড়ে ফেলে চলে গেলাম।

অনেক সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে পাব এ সৌভাগ্যের কাছে অমিয়ন্ত্রণের লজ্জা ছোঁট হয়ে গেল। কোন পাবিব বন্ধ পাবার লোভে ছাফি না, যে ক্রান্তি অপাবিব গুণ্যমর, সেখানে নিমন্ত্রণের প্রতীক কেন? শুভে নিমন্ত্রণ লাগে না। কোথাও নাম-পান হওয়ার সংবাদ গেলেন নামের তক্তকে বেতেই হবে। না বাওরটাই লাগ। চলে পেলো।

অনেককেই দেখেছিলাম। সকলের নাম মনে নেই।

মনে আছে অগ্রজতুল্য প্রদেব ঐহুজ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায়কে, স্বর্গীর প্যারীমোহন সেনগুপ্তকে এবং স্বর্গীর কর্ণবোগী বাবকে। ঐহুজ উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ই সেদিন সভাপতি। বৈঠকে গর পড়বেন স্বানবধর ঐহুজ রবেন চন্দ্র সেন হুতপালার লেখক। একাধে পবিত্রের অন্তরালে বলে রইলার। পবিত্র হু চার জনের সঙ্গে আলাপ করিতে যোবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তাঁরাও উৎসাহিত হলেন না, আবিও না। সময়টা পরের সময়। আমি বাবতে বুক করলাম। সভার অবতন ঘটল। ঐহুজ রবেনবাবু এসে গৌড়লেন না। শেষে কয়েকজন কবিতা পড়ে আসর বুক করলেন। এমন সময় রবেনবাবু ব্যস্ত হয়ে এলে সভাপতিকে দুহুসরে কয়েকটি কথা বলেই আবার চলে গেলেন। ঐহুজ উপেন্দ্রনাথ বললেন—কবিতাও সাহিত্যিক বিপন্ন, তাঁর একটি বোগীর অবস্থা অকস্মৎ মক হয়ে পড়েছে একেত্রে আমাদের দাবী তিনি রাখতে পারছেন না। কসারনের দাবী রসের দাবীকে আক ছাড়িয়ে গেছে। স্তব্ধতা—

সভা ভঙ্গের কথাই তিনি বলতে চাইলেন; কিন্তু দুহু হুটে না বলে ইমিডেই জা নিয়ে দিলেন। সকলেই বেশ একটু হু হ'ল। ভাই তো!

পবিত্র সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন—আমি কিছু আপনাদের অস্থিতি হ'লে রসের দাবী মেটাতে পারি। আমার সঙ্গে তারাপতর রয়েছে, সে আবারে তার নতুন লেখা গল্প শোনাতে এগেছিল। বৈঠকের সময় হওয়ার শোনা হয় নি। সঙ্গে থরে এনেছি, বৈঠকের শেষে বাকী দিয়ে জনব। গল্প ওর পকেটেই আছে।

সভার অবস্থা তখন অকস্মৎ আত্মা ভূমিতে ব্যস্ত সভার জলময় হওয়ার বেশের রেপনিং ফেল করা হুড ডিপার্টমেন্টের বত। একেত্রে চাপ গমের বলে রাজা আলু কি মানকচুই সই। রেপনিং চাপু নিয়ে কথা। স্তব্ধতাং কতৃপক্ষ উৎসাহিত হয়ে এবং অজর দিয়ে বললেন—যের কজন গল্প। ৮কর্নবোগী রাহের বাকীতে বৈঠক, তিনি এসে আমার পাশে বলে সভাপতি পকেটে হাত পুতে দিলেন। আমি কিছু খুব লজ্জিত হয়েছিলাম। মনে হয়েছিল আমার সাহিত্যিক ছাংলাবিটা যেন অত্যন্ত সঙ্কলভাবে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে, শৈলজানকের (বোগ হু শৈলজানকেরই) গল্পের বত। এক দরিদ্র কেরানী কোন নিমন্ত্রণে গিয়েছিল। সেখানে কারও কিছু মূল্যবান বস্তু হারানোর লজ্জা সকলের পকেটে তরঙ্গ কল্পতে গিয়ে কেরানীর পকেটে গেলেন অনেকগুলি মিঠায়। দরিদ্র কেরানী গোপনে ছেলেদের লজ্জা নিয়ে ব্যস্ত।

যাই হোক, আসরে পড়তে হ'ল গল্পটি। পড়া শেষ হ'লে সমালোচনা আরম্ভ হ'ল। একজন কঠোর সমালোচনা করলেন। একটি চরিত্রের পরিগতি নিয়ে সমালোচনা। তিনি প্রমাণ করলেন—এই চরিত্রের পরিগতি এই হ'তেই পারে না। স্তব্ধতাং গল্পটি একান্ত ভাবে বার্ব। এই সমালোচনার পর আর কেউ সমালোচনা করতে চাইলেন না। অর্থাৎ অজ্ঞাবাস্ত করবার আর স্থান ছিল না। আমি চুপ করেই বসে রইলাম। জাবহিলাস বাধ্যবে এবং সাহিত্যে এত পার্শ্ব্য কেন? যে চরিত্র নিয়ে এত কথা—যে চরিত্র বাস্তব। রাজা রাণী প্রমা গল্পের রাজা আমি, রাণী আমার সুধিনী, প্রমা যে সে রাধাবল্লভ, সেও আমারই মত বাস্তব সভা; ঘটনাটিও গল্পের আনা সভা। সমালোচক বললেন—গল্পটিকে নিষ্ট বহুর লুপপাঠ্য করে তোলাবার লজ্জা চরিত্রটিকে নষ্ট করা হয়েছে। স্তব্ধতাং গল্পটি নিষ্ট হয়েছে লুপপাঠ্য হয়েছে। তবে?

(বেশ্যে ৬০ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য)

জাতীয় চরিত্র

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

স্বাধীনতা লাভের পূর্বে জাতির মন একটা বিশেষ করে থাকে। তখন জাতীয় মনের সমস্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা, আশ্রয় ও উদ্দেশ্য একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিয়োজিত হয়। এই প্রচেষ্টার কিছু কিছু সমাজ বিরোধী মনোভাব জাতির মনে জাগে এবং প্রকাশ পায়। যেখানে গোপন সমস্ত সংগ্রামের পছন্দ অবলম্বন করে, সেখানে প্রায় নীতি হিসাবে গ্রহণ করা হয় "No means is too mean"—কোন পথই পরিহার্য নয়। নরহত্যা, দূর্ভিক্ষ, আত্মগোপন, মিথ্যাভাব, প্রতারণা, ও কপটচরণ প্রভৃতি সব কিছুই সেখানে জাতীয় যুক্তির মতো নরম উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে অবলম্বনীয় বলে স্থিতিশীল হয়। সাম্প্রদায়িক মতাদর্শ হিসাবে দেখা এবং মানুষের ব্যক্তিগত চরিত্রের মর্যাদা বজায় রাখা, এসব সেখানে বিপ্লব বিশ্বাস মনের বিলাস বলে বিবেচিত হয়।

তার কালে সমস্ত জাতির মন ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে বহুতর ধর্ম ও সমাজ ধর্মের বিরোধী ভাবে গড়ে ওঠে। বিপ্লবের ইতিহাসে তাই আমরা যেখানে পাই, ক্ষমতা লাভের পর ক্ষমতার অধিকার নিয়ে অসাম্প্রদায়িক কাড়াকাড়ি শুরু হয়ে যায়। সংগ্রামের মুখে সবাই শিখেছে—প্রচলিত চরিত্রনীতি ও সমাজনীতির কোন ফলাফল নেই। হঠাৎ ক্ষমতা লাভের পর তাদের মনে চরিত্র-নীতি ও সমাজনীতির প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণের স্রষ্টা হবে, এমন আশা করা যায় না। বিপ্লবের নারক যেখানে লেলিহেনের মতো একজন অসারারণ মানুষ, সেখানেও ক্ষমতার কড়াকড়িতে পূজ্য কালকার সহযোগীদের নির্মমভাবে হত্যা করতে কেউ পছন্দপন হয় না। এই প্রসঙ্গে একটু অবাক হলেও একটা কাহিনী এখানে উল্লেখ না করে পারছি না। অল্প কিছুদিন পূর্বে বেঙ্গাল কোলেক্টাই নারক কলিকাতার একজন বিখ্যাত মহিলায় দুই সংবাদ প্রচারিত হয়। বিপ্লবের সময় এই মহিলা অবিবাহিত ছিলেন। যদিও কলকাতার সাথে বিপ্লবের

সময় এর প্রায় হয়। তারপর হঠাৎ একদিন উভয়ে কাউকে না বলে অদৃশ্য হন এবং কয়েকদিন পরে স্বামী-স্ত্রী দুজনে এঁরা আবার বিপ্লবের কাজে যোগ দেন। কমিউনিষ্ট পার্টি এঁদের দণ্ড দেওয়ার জন্য কিছু হয়ে উঠলো; পার্টির পক্ষ থেকে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করা হলো। সকলেরই দাবী—শুধুমা তত্ত্বের চরম দণ্ড চাই। একমাত্র লেলিহেন সেখানে উদ্ভেজিত হন নি। শাস্ত্যভাবে সব কিছু তিনি তুলে দেন। তারপর রাত্রি ছিলেন—উভয়ের অপরাধ গুরুতর এবং শাস্তিও গুরুতর হওয়া প্রয়োজন, তাই দণ্ড দেওয়া হলো। উভয় উভয়ের প্রতি চিরকালের জন্য বিশ্বস্ত দাম্পত্য বন্ধন আবদ্ধ থাকবে। লেলিহেনের মতের বিরুদ্ধে অসম্মত সভাপতি কোন বস্ত্র প্রকাশ করতে পারলো না। কিন্তু তারা অত্যন্ত কষ্ট হলো। এমনি অসাধারণ মানব ধর্মী বেঙ্গালী সচরাচর পাওয়া যায় না। তাই বিপ্লবের যুগে মানুষের চরিত্রে সমাজ বিরোধী ভাব প্রবল হতে থাকে। বাংলায় যেনে শুধু বিপ্লবী যুগের সময় কত নিরীহ লোকের প্রাণ কেবল ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য বর্জ্য দেওয়া হয়েছে, তা হরত জনসাধারণ কোনদিনই জানবে না।

একাত্তর বৎসর পূর্বে প্রচলিত বিপ্লবী যুগক আত্মগোপন করে বাস করতো। একজন হঠাৎ অত্যন্ত বিমর্ষ ও মন-নয় হয়ে মিন কাটাচ্ছে। অপর যুবকটি তার তার জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলে, 'ওর জেলায় সমিতি থেকে নির্দেশ এসেছে ওরই এক বন্ধুকে পুলিশের গুলির বলে মরেছে' কথা হয় এবং তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে কোন নির্জন স্থানে ওরই নিয়ে যেতে হবে এবং তাৎপর্য.....। যুবকটি বলছিল এই কাল যদি করতেই হয় তবে তাকে দিয়ে কেন! সে যে সবেমহতাজ লোকটির বন্ধু! অপর যুবকটি তখন তাকে বললো জেলায় হুকুম এখানে কোন কিছু হতে পারবে না, এগনিকার বাতীর কমিটির নির্দেশ ব্যতীত এগনি কাল সংঘটিত হতে পারে না।

তখন ডায়ের কলিকাতা কমিটির অধিনায়ক ছিলেন 'গেভোজ চন্দ্র মিত্র'। তাঁর কাছে বাতখা হলো। তিনি সব শুনে এমনি কান্ন করতে নিবেদন করেছিলেন। হৃদয়: একটি নিরীহ জীবন এমনিভাবে রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু বহু নিরীহ জীবন এমনিভাবে বিচ্যোনে লুপ্ত হয় নি: '২৪ সালে এক পুলিশের গুলিচর এক ছাত্র ঘরের অধিনায়কত্বের অনেক অপকর্ষ বাংলা দেশে করেছে। তাইই নির্দেশে একটি হৃদককে কলিকাতার বাইরে হুঁরে নিয়ে গিয়ে তার সহকর্মীরা হত্যা করে। আলপুর জেলে নিকের বস্ত্রে ও বিছানাতে কেবোদিন দিক করে অস্বিহত হয়ে, অধিকা বা সে পাপের প্রারম্ভিত করেছিল।

এই সব জো গেল সশস্ত্র সোণন বিয়ব প্রচেষ্টার কথা। ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করেছে অহিংস আন্দোলনের ভিতর দিয়ে। এর অধিনায়ক ছিলেন সভাসদী ও বর্ষপণী মহাত্মা গান্ধী, তাঁর কর্মপন্থা ছিলো অহিংসা ও সত্য, তা সত্ত্বেও এই অহিংস সংগ্রামের কর্মপন্থার ভিতর এমন বহু দফা (Item) থাকতো, যাতে লবাক বিরোধী মনোভাব প্রদর্শন পেয়েছে এবং লুপ্তলা এবং নীতিবোধ ব্যাহত হয়েছে। কথার কথার ধর্মঘট বা হত্যাকাণ্ড হত গান্ধীজীর অমুখোদিত ছিল না। কিন্তু স্থানীয় নেতৃবর্গ অনেক সময় তা প্রদর্শন দিয়েছে। অনেক সময় এমন সব কারণেও উদ্বেগের কারণে ও সত্যপ্রিয় করা হয়েছে, যা সর্বনিঃসংশয় নয়। তা ছাড়া রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতি হিসাবে না-মানার মনোবৃত্তি এবং অনেক স্থলে পরিবর্তনকার প্রদর্শন দেওয়া হতো। আইন মান না; বাজনা দেব না; টেক্স দেব না; বিজ্ঞান বা কর্মস্থলে যাব না—এই সব মহাত্মা গান্ধীর ও কংগ্রেসের অমুখোদিত কর্মপদ্ধতির মধ্যে থাকত। জনসাধারণ এবং স্থানীয় নেতৃবর্গ অনেক সময় এই সব অমুখোদিত কর্মপদ্ধতির পুণী মত ব্যতিক্রম করে নিত। রেল লাইন বন্ধ করে দেওয়া বা সহরের গল সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়া বা রাজ্যের আলো বন্ধ করে দেওয়া,

কাথখানা বন্ধ করে দেওয়া—এসবও কংগ্রেস অমুখোদিত কার্যসূচীর মধ্যে থাকত। এ থেকে একটু সামান্য ব্যতিক্রম করে রেল লাইন উল্লিখে ফেলানো বা সহরের গল সরবরাহের ব্যবস্থার হানি ঘটানো বা কাথখানার আংশিক ধ্বংস সাধন করা—আখানের আত্মীয় আন্দোলনের মধ্যে খুব বিরল ছিল না। এবং এসব কাজ বারাক্রান্ত তাদার জনসাধারণের কাছে বাহবাই পেতো। '৪২ সালের আন্দোলনের সময় যখন মূল মূল পোড়ানো, ডাকঘর পোড়ানো, রেল ট্রেন পোড়ানো, টেলিগ্রাফের তার কাটা বা রেল লাইন ভুলে ফেলা প্রভৃতির বহু ঘটনা আছে।

আদি একথা বলতে চাই না যে, এসব করা অস্বাভাবিক বা অজ্ঞান ছিল। কিন্তু আতির হুক্তি সংগ্রামের অল হিসাবে যখন এসব কাজকে আসন্ন তাদিক করছি বা প্রদর্শন দিয়েছি, তখন আতির মনে এর কি প্রতিফলিত হতে পারে তা আমাদের তেবে মেঝা প্রয়োজন। আসন্ন ব্যবহারই শিখিয়েছি কোন কিছু অভিযোগ থাকলে তাই প্রতিকারের গন্ত সংগ্রাম করতে হবে এবং সে সংগ্রামের রাজ্য হলো আইন লুপ্তলা তদ করা এবং সামাজিক ন্যায় অবলম্বনা করা। হুক্তি সংগ্রামের উপরি উল্লিখিত কর্মপদ্ধতির অলসরণ জনসাধারণের কি অলুবিধা ও লুপ্ত কষ্ট হয় তা আমরা বিবেচনা করতে কাউকে বলি নি। রেল লাইন ভুলে ফেললে গাড়ী চলাচল বন্ধ হবে এবং জনসাধারণের যাতায়াতের অলুবিধা হবে। অথবা তার চেয়েও বড় কথা গাড়ী লাইন ছাড়া হলে, বহু লোকের জীবন হানি হতে পারে। এসব বিদ্যে আমরা কখনো পরোয়া করি নি। আল যখন উদ্বোধনের অত্যন্ত অভিযোগের সুযোগ নিয়ে কোন রাজনৈতিক অভিলক্ষি-সম্পন্ন ব্যক্তি উদ্বোধনের নিয়ে রেল লাইনে বসিয়ে রাখে, তখন তারা পূর্বাভাসিত কর্মপদ্ধতির অনেক তত্ত্ব ও লেশোপিত পদ্ধতিরই অলসরণ করে।

স্বাধীনতা লাভের পর আল গন্ত লুপ্ত পরিপ্রেক্ষিতে

আমাদের জাতীয় চরিত্রকে বিচার করা প্রয়োজন এবং নতুন করে জাতীয় চরিত্র গড়ে তুলবার চেষ্টা করতে হবে। স্বাধীনতা লাভের পূর্বে আমরা সকলকে বলেছি স্বাধীনতা লাভের পর কি পাওয়া যাবে; কিশোর কিশোর তারা অবিকারী হবে। কিন্তু কখনো তাদের মৈত্রিক ও সামাজিক দায়িত্বের কথা বলি নি। বিপ্লব সাধন করে রাষ্ট্রীয় কনতা, অধিকার করা এবং বিপ্লবকে গঠন করে জাতির সামাজিক ও আর্থিক ভিত্তিকে গড়ে তোলা—হুঁচি সম্পূর্ণ জালালা কিনিব। আমরা কখনো জাতিকে শিখাই নি—স্বাধীনতা লাভের পর বহু প্রবাসীরা কাক তাদের করতে হবে; বহু ত্যাগ-বীকার তাদের করতে হবে; বহু নতুন দায়িত্ব তাদের গ্রহণ করতে হবে। ত্যাগ ও প্রত্যাশার ভিত্তর দিয়ে নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করার পরেই কেবল তারা নতুন অধিকার পেতে পারে—একথা কখনো আমরা তাদের বলি নি। তাই আজ যেসব শিখাই স্বাধীনতাকে কাজে লাগাবার জন্য ব্যস্ত অর্থাৎ স্বাধীনতার স্বপ্ন সুবিধা ভোগ করার জন্য ব্যস্ত। স্বাধীন রাষ্ট্রের দায়িত্ব পূরণের আগেই কারোই নেই।

এই প্রসঙ্গে আর একটা ব্যাপারও বিবেচনা করা প্রয়োজন। গত মহাযুদ্ধের ভিত্তর ইংরেজেরা যুদ্ধে পরারলো যে, তারকবর্ষকে বা এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত পরাধীন দেশসমূহকে দীর্ঘকাল তাদের ওঁবে রাখতে পারবে না। কোন কালেই তারা জাতির চরিত্র গঠনের দিকে নজর দেয় নি এবং যেওয়ার প্রয়োজনও তাদের ছিল না। রাষ্ট্র শাসনের ভাড়াটে বা বেতনভূক্ত কর্মচারী হিসাবে বড়ই চরিত্রের প্রয়োজন ততটুকু থাকে কিনা, তা দেখাই তাদের স্বার্থ ছিল। তার বাইরে তারা কখনো দেখে নি। এই যুদ্ধের সবচেয়ে বড় কথাটা টের পেল যে দীর্ঘকাল এ দেশ তারা শাসনে রাখতে পারবে না, তখন জাতীয় চরিত্র লম্বচ্ছে তারা আরো উত্থানী হ'লো। অপরদিকে যুদ্ধ জয়ের জন্য তাদের প্রয়োজন হলো জাতিকে তাতে যোগ্য ও চরিত্রে বরা। তাই একদিকে তারা সৃষ্টি

করলো '৪০ এর মনস্তত্ত্ব। অপর দিকে তারা সৃষ্টি করলো ব্যাপক অসন্তোষ। অর্ধেক লোক সবচেয়ে বড় কথা বলে দাঁড় করতে চেষ্টা হলো। যুদ্ধ সংক্রান্ত কোন কনট্রাক্ট নেওয়ার বিরুদ্ধে কংগ্রেসের প্রত্যাব ছিল। তাই খোলা কনট্রাক্ট গ্রহণ গ্রহণ করে ব্যবসায়ীদের এলুত করা হলো। কোন দর নেই, মন্তর নেই, নির্ভরিত হার নেই—কাজ কর, বিল কর, টাকা নিয়ে বাও। এক টাকার কাজে বহু টাকার বিল করলেও আপত্তি নেই। এই অর্থশালসাকে জাতিতে জাতির চরিত্রকে এরা ধ্বংস করে দিয়ে গেল। কমিউনিষ্ট পার্টি এর একটা রাজনৈতিক সমর্থন যুগিয়ে দিল। "জন যুদ্ধের" হুঁচি তুলে এরা গ্রামে গ্রামে প্রচার করলো, এই যুদ্ধ জয়ের জন্য বা কিছু কর, কোন অস্ত্র নেই কোন পাপ নেই। মতান্তর যথার্থ, নারীর সম্মান, মহিলাদের মূল্য, ব্যবসায়িক মততা—সব কিছুই এই যুদ্ধ জয়ের জন্য তুলে। স্থানে স্থানে সশস্ত্র চাল নেই হয়েছে; অথচ আপন পালের গ্রামের লোক অন্যদিকে বেরছে। আর কমিউনিষ্ট পার্টি গ্রামে গ্রামে প্রচার করেছে—এই যুদ্ধ জয়ের জন্য মহিলাদের জীবন তুলে। ঠিকাবার ও ব্যবসায়িক চোরাচালার ও অতিরিক্ত মূল্যের কারণে। কমিউনিষ্ট পার্টি এটার করেছে "জনযুদ্ধ" জয়ের জন্য এগিয়ে এয়েছে। যুগের জাতির বুদ্ধি-সঠি নারীদের হয়ে দিয়ে মৈত্রিকদের লাঙ্গলার খোরাক যোগান হয়েছে। কমিউনিষ্ট পার্টি জাতিকে শিখিয়েছে—সত্যি প্রকৃতি সংগ্রাম হলো বুর্জোয়া, শ্রেণীর বিলাস; "জন যুদ্ধের" জন্য এগিয়ে বিলম্বন মিতে হবে।

বিপ্লবী আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য এগারদশ—শাসনে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা অবলম্বন করা হলো বা যুদ্ধকদের মন ও চরিত্র থেকে দর্পা ও শক্তিসাহায্যের ভাব দূর করে তরল ও আত্মসী মনোভাবকে প্রসার দিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাংলার যুদ্ধগণ বিভিন্নরূপে ও বিবেকানন্দের দিক দীক্ষার গড়ে উঠেছিল; এর প্রধান কথাই ছিল শক্তি-

সাবনা ও কষ্ট বরণের নীক্ষা। একটা আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা এবং সেই আদর্শ সিদ্ধির জন্য যুগ্ম বরণের সজ্জা নিয়ে সেই যুগ্মের যুবকগণ জীবন শুরু করত। এ শিক্ষা ও নীক্ষা যুবকদের মন হতে যুব করবার জন্য একটা প্রচ্ছন্ন চেষ্টা সরকার তরফ থেকে অনেকদিন যাবৎ চলছিল। এস্তারসনের আমলে এটাকে একটা প্রকাজ কার্যক্রম হিসাবে সরকার গ্রহণ করল। বন্দীশালায় (detention camp) এবং জেলখানায়ও এই চেষ্টা চালানো হলো। পুস্তক, খাতা, কালি কলম প্রভৃতি লেখা পড়ার সরঞ্জাম এবং অস্ত্রাস্ত্র প্রয়োজনীয় প্রকারে সজ্জা আদ্যাদিগকে জেলখানার বহু বগড়াখাটি ও কষ্ট বরণ করতে হয়েচে। কিন্তু সিগারেট ও চা চাইবার পূর্বেই প্রথম দিন থেকেই আনরা পেয়েছি; এরপরও বিলাস দ্রব্য আমরা বত সন্ধ্যা সরকার থেকে পেতাম, লেখাপড়ার দ্রব্য পাবার জন্য অনেক বেশী বেগ পেতে হয়েছিল। যখন সরকার পক্ষের ও বামপন্থী দলগুলির বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্দেশ্যের সাম্য ঘটানো, তখন জেলখানা ও বন্দীশালায় আবহাওয়া বিশেষ ভাবে বদলে গেল। দুগাছর ও স্তম্ভসঙ্গে অস্থলীলন দলকে ভাগতে হবে এবং নৈতিক ঐতিহ্যকে বিক্রয় করতে হবে, উভয়ে এই উদ্দেশ্য নিয়ে জেলে ও বন্দীশালায় চলছে। বরণদের প্রতি প্রজ্ঞা রাখবে না, বেপারোয়াভাবে সিগারেট কুকবে, নৈতিক নিষ্ঠা ও কষ্ট বরণের ভাবকে বিক্রয় করবে এইভাবে একটা প্রচার বন্দীদের মধ্যে করা বহুর পর্যন্ত চালানো হয়েছে। শিক্ষিত যুবকগণ হলো জাতীয় চরিত্রের বেকরত; তাঁরাই একটা আদর্শ নিয়ে জনসাধারণের মধ্যে ছুটে বেড়াতে পারে। তাঁরাই জনসাধারণের কাছে উচ্চ আদর্শের কথা বলতে পারে। তাঁরাই দুর্নীতির বিরুদ্ধে সমাজ-ব্যবস্থার ব্যাঘাত করতে পারে। সেই যুবকদের মন থেকে ও চরিত্র থেকে দাচ্য ও গভীরতা দূর করে তরল আরাগী মনোভাব আনা হলো।

গাজী বিল্লাহের মূল কথা হচ্ছে পুরানোর ভিত্তির উপর নতুন সমাজ গড়তে হবে, আদ্যাদ্যের ঐতিহ্যকে

বজায় রেখে। কমিউনিস্ট পার্টির মূল কথা হলো সব কিছু জেলে চুরমার করে কমিউনিস্ট আদর্শে সমাজ গড়তে হবে। গাজী চেরেছিলেন—বিল্লাহের পূর্ব হতেই জাতির চরিত্রকে গড়ে তুলতে হবে বিল্লাহের সমাজের জন্য। তাইই অন্য ভিন্ন তাঁর গঠন মূলক কর্ম পদ্ধতি; তাঁরাই অন্য তিনি নির্দেশ করেছিলেন সত্য ও অসিংহার লব। কমিউনিস্টরা চার সর্বাঙ্গিক ধর্মসম্বন্ধের পরে নতুন সমাজ গড়ে তুলবে যেখানে ব্যক্তি বা ব্যক্তির কোন নিজস্ব সত্য থাকবে না। তাই তাদের কর্মপদ্ধতির ভিতর একটা প্রধান কাজ হয় সর্বাঙ্গিক ধর্মের বাস্তবীকরণ। প্রচলিত সমাজ বা মানবের সংস্কার তাঁরা চার না বহু স্তর। চার সমাজে এবং শাশন ব্যবস্থার অনন্ততা ও অপর্যন্ততার প্রভাব আরো বাড়ুক; দুর্নীতিতে ও পাপে সমস্ত সমাজ জেলে পড়ুক। সেই সর্বাঙ্গিক ধর্মের অনুশাসনে তাঁরা নতুন সমাজ গড়বে। সেই ভাবেই তাঁরা তাদের কর্মপদ্ধতি পরিচালিত করে।

এইসব নামা কারণে আজ জাতীয় চরিত্রের এই দুর্বলতা অধের। দেখতে পাই। কোথাও কোন বড় আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা নেই। যে কোন রকমেই নিজের আত্মা ও মন চাই এবং তা কেনবার প্রকৃতি উপায় হচ্ছে প্রচুর অর্থ। তাই অর্থ সঞ্চয় সঞ্চয়ে কোন সন্তোষ বা বিরাগ নেই; সন্তোষী কর্মচারী ব্যবসায়ী মহল, সাধারণ অধিবাসি ও রাজনৈতিক দল কেউ এই মনোভাব থেকে অত্যাধিক পাই নি: এক পক্ষ অপর পক্ষকে গাল দেয় বেপারোয়াভাবে কিন্তু কেউ নিজের চরিত্রের বিশেষণ করে না। যে সবকে দিয়ে ক্ষুদ্র হাড্ডানো হবে সেই সবকেই ক্ষুদ্র আশ্রয় নিয়েছে; কাজেই দুর্নীতি ও অসদ্ব্যবহার দূর করার বত চেষ্টা হচ্ছে, তা মোটেই কার্যকরী হয় না।

নতুন এর উঠতে এর প্রতিকার কি? প্রতিকার একটা বের করতেই হবে যদি জাতিকে বাঁচাতে হয়। সেই কথা বারাতরে আলোচনা করা যাবে। এই প্রসঙ্গে

একটা পুরানো ইতিহাসের কথা যখন পড়লো। বিখ্যাত গ্রীক বৈজ্ঞানিক আর্কিমিডিস আক্ষেপ করেছিলেন— পৃথিবীটা তিনি ওজন করতে পারতেন যদি পৃথিবীর বাইরে ঠাঁড়াবার বতো একটু স্থান পেতেন; তাহলে Lever এ জুলে এর ওজন করতে পারতেন। আজ সর্বগ্রামী ছুনিভীয়া প্রতিকার করতে হলে অসম্ভব কতক শোককে তার বাইরে ঠাঁড়িয়ে চেষ্টা করতে হবে। সেই চেষ্টা করতে হবে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শিক্ষিত যুবকগণের। তাঁদের বর্তমান আর্থিক ও নৈতিক নৈশ্র কাহার-ও

অজানা নয়। কিন্তু তবুও এরাই বাস্তব অবস্থার উর্ধ্বে উঠে তার বিকল্পে সংগ্রাম করতে পারে। ১৯৬০ বছর পূর্বে বাংলায় যুবকগণ যে আদর্শে অহুগ্রাণিত হয়েছিল, আজ কি আবার সেই আদর্শে তাদের অহুগ্রাণিত করা যায় না? আজ সবদিকে চেষ্টা হচ্ছে স্বাধীনতাকে বাস্তবের পন্থা পরিণত করে আশুত্বের দ্রব করা। এট আশ্রাসী মুখ-অভিলাসী বনোভাবের বিকল্পে সেবা ও বই বরণের দ্রব নিয়ে একমল যুবককে ঠাঁড়াতেই হবে এবং তার উপর-ই আশ্রিত তবিস্থ নির্ভর করেছে।

কেরানীর বন্ধু

নর্ধেন বসু

কোন এক সোনালী সন্ধ্যায়

কেরানীর বন্ধু।

স্বতি গাণে শুধু,

কেলে-আগা হুমারী দিনের।

রাহগ্রস্ত জীবনের,

বাধা-বধা জুয়ে।

জীবনে গাছে না গান,

এই অস্ত্রপুত্রের।

উজনের পাশে কুচিকাটা,

শিরাজের কলি।

ছড়ানো চিংড়ির খোলা,

শুভ্রতার পূর্ণকরা বেশদের বলি।

বাট কি সত্তর তম্বা দারী

এম. এ. পাশ স্বামী,

হেঁড়া আদা শেলীর কবিতা।

সকলই ত অবলুপ্ত,

অস্ত্রগামী সন্ধ্যার সবিতা।

সোনালী চুড়ির টুংটাং।

লপট কি অলপট জুয়ে,

কথা কর নিরুপ্ত বনে।

দাম্পত্যের প্রথম পাতায়

লেখা আছে তুনি-আমি

শুধু ভালবাসা।

দ্বিতীয় পাতায়, অশ্রুতর

উৎকর্ষের স্তর।

আকাজ্জিত জনমীর আশা।

তৃতীয় পাতায় বিলম্বিত জুয়ে

বিচ্ছেদের বেগু বাজে।

ক্রান্তি যেটে সে-এক-অজানা অবসাদ,

কর্তব্য-বোড়াই মন চলে যায়
হেঁসেলের কাছে ।

সেদিন গোবুলি লগে
পাশের বাড়ীতে বাকে লাথ ।
বিলাতী ব্যাঙের হাত
বাক্য বাকে ছুই-তিন লাথ ।

কলোহন হুখরিত ফুলের বাসর ।
বিগত বৌবনা নারী জমায় আগর ।
অতীতের হাই তোলা,
কীটে-কাটা শ্রোনের ঢেঁকুর ।
পরিচ্ছন্ন দৃষ্টি নাই অবাহিত কোকুহলে
গুপ্তি ভরপুর ।

বাসর রাত্রির বেশা
চুলুচুলু আঁধি,
লোহাগ ভ অনেক হলো,
আরো কিছু বাকি ।

ও বাশরী, ঐ লাথ,
সামাজিক হগালো আবেশ,
কণিকের অগ্নি জ্বল ।

মনে রেখো, ওগো নববধূ ।

এ-বেহ লতার কুসারীও ফুল ।
মিছে শুধু, মিছে মিটে ফুল ।

অল অলে সিঁদুর সিঁদুর,
গোবুলির লগ-ভরা আগার আকাশ ।

মাত্র দিন ছুই-তিন,
ওগু দেখে তপ্ত যধুয়াস ।

তার পর কোলে-কাঁখে
'বাই' বাব বাগো ।

নয়ত বা কর শব্দা পাশে
বলে রাত আগো ।

কলের বাশরী,
নয়ত বা দেওয়ালের ঘড়ি চ্য চ্য চ্য ।

ভাত চাই—
অড়িলের বেলা ;
ভানা হলে পড়িলেব বিষম বধন ।

অবসর কটকিত দিনের বেলায় ।
রাত্রির প্রাণাশে কাগো
মধু কুকা শ্রোম,
এ শুধু বাড়ারে দিলেম ;
গঙ্গা হেলায় ।

ওপাশে মেফালী কাদে
মশকের শুদ্ধগ্ন গান ।
পাশের বাড়িতে বাগে
তৈহবী গ্রেবে বেহালায় তান ।

কুশারি অঁজুরণ পাশে
ভাড়া স্বর্ষ কড়া নাড়ে,
দিনের কবচ বাহ খুলে ।
হেসেল হাড়ির শব্দ,
পরিচিত গলার স্বক্কার,
আরো কিছু কটু কথা—
কীট-নড় ভীবনের আশা বেদীমূলে ।

আব্রাহাম

(উপভাস)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

ঘরের মধ্যে ঢুকেই শুন পে টেবিলের ওপর বইগুলো;
আছেড়ে ফেললো। কমল লোভা বিছানার ওপর বসে
একিক শুকিক চেয়ে বললো, 'কিছু যদি মনে না করেন,
জল খাওয়াতে পারেন এক মাস?'

'কি আশ্চর্য, এতে মনে করার কি আছে।' শুন পে
কুঁকো থেকে জল গড়িয়ে কবলের ছাঁতে দিয়ে বললো,
'একটু বসুন। আমি বাগরুখ থেকে মুখ হাত ধুয়ে
আমি। ঢোক কান দিয়ে যেন অশ্বনের হৃদ্য বেকছে।'

শুন পে দরজা তেজিয়ে দিয়ে বাইরে চলে গেলো।
ধূধে চোখে জল ধাংড়ে একটু পরেই ফিরে এসে বেকলো
কমল দিবা টান হ'য়ে নিজেই ছেড়ে দিচ্ছে বিছানার
ওপর। বুকের ওপর একটা বই রেখে চোখ বন্ধ করে
ছাঁতে শুবলার মতন পেটা চাপড়চ্ছে। শুন পেতে
চুকে বেকে বইটা সরিয়ে রেখে চোখ খুলে বললো,
'আমুন, কিছু মনে করবেন না। নরম বিছানা দেখে
লোভ লামলাতে পারি নি।'

'কি আছে।' শুন পে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বিছানার
পাশে বসে পড়লো, 'শেরাবাখানের কথাটা বসুন এবার।
কিছু ভীকে সরিয়ে দিচ্ছেলো বলেন?'

কমল বাগিয়ে শুর দিয়ে উঠে বসলো, 'শেরাবাখান
তোবামা পাটির পোক ছিলেন কিনা?'

'ডোবাযা পাটির লোক! ডোবাযা। শুন পে
কথাটা মনেকবার উজ্জরণ করলো। কিন্তু ঠিক কিছুট
বুকে উঠতে পারলো না। একটু থেমে বললো, 'ডোবাযা
পাটি' কি?'

'ডোবাযা, মানে আমাদের বর্ষা এই দাবী বারা পেস
করতে চায়।'

'তাই নাকি। শেরাবাখান বৃত্তি চাইতেন বর্ষামেশ
বর্ষাদেরই থাক, ভারতীরদের তেজাল এবেশে এসে না

ছোটো।' কথাটা মুখ থেকে বেরিয়ে যেতেই শুন পে
একটু অগ্রস্বত হ'য়ে পড়লো। কথার ঝাঁকটা মুকানো
রইলো না। হটাৎ এতটা উগ্র হওয়ার কোন মানে
হয় না।

কমল কিছুক্ষণ আড় চোখে শুনপের দিকে চেয়ে
বেকলো, তারপর বীর গলার বশলো, 'ঠিক যেভাবে হরত
গুরা ভাবেন নি। বর্ষা আর ভারতীরের এগ্ন নর, গুরা
ভেবেছিলেন শাক আর শাসিতের কথা। সাত সন্ত
তের নদী পার হ'য়ে জলে বলে কৌশলে ধার। এদেশের
প্রতি ইকি এগ্ন করছেন। চিনা বাগানের বজন
দেশটাকে বিরাট ক্রাসারের চাপে বের্তলে সমস্ত
নির্ধাসটুকু বের ক'রে নিচ্ছেন। ভারতীরদের আব
গোষটা কোথায়?'

শুন পের বটকা লাগলো। তাই কি! ভারতীরদের
কি কোনই দোষ নেই। সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ তারা। নিরাসক্ত
নিম্পৃহভাবে হুকি এবেশে বলবাস ক'রে চলেছে।
এদেশের বাটি, সোনা, কসল কোন কিছুতেই লাভ নেই
তাদের!

'কিন্তু ভারতীররা সম্পূর্ণ নির্দোষ, একথা মানতেও
বন চাইছে না।' মনের কথাটা শুন পে বলেই ফেললো,
'বর্ষাদের সরিয়ে সেই আনগার ভারতীরদের পোষা,
বড়ো বড়ো চাকরীতে তাদের বসানো, কায়াক তোবা-
যোষ করা, এসবের পিছনে কি কোন চাল নেই, বলতে
চান?'

'আছে বই কি, একশোবার আছে। পিছনে রয়েছে
খেত শক্তির দাবার চাল। যে চালে অর্ধেক পৃথিবী
তারা মাং ক'রে রেখেছে। একে দাবিয়ে ওকে দাবার
জুলে নাচছে, আবার কাল ভাতকে পায়ের তলার গিয়ে
একে কাঁধে চড়াচ্ছে।' কমল উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো,
'ভারতীরদেরও দোষ আছে বৈ কি। বর্ষাদের চেয়ে

ভাসের ঘোষ কোন অংশে কম নয়। বুড়ির ভাসের আরো গুরোনে: ঐক্য, তারা আরো অনেক বেশী দিনের সোলাস, এ বেলায় রক্ত ভাসের বোতা উচিত ছিলো আরো অনেক আগে। বীণীর ভালে ভালে পা ফেলে নাচবার আগে, ভাসের উচিত ছিলো বাগুরিয়ার সুধোবুধি পাড়িয়ে সোকা কৈকিরং তলশ কতা, আর কতদিন একই জ্বরের বেলা চলবে?'

লুন পে অনেককণ কোন কথা বললো না। বলবার মতন কোন কথা কোপালোই না তার মুখে। কমলং বাইরেটা দেখে কিছু মনে হয় নি এতটা আশুন লুকানো ছিলো ভেতরে। আশাত শান্ত আবরণের তলার এত জ্বালা।

লুন পের মনে পড়ে গেলো অনেকটা এই বকমের কথা সোরেবিন হাই তুলে শেরাজীও বলতেন। রক্ত এতটা প্রত্যাক নয়, আভাবে বোকাতে চাইতেন এই বরনের ব্যাপার। এবেশের শেষ রাজা বিবকে কি ভাবে টেনে তুলেয়ার নাহিরে এনেছিলেন বিবেশী বনিকেরা তার হানী ত্রুপিরালিও ইচ্ছত নিয়ে তিনিমিনি খেলেছিলো এসব কথা শেরাজীও বলেছিলেন। বনিকের সুধোসের অরগালে লুচ ছুটি চোখ দিয়ে এবেশের মনি মাপিকা আর সম্পদের দিকে দুটি দিরেছিলো। আটোপানের মতন বিকে বিকে বাহু বিস্তার ক'রে সব কিছু গ্রাস করেছিলেন। আস্তে আস্তে এ সব শেরাজীর কথা, প্যাপোভার চাতালে মানুষকে ভাডিয়ে ভোলবার মত মিয়া কথার পাখনী নয়। রক্ত দিয়ে শেরাজী যা অনুভব করতেন, তাই শু্য বলতেন। এ সব তো মিথ্যা হতে পারে না।

'কি তাবচেন?' কমল একটা হাত দিয়ে লুন পের বাহুধূলে চাপ দিলো।

'না, কিছু না,' লুন পে নিজেতে সাংলে নিলো। তারপর বললো, 'আপনার সময় ইমারের হু'পানে বড়ো বিশ তারবান। দেখলান সবই ইংরেজদের। আমাদের নিজেদের বলতে কিছুই নেই।'

'নেই বানে?' কমলের ঠোঁটের কাঁকে হাসির খিলিক, 'আমরাই তো সব। দেখুন না সেই সব মিলে আপনারা আর আমরা পাশাপাশি পাড়িয়ে চালের বস্তা তুলছি। কাঁঠের তারবানার জান কতুল ক'রে মেশিনের সংপে লতাই করছি আমরা হু'কনে। কটা চোখ থেকে করণা বসিত হবে এই আশার পাশা দিয়ে ছুমনে জুটছি ঐকুর শায়ের তলায়। অংশ আমাদের হয়েছে বই কি। রক্ত আর ঘাঘ ভাপাতাশি করে দিছি দিনের পর দিন।'

লুন পের অবস্থি লাগলো। আকর্ষ, দেশের শোকেরা কি অস্ত। মহাশাওলার রক্ত এমনি খোলাটে হ'য়ে গেছে বুঝি। কাঁবে কাঁব রেখে সার বেঁধে পাড়াতে পারে না সবাই। বলতে পারে না, আমাদের উপতুল জেঁদে চলে বাঙ নিজের সোপে। সুখোশ খুলে গেছে তোমাদের, আমরা তোমাদের চিনে ফেলেছি। অনেক বছরের খেলা এমির শেষ করে। আমরা আগে উঠেছি।

লুন পে সাংলাতে পারলো না নিজেকে। ব'লেই ফেললো কথাটা। 'আমাদের দেশে শতিকাযের বাহুল নেই নাকি? তারা সব বলতে পারে না কোরালো গলায়, বাগা দিয়ে আর চলবে না। সরে পড়ো।'

কমল হাসলো, 'কে বলবে বলুন। মদ, কোকেন, তাকি, পেয়ে নাচ, ইংরেজি কেতার বল ডাঙ্গ এই সব ছেড়ে বাক্যে কথা ভাববার সময় কোথার আমাদের। মরকিরা দিয়ে বেশটাকে হুম পাড়িয়ে রেখেছে। পাকের ইনঅেকশন চালালেও যাতে চমকে না উঠি, বুঝতে না পারি কিছু, 'কণার সংপে সংপে কমল পাড়িয়ে উঠলো, 'উঠি আজ। বেলা পড়ে এসেছে। বাবার সংপে বাড়ী ফিরি কি না। কিছু মনে করবেন না, নিবিছ আলোচনা করে গেলাম। আমি চলে গেলেই তুলে বাবেন এ সব।'

'নিবিছ আলোচনা।'

'নিচর। শু্য নিবিছ নয়, গহিছ। যেখেন নি কলেজের হ'ল খরে পাশি তারার বড়ো বড়ো করে কি লেখা রয়েছে — 'ন অবি বিজ্যাং সমং মিতং।' আর সে বিজে হ'চ্ছে ইংরেজের ছাঁকনাতে হু'য়ে হু'য়ে পড়া বিজা, তার বইয়ের কিছুই নয়।'

কমল সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাথরুম অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত লুন পে জানিবার পরাধে বাথা রেখে চুপ চাপ ঠাঁড়িয়ে রইলো। অস্থিত ছেলে। আর সময়ের মধ্যেই সব কিছু ভোলপাড় করে দিবে গেলো। অনেক বিনের বন্ধ একটা দরজা বাজা দিয়ে খুলে দিলো। রোগের বলকের মতন প্রাণবন্ত—বিকেলের রান্না রান্না নর, দুগুহের চোখ বলসানো কড়া রোদ। আরাধিকান ইরমার পাথরে পর্যন্ত চিড় খাওয়ায়।

জানলা ভেজিয়ে লুন পে বিছানার ওপর এসে বসলো। বিছানার চাদরটা হাত দিয়ে টান করে দিলো। বাগিনে কইই রেখে হুঁপালে হাত তেপে উলুড় হুঁরে পড়লো। একদিকে বরগোশা প্যাটাটার হেলোটি, অজবিক কমল। দুজনে একেবারে হুঁ বরণের কথা বলে। কিন্তু লুন পের মনে হ'লো দুজনেই বেন অস্ত কারোর শোখানো বুলি বলছে। নিবের কথা নয়। এবেশের বিভিন্ন দুই চিন্তাধারার প্রতীকের মতন, একই নীরব মোহরার আর ভাঁটার মতন ওয়া ভিন্ন দুই।

সোয়েবিন গায়ে কিন্তু এত সব কথা কেউ চিন্তা করে না। একবারে রাজনীতি আলোচনা হ'তো বছরের পর বছর মিউনিসিপ্যালিটির ভোটের সময়। শুধু কথা নয়, মুখ বঁচিয়ে বিজি খেউড়, দরকার হ'লে মারপিট খুন লক্ষ্য। বছর তিন চার বরে মোদালাটা কম, উচান টিনই জিতে আসছেন। বাজবের সংগে বাজব লড়তে পারে, কিন্তু চোখ বলসানো কচকচে টাকার ভোড়ের বিকচে কে যাবে ঠাঁড়তে? উচান টিন মুক্ত হতে টাকা বিলিয়ে বেড়েন। বে লোক একটু পাশ ফেরবার চেষ্টা করতো, নোটের ভাড়া হাতের মুঠোর ভেঁষে দিয়ে তিনি তার দিকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন। লুনে অবস্ত ওই একই খেলা।

রোগের বলক চোখে এসে পড়তেই লুন পে এক হাত দিয়ে মোদটা আড়ালে করলো। অবসাদ আর ক্রান্তি। চোখের পাতা দুটো এক সময়ে বুজে আসলো। দরজার টোকার নক হ'তেই লুন পে জেগে উঠলো।

দর অন্ধকার। লুডা হুঁরে গেছে। গাভার বাড়ি গাভের পাতার কাক দিয়ে জানিবার এসে পড়েছে। আলোর ঝাঁড়। চোখ বগড়ে লুন পে বিছানার ওপর উঠে বসে বললো 'কে?'

'আমি।' কৌকড়ানো চুল সোয়ে মতের গলা।

'আমুন, দরজা খোলাই আছে।'

দরজা ঠেলে সোয়ে বসে বসে এসে চুকলো।

বেওয়ারাল হাতড়ে আলোর দুইচটা টিপে দিলো, তারপর লুন পের দিকে চেয়ে বললো, 'কি, এক দিনেই রান্না? সারাটা বছর পড়ে রয়েছে যে?'

লুন পে বিছানা ছেড়ে ঠাঁড়িয়ে উঠলো, 'হঠাৎ অবলোয় দুদিয়ে পড়েছিলো। বা রোদ, চোখ চেয়ে থাকাই যায়।'

সোয়ে বসে হাসলো, 'আমার তো মনে হয় চোখ বন্ধ করে রাখা আরো ক্রান্তিকর। আমি তো কেবল ওপর আর নিচে করছি। তাবলাম আপনায় কাছে একবার আসি কিন্তু সেখানম কে একজন ছিলো। কথাবার্তার ব্যস্ত ছিলেন আপনাবা। তাই আর বিরক্ত করলাম না।'

'না, না, বিরক্ত আর কি আপনাকে পেলে ভালোই হতো। কতলোক কমল খোস। এবারের মূল কাইনালে বিতীর হয়েছেন।'

'দর্শনাশ, তা হলে তো না এলে খুবই ভালো করেছি। আবার মতন লোক চুকলেই রস ভগ্ন হতো। কাঠ' লোকের বয়ের মধ্যে কি আর আশ্বাসের বস্তু চলে? কি আশাপ করেছিলেন? পরীক্ষার আগে আশা হুন খেয়ে ক বক্টা করে পড়বেন তাইই ছিলো চলছিলো হুঁরি?'

'উহু, লেখাপড়ার ব্যার বিরোধ আমার বাই নি। একেবারে অস্ত কথা। লুন পে চটি জোড়া পায়ে গলিয়ে নিলো।'

'বলেন কি, লেখাপড়া ছাড়া অস্ত কথা! বিশ্বাসই করতে পারছি না। কিন্তু বয়ের মধ্যে আর নয়। বললে যাবো। চপুন খেড়িয়ে আসি একটু।'

বরে ভালো পাগিয়ে দুজনে সিঁড়ি দিয়ে বাগানে এসে নামলো।

হাসপাতালের পাশ দিয়ে হুত্বাঝাঝের দিকে রওনা হ'লো। ভীড় আর ঘুণো। লাগা আর খোঁজার গাড়ীর পলোপাদি। কটা বাড়িরে গম্বিক দিয়ে ট্রাম চলছে। পরম যেন আগে বেনী।

'পরবের হাত এড়াতে বাঁচারের তেভর এসে চুকলেন যে। এগা বাবার বোম্বাঙ্ক।' লুন পে পকেট খেঁচে কনাল বের করে পলা আর খাড়া হচ্ছে নিলো।

'চলুন না। পরের থাকবেন আর খুলো থাকেন না, তা কি হয়?' ভীড় কাছিরে সোরে মঙ এগিরে চললো।

সাতার দুপাশে কাঠের ফ্রেমের ওপর রিপল টাভিরে সারি সারি বোকান বসেছে। সামনে খেঁচেরমের ওজ নিচু টুল পাতা। মোরোংগা, ব্রিচ, চিংড়ী বাঙের কাটলেট খুলাকার টেবিলের ওপর ঢালা। গন্ধ জায়গাটা ভরপুর।

সোরে মঙ হুটপাতের ওপর উঠে নিচু টুলে জাঁকিরে বসলো। হাত নেড়ে লুন গেকে ডেকে বসালো পানের টুলে। সাননের বগা মেয়েটিকে বললো, 'হু ডিল মোলোরেন ব্রিচ বাঙ তো। বেথো সংগে নকুন মাহুয়। খেয়ে বেন নিশা না করে।'।

মেয়েটি লুন পের দিকে চেয়ে হুচকি হাসলো। ঐচুধ কানখা লেপা দুখ। হুত্বুতে চোখ। ছ্যালেবের চোরাল বিস্তীতাবে ঠেলে উঠেছে। ছুটো ডিল ওদের দিকে ঠেলে বিততে দিতে বসলো, 'নার অম্ব। একলা সমস্ত সামলাতে হচ্ছে। এমন মু'ঙ্গেল পড়েছি।'।

লুন পে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলো। কিলের এত তাড়া। খেঁচেরের তো চিৎও নেই।

ব্রিচ পের করে সোরে মঙ মোরোংগা চাইলো। লুন পের দিকে হুঁকে বললো, 'ব্রিচ কিছ ভৈরী করে বেশ। হবে না কি আর এক ডিল?'।

লুন পের আপত্তি হলো না। সত্যিই ব্রিচ বেশ ভালো ভৈরী করে। বচমন্ডে আর পরম। নীতকালে আরও বোধ হয় ভালো লাগবার কথা।

মোরোংগার বাড়িটা দিম্বের দিকে টেনে দিয়ে সোরে

মঙ কথটা পাড়লো, 'এবার বলুন ছুই ভালোহলে দিলে কিলের কথা হুজিলো?'।

'এই মত সব বাজে কথা লুন পে আমতা আমতা করলো।'।

'ওনিই না। বাজে কথা একটু, অম্বস্ত যদি আপত্তি না থাকে।'। সোরে মঙ নাহোড়বালা।

'এই বেণের কথাই হুজিলো,' লুন পে আলগোহে উত্তর দিলো, 'ইংরেজরা কি ভাবে পানের তলার রেখে আমায়ের লাগুন করছে, সেই কথাই বলাবলি করছিল।'।

'সর্বনাশ, রাজনীতি?'। সোরে মঙ ছোট চোখছুটো এয়ে কপালের মাঝ বরাবর ফুলে কেললো 'মোহাই আপনার, আর গুনতে চাই না। ও জিনিবটা আমার মাথায়ই ঢোকে না।'।

লুন পে ব্রিচের ডিলটা সরিরে রাখলো। এখির পকেট খেঁচে কনাল বের করে লম্বরে সুখের ছুটো পাশ হচ্ছে নিলো। ভুতছুটো হুচকে বললো, 'কানে হাতচাপা দিলেই কি আর রেহাই পাবেন। গলাগালিই না হয় স্তনতে পাবেন না, কিছ পিঠের চাকুতের রাগগুলো লুকাবেন কি করে?'।

পকেট খেঁচে ব্যাগ বের করে সোরে মঙ মেয়েটির সামনে দাম কেল দিলো তারপর লুন পের হাত করে টেনে ফুলে বললো, 'চলুন চলুন, ওঠা বাক। দিনেবা ভেঙেছে, এইবার ভীড় গুচ হবে।'।

ছুমনে সাতার গিরে পাড়লো। ফ্রেমার স্ট্রিট দিয়ে পূবদুখে চলতে চলতে সোরে মঙ এক লম্বরে বললো, 'বরদার পণে খাটে রাজনীতির খুঁদী একবারে আঙ-ডাবেন না। আপনার সত্যমত সিজের কাছেই রাখবেন। ল্যাম্পপোষ্টেরও কান আছে। কোথা দিয়ে কি বিপদ ঘটে বার, ঠিক আছে?'।

খীকার করলো লুন পে। সত্যিই তার উচিত হর-নি পণে খাটে এদম কথা আলোচনা করা। নতুন লোক, লম্বরের হাসচালের কিই বা জায়ে। বোখা দিয়ে কি হবে যাবে, ঠিক আছে? গড়াশোনা করতে এসেছে

এখানে, কি হরকার এলব পোলমেলে বাপারে বাবা গলাবার। বেশের কাজ করতে হয়, পরে সাবাজীবন পড়ে রয়েছে। কলেজের পড়া শেষ ক'রে এলব করার সময় পাবে।

মুদিত আর বোবোংগা পেটের মধ্যে গিরে কাজ শুরু করেছে। কেমন ঢাকা ভাব। ভরা পেটে পুথিবীর তীজ, ধোঁয়া হলো সবই ভালো লাগছে। সারা ভ্রমুরটা অথবা হৈ চৈ ভরকৈ নষ্ট করেছে তাইতেই মুন পে লক্ষিত হয়ে পড়লো। কদল বোসের যেমন কাণ্ড। গ্রিক কপাই লেখা আছে হলবরের দেয়ালে। পড়াশোনা ছাড়া ছাত্রজীবনে আর কিছুই করার নেই, করা উচিতও নয়।

'কি কুপচাপ যে! কথাটা মনঃপূত হলো না?' সোহে মও হাসতে হাসতে বললো।

'না ষ্টিক কথাই বলেছেন। আমিই বোকার মতন আবেল ভাবোল বকতে বাচ্ছিলাব।'

'সব জিনিষেরই সময় আছে তাই, লাকালাকি করতে গেলেই বিপদ। অসময়ে গাছের ডলার গিরে চোচামেচি করলে কি আঁর মরিষম পাবে। সে পাকে নিজেও সময় হলে। এ-বয়সে খালি উজ্জ্বল আর হৈ চৈ। কাজের কাজ কিছুই হয় না।' সোহে মও খেবে পড়ে কিছুকণ চেয়ে বইলো মুন পের দিকে তারপর বললো, 'সব পাবেন না। এলব আবার কথা নও, সেটা বা জ্ঞানের কথা। বেশবোতা লোক। ইংরাজী ক্লাসেই পলিটিকস শুরু করে ফেলতেন।'

'সেটা বা জ্ঞানের কাছে পড়তেন আপনি?' কৌতূহল যেন উপরে পড়লো মুন পের গলায়।

'হ্যাঁ পড়েছি বইকি। আমরাই তো তাঁর শেখ ছাত্র। সেই বছরেই তাঁর ডাকবী গেলো। দেখবেন লাখবান, বোটর আগছে।' সোহে মও হাত দিয়ে মুন পেকে ঠেলে দিলো।

লাখবানে দুজনে রাজা পাথ হয়ে ওপারে চলে গেলো।

আলোর বেলা। ছুটপাথ জুড়ে ছোট ছোট বোকানের সার। হরেক রকমের খেলনা আর গৃহস্থের নিত্য জয়োজনীর টিকিটাকি জিনিষ। তীড়ের অস্ত নেই। বোকানীরা একমুহুরে গান গেয়ে চলেছে, 'সে যাও সে যাও মো আনা চুনকে সে যাও মো আনা, দেখকে সে যাও মো আনা—'

সোহে মও মুন পের দিকে ফিরে বললো, 'এই হচ্ছে রেগুনের নাইট হার্টেট। দিনের বেলা দেখবেন তেঁ। তেঁ। আর রাত সাভটা না বাছতেই ব্যাঙের ছাত্তার মতন সারা ছুটপাথ জুড়ে সব বোকান গজিরে উঠবে। গাঁড়ান কিছু শব্দটা করতে হবে। তীড় ঠেলে সোহে মও বোকানের সামনে গিরে ছাতির হলো। হিসেবী লোক। পাকা গৃহস্থ। খুতো, বোতাম আর সূচ কিনলো এক বাঙাল। আবার বোতাম, ছাত্তার স্লিপ সব মিলিয়ে আর টাকা ছরেকের জিনিষ।

প্যাকেট হাতে করে বেরিরে মুন পের কাছে এসে বললো, 'বদন নিষের হাতে কামার বোতাম আর হেঁড: মুগী সেলাই করতে হয়, তখন সত্যিই কামা পড়ে। মনে হয় ভালো হবে যদি সেলাইটাও শিখতাম তাহলে এ জুজোংগ হতো না। এমিক ওমিক কোনমিকই হলো না।'

সোহে মওর কথা বলার ভংগে মুন পে মশকে হেসে উঠলো, 'কেন, চাকর বাকরদের কাউকে দিয়ে দিলেই তো পাবেন।'

'সর্বনাশ, এমন কাজও করবেন না কখনো। নিঃস্ব নাটের ওপর কুটের বোতাম বসিরে বেবে। এজি এমন সেলাই করে বেবে যে পরে রাস্তার বেবোলে কুকুরের দল নাঙানিবিদ করে তুলবে আপনাকে।' দুজনেই আবার হেসে উঠলো।

'চলুন, ফেরা থাক এবার। কথার কথার অনেকদূর এসে গিয়েছি। মুন পে ছাত্তার দিকে পা বাড়ালো।'

'হেঁটে নও, চলুন একটা লাফা মিই' সোহে মও হাত নেড়ে রাস্তার পাশে বসা এক লাফাওয়ারলাকে ইংদিত করলো।

হুকনে ভাঁড়ি ঘেরে লাফাও গিয়ে উঠলো। লাফার মাথার ঢাকাটা খুলে দিবে জুতসই হয়ে বসলো।

‘লাফা চড়তে আমার ভালো লাগে না’ মুন পে বললো, ‘নাহুবে টানবে ভাবতেই কষ্ট হয়।’

‘না, আপনার কলেজে না চুকে হুংগীটাউতেই বাধ্যতা উঠিত ছিলো বাবেন বলুন? আমার এক সম্পর্কে কাকা আছেন, বন্ধোংবত্ত করে দিতে পারি।’

মুন পে হেসে হুখ জিরােলো।

কেবরবার হুখে শোয়ে মত্ত আত্মল দিয়ে হুদিতের বোকানের দিকে দেখালো। ভিল বারনের স্থান নেই। সমানে পাতা ছোট টুলগুলো তত্তি তো হ’রেইছে। বোকানের আশে পাশে কাতার দিয়ে লোক অড়ে হয়েছে। মেবেটি একলা সাবলে উঠতে পারছে না।

এ লোকানটার এ তরাটে খুব নাম। ড দিরা বুড়ীর বোকানের হুদিও আর বোয়েংগা খুব নাম করা। সমায়ে ছবার ক’রে এ বোকানে না এলে আমার জীবনটাই বিখ্যদ হ’রে যায়।

গেটের নখা দিবে লাফা কলেজে চুকলো। ভাড়া চুকিয়ে দিবে শোয়ে মত্ত বললো, ‘চলি। আপনি পড়াশোনা করুন গে।’ ভড নাইট।’

উত্তরের অগেকা না ক’রেই শোয়ে মত্ত গট গট করে বারান্দার ওপাশে চলে গেলো।

বাত বেশী নয়। এখনও মাঠের এখানে ওখানে ছেলের দল জটলা করছে। বারান্দার এ কোণে সিনেমা ফেরৎ ছুটি ছেলে ভুল্ল ভল্ল ফুড়ে দিবেছে যা সিরা ধিনের অভিনয় প্রভিতা দিবে। আবহা অঙ্ককারে চেনা গেলো না হুকনকে। বাধ হয় সিনিয়র ক্লাসের হাজি। পান কাড়িয়ে মুন পে ওপরে উঠে গেলো। সিঁড়ির মুখেই হুক লিমের সংগে মুখোমুখি দেখা হ’লো। গারে তোয়ালে অড়িয়ে বারান্দার বেলিংয়ের ওপর পা হুসিয়ে ব’লে শিল দিচ্ছিলো। ননে হ’লো ব্যায়াম সেয়ে বেধ হয় স্থান করতে ব্যাকার ভোডভোড করছিলো। মুন পেকে দেখে এক গাল হেসে বললো, ‘এই বে

ভালোছেলে, কতদূর বাড়িয়া হ’রেছিলো?’

‘হুতি বারানের দিকে’ মুন পে চলতে চলতে উত্তর দিলো।

‘ড মিটার বোকানে তো? আগেই বুকেছি।’ হুক লিম লাফিয়ে বারান্দার ওপর নামে পড়লো।

‘কে বললো আপনাকে?’

‘এসব বলতে হয় না। শোয়ে মত্ত সংগে ছিলো তো, আর বাবেন কোথার। আমারে ছুদিন নিরে যেতে ডেরেছিলো, দুই দুক, ও সব ছাই পাশ এই গরবে গিললে কলেরা হ’রে পড়বে।’ কথার সংগে সংগে হুক লিম ছ’হাতের মজবুত পেশীভলো চালনা ক’রে নিলো। তোয়ালে দিয়ে হুকটা সময়ে মুছে নিলো। আবহা অঙ্ককারে মুন পের চোখ এড়ালো না। হুগঠিত পেশী প্রশস্ত হুক, হাতের নীল শিরাস্তিলো মুলে মুলে উঠেছে। পরীরের পিছনে হুক লিম কি কম কদরং করে। শুধু এক নম্বরে দেখবার নয়, অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবার মতন চেহারা হুক লিমের।

ভালা মুলে ঘরে চুকে মুন পে পাখা আর আলোর সুইচ একসংগে টিপে দিলো।

বই নিয়ে বসতে হবে। ইতিহাস আর ইংরেজী বইটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। গোড়াতেই চিল ফিলে শেষের দিকে আর ভাল পাবে না। অর্ধে অলে হাবুতু খেতে হবে।

মুন পে দরজাটা বন্ধ ক’রে দিলো। সামান্য আওরাচ্ছেই ওর আবার পড়ার মূত হয় না। বরগোল প্যাটার্ণের হেলেটির পড়ার পক্ষ কেসে আসছে। খুব চাপা কান্নার আওরাচ্ছের মতন ইনিরে বিদিয়ে হুয় করে পড়ছে। মুন পে বইয়ের ওপর ঝুঁক পড়লো।

অনেকক্ষণ পর। বস্টাখানেকের কম নয়। দরজার খুট খুট আওরাচ্ছে মুন পের চমক ভাঙলো। কে আবার এমন সময়ে আজ্ঞা দিতে আসলো। হুক লিম না শোয়ে মত্ত। হুড়িল। দির্ঘকালটে পড়াশোনা করার

স্বযোগ না পেলে তো অস্ত্রবিধাই হবে। হুন পে বিরক্ত হয়ে উঠলো।

দমক্সা খুঁলেই হুন পে ঠাড়িয়ে পড়লো। ওরা কেউ নয়। হোটেলের বেকার।

‘কি খবর?’

‘আজ্ঞে, আপনায় চিঠি।’

‘চিঠি?’ হাত বাড়িয়ে হুন পে চিঠি নিলো তারপর অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ ঠাড়িয়ে বইলো বাড়ির তলার।

মা শিনের চিঠি। এবার আর পক্ষে নেই। গোটা গোটা অক্ষরে মা শিন নিজে টিকানা লিখেছে। ‘কলেজ কথাটা ছুবার কেটেছে, কিন্তু ওর নামের বেলার ভুল করে নি। টিক লিখেছে আঁকাবাঁকা অক্ষরে ‘বঙ হুন পে।’ এতদিনে বুঝি সনয় হ’লো মা শিনের। বিমেনী লোকটাকে মনে পড়লো এতদিন পরে। চিঠিটা খুলতে গিয়েই হুন পে বাধা গেলো। ঢং ঢং করে বাবার মন্ডা বেঁধে উঠলো। চিঠিটা টেবিলের ওপর রেখে এলি গারে দিয়ে নিলো। খেয়ে এসে পড়বে চিঠিটা। একবার, দুবার ক’রে নয়, সারারাত হ’রে অনেকবার ক’রে পড়বে। ওর জীবনের প্রথম চিঠি। এতোকাল অক্ষরে মা শিনের স্পর্শ। দমক্সা বন্ধ করতে গিয়েই কি মনে হ’লো। তা কি হয় কখনো। এই অন্ধকারে বন্ধ ঘরে মা শিনের চিঠিটা টেবিলের ওপর বাজে আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকবে? চিঠিটা তুলে নিয়ে এঞ্জের পকেটের মধ্যে রাখলো। এই বেশ। নড়তে চড়তেই খচ ক’রে লাগছে, তুলে বাবার উপায় নেই। বুকের কাছেই রইলো মা শিনের চিঠিটা—চিঠিতো নয়, মা শিনের বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শ সব কিছু যেন জড়ানো রয়েছে এতে।

বাবার ঘরে ঢুকে হুন পে ঝালি টেবিল খুঁজতে লাগলো একটা। আজ আর অস্ত্র কারোর সঙ্গে বলতে ভালো লাগলো না। চুপচাপ বলে কোন রকমে খাওয়া শেষ করে ফেলতে হবে। চেখে চেখে চেখে চিখে খাবার সনয় নয় তো আজ। হুন পে চকম হ’রে

উঠলো। সারা হল ঘরে ছেলে ঝিক ঝিক করছে। ঝালি চেয়ার পাওয়ারই দ্রুত। খুঁজে খুঁজে বাথিকের কোণ বেঁধে একটা চেয়ারে বলে পড়লো। মায়ের ছুটি ছেলে বলে রয়েছে। কথাবার্তার সিনিরর হাত বলেই মনে হ’লো। হুন পের দিকে আলতো একবার নুটি দিয়েই তারা নিজেদের আলাপের খেঁই বরলো। ভালোই হলো। কথাবার্তা বলবার মতন মনবেজাজ হুন পের নয়। কি কথা কি উত্তর দিয়ে ফেলবে ঠিক আছে।

‘হুন মত্তের ওপর কিছু অবিচার করা হ’রেছে, কি বলেন?’

‘আবার তো তাই মনে হ’লো। ওর ‘হাটির ভাঁড়’ ছবিটা আমার অতুল লাগলো। ‘কাঠে গ্রাইজ’ সেওরা উদ্ভিত ছিলো।’

‘ছবিটা খুব ভালো হয়েছে বুঝি? আমি হুন মত্তের এ ছবিটা দেখিনি। আগের বারে ‘ভালবন’ ছবিটা আমার খুব ভালো লেগেছিলো। তত্ত্বালোকের সংস্করণ হাত অপর্য। টিক মনে হয়, ছবিগুলোর ওপর সংস্করণ হয় নি, সংস্করণে যেন ওরা জমেছে।’

খেতে খেতে হুন পের কাণে গেলো কথাগুলো। একজন এঞ্জিভিশন ফরম। ছবির আলোচনা হচ্ছে।

‘হাটির ভাঁড়’ ছবিটা কিন্তু একেবারে অস্ত্র ধরণের। বিষয় বস্তুটা হচ্ছে, একটা ভিথিরী গাভের তলার মেরে পড়ে আছে। তার লাটিটা তখনো বুকে জড়ানো। কিছু দূরে ভাঁড়টা ছিটকে পড়ে চিড় খেয়ে গেছে। সব মিলিয়ে চমৎকার ছবি। আমার সব চেয়ে ভালো লাগলো ‘হাটির ভাঁড়’ নাথটি। হুনকো জিনিব, সামান্ত জাঁজড়েই চিড় খেয়ে যায়—সব ভিকারুস্তির প্রতীক। আইডিয়াটা খুব সুন্দর লাগলো। সত্যি, এ ছবিটা তুলে করা অবিচার। মা শোরে মস্তর, মেয়ে ব’লে তার আঁকা ‘কাঠের পুতুলটাকে’ প্রথম পুরস্কার পাইয়ে দেওয়ার কোন মানে হয় না।’ ছেলোট উত্তেজিত হ’রে উঠলো।

১৩০৭৭৪

হুন পে ছ' একপ্রাণ যেয়েই উঠে পড়লো। আলো লাগলো না। বহু জীড় এখানে। ছেলেদের বৈ হুমা, পাখার আওয়াজ, বহুদের ছুটোছুটি, ক্রাণ বেন হাঁকিরে উঠলো।

মেট ঠেলে রেখে হুন পে উঠে পড়লো। সামনে বসে ছেলোট একবার ওর আঁখি খাওয়া মেটের দিকে আর একবার ওর দিকে চেয়ে দেখলো।

শিঙনের দরজা দিয়ে হুন পে বাতাসটার চলে এলো।

ঘরের দরজা ভিতর থেকে ভালো। ক'রে বন্ধ ক'রে এজির পকেট থেকে চিঠিটা বের করলো। সাবধানে খানেক কোণটা ছিড়ে চিঠিটা বুলে নিয়ে টেবিলের কাছে গিয়ে বসলো।

অনেকখানি লিখেছে মা শিন। ছোট ছোট অক্ষরে ছ'পাতা ভ'রে লিখেছে। সবোদন ক'রেছে 'শবরের বন্ধু' ক'লে। মাসীর বাড়ীতে অনুখে পড়ে গিয়েছিলো মা শিন। জর। মাথা ভেলেবার উপায় ছিলো না। মিন করেক পথা করেছে। এখনও শরীর দুর্বল। মাথা কিম্বিন করে। হুন পের বৃকের তেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ভালোমতে না সেয়ে উঠে কেন এতো পরিশ্রম করতে গেলো মা শিন। এতখানি চিঠি না লিখলেই তো হ'তো। কিংবা শুধু ছ' লাইন। অনুহ, সেই অনু লখা চিঠি লিখতে পারলো না, পরে বড়ো চিঠি দেবে। আগের বারের মতন মা শিনের যাও তো জানাতে পারতেন বহরটা। চোখ বন্ধ করলেই মা শিন নাকি দেখতে পায় লালা শাখু ঢাকা একটা গরু পাড়ী ক্যাচ কোঁচ লক করে বেটো। পথ ধরে এঁকে বৈকে চলেছে—ভর মনের পথ ব'রেই চলেছে হুঁকি নিফুদেপের দিকে। এখনও থাকে থাকে মা শিন গাঁ ছাড়িয়ে পানের বরজের কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। আঙনের হুকার পানভলো শুকিয়ে দালচে হ'রে আসছে, কিন্তু মা শিন সেদিনের ঘন সবুজ চকচকে পানভলোই দেখতে পায়। মনের রয়ের হোয়ার লখই বহু আঁর উজল মনে হয়। হুন পের শাল্পানটা তুলে নিয়ে গেছে। কোকোপিন গাছের

গোড়ার কাছি ধাঁধার দাঁপটা কিছ এখনও স্পষ্ট। কতদিন মা শিন গাছের তলায় বসে সেই দাঁপের ওপর হাত বুসিয়েছে। আশ্চর্য, কতদিন থাকবে এই কাছির দাঁপটা!

শেষের দিকটা পড়ে হুন পে স্বপ্নির নিঃশ্বাস ফেললো। হুন পের চিঠিটা খোলেন নি বুড়ী। শুভ্রীর হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছিলেন, মা শিন ফিরে আসলেই তার হাতে তুলে দিয়েছেন।

ভালো লাগছে না মা শিনের। ক'দিনেই বেন বিভূকা এসে গিয়েছে। কলেকের ছুটি হ'তে আতো কতদিন থাকি? হুন পে কবে ফিরবে সোরোবিন গারে?

হুন পে চমকে উঠলো। টপ টপ ক'রে ছুঁ কোঁটা জল চিঠির ওপর পড়তেই নিজেকে সাহসে নিলো। এজির হাতায় চোখ ছুটো মুখে নিয়ে আন্নার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। হুব গরম হচ্ছে। আওয়াজের ভরে হুন পে পাখাটাও খোলেন নি। বৈ চৈ গোলমালের মধ্যে কি পড়া যায় মা শিনের চিঠি। পাখার ব্রইচটা টিপে মিটেই দরজা হাওয়ায় মা শিনের চিঠিটা উড়ে পড়লো বেবের। হুন পে চিঠিটা হুড়িয়ে নিয়ে বাগিশের তলায় রেখে দিলো। ছুটি হবার এখনও অনেকদিন থাকি। তবে তো কলেক বুলেছে। মা শিনের সংগে দেখা হবার কোন উপায়ই নেই। কাহাকাছি রাজা তো নর, বে ছ' একদিন ছুটি নিয়ে বুবে আগবে চট ক'রে। তারি সূক্ষ্ম চিঠি লিখেছে মা শিন। লেখাপড়া জানা মেয়ের মতন কথার গাঁবনি। লেখাপড়া লিখলেও তো পারতো মা শিন। একসংগে সহরে এসে পড়তো মলেন। ও এখানে থাকতো আর মা শিন থাকতো বেবেরের হোটেলে। ক্রাসে অভ ছেলেমেয়েদের নজর এড়িয়ে চোর। চাউনি ছুঁড়তো। হু একদিন বরত বরগ পড়ে যেতো। হু একটি বেবের মুখ টিপে টিপে হাগতো, মা টেপাটেপি করতো আর কুঁকে পড়ে মা শিনকে বলতো এক লম্বের 'কি ব্যাপার, একেখানে হাবুডু খাচ্ছে বা বে? নতুন আলাপ না একেবারে গাঁ থেকে ইতনীতে গেছে সংগে নিয়ে এসেছো।'

‘আপনার দিকে ঘেঁষেটা কি বিধিভাবে চাইছে দেখুন। খেলোয়াড় ঘেঁষে। কলেজে তো আর পড়তে আসে না, এই করতে আসে।’ বরগোশা প্যাটার্নের ছেলেটিকে বোঝায় এর চেয়ে আর বেশী কিছু লুন পে বলতে দিতো না। টুটি চেপে ধরতো, কিংবা চোখ রাঙিয়ে বলতো, ‘খবরদার লুন সাহসে কথা বলবেন।’

বৌদ্ধের মাথার লুন পে জানলার পরামর্শগুলো শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছিলো, খেরাল হতেই চেড়ে গিয়ে সরে দাঁড়ালো। ‘কি সব আবেশাল ভাবোশ বকছে! নিজেই গড়ছে আর ভাঙছে। মাথা খারাপ হবার আর বেরী নেই।’

লুন পে বিছানার টান ছবে তরে পড়লো। পড়ার বইয়ের আঁজ আর মন বসবে না। পাতা খুললেই যতো রাক্ষাস চিত্তা এসে চুকবে মাথায়। বা শিনের চিঠিটা খুলে আবার পড়তে শুরু করলো। কালই উত্তর দিতে হবে। লিখে দিতে হবে বা শিনের শরীর সম্পূর্ণ না সেরে ওঠা পর্যন্ত চিঠি লেখবার দরকার নেই। শরীরের দিকে ঘেঁষেটা কোনদিন যদি একটু বয় নেবে।

লুন পের মনে পড়লো। ‘অনেক দিন আগে মরিচম বনের ভেতরে বা শিনের ছোটো হাত ধরে নিজের দিকে টেনে আনতে গিয়েই লুন পে চমকে উঠেছিলো। ‘এ কি, গা খেন পুড়ে বাজে! জর হয়েচে না কি।’

বা শিন বাড় বেড়ে ছিলো। ‘গাঝার একটু গা গরম হয়েছিলো। সকালের দিকে, বিশেষ কিছু নয়।’

‘বিশেষ কিছু নয় মানে? গা খেন আঙন। বেশ জর হয়েচে।’ বা শিন বিলম্বিত করে হেগে উঠেছিলো। ‘বাজে, তুমিই তো হাতছানি দিয়ে ডেকে আনলে। ডেকে এনে এখন গালাগাল মিছে, বেশ লোক তো!’

কি অবুত ঘেঁষে। লুন পে ডেকেছিলো বলে জর গায়েই বৃদ্ধি বেগিয়ে আগতে হবে এমন করে? কেন

বললেই হতো শরীর খারাপ।

‘হু’ এগিয়ে এসে বা শিন লুনপের বুকে মাথাটা রেখেছিলো, ‘তুমি ডাকলে না এসে থাক! বার কখনও!’ অবুত মেরে।

পাখার একটানা অব্যবহ শব্দ। বুদিয়ে ঢেঁকু উঠলো। বিধি গজ। উঠে এক রাস জল খেলে হজো। উঠতে ইচ্ছা করলো না। ভবেট গরম। কেন যে মাহুদ শহরে আসে তার ঠিক নেই। বা শিনের চিঠিটা বুকের ভপর বরা রয়েছে। চিঠির কোনগুলো পাখার হাওয়ার ধরবার করে কাপছে। প্রথম চিঠি গুর জীবনে।

দরজার টোকা। পড়তেই লুন পে ঝড়মড় করে উঠে পড়লো। কে ডাকছে এত রাতে? দরজার শূণ্যীর ভপারে গুয়ার্ডেন উ মিস্টের বলগলে ঘুট্টা দেখা গেলো। কি ব্যাপার। লুন পে ভাড়াভাড়া বরজা খুলে দাঁড়ালো।

‘বারোটা বেজে গেছে। এগারোটার পরে বাতি জ্বলে রাখবার নিয়ম নেই।’ ঝড়মের খট খট আওয়ার করে উ মিস্ট বারাক্ষার গুলিক চলে গেলেন।

লুন পে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। হোটেলের নিয়ম জেগেছে। হরত কাইন করে দেবেন গুয়ার্ডেন। কালই নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দেবেন এগারোটার পরে বাতি জ্বালিয়ে বুদিয়ে পড়ার জন্ত মন্ত লুন পের এক টাকা কাইন। তা থেকে কাইন দিতে গুর আপত্তি নেই। কিন্তু চারদিক অন্ধকার করে রেখে বা শিনের চিঠি ছোঁয় বার বুঝি? খুটখুটে অন্ধকারে দেখা যায় বা শিনের হাতের আঁচড়! চিঠি পড়া শেষ হয়ে গেলেই চট করে চারদিক অন্ধকার করা বার কখনো। কি মনে করতো বা শিন! অনান্য আর অবহেলার গুর পাতলা ছুটে। ঠোঁট কেঁপে কেঁপে উঠতো। এই চিঠি বুকে নিয়ে আসলো নিভিয়ে যেওয়ার সাধ্য নেই লুন পের। গুয়ার্ডেন যাই কিছু মনে স্কুন।

(ক্রমশঃ)

শিক্ষাসংস্কারের বনিকাদ

ঐহেনন্ড হুয়ার ভরকদার

“ও সহ নাববহু, সহ নৌ ভুনক্ত, সহ বীধ্যং বরবাবহৈ।

ভেদ্যসী নাববীতমত, বা বিবিবাবহৈ।

ও শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।”—উপনিষৎ

কোন মহাপুরুষের এই বাক্য একটি উজ্জ্বল প্রতীকিত আছে : তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল শিশুর শিক্ষা কোন সময়ে শুরু করা উচিত। তিনি বলেছিলেন শিশু জন্মাবার একশো বছর আগে। দৃষ্টান্ত : হৈয়ালী হলেন, এর নিহিতার্থ অত্যন্ত স্পষ্ট। এর হচ্ছে যে সব শিশুর জন্মের পূর্বকার একশো বছর কোন না কোনও কারণে নষ্ট হয়েচে তাদের সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা যায়।

ইংরাজ আমলে আমাদের জাতীয় জীবনের বেবে মিক বিশেষ ভাবে উপেক্ষিত হয়েছিল শিক্ষা তার মধ্যে অন্তর্ভাব—অনেকের মতে প্রধানতম। একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে এই শোষণ মত অতিরিক্তিত নয়। পূর্ণ জীবন গঠনের ক্ষত বা প্রয়োজন—বলিষ্ট মেহ, সাংসারিক দক্ষতা, ব্যাপক সমাজ-চেতনা, নীতি-জ্ঞান, সৌন্দর্যবোধ, ধর্মজিজ্ঞাসা, বুদ্ধি বৃদ্ধি, বলিষ্ট বিবেক, উপার কল্পনা, এক কথায় বা কিছু জীবনকে সার্থকতা দেয়—তার বিকাশ নির্ভর করে উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থার উপর। এর বক্তব্যগুলিতে অবশ্য কুলস্ক্রমের (heredity-র) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অন্তর্গত স্বল্প ভরকের মধ্যে না গিয়ে (বিশেষতঃ যাকে শিক্ষা দেওয়ার এর তার জন্মের ঘটনাটার উপর দখল কারো হাত নেই) সাধারণ ভাবে একথা মেনে নেওয়া চলে যে বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থার দ্বারা বিশেষ দরপের ব্যক্তিত্ব গঠন করা সম্ভব। এই বিষয়ে ইংরাজ শাসকদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এ নয় যে তাঁরা কোনই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত করেন নি। অভিযোগ ছিল এই যে তাঁরা যেটা করেছিলেন সেটা কোন বলিষ্ট ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অসুপযুক্ত। স্বাধীনতা সংগ্রামের দীর্ঘ পরিচালক তাঁরাও অনেকে এই কথা ঘোষণা করেছেন।

এবং এ সংগ্রামে প্রত্যেক কোন অংশ ধোয়া নেন নি—বিশ্বকানন ও রবীন্দ্রনাথের মত ভিন্ন পন্থী ভাবুক—অন্ত অনেক বিষয়ে মতাদৈক্য থাকলেও, এ বিষয়ে এই একটি কথা বলেছেন। ফলে, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বর্গের কিছু কাল পূর্ব থেকেই শিক্ষিত জনসাধারণের কিছু অংশ থাকে বলে শিক্ষা সচেতন (education conscious) হয়ে উঠেছিল। আশা ছিল,—যেহেতু জাতি গঠনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রথম উপাদান হচ্ছে শিক্ষা ব্যবস্থা—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ফলে জাতি বহন মনোমত কাজের স্বাধীনতা পাবে তখন উপযুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের কাজই প্রথম হাতে নেওয়া হবে। এ আশা ব্যর্থ হয়েছে তা বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হচ্ছে গত পাঁচ বছরের চেষ্টায় শিক্ষা সংস্কারের যে পথ চিহ্নিত হয়ে উঠেছে সেই পথে কোন সাফল্য মিলতে পারে সেইটা শিক্ষা সচেতন জনসাধারণের একজন হিসাবে একটু আলোচনা করা। অকপটে মনোভাব প্রকাশ দুর্বলী না হলে একথা বলা চলে যে প্রাক স্বাধীনতা যুগের আশা সফল হয় নি, এবং হবার সম্ভাবনাও খুব জোড়ালো মনে হচ্ছে না। এটা যথেষ্ট সন্তোষজনক বুক্তি নয় যে আত্ম-নিরস্ত্রের স্বাধীনতা পেয়েছি আমরা আজ পাঁচ বছর—এরই মধ্যে কোন বিরাট সাফল্য আশা করা উচিত নয়। বড়তর কোন নিদ্রার মস্ত পাঁচ বছর কেন, পকাশ বছরও যথেষ্ট না হতে পারে; কিন্তু শুরু করার ক্ষমতা পাচদিনই যথেষ্ট। আরো যদি আরো মুকই না—করে থাকি, অথবা বা করেছি সেট যদি যথেষ্ট আশা প্রদ না হয়, তাহলে বুঝতে হবে কাজের দিপাটা আমাদের চোখে এখনও স্পষ্ট হয় নি।

অবশ্য এর ক্ষত বাসুদী ভাবে সরকারকে ধোয়ী করা অন্ততঃ পুরাপুরি ধোয়ী করা, সম্ভবতঃ উচিত হবে না। কারণ সরকার জনসাধারণেরই প্রতিনিধি দ্বারা। জন-চেতনা যে ক্ষয় পর্বৎ পৌছেছে তার বহু উপরের কোন

চৈতন্যর দ্বার থেকে সরকারীভাবে কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। অস্তিত্ব বহু ক্ষেত্রেই মনন শিক্ষা ব্যাপারেও এতদেই জনচেতনতা সমগ্রভাবে আঁজা গুব উঁচু করে উঠেছে। অবশ্য একথা সত্য যে কোন বিরাট ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন নেতা আপন শক্তিতে অদ্বিতীয় জনচেতনাকে অত্যন্ত অল্প সময়ে এক স্থান থেকে দুগুণের পৌঁছে দিতে পারেন। পণ্ডিত জগদ্বদলাল দেহর এমন দৃষ্টান্তসম্পন্ন প্রতিভা কি না, অথবা তিনি বা করেছেন তার চেয়ে বেশী করতে পারতেন কি না, তা নিয়ে তর্ক করা যেতে পারে কিন্তু সে তর্ক অবান্তর। বা প্রাসঙ্গিক এবং অস্বাভাবিক তা হচ্ছে এই যে বিগত দুগুণের বহু ব্যক্তি এবং অব্যক্ত ইচ্ছা। সবেও স্বাধীন ভারতে শিক্ষা সংস্কারের উৎসাহ এখনও কোন নির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করে নি—যেন যৌক্তিকের চারদিকে যথুত্ব অল্প প্রবাহের বহু জনমনের একটা অচেতন আকাঙ্ক্ষা শুধু আপনাকে কেন্দ্র করে এখনও ঘুরে ফিরছে। হঠাৎ এটা অত্যন্তই স্বাভাবিক। কিন্তু মানুষ জ্ঞানী জননেতাদের কাছ থেকে নিছক স্বাভাবিকের অতিরিক্ত কিছু আশা করে। অভিযোগ এ নয় যে আশার দ্রুততম প্রাপ্তি গোটা দেশকে এখনও পৌঁছে দেওয়া হয় নি; অভিযোগ হচ্ছে এই যে নিকণায় নিষ্ঠুরা শতাব্দীর দিশাহীন মানসিক অভ্যাসের অভাব তাকে আন্তিকে নতুন একটা পথে চালানোর আশা না আসছে কোন প্রেরণা, না কোন পাথর।

সরকারী প্রচেষ্টার (যদি আরো কোন প্রচেষ্টা শুরু হয়ে থাকে) সমর্থকরা অসহিষ্ণু হয়ে একশ্রেণে বলতে পারেন—বেশ ত বশাই, নতুন একটা পথের কথা আপনাই বলুন? এর বিনীত উত্তর হচ্ছে এই যে বর্তমান প্রবাহের লেখক নিজে শিক্ষাবিদ নয়, শিক্ষাবীষের পক্ষ থেকে প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির একজন ঘর্ষক রাজ। শিক্ষাবীষের পক্ষ থেকে, প্রত্যয় নিরপেক্ষ ঘর্ষক নয়। দুটি ভঙ্গীর ক্রটি থাকতে পারে; কিন্তু মোটের ওপর এ দৃষ্টিতে যে ছবি প্রতিকলিত হচ্ছে তা নিশ্চয় কোন শিক্ষাবিদের কাছে সর্বোপেক্ষ উপকরণী নয়। জুতা যদি পারে

বিবর্তে তবে সংশোধন করতে হলে আগে জানতে হবে কোণার বিবর্তে, এবং ঠিক কোণার বিবর্তে তা পারের বালিক বস নিবিড় ভাবে ঘুঘুছে, জুতার কাগজগত তত্ত্ব নয়। উদাহরণে দেখলে সরকারী ব্যবস্থা জনসাধারণের ইচ্ছারই প্রতীক রাজ, এবং যেহেতু জনসাধারণের ইচ্ছাটা এখনও কোন স্পষ্ট রূপ নিতে পারছে না, তার প্রতীকও অস্পষ্ট থাকতে বাধ্য। কিন্তু এই অস্পষ্ট ইচ্ছার গোলক-বাঁধার ঘুরে ঘুরে ব্যাখ্যাত হচ্ছে দ্বারা, তাদের বাখাটা কোথায় তা জানাবার এবং জানার প্রয়োজন আছে।

বিগত দুগুণে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার ক্রটি অনেকের চোখে ধরা পড়ে বাস্তবতার পরও এই গোলকবাঁধাটা এখনও আসছে কি করে এটা প্রথম দেখতে হবে। আশার কারণ অবশ্য জটিল কিছু নয়। শিক্ষা সম্পর্কে জাতির ভবিষ্যৎ কল্পনা করে ধারা শক্তিত হয়েছিলেন তাঁরা। বহু দূরদৃষ্টি সম্পন্ন করেকজন ব্যক্তিরাজ, তাঁরা জনসাধারণ নন। এদের কাছে শিক্ষার যে সংজ্ঞা, সমাজের গড়পড়তা ব্যক্তির কাছে সে সংজ্ঞা নয়। শিক্ষার উদ্দেশ্য হেসেলে (যেহেতুও) মানুষ করা। কিন্তু মানুষ কাকে বলে তা নিয়ে মানুষের মানুষের মতামতের আছে। অধিকাংশ মানুষের মতে মানুষ হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আত্মকমত (আত্মপ্রকাশের অতিরিক্ত হলে ত ভালই) অর্থ উপার্জন করতে পারে। আত্মপ্রকাশের একটা প্রত্যাবর্ত অবশ্য সমাজের চেতন বা অচেতন মনে নিরন্তর কাজ করছে, তার ফলে এই অধিকাংশের কিছু লোক অর্থের সঙ্গে কিছু সাংস্কৃতিক উপাধান, অন্ততঃ একটা মানসিক চাকচিক্য (refinement) দেখতে গেলে খুশী হয়। কতকগুলি ঐতিহাসিক কারণে ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এই দ্বিবিধ চাকার নিবৃত্তির সুযোগ ঘটেছিল। লুই কারলের Alice in Wonderland এ বর্ণিত আছে গাছের ডাগ থেকে একটা খিজল এ্যালিসের সঙ্গে গল্প করতে করতে হঠাৎ হেসে উঠলো এবং পরে ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হয়ে গেল, কিন্তু এ্যালিস বিম্বিত হয়ে লক্ষ্য করতে লাগলো যে বিভ্রান্ত গলে

পেলেও তার হাসিটি তখনও গাছের ডালে লটকে আছে। আমাদের অবস্থাও হয়েছিল অনেকটা এ্যালিসের মতো। হুল কলেজের শিক্ষা যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছিল সে কবে অদৃষ্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তার হাসিটা এখনও রয়ে গেছে। হাসিটা হচ্ছে গ্রাফুয়েট চাকরিক। একজন নিরক্ষর কিন্তু দরদী স্ত্রীর কারণে চেরে বা একজন অস্বীকৃত গ্রহ সংখ্যার হিসাবে) অস্বাভাবিক চিত্রকর বা সমাজ সেবক বা সন্ন্যাসীর চেরে একজন সাধারণ গ্রাফুয়েটের সামাজিক মূল্য কোন অংশেই বেণী নয়। কিন্তু গ্রাফুয়েটের নিজের এবং তার পরিচয়নের ব্যাপার অস্ত্র রকম। এবং বেছেহু সন্ধ্যায় সমাজে (বিশেষতঃ বাংলাদেশে) এক আদর্শ অনুগ্রাহক বা প্রায় গ্রাফুয়েট প্রতি পরিবারেই পাওয়া যায়, গ্রাফুয়েট মোহ বহনিত ধরে প্রায় গোটা সমাজকে ব্যাপ্ত করে রেখেছে। অর্থাৎ সংস্কৃতির পূর্ণ সন্ধ্যায়ের প্রতীক হচ্ছে ব্যাক্সিটেট বা ক্ষয় বা ব্যাক্সিট। কিন্তু কার্যতঃ শেখ পর্যন্ত ব্যাক্সিটেট না হয়ে (দেশে কটা ব্যাক্সিটেটেরই বা দরকার?) ব্যাক্সিটেটের কেন্দ্রীণ হলেও চলছিল। কেন্দ্রীণকে যদি উপোষ করতে হয় (যাকে যাকে করতেই হবে, গভীরতর নেই) তবু সাধনা এই যে সে নিরক্ষর কুলী বা বিড়িওরাশা নয়। সে কালচার্ড লোক। কোনমতে ছুটা বেতে পেলেই এগো যার ভাড়া চৌকির উপর চিংহের গুহে করনা করা চলে "আকবর বাঘশার সঙ্গে হরিণের কেন্দ্রীণ কোন ভেদ নেই।" কিন্তু যখন অস্বাভাবিক ভাবে স্মৃতিষ্ট কালচার লক্ষ্য করতে শুরু করে, "আমি ছাড়া যার থাকে আর একটি জীব, সেটা টিকটিকি।

ততঃ আমাদের সঙ্গে এই গুহ

নেই ওর অস্ত্রের অস্তাব..." —তখনও ছেঁড়া ছাতা রাখছো একসাথে নিলে চলে গেছে একা বৈকুণ্ঠের পানে"—এই আশ্বাসে অনেক শান্ত করা ভারি শক্ত হয়। দীর্ঘ দুই জেনারেশনের নিবিড় নৈরাশ্রমর জীবনের ভিত্তি অভিজ্ঞতার পেছনে ক্রমে অবশ্য এই স্নেহভিত্তি পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। শিক্ষার মধ্য থেকে কালচারের অপেক্ষার

প্রতি যখন উদ্ভূততা ক্রমশঃ কমে আসছিল। বৌদ্ধ পড়ছিল ব্যক্তিগত শিক্ষার ওপর—অর্থাৎ যে কোন রকমে হোক এমন কোন দৃষ্টান্ত অর্জন করা দরকার যার দ্বারা কিছু আর্থিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত হতে পারে। তারপর এলো বিশ্বমুন্ডের আমলের চোরাবাড়ার। চোরা-বাড়ারের কারণেই সেখানকার অল্প কোন পাঠশালা কেউ করে নি। কিন্তু গত দশ এগারো বছরে ইন্ডার জঙ্গ নিবিশেষে মুনকা অর্জনের বেলায় এমন বিশ্বমুন্ডের অস্বাভাবিক পট্টের পরিচয় দিয়েছে যে নিছক অর্থো-পার্জনীয় অল্প যত্নের পরশা খরচ করে কারো কোন একটা কিছু শিখতেই হবে এ কলঙ্কের আর বড় একটা কারো ব্যাপার কথা নয়। কিন্তু তবু থাকছে। তার কারণ অস্ত্র বহনিত। প্রথমে কয়েকটি এই যে সংস্কৃতির অস্ত্র কিছু লোকের লোভ চিরকাল আছেই, থাকবেও। যাদের এ লোভ তত দুর্বীর নয় তাদের আছে বড় চাকরীর লোভ। যদিও বেথা থাকে বড় চাকরী সবার ভাগ্যে ছুটছে না, তবু এটোও সত্য যে তাদের জুটছে তাদের বিশ্ববিভাগের ইচ্ছানীতে ছেকেই তবে নেওয়া হচ্ছে। ভারী জীবনের পথের কোন্ অজ্ঞাত বাক্যে কোন্ দৈবী সুযোগ অপেক্ষা করে আছে তা যখন জানা নেই তখন বিশ্ববিভাগের প্রাণ একবারে না মাড়া-নোর সংকল্পটা কোন কাজের কথা নয়। তাদের গুহ চাকা হলেই সব অস্ত্রা যেনে তাত্ত্ব্য ক্রমে এটা অদৃষ্টব করছে যে জীবিতের বস্ত চোরাবাড়ারের উচ্চ মুনকার পথও সবার পক্ষে লুপ্ত নয়। এ ছাড়া আরো অনেক রকম আশা আকাঙ্ক্ষা, সুবিধা অসুবিধার হিসাব নিকাশ আছে। এইসব একসাথে মিলেমিলে যে পাট বা অস্পষ্ট স্নেহভাব একটা সামাজিক দাবীর আকারে আমাদের চেতন যখন উপরের স্তরে তুলে উঠছে, এবং যে দাবীর দ্বারা সরকারী নীতি গঠিত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এই যে শিক্ষার একটা বিধানো রাখাণ থাকাই চাই। তবে পথটা আগে বড় সংকীর্ণ ছিল। ওটাকে বাড়াতে হবে—এমন চপ্তা করতে হবে যে আর্থিক ও সংস্কৃতিগত বস্ত

বিচিত্র পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে। জীবনে তার সমস্ত-
জন্মের বার ঘেঁষে ঘেনে যায় পথটা—যাতে পথচারীরা—
আপন আপন রুচি বা হুবিধা অনুযায়ী এক পদক্ষেপেই
পথের পাশের যে কোন পাকা বাজীর চত্বরে গিয়ে উঠতে
পারে। প্রাচীন রোমের লোকেরা বড় এক মন্দির তৈরী
করে উৎসর্গ করেছিল: "To all the known and
unknown Gods." এখানেও এই মনোবৃত্তি কাজ
করছে। জীবনের অবিচ্যুত দেব দেবীদের অনেককে
জানা গেছে। কিন্তু জানা চেনা যাচো হয় নি, এমন
আরো অনেক থাকতে ত পারেন। তাঁদের কার কোন
মূলে পরিচুষ্টি ভাও জানা নেই। সুতরাং কোন অনিচ্ছা-
তার হুঁকি খাড়ে না নিয়ে প্রথম আঠারো বিশ বছর
যের জানা এবং অজানা সমস্ত দেব দেবীর পূজার ভক্ত
বিচিত্র মূলের একখানি ভালি রূপে জীবনটাকে সাধিয়ে
কুলতে হবে।—সাংসারিক দৃষ্টিতে এ হিলাব একেবারে
নির্গুণ্ড, বাকে বলে fool proof কিন্তু এর ব্যবহারিক
রূপটা কি?

সেটা হতে চলেছে এই রকম:—প্রাথমিক ও
মাধ্যমিক শিক্ষার মাধ্যম বাছুত্যা—শিখতেই হবে।
কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরী পাওয়া যাবে না—এই
মনোভাব নিয়ে জীবন শুরু করা কোন কাজের কথা
নয়। সুতরাং রাষ্ট্রভাষা শিখতে হবে। বিজ্ঞানের
উচ্চতম সোপানে কোন ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে ওঠা
সম্ভব নয়, সুতরাং ইংরাজী ছেড়ে দেওয়াটা নিরু-
দ্ভত্তা হবে। 'অর্থাৎ শিক্ষার বাস্তবপন ওড়া হোলো প্রপমেই
তিনটা ভাষা দিয়ে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এ সমস্তটুকুই
তুচ্ছ বৃত্তিগত চিন্তার ফল। Man does not live by
bread alone. বর্ষ চাই, নীতি চাই, প্রাচীন সংস্কৃতি ও
ঐতিহ্যের সঙ্গে যোগস্বত্ব রাখা চাই। অর্থাৎ
সংস্কৃত বা আরবী (সম্ভার অছলারে) শিখতে হবে।
রাষ্ট্রে নেতারা অতঃপর যখন রাষ্ট্রের প্রয়োজননে ভবিষ্যতে
কাকে কোন ভূমিকা অবলম্বন করতে হবে তা কে জানে।
তা হাড়া রাষ্ট্রের ঐক্য বন্ধন করার প্রয়োজনও রয়েছে।

সুতরাং উত্তর ভারতের লোকের কোন না-কোন দক্ষিণ
ভারতীয় ভাষা এবং দক্ষিণ ভারতীয়দের কোন না-কোন
উত্তর ভারতীয় ভাষা শিখা করা উচিত। শিক্ষার দায়বর্ধ
এইভাবে বহিষ্ঠ গতিতে প্রশস্ততর হচ্ছে।

এরপর শিক্ষণীয় বিষয়। গণিত, ভূগোল, বাহ্য
ইত্যাদি আছেই। বিশ্ববোধ বিকশিত করতে হলে
শিক্ষাকাল থেকেই তার লীক্ষা প্রয়োজন। অন্তঃপ্র
পাঠশালায় (Primary School এ) এলো "পৃথিবীর
ইতিহাস।" পৌর জীবন সম্বন্ধে অল্প থাকে উচিত নয়,
অন্তঃপ্র এলো পৌর বিজ্ঞান। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর
অর্থাৎ আট নয় বৎসর বয়সের শিক্ষার্থীর জন্য নির্দিষ্ট
পাঠ্য পুস্তকে State ও Government এর পার্থক্য
সম্বন্ধে আলোচনা দেখতে পাওয়া যাবে। (বইয়ের
লিখনভলি ও অলভারবুদ্ধি ভাষার কথা বাদেই দেওয়া
গেল) স্মরণে জ্ঞান না হলে মনের সৌভাগ্য আছে না,
সুতরাং সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা চাই। বর্ষবোধ বিকাশের
জন্য প্রাচীনাদি অপরিহার্য। (এ ছুটি অবশ্য কোন কোন
মূলের প্রাকটিক্যাল শিক্ষক মহাপরজা একসঙ্গে মিলিয়ে
নিরেছেন মূলের প্রারম্ভে "রবুগতি বাব...কোরাসের
মধ্যে) তারপর আছে চিত্রাঙ্কণ, কারণ রঙের তাৎপত্যের
জ্ঞান না হলে সৃষ্টিশক্তির উচ্ছেদ হয় না। তা হাড়া
কে জানে ছেলেকে একদিন বাধা হয়ে ওড়ারিয়াসি
পরীকাই দিতে হতে পারে। অন্তঃপ্র ভুইং অপরিহার্য।
হাইস্কুলে গিয়ে পরিলর ক্রমে আরো বাড়লো 'বিজ্ঞান
এলো, এলো ভাষাতত্ত্ব। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে
প্রবেশিকা বাংলার পাঠ্য পুস্তকের মধ্যে অন্তঃপ্র
হচ্ছে স্নোতিবাবুর বাংলাভাষা পরিচয়। To all the
known and unknown gods!

কিন্তু এখনও সব হয় নি। হাইস্কুলে এইসবের সঙ্গে
যোগ করা হচ্ছে আগল বৃত্তিগত শিক্ষা, অর্থাৎ খেলনা
তৈরী প্রভৃতি হাতের কাজ, তাঁতের কাজ, কামারের
কাজ, চুতাতের কাজ ইত্যাদি। ছেলেরের সকলকে
এর একটি বা একাধিক শিখতে হবে। Fool proof

সম্ভবতঃ এও সব নয়। এই প্রবন্ধ যে সময় লেখা হচ্ছে সেই লগ্নাহেই দিল্লীতে শিক্ষা সম্পর্কিত এক প্রাক্তন সভার রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও প্রবাসিনী নৈরুতী নীতি ও যত্নসহ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা কোরের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। আশা করা যায় এ বিষয়েও নীতিই কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে।

প্রশ্ন হতে পারে যে এ ব্যবহার বিরুদ্ধে আপত্তি কি ?

উত্তরে বলা যায় যে, এর কোনটার বিরুদ্ধে আপত্তি নেই। সম্ভবতঃই প্রয়োজন। অল্পকাল পরিসরে উপযুক্ত শিক্ষকের ভাবাবদানে সাধারণ বুদ্ধি ও বৃত্তিপক্ষি সম্পন্ন একটি ছেলে বোল আঠারো বছর বয়সে পাঁচ হটা ভাষা অমনায়ে শিখতে পারে, উপরে উল্লিখিত সময়গুলি পাঠ্য বিষয় সম্বন্ধে ঘোঁড়াঘুটি জ্ঞান লাভ করিতে পারে এবং সংগে সংগে ধর্মবোধ, নীতিবোধ ও যত্নসহের পরিচয় দিতে পারে। কিন্তু যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে তার সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন ওঠে : প্রথমতঃ দেখা যাচ্ছে এ পদ্ধতিতে কোন মৌলিক নৃনম্ব কিছু নেই, এটা পুরানো পদ্ধতিরই একটা বৃহত্তর সংস্করণ মাত্র। এতে যদি আশাহ্রুণ কল পাওয়া যায়, আগে তার নি কেন ?

দ্বিতীয়তঃ প্রাথমিক বিভাগে যে ওকতার পাঠ্য চাপানো হচ্ছে তা গৃহ শিক্ষকের সাহায্য ব্যতীত মন্বন করা কোন ছেলের পক্ষেই সম্ভব নয়। সদর অঙ্কে দেখা যায় প্রায় প্রত্যেক ছেলেরই গৃহশিক্ষক আছে। যাদের নেই তাদের পড়া হয় না। দ্ব্যর্থো বিবরণ্যুপেহ মধ্যে পথ হাতছাতে হাতছাতে পড়ার আনন্দই তারা হারিয়ে ফেলে। এর মন্ত্র কি ব্যবস্থা ? এই অল্পত শিক্ষা সম্ভারের কালে বহু জীবনের কোন বকর বিকাশের পথ একবারে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে না কি ?

তৃতীয়তঃ, বৃত্তি শিক্ষার যে ব্যবস্থা হচ্ছে তার সাক্ষ্য কোথায় ? সম্ভ্রাহে এক ঘটা বা দু ঘটা নাড়াচাড়া করে জ্ঞান বোনা দেখা যাবে এই বিশ্বাসে সত্যিই

অঙ্গুর হচ্ছে ভাল জ্ঞাতী লক্ষ্য পাবে এবং শিক্ষার্থীরা খায়াপ জ্ঞাতীও হতে পারবেন কোনদিন। কামার বা চুতার সম্বন্ধেও এই একই কথা বলা চলে। আধুনিক সমাজে গড়পড়তা নকতার কোনই দাম নেই, দাম হচ্ছে বিশেষজ্ঞের। অর্ধ নৈতিক ক্ষেত্রে একথা আরো বেশী সত্য। যে সমাজে স্রষ্টা জ্ঞাতী উপোস করে, সেখানে ছেলের পোষাকী জ্ঞাতী কোন কাজে লাগবে ?

চতুর্থতঃ, এত বিভিন্ন ক্রিয়ই এমন নিপুণভাবে দেখাবেন, আশা করা যাচ্ছে, যারা, তাঁরা সেই পুরাণে শিক্ষক সম্প্রদায়—অর্থাৎ কালচারড ওয়ালোক শ্রেণীর মধ্যে দুহৃত্তম একদল লোক। একদল হিসাবে দেখলেও, এঁরা আবার নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন দলে বিভক্ত—শিক্ষার প্রচলিত বানধণ্ডা অনুসারে এঁদের কেউ উচ্চ—শিক্ষিত, কেউ মাঝারি, কেউ নিম্ন, দুই একজন এমনও থাকে সম্ভব যাদের কোন বিচারেই শিক্ষিত বলা চলে না। এছাড়া আরো একটি শ্রেণী বিভাগ এঁদের মধ্যে আছে এবং সেইটাই বিশেষ করে উল্লেখ্য : এক, যারা নিজে যথার্থ শিক্ষিত এবং শিক্ষকতার কাজে যাদের আন্তরিক প্রেরণা এবং বাস্তবিক নকতা আছে। এঁদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। দুই, শিক্ষকতার কাজে যাদের প্রেরণা আছে কিন্তু পটুতা নেই। এঁদের সংখ্যা অরেকটু বেশী। তিন, যাদের প্রেরণাও নেই, পটুতাও নেই, এবং এরাই সংখ্যা গরিষ্ঠ। এই সংখ্যা গরিষ্ঠেরা শিক্ষক হয়েছেন নিরুপার হয়ে। উপহারত্তর উপস্থিত হওয়া মাত্রই গ্রহণ করতে এঁরা রাজী। কিন্তু যেহেতু সে উপস্থিতি বড় একটা ঘটনা, এঁরা শিক্ষকই থেকে যাচ্ছেন কিন্তু প্রচলিত ব্যবহার মধ্যে এই শ্রেণীবিভাগকে কোন গুরুত্ব দেওয়া হয় নি বা দেওয়ার সুবিধা নেই ; সোচ্চ ঘরে নেওয়া হয়েছে যে, শিক্ষকের চাকরী যাদের দেওয়া হয়েছে তাঁরা সবাই শিক্ষক। দ্বিতীয়তঃ ধরে নেওয়া হবে—এবং এইটাই অত্যন্ত যারাম্বক রকমের কারণ যে যদিও এই সব শিক্ষকদের শতকরা ৯৯ জনের দুবেলা পেট ভরে খাওয়া কোটে না এবং এঁদের অধিকাংশেরই

নিষেধের ছেলেখেয়ের অর্থাভাবে উচ্চ শিক্ষার আলো কোনদিন দেখতে পায় না, তবু এঁদের আগ নিঃস্বার্থ লম্বা হিঁচকিবার এমন নিবিড় প্রেরণার নিরন্তর উৎসূহ যে, অস্ত্রের শব্দের শিক্ষার অস্ত্র এঁরা অকাতরে স্বীকারের পটিন ত্রিশ বৎসর প্রতিদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে বাবেন। এ ট্রাজেডির প্রস্তাবনা হচ্ছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিশুর অধ্যয়ন আরম্ভের প্রথম তরেক বৎসরই বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় অধ্যয়নে বাণের কুচি কন্দে, পরবর্তী কীমদে বহু বিদ্র অতিক্রম করেও তারা শিক্ষার অস্ত্র অধ্যবসায় করতে পারে। অশিক্ষিত অশুই শিক্ষকের হাতে এই সময় যারা অধ্যয়নে কুচি হারালো তাদের উচ্চশিক্ষা দেওয়ার চেষ্টা কিছুতেই সফল হতে পারে না। কিন্তু বিশ্বস্তের বিশ্ব হচ্ছে এই যে, শিক্ষা ও গৃহস্থের দিক থেকে আর অবিসংবাদিত ভাবে তাদের অধিকাংশ কৃতীর শ্রেণীর তাঁদেরই হাতে দেওয়া হয়েছে প্রাথমিক শিক্ষার ভাব। উচ্চ বিদ্যালয়ে বড় বড় ছেলেদের ধারা পড়াবনে বলে ট্রেনিং পাশ করতে থাকেন তাঁদেরও শিশু মনস্তত্ত্ব পড়তে হয়, কিন্তু পাঠ্যপালে বেগম শিক্ষকরা প্রতিদিন নিহক শিশু নিয়েই কারবার করবেন শিশু মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে ছ' একটা কথা তাঁদেরও জানতে হবে এ দাবীটুকুও এ সমাজে হুজিযুক্ত বলে মনে হচ্ছে না। দাড়ি কামানার যত একটা সাধারণ কাজের অস্ত্রও মানুষ আনাড়ী নালিতকে ডাকে না, কিন্তু সমগ্র উত্তর পুরুষের সাংস্কৃতিক দীক্ষার প্রথম আচার্যের পদে মেনে শুনে আত্মান করা হচ্ছে তাঁকে ধীর আচার্যের কোন অধিকারই নেই। এবং এতে আমাদের বিবেক বিন্দুনাশ হুজু হচ্ছে না।

ফলে শিক্ষা সংস্কারের নামে মোট ব্যাপার যা ইচ্ছাচ্ছে সেটা হোলো মাত্র শিক্ষণীয় বিষয়ের বিস্তার। ছেলে একটা ভাষা যদি না শিখতে পেরে থাকে, এখানে তিনটা ভাষা দেওয়া হোক, একদানা খই যদি না বুঝতে পেরে থাকে, পাঁচবানা দেওয়া হোক, কিন্তু শিক্ষা পদ্ধতির আর বাকী আনুষ্ঠানিক বা যেনম আছে তেমনই থাকুক।

স্বপ্ন মন্ডিকে একথা মনে করার কোন হেজু নেই যে শিক্ষণীয় বিষয়ের বহুতাই পূর্বতন যুগের শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যর্থতার কারণ, সেই ভুলই প্রশ্ন ওঠে যে শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার না রেখেই জাতীয় শিক্ষার ভিত্তি বচনা করা সম্ভব হবে ?

শেষতঃ, যে নীতি-শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে তার ভিত্তি কি ? আজকার দিনে সদৃশ নীতির নাপকাটি কার হাতে ? একটা সাধারণ দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক— খেলার মাঠ থেকে ঘরে ফেরার পথে শিব মন্দিরে প্রণাম করে যাওয়া নীতি সম্বন্ধে একদিন নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু বাঘের ঘরে ফেরার পথে একটা বা ভূটা সিনেমা হল পড়ছে তারা যদি সিনেমা দেখতে চুকে পড়ে অথবা নেহাৎ পরলা না থাকলে শুধু দাড়িয়ে নেওয়ারো ঠাঁট। চিত্র তারকারদের নানা ভঙ্গীমূর্তি ছবি দেখে তা হলে সেটা দুর্নীতি হবে একথা কে বলছে ? ব্যক্তিগতভাবে কোন শিক্ষক বা অভিভাবক বলছেন কি না সেটা অবাস্তব এবং অকিঞ্চিৎকর। আজকার সমাজ একথা বলছে না। অকালে যৌন চেতনার উন্মেষ কতিপয়ক বলে যে সমাজ মনে করত সে সমাজ এই উন্মেষের উপলক্ষ্যতলা সমস্ত গোপন করে রাখত। আজকার সমাজ তা করছে না। সমস্তের হাতায় প্রতি বিশ গজ অন্তর নট নটীদের বিচিত্র ভঙ্গীমার দৃশ্য কে না দেখেছে ? কিন্তু ইতোপূর্বে এনকোয়ারার কনিশনের রিপোর্টে দেখা যায় ভারতবর্ষে ১৯৫০-৫১ সালে সিনেমা ইণ্ডাস্ট্রিতে মোট মূলধন ছিল ৩০ কোটি টাকা। এক বছরে ৬০ কোটি টাকা চিকিৎসা বিভাগে ছেড়েছে। ত্রৈমাসিকের মধ্যে শতকরা কতজন ছাত্র ছাত্রী তার অবশ্র হিসাব নেই : কিন্তু সেটা খানিকটা অনুমান করা যায়। কলকাতার আদর্শ জাল কি মল তা নিয়ে হরত তর্ক করা চলে, কিন্তু যা নিয়ে তর্কের কোনই অবকাশ নেই সেটা হচ্ছে এই যে বনভাটিকের অব্যবহিত আনুষ্ঠানিক বনভাটিক সমগ্র সমাজে ছুড়ে যে অসামাজিকতার সৃষ্টি করেছে তার মধ্যে বসে কেউ কলকাতা হতে পারে না। এটা শুধু বিশেষ একটা

ব্যাপার সবচেয়ে সস্তা নয়, এটা সমগ্র নৈতিক জগৎ সবচেয়ে সস্তা। যে সমাজে চোরাখাজারে অজ্ঞার দুলালা না; কচড়ে এখন লোক খুব কমই আছে, যে সমাজে নিচক বেঁচে থাকবার জুড়ই কখনো না কখনো চোরাখাজার থেকে জিনিষ কিনতে হচ্ছে না এমন লোক কেউই নেই, যে সমাজে ভুল কলেজের শিক্ষক অধ্যাপকদের বিরুদ্ধে পর্বত অর্ধদুর্ভূত দুর্নীতির অপব্যব রটছে এবং মাকে মাকে প্রাণগু হচ্ছে, সে সমাজে কিশোর বনে পূর্বানো যুগের কোন নীতি, বহুদুঃখের কোন বড় আশ্বর্ষ নিভড় গজাবে না।

তা হলে কি শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টার কোন সার্থকতা নেই?

সার্থকতা আছে কি না তা নির্ভর করছে সংস্কারকদের বুদ্ধিতর্কী, এবং কালে কালেই, অবলম্বিত পদ্ধতির উপর। গোড়ার উদ্ধৃত মহাপুরুষের উক্তি স্মরণ করা যাক। শিক্ষার জন্ত উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে শিক্ষাবীর জন্মের একশো বছর আগে থেকে। শিক্ষা ব্যাপারটা ডাক্তারী ইন্ডেক্সন নয়; ওটা প্রাণ ও মনের সহজ বিকাশ। গাভি যেমন তার চারণানের ছাওয়া থেকে চোঁচ থেকে জীবনোপজীবী সংগ্রহ করে, শিশুও তেমনি তার চারিধারের মানসিক পরিবেশ থেকে নিজের বিকাশের রসদ সংগ্রহ করে নেয়। যে সমাজের মানসিক পরিবেশে এই রসদ নেই, সে সমাজে পূর্ণ ব্যক্তিগত বিকাশের শিক্ষা হবে না। কার্যসকতা হতে পারে, কেউ ভাল ডাক্তার হতে পারে, ভাল কানার হতে পারে। উপযুক্ত পরিচালনা অর্থ ব্যয় করতে পারলে প্রত্যেক শিক্ষাবীরকেই কোন না কোন কাজে লক করে গড়ে তোলা যেতে পারে, এবং ওপরে আলোচনা করা হয়েছে যে এখনও পর্বত সমগ্রভাবে জনমনের কোঁকণ এই রকমতা অর্ধনেই দিকে। কিন্তু শিক্ষাবিশেষ। যদিও জনসাধারণের এই রাবী ছাত্রাই প্রাধান্য: পরিচালিত হচ্ছেন, তবুও নিজেরের বোঁধ অহুলাবে শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে পূর্ণ বহুদুঃখের আশ্বর্ষও ছুড়ে

ঘিটে চাইছেন, এবং এই কারণেই পোলকর্বাণা থেকে বেরোবার পথ পাচ্ছেন না।

পৌরাণিক যুগে বিবাস ছিল যে গোটা পৃথিবীতে জুটিকল্প হয়ে গেলো তার কল্পন ব্যাপারী লঙ্ঘরে লাগে না, কারণ ওটা: পৃথিবীর বাকী অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন। শিক্ষাবীর মনোবাক্যকে এমন পৌরাণিক ব্যাপারীরা বস্ত করনা করে যে শিক্ষা সংস্কারের পরি-কল্পনা তা বার্য হতে বাধ্য। ভিন্নটি জিনিষ যেনে নিতে হবে: (১) সমাজের মধ্যে শিশু মনকে তার পারিপার্শ্বিক মানসিকতার ছোঁচ থেকে আদগা রাখা বাবে না; (২) পূর্ণ বহুদুঃখের যে আদর্শ বিগত যুগে ছিল তা ভেঙে দেছে, এবং (৩) বর্তমান যুগের আদর্শ এখনও গড়ে ওঠে নি। এগুলি স্বীকার করলে দেখা যায় যে, পূর্ণ ভারতীয় কোন শিক্ষা পরিকল্পনার মধ্যে নিচক দক্ষতার (efficiency-র) বিকাশ ছাড়া অল্প কিছুই বিশেষ কোন স্থান থাকতে পারে না। অর্থাৎ এক কথায়, আপাততঃ বেটা সার্থকতার লক্ষে করা যেতে পারে তা হচ্ছে নিচক technical educationএর বিস্তার।

তার চাইতে উন্নততর শিক্ষা চাইলে উন্নততর মানসিক পরিবেশ (mental climate) আগে সৃষ্টি করতে হবে। অর্থাৎ নতুন সমাজের ভিত্তি রচনা করতে হবে। সে সমাজের কাঠামো কি হওয়া উচিত তা এ প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয় নয়। মোটের উপর কথা হচ্ছে শ্রেণী শোষণযুক্ত সমাজ-রচনার কাজ বৃদ্ধিত রেখে এবং সেখানে হাজারটা পৌজামিগ দিয়ে শুধু শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে হাতারাত্তি একশো বছর এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা সমগ্র, অর্থ ও উৎসাহের অপব্যব এবং আত্ম-প্রতারণা।

কিন্তু নতুন সমাজের পরিকল্পনা বাই হোক না কেন, তা গড়ে উঠতে দেবী হবেই। শিক্ষা বিজ্ঞার ধাঁড়ের ব্রত, তাঁরা ততদিন চুপ করে বসে থাকতে পারবে না ত? তা ছাড়া নতুন সমাজ রচনার কাজে শিক্ষা পদ্ধতিরও একটা প্রভাব আছেই। একদিনের সমাজের

প্রচলিত সভ্যতা বা অসভ্যতা যেমন আপাদী ধিনের শিক্ষার ধারা নিরস্ত্রিত করে, তেমনি আশ্চর্য শিক্ষা পদ্ধতিরও আপাদী ধিনের সামাজিক কাঠামোকে নিরস্ত্রিত করবে। প্রত্যাগঃ দেশের সমস্ত অসংগত তথ্যই নিষ্কৃত কারিগরী শিক্ষার হাতে ছেড়ে দিবে বলে থাকা নিশ্চয় উচিত হবে না।

এ হুক্তি খুবই ষোড়শো, মানতেই হবে। কিন্তু হুক্তি হুক্তি এই যে সমগ্র সমাজের বিক থেকে দেখতে গেলে বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এমনই কাজে নাহতে পারেন তাঁরা ষাদের চোখে তাঁরা সমাজের ছবি পরিচুত হয়ে উঠেছে। এমনই একটি কাজের কেন্দ্র পড়ে উঠেছে পতিচেরী ঐশ্বরবিন্দু-আশ্রমে। সেখানে আশ্রমবাসী ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য যে স্থল স্থাপিত হয়েছে তা ইতিমধ্যেই যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছে। প্রকৃত শিক্ষা সেখানে হচ্ছে এটা নিঃসন্দেহ, কারণ সেখানকার মানসিক আবহাওয়া, সাংস্কৃতিক পরিবেশ আশ্রমের এই সমাজের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং গোত মোহে মুক্ত। সে পরিবেশে শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয়। কিন্তু আশ্চর্য যে কোন একজন বা কয়েকজন লোক গোটা কতক ছেলেমেয়েকে নিয়ে সমাজের একান্তে নিরালায় গিয়ে পড়াতে লুপ করলেই এমন নতুন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি হবে তা মনে করা কুল। পতিচেরী আশ্রমে যা হয়েছে তার স্রষ্টা ঐশ্বরবিন্দু নিজে—ষার মত বিশাল ব্যক্তিত্ব হাজার বছরের একটি মধ্যে কিনা সম্ভব। তাঁর পরিচালনা যা সম্ভব হয়েছে, অজ্ঞের হাতে তা হওয়া সম্ভব নয়। প্রেসদন্তঃ সাংস্কৃতিক শিক্ষার ভারত সরকারের যদি আশা থাকে তবে তাঁদের উচিত ঐশ্বরবিন্দু ইউনিভার্সিটি সেনেটরকে আবশ্রকমত অর্থসাহায্য করা।)

কিন্তু কথা হচ্ছে অজ্ঞেরা কি করবে। Best বখন না পাওয়া যায় তখন বাছব next best এর বিকে হাত বাড়ায়। এই বিষয়ে দেশের শিক্ষাবিদদের

ও সরকারের কাছে একটি পরিকল্পনা পেশ করে এই প্রশ্নের উপসংহার করতে চাই। পরিকল্পনাটি হচ্ছে সংক্ষেপে, আশ্রমের দেশের প্রাচীন টোল ব্যবহার অল্পরূপ একটি ব্যবস্থা প্রবর্তিত করা। শিক্ষাব্রতীদের, মধ্যে এমন অনেকে আছেন ষাদের উন্নততর শিক্ষা দেওয়ার শক্তি আছে কিন্তু ষারা বর্তমান শিক্ষা ব্যবহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েছেন। ভালতর কোন ব্যবস্থা হলে তাঁরা সেটা অবলম্বন করতে রাজী আছেন। তাছাড়া দেশে এমন লোক আছেন কিছু কিছু নিষ্করই আছেন ষারা অনাড়ম্বর পবিত্র জীবন বাপন করতে চান, যে কোন রকমে বনস্করের প্রদোত্তন থেকে ষারা স্বাব্যবস্তুই মুক্ত। এঁরা বর্তমানে শিক্ষকতা না করলেও অল্পকূল পরিবেশে করতে প্রস্তুত আছেন। এদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন ষারা মহাশ্চা গাছী থাকে bread labour বলেছেন তাই করে জীবিকা নির্বাহ করতে ইচ্ছুক, এমনকি তার সুবিধা পেলে জীবন সার্থক মনে করবেন। এই সব আশংকিত ব্যক্তির কয়েকজনের এক একটি ছোট বল গঠন করে তার এক একটি বলকে চাবের ভূমি আশ্রম দিয়ে যদি প্রাম্য পরিবেশে বসতি করিয়ে দেওয়া যায় তবে সেই বলগুলির প্রত্যেকটির দ্বারা একটি করে শিক্ষাকেন্দ্র পরিচালিত হতে পারে। শিক্ষার ব্যবস্থা কোন ষাধা হরা করলো সাক্ষিক হবে না, এবং তা হওয়া প্রয়োজনও নয়। শিক্ষাবীরা এই উপনিবেশে এসে শিক্ষকদের পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকবে, শিক্ষকদের সঙ্গে চাষ করবে, কাঠ কাঠবে, জল তুলবে, গরু, ছাগল, হাঁস, মুরগীর পরিচর্যা করবে। ঔদ চরকা চালাবে, আবশ্রক মত হাড়ুড়ী ঝাঁপাও চালাবে। কাজের প্রসঙ্গে এবং কাজের অবসরে শিক্ষাকরা নিজের নিজের জ্ঞানমত তাদের শিক্ষা দেবেন। এখনকার স্কুলের মত বড়ির কাঠার বিকে চেয়ে পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে কারিগরী শিক্ষার রূপ দেখ করতে হবে না। যে যা করবে সম্বই প্রাধানতঃ নিজেরের ব্যবহারের জন্য করবে বলে শিক্ষাবিশেষর কাজ সম্বৎ এবং

আনন্দদায়ক হবে। সঙ্গে সঙ্গে 'পৃথিবীর ইতিহাস' ভ্রমতে তাঁদের কোন বিষ হবে না এবং State ও Government এর পার্থক্য সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে জ্ঞান সেওয়ার সময় পাওয়া যাবে। অবশেষে একদিন শিক্ষা এখন সমাপ্ত হবে, চাকরীর দরখাস্ত নিয়ে তাঁদের অফিসে অফিসে ঘুরতে হবে না। কারিগরী শিক্ষা যেহেতু তারা শীর্ষকাল ধরে প্রতিদিনের প্রাসঙ্গিকতার জন্য একটু একটু করে শিখেছে, শিক্ষা সমাপ্তির পরদিন থেকেই তারা নিজে কারিগর হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনের বিনিয়োগ স্থাপন করতে পারবে। এমনি স্বাধীন মানুষের সমষ্টি নিয়ে যে সমাজ হবে, সেই সমাজেরই থাকবে স্বার্থ

শিক্ষা, একত্র সংগতি ও বলিষ্ঠ বিশ্ববোধ; সেই সমাজেই একদিন স্থানিত হবে নিঃশেষ, নিরুদ্ভিদ, মুক্ত মানবের কঠোর পণ্ডিতের চরম ভরপান; কারণ সেই সমাজের রচিত্তারা এখন পৈশব থেকে প্রতিদিন বাস্তব জীবনের কাজের মধ্য দিয়ে শিখেছে "না বিধিব্যবস্ট্র", শিখেছে শিক্ষক ছাত্র মিলে এক সঙ্গে প্রার্থনা করতে—"ঈশ্বর আমাদের উত্তরকে সবভাবে রক্ষা করুন ও উত্তরকে তৃণাত্মকে বিভাকল প্রদান করুন; আমরা যেন সবভাবে বিভাকল আমাদের সামর্থ্য অর্জন করতে পারি; আমাদের উত্তরের বিভাকল সফল হোক; আমরা যেন পরশুরের বিবেক না করি।"

বৈশাখী

ঈশ্বরের সেমন্ত

আবার এ অন্ধকার কারা কল হ'তে
রবিকর-বীণ তব জয়-বাত্মা-পথে
জীবন-মধুর গুণে, হে নব বৈশাখ,
বোরে সহ ডাকি'। শিখে পড়ে' থাক
কল্পনা রঙীন বোর-আবাসের নীড়।
নব জন্ম দাও বোরে। এই বরিত্তীর
অসীম প্রান্তর 'পথে বোরে ডেকে নাও
আজিকে তোমার পাশে। আবারে ভ্রমণও
তোমার বীণার তারে জীবনের সীতি
হে কল হৃদয় বোর! অতীতের স্মৃতি
তোমার কটন করে মুহুরিমা নিঃশেষে
আবারে লাভারে দাও অস্তিনব বেশে!
কল্পনাও মাতলোকে আর লোভ নাই,
বাত্মবের মাকে আজি বাঁচনাতে চাই।

স্বজনীপাত্রা

পুণ্যরজন চট্টোপাধ্যায়

—জীবনটাত একছুটো ধুলো নয়, যে এক বলক
মনকা হাওয়া এসে তাকে উড়িয়ে দিয়ে ছত্রধান করে
দিতে পারে—চন্দ্রমার পুরু কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা
সুন্দরী দেবীর চুলটাকে যেন অন্তর উজ্জল বলে মনে
হ'ল মাধবীর—মনে হ'ল শুই তীক্ষ্ণ চুল্লির অবশেষের
ভেতর দিয়ে আরও একটি বেগুনের চুল্লির মেঘমল্ল
এই মাত্র মনের গভীরে একটা হৃদয় অল্পভূতির ডেউ
জাগিয়ে ফুলল।

সুন্দরী দেবী একটু নড়েচড়ে বসলেন। জীবনে
কতখানি সন্দেরের আঁর থাকলে যে এ ভাবে করা আর
জীবনটাকে ঠেকিয়ে রাখা বাহ শুঁকে নিষেধ চোখে না
সেখা পথও মন ভা বিখাল করতে চায়না। মাধবীর যেন
মনে হ'ল আয়ত্না দেহটাকে এই বানানেই বেঁধে রাখতে
পারবেন ইনি। প্রাকৃতিক সভ্যকে উপেক্ষা করেই
জীবনটাকে বাটের কোঠার বন্দী করে রাখা এঁর
পক্ষেই সম্ভব। কে বলবে, এঁর বল সন্দেরের গভীর
পেরিয়ে পড়াত ছুঁই ছুঁই করছে! সফল দেহ একটু
যেন রক্ত, যুগ উচ্চারণ কিছুটা তীক্ষ্ণ। সুন্দরী দেবীর
জীবনটাই যেন প্রকৃতির বিকছে একটা বিরাট
অবস্থায়।

কি যেন ভাবলেন সুন্দরী দেবী ভায়রন বললেন—
জীবনে গতির আনন্দ চটুল—ওটা মনকে প্রভু
করে, কিন্তু স্থিতি—স্থিতির আনন্দ হচ্ছে পথি।

সমগ্র পরিবেশের একটা অস্বাভাবিক গাভীর
মাধবীকে যেন অভিভূত করে রেখেছিল এতক্ষণ।
প্রায় তুচ্ছ নিঃশ্বাসে মাধবী জনে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যই
আসবার প্রয়োজন ছিল তার আঁকের মনে।
মাধবীর মনে পড়ল, তার প্রথম দিন এখানে আসবার
কথাটা। শব্দ বশীর বিহার দেবার আগে সুন্দরী
দেবীর কাছে হাতজোড় করে বলেছিলেন—মা যের

বলতে যের, হেলে বলতে হেলে আর পূজক বলতে—
যাকী কথাগুলো আর শেব করতে পারেননি
তিনি।

সুন্দরী দেবী বীর গলার তাঁকে যে অন্তর দিয়েছিলেন
একমাত্র সেটাকেই সফল করে বিলিনবার বিহার
নিরে গেছেন। মাধবীর মাথার হাত রেখে আশীর্বাদ
করে গেছেন—যে ব্রত পালনের জন্য তোমার এখানে
দিয়ে গেলাম মা, আশীর্বাদ করি তাতে সফল হও।
আমি সেদিন আবার আসব। তোমার বাড়ী তোমার
থর সবই আবার তোমার হবে।

সেদিনের কথা মনে পড়লে চোখ দুটো অঙ্গসজল
হয়ে ওঠে মাধবীর। বুকের একমাত্র বংশধর ছিল
অল্প—আর একমাত্র পূজক মাধবী। কিন্তু কি চল,
একটি সন্ধ্যারীন বৃদ্ধ আর একটি সন্ধ্যা বিবাহিতা যেরের
জীবন কোন এক অব্যর্থ শর্য্যানে একত্র হয়ে ছিল
হয়ে গেল!

সুন্দরীদেবীর গভীর গলার মাধবীর চমক ডাল—
মুহুরা আজ থেকে মাধবীর সমস্ত তার আমি তোমার
গুপ্তই দিলাম। ওর মত হরত আর কেউই নেই এখানে
একথা সত্য; কিন্তু কথা দিয়ে থাকে আমর একবার গ্রহণ
করেছি তাত আমাদের পালন করতেই হবে। আর
আমি জানি, মাধবী এতে ব্যর্থ হবে না—সুন্দরী দেবীর
গলার হয়ে একটা বলিষ্ঠ প্রত্যাহার হ'ল।

ভক্তকণে সন্দের তীর হারা মাতৃমন্দিরের উঁচু দেওয়াল
দেওয়া অন্ধ মহলটিতে রাত অন্ধকার স্রষ্ট করে
কেলেহে। উঁচু শালগাছের শেব পাতাটিতে হরত
তখনও কিছুটা আলোর বেশ অড়িয়ে আছে। আশ্রয়ের
যেরেরা সন্ধ্যারতির জন্য কর্মমুখর হয়ে উঠেছে।

সুন্দরীদেবী গাত্রোধান করলে, মুহুরাদেবী যুগ
গলার বললেন, আজ থেকে তোমার জন্য আলাদা থর
দেওয়া হয়েছে।

কথাটা যেন শুনেচেই পার নি মাধবী গ্রন্থে, হঠাৎ মনে পড়ল যেন জুমনাঙ্গি কিছু বললেন।

কিছু বললেন? মাধবী প্রশ্ন করল।

জুমনা দেবী যেন একটু কুণ্ঠিত হলেন, তারপর বললেন, মা বললেন আমার পাখের বয়টাতে থাকতে হবে তোমার—আর বা বললেন সেটা শুনিছের কোন গুনে নিলে।

মাধবী দু'হাসল একটু, বলল—আপনারা কি মনে করেন যে আমার আঁখির মনটা এভাবেই কোন বিবাক্তান লাভ করবে।

জুমনা এবার একটু শঙ্কিত হলেন, বললেন, হি মাধবী এভাবে কথা বলতে নেই এখানে আর আমার ত কোনও ছল খুঁসিনি সে ধরণের। মা নিজের জীবন দিয়ে বা বুঝেছেন তাই করছেন—আর তুমি পবিত্র এই তাঁর স্রুত। অন্যথা, ভাগ্যহীন আর দুঃ মেরেবের অন্তই ত তাঁর এ সঙ্কল্প।

মাধবীর মনটা হঠাৎ যেন কেমন বিতণ হয়ে উঠল—যেন নিজের প্রতিবাদ করবার অন্তই বলে উঠল মাধবী—কিছু, আমি ও বলব কোনটার—আর আমার ওপর আপনাদের দায়িত্বই বা কি ধরণের!

জুমনা হাসলেন একটু, বললেন—এর কোনও উত্তর আমি বা আমার তোমাকে সহানুগি দিতে পারব না নাহেবী, তুমি বুদ্ধিমত্তী নিজেই বুকে নেবে যীরে গীরে।

মাধবী আর কথা বাড়াল না। জীবনের সূরুটা যখন পরীক্ষা দিচ্ছেই তখন দেখাই থাক কত পরীক্ষা ভাবে দিতে হয় এভাবে। তবু যেন বিজ্ঞোহ করে বলে মাধবীর মন। যেন নিজেকেই নিজে বুঝতে পারে না মাধবী। মনে হয় এখানে আসবার কি প্রয়োজন ছিল তার। স্বামী যখন গেছে শ্রীজীবনের সব পৌরষই সেই সঙ্গে বিদায় নিয়েছে। স্বত্বের কাছে কাছে থেকে শেষ জীবনে তাঁকে নিজা সাহচর্যে সাধনা সেবার প্রয়োজনও ত আছে তার। কিন্তু তিনিই ত মাধবীকে এখানে দিয়ে গেলেন। হতত তিনি এটাই চেয়েছেন—

জীবনের সব আকাজক্ষা সব লোভের উল্লে'উল্লেখ মাধবী—নিজেকে তবিত্ততের অন্ত একান্তে প্রত্যন্ত করল। এত বড় সম্পত্তির তবিত্তত পরিত্যক্তিকা পৃথিবীর আকর্ষণ তলোকে ডুঙ্ক করতে শিখল। পুড়ে পুড়ে গাণবিত্তীন গোণার ছাতি নিয়ে কিরে আনুক।

যীরে যীরে, একটার পর একটা, এমন করে হটাৎ মনে কেটে গেল মাধবীর। পরতের নীলজা কেটে গেল—যেথা ছিল হেমন্তের কুঁড়ানো তারপর এল দুঃস্বপ্ন শীত—তাও কেটে গেল। এল বসন্ত। উঁচু দেওয়ালে বেগা গজীর নিবেশ না যেনেই যেন প্লাপ গাছগুলোই উদ্ভূত রক্ত-ভিলক হাওয়ায় আঁখির ছড়ার, শাল বহরার গাছে কিনলয়ের জীবন-যোগনা যেন হাত ছানি দেয়। সব চোখে পড়ে মাধবীর। জুমনার অদ্বতব তলোকে যেন কিছুতেই ছাড়তে পারে না মাধবী। যে মুক্তিতে নিজেকে ছাড়তে পার সেই মুক্তিতে পাণ্ডপত হয়ে কিরে এসে অব্যর্থ আশাত হানে নিজের ওপর। মাধবীর মনে হয় তমালে অনেক বেবেছে এখানেকার—সব পুটিনাটা বুঝতে চেষ্টা করছে—প্রজ্ঞা এসেছে তার মুন্ডরী দেবীর কর্ণ-নিষ্ঠার। তবিত্ততে মুন্ডরী দেবীর হলিকারিণী জুমনাদির কর্ণনিষ্ঠাও ভাল লাগে মাধবীর। যে ঘেহ, যে সমবেদনা বোধ তাঁর আছে, তা যিরে মাধবীকে ভুলিয়ে দিতে চেষ্টা করেছেন জুমনা দেবী। একাধে তাঁর কর্ণ পঙ্কতিতে এতটুকু উজ্জ্বল নেই। "তোমার অন্তই এসব" নয় "এসবের অন্তই তুমি" জুমনা একান্ত তাবে এ বারপাটাই পুটী করে তুলতে গেরেছেন মাধবীর মনের ভেতর।

কিন্তু বাত্মমন্দিরের উল্ল'স্তন কর্তৃ'নক, মুন্ডরী দেবী, যে তাবে চলতে নির্দেশ দিয়েছেন মাধবীকে তা কি সে গেরেতে সম্পূর্ণ তাবে যেনে নিতে! সঙ্গপাঙ্ক দায়িত্ব ছেড়ে সে ত এখনও নিজের পরিবাসে নিতে পারল না গৈরিক বয়, হাতের গোণার রঙি হুগাহি খুলে পারল না ত নিরাভরণ হতে। স্বত্ববশার বলেছিলেন,—"যে বেশে তুমি আছ, আমার অদ্বয়োগ, সেই বেশেই যেন থেকে। কুড়ি বয়সের বয়সের যোগিনী বেশ আমি সইতে পারব না।"

—কি জাবহ? সুনাম! সাজা প্রার্থনা শেষে ঘরে ফিরলেন।

—কই কিছুনা—মাধবী ঘুরে গাড়িরে সুনামদিকে দেখতে চেষ্টা করল।

সৈয়দিক চানরট! খুলে তাক করে আলোনার তপস রাখলেন সুনাম—হারিকেনটা জুড়ে নিয়ে আলোটা উল্টে দিলে বই এর আলমারীর কাছে গেলেন।

—বই পড়বেন মুক্তি? মাধবী প্রশ্ন করল।

সুনাম বললেন, সেসকল ঘরপের পড়বার বই নয় এমন কিছু—নেস্কিভের গ্রামারটা দেখব একবার।

মাধবী প্রশ্ন করল, গ্রামার পড়ছেন কেন হঠাৎ?

সুনাম বললেন—ঘেরনের চেষ্টা পরীক্ষা এসে গেল যে, এখন থেকে রোজ একঘণ্টা করে ওদের কোচিংক্লাস হবে লজ্জার।

মাধবী বলল—কে কে কি কি সাবজেক্ট পড়াবেন!

—আমি ইংরাজী আর ভূগোল পড়াই, গারজী আর আর ইতিহাস—সুনাম আলমারী থেকে গ্রামার বইটা বার করে আঁচল দিয়ে কেড়ে নিলেন। তারপর বললেন—ভূমিও ত বিএ অবধি পড়েছ। ভূমিও যোগ দাত না আখাদের সঙ্গে, আর এনগেজমেন্ট হিসেবে এর মূল্যও বড় কম নয়।

মাধবী হাসল একটু, বলল—কিন্তু আদি কি পারব ম্যাট্রিকের মেয়েদের পড়াতে? আর তা হাড়া আমি ত বিএ পান নই সুনামদি।

সুনাম একটু হাসলেন, বললেন—ভ্যাত্তে কি এল গেল; আখাদের যদি পান করেই পড়াবার অধিকার ভয়ে থাকে, ভূমি না হয় না পান করেই সেটা পেল। তকাবে যে পূব বেশী হ'বে একখাত হালপ করে বলতে পারি না। কি বছরেই ত' তিন চারটি করে মেয়েকে পরীক্ষা দিতে পাঠান হয় আর তাদের কেউ ফেল করে ফিরেও আসেনি এই তিন বছরের তেজসর। অবিজ্ঞ বাদের পাপ করবার ভাবা নিজেও ভুলেই করে। কেউ কি জোর করে পারে। ভূমি মাঝী থাকলে আমি হাতে ধলে দেখব।

মাধবী বলল—তা আপনি যদি ভাল হবে বলে মনে করেন, চেষ্টা করে দেখব একবার।

—বেশ। সুনাম! গ্রামারে মনোনিবেশ করলেন, কিছুক্ষণ পরে পাতা ওল্টাতে লাগলেন, তারপর মাধবীর দিকে তাকিয়ে বললেন, এই মেয়ে, এ্যানালিসিস অব পেটেন্ট জিনিফটা, এটা কানেক্ট জোর করে দেখানো যায় না, নিজের ক্ষমতার যে বুঝে নিতে পারে।

কিছুক্ষণ চুপ চাপ কাটল। সুনাম! একের পর এক পাতা উল্টে দেখে যেতে লাগলেন; মাঝে মাঝে পেন্সিল দিগে দরকারী অংশগুলো লিপ্যে নিয়ে রাখতে লাগলেন।

মাধবী বলে লক্ষ্য করছিল সুনামদিকে। ভাল করে লক্ষ্য করে মাধবীর মনে হ'ল খ্রিস বছর বয়সের সুনামদিকে বছরের দিক থেকে যেন অনেক প্রবীণা বলে মনে হয়। বিগত দিনের গোরবর্ণ, যোগে, ভুলে, কৃষ্ণ নাথনায় কেমন যেন ভাষাতে রং হারান করেছে। মাধবী বার বার লক্ষ্য করল সুনামদিকে, কিন্তু না, কোথাও এতটুকু ফ্রাঙ্কি এতটুকু ভীকতার চিহ্ন নেই ওর লারা বুকে।

কিন্তু এই ভূমি বছরে চকল মনটা প্রতি মুহূর্তেই কেমন যেন প্রবক্ষ্য ক'রে বলে নিজেকে। নিজের সৈন্ত, বৈদ্য, নিজেকেই যেন চেষ্টা করে শরণ করতে হয় ভাবকে। যেন জীবনের কোনও দীর্ঘ অবসর ছাপন করতে সে এমন। আবার সে ফিরে যাবে নিজ প্রতিষ্ঠায়—ঊর্ধ্ব পৃথিবীরে আবার সে ফিরে পাবে—মনের দীর্ঘতরে মাধবী একমাত্র এই আশারই নুঁছে পায়।

—আজ্ঞা সুনামদি—মাধবীই কথা বলল প্রশ্নে।

—কিছু বলত, সুনাম! মুখ তুললেন।

মাধবী যেন একটু অপ্রস্তুত হ'ল, এই মুহূর্তে যেন বলবার মত কিছু নুঁকেই গেলনা।

—কিছু বলবে?

এইএর কানকে আঙ্গুল রেখে বলাউটা বড় করলেন সুনাম।

—যদি কিছু না বনে কয়েন, তত্বনো গলায় বলল মাধবী।

—কিছু বনে না করতে পারি এমন গ্রন্থই তোমার কাছ থেকে আশা করি। হুম্মনার ঠোঁট ফুটোহতে বেন একটু হাসির আভাস দেখা গেল।

মাধবী একটু চূপ করে রইল। কারণ হুম্মনামির লর্ভটা একটু কঠিন কিছু অবচী অভ্যস্ত সোজা। তবু বলল মাধবী—বলল, আর আপনাকে যেভাবে যেখানি, এর আগে আপনাতত্ত্ব তা' আর একটা জীবন ছিল। সেটা কি রকমের বড় ভ্যানেতে ইচ্ছে হয়।

হুম্মনার মুখটা একটু কুণ্ডিত হ'ল। কপালে বেন প্রত্যয়ের তীক্ষ্ণ রেখা ফুটে উঠল। কিছুক্ষণ বেন কথা ফুটল না তাঁর।

মাধবীরও বেন অভ্যস্ত অবস্থি বোধ হচ্ছিল এতি মুহূর্তে।

—এ বরণের গ্রন্থ করা আর তার উত্তর দেওয়া আশাভের নীতিবিকৃত। হুম্মনা উঠে ধড়ালেন, তারপর বললেন, চল মার গীতা পাঠের সময় হয়ে এল। আর কিছু বলবার অবকাশ মিলেন না তিনি মাধবীকে, আলোটা কবিরে মিরে মাধবীর একটা হাত ধরলেন, বললেন—চল, আর আর—একটা কথা বলছি তোমার, মাকুম্মির কোনও সেবিকার জীবনের গ্রন্থ হুংখের ইতিহাস শোনবার বা শোনাবার স্থান নয়।

মাধবী বেন অভিভূতের মত হাতটা ধরল হুম্মনার, আচ্ছন্নের মত অন্ধলয়ণ করল তাঁকে। মাধবীর একবার বনে হ'ল, একি অস্তার করল সে।

নাট বকিরে পৌছুতে দেখা গেল, একটা উঁচু আসনে বসে আছেন মুগ্ধবীদেবী। নীচে ছোট বেয়ে। হ্রর করে ভোজ পাঠ শুরু করেছে। গারুজী দেবী বুকে কিরে সব দেখাশোনা করছেন।

প্রশ্নম করে বীরে একপাশে মিরে বসল মাধবী। উচ্ছল আলোর একবার মুগ্ধবী দেবীকে ভাল করে দেখল। মুগ্ধবী দেবীও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার লক্ষ্য করলেন

মাধবীকে। তারপর বীরে বীরে পাঠ শুরু করলেন। মুগ্ধবী দেবীর বা পাশে হার্বা ছোট আসনটিতে বসলেন হুম্মনা।

হুম্মর উজ্জাহর আর হুম্ম মাধুর্ঘের একটা বিশ্বমকর সময় ফুটে উঠল মুগ্ধবী দেবীর পাঠ শুরু হ'বার সঙ্গে সঙ্গে।

শেখিন বিকলের ডাকে বিপিনবাহুর একটা চিঠি এল। হুম্মনাই মিরে গেলেন। হুম্মর বশাই লিখেছেন "ইচ্ছে করে, সব কাজ ফেলে একবার তোমাকে যেনে আসি, কিছু পারি না। পারি না এই ভেবে, যে তোমার ক্রতে বিয় বটবে তা হলে। জীবনে উপলব্ধি করবার, শেখবার, কত জিনিষ আছে—কত রকমের রীতি, কত পদ্ধি। সব হজাশা, সব শোক তুলতে শেখো—দূর থেকে জেটুইই প্রার্থনা করব। আশীর্বাদ নাও।—"

মাধবী বার বার পড়ল চিঠিখানা। এই দীর্ঘ সময়েরও ভেতর এই তাঁর যিহৌর চিঠি।

হুম্মনা বললেন, মা বললেন, এখন থেকে তুমিই সজ্জা প্রার্থনা, আরতি পরিত্যাগনা করবে। গীতা পাঠটাও এর পর থেকে তুমিই করবে, মার দে রকমই ইচ্ছে।

মাধবী বলল—মা যদি বোগ্য বনে করেন, তাই হবে।

নতুন কার্ণভার বেবার পর থেকে মাধবীর সময় যে কিতাবে বেতে লাগল, নিষেই ফুটে উঠতে পারল না মাধবী। সকাল থেকে সন্ধ্যা রাত এগারটা অবধি প্রতিটি মুহূর্ত বড়ির কাটার সঙ্গে বাধা। কোনও কিছু চিন্তা করবার অবকাশটুকুও নেই। হুম্মনা হেসে বললেন—মা অভ্যস্ত আশা পোষণ করছেন তোমার নব্বড়ে—তোমার সামনে একথা বলা উচিত নয়, কিন্তু তোমার দক্ষতার এতদিনের রোদে জলে পোড়া এই আশিক সীমা বোধ করি।

মাধবী বেন একটু বিম্বিত হয়েছিল—একি বলছেন হুম্মনামি। 'এত' সেই গুরু গরুর হুম্মনামি নয়। কানে বেন কেমন একই লগু শোনাল। মাধবী মুহূর্তাবে

বলেছিল—খাক খাক, স্নানবাড়ি, অমনভাবে লক্ষ্য দেবেন না।

স্নানা কিছুক্ষণ চুল করে বইলেন, তারপর বললেন, তুমি একদিন আমার কাছে একটা কথা ওনতে চেয়েছিলে মাধবী—তাই না।

মাধবী একটু বিব্রত হ'ল, বলল—প্রশ্নগত তাবে অনেক কথাই ত' বলেছি, সেমন্ত কথা করবেন।

এক তোড়া বিছারাবিঠ দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ মাধবীর দিকে চেয়ে রইলেন স্নানা—তারপর, মাধবীর মনে হ'ল, ওর গোট ছুটে। একটু নড়ে উঠল, মুখ দিয়ে অশ্লীল একটা জ্বনি বেরল—ত।

মাধবী কি বেন বলতে বাজিল, কিন্তু স্নানা আর গাড়ালেন না, বীরে বীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

আর মাধবীর মনে হ'ল স্নানাদির না বলা কথাগুলো হৃদয় কত দুঃখের ইতিহাস। আর তার শোনা হ'ল না।

বেকেদের টেট নেওয়া হয়ে গেছে। সেদিনের লক্ষ্যের বৈঠকের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল, কোন্ কোন্ মেয়েকে কাইন্ডাল ঘোষার জন্য পাঠান হবে সে সম্বন্ধে প্রভোক্তার নতানত ব্যক্ত করা।

সুদারী দেবী আসন গ্রহণ করলেন। নীচে বসলেন গায়ত্রী দেবী, সত্ত বি. টি ট্রেনিং নিয়ে আসা সুনীতি দেবী। এখানে এসে এর আগে আর তাঁকে দেখবার সুযোগ হয় নি মাধবীর। ট্রেনিং নেবার জন্য একদিন অল্পপস্থিত ছিলেন—আজই সকালের গাড়ীতে এসেছেন। কিন্তু স্নানাদির অল্পপস্থিতিটাই বেন চোখে পড়ল বেশী করে।

সুদারী দেবী বললেন—স্নানাদি কি হ'ল, এখনও এল না যে। আসবার সময় শুকে ঘরে দেখতে গেলেন। —মাধবীর দিকে চাইলেন সুদারী।

মাধবী বলল—কই, সেখানে গেলো না ত' যা। উনি আগেই এসেছেন ভেবে, আমি চলে এসেছি।

—তবে কি নাট মন্দিরে গেছে, না কি শরীর খারাপ করেছে—একটা উৎসাহ ফুটে উঠল সুদারীর কথায়। এই

দীর্ঘ বন বছরের তেতর গুর শরীর খারাপ করতে দেখেছি বলে ত' মনে পড়ে না—তুমি বরং একটু মন্দিরের দিক থেকে দেখে এসো—বলো আমরা বলে আছি এর জন্য।

মাধবী উঠে গাড়াল, বলল আমি এগুনি দেখে আসছি।

স্নানাকে অবশ্য মন্দিরের দিকে পাওয়া গেল না; পাওয়া গেল ফুল বাগানে। বীরে বীরে পায়েচারী করছিলেন।

মাধবী একটু বমকে গাড়াল, বলল—ওরা সবাই আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছেন, স্নানাদি। মাধবী দেখল স্নানা ঘুরে গাড়ালেন।

তারপর অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে বললেন, তাই নাকি! আজ যে মিটিং আছে সেখানে একবারে তুলে গেছি মাধবী, যা কি তাবছেন জানি না, চল শিগগির করে।

স্নানা এসে আসন গ্রহণ করলেন।

সুদারী দেবীও বেন একটু নড়ে চড়ে বসলেন, একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন চারদিক, তারপর বললেন—স্নানার শরীর বোধ হয় বিশেষ ভাল নেই আজ। আমি তাবছি মিটিংটা। না হয় আজকের মত বন্ধ থাক, কাল হবে। সুনীতি কি বল?

সুনীতি একবার গায়ত্রী আর একবার স্নানার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, আপনি যা ভাল মনে করেন।

স্নানা বাধা দিয়ে উঠলেন, না না আমার কিছুই হয় নি, আপনাদের যা করার আজকেই করুন, কালকের জন্য তুলে রাখা মানেই ত' একদিন আরও শিখিয়ে যাওয়া। আর তাছাড়া বেরেওলে অস্বস্তিতে দিন কাটছে।

সুদারী দেবী বললেন, তা হ'ক, কালই আবার একত্র আসা যাবে, আজ এখানেই শেষ করছি—সুদারী দেবী উঠে নিষেধ করে চলে গেলেন।

কি রকম একটা অস্বস্তির তেতর লড়াই থেকে গেল মাধবীর নিষেধও ভাল লাগছিল না।

স্বপনা স্থীতির সঙ্গে গল্প করতে করতে এগিয়ে গেলেন, মাথার নিম্নের ঘরে ফিরে এল।

সব কিছু মিসিয়ে দেখতে গিয়ে নিজের ওপরাই একটা অদ্ভুত আক্ৰোশ ভনে উঠল মাথার। সব কার্খকার্যের অস্ত্র যেন নিজেকেই একান্ত ঘোবী বলে মনে হতে লাগল। কেন সে এসেছিল এখানে। তার যৌবন, তার অশুচি চিন্তা, তার সংসার আগুতি, প্রতিটি মুহূর্তে এই পবিত্র প্রতিষ্ঠানে যেন এক অশান্তির বীজ বপন করেছে। অস্বস্তি আর কান্নার মনে না হ'ক প্রুমনাদির মনে যে কাঁপ পড়েছে—এটা সে আজকাল প্রতি মুহূর্তে হৃদয়ে পারে।

বিদ্বান্নার উপড় হয়ে পড়ল মাথার। অজ্ঞতার ঘরে, ততোধিক অজ্ঞতার মনোরাজ্যে নিজের মনটাকে আত্ম-শাস্তি করে ঝুঁকে দেখতে চাইল মাথার। সংসারের সব কিছুর উর্ধ্বে যে জীবন, গভীর অজ্ঞত্বের যে জীবন, তা তাকে লাভ করতেই হবে। জীবনটাই 'ত' তার সেজাবে হুক হয়েছে। তাবতে তাবতে যেন অক্ষিত্তার মত হয়ে এল মাথার সব অজ্ঞত্ব। কতকণ যে কেটে গেল তার কোনও হিসাবই রাখতে পারল না সে। কোটের পেট। যড়ির আভ্যন্তরে চমক ভাঙ্গল। রাত এগারটা।

মাথারী উঠে ঠাণ্ডাল, আলো জালল, তারপর খুলে ফেলতে লাগল তার বেশবাস। হাতের কলি, গলার হার। খুলে কেলল চওড়া পাড় শাড়ী।

আলনা থেকে তুলে নিল গৈরিক ধান, গৈরিক চাবড়। "মন না বাঙারে কি জুল করিলে"—কিছু উপায় কি, ভোগের পৃথিবীটাতে সাধারণ মানুষগুলোর কাপড় রাতানোর প্রয়োজনটাই সব্বাঙ্গী। একটা আকারকে আশ্রয় না করে নিরাকারকে পাবার আশা ছাড়া। মাথারীর মনে হল, মাথারী প্রার্থনা করল আজকের এই রাত্রিই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ রাত্রি হ'ক—সত্য হ'ক, সুস্ব-ভব হ'ক। একটা অশুট প্রার্থনার উচ্চারণ শুভ্ররূপ করে উঠল মাথারীর ঠোঁট দুটোতে।

মাথারীর মনে হল আজ রাতে একবার প্রুমনাদিকে

প্রণাম করে এলে মনটা যেন অনেকটা স্থির হ'ত।

দরজা খুলে বেকল মাথারী। বারান্দার ওপাশেই প্রুমনাদির ঘর।

কিন্তু শুকি, গুঁর ঘরে এত রাতেও আলো জলছে বলে মনে হল মাথারীর। হৃদয় পঙ্কাতনো করছেন প্রুমনাদি। মাথারী একবার ইতস্তত করল তারপর নির্দিষ্ট বেয়ে ওপরে উঠে গেল। দরজার মুহূর্তটাকা দিল। কোনও শব্দ নেই। আবার লক্ষ করল মাথারী।

এবার উত্তর এল, কে?

—একবার দরজাটা খুলুন না, আমি মাথারী।

—মাথারী? এত রাতে? প্রুমনাদির গলার স্বরটা

কেমন যেন অস্বাভাবিক মনে হল মাথারীর কানে, কেমন যেন একটু কাঁপা কাঁপা।

—একটু লিগলির করে খুলুন, কেমন যেন ভয় ভয় করছে।

ভেতর থেকে দরজা খুলল। আর সঙ্গে সঙ্গে মাথারী প্রায় উপড় হয়ে পড়ল প্রুমনাদির পারের ওপরে—আপনারা একে প্রণাম করতে এসেছি প্রুমনাদি—

কিন্তু একি প্রুমনাদি সত্যের রূপ। গিড়িয়ে গেলেন, যেন মুহূর্তে আর্জনাৎ করে উঠলেন হঠাৎ - না না আমায় ইয়ে না ভূমি, তোমার প্রণাম বেবার যোগ্য নই আমি।

তরে তরে মুখ তুলল মাথারী—কিন্তু চোখ দুটোকে যেন কিছুতেই বিশ্বাস হল না—তার সামনে ঠাঁড়ির কে এ! ঘরের অশুট আলোর বেগতে এতটুকু অন্ধুবিবে হচ্ছে না মাথারীর। উজ্জল লাল পাড় শাড়ী, হাতে বালা, কপালে সিঁদ্ধরের টিপ, লিপি লীমকে উজ্জল রঙ বেধা।

—একি প্রুমনাদি, আপনার এই বেশ—মাথারী যেন পাথর হয়ে গেছে।

কয়েকটি মুহূর্ত যেন কোনও কথা ফুটল না প্রুমনাদির তারপর বললেন, আমি পরিত্যক্তা জীর লক্ষ্যে এই বেশ কি খুব অস্ত্র মাথারী?

মাধবী কোনও উত্তর দিতে পারল না। সমস্ত সুধিবী এই হবার ছিল।
 সবুজ গ্রহপুত্র থেকে যেন একটা ছুঁবার অক্ষর প্রাচীন উদ্ভাস মাধবী নিরুত্তর।
 হেরে ছুটে এসে তাকে ভাসিয়ে দিল।
 হুমনার বেন মনে হল, তাঁর সমস্ত বাসনার, আত্মকের
 মাধবীকে নিজের হৃদয় কাছে টেনে নিলেন হুমনা,
 বাস্তব এই লবু বাসনার, চিত্তাক্রান্তের ওপর লাড়িয়ে
 অতি সুহৃৎলাভ, অক্ষর বাধা বীরের বীরে সড়িয়ে, বললেন,
 বৈরাগ্যের এক হুমর রজনীগন্ধা হেরে ছুটে উঠেছে
 আমি হেরে গেলাম মাধবী—তুমি জিতে গেলে। হুমত মাধবী।

কাহনা

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

একটি কুটীর চোট আভিনায় তার,
 নোপাটি-করবী-রক্তজবার বাহার।
 পাশ দিয়ে চলে নদী—কাকচক্ষু জল,
 পরপারে মনোহর প্রান্তর স্তাবল।
 পিছনে বহুল-বেল-তমালের শাখে,
 বউ-কথা-কণ্ড পানী সারায়েলা ডাকে।
 চাঁদ গুঠে—ঝোছনার ঘুমার ধরনী,
 নদী জলে যলকার শতলক যদি।

ফুল আর পানী আর চাঁদ আর নদী—
 এরই মাঝে দিনগুলি কেটে যার যদি
 বাছা বাছা স্রিয়তন বইগুলি নিয়ে
 আর কিছু নাহি চাই। বসন্তাপি ফিরে
 স্নিক প্রাণ পূর্ণ হারা কত্রিবারে চাথ—
 নুতুন জায়গা তাতা সুহৃদা বেড়ায়।

একটি প্রশ্ন

অন্যত গোআন্দী

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য-সাহস্যর থেকে আমরা এতকিছু পেয়েছি যে সেই অজল মানের বিশুল সজ্ঞারের আনন্দে আমরা আজ পর্যন্ত অভিভূত হয়ে আছি। এই বিরাট প্রাপ্তির আনন্দের মধ্যে যদি কেউ এতবড় রহান রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে কোন অপর সজ্ঞাবনা হলে কলে রলে পরিপূর্ণ সজ্ঞ হলে উঠতে পারেনি বলে আকশোষ করে তবে তা একটু খেয়তো লাগতে পারে বৈ কি।

তবু রবীন্দ্র সাহিত্যের এই অসম্পূর্ণ সজ্ঞাবনাগুলোকে কেন্দ্র করেই একটা প্রশ্ন জুঘী সমাজের সামনে তুলে ধরতে চাই। রবীন্দ্রনাথকে অনেক দিক থেকেই অনেক আলোচনা করেছেন। সেই সব আলোচনার মধ্যে নতুন আলোকপাত করার সুযোগ যে একেবারে নেই তা নয়, বোধ করি আরও কিছুদিন পরে আরও একটু দূর থেকে রবীন্দ্রনাথকে দেখার যেদিন অবকাশ মিলবে সেদিন সেই সুযোগ আরও একটু বেশী করে পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধে রবীন্দ্র সাহিত্য সজ্ঞে যে প্রশ্নটি উত্থাপন করতে চাই তার উপরে আজ পর্যন্ত কেউ কোন উল্লেখযোগ্য আলোকপাত করতে পেরেছেন বলে জানি না।

গত বছরের কোন একটি শারদীয় সংখ্যায় একটি ছাড়া রচনার ভিত্তর দ্বিধে একজন লেখক বলতে চেয়েছেন যে একশো বছর পরে রবীন্দ্র সাহিত্য নিয়ে কোন সমালোচক আলোচনা করতে বসলে তিনি অনারাসে তিন জন বয়ঃ সম্পূর্ণ রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পারবেন। বাস্তবিক একক রবীন্দ্র সাহিত্যের মধ্যে এত বিভিন্ন ভাব এবং বস্তুর সমাবেশ পৃথিবীর সাহিত্য ইতিহাসে দুর্গত এবং তা স্বভাবতই রবীন্দ্র-ভক্তদের বিশেষ বিমুগ্ধ করে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ নিকেতন জ্ঞানতেন একটি বছরের মধ্যে যেমন বার বার গুরু পরিবর্তন হয় তাঁর সাহিত্য জীবনেও তেমনি বার

বার করে গুরু পরিবর্তনের পালা চলেছে। বার বার এই গুরু পরিবর্তনের কলে আমরা যদিও বহু বিচিত্র ভাব এবং বস্তুর সমাবেশ পেয়েছি, তবু একটি বিশিষ্ট ভাব বা বস্তু নিয়ে গুংগাহুংগাহ আলোচনা ও অন্বেষণ এবং তার একটা সহজ সরল ক্রম পরিণতির ধারা আমরা হস্ততো পাই নি। এইখানেই আমার প্রশ্ন। পৃথিবীর উপর সূর্য-রশ্মিপাতের তারতম্য অনুসারে বছরের গুরু পরিবর্তন হয় এ সত্য আমরা জানি। কেন্ অল্প সূর্যের রশ্মিপাতের তারতম্যের জন্ত রবীন্দ্র সাহিত্যে বার বার গুরু পরিবর্তন ঘটেছে তা কি কেউ আবিষ্কার করতে সচেষ্ট হবেন না ?

প্রশ্নটিকে আর একটু বিস্তৃত করে উপস্থিত করি।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের বসিতা নিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক। কতি ও কোমলের মধ্যে কবি তাঁর প্রথম যৌবনের আবেগকে কাব্যে রূপ দিতে চেয়েছেন। কোন এক অসুস্থ অনির্গত প্রিয়াকে যে তাঁর চুটি বাহুলতা জড়াতে চায় সেই আতুলতাকে কবি অসুপ্তিতভাবে প্রকাশ করলেন। প্রিয়ার কোন স্পষ্টরূপ কবির মনের সামনে তখনো রেখারিত হয়ে উঠেনি; যৌবন-কামনার মধ্যে যে বাধা যেমনা এবং আনন্দ জড়াজড়ি করে থাকে তারও বোল আনা সন্ধান কবি তখনো পান নি। কিন্তু 'কতি ও কোমলের' মধ্যেই কামনা-সর্বশ প্রেম কবির মনে যে অবলান সৃষ্টি করেছে তাতে তিনি উত্থাপ্ত হয়ে উঠেছেন। 'চুখন মরিয়া আর করায়োনা পান' বলে আতুল কবি প্রিয়ার কাছে সত্যের অলুযোগ জানিয়েছেন। 'মানমৌ'র ভরে এসে কবি প্রেমের বাতোর আরও কিছু কিছু সত্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। মিলনের আনন্দ যে কত নিবিড়, এবং বিরহের কেনা যে কত সর্বাভিক তা তিনি এখন বুকতে পেরেছেন। প্রেম কখনো প্রাপ্ত হতে পারে, কখনো মনের গোপনে আশ্রয় নিয়ে আপনাকে আপনি গড় করতে থাকে।



'হানসী'র মহোই কবি শেষ পর্বত আবিষ্কার করলেন যে প্রেমের ব্যাপারে এই ব্যাধা যেমন এবং তন্মুখিত হানসিক অশক্তি হাত থেকে আত্মরক্ষা করার শ্রেষ্ঠ উপায় হ'ল প্রেমকে দেহজ কামনার উল্লেখ স্থাপন করা। 'স্বরসার প্রার্থনা'র মধ্যে কবি 'হানসী হানসি আঁধি কলংক' যে প্রেমের উপর দ্বারা বিজ্ঞার করতে পারে না প্রিয়ার নিকটে সেই 'দেহীনা জ্যোতি' কামনা করেছেন। তার ফলে শরীর আর মন জুড়ে বাধা আর আনন্দের অক্লান্ত উৎস হিসাবে যে হানসী প্রেম সমুদ্র সমাজের মধ্যে, মধ্যে, অজস্রবিধ তার পরিপূর্ণ প্রকাশ এবং বিকাশ আনয়ন রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতার আর পেলান না। অথচ 'কড়ি ও কোমল' পড়ে কি আনন্দের মনে এই আশা জাগে না যে, রবীন্দ্রনাথের থেকে আনয়ন অতঃপর প্রেমের অভিজ্ঞতার আরও সম্পূর্ণতার আরও বিস্তৃততার পরিচয় পাব?

কামনার ব্যাক্যের থেকে উল্লেখ তুলে এনার কবি সহজভাবে প্রেমকে অভিন্নমন জানাতে পারলেন ('প্রেমের অভিধেব'—'চিহ্ন'), প্রেমের অভিজ্ঞতা এমনি ব্যাপক ও বিচিত্র যে তাকে বোল আনা বোকা যায় না। সে চোঁটা করাত বাতুলতা ('হুঁহু—'লোনার তরি')। কিন্তু প্রেমকে কামনার স্তরে রাখলে তার আর চিহ্ন ভাবের হুঁহু থাকে না, কামনার তাঁটা আসে, এবং সেই স্রিয়মাণ কামনাকে কৃত্রিমভাবে উত্তমিত করে তোলায় আত্মঘাতী আরোহনে শেষ পর্বত যেতে উঠতে হয় ('হুলন'—'লোনার তরি')। অর্থাৎ কাব্যের হস্ত বস্ত্র আবরণে বড়ই আড়াল করার চেষ্টা থাকে কবির প্রেম-কাব্য রচনার সময় যে একটি নীতি-বাসীল মন পিচ্চনের থেকে জর্জরী নাড়াছিল তা অস্বীকার করা যায় না।

'কচ ও দেবদানী' গীতি নাটিকার মধ্যে কবি দেখিয়েছেন যে কামনা-পর্বত প্রেম শেষ পর্বত প্রেম-পাত্রে উপরেও আঘাত হানতে উদ্ভূত হয়, আর দেহাতীত প্রেম প্রেমের উপরে কর্তব্যকে স্থান দেয়, আর কখনোই

কল্যাণের পথ থেকে চ্যুত হয় না। 'জ্ঞান' নাটিকার কবি দেখিয়েছেন দেহজ প্রেম পহিততম অভ্যাস করতেও সক্ষম হয় না। বিশ্ব বিস্তৃত কবি কুহুমের কীটকেই এত বড় করে দেখলেন যেন শেষ পর্বত।

রবীন্দ্রনাথের প্রেমের কবিতা পড়লে নিশ্চয়ই মনে হয় যে দেহজ প্রেমের বিচিত্র গতি এবং প্রকৃতি বাণ্য এবং আনন্দের আরও সম্পূর্ণতার গভীরতার পরিচয় আনয়ন তার অমর লেখনীর থেকে পেতে পারতাম, যদি না তিনি হঠাৎ দেহের উপর বীভূতায় হয়ে উঠে দেহাতীত প্রেমের দিকে হুঁকে পড়তেন। এই পরিবর্তন এটি আকস্মিক যে, কোন সংবেদনশীল রূপশিলাভূর মনে তা স্রুত আঘাত না করে পারে না। স্বাভাবিক বিবর্তনের পথে গেলে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ দেহজ প্রেম আর দেহাতীত প্রেমের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য বিধান করতে পারতেন।

দেহাতীত প্রেম নিজে কবিতা লেখার সময় কবি প্রেম জগতের বাইরে নারীর আর একটি দ্বিতীয় রূপ আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। উর্বরী এবং নিখরীন্দী কবিতার কবি এমন এক অপূর্ণ নারী রূপের কল্পনা করেছেন যে নারীর অনন্ত ঘোঁষনা দেহকান্তি দেখে সুনিগম ধ্যান ভেঙে ওঠা পারে তপস্তার ফল অর্পণ করেন, আর কামদেব পঞ্চপরের আঘাত দিয়ে ওঠা থেকে প্রেম-কৃত্তা ভাগ্যত করতে এসে সেই নিরাবরণ ঘোঁষন-মুষ্টির পারে পূর্ণতার পূর্ণাহুতি দিতে বাধ্য হন। এই নারী নিজে সমস্ত কামনার উল্লেখ, কিন্তু পৃথিবীর পুরুষ তার কামনার উল্লেখ করে ওঠে; সে নিজে বড় হয় না, কিন্তু আর সহ্যইকে পুড়িয়ে রাখে। অসীম কামতার অসীমতাই এই অকল্পনা নারী আসলে নারীর বাহবণিতা রূপ। বাহবণিতাই কামনার আগুনে পুঙ্খবকে পুড়িয়ে রাখে, কিন্তু তার নিজের মধ্যে কোন কামনা নেই। একটিকে দেহাতীত প্রেম আর একটিকে বাহবণিতাকে অভিন্নমন জ্ঞান। কবির এই সময়ের কাব্যের এই যে বিচিত্র প্রকৃতি এর তাৎপর্ষ্য নিয়ে পরে আরও আলোচনা করা চলবে।

উপজ্ঞানের ক্ষেত্রেও প্রেম মূলক উপাখ্যান নিয়ে লিপিতে গিরে কবির আকস্মিক দিক-পরিবর্তন কারোই দৃষ্টি এড়ানোর কথা নয়। সমালোচক বাজেই জানেন মৃণমল্লক হিন্দু ধর্মের উপরে উমার ব্রাহ্ম ধর্মের স্রোতঃ প্রমাণ কবাই 'গোরা' উপজ্ঞানের প্রধান উপজীব্য বিষয় নয় বোটেই। গোরা'র মধ্যে কবি দেখাতে চেয়েছেন যে বাহুবীর ঐশ্বর্যবিক্রমের আকর্ষণের সঙ্গে সমাজ অনেক সময় ছুঁতর বাহার প্রাচীর তুলে ধরে। আরও মর্যাদিক ব্যাপার হল এই যে এই সামাজিক বাধা বাইরের থেকে না এসে অনেক সময় নিতের মনের মধ্যেই পাকা। আসন করে বসে থেকে বাহুবীর মনকে কতবিস্তৃত করে তোলে। প্রেম আর ক্রিয়ের সমাজের এই ধর্মের কথা আরও জটিল পরিস্থিতির মধ্যে একপাশে পেঁতেই 'চোখের বাসি' উপজ্ঞানে। প্রেম বসিতা বিষয়া নারীর অপরের স্বামী'র মধ্যে প্রোম্পতকে আবিষ্কার করার কাহিনী করণ হলেও অন্ত্যন্ত বাস্তব। প্রেমের মেহাতীত রূপের আশ্রয় নিয়ে কবি এখানে সহজ সমাধান খোঁজার চেষ্টা করেন নি আর সেইজন্যই আধুনিক বাংলা উপজ্ঞানের পথ প্রদর্শক বলে রবীন্দ্রনাথ চিরদিন অস্বীকার করে থাকবেন।

কিন্তু 'চোখের বাসি'র পরে কবি অকস্মাৎ এই বাস্তব প্রেমের কাহিনী এবং তার সমস্ত পরিভাষা করলেন। পরবর্তী উপজ্ঞান সমূহে তিনি যে প্রেমমূলক ধর্মের চিত্র উপস্থিত করেছেন তা ভিন্ন জাতির। কামনা প্রাধান্য প্রেম সহজেই চ্যাকটিক্যাতন পাঠি জিনিষ হ্রেড়ে চকচকে মেকি জিনিষের দিকে হাবিত হর এবং নিম্নের ও আরও অনেকের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনে এই কথাটাই 'হরে বাইরে' উপজ্ঞানের উপজীব্য বিষয়। অর্থাৎ কাব্যের ক্ষেত্রে আত্মর বেধন দেখেছি রবীন্দ্রনাথ দেখেন প্রেম এবং কামনা প্রাধান্য প্রেমের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তাঁর উপজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। আরও অনেক পরে 'হুই বোন' উপজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথ আরও স্পষ্ট করে হুই জাতের প্রেমের চিত্র উপস্থিত করেছেন; এক

প্রেম কল্যাণবহী, বা জীবনকে সুখের পরিপূর্ণ করে তোলে আর এক ধর্মের কাব্যকুর প্রেম বা শুধু জীবনকে পুড়িয়ে মারতেই জানে। 'চোখের বাসি'র পরে কবি এই যে নতুন দৃষ্টি-ভঙ্গীর থেকে প্রেমকে দেখতে শুরু করলেন, এর যে একটি সত্য ও বাস্তব সমজ্ঞা নয়, বা এ যে আত্মর সচরাচর দেখতে পাই না তা নয়। এবং সমাজ সচেতন কবির শব্দে কামনা প্রাধান্য প্রেমের এই ধ্বংসকারী রূপের উপাখ্যান উপস্থিত করা বাস্তবিকও। আগতি দেখানো নয়। কিন্তু আমাদের অবেজ্ঞানিক সমাজ ব্যবহার মধ্যে ব্যক্তি-বাহুবীর তার উচ্চাংশ প্রবৃত্তি নিয়ে সমাজকে বড়টা না আঘাত করে, তার চের বাহুবীর সহজ চরমের আকর্ষণকে নিরুহর হতে নিপীড়িত করার যে সামাজিক বড়ত্ব তার প্রকোপ অনেক বেশী। অনেক সময়ে প্রেমর অবস্থাটা দ্বিতীয় অবস্থাই অপরিহার্য ফল। এই সত্যটুকু কবির তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টির গোচরে ছিল না এমন মনে করার কোন কারণ নেই। তা হলে 'চোখের বাসি'র মত উপজ্ঞান তাঁর কলম দিয়ে বেরতে পারত না নিশ্চয়ই। কাজেই 'চোখের বাসি'র দৃষ্টি-ভঙ্গীর বাস্তবিক ক্রম পরিণতি হিসাবে আরও সম্ভারিত পটভূমিকার গভীরতর আরও অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে যে সব অমূল্য অপর উপজ্ঞানগুলো কবি-সম্রাট রচনা করে দান নি, তাঁর সেই অসিখিত সম্প্রদায়িতর জ্ঞান যদি কোন কবি-ভক্ত এক কোঁটা চোখের জল কেলে তবে তার উপর আপনাতা রাগ করবেন কি?

আবার কাব্যের ক্ষেত্রে কির আসা যাক। ব্যক্তি-বস্তুর কবি এক সময়ে সমাজের থেকে নিজেকে নিঃশেষে বিচ্ছিন্ন করে এনে একটি অতি চরমকার স্বরূপ-সম্পূর্ণ পরিমণ্ডল সৃষ্টি করে তাঁর ঈশ্বরের সঙ্গে বসতি বোগ্যবোগ স্থাপন করলেন। আমি এখানে 'গীতাভাসি' 'গীতানাল্য' এবং 'গীতানী'র অন্তর্গত কবিতাগুলোর কথা বলছি। অজান্তেই জানার জন্য বাহুবীর যে চিরন্তন আকাংক্ষা, তাকে না জানতে পেয়ে অস্তিত্ব তার সঙ্গে একটা বাহিক বোগ্যবোগ স্থাপন করার (বাক্যে কেউ বলেন

বিল্লিক, কেউ বা ইন্টুইশনাল) যে স্বাভাবিক আগ্রহ,—
তা সব মাত্রায়ের মধ্যেই আছে বলে সমাজ বিদ্বির কবি
এই আশ্চর্যকর মত আশ্বাসের মুক্ত করেছে। শুধু তাই
নয়। এই সব কবিতার মধ্যে বলিষ্ঠ ব্যক্তি-মানবের
কতকগুলো শ্রেষ্ঠ নীতি আশ্চর্যকর করেছে। 'দিনের
যোরে রক্ষা করো এ নহে যোরে প্রাণনা' বা 'অস্তার যে
করে আর অস্তার যে নহে, তবু তুমি তারে বেন তুল সব
মহে' বা 'জীবনের বস্তু পূজা হল না মাতা'—প্রভৃতি জ্বলন্ত
কবিতার মধ্যে সমাজ জীবনে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব কোন নীতি
অঙ্গুলর করবে তা অতুলনীর ভাষায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
কিন্তু যে কবিতাগুলোকে কেন্দ্র করে কবি মোবেল
পুরস্কার পেলে, সেই বহুদল-প্রবাসিত কাব্য ধারাটি
সেই যে তিনি ভাগ্য করলেন পরবর্তী জীবনে আর
কোনদিন সে ধারাকে অঙ্গুলর করে তিনি কবিতা
লিখলেন না। সামাজিক কবি লম্বাক-বিদ্বির ব্যক্তিত্বের
নিঃসঙ্গ মহিমার বেলী বিন থাকতে পারলেন না। তাতে
আমরা অথব সামাজিক জীবন হরতো আপশোষ করব
না, এই উত্তরের কাব্য-রসকে উপভোগ করতে পারা
সম্ভব;—কিন্তু কোন অধ্যাত্মনিক পাঠক হয় তো
ভাবতে পারেন ঈশ্বরের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ
স্থাপন করে কবি যে করে কটা কবিতা লিখলেন এই বিষয়ে
কবির বা কিছু অভিজ্ঞতা ছিল বা কিছু বজব্ব ছিল তা
কি এর মধ্যেই গোল আনা একাশ করতে গেয়েছিলেন?
পরবর্তী দীর্ঘ সাহিত্য জীবনেও তিনি কি এ বিষয়ে আর
নতুন কিছু চিন্তা নতুন কিছু অঙ্গুলিত খুঁজে পান নি?

বল-ভল আন্দোলনের সময় দেশের বিপুল
উদীপনার থেকে কবি নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে
রাখতে পারেন নি। তিনি সে সময় জনসভার বক্তৃত্যও
দিয়েছেন। রাবী বন্ধনের গান 'বাংলার রাটী, বাংলার
জল', তিনিই রচনা করেছিলেন। বঙ্কতঃ বৈদেশিক
শাসকের স্বাধীনতার প্রাণি কবির স্পর্শকাতর প্রাণ মর্মে
মর্মে অঙ্গুলব না করে পারে নি। কবি জীবনের
একবারে স্রুতে সেই যে লিখেছিলেন, 'ওরে চারিদিকে

মোর, একি কাহাণীর ঘোর'। সেদিন সামাজিক এবং
হরতো আশ্চর্য অঙ্গুলি কাহাণীরের সঙ্গে রাজনৈতিক
কাহাণীরের প্রাণির কথ্যও মিশেছে তার মনে
স্বপ্নিত-দুট ছিল। অগচ্ সেদিন 'ভাল-ভাল-ভাল-ভাল'
আবাস্তে আবাস্ত কবু' বলে যে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা
গ্রহণ করলেন, পরবর্তী কাব্য প্রাণ স্রুতের অঙ্গুল কাব্য
স্রুতের মধ্যে সেই প্রতিজ্ঞা কাব্যের নিঃসঙ্গে তলিয়ে
গেল? প্রতিজ্ঞা পূরণের অঙ্গ তিনি কি ভাবলেন,
কি কি কবলেন, তার কোন পরিচয়ই বীজ্য কাব্য-
মৌলীরা তার কাব্যের মধ্যে খুঁজে পেল না? অনেক
দিন পরে 'বলাকা' কাব্য গ্রন্থে একবার তিনি তরুণদের
আজ্ঞান করে জিজ্ঞেস করলেন, 'শিকল দেবীর ঐ যে
পূজা দেখী, চিরকাল কি রইবে খাড়া?' তারপর এই
গ্রন্থে কবি কিরে এলেন একবারে তার জীবনের
সাম্রাজ্য বোলা, বন বিদ্যার নেবার আগে বানবের সাথে
সংগ্রামের ভয়ে খাড়া হয়ে গিয়ে গ্রন্থত হচ্ছে তার
তিনি ডাক দিয়ে গেলেন। বল ভল আন্দোলনে কবি
সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু কংগ্রেসের
পরবর্তী অঙ্গুলযোগ আন্দোলন স্রুত্রে তিনি যোগ দিতে
পারেন নি; গান্ধীজীর সঙ্গে তার মতভেদ দেখা গেল।
অথচ গান্ধীজীর থেকে তার স্বাভাবিকতা খোঁচ কম ছিল,
বা স্বাধীনতার জালা তার মত স্পর্শগ্রহণ মনে বস্তু তীক্ষ্ণ
ছিল একথা তার অতি বড় মজ্ঞও বলতে সাহসী হবে না।
কিন্তু কেন তিনি স্বাভাবিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ
করলেন না, কেন তার এত বড় কাব্য স্রুত্রে স্বাধীনতার
প্রাণ বৃদ্ধির মত এক একবার বাধা জুলাই মিলিয়ে গেল,
এ প্রসঙ্গ অব্যব কে দেবে? সমানাবিকারের, স্বাধীনতার
অস্তার প্রতিরোধের অঙ্গ কবি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে
স্বাধীনতার অঙ্গ বস্তু কিছু ভেবেছেন, বস্তু কিছু অঙ্গুলব
করেছেন নিশ্চয়ই তার একটা ক্রমবিকাশ ছিল। কিন্তু
কাব্যে তার অতি বামাত পরিচয়কে পেয়েই কি
আমাদের চিত্ত করে ওঠে? আরও কিছু পেলান না
বলে মনে আশ্চর্য্য ভাগে না কি?

এই জাতীয়তা বোধের প্রেরণ রবীন্দ্র সাহিত্যের আর একটা উজ্জ্বল দিকের প্রসঙ্গ এসে যাচ্ছে। সব মানুষই প্রকৃতির দিক দিয়ে এবং অস্বভাবিক দিক দিয়ে মূলতঃ সমান এ বোধ করি রবীন্দ্রনাথের কবি মানসের একটা সহজ আবিষ্কার ছিল। কাবুলীওড়ালার বধোও তিনি যে বাৎসল্য আবিষ্কার করেছিলেন তার নিবিড়ভাষ কোন বড় ঘরের মাহুকের বাৎসল্যের চেয়ে কম নয়। সেই অল্পই মানুষের দৃষ্ট সমাজে মানুষকে যে ক'জনভাবে মাহুকের চেয়ে ছোট করে রাখা হয়েছে এ তাঁকে অত্যন্ত নরপীড়া দিয়েছে। মাহুকের অবিকারে বাদের বক্তিত করে বাদের অপমান করা হয়েছে অপমানের ভিতর দিয়েই সবাইকে তাদের সমান হতে হবে, একথা তিনি বলেছেন। মানব জাতির নতকরা পকাশ ভাগকে অবজ্ঞার অবহেলায় যেভাবে ঘাটো করে রাখা হয়েছে, সেই নারী সমাজের প্রতিভা তাঁর সহস্রকৃতি অত্যন্ত প্রখর ছিল। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন, 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি নিবে অবিকার যে বিধাতা?' এবং এ প্রশ্ন যে সমাজকে উদ্বেগ করেই করা তা বোধ হয় না বললেও চলে। রোদ্দুরে গুড়ে, জলে ভিজে যে চাষী চাষ করছে, বারো মাস পাটছে, তখন পুজন সাধন আরাধনা কেলে রেখে কবি তার সান্নিধ্য হতে চেষ্টা করেন। অর বঙ্গ বলিঙ্গ মাত্রাজ বোম্বাই ভদ্রশাটে যে শ্রমিকরা চিরকাল নত নত সাম্রাজ্যের গু রজ্যে পরে কাজ করে এসেছে কবি তাদের স্রষ্টার জ্ঞান করেছেন। জনসাধারণের থেকে তিনি দূরে ছিলেন বলে তাদের জীবন যাত্রা তাদের ব্যর্থ আনন্দের পুরঃপুরি তপাচিত করতে পারেন নি বলে কবির মনে দুঃখ ছিল, এবং 'যে আছে মাটির কাছাকাছি, সে কবির বাণী লাগি' তিনি কান পেতে ছিলেন। আর অনেকের নত জনসাধারণের প্রতি কীকা: সহস্রকৃতি দেখিয়েও কবি আশ্ব প্রত্যঙ্গা করতে চান নি। তিনি লম্বা করে বলেছেন, 'এই সব সূচ স্নান মুক মুখে বিতে হবে তাবা', তিনি এদের অল্প দাবী করেছেন, 'অর চাই, বল চাই, প্রাণ চাই।' জনসাধারণকে সমানাবিকার দিতে কবির এই প্রাঙ্গহ,

তাদের সঙ্গে এই অসন্তোষ বোধ, রবীন্দ্র সাহিত্যের গল্পে কবিতার নানা আবিষ্কার বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। তাদের পরিমাণ কম বলে তাদের আকর্ষিত্যর সম্বন্ধে করার কোন কারণ নেই। কিন্তু প্রশ্ন জাগে যে এত বড় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এর চেয়ে বেশী কিছু যত্নব্য কি কবির আর ছিল না? কবি বাই বপুন, যে জনসাধারণকে তিনি এত ভালবাসতেন, তাদের জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর অজানা ছিল না। তাঁর জ্ঞান-ভাণ্ডারের সেই অমূল্য বস্তুসমূহ আমাদের থেকে গোপন করে রেখে তিনি কি আমাদের বঞ্চিত করেন নি?

বিরাট রবীন্দ্র সাহিত্যের কয়েকটি ধারার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া গেল তার তালিকা: আরও অনেক বাড়ানো যায়। কিন্তু আমার প্রাণটি পরিষ্কার করার পক্ষে এইটুকুই বোধ করি যথেষ্ট। সহজ রবীন্দ্র সাহিত্য যদিও অত্যন্ত বড়, কিন্তু তার মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে নিলে এমন অনেক ধারার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যার আরও অনেক সম্ভারণ, আরও অনেক ক্রম পরিণতি আশা করা কোন পাঠকের পক্ষেই অসম্ভার নয়। কারণ সেই ধারা সহজে যেটুকুই রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তার মধ্যেই এতখানি জীবন সত্য প্রতিফলিত হয়েছে যা দেখে অস্তাবস্তই আরও অনেকখানি সম্ভাবনা আরও অনেক কিছুই আশা যেন না জাগে পাঠক। রবীন্দ্রনাথ এই সম্ভাবনাকে পরিপূর্ণ করলেন না কেন? রবীন্দ্রনাথ এই আশাকে সন্তুষ্ট করলেন না কেন?

যে ভাবে রবীন্দ্রনাথ বার বার করে অসম্পূর্ণ সম্ভাবনাকে পাশ কাটিয়ে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন তার থেকে রবীন্দ্র সাহিত্যের আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা মনে হয়। রবীন্দ্র সাহিত্যে এক আঙ্গিকের দিক দিয়ে ছাড়া কোন সত্যিকারের ক্রম বিবর্তন আবিষ্কার করা যায় না। তাঁর বিবর্তন যানে নিম্নক প্রসঙ্গ পরিবর্তন। কিছুদিন একটা ধারায় লিখে তিনি সেই যে সেটা ত্যাগ করলেন আর কখনো সেই ধারায় লিখে সেটা করেন নি তিনি। যদিও বা অনেক পরে আকস্মিকভাবে আবার

তিনি সেই গ্রন্থে কিবে এসেছেন তো সাহসানের দীর্ঘ বাবদান কোন বিবর্তনের দ্বারা আবিষ্কারের সম্ভব একটা বার করে দেবে।

মনে হয় যেন রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে একটা অকৃত লুকোচুরি খেলার খেতে ছিলেন। একবার হঠাৎ সারাবে এসে পড়েছেন, আবার অবনি আড়ালে লুকিয়েছেন, আবার দূরতে দূরতে আর একটুকু দিবে সারাবে এসে পড়েছেন, কিন্তু তখনই নতুন কোন দিকে পলায়নের পথ খুঁজেছেন। কার কাছে রবীন্দ্রনাথ বার বার করে কাছে আসতে চেয়েছেন, কিন্তু কাছে এসে আবার পালিয়ে গেছেন?

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে যে প্রশ্নটা উত্থাপন করা বর্তমান গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল সে পূর্ব মোটামুটি শেষ হয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রশ্নটির একটি খসড়া অবশ্যও আমার মনে তীব্র করে এসেছে। আত্মপো সেটার একটু উল্লেখ করলে তাতে হয়তো স্তম্ভী সমাজের একটু প্রবিধা হতেও পারে।

আমার মনে হয় রবীন্দ্রনাথের মনের গভীরে একটা অন্তর্ঘর্ষ ছিল। বার সন্ধান এমন কি স্বয়ং কবিও জানতেন না। কলে তাঁর সমালোচকরাও আজ পর্যন্ত তার সন্ধান নেওয়ার চেষ্টা করেন নি। এই অন্তর্ঘর্ষের পরিচয় কোথায় পাওয়া যায় এবং তার স্বরূপ কি সংক্ষেপে আলোচনা করার চেষ্টা করা যাক।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের কবিতার গ্রন্থটাই আমার তুলি। আজকাল আমরা বাসিক পত্রের প্রত্যেক পাতায় একটি করে গেমের গল্প পড়ি এবং তখনই তা ভুলে যাই। গেমের শেষে গিয়ে গল্পের আরম্ভটা ভুলে যাই। গেম জিনিষটা আসলে কিন্তু এত সহজ বা হাল্কা নয়। এটা গণভক্তের একটা প্রবৃত্তি দাবী। আমার জন্মের দ্বাদশবিক প্রবণতা যাকে কখনো করে তাকে পাণ্ডুর পথে আমি কোন বাধা মানব না। সমাজ যদি কৃত্রিমভাবে কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তির সঙ্গে আমাকে জুড়ে দেয়, তো সে কৃত্রিম বন্ধন আমি মানব

না। নির্বাচনে আমি যদি ভুল করি তো তারও কারণ খুঁজতে সমাজ বলেই, ভুল করার অধিকারও আমার দাবীর অন্তর্গত। আমেরিকার দিনে এই গ্রন্থের দাবীকে অত্যন্ত কাগজে কলমে আমার একরকম মেনে নিয়েছি। কিন্তু উনিবিংশ শতকে ব্যাপারটা অনেক অসীম ছিল। এবং ভুলে গেলে চলবে না আমার মনের পুরোতাপে থাকলেও রবীন্দ্রনাথ আসলে উনিবিংশ শতকে বাস্তু।

মধ্যযুগীয় সমাজে গ্রেম অপার্টমেন্ট, অধ্যক্ষ। অল্প নৈতিক অগ্রশাসন দিয়ে তার দু'টি চেপে থাকা হয়েছিল সেদিন। তার একটা কারণ হল গ্রেম অন্তঃস্থ দাবী হলেও নারীর সমান অধিকার স্বীকার করে নেয়, আর মধ্যযুগীয় সমাজের তাতে ঘোর আপত্তি। মধ্যযুগের উচ্চস্তরের শ্রেণীর মধ্যে বিশেষ করে তাই নৈতিক অগ্রশাসন নারীর উপরেই প্রযোজ্য। দশ বছরের মেয়ে বিধবা হলেও তাকে আজীবন বশিত জীবন যাপন করতে হবে। পুরুষের বেলায় 'তোগের অকৃত ব্যবস্থা' ছিল। তার একাধিক বিয়ে করার সুযোগ ছিল; অধিকন্তু ছিল বারবণিতা। বারবণিতা কৃত্তি অবস্থা হীন হলেও নারীরও অল্প কখনো চরিতার্থতার একটা সুযোগ বলে মনে হতে পারে। আসলে তা নয়। দেশের কমনার ইচ্ছন যোগাতে গিয়ে নিম্নের কমনার অপমৃত্যু ঘটে বারবণিতার জীবনে।

কিন্তু গ্রেম অন্তঃস্থ কতকটা পরিমাণে ছিল অনলাভার্থের মধ্যে। গরীব পুরুষ অনেক বিয়ে করতে পারত না। বারবণিতার ঘরোও বেড়ে পারত কঠোর। নারীকেও সে একেবারে অধীন করে রাখতে পারত না, কারণ তার অর্থ নৈতিক জীবনের অপরিহার্য সহকারী ছিল নারী। কাজেই সমানে সমানে গ্রেম সম্ভবপর ছিল। প্রাচীন অতিজ্ঞাত সাহিত্যে তাই গ্রন্থের চিত্র বিরল, কিন্তু লোক সাহিত্যে অনেক সহজ অনাড়ম্বর গ্রন্থের চিত্র মেলে।

রবীন্দ্রপ্রাণ বধন তাঁর বৌদ-কামনার ভরগান করেছিলেন তখন তিনি জনসাধারণের পাশে ছিলেন। কিন্তু তাঁর সেই সহস্র অক্লান্ত কামনাকে পুরোপুরি রূপ দিতে পারার আগেই তিনি হঠাৎ এই কামনার মধ্যে গুহুই যেহেতু বন্ধন গুহুই বিরহের বরণ্য আবিষ্কার করেছিলেন। সেদিন তিনি এটা আবিষ্কার করে যেহাতীত প্রেমের তাগদীন আলোক, বুধদীন জ্যোতির অবাত্তর কল্পনার বহু হতে গেলেন সেদিন তিনি জনসাধারণের সংস্রব ছেড়ে তাঁর নিজস্ব জগৎ আভিজাত্য বহলের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন। অন্তর্ভুক্ত কাব্য প্রতিভা ছিল বলেই সেদিন নীতির প্রকট তাঁর কলমের তপস্বী এসে তাঁর কাব্য জ্যোতিক নিম্নত করে দিতে পারেনি। আর নীতির দুর্গ তাঁর কবিত্মকে অচেতনভাবে আচ্ছন্ন করতে পারেনি বলেই সেদিন তিনি যেহাতীত প্রেমের পাশাপাশি কামনার কামনার বস্তুর আর একটি চিত্র উপস্থিত করতে পারেনি। কিন্তু নারীর এই 'রূপ হল আসলে বাস্তবতার রূপ, যা সেদিনকার অভিজাত্য বহলের কাছে অতি প্রয়োজনীয় বিলাস সামগ্রী হলেও খোলাখুলি দার আলোচনা ছিল নিষিদ্ধ।

প্রেমের কবিতার ক্ষেত্রে আঘাত ভাঙলে দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথের সহজাত কবি-প্রতিভা তাঁকে জনসাধারণের পাশে টেনে এনেছে তাহাঙ্গের রূপ ছাড়াও তাঁর হস্তার অভ্য। কিন্তু পরস্পরকেই তাঁর অভিজাত্য রক্তের সংস্কার আবার তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। এটি ঘটতে তাঁর আত্মবিশ্বাসের সাহিত্য সাধনার মধ্যে, বারবার করে তিনি তাঁর সংস্কার অজ্ঞাতীয় স্রষ্টার কল্পনা, স্রষ্টা দার্শনিকতার, এবং দুর্বোধ্য ভৌত-দেহতার আবিষ্কারে নিজেদের বহু করে রাখতে চেয়েছেন, আর বারবার করেই তাঁর কবিত্ম তাঁকে জনসাধারণের পাশে টেনে এনেছে, যেটা তাঁর সভ্যতার নিজস্ব আটগা ছিল। সেই রক্তই বারবার করে তাঁর জীবনে গুরু পরিবর্তন এসেছে আর অকস্মাৎ অকস্ম হতে গেছে তাঁর একটি বিশিষ্ট কায়দা। সন্ত পৃথিবীর দিকে নিজেই বিচ্ছিন্ন করে কবি একান্তে বলে আত্মসাধনার বহু হতে নীতান্তি পর্ষের কবিতাভঙ্গি লিখলেন, কিন্তু এটি কবিতা প্রকাশ, তাঁর মধ্যেও অকস্মাৎ ভগ্ন-পূজন কেলে রেখে তিনি নাটক

চাষীর সঙ্গে কাঁচা বিলিয়ে চাপ করতে নামতে চাইলেন। হাস করে তিনি অতঃপর আরও দুই-দশ চৌর আত্মনিয়োগ করে 'বলাক' লিখলেন আরও সবাত্ত বিচ্ছিন্ন কাব্যচিত্রকে অবলম্বন করে 'পূরবী' লিখলেন। তবু পারলেন না জনসাধারণকে এড়াতে। হঠাৎ একদিন তিনি সেই যেহেতু কবি লিখলেন বাক তরে বাপ তাঁর প্রেমাল্পদের হাতে না দিয়ে কৌলিঙ্গের খাতিরে এক স্রষ্টার হাতে তুলে দিয়েছিল কিন্তু সে যেহেতু পরে সমাজের শাসন এড়িয়ে তার প্রেমাল্পকে নিয়েই পালিয়ে গেল (নিষ্কৃতি-পলাতক)। এই যে অকস্মাৎ, এক দিকে গণতন্ত্রের দাবী আর একদিকে আভিজাত্যের দাবী, এটা হয়তো কাচ করেছিল রবীন্দ্রনাথের সচেতন মনের আগেচরে।

জাতীয়তা বোধের ক্ষেত্রে বড় ব্যাক। উদবিগ্ন শতকের জাতীয় চেতনার মধ্যে ছিল অসুস্থ বিরোধ। গণতন্ত্রের চেতনা সেদিন সীমাবদ্ধ ছিল অভিজাত্যের মধ্যে, তাঁরা দেশে এত গণমানস অলচ সাহেবরা সব সময় চোখে আঁচুল দিয়ে দেখিয়ে দেন, তাঁরা আসলে কালা আঁধারী, অজ্ঞান। এই অগণমানসই সেদিন জাতীয় চেতনা উদ্ভূত করতে খুব সাহায্য করেছিল। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে যে সমাদিকার তাঁরা বিধ মাকে দাবী করেছিলেন, সেই সমাদিকার কি নিজের দেশের ইতর শ্রেণীর মধ্যে অবাধ সঞ্চারিত করতে তাঁরা দাবী ছিলেন? না, তা ছিলেন না। সেদিনকার আবেগন নিবেদনের রাজনীতির মধ্যে জনসাধারণকে এড়িয়ে রাখা সম্ভব ছিল। কিন্তু দুইটি বৎসর বর্তমান শতকের গোড়ার দিকে। সেদিন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামের প্রয়োজন দেখা দিল। সরকার হল জনসাধারণকে টেনে আনার। সুরেনবাবু অকৃতি পুরানো রাজনীতিকরা সেদিন যেটা পড়লেন। নতুন পুরোহিত হলেন লালমণ্ড রায় এবং আরও পরে গান্ধীজী। এটা একটা অসুস্থ পক্ষ অবলম্বন করলেন। অর্থনৈতিক পাশাপাশির অগণতার প্রতিক্রিয়া ভাঙা সমাদিকারের কবি জনসাধারণের কাছে অর্থহীন। সেই প্রতিক্রিয়া দিতে না পেরে তাঁরা তির পক্ষ গণ-চিত্ত অর করলেন। রাজনীতির সঙ্গে ঘর্ষের গাঁটছড়া বাঁধা হল ঘর্ষের আবেগনে মোহাচ্ছন্ন অগণ পাড়া দিল সেদিন।

নিবেদনের মনের গণ বিজ্ঞির গণতন্ত্রের চিন্তাধারা।
নিরেই রাজনীতিকদের সঙ্গে সক্রিয় হওয়া সঙ্গপর
হয়েছিল বটে, কিন্তু দুজনে পড়ে গেলেন রবীন্দ্রনাথ।
তিনি যে কবি, উঁচু নীচু প্রত্যেকের কাছেই তিনি যে
নিজের জন্মের ছায়া খুলে দিতে ব্যাধ। জনসাধারণের
পাশে বসার ভিঁনি না থাকতে পারেন, কিন্তু তাই বলে
ধর্মের নামে জনসাধারণকে প্রভাবিত করা ? নিজে ধর্ম-
প্রবণ হলেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বুদ্ধি নিয়েছিলেন।
বলেছিলেন, জনসাধারণের মনে জাতীয় চেতনা পুষ্টোপ্তি
না জাগিয়ে তাদের স্বাধীনতার মধ্যে টেনে নিয়ে লাভ কি ?
কিন্তু যে দিন যে বুদ্ধিটা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে খুলে
বলেন নি সেটাই ছিল তাঁর প্রধান বুদ্ধি ; বক্তিত অল্প জন-
সাধারণকে প্রভাবিত করার তাঁর কবি মন শার মের নি।

হরতো রবীন্দ্রনাথের এ বুদ্ধিতে ভুল ছিল। অল্প
জনসাধারণ আত্মনের মধ্যে ঝাঁপ দিলে আর অল্প থাকে
না। কিন্তু তাঁর বুদ্ধির মধ্যে যে জনসাধারণের একজন

শ্রেষ্ঠ বন্ধুর দুটিপাতের পরিচয় পাওয়া যায় তা অনস্বী-
কার্য। কিন্তু সেদিনকার রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে
একান্তবোধ না করতে পারার ফলে অত্যন্ত তীব্র জাতীয়
চেতনার অধিকারী হয়েও রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তা নিয়ে
স্বাধীনতার কথা নিয়ে অল্প কথ লিখেছিলেন।

এইগর ভিতরের এবং বাইরের জটিল সম্বন্ধের চাপে
রবীন্দ্রনাথের রচনা স্বাভাবিক একটানা ক্রমবিকাশ ও
ক্রমপরিণতির পথে যেতে পারেন নি। এখানে শেষের
পথের উপর দিয়ে ধমকে ধমকে আকস্মিক পরিবর্তনের
মধ্যে দিয়ে তাঁর কাব্যের রথকে এগিয়ে চলতে হয়েছে।
সেইকজাই এমন অনেক চিন্তাও বন্ধুর সমাবেশ আবার
রবীন্দ্র সাহিত্যে পাই যাদের আরও অনেক বিতৃষ্ণা,
আরও অনেক বিকাশের সম্ভাবনা ছিল। সেই সম্ভাবনাকে
বাড়বে রূপ দেওয়ার মত সামর্থ্য এবং প্রেরণের অভাবও
রবীন্দ্র-মানে ছিল না। তাই সেগুলো সম্ভাবনাই থেকে
গিয়েছে।

রূপসী পল্লীবাসিনী

যেখানে পুষ্পভরা বাগানব জীবন বকে যে কাব্য ও
সদীতের সন্ধ্যারা এবং যখন তা সূর্যের উত্তরে বায়নার
পাল্লিরসারীর সীমানা ও গঠিত।

যাকালী নারীর কন্ঠের লাবণ্য হঠাৎ জাবে বিকসিত
হর তার মনে, অস্বাভাবিক দেখে। সাধারণ পাঠ্যে তার
লালিতা ফুটে ওঠে, যেন বাহিরের আসে অসুখের দ্বন্দ্ব,
পাড়ার বর্ষার পাত ও তার জমির শুষ্কতার দৃষ্টি অসুখ
সম্বন্ধ।

কেশোরাম কটন মিলস্‌ এমন ধাতুর চাটখা
মিটারের ধাতু নানাব্যকার কাপড় তৈরী করতেন।
আমাদের তৈরী পাড়, বৃত্তি ও পাড়িঙালি বস্ত্র ও বর্ণিত্য
কল পাড়া ভারতে হবার অর্জন করেছে।

অনুপম বসন

কেশোরাম কটন মিলস্‌ লিমিটেড

কেশোরাম

মানসিং এড্রেস : বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ

৮, রয়েল এক্সচেঞ্জ প্লেস, কলিকাতা



পঁচিশে বৈশাখ

ঈশ্বরদাস সরকার

পাশ হসে গেছে দুগ বছর ও দিন
পঁচিশে বৈশাখ তবু আশ্বর্ষ রতিন !

এইদিন রূপে রূপে গড়ে মনোহর
সমীত-সুখর !

অত্যন্ত রৌদ্রের বন্তো শুচিহাসে দীপ্ত অমলিন
পঁচিশে বৈশাখ এইদিন ।

নব আশীর্বাদে
পৃথিবীকে পূর্ণ করে একা নিবিধানে
পঁচিশে বৈশাখ ।

পঁচিশে বৈশাখে জাগে নৃপ বাহুবেরা লাখে লাখ ;
অবলম্ব তাহাদের মন

শক্তি পাশ, বাধে নীত যনের মতন ।
পরম ঐতিহ্যে

সবারে আপন করে চায় তারা নিতে ।
পঁচিশে বৈশাখে

আবরা মিলিত ছই হাজারে হাজারে লাখে লাখে ।

পঁচিশে বৈশাখ নয়—নয় শুধু বৈশাখ পঁচিশে :
বহুরের ঐতিহ্যে, নিমেষে নিমেষে
কতো গান, কতো কথা, কতো শত সুর

পৃথিবীকে অহরহ করে জ্বলন্ত ;
কতো গ্লোম ঐতি ভালাবালা

আরো, কতো অভ্যুদয় অহরহে আশা
আমাদের জন্মের একান্ত গভীরে

বাহে বালা নীরবে শু ধীরে অতি বীরে,
তবু যদি বছরের সাধারণ রক্তহীন দিন

জন্মকে করে কতু বৈচিত্র বিহীন ;

হয়তো জন্ম

যেনে নের জীবনের তুচ্ছ পরাজয় ;

হয়তো বা থাকে না'ক কারো সাথে তার কোনো মিল ;
তার কাছে ব্যর্থ মনে হয় খেদ বিপুল নিখিল !

আর তাই ভুলে গিয়ে সব কথা স্মর
পীড়িত জন্ম হয় ব্যথিত বিস্তর !

তাইতো যখন এই বিচিত্র নিবিধে

আমাদের ভাবনাঃ নষ্ট হয়ে যায় ভিলে ভিলে,
যখন অস্থির

এই মন, এ-পৃথিবী, নক্ষত্র ও নীর ;
যখন হিংসার

উন্নত পৃথিবী কাপে সরোবর তরঙ্গ
তখন বিশ্বর আনে অকস্মাৎ পঁচিশে বৈশাখ ।

পঁচিশে বৈশাখ আছা অপরূপ অদীন অবাক !

যে-পঁচিশে বৈশাখের তরে
আমাদের অন্তরে অন্তরে

জাগে আশা, জাগে গান, জাগে উদ্দীপনা
যে-পঁচিশে পাই যেন আমরাও কবির কল্পনা

পঁচিশে বৈশাখ সেই যে-কবির পুণ্য জন্ম দিন
সে কবির গনে গেয়ে পঁচিশে বৈশাখে ছই আমরা নবীন ।

আমরাও লাভ করি নব জন্ম সুখে

পঁচিশে বৈশাখে বিশ্ব কবির গৌরবে ।

আরো একবার

ব্যস্ত করি দিকে দিকে বাহুগুলি এমন-দীয়ার ।

ব্যথার-পূজা

যতীন চন্দ্র দাসগুপ্ত

(উপভাস)

[এগারো]

বীণার মৃত্যুর পর মিনতির সাহচর্যে মণির সংসার পরিচালনা এবং সন্তান প্রতিপালনের কাজ বেশ সুস্থ-ভাবেই সম্পন্ন হয়ে আসছিল। কিন্তু মণির বাধন হারা মনের কোথার বেন তবুও সেই ভাঙনের একটা অব্যক্ত কান্না, মাঝে মাঝে বড় করুণ রূপে ঝিকিয়ে কেঁপে উঠতো। কিসের বেন একটা অব্যক্ত বাধা, অম্বরের অম্বস্তর স্তর থেকে তীব্রের মতো বেগে ছুটে এসে, যুকে বিধে, মাঝে মাঝে কেমন বেন তাকে বিস্মিত করে তুলতো।

মিষ্ট, হালু আর চিয়ার প্রবাবস্থা করেছে মিনতি, তাদের ভালো ভালো ফুল ছোটেলে রেখে পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দিয়ে। কিন্তু পন্টুকে সে আজ পর্যন্ত নিজের আয়ত্বাধীনে আনতে পারে নি। তাই, সেই কনিষ্ঠ পুত্রটিকে নিয়েই মণির মিনের বেনার ভাগ সময়ই অভিযাহিত কর্তৃত্ব হচ্ছে। আবহাওয়ার আর অভ্যাচারের মাত্রা মণি আত্মকাল এমন বাড়িয়ে দিয়েছে পন্টুর, যে তা দেখে মিনতিও মাঝে মাঝে বীতিমতো বিবস্ত্র না হয়ে পারে না। অথচ হু হুটে সে মস্ত তেমন কিছু বলতেও আর ভরসা পায় না সে। বীণার আকস্মিক মৃত্যুতে যে কল্লনাতীত আশাটা ইতিপূর্বেই পূর্ণ হয়েছিল মিনতির, তার বেন কেমন একটা অব্যক্ত লজ্জা, তার ফলর বীণার তত্ত্বাভে থেকে থেকেই মাঝে মাঝে বেহরো থেকে উঠতো। আসলে চেয়েছিল সে শুধু মণিকে।

পন্টু কিন্তু মণির লগ ছেড়ে একদম থাকতে চায় না। মাঝে মাঝে সেজন্ত মণির যে কাজ কর্তের অঙ্গবিধে না হয়, তা নয়। কিন্তু শাসন কিবা তার বেথানো তো হুয়ের কথা, বিরক্তভাবে মণি যদি ছেলে-প্রতি ভুলেও কখনো হুখ বিহীন করতার চেষ্টা করে, তা হলেই পন্টু

একেবারে কারার কুলকেজ বাধিরে রেখ। তখন মণিকে এটা ভটা সেটা বা হোক একটা কিছু দিয়ে চুপ করাতেই হয়। অতিরিক্ত আত্মা বিরে শেষ পর্যন্ত ছেলেটার মৃত্যুবাণ হতে উঠলো মণি। উন্টোপান্টো খাত্ত জবোয় আচুর্থে, শেষ পর্যন্ত ঈহাৎ পায়ালাসিলে আক্রান্ত হ'রে পড়লো পন্টু।

আহার নিত্রা ত্যাগ করে মণি শুধু নিশিদিন ছেলের মূণের দিকে চেয়ে বসে থাকে। শিতা আর শিত-পুত্রের চার চক্ষের, সে কি গভীর যেমনায় গোপন জিজ্ঞাসা। পৃষ্টি বিনিময়ের ভেতর দিয়ে তা বেন একই ভাবে যত্নে চলেছে। বরদাত্ত কর্তে পারে না মিনতি মণির এই সব রেহের অভিনয়। ছেলে কি আর কারো হয় নি পুণিবীতে? হোগ কি আর তাদের হয় না কোন মরি? হাসপাতালে মিলেই বরং বাঁচতো ছেলেটা। কিন্তু সে সব তো করবে না ও লোকটা; তা হলে যে ও নিজেও বাঁচতো ছেলেটাকেও বাঁচাতে পারতো; বলবে তাকে মিনতি সে সব কথা? মক্কুগে যাক; সত্যিই থেরা ধরে গেতে মিনতির মণির ওপরে।

ভাত্তার, বলি সবই আসছে; কোনও ক্রটি হচ্ছে না কিন্তু ছেলের চিকিৎসার। তবুও তার জীবন প্রাণীপ বীরে বীরে নির্ধাপিত হয়ে আসছে। না না, সেবে উঠবে পন্টু। ও মরে গেলে কি নিয়ে বেঁচে থাকবে মণি এ হলোয়! এ যে সেই হুখ, সেই চক্ষু ছুটি! বীণার সঙ্গে বেন অবিকল মিল রয়েছে। পন্টুকে হারিয়ে কি আর মণি বেঁচে থাকতে পারবে? না না, তা সে কিছুতেই পারবে না। বীণার পর পন্টুকে হারানো, আর বিশ্ব মঙ্গারকে হারানো একই কথা।

“আমি বরাহি ছেলের কাছে। একটু কিছু মূখে না দিহে এলে যে শরীর ভেঙ্গে পড়বে।” বলতে বলতে

যেন বাক্যে হবার উপক্রম হয় মিনতির। তবুও যদি উঠতে পারে না। তার ভিলেক অদর্শনে পল্টুর ঢকল ঢকু সহসা স্তব্ধ হয়ে ওঠে। বাক্য যেরূপ হয়ে গেছে সেলেটের সেই রাত দশটা থেকে, তবুও কি যেন সে বগতে চায়। বাতাস লাগে গোলাপের পাণ্ডির মতো কাপড়ে থাকে পল্টুর ঠোঁট দুখানা। একটুখানি বেলানার রস ঢেলে দেয় চানচে করে যদি ছেলেটার মূণে; বাতেনেই না যখন ছেলেটা, তখন আরও কি হবে তার গলা জকিরে রেখে?

গভীর রাতে সজ্জার ঘোরে পল্টুর মাথার কাছে একটু এগিয়ে পড়েছিল যদি; সহসা একটা ঘর ঘর নড়ে আবার ভেগে উঠলো সে। বাতালের মতো অমন করে মাথাটা কাপড়ে কাপড়ে ঘলে চানছে কেন পল্টু? “পল্টু ও পল্টু অমন করছিল কেন বাবা? কি হোলো তার? প-টু ও প-টু! এতালবাবু আছেন? নিতাই, ও নিতাই একবার তোমার নাকে ঢেকে ভালো তো!”

কি হয়েছে? মিনতি পল্টুর লম্বা পালে ছুটে এসে মনকে ঝর করতে করতে সহসা যেন ঢেকে যেন ঝাঁক! কৈ উবেগ তো আর কিছু নেই পল্টু! ও তো ঘুমিয়ে পড়েছে বসেই যেন হচ্ছে না? ভাতাভাড়ি গায়ে হাত দিতে যায় মিনতি! চোখের জল মুহুর্তে মুহুর্তে বাবা গিরে যদি বলে,—“জন্মে আর ছুঁয়ে কি হবে! সব শেষ হয়ে গেছে মিনতি, সব শেষ!” বালাকের মতো হাউ হাউ করে কেঁদে ওঠে যদি! কিছুক্ষণ পরে মনির কান্নাও বেগ কমে এসে—চোখের জল মুহুর্তে মুহুর্তে মিনতির দিকে চেরে সে বললো—“আহ! বিহু, হাবু আর চিত্তা ওকে আর শেষ বাতের মতোও একবারটি লেবতে পেলো না।” কান্নাও বেগ কমে গিয়ে আর একবার হা ভক্ত্য করে উঠলো যদি। মিনতির চোখের কোণ বেয়ে তখন টপ টপ করে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়লো। নির্জান মনের কোণার যেন তখন তার মনের ঝাঁক ভেঙে বাবুল বেগে অন্ধর কোয়ার ছুটেছে স্রব করেছে।

তার হৃদে না হতেই প্রতিবেশীরা এসে মনির ছেলেকে শ্রমানে নিয়ে যেতে চাইল। কিন্তু যদি কাউকেই তার ছেলের অঙ্গ স্পর্শ করতে দিল না। পাঁজা-কোলা করে, বরাং ছেলে কোলে নিয়ে, একাই সে শ্রমানে বহুদের সাথে নিরস্ত। বাটের দিকে এগিয়ে চলতে লাগলো।

ছেলের লুককার শেষ করে যদি যখন বাবার কিয়লো—
—তখন বেলা তিনটে। শ্রমানের আচার নিয়ম শেষ করে, শ্রমান বহুদের বিদায় দিয়ে, যখন সে তার ঘরে চুকলো, তখন তার ডান পায়ের দিকে চেয়েই মিনতি একেবারে টেজির উঠলো—“কি সর্বনাশ! অমনি করে পাটা গুললো কি করে?”

উদাস গভীর কর্তে যদি উত্তর দেয় “একখানা জলধ পোকা কাঠ এসে পড়েছিল পায়ের ওপরে!”

কোনও মতে চক্ষের জল পুকিরে মুছে, নিতাইকে পাঠিয়ে দিল মিনতি ভাতার ভাতকে।

ভাতার বড়ি লাগিয়ে হীতিন্যতা অবরোধ করে, যদি বা মিনতি দিন কয়েকের মধ্যেই মনির পায়ের কত লাগিয়ে তুললো, কিন্তু মনের কত তার আর কিছুতেই সারে না। জ্ঞানিক হুঁতাবনা পড়লো মিনতি মনকে নিয়ে। পত্রিকা অফিসের সমস্ত বারিষ এক। এতালের খাড়ে চাপিয়ে দিয়ে, সর্বশেষের সবচরী লেখে বললো মিনতি, মনির মনের গতি ফেরাবার ক্ষমতা। কিন্তু মনির যেন তাতে মনে হয়, মিনতি বন্ধ বাড়াবাড়ি করছে তাকে নিয়ে।

মনির মনের গতি ফেরাবার আর কোনও উপায়ের না দেখে, তুল হোটেল থেকে ছুটি করিয়ে দিয়ে এলো মিনতি মনির ছেলেদের তিনটিকে। বিহু ছদ্ম খুব কান্নাকাটি করলো—পল্টুর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে। কিন্তু হাবু আর চিত্তার মনে শুধুমাত্র কিছু স্পর্শ করলো না পল্টুর শোকটা। মিনতি সকালে বিকেলে এগিয়ে বের বীণার ছেলোমেরে ভালোকে মনির লম্বা। উদ্বেগজনিত মৃত্যুতে যদি ওই চেরে থাকে ভাতের দিকে। পিতার

হুকের সেই চেহারা দেখে, হুধে ঝাঁচল চাপা মিরে মিল্লু হুঁশিরে কেঁদে, স্থানান্তরে লুকিয়ে চলে যায়। মিনতি অস্থির হয়ে ওঠে এদের কাজ কারখানা দেখে।

কেন এমন হয়? হেলেমেয়ে কি মরে না কারো। কোনদিন? একটা ছোট্ট ছেলের শোকে শেষ পর্যন্ত কি পাগল হয়ে বাড়ে লোকটা! ছুঁকিয়ার হাঁপিয়ে ওঠে মিনতি। পরামর্শ করে সে মশির ভাবাকার লম্বা, বড় বড় ডাক্তার আর সেডি ডাক্তারদের সঙ্গে। কেউ বলেন—গিরিয়াস্ শব্দ, কেউ বলেন মেটাল ডিকঅর্ডারমেণ্ট, কেউ বলেন মার্জিঙ্গ পাঠাতে, কেউ বলেন—জুসৌরী; কেউ মোমাক্রমিক বলে দেন, রাঁচি ছাড়া ওর আর ভাল হবার উপায় নেই। কথা শুনে শুনে বেত্না ধরে যায় মিনতির ডাক্তারগুলোর ওপরে।

চেষ্টা করে করে মিনতি দিন সাতকের ভেতরেই বোটর কারটা চালানো শিখে নিচ্ছে ছাইভারের কাছে। সন্ধ্যার সময় আজকাল সে একাই মনিকে পাশে বসিয়ে হাওয়া খেতে বেরোয় গড়ের মাঠের দিকে। কোনদিন যায় লেকে, কোনদিন বা বেলুডে, কোনদিন দক্ষিণবরে। গাছগাছড়ার ঘেরা এক একটা নিরিহিদি জায়গা বেছে নিবে অদূরে গাড়ী থানিয়ে, একখানা সমুদ্রকি পেতে, বসে সেখানে মিনতি মনিকে নিয়ে। ছাত্রকালের গল্পগুলো দেয় নানা বকমের। আকর্ষ হয়ে চেয়ে থাকে মনি মিনতির হুধের দিকে।

অভিমান জড়ো জড়ো করে মিনতি প্রায় করে মনিকে “অমন করে চেয়ে রইয়েছো কেন? আমাকে দেখতে পায়ো না বুঝি দুটকে?” তারপর কৃত্রিম কান্নার তান করে সে চকু মুড়তে শুরু করে তার নিজের কাণড়ের ঝাঁচল দিয়ে। কখন যেন সমস্তা হয় মশির— বলে, “না না আমার কিছু হয়নি মিনতি তুমি অমন করে কেঁদে না।” তার পর তার কাছে এসিরে বসে চেকের জল মুছে দেবার চেষ্টা করে মনি। মিনতি বিল বিল করে হেসে উঠে, লম্বা জাপটে জড়িয়ে ধরে তাকে। কানের পাশে মুখটা নিয়ে বলে—“ছোট্ট

একটা ছেলের শোকে হুধি মাছব অনুনি করে তেবে তেবে মরে? বাবা যেখানে তারাই বা বলে কি বলো দেখি? তুমি কি হেলে বাছব? মিছটা পর্বত লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁবে ভাসাছে তোমার কাণ্ড দেখে? একটা হাসো দেখি?”

মিনতির কথাত্তনে বিবান মাখানো পুট্টি হেলে লম্বা হাসবার চেষ্টা করে মনি। কিন্তু হুই চকু ততক্ষণে তার অস্তর খোয়ারে তারাক্রান্ত হয়ে ওঠে।

ঝাঁচল দিয়ে মশির চকু হুধিরে দিতে দিতে, মহা বিহবল হয়ে মিনতি বলে,—“সত্যিই এ সব ভারি দিল্লী লাগে আমার। চলো আমা বাসার দেখবে নিস্তর আঙ আঁমি ঘেরাশে মাগ: বুঁড়ে মরবো।”

কথা শুনে চমকে ওঠে মনি,—“না না ও কথা বলো না! ও ভারী মল্লুত্বণে কথা,—আমার জন্ম তুমি কেন মাথাবুঁড়ে মরবে মিনতি?”

প্রচণ্ড অভিমান তত্বে, হুধ ফিরিয়ে কাঁদো কাঁদো হয়ে মিনতি বলে,—“নিস্তর মরবো একশো বার মরবো, নইলে তুমি হাসো—একুনি, হেলে কবী বল আমার সঙ্গে। এমনি করে থাকলে তোমার অন্তো সাধের পজিকা যে গোলায় বাবে, সেটা খেয়াল আছে তোমার? এবারনা মিল্লী থেকে কালকে কতো বুদী হয়ে তিরি লিখেছে তোমার পজিকার কথা তুলে। কতো বিজ্ঞান নিয়ে আলোচন প্রকাশ বায়, কতো নাম হরহে তোমার! বড় বড় করছে লোকে তোমার কাপড়টার নাম উল্লেখ করে। যে নইল কি তুমি জাসিয়ে দিতে চাও, শুধুদ্বারা একটি ছেলের শোকে? তুমিই তো এক দিন বগেছিলে,—ম’রে বাছব শুধু যেহটাই পরিভ্যাগ করে, কিন্তু কোথাও বার না তার। অস্তরের সায়িছ ছাড়িয়ে? সেই তুমিই আত তোমার ছেলের জন্ম কাঁদতো?”

ভারি স্তব্ধ স্তব্ধ কথা বলছে তো মিনতি! মনি যেন লম্বা ভেগে উঠলো মিনতির কথা শুনে! হুধে

বলে,—“পত্রিকাটা সত্যিই ভাল লাগছে গ্রাহকদের কাছে” উল্লসিত হয়ে মিনতি উত্তর দেয়, “কেন লাগবে না তুমি? এমন সুকৃপূর্ণ সম্পাদকীয় মন্তব্য, এমন সব নানী দেখকরের selected লেখা, অল্পর স্থলর হাসির গর, পতীর গবেষণামূলক এমন সব ত্রাণনৈতিক গ্রন্থ, কায় না ভালো লাগে বলো? এতো মতকের খোঁচাক আঁককের বাতাসে আঁক কটা পত্রিকা জোগাচ্ছে তুমি? তুমি কবিতা লেখন। বলে, প্রভাস লেখন ছুঁ কতছিল! কীরেনবাবু তো লেখন সুখের গুণেই বলে গেলেন,—না না সে standard আর মিনতি পত্রিকার নেই দেখতে পাচ্ছি।”

“কেন কেন?—সে কথা বললেন কেন? কি হয়েছে ঘোড়া তুমি?”

“বাবা হোব হুইনি! ছাপল দিয়ে যদি দান বাড়ানো চলতো, তা হলে আর গরুর হরকার ছিল কি? আমি কি পারি তোমার মতন সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে? তাইভেই বলেছেন। তোমার সম্পাদকীয় লেখাটার জন্ত মাস কাবার চতে না হতেই কতো লোক বে আসেন পত্রিকাটা কিনতে তার ট্রিক নেই। কিন্তু যখনই শোনেন গুঁরা, তুমি অশ্লুত, এবং সম্পাদকীয় মন্তব্যটা তোমার লেখা নয়, অমনি সবাই হুৎতকিরে আস্তে আস্তে ফিরে চলে যান! অগতঃ সত্যিই তো আর তুমি অশ্লুত নও! তবুও আমাকে তো সেই কপাই বলতে হয়! না-ই যদি চালাতে চাও কাগজটা তাহলে বলো কাল থেকেই বন্ধ করে দিওটা!”

চকল হয়ে প্রশ্ন করে বসি—“কি কাল থেকে?”

“কেন। পত্রিকাটা?”

“না না বন্ধ করতে হবে না। আমি আজ থেকেই সিনবো আমার সম্পাদকীয়! তুমি ভাদিরে দাও আমারের গ্রাহক অগ্রগ্রাহকবর্গদের, আমি বহাল ভবিষ্যতে আছি এবং ও মাস থেকে তারা পূর্বের মতোই পত্রিকার ভালো সম্পাদকীয় মন্তব্য পাঠ করতে

পারবেন! নিজের হাতে পড়া এমন ভিন্দি কি নষ্ট করতে পারি আমি? চলো বাসার বাই।”

উঠে পড়লো মিনতি মনিকে নিয়ে আবার তার ঘোড়ায়। বাসার চুকে মিনতি নিয়ে হাতে অল্পর করে শুদ্ধিরে দেয় মণির সেক্রেটারীরেট টেবিলের গুণরকার কাগজপত্র আর পাশের খোঁচানো শেরের বই কেতাব-গুতো। অল্পর একটা টেবিল ট্র্যাণ্ডের হুন লাইটের সেডের ভেতরকার বাথ খেঁক, বৈজ্ঞানিক আলো যেন দিবালোকের মতোই পরিষ্কার আলো ছড়িয়ে দিয়েছে মণির সারা টেবিলটা দিয়ে। কি অল্পর ক’রে সাজানো রয়েছে ডিন ডিনটে কাউন্টেন পেন। কে আসলো এসব? এমন টেবিল চেয়ার তো মণির কোনকালে ছিল না। পরিতৃপ্তিতে সবুজ বন যেন তারে উঠতে থাকে তার। নিশ্চয়ই এ সব মিনতির কাজ। এ সব তো কিছুই এতোদিন লক্ষ্য করে নি মণি? সহসা টেবিলের পাশে মিনতিকে আসতে দেখে, কৃতজ্ঞতার হাসি হেসে, প্রশ্ন করে মণি,—“বীণার মৃত্যুর পর তুমি বাসার বহল করেছিলে জানি, কিন্তু এতো সব আসবাব পর কবে আসলে মিনতি? এতো টাকাই বা তুমি পেলে কোথায়?”

“কেন আমার কি টাকার অভাব? থিরে করি নি বলে বাবা আমাকে তার ছেলের মতোই আমারো নামে উইল করে গিয়েছিলেন। সংসারে না থাকতে চাইলে আমি তার উইল অস্থায়ী লক্ষ্যাবি নগদ টাকার অধিকারী। দাদা সে টাকা আমাকে পূর্বের ব্যাঙ্কে আমার নিম্ন একাউন্টে আলাদা করে দিয়েছিলেন। সেই টাকার Fixed deposit এর খুঁদ কি বড় কম টাকা। আসল টাকার তো আজ পর্যন্তও আমাকে হান্ডাই দিতে হয় নি। হুইয়ে তো তোমার পত্রিকা থেকে সব কিছুই চালাচ্ছি। এ সব আসবাবপত্রের আর দান কতো? এতো অশ্লুত হবার কি আছে তোমার? আরো কি চাই বলো না?”

কৃতজ্ঞ-কল্প মৃষ্টি মেলে, মণি উত্তর দেয়,—“না না,

আমি কিছুই চাই না! কুমিই তো আমার সর্বস্ব! তোমাকে পেলে আমার কি চাইবার থাকতে পারে?*

বুঢ়কি ধেনে মিনতি জবাব দেয়—“আমাকে বুঢ়ি পাতনি এখনো কুমি? কি করলে পাবে তুমি? আমার সমস্ত টাকাকড়িগুলো তোমার নামে লিখে দেবো, তা হলে খুশী হবে তুমি?”*

এদিকে, মিনতি বৃষ্টিতে, মিনতির সুখের দিকে চেয়ে বসি বলে,—“না না, সে সব আমার বরদাস্ত হবে না। এতেই তো দেখছি আমি নিজেকে যেন কোথায় হারিয়ে ফেলেছি। এ গোবাকী জীবন কি আমার হাতে বরদাস্ত হবে বেনী দিন? তার চাইতে কুমি যদি এই বাড়ীর কোনও একটা পরিত্যক্ত খুপরিতে, একটা আধমরলা যেমন তেমন টেবিল চোরাগ পেতে মিটে আমাকে, তা হলেই বরং লেখাপাড়াটা আমি চালাতে পারতুম কিছুদিন। এ রাত্তিরেই অতরাং আমার স্বপ্নগ্রন্থ মনের ভাববাহারাই তো খুঁজে পাবি না মিনতি। লিখবো কি করে বল বেণি?”

অত্যন্ত খুশী হয়ে মিনতি উত্তর দেয়,—“সেই কথা বলছো? তা হলে উঠে এসো আমার সঙ্গে,—বেববে এসো বলছি।” বলেই মিনতি আগে আগে দর থেকে যেহিঁরে একটা গাড়ী বারান্দার দ্বার দিয়ে চলতে থাকে।

বহুচালিত পুস্তিকার মতো মণি তাকে অঙ্গুলন করে চললো সেই পথে।

হঠাৎ ঝড়ের পড়ে মিনতি, একটা ছোট্ট কুঠুরীর দরজার সম্মুখে। তারপর তালচাচী খুলে ভিতরে ঢুকে বাড়ির ছুইচটা টিপে দিয়ে বলে,—“দেখ বেণি এখানে বলে তোমার লেখা চলবে কি না?”

ব্যাপার দেখে, নিদাক্ষণ বিশ্বের তুচ্ছিত হয়ে পড়বার উপক্রম হয় মণির। নিখিষ্ট মনে ঘরখানার আগাগোড়া বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করে মণি বেশ বুজতে পারলো, এ যেন তার পুরানো বাসার সেই নিদ্রা পড়বার কক্ষটি। সেই টেবিল, সেই ছাশান চোরাগ, সেই হাতল ভাঙা

কেবিনের ইতিহাসঘরটা। তেমনি ঠাণ্ডানো রয়েছে কক্ষের দেওয়ালে তার চির শ্রিত ভিত্তিরিস আয়ের-গিরির বিকল্প রোম নগরীর আটান চিত্রটি। তেমনি তার অপর পাশের দেওয়ালে লাকানো রয়েছে পদানদীর চরের সেই পোকার কাটা ফটোখানা। আশেপাশে বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিম রায়, রামকৃষ্ণ রায় আর বঙ্কিম নন্দকুমারের ছবি। টেবিলের পাশে সেই পুরানো দেয়ে তেমনি লাকানো রয়েছে তার সেই পুরানো ছেঁড়া নানা রকমের পুঁপিপত্রগুলি। আর ছিল মাথার ওপরে একটা ছোট্ট কোলানো পাখা। কিন্তু গরমের দিনে ওটা এয়োজন বলেই তার নতুনবে সে তেমনি বুদ্ধ হোলো না। কিন্তু সব চাইতে বিশিষ্ট হোলো সে, মিনতির আত্মরিক্তাপূর্ণ রুচি বাবের ত্যাগ এবং বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে। ঝড়েরে ঝড়েরে শুধু দেখতেই লাগলো মণি, সুখের ভাষা কে যেন তখন তার বন্ধ করে দিয়েছে।

“কেন, এই ঘরে চলবে তো? পারবে তো পূর্বের মতো লিখতে এখানে বসে?”

মহলা মিনতির কথায় সচিব কিরে পেয়ে ত্রুপি জবাব দেয়,—“হী তা পারবে। তবে আজ থেকে আমি তোমার নতুন লেক্টোরাইরেট টেবিলে বসেই লিখবার চেষ্টা করবো। বন্ধ করে দাও এ ঘর। চলো!”

কক্ষ তাল্য লাগিয়ে মণির সঙ্গে নিষের ঘরে কিরে আসবার পথে, মিনতির বুকের হৃদিতার প্যাবন বোঝাটা যেন ধীরে ধীরে কোথায় অসুস্থ হয়ে যেতে লাগলো। এ ঘরে এসে টেবিলের সামনে বলে বলে কি যেন ভাবলো মণি কিছুক্ষণ। তারপর সেজ থেকে একটা বই টেনে নিয়ে সে অস্তমনের মতো বলে উঠলো,—“কি আমার কাটা কাগজ কোথায়?”

মহলা বুজতে পারলো না মিনতি মণির সেই কথা। তখন পাশের ঘরে মিষ্টকে গিয়ে সে প্রশ্ন করলো,—মণির বক্তব্যটা বুঝবার অস্ত।

হাত ব্রহ্ম নেড়ে বিহু উত্তর দেয়,—“ও আপনি আনেন

না বুঝি? বাবা যে দেখক! লিখবার অল্প কাগজ চাচ্ছেন।”

মিনতি তৎক্ষণাৎ নিতাইয়ের ঘর থেকে তিন বিজ্ঞা লতা হুলস্থাপন কাগজ নিয়ে মণির টেবিলে হাজির করলো।

মনি বলে,—“বড় ছুরি আছে কাগজ কাটবার?”

হেসে হেসে মিনতি উত্তর দেয়, “কাটতে হবে কেন? এক একটা সিট নিয়ে নিয়ে দেখা চলবে না বুঝি?”

অন্নমনন্দের হস্তো মনি বলে,—“না না, ছুরি না থাকে তো একটা ছেল নিয়ে এসো, টুকরো খিঁপ কাগজ না হলে আবার দেখা হয় না। নীপসির কথা,”

উৎফুল্ল মনে ছুটে গিয়ে চাকু নিয়ে এসে মিনতি নিজেই কেটে চার টুকরো করে দিতে লাগলো কাগজ-গুলোকে। আর সেই সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে বক্তব্য দিতে লাগলো সে নিজের অজুতকে, সহসা মণির এই সহজ হবার রকম দেখে।

সমুদ্রের কলরোল থেকে মনি অন্নমনন্দের হস্তো কুলে নিলো প্যাক্টর কিপটিওয়ান কলমটি। তারপর একটার পর একটা মিনতির কাটা কাগজের সিট টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করলো মনি।

সেই রাত্রি চুটার সময় বসেছে লেখার কলম নিয়ে, রাত্রি এখন দশটা বাজে, তবু লিখেই চলেছে বাহুঘটা গ্রিক যেন বহু জালিত পুঙ্খলিখার হস্তো। কেন বিকে খোলা নেট, ক্রাশপ নেট, শুধু লিখতে আর লিখছে। কি লিখছে অতো? গল্প? না প্রবন্ধ? অজুত হুঙ্কার দেখাচ্ছে তো। বাহুঘটাকে! সত্যিই মিনতি মুগ্ধ হয়ে যেতে লাগলো মণির সেই চেহারা দেখে? অপরূপ এদের ভগ্নতা তো? আবার তার প্রীতিসার কথাগুলো মনে পড়ে যায়। এক একবার গিয়ে উঁকি বেঁধে লেখাটার অংশ বিশেষ পড়ে দেখবার সাধ হয় মিনতির। কিন্তু পরকণ্ঠেই বিদ্রূষ কথা তার মনে পড়ে যায়। “পরহাস্য সামনে রাখেন না বেন। ভাকলে বাবা ভয়ানক বিরক্ত হবেন। রাতের পানার ঠাণ্ডায় টেবিলের পাশের

একটা টিপযেতে লাড়িয়ে রাখতে বলে আপনি ঘরে দেখে তুরে পড়ুন গিয়ে। লেখা করে গেলে বাবা নিজেই উঠে যাওয়া লাগবে।” করবেন। পাশেই একটা ছোট্ট কুশোতে গুল রেখে দেবেন কীচের রাস চাপা দিয়ে। রাত্রি বাহোটার মধ্যে ঠেকে চা দিতে হবে আর তিনেক। সময় বতন চাটেবিলে না গেলেই দেখবেন,—রাতের কলমটা নাড়িয়ে রেখে বাবা আবার ভাবতে বসে গেছেন।” না না, সত্যিই এদের বিরক্ত করা উচিত নয়। তাগো কিছু ছিল, নইলে তো আজ বেরানুব বনে যেতো মিনতি লোকটার কাছে। সত্যিই মিনতি চা দিতে দিতেও পরব করে দেখেছে বিদ্রূষ কথাগুলো।

রাত্রি বাহোটার পর, যথারীতি নিজ হাতে মিনতি, মণির খাবার এবং কুশোর গুল ঢাকা দিবে, মণির পেটনের ইচ্ছাচারে বসে, রাতের আহার না গ্রহণ করাই লুপ্তিরে লুপ্তিরে দেখতে লাগলো মণির কাঁকলাপগুলো। ছিন্ন করলো মিনতি সেও আজ ছেগেই থাকবে মণির সঙ্গে, তাতে যদি রাত পুইয়েও যার তাতেও লে রাত্রি।

কিন্তু রাত্রি একটার পর কেমন যেন চোখের পাতা ছুটো তারি তারি ঠেঁকেতে লাগলো তার। শুদিকে বিশেষ তার কিছুটা পাক্সিল বই কি, কিন্তু খেতে গেলেই তো আবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়ে থাকে। না না, এতো দুর্বল নয় মিনতি। মনের খোর হয়েছে তার। ছেগে থেকে আজ সে দ্বিতীয় লক্ষ্য প্রমাণ করে দেবে মণিকে, সত্যিই তার আত্মনিক ভালবাসা আছে কিনা। এতো প্রতিজ্ঞা সবেও মিনতি কিন্তু শেষ পর্যন্ত বুঝিয়েই পড়লো।

রাত্রি চুটার পর চলাপথের দর বাহকের আচম্ভক্য হঠাৎকনি মনে, সহসা মণির লেখার নিবর্তিতা ছিন্ন হয়ে গেল। অন্নমনন্দের হস্তো তখন সে একবার দ্বিগু বলে ডেকে উঠেই, পিছন ফিরে মিনতিকে ইচ্ছাচারে বুঝিয়ে থাকতে বেগে, অত্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে গেল। আস্থা উপেক্ষিতা রাজ কস্তার মতোই বেচারা পড়ে পড়ে কতক্ষণ থেকে যেন ঘুঞ্জে গো। মনি বেচারা এই করে নি এতক্ষণ

কিছু। দেওরাল বাড়িটার দিকে চেয়েই, আড়াইটা বেজে গেছে দেখতে পেরে, সে যেন একবারে বেরাকুন ম'নে গেল। কি অত্যাচার বেশ দেখি? বেচারী হত না খেয়েই ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়ছে। এতোটা রাত্তির কখন হোলো! একবার কি তাকে ডাকতেও পারেনি মিনতি? লহল্য ভরানক চুর্ভাবনার পড়ে ঘরের তেতরে পাখচানী করতে লাগলো মনি। স্বাক গরুরা শেষ হয়ে গেছে আর মাত্র একটুখানি স্বাকি, তা'দে কাল জোরে উঠেও লেখা চলবে। কিন্তু মিনতিকে কি ডাকবে সে?

টেবিলের পানের টিপরের দিকে নজর পড়তেই ঢাকনা তুলে পথক করলো মনি, হু'লনের ছোটো খালসা খাবার ভাতে ঢাকা দেওয়া রয়েছে। মিনতি খানি পর্বত-মরি অজ্ঞ? না না, এতোটা স্বাৰ্ভাভ্যাগ বীণাও করে নি তার অজ্ঞ কোনমনি! সত্যিকারের শিক্ষা না পেলে সত্যিই ঘরেরা পুরুষের অত্বরণ হতে পারে না হরতো। প্রবীরবার সেই চিঠির লাইন ক'টা তার আবার আজ একবার মনে পড়লো। সত্যিই যদি এই মিনতিকে সে জীবনের গোড়ায় পেতো, তা'দে হলে হরতো তার জীবনের ধারাই বয়ে চলতে থাকতো। অজ্ঞ খাতে। একটা জীবন সে সত্যিই দুইয়ের কেলোছে। কিন্তু আজ এই অধৰ্ব্ব মনিকে দিয়ে কি কাজ আর হবে মিনতির? না না, মিনতির জীবনকে সে কিছুতেই বিপর্যস্ত করতে পারবে না। পাইচানী করবার সময় লহল্য কহুইরের বাজা লেগে, একটা বই মেকেন্তে আছাড় খেয়ে পড়ে যেতেই মিনতি ধড়মড়িয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠলো।

“গাত কটা বাজলো? ঘুরে বেকাছ বে বড়ো? জুনি খাওনি এখনো বুঝি?”

লহল্য ঘুম ভাঙানোর লজ্জার, ককল কৃতজ্ঞতার হু'লান হয়ে, মনি উত্তর দেয়,—“জুনি কেন বাওনি শুনি? আবার অজ্ঞে জুনি এমনি করেছে বুঝি তিলে তিলে নিজেবে মেরে ফেলবার মন্তলব করেছে? কালকেই আমি চলে যাবো তোমার বাসা ছেড়ে। তারপর বা

ঘুনী কোরো।”

পুথের অজ্ঞতা কাটাতে, হাই তুলে, দু'ধর ওপরে হাতের তুড়ি দিতে দিতে মিনতি বলে,—“আছা-কা-হা গেলেই হোলো বেন! আমি কি জানি জুনি অতকল বলে লিখতে পারো? খাবে এলো নীগসির?” তারপর স্বড়ির দিকে চেয়ে বলে,—“কী সর্বনাশ! তিনটে বাজতে চললো! জুনি অতকল লিখছিল কি করে? কোমরে খিল বয়ে না তোমাদের?” তারপর সে খাবার টেবিল টেনে বসলো।

মুচকি হেসে, রেট থেকে খাবার দুখে তুলতে তুলতে মনি উত্তর দেয়,—“কোমর থাকলে তো খিল বরবে।”

মিনতি ঐর করে,—“কি লিখছিলে ওটা?”

লংকেশে মনি উত্তর দেয়,—“একটা বাজে গল্প।”

তবুও শেষ হয়নি লেখাটা অল্পের অজ্ঞ।

খেতে খেতেই মিনতি বলে,—“কেন কে তোমাকে বাবা দিলো?”

“আবার কে বেবে,—হতভাগারা এমন চেষ্টিরে উঠলো রাজা থেকে, ‘বল হরি হরি বোল’ বলে, যে তারপর আর বনই বসলো না।”

সে কথা না শোনার ভান করে মিনতি বলে,—“কাল শোনাবে তো গরুটা?”

“বাজে গল্প একটা। ওর আর কি ছাই শুনেবে জুনি।”

“শুনে না লিখলেই পারতে!”

“লেখার ভূত একবার যাড়ে চাপলে আর না লিখে রক্ষা থাকে?”

“জুতে লেখার বুঝি তোমাদের? তাই অমনি বলে থাকতে পারো বুঝি?”

“তা বই আর কি?”

“আবার যাড়ে তোমার ঐ ভূতটাকে একবার চাপিয়ে দিতে পারো?”

“নিজের জালায় জলে মরছি তারই ওকা জুটছে না, এরপর আবার তোমার যাড়ে চাপালে তো মড়া হুঁজিলেই পড়বে আমি। কিন্তু তোমার একমিনকার

জুতের সাহায্য দেখেই তো ভয় পাচ্ছি আমি।”

“আহা তোমার বুখে ফুল চন্দন পড়ুক গো! চাপুক আবার বাড়ে ঐ জুতটা। সত্যি বলছি তোমার ঐ জুতকে আমি সর্বাঙ্গকরণে কামনা করছি।”

“সরবে শেষ পর্যন্ত না খেয়ে, না সুমিয়ে, বাবে গোমার তোমার সংসার ছেলেপিলে; তখন হুততে পারবে জুতের জালা!” বলেই এক হাসি জল খেয়ে উঠে পড়লো বনি!

হাস হাস করে মিনতি বলে,—“ও বে কিছুই খেলে না? তুমি দেখছি?”

“খুব খেয়েছি। এত রাত্রে আর বেশী খেলে বদহজম হবে।”

“তা হলে আমার বাকী খাবারগুলোও ঢাক! দেওয়া থাক। বদহজম তো আমারো হতে পারে?”

মহা বিচল হয়ে বনি বলে,—“এরি মধ্যে জালাতে শুরু কবলে?” তারপর গিরে সে আবার মিনতির সঙ্গে খেতে বসে।

হাসতে হাসতে মিনতি বলে,—“তুমিই তা হলে আমার প্রেমে পড়লে দেখছি?”

পরদিন বেলা আটটার ঘুম থেকে উঠেই অর্ধ ঘণ্টার ভেতরে পূর্ব রাত্রেই অসমাপ্ত গরটা শেষ করলো বনি। তারপর দেটাকে পূর্বের অংশের সঙ্গে একবার মিলিয়ে পড়ে নিয়ে, কাঁদলজুড় করে গিরে রাখলো।

মিনতির পেছনে পেছনে বিগম্বর নিয়ে এলো ট্রেতে করে চা আর কুটী রাখন বিছুট লাভিয়ে। তারপর সে সব একটা টিপরের উপর রেখে চলে গেলো সে।

মিনতি একটা ছোট্ট কেক টেনে বসে, কাপে চা ঢালতে ঢালতে বললো,—“এই দিকে জুর বসতে হবে নিষ্ঠার! this is break-fast.”

চমকে পেরন ফিরে বনি বলে,—“রাত্তিরেই খাবার-গুলোই তো পেটে এবনো ডন বৈঠক দিচ্ছে, তার ওপর আবার একুনি এই সব খেতে হবে?”

“আর কিছু না খাও চা! জো! বাবে? তার সঙ্গে

বিছুটে খাবার মিশিরে নিরে কিছু কিছু গলাধঃকরণ করতে শুরু করো না, কিছু কতি হবে না।”

সুবোধ বালকটির মতো আর কোনও কথা না বলে বনি তাই খেতে শুরু করলো। বুখে বললো,—“সন্দ্বিহ্নীর কবে লিখে দিতে হবে?”

চারের কাপে চুচুক গিরে মিনতি বলে,—“ও-হো জুলেই গিরেছিলুম সে কথা। আতংকই চাই। কালকেই বে সব প্রেমে দিতে হবে। ঝাড়াও নিয়ে আসতি এ বাসের সব কাগজপত্রগুলো। ছোটো আবার নতুন খ্যাগাখিন এলেহে বহে আর করাচী থেকে।” বলতে বলতেই সে চারের কাপ হাতে নিয়ে কয়েক মুহূর্তের দ্বন্দ্ব অস্তবান হয়ে, ফিরে এলো এককীড়ি দৈনিক মানিক আর সাপ্তাহিক পত্র ও পত্রিকা বগল দাবা করে।

বনি বলে—“এতগুলো পড়ে কি আজ বোল পুঠা যত্নবা লিখে কেলেতে পারবো?” তারপর হেসে সে মিনতির বগল থেকে কাগজ পত্রগুলো নিয়ে টেবিলে রাখলো।

চোখ টান টান করে, হাত বিনিমিত ভঙ্গীতে মিনতি বলে,—“Private secretary-র ওপরে যদি একেবারেই আদা না থাকে, তো লিখে যাও আর আর করে বা পারো! বেশীর ভাগ কাগজপত্রগুলোই আমি পড়ে পড়ে অনেক আরগার লাল পেনসিল গিরে চিহ্নিত করে রেখেছি, দেখো যদি সেগুলো কাজে লাগে তো কিছুটা help হতে পারে।”

চা গাওয়া শেষ করে অভ্যস্ত উৎসুক দণ্ডি বলে, প্রত্যেকটা কাগজের লাল পেনসিলের চিহ্নিত অংশ-গুলো পড়তে পড়তেই বনি ঝাঁগজ টেনে লিখতে বসে বোললো—“এমন লক্ষ্যই পেলে বোল চেড়ে ছত্রিশ পুঠা লিখতেও আমার অসুবিধে নেই। না? তুমি দেখছি পারবে কাগজটা চালাতে! এলো দেখি এই দিকে টেবিলের পাশে জুর বোসো!”

“তা না হয় বসতি! কিন্তু পুথি বা খোঁচা

না তো? যে রকম করে কলমটা বাগিরে হবেতো, তা বেখেত্তর হচ্ছে কিছ আদার!”

মনি অস্ত্রমনস্কের মতো হাসি হাসি মুখে উত্তর দেয়,—“তা বা বলেতো! তীক পার্সোমেন্টের প্রব্রা, আর চোরাকারবাণীনের বোরাগা, এর ওপরে মন্তব্য করতে গেলেতো—বৃষির কথাটাই আগে মনে পড়ে! বারাস্তক বারাস্তক কাহগা কুমি দাগিরে রেখেতো দেখছি!” তারপর মনি একটার পর একটা কাগজ ভুলে মন্তব্য লিখে সেটা মিনতিকে তেরং দিয়ে অপর একটা কাগজ টেনে নিয়ে লিখতে শুরু করে।

ছবির বসে: মিনতি শুধু মনির কলমের অবাচ্ছত্ত গতি নিরীক্ষণ করতে করতে হুটু হুটে যায়! অতুত মাহুত বটে! জিজ্ঞাসা করলে মূখের ওপরে অনেক লম্বাই অনেক কথা বুল উত্তর দিয়ে বলে, অখচ লিখবার লম্ব লোকটা যেন শ্রুতি মন্তনের মন্তর বিশেষ! এক একটা করে মনির লেখা slip টেনে নিয়ে পড়তে পড়তে মিনতি গভীর মিসরে হতবাক হয়ে পড়ে! কি অতুত বৃত্তি আর কি তার নজির! এতে: কথা লোকটার মনের কোথার মুকিয়ে থাকে?

বেলা ১টা পর্যন্ত পনরখানা slip লেখা সাক্ষ হল, মিনতি বলে ওঠে,—“disturb করছি কিছু! এবার Lunch এর লম্ব উত্তরে থাকে! take the bath first.”

মিনতির লম্বার লম্বা পেয়ে পড়লো যেন মনির চলমান কাউন্টেন পেনের অবাচ্ছত্ত গতি! টেবিলের ওপরে কলমটা নাখিরে রেখে সে বলে উঠলো। “কটা বাজে এখন হলো দেখি? এই তো একটু আগেই না চা খেলুম?” সে কপার উত্তরে রসিকতার চোঁটার ক্রুতঙ্গী

করে মিনতি কথার দেয়—“That was ৪ a.m. and now it is ১-৩০ p.m. get up please.” বলেই মিনতি উঠে ঝাড়ার।

হুসুরের পর মিনতির অস্ত্ররোধে, নিস্রাহের অস্ত্র মণিকে অসিচ্ছা লম্বের বিচানার ভুতাই হলো। মূখে বললো—“আনাকে আবার কিছু বেলো চারটের ভেতরেই ডেকে দিও বেনো!”

মিনতি উত্তর দেয়,—“সে চিন্তা আদার। তুরি একটু গুমোও দেখি! সারাটা রাত ভেগেতো কাল, সেটা মনে আছে তো? খর রেড়ে আমি পালাচ্ছি না মনে রেখো। না গুদুলে তোমার মাথার আচ্ছ বরফ চাপাখো আমি!” বলেই সে বরের ভালানা মরজা-ভলোর পদমা ওলদ করে টেনে বদ করে, মূল মোশনে বরের পাখাট: চালিয়ে দিয়ে, পানের চোট ঝাটটার গিরে নিজে তুরে পড়লো।

আরামের আতিশয্যে কিছুক্ষণ পরেই কিছু মনি তস্ত্রা বোরে আচর হ’য়ে পড়লো। তস্ত্রার বোরে বস্ত্র দেখতে মনি, এক পাল বৃহত চেলের দল যেন তার পন্টুকে বরে মারছে। ‘বাবা বাবা’ বলে, টেটিয়ে কাঁদতে ছেলটা! তুম তেজে লম্বা বড়মড়িরে উঠে পড়লো মনি। তুমের বড়তা তখনো তার দুই চকু চেয়েই ছিল। অস্ত্রমনস্কের মতো অলুনা খেকে পাঞ্জাবীটা টেনে গারের পরলো মনি, তারপর কোনও মতে গারে ল্যাণ্ডলট: গলিয়ে, মরজার পদমা ঠেলে, পথে বেরিয়ে পড়বার অস্ত্র এলো মেদো পা ক্লেপে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাখতে শুরু করলো সে। মিনতি তখনও ঘুদুচ্ছে।

(আগামী বারে লম্বা)



কাল-পন্থিকতা

(অভিনেত্রীর চিঠি)

শশীভদ্রমোহন চৌধুরী

সংবাদপত্রের ব'র্জগতে বর্ষের স্রোত ব'য়ে চলেছে
সম্মত। হাত-ডাঙী, দুক-বুঝী, নেতা-নেত্রী—বড়
সংস্কার, ক্ষুণ্ণ সরকার, অস্বাভাবিক সঙ্কট
করেছে আমাদের বেয়ে ঘাই তবী। মনোবল্লভ মানচন্দ্র
সরস্বতী অটীতকালে বেয়ে ঘাই তবী। মনোবল্লভ মানচন্দ্র
এসেছে। কাগজের প্রতিষ্ঠান হিসাবে ফরওয়ার্ড
কোম্পানীর ১৯২৩-২৪ ছুটি সংস্করণে বেয়ে ঘাই তবী
হয়। এখানকার কালচক্রের কাটুটি হুড় হুড়
ক'রে বেছে গেছে, ইংরেজী 'ফোরওয়ার্ড' তবী
অনুভবাত্মক পত্রিকা পড়ে গেছে, 'বাংলাকার কথা'র
প্রকাশনে 'মানববাক্য' ভলিউমের গেছে, সাপ্তাহিক বসন্তে
তখন 'আত্মজিজ্ঞাসা' একবার। কাগজ বিক্রি একেই
উগ্র সিংহের সে কি উগ্র স্তম্ভ তখনকার দিনে—
লাগে টাকা দেবে উগ্র সিংহ শুধু কাগজ সব চাপু রাখা
চাই, এই ছিল উগ্র সিংহের মনোরম ভাব।

এমন দিনে শচীনদা করে বসলেন এক ক'ত্র।
বলছি সে কথা। সম্প্রদায় হিসাবে শচীনদা ছিলেন
নিষ্ঠুর, উদার। নিজস্ব মত ব'লে তাঁর একটা বিশ্বাস
ছিল যা তিনি কখনই পরম্পরাগত হ'য়ে বিচ্যুত করতে
পারেন নি। ভঙ্গন সাহিত্যিক ব'লে তাঁর তখনকার দিনে
নাম-করা সম্প্রদায়ের কাছে ছিলেন অস্পষ্ট।
অন্যদিক দিয়েও তিনি আদরে ডেকে নির্যাসিত
কাজে, তাঁরই হান ছিল তাঁর কাগজে অবস্থিত।

আত্মজিজ্ঞাসে কবিতা নির্বাচনের তার ছিল অস্বাভাবিক
উপর। শচীনদা বলতেন—কবি, ভক্তদেবী দুই ধরনের
হিসেবে তাই, আমি ওদিক বৃত্তি না।

একদিন ভক্তদেবী কবিতার গুচ্ছ আমার
সামনে ফেলে দিয়ে তিনি বললেন—এই গুচ্ছ তাই,
দেখো দিকি ছাপা চলে কিনা।

একই ব্যক্তির লেখা। লেখক অনুভবের পূর্ব
অধ্যাপক বিনয় কুমার সরকার। প্রথম কবিতাটির প্রথম

লাইন শব্দেই আমার চক্ষু প্রায় কপালে ঠেকে গিয়েছিল।
কবি আরম্ভ করেছেন—

“ক’ বোতল মদ টানিলে রক্তবর্ণের বার গো লেখা।”
প্রথম লাইনেই দুশকে জবাই। তারপর আরও
কবিতা এগিয়ে বাবার চোটে করলাম। তবীত।
তবলম্ব বই বাঁহু না’ কেন হুগুগু কবিতা
লিখতে হুগুগু প্রতি এই নির্মম উবাগীনা তা
গা করা বার না। লেখক হলো কবির প্রতিকৃতি
লিখতে।

নয়া বাংলায় পাঁচটা বাবা বাবা ব্যাকের অর্থ-
নৈতিক বিনিয়োগ লিখতে আলোচনা ছেড়ে অধ্যাপকের
কবিতা লিখবার এ হুঁচকি কেন হলো তা বুঝতে
পারিনি। বললাম—বাক করুন শচীনদা, এ মাল
চলবে না।

চলবে না, বলো কি হে?—বলে শচীনদা বেন
হুগুগু হয়ে কবিতা লিখতে নাড়তে নাড়তে চুপ করে
গেলেন।

আত্মজিজ্ঞাসে কবিতাটির বার হতেই দেখি এ মাল
ছাপা হয়ে গেছে। আমি একটু বিস্মিত বোধ করলাম।
শচীনদার কাছে গিয়ে বললাম—শচীনদা, কি রকম
হলো?

শচীনদা বললেন—কি করবো তাই, দিগন্ত ছেপে
ভূমি তো মানোনা আমি বিনয় সরকারের ছাত্র।
যখনই মূগে ক্রান্তি লেখতে উনি ছিলেন আমার
অধ্যাপক। সে দিন বেধা করতে গেছি তাঁর সঙ্গে
দিয়ে গেলেন এই কবিতাগুলো। তাঁর এখন কবিতা
লেখার বাস্তবিক হয়েছে। কি করি বলো? হাজার
হোক মাটির মরার তো।

যাই এই ক্ষেত্রেই শচীনদার এই দুর্বলতা দেখছি।
অন্য আত্মজিজ্ঞাসে লেখা আত্মজিজ্ঞাসার একটা কঠোর
রূপ ছিল তাঁর চরিত্রে।

এখন আসল কথাটা বলি। বিনর সরকারের শাসন আমতা হবে দেখে করেছি। এমন সময় এলেন এক ছুন্ন ভুল্ললোক থাকে আররা উভয়েই চিন্তাম, তিনি করেছিলেন আগে একটি প্রবন্ধ দিয়ে গিয়েছিলেন আশু-শক্তিগে প্রকাশের জন্যে। আজও সেটা ছাপা হয়নি দেখে ভাবি দিতে এসেছিলেন। লোকটির ছুন্ন বিপ্লবী বলে গর্ব ছিল, কেননা সরকারের ফেল খাটার জোঁদা তিনি দেখে ধারণ করে তখনকার সুব-সমাজে প্রবন্ধ হেরেছিলেন যে। শতীনদা বললেন প্রবন্ধটি তিনি দেখেছেন, একটু অবলম্বন করা সরকার সেই হেতু দেয়ী হচ্ছে। দেখে ঠিক-ঠাক করা হলেই তিনি ভটা প্রকাশ করবেন।

বিপ্লবীর প্রবন্ধের গায়ে হাত? সম্পাদকের স্মার্তা ভো কখনও। প্রবন্ধ লেখক বললেন তাঁর লেখা যেমনটি আছে ঠিক তেমনটি ছাপতে হবে। পরবাবুর লোকও তাঁর কথা হয়েছে।

কে পরব বাবু?—শতীনদা জ্ঞাত্য দিয়ে উঠলেন।

—পরব বোস।

—পরব বোস কি সম্পাদক বে তিনি প্রবন্ধ নির্বাচন করবেন?

দাঙ্কি শতীনদার নম্র এইবার কেটে পড়লো।

বিপ্লবী বলে তাঁর প্রবন্ধ ছাপতে হবে অমৃত অবস্থার এবং তা পরব বোসের কথামত? শতীন সেনগুপ্তকে সেই পায়ে পেতেছেন নাকি গুঁরা?

টেবিলের উপর একটি আশির ওজনের খুঁবি বেয়ে প্রবন্ধটি ছুড়ে ফেলে দিয়ে শতীনদা একেবারে রাজতাবার বিপ্লবীকে নির্দেশ দিলেন—Get out!

আবার সেই Get out! একদিন শুনেছিলেন 'বৈকল্য' অফিসে আর এই আজ। কিন্তু কীভাবে জীবিত? শতীনদার এই বিপ্লবী হুঁতি দেখে আমি রীতিমত খাবড়ে গেলাম। তাৎক্ষণিক বিনর সরকারের রণবংশ যদি এইবার আসল বংশগত হয়ে আসার পিঠে পড়ে তো গেছি আর কি। আর দেয়ী করতে আছে?

তিনগুলা থেকে আমি একেবারে সোভা দৌড় দিলার সিঁড়ি বেয়ে হোতলার নিজের ঘরে।

এমন তীক্ষ্ণজনক অথচ দুগ্ধহাসক সংবাদটী উপেনদাকে না দিয়ে থাকি কি করে? উপেনদা এক-গাল হেসে বললেন—বলিস্ কি, বিশেষ একেবারে গোট-আউট করে? বেশ করেছে। কিন্তু গোঁয়ার-গোবিন্দটা চাকরী রাখতে পারবে না দেখছি।

চুলোর থাক চাকরী: শতীন সেনগুপ্ত চাকরীর পরোয়া করে না। নম্র আর চাকরীর মধ্যে প্রথমটিই তাঁর কাছে প্রাধান্য।

এই ঘটনার পর বোধ করি বেশী দিন নয়। একদিন পরব বোস তাঁকে তাকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর বাতীতে তাঁর সঙ্গে দেখা করে কি একটা কৈফিয়ৎ দিতে।

শতীন সেনগুপ্ত কি পরব বোসের বাড়ীর চাকর বে ডাকসেই সেখানে যেতে হবে? রাগ একটু কিম্বিয়ে এলে তাঁর মনে হলো—না; যাওয়াই বরকত। এই প্রবন্ধের সম্বন্ধে যদি কোন কথা গুঁঠে তবে তিনি আজ্ঞা করে শুনিবে কেবল পরব বোসকে। পরব বোস কৈফিয়ৎ রাখা করলে কৈফিয়তের বরলে চাকরীতে ইচ্ছা দিয়ে তিনি বলে আসবেন—রইলো তোমার চাকরী বোস সাহেব, আমি চম্প।

বিপ্লবী প্রবন্ধ লেখক পরব বোসকে ইতিমধ্যে নালিশ করেছিলেন কি না জানা যায় নি। যা জানা গেলো তাতে শতীনদা বিম্বিত হয়ে না রেগে আর হেসে ফেলে-ছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত এক রকম বিলাতী কার্যদার করাই প্রার্থনা করে এসেছিলেন বোস সাহেবের কাছে—“I am sorry.”

এর আগে আমাংর সরকারী চাকুরে ভর এন.এন সরকার 'বংশবাহন' ভাতীর শতীত হওয়া উচিত নয় বলে সংবাদপত্রে এক চিঠি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর গবেষণার হুজির বা গারম্ব তা আমাংর শাসক প্রজাদের জেদ-নীতির সমর্থক ছাড়া আর কিছুই নয়। শতীনদা এই চিঠির তীব্র প্রতিবাদে সরকার সাহেবকে দিয়েছিলেন

জন্ম করে চুকে। শরৎবার তা পছন্দ করেন নি।
ক'রপটা হাজির। শরৎ বাবু নিজে 'বহুস্বাক্ষর'—এর
বিরোধী নন, অপরে বিরোধী হলেও তিনি বাধ্য পান
নিক। কিন্তু ভয় এন। এন। সরকার বাধ্য হিলে তিনি চুপ
করে মজু করে যেতে রাজী—এ কথা কেনে শচীনদার হুঁচি
থোলা হ'য়ে গিয়েছিল। শরৎ বাবু অকপটে তাঁর
করলেন এন। এন। সরকার তাঁর যে professional জ্ঞান,
গুরুত্ব। তিনি লইতে পারেন না। শচীনদা বলে
ছিলেন—“ওঃ তাই!”

হিতীয় নব্ব কৈফিয়তের ব্যাপারটা আরো হাজির।
মজবোর বিষয়বস্তু নির্বাচনে সম্পাদক নব্ব কখন অলকো
রায়বাহাদুরের ঘরে টান দিয়েছিলেন। ইংরেজ
আমাদের পক্ষ, এই পক্ষের সঙ্গে সংযুক্ত কোন ব্যক্তি বা
বিষয় পেলেনই বা মাথা ছিল দেশপ্রেমের পরিচয়। এমন
শোভনীয় কর্তব্য কর্ম শচীনদা উল্লসিত হ'য়ে ক'রে
ফেলেছিলেন এর সময়। শরৎ বাবু সেই প্রসঙ্গই তুলে
শচীনদাকে বুঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে ঐ দুচ্ছ
ব্যাপারের দিকে তাঁর অন্তর্ধান মনোযোগ দেওয়া ঠিক
চর নি। কিন্তু শচীনদা কিছুতেই বুঝতে পারছিলেন না
রায়বাহাদুরের আঘাত করে তিনি এমন কি অজ্ঞার
করে ফেলেছেন। শরৎ বাবু সেবার সময়ভাবে
শচীনদাকে প্রস্ত করলেন—“আপনি জানেন না আমার
বাবা তারবাহাদুর?”

সম্পাদক নব্ব অতঃপর বিপদে পড়ে গেলেন। শুধু
বিপদ নর, গম্ভীরও হলেন। রায়বাহাদুরকে ধরেছিলেন
একটা সাধারণ স্রেণী হিসাবে, শরৎ বাবুর সঙ্গে এই
শ্রেণীর সম্পর্কের কথা যুগান্তেরও তাঁর মনে গঠিত তখন।
বৈদেশিক আপত্তা ত্যাগ করে তাই তিনি লক্ষ্যের হাসি
হলে শুধু বলে বলেন বোম সাহেবকে—“I am sorry!”

শচীনদার এই বিভাভিত বিপ্লবী প্রবন্ধ-লেখকটি কিন্তু
আজ বাংলা দেশে একজন অতীব গণ্যমান্য ব্যক্তি। তাঁর
সরকার প্রস্তুত বোর্ডিংহাউসে অশোক-চক্রের তত্ত্বাবধায়
চাপরাশী পাতে, হয় তো বা শত্রু মেধাশীলও সঙ্গে তার
তাঁর সফরকালে।

শচীনদার বিপ্লবী বিভাভিন প্রসঙ্গ এইখানেই ইতি
মিথে আমাদের এমিকে নব্বর দেখা যাক। কিংগনগরের
চেলো সত্তোজের পক্ষাতি, বিজয়লালের খামখেয়ালি আর
প্রেমের দৌরাখিা বেড়েই চলেছে। লংকো কিংগ-
নগরের কথা বলার ভুলটা উপেন ঝাটুবার রসের সময়
দিয়ে সে এক অসুস্থ ব্যক্তির পরিবেশন করতো, সেটা
ভালোই লাগতো। উপেননাও এই পক্ষকে একটু
ভালোই বাসন্তেন। প্রেমকে প্রায় শনিবারে পাওয়া
যায় না, অস্ত্রবারেও সে হঠাৎ গা ঢাকা দিতে দেয়। পরে
এসে বলে অসুস্থ রোগেই বাসন্তেটা জিমের মারলেট
থেরে সে বুঝে অস্ত্রার করে কেলেছে এবং এমন কুকার
সে আর কখনো করবে না। সেটা তার ঐ অজ্ঞেই
ব্যাপার হয়েছিল। এ ঘরের লোক বিশ্বাস করে না,
ও ঘরের লোক মূখ টিপে হাসে। সত্তোজ বলে বানী
লজা। বিজয়লালের উপর তখন একককনের ‘ভর’
হতো, ওয়ার্টে হইটম্যান, এডওয়ার্ড কার্পেটার
কিংবা রাগেল প্রভৃতি যে কোন লেখকের লেখাই
বিজয় পড়ক না কেন তার সে পাঠ্যকালের
অনুভূতি ছিল আমাদের পক্ষে রাসাঙ্ক।
বাংলা কাগজে সম্পাদকীয় প্রবন্ধের পাতার একটি
বিশেষ প্রবন্ধ ছাপাবার রীতিটি প্রবর্তিত হয়েছিল। বলা
বাহালা এ রীতি প্রবর্তন প্রথম করেছিলেন আমাদের
ইংরাজী দৈনিকের অধ্যক্ষের কংগ্রেসার্ড পরে মেম্বর
গ্রাহাম পোল কিংবা ল্যাংকোবীর প্রবন্ধ অথবা ‘Irish
Gleanings’ দিয়ে বেমন হু’ তিন কলম ভগানো হ'তো
আমরাও বাবু করেছিলেন ঐ রকম কোন বিশেষ
লেখকের বিশেষ লেখা দ্বারা সম্পাদকীয় পূজা সাজাতে।
বিজয় ঐ বিশেষ প্রবন্ধের স্থানটি আর দখল করে
বসেছিল। বিজয় হইটম্যানের কবিতা নিয়ে চালালে
প্রবন্ধ করেকদিন, তারপর হরতো আনবে রাগেল কি
থোর্কি। একেই আমরা বলতাম বিজয়ের ‘ভর’
হয়েছে। বিজয় এতে চটতো না বরং হেসে উঠতো—
হেঃ হেঃ।

বহুবর্ষ প্রমোদ সেন ছিলেন উকিল। হঠাৎ তাঁর একবার খেয়াল হলো তিনি শুকালতি করবেন, সবরের কাগজের মাইনেতে পেট ভরে না। গেলেনও তিনি বপোরে কিছুকালের অজ্ঞে শুকালতি করতে কিছু আবার তিনি ফিরে এসেছেন আবারের মধ্যে। কাহল তিনি ছিলেন জ্ঞাত সাংবাদিক। পরসার বোহ তাঁর কাছে বড় নর; সংবাদ ও সাংবাদিকদের সমালোচক বোহ তাঁর কাছে অনেক বড়। বিজ্ঞ, বহুবৎসল, স্থির হীর প্রভৃতির লোক। রাজনীতি, সমাজনীতি এমন কি ধর্মনীতিতে তখন বোহ হয় তিনি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত এসে ঠেকেছেন, খ্রীষ্টধর্মিক পর্যন্ত তখনো এসে পৌঁছান নি। চন্দ্রদাক্ষ্য উকিল ছবার অজ্ঞে চুইকটু করছেন, সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি আগের চেয়ে কমে এসেছে। শটীন সেন এম-এ পাশ করে গার-এডিটরি করে; তার চূপ এই যে Once a sub is always a sub; সে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লেখার অধিকার পান্ধে না। কোন একটি বিশেষ সংবাদকে কলাও করে দিতে হলে সংবাদটির সারাংশ প্রথমে ভবল কলমে সরিয়ে ক'রে দেওয়াই রীতি ছিল আবারের। শটীন হয়তো ভাই করছে। তাকে টানতে গেলাম আজ্জার। ক্রীড় কোণে শটীন তার পূর্ববঙ্গী চড়ে ব'লে উঠলো—ইসে, কবো কী, দেখোনো এডিটোরিয়াল লিখতে আছি।

—এডিটোরিয়াল ?

—হঃ ভবল কলম সাবারি। আরে, আবারগো তো এই এডিটোরিয়াল !

শটীনের ইসে বলার মুদ্রাদোষ ছিল। কলে আমরা তাকে ডাক্তার 'আমারগো ইসে' বলে। ছিল-খোলা চন্দকার আজ্জাবাজ ছিল আবারের এই শটীন।

সক, লিখলিকে ছোট্ট বাহুবটি জামকী জীবন। কথা তাঁর মুখে খুব স্বয়ই চলা যেতো। কথা বলার চেয়ে কথা শুনার বোহ ছিল তাঁর বেশী। তাঁকেও ইতিমধ্যে

বকিরে তুলেছিলেন হীরেন সেন (অধুনা ডাঃ)

আমাদের গলের এ-বেন আবহাওয়ার মধ্যে একদিন বিজয়লাল এক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখে তার চরম খাম-খোলাসি কুঁচক বেথিরে লবাইকে অম্বাক ক'রে দিল। শিথির তাড়ুড়ির রক্ষমকে কোন এক ব্যাঙনাথ্য অভিনেত্রীর অভিনয় দেখে বিজয় তো একদম লাগল। পরের দিন এসেই গে এই অভিনেত্রী লম্বা বাক্স উজ্জ্বল করে এক মেডগনী প্রবন্ধ বেঁধে বসলো এবং তা প্রকাশিত হলো সম্পাদকীয় ভুক্তে। রকালর বা সিনেমার কোন কাগজে এ প্রবন্ধ ছাপা হলে মানানসই হতো লম্বা হই; কিন্তু একটা দৈনিক সংবাদ পরের সম্পাদকীয় ভুক্তে এ প্রবন্ধের প্রকাশ বেন খুবই ব্যাঙাখাতি বলে আবারের মনে হলো। বিজয়লালকে একটু সাহেবতা করতে না পারলে তো আর চলে না দেখছি। আমার মাথার তখন চট ক'রে বেলে গেলো এক দুর্বুদ্ভি—দুর্বুদ্ভি নর, একেবারে দুইবুদ্ভি।

স্বরে ফিরে সেদিন রাতিতে এক পত্র রচনা করলাম বিজয়কে সন্ধান করে। লিখছেন বেন লেই অভিনেত্রী। আবারের কাগজের তরক থেকে বিজয় যে অভিনয় দেখতে গিয়েছিল সে তো বলমকের লোকেশের জানা মুক্তরাং অভিনেত্রী বহি বিজয়কে সন্ধান করে চিঠি দেয় তবে বিজয়ের কাছে তা অবিস্মৃত হবে না যদিও কিছুটা বিস্থিত গে হ'তে পারে। চিঠিখানার বরান ঠিক মনে নেই, কাহল তার নকল তো রাখিনি। ঝাক হাতে মানান তুল ক'রে বড়টা লম্বা ঘেরলী চড়ে চিঠিখানা রচনা করেছিলাম। কতকটা এই ধরণের :—

সম্পাদক বগার,

আমি আনি আপনাই এখানে এসেছিলেন। আমার অভিনয় আপনার এতো ভালো লেগেছে জেনে আমি গবিত। কিন্তু সত্যিই কি আমি অন্তোখানি প্রশংসার যোগ্য ? আপনাদের লেখা আমি কতোবার যে পড়লাম। তার মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি আপনাকে। আপনি যে কতো বড়ো কতো

মহৎ তা ভাবতে পারি না, বোধ হয় বেবতাই।
নইলে আমায়ের মতো দুশা নারীকেই এমন দরদ
দিয়ে আর কে দেবে ?

রত্নকে আমার কাছে উঠি। ওখান থেকে নেমে
এগেই আমবা যেন নোংরা জল, তাতে পা পড়লেই
নাইতে হয়। আচ্ছা, আমায়ের ভালো হবার কি
ফোন পথ নেই, কেনো অধিকার নেই ? সেই
কথাটাই কেবলি ভাবি। আপনার লেখা পড়ে
শুক বল পাই, মনে নব আমায়ের কথা ভাববারও
লোক আছে তাই আপনাকে বেগতে ইচ্ছে করে।
মহা কোরে যদি আমার ব্যক্তিতে একবার পারের
মূল্যে মেন তবে বড় হই।

জানি আপনি আসবেনই কারণ আপনার মনে যে
কোনো মরলা নেই। গলাজল যে আপনার হাতে,
সব মরলা তাতে কেটে যায়। সবচেয়ে আমায়ের
ভালো করবার বাচ্ছ আপনিই জানেন। আপনার
ঐক্যিকার রইলাষ। আমার ব্যক্তিট্রিকান উপরে
সিলাম। আমার শত কোটি প্রণাম জানবেন।
ইতি—

অতাসিনী অমুক।

চিঠিখানা আর একটু দীর্ঘ ছিল এবং বিনিয় বিনিয়
হরতো। আরও কিছু বলা ছিল কিন্তু মোকো কথাটা ঐ।
চিঠিখানা যাবে এঁটে তাতে আমায়ের অফিসের
ট্রিকানার বিজয়ের নাম লিখে বিলাস ফেলে কর্ণওয়ালিস
ষ্ট্রীটের এক ডাকঘরে দুর্দা ব'লে।

পরের দিন অফিসে এসেই আমার সেই দুর্দারের
সংবাদ প্রথমে দিয়ে রাখলাম আচার্য কষ্ট্রনাথকে,
তারপর বললাম সম্পাদক গোপাল সান্তানাকে। পরং
বোস এবং সুতা বোসের কাছে প্রায় নিভা বাঙরা
আমি ছিল গোপাল সান্তানের, তিনি ছিলেন তাঁদের
প্রিয় পাঠ্য; কয়েকই বিপদে অবন-তারণ তিনি হ'তে
পারতেন নিশ্চয়। চাকরীর মারা বড় মারা। অন্তঃপের
কানে গেল উপেনদার। উপেনদা বললেন, জানিস

বিজয়ের মারার কু কটা আলগা, একটা কাত করে
না যলে। কিন্তু এই বরংহালের কলাকল বেখবার
উৎসুক্য তাঁর মিটি মিটি হাসিতে প্রকাশ পাচ্ছিল।
বাকী আর সবলে ছিল অন্ধকারে।

বখাসময়ের ঝাঁক হাতে লেখা খামের চিঠিখানি
এগে পৌঁছিলো বিজয়ের হাতে। বিজয় প'ড়ে তে
অবাক : এক আত্মিক ছুঁইব ! প্রথমটা তার মনে
হলো সে যেন কোন রহস্যলোকে এসে পড়েছে—সবটাই
আবছায়া কৃষ্ণাটিকার। আমার ভুব দিল সে সেই
রহস্যলোকে গভীর মনোবোপের সঙ্গে। আরজিন মুখে
চিহ্নাশির ক্রত সক্রপের সে কী দুস্ত ! চোখের
কোণ দিয়ে চাইলাম একবার আচার্যদেবের মিকে,
তিনিও লক্ষ্য করছিলেন বেখলাম।

চিঠিখানা কতকণ ধরে যে বিজয় পড়লো। সুঠোর
মধ্যে চিঠিখানি হয়ে উভাসতাবে কড়িকাঠের মিকে
বাণিককণ চেয়ে থেকে বিজয় হঠাৎ এক সময়ে লাক
দিয়ে চেয়ার চেড়ে উঠে গেল ঘরের সামনেরকার
বাগান্দার। ক্রত পারচাতির সঙ্গে তার চিহ্নাশি
আংশলিত হচ্ছিল—হরতো বা সংঘর্ষ, সে সংঘর্ষে
চলেছে তার আত্মপটীক।

এ দুস্ত উপেনদাকে দেখাবার লোভ সামলাতে
পারি নি। এক সময় হুপ করে উঠে তাঁকে খবরটা দিয়ে
এলাম। উপেনদা এসে বললেন—ও বিজয় ! খর ছেড়ে
বাইরে এমন পারচাতি করছো কেন ? মাথাটা স্থিতি
ধরেছে ?

বিজয় ভাব্য দিলে—না, কিছু না, রেঃ রেঃ।

হাসির মধ্যে প্রাণ ছিল না, প্রাণটা ছিল অন্ধর।
উপেনদা একবার চোখ টিপে আমার মিকে চেয়ে হাসতে
হাসতে বর থেকে নিভ্রাত হ'লেন।

বিজয়ের সেদিন আর লেখা এগায় না। মাত্র
ছুটি প্যারা সেদিন সে কোন প্রকারে বাড়ি কমেছিল
এবং তাতেও মুটেচল অসংলগত। গোপাল সান্তান
করেকটা লাইন কেটে একটু অল্প বল ক'রে দিতেই

বিজয়ের কৰ্ত্তব্য জুই থেকে একটি বিজয় বার বার হ'তে লাগলো। এরকম ক্ষেত্রে বিজয়ের বর্ণনা আশা করে পকেট ছিল পীড়াদায়ক। তার লেখার হাত দিলেই সেমিকে চেয়ে থাকতো সে অপলক চুপে; এক একটি শব্দ কাটা হচ্ছে আর বিজয়ের শব্দেই এক টুকরো সাংসদ যেন কে কেটে নিচ্ছে। বিজয়ের সে সর্ববন্দনা নিহত চক্রবাকীর শোকে শোকাভূত বর্ণনা চক্রবাকীর পাখার কটাগট শব্দ যেন—কৰ্ত্তব্যজুই এসে তা-ই প্রকাশ পোতো।

পরের দিন এলো বিজয় গজী, চিত্তাকুল। গত রাত্রির আশোষিত চিত্তের ক্রান্তি চোখের নীচে স্থান নিয়েছে। বেনীশ লে বসলি চোরায়ে। একটু পরেই তড়াক করে সে চোয়ার থেকে উঠে বাইরের খোলা চারটীর বার করে পায়চারি করে ইজিতে ডাকলো আচার্য কণীন্দ্রনাথকে। আত্মপূর্বিক ইতিহাস সে কণীন্দ্রনাথ কাছে ব্যক্ত করে শেখটার পকেট থেকে বার করলো একখানা খামে খাঁটা চিঠি—উপরে সেই হস্তাক্ষরিত নাম লেখা। ভিতরের বক্তব্য কণীন্দ্রনাথ না জানলেও চলে। মুখেই বিজয় বললে যে, সে ঠিক করে ফেলেছে হস্তাক্ষরিত নামে সে দেখা করবেই—চিঠিতে সেই কথাই আছে লেখা।

এইবার হলো আগল বিপদ—বাক বলে লুপট। কণীন্দ্রনাথ মুখখানা কালো হয়ে উঠলো। তাইতো, বিজয়কে ঘোষ করা বার কি করে? মাথায় যখন খেরাল চেপেছে তখনও যে ছুটবেই। তবু রক্ষা খাবার আগে কণীন্দ্রনাথকে সে জানিয়েছে সব। এখনও আশা আছে! বিজয়কে তিনি অনেক করে বুঝালেন যে, অভ ভাড়াভাড়ি করা সীতীন নয়; এ সবচেয়ে ভালো করে বিবেচনা করা দরকার। তা ছাড়া চিঠিখানি সত্যিই হস্তাক্ষরিত নামে লেখা থেকে এলো কি না এটাও তো জানা দরকার। সে দিকে চিন্তা করবার মতো বিজয়ের স্বেচ্ছা হ'ল নিঃসন্দেহ।

কণীন্দ্রনাথ ইজিতে আশাকে এক কোণে ডেকে নিয়ে

গিরে বললেন—চাঁদমান, লাগে এখন ঠেলা সাইলাণ্ড। বিজয় চিঠি লিখে এনেছে, দেখা করবে তার সঙ্গে। আমার নামের গোড়ার দিকে শশাক্ষর প্রতিশব্দ চাঁদ বসে চাঁদমান হ'লেছিল। পরে তা আরো সচ্ছিন্ন হয়ে 'চাঁদমান' হাজার এবং এটা বোঝ করি পক্ষিণ ভট্টাচার্যেরই মেহের দান।

আমিও প্রতিদান দিইছিলাম পক্ষিণকে। তাঁর নামকরণ করেছিলাম পাঁচসিকে। এটাও বেশ চালাই হয়ে গিয়েছিল দয়ার মুখে।

সত্যিই এইবার তর হলো আমার। শেখটার কেলেকারী না হয়। বললাম কণীন্দ্রনাথকে যা হোক করে ওকে ঘোষ করতেই হবে কণীন্দ্রনাথ। সবটাই যে কাকির কাকি ফাটল এটা ওকে কোন রকমে বুঝানো দরকার। কিন্তু বোঝাই আপনায় কণীন্দ্রনাথ, অপরাধীর নামটা বুঝিয়েও যেন প্রকাশ না পায়।

উপেনন্দাকে বললাম ব্যাপারটা সব এমিকে কণীন্দ্রনাথকে পুলিশ সাহাবার কাছে বহাল রেখে।

উপেনন্দা বললেন—কেপট্রিয়াস, বিজয় পারে ত্য। ও যে গজীর চোলা দে, সত্যাক্ষরী। অহিংস ভাবে সব করে ফেলবে। আটকে কেলেকারী ব্যবস্থা কর এখন।

বিজয়ের কেপট্রিয়াস বিশেষণটি উপেনন্দা ব্যবহার করতেন বেশখো।

কণীন্দ্রনাথ এত চেষ্টা সত্ত্বেও বিজয়ের মন মানে না মানা। 'মা' বলে এক সময় বিজয় ছুটলো চিঠিখানা ডাকে দিতে। কণীন্দ্রনাথ তাঁর দুল দেখটা নিয়ে ছুটলেন বিজয়ের পেছু পেছু কল্লপের মতো। শিঁড়ির নীচে গিরে তিনি বললেন বিজয়কে একেবারে তাপটে, হাত থেকে চিঠিখানি তিনি হিন্দিতে নিয়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। কী লেখা ছিল তাতে কে জানে। বললেন—কেলেকারী কেলেকারী হতো। কুমি যে চিঠি পেয়েছে তা জাল, বলবে সব কথা পরে, আজ থাক।

বিজয়কে নিয়ে কণীন্দ্রনাথ উপরে উঠে এলেন তখন তার দিকে তাকাবার জো ছিল না। তা ছাড়া অপরাধী

মন তো, যদি হয়। পড়ে যাই।

চকল। বিজ্ঞান বনের লক্ষ্য বিজ্ঞানকে সেদিন অবিকৃত করেছিল। সেদিন তার হাতে আয় কিছু লেখা যায় হয় নি।

কিন্তু আশ্চর্য যে এলয়কাণ্ড আঁপড়া করেছিল তার কিছুই ঘটলো না। বেধে হয় লক্ষ্যই হ'য়ে উঠেছিল এখানে প্রচণ্ড বাধা। চিত্তবৃত্তির প্রাবল্যে বুদ্ধিভ্রাম, আর চাকলা। নিজের এই চৌর্যল্য অতঃপর তার আক্রোশকেও লক্ষিত করেছিল বোধ হয়।

এর গাড়া সাহসেতে বিজ্ঞানের লেগেছিল অনেকদিন। পরে সে কানতেও পেরেছিল এ হুত্বতি কাঁর। কিন্তু বিজ্ঞান সংঘত হয়েছিল; আমাকে এ ভক্তে ভিরঙ্করও সে করে নি। কন্ডাই পরম বর্ষ—গাভীতীর এ শিক্ষা সে গ্রহণ করেছিল।

এই ঘটনার বছরদিন পরে একদিন কলেজ স্ট্রীট ও কলেজ রো'র সন্ধ্যা বিজ্ঞানশালায় সন্ধ্যা আমার দেখা। আনন্দোচ্ছল সুখ তার। চৌর্য ঘেঁষা বেন লম্বক পানীর মতো। আরও তাৎপে বদ্যাসুতা। আমার যেন কেনন লস্বেই হ'লো।

বললাম—বিজ্ঞান, লভে পড়েছ নাকি ?

দেখলাম বিজ্ঞান চকলের জায় কী একটা খেল গেলে তার মুখে। হেঃ হেঃ করে হেসে উঠলো বিজ্ঞানশালা। সে হাসির দীপ্তি অতুলপূর্ব। অস্তর থেকে তা এলোছিল বাইরে। তার বর্ণনা করা যায় না, তা শুধু অসংখ্য বিশ্বের চেয়ে মেগতে হয়। কিছুক্ষণ আমার আপাদ সন্তক ভালো ক'রে নিরীক্ষণ ক'রে নিয়ে তারপর হঠাৎ আমাকে আলিঙ্গন ক'রে উজ্জ্বলতার মুখে সে বলে উঠলো—আজকের দিনে তোমাকে কিছু উপহার না দিতে পারলে তো এই মিলনের কণটি আমি ধরে রাখতে পারবো না ভাই।"

হাতে ছিল তার কয়েকখানা বই। বসু বসু ক'রে একখানা বইয়ে সে লিখতে লাগলো—

"আজিকার পরম আনন্দের দিনকে শ্রবণ করিয়া—
হে বসু, তোমার করকমলে ইহা অর্পণ করিলাম আমার
আত্মিক বস্তু স্রীতির নিদর্শন রূপে। —বিজ্ঞান।

৮.০৮.০৮ কলিকাতা, কলেজ স্ট্রীট।"

আমার হাতে বইখানা দিতে বিজ্ঞানশালা বৃহত্তর মতো বাহুদেগে কোথায় অশ্রুত হ'য়ে গেলো। মুখে সে কিছুই বীকার করে নি। কিন্তু তার সবই আচরণে সে

খানিরে গেলো আজকের এই পরম আনন্দের বৃহত্তর জীবনে খুব কমই আসে। অন্যত, অগার মধ্যকালের এই বৃহত্তরিত তরল কণিকের অস্তর আকোশিত হ'য়ে ব'লে যায়—হে বানব, তুমি তো দেখে আনন্দমন জ্যোতির্বিদ সত্যাই আনন্দমন রূপ—ভূগে বাও কেন ?

বিজ্ঞানশালা অশ্রুত হ'য়ে গেলো কিন্তু আমার আগে যে ডেউ দিয়ে গেলো আমি সেই ডেউয়ের ঘোলায় চুলকে লাগলাম। দেখলাম যে বইখানা সে আমার উপহার দিয়েছে তার নাম 'মনের খেলা', লক্ষ্য করেছিলো আরো কয়েকখানা বই সেদিন ছিল তার হাতে—সেভলো 'সবহারায়ের গান'।

বিজ্ঞানশালা ইতিমধ্যে ডুব দিয়ে অল খাঙ্কিল তার বসর কে রাখতো। আর সে যে-সে ডুব নর, একেখার বনের গহনে ডুব—সেখানে ফিরছিল সে যদি মানিকের লক্ষ্যে। যে মানিক সে কুড়িরে পেরেছে তাহারি মানিক কি সে আজ দিয়ে গেলো আমাকে ?

তবু হ'য়ে ছিলো কিছুকাল। সেই বিজ্ঞানশালা যে নারীর প্রসঙ্গ উঠলেই 'ছো' বলে একটা অস্বাভাবিক শব্দ ক'রে তার আরম্ভিক গালে টেনে আনতো এক লম্বুচিত সন্ধ্যার কল্পমানতা।

নবুন বিজ্ঞানশালাকে দেখলাম আজ। আজ নবরূপে সে উজ্জ্বলিত হ'য়েছে আমার কাছে। কে যেন আমার ভিতর থেকে প্রস্র করেছিল—"লভে পড়েছ বিজ্ঞান ?" তার উত্তর আমি পেয়ে গেছি। 'সবহারায়ের গান' পেয়ে বেড়াচ্ছিল যে কবি সে আজ উঠেছে 'লব পেরেছির' পর্বারে।

বিজ্ঞানশালাকে অনেক আলিঙ্গনিত কিন্তু তার ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হই নি কখনো। অকলর চরিত্র আর আকাশের মতো; উদার ক্ষুর তার। তার অপরিমিত আদর্শনিষ্ঠা, অদ্বা কর্ণশক্তি ও নিবোর্ব ত্যাগে মনে হতো আমার তার চেয়ে কত ছোট !

কিছুদিন পরেই জানলাম একটা অসংখ্য নারী হঠেচেন বিজ্ঞানশালায় জীবন-সঙ্গিনী। নবদ্বার করলারি বিজ্ঞানশালাকে অস্তরের শ্রদ্ধা দিয়ে। যে আদর্শকে সে লভা বলে গ্রহণ করেছিল তাকে জীবনে প্রতিকলিত করতে সমস্ত প্রতিশ্রুত নতির বিজ্ঞানে বাণা উঁচু ক'রে হাটোবার সানর্থ্য তার ছিল। এ ভক্ত অশ্রুশীলার প্রাণ পবন যে সে বিসর্জন করতে পারতো তাও বিশ্বাস করতাম।

আমার সাহিত্য জীবন

(৮ পৃষ্ঠার পর)

এইবার সত্যাপত্তি প্রদানের উপলক্ষ্য তাঁর ভাষণ গ্রহণ করলেন। আমার বাপা তখন ব্যক্তিগত ভাবে পড়েছে, বারবার নিজেদের দিকের দিচ্ছি কেন এলাম? লোককে লেখা শোনার জন্য কেন আমার এই ব্যাকুলতা? ক'নে দুকল—আমার কিছু গল্পটি বড় ভাল লেগেছে। গল্পটির সবচেয়ে বড় ভগ্ন পায়া। অল্প একটি পবিত্র বাস্তবের ভরে ওঠে। আর চরিত্রের কথা। মানব চরিত্র আদিক নিয়মে পরিণতি লাভ করে না। হুই আর হুই চার সব ক্ষেত্রে হয় না। বাস্তবের চরিত্রে ভিনও হয় পাঁচও হয়। ওতে বিশ্বাসের কথা কিছু নাই। লেখক নৃত্যন। কিছু তাঁর ভবিষ্যত আছে। উচ্ছল ভবিষ্যত বলেই আমার মনে হচ্ছে।

তিনি আমাকে সাধনা দেবার অন্তরেই বলেন নি। সভার শেষে আলাপ করে আশীর্বাদ করেছিলেন। গেমিন সভাতে মিথাক হয়ে বাড়ী ফিরলাম। পরিপূর্ণ মন নিয়ে। শরের মিন গল্পটি দিয়ে এলাম ভারতবর্ষে। ভাইলীর ধানী ও বেলার অন্ত্রে পারিত্রমিক রশ এবং পনের পঁচিশ টাকা পেলাম। এবং মৈলজানদের সাহায্যে উপাসনায় প্রকাশিত বোগবিরোগ উপস্থাপনাবিব সর্বস্বত্ব অনুদান চট্টোপাধ্যায় এত সন্ধ্যা একশো। টাকার বিক্রী করে অনেক আশার আশাবিত্ত হয়ে বাড়ী ফিরলাম। যা এবং পিসীমাকে সেই টাকাসুপা দিলাম। বললাম—রপায়াড়র জগন্নাথ রশনে বাবার ইচ্ছার কথা শুনেছিলাম। এই টাকার তোমরা পুতী বাস্ত। রথের বড়ি টেনে কামনা করো যেন আমার বাজা কোন দিন না ধামে। ওই টাকার সঙ্গে আমার জীবনের বড়ি জড়িয়ে দিয়ে এসো।

সবে সবে স্থির করলাম, এইবার বেখানে হোক মহানগরীর দীন পরিবেশ। বেখানে বাস করে সেইখানেই না হয় গিরে বাসা নেব। খাওয়ার ভাবনা করি নি, তখন পাইল হোটেলের ওড়াদড়ি। দু'আনার রাজভোগ

না হলেও কাছাকাছি রাজভোগ। স্থির করে আমার বসলাম লিখতে। লিখলাম নতুন।

গল্প লিখেছিলাম আমার জেলার প্রাচীন আমলের রাজধানী রাজনগরের জংল জুপের মধ্যে বসে। জংল জুপের মধ্যে বোতলার একটি অংশ কোন মতে ধাঁড়িয়ে আছে। সন্ধ্যাবেলা একটি জারিকেন নিয়ে তাড়া সিঁড়ি বেয়ে কোন মতে গিরে বসলাম সেই তাড়া বোতলার চানে। অল্পবার রাজে চারিপাশে অমট বাখা অল্পকাহের মত অল্পজুপ এবং অরণ্যের মত ঘন জঙ্গল। মধ্যে বিয়াই কালীঘর দ্বিতী। সেইখানে বসে লিখে চলেছি, হঠাৎ আলোটা গেল উঠে, সেটাকে তুলতে গিয়েই অল্পতব করলাম তাড়া বাড়ী তুলছে, চারিদিকে শাঁখ থেকে উঠল। ছাষের উত্তর প্রান্তে ধানিকটা জাঙ্গন জাঙ্গল। বুলালম কৃষিকল হচ্ছে। কি করব? স্থির হয়েই বসে রইলাম। কবের মুহূর্ত পরেই বুলালম কৃষিকল থেকে গেছে। এবার দেশলাই জ্বলে আলোটা জ্বললাম। তদিকে নিচে তখন ডাকছেন আমার বন্ধু হার বাড়ীতে রাজনগরে অস্তিত্ব হয়েছি। তিনি বললেন নেমে আসুন বশত! আলো বাখা তুলে নিয়ে উঠলাম। তাড়া সিঁড়ি, সর্গর্গেই নামছিলাম হঠাৎ একটি সিঁড়ির উপর যেখি এ বাখা থেকে শু বাখা পর্যন্ত জুড়ে শুধে আছে এক বিবহর। রক্ত রেখে বুলালম গোপুত। স্থির হয়ে শুধে আছে, গাঢ় ঘুমে যেন স্থির হয়ে পড়েছে। কিছু আমি শুকে পার হয়ে যাই কি ক'রে? কৃষিকলপে তাড়া বোতলটাকে খাড়া রেখে জংলজুপ সম্বন্ধিত না ক'রে নিয়তি কি এই একে পাঠিয়ে দিল শেষে? সর্গর্গমনে মুহূর্ত অনেক দেখেছি আমি এক সময় চিকিৎসকের কাজ করেছি। মন্ত্র জন্তু কাঞ্চকু বিস্তার নত। নিহিলায়ের পি, ব্যানাজীর লেকিঙ্গন ভদ্র রাষ্ট্রতাম। এটি ছিল আমার আর এক বেকারত্ব বিনাশনের নিমিত্ত বেগার বাড়ীর পথ। বড় যন্ত্রণার মুহূর্ত হয়। কিছু কি করব? আলোটা বাড়িরে লাননে হয়ে রইলাম। আলোকে অর্বাৎ অগ্নিকে ভর করে

সাপ। আলোটা থাকতে কণা তুলে আত্মবশ করতে পারবে না। পিছন কিরে ছাখে ওঠাও অসম্ভব। বির হরে গাড়িয়ে রইল। নিচে থেকে ভাগিৎ এস—কি করছেন বনাই?

চীৎকার করে অব্যব বিতে পাহস হ'ল না। বির হয়েই গাড়িয়ে রইল। অকস্মাৎ আবার মুখে সেদিন বিচিত্র হাসি ফুটে উঠেছিল। সাপটা জীবন্ত নয় মৃত। মুখে দিকটা একটা কাটলের মধ্যে বশন ঢুকিয়েছিল, ঠিক সেই মুহুর্তে কেপেছিল বহিরা; কৃষিকম্পের নাদার কাটলটা কবে এসে সাপটার মুণ্ডটাকে নিষ্ঠুর পেদে পিষে চেপে ধরেছে। তাতেই মরে গেছে সাপটা।

এই বিশ্বকর পরিভ্রমের মধ্যে আমি বেন রক্তময়ী নিরন্তিকে চকিতে মিলিয়ে বেতে দেখলাম—তাকে দেখলাম না, তার আঁচলের খানিকটা বেন চলে উঠে মিলিয়ে গেল। অস্থান করলাম, তার অবরে বিচিত্র মধুর পরিহাসের হাসি।

নেবে এলাম।

উৎকণ্ঠিত বহু বললেন—আজ্ঞা বাতিক, কি করছিলেন একজন। সিঁড়িতে গাড়িয়ে তাবছিলেন কি?

হেসে সব ঘটনা বললাম। তিনি সিঁড়ির উঠে বললেন—আবারই ভুল, আবারই ভুল। ওখানে ভয়ঙ্কর সাপ। আপনাকে বেতে দেওয়া উচিত হয় নি।

আমি আবারও হাসলাম।

বহু বললেন—ও বা হবার তো হয়েছে। ওরিকে দায়েগা এসে বসে আছে বাসায়। বোঝ করতে এসেছে এখানে আপনি কি করে?

দায়েগা লোকটি ভাল। তিনি বললেন—কালই আপনি এখান থেকে চলে যান। আপনি এসেছেন

বিকলে, তাম্রি আটটার লাইকেলে আই বির এ-এস-আই এসেছে আপনার পিছনে। লোহা অর্থাৎ সাবলক্ষ্যেহার ভয়ানক নজর আপনার উপর। পারেন তো জেলা ছাড়ুন। নইলে শু আপনাকে রেহাই বেবে না।

দায়েগা চলে গেল।

মনে হ'ল এটাও বেন একটা ইমিত। ওই কাণ্ডের আঁচলের খানিকটা বেন এবারও চলে গেল।

বাড়ী কিরেই বিজ্ঞানা বাক্স বেঁধে রঙনা হল। একখানি টিন ছাওয়া কুঠুরী জাড়া করলাম, অখিনী দত্ত বোডে মহানিবাণ বোডে মনোহরপুত্র বোডের সমন-ফলের কাছাকাছি। এসে উঠলাম সেখানে।

অগ্নাখের রখে চাকার বাগা জীবন চলতে শুরু হ'ল। পাকা হয়ে শুরু করলাম সাহিত্যিক জীবন। জুনিকা শেষ হয়ে গেল। শেষ হয়ে গেল লাভপুরের জীবন। তখন ছিলেব ক'রে মনে হয়েছে এর পরিণতি ব্যর্থতায়, এর পরিণতি অর্ধাহারে হয় তো অনশনে, হয় তো বা করোগাক্রান্ততার, এর শেষ বাহুরে পরিহাসে ব্যথে। কিন্তু তবু আমি বাবতে পারি নি। মনে মনে শুই এই বদেছি, বন নয় মান নয়—শুই এইটুকু বেন মুহুর পর বাহুর একবার অরণ করে। ঐর একটি কামনা জানিয়েছিলাম। বেন হীন প্রকৃতি আমার না হয়। চরমতম অতাবেও বেন প্রতারণা না করি; চুরি না করি। ডিক; না করি। এ কামনার সময় অরণ করেছি ভগবানকে।

সাহিত্যিক জীবনের প্রথম পর্ব সমাপ্ত হয়ে গেল। দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ হ'ল ওই টিনের খবে। সে কথা এখন থাক।

(সমাপ্ত)

লিফ্টম ট্রাঙ্ক বোডের বোকান থেকে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে গাড়িতে উঠতে বাঙ্লি ভুভেন্দু, একবারে চোখাচোখি হয়ে গেল। নীলিমা বাগ থেকে নেমে গলির মধ্যে চুকবার জন্য পাড়িরেকে, ভুভেন্দুকে দেখে বেমে পাড়াল, বলল, 'ভুবি !'

ভুভেন্দু ওই একটি পকেটই এন্ডিকনি করল, 'ভুবি !'

ভারপর বলল, 'কতকাল পরে দেখা।'

নীলিমা বলল, 'হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে কোন না কোন দিন দেখা হওয়ার সম্ভাবনাটাও পাকে।'

ভুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার পরনে কুমদারী লাঙ্গা ধোলের একখানা বিলের শাড়ী, মলিষন্ধে দুপাছা সফ্রু চুড়ি ছাড়া সারা দেহে আর কোন আভরণ নেই। বাহাতে মূল পাঠ্য একখানা ইতিহাসের বই, আর তার ভলার এক রাশ খাতা। শরীর তারি রোগা হয়ে গেছে, সেই আগের মত চেহারা আর নেই। কিন্তু সিঁথিটি আগের মতই লাগা রয়েছে। নীলিমা লক্ষ্য করল ভুভেন্দুর পরনে দারী ছট। আঙ্গুলে পাখর বসানো ছুটি আংটি, একটির রত্ন নীল আর একটি গাঢ় রক্তবর্ণ, আগের চেয়ে বেশ একটু বোটা হয়েছে দেখতে।

ভুভেন্দু বলল, 'এদিকে কোথায় যাচ্ছ ?'

নীলিমা বলল, 'স্কুলে। নোলাপুজুর বিভাগীঠে মাঠারী করি।'

'ভুবি যাচ্ছ কোথায়, কোন অফিসে ? না কি চাকরি থাকরি আর করতে হয় না।'

ভুভেন্দু বলল, 'বা চাকরি করতে হয় বৈ কি, চাকরি না করলে খাব কি। একটা ইন্সিওরেন্স অফিসে কাজ করি।'

নীলিমা বলল, 'যেবে মনে হচ্ছে বড় চাকুরে।' ভুভেন্দু বলল, 'কিন্তু আসলে বড় চাকর।'

নীলিমা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'বিরে করছে তো ?'

ভুভেন্দু এবটু তৌক গিলে বলল, 'রাস বল। বিরে

করবার আর সময় পেলারি কই।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু আমি বেন ভুভেন্দুলাম...।'

ভুভেন্দু এবটু হাসল, 'সে তো আমিও ভুভেন্দুলাম তোমার বিরে হয়ে গেছে। কিন্তু যেবাছি তো অন্তরকম। দেখার লগে কি সব সময় সোনায় মিল হয় ?'

নীলিমা বলল, 'তা ঠিক। আচ্ছা চলি।'

ভুভেন্দু বিম্বিত হয়ে বলল, 'সেকি, এতদিন পরে দেখা। কথাবার্তা কিছুই হোল না এইই মধ্যে বিদায় নিচ্ছ।'

নীলিমা বলল, 'কিন্তু স্কুলের বেলা হয়ে গেল বে। অবসিততে আজ একটু লেট হয়েছি, কটা বাজল, এগারটা বেজে গেছে যোগ্যহয়।'

ভুভেন্দু হাতবড়িটার মিকে তাকিরে বলল, 'হ্যাঁ সোয়া এসরি। শোন আজ আর তোমার স্কুলে গিড়ে কাজ নেই, আমিও অফিস কায়াই করব, এসো গাড়িতে।'

নীলিমা বলল, 'ভারপর।'।

ভুভেন্দু বলল, 'ভারপর আর কি। নারাদিন ছুটে যেড়ার আর যাকে যাকে চা খাব। মনে আছে সেই চা বাগড়ার কথা ?'

নীলিমা বুদ্ধ হেনে বলল, 'আছে। কিন্তু স্কুল আমার আজ কায়াই করবার জো নেই, অকরী দরকার।' আজ রাইনের তারিখ, যে কথাটা আর নীলিমা খুলে বলল না। বলল, 'বরং আমাখের বাড়িতে এসো।' ভুভেন্দু বলল, 'বেশ, কবে যাব বল।'

নীলিমা বলল, 'কালই এসো লজ্যার পর।' বেকিয়া ডাঙ্কা লেকগ লেন। তেত্রিশ মঘর বাসে উঠে বগুেল গেটের কাছে নামবে, ভারপর রেল লাইন ক্রশ করে,— ওয়া তোমার তো গাড়িই আছে।' বেশ একটু অগ্রজ্ঞত হলো নীলিমা।

ভুভেন্দু বলল, 'বা ভেবেছ তা নয়, অফিসের গাড়ি। অফিসের কাণ্ডেই এদিকে এসেছিলাম। সব পরের মনে

শোকারী।' নীলিমা, বলল 'আজ্ঞা, তা হলে কাল তা হলে দিখাই আসছি তো।'

'ওতেন্দু বলল, 'নিশ্চয়ই।' তারপর শিঙন ফিবে ইন্টার হুজ করল নীলিমা। বক্তব্য দেখা যায় ওতেন্দু এক দুইতে ওর বিকে তাকিয়ে রইল। বেশ বাপ চেহারা দেখে যোকা তার অভ্যে পড়েছে। সেই আগের দিন আর নেই। কিন্তু সেহের সেই স্মরণ পড়ন এখনো যেন সার ভেদনি আছে। প্রায়বর্ণের ওপর ছিপছিপে হোহারা চেহারা। বড় বড় কালো ছুটি চোখে রক্ত যেন আর পড়ি হয়েচে।

পাড়িতে ষ্টাট' ছিল ওতেন্দু। ব্যাটো লেনে অফিসে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু কাজ কর্মে মন লাগল না। আট নয় বছর আগের একটি মধ্যমল স্মরণ আর কয়েকটি টুকরো টুকরো ছবি ওর চোখের সামনে তেলে বেঁধেতে লাগল আর সব জীবের সঙ্গে ভিত্তি'রইল একটি ঘরে। বোল সতের বছর তার বয়স, যেমন চকস তেমন আগলত।

কাগারী বাড়ির কাউপাডের সারির শিঙনে লাগ জড়কির পথ। আর সেই পথের প্রান্তে যোতলা হলধে রঙের বাড়ি। এই বাড়িটির সঙ্গে প্রথম পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ওতেন্দুই এক দুই লক্ষ্যের বাবা নিবতোব। সতের কাট' হুঙ্গল তবশ দত্ত শিবুনার মসখর। দুই থেকে একদিন আসুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন শিবুনা। তারপর একদিন কলেজ ছুটির পরে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, বললেন, 'আজ, আত্মীয় স্মরণের সঙ্গে পরিচয় কর। আরকালকর দিনে এত কুনো, হুখ-চোরা হয়ে থাকলে চলে নাকি ছুনিয়ার?'

তখন তারি হুখচোরা অভাবই ছিল ওতেন্দুর। দু' বছর এই সময়ে থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেছে বটে কিন্তু দু' একজন একেবারে আর ক্লাসের ছাত্রটি ছাত্র ছাত্রী কারও সঙ্গেই তার খনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় হয় নি। কলেজ ছোট্টো তিন শিট ওলালা একটি ঘরে কোণের বিকের একখানা তক্তপোষে সে পকে, কারো সঙ্গে বড় একটা বেশে না, ইচ্ছা সত্ত্বেও বিশেষ

পারেনা। এই নিয়ে লক্ষ্যী লক্ষ্যীরা নানা রকম ব্যয় বিক্রয় করে। কেউ বলে মেঝাকী, কেউ বুঝ থাকিয়ে বলে বেঁধো ভূত। ওতেন্দু বইয়ের আড়ালে চোখ ঢাকে। তারের হুখ তবির দিকে তাকায় না, বক্তোজির সময় ববির সাক্ষে।

এমনি করেই চলেছিল। শিবুনা কলকাতা থেকে গানের বাড়িতে বাতরার পথে খুলনার ছুদিন করে গেলেন। আর সেবারই পরিচয় করিয়ে দিলেন তবশ বাবুদের সঙ্গে। বেশ শিক্ষিত লম্বার পরিবার। বড় হলে কলকাতার থেকে ল পড়ে। ছুটি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে, সেহেটি ব্যাটিক পাশ করে কলেজে কতি হয়েচে, তার পরেই সব স্কল আর হাক পাণ্টের হল।

এই বাড়িতে প্রথম দিন এসেই বড় অপ্রসন্ন হয়েছিল ওতেন্দু। শিবুনা বক্তর শাত্তীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, 'ছেলেটি পড়াভনার বেশ ভালো, কিন্তু বক্ত লাঙ্ক।' শিবুনার বাকী শাত্তী বললেন, 'লাঙ্কই ভালো বাবা, যে কামিল কক্তর ছেনেমেই হয়েচে আমকাল। এদের মধ্যে শাত্ত সৌবা কাউকে বেবেলে আবার তো চোখ জুড়ায়, তোমরা যে বাই বল।'

বারাকার বেস্তের টেবিলে চেয়ার পেতে লাভা চারের আরোহন ছিল। সেখানে ডাক পড়ল শিবতোব আর ওতেন্দু। সেটে করে ভিদের তৈরী ছুতিন মকমের বাবার এগিয়ে দিয়ে বড় একটা কেটলি পেকে প্রত্যেকের কাপে চা ঢেলে দিচ্ছিল নীলিমা। বানিক আগে শিবুনা তার এই তরুণ প্রালিকাটির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে-ছিলেন, নবস্তার বিনিময় ছাড়া বাক বিনিময় তখনো হয়-নি, কিন্তু তার কাপে চা ঢালবার সঙ্গে সঙ্গে ওতেন্দু বলে উঠল, 'পাখি তো চা খাইনে।'

নীলিমা তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিপ্লব হয়ে বলল, 'খান না।' সেলেছি যখন একটু খান।' কথা-বার্তার তারি লক্ষ্যীত নীলিমা। যেন ওতেন্দুর সঙ্গে তার কতদিনের পরিচয়। শিবুনা হেসে বললেন, 'তবেই হয়েচে, ওতেন্দু আবারের এগুনের বক্তদু, এত বড়

হলে হবে কি পান সিগারেট চা কোন দিন বুধে তোলেনি। এলব খাপ্যাবে রাত্তা কাকার তারি কড়া শাসন।’

নীলিমা বলল, ‘তা খাজুক গিরে, পান সিগারেটের লম্ব চাহের তুলনা দেবেন না কানাইবাবু, চাটা পান সিগারেটের বত জাতি নয়। অনেক ভালো, অনেক সুন্দর।’

নীলিমার মা হেসে বললেন, ‘ভাতো হবেই, যা একটি চাহের পোকা জুদি, দুধের চেয়ে শু ভোমার কাছে চা ভালো।’ তারপর স্বামীর দিকে তাকিয়ে বললেন, ‘যা দেখছি তোবার এই মেয়ের জন্তে কোন চা বাগানের ম্যানেজার ট্যানেভার খুঁজতে হবে।’

অবশ্যবাবু তারি মিততাবী, মিত বুধে বললেন ‘হ’। শ্বেতপদ্মের বত চমৎকার কাণটি। তার মধ্যে কাণার কাণার ভরা তন্ত্রিত পানী, সেবে সেবে তারি লোভ হলো। শুভেন্দুর। একবার তাকাল নীলিমার দিকে তারপর নিচু হয়ে আচমকা কাণে চুম্বক মিল। কিন্তু লম্ব লম্ব মুখটা সরিয়ে নিলো শুভেন্দু, তরল পানীরের উত্থানে ঠোট দুটি বেন পুড়ে গেছে।

নীলিমা তার দিকে তাকিয়ে ছিল, চোখাচোখি হতয়ার মুখে ঝাঁপে চাপা দিল, তবুও কি অস্থ বাববার কো আছে। ভিতর থেকে ঝল ঝল এক হাসির বেগ ওর সমস্ত শরীরকে আন্দোলিত করছে। সেব পবিত্র পরিবেশন বন্ধ রেখে ছুটে চলে গেল ঘরে। জানালা দিয়ে শুভেন্দুর চোখে পড়ল ভক্তপোষের ওপর শুভে পড়ে তখনো নীলিমা হাসির দমকে কেঁপে কেঁপে উঠছে। সে একা নয়, তার সঙ্গে যোগ দিয়েছে সেই প্যাক্ট ক্রকের দল। নীলিমার মাও অতি কঠোর হাসি চেপে বললেন, ‘মুখ-পুড়ীর কাণ দেখ।’

অবশ্য বাবু মেয়ের উদ্দেশ্যে ভিরত্বারের দ্বারে বললেন, ‘না না এলব কি, বরল তো কম হয় নি, এখনো বহি ম্যানাস’ না দেখে—’

নীলিমার মা বললেন, ‘চা বখন ভোমার খাওয়া

অভ্যাগ নেই তখন আর খেয়ে কাজ নেই বাবা। আমি তোবার অস্ত্র সরবৎ করে আনিছি।’ শুভেন্দু লজ্জিত হয়ে বলল, ‘না না আমার আর কিছু দরকার নেই।’

এত অগ্রহভত আর নাকাল শুভেন্দু ধীমনে হয় নি। বাইরে এসে শিবুদাও বললেন, ‘খুই একটি আন্ত উজবুক, একটা দিন ক্রিয়েট করে হাড়লি তো।’

দিন দুই পরে কলেজে চুকতে বাজে পিছন থেকে ডাক শুনল, ‘শুনা’

শুভেন্দু তাকিয়ে দেখল আরো দু তিনটি মেয়ের সঙ্গে নীলিমাও বেরোচ্ছে। তখন কলেজে সকালে মেয়েদের ক্লাস হোত দুপুরে ছেলেদের।

১৯২৪’এ স্কুল
আজিও সেরা



‘কাজল-কালি’

কেমিকেল এনোমিয়েশন (কলিকাতা)

৫৫ নং ক্যালিং স্ট্রিট,
কলিকাতা।

শুভেন্দু ওর দিকে তাকাত্তে নীলিমা বলল, ‘কানাই বাবু কি চলে গেছেন।’

‘শুভেন্দু এবাব মিল’ হ্যাঁ।

ইসারার সন্নিবীসের একত্রে বলে নীলিমা ত্তেঙ্গুর
সিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিনের ব্যবহারের অঙ্ক বড়ই
লক্ষিত হচ্ছি। বা যেতে বলেছেন আপনাকে। তাঁর
কাছে খুব বহুনি খেয়েছি। আপনি না গেলে আরো
বকবেন।'

ত্তেঙ্গুর বলল, 'আমার তো সময় হবে না'। কিন্তু
শেব পর্বত দেখা গেল সমস্ত হোল। তারপর খন খনই
যাতায়াত শুরু করল ত্তেঙ্গুর।

লজিকটা মাথার ঢোকা না নীলিমার। এদিকে
ত্তেঙ্গুর লেটার পেয়েছে স্মারশাস্ত্রে। নীলিমা বলল,
'না, ত্তেঙ্গুরা যদি মাঝে মাঝে আমাকে লজিকটা
বেরিয়ে দেন খুব সুবিধে হয়।' নীলিমার মা বললেন,
বেশ তো, ওর যদি পড়াশুনোর কোন কতি না হয়—।'

ত্তেঙ্গুর আপত্তি দেখা গেল না। সে নীলিমাতে
লজিক দেখাতে লাগল, আর নীলিমা তাকে চা খাওয়ার
রপ্ত করে ফুলাল। প্রথম প্রথম অবশ্য চা দিত না নীলিমা।
কিন্তু, 'কি রকমার পরের ছেলেকে হুজুরান বানিয়ে।
ঠাণ্ডা ছেলের পক্ষে সরবতাই ভালো।' কিন্তু দিন কয়েক
পরেই সরবতের রাসের বরলে চায়ের কাপ দাওয়া
দখল করল। আর ত্তেঙ্গুর সমস্ত ক্ষর দখল করল
এই স্মারশাস্ত্রে। চা দাত্রীটি। স্মারশাস্ত্রের বিবি রক্ষিত
হোল কি না বলা যায় না, কিন্তু বা লজিক্যাল তাই ঘটল।

নাটক লক্ষ্যে গিয়ে পৌছবার আগেই ভবেন-
বার টাটগারে বদলী হয়ে গেলেন। নীলিমা আর ত্তেঙ্গুর
অনেক মতলব ঝাঁটল। একবার খাবল কাটকে না বলে
ছুরনে মিলে পালার আর একবার তাবল সোমাস্ত্রজি
বাবা মাকে বলে। কিন্তু কাহে কিছুই হলো না। চরম
কোন পদ মেওয়া কাগোই সাধে সে কুলিয়ে উঠল না।
তা ছাড়া বি, এ পরীক্ষার চাপ তখন ত্তেঙ্গুর ঘাড়ে।
বেশী হৈ চৈ করবার মত অবস্থা তখন নয়। বিদায়ের
সময় লজল চোখে নীলিমা বলল, 'চিঠি দিয়ো।'

আজগলার ত্তেঙ্গুর প্রতিবাদি করল, 'চিঠি দিয়ো।'

চিঠির আদান গ্রহান অনেক দিন পর্যন্ত চলছিল।

তারপর একসময় আত্মনিক নিরবেই তা বন্ধ হয়ে
গেল। সাদা এল না নীলিমার কাছ থেকে। ত্তেঙ্গুর
সমস্তে গেল ওর বিয়ে হয়ে গেছে। প্রথম খুশি আদাত
পেগেছিল। যেন হয়েছিল এই বাগ, এই ক্ষত চিহ্ন বুঝি
কোনদিন মিলাবে না, এই শূন্যতা কোনদিন তারে উঠবে
না। কিন্তু জীবনের নিয়ম অস্তরকম। সেই নিরবে
ত্তেঙ্গুর পড়াশুনোর পাঠ শেষ করে চাকরি সংগ্রহ করল।
বাবার অহুতোধে বিয়েও করল। নীলিমার স্মৃতি আর
হুছে গেল মন থেকে, কিন্তু চায়ের অভ্যাসটি গেল না।
বয়ং চারুকি হিসাবে বন্ধ বহলে ত্তেঙ্গুর বেশ খ্যাতি
বেড়ে উঠল। চা শুধু খায়ই না ত্তেঙ্গুর, বন্ধ বান্ধকে
ডেকে খাওয়াও তা। সবাই বলে, চায়ের এমন স্বাদ
এমন সৌরভ আর কারো বাড়িতে মেলে না। অবশ্য
এ ক্ষতিগু ত্তেঙ্গুর একার নয়, তার স্ত্রী মানসীও এর
অধঃংশ ভাগিনী।

লাকের সময় অফিসের বেরাটা অঙ্ক বাবারের সঙ্গে
চাপ নিয়ে এল। সেই তরল পানীরের মধ্যে পুরোন
দিনের অনেক স্মৃতিছবি দেখতে গেল ত্তেঙ্গুর। কতদিন
যে কত জারগার নীলিমার সঙ্গে সে চা খেয়েছে তার
টিক নেই। কখনো বাগানে, কখনো ছাদের কোণে
কখনো ছুপুর রোদে, কখনো বুড়ির সময় আনলারির
বারে বলে ছুরনে চায়ের কাপ সাধনে নিয়ে গজ করেছে।
সেই অতীত দিনের মূঠ দিনগুলির কথা তাবতে তাবতে
ছাটাইছে হোল আল নীলিমার শুধানে গিয়ে চা খেলে
কখন হয়। নিমন্ত্রণ অবশ্য কাল, কিন্তু একদিন আগে
গিয়ে ওকে অবাধ করে দেবে।

অফিসের ছুটির পর সোজা বাড়ি চলে গেল ত্তেঙ্গুর।
সিন্না স্ট্রিটের একটি স্ট্রাট নিয়ে ওরা থাকে। কেরা
মাত্র তিন বছরের ছেলে এলে অফিসের বরল, 'বাবা, আমার
তত্তে কি এনেছ।' কিন্তু ত্তেঙ্গুর আল বড় অঙ্ক মনস।
মানসীও এগিয়ে এসে বলল, 'আজ বে বড় সকাল সকাল
কিবেত।'

তুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ একুশি আবার বেতোতে হবে।' অকস্মিক পোষাক ছেড়ে সাধারণ ধূতি পাঞ্জাবী পরল তুভেন্দু। মনে মনে আগেই ঠিক করেছিল কমকালো বেশে নীলিমার শুধানে বাবে না, আটপৌরে সাধারণ বেশে গিরেই উপস্থিত হবে, যেন নীলিমার অস্বাভাবিক গলে ওকে মানায়।

মানসী জিজ্ঞেস করল, 'এত কি ভাড়া, চা খেয়ে বাবে না?'

তুভেন্দু বলল, 'না সময় হবে না, তরুণী সরকার আছে।' আজ নীলিমার শুধানে গিয়ে প্রথম সাক্ষাৎ বাবে ঠিক করেছে তুভেন্দু।

গাড়ি নিল না, হেটে গিরে ট্রাম ধরল। সাহুলার রোডে পড়ে ডেজিথ্রি নব্বের বাস ধরল তুভেন্দু। নীলিমা যে বাসে রোজ বাতাবাত করে সেই বাসে। তাতে যেন ওর গায়ের স্ফাবন পাওয়া বাবে।

গাড়িতে অত্যন্ত ভিড়, সারাটা রাস্তা গ্রায় গাড়ির যেতে হোল, তবু মনে মনে এক অদ্ভুত বৈচিত্র্য অনুভব করল তুভেন্দু। যেন দুর্গম পথে অভিযানে বেরিয়েছে।

বাস থেকে মেনে নীলিমার ডেজিথ্রা নিশানা ধরে ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে গেল তুভেন্দু। সন্ধ্যের একেবারে বাইরে জনমানবহীন অন্ধকার জাঁপ একটা পোড়ো বাড়ির সামনে এলে ধামতে হোল ওকে। কড়া নাড়ন্তে, একটা হারিকেন হাতে নীলিমা এলে সামনে গাড়া। বিস্মিত হয়ে বলল 'তুমি! তোমার না কাল আসবার কথা ছিল!'

তুভেন্দু বলল, 'কালকের সন্ধ্যার টেরে আজকের সন্ধ্যা অনেক কাছে।'

নীলিমা বলল, 'এসো আমিও এই একটু আগে ফিরলাম।' এত ঘেরী করে কেন ফিরল সে কথাটা অবজ্ঞা আর নীলিমা হাসাল না। ফুলের বাইনে আজ হয় নি, প্রতিবেশীর কাছে গোটা পাঁচেক টাকা বাবে জেটার বেরিয়েছিল পার নি। নীলিমা বলল, 'এসো বা বাড়ি ঘরের অবস্থা তোমার ভারি কষ্ট হবে।'

তুভেন্দু বলল, 'কষ্ট তো তোমারও হচ্ছে। কিন্তু এভাবে অজ্ঞাতবাস করে লাভ কি।'

নীলিমা বলল, 'তোমার কি ব্যারণ ইচ্ছা করে অজ্ঞাত বুল করছি। করতে বাধ্য ছিলাম, এসো।'

ভিড়ের একখানা ঘরে গিরে নীলিমা তুভেন্দুকে বলতে দিল। আসবাবের মধ্যে একখানা ছোট তক্তাপোষ, তাতে ছেঁড়া একটা সতরঞ্চি পাতা, নীলিমা বলল, 'গাড়াও বিছানার চাদরটা পেতে দিই।'

তুভেন্দু সেই ছেঁড়া সতরঞ্চির ওপর বলে পড়ে বলল, 'ধাক ধাক আর চাদরের সরকার নেই। তারপর খবর টবর বগ। বাড়ির আর সব কোথায়।'

নীলিমা সংক্ষেপে তাদের পারিবারিক দুর্ভাগ্যের বিবরণ দিল। বহু টাকা বেনা বেখে বাবা মারা গেছেন, মাও আজ বছর তিনেক হোল নেই। দাদা টি, বি, হাসপাতালে। অল্পের আগে বিয়ে করেছিলেন, দুটি ছেলে বেয়েও হয়েছে। তাদের তরুণ পোষকের তার নীলিমার ওপর। আগের দিন চেতলা থেকে বউদির কাকা এসে সবাইকে নিয়ে গেছেন। তার পুড়ুজুতো বোনের বিয়ে।

এসব কথা শেরে নীলিমা একটু স্থান হেসে বলল, 'কিন্তু এখন তিনেই এলে তোমাকে যে কিছু আনিবে দেব তারও আশা নেই, কোন দোকানপাট নেই বায়ে কাছে, এমন পাড়া।'

তুভেন্দু বলল, 'হরহে। তোমার আর তরুণী করতে হবে না। দিতেই যদি হয় এক কাপ চা নাও।'

নীলিমা বলল, 'চা।'

তুভেন্দু বলল, 'হ্যাঁ, চা খেতেই তো এসো।'

হারিকেনের স্থান আলোড়নেও তুভেন্দু লক্ষ্য করল নীলিমার মুখের রঙ বদলেছে। চায়ের গ্লাসে, চায়ের অল্পবন্ধে ওর রক্ত শেগেতে স্থানিয়ার।

নীলিমা বলল, 'বেসো আসছি।'

নিমন্ত পাড়া, নির্জন ঘর। বাইরে রাত্রির অন্ধকার।

তুভেন্দু মনে মনে ভাবল বহুদিন পরে চা খাওয়ার এক

নতুন পরিবেশ জুটেছে। বুঝোমুখি বলে চারের পেরালা হাতে নীলিনাকে বলি আজ জিজ্ঞেস করে শুভেন্দু, 'নীলি, সেই দিনগুলি কি একেবারেই গেছে, তাদের কি আর একটি বারের জন্তও ফিরিয়ে আনা যায় না?' তা হলে কি খুব অজ্ঞান হবে?

একটু বাধে এক কাপ চা এনে নীলিমা শুভেন্দুর হাতে তুলে দিল। আত্মলে আত্মলে হোঁরা লাগল দুজনের।

শুভেন্দু বলল, 'তোমার চা।'

'আনছি।'

বলে নিজের চারের কাপটিও নিয়ে এসে সাবনে বলল নীলিমা। সেই আগেকার দিন যেন ফিরে এসেছে। বলল, 'ওহু চা-ই কিন্তু মিষ্টি।'

শুভেন্দু বলল, 'ওহু চা-ই নাওনি, তা তুমি নিজের জানো।' বলে আন্তে আন্তে চারের কাপে চুমুক দিল শুভেন্দু। আর সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই প্রথম দিনের মতই মুখ বিকৃত করে কাপটি তক্তপোষের উপর নামিয়ে রাখল। অতি বিস্ত্রি একটা গড়ে পেটের নাড়ী যেন উঠে আসছে। এত বাজে চা জীবনে শুভেন্দু বুঝে সেরে নি।

নীলিমা বিস্মিত হয়ে বলল, 'কি হলো।'

'না কিছু হয় নি' বলে কাপটি আর একবার হাত বাড়িয়ে নিতে গেল শুভেন্দু। কিন্তু যনের বস্তথানি উৎসাহ আছে অবাধ্য হাতের যেন তক্তথানি আগ্রহ নেই। নীলিমা শুভেন্দুকে সব টের পেয়েছে। বাধ্য দিয়ে বলল, 'খাও এটা তুমি খেতে পারবে না, আমার আগেই খোতা উঠিত ছিল।'

এই খিতীর বার অগ্রজত হোল শুভেন্দু। ওর মুখে আজও কোন কথা ফুটল না। শুভেন্দুর ইচ্ছা করতে লাগল সেদিনের মত নীলিমা আজও ওর সমস্ত অপটুতা বেলে উড়িয়ে দেয়, সেদিনের মত উজ্জল হাসির চেউরে সমস্ত বাবদান, অভ্যাস আর অনভ্যাসের সমস্ত বৈবদ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু তা হলো না। নীলিমার মুখে আজ আর হাসির লেশ বাক্স নেই। কনাক্টন কঠিন চোয়ালে সে মুখ যেন আর নীলিমার নয় অথ কোন অপরিচিতার।

বাইরে ঘন অম্বাট অন্ধকার। আর সেই নীলিমা বিস্ত্রি পথ, দুদিকে কাঁচা চামড়া আর নর্দমার গড়। শুভেন্দুর হঠাৎ যেন হোল এসব পার হয়ে কতকণ্ঠে একটি স্বাচ্ছন্দ্য চারের কাপ সে মুখে তুলতে পারবে। অনেককণ্ঠ সে চা খায় নি।

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

—ঃ হেড অফিস :—

৪ নং ক্লাইভস্ট্রাট স্ট্রীট, কলিকাতা।



অন্যর্থাৎ

চিরাজবিল্লি এখা নত্যা আশাধের পাঠক অগ্রাহ্যক
ও লেখকদিগকে আশা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মন্দিরা এবার ১৫শ বৎসরে পূর্ণাঙ্গ করল। বহু
বাধা বিঘ্ন অতিক্রম ক'রে মন্দিরা এগিয়ে চলছে,—
স্বাধীনতা লাভের পূর্বে যে সব বাধা এর পথে আসত,
আজ তা নেই। কিন্তু তবুও এর যাত্রা-পথ এখনও খুব
সহজ নয়। 'মন্দিরা' নিতীকভাবে তার কর্তব্য ক'রে
যাচ্ছে; কারো বনজটিলি অস্ত্র সে চোঁটা করে না। তাই
হয়ত অনেকের বিরাগ এর উপর পড়ে;—কিন্তু সাধারণ
পাঠক সমাজে এর আদর দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। আশা
আশা রাখি—আগামী বছরে মন্দিরা আরও জনপ্রিয়
হ'বে।

বাংলার কংগ্রেস

কোন অদূর অতীত হতে বাংলার কংগ্রেসে দলানলি
ও ঝগড়া শুরু হয়েছিল, আজও তার সমাপ্তি হয় নি।
তারতর্ষ্য স্বাধীন হওয়ার এবং বঙ্গ বিভাগের পর এই
দলানলির লড়াই একটা আলাদা রূপ গ্রহণ করে।
বাংলার কংগ্রেসে বরাবরই পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কর্মীদের
প্রাধান্য ছিল। তথা সংখ্যাগত বেনী ছিল। হয়ত
কার্যকমতারও তারা পশ্চিম বঙ্গের কংগ্রেস কর্মীদের
চেয়ে একটু স্বতন্ত্র ছিল। একথা বলা চলে যে বঙ্গ
বিভাগের সময় বাংলার কংগ্রেস প্রধানতঃ পূর্ব বাংলার
কংগ্রেস কর্মীদের হাতে ছিল। তখন প্রায় ওঠে, পূর্ব বাংলা
হতে আগত কংগ্রেস কর্মীদের স্থান কি হবে। নিম্নলি
ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশে পূর্ব বাংলা হতে আগত
প্রাদেশিক কংগ্রেসের কতক সত্তাকে পশ্চিম বাংলার

নতুন কংগ্রেস কমিটিতে স্থান দেওয়া হ'ল। এই
সংখ্যাধিকার ভাৱে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস কর্মীগণ নতুন
প্রাদেশিক কংগ্রেসে প্রাধান্য লাভ করে। অল্প এদের
মধ্যে পশ্চিম বাংলারও অনেক কংগ্রেস কর্মী ছিল।
কিন্তু তারা কোন সংগঠন কার্যে মন না দিয়ে সে
অযোগ্যের অপব্যবহার করে। এরও মূল ছিল ঐ দলের
মধ্যে ছুই তিনটি উপদলের ক্ষমতা নিয়ে কাড়াকাড়ি।

অপরদিকে নিম্নলিভারত কংগ্রেস কমিটির কতৃপক্ষ
এদের প্রাধান্যকে হ্রাসের কখনো চেষ্টা নি এবং নতুন
প্রাদেশিক কমিটির আগর নির্বাচনের প্রধান দায়িত্ব
কমিটির হাত থেকে নিজেরা নেয়। কালাভেদেই রাগ
ও গোমুগুড়াই ভাটকে পাঠিয়ে নতুন কমিটি নির্বাচন
করায়। এই নির্বাচনের বিষয়ে বহু অভিযোগ উঠেছিল
এবং একথা বলা চলে যে নির্বাচন কার্য খুব নিয়মসম্মত
ভাবে পরিচালিত হয় নি। এই নির্বাচনের ফলে পশ্চিম
বাংলার একমুগু কংগ্রেস কর্মী প্রাদেশিক কংগ্রেসের কতৃপক্ষ
লাভ করে। এবং তাঁদের বিরোধী দলের প্রায় কেউ
কংগ্রেস সংগঠনের কোন উল্লেখযোগ্য পদে স্থান পায়-
নি, এই দলের হাতেই বাংলার মহিলার চাবিকাঠি
ছিল; অর্থাৎ ক্ষমতা ছিল এদেরই হাতে। দলপুষ্টি
করতে এদের খুব অসুবিধা হবার কথা নয়।

যদিও এই বিরোধী দলকে পূর্ব বাংলার কংগ্রেস
কর্মী দল বলে অভিহিত করা হয়, তবুও এই কথা ঠিক
নয় যে পশ্চিম বাংলার কোন কংগ্রেস কর্মী এই বিরোধী
দলের মধ্যে ছিল না। পশ্চিম বাংলার যে সব কর্মী
ঐ দলে ছিল তারা অনেকেরই আস্তে আস্তে ঐ নতুন
দলে যোগদান করে, তবুও শেষপর্যন্ত পশ্চিম বাংলার

অনেক বিশিষ্ট ও সং কংগ্রেস কর্মী বিরোধী দলে ছিল। কংগ্রেসের নূতন সংগঠনে তারা কেউ কোথাও স্থান পায়নি। পণ্ডিত জহরলাল নেহরু সভাপতি হওয়ার সময় ব্যাপকভাবে বহু আশা ছিল তাদের দিয়েছিলেন, তা সবেমাত্র এসে কার্যকর কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করে দেওয়া হল। যে করেই হোক এই পূর্ণগঠিত কংগ্রেস সংগঠনে কোন বিরোধী দল গ্রহণ হইল না। তখন আশা করা গিয়েছিল যে এবার বাংলার কংগ্রেসে আর দলতান্ত্রিক থাকবে না এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ একটু উদার ভাব নিয়ে কংগ্রেসের সংগঠন কার্যে মন দেবেন। কিন্তু আশাভঙ্গ এই দুই আশাই বিফল হয়েছে। ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচনের পরই এই নূতন দলের ভিতর বিভেদ দেখা যাচ্ছে। রাজ্য কয়েক দল পূর্বে করা একযোগে কাজ করেছিল পুরানো বিরোধী দলকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কার করার বিষয়ে ক্রমশঃ পাওয়ার পরেই নূতন দলের মধ্যে ক্রমশঃ কড়াকড়িতে আবার উপদলের সৃষ্টি হ'ল। দ্বীনীভিত্তিক ক্রমশঃপ্রিয়তা প্রভৃতির অভিযোগ নিয়ে এরা বর্তমানে কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। হরত তাদের অভিযোগ অনেকাংশে সত্য। এবং একথা অনেকটা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে তারতের আর সর্বত্রই কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে এই সব গলদ আছে, কাজেই বাংলার কংগ্রেসে যে এই সব গলদ আছে তা সহজ ভাবে ধরে নেওয়া চলে।

কিন্তু ধারা আশা দ্বীনীভিত্তিক ক্রমশঃপ্রিয়তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন তাঁদের অতীত যে এই সব অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ভেবন কথা বলা কঠিন। আশঙ্ক্য এই নূতন অভিযানে তাঁদের উদ্দেশ্য কতখানি নৈব্যক্তিক ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট সে সম্বন্ধেও লোকের মনে সন্দেহ হতে পারে, যদি কেউ কংগ্রেসকে দ্বীনীভিত্তিক ক্রমশঃপ্রিয়তার দোর থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যেই নিয়ে দাঁড়ায় তবে তাঁর কাজ মুক্ত করা উচিত তলা থেকে। গ্রামে গ্রামে অল্প কংগ্রেস অস্থায়ী ও কংগ্রেস সত্য আছে। তাঁদের ভিতর থেকে আন্দোলন শুরু করে কংগ্রেসকে নূতন ভাবে গঠন

করার চেষ্টাই হচ্ছে প্রকৃত উপায়। কংগ্রেস সভাপতি জহরলাল নেহরু বা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক লালবাহাদুর শাস্ত্রী কখন কোন দলের উপরে প্রভাব চাইবেন, তার উপরে নির্ভর করে যদি কংগ্রেসকে শোষণের চেষ্টা করা হয়, তাহলে বিবর্তন প্রবণের ব্যর্থতাই লাভ করা হবে। গত কয় বছর যাবৎ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই হাত থেকে ঐ হাতে অনেকবার বদল হয়েছে; কিন্তু এইকথা বলা চলে না যে কোন সময় কংগ্রেস সংগঠন ঐ সব দোর থেকে মুক্ত ছিল, হয়ত কখনো কখনো বেনী—এইটুকু রাজ্য পার্থক্য ছিল। তার কারণ আর সব সময় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দেশ বা সালিসীতে বাংলার কংগ্রেসের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হয়েছে, কাজেই বর্তমানের এই চেষ্টার প্রতি আশাভঙ্গ বিশেষ কিছু আশা নেই। গণতান্ত্রিক উপায় হ'ল—খোঁড়া থেকে শুরু করা;—আর বা হচ্ছে, তা হ'ল উপরত্ব কর্তৃপক্ষের নেক নম্বর পাওয়া চেষ্টা।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি নির্দেশ দিয়েছে প্রাদেশিক ও জেলা কংগ্রেস সমূহের কর্তৃত্ব ও কার্যনির্বাহক সমিতির নূতন নির্বাচন করতে হবে, কংগ্রেসের সভাপতি জহরলালের দাবার অনেক সং উদ্দেশ্য ও খোঁড়া মাকে মাকে চাপে, এই নির্দেশও তাঁরই কল। তিনি আশা করেছিলেন নূতন নির্বাচনের নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেসের ভিতর উপদলীয় প্রভাব খর্ব করতে পারবেন, কিন্তু খোঁড়ার উপরও খোঁড়াকারি করা চলে। নিখিল ভারত কংগ্রেসের নির্দেশ অল্পাংশে কংগ্রেসের কর্তৃত্ব ও কার্যনির্বাহক সমিতির নূতন নির্বাচন হ'ল। নূতন গোলমালকারী দলের একদলকে বাই দিয়ে সেই দলে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কার্যনির্বাহক সমিতিতে গ্রহণ করা হয়েছে, আর কোনই পবিত্রতাই সাধিত হয় নি। পণ্ডিতজী এখন নূতন নির্বাচনের নির্দেশ যেন এখন তাঁর উদ্দেশ্য ছিল ব্যাপক ভাবে উপলব্ধি নির্দেশে যোগ্য লোক নিয়ে কংগ্রেসকে পূর্ণগঠিত করা হবে, কিন্তু

তা হয় নি। তাই বলা চলে পণ্ডিতমহীর্ষ নির্দেশকে প্রকাশান্তরে অস্বীকার করা হয়েছে।

এবারকার আইন সভার সাধারণ নির্বাচনে বাংলা দেশে কংগ্রেস জয়ী হয়েছে। এবং এটা অনেকটা অপ্রত্যাশিত। আবার পাঁচ বৎসর পরে নির্বাচন হবে, আজ থেকে যদি কংগ্রেস সেখিকে দৃষ্টি রেখে নিজের সংগঠন ও কর্মপদ্ধতি চালিত না করে, তা হলে পাঁচ বৎসর পরে বাংলার কংগ্রেসের অবস্থা নির্বাচনে কি হবে— তা নিয়ে সম্বোধের বর্ণেই অবকাশ আছে। নিজেদের হাতে কন্ডা রাখতে হলে, একটু উজার মনোভাব নিয়ে চলা প্রয়োজন এবং বিরুদ্ধ কন্ডা লাভের পরে, কংগ্রেসের দুতন কর্তৃপক্ষ নির্ভয়ে সে রাজ্য নিতে পারতেন, তাতে তাঁদেরও মঙ্গল হ'ত কংগ্রেসেরও ভাল হত।

দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্য নীতি

তিন শত বৎসর পূর্বে একদল ওলন্দাজ দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে অবতরণ করে। সেই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার ওলন্দাজ উপনিবেশ স্থাপিত হয়। কিছুদিন পরে ইংরেজ নাবিকগণও দক্ষিণ আফ্রিকার উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য অবতরণ করে। ইংরেজ ও ওলন্দাজ উপনিবেশ পাশাপাশি স্থাপিত হলো। নেপোলিয়নের যুদ্ধের অবস্থানে ওলন্দাজ উপনিবেশও ইংরেজের শাসনাধীনে আসে। সেই থেকে সমগ্র দক্ষিণ আফ্রিকা ইংরেজের শাসনে ছিল। ওলন্দাজ উপনিবেশিগণ জন্মে বুওর নামে (Boer) নামে পরিচিত হয় এবং তারা কোন দিনই ইংরেজ শাসনকে স্বত্বস্বত্বের সহিত গ্রহণ করতে পারে নি। বুওরদের স্বাধীনতা প্রচেষ্টা ১৮৯৯ সালে বুওর যুদ্ধের রূপ ধারণ করে এবং তিন বৎসর পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার বুওর অধিবাসীদের সাথে ব্রিটেনের যুদ্ধ চলিতে থাকে। যুদ্ধের বুওর অধিবাসীদের সঙ্গে যুদ্ধ আর করতে ইংরেজদের সাম্রাজ্যকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। ১৯০২ সালে সন্ধি স্থাপিত হয়; কিন্তু ইংরেজেরা যুদ্ধে পারলো। এমনিভাবে বুওরদের বেশী

দিন বাথিরে রাখা সম্ভব হবে না। পাঁচ বৎসর পরেই ব্রিটেন ওখানে শাসন সংস্কারের চেষ্টা করে এবং ওলন্দাজ উপনিবেশদ্বয়কে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রদান করা হয়। ১৯০৯ সালে নতুন আইন করে ইংরেজ ও বুওরদের চারিটি উপনিবেশকে এক যুক্তরাষ্ট্রে পরিণত করে স্বাধীনতা দেওয়া হলো।

সমগ্র রাষ্ট্রে বুওর ও ইংরেজের সংখ্যা শতকরা ২২। ভারতবাসী ও অল্পাংশ এমীয় জাতি সমূহের লোক সংখ্যা শতকরা ১২ জনের মত এবং শতকরা ৬৬ জনের মতো স্থানীয় আফ্রিকীয় জাতীয় লোক। বুওরদের চেষ্টা হলো সমগ্র আফ্রিকাকে যেত জাতির দেশে পরিণত করা। আর শতকরা ৮০ সংখ্যক আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিবাসীদিগকে কোথাকার করে রাখা এবং সর্বপ্রকার নাগরিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রাখা, বুওর রাষ্ট্রের মূল নীতি। যেতকারদের অধ্যুষিত কোন অঞ্চলে তারা বাস করতে পারবে না। তাদের ব্যবহৃত যানবাহন বা কোন থাকার ঘর এরা ব্যবহার করতে পারবে না। কোন যেতকারদের সঙ্গে এদের কোন বিবাহ বা সামাজিক সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারবে না। এমনি বহুবিধ অপরমানুষক ব্যবস্থা এই রাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। বুওরগণ ইংরেজকে যদিও স্বত্বস্বত্বেরে গ্রহণ করে না তবুও যেতকার হিসাবে এদের বরদাশ্ত করতে এরা রাজী আছে। কিন্তু বর্ণাল (coloured) আফ্রিকা বা এশিয়ার অধিবাসীদের এরা কোন রকমেই বরদাশ্ত করিতে রাজী নয়।

বর্ণ আফ্রিকার ভারতবাসীদের অবস্থা

ভারতবাসীদের ওখানে প্রথম নেওয়া হয় চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে, কতকটা ক্রীতদাসের মতো। চুক্তির সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পর তারা অনেকেই সেখানে বসবাস করতে থাকে। যতদিন ইংরেজ শাসন বলবৎ ছিল ততদিন ভারতীয়দের বসবাস ও ব্যবসাবাণিজ্যের পক্ষে তেমন অনুবিধার সৃষ্টি হয় মাই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বুওরগণ স্বাধীনতা লাভ করার পর ভারতীয়দের উপর নানা জুলুম ও অত্যাচার আরম্ভ করে।

বহাঙ্গা গাড়ী ব্যাক্তিগত করতে হকিম আফ্রিকার যান। এই সব অনচাের বিরুদ্ধে তিনি সেখানে সভ্যগ্রহ চালাতে শুরু করেন। তখন হকিম আফ্রিকার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন স্মিটস (Smits)। তিনি উক্ত বর্গ-বিষেবী ছিলেন না। গাড়ীভীর সঙ্গে তাঁর একটা আপোষ সম্বন্ধ হয় এবং গাড়ী-স্টার্ট চুক্তিনাক্ত বাকবিত্ত হয়। কিন্তু ক্রমে উক্ত ব্যক্তিগতবাদি বৃত্তবল দেশের শাসন কনভা পায় এবং সেই থেকে ভারতীয়দের অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হতে থাকে।

বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শালান অত্যন্ত উগ্র জাতীয়তা-বাদী এবং বর্ণিত-বিষেবী। তার অল্পবয়স্ক নীতির প্রতিবাদে বহু বৎসর ব্যবৎ হকিম আফ্রিকার সঙ্গে ভারত সুনয় বারিগত সম্পর্ক বর্জন করেছে; হকিম আফ্রিকার নিকট কোন ব্রব্য বিক্রয় করা বা হকিম আফ্রিকার নিকট হইতে কোন ব্রব্য ক্রয় করা ভারতীয় রাষ্ট্রের আজ সম্ভব নয়। ইংরেজ শাসনের আমল হতেই ভারত এই নীতি গ্রহণ করেছে। সন্নিহিত রাষ্ট্র সন্মের নিকট হকিম আফ্রিকার বর্ণার বিষেবী নীতির বিরুদ্ধে নাশিণ করাও হয়েছিল। সন্নিহিত রাষ্ট্রসম্ম এই নীতির নিষা করে প্রস্তাব পাণ করেছে। হকিম আফ্রিকার প্রধান মিচারালর সুপ্রিম কোর্ট বর্ণার বিষেবাত্মক একটি আইনকে বেআইনি বলে তার বিরুদ্ধে। কিন্তু হকিম আফ্রিকা সেই সমস্ত অগ্রাক করে বর্ণার বিষেবী নীতিকে আরও উগ্র করে তুলেছে।

সভ্যগ্রহ

হকিম আফ্রিকার এই নীতির প্রতিবাদে বহাঙ্গা গাড়ীর কোর্ট সূত্র স্মিটসিয়াল গাড়ী তিন সপ্তাহ অনশন পালন করেন। ব্যাপক সভ্যগ্রহের প্রতীতি হিসাবে তিনি এই অনশন ব্রত গ্রহণ করেন। তবল ভারতবাসী নর আফ্রিকার আদিব অধিবাসীরাও এই প্রতিবাদাত্মক সভ্যগ্রহে যোগদান করবে—এই স্বাবস্থা হয়েছিল। হকিম আফ্রিকার বেতার শাসকদের যে বনোভাবের পরিচয় আমরা পেরেছি তাতে এমন

ব্যাপক সভ্যগ্রহ যে নিরুপগ্রহে পালিত হবে, এমন কোন সম্ভাবনা নেই। তাই সভ্যগ্রহের উত্তোলাপণ শেষ পর্যন্ত তাহের সংগ্রোবের পদ্ধতি পরিবর্তন করেছে। ৩ই এপ্রিল সমগ্র হকিম আফ্রিকার অবেতাল সমগ্র অধিবাসীরা বিভিন্ন স্থানে বিকোভ প্রদর্শন করে। কিছু কিছু বেতার অধিবাসীও প্রতিবাদমূলক এই বিকোভে যোগদান করে। হকিম আফ্রিকার রাইরেভ অনেক স্থানে এই আন্দোলনের সমর্থনমূলক সভা হয়েছে। নির্বিঘ্নে এই প্রতিবাদ অহুষ্ঠান পালিত হয়েছে।

হকিম আফ্রিকার বৃত্তবলের এই প্রতিক্রিয়ানীল মনোভাবের বিরুদ্ধে যে জনমত গড়ে উঠেছে তা প্রধান মন্ত্রী শালান ও তার সরকারের উপরে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে, সে সম্বন্ধে আমাদের সন্দেহ আছে। শালান ও তাঁর সমর্থকগণ হিটলার-মুসোলিনীর সঙ্গে সমনোভাবের লোক।—বর্তদিন পর্যন্ত মনের সমর্থন এবং সরকারী সৈন্ত বাহিনীর উপর কর্তৃত্ব তার হাতে আছে ততদিন পর্যন্ত বাইরের লোকের প্রতিবাদকে সে খোটেই গ্রাহ্য করবে না। সন্নিহিত রাষ্ট্রসম্ম কেবল একটি প্রস্তাব পাণ করে চূপ করে বসে না থেকে কিছু কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে থাক। আর্থিক ও রাষ্ট্রীয় যোগাযোগ কেটে দিয়ে হকিম আফ্রিকার রাষ্ট্রকে কারু করা সম্ভব এবং সেই অবিকার সন্নিহিত রাষ্ট্র সন্মের আছে। আমরা আশা করি সন্নিহিত রাষ্ট্র সন্ম ভেদনি কোন কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পশ্চাৎপদ হবে না।

সিংহলে ভারতীয়দের অবস্থা

হকিম আফ্রিকার ভারতীয়দের অবস্থা সম্বন্ধে বা বলা হয়েছে, সিংহলেও ভারতীয়দের অবস্থা আর তার অনুরূপ। সিংহলের সংগতি ও সত্যতা সম্বন্ধে ভারতীয় উৎস থেকে উঠেছে এবং বাংলা, বঙ্গ (বিহার), হকিম ভারত থেকে সেখানে সভ্যতার আলো প্রথম বার। ভৌগোলিক অবস্থান হিসাবেও সিংহল ভারতেরই অংশ সিংহলের রাষ্ট্র ও শাসন ব্যবস্থা ভারতের বার্ষ ও

নিরাপত্তার সাথে বিশেষভাবে জড়িত। কতকটা সেই কারণেই ইংরেজেরা নেশাপলিরদীর বুকের পর ওলন্দাজদের হাত থেকে এই দ্বীপটি নিজেদের অধিকারে নিয়ে নেয়। ওলন্দাজদের পূর্বে সেখানে পল্লুঙ্গ নামক অনেক কাল চলেছিল। আজও সেখানে ওলন্দাজ ও পল্লুঙ্গীয় রক্তের সঙ্গে দেশীয় রক্তের সংমিশ্রণে একটা প্রভাবশালী ফিরিনী সম্ভার আছে। এই দ্বীপে কিছুদিন আরব প্রভাবও ছিল। তার ফলে কিছু মুসলমান অধিবাসীও এখানে আছে। এই দ্বীপ ইংরেজের অধিকারে যাওয়ার পরে দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, গায়ানা প্রভৃতি স্থানের ভ্রাম্য সিংহলেও ভারতীয়দের কুলী হিসেবে আমদানী করা হয়। তার পূর্ব হ'তেও দক্ষিণ ভারতের বহু তামিল জাতির লোক সিংহলে বসবাস করছে। ১৯৪০ সালের আদম শুমারীতে সমগ্র সিংহলের লোক সংখ্যা ছিল ৫১ লক্ষ। তন্মধ্যে ষাটটি সিংহলী ৪'ল ৪১ লক্ষ এবং বাকি সব বিভিন্ন সম্ভারদের। ইউরোপীয় এবং ফিরিনীর সংখ্যা যাত্রা ৫১ হাজার। কিন্তু তাইহা আজও সেখানে প্রাধান্য করছে। ভারতবাসীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লক্ষ; ১৯৩১ সালেই প্রথম নির্বাচন হয়; তাতে ১ লক্ষ ভারতবাসীকে ভোটের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ৩৯ সালে তার সংখ্যা ২ লক্ষ ২৫ হাজার হ'ল। কিন্তু '৪২এর নির্বাচনে তা কমিয়ে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার করা হয়েছে। এখন যে নির্বাচন চলছে তাতে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ভারতবাসী ভোটের অধিকারের স্বত্ত্ব দরখাস্ত দিরাছিল। কিন্তু যোগ্য হয় ৮ হাজার ৫ শতকের বেশী এই নির্বাচনে ভোটের অধিকার পায় নি।

সিংহল সরকারের মনোভাব

সিংহল গভর্নমেন্ট একটা ভারত বিরোধী মনোভাব নিয়ে চলেছে এবং তারই স্বতন্ত্র ভারতীয়দের ভোটের ও নাগরিক অধিকার খর্ব করা হচ্ছে। এখানে বলে রাখা উচিত যে, এই সব ভারতবাসী প্রকৃতপক্ষে সিংহলেরই অধিবাসী। কারণ অনেকেই ছ' ভিন্ন পুরুষ বাবা

সিংহলে বাস করছে। এরা ভারতের নাগরিক নয়। কিন্তু ভারতীয় বংশে এদের স্বত্ত্ব, কার্য ক্ষমতার ও বৃত্তিতে হরত সাধারণ সিংহলীদের চাইতে এরা উন্নত এবং তাই এদের সম্বন্ধে সিংহলীদের একটা সন্দেহের মনোভাব সাধারণতঃ আছে। ঐধানকার ভারতীয় অধিবাসীদের একটা ক্রটির কথা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। কয়েক বৎসর পূর্বে যে নতুন শাসন সংবিধান এখানে প্রবর্তিত হয়, তাতে ভারতীয়দের দু' ভাগে ভাগ করা হয়েছিল। একদল যারা এই দ্বীপে domiciled বা অনেক দিনের স্থায়ী বাসিন্দা এবং যারা অপেক্ষাকৃত নব্যগত। নতুন সংবিধানে বলা হয়েছে যে, প্রথমোক্ত দল সম্বন্ধেই নাগরিক অধিকার পেতে পারে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা ৫ বছর বয়সের পরে এখানে স্থায়ীভাবে বাস করবে এই শর্ত নিয়ে দরখাস্ত করে নাগরিক অধিকার পেতে পারবে। অনেক ভারতবাসী এই ব্যবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে নি। সেই হিসাবে আইনগত বৃত্তিনাট্য দিক থেকে সিংহল গভর্নমেন্টের কাজের পিছনে কিছুটা বৃদ্ধি আছে। কিন্তু সিংহল গভর্নমেন্টের মনের ভারত বিরোধী ভাব থেকে যে এই সব ব্যবস্থা ও অব্যবহার সৃষ্টি হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

আম সিংহলীর ভারতীয় কংগ্রেস এই অব্যবহার বিরুদ্ধে সত্যাপ্রহ স্রব করেছে। তাতে গভর্নমেন্টকে কতটা কাঁপু করতে পারবে, জানি না। ভারত সরকারের উচিত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করে এর একটা বীজাংশা করা। ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক দিক থেকে সিংহল ও ভারতের মধ্যে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সামরিক ব্যাপার নিয়ে তা সূত্র হ'তে দেওয়া উচিত নয়। সিংহলের বোকা উচিত ভারতের বিরোধিতা করে তার পক্ষে প্রকৃত স্বাধীন সত্তা বতায় রাখা করিন। তাই এই সংঘর্ষ সিংহলের প্রকৃত স্বার্থের বিরোধী। ভারত সরকারের উচিত সিংহলকে এই সমগ্র সত্যটা সম্বোধিত দেওয়া।

শ্রীমতী প্রেস মিটিং, ৩২নং আগার সাকু'দার রোড হইতে শ্রীমতীমণি চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'দমিত্রা' কার্যালয় ৩২নং আগার সাকু'দার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

আমার
শিশুর
জানাই
এই
বার্লি



আমি যখন ছোটো ছিলাম আমার মা একথাই
বলতেন। সেরা শস্ত থেকে, স্বাস্থ্য-সম্মত
উপায়ে এবং দেড়শো বছরের পেবাইর
অভিজ্ঞতার সাহায্যে 'পিউরিটি' বার্লি তৈরি।
এই বার্লি যেমন চমৎকার, তেমন এতে
খরচও কম।

পিউরিটি



বার্লি

অ্যাটলান্টিস (ইন্স) লিমিটেড, পোস্ট বক্স নং ৬৬৪, কলিকাতা

—স্মৃতিস্মৃতি—

পঞ্চদশ বর্ষ

জ্যৈষ্ঠ—১৩৫৯

দ্বিতীয় সংখ্যা

আমাদের শশীদা

—শ্রীপদ্মকুমার দত্ত

পুণ্যের স্থল। আত্মনিবেদনেই তার সার্বকথা। তারপর কালের মোড়তুখে এক অজানা সমুদ্রপথে তার ভিন্ন বিদ্যুষ্টি। ওরই মধ্যে এই অপেক্ষের জীবনের সুবসার বাসের প্রাণের নিঃখাল বাহুরে সুমধুর ক'রে তুলেছে, তারাই একদিন একান্তে বসেছে স্মৃতির তর্পণ করতে। এ তর্পণের পৌরহিত্যে যোগ্যতা অযোগ্যতার বিচার নেই। থাকলে, এ আপনে বসতে আপনাতা আমার ডাক্তেনে না। কিন্তু শশীদার কথা বলতে ও গুনেতে আজ এই ৩০ বছর ব্যাপে আপনাতা যে আমার ডেকেছেন, তাতে আমি আনন্দিত, আপনাতার কাছে কৃতজ্ঞ।

এই ৩০ বছরের ভিতর অল্প ১৮ বছর কেটেছে আমার ইংরেজের কেলখানার। তার আগে আর যে কয় বছর খেলে ছিলাম, তার অধিকাংশ সময় শশীদার বন্ধী জীবনে। এই জীবনটা আমাদের কি করে এল, তারই কাহিনী আজ আমি আপনাদের কাছে বলব। তারই ভিতর শশীদার স্মৃতির তর্পণ করব। বন্ধীজীবন তো আমাদের আকস্মিক বা অপ্রত্যাশিতভাবে আগে নাই—কর্মের সঙ্গে কলের যোগও যেমন ছিল, তেমনি জীবনেরও যোগ ছিল।

দেশকে স্বাধীন করার কল্পনা মাথায় ঢোকে ১৯০৬-৭

সালে, তখন আমার বয়স ১২। ১৯১০ সালে গুরু-সমিতির সম্পর্কে আসি। শশীদার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় ১৯১৩ সালে দৌলতপুর কলেজে। এ কয় বছর অগ্রগামীদের উপদেশে, সহচরদের সঙ্গে পরীক্ষকে, মনকে, নির্ভীকে পৃষ্ঠ কববার সাধনার কাটে। তারপর দৌলতপুরে এসে সংকল্প করি, আপন মনে একান্তে একমল স্বাধীনতার সাধক গ'ড়ে তুলব। দৌলতপুর কলেজের নাম শুনেছিলাম আদর্শ প্রতিষ্ঠানে হিসাবে। কিন্তু প্রথম একমল ডেকেলে দেমে হতাশ ছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে আপন মনে ঘুরতে ঘুরতে মিকটবর্তী খালিশপুর গ্রামের এক কল্লের ভিতর পেলাম এক জনমানবহীন কালী মন্দির, কিন্তু সন্ধ্যার দীপ জলছে। পড়াতেনে করি, ব্যায়াম করি, সন্ধ্যা চলে বা বেশী রাত্রে এই মন্দিরে ঢুকে বসে ধ্যান করি। এইভাবে কিছুদিন কেটেছে, ছ'একটি বন্ধ জুটেছে—এমন সময়, এক সন্ধ্যা খালিশপুরে এক বাড়ীতে আগুন লাগে। হে'টেমের চারিদিকের সঙ্গে ছ'মাইল পর্ব দৌড়ে গেছি আগুন নিভাতে। সেখানে গিয়ে দেখি, বহু লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, বিশেষ কেউ কিছু করছে না। সেখানে যা পেয়েছি করেছি।

পর দিন, নিজের ঘরে ভোরেই অঙ্ককারে ব্যস্ত হয়ে
ব্যায়াম করতি, ডেজানো দরজাটি আস্তে ঠেলে ঢুকলেন
কুজসেই শীর্ণ একটি তরুণলোক, বরষ অস্থান কর্য শক্ত,
গুণ্ডা গা, হাতে একটি খটি। তাড়াতাড়ি ডাবেল বেখে
এগিরে বাজিলাম—হাতের ইশারায় বললেন, যা' করছ
কর, বলে যেমন এসেছিলেন দরজাটি বন্ধ করে দিবে
তেমনি নিঃশব্দে চ'লে গেলেন। আশ্চর্য হয়ে ভাবতে
লাগলাম, কে লোকটি।

হাজে খেছে দেয়ে ঘরে এসেছি, ছোট্টেলের হোলের
খাতা হাতে এলেন—কে তখনও চিনি না। ঘরের অস্ত
বস্তুদের কাছে শুনলাম, অঙ্কের নতুন অধ্যাপক এসেছেন,
মণীন্দ্রনাথ শেঠ—এম. এ-তে কাঠ' ক্লাস ফার্স্ট। নতুন
যিনি ছোট্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট হয়ে এসেছেন, তিনি কঠ,
ইনি তাঁর হয়ে কাক ক'রে দিচ্ছেন, দু'জনাই দোস্তলার
একটা ঘরে থাকেন।

কিছুক্ষণ বাসে, বজুরা তখন বড় ছেড়ে অস্ত ঘরে
গেছেন, একা আছি, আবার অধ্যাপকটি এলেন, গম্ভীর
কিন্তু মিষ্ট স্বরে বললেন, তোমারই তো নাম জুপেন?

"হ্যাঁ" বলতেই বললেন, সুপারিন্টেন্ডেন্ট তোমার
ডাকছেন তাঁর ঘরে।

একটু বাবড়ে গেলাম—ছোট্টেল সুপারিন্টেন্ডেন্টের
ঘরে তো তলশ পড়ে কোনো অপর্যাপ্ত করলে।

উপরে গিয়ে দেখি, তলব সুপারিন্টেন্ডেন্টের টেবিলে
নয়—ঘরের সামনে একঝানা খোলা বাতাসায় অঙ্ককারে
একই কঞ্চল আসনে। সেখানে ব'সে রইয়েছেন ভোরের
সেধা সেই কুজ, গৌরবাস্তি তরুণলোক।

মণি বাবু—পরে ইনি হ'লেন আবারের বড় আয়রের
মণিবা—বললেন, "দাদা, এই বে জুপেন এসেছে।"
অধ্যাপক, সুপারিন্টেন্ডেন্টের সন্ধান, তাবার অন্তরঙ্গতা
সবই একটু কি রকম কি রকম লাগলো।

মণিবা জুড়ে দিলেন, "এর গারে দু'খ জোর, কাল
দুই দুটো করে খড়া হু'হাতে তুলে বল এনেছে, আর
আঙুন নিভিয়েছে।"

শারীরিক শক্তির এমন একটা কাজ যে আমি করতে
পারি, তা আমি নিজেই ঐ দিনের আগে জানতাম
না। কিন্তু আশ্চর্য হ'লাম সুপারিন্টেন্ডেন্টের দু'খের
জবাবে। এই সুপারিন্টেন্ডেন্টই আমারের শশীলা।

তিনি হেসে বললেন, "গারে জোর থাকলেই যদি
যেখ শরীল করা যেত, তা হ'লে তো গোটাকতক হাতি
লাগিয়ে দিলেই চলতো। অরবিন্দের গারে জোর
কতটুকু?

লোটা এমন দু'গ নরদমন বেশের কথা, বিশেষ ক'রে
বেশের শরীলভার কথা যাটে গণ্ডে শোনা যায়। একান্ত
নিভুতে তখন দেশের শরীলভার কথা বাংলার যে
করটি লোক বলতেন, তাঁদের সংখ্যা প্রায় হাতের ক'রে
গণে বলা যেত। তার উপর শশীলার চেহারাটি এমন
যে বরষ তাঁর ৪০-ও হ'তে পারে ৬৫-ও হ'তে পারে
ও-বরষের শোকরা তখনকার দিনে দেশ একটা আছে,
তা নিয়েই বাধা বামাতো কম, তাকে আবার শরীল
করা যেতে পারে—তখন অলীক কল্লা তখনকার
দিনের শোকরা উদ্বাসাগরের অস্ত বেখে বিরহিল।
মনে মনে ভাবতি, এ লোকটি কে? তার উপর বলছেন
অরবিন্দের কথা এবং এখনভাবে বলছেন যেন ইনি
অরবিন্দের বিশেষ ক্ষেত্রে অরবিন্দের চেয়ে প্রবীণ, যেন
সত্যানন্দের মহাপুরুষ।

পরে একেই জিজ্ঞাস ক'রে জানি, ইনি অরবিন্দের
কথা বলেন নাই, বলছেন এ'রই অতি জির মিষ্ট
অরবিন্দ প্রকাশ খোবের কথা। স্বদেশী যুগের ধাতা
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ গঠনের কথা এবং পরে বাংলার
অনুহবোগ আন্দোলনের কথা জানেন, তাঁদের কাছে
অরবিন্দ প্রকাশের নাম সুপরিচিত। কাঁচড়াগাড়ার এক
আদর্শ জাতীয় বিজ্ঞানের সঠি চেষ্টার তিনি জীর শেখ
অলংকারখানি পর্বত বিক্রি করেন। সুশিক্ষিত লোক—
মহৎ প্রভাসের বার্ষিক ও দারিত্র্যের মধ্যেই তাঁর জীবনের
অবসান ঘটে।

বাই হোক, ঐ রাজ্যের পর থেকে শশীলা প্রায়ই

ডেকে পাঠাতেন। জীবনের নিগূঢ় পরিচয় খুঁজতেন।
করের বিনেয় নখোই বললেন, বই বিভানা নিয়ে আবার
ঘরে চলে আর, এখানেই থাকবি।

হোটেলে দুপারিস্টেন্টেট এবং একজন অধ্যাপকের
সঙ্গে এক ঘরে থাক।—আমার ইচ্ছা তখন ছিল। বললেন,
কিন্তু ভাবতে হবে না, চলে আর। তাবতে আমার
বেশী হয় নি, আমার দুর্ভাগ্যনার ঠিকেরই বরং মারে
যাকে বিজ্ঞ বোধ করতে হ'ত—যদিও আনন্দও
পেতেন।

পরিচয় ঘনিষ্ঠ হ'তে হুজুমান, যে কাজ আমি চাই,
সেই কাজ ঠিকেরও। ঠিকার মানে তখন তিন জন।
শব্দমালা, মণিয়ার কথা বলেছি, আর একজন, ইতিহাসের
অধ্যাপক স্নিহুত পত্র চক্র যোগ। ইনি এখনও জীবিত
আছেন।

ক্রমে শব্দমালা কাচে তাঁর নিজের জীবন কাহিনী যা
গেলায়, তা সংক্ষেপে এই :

বছর বার বখন তাঁর বরষ, সে কংগ্রেস জন্ম নেবার
প্রায় দশ বছর আগের কথা। তখন থেকে অন্তরে একটা
জ্বালা অহুতব করতে শুরু করেন এই চেবে যে, আমার
জাত গোলাবের জাত। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিন্তা জুটলো—
এই আমার অগণিত দেশবাসী—চালী মজুর, এরা সব
নিরক্ষর ঘূর্ণ। এরা যদি এমনি পড়ে থাকে, কি ক'রে
কবে এদেশ স্বাধীন হবে? চিরদাশত্ব, দুনিয়ার চোখে
কীট পতঙ্গ পত্তর নগণ্যতা—এই নিয়ে বেঁচে থাকতে
হবে—এ তো একটা জ্বালের নিয়তি হ'তে পারে না।

আত্মকেন্দ্রাতিগ এই চিন্তা, আর চিন্তার সঙ্গে
জ্বালাবোধ—এ আন্দলের জ্বালের পূর্ব বেশী লোকের
দেখিছিল না, আজও কতট। আছে জানি না।

We hate by chance, we love by accident ;
We make no sacrifice to hate or love
Within our minds presides a secret chill
Even while the flame is burning

in our blood.
(Lermontov)

চিন্তার সঙ্গে যেখানে জ্বালাবোধ ছিল, কিশোর বয়সেও
যেখানে কাজ হ'তে দেওয়া হ'ল না। সন্তোষ-বন্ধনে
কাঠবিড়ালী কাছ দিয়েই পারন্ত করলেন। হৃৎ-প্রবাস
—যারই বিজ্ঞের দেওয়া নাম 'অলীক বয়স'—তা
কোথাও কোথাও, একদিন না একদিন কাউকে
আরম্ভ করতে হয়। প্রতিবেশীরা তাকে বলে 'পাগল'।
তৎকালের এই ১২ বছরের পাগল ছেলে গ্রামের গর্তী
হুণীর ছেলে, বাদা কুলে পাঠশালার যায় না, তাদের
নিয়ে নিজের বাড়ীতে ঘরের মাঙগায় লাগা বিজ্ঞার
হুললেন। ক্রমে বয়স বাড়ার, সারাদিন কেত থামারে
কাজ করে, তাদেরও ডাকতে শুরু করলেন। মাপ
মোব কিনতে, ছেলেরের রেট, বই বোগাতে পরসার
প্রোগ্রাম হয়। পরিচিত উপার্জনশীলদের কাছে
চাইতেন। পরবর্তী জীবনে শব্দমালাকে ধারা দেখেছেন,
তাঁরা অনেকেরই তাঁর কাছে একথানা চাপার খাতা দেখে
থাকবেন। বেশ বিবেকের অনেক লোকের নাম তাঁর
ভিত্তর ছিল—কেউ বা একটাকা ছুঁটাকা, কচিং কেউ
বা পাঁচদশ টাকা নিয়মিত বা অনিয়মিত ভাবে তেবরা
কুলের জতে দিতেন। বখনকার কথা বলছি, তখনই
এই খাতার পত্তন। কিন্তু পনের কাচে চাইবার আগে
নিজের বিতে হবে। নিজের কি-ই বা আছে? বাড়ী
থেকে হুবে সোপপুর কুলে পড়তেন—টিফিনের সময় মুড়ি
বাতাসা বা বেগুনী কিনে খাবার জন্ত চারটি করে পরসার
পেতেন। খুঁব: সরে তার থেকে ছুঁটি ক'রে, কোনো
দিন বা চারটি পরসারই বাঁচাতেন।

বারান্দার ছাত্র ঘরে না। গ্রামের পথে বট-
অশ্বথের দ্বারা ঘনীভূত জারমাটি আপনাদের পরিচিত।
অবসর সময়ে ছাত্রদের সাহায্যে ওখানে
মাটি কুলে বড় রকমের—একটি বেদি তৈরী হ'ল।
শান্তিনিকেতনের পত্তন হতে তৎকাল অনেক বছর ঘেরি।
নূব উদ্ভিটার দ্বারা যোগবদ্ধ হলেও সত্যবাদী Open Air
School করবার আগে যুবক শব্দমালা সঙ্গে ঘনিষ্ঠ
বন্ধুদের বন্ধনে আবদ্ধ হন। গ্রামের কুন্ডিরান বিশদাতি-

যেহ আত্মার তখন মাকডোনাঙ্ক ব'লে এক পাদরি ছিলেন। বালকের কীতি যেহে তাঁর কৌতুক মিশ্রিত উৎসাহ ভাগলো। তিনি শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টরের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। ক্রমে আরও বাইরের লোক আকৃষ্ট হ'লেন। শশীদাসেরই পৈত্রিক জমিতে স্থানের ঘর ভেঁদী হল।

এট্টেস পাশ করে শশীদাস এক এ. পডতে কলিকাতায় এলেন। অল্প শিক্ষক তখন বিভাগে চালান। বেকারের দারিদ্র্যের জীবন যাত্র, বেশের লজ্জা কাজ করা ঘুরে ঘুরে কষ্ট, বেশের ডিঙাও তার আসে না। শশীদাস তাই সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে কৃষি ও শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থাও করতে চাইলেন। ক্রমে তেঁহার ফুলে তাঁর চালানো, তাল। ভেঁদী করা, ঘেঁষনের জটিল চাব ইত্যাদি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা হ'ল। এখানকার ছাত্রের ভেঁদী নাট্যগোড়ের তালার এককালে বেশ নাম ছিল।

শশীদাস রিপন কলেজে পড়তেন। এই কলেজের লর্ডা হুয়েল্লনাথ তখন কলিকাতার ছাত্র সনাতন ম্যাট্রিসিনি, গ্যারিবন্দির আদর্শ প্রচার করে ফিরতেন। একাডেমি বিপিনচন্দ্র পালও তাঁর সহযোগী। শশীদাসও হুয়েল্লনাথের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন। দি. বিদ্যাবিদ্য থেকে ব্যাঙিটারি পাশ করে এসে কিছুদিন রিপন কলেজে অধ্যাপকের কাজ করেন। শশীদাস তাঁর সঙ্গে পরিচিত হন। কলিকাতার কয়েকটি কলেজে, সোরাবাসান, হজিগাড়া, বেনেটোলা ইত্যাদি গলীতে কতকগুলি জিমনাস্টিক, কুস্তি, লাঠিখেলা প্রকৃতির সমিতি ও আশ্রয় পড়ে উঠেছিল। শশীদাস ঘুরে ঘুরে এগুলির সঙ্গে একটা যোগ স্থাপন করেন। এবং ব্যাঙিটারি বিদ্য সাহেবের ইচ্ছানুযায়ী তাঁর সঙ্গে এগুলির পরিচয় করিয়ে দেন। এইই একটর নাম ছিল শ্রীমহালীলন সমিতি। এই নাম অস্বাভাবিক পরবর্তী সময়ে ঘুরে বিখ্যাত সমিতির নামকরণ হয় অম্বলীলন সমিতি এবং বিভিন্ন সাহেব সেই সমিতির প্রধান সকলক নিযুক্ত হ'ল।

ঘুরে ঘুরে বিপ্লবের দীক। দেওরাটা ছাত্র জীবন থেকে শশীদাস জীবনের ব্রত হয়ে ওঠে। বিপ্লবের উপায় হিসাবে শশীদাস নিরঙ্কুলেন শিক্ষা প্রচার। এই উত্তর কাজে অনিহন পরিপ্রয় এবং নিজহাতে লষ্ট বিভাগের লজ্জা বাওদাদাওয়ার পরশ। থেকে পরশ। ইচ্ছানো—এই সঙ্গে মিলে অল্প বয়সে শরীর ভেঙে পড়লো। বালদেহিয়ার ফুলে ফুলে ইচ্ছানীতে থললো। এক এ. পাশ করার পর আর পড়া চালাতে পারলেন না, তখন থেকে বাহ্যের লজ্জা এখানে ওখানে ঘুরতে লাগলেন। কোথাও বা বিভাগের শিক্ষকতা করেন, কোথাও বা গৃহশিক্ষকতা। যেখানে বান, সেখানেই শিক্ষাব্রতী সংগ্রহ করেন, নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়েন, আদর্শ শিক্ষাপদ্ধতি সেখানেতে চেষ্টা করেন। নদীরা জেলার ব্রহ্মসামনে, গরাত্তে ও ঘুরে ঘুরে উচ্চ ইংরেজি বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। সত্যাবাদী Open Air School প্রতিষ্ঠার পূর্বে থেকে মহাভোগ গোপবন্ধু বাসের সঙ্গে শশীদাস বন্ধু হন। উদ্ভিদ্ধার তাঁর কনিষ্ঠ অল্পবয়স্ক বন্ধুরা আশ্রয় অনেক সেখানকার প্রতিষ্ঠানবান রাজনৈতিক ও সমাজকর্মী।

তাঁর এই অকল্পিত দেশপ্রেমী ও সমাজসেবা দৌলতপুর কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রহ্মলাল চক্রবর্তীর লজ্জা আকর্ষণ করে। ব্রহ্মলাল আদর্শ প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবার প্রেরণার শশীদাসকে দৌলতপুর নিয়ে আসেন। এই ভাবেই তাঁর দারিদ্র্যলাভের সৌভাগ্য আবারের ঘটে।

দুঃস্বভাবে বিচার করে যেহেতে গেলে কিছু তাঁর সঙ্গে আবারের একটা আশ্রয়গত পার্থক্য ছিল। বলতে গেলে তিনি ছিলেন দুঃস্বভাবী সাধক, আবারা ছিলেন হিন্দুস্তান। আবারা তখন 'পড়তার লজ্জা' ওয়াশিংটনের জীবনী, তিনি আবারের পড়াতেই দুঃস্বভাবী ওয়াশিংটনের জীবনী—Up from Slavery, পরবর্তী জীবনে দুঃস্বভাবী, তিনি চাইতেন গাভীজির বড়ো বড়াজে তলা থেকে এবং ভিতর থেকে গড়ে তুলতে।

এ পার্থক্য অবশেষে বনে অল্পবয়স করতায়। কিছু প্রাপ্তের চান তাতে কোনো দিকেই কন পড়েনি

শশীদার বুকেই তুনেছিলাম, ১২ বছর বয়সে যখন তেওঁরা পেকে লোণপুর ফুলে যেতেন, রাত্তার একটা কালভাট ছিল—কোনো ইংরেজ কর্কচরীর নামে কালভাটটির নামকরণ হয়েছিল, এবং নামটা কালভাটের গায়ে খোদাই করা ছিল। এটা আভের গোলাঘর একটা পরিচয় ব'লে শশীদা একদিন একখানা ইট দিয়ে হুঁকে হুঁকে ও নামটা ওখান থেকে মুছে ফেলেন।

গোলাঘর বিলুপ্ত সেই জুগে এই বার বুকের আলার পরিচয়, তিনি যে সুরেক্সনাথের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে ম্যাটসিনি, গ্যাব্রিখভির আদর্শ প্রচার করবেন সেটা আমাদের কাছে মনে হ'ত স্বাভাবিক। তেমনি স্বাভাবিক মনে হ'ত তাঁর ম্যাটি খেলার সমিতিগুলোর সঙ্গে পরিচয়। সেই সঙ্গে তিনি যখন আদর্শ হিসেবে বলতেন, অল্প কোনো চাকরী বাকরী করবিনে, সংকল্প কর, আদর্শ শিক্ষাত্রী হ'বি, দেশে বিদ্রোহী সৃষ্টি কর'বি, আমরা হলে বলভায়, আপনায় এ বিদ্রোহ হবে কোন যুগে?

এতে যেমন শশীদাও ছুঁৎ করতেন না, আমরাও তেমনি বীরে বীরে বুঝলাম, শুধু মাত্র বোমা পিস্তল দিয়েই আমরা দেশ স্বাধীন করতে পারব না। এ বুদ্ধি আমাদের কি ক'রে এল, তার ঘটনার কথাটুকু আজ আপনাদের কাছে বলব।

গুপ্তযুগের পরাধীন আভের কয়েকটি মহাপ্রাণ তরুণের মনে জেগেছিল সেদিন জাতির রাস্তা বুঢ়াবার জন্ত এক অঙ্ক আবেগ। সেই আবেগের বশে শশীদা একদিকে যেমন পরিচিত হয়েছিল তন সোসাইটির সত্যীদ বুখাজী, প্রথম বুখাজী, কালিওদার দালভন্ত, রাবাকুদ বুখাজী, রাধা কবল বুখাজী, বিনয়কুমার সয়কার প্রকৃতি নিকারভীর সঙ্গে, তেমনি অপরদিকে আকুই হয়েছিলেন ঐশ্বরবিন্দু প্রতিষ্ঠিত যুগান্তের ও বাণিকতলা বাগানের করীদার প্রতি। এঁদের তিনের তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হয় রাণবিহারী বোমের সঙ্গে ও জ্যোতিষনাথ বুখাজীর সঙ্গে।

বাণিকতলা বাগানে বাধীন বাবুদা যখন ধরা পড়েন রাণবিহারী বুখানা চিঠি সেখানে পুলিশের হাতে পড়ে। জ্যোতিষনাথ বলেন, রাণবিহারী বাবুর ধরা দেওয়া চলবে না। শশীদা তখন পি. এন. ঠাকুরের বাড়ীতে গৃহ শিক্ষকতা করেন। ছেলেদের নিয়ে এই সময় শশীদার বেড়াছেন বাবার কবাহর। কিন্তু রাণ বিহারীর এই সংকটের কথা জেনে শশীদা ও চাকরী ছেড়ে দেন, রাণবিহারী বাবু গৃহশিক্ষক হিসাবে বেড়াছেন চ'লে যান। সেই থেকে লর্ড হার্ভিলের উপর বোমা পড়া ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে রাণবিহারীর জিহাফলাপ সম্পর্কে লকল কাছিনী আজ যেনবাসী জেনেছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে যখন জার্মানীর সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষে বিদ্রোহের চেষ্টা করে, তখন জ্যোতিষনাথের দৌলভদ্রুর কলেজে স্বাভাৱত লোক হয়। শশীদার পাশের ঘরে জ্যোতিষনাথের পরিচিত একটি চেলে থাকত। তিনি তার কাছেই এসে উঠতেন। কিন্তু আসন বিছাতেন শশীদার বয়সার পাশে। সেখানে কথা বলতে বলতে কখনও তাঁর হয়ে যেত। তাঁরের ট্রেনে জ্যোতিষ বা চ'লে যেতেন।

সবাই চ'লে যাবার পর গভীর নিশীথে একদিন কথা হচ্ছে। একলা আমিই ছিলাম। উর্দু আকাশ থেকে অল্পশ্রেরণা নিয়ে যেন জ্যোতিষদা ব'লে যেতে লাগলেন, আভাভের পর আভাতে বেশ এগোবে। বাহুগোপাল মনে করে, একটা সভবত্বের ফলে, যেদী সৈন্তের সাহায্যে এক ধাক্কাতেই দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে। আমরা তা মনে হয় না। আমরা ধারণা, প্রকুর আর কুদ্রিয়াম, সন্তোম জায় কানুই—একক চৌধুর, নিকেরা ন'রে দেশের অনেক লোকের জাগরণে সাহায্য ক'রে গেছে। আমরা আজ জার্মানীর কাছ থেকে অল্প গেলে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করব। কিন্তু এতেই দেশ স্বাধীন হবে যাবে, আমি মনে করি না। আমরা যদি দেশের বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলি লোক বুদ্ধ ক'রে করতে পারি, যেনবাসীর আদু বিদ্বাস আগবে, তারা সিংবে, কি করে

ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে যেথাকে স্বাধীন করতে হবে।
এখানেই আমাদের মুক্তার সার্থকতা। এমনি ক'রে
আমাদের মুক্তার কলে যেথের জনসাধারণ দেশের
স্বাধীনতা চাইতে নিশ্চয়। তখন এ জাতকে স্বাধীন
ক'রে রাখতে পারে, এমন শক্তি ইংরেজের নেই।

এই ভাষিত জার্মান স্বতন্ত্রের সম্পর্কে আমাদের
কীবন কর্তব্য হল যে ওঠে এর কিছু পরে। ইতিমধ্যে
কিছু আমাদের কীবন একমাত্র ঘোষা পিতৃদের ব্রত
সম্বল হয়ে উঠতে পারে নি শ্রীমাদার সংস্পর্শে এসে।
এই সংস্পর্শে এসেই কীবনে মুক্তি—

If our thought has changed to
dream, our will unto desire,
As smoke we vanish though the
fire may burn,

(A. E.)

পরবর্তী কীবনে মহাত্মা গান্ধীকে বলতে শুনেছি,
My life is my message—আমার কীবনেই আমার
বাণী। কীবনে একান্ত কাছে বাদেব পেয়েছি, তাঁদের
ভিতর প্রথম শ্রীমাদাকেই দেখেছি, আত্মরূপে জোয়ারাঙ্গীর
ধর্ম বন্ধিতের বীণের মতো প্রতি মুহূর্তে অনিবার্য রেখে
তার সামনে ভিলে ভিলে নিজেই নিঃশেষে বলি দিতে।
আমাদের মৌলভপুরের কীবনে এর যে জিহ্বাইকু দেখেছি,
তাই আমাদের চোখের সামনে ধরতে চেষ্টা করব।
তিনি কবা মিরে আমাদের তেমন দেখান নাই যেমন
নিখিরয়েন প্রতিদিনের কীবনের কর্ম মিরে।

মৌলভপুরে প্রথম গিরে দেশের কাজ করতে পারে
এমন যে কবচি কিছু পাই, তার ভিতর হু'একজনকে
সেখলায়, বাঘের বাড়ী থেকে পাওয়া টাকার গুদামকার
বড় ভালোবাসে। হু'তিনজন বন্ধু মিলে কিছু কিছু
দিতাম। সে আর কতো? এর পর নজর পড়লো
poor fund-এর দিকে। তার আর দেখলো অতি
সাধারণ। অপর দিকে সেখলায়, হু'উতে কলেজ থেকে
যে সব অধ্যাপক বা রাজ বাড়ী বান বা বাড়ী থেকে

আসেন, তাঁদের মালপত্র ঘরে নেবার মত সুবিধা পাওয়া
যক। সুবিধিত ক'রে কয়েক বছরে কিছু কিছু
উপার্জন শুরু করলাম। শ্রীমাদার উৎসাহ-বেগে গেল।
দীর্ঘ দুই মাসের সময় যখন তার সব ছাত্র অধ্যাপক চ'লে
যান, তখন কলেজ কর্তৃপক্ষকে বলে তাঁদের গরুর পাকী
আমাদের দিলেন, তাকে ভালো পাকী ক'রে আমরা মাল
আনা নেওয়া করলাম। কোনো কোনো অধ্যাপক
সুবিধে আমাদের হু'এক টাকা বকশিশও দিতেন।

শ্রীমাদার অল্প দিকে নজর পড়লো। কলেজের
কতকগুলো বাড়ী তখন সব ঠিকঠাক হয়েছিল, ইদানীংকার
মুহুর্ত বাগান আর lawn তখনও ছর নাই, অনেক
জায়গার শুষ্ক বাবা ভোবা আর জল। কর্তৃপক্ষ
সেগুলোকে সমান করার আর পরিষ্কার করার কথা
তাবছেন। শ্রীমাদা বললেন, ছেলেদের সুবিধে কোলাস
দিন, আর একটা যেট ধ'রে দিন। কর্তৃপক্ষ আমাদের
মাগে রাজী হ'লেন। মাটি কাটা আর সুবিধে বস্তার সে
কি উৎসব লেগে গেল। আমরা হু' তিনজন ছিলাম,
যারা সুবিধে উপর সুবিধে তিনটে পর্যন্ত সুবিধে মাটি
বইতাম। পরস্পরের মাগে মাটি চেলে দিতাম।
বেলায় ভিতর মিরে কাজ, কাজের ভিতর মিরে আনন্দ
উপভোগ—শ্রীমাদা, সুখ দেখে মিরে শ্রীমাদা সে আনন্দের
জাপী হতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে কোলাস ঘরে
মাটি কাটতেন, মাগার করে সুবিধে বইতেন। সঙ্গে সঙ্গে
মিলি, পরতমা, ডাঃ মুগল খাচা, অধ্যাপক কাবাখা চরণ
নাথ, অধ্যাপক বিজয়র বালাজী, আত্মও অনেক
অধ্যাপক আমাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। শ্রীমাদা যেদিন
মহীরের ওপর সুবিধে বইতে পারতেন না, সেদিনও কাছে
ব'লে দেখতেন, আমাদের উৎসাহ দিতেন।

শ্রীমাদা বলতেন, বাঙালীর হেলে দিনে যদি অল্পত
ছর-বটা শারীরিক পরিশ্রম না করে, তা হ'লে বাঙালী
জাত ধ'রে বাবে। আমরা কয়েকজন ছিলাম, দুটি
দিনে শ্রীমাদা আমাদের ৬৭ বটা মাটিয়ে নিতেন। মাটি
কাটা ছাড়া ছিল জল পরিষ্কার করা, দৌড় ক্রীণ,

পুকুর বা নদীতে নেমে সাঁতার কাটা। কুশীরের গুয়ে তৈরবে নেমে সাঁতার কাটা নিষেধ ছিল। সে নিষেধ আমরা ভাঙি। আকাশে মেঘ দেখলে কলেজের নৌকো গুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়তাম। নৌকোর উপর রক্ত-টানাটানি (mug-of-war) করে নৌকো উটে দিতাম, তার উপর পরস্পরকে তাড়া করতাম। এসবের অল্প কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে শাসনের কথা কখনও উঠতো না, কারণ, শশীমা ছিলেন আমাদের সাথেই সান্নিধ্য। ছুটিখণনাও তাই আমাদের ভাব্যতা বা সংস্কারের সীমা রেখাকে অতিক্রম করতো না।

কলেজ কর্তৃপক্ষ আমাদের মেহই করতেন। তার আর একটা হেতু ছিল রোগী গুজব। প্রধানতঃ শশীমার তত্ত্বাবধানে সৌন্দর্য্য কলেজে যেমন নিয়মিত ও আত্মরিক্ততার সাথে রোগী গুজব। চলতো, তেমন খুব অল্প কার্যগতই দেখেছি। আনপাশের গ্রাম থেকে ছুই ছাত্রদের অবস্থা রাত্তা থেকে হুড়িয়ে এনেও রোগীকে হোটেলের বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা ও গুজব করা হত।

এমনিভাবে দিন কাটছিল, এর ভিতর এসে পড়লো স্বাধীনতার সাহাবো বিপ্লবাবোলম। ইতিমধ্যে ডাঃ বুলগ আচা বিলেত চলে গেছেন, তাঁর কার্যপার এগেছেন ডাঃ অল্লা উকিল। তিনিও আমাদের দলে। তাঁর নেতৃত্বে ভোর থেকে বিউগল বাজিয়ে মিলিটারি প্যারেড চলে, খোড়ার চড়া, নৌকার বাচ বেওয়া হয়। বুলনাতে মিলিটারি পুলিশ হাত করার চেষ্টা হয়, সারোংদেং সাথে ভাব করে আহাৎ চালালো দেখা হয়। অধ্যাপক ছাত্রের দলে বশোর বুলনা দু জেলায় ক্রম দল বাড়াবার চেষ্টা চলে। এই উদ্দেশ্যে স্থলে স্থলে গুরে অধ্যাপক ছাত্রের দলে ম্যাজিক লর্ডন নিয়ে বক্তৃতা দেওয়া হয়। আবার অল্প শশীমা সন্ধ্যার ভিতর থাকতে পারেন না। তাঁর উৎসাহ উদ্বীপনা আমাদের প্রেরণা যোগায়।

* * *

দলের ছাত্রদের অনেকের বাড়ীর অবস্থা এমন যে পড়া চালালো শক্ত। এর অল্প বেকাবে আমরা উপার্জন

করতাম, সে কথা আগে বলেছি। একটা ছুটিতে করকতনের সম্পর্কে এমন খবর এল যে তাঁদের বুঝি আর বৌলতপুরে রয়ে রাখা যায় না। বাড়ী থেকে খরচ চালাতে পারবে না। ছুটিতে আমি হোটেলেরই রয়ে গেছি। ডাঃ উকিলকে বলতে তিনি বললেন, তেবে দেখ, কি ব্যবস্থা করা যায়। একসা রাত ভোগে ছাদে ঘুরতে ঘুরতে একটা বুড়ি মাথার আসে। অমূল্যদাকে বলি, আমাদের দলের ভেলে যারা, তাদের সবাইকে যদি একটা বেলে এনে দিতে পারেন, বাড়ী থেকে যার বা টাকা আসে একত্র করব, কলেজের লাইনে, বেশের ঘর তাড়া মোটা বা লাগে দিতে দেব। তারপর বা টাকা বাচবে, তা থেকে আলুসেজ ভাত হয় বাব, ডালভাত হয় খাব। প্রত্যাহটা অমূল্যদার ভাল লাগলো। শশীমার উৎসাহ হয়ে না। যদিয়ারও আনন্দের সীমা নেই। একাত্রে শব্দদাকে প্রয়োজন। টেলিগ্রাম পেরে তিনি এসে খেতুবাবান মেলটাকে বালি করলেন, লেখানকার ছাত্রদের বুঝিয়ে শ্রুতিয়ে এখানে ওখানে স্থান করে দিলেন। বাংলার সামান্য নীতিতে প্রথম মেগ হ'ল। শশীমা মাঝার উপর থাকতে আমাদের পরস্পরের সম্পর্ক এমন ঠাড়ালা। যে, কোনো পরিবারের ভিতরও অন্তরানি দ্বন্দ্বতা সব সময় থাকে না। —বিশেষতঃ যদি সেটা অতাবের সংসার হয়। আমাদের কিছু কাগজ দ্বা বা পত্রও শু'একটা ট্রায়ে ভরা থাকতো। —যার বখন বা প্রয়োজন হত নিয়ে নিত—বাক্তিগত প্রায় কারও কিছু ছিল না। কিছু একদিকে শারীরিক পরিপ্রভ প্রচুর, রোগী গুজবার রাত্তাপা প্রায় লেগেই আছে, তার সঙ্গে বাওরাভাওরার ঐ দ্বন্দ্ব—সবাইই পরীক্ষার ধারণ হতে ছু হ'ল। তখন অধ্যাপকরা এগিরে এলেন, কেউ বা একবেশার অল্প ভিন্ন কিনি বেন, কেউ বা আর একবেশার গুজ্ব বাচ।

অধ্যাপকদেরও এই খেঁচ লাহুত্বিত সচরাচর দেখা যায় না। বৌলতপুরে এর একটা চরম পরীক্ষাত এক সময় হয়ে গেল। দাশোদরের বক্তা—আমরা একদল

গেছি সেবার কাজে। দারোয়ান বস্তার এই সেবার কাজ সম্পর্কে পুলিশ কি রিপোর্ট দেয়। তার কলে কলেজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজবাবু মনস্থ করলেন, শশীদাকে কলেজ থেকে পদচ্যুত করবেন। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক কামাখ্যাবাবু সহ আটজন অধ্যাপক সংকল্প করেন, তাঁরা চাকরী ছেড়ে বেবেন। সংবাদ পেয়ে ব্রজবাবু নিভৃত হন।

পরবর্তী জীবনে ভাণ্ডি অতিথানে গার্ভীজিকে ঘেঁষেছি নোয়াখালী ও বিহারের সর্বত্র এবং অল্পজ্ঞ, কাজ হতোই থাক, ছুবেলা সবেবেত তাতে উপাসনা করতেন। শশীদা যোগে সকাল সন্ধ্যার আরাধনের বস জনকে শেখতেন সঙ্গে নিয়ে প্রার্থনার বসতেন। তপস্বানের অভিক্ষেপে বিখ্যাত কেউ হোক বা না হোক, তার সঙ্গে এই প্রার্থনার বসার কোনো যোগও ছিল না, বিবাহও ছিল না—যিনি যেমন বুনি গ্যান বা উপাসনা করতেন—উদ্বেগ ছিল আত্ম-নিবেদন করা, আত্মপূর্ণের সঙ্গে নিত্যযোগ করার রাখা। শশীদা নিজেও বা পারতেন উপাসনার সময় গান গাইতেন, অল্পবেতও তেমন গান করতে বলতেন।

মৌলভীগুরের আরাধনের তখনকার দিনের জীবনের কথা শুনে বাইরে থেকে কেউ কেউ বেগতে আসতেন। কটকে থাকতে হুতাবচ্ছ শশীদার নাম তনেছেন। এই সময় তিনি বলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আই. এ. পড়েন। চাঃ হুশেণ ব্যানার্জীর সঙ্গে মৌলভীগুরে বাঙলা আসা শুরু করেন। প্রথম দিন তোরের প্রার্থনা চলছে, শশীদা তাঁকে গান গাইতে বলতেন, খোলা জানালার ধাঁকে প্রথম সূর্যের আলো পড়েছে মুখে, দুজনে গান গাইছেন—

চিহ্নায় সব রানস হরি তিগুন নিভজন।

নিরীক্ষিত চোখের পাতা ঘেরে বারা গলছে, চারুতা জানলার এগে বেগছে তে এই নতুন লোকটি গান পার।

প্রার্থনার পর শশীদা দুজনেকে বলেন, এমন এককথাটি চোখের চলেবে না, কোমল ব্যয়ি চল।

অপটুহাতে কোমল হয়ে সলজ্ঞ গভীর আনন্দের হাসিতে হুতাবের চোখের উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। মৌলভীগুরের জীবনে—বিশেষতঃ আরাধনের মেগের জীবনে—হুতাবকে আকৃষ্ট করে, মাকে মাকেই তিনি আসতেন।

বর্ষ থেকে কিকিৎ অবসরের বা খিপ্রানের জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত ছিল শশীদার ব্যানের জীবন। যোগাসনে বসে থাকতেন। বা চান না, এমন কোনো কামনা বাসনা মনে এগে, প্রতিষ্ঠা, প্রশংসা বা মান প্রতিপত্তির আকাংক্ষা জাগলে “না” “না” ভেবে উঠতেন। বাবের আপন ব’লে মনে করতেন, তাবের তিতর তিলেক কাকির তাব বেগলে কাদতেন। এই মরদ যোগে বিবে পরকে আপন করতেন।

কোমলে কঠোরে মেগানো অমৃত চিত্র ছিল শশীদার। নিজের মাঝে একটু হুবিহার তত্ত্ব মন জনের অন্তর অহুবিধা বটাতে আরাধনের আটকার না। শশীদাকে দেখেছি, নিজের বড়ো অহুবিধা বা বঠই হোক, নিজে উঠলে পাছে পাশের লোকটির বুঝ ভেগে যায়, তিনি সব কিছু গুরে থাকতেন। নিজের হুবিহার তত্ত্ব অগুরের অহুবিধা নষ্ট করার বৈশিষ্ট্য, তার মধ্যে শশীদা বেগতেন শিক্ষা সংগতির অতাব। আবার আবার তত্ত্ব অত্যাগ ছিল কোনো গুরুতে ভোর ও টার, কোনো গুরুতে ও টার—ঐ সময় আবার কতকগুলো কাজ থাকতো—আবি রাত ১২ টাতেই শুই আর ১ টাতেই শুই, ঠিক সময় হতো তুলে গিতেন।

নীচতা, অসততা আককের সমাজে আরাধনের প্রা-সত্তা হয়ে গেছে। চোখের লাননে বেগলে কখনও বা কোথাও থানিকটা উজ্জ্বল প্রকাশ করে বা গলমল করে আরাধনের কর্তব্য সম্পাদন করি। কিন্তু শশীদাকে দেখেছি, ট্রেণে, ট্রামে কেউ পরমা কাকি দিলে—বা ঐ মরপের অল্প রকম নীচতা বেগলে তাঁর খেন-শুক কেটে বেত। সময় বা কথা বিবে কথা ঠিক না রাখা এবং তার অল্প-ক্রমাখত অহুহাত বেগুরার ভিতর শশীদা সেগতেন কাকিখাতি, insincerity, শশীদার কাগে লখ

চেয়ে বড় পালাপালা ছিল hypocrite বা কপট।

শশীদার সমগ্রই ছিল যেন একটা civic sense-এর—সাধারণের কর্তব্য জ্ঞানের—পাঠশালা। বারান্দা দিয়ে যেতে যেতে বানিকটো আবর্জনা দেখলে, পদ চলতে কোথাও ঠাঁটা পড়ে রয়েছে দেখলে, সেগুলো পরিষ্কার না ক'রে এতদেন না। বেখানে সেখানে খুঁ খেলা, কলস-অগলি ছেড়ে দিয়ে বলে দাত বাজা—এই ধরনের স্বভাবগুলো তাঁকে বাধ্য দিত। এমনি সব ছোটখাটো আচার বাবহারের ভিতর দিয়ে তিনি মানুষ চিনতেন, আর মানুষ গড়তেন—এই সব ছোট জিনিষের প্রতি সদা সজ্ঞিত নৃষ্টি দিয়ে একটা মহৎ প্রাপের পরিচর দিতেন। যে সব জিনিষে জীবন গড়ে, তার কোনো ছোট জিনিষই তাঁর চোখে ছোট ছিল না। ‘অম বরলে সদগুন সকলের ভিতরই অনেক কিছু থাকে, কিন্তু তার সাধনা নেই, তার কিছুই নেই।’ যে কোনো গুণই হোক তাকে বজায় রাখতে, সড়ে তুলতে জীবনে প্রতি মুহূর্তের সাধনা প্রয়োজন—এইটাই শশীদার জীবনের শিক্ষা।

আর্য্যগ্রন্থিতা, বিলাসগ্রন্থিতা শশীদা সইতে পারতেন না। এক-এ পাশ করে তিনি গড়া ছেড়ে দেন। কিন্তু ইংরেজি লেখার, বলার এবং বিশেষ ক'রে উচ্চারণে তাঁর সমরক তখনকার বা এখনকার অধ্যাপকদের ন্যেও কম দেখছি। ‘তাঁর একখানা গ্রন্থ বই ছিল Goldsmith-এর Vicar of Wakefield. বিকেলে নটি কাটতে বাবার আগে কিছু সময় এই বইখানা তিনি আবারের পড়াতেন। এই লম্বাটো আবারের কিছু খবার প্রয়োজন হ'ত—হুড়ি, চিড়ে, ছাতু, ভিজানো রোসা বা হোক কিছু যেতায। কোনো অধ্যাপক বা কোনো বন্ধুর কল্যাণে কোনো দিন হরতো কিছু ভাল খাওয়াও ছুটে যেত। এক বন্ধু ছিলেন, ভাল খাওয়ার মিকেই তাঁর কৌক ছিল। যেদিন আমাদের হুড়ি ছুটতো, সেদিন তিনি খেতেন না, বলতেন, হুড়ি যেতে আমার জিত হ'তে যার। কথটা শুনে কি বাবার রান হানিই ছুটলো শশীদার মুখে। পরে এক সময় মিত্তে বললেন, ‘আজের আজ অগনিত মানুষ আছে—বারা হুঁৎলা হুট্টো হুড়ি পেলে বেঁচে যার; আর এ সবক, কলেজের ছাত্র, অবস্থাও এমন

কিছু ভাল নয়, বরং প্রতীকই। কথটা বলতে লজ্জা হ'ল না যে হুড়ি খেলে জিত হ'তে যার! এ কথা পরে ঐ-বন্ধুটিকেও ব'লে শশীদা ভিতরকার করেছিলেন। কিন্তু লাভ হয়নি কিছু।

শশীদা তাঁর জীবনে, কথার হুকিরে বিস্তেন আরাম-গ্রন্থিতা, বিলাসগ্রন্থিতা নিয়ে স্বাধীনতার সাধনা চলে না। আজ হুড়ি, স্বাধীনতা পাওয়া নানেন আরাম আর বিলাস উপভোগের প্রবেশ নয়, দারিদ্র্য-দেবার প্রবেশ। এইখানটার ভুল বুকে আরাম আর বিলাস, পদ আর প্রতিষ্ঠার লালসাকে বাড়ির বোকা ক'রে তারের বেগে আজ আততন্ত কোথার যে আমরা টেলে চলেছি, জানিনে। এ যাত্রা যদি অচিরে না বাবে কোথার কখন যে আমাদের ত্যাগচুরি হবে তাই ভাবি।

শশীদাকে একাধ আপনার ক'রে পেরেছিলাম যেনের অস্ত্র সন্ন্যাসের সীকার ভিতর। আচার অহুতান পূজা পার্বণ, জাতি ধর্মের ভোগভোগ—এই সব নিয়ে যে হিন্দু ধর্ম, সে হিন্দু ধর্ম তাঁর ভিলেক আরা ছিল না। এমন নিয়ে যার: বেশী মাথা মাথাভো, তাঁদের সম্পর্কে একটু কলশার হাদি হাসতেন—বদিগ বুগলার, অনুবাদ। দৌলতপুর কলেজের দেকালের জাতিভেদের অচলোত্তন ভাঙতে আমাদের সাথে নিয়ে যাকে যাকে যে সব কুকক্ষেত্র কাণ্ড মাথাভেন, তাতে শশীদা শিচিরে না থাকলেও যেন খুঁ উৎসাহ পেতেন না। কিন্তু হিন্দু ধর্মের যেটি সার কথা—ভ্যক্তেন ভূজীবা, ভ্যাগের যারা জীবনকে উপভোগ কর—এতে ছিলেন তিনি গভীর বিশ্বাসী। তাঁর সেবার জীবনের বুল এখানে, দরিদ্র্যাকে ক্ষোভ-বরণ ক'রে দেবার তাঁর প্রেরণার উৎস এখানে। সেবাবাদীর সৌব, সনুছি, হুখ, শান্তির জন্য স্বাধীনসত্তর সংগ্রাম। সেই সংগ্রামের উদ্দেশ্যে শিক্ষাও সেবার ব্রত। কিন্তু সে সংগ্রামের সৈনিকের কন্যা যুধ নয়, শান্তি নয়, সনুছি নয়, বিলাস নয়, তার জন্য চিরদারিদ্র্য, ক্ষোভার বরণ করা হুখভোগ। সেই দারিদ্র্যের জীবনে হুখের-জীবনে যে আনন্দ ব'লে না পার, বিপ্লবের ক্ষেত্রে সে বিশ্বাসের অবোধ্য—শশীদার জীবনে, কথার এই বিশ্বাসই পেরেছিলার। সন্ন্যাসের আদর্শ হিলাবে অস্ত্রবরণের গ্রন্থ কথাই শশীদা বলতেন, সমাধ খেতে বাচায়। যে মুহূর্তটি তার কাকে বা চিত্তার বা তাঁর

কাজের যোগ্যতা অর্জনে না লাটে, সেই ব্রহ্মচরীই তার কাছ থেকে চুরি করা যন। এই চুরি করা যনেরই উল্লেখ করেছেন উপনিষদকার বেদানে বলেছেন, যা গৃহ; কস্তা বিদ্বদন। অর্থাৎ একটি কথার উপর জোর দিচ্ছেন, Think not of the morrow, কাল কি খাবি আজ তার জন্যে ভাববিনে। নিজের জন্যে উপার্জন করবিনে, তিক্যার লবল করবি। কিন্তু নিজের স্বাস্থ্যবশ হেড়ে যতদিন না বেরতে পারবি, ততদিন তিকা করবার বা অপরের কাছে চাইবার অধিকার নেই।

এরপর, তিকা করার প্রথম হাত পাকাই এই তেজরাজেই, শশীদার বাড়ীতে বসেই। তেজবাব তখন অনেকবার এসেছি। ফুলের ঘরখানি ভেঙেচুরে গেছে। শশীদা বললেন, তোরা করজন বা, কাড় থেকে দাঁল কেটে খুঁটি লাগ সব ঠেঙা কর, আমি এলে খড়ের ব্যবস্থা করব। আমরা পাঁচ ছয় জন আলা দ্বির করলাম। কিন্তু শশীদাকে বললাম, আমরা তো এক একজন ভিন জনের ভাত খাব, আপনাদের বাড়ীতে আকাল লাগিয়ে ছাড়ব। এটা ফুলদার বিলম্বত বাবার ঠিক আগের কথা। সমস্তার বীমাংসা করলেন তিনি। বললেন, আমিও যাব—আমরা দু'জন করে তিক্যের বের হব, বাকীরা কাজ করবে। তলিকাতা থেকে সাবী ছুটলেন দুজনের কটকের এক বন্ধু—সখ্যাক হুখাখি। কৌচায় খুঁট গায়ে দিয়ে লম্বাক চমৎকার হয়ে বলতেন, চারটি তিক্যে বিন না যা। বেশ পানও গাইতে পারতেন। আশেপাশের গ্রামবাসীরা দু'দিনেই আসে নিলেন এই ভিখারীরা সব শশীদার চালাচালুজ্ঞ—কোনো গল্পলোক বা একপের সেতসের চাল দিয়ে দিচ্ছেন, কোনো মহিলা বা চালে সব কিছু ভরকাহিও। তরকারি যেদিন না ছুটতো, শশীদার আমপাচের ভলার উঠন খুঁড়ে রান্না করতাম, গাছ থেকে গোটা কস্তক কাটা আমি পেড়ে ভাতে সিদ্ধ দিয়ে নিতাম। শশীদার দাধা উষ্মচক্র তখনও বেঁচে আছেন। রুদ্র আভ্যরিক যথা শেতেন—উজ্জনের পাশে যগে থাকতেন, চোখ দিয়ে জল গড়াতে—বলতেন, আমি কি ছোটো ভাতও ভোমারের দিতে পারিনি? আমাদের পক্ষে তাঁকে সাধনা বেড়ান্য কষ্টকর হ'ত। শশীদা বাড়ীতে এসে তাঁকে বুঝিয়ে পাও

করলেন।

এর কিছুকাল পরে আমাদের জীবনে বড় উঠলো, পাল ছিঁড়লো, হাল ভাঙলো, খোঁকাও যার যার। বাড়ি বালেশ্বরের হুতবলংএর খরলোতে ভেঙ্গে অজানা সমুদ্রের পরপারে ইতিহাসের অপর লোকের দান পেলেন, কত বন্ধু গ্রাম বিলেন, কতজন দীর্ঘকালের রক্ত বারাদরপ করলেন, হাজার হাজার সহকর্মী অন্তরীণে আত্ম হলেন, কত পরিবার নিঃশেষ হয়ে গেল। অন্তরীণের ভিন বছরে শশীদার ভাতা শরীর আরও ভাঙলো, শশীদার কাল বন্ধারোগে অতি শোচনীয় অবস্থার ভিতর দেহাত বটলো। আমি গ্রন্থর পেলার পলাতক জীবনে, তারপর বটা পড়ে খেলো। বাংলা ছরে ট্রেন থেকেই সোজা শশীদার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বুকে জ্বালায় ধরে যে অল্প বিলম্ব করলেন, তা কতোখানি আনন্দের, কতোখানি শোকের বলতে পারিনি, গর্বের কতোটা ছিল, তা নিজখুঁই বললেন। যাক সে সব কথা। তারপর, কর্জীবনের ঠাঁকে ঠাঁকে কখনও কখনও দেখা হ'ত। আর দেখা ১৯২২ সালে বশিধিতে—আমি বন্ধা-রোগী দুটি সহকর্মীকে নিয়ে দেখানে গেছি, শশীদাও ওখানে গিয়ে আলোচা একবাড়ীতেই রোগেই দুসহেন। ঐ দেখাই শেষ দেখা। এর পরই এই মহাপ্রাণের অবশান ঘটলো।

অজ্ঞাত, অখ্যাত থেকে জ্ঞাতকে গড়ে তুলবেন—এই ছিল তাঁর একান্তমনের সাধনা। অজ্ঞাত, অখ্যাতই তিনি হয়ে গেছেন। কিন্তু জ্ঞাতকে গড়ে তুলবার তাঁর সাধনা জ্ঞাত কি নিঃহাতে তুলে বেবে না? জ্ঞানার হয়ে দীপ খেলো যগে তিনি জীবনের দিন কাটি কাটিয়ে দিয়ে গেছেন—এই আশার যে, ঐ দীপ থেকে লগতে আলিয়ে ধরে ধরে দীপ জ্বালবে। সেদিনকার সে আশা যদি ব্যর্থতার রান হয়ে গিয়ে থাকে, শশীদা তারতে তাঁর এই সুভিগতার আবার কি একটি প্রাণেও সংকর জাগবে যে, এই জ্ঞাতকে গড়ে তুলতে হবে। সেই সংকল্পের যাকে কি তাঁর জীবন ও মৃত্যু সার্থকতা খুঁজে পাবে?

• বাংলার শ্রমজীবী নিপার প্রবর্তক জীবনচক্রের তার চৌহুরী বক্রাবে তেজবাব তাঁর বৃত্তি বাৎসরিক নজাপতির অভিভাবক।



ভূমিকা

১৯০৫ সনে বলভর, ১৯১১ সনে বলভর রদ, ১৯২১ সনে অসহযোগ আন্দোলন, ১৯৩০-৩২ সনে আইন-অমর্ত্য ও লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলন, ১৯৪২ সনের অগষ্ট বিপ্লব এবং ১৯৪৬ সনে ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতীয়র হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর—এই রাজনৈতিক ঘটনাগুলি এই পঞ্চাশ নাটকের বিষয়বস্তু। মেদিনীপুর জেলার সন্ন্যাসকুলবর্তী একটি গ্রামে মহাত্মার মাইতি নামক এক মহাবীর কৃষক এবং তাহার পরিজনকে কেন্দ্র করিয়া এই রাজনৈতিক নাটকটি পরিচালিত হইয়াছে। চরিত্রগুলি সবই কাল্পনিক। ঘটনার ক্রটি-বিচ্যুতি অথবা অন্ত কোন অসঙ্গতি সংশোধন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত থাকিব। এ বিষয়ে সন্দের পাঠক আমাদের সাহায্য করিবেন এই নিবেদন। সমগ্র নাটকে মাত্র একটি দৃশ্যপটই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীমন্ত পণ্ডিতপানব বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃকখানি গান রচনা করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করিয়াছেন।

প্রথম অঙ্ক

[১৯১১ সালের ডিসেম্বরের শেখড়গ। মেদিনীপুরের অন্তর্গত কীর্তী মহকুমার রামনগর থানার সন্ন্যাস-কুলবর্তী গ্রাম, নাম শ্রীপুর। মহাত্মার মাইতি সেই গ্রামের একজন সম্পন্ন চাষী, বয়স ৪৫ বৎসর। কার্ঘ উপলক্ষে মহাত্মার মাইতিপুর সহরে গিয়াছিল। সে যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা নামিতেছে। এক পার্শ্বে চৌকীঘর, অপর পার্শ্বে মহাত্মার ঘরের বারান্দা, বারান্দার পাশ দিয়া অন্যরে বাইবার গলি, বারান্দা এবং চৌকীঘর উভয়ের মধ্যে প্রাঙ্গণ। ভাষার এক কোণে একটি তুলসী মঞ্চ, আর এক কোণে একটি ধানের গোলা, পক্ষান্তে মাটির উঁচু বেওয়ার। মহাত্মার ঘর ও গঙ্গা তুলসীমঞ্চ প্রাঙ্গণ দিয়া করছোড়ে প্রাঙ্গণ করিল :]

গঙ্গা ॥ মা লক্ষ্মী, তুপা করো, কাকন দিয়ে আনি
কীচ নেবো না। ঘরের থাকতে আনি পরের নেবো না,
শাখা থাকতে আনি ছুটি পরবো না। পরের ছাড়িয়ে

ভিক্ষা করবো না, মোটা বসন অঙ্গে নেবো, মোটা জুত
আবরণ করবো, মোটা অন্ন অক্ষর হোক। মোটা বস্ত্র
অক্ষর হোক। ছেলেমেয়েরা মাছব হোক।

[গঙ্গা প্রণাম করিয়া বাতাসার বাংলা হাতে উঠিয়া
গাড়াইল। ছেলেমেয়েরা কীর্তন গাইতে
লাগিল।]

ছেলেমেয়েরা ॥ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম
রাম রাম হরে হরে ॥

[পূর্ণা হরির হুট দিল। সকলে কাড়াকাড়ি করিয়া
হরির হুট লইল। জিনিষপত্র হাতে লইয়া
মহাত্মার আসিয়া গাড়াইল। তাহার পক্ষান্তে
আসিল বাবুস বিদ্যান বহিয়া একজন চাকর।
সে অন্যরে চলিয়া গেল।]

মহাত্মার ॥ মেদিনীপুর থেকে সেই কোন সন্ধ্যা
রক্তমাংস হরেজি, বাবু হরির তুপার টিক সময়ই বাঁকী
কিরেছি দেখি।

[হাঁটু গাড়িয়া তুলসীমঞ্চ উৎসবে প্রণাম করিল।
 তেলেমেয়েরা সকলে তাহাকে বিহিরা দাঁড়াইল,
 গংগা হস্তির খুঁটের খালা হইয়া কাছে আসিয়া
 দাঁড়াইল। বড় মেয়ে তুলসী, বহন আঠায়ে
 বৎসর, কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—]

তুলসীঃ এত দেখি করলে কেন বাবা?

গংগাঃ পরীত ভালো তো?

[বিত্তীয় পুত্র নিধিরাম বহন খোল—মহাতারতের
 হাত হইতে জিনিষপত্র লইতে গেল।]

নিধিরামঃ খোড়া কিনে এনেছ বাবা?

খোড়া?

[ছোট ছেলে বলরাম বহন চৌক বৎসর—সাগ্রহে
 কাছে গিয়া দাঁড়াইয়াছে।]

বলরামঃ আমার ছুতো, আমার কোট?

গংগাঃ বাবু সব। বাতীতে পা দিতেই তাওব
 ক্ষুদ্র হইবে। কই জিনিষগুলো জানাকে দাও।
 (তেলেমের প্রতি) গোয়াল ঘরে খুঁজে খিঁচি সব পড়তে
 বসো গিরে। (তুলসীকে) ওর হাত-পা খোবার
 পামতা-পাড়ু।

[গংগা জিনিষগুলি নিজের হাতে লইল, তেলে-
 মেয়েরা চলিয়া গেল।]

মহাতারতঃ (তেলেমেয়েরের লক্ষ্য করিয়া)
 এনেছি। সবাই আছেই কিছু কিছু এনেছি, তোমাদের
 খবরী গুরুব গলার বটো তাও তুলিনি। (গংগাকে)
 ভালো ছিলে তো সব?

গংগাঃ ইয়া সব ভালোই ছিল। ঐর ঠাকুরপো
 কলকাতা থেকে আজ ফিরেছে, তোমার সঙ্গে দেখা
 করতে এসেছিল।

মহাতারতঃ রামের কোন খবর এনেছে?

গংগাঃ কি জানি আমি ওর পাগলামী সব সময়ে
 তুলি না। কথা শুনে বনে হয় রামের অনেক খবরই
 জানে। কিছু ভাগ্যে চলে না। রামের কথা আমি
 আর জানতে পারি না। পেটের ছেলে-হয়ে এখন

বাগা বেবে—কে জানতো? একি, কোণার চললে?

মহাতারতঃ ঐররের সংগে একবার দেখা করে
 আসি।

গংগাঃ না না—একুশি কি বাবে? ঐরর
 ঠাকুরপো আবার আসবে বলে গেছে, না আসে; খবর
 পাঠাবে। তুমি এনো...হাত-পা ধোবে...খাবে।

মহাতারতঃ ও, ইয়া, আসল কথাই কে তোমার
 কথা হয় নি।

গংগাঃ কি?

মহাতারতঃ নারায়ণ আসছে যে।

গংগাঃ কোন্ নারায়ণ?

মহাতারতঃ দক্ষাদার নারায়ণ।

গংগাঃ বল কি? তা হঠাৎ গরীবের বাতীতে
 হস্তির পাড়?

মহাতারতঃ পথে দেখা। বললো কি একটা
 ভদ্রতে যাচ্ছে। ফেরবার পথে আমার এখানে
 খাওয়াদাওয়া করে যেতে বলেছি। একটু যোগাফ-
 বর কর। তুলসীর সংগে ওর বিয়ের কথাটা আজ
 পাকা করবো।

গংগাঃ ও জানাদের ঘরের বেতে বিয়ে করবে
 না। ওর চালু দেখে আমার গা জলে যায়।

মহাতারতঃ তা দক্ষাদার বাড়ির চাল তো একটু
 হবেই। এতাপটাতো কম নয়। দশটা পায়ে
 চৌকিদারের বাধ্য। এ ছেলেকে জানাই করতে
 পারলে আমার এতাপটাই কি কম হবে গিন্নী...হ্যাঃ হ্যাঃ
 (হাসিয়া উঠিল)। বাও, বাও। তুলসীর অল্প বহুসংখ্য
 শাও এনেছি। ওকে একটু শাকিরে শুকিয়ে রাখো।
 শুধু মেয়েকে শাকালে হবে না—মেয়ের মাকেও শাকতে
 হবে। শাক্তীও পছন্দ হওয়া চাই কিনা তাই। হ্যাঃ
 হ্যাঃ—এই যে নীলাম্বরী, তা আমিও এনেছি তোমার অজ।

গংগাঃ ওহা। ও শাকী পরবার কি আমার
 বহন আছে? আর এত গাভলা। ওহা এটা বে
 বিসিক্তী।

মহাভারত । তা হোক—তবু তো মনের মতো
হয়েছে।

গংগা । না, না, বিলিতি শাড়ী আমি পড়তে
পারবো না।

মহাভারত । আর, লব্ধের তবু এলাহ, তাংগা
বাংলা আবার জোড়া লেগেছে। বিলিতি শাড়ী পরতে
তবে আবার বাধা কি ?

[তুলসী আসিয়া বলিল—]

তুলসী । বাবা—কুঠোর পাড়ে তোমার হাত-পা
ঘোষার জল দিয়েছি।

মহাভারত । ব্যক্তি।

[মহাভারত হাত-পা দুইতে চলিয়া গেল]

তুলসী । মা, বাবা আমার অঙ্ক ময়ূরপংখী এনেছে ?

গংগা । কি জানি মা, কি এনেছে সেখো। নারায়ণ
হৃদয়ার আজ রাজ্যে থাকে, চল দেখি—কি রাজ্য বাধা
হবে।

[তুলসী কাগজের ঘোড়ক হইতে শাড়ী বাহির
করিল]

তুলসী । মা, এই তো আমার ময়ূরপংখী। উঃ কী
চমৎকার। আর এটা ? ও, এটা নীলাবরী। তোমার
অঙ্কে। কিছ মা—তোমার এ শাড়ীটা তো বিলিতি।
বাবা বিলিতি কেন আনলেন ? তুমি বিলিতি শাড়ী
পরবে না ?

[অদূরে শ্রীধর ও ভাষ্কর মলবলের ব্যবসী গান
শোনা গেল]

“বাংলার মাটি বাংলার জল

বাংলার হাওয়া বাংলার কল

পূণ্য হউক, পূণ্য হউক

পূণ্য হউক, যে ভগবান—”

তুলসী । (চাপা গলায়) মা, শ্রীধর কাকা।
বিলিতি শাড়ীটা দেখলে আর রক্ষে নেই। তুমি এসব
দিয়ে ঘরে বাও। আমি কথা কইছি।

[গংগা কিসিয়গজ নিয়ে অক্ষরে চলিয়া গেল।

গায়েব গায়েব শ্রীধর মলবলে গাহিতে
গাহিতে চতীকতপ প্রাণে আসিয়া গাঁড়াইল।]

“বাঙ্গালীর প্রাণ বাঙ্গালীর মন

বাঙ্গালীর ঘরে বসে ভাইবোন

এক হউক, এক হউক

এক হউক হে তগবান।”

[গান শুনিয়া সেখানে বাড়ীর স্কুলে সববেত
হইল, মহাভারতও। শ্রীধর মলবলে গাহিয়া
চলিল]

“বণিক এলো বিবেক পেয়ে

মোদের দেশে বসলো কোঁকে।

বাবলা ছেড়ে শাসন গেড়ে

শোষণ করলো লুক।”

গাও ঘের গরীবান।

(বাংলার গরীবান)

(করে) লাঠি সাহেবিয়ান।

গর্বে ভায়া আত্মহারা

তুললো লম্বু গুলা।

বণিক শাসন করলো লুক ॥

এই বাংলার রক্ত চুষে।

এলো উনিশ-শ পাঁচ শন

এলো লাঠি লর্ড কার্জন।

লর্ডে এত ইচ্ছা মতো

(করলো) বাংলাকে ছাড়া !

অখিনী, কুয়েত, বিশিন

গর্জে উঠে লকাই শেনিন।

বললে হেঁকে সভা ডেকে

(বাংলা) ভাগ হবে না মান।

বাংলা ভাগ হবে না মান।

বাংলা একই হবে।

উঠলো জিনি বেধ মল্ল

বলেশান্তরম্ বলে

রেশমর কাগলো লাড়া

বাংলাঘরের ভর ।

রবি ঠাকুরের দলও তখন

রাখী বন্ধনে করলো পূণ—

এক বাংলা এক বাঙ্গালী

ছুই কিছুতেই নয়,

ভর বাংলায় ভর ।

বাঙ্গালী উঠলো জেগে ।

বিলাতী বরকট হোল

বেশে সব দেশী চললো ।

ভারত জুড়ে একই সুরে

হাঁকে বন্দেমাতরম্ ।

বংগ ভংগে আন্দোলনে

বাঙালি অরবিন্দ সনে

বিদ্রোহীরাও যোগ দিল তার

নিরে বাক্স বোম্ ।

হাঁকে বন্দেমাতরম্ ।

ভারতে পড়লো সাড়া ।

উনিশ-খ' এগারোর পেবে

পঞ্চম জর্জ ভারতে এসে

দরবার ডেকে দিল্লী থেকে

বললে বংগ ভংগ নয় ।

সফল বোধের আশ্বাসন

হেঁট হুণ্ড লর্ড কার্জন ।

কলকাতা থেকে দিল্লী নিল

(রাঅখানী তাই দিল্লী নিল)

বাঙালীকে তার ভর

ভর বাংলায় ভর ।

মহাভারত । ইয়া—রাঅখানী কোলকাতা থেকে
দিল্লী গেল । বাঙালীর তরে । তোমার যেমন কথা ।

ঐক্য । ইয়া, বাঙালীর তরে । একশ বার বলবে
বাঙালীর তরে—এই বেদিনীপুরের তরে—তাও বলবে ।
জুনি তোমার নামের খবর আমার জিজ্ঞেস করে ।
করে কিনা ? তবে আমার এই রামায়ণ শোন—সব
খবর পাবে ।

[গান বহিল]

শোন শোন তাই বেদিনীপুরের

অমর কাহিনী

এই মেলাতেই প্রথম হোল

শহীদ বাহিনী ।

অরবিন্দ এসে গড়েছিল গোপন-সমিতি

(যে ছুই গুণ্ড সমিতি)

অধীন দেশকে স্বাধীন করা

যার ছিল নীতি ;

সেই পরিভিঁর এক সমিতি

এই বেদিনীপুরে ।

এই মেলায়ই হেম কাশ্মিনগো

এলো সে স্রোতে ঘুরে ।

করালী বেশ থেকে শিখে

বোমার কারিকুরী ।

হুয়ারী পুতুরে করলো বোমা

ভৈরৱীপুরী ।

(ও তাই) প্রথম বোমা নারায়ণগড়ে

সেতো বেদিনীপুরে ।

এক বোমাতেই লাট সাহেবের

ট্রেনটি গেল উড়ে ।

বোমা নিরে বেকল যে তরুণ বাহিনী

তাদের কথাই বেদিনীপুরের অমর কাহিনী ।

কিংসকোর্ড সাহেব বিপিন পাগকে

পাঠিয়েছিল মেলে ।

কিংসকোর্ডকে শেখ করবে

পন করে ছুই ছেলে—

(একজন বেদিনীপুরের ছেলে)

বজ্রকরপুর মেলায় তাকে

বদলী করে দিলো ।

জুদিরাম অম্বুজ চাকী

সেখার পিছু নিলো ।

মরলো বারা জুদিরামের

সাকল বোনা খেয়ে
 একজন বিশেষ কেনেভি, আর
 কেনেভির মেয়ে।
 প্রহর চাকী দিল কাঁকী
 নিষেক বেবে হাসি,
 পড়লো ধর! ছুনিহার বোস
 গলায় নিল কাঁকী।
 (ও ভাই) কিশোর ছেলের এমন সাহস
 কেউ তো ভাবিনি—
 বেদিনীপুরের কুকে লিখলো
 অমর কাহিনী।

মহাত্মারতাঃ না না ভাই! এসব বড় পোলমেলে
 কথা। নারায়ণ সেদিন বলছিলেন পুন্নিশ খবর পেয়েছে
 তুমি এই সব বে-আইনী গান গাও। বলতে কোনদিন
 তোমার হাতে দড়ি পড়বে। সেই নারায়ণ আমার এখানে
 আসছে। তুমি ভাই বাড়ী যাও। কাজ নেই আমার
 যামের খবর।

গংগাঃ আমি জানি সে আর নেই।

ঐশ্বরঃ আছে কি নেই সে তোমরা বলতে দিচ্ছ
 কই?

মহাত্মারতাঃ না না তোমাকে আর বলতে হবে
 না, ও সব বে-আইনী গান শুনে কি শেষে আমাদের
 হাতেই দড়ি পড়বে?

ঐশ্বরঃ তবে দাদা শোন এবার—

“বাবের ঘরে ঝোঁগের বাসা

এর চেয়ে নেই বড় ভায়াসা।”

মহাত্মারতাঃ ঐশ্বর, তুমি বাবে কিনা বলো—

ঐশ্বরঃ বাচ্ছি দাদা, বাচ্ছি।

“বাবের ঘরে ঝোঁগের বাসা

তার চেয়ে নেই বড় ভায়াসা।”

গাহিতে গাহিতে সন্ধ্যাবে চলিরা গেল।

অজ্ঞাত লোকজনও কর্তার রাগ লক্ষ্য করিরা
 অগ্রত হইল।

গংগাঃ (হৃদয় মহাত্মারতের কাছে গিয়া দাঁড়াইয়া)
 তুমি নিজে কলকাতার গিরে রাসের খবরটা নিরে
 আসতে পারো না?

মহাত্মারতাঃ না পারি না, আমার ভারী দায়
 পড়েছে। ঘরে নাও ও ছেলে আমার ঘরে গেছে।
 বাড়ীর বড় ছেলে কেউ খানার করবে, আমার পাশে
 দাঁড়াবে। তা না করে তিনি গেলেন কলকাতা সহরে
 চাকরী করতে, চাকরী কিনা—খানসামার চাকরী। যে
 দিন গেছে সেদিনই আমি জেনেছি ও ছেলে আমি
 হারিয়েছি।

[একাকী ঐশ্বরের প্রবেশ]

মহাত্মারতাঃ একি? আবার?

ঐশ্বরঃ রাসের খবর।

মহাত্মারতাঃ বাক।

গংগাঃ সত্যিই কি তার খবর কিছু জানে।
 ঠাহুহপো?

ঐশ্বরঃ জানি।

মহাত্মারতাঃ জান তো বলতে কি হচ্ছে?

ঐশ্বরঃ বলতেই এলছি।

মহাত্মারতাঃ কিন্তু খবরদার, গানটান নয়।

ঐশ্বরঃ না, গানটান নয়, বলবল গরিয়ে বেবে
 ছুপি ছুপি আমি এলাম, বলবো গোপনে।

মহাত্মারতাঃ গোপনে? গোপনে কেন?

চোর না ডাকাতি।

গংগাঃ না, না সে হরত বেঁচে নেই—ভাই।

ঐশ্বরঃ বেঁচে আছে—ডাকাতি করছে।

মহাত্মারতাঃ ডাকাতি করছে—আবার ছেলে?
 আমি বিশ্বাস করি না। বরং বলো যে মরেছে।

ঐশ্বরঃ মরেনি বরং মারছে। দেশের শত্রু নিপাত
 করছে। বিশেষী ডাকাতিদের তাড়াতে সে অসেনী
 ডাকাতি করেছে।

মহাত্মারতাঃ আমি বিশ্বাস করি না। আমার ছেলে
 কি এক খবরের কাগজের আপিলে খানসামার কাজ

করতো, খামসাবার কাজ ছোট কাজ—ভাই বলে
ডাকতি করার মতো ছোট কাজ সে করবে না।

শ্রীধরঃ হ্যাঁ—‘মৃগাক্ষর’ আপিসে সে কাজ করতো।
সোটা দেশকে মৃগাক্ষর আঁপিয়েছে। তোমার রাম বাপ
যাচ্ছে—জুনিরামের কীলীতে সে কেঁপে ওঠে। বৈদী-
পুত্রেই তো ছেলে।

গংগাঃ তবে কি রাবেরঙ কালী হবে ঠাকুরপো?

শ্রীধরঃ কালীর ভর আছে বৈকি বৌদি। কিন্তু সে
তরকে ওরা খর করেছে। জুনি বা, তোমাকে কেউ
বদি বেঁধে রাখে—ছেলে কি তা ঠাড়িয়ে দেখবে? তাতে
কি তোমার বুধ উঠে হবে বৌদি? আজ আমাদের
সকলের বা, আমাদের বেশ অমনী দাপন সুখলে বন্ধিনী।
সে বন্ধন মোচন করতে হলে শুধু আবেবন নিবেদনে
চলেবে না। শুধু হুয়েন ঝড়ুজোর আবেদনে ভাল
বালা জোড়া লাগেনি। জুনিরামের ঐ বোমারটার
মরকার ছিল।

মহাভারতঃ বোমা বাক্স আমি খুঁজি না।

শ্রীধরঃ কিন্তু রাম সেটা ভালো করে বুকেছে।
‘মৃগাক্ষর’ আর ‘অমূল্যল’ হল বোমা বাক্স দিয়েই
বিদেশী শাসন উড়িয়ে দেবে। দেশের বিপ্লবী সন্তানরা
সরীরা হরে উঠেছে। অত্যাচারী শাসকদের কুহুরের
মত স্তলী করে ঘরে একে একে তারা লাগড় করছে।
কিন্তু শুধু হাতে এ লড়াই চলে না। টাকা চাই।
ডাকতি করে এই টাকাটা বোপাড় করতে হচ্ছে।

মহাভারতঃ হ্যাঁ—দেশের লোকের সর্বনাশ করে
দেশোচ্চার হচ্ছে।

শ্রীধরঃ লোক বুকেই তারা ডাকতি করছে
মহাভারতবা। বাবের অনেক আছে, শুধু তাদেরই
নিচ্ছে, একটা কথা ভুলো না মহাভারতবা, বাবের বন্ধন
কোচন করতে পারে পাণ পুণ্যের চুলচেরা বিচার চলে
না। সব চেয়ে বড় কথা—বাক্যে মুক্ত করা। পরাধীনতার
অতৃষ্ণি থেকে মুক্ত হওয়া, এ পরনায়, এ ভলভার
মেকিনীসুর পিড়িয়ে নেই, এপিডে আছে। কং গর্ব

করো—সে বলে তোমাদের রাশিও আছে।

মহাভারতঃ ভাই যদি হয়—আমি মনে করবো—
ছেলে আমার মরে গেছে।

[মহাভারত চলিরা গেল।]

গংগাঃ আমি তা মনে করবো না ঠাকুরপো,
ছেলে আমার বেঁচে থাক। তোমার অভ কথা আমি
মুখি না। কিন্তু ঝড়ুটুকু হুঁকি আমাকে বদি কেউ বেঁধে
রাখে সে বাবন খুলে আমার মুক্ত করতে যে ছেলে
আমার গ্রাণ দেবে—সেই আমার ছেলে, যে দেবে না,
সে আমার ছেলে নয়।

শ্রীধরঃ রাম তোমার সেই ছেলে। সে বেঁচে
আছে।

গংগাঃ আমি জানি, আমি বিশ্বাস করি, আমি
দেখেছি বাবের অস্ত্র ওর গ্রাণ কাঁধে। ‘বাবের সেওয়া
মোটাকাপড় বাখার তুলে নেবো তাই।’ ওর সেই গান
আমি এখনো ভুলতে পারি না।

[শ্রীধরের গান]

বাবের সেওয়া মোটা কাপড়

বাখার তুলে নেবো তাই।

ধীন হুঁকি না যে বাবের

তার বেশী আর লাগি নেই।

সেই মোটা মুক্তার মংগে

বাবের অপার মেহ দেখতে পাই
আমরা এমন লাগি। তাই ফেলে ভাই
পরের ঘরের তিক্ত।

আমাদের আরও বাবের মাথে,

এই প্রতিজ্ঞা করবো তাই,

পরের ঘরের জিনিষ কিনবো না।

যদি বাবের ঘরের জিনিষ পাই।

[গানের মধ্যভাগে মহাভারত এবং শেখ ভাগে
নাগর দক্ষাভার আসিরা ঝাড়াইল]

নাগরঃ আবার তোমার পাগলারী মুক্ত হুয়েছে

শ্রীর যুতো। এ সব বদেনী গান গাওরা বে-আইনি।
আনতো ?

শ্রীরঃ হাঃ হাঃ হাঃ অষ্টভাঙ্গ করিরা গান বরিল।

“আমার বেত মেরে কি যা কুলাবি।

আমি কি আর সেই ছেলে ?

নেপে বক্তারক্তি থাকবে নক্তি

কে পালাবে না কেলো ?”

[শ্রীর গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল]

মহাতারতঃ এলো বাবা নারায়ণ, এলো, বসো।

নারায়ণঃ হাঁ বসছি। কিন্তু এঁদের নামে ত্রিপেট
করতে হবে। আর এরা আপনার বাড়ীতেই বা আসে
কেন ?

মহাতারতঃ পাগলে কি না বলে আর ঠাগলে
কি না খায়। ওঁদের কথা বর না বাবাজী। ওঁদের
কান্নাই হলো বাড়ী বাড়ী ঘোরা আর তিক্তে করা। আমি
ইকিরেই বিরোধি।

গংগাঃ তাহলে তোমরা বসো, আমি আসছি।

নারায়ণঃ (হঠাৎ গংগাকে লক্ষ্য করিয়া) ও,
আপনি। আমি দেখিইনি।

[গলাকে প্রশ্নাম করিল]

গংগাঃ থাক বাবা—থাক। ভালো আছো তো ?

নারায়ণঃ আর ভালো, যশ দশটী গায়ের চৌকিদার-
দের বশরত্নি করে বেড়াতে হর একা আমাকে।
সব অপদার্থ, হুঁ অনেক এবার তাঁত মারবে টিক করেছি।

গংগাঃ না বাবা—এ দিনে কাহো ভ্যতটাত বেয়ে
না। অজ্ঞা বোসো—আমি স্তোত্রারের ধারার যোগাড়
করি গে।

নারায়ণঃ না না আমি খাটাব না। আমার তাড়া
আছে। আসবার সময় খবর পেলাম পুলিশের বড় কর্তা
কাল এই থানা দেখতে আসছেন। সে সব যোগাড়ও
আবার আমাকেই করতে হবে কিনা।

মহাতারতঃ কিছু না খেয়ে গেলে চলবে কেন
বাবাজী। আমি যে কত আশা ক’বো...

নারায়ণঃ আশা কি আমারই কম ছিল জেঠামশাই।
তেবেহিলাম থাকো থাকো—রাতটা এখানেই কাটাও।
কিন্তু গেরো যেন।

মহাতারতঃ অন্ততঃ একটু মিষ্টিদ্রব্য করে যেতে
হবে বৈকি ! বাত, তুনি বাত। তুলনীকে দিয়ে
পাঠিয়ে বাও।

গংগাঃ বিচ্ছি। [গংগা চলিয়া গেল]

মহাতারতঃ তা বাবা তেবেহিলাম—তুলনীর সংগে
বিশ্রের পাকা কথাটা আজই হবে। বড় আশা করে
আমরা অনেকদিন ধরে বসে আছি।

নারায়ণঃ স্থগিল হয়েছে কি আনেন—বাবা যারা
গেছেন—আমাকেও যেরে গেছেন—জোত করি কিছুই
নেই। বিশ্রের এসব খরচ পত্তরই বা আসবে কোথেকে,
আর বিয়ে করাই বা চলবে কি করে ? লেখা তেবেই
আকুল ছিছি জেঠামশাই।

মহাতারতঃ তোমার আবার অভাব। সবকাজী
চাকরী। তাও আবার পুলিশের চাকরী।

নারায়ণঃ হ্যাঁ দশটী গা তাই ডাবছে বটে, কিন্তু—
বললে বিশ্বাস করবেন না—বদেনীরা দুবট্টে য়েখ না।
দেখাবেনি চোর-চোঁড়ারাত না। তার কলে ক্ষমটিয়া সব
জেড়ে দিয়েছি, ঘোব করেছেন কি গেছেন—সে আপনাই
হন—আর...

মহাতারতঃ ওরে বাবা, তাতো বটেই, তাতো
বটেই, থাক, বুঝে ওজ্ঞ তেবো না বাবাজী। মেহেরে
স্তো শু হাতে সেবো না আমি। কিছু জোতকরি
যু—যানে বৌতুক দেবো বৈকি।

নারায়ণঃ বাসু—তাহলেই হলো। যানে আপনার
সেরে কই না পেলই হলো।

মহাতারতঃ ইঁচালে বাবা নারায়ণ—তুনি আমাকে
বাঁচালে। তোমার এই পাকা কথাটা পাখার ওজ্ঞ
আমরা কদিন থেকে বসে আছি। বেশ, দিনখণ টিক
করে স্তোত্রাকে জানাবো’খন। আঃ, একটু জলখাবার

তখন দেখা যাবে। আসি।

[নারায়ণ চলিয়া গেল। মহাত্মারত্ন শুভেলেতা তারায়
শিঙনে শিঙনে গেল। মক ক্রমশঃ অন্ধকার
হইয়া আসিল। রাত্রি গভীর হইয়াছে।
নেপথ্যে লুপালের সব শোনা গেল। গ্রাম্য-
চৌকিদার হাঁক দিয়া গেল। এই অন্ধকারের
বশে বীর পদক্ষেপে গ্রাম্যগণে একটি দ্বারা
যুতি আসিয়া গাঁড়াইল। পানিকক্ষণ সব
চূপচাপ... শুধু কিঁ কিঁ শোকার ডাক শোনা
বাইতেছে, ভায়াবৃত্তি নিঃশব্দে বতের দরজার
সামনে আসিয়া দাড়াইল। অজুত কঠে
ডাকিল—‘মা—মা’। লাড়া মিলিল না, তখন
সে দরজার করাঘাত করিল। জিতর হইতে
মাতী কঠের আওয়াজ শোনা গেল—‘কে’?]

রাম। আমি মা, আমি রাম।

[গংগা দরজা খুলিয়া গমনে রামকে দেখিতে
পাইয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেল।]

গংগা। রাম! জয় মা মংগলচরী। আর বাবা
ঘরে আর।

[রাম মাকে প্রণাম করিল। মহাত্মারত্ন ভিতর
হইতে জিজ্ঞাসা করিল।]

মহাত্মারত্ন। কে ওখানে?

গংগা। (উজ্জ্বলিত কঠে) রাম এলোছে।

রাম।

রাম। চূপ। তাই বোনো সব ভোগে উঠবে।
একটা আলো নিয়ে ভূমি বাটরে এসো বাবা।

[মহাত্মারত্ন লষ্ঠন নিভা আসিয়া গাঁড়াইল।]

মহাত্মারত্ন। রাম! বেঁচে আছিস বাবা।

[রাম মহাত্মারত্নকে প্রণাম করিল]

ঘরে আর।

রাম। মা, বাবা—আমি লুকিয়ে এগেছি—লুকিয়ে
চলে বাবো।

মহাত্মারত্ন। লুকিয়ে এগেছিল?

রাম। লুকিয়েই রয়েছি বে, আজ তোরে গিয়ে
পৌছেছি। ঐক কাকার বাড়ীতে দিবটা। লুকিয়ে
কাটিয়েছি। রাঙের অন্ধকারে এসেছি বাড়ীতে, আবার
মাতারাত্তিই ছুটেতে হবে—কলকাতার।

গংগা। বলি কি! তবে ওদের সবাইকে
ডাকি?

রাম। না। তাই বোনদের ডেকো না। ওরা
ছেলে মানুষ। একথা তবে গোপন থাকবে না।
তোমাদের বিপদ হবে। চলো ডই উঠোনটার বলি।

গংগা। তোমরা বল, আমি কিছু বাবার নিয়ে আসি।
মহাত্মারত্ন। আবার হাঁকো কলকোটাও এনা।

[গংগা চলিয়া গেল। মহাত্মারত্ন শু রাম গ্রাম্যগণে
আসিয়া বলিল]

লুকিয়ে এসেছ কেন?

রাম। আমায়ের সংলগ্ন সরকারের লড়াই চলেছে।
মহাত্মারত্ন। (বিম্বিত হইয়া) লড়াই? সরকারের
সংলগ্ন? রাকার সংলগ্ন? তবে বে ঐকর বলে গেলো
সে কথা সত্যি? তবে ভূমিও বসেনী ডাকাত হয়েছ?

রাম। পরের গোলারী দূর করতে হলে, শু ডাকা
আর কোন পথ নেই বাবা।

মহাত্মারত্ন। আমি অত সব বুঝি না। কিন্তু
এইটুকু বুঝি—ডাকাতি বরা পাপ।

রাম। তাই যদি হয় বাবা—তবে সবচেয়ে বড়
পাপ করেছে ইংরাজ সরকার। ডাকাতরা ডাকাতি
করে চলে যায়। এরা আমায়ের দেশে ডাকাতি করতে
এলে ঘর জুড়ে বসেছে। বাবার কোন মন্তব্য নেই।
শাসন গেছে মনের মধ্যে শোষণ করছে।

মহাত্মারত্ন। বুঝি না—আমি অত সব বুঝি না।
বিলাতী জিনিষ না কিনে বসেনী কিনতে বলছে—সেটা
খানিকটা বুঝি। বাংলা দেশ ছ’তাল করেছিল—তার
অর্ধ রানী বন্ধন হলো। বিলাতী জিনিষ পোড়ানো
হলো—বসেনী জিনিষ কেনার খুব পড়ে গেল—তাও
আলো। কারো আশপতি নেই। কিন্তু বোমা বারুদের

কারবারে তোমাকে আমি যেতে দিতে পারবো না।
এসব ছেড়ে দিতে কেত খোয়ার নিরে থাকো।—আমার
পেচপে ঝড়াত।

রাম। তার চেয়ে বরং মনে করো তোমার ওই
ছেলে মরে গেছে।

মহাতারত। হ্যাঁ হ্যাঁ, তবে আমি তাই মনে
করবো রাম।

[গংগা এক হাতে খাবার ও অল্প হাতে হাঁকা নিয়া
আসিল]

রাম। এই যে বা—কি খাবার এনেছে! মাও,
বন্ধু ক্রমে পেরেছে। আঃ কতকাল তোমার হাতের
খাবার খাই নি।

[রাম দ্রুত শাইতে লাগিল ও মহাতারত নীরবে
তামাক টানিতে লাগিল]

গংগা। হ্যাঁরে—তুই নাকি দেশের অল্প ডাকাতি
করছিল?

রাম। হ্যাঁ—না।

গংগা। কালটো কি ভালো হচ্ছে? (মহাতারতের
দিকে তাকাইয়া) তুমি কি বলো?

মহাতারত। আমার বা বলবার বলেছি।

রাম। হ্যাঁ বা। দেশের কাজে জীবন দেব—
বাবার তাকে আপত্তি নেই।

গংগা। কিন্তু আমার আপত্তি আছে, বাবা।
দেশের কাজে হেলার জীবন দেওয়ার চাইতে বেঁচে
থেকে লড়াই করা অনেক বড়। যে বীর—সে মরেনা,
সে হারে না, সে বাঁচবার জন্য লড়াই করে। সে হারিয়ে
মের—হারে না। তুমি আমার সেই ছেলে রাম।

রাম। তোমার কথা আমি মাথায় করে নিলাম, বা!

গংগা। দেশের কি কাজ তুমি করছ আমি জানি না।
তুমি বললেও হুমকি বুকবো না, সত্যি কথা বলতে গেলে
দেশ কি ভাত আমি জানি না, কিন্তু যে কাজই তুমি কর
না কেন—আমার সুখ কেন কখনো হেঁট না হয় বাবা।
আর একটু পায়ের দি?

রাম। না বা বাবু। আমাকে এতদিন ছুটতে হবে।
সাত্তারাত্তি কাঁধ ডাকতে হবে। অনেকদিন তোমাদের
যেনি নি! শ্রীধর কাকার কাছে তোমাদের কথা শুনে
মন আনন্দান করে। পুলিশের চোখে খুলি দিয়ে পালিয়ে
এলাম—তোমাদের দেখতে—পায়ের খুলো নিতে।

গংগা। আর একটা দিন যদি থেকে যেতিল।
পুকুরেই থাকতিল, আমার বা মংগলচরীর হবে।

মহাতারত। না।

রাম। না বা, বাবা দিকই বলেছেন। গাঁরে
নাকি নারায়ণ মকাঘার এনেছে। জালাজানি হলোই
বিপদ। বাবু এই রাখাগুলো আজ কবছর জমিরে
অমিরে রেখেছি।

[বাহের হাতে বাঁধিতে বাঁধিতে]

এতি বছর ৩০ শে আশ্বিন বালাপীঠা বালাপীঠ হাতে
রাখী বেঁধে, বলে আমরা এক। তোমার হাতে এই রাখী
বাঁধছি—মনে হচ্ছে, তুমি আমি এক। একরক্ত, এক
নাড়ী, এক আশা, এক কামনা—আমরা এক থাকবো,—
আমাদের দেশ আমাদের—আর কারো নয়। তাই
যোনদের হাতে আমার হয়ে এই রাখী তুমি পরিবে
দিয়ো—বা, আমি।

গংগা। বাবি? এতুনি? এই বুরবুটে, অঙ্ককার
পথে চলতে পারবি?

রাম। আমাকে যেতেই হবে বা।

গংগা। একটা লঠন দিই।

রাম। না, না, লঠন নয়। বরং দাত একটা
দিয়াশলাই, ভোমরা বেশী দিয়াশলাই পাচ্ছে।

গংগা। আছে বাবা আছে।

[গংগা অধিত পদে ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল।
মহাতারত ও রাম চুপচুপে নিত। পরক্ষণেই
দিয়াশলাই ও সস্ত্র আনা সেই দিলাজী শাড়ী
আনিয়া গংগা আসিয়া ঝাড়াইল।]

গংগা। এই মাও দিয়াশলাই, আর এই শাড়ীটাও
নাও।

রাম। শাড়ী দিবে আমি কি করবো না।
 গংগা। অন্ধকারে যখন বিশেষরূপে চলে—তখন এই
 দিরাশলাই দিবে দিরাশী এই শাড়ীতে আঙন ধরিতে
 দিও।

রাম। না, যে আলো তুমি আমার মনে জ্বলি দিলে
 —পথ তাতে কখনো হারাবো না। আঙনের চেতনও
 বড় আলো তুমি আমার দিচ্ছ না। তোমাদের পারে
 আমার প্রণাম হইলো। আদি।

[গংগার হাতে হইতে শাড়ী দিরাশলাই পড়িয়া
 পেল। গংগা কণ্ঠস্বরে রামের পথের দিকে
 ডাকাইয়া রহিল। তৎপরে তুলসীমন্ডের
 সামনে আসিয়া নমস্কার হইয়া প্রার্থনা
 করিতে লাগিল—]

গংগা। বা সন্তী, স্তম্ভ্য করো। কাকন দিবে আমি

কাচ নেব না। ঘরের থাকতে আমি পরের নেব না।
 শাঁখা থাকতে আমি চুড়ী পরবো না। পথের দুইদিকের
 ভিক্ষা করণো না। মোটা খসন অংগে নেব। মোটা
 জুপন আঁতরণ করবো। মোটা অন্ন অক্ষর কোঁক। মোটা
 বস্ত্র অক্ষর হোক। হেলে মেয়েরা মানব হোক।

[গংগার এই প্রার্থনার সময় মহাত্মার হৃদয়ে
 টানিতে টানিতে কি ভাবিয়া, হৃদয়ে কি ভাবিয়া,
 দিরাশলাই আসিয়া শাড়ীটাতে আঙন বরাইয়া
 দিল। গংগা তুলসীমন্ডের উদ্দেশে প্ৰণাম
 করিয়া উঠিয়াই দেখে শাড়ীটি পুড়িতেছে—
 মহাত্মার সেই আঙনে টিকা বরাইয়া চক।
 টানিতেছে আর তাহা দেখিতেছে। গংগা
 তুলসীমন্ডের উদ্দেশে আবার প্রণাম করিল,
 যবনিকা নাহিল।]

সাধাস্তম

ঐক্যভক্ত মাধ বাগ্‌চী

আমি তোমাদের একজন,
 মহা সবারের সাধারণ।
 সারা বেলা খাটি,
 মাঝি কালি খাটি,
 পুঁজি নাহি করি চোরা ধন।
 আমি তোমাদের একজন।
 হস্তাধার তাতে নত নহি,
 ঘন কালো রাতে দীপ বহি।
 নাজ্জ্বের তরে,
 চলি বচা গড়ে,
 দৃঢ় অতীতের শব্দ বহি।
 ঘন কালো রাতে দীপ বহি।

আমি সবাকার ভয় গাই,
 ঘরে ঘরে ঘোর বোন ভাই।
 দুটি আঁখি জল,
 দুকে আমি বল,
 যেথা দুখী নল যেথা পাই।
 ঘরে ঘরে ঘোর বোন ভাই।
 আমি সকলের একজন,
 চির সবারের সাধারণ।
 ঘোর পরিচয়,
 কল্প নাহি ক্ষণ,
 মহা ধরণীর তাজা ঘন।
 সব সম্পদ দেয়া ঘন।

আব্রাহাম

(উপভাস)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বাহ্নয়তি]

সেদিন সাইক্লেরীতে এক কাণ্ড ঘটে গেলো। একেবারে কোণের দিকে বলে লুন পে ইতিহাসের বই গুলে নোট দিলিয়ে নিচ্ছিলো। অদ্ভুত সব নাম। নিনেড, হাম্মরাবি, ইথন্যটন, বাবেলিশ, আবেনহোটেণ। বানান ঠিক রাখাই মুশিল। হঠাৎ পিছনে থস থস আঙরাখ হ'তেই লুন পে চমকে মুখ ফেরালো। একটি মেয়ে। ওদের সংগেই পড়ে। মেয়েটিকে লুন পে ক্রাসেণ্ড দেখেছে। খুব বানী জুসী আর এল্লির বাহা। হাতে হাত বড়ি এল্লির বোতামের শাখরগুলোও কুটো কাঁচ নয়। খুব বডো বরের মেয়ে বোব হয়।

'আপনাকে একটু বিরক্ত করতে এলুম।' মেয়েটি লুনপের দিকে এগিয়ে এলো।

অবজি লাগলো লুন পের। সাইক্লেরী ঘরে ভড়ানো ছিটানোভাবে হেলের দল বলে রয়েরচে। কয়েকটা মেয়েও ব্রুজে আলমারীর সামনে।

দানী সেন্টের উগ্র গন্ধ। চুলে আটকানো টোপা কুলের গন্ধও কম নয়। পরিপাটি করে মেয়েটি সেবেছে। লুন পে সোভা মেয়েটির বুকের দিকে চাইতে পারলো না। আড় চোখে টেবিলের ওপর রাখা মেয়েটির হাত ছুটোর দিকে চেয়ে রইল। বক আঙুলের সার—কসাঁ বব বব করছে। আঙুলের নখগুলো পর্জি নিপুণভাবে কাটা। হাতের চেটোর বেহী পাতার চোপ।

'আজকের ইতিহাসের লেকচার একটি লাইনও টুকতে পারি নি। প্যানে মেয়েগুলো এমন গোলবাল লুক করেছিল কি বকবো।'

লুন পে মুখ তুলতে গিয়েই বাধা পেলে। মেয়েটি হানলে গালে ছুটি টোল গায়। চেরা পেস্তার বতন ভোট ছুটি চোপ কিন্তু হানির তালে তালে চোখে—ক'কে শব্দ হলো। তারি মিটি শব্দ। কালো কুচুচে ম'ব কুটোও কেঁপে উঠলো।

'আনিও অনেক জায়গা লিখতে পারি নি, বিশেষতঃ ইঞ্জিনের ওই বিমুটে সব জায়গা আর লোকের নামগুলো। এই দেখুন না বাবে বাবে কাক রেখে দিয়েছি।' লুন পে এক নাগাড়ে অতন্তলে: কথা বলে হাঁকতে লাগলো তারপর ওর খাতাটা মেলে ধরলো মেয়েটির দিকে।

মেয়েটি আবার বিল বিল ক'রে হেসে উঠলো, 'আপনার খাতা আর কি দেখবো, আমার খাতা দেখবেন। এই দেখুন।' মেয়েটি টেবিলের ওপর থেকে সবুজ বলাটের একটি খাতা বের ক'রে শাভা উটে লুন পের সামনে খাতাটা গুলে দিলো। 'আমার আঙুলের ইতিহাসের নোট।'

লুন পে ঝুঁকে পড়ে দেখলো। পচ্চার খাতা। কালির নামগন্ধ নেই। কেবল খাতার মাফফানে পেলিলে হু'হু লেখা। লেখাগুলো প'ড়েই লুন পে হেসে ফেললো—'বাঃ আপনি লিপেছেন। তারি দুজর হ'য়েছে। কলেজ যোগাফানে পাঠিয়ে দিন।' লুন পে বিড় বিড় ক'রে লাইন ছুটি আবার পড়লো:

বেশাই না বেশলাই।

ভক্ত জলে বতই আলাই।

মেয়েটি মুখে কমাগ হেসে হেসে উঠল 'ভট! অবজ ইতিহাসের নোট নয়। ইংরেজী কাসে লেখা। গাড়ান মুচে ফেলি আগে, কে দেখে ফেলবে কোথা দিয়ে, মুকিলে শড়ে বাধো।' মেয়েটি ফোলের ওপর থেকে ছোট হাত ব্যাণ্ড কুলে নিয়ে দবার বের করলো তারপর হবে হবে লেখাগুলো মুছে ফেললো। ঘবার তালে তালে মেয়েটির হাতের দুটি সোপার চুড়িতে কুপকুপ এক তাল চুল মেয়েটির। লুন পের মনে হ'লো না

ফুলে ফুলের গোছার সাধা পিঠ ঢেকে বাবে।

‘নেমে লেববার বৈধ আমার নেই।’ মেয়েটি দুখ ভুলে বললো, ‘তার চেয়ে আপনি পড়ে বান, আমি লিখে নিচ্ছি।’ এজির ভাঁজ থেকে লাগ কলম বের করে মেয়েটি তৈরী করে নিলো।

লুন পে নিজের বাত। থেকে আছে আছে পড়ে গেলো আর মেয়েটি মাথা নীচু করে লিখে নিতে লাগলো। যাতে যাতে শুধু শব্দ কথাগুলোর বেলা খেমে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো, ‘কি উছুটে নাম বাবা! পড়তেই পাত ভেঙে যায়।’ বানান করে বলুন নরতো কি বা ভা বানান লিখে ফেলবো! ইকহোটেল, খুটবোস মেয়েছেলের নাম হাটসেলপনট, বাবা! বানানগুলো বলুন শীগগির।’

‘বানান কি আর আমিই জানি, গাড়ান বই খুলে দেখতে হবে। আপনি যে তাবে ভাগির দিচ্ছেন, এঁয় বেশ ন্য আবার গাঁয়ের লোক, এলেম বাজীর আর হাঁড়ির ববর লব আবার জানি,’ লুন পেও পরিহাস করার স্রবোগ ছাড়লো না।

‘গাঁয়ের লোকই তো’ মেয়েটি ভুরু দুটো তুললো, ‘আরাকান আর ইজিষ্ট পাশাপাশি ডিট্রিট, তা বুঝি জানিনা তেবেছেন?’ হাসি মিলিয়ে বাবার পর পর্বত মেয়েটির গালের ঢোল গুটি কিছ নিললো না।

‘আমি আরাকানের হেলে জানলেন কি করে?’ লুন পের গলার অরবা কৌতুহল।

‘না হয় আপনার মতন প্রথমই হ’তে পারি নি, তা ন’লে সোমোবিন যে আরাকানে এটুই বোকার মতন নিজে আবার আছে, আশকরি এটুই অশক্ত; স্বীকার করবেন।’

লুন পে অপ্রস্তুত হ’রে পড়লো, ‘কি, কি, আমি কি বলছি সে কথা।’ লুন পের মুখের তাব বেধে মেয়েটি আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো। ‘বলছেনই তো। মুখেই না হয় বলেন নি। কিছ কথার তাণে কি আর বলতে বাক্তি রেখেছেন।’

লুন পে উত্তর দেখার মুখেই বাবা পেলো। আলবারীর শিহন থেকে বই হাতে নিয়ে সলোমন উকি দিলো, ‘একটু আছে। আবার পড়ার জীবন অশ্রুবিধা হচ্ছে।’

লুন পে আর মেয়েটি দুজনেই খন্তরত খেয়ে খেমে গেলো। অস্তায়ই হ’য়েছে। লাইব্রেরীটা কমনকন নয়, প্রাণ ফুলে হাসবার, জোরে গল্প কববার কোম অবিকার শুধুর নেই। একেবারে পিছনেই যে সলোমন লাইব্রেরী ব’সে আছে, আগে জানলে লুন পে সাবধান হ’তো।

মেয়েটি অনেকক্ষণ পরে কথা বললো। বইগুলো শুষ্কিয়ে নিয়ে গাড়িতে উঠে বললো, ‘আপনার ইতিহাসের নোটটা বেবোন আশকের মতন, লেকচারগুলো টুকে নিয়ে কাল ফেরৎ দেবো।’

লুন পে একটু মুকিলে পড়ে গেলো। রোজকার পড়া রোজ করে নেয়। বাত। দিয়ে দিলে এক দিনের পড়া বাক্তি পড়ে বাবে। কিছ এসব কথা তো আর সামনে গাড়ানো মেয়েটিকে বলা যায় না। দুখ বৃদ্ধকে হাসবে আর তাববে, ইখুলের ঢেলে ঢেরেও অরম। একদিনের পড়া না করতে পারলে মহাভারত অশ্রু হ’রে বাবে।

লুন পে হাসলো, ‘বেশ তো নিন না। লকালের দিকে গেলেই চলবে।’

‘কিছ এগানে আর নয়’ মেয়েটি ছুটি চোখ অদ্বুত ভাগীতে বোরালো। ‘একটু জোরে হাসলেই কালা পাশ থেকে বেরিয়ে এসে হমক বেবে, তার চেয়ে আপনি সেকেন্ড পিরিডে আশকের কমনকনের সামনে এসে গাড়াবেন, কেমন?’

লুন পে খাড নাড়লো। মেয়েটি বাইরে বাবার মুখে খাড কিরিয়ে লুন পের দিকে দেখলো। সত্যিই স্মরী। প্রসাধনের আলতো হোয়ার নিজেকে পরিপাটি করে তোলার বাহু মেয়েটি জানে। টেবিলে ভর দিয়ে লুন পে চুপচাপ অনেকক্ষণ গাড়িয়ে রইলো।

ইংরাজী ক্লাস থেকে বেরিয়ে আসবার মুখেই কল

বোল পাশে এসে গাঁড়ালো, 'খুব ব্যস্ত আছেন না কি?'

'না ব্যস্ত আর কি? এখন জো টিফিন।' লুন পে খুব সাবধানে কথাগুলো উচ্চারণ করলো। খুব গভন করে কথা বলতে হবে। এবিধ সেমিক ব্যঞ্জে কথার ধার মিথেন্ডে বাবে না। শুধু লেখাপড়ার কথা আর কলেজ জীবনের গল্পগল্প, নিজের চারপাশে একটা গভী এঁকে নেবে, তার ওপরেই কথাবার্তা এড়িয়ে বাবে চলছেতো। কণে, কানেই তুলবে না। রাজনীতি করার চেয়ে সময় পড়ে আছে, সে সব আলোচনা করারও প্রয়োজন নেই।

'চলুন না, বাটার সংশে একবার দেখা ক'রে আসবেন। আপনার কথা বাবাকে বলেছি।'

'আমার কথা? আমার লম্বা কি বলবার আছে?'

'না রশাই আপনি বক্ত নিজের প্রশংসা শুনেই ভালোবালেন। আহুন, আহুন।'

কমল আর টেনেই লুন পেকে ডগরে নিয়ে গেলো।

এমিকের সারিতে পা দিতেই বিস্ত্রী শুকুরের গন্ধ।

কমল পকেট থেকে কমাল বের করে নাকে চাপা দিতে বললো, 'নিম, নিম, নীসগির নাকে চাপা দিম। এখানে পা দিলেই আমার গা বমি বমি করে।'

লুন পে কমাল বের করে আলতো চাপা দিলো। ঝা দিকের ঘরে ছুজনে চোকার মুখেই ভাগি গলার আঙুরাজ শুনেই পেলো, 'তোমরাই সত্যিকারের খাটপের ছাত্র। সারেকের গন্ধও লক্ষ করতে পারো না।'

লুন পে খুঁচি করে দেখলো বীর্ষ চেহারা একটা তরলোক লাদা টেবিলের ওপর হুঁকে পড়ে কীচের পায়ে কি একটা তরলপদার্থ গরম করছেন। দৃষ্টি নিজের হাতের কীচের পায়েই দিকে। একটু আগে যে তিনি কোন কথা বলেছিলেন, তার খুঁচি দেখে বোঝার উপায় নেই।

লুন পে আর কমল ঘরের মধ্যে ছুকেই তিনি ইংসিতে পাশের খালি চেয়ারগুলো দেখিয়ে দিলেন। ছুজনে চেয়ারে গিয়ে বসলো।

একহাত দিয়ে টোডটা নিভিয়ে দিয়ে তরলোক তরল

পদার্থটি বেক নিলেন করকবার তারপর কীচের সেলকে কীচের পায়েই জুগো ভঞ্জে সাবধানে রেখে দিয়ে, হাত খুঁচি করে ওদের দিকে কিং গাড়িয়ে হেসে বললেন, 'Now I am ready to meet you young gentlemen'.

কমল বোল গাড়িয়ে উঠলো, 'ইনি আমার বাবা। জমক খোস। ইনি আমার লম্বাটি মত লুন পে।'

লুন পে গাড়িয়ে উঠতেই ডাঃ বোল লুন পের কাঁধে একটা হাত দিয়ে তাকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'বোলো বোলো, তোমার কথা কমল আমার বলছিলো। তুমি এবারে প্রথম হরেক: শুনে যত না আনন্দিত হরেকি, তার চেয়েও বেশী আনন্দ পেয়েছি, তুমি সত্যিকারের ভালো ছেলে জেনে। সত্যিকারের ভালো ছেলের ভাগি অভাব।

লুন পে বাবা নীচু করে বসে বইলো।

ডাঃ বোল চেয়ার টেনে নিয়ে ওদের সামনে বসে পড়লেন।

অনেকক্ষণ পরে লুন পে আঙে আঙে বললো, 'কমল বোলের মতন আমিও কিছু খাটপ ছাত্র। আপনি আমার আমায়ের ওপর খুব চটা।'

লুন পের কথা বলার চংয়ে ডাঃ বোল হেসে উঠলেন, 'না, না, বোটেই না। তুল শুনেছো তুমি। চটা আমি বোটেই নহ। আমি শুধু চেয়েছিলাম যে, কমল সারেল পড়ুক কারণ এ দেশে সারেলিটেরই আক খুব দরকার।

লুন পে খুঁচি তুলে চাইলো। এ কথা কেন বলছেন ডাঃ বোল? ডাঃ বোল বলতে শুরু করলেন কতকটা যেন নিজের মনেই 'বৈজ্ঞানিকের দরকার আর দরকার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী' এ দেশের শোকেরা বড়ো আবেগপ্রবন, বড়ো উজ্জ্বলহনী। এটা হচ্ছে Age of Reason, এখনও খুঁচীরা রাজনীতি চালিয়ে, ধর্মম্বা বাতলাবে, তার দেশের লোক তেড়ার পালের মতন ডাবের অঙুলি নিধেই লাফালাফি ছুটোছুটি করবে, এ

বান্ধবার অবশ্যই হওয়াই দরকার।'

কথাগুলো লুন পের মনে ধরলো না। হুংসিরাই তো দেশের জ্ঞান। সব কিছু ছেড়ে পৈত্রিকবাস সংগে জড়িয়ে ভারাই তো সব কাজে এগিয়ে আসে। কুন্দের বেশে হুংসিদের বার দিই কোম কাছ হতে পারে কখনও ?

লুন পে প্রতিবাদ করলো, 'কেন আপনি কি বলতে চান, হুংসিরা বেশকি ভালবাসতে পারে না, চিন্তা করতে পারে না জাতির ক্ষয় ?'

'তুই দ্বন্দ্ব দিই ভালবাসার কোন মানে হয় না, তার সংগে মজিক থাকে চাই। এইক্ষণই বলছিলাম, বৈজ্ঞানিক চিন্তাব্যবহার প্রয়োজন। উদ্ধাস যখন বুদ্ধিবৃত্তিকে ছাপিয়ে ওঠে তখন আসল কাজ কোনমিনিই হয় না। কেনাকি চেষ্টা ভাবলে ঠকতেই হয়। তাছাড়া হুংসিরা যখন সংসার থেকে সরে দাঁড়িয়েছে, সামাজিক জীবন বলে কুন্দের কিছুই নেই, তখন শুধু বর্ষের চিন্তা নিয়েই তো একপাশে সরে থাকা উচিত গুণের। অথচ আমাদের কথা, এ বেশে যে কোন আলোড়নের পুরোতাপে ওঠা এলে দাঁড়ায়। সব জিনিষকে বর্ষের খোলাস পরিয়ে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি করে যে বাহুব ভাবতে ভুলে যায়, নিছক একটা উদ্ধাসের ঝাঁক এগিয়ে চলে। আমরা দু'পুরুষ এ দেশের বাসিন্দা। এ দেশের সংগে নাড়ীর যোগ আমাদের। এ বেশকি সত্যিই আমরা ভালবাসি। তুমি বিশ্বাস করবে কি না জানি না নিজের দেশই আমাদের কাছে বিভ্রান্তার মতন হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ সে দেশের রাষ্ট্র সংগে আমাদের সামান্য যোগসুত্রও নেই। আমি চাই, হুংসিরা নয়, তোমরা, দেশের চিন্তা-শীল বাহুব', এগিয়ে আসবে। দেশের লোকদের ভাবতে শেখাবে, মেরুদেশে তুমি দিই দাঁড়াতে শেখাবে। তুমি তো। ইতিহাসের দ্বার, ভালোই জানো, রাক্ষুস-হিতের কাজ রাজার অভিযেকের সময়, রাজ্যবিজ্ঞানের সময় নয়।'

লুন পে নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসলো। মনে মনে

কথাগুলো সাঝিয়ে নিয়ে বলে ফেললো, 'কিন্তু আমরা এগিয়ে এলে তো হবে না। আমরা তো আট'নের ছাত্র। আপনার ভাবার একেবারে মূল্যহীন।'

ডাঃ বোল হেল লঠলেন, 'oh no, no, যেটেই তা নয়। আমার আপত্তি কোথার জানো, তোমরা আট'ন এর ছাত্র, হয় আই, সি, এল হয়ে বিলীতি গোখাক বিলিতী আবদকারক। রপ্ত করে একেবারে বিলিতী পুতুল দেখে এলে এদেরই তৈরী চেয়ারে বলে গুন্দের দেখানো বুলি আঙড়াও, হাত পা নাড়ো গুন্দেরই নির্দেশ মত, মরত বডো চাকরীবাকরী যোগাড় করে মনের আনন্দে খ্রী পুত্র নিয়ে সংসার করে। কিংবা শেষ পর্যন্ত এই কলেজেরই লেকচারারশিপ জুটবে নিয়ে বহুরের পর বহুর তালি দেওয়া নোটের আবার কাটো। মনে এককথার দেশের কোন উপকারেই আসে না।'

'কিন্তু সাংঘটিষ্টরাও তো বডো চাকরীবাকরী নিয়ে স্নেহে বন্ধনে বরকরা করে।' এতকথ পরে কল বোল প্রথম কথা বললো।

'তাদের আমি সাংঘটিষ্ট বলি না। বিজ্ঞানের গারে শুধু তাই হাত বুলিয়েছে, সাধনা করে নি। এ দেশের অতুন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ, বড়ই লজ্জার কথা যে সে সব শুধু বিদেশী কলের ছোয়ার অপেক্ষার হয়েছে। এ দেশের ছেলেরা ফিরেও চাইলো না এ সবের দিকে। সোনা, ত্রুপে', কেরোগিন কি নেই এবেশে, কিন্তু বলতে পারো তোমাদের নিজের বলতে কি আছে ?'

'কিন্তু বিদেশীরা জরী। এ সব তো বুটের বাল। যে মাটি হাতের ছোরে ছর করেছে, সে মাটি ভোগ করবার সম্পূর্ণ অধিকার তাদের আছে বই কি।' কল বোলের গলায় আঙাড় বেশ মৃদু।

'চিনাবাঘাবের গারকে পাড়ে মলে যাওয়া বার কিন্তু ভালগাছকে আঘাত করতে হলে আকাশের বন্ধকেই ডাকতে হয়। বত তোমরা ছুরে পড়বে ততই তো প্রবোণ পাবে ওরা। কুকের গুপ্ত বুট দিই মাড়িয়ে বাবে। কিন্তু তোমরা দাঁড়াও তো কাঁধ কাঁধ ঠেকিয়ে

সার দিয়ে দাঁপি কত সাহস ওষের এক পা এগোতে পারে! চীৎকার করে বসো, দেশের মাটি কাড়তে পেরেছো বলে দেশের সাহসের ইচ্ছা কাড়বার তোমাদের কোন অধিকার নেই। আমাদের আঁকি চমকে খুব পাড়িয়ে আমাদেরই ঘরে গিঁদ কাটবে তোমরা, তা হতে হবে না।—’

হঠাৎ চমকে ওঠে ঘটার আগ্রহ হতেই তাৎ খোস লবিং ফিরে পেলেন। চোখ দুটো মুঠকে কিছুক্ষণ লাড়িয়ে রইলেন তারপর লুন পের একটা হাত কাপটে ঘরে ঘরা গলার বললেন, ‘কিছু মনে করো না লুন পে। কি করার কি সব কথা এসে গেলো। অনেকদিন আঁকি এ দেশে, এ দেশের লুং কঠোর যোগে জড়িয়ে ফেলেছি নিজেকে, তাই দেশের লোকের নিশ্চেষ্ট ভাবটা তারি চোখে লাগে। ব্যাভ ক্লাস আছে বোধ হয়, না?’

লুন পে উঠে গাড়িয়ে ব্যাভ নাড়লো।

বহুজ্ঞার মোড়া অবধি ভাং খোস এগিয়ে আসলেন। কমলকে উদ্দেশ করে বললেন, ‘কমল একদিন সময় করে লুন পেকে বাড়ীতে নিয়ে এসো। বলে বলে অনেককণ ঘরে গর করা বাবে এখন।’

দি’কি দিয়ে নামতে নামতে কমল বললো, ‘

বাবা কি অদ্বুত সাহস।’

লুন পে দোজা কমলের দিকে ফিরে চাইলো। ছোয়ালো গলার বললো, ‘আপনি মহাত্মা গান্ধী। আপনার বাবার নতন অদ্বুত সাহস একটা খুব বেশী থাকে না। এদিক দিয়ে কিন্তু আপনি কাঁট, আমি আপনার অনেক নম্র পিছনে।’

লুন পে সেকেন্ড শিরিয়ডের ঘটার সংগে সংগেই বেরেবের কমনকনের কাজ বরাবর এসে গাড়ালো। এদিকটা প্রায় বেরেবের রাজত্ব। রুনের ভিতর থেকে চীৎকার আর বিল বিল হাসির শব্দ। আন্দর, রাসে এরের দেবলে কিন্তু রং চায়ের কাঁচের পুতুল বলে মনে হয়। ভীক চোখের চাঁটনি, আর ঠোঁট অন্ন কাঁক করে ফিসফিস করে কথাবার্তা। কিন্তু নিজেদের মধ্যে যখন

ফিরে আসে, হৈ হাজার ফেলেনেবু পেছনে তেপে যায়। খুব আছে পা কেলে কমনকনের সামনের ব্যাভার ফেলিয়ে তার দিয়ে লুন পে গাড়ালো। হু একটা বেরে তবু চোকবার আর খেরোবার মুখে আড়চোখে লুন পের ওপর নজর বুঝিয়ে গেলো। চার কি ফেলোট ?

লুন পে তারি অবস্থি বোধ করলো। বেরেটার নাটকও জানা নেই। বেরারা দিয়ে স্লিপ পাঠান তাত্ত সম্ভব নয়। অথচ এই রকম একটা কারগার তৈরীকণ গাড়িয়ে লোকতেও বিক্রী লাগলো। ইতিমধ্যেই পানের বাগান দিয়ে বেতে বেতে হু একটা চোকবার উঁকি দিয়ে ওর বিকে চাইতে চাইতে গেলো। কি মনে করলো কে জানে ? তার চেয়ে কিরে যাওয়াই ভালো। অল্প সময় বেরেটির দেখা গেলে খাতা চেয়ে নিলেই হবে।

ঘুরে গাড়িয়েই লুন পে খেবে গেলো। বিল বিল করে হাসতে হাসতে দ্বিট বেরে অইং জের ট্রেলে ছিটকে বাইরে এলো। একটা এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বেরে, সংগে লুন পের পরিত্তি বেরেটি। বেরেটি লুন পেকে মেখেই এগিয়ে এলো, ‘আরে, কতকণ গাড়িয়ে আছেন ?’

‘ভা প্রায় মিনিট লক্ষ মনোবো হবে।’

‘বেরারাকে দিয়ে একটা স্লিপ পাঠালেই পারতেন।’

‘তবু স্লিপ তো আর পাঠানো যায় না, কিছু তো একটা লিখতে হবে তাকে। আপনার নামই তো জানি না।’

বেরেটি বিল বিল ক’রে হেসে উঠলো, ‘ওহা, তাই তো বটে। এক কাক করলেন না কেন, লিখে পাঠালেই পারতেন, বে বেরেটি আমার ইতিহাসের মোট কেড়ে নিয়েছেন তিনি বাইরে আসুন।’

লুন পে হেসে কেললো।

‘স্বাভান, মোটটা নিয়ে আসছি’ বেরেটি একটু ঘুরে স্টের গাড়ানো এ্যাংলো ইন্ডিয়ান বেরেটিকে কি বললো হাত মুখ বেড়ে, তারপর দুই মনে কমনকনে ঢুকে পড়লো।

একটু পরেই বেরেটি ওরিয়ে এলো, বুচকি হেসে

বললো, 'এই নিম্ন আপনার বই। আমার নাম হাটিন, মনে থাকবে তো?' লুন পে খাড নাড়লো, 'হাসুয়াবি আর বুটখোসের টিকুকা আর জটির তালিকা বখন লুখ করতে শেখতি, তখন আর নিজের ঘেপের ঘেপের সহজ নামটা মনে থাকবে না?'

যেহেটি হাসলো। যেহেটি একটু বেশীই হাসে— কারণে আর অকারণে। লুন পের মনে হ'লো গালের ছুটি টোল দেখাবার অভ্যই বুদ্ধি যেহেটি ওবনি করে সময়ের অসময়ে হাসে।

'এখন তো আপনার ক্রাস নেই?'

লুন পে খাড নাড়লো।

'চলুন একটু বসি মাঠে গিয়ে। আপত্তি আছে?'

যেহেটি গোখ ছুটি তেরটা ক'রে চাইলো।

'না, আপত্তি কিসের?' লুন পে বহিরা হ'য়ে উত্তর দিলো। কিন্তু এই রোকে মাঠে গিয়ে কোথায় বসবে দুজনে? ঠিক হুপুর বেলা পাশাপাশি বসে থাকলে আপোপানের ছেলেবোনেরাই বা মনে করবে কি? কিন্তু যেহেটি চলতে শুরু করার লুন পেত্ত তালে তালে পা ফেলে এগিয়ে চললো।

অনেকগুলো বাঁশপাতের কাড়। লম্বাচোপিত বলেই মনে হ'লো কারণ গোল ক'রে অনেকখানি জারগা ছুড়ে পোতা হ'য়েছে। তলার একটা শুকনো পাত্তা নেই। বেশ খানিকটা জাভার আঁড়।

যেহেটি ক্রমাল বিছিয়ে বসে পড়লো। লুন পে বললো একটু হুরে।

'ইতিহাস নিয়ে কি করি বলুন তো?' যেহেটির গলার আঙঠাকে অসহায়তার আবেহ।

লুন পে চেয়ে দেখলো। বাঁশপাতের কঁক দিগে চুলে আর বাঁ দিকের দাগের ওপর রোদ এলে পড়েছে। ঠিক ঠিক করে উঠছে চুনগুলো। বোঁপার আটকানো লাল রংয়ের ফুলটা আঙো লাগ মনে হ'লো রোদের ছোঁয়ায়। গলার নীল রংয়ের পাংরের মালাটা এক

হাতে দিগে অড়িয়ে যেহেটি এক দৃষ্টে লুন পের দিকে চেয়ে রইলো।

লুন পে হেসে বললো, 'কেলে দিগে আতুন লেহংয়ের জলে। আপন চুকে বাবে?'

'না, না, ঠাট্টা নয়' যেহেটি ব্যাকুল গলার বললো, 'আপনি আমেন না কাল অনেক রাত অবধি ইতিহাসের বইটা নিয়ে বসেছিলাম। মাথা ক'রে উঠলো। জাঙ্কা বলুন তো, কোথার মিশর আর কার্বেজে লোকেরা কি করলো হাজার হাজার বছর আগে তাই নিয়ে উদ্ভিদ শো উদ্ভিদ লালে এদেশের একটা ঘের কেন মাথা খামাবে?'

'ওই তো ইতিহাস। মাটির ওলার, পথের আড়ালে যে সত্যতা লুকিয়ে আছে, আপনার জ্ঞানের কাঠির ছোঁয়ায় সে সবের ঘূন ভাঙতে হবে। আগের মানুষদের না জানতে পারলে আজকের মানুষদের চেনা যায় না।' কথাগুলো বলেই লুন পের মনে পড়ে গেলো, একটা কথাও ওর নিজের নয়, লম্বা শেহাজীর শেখানো। তুনে তুনে কথাগুলো ওর অছি মজার মধ্যে মিশে গিয়েছিলো, নিজের লজীরের একটা অংশের মতন। আরও একটা কথা বলতেন শেহাজী, বলতেন, আগে নিজের বেশকে ভালো ক'রে জানো। হাজার বছর আগে আমাদের দেশ কি ছিলো, সেটা জেনে তবে অন্য দেশের ইতিহাসের পাতা ওঠাও। শেহাজী বলতেন, আমাদের দেশের আলল ইতিহাস জানো, ওদের কালিতে, ওদের কলবে ওদের মতন করে লেখা ইতিহাসের কোন নাম নেই। কিন্তু যেহেটিকে এমন কথা বলে কি লাভ?

যেহেটি পাংরের মালা থেকে হাত সরিয়ে নিজের কোলের ওপর জড়ো ক'রে রাখলো হাত দুটো। খুব মিহি গলার বললো, 'কি জানি, ইতিহাসটা আমার বড়ো ঘট ঘট লাগে। কেবল ঘটনা আর লালের ভিত্তি।'

'এটা হয় পড়াবার শো

আবার ভালো লাগে না। আপনি হয় তো শুনে হাসবেন, আমি যে দী থেকে এগেছি, সেই সোয়েবিন গাঁয়ে একটি বুড়ো শেরাজী ইতিহাস পড়াতেন। বুড়ো বাহুব কিছু খুব পণ্ডিত। ইংরাজীতে অসম্ভব দখল। কি অসম্ভব ক'রে যে ইতিহাস পড়াতেন আপনাকে ব'লে বোঝাতে পারবেন না। রূপকথার বস্তু ব'লে যেতেন, আমরা চুপচাপ শুনে যেতাম। বাঙালীতে এসে আর বই পড়তে হ'তো না। অবজ্ঞা পছন্দ নয়, কিন্তু সেই শেরাজী যদি কলোজে পড়াতেন, দেখতেন ইজিপ্টের ইতিহাসও কি ভালো লাগতো আপনায়।'

কথা বলতে বলতে লুন পে আচমকা থেমে গেলো। গলার কাছে কি একটা। যেন ফুঙালী পাকিয়ে উঠলো আর হৃকের ঠিক বাতখানটায় অসম্ভব একটা ব্যথার মোচড়। আশ্চর্য, যেহেতু দুটি হাত গালের ওপর রেখে এক দৃষ্টে চেয়ে রয়েছে ওর দিকে। ঠোট দুটি অন্ন কঁক করা। কপালের ওপর এসে পড়া দু'একটা টুকরো চুল উড়তে এদিক ওদিক। অবিকল এক ভাঙ্গী।

সোয়েবিন গাঁয়ে কেলে আসা আর একটি ঘরের দরশন ব্যাপন, চাউনি সব কিছু কেনন ক'রে নকল করলো পছন্দের এই বেয়ে। আরো অস্বস্তি লাগলো লুন পের বাতাসে গুলে তঠা বাপঝাড়ের গোঙানীর আওয়াজে। লম্বাই মিলে যেন শব্দবদ্ধ করেছে। ওর মনটাকে টেনে ছিঁচড়ে নিয়ে যেতে চায় হাজার মাইল দূরের এক গাঁয়ে। সেখানকার বাপঝাড়ের নিচে অজ্ঞ আর এক জনের পাশে বসিয়ে দিতে চায়। মা দিন আর রাটিনকে এক ক'রে দেবার বিশ্রী এক বড়বয়।

লুন পে হঠাৎ একেবারে ঝাড়িয়ে উঠলো 'চলি, একটা কাজ যেন পড়ে গেলো। বস্ত্র ছত্রী কাজ।' পিছন দিকে না চেয়ে লুন পে হন্ হন্ ক'রে মাঠ পার হ'রে গেলো। একেবারে বাতাসের কোণ ঘেঁসে ঝাড়িয়ে একবার ফিরে চাইলো, যেহেতু ঠিক তেমনি ভাবে বসে রয়েছে। এতদূর থেকে বাপঝাড়ের গোঙানীর আওয়াজ কিছু লুন পের কানে এলো না।

(ক্রমশঃ)



দাশ পটীম জৌমিক

'এই বেশ'—ভাবে শুভংকর। তাঁর দকলে
জুয়ারনৌলী পাছাড়ে পাছাড়ে স্বর্গমন্দের আভরণ,
কানাগার কাঁচে নীতকাতুরে যোদ্ধারের গুণ অড়ানো
লজ্জা, পাছাড়ে বেরা ভেদা বনানীর সারিবদ্ধ পাটগুলোর
সবলে স্থানীয় সিদ্ধান্তি, আর তাঁর পানীর উজ্জ্বল
মতো বীনাকী।

তবুও তবুও কোথাও বেন.....

বাক। পেছনের চুকিরে দেখা দারস্থতির নিষাঙ্গই
নেরা বাক বহন। সেই ভালো। আগামী পথের
জ্যামিতি বহনছে সাধনে। নতুন জীবনের এতিয়া
ধরে হাঁটার পূর্বসংক্রান্তি এখন, পা মেলাবার প্রথম
পাঠ। কিন্তু সংযোগে সরলরেখার স্বীকৃতি আদার
করতে হবে বীনাকীর কাছ থেকে। নইলে.....
নইলে?.....

নতুন পরিবেশ অভিনববে গুণের ঘনিষ্ঠতার মধ্যে
তাগেবাগার রঙ একটু বেশী করেই রোদ ছড়াক, ভাবে
শুভংকর যে রঙ স্বর্গ ভূবে গেলে আকাশে জলবে আরো
অনেককণ, অরবক্ষ্যেষ্টি মতো।

তবু বীনাকী বেন কতদূরে, স্নহুরের তারার মতো।
ওর সিঁদালোক ভালো লাগে, কিন্তু হোয়া বার না।
বীনাকীর মন বেন মতো হেঁচা পুড়ির মতো, বার
মতোটার নাগাল না গেলে বুড়িটাকে অধিকার করা বাবে
না কোনদিন। বুড়িটা নজরে পড়ে আকাশে, অথচ
কোথাও বুঁকে পাওয়া বার না মতোটার মূখ। বুড়ির
মূলতা লজ্জাবৃত্তি, কিন্তু মতোর মূলতা বাবা চোখের
জ্বালা মতোই নির্বোধ, নিলুট। ক্রান্তি আসে
শুভংকরের, স্রষ্টির বেবে হাটু ডেকে আসে গুর, তবু
থানিতে বাঁধা নয় শু, বীনাকীর স্তম্ভাংশ নিয়ে বেঁচে
থাকতে চায় না শুভংকর।

বীনাকীকে সে প্রথম দেখেছিল এক গানের আসরে।
রাত বেশী হওয়া বান-অভাবে থাকে শুভংকর চৌরকৌর

ওরাই, এম, সি, এর উৎসবধর থেকে ভাবানীপুর
পদ্মপুত্রে তার গাজীতে একটি দিকট দিয়ে দিয়েছিল
নারীসমবহুর ভালো লাগা স্তম্ভাংশ। একটু আলোপেই
আনতে পারে শুভংকর বীনাকীর বাবা মতোলেতে
গোঠি মটোর ছিলেন, যেখানে আশ্রয় ঘটনাচক্রে ফলে
তার বাবাও দীর্ঘ পট্টি বস্ত্র ডাক্তারী করে কাটিয়ে
ছিলেন অসুস্থ প্রতিপত্তিতে। পূর্বপুরুষের সে পরিচিতির
আলপথ বেয়ে শেষ পর্বত বোটারিকলের অনেক বিকল
কেন্দ্রাঙ্কিত হল বীনাকীর চোখে, রেড রোড চিরে
শুভংকরের কাণ্ডারর ফড়ে অনেক বর্ষা-বোত্তরা গ্যাল-
নীল-অলা রাত কবিতা হয়ে রইল বীনাকীর বিশ্বরণ-
জুঁমিতে গুণেমিলের স্বপ্নলজ্জার গর্ব নিয়ে। অনেক
বসন্ত আকাশ চৈত্রদিনের ব্যর্থতা নিয়ে ফিরে গেছে
শুভংকরের বীনাকীমুগ্ধ অপরাজে, আবার অনেক চৈত্রানী
সুদিক্কা-হুগুর বসন্ত সুদিনার সিঁদ বারার আবেশ
বুনিমেতে বীনাকী বন সারিয়ে।

তবুও, হ্যাঁ, তবুও বেন কোথায়.....

প্রথম হোঁচট পেয়েছিল নিখনি ব্যাংকপুরের
গজাপারের বাগের ভূমিতে বসে যেদিন বীনাকীর হাত
চোপে ধরেছিল ও। ওপারের বিকলেদে ধরতী
আকাশের ওলার ইটের পাঁজার কর্ণরত মজ্জ-মজ্জানী,
সজ্জার পাগে-হাওয়া-লাগা মজ্জগতি মহাভনী নৌকা,
এক কীক নাম না জানা হঠাৎ ডেকে চমকে দিয়ে উড়ে
বাঁধরা পানী, জলচক্রে টেট ছলিয়ে শুভংকর
জিগবাকী, আর লজ্জা বাগের ভূমিতে বসে এই পরিবেশে
উজ্জ্বল কান বেগের হাত চোপে ধরা—শুভংকর
ডেবেছিলো। এতে কোথাও চন্দ্রপতন নেই, ওর সব
কিছুই মিলিয়েই একটা পূর্ণাঙ্গ সনেট বৃষ্টি। তাই
বীনাকীর হাত চোপে ধরে মুগ্ধ আকর্ষণ করেছিল
শুভংকর, বীনাকীর লজ্জাশ্রী-উজ্জল মুগ্ধের ওপর নামিয়ে
এনেছিল ওর নিজের মূখ। কিন্তু হঠাৎ ফিগের মতো।

প্রচণ্ড বাত। ঘিরে গুকে সরিয়ে ঘিরে উঠে গাড়ালো মীনাকী। চাপা অঘট ভীষ বঠে চোঁচের উঠল, 'ক্রট'—কাপছে মীনাকী। উত্তেজনার।

বিস্ময়ভ্রান্ত হরে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল গুতংকর। সন্ধ্যার সূতো তখন রাতের লাড়ী বুনে চলছে রক্তপাক্ষিক ক্রমভার। গাড়ীর চাবিটা হাতে নিয়ে বখন ও উঠে গাড়ালো, তখন অবাধ হয়ে দেখলো মীনাকী কাছে কিনারে নেই কোথাও। চিপ চিপ করা বুক গাড়ীর ভেতর খুঁকে দেখলে পেছনের হুগনে গভীর প্রান্তিতে চোখ বুজে পড়ে আছে মীনাকী। তন্ত্রাতুরা।

আন্দর!

ব্যারাকপুর ট্রাংক বোডের নিৰ্জনতার গাড়ী বখন ছুটে চলছে চল্লিশ মাইল বেগে তখন হঠাৎ গুতংকর চমকালো মীনাকীর হয়ে। হুয়েও।

—ওত, আমি তোমার পাশে বসব গুতং—

আর তারপর প্রান্তবিশুর চোখ ছুটো ওর চোখে রেখে অসহায় গলায় ভেঙ্গে পড়ে মীনাকী—কিছু মনে করেনা, ভুল বুকে না আনাকে—

ভুল বোঝেনি গুতংকর। যদিও কোথাও যে কোন কঁক রবে পেছে, কোন অন্তর্গতিক গভীরতা, এটা সে বুঝেছিল ঠিকই। শুধু ভুল বোকে নি মীনাকীকে।

তাই, ওয়েলিংটনের ব্যারেক্স রেজিষ্ট্রারের বাড়ী থেকে একদিন বেগিয়ে এল ওরা। হাতে হাত জড়িয়ে। হু'জনে।

তারপর অনেক ফুল আর হাসিখুসীর কথা, অজস্র প্রেমেস্ত মরে উঁচু পোসাইটিভ টরলেট থবা খেনো বাতাসে উৎফলিত করেকটি দিন। তা'ও কাটল স্বাভাবিক ভাবেই।

আর তারপরই আবার চমকতে হলো গুতংকরকে। নামনে আবারো বাদ। পিছু ছুটে এলো ও। কিন্তু পালালো না।

হাসিনা সার্কুলার রোডে রাত নেমেছে পৌষালী।

সুন্দর নীল আলোটা মীনাকীর লাবণ্যর যতোই অগুহে। কখনোনির নীলিমা খেন। ভুল হয়নি কিছুই। বাটের বাজতে ভাঙা খোঁপা ছড়িয়ে মাথা ঘেঁষে কাৎ হরে বসেছিল মীনাকী। মনোযোগে ভীটীট খেন তালোবাগার মতো অরেল। হু'হাতে মীনাকীর কাঁধ জড়িয়ে বুক টেনে নিরেছিল গুতংকর। ভীক পাকীর মতো কাপছে মীনাকী। নিঃশব্দত চোখ দুটো গোলাপ কুঁড়ির মতো বোজা।

আজ্ঞে করে, বেন কত ভয় মীনাকী, গুর বোজা চোখের গুপার টোঁট হোলাল গুতংকর। আর তারপরই খেই গুতংকর মীনাকীর টোঁটের কাছে নামিয়ে এনেছে মুখ, তাঁর একটা চিবকার করে উঠল মীনাকী।

—না না না ছাফো, ছাফো, আনাকে। উঃ জানোয়ার, কাউন্সেল, ক্রট।

—'কি বলছ, কি বলছ মীনাকী, আমি, আমি গুতংকর। মীনাকী'—হু'হাতে ধরে ওকে প্রচণ্ডভাবে জাঁকতে থাকে গুতংকর।

—'খাঁ' বিবর্ণ নামাটে চোখ ভুলে থাকার মীনাকী। পরিপ্রবে ইপাতে থাকে ও,—ভুমি গুতং, ভুমি। তবে তোমার মুখে ও দাগ কিসের? ও দাগ এল কোথেকে?—

—দাগ? কোথার দাগ?—হু'বোবা মনে হয় গুতংকরের। কট করে উঠে বড় আলোটা আলিতে আরনার সামনে ঠাড়ার ও। মুখ দেখে।

আন্দর, মীনাকীর লাল রঙের লাড়ীটার জাঁকল থেকে বলা এক গোছা লাল সূতো গুর কপাল থেকে গালের গুপার লেপটে আছে। নীল আলোর কালচে দাগের মতো দেখাচ্ছিল বুঝি এটাকেই। কতচিহ্নক মতো।

—কই মীনাকী। দাগ কোথার? এ'তো করেকটা? হু'তো লেপটে ছিল—সুতোটা হাতে করে ভুলে ধরে গুতংকর।

—ও—ওর কেটে বাওয়া ক্যাকাল হাসি হাসে

মীনাকী। তারপর শুভংকরকে জড়িয়ে ধরে ওর বুকে
স্থগে গেছে।

—তুমি আমার কথা করো, কথা করো শুভ, তোমা
চোখের পাড়ার ওল ডিক ডিক করে। ঠোঁট দুটো
কাপড়ে আশ্রয়ের অবৈধ নিবে। সারা মুখে ওর স্নায়ুর
হাশ। শুভংকরবড়।

অনেকবার বলেছে শুভংকর, বলেছে,—চলো কোন
সাক্ষিরাটিকের কাছে যাই, তোমার এ মানসিক
রোগের প্রকৃতি ধরকারি—

প্রচণ্ডভাবে মাথা ঝাঁকিয়ে আপত্তি করেছে
মীনাকী।

—বামো তুমি, আমার ওলব লেহে গেছে। ভালো
হয়ে গেছি আমি—

—মোটাই না,—অবশ্য বের শুভংকর,—তোমার
লাবকলাস মনে কোথাও কোন ঝাঁটা রয়েছে, কোন
ধাঁবা। এর মীনাকী না হলে আমার স্ত্রী হতে
পারতো না মীনাকী, এটোমের হেয়াল না তাওলে
সহজ হতে পারব না ছুঁয়ে। আচ্ছা, তুমি মনে
করতে পারো, কেন ঐ রকম চোঁচাও ? কিসের দাগ
নেবে তোমার অমন ভর ? কার মুখ মনে পড়ে ?

—চূপ করো, চূপ করো!—মুখ পাণ্ডটে হয়ে যায়
মীনাকীর, —না না, কিছু না, কিছুই মনে পড়ে না
আমার। কোন কিছু জানি না আমি সত্যি জানি না।
তুমি আমাকে বিশ্বাস করে শুভ,—শুভংকরের হাত
দুটো চেপে ধরে মীনাকী, কারার ভেঙ্গে পড়বে বুঝি
একুনি। তারপর কাতর চোখ দুটো ফুলে বলল হঠাৎ,
—তার চেয়ে চলো শুভ, বোলকাতার বাইরে বাই
কোথাও। এখান থেকে পালিয়ে বাই কিছুদিনের
জন্মে। চলো, এ অন্ধকূপের বাইরে কোন পাহাড়ী
জায়গার, সেখানে গেলে, যেখা তুমি, আমার লব রোগ
কেটে যাবে, সেয়ে যাবে সব অন্ধ। যাবে শুভ, কালই
যাবে ?

—কাল ?—একই অথাকই হয় শুভংকর, শুভ

আশাবিত হয় সে। উজ্জল কর্তে বলে,—কাল না হোক,
দু তিন দিনের ভেতর যাওয়া বাবে বরং। তুমি যা
জানোবার জেনেতে ছক করো, আমি ওদিকে কাজের
দায়িত্ব থেকে ছুটি নেবার ব্যবস্থা করি গে।

—ও শুভ, তোমাকে আমি, আমি—কি করে
হেসে ফেলি মীনাকী। স্বমীরাগ মনের পাথা নাচার
আনন্দে। দুহাতে শুভংকরের গলা জাঁকড়ে ধরে
ফুলতে থাকে আকার-নিষ্টি কিশোরীর মতো।

তারপরই শিলং। পাহাড়ী দেশ। শিব্রতামরী পর্বতকরা।

'এই ভালো,'—ভাবে শুভংকর। আজ ক'দিন
ধরে ওরা এসেছে শিলং। এর মধ্যে এমন পর্বত
একদিনও মীনাকীর মানসিক অস্থিরতাকে খা মের নি।
বরং মীনাকী যেন আগের চেয়ে অনেক বেশী প্রাণবন্ত
হয়েছে। সময় সময়ের ওর চাকলা লাগে চকিতচরণী
হরিনীর মতো, চললমজী সর্গার মতো হুড়ি লাগরের
বুকে ঠোকর লাগত। হাসি বাজে ওর মিঠে জলন্তনের
বোলে। হরতো, ভাবে শুভংকর, সেয়ে উঠেছে মীনাকী।
হুড়ি শেষেছে দুই গ্রেহের হুংসিং কবল থেকে। বুকে
এক বলক তেজা হাওয়া টেনে নেয় শুভংকর, শিলংকে
বুক ভরে টেনে নিয়ে ছেড়ে দেয় আনন্দের কাচে জমে
থাকা কিছুটা কুয়ার গলিরে। একটা হাত রাখে পুন্ডর
মীনাকীর মাথার। ফুলে। আত্মশের ঠিকনী বুলোর
মেহমিঠে ময়ংতার।

যাক। অতীতের ছ'চারটে কালা যাক। তোলা
যাক সে সব। যাকের ছ'চারটে তারা হারিরে যাক
শ্রবণ মিথালোকের উজ্জলো।

কেড়ে ফেলতে চায় শুভংকর, তেজা পাথা থেকে
পুন্ডর সূত্রের ওল কেড়ে ফেলতে চায়। নতুন রোগ
পড়ুক পাথার, নতুন আলো।

কিছু কই, সেয়েছে কই ? হঠাৎ সেদিন এক
ইংরেজী যুদ্ধের বই দেখতে গিয়ে ব্যাপ্তক খোলা
অভ্যুত্থ ওরা। একজন সৈনিকের ফ্রোক আপেকের
অস্থিরতাকে খা দিল মীনাকীর। জান হারালো শেষ

পৰ্বত। সমস্ত আশা হুলিনাৎ হয়ে গেলো শুভংকরের।
হুশিত্তার পাখী পাখা কাপটালো। এর কিনারা তাকে
করতেই হবে। নইলে.....

ব্রাহ্মই বর্ণান। বৃত্তীশ টুটিট। আবার ভালো
আঁকিয়েও। ঘুরতে ঘুরতে শিলংএ এসেছেন তিনি
বেড়াতে। রিক বেড়াতে নয়, শরীরটাও নাকি ইকানীং
ভালো নেই তার। আর কে যেন তাকে বলছে
শিলংএর ল্যাঙসকেপ ও গুয়াডাংকুস, ইটস্ আটটিস্
প্যারডাইস! শুভংকরের সংগে আশাপ হল বর্ণানেব।
আশাপ হওয়ার পেছনে মতো এক তারণ আছে
অবিস্ত্রি। যা দেখে প্রথম ভীষণ চমকে উঠেছিল
শুভংকর। দাগ। ঝা চোখের একটু নীচ থেকে গালের
মাকানবি পৰ্বত মতো এক স্তম্ভচ্ছ। সে স্তম্ভচ্ছ
যেন বাহু জামে। সে বাগের ছুনিবার আকর্ষণে
শুভংকর আশাপ করলো বেড়ে। লিক্ ট বিল হোটেলে
পৰ্বত। বৃত্তীশ সঞ্চিত্তর ওপর আলোচনা করল সুদ
জজের মতো। তারপর বর্ণানের ল্যাঙসকেপ বেখে
বৃত্তীশ জ্ঞানদাল আট ও তারতীর শিলের বিশেষণ ওপর
আন্দর সনালোচনা করল বিবর্ত কলাসনালোচকের
মতো নিম্পূর্ণ গন্তঃগতিক চংএ।

খুশী হল বর্ণান। রিভাল ইন্ডিয়ান ক্রেণ্ড বলে
যেনে নিল শুভংকরকে। ফেরবার পরে চানতে জুলে
বাঙরা শিগারেট আনুলে চোপে তাবল শুভংকর, না,
খুব শাবধানি এজতে হবে। রহস্যের হাশি পেতে হবে
বীনাঙ্কীর মনেত। তবে খুব ধীরে, তৎপরতার বিপর
ঘটে বাঙরা এমন কিছু অসম্ভব নয়। শ্রীরার পাণ্ডালো
শুভংকর।

প্রথম আশাপে বীনাঙ্কী টেঁচেয়ে উঠবে হুঁহুহুহু-
এজের মতো—এই ভেবেছিল শুভংকর। কিন্তু আন্দর,
বীনাঙ্কী ভেমন কিছুই করল না, শুধু ধীরে ধীরে ঠোট
কাঁড়ালো একবার, আর হাসলো কৃত্তির বুখোল
এটে একটা মতো ফাড়া কাটল—আশ্চর্য হলো ও।

দেখা বাক, কন্দুর গড়ায় ব্যাপারটা, রক্তজোখবাটনে
উৎসাহে বৈধ বাঁধে শুভংকর, বৈধনীল হর ও।

—এই তো সেরে গেছে তোবার রোগ—বীনাঙ্কীকে
উৎসাহিত করে শুভংকর, 'বাবা—ভেবেছিলাম ওর কাটা
খুব মেখেই ছুবি চোঁকাবে। কিন্তু কই, বেশ ভালো
আলাপই তো করতে পারলে—

আমীর কথাই হাসল বীনাঙ্কী। একটু ঘোঁরাটে
হাসি। অস্ত্রমনক কটে বলল,—সেরে গেছে, ভালো
হয়ে গেছি, না? তারপর জ্ব্ব হয়েই হেসে ফেলল,—
'এখনো চূপচাপ বসে? বেরবে না? আমি এক
মিনিটে তৈরী হয়ে নিছি—

যা ভেবেছিল শুভংকর সব উটে দিলো বীনাঙ্কী।
বর্ণানের সংগে খুব সহজভাবেই কথা বলল ও।
বর্ণানের বাখালী ঘেয়ে সম্পর্কিত প্রাপ্তি, চুল আর
চোখের প্রাঙ্গনা স্বভাবজুলন্ত লঙ্কার গ্রহণ করল
বীনাঙ্কী। কাপে চা চাপতে হাত কাঁপল না একটুও,
কেক কাটতে ছুবি। প্রাঙ্গনে ঐটি থাকে না কোথাও,
চোখের তারার আলো। এমনকি পোষাকে অনেক
লঙ্কাকে বিবেশী ধাঁচে লঙ্কার রূপান্তরিত করেয়ে যেন
বীনাঙ্কী। নিরাবরণ অনেক তত্ত্বাংগ আবরণীর চাইতে
ডের আকর্ষণীয় করে তুলেছে ও, আবার অনেক সজ্জ
আবরণীর আটো ধাঁধুনি আকর্ষণীয় করে তুলেছে
নিরাবরণের চাইতেও।

অব্যাক মানে শুভংকর। বিমিত হর ও।

সেদিন ছিল ভোববারের বিকেল। শিলংএর
বিকেল। বেড়াতে ঘেরিয়েছিল ওরা তিন জন। বর্ণান
শুভংকর আর বীনাঙ্কী।

নানা ভাংগা ভাংগা গরজতবে পাহাড়ী ভাঙরে
অনেক দূর চলে এসেছিল ওরা। হঠাৎ বীনাঙ্কীর
কথার গামলো লবাই।

—উঃ, হাঁটছি তো হাঁটছিই। শানবার নাম নেই।
আবার বাপু পা বাঁধা করছে। আমি ঐ পাখরটার
বললাম—খামের দিক থেকে নাকের মতো উঁচু হয়ে

খাকী পাথরটার মনে পড়ল মীনাকী। হাঁ হাঁ করে উঠলো বর্ণন। মিলেস চ্যাটার্জীর বক্তৃতা কষ্ট হল। আশাবাদের একেবারে খেরলেই ছিল না আপনাদের কথা, হাসিলো বর্ণন।—তুলেই গিরেছিলাম, দেয়ার'স এ লেডী এমংস আস, এককিউড ম্যাডাম—

পাথরটার ওপর জাঁকিয়ে বসলো নখাই। তিনজন। পেছনে পাহাড় হাড়িখে আছে এটল গাছীখোঁ। সন্ধ্যা হাওয়াটা রান্ধাটা। হুজুরের মতো পাহাড়ের গা বেঁচে ঘুরে গেছে নীচের দিকে। সামনে গভীর বাধ। বন জলধর উপত্যকা। ঘুরে উঠে নীচু পাহাড়ের গায়ে ছোট ছোট বাংলো। স্মৃতির পরিবেশ। আর এ পরিবেশে সবচেয়ে ভালো দেখাচ্ছে মীনাকীকে। তারী স্মৃতির লাগছে ওকে।

নিঃশব্দতা তাহলো বর্ণনাই। —‘এরকম পাহাড় দেখলেই আমার মনে পড়ে হুজুরের কথা। প্রথম মহাহুজুর আমি লড়াই করেছি যেসোপেটেমিয়ার। আই ওখাক এন ইনকেন্টিম্যান, আউট এন্ড আউট গোলমার—

—তাই নাকি? অবাক হর শুভংকর, ‘একেবারে লখ্যালটাই মনে হচ্ছে আপনাকে—

—সেজগুই, ইউ নো চ্যাটার্জী, আই হেট ওয়ার, হুজু আমার একেবারে বিপরিত করে দিয়েছে। কেমন উল্লাস হয়ে বার বর্ণনের মূহুর,—উইয়েস, আমি একজন আর্টিস্ট, শিল্পী। হুজুরের প্রচণ্ডতম নরকের মধ্যে বসেও তাই টেক থেকে হঠাৎ আমার ভালো। লেগে গিরেছিল একফালি আকাশ, অজগামী হুজুরের লাগিলা। হুজুরের মতো জাঁকতে গিরেছিলাম ছবিটা, কিন্তু সন্ধ্যা পক্ষের কানান শিল্পরসিক নয়, তাই প্রচণ্ড একটা গোলা, আর তারপর দাঁধ হ’মাসে মিশিটারী হাসপাতাল—

—আর তাতেই কি আপনাদের হুজুর এই লাগ? শুভংকর জানতে চায়, আড় চোখে তাকায় ওর দিকে।

—বাগ? বেন কতঘুরে বলে আছে বর্ণন, হুজুরের দীপ থেকে ভেঙ্গে আসছে বেন তার কণ্ঠস্বর,—না, সে লাগ চোখে দেখা যাচ্ছে না,.....হুজুরের লাগ আমার

পাঁজের। হুজুরের মনে মনে চ্যাটার্জী!... রক্তস্রব হাসি কোটে বর্ণনের ঠোঁটে, হুজুরীভরা চ্যাটার্জী।

—বেথানে জলিবাগদাদ রক্ত, সে স্বর্ঘ্যতার মনে আসনি বুঝাই মূল কোটাতে চেঁচিয়েছিলেন। বেরনেট দিয়ে কি কবিতা দেখা বার মিং বর্ণন?

—ইয়েস ওয়ার ইক এ কাস। কাস’অন কালচার। হোরেন ক্যানন রোয়াল, মিং চ্যাটার্জী, কলম আর তুলি তখন চুপ করে থাকতে বাধ্য

—আজ্ঞা হুজুরের গল্প আপনাদের খুব মনে আছে, না মিং বর্ণন? আরেকটা জগৎনেই চব্বকে উঠল মীনাকীর বাকানো কথার তুরে।

তবু হাসল বর্ণন। —তা কি তুলতে পারি? যে হুজুরি জীবন আমি প্রত্যক্ষ করেছি মিলেস চ্যাটার্জী, উঃ ইউ কান্ট ইমাজিন। নৈতিকতার কি অধঃপতন যে আমি দেখেছি—

—ওঃ বাবা দেহ মীনাকী, ‘আজ্ঞা তা’হলে একটা হুজুরি ঘটনা শোনাই আপনাকে। আমার নিজের অভিজ্ঞতার গল্প, হুজুরতা,’ বেন জীভু-একটা রেলবাগ হামল মীনাকী, আপনাদের। বক্তৃতা বর্ণন তখন বোমা পড়তে খুব। পাগলের মতো তবু প্রাণ বাঁচাবার ভেত্রে হুজুরের মতো ছুটে আসছে ইত্যাদি বর্ণন। বেন বেনো জলে ভেঙ্গে আসছে কলুরীপানার বর্ণন।

বেন জলে এসেই হেঁটে হেঁটে রবে পড়ে হেঁচে উঠল কত লোক, কত লোক হারিয়ে গেল জলদের ভেতর। এরনি স্নান অবস্থার একটি পরিবর্তনের সংগে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল একমুগ্ধ সৈন্তের। ক্যান্ট্রেলক ব্যাটেলিয়ন। মনে পড়ছে মিং বর্ণন?

—হোয়াট ডু ইউ বিন মিলেস চ্যাটার্জী, ডু ইউ— বলে অবাক চোখে তাকায় বর্ণন। কোথায় বেন সে খেই পাচ্ছে না কথাসংলাপ। বোঁরাটে লাগছে। আমতা আমতা করে ফের চুপ করে বার সে বোকার মতো।

চাপাকর্মে প্রায় করে শুভংকর,—কি হচ্ছে মীনাকী?

অন্যতঃ এক কলক হাসি মুষ্টিয়ে বলে চলে বীণাকী,
—বেশা বেশে ওখানে একটা রেল লাইনও রয়েছে
জঙ্গলের ভেতর দিয়ে যেটা সৈন্ত সত্বেয়ারের জন্তে তৈরী
হয়েছে নতুন। তার স্তম্ভগ্রার ইভাকুয়ারিও বল সে
সৈন্তদের হাত পায়ে বরফে, দয়া করে যদি তাঁরা তাদের
পার করে দেয় জঙ্গলটুকু। আর হাঁটতে পারছেন না
তাঁরা, হুঁ এক গজ বেয়েই হুখ বুঝে পড়তে হবে।
সৈন্তরা গাড়ী হতো নাহে নাহে, পার করে দিত কাউকে
কাউকে। সে পরিবারটির যে কর্তা, সেও অর্ধের
বিনিময়ে পরিবারটিকে পার করে দেবার জন্তে হাতে
বল ওদের করেকজনকে। পরিবারে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীণেকটি
তখন মৃত্যুবরণে। এক কদমও হাঁটতে পারছেন না
তিনি। অবিশ্রিত ওরা গাড়ী হল গুল, বলল, হাতে ট্রেন
এলে ওরা মাল ওরাগনে ফুলে পার করে দেবে। না,
টাকা চাই না ওদের। হিউম্যানিটির প্রচার কিনা
স্বাধী, তাই। রাতে ওরা পার করে দিল টিকি।
কিন্তু বললে মাল ওরাগন বন্ধ করে পরিবারের একমাত্র
বেরেটিকে আর তার স্তম্ভগ্রার মাফেও, ওদের ছোট
দলটার সব ক'জন লোকই, হি...হি...হি...করে হঠাৎ
উল্লাসী ভীত হাসিতে কেটে পড়ল বীণাকী। কি,
বর্গান, বনে পড়ছে না তাদের কথা? আশি কিন্তু
তুলি নি। অজান হয়ে গিরেছিলাম টিকিই, না যাওর
আর পরিচয় কতটুকু সজি থাকে একটা মেয়ের গুণ,
যে এই একমল নেকডেকে চৈকাবে? তবু গুল, প্রথম
ছাউণ্ডুলটা পৰ্বত জ্ঞান ছিল আমার। তার মুখের
কাটা বাগটা বনে আছে, ভুলতে পারি নি আছে।
না বাহা সেল ভাতেই। আর আমি জ্ঞান হারিয়ে-
ছিলাম। এবার বর্গান,—চিথিরে চিথিরে মাঘটা
উচ্চারণ করে বীণাকী। বেন চেরা শিত বের করে
হিসিয়ে উঠল কোন কালকেউটে।

—বাট, মিলেও চটাকী, আই কাক...বাট কলেইউ—

—বীণাকী,—চৈচিরে উঠল গুণ্ডকর, বরপোড়।
গর বেন সি দুয়ে বেব দেখেছে, বাসাবুক একটা ভুল
করে চলেছে বীণাকী, একথা দিনের মতো বুঝতে পারে

ও,—চুপ করো। ভুল, ভুনি মতো ভুল কিততো
বীণাকী। বর্গান সে লোক নয়, সে এ মুহুরে শৈল্প
ছিল না, মুখের একটা কাটা। বাগের মিলে কিছু ব্যার
আসে না। বীণাকী—হু হাতে গুণ্ডকর পাগটে ধরে
গুণ্ডকর। কাঁকাতে থাকে। কিন্তু তার আগেই এক
কটকার হাত চাড়িরে উঠে হাঁড়ার বীণাকী, নাদিনীর
মতো হুঁহার দুলে উঠল ওর তলুবেহ,—চুপ করো
ভুনি, এতাদিন এজছেই অপেক্ষা করছিলাম আমি,—
মুহুরের মধ্যে পাগলের মতো অনর্গল হাসির তুকান
তুলে বীণাকী জানিয়ে পড়ল বর্গানের ওপর, নির্বর
ভাঙা মিল গুণ্ডকর মিলে।

মুহুরেই ঘটে গেল ব্যাপারটা। কি বে হল প্রথমে
বুঝেই পারে না গুণ্ডকর। হুঁ হাতে জ্ঞানকে টেনে
রাখতে চেয়েছিল ও। কিন্তু পা পিচলে বসিয়েছিল
বীণাকীরই, বর্গানের নয়। বর্গানের হাত বরফে
পেরেছিল ও শক্ত করেই, কিন্তু বরফে রাখতে পারে নি
বীণাকীর হাতটা। মুতে করেকটা পাখা খেয়ে বাঘের
অন্তলে কোথায় ছিটকে পড়ল বীণাকীর অপরিসীম
তলুবেহটা। মুহুরে আন্দোলিত কাঁকা গাছগুলো স্থির
হয়ে গেল খানিকটা বাঘেই। অনেককণ কেউ কোন
কথা বলল না ওরা। চকনেই নিলুপ। অটল নীরবতা।
তারপর প্রায় নিঃশব্দিত কঠে বলে গুণ্ডকর,—মি
বর্গান, ও অস্ত্র লোক বলে ভুল করেছিল আপনাকে।
কিন্তু এর পর, আমার আর কমা না চাইলেও চলবে
বোধ হয়,—ভেঙা বর কৈপে কৈপে উঠল বাতাসে।
হুঁ হাতে গুণ্ডকরের হাত দুটো ছাড়িয়ে গবে বর্গান।
নিঃশব্দে শুধু চেপে ধবে সত্যজ্ঞ বাঘার মতো।

সন্ধ্যা পাত হয়ে নামছে শিলং পাছোড়ে। বহুতের
মতো ঘন অন্ধকারে দুয়ে দুয়ে বাঙো ঘরগুলোর
আলোর জোনাকি জলে উঠলো বিটমিট। নাক উঁচু
পাখরটার ওপর নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে ছুঁটি-ছাত্রা—
দুদীর। ক্রি তীব্র অন্ধকার, ভাবে গুণ্ডকর, বুঝি
বীণাকীর বনের মতোই। অন্ধকারে বর্গানের মুখটা
খেতে পাচ্ছে না ও। এমনকি সে বাগটাকেও নয়।

কাল-পরিচয়

(গিল্‌য়ার ট্রেন দুর্ঘটনা)

ঈশানচন্দ্রমোহন চৌধুরী

উপেনদা টালা অফলে ইতিমধ্যে একখান বাড়ীও কিনে ফেলেছেন। একদিন গলায়শও সেখানে। যৌবনে উড়ে যাওয়া পক্ষী এবার নীড় বেঁধেছে। হাসির সঙ্গে পুশির ভাব ছিল উপেনদার। বললেন এ কৃতিত্ব তাঁর নয়। বাদ্মীর পেটে পেটে এত বুদ্ধি ছিল তা তাঁর জানা ছিল না। যে ভিন্ন বহুর তিনি ফেলেছিলেন সেই সময় গভর্ণমেন্ট দফা ক'রে তাঁকে মাস মাস যে মাসোহারা জুগিয়ে গেছেন সেই টাকাটার কানাকড়ি খরচ না ক'রে বাদ্মী তাঁর ভাইয়ের হাতে দিয়ে গোটা টাকাটাই কোথায় বেন খাট্টিরে আর ডবল করে ফেলেছিলেন। তিনি ফিরে দেখলেন ব্যবস্থা শুভা মন্দ নয়। এ নারী পুত্রব হলে মাড়োয়ারী হ'তে পারতো কিংবা স্বেযোগ সুবিধা পেলে বানী হুশভান্য অবস্থা তিক্খিও হ'তে পারতো। তাসিয়ু বাদ্মী কলেজে পড়েন নি ভাই একা! স্কালকের খাড়ে ভর কবে কিছু দিন দুচিন্তা আর দুটো লাগে! আমের-আম্বাদ তিনি গ্রহণ করবেন, এ উপাধার আর বাদ্মী রাখেন নি। তাঁরই ভাড়াই চট্টপট এ ব্যবস্থা তাঁকে করতে হয়েছে।

কিন্তু স্থবী পবিবারের সুখের দিন বুঝিবা ফুরিয়ে এলো। রাজনীতির আকাশে মেঘ বনিয়ে আসে; বাংলায় বেঘের সংগে বাকে হাতে বড়ের আলোড়ন দেখা যায়।

বাংলার নেতৃত্ব নিয়ে লেনগুস্ত ও হুতাধের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন উত্তর নেতার দল; নেতারা বেন ছিলেন শিকড়ী। হুতাধের মধ্যে তিনি চেয়েছিলেন কল্পকল্পের প্রকাশ কিন্তু ঘটনাচক্রে তাঁর সে রূপ চাপা পড়েছে বুঝিবা অপৌকষের অহিংসার একটা বিখ্যাত আবরণে। শিকড়ি, বরকট ইত্যাদি চলছে এবং পুলিশের লাঠিও পড়ছে গিঠে বাঘার। অহিংসার ভাড়া এক এক সময় এমন চরমে ওঠে যে, তা মনে হয় শুধু ঘোঁড়ার কুড়লী। পথের নির্মানার চেয়ে

বিপণে যাওয়ার ভয় থাকে বেশী। এখানে ওখানে এক একটা বিক্ষোভের আগুয়াক কানে আসে। উপেনদা উল্লসিত হয়ে ওঠেন। ওখানেই কি আছে তাঁর চাওয়া ও পাওয়ার নির্দেশ। উপেনদা ভাণ্ড টিক বলতে পারেন না। কিন্তু তাঁর প্রকৃতি যে ভাই গ্রহণ করেছিল, দুর্ভরক ভাড়া দিবে ঠাণ্ডা করার নীতি তো সনাতন। সেই সনাতন নীতি ত্যাগ তাঁর স্বর্ঘ্য ত্যাগেরই জুলা। কল কি হবে এবং কবে কলবে সে চিন্তা তাঁর নয় কারণ না কলেই কদাচন যিনি শিগিরেছিলেন সেই গারখির শিকার কি তবে জুলা?

এমন সময় হ'রে গেল একদিন গিল্‌য়ার ট্রেন দুর্ঘটনা। কত লোক নারা গেল, কত হলো আহত। তখনকার দিনে এমন দুর্ঘটনা হলে কুত বা আহতের সংখ্যা নিরূপণ করা কঠিন হতো। লোকের মনে তখন রেলকর্তৃপক্ষের প্রতি একটা ঘোরতর অবিশ্বাস ছিল, সাধারণের ব্যরণ এই ছিল যে, বারা দুর্ঘটনার আহত হয়েছে তাদেরকে কতিপুহণ দিত হবে এই ভরে কতৃপক্ষ তাদেরকেও চালান করে দিত কুতের দলেই সঙ্গে কোথায় কোন্ অজ্ঞাত স্থানে। অটিকেরক চাড়! হত্যাহতের নামও সহজে প্রকাশিত হতো না।

রেলকর্তৃপক্ষ বলতে বুঝতো ইংরেজকেই। এমন ঘটনা ঘটলে ইংরেজ-বিবেক জেগে উঠতো সহজে। রাজনীতি কেন্দ্রে এবংশের দুর্ঘটনার দাব ছিল।

গিল্‌য়ার ট্রেন দুর্ঘটনার পর করওয়ার্ড পত্রিকা ই দুর্ঘটনার এক তত্ত্বাবহ বিবরণী প্রকাশিত হয়েছিল "Horrid Spectator" এর নামে। যেন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ জয়দ্বীনের অর্থনীর বৃশংসতার দুষ্টক যেওয়া হয়েছিল তাঁর ভয়ে চলে।

ঐ বিবরণী প্রকাশের আগের দিনে নিখীল রাতি পর্বত হুতাধর ছিলেন সত্য বজীর ঘরে।

ইংরেজ প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ রেলের কতৃপক্ষের তরফ

যেহে ঐ বিবরণীতে প্রতিবাক এলো বৎসরমত্রে। তাঁরা জানালেন ঐ বিবরণীতে যা প্রকাশ করা হয়েছে তা সেইব মিত্যা, তা প্রত্যাখ্যান না করলে তাঁরা ফরওয়ার্ড কোম্পানীর নামে কতিপূরণের দাবী দিয়ে মানহানির মামলা কল্প করবেন।

ফরওয়ার্ডের কর্তৃপক্ষ তা প্রত্যাখ্যান করেন নি। সাধারণের মনে যে ইংরেজ-বিষেভ ভাষ্যত হয়েছিল তাকে পোষণ করে বাঙরাই ছিল তখন তাঁদের নীতি। মতোর কাঠানোর উপর হয়তো হং কলানো হয়েছিল অনেকটা, কিন্তু তা পূর্বসাধারণের গোচরীভূত করার অর্থ রাজনীতি উদ্দেশ্য পণ্ড করা। ফরওয়ার্ড কোম্পানী রেলকর্তৃপক্ষের ন্যায়ানিতে তীত হতে রাজী হলেন না।

বখারীতি মামলা স্ক্রু হলো। বিচারে হলো ফরওয়ার্ড কোম্পানীর লাগ টাকা জরিমানা। তখনো করা প্রারম্ভ। কথলে রেলকর্তৃপক্ষ এই টাকাটা দাবী করতেন না কিন্তু লক্ষ্যমক অচল, অটল। কেনই বা? হলেন না? টাকাটা হয় থেকে বা'র ক'রে দিতে হবে একথা কে বলেচে শরৎ বোপ থাকতে? ইংরেজের আইন আছে কিন্তু আইনের কীক নেই? এগিল ব্যারিষ্টার শরৎ বোলের ছিল জান। সেই কীকির হাতা; তাঁর স্ক্রু পাক। ব্যারিষ্টার বেশবজুই তৈরী ক'রে গিয়েছিলেন এই কীকির হাতাটা, তাঁর পুরণুটিতে ছুধিনের দুর্ধশা বরা পড়েছিল তাই জুলসী পোলাইয়ের টাকার বে গ্রেস কেনা হয়েছিল তা ছিল বেনাশীতে।

বেদিন বিচারের ব্যাং বার হলো। আমরা তো গালে হাতে গিরে বদাম। পরের দিন থেকে বুকি আবার পথে ভাসতে হবে! অন্ততাক। দিলে কি কোম্পানী আত থাকবে? মনটা খুবই ব্যাংগ হয়ে গেল। কিন্তু বলা হলো আমাদের দাবীকেই বখারীতি অফিসে আসতে। ব্যাপারটা রহস্যজনক মনে হলো। পরীক্ষের দ্বারা কি আর ইংরেজি করবেন আমাদের কর্তারা?

এলা অফিসে পরের দিন। হাতে এলো এক টুকরা টাইপ করা কাগজ, তাতে লেখা আছে—তোমার

চাকরী বতম! আমার একার নয়, যেহি মবারই কপাল পুড়েছে। খানিকক্ষণ বাড়েই আবার এলো এক একখানা নিয়ন্ত্রণ শব্দ—নতুন কাগজে নতুন চাকরী। ফরওয়ার্ড, বাংলার কথা, আত্মপক্ষি এই তিনখানি গতাহ কাগজের নবজন্ম হতেছে, তাদের নতুন নামকরণ হতেছে 'লিবার্টি', 'বহুবালী' আর 'নবজন্ম'। বাঃ রে কেজী বাঃ। শরৎ বোলের বাহাদুরী আছে বলতে হবে। তিনি রেল-কোম্পানীকে অটবজা দেখিয়ে দিলেন।

ব্যারিষ্টার পি, কে, চক্রবর্তী, হেমেস্রজসাদ বোপ, মলমর বাবা এরা ইংরাজী বিভাগে লক্ষ্যমকীর প্রবক্তা লিখতেন। কিন্তু এরা ছিলেন বেন মরভনী শাখীর মতো, কিছুদিন থাকেন আবার অন্তর্ধান করেন। পি, কে, চক্রবর্তী লিখতেন চমৎকার কিন্তু লিখতেন খুবই কম কারণ তাঁর প্রেরণা নামক মহাবলা ভণ্ডি আরই তাঁকে কীকি বিত।

আমাদের ছুধের দিন এলেও তখনো আমরা স্তেনন কিছু অল্পতব করতে পারত'ম না। ইংরেজের রক্তকল্প পড়েছে জ্ঞানদের উপর, মারগ উচাটনের বজা চলেছিল তলে তলে কিন্তু সেমিকে তখনো আমাদের ক্রকণ ছিল না।

হেমেস্রজসাদ থাকে থাকে ছোকরাদের দলে এলে এক একটা পয় ছাড়তেন বেশ বাগবাজী। বলা লাগতো না আমাদের।

হেমেস্রদের দৌরাশ্বা চরনে উঠেছে। প্রায়ই দুখ বেহে বের, কখনো কখনো একটান' ছ' তিন দিন আসে না। এলেও সকাল সকাল কোন্ সময় টুপ করে সরে পড়ে। কপি দিতে দিতে আমাদের গ্রাণ ব্যাং। রাগটা তাঁর উপর ক্রমেই জমে উঠছিল। একদিন ধরলাম তাকে চপে। সেদিন ছিল সোমবার। বললাম—কি হে, মনিবারের দিন তো। কখন পাগিরে গেছ কেউ টের পায নি? তারপর কাল একবারে ছুঝ। ব্যাপারটা কি বলতো? তোমার ভতে আসরা যে মারা বাই কেব্দই কপি দিতে দিতে।

গ্রেবেন বেগে উঠলো। ছোট ছুটি চোখ পাখিরে
সে জোর করে বললে—শনিবারের দিন সে সকাল সকাল
গেছে বটে কিন্তু আর খোল মিশ কপি দিয়ে গেছে;
কাল সে আসতে পারে নি, তার কারণ একটা
রেষ্টোরাঁতে সে বোলটা ডিবের' নামেরটে খেতে পেটটা
একটু নারপণ করে কেলেছিল। কপির সংখ্যার সঙ্গে
ডিবের সংখ্যার এমন চমৎকার মিল শুনে আশ্চর্য্য হলে
কেলেছিলাম।

ডাক পড়লো গ্রিষ্টার অরবার। গ্রাবণ চাই।
অরবার উপরে উঠে আসতেই গ্রেবেন তড়বড় তড়বড়
করে বকে চললো। অরবারে সে বেশ করে চেপে
ধরেছে। শনিবারের তার দেওয়া কপি কোথায় তা
সে খেপতে চায়। তা ছাড়া, তার অভিযোগ এই যে
তার লেখা আরই হুণো হয় না তাও সে লক্ষ্য করেছে।
কেন, কারণ কি?

অরবার বাড়ী ছিল গুলনার জেলায়। কালো চেহারার,
হাড়ির মতো পাকানো। গম্বীক সেবনের কলে বোথ
হয় ঐরকম ঠাণ্ডিয়েছিল। গ্রেবেনের অভিযোগ সব
নীচবে শুনে গেল। তারপর এক সময় হেসে ফেললে।

আমাদের দিকে চেয়ে সে গুলনার ভাবানু বিষ্টি করে
বললে—তালি বলবো? সত্যি কথা বলবো?

—বলো সত্যি কথা। বাবা কি?

—এই, আসতে বহন কপি তাহে না বাবু তখনই
গ্রেবেন বাবুর লেখা দিই। কেউ ধরতি চায় না বাবু,
আমি কি করবো? অর্থাৎ হাতে বহন কপি থাকে না
তখনই অরবার গ্রেবেনের লেখা কল্যাণ করতে দেয়।
কারণ, কোন কল্যাণিটাই সে লেখা ধরতে রাজী হয়
না—এতই বিষ্টি সে হাতের লেখা।

অরবার হাসিতে আবারেরও হাসি পড়লো কেটে।
গ্রেবেন কিন্তু যেহাই শেষে সেলো।

গোলবালে উপেননা এসেছিলেন এ ঘরে। হেমেজ-
গ্রাসবও হাফির হয়েছিলেন। উপেননা অরবার দিকে
, চেয়ে নীরবে হাসছিলেন। এমন কথা বলার তরী

বোধ হয় আর তিনি এর আগে কখনো শোনেন নি,
খেচারীর বৈশনাতে তাঁর সহানুভূতি এসেছিল।

অতঃপর ব্রহ্ম করলেন হেমেজগ্রাসব :

বুকেছ উপেন, সেই বৈ সেবার গেলাম বিলাতে।
হ্যা, যেখানি বটে একখান লেখা। কী বলে একা
গ্রেবেনের লেখা বিষ্টি—কেল্যাম তো গ্রেবেনের লেখা,
তার কুলনার ও তো পোন!

লোহসুখ দুটিতে লম্বাই তখন চেয়েছে হেমেজবাবুর
বুকের দিকে।

অতঃপর হেমেজগ্রাসব যে গল্প বললেন তাতে জানা
গেল লজ্জনে অসুখ বিখ্যাত গ্রোলে অসুখ বিখ্যাত
লম্পাদকের সঙ্গে তিনি দেখা করেছিলেন। নাম-করা
সংবারলকের লম্পাদক নাম-করা গ্রেসের লম্বা তাঁকে
সঙ্গে ক'রে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘেরিয়েছিলেন। এই
লম্পাদকের হাতের লেখা একই বিষ্টি ছিল যে, কোন
কল্যাণিটাইর বাপের মাথি ছিল না তা কল্যাণ করা।
তাঁর হাতের লেখা ধরবার লজ্জা তাই নিখুঁত ছিল একজন
লম্পাদক কল্যাণিটাইর—সেই কল্যাণ করতো সে-লেখা।
হেমেজগ্রাসব বুকেছে দেখে এসেছেন সে লেখা।
একখানা লম্পা কাগরের উপরে কোন বোলতা যেন
কালি মাখা পায়ে হেঁটে গেছে।

'কহুহতী' কাগজের অফিসের সামনে আগে ট্রাম-
গাড়ী ধামতো না। তাঁর লম্পাদক বাঁকা কালীন
ঐখানে ট্রাম ধামাবার ব্যবস্থাত কি ক'রে সম্ভব হলো
তাও হেমেজগ্রাসব গুনিয়েছিলেন একদিন। কিন্তু
আজকের গল্প হলো অভিনব।

উপেননাযে কেউ উপেন বলে ডাকে তা তিনি
এর আগে আর কখনো। হেমেজগ্রাসবের বুকেই
গুলনার গ্রাবণ।

হেমেজ বাবুর গল্প শুনে উপেননা হাসিমুখে শুধু 'হ'
বলে একটু শিশুর প্রকাশ ছাড়া বুধে আর কোন মন্তব্য
করেন নি। তাঁর বিশ্বাস হলো কিনা জানি না তবে
তিনি গ্রেবেনের প্রতি সহানুভূতি ঘেরিয়ে আবারের দিকে

চেহে বললেন—ওহে, তোমরা গ্রেমেনের জন্তে এরকম একটা স্পেশাল কম্পোজিটর ট্রাক করে কোলো না।

উপেনদার মুখে জনেছিলার হেমেস্রাব্য তাঁর চেহে বরসে কীরকম বহুব্রহ্ম বড়।

গ্রেমেনকে প্রব কর্তে গিরে পেখটার আমরাই পড়বার বিশেষ। অন্তঃপর স্থির করা হলো যে কত কপি দিচ্ছে তার হিসাব রাখা হবে। পনের দিন থেকে দেখি আবার আচার্যের সকলের লেখা জড়ো করে গজ কাঠি দিয়ে বেগে দেখছেন তার লেখা কতখানি চাপা হয়েছে। এমনি চললো কিছুদিন। কপীদার বিরক্তি বেধে বাড়িল, আবারের কাছেও এটা অতি বিস্ত্রি বোধ হচ্ছিল। এই বাপাবাপি ব্যাপারটার বনিকটা চানলো শেষে সঠিক। সে কপীদাকে এমন কিছু বাপবার ইলিজি বলে বাতে কপীদা তত্ত্ব লক্ষিত হলেন না, তরুণ পেরে গেলেন। আবারও বন্ধা গেরে গেলেন।

ইতিমধ্যে বীরে বীরে আবারের মধ্যে কুটিলতা সঞ্চারিত হয়েছে। নিরুপ আশ্রয় থেকে আদর্য গরে এসে দলদলির সন্তার সতীর্ণ হয়ে উঠেছে। সংবার সাধাবার ও সংবার পরিবেশনের মধ্যে আবারের লক্ষিত ক্রিয়া দেখতে পাই। কারো প্রাধাত্য বর্ধ করতে হলে তাঁর সমস্ত সংবাদ অনেক সময় বিতল হয়ে আসে এবং কখনো বা জা চাপা হয় কাগজের কোন এক কোণে ক্ষুদ্রাক্ষর হরকের সৌন্দর্যবোধের পাছে তা চাপিয়ে গুঠে আবারের গির কোন ব্যক্তিকে। একটা বিশেষ দলের বিশেষ কার্যক্রমকে প্রাধাত্য দিবার কৌশল আদর্য আরও করে কলেশি। চাপার হরকের বাগে প্রতিপক্ষকে কাৎ করতে পরাগে উল্লসিত হয়ে উঠে।

কোন একটা বিশেষ ব্যাপার বা ঘটনাকে প্রাধাত্য দিতে হলে কাগজের প্রথম পৃষ্ঠার মুখপাতের মাঝে উপরে ফেড ইজি হু' ইজি পরিবান নোট হরকের বিরোধনামা দিতে হতো—তাকে বলা হতো 'ব্যানার রেজিঃ'। ইংরেজের বৈতন্যগন চেঙে কেনবার চেষ্টাই

তো চলছিল সেই অসহযোগ আন্দোলন পুঙ্ক হবার পর থেকে। আবারের বাণ নিষেধের শিকার বিলম্বিত। কোন না কোন দিন। এমনই একটা দিনে শরৎ বোলের উৎসাহ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি হঠাৎ মোটর হাঁকিয়ে এসে অফিসে উপস্থিত, বললেন—আজকের ব্যানার বেডিং যেমন তিনিই। "লোগো Diarchy's Devilry Damned."

পনের দিন আবার হাজির হয়ে প্যাণ্ডের পকেটে বা হাতখানা ছুকিয়ে বর্ষা চুক্তির ঘোঁষার কুণ্ডলী ছেড়ে বললেন—কেমন?

অর্থাৎ সেই ব্যানার, বেডিংটা কেমন জুত সই হয়েছে তাই শুনে খুশি হতে চান তিনি।

ম্যানেজিং ডিরেক্টর খুশি হলেন, আর কথা আঙে প আদর্য সব বস্তু বিকশিত করে বললেন—চমৎকার।

এই সময় আর একটা মহিলার ভয়ে সত্য বস্ত্রী কাতর হয়েছিলেন। এবার তাঁকে বাঁচিয়েছিলেন উপেনদা, আদর্য নই। এই মহিলাটিকে প্রথম দেখেছিলেন বীর্জাপুর পার্কে (তখনো স্বতন্ত্র পার্ক হয় নি)। বেশবস্তু ছিলেন সেদিনকার সত্যার সভাপতি। এই মহিলাটির সেই সত্যার বক্তৃত্য-বিবার কথা ছিল। প্রায় শেষ মুহূর্তে তিনি এলেন। পরশে তাঁর ছিল আত্মনির্ভরিত বন্ধরের একখানা লাল চণ্ডা শাড়ী, হাতে একটা ত্যানিটি ব্যাগ মোছাখান। শেষ মুহূর্তে আসার সুবিধা এই যে, সময়ের অপেক্ষান জনতার গুটি গিরে পড়লো একসঙ্গে এই আগজ্জ্বল দিকে। ঠাড়া তাঁকে আগে চোখে ধোঁয়ে নি তাঁরা ব্রুড হলেন। তাঁর বক্তৃত্য কিছু মুহূর্তে করলো লক্ষ্যকোই।

এরপর আরও করেবার তাঁর বক্তৃত্য ত্রুনেডি। শেষ ত্রুনেডিলাম এলবার্ট'হলে—যেদিন তখনকার বৃষ্টি পাল'সেন্টের ভায়েতীর সত্যা লাক্সাভগুয়ালা ছিলেন সত্যার সভাপতি। চমৎকার বক্তৃত্য দিচ্ছেছিলেন এই মহিলা ইংরেজী এবং ফিলী উত্তর ভাষায়। বাঙালী মহিলারা এই শক্তি সত্যিই প্রাণবীর।

ভারপর কলেজ কোয়ার্টারের কাছে একদিন বহা হৈচে। কি হলো? কি হলো? তখনকার ঐ মহিলাটিই কোন এক নামকরা ব্যক্তিকে তাঁর হুড়ো ছাড়া গিঁথে টেনেয়ে এসেছেন কারণ ঐ ব্যক্তি মহিলাটির লম্বন্ধে কি একটা বিশেষ মন্তব্য নাকি করে ফেলেছিলেন পথের কাগজে।

অতঃপর উপেন্দ্রা ঐ মহিলাটির নামে সংযুক্ত পদবীটির একটুখানি অংশ বদল করে দিলেন সস্তা।

মহিলাটির কি একটা বাণী না বক্তব্য ছাপা হয় নি সেখানকার বাহুর ভাগির গিয়েছিলেন একসময় কোনে। একদিন এসে লতা বাবুর সঙ্গে দেখাও করে গিয়েছিলেন তথাপি ফল হয় নি সেখানকার দ্বিতীয় দিন আবার স্বয়ং এসে হাজির হয়েছেন। আজ আর বোধ হয় রক্ষা নেই। লতা বাবুর বোধ হয় রণ-রত্নিনীর রূপ মনে পড়ে গিয়েছিল। তিনি ত্যাগাত্যাগ উপেন্দ্রার কাছে পালিয়ে এসেছিলেন।

মহিলাটি যেখানে বসেছিলেন সেইখানে উপেন্দ্রা গিয়ে কাগজ ও কলম তাঁর কাছে এসিয়ে দিয়ে বললেন—এই দিন, আপনায় বা বক্তব্য লিখে দিন তো, নিশ্চয়ই ছাপা হবে; লিখুন আপনি, আমি আঁসছি একটু বাধে।

প্রায় দশখানেক কেটে গেল। মহিলাটির লেখা আর শেষ হয় না। উপেন্দ্রা আবার উঠে গেলেন তাঁর কাছে। বিষয়ে তাঁর দিকে চেয়ে বললেন—একি, আর কতক লাইন লিখে আপনি বলে আছেন দেখছি। মাথাটা বুঝি ভালো নেই? তাই তো, চুলগুলোও দেখছি উম্মকো খুস্কো। রোকে টো টো করে ঘুরে লতা সমিতি করে বেড়ান, ঘান করবার সময় পান না

বুঝি? বাধায় একটু ভালো করে অবাকুসর বেখে সময় যতো নাওরা খাওয়া করে দিন দুই বিশ্রাম দিন দেখি। ভারপর আসবেন। রাজনীতি রাজনীতি করে ছুটে বেড়িয়ে স্বাভাবিকতার প্রতি এমন উল্লাসী হওয়া তো উচিত নয়।

লক্ষ্য আর বাগে মহিলাটির চোখ মুখ লাল হয়ে গেলো! তিনি ভালো বক্তৃতা করতে পারেন, কিন্তু লিখতে গেলে সব গুছিয়ে উঠতে পারছিলেন না। বাবড়ে গিয়েছিলেন। এমন হয়। আর অপেক্ষা তিনি করতে পারলেন না। সেই যে নিজস্ব হলেন, আর কোনদিন এদিকে পা বাড়ান নি!

উপেন্দ্রার মধ্যে ছেলোমাছবিরও অঙ্ক ছিল না। একদিন পড়বে বেলা, তখনো লক্ষ্য হয় নি। আক্যেপে কোথাও কোন বেঘের চিহ্ন নেই। হঠাৎ যেন বুজির লক্ষ্য কানে এলো। চেয়ে দেখি আনাদের ঘরের সামনে যেসিং ঘেরা ছাঘের কোণে উপেন্দ্রা ঝাঁড়িয়ে। চাণু ছাঘ আর বুজির লম্বন্ধে সঙ্গে উপেন্দ্রার ঐ ভাবে ঝাড়ানো নিলিয়ে নিয়ে আনাদের বুজতে বাকী রইলো না ব্যাপারটা কী।

উপেন্দ্রা!—বিস্মিত হয়ে ডাকলো তাঁকে। কারটি লেরে তিনি আনাদের সামনে এসে মুখ তেতটে উঠলেন—উপেন্দ্রা! তর্জনে প্রস্তাবের দরটার বাবার ছো আছো? তাই এখানে একটু নিশ্চিন্ত বনে—। ভারও উপার নেই দেখছি।

এরপরে অনেক মহাজনের পথ ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু নিজেদেরই নাসিকার পক্ষে সেটা লক্ষ্যকর নয় বলে পিছিয়ে এসেছিলেন।



নজরুল ইসলাম

অমলেন্দু দত্ত

নজরুল ইসলাম

ভূখাতারভেদে নিরম কবি, তোমার নাম
স্বয়ং প্রাণ সচকিত করে। জানিতো ঠিক
বিশ্বোদী গণ-অস্মার জুনি খাটি শরিক।

বাহের পাণে এ-মলয়ক বিব, তুমার জল
সারীবাঁধে ভরা, বৃষ্টি-ছয়ার অনর্গল—
সেই সব কুসুমতা তোমার ক্ষয়-মন
ভীর ভুগার ঘননে করেছে বিদ-অরণ।
মন গুড়ে থাক তাইতো তোমার বাঁধিতে বিব
নাগ হয়ে ছর মৎসন করে অহনিশ।
অগ্নিবীণার প্রতি তারে বাজে নীলকন্ডান
কাণে 'বৃদ্ধবিল', নিপীড়িত করে সূর্য-মান।

আমরা তোমার গভীরে পেলাম আগামী দিন
রাত্যানোর বাণী—রক্তপলাশ রঙে রঙিন।
সকল কণ্ঠ আবের্ষনার দিনাবসান
হঠনায় ঐ বনধমে বুঝি কোণ্ ঈশাণ।
তোমার জেহাদ ঘোষণার কাণে 'আলিম' মল।
তোমার লেখনী-কৃপাণ-কলকে এ-পৃথিবল
পারে দলবার কতিন মপথ—অগৌকার
আমরা নিরেছি—গেরেছি কর্তে গান তোমার।
সামোর কবি, তোমার নাম
গণ-মামসের পরতে পরতে—তাই মিলায়
রক্তধার অর্ধে লাআনো বাঙা প্রণাম।

ব্যথার-পূজা

যতীন চন্দ্র দাশগুপ্ত

(উপন্যাস)

[বারো]

ভেতর বাড়ীর চোচামেটিতে সহসা মিনতির 'মুম' ভেঙ্গে গেল। বিজ্ঞানার উঠে বলতেই, বরজার সামনে দিগম্বরকে বেধে তার চিত্ত একেবারে ভেলে বেগুনে জলে উঠলো,—“অমন বাঁড়ের মতো চোঁচাছিল কেন? বাড়ীতে কি ডাকাত পড়েছে?”

ব্যতিথাত্ত দিগম্বর সাড়া দেয়,—“দাদাবাবুর বাবা ফাটি গেলো,—আমরা কল্লাল কাটি গেলা! নীগগির দেখিবে চলো।” বলেই সে সিঁড়ির দিকে চলতে থাকে।

কিছুই লষ্টক বুঝতে পারে না মিনতি। কোনমতে গায়ে, শাড়ীর ঝাঁচলটা অড়িয়ে শুকনোগাং সে চলতে শুরু করলো দিগম্বরের পেছনে পেছনে।

মুম কতটা ভেঁড়া চোখে চশমাটা নিজে তুল করে, ঘর থেকে বেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করেছিল মনি। কিছু সিঁড়ির কয়েকটা বাপ নেবে বাবাটা। ঘুরিয়ে উঠতেই সহসা চশমার কথা তার মনে পড়লো। ভখন যেমনি সে ঘুরে ওপরে উঠতে বাবে, অমনি কাপড়ের কোঁচায় লা বেধে একেবারে ছমড়ি খেয়ে পড়লো সে সিঁড়ির ওপরে। তারপর উঠতে গিয়ে আবার বাবাটা ঘুরিয়ে, গড়াতে গড়াতে একেবারে সিঁড়ির নীচের ধাপে গিয়ে সে থামলো। ধুলো ঝেড়ে উঠে ঠাড়াতে ঠাড়াতে তার লবিং কঁরে এলো। এতক্ষণে তার মনে পড়লো অগ্নের ঘোরে পশুটর চাঁৎকায়েই সে ঘর থেকে বেরিয়ে ছিল। পাগল! না মতিভক্ত বিকৃতি বটেছে তার? মরা ছেলেকে সে কার হাত থেকে রক্ষা করতে বাচ্ছিল? শেবে সিঁড়ির ওপরের বাপল নজর পড়তেই মনির চক্ষু একেবারে স্থির হয়ে গেল। সর্বনাশ! মিনতি, দিগম্বর, কারোই কি কল্যাণকারী কথা আনতে বাকী নেই? লক্ষ্যার মনির

বাবাটা! যেন মাটির ভেতরে পৌঁথির যেতে চাইল। কিছু মাথা হেঁট করতেই মনির নজর পড়লো গায়ের জামাটার দিকে, ইতিমধ্যেই যে যেন সেটাতে রক্ত ছিটিয়ে দিয়ে গেছে। কপালে হাত পড়তেই ভখন যে আর এক দফা অবাক হয়ে চোরে দেখলো, ইতিমধ্যেই কখনো যেন তার কপাল কেটে রক্ত পড়তে শুরু করেছে।

সিঁড়ির ওপর থেকে ঐ অবস্থার মনিকে দেখতে পেয়েই, মিনতি আর দৌড়ে নীচে নামতে নামতে, দিগম্বরকে ধমকে উঠলো,—“আহা! মনিকের মতো আমার লুকে কোথায় বসতে বাচ্ছিল? নীগগির টেবিলের ওপর থেকে টিনচার খেজুইনের শিশিটা নিয়ে আর হস্তাগাণ।” বলেই নীচে নেমে গিয়ে মনির কপালের কাটা আয়গাটা নিজের শাড়ীর ঝাঁচল দিয়ে চেপে বরলো।

মনি ভখন মিনতির কাছ থেকে পালাতে পারলে বাঁচো। তাতাতাড়ি সে ওপরে উঠতে গিয়ে মিনতির ঝাঁচল চাপাটা কোমল হস্তে কপালের পাশ থেকে সরিয়ে হিতে হিতে বলে,—“বুদ হরেক্তে, চলো দেখি! এখানে সিঁড়ির নীচে ভোমাকে আর ভিল্পেগুম্বরী খুঁজতে হবে না। কিছু হয় নি আমার। ওপরে চলো।” ওপরের ঘরে ঢুকে ইন্সিডেন্টারে গিয়ে মনি বলতেই, মিনতি একেবারে টিনচার খেজুইনের দিলি আর খানিকটা চতুকার পেঁকা তুলো নিয়ে, মনির বাবার কাছে ঠাড়ির কশিভ হস্তে আর আউল ধানেক টিনচার খেজুইন, এককারী পেঁকা তুলোর ওপরে চেলে, মনির কপালের কাটা আয়গাটা লেপ্টে বসিয়ে দিয়ে, শড় শড় করে একটা ঘোরা মুতি থেকে একখণ্ড খবরবে লাগা নেকড়া ছিঁড়ে নিয়ে, তাই দিয়ে অন্ত্যস্ত হাতে, আর

সবটা মাথাই সে পেঁচিয়ে রাখলো— ব্যাঙের
ঠেলার চোখ কানগুলো পলক বাঁধা পলকবার উপক্রম
করেছে বেঁচে, যদি বলে উঠলো, “আরে! তুমি কবলে
কি? চিকিৎসা! শব্দের নকলও দেখি হাব মানিয়ে
ছাড়লে, এগুলো একটু তুলে খুলে দাও! মাথাটা তো
আগুন হয়ে উঠলো দেখছি।” তারপর বলে,
“দিগন্তটাকে চা আনতে বলে এসো দেখি।” বলেই
যদি ইচ্ছাচারে উঠে বসবার চেষ্টা করলো।

মিনতি বলে—“স্বপ্নার মাথা তুলবে না বলছি!
চারের ভক্ত দিগন্তকে ডাকতে বাই, আর তুমি আমার
ব্যাঙের খুলতে ছক করা?” বলেই সে আর মণির
কোনও কথা শোনবার অপেক্ষা না রেখে, টেবিল চারের
বলে, খুণ ভাঙাভাঙিতে একটা চিঠি লেখা শেষ করে,
খামে তরে, ঠিকানা লিখে, একেবারে বৃথ বন্ধ করেই
দিগন্তের নাম হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো। যেচাঁদী দিগন্ত
ততক্ষণে ট্রেতে করে চারের সরঞ্জাম নিয়ে সেই ঘরেই
ছুক্ছিল। মিনতির ডাকের ধবক, দরজার ঠোঁটের
লেপে, তার হাত থেকে যথা সর্ব্ব একেবারে হেঁকে
আড়তে পড়লো। ব্যাঙের বেঁচে যদি হেঁলে উঠলো,
কিন্তু মিনতি একেবারে বিবন কপে গিয়ে দাঁত কিনিড়
করে, গলা খেঁকিরে বলে উঠলো, “মরণ নশা দেখেছো!
হতভাগা মরবে কবে? দুব হ—দুব হ বদছি, ডাক নীগিরি
পাড়ির নাকে। হতভাগা আনোয়ারের কান্দ দেখেছ।”
বলে তার দিকে এগিয়ে যেতেই দিগন্ত তার গল কঠের
বিশেষ্য হুয়ে, বাংলা ও উৎকলি ভাষার সমিশ্রণে কি
বে বগতে বগতে বর থেকে বেরিয়ে গেল, তার বিলু
বিসর্গও বোকা গেল না। তারপর ছুকলো এসে পাঁচির
মা। তাকে দেখেই মিনতি তার হাতের লেখা চিঠি-
খানা তার হাতে দিয়ে, মোটর ড্রাইভার জুবণকে সেই
চিঠিটা নিয়ে ভাঙারের বাড়ীতে রওনা করিয়ে দেবার
কথা বলে, আবার চা ভৈরী করে আনতে হুকুম দিয়ে,
চোরায় গিয়ে ন’সে, হাঁপাতে লাগলো। চকু বুজে যদি
ততক্ষণ রগড় দেখছিল। এখন মিনতিকে শান্ত হয়ে

বসতে যেয়ে বললো, “লহা এমন ক্ষেপে গেলে কেন
তুমি?” সঙ্গে সঙ্গে মিনতি উত্তর দেয়, “তোমার গল
আবার কি। কথা নেই, বাড়ী নেই, তুমি মিঁড়ি গিরে
কোণার মরতে থাকিলে তুমি?” যথা অপ্রত্যাশিত যদি
তখন ক্রিমি রসিকতার তান করে বলে উঠলো, “আর
বলো কেন? ঐ যে সেই কি নাম যেন? সেই ভুল্লোলক
গো। মাংস কাড়কাড় কাড়কাড়। যদি বাবু, যদি বাবু
বলে এমন চোঁচাতে ছক করেছ বাইরে থেকে, যে না
গিরে উপার ছিল না। তাই ভাঙাভাঙিতে চপমাটা
নিয়ে তুলে গিরে মিঁড়ির গলরে আঁচড় খেয়ে মরি আর
কি! তারপরে বোর করি লজ্জার পাণ্ডিতে গেলো
ভুল্লোলক তেতর বাড়ীর চাকর বাকর জলোর চোঁচামিতি
আর হৈ হলোড়ে।”

“আর সেই সঙ্গে সকেই বুকি গমের গুটটা মাংস
মাংস ভৈরী হয়ে গেল তোমার?” বলেই মিনতি হেসে
উঠলো।

নিজের হাতের নাড়ীটা টিপতে টিপতে যদি বলে,
“একবার থারমোমিটারটা আনো দেখি, আর আসতে
বলে যেন মনে হচ্ছে।”

“হর!” বলেই মিনতি চোরার ছেঁড়ে উঠে গিরে
মণির কপালে হাত দিচ্ছেই, কঠহার। হুয়ে বলে উঠলো,
“সর্বনাশ! গা যে গুড়ে বাচ্ছে আর! কি একটা
কাণ্ড তুমি আবার করে বললে বলো দেখি?”

“কাণ্ড না হাতি। বিছানোটা একটু ঠিক করে দাও
তবে পড়ি। এমনতেই পরীরা কেন মাঝ মাঝ
করছিল কাল থেকে। তার ওপরে এই বরসে একটা
খাঁচকা আঁচড় খেলু, তাই একটু জর জর মনে হচ্ছে।
একটা লম্বা দুম দিলেই সব সেয়ে বাবে।”

মিনিকে ভাঙাভাঙি বিছানার গুইয়ে দিয়ে, জ্বার
পেকে একটা থারমোমিটার এনে সে মণির জর পরীক্ষা
করেই একেবারে মাংস হাত দিয়ে বসলো। গায়ের
জর তখন একশো তিন ডিগ্রীর কাঁচাকাছি। কেমন
বেন কিম খেরে পড়ে রয়েছে যদি। থারমোমিটারটা

বাশিদের ভলায় রেখে মিনতি, মণির মাথার চুলগুলোতে হাত বুদিয়ে দিতে লাগলো। মাথার চুলশাশের রগ ছুটো বেন দশদশানিতে ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে মণির। পাঁচির বা তবন নতুন করে চায়ের লজ্জায় নিরে খরে ভুকতেই মিনতি বললো, “চিঠিটা দিয়েছিলে তো জুবনকে? দেখে কি পে তুমুনি ভাঙ্কার চৌধুরী ওখানে?” চিপরের ওপর কোনমতে চায়ের ট্রেটা নানিয়ে, পাঁচির বা একেবারে হাত বেকিয়ে চোখ পাখিয়ে, হাত নেড়ে বলে উঠলো,—“ও না! তা কি না নিরে পারি? খুজিয়েন জুবনবাবু ওখানে ঘরের বেকতে গুয়ে। একেবারে গিরে তার খাড়ে কাঁপিয়ে পড়লুম না আমি!—না গিরে রকা আছে? আপনার নাম ছুকেছে ওঁর কানে; সেই লগে লগে চিঠি, তারতপর আবার তুমুনি ভাঙ্কারের বাড়ীতে বাঙার ভাগদা। ছিলে হেঁড়া হুকের নতো উঠে দাঁড়িয়েই একেবারে গিরে ঘোটার প্যারেজে। তারপরই পাড়ী নিরে পে কি ছুট!”

“তুমি স্বচক্ষে বেগেছো ঠিক? না পরের হুখের কাপ খেরে কথা বোলছো?”

সহসা গালে একটা চড় খাওয়ার তদ্বিতে, খমেরে গিরে পাঁচির বা বলে, “আমি কি পাগল হয়ে গেলাম? আপনার নাম কানে গেলে বা আমাদেবি পেটের দিলে চমকে ওঠে, আর জুবন ভ্রাইভার তো ছেলে নাহন। আপনার ঠেলে মিখে কথা! না না তেমন হুংসাহন আবার নেই।”

আর একবার মণির বগলে বারনোমিটার দিতে দিতে মিনতি বলে, “চায়ের ট্রেটা এই বিছানার কাছের ছোট টেবিলটাতে রেখে আমাকে একবাটি ঠান্ডা ভল এনে হাত। তারপর ঐ ভাক থেকে অভিকালনের শিপিটা দিতে হবে। শীগদির বাও।”

পাঁচির বা আব-কাল বিলম্ব না করে বলাকর্তব্য সম্পাদনের অন্য কক পরিত্যাগ করলো।

মণির বগল থেকে ঝারনোমিটারটা তুলে নিরে

মিনতি দেখলো,—অয়ের উত্তাপ গুরোগুরী ভিন ভিনী।

মহা হুস্তিতার পড়ে একটা টেবিল ক্যান মণির মাথার পেছনে টেনে, কল মোলানে সেটাকে চালিয়ে দিরে মণির মাথার পাশে তিছানার বসে, লম্বুদ্বিত টেবিলে রাখা চায়ের ট্রে থেকে এক কাপ চা তৈরী করে নিরে, যেমনি পে চুখ দিতে বাবে, অমনি মণি কল চাকা থেকে কোনমতে মাথাটা একবার মিনতির দিকে ঘুরিয়েই বলে উঠলো,—“আমাকে একটু দেবে?” মণির বক্ত অবার নতো চোখ ছুটো দেখেই সহসা বেন তর শেষে গেলে: মিনতি। কিন্তু পরক্ষণেই মণির চা পানের আদ্রে, উৎক্ল হরে, মিনতি বললো,—“তুমি পারবে চা খেতে?”

“খুব পারবো।” বলতে বলতেই, মণি উঠে বলে মিনতির চায়ের কাপটাকেই ধরে ফেলতে বাহ।

বাধা দিরে মিনতি বলে,—“এটা এঁটো করেছি আমি। এইতো রহেছে চা এইখানেই, দিচ্ছি আমি তৈরী করে। তুমি শোভেখি।” তারপর বলে,—“গারে তো বাধা হয়েয়ে নিছর। হুকে টুকে কোথাও লাগে নি তো?”

মিনতির জগ্রে সহসা চমকে উঠলো বেন মণি। হুখে বলে,—“তুমি কি করে জানলে? জান হুকের পাশটা একটু বাধা বাধা করছে বটে, তবে পে কিছু নয়; কিন্তু মাথাটা একেবারে বাধার অগাধ হয়ে পড়বার উপক্রম হয়েয়ে। বাও চা হাও।”

এক কাপ চা এগিরে দিতে দিতে মিনতি বলে,—“কেক কিছুট কিছু খেতে পারবে?”

চায়ের কাপে চুখ দিরে মণি বলে,—“না! শুধু চা—আরো চা হাও, চা খেলেই আমার সব সেয়ে বাবে। তুমি কিছু ভেবনা মিনতি আমি কাল তোরেই তোমাকে আরো সম্প্রদায়ী মন্তব্য লিখে দেবো। আঃ বাচলুম!” এমনি লগে জুবন, ভাঙ্কার চৌধুরীকে নিরে সেই ঘরে জবেশ করলো। ইতিপূর্বেই পাঁচির বা কতখন টেবিল ক্যানের টুলের ওপরে একটা অলের

বাড়ি আর ওড়িকোলনের শিশিটা রেখে গিয়েছিল, তা মিনতি বেখতেও পার নি। ডাক্তার চৌধুরীকে দেখেই সে যেন অকুল কূল পাওয়ার আশার, অস্ত্র বনরের মতো। বর্ণির হাত থেকে চারের কাপটি টেনে নিয়ে, তাকে বিছানার ওইদিকে দিয়েই, ডাক্তারের কাছে বর্ণির হোগা এবং আছাড়ের আছড়ান্ড ব্যাপারটা এক নিঃশ্বাসে বিবৃত করলো।

মিনতির কথা শুনে ডাক্তার বেশ ভালো করে মণিকে পরীক্ষা করে দেখলেন। খারনোমিটারে অরের উত্তাপ, এবং টেম্পারেচারে ফু পিঠ বেশ ভালো করে পরীক্ষা করে, ক্ষত স্থানগুলো দেখতে দেখতে, ডাক্তার মিনতিকে প্রশ্ন করলেন,—“কপালে কি মিকেছিলেন? আরোডিন, না টিনচার বেবুইন?”

মিনতি উত্তর দেন,—“টিনচার বেবুইন।”

“মুগে দিন ব্যাওজটা। কুলোটা লাগানো থাক, কুলবেন না এখন। ঠান্ডা জল এনে বেশ করে মাগাটা ধুইয়ে দিয়ে, তখনো কাপড়ে ভালো করে মুছে দিন।” বলে, ডাক্তার গিয়ে টেম্পারেচার লায়নের চেয়ারটাতে বসে, তাঁর ব্যাগ থেকে বের করলেন একটা সিরিজ, কুলো আর একটা ছোট স্পিরিটের শিশি। তারপর এক কাইল ইনজেকশন বের করে, তিনি মিনতিকে গরম জলের বন্দোবস্ত করে দিতে বললেন।

মাথা ঝোটার জল আর গরম জল প্রভৃতির জন্ত, পাড়ির বা, দিগম্বর আর ভুবনকে তেতর বাড়ীতে পাড়িরে, মিনতি মণির শিশি সন্ধান বিরোগের কথাটাও ডাক্তার চৌধুরীকে জানালো।

সে কথা শুনে, অস্ত্রমিকে চেয়ে, কি যেন ভাবতে ভাবতে ডাক্তার বলে উঠলেন,—“তা হলে ভর পাবার কিছু নেই। হঠাৎ শক লেগেই অরটা হরেছে। খাদি ইনজেকশন দিয়ে বাচ্চি ভাতেই জর এবং গায়ের বাবা অনেক কমে যাবে।” তারপর নিঃশ্বাস একটা চিঠির কাগজের প্যাড, ব্যাগ থেকে বের করে, ঘচ খচ করে একটা গ্রেসক্রিপশন লিখলেন ডাক্তার। বুখে বললেন,

“—বাবার ঔষধ দিয়ে সেলুখ চার কোম, আর সেই সঙ্গে একটা পেটেট অরেটমেন্ট লিখে দিলু বালিশের জন্ত। কুলো এবং মাথাগুলো যে সব কারগার ঔষ বস্ত্র বেনী বলে মনে হবে, সেই সব কারগার সেটা বালিশ করে যেকোন।”

ডাক্তারের হাত থেকে গ্রেসক্রিপশনটা নিতে নিতে মিনতি বললো, “রাত্রি এখন আটটা, কোথা থেকে আনাই বন্ধু তো ঔষুগুলো?”

ডাক্তার বললেন—“পাড়িরে দিন, বর্ষভলা অথবা চৌরঙ্গীর যে কোনও একটা দোকানে লোক পাঠালেই নিয়ে আসতে পারবে।”

এমনি সময়ে ক্ষুধণ একপাশে গরম জল এনে টেম্পারেচার গুণর রাখতেই, মিনতি তার হাতে, টাকা আর গ্রেসক্রিপশনটা দিয়ে, গাড়ী নিয়ে গিয়ে চৌরঙ্গী থেকে ঔষধটা আনবার হুকুম করলো। ইতিমধ্যেই ডাক্তার চৌধুরী গরম জলে ভালো করে ইনজেকশনের সিরিজটা ধুয়ে নিয়ে, সেটাকে মুছে, ইনজেকশন এন্সপুলসরের হুচলো ঝাঁকের মাথাটা ছোট একটা করাতের মতো বস্তুর সাহায্যে কেটে, ঔষধটা ভরে ফেললেন সিরিজের ভেতরে। তারপর চেয়ার থেকে উঠে বর্ণির বিছানার পাশে বেতে বেতে বললেন, “একটু আত্মন তো। হোগীর মাথার পাশে বসে হাতটা একটু হালু আশনি।”

ইনজেকশন দেবার সময় বর্ণি একবার শুধু ডাক্তার আর মিনতির হুখের দিকে চেয়ে দেখলো। তারপর পাশ ফিরে গুয়ে রইল।

কাজ শেষ করে ডাক্তার চেয়ারে গিয়ে বসতে বসতেই, পাড়ির বা, দিগম্বরের সাহায্যে বর্ণির মাথা বোচাখার অস্ত্র তিন বালতি ঠান্ডা জল আর একটা মগ নিয়ে তেতরে প্রবেশ করলো।

ডাক্তার তাই দেখে বলে উঠলেন, “আগে বেশ করে মাথাটা ধুইয়ে বিন তো। তারপর একবার টেম-পারেচারটা নিও।”

পাড়ির বায়ের সাহায্যে বর্ণির মাথা

পর্ব শেষ করে, টেম্পারেচার নিয়ে দেখা গেল, জর তখন ছুই ডিগ্রীর নীচে নেমেছে। তাই দেখে, ব্যাখার খুশী হয়ে ডাক্তারের দিকে চেয়ে মিনতি বললো—“খুব আশ্চর্য তো!”

এসে তার উত্তরে ডাক্তার বললেন, “তাই বলে যে শত্যা সত্যি জরটা জেড়ে আসচে, তা কিন্তু মনে করবেন না, বরং গরু চাইতে আবার বেড়েও যেতে পারে। তবে ঔষধগুলো এলে পর, যাতে গেলোর ব্যাবল গদব্যবহার হয়, তার চেয়ে, করলে উপকার নিশ্চয়ই পাবেন। আর যদি সম্ভব হয়, তাহলে অল্পটা আর্জকে হামিটার মতো একজন নার্স বোগাড় করতে পারলে ভাল হয়।”

বিনয়ের গলে গিয়ে মিনতি বলে উঠলো, “আপনিই তার একটা ব্যবস্থা করে দিন না ডাক্তার চৌধুরী।” ডাক্তার তখন আবার চিঠির প্যাডটা টেনে নিয়ে একটা চিঠি লিখে, মিনতির কাছে একটা খাব চেয়ে বললেন।

মিনতি একপাশা খাব ডাক্তারের হাতে এসিয়ে দিতেই সেটাকে ঠিকানা লিখে, চিঠিটা বন্ধ করে ডাক্তার মিনতির হাতে দিয়ে বললেন, “আপনার ছাইভার ফিরে এলে, তাকেই এ চিঠি দিয়ে ডক্টর রায়ের কাছে আজ রাখেই পাঠানো, আপনি নার্স পেয়ে যাবেন। আমি নার্সের কাছের একটা নির্দেশ লিপিশু এই সঙ্গে দিয়ে যাচ্ছি। নার্স যদি আজ আসে তাহলেই তার হাতে এটা দেবেন।” বলেই ডাক্তার উঠে গড়ালেন।

মিনতি ব্যস্ত হয়ে বলে ওঠে, “ভূষণ যে গাড়ী নিয়ে ঔষধ আনতে গেলো ও তো কিয়তে না এখেনো? একটু বলবেন না? ও এলে আপনাকে ডেয়ারে পৌঁছে দিতে পারতো।”

উত্তরে ডাক্তার বলে উঠলেন, “তার প্রয়োজন হবে না, আমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে চলে যাচ্ছি। ঔষধ নিয়ে আপনার প্লোকার ফিরতে, দ্বীতী খুব বেশী হবে না। এদেশে বেন খাবার ঔষধটা ঠিক আগে খাইয়ে দেবেন।”

মিনতি তখন টেবিলের দ্রব্যর থেকে করেখানা

দশ টাকার নোট বের করে ডাক্তারের হাতে দিতে দিতে বললো—“আপাততঃ এই নিয়ে বান, কাল ভো। একবার আগন্তেই হবে আপনাকে, তখন ইনজেকশনের বিল টিলগুলো মিটিয়ে দোবে।” শেকবার উত্তর না দিয়ে, নোটগুলো পকেটে পুরতে পুরতে ডাক্তার বললেন, “চিঠি বা লিখে দিয়েছি, তাতে নার্স আপনি এজুনি পেয়ে যাবেন। আমার চিঠি হাতে পড়লে ডক্টর বীণাপাণি রায়ে, ব্যবস্থা আপনার জ্ঞত করবেনই একটা কিছু।” বলেই মিনতি ব্যাগ নিয়ে ররখার দিকে গেলো ছুত করলেন।

মিনতি তাকাতাড়ি ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে দিগবন্ধকে ডেকে, ডাক্তার বানুকে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিয়ে কিরে আসতে বলে, যদিও কাছে কিরে গিয়ে বললো।

হামি না তার তততরেই ভূষণ চৌধুরী থেকে ঔষধ পত্রগুলো নিয়ে ফিরে এলো। মিনতি তখন ডাক্তারের সেই চিঠিটা ভূষণের হাতে দিয়ে একজন নার্সকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবার জ্ঞত, ডক্টর বীণাপাণি রায়ের বাড়ীতে গাড়ী পাঠিয়ে দিয়ে, মণিকে ঔষধ খাইয়ে, জ্বরের টেম্পারেচার দেখবার জ্ঞত বারোহামিটারটা নিয়ে এলো।

পাশ ফিরে গুয়ে মণি বললো—“তোমার কি জ্ঞত কোন কাজ নেই? আমাকে নিয়ে এত হাকানো লাগলে কেন? এমনতেই পা মাথোওলো ব্যাধা করছিল, তার ওপরে একটা ইনজেকশন দিয়ে, হাতটাকে পর্বত বাধা করিয়ে ছাড়লে। কিছুই হয়নি আমার, পালাও দেখি।”

“তাই বই কি। আমি একটু পালাই আর ভুনি আবার সেই ওস্তলোককে খুঁজতে ছোট সিঁড়িতে। একবার পেলে ছোটো তোমার ওস্তলোককে মজাটা দেখিয়ে দিকুম।” মণি বলে—“মাথাটার জ্ঞত খুঁজতে পারছি না। একটা হাতুড়ী নিয়ে এবে মাথার পেছের টুকে দিতে পারো?”

লম্বাৎ খুঁজে মিনতি মাথার ঘের, “খুব পারি, একটু টান টান হয়ে গুয়ে পড় দেখি।” বলেই সে জলে পোলানো অভিকেলনের বাটিটা নিয়ে এসে মণির মাথার ওস্তলোক

বিত্তে লাগলো। যদি বলে—“পথে পড়া লোক কুড়িয়ে এনে তুমি তার চিকিৎসা করতে চাও, রাজপ্রাসাদের হুজুর্নামিত লম্বাও শুইয়ে। তার কখনো রোগ সাধে।”

বহা! বিরক্ত হয়ে, অভিমানে কল্লিতে মিনতি বলে ওঠে, “বাক্যে বকো না বলছি। পথে পড়ার লম্বা না তো যেখানেই থাকে। সিঁড়িতে একটা আছাড় খেয়েছে তো চিং পটাং। কবতে আশ্বাসের হাতো ঘেঁষের কাজ, পড়তে সুগন্ধের পাঞ্জা, হাজত বাসের বগরে, বসতে পারতে তৈলা কাকে রলে। তোমার তো বয়স ভালো।”

“তা বা বলেছ। আরটা কিছু লিখিই কবতে প্রক করেছে, মাথার বগলাটাও অনেকটা কবে আসছে যেন মনে হচ্ছে। একটু চা খাওয়াবে?”

“তুমি চা হলেই চলবে? আর কিছু খাবার ইচ্ছে হচ্ছে না তোমার?”

“হচ্ছে বই কি। তোমার ঐ নরম তুলতুলে হাত ছানাকো।”

হেসে মিনতি অগাধ ঘের, আশ্বাসিতো কর নয়। আবার মাথাটা ঝেঁতে ইচ্ছে করছে না।

“ওটা তো খেয়ে কবে হজম করে ফেলছি। খাওয়াবে একটু চা?”

অভিমান ভরা বিরক্তিতে, চোখ পাখিখে মিনতি বলে ওঠে, “বেছ ছেলে বাছব তো? জল গরম হবে তবে তো চা। চূপ করে শুয়ে থাকো বলছি, কেনী জোবেচি করলে, একুনি আবার ডাক্তার চৌধুরীকে ডেকে, ফের একটাই ইনজেকশন জুড়ে দেবে কিছ।”

চাক চকু ছুটি মিনতিও বুকের ওপরে বিক্ষান্তিত করে, যদি বলে—“তা বাই কতো, চা আমাকে এখন দিতেই হবে। না দিতে চাও তো ব্রেড দিয়ে কেটে আনো তোমার জিবটা, এঁটে চুষতে পারলেও অনেকটা তেঁটা মিটে যাবে।”

আত্মিক দুখীতে উদ্ভাসিত হয়ে, কপট পাচ্ছিরের বেশ বুখে মাখিয়ে, মিনতি অগাধ ঘের—“হুইবি তো খুব জানে যেখনি। মাথার তো বাধা তোমার কেটে

পড়ছিল, আরও তো গারে ১০১ ডিগ্রীর ওপর, শুধুও রল তো ক'ম নেই দেখছি। ঝাড়াও না, নাস ডাকতে পাঠিয়েছি। শ্রেয়টা একবার অমাব্যার চোঁটা কোরো না, তারপর তোরা খেলা উঠে বজাটা দেখতে পাবে।”

“তুমি থাকতে আবার লেডি ডাক্তার নাস কেন? উঃ—তাপো ডাক্তার সাহেব এসে পড়েছিলেন, মইলে তুমি তো এখনো আমার মাথাটাকে ভেঁমনিই বেঁধে রাখতে! কিছ চা কৈ?”

“তুমি কি মাথা? ঝাড়াও না এবার তোমার হাত ধাঁধার চোঁটা করছি। প্রবীরদা! দিল্লী থেকে তোমার হাজত বাসের জন্ত কি রকম বড়বড় পাখিরে আসছে তাজো আনো না? একেবারে বাঁটা হিন্দু মতে জোমাকে বিয়ে দিয়ে তবে ছাড়বে।”

খাপারটা টিক পরিপাক করতে না পেরে, যদি বলে ওঠে—“আমাকে বিয়ে দেবে? এই বরলে? কার সঙ্গে বল দেখি?”

বুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে মিনতি বলে, —“ও হরি। তাও জানো না বুঝি? সেই যে গো লেই বেরেটা। প্রবীরদার সঙ্গে বলে বলে পড়তো সেই ঢাকতে। চোরের মতন গিরে তুমি লম্বার সময় ছাঞ্জির হতে, হু চকে দেখতে পারতো না যে তোমাকে কোনদিন, সেই বেরেটা।”

একটা হুচ্চিয়ার নিশাস বোচন করতে করতে যদি উত্তর দেয়,—“ভরানক হুচ্চিয়ার কথা তো! শেষে এই বুড়ো বরলে আমার সঙ্গে তার বিয়ে বসবার সাধ হলো? আচ্ছা বোকা ঘেঁরে তো দেখছি!”

হুচকি হেসে মিনতি বলে—“তা বাই বলো, বিয়ে তোমার সঙ্গে না বলে আর তার উপায় নেই। আর তার বটকালী করছে আমার সেই প্রবীরদা। দাধা বৌদার কাছে পঞ্চ চিঠি এসে গেছে, আর কি পালারার পথ আছে তোমার?”

পারের কলমটা ফেলে দিয়ে যদি বলে ওঠে—“খান ছুটেতে প্রক করলো পা বিয়ে, তোমার কথা শুনে।

একটু ভালো করে চা পান করতে না পারলে তো মাথাটা ঠিক হবে না দেখছি।” বললই সে বিছানায় উঠে বসলো।

এমনি সময়ে জ্বষণ এসে ঘরে ঢুকতেই মিনতি বলে উঠলো—“কৈ নাস? কোথায়?”

সে কথায় কোনও উত্তর না দিয়ে, একটা চিঠি সে শকেট থেকে বের করে মিনতির হাতে দিতেই, জ্বষণকে চা আনতে বলে—মিনতি চিঠিটা খুলে পড়েই হেসে ফেললো।

মনি প্রশ্ন করলো—“ব্যাপার কি?”

মিনতি বলে—“তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হলো। নার্শেরা সবাই আশ্বকের মতো ভিউটিতে বেরিয়েছে বলে, লেডি ডাক্তার চিঠি পাঠিয়েছেন। আর লিখেছেন আশ্বকের মাতৃটা কোনবতে চালিয়ে নিতে, এবং আগামী তাল জোরে তিনি অবশ্য অবশ্য তার একটি পালিতা কন্যাকে পারিয়ে রোগীর খোঁজ খবর ভালো করে জেনে, পরে নাস পাঠাবেন।”

তার কথা শুনে, মনি উত্তর দেয়,—“ঠিক হয়েছে। মশা হারতে কামান মাগাতে বাবে আর কখনো?”

হাসতে হাসতে মিনতি জবাব দেয়—“আমার যেন তারি অপরাধ! যে কাণ্ড তুমি তখন বাধিয়েছিলে, তাগিয়া ডাক্তার চৌরুরী রেডি হয়ে এসেছিলেন, নইলে আর এতক্ষণ রসিকতা করতে হতো না! প্রেক বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকতে বিছানায়!”

এমনি সববে ট্রেতে করে চা নিয়ে সেই ঘরে এবেশ করলো দিগম্বর।

টিপরের ভগ্নর চারের ট্রেটা বসিয়ে, দিগম্বর যেই কক্ষ থেকে নিজাও হতে বাবে, এমনি আশ্চর্যিক খুশীর অভিপ্রেত্য রসিকতার হলে, কপট গাড়িঘের তান করে মিনতি বলে উঠলো—“ভলে বাজিল যে বড়ো! তুই তখন এক প্রকৃত কাপ ডিস ভেঙ্গে দেবে যে ট্রেতে ক’বে চা নিয়ে এসেছিল আবার? ঐ সব কাপ ডিস তুই কাল জোরে এনে দিবি। নইলে কগাই ভেঙ্গে তোরা

গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে, তাই যেতে আমি কাল কাপ ডিস নিতে আসবো।”

হাট্টি সাট করে কেঁদে উঠে দিগম্বর উত্তর দেয়—“তা কি করিব আমি! মারিলে মারিবে কাটিলে কাটাবে। বসক মারিলে মোরে বুকটা হরাস করি উঠিল, আর হাত থাকি আমার সকলি পড়ি গেল। এই জাপ, আমার হাতে আর পারে কোন্ডা পড়িল, এখন বলিলে বোর গল্পা কাটি চামড়া উঠাই লিখ। পোড়া অঙ্গুরীর অভিসম্পাত লাগিল আমার,—বা করিবে করো।”

দিগম্বরের এই কথাগুলো শোনবার জন্তই মিনতি তাকে বাধিয়েছিল। তার কথা জুস্ত হতেই যুখে ঝাঁচল চাপা মিঠে, লুকিয়ে হেসে হেসে সে মরে বাজিল এতক্ষণ। দিগম্বরের কথা শেষ হতেই, তার চোখ মুহূবর রক্ত হইবে, সে তখন বলে উঠলো,—আমি মাতৃ ত’রে এই ঘরের দরজার পাশে, বাইরে জেগে শুয়ে থাকতে পারবি? তা হলে এ মাতার তোর গাবের চামড়া গায়েই থেকে বাবে। কিছ সে জন্ত যে তুমি ঐ দরজার বাইরে বসে, গালে পান দোক্তা পুবে, গান শ্রুত করে টোচাতে থাকবে, তা চলবে না কিছ। চুপটি ক’রে জেগে থাকবে, আর ডাকলেই এসে ঘরে ঢুকবে। কেমন রাজী?”

একবারে বেন ঈগিরি বক থেকে দিগম্বরকে নারিয়ে আনা হয়েছে, এমনি মুখের তাবখানা ক’রে সে বলে উঠলো—“এছোটুকু নড়চড় হবে নি তোমার কথু। আগি বাই দাই আসি বসিব, আর জাগিব সেই তোর মাথাটা পথ্য।”

হেসে তখন মিনতি বলে জঠে—“বেশ দেখা বাবে, বা দেখি ঠাকুরকে বলে গরম ছব আর বাজার থেকে বৈকেক বিকুট সব কিনে নিয়ে আর। পরমা পাতির মাঝের কাছে চেয়ে দিবি।”

দিগম্বর ঘর ছেড়ে গেলে—বিত্তীর চারের কাপে চুপুক দিতে দিতে মনি বললো—“দিগম্বর তো ছেলে-মাহু, তোমার বসক খেলে আমারি পেটের দিলে চমকে জঠে।”

অভিমান ভরা হৃষ্টিতে তার হৃৎকের দিকে চেয়ে, মিনতি উত্তর দেয়—“আ-হা-হা-হা তোমাকে আবার কখনো বনকেছি আমি?” বলেই সে কেটলি ঊগুড় করে চা চালতে দিবেই যেনে, বানিকটা তলানি চাড়া তাকে আর চায়ের ঊগুড়ক আধ কাপ পাতা ভেজানো জলও অবশিষ্ট নেই। তখন ছুই চক্ষু বিক্ষুব্ধিত করে মিনতি বলে উঠলো, “আড়াই কাপ চা তত্তি কেতলীটাকে একেবারে সাথরে দিচ্ছে এরি যথো?”

“তা কি করি বলো? তেটা তো আগে যেটাতে হবে!”

কিছুক্ষণ পরে, হস্তক হরে দিগম্বর এক বাটী গরম ছুধের সঙ্গে একটা চোঁকা তত্তি করে খই, কিছুটা আর কেক এনে টেটার ওপর রেখেই আবার চলে গেল। মিনতি বললো—“এইভাবেই তো তোমার তেটা যেটার জন্ত ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন খাও এইগুলো।”

ছুহাত ছোড় করে বসি বলে—“ঐ আর বাটির এক বাটি ছুধ আর ঐ চোঁকা তত্তি আদ্যো? তুমি দেখছি আমাকে খাইয়েই মারবে?”

“তা শুধু না খেতে চাও, গরম ছুধ তো বানিকটা খাবে? নইলে তো সেহটা ঠাণ্ডিমনতো হবে বাবে। ওমনিতেই যা কড়া কড়া ঔষধ পড়েচে। তার ওপরে চার চার কাপ চা তো এর মধ্যেই তলপেটে করেছ, এখন ছুধ না খেতে পারলে চলবে কেন?” বলেই মিনতি একটা কাপে গরম ছুধ ঢেলে কাপটা ভরে দিয়ে বললো—“অন্ততঃ এইটুকু তো খেয়ে নাও।”

“বদা আজ্ঞা” বলে, বসি সেই কাপটা হাতে তুলে নিজেই স্নক করলো—“সত্যি সত্যি জরটা তুমি দেখছি আমার ম্যাডিকের মতো সারিয়ে দিলে, এখন একটা হাত হলে বোধ করি সব মূর্খিলের আগমন হবে যেতো।”

মিনতি বলে—“সেই জন্তেই তো বৈ আনানুম। কালের ছুধ না হয় নাই খেলে। যেবো বাটির ঐ ছুটুকুতে চট্টাি খই ঢেলে? এছনি পেট পরিষ্কার

হবে বাবে।”

ঊৎক্ল হরে বসি বলে—“নাও তাই! বলতো এখন একটা লেডি ডাক্তার তুমি। বিশেষতঃ এখন পাচ্ছে একটু, খেয়েই কেলি। তা হলেই খুশী হবে তো?”

“এটা কি তা হলে আমাকে শুধু খুশী করার মহড়া দেওয়া হচ্ছে? তা হলে তোমার খেয়ে কাজ নেই। কে জানে আমার খেয়ে বসি টমি করে কি বিপত্তি ঘটবে বলবে! ওমনিতেই তো বিকেল থেকে আমাকে নায়েদাল করে মারছো।”

ছুধ ওকিরে বসি জবাব দেয়—“না না, লড্ডাই খিবে পেরেছে। তা ছাড়া পেটটাও আমার পরিষ্কার হওয়া দরকার।” বলেই সে বাটি টেনে খই মিনিটে খেতে শুরু করলো।

চট করে উঠে পড়ে মিনতি বলে—“তুমি তা হলে বীরে বীরে খেতে থাকো, আমি গিয়ে ঘেঁসেল থেকেই ছুটো মুখে দিচ্ছি আসি।”

পরদিন ভোরে মণিকে অনেকটা সুস্থ স্বাভাবিক লোকের মত দেখাচ্ছিল। জ্বর তখন তার একেবারেই নেই। গা হাত পাখের ব্যাথাও রীতিমতো কমে গিয়েছে। চায়ের পাঠ শেষ করে মিনতি বললো—“তা হলে তুমি আর এখন কোথায় বেকয়ার চেষ্টা করো না, আমি নীচে অফিস ঘরে বাচ্ছ একটু। খুব দিগগিরই কিরে আসবে। তুমি ততক্ষণ খবরের কাগজটা দেখতে থাকো। কিন্তু সাবধান, আজ কিন্তু কোনও সম্পাদকের মন্তব্য লিখতে বসো না। সে সব আরও দুই তিন দিন পরে হলেও চলবে।” বলেই সে চলে গেল।

নীচের অফিসে গিয়ে, ফাইল খেটে, করেকটা লেখা বের করলো মিনতি প্রেসে দেবার জন্ত। তারপর ড্রয়ার থেকে একটা ঢেক খই বের করে টাকার অর্থ বসিয়ে লেটা লই করে রাখলো। এমনি সময় ত্যানিচী ব্যাগ হাতে একটা সুমারী ঘেরে তার কক্ষে প্রবেশ করে

নমস্কার জানিয়ে, কি যেন বলতে গিয়ে শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে পাড়িয়েই রইল। মেরেটের সেই অবস্থা দেখে মিনতি একটু বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে বললো—“আপনি কোথা থেকে এসেছেন?”

যেরেট উত্তর দেয়—“লেডি ডক্টর মিসেস বীণাপাণি রায়ের কাছে থেকে।” বলেই একটা চিঠি সে মিনতির হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে পাড়িয়ে রইল।

চিঠিখানা হাত থেকে নিয়েই মিনতি যেরেটিকে চেয়ারে বসতে বলে, এক নিম্নাঙ্গে চিঠিটা পড়ে ফেলে বললো—“ওঃ বুকেছি! আপনি ঠাণ্ডে বলবেন, আমার রোগী আশান্তভ্য ভালই আছেহে, পরে যদি কখনো সরকার হর আমি লোক দিয়ে খবর পাঠাবো।”

সে কথা শুনেও যেরেট কিছু চেয়ার ছেড়ে উঠে যেমিয়ে বাবার কোন আগ্রহই প্রকাশ না করে, বিস্মিত দৃষ্টি মেলে মিনতির মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন ভাবতে লাগলো।

অপ্রত্যক্ষ মিনতি তখন হুচকি হেসে বলে উঠলো, “আর কিছু বলবার আছে আমাকে আপনার?”

যেরেট তখন লজ্জা চোখে তার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—“আপনি মিনতি দি?”

লজ্জা বিস্ময় হয়ে পড়লো যেন মিনতি। বললো, “হ্যাঁ, কেন বল যেমি? তোমাকে তো গ্রিক আমি চিনতে পারছি না!”

তবনি লজ্জা দৃষ্টিতে মিনতির মুখের দিকে চেয়ে মেরেট জবাব দেয়—“আমি নবগ্রাম-গোবিন্দপুরের ক্ষিত্রজ্ঞ নাথ রাই চৌধুরীর মেয়ে, বামুদী।”

অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে মিনতি প্রশ্ন করে—“যে জিনেবাবু আবারের ট্রেটর সরকার ছিলেন?—তুমি ভারই যেয়ে বামুদী! লেডি ডাক্তার বীণাপাণি রায়ের কাছে কি করছো তুমি?”

সে কথার উত্তর না দিয়ে চোখের জল মুছতে মুছতে বামুদী চেয়ার হেড়ে উঠে গিয়ে, মিনতিকে টিপ করে একটা প্রণাম করেই উঠে পাড়লো।

হৃদয় দিয়ে তাকে বুকের কাছে টেনে আনতে আনতে মিনতি বললো—“থাক থাক আর প্রণাম করতে হবে না। কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখে যেমি! লেডি ডাক্তার বীণাপাণি কাছে তুমি বেশ ভালো আছো তো? বসো আমার কাছে এই চেয়ারটাতে বসো। কিছু খাবো তুমি? চা আনাবো?”

বামুদী বিবীতভাবে বাবা! হৃদয়ের জ্বালালো, তার অস্ত্র চা কিবা জল খাবার কিছু আনতে হবে না। মিনতি তখন হাতের কলমটি টেবিলে রেখে, চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বললো—“বল তো তোমার ইতিহাস, কি করে তুমি বীণাপাণি রায়ের কাছেই বা গেলে আর কি-ই বা করছো এখন?”

বামুদী তখন ধীরে ধীরে তার কলকাতার জীবনের গোড়া থেকে শুরু করে, তার ভাই নিতাইকে হারিয়ে মশির বাগার থাকা থেকে, লেডি ডাক্তার বীণাপাণি রায়ের কাছে বসবাসের আত্মোপাখ্য ইতিহাস মিনতির কাছে বিবৃত করে, শেষে, সে নিজে যে এখন ভালই আছে, এবং সুখে আছে, সে কথায় জানালো। তারপর হারানো ভাই নিতাইয়ের অস্ত্র হৃদিতা করে না। সে ভালই আছে।

উরাস গজীর ভাবে পূর্বের দিকে চেয়ে, মিনতি কিছুক্ষণ পরে একটা দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করে বলে উঠলো—“নিতাইয়ের অস্ত্র হৃদিতা করে না। সে ভালই আছে।”

মিনতির মুখে সেই কথা শুনেই, বামুদী কর্তৃত্বের সুরে প্রশ্ন করলো—“কোথার আছে মিনতি দি? তাকে কি আমি দেখতে পাবো?”

গজীর ভাবে মিনতি উত্তর দেয়—“তা পাবে। তবে সে কি আর এখন তোমার কাছে থাকতে চাইবে? যেখানে সে আছে, সেখানে ভালই আছে এবং লেখাপড়া করছে। তাকে পেলে, এখন কি নিয়ে গিয়ে তুমি তাকে ভালভাবে প্রভিগালন করতে পারবে?”

“হুঁ পারবো মিনতি দি, নিশ্চয় পারবো। না

আবার অল্প এক কণ্ডে পারছেন, আমার ভাইটিকে কি আর তিনি ভাড়ির দিতে পারবেন? তা তিনি কিছুতেই পারবেন না। তিনি যদি একবারেই আমার ভাইকে হান দিতে না চান, তাহলে আমি নিজের হোজগার খেঁকেই তাকে কোড়িৎএ রেখে বাছুর করতে পারবো। নিতাই আমার একমাত্র ভাই। আমারের বংশে বাতি দিতে ও ছাড়া আর তো কেউ নেই মিনতি দি! আপনি শুধু বলে বিন, কোথায় গেলে, আর লগে দেখা করলে, আমি আমার হারানো নিতাইকে আমার আমার হুকের ভেতরে ফিরে পাবো।”

মাধুরীর কথা শুনে শুনে, মিনতির এটা বাক্যে বাকী হইল না যে, লতিাই মাধুরী তার ভাইটিকে এখনো আশ্রিত ভাবেই ভালোপালে। এবং শ্রুতি ভাঙার মিলে সীতাপানি তারকে সে বারের সন্তানই ভক্তি করে। কিন্তু সে ভাবছিল তখন নিতাইয়ের কথা। ভাইয়ের প্রতি মাধুরীর সমস্ত বস্তা প্রেমই থাক, সে সমস্তার বদাম্য কি নিতাই আজ তাকে দিতে পারবে? কিন্তু পরীক্ষা করে দেখলে কতি কি?

“—মিনতি দি বসুন না, কি করলে আমি নিতাইকে পাবো?” লগা মাধুরীর ডাকে মিনতির চিত্তাঙ্গাল ছিন্ন-স্তির হয়ে গেল—। সুখে বললো,—“লতিই বলছো নিতাইকে গেলে তুমি এখন লালন পালন করতে পারবে?”

“নিশ্চয় পারবো মিনতি দি, নিশ্চয় পারবো! সে যে আমার বারের পেটের আপন ভাই। বারের বৃত্তার পর থেকে আমি যে তাকে লজ্জার সন্তান করে বাছুর করেছি মিনতি দি। সে যে আমার বধা সর্ব্বথ, তাকে বাঁচাবার অল্প আমি নিজে উপোষ করে থাকতে পারবো মিনতি দি। আপনি দয়া করে আমাকে তার সন্ধান বলে বিন।”

মিনতি উত্তর দিল—“আজ্ঞা বেশ! তুমি আগামী রবিবার দিন আমার এখানে এসো। আমাকে যদি লীচে না পাত, তা হলে বাইরের কলি বেলটা টিপে

খবর দিও।”

অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হয়ে মাধুরী বলে—“রবিবার দিন? সে তো আর তিন দিন ঘোটে বাকী। সামনের রবিবারের কথা বলছেন?”

“হাঁ! তুমি সামনের রবিবার দিনই এসো। খুব ভোরে আসবার দরকার নেই। বেলা চান্দটার সময় এলেই চলবে। আমার এখানেই সেবিন ছুটি খেতো। কেমন এই কথা হইলো তো?”

সহজ সুখে মাধুরী জবাব দেয়, “হ্যাঁ আমি নিশ্চয় আসবো। নিতাইকে কি আপনার কাছেই দেখতে পাবো?”

“শাব্যে—পাব্যে—পাব্যে, বশি তো। তুমি রবিবার দিন এসো।”

তখন মাধুরী আবার মিনতির পায়ে উগুড় হয়ে একটা প্রণাম জানিয়ে কক্ষ থেকে নিষ্কান্ত হয়ে পড়লো। মাধুরীকে বিদায় করে দিবার উপরে আসতেই, যদি তাকে বলে উঠলো—“এর নাম বুঝি এতুনি ফিরে আসা? আমি তো শেষ পর্যন্ত আর কিছু গড়বার না পেরে, খবর কাগজ খানার বিজ্ঞাপনগুলো পর্যন্ত পড়ে শেষ করলাম।”

মিনতি কলি বেল টিপে চারের অর্ডার দিতে দিতে উত্তর দেয়, “তা ভালই তো করছে। বেচারীরা পরস্পর করে কাগজে বিজ্ঞাপন যে দেয়, সে তো তোমাদের পড়বার জন্যই।”

ইচ্ছিত্যের উঠে বলে যদি জবাব দেয়, “তুমি কিছু জানো না। ওরা কি আর শুধু শুধু পড়বার জন্য বিজ্ঞাপন দেয়? তা নয়। বিজ্ঞাপন পড়েছো কি আল তোমার হাত টাকা খরচ করবার অল্প চুলকুতে শ্রুত করবে। এরনি লোভনীর ঘরে মিনতিগুলোর এরো-জনীরতা বিজ্ঞাপন পাতারা তোমার কাছে জাতির করে, যে কিছু একটা না কিনে তোমার নিষ্ঠার নেই। কিন্তু হুজিল হচ্ছে কি জানো? কোনটাকে কেলে কোনটা যে তুমি কেনবার অল্প পছন্দ করবে, সেইটেই ভাবতে বললে হুতোমার বাধা রতে থাকবে।”

মিনতি বলে—“তা বাই বলো, গহনার বিজ্ঞাপন আর শাড়ীর বিজ্ঞাপনগুলো কিছ পড়তে আমার ভালই লাগতো একদিন। তা ছাড়া সিনেমা পেটটা তো তোজট পড়ি, কিছ ও থেকে বেছে আর ছবি দেখবার প্ররতি আজকাল আমার কিছুতেই হয় না কিছ।”

মুচকি হেসে মনি জবাব দেয়, “তার কারণ সিনেমা-গুস্তালাদের ছবি সবচে অতিরঞ্জিত করবার অভ্যাসটা বজ বেনো। এবং বিজ্ঞাপন দেখে গিরে তুমি ছবি দেখতে প্লু করলে বখন দেখবে, যে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে ছবির একেবারেই কোন মিল নেই, তখন যেজাজ তোমার ধারণা না হয়েই পারবে না। কিছ সে যাক। বাসা থেকে এই অফিসটাতে দেখছি না গুস্তালেই চলবে না। বাসার ওপরে ঐ অফিস অফিস গচ্ছ, ও আমার মোটেই বরফাত হয় না।”

মিনতি উত্তর দেয়, “বাসার এ অফিসটা তো আমার নিম্ম। ওতে তো আর তোমার মূল অফিসের কিছু কতি হচ্ছে না। তা ছাড়া গুস্তার স্ট্রী করতে হয়েচে তো গুস্তা তোমার অচ্ছ। আর তার অচ্ছ খাটুনি বেড়েছে যেচোরী প্রভাস বাবু। নইলে তো আমাকে সেই কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট পৰ্বত দুটতে হতো যোজ যোজ। তাতে কি তোমার সুবিধে হবে? ব’ল তা হলে কালকেই উঠিয়ে দিচ্ছি।”

ইতিমধ্যে পাড়ির মা চা দিয়ে গিয়েছিল, তাই কাপে ঢালতে বন্যোবোগী হয়ে উঠলো মিনতি তারপর।

মনি বলে, “তোমার সঙ্গে জেরার আর মুক্তিতে আমি দেখছি কিছুতেই পেরে উঠি না। অফিসের কথা বললুম, তুমি বাবে বাবে নীচে যাও বলে। অর্থাৎ তোমাকে আমার ‘মিনতি’ পত্রিকা অফিসে বেতে দিতে আপত্তি নেই, কিছ বাসার এই অফিস অর্থাৎ, সেটা তুমি নীচে না রেখে, এই ঘরেই তো রাখতে পারো, এই রকমের একটা ইচ্ছাই আমার প্রকাশ করবার অভিপ্রায় ছিল। তুমি দেখছি আমার গলায় পা দিয়ে একেবারে সে গোপনীয়তাটুকুও উল্লঙ্গ করে ছাড়লে।”

চারে চুপ্ক দিতে দিতে মিনতি হেসে বলে, “হুড়ো বয়েস গ্রেম যে বজ গলীর দেখছি। তা হলে বয়ঃ আমার ঐ ঘরটার ভেতরে থাকিগটা জায়গা তুমি পাটিগান করে নিয়ে, একটা বৈঠকখানার বতন কিছু করে নাও না? লোকজন তো আসেই, তাদের কি আর সব সবরে উপরে নিয়ে আসা ভালো?”

মুচী হয়ে মনি বলে—“তা যা বলো! যাক্ তবুও তো সে প্রাংগনটা আমার হয়ে তইল। এর পর একদিন কাঠের মিত্রী ভেঁকে টিক করে নিলেই হবে।” বলেই সে হাসতে থাকে।

মিনতি মুচকি হেসে বলে গুঠে—“মুঠের নিরোয়ানি কোথাকার!”

মনি উত্তর দেয়—“তা কালে কাজেই। কার সঙ্গে নীচের ঘর থেকে গ্রেম করে ওলে, তার টিক নেই, উপরে এলে আবার আবারকেই দেখছি গ্রেমিক টেমিক বলে আদিবোভা করছে।”

মনির কথা শুনে মিনতি কি ক’রে হেসে কেলেই চায়ের কাপ ট্রেতে নামিয়ে বোললো, “গ্রেম করছিলুম তোমার সেই বোনের সঙ্গে।”

মহা আন্দর্ভাষিত হয়ে মনি বলে গুঠে—“আমার বোন? এ পৃথিবীতে আমার কোনও বোন আছে ব’লে তো আমার জানা নেই! বলছে কি তুমি?”

পক্ষীর হাতবিনিক্ষিত হবে, মিনতি জবাব দেয়—“টিকই বলছি আমি। একদিন যার অচ্ছ আমার কাছে অত রহস্য রহস্য করেছিলো। তাকে আমার কাছে স্থান দিতে পারি নি বলে মনে মনে রাগ পৰ্বত করেছিলো যার অচ্ছ আমার ওপর, তাকে আচ্ছ কি এমন করেই জুলে গেলে? মায়ের পেটে না জন্মালেই বুঝি পৃথিবীর আর কেউ তাই বোনের পর্দাভুক্ত হ’তে পারে না না কি?”

মিনতির কথায় অতি অকস্মাৎ মাদুরীর কথাটা মনির মনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। বললো—“কিছ সে তোমার কাছে আচ্ছ কোথা থেকে এসে উপস্থিত হলো?”

তাকে ওপরে তেঁকে আসলে না কেন ? মাধুরীর কথা বলছো তো ?”

হাসতে হাসতে মিনতি বলে—“আমার তো আর খেয়ে বেয়ে কাজ নেই, তোর বেলান্তেই একটা সিন্ ক্রিয়েট করে বসি আর কি ! বে রকমের তাবগ্রন্থ নাহব তুমি, মাধুরীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে, তাব সাগরের তেঁউরের বাতাস কোথার গিরে ছিটকে পড়বে, তার টিক আছে কিছু ? শেষে তাপ সামলাতে গিরে আমি কালকের মতো আর এক দফা নাকানি চোবানি বাই আর কি । তবে তরুণী তোমার, আমি তাকে একেবারে তাড়িয়ে দিই নি, আগামী রবিবার বিন তোরেই আসবার জন্য নৈমন্ত্য করে এসেছি । সেদিন ও ঠিক আসবে । ও এখন ঘুখেই আছে । পেড়ি ডাক্তার হিসেপ বীণালাপি রাতের কাচেই ও আছে । তাকে ও যা বলে ডাকে দেখলুম । বোটে বোটে ওর জন্য এখন তোমার আর দৃষ্টিতা করবার কিছু নেই ।”

একটা জুদীর্ঘ নিশ্বাস বোচন করে মনি জবাব দেয়—
“বাক নিশ্চিন্ত হলুম । ওর জন্য সত্যিই আমার একটা দৃষ্টিতা ছিল । আজ ওপরে না নিয়ে এসে তুমি ভালই করেছো ।” তার পর বলে—আজ আমাকে তাত কট্ট টুটি কিছু পণ্য দেবে তো, নাকি কালকের মতো শুধু

খৈ ছব খাইয়েই রাখবে ?”

পতীর মধুর হাসি হেসে মিনতি জবাব দেয়—
“ব্যয়তক দেও দেও দোক তো তুমি ! আজকের দিনটা না হয় উপোস করেই থাকো না । পারবে না তা ? শ্রবীরদাও তো শামনের সপ্তাহেই এসে পড়ছে । সে ববি বা ছাড়ে, কিন্তু আমার বৌদি তো আর বিয়ের দিন তোমাকে উপোস না করিয়ে ছাড়বে না, তারই একটা ট্রায়াল আজকে দিয়ে ফেল না ?”

মুখ শুকিয়ে মনি উত্তর দেয়—“বিয়ের জন্য উপোস করতে হবে বলে, আজ থেকেই পেটে কীল মেরে পড়ে থাকি আর কি ! বেশ, তা হলে তুমিও উপোস করো না, ট্রায়ালটা তোমারও হয়ে যাক ।”

সে কথা শুনে ভাড়াভাড়ি উঠে গিয়ে পেছন থেকে মনির গলাটা জড়িয়ে ধরে, মিনতি বলে—“আমার ব’রে গেছে উপোস করতে । কেউ ভেতন শীড়াশীড়ি করলে সেদিন মুকিয়ে এসে তোমার এই গাল দুটো আর ঠোটটা কি আমি আত রাখবো মনে করেছি ?” এই বলেই সে মনির গাল দুটো হুহাতে টিপে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ।

(শেষাংশ আগামী বারে সমাপ্য)



রবীন্দ্রনাথের প্রতাপ

ঐক্যদেব হার

[পূর্বাহ্নভক্তি]

বহার ভেঙরা ক্রান্তগতি

আজ বহুত সুগন্ধ পবন হৃদয় মধুর বসন্ত ঘেঁ,
হর মকুদ পর মুখ মধুপ মদহর নিরন্ত কর রব কুন্ত ঘেঁ ।
কহি কোয়লিয়া কুল করহি আদুবাক ডার বসন্তে,
কহি খেলি চামেলি শুলাব সৌন্দ্য চন্দ্ররজ বিরজনে ।
ইত যৌবন সদাশ্রী সুখী অদি রবী বিন কান্ত বে,
পুকার বন হা নাথ নাথ বিহত তই প্রাণান্তবে ।
তুনি প্রবণ রব রজন্য কহত বচাবে নাথ কুসলমে,
এহি রজ চক অনন্ত মনসো উত্তারী রাব সুসলমে ।

(রজন্য)

বহার ভেঙরা ক্রান্তগতি

আজি বহিছে বসন্ত পবন সুবন্দ
তোমারি সুগন্ধ হে ।
কত আকুল প্রাণ আজি গাহিছে গান
চাহে তোমারি পানে আনন্দে হে ॥
জলে তোমার আলোক ছলোক ছলোক
গগন উৎসব প্রাণপ্রে
চিত্র জ্যোতি পাইছে চক্ৰভাষা,
আঁখি পাইছে অন্ধ হে ॥
তব মধুর মুখ ভাতি-বিহসিত
প্রেম বিকশিত অস্তরে—
কত তকত ডাকিছে, "নাথ, বাতি
দিবল রজনী তব সঙ্গ হে ।"
উঠে সন্মানে প্রান্তরে লোক লোকান্তরে
বশোপাশা কত হৃদয়ে হে—
ঐ তবপরশ, প্রভু, অস্তর শব্দ তব সুর
হানব দুনি বন্ধে হে ॥

রামকেলী বা রামকিরি ভৈরব ঠাঁটের গান । প্রভাত-
কাসের রাগিনী বলিয়া নির্ভিত । ভৈরবী, গুর্জরী ও
তোড়ীর সংমিশ্রণে ইহার জন্ম । সম্পূর্ণ ভাতি, বাদী

অর বৈগড়, সংবাদী অর বসন্ত । শব্দীত শাস্ত্রে রামকেলি
রাগিনীর রূপ বর্ণনা এই প্রকার—

হেতপ্রভা তাম্র কুণ্ডলা চনীলং নিচোলং বপুয্য
বহুতী । কাণ্ডে সখীপে কমনীয়কর্পা মনোমত্তা বহুতী
রামকেলি যতেরম ॥

জান রনের মূল গানটি এবং কবির ভাষা গানটি
এই—

রামকেলি
বাগত বীণ প্রবীণ বধাব
কিন্নর গাবত ইজ্বরবাব ।
উষটত (উদঘাটন) নহর দুন (ধনি) চহঁ বিপ চাতো,
ওঁর তান মুরগ মুক্তার ।
সিংহাসন পর বৈঠে সুবপতি,
নিরখ কোটি বহো (চক্ৰ) জ্যোত ছার ।
রহ সতাকো সাক বেঁথে সব
মন যে আনন্দ পাবে অশার ॥ জানরজ
রামকেলি কাঁপতাল
হুগে দুর করিলে, দরশন দিলে
বোহিলে প্রাণ
সপ্তলোক জ্বলে শোক, তোমারে চাহিলে
কোথার আছি আমি দীন অতি দীন ।
রবীন্দ্রনাথ

আড়ানা, কানেন্ডা, জাতীর, ইহার গাভার ও নিবাদ
কোনল । ইহাতে কোন সুর বজিত নাই । ইহার
বিশেষ এই অপরোহণের সময় কোনল নিবাদ হইতে
একবারে পক্ষে নামিরা আসে । কানেন্ডা এবং
সারসের সংমিশ্রণে আড়ানার সৃষ্টি ।

আড়ানা রাগিনীর চৌতালের এই গানটি রবীন্দ্র-
নাথের জ্ঞান ছিল, ওঁহাকে গানটি অনেক সময় গাহিতে

সন্ধ্যা) আমি যেবার থাকি তুমি গাহিতে (পরম বসন্ত)
হেরি অধরহ তোনারি বিরহ (বিল কানাকড়ি, চৌতাল)
প্রকৃতি—

ইমন চৌতাল ব্যাগতি

সন্ত হুহ তিন গ্রাম একইন মুরছন

বাইন শোরত নে (প্রতি) উনপকাশ কোট তান সাধ নাহ
আরোহী অবরোহী আত্মারী সকাই বরণ মুরণ (মুতি)

উষট প্রগট তিরক বা নিখান।

কর্তৃত্বন বনাকে দাঁচো পটরী

পঠায়ে মুর সখান।

সখা সখা গগ ধান পটান পম গগ ধাগ গগা

সধাগম পধ নিধল নিধল নিধি বধ পধ

গগধাস সধাগম পধ পুরত মুরত মিটত বাহ ॥ শুণ সেন

হিন্দুস্থানী ভাষার লক্ষণ গীতের নাম 'লক্ষণ গীত';
বাহ্যীয় হতে ভাল এবং শব্দের সহযোগে নির্দিষ্ট রাগের
ঠাঁট, জাতি, ধারী, সধারী, গীতের কাল এবং রাগরূপ
অক্ষয় এই শ্রেণীর গানের উদ্দেশ্য। Theoretical
রূপ বর্ণনাই লক্ষণ গীত।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণ গীত এবং সারস্বতের উল্লেখ
করিতে হয়। লক্ষণ গীতে রাগিনীর স্বর, জাতি, সধর,
ধারী, সধারী, বিধারী প্রভৃতির বর্ণনা করা হয়, সারস্বত
গীতে রাগিনীর স্বর সঙ্কেতের ধারা গান গাওয়া হয়।

বহি উপরের ঐ পানটির অঙ্করূপ মূরে রচনা করেন—

শক্তি রূপ হেরো তাঁর,

আনন্দিত, অন্তরিত,

ভুলোকে ভুললোকে,

বিশ্ব কাঙ্খে, চিত্ত মাঝে

দিনে রাতে।

জাগো রে জাগো জাগো,

উৎসাহে উল্লাসে,

পরাণ বিধোরে মরণ হরণ

পরম শক্তি মাঝে।

প্রাতি অদম বিদ্য

বিলাস বিদ্য বিদ্য

দূর করো রে ॥

চলো রে,—চলো রে কল্যাণে,

চলো রে অভয়ে, চলোরে আলোকে,

চলো বলে ॥

দুখ শোক পরিহারি

বিল'রে নিখিলে নিখিল মাঝে ॥

প্রণয় গানের উদ্ভব খৃস্ট প্রাচীন নয়। গোয়ালিরবের
রাজা মানসিংহের (১৫৮৬-১৫৯৬) রাজত্বকালে
ঊষারই উৎসাহে এই রীতির জন্ম হয়। ঊষার রাণী
মৃগনয়নীই সম্ভবতঃ গোয়ালিরবের এক শ্রেণীর লোকগীতি
(যেরেলি গান) হইতে এই গুরু গভীর অভিজাত
গীতি পদ্ধতির প্রচলন করেন। লক্ষ্যই আকবরের
রাজ দরবারে শুধী তানসেন এবং ঊষার গুরু হুসিনাল
দ্বারী সাধন উৎকর্ষতার আধুনিক প্রণয় গভীর
রূপলাভ হয়। আইন-ই-আকবরী'তে আবুল-ফজল
এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন—

"The other kind of songs are called
Deysee (or local) each place having its
peculiar ones, as Dhroopad in Agra, Cavalior,
Bary and that neighbourhood. In the reign
of Raj'ah Mansingh at Gowalior, three of his
musicians, named Naik Bukhsboo, Mujhro
and Bhanoo, formed a collection of songs
suited to the taste of every class of people.
When Mansing died, Bukhsboo and Mujhro
went into the service of Sultan Bahadur
Cujeratty, and being highly esteemed by that
prince, introduced into his court their kind
of songs. The Dhroopad consists of stanzus
of three or four rhythmical lines of any length.
They are chiefly in praise of men who have
been famous for their valour for their
virtue."

এই শ্রেণীর উত্তারের traditional গ্রন্থ গানগুলি বহুদিন হইতে ব্যয়োগ্য। পরম্পরা চলিয়া আসিতেছে ; কিন্তু তাহাদের আটান সুরকৌশলিত ষ্ট্রিকমত বজার থাকিতেছে কিনা সেই বিষয়ে পাকাত্য সুর বৈজ্ঞানিকগণ সন্দেহ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ Dr. Arnold Bak'e এই বিষয়ে বলেন—"The Indian practice of handing down melodies from guru to pupil, leaves us to guess how much of the old music as sung today really belonged to the original compositions of the singers of old."

এই সকল অবিকাংশ গানেই কাব্য আছে, সুরেরই বাহুল্য। কবি তাই দুঃখ করিতেন "এইজন্ত সংগীত আশ পর্বত সেই সকল অলিঙ্কিত সোবের মধ্যেই বহু বাহ্যদের সমুদ্রে বিশ্বের প্রকাশ নাই। বাহ্যের অক্ষয় জীলোকের মতো নিজের সমস্ত ধনকে গমনা গড়াইয়া রাখিয়াছে, তাহাকে কেবল গ্রহণ করিতেই পারে, সর্বতোভাবে ব্যবহার করিতে পারে না। এমন কি ব্যবহারের, কথার আভাশ দিলেই তাহার আতঙ্কিত হইয়া উঠে, মনে করে, ইহা তাহাদের সর্ব্ব খোয়াইবার পন্থা! কিন্তু তুলসীদাস, সুরদাস প্রভৃতির কবি প্রতিভা অনবীক্য। তাঁহাদের গান সুরের অলঙ্কারে ঢাকা পড়ে নাই। তুলসীদাস আজও ভারতবর্ষের সর্বপ্রিয় কবি জ্ঞান, তাঁহার কাব্য আজও সারা ভারতের সর্বাপেক্ষা বেশী লোক পড়িয়া থাকে, বাংলা পদ্যেরের স্তার তাহার একটি বিচিত্র গতি আছে।

নি সা সা গ, তুলসীদাসের গানের প্রচলিত সুর। তুলসীদাসের নামে পরিচিত ভজন প্রভৃতি গানে দীর্ঘ বাক্যবিশিষ্ট তাহার রাগাদির প্রকাশের বাধ্য বস্তুর বলিয়া মনে করা যায়। কবি শুধু তুলসীদাসের এই রাগ ভজনটির সুর অল্পরূপে স্মৃতি করেন—

নি সা সা গ সঙ্গীতাল মধ্যগতি
দুস্ন হোথ-দুথ দল নি, কক বেধি দয়া।

বিশ্ব-মুখাংসি জন সাহুসুলাসি,
করমুল বারিনি মধ্যমুল ময়া।
ভক্তি পর্জা নরাল মুখের ললিত
দিব্য পট ভদ্র তুখন বিরাজে।
যালদুগ মন্তু বহনি বিশোচনি
চন্দ্রবহনি লখি কোট রতি মার লাভে
হপমুখ-শীল সীমাহসি জীমাহসি
রাবাহসি বাবাহসি কর বুদ্ধি মালী।
দুঃখ হেরখ অহাসি অগদধিক
শমু তারাসি অর জর ভাবানি।
চকু তুখ দত্ত বত্তনি বিহত্তনি সুত্ত
মহিখ মদ ভল করি অম তোরে।
তত্ত নিত্ত হুজীল রণ কেশরিণ
জোব বারিখি বৈরী বৃন্দ যোরে।
নিগর আগন অগন শুবি তব গুণ কখন
উবিধর (শেষ ২২%) তপত যোছে সরস বিছা।

যেহি বা যোছে প্রণ প্রেম নিত মেঘরহ
রাব বলভার তুলসী পণীহা ॥ তুলসীদাস

বহে নিরন্তর অনন্ত আনন্দ ধারা
বাগে অলীখ নত-বাক্যে অনাবি রব,
আগে অগণ্য রবি চন্দ্র তারা ॥

একক অকণ্ড ব্রহ্মাণ্ড রাজ্যে
পরম এক সেই রাজ্যরাজ্যে রাজ্যে।
বিস্তিত নিমেষ হস্ত বিশ্ব চরণে বিনত,
লক্ষ শত ভক্তচিত্ত বাক্যাহা ॥

হরীর চৌতাল

রবীন্দ্রনাথ
মধ্যগতি

আলি হি, গরমত খন টপকতাবন,
ভিক্রে বসন কলিত তন অতি সহরাই।
করি বটা মুখ আই, জোরি বেল লহলহাই
ভাগোই হর তুম তই, সুবত দামিনী চবকাই।
হসন মশন বত্ততাই, খোপত বিহুখ আই
দুগনন কে লখন তাই অতি তর শাই।
মানদাস সুরদাই, অচকে: নিল কহাই

ভবত হাতি বগবাই হুসাই কঠি উর লাই ॥ মানদাস
গহন ঘন বনে, গিরাল ভবাল
সহকারি হায়ে ;
সজ্জা-বারে তুপনধনে সূজনধনে
রবেতি বসে ;
জামল পল্লবভার আবারে বর্মবিত্তে,
বাহু তরে কঁপে শাখা,
বকুলগল পড়ে বসি ।
জল নীচে নীরব বিহগ
নিজরঙ্গ নদীপ্রান্তে অবগোচর
নিবিড় ছায়া ।
কিন্দিবস্ত্রে তজ্জাপুর্ণ জলধল নৃত্তল,
চরাচরে বশনের বসে ।
নির্জন ছদ্মে নোর আগিতেছে সেই
খুশ-শশী ॥

রবীন্দ্রনাথ

হৃদয় কোমল প্রকৃতিতে কেহ কেহ কল্যাণ ঠাঁটের
বহো ধরিয়াছেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, ইহাতে যদি
জুই কড়ি ম থাকিত তাহা হইলে সত্ত্ব হইত, বশন
ছুই ম লাগিয়াছে, তখন উহাকে কল্যাণ ঠাঁট বলা বাইতে
পারে না, তবে কোমল, জাম ইত্যাদি হৃদীর ঠাঁটের
রাসিনী ।

রবীন্দ্রনাথের হৃদীরের অস্তিত্ব গানের মধ্যে—জননী
ঘরে আছি শুই শুন গো শব্দ বাজে, আনন্দধ্বনি আগাগ
গগনে প্রকৃতি গভীর স্রুটি একাশ করিয়াছে । আধুনিক
বুগে-ভাঁহার হৃদীরের গান অজ, যেমন 'কতো অজানারে
জানাইলে তুমি' প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত আধুনিক বুগ পর্বত
কবি হিন্দী ভাষা গান রচনা করিয়া আসিয়াছেন ; তবে
ব্রহ্ম সঙ্গীতের সুপের অবগান হইয়া গিয়াছে, কাজেই
এখনকার গানের ভাষা সম্পূর্ণ রাগ সঙ্গীতেরই । রবীন্দ্র-
নাথের অগুণ প্রকৃতি রঞ্জিত কবিতা ভারতীয় আদর্শ
সুপের ভাষ্যে একাশ হইয়াছে । 'এই বুগের আদি
হিলি গানগুলিও বুগ প্রাচীন নয়, পরম্পরায়িক বুগেরই
রচনা । শ্রীমতী সাহানা বেবী প্রকৃতির কণ্ঠেই এই

সুপগুলি কবি তনিয়া ছিলেন, তাঁহার ভাষার "কবিত্ব
গান শোনাবার বন্দই আছেন আসল, তিনি বলতেন
তোমাদের দেশের গান শোনাও, আমাদের দেশ বলতে
তিনি লক্ষ্যের গান মনে করতেন; তাঁকে শোনাবার
অজ্ঞেই আমরা নতুন ভালো-হিন্দী গান শেখবার আগ্রহ
অদ্বার ।" এই ভাবেই নৃত্য—

দ্বৈতপুত্রী

ত্রিভাঙ্গ

(অদ্বারী) বাজে বনন কনন বাজে পায়েলিয়া বোরি ।
রাগ হুলারি ভোরে অদন বামা ॥
(অদ্বারী) মন বস্তক বস্ত বারোহি ভোরে ভোরে
হল নৈলন অব অতহি ছাই ॥
এল পরতের অদল মহিমা,
এলে! যে বীরে ।
ভিত্ত বিকাশিবে চরণ বিরে ॥
বিরহ তরলে অকুলে সে দোলে
দিবা বামিনী আকুল স্নানীরে ॥

ভৈরবী

ত্রিভাঙ্গ

(অদ্বারী) জাগো মোহন পায়ে, নীরব স্রবত বোরে মন
ভাবে, স্নানর লাল হুমায়ে ॥
(অদ্বারী) প্রান্তে মনে উঠে তাহু উদয় করে
গোয়াল বসন জুগার বাড়ে,
মরশন কে লব বুঝে শিখালে
উঠ হো নন্দ কিশোর রে ॥
তুমি আগনি আগাগ বোরে
ভব হুগা পরশে
ছদর নাথ, তিমির রজনী অবগানে
হেরি তোমার ;
বীরে বীরে বিকাশো ছদর গগনে
বিমল ভব সুখভাতি ॥

গাভারী

ত্রিভাঙ্গ

(অদ্বারী) বোরে ক'নন নকতা পাইলি রি
বব আবেগে হুমায়ে ললন।
অপাহি বোরে মন্দর বা ॥

(অষ্টম) স্বয়ং আবেগে আসন্ন যতন
অনন্য বন নো ছায়ায় করি হো
সহায়কালি যোহনন খা
কতন বলক বা আ বোরি ॥

কায় বাণি নিশি তোরে বাকিল
বোরি প্রাণে।
হুটে দিগন্তে অরুণ কিরণ কলিক। ॥
শরতের আলোতে স্নান করি আসে
হরদীপ জ্বলি যে শিশিরে ভালে
উষর কুজবনে মুক্তকিল মধুর
শেফালিকা।

এই গানটি কবির Traditional স্রষ্টা সঙ্গীতের আদি
গান এবং পূর্বের গানটি সেই পদ্ধতির শেষ গান। ইহা
ইহা স্রষ্টা সঙ্গীতের ক্রম বিকাশের একটি স্তর। তবে এই
আদি গানটি কবির অথবা কবির গুরু জ্যোতিবিরোধের
নিশ্চয় করিয়া বলা সম্ভব নয়।

বাঁহা জ্বলন্ত স্রষ্টা সঙ্গীত
আজু শব্দ হর নাচত উন্নত করে,
বহুবিধ গল্পবদন লয়েছার স্রষ্টা
আনন্দ করে।

পানান অনাধি নাম আলাপ করে,
পানত স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা করে,
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

বাঁহা জ্বলন্ত স্রষ্টা সঙ্গীত
আজু বিশ্বজন গাইছে মধুর করে,
সনাতন স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
আনন্দ করে।

পূর্ণ গগন অনাধি নাম আলাপ করে,
গাইছে স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা করে,
বিশ্বনাথ অন্নর দেবিত, অন্নর
জ্যোতিতে বিরোধে।

বাঁহা জ্বলন্ত স্রষ্টা সঙ্গীত
আজু স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা করে,
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
আনন্দ করে।

বিশিষ্টের স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

আজু স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা
স্রষ্টা সঙ্গীত স্রষ্টা স্রষ্টা স্রষ্টা

এ বছর ভারত সরকারের হাতে নতুন পাণ্ডপও অনেক আছে। কাজেই একটা ব্যাপক হস্তিষ্ক দ্বারা

আশঙ্কা বুঝি কম। তবে মুসকিল হচ্ছে এই যে পর্বাণ পরিমাণ চাল সরকারের হাতে বা বেশেই নেই। অথচ বাঙালী বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের বাঙালী ভাত ব্যতীত অন্য খাদ্যে বিশেষ অভ্যস্ত নয়, এবং খেতেও চান্না নয়। অনেক সময় তারা আটার কুটি খেতে চান না। বা খেয়ে বলব করতেও পারে না। বাঙালীর এই চুর্বলতার ব্যবোগ নিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ঐ সব অঞ্চলের লোকদের উলকাচ্ছে এবং তবিলুতে উলকাবে, যাতে চালের দাবী প্রবল করে তোলে।

অনেকেই মনে আছে ন'বছর পূর্বে বাংলায় একটা ভীষণ ও ব্যাপক দ্রুতিক হয়েছিল। অন্নান ৩০ লক্ষ লোক একমাত্র বাংলায়ই সে দ্রুতিকে মারা গিয়েছিল। তখন সেই দ্রুতিককে ইংরাজ সরকারের ইচ্ছাকৃত বলে অনেক মনে করত, এমনকি ক্রেন্সওয়ান কাগজ পর্বত ওই দ্রুতিককে বাহ্যের তৈরী (man made famine) বলে অভিহিত করেছিল। সেই দ্রুতিকের সময় কয়লাশিট পাটি ও অস্ত্রাঙ্গ করেকটি দল সরকারের সর্বপ্রকার অপকর্মে সহযোগিতা করেছিল এবং দ্রুতিক সৃষ্টির কাজেও তাহাদের সহযোগিতা ছিল। আভকের এই আশঙ্কিত দ্রুতিককে রাজনৈতিক অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে এরা ক্রটি করবে না। কাজেই এ বিষয়ে সরকারের বিশেষ অবহিত হতে হবে।

আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে দ্রুতিককে প্রতিরোধ করার অস্ত্র পর্বাণ ব্যবস্থা সরকার অবলম্বন করবে। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীদের ও কংগ্রেস কমিটিগুলিরও এই সংকল্পে বিশেষ কর্তব্য আছে। যে সব অঞ্চলে অল্পের অভাব আছে সেখানে যাতে পর্বাণ পরিমাণ আটা ও গম বা অন্য প্রকার সহজ পাচ্য বিকল্প খাদ্য বার এবং অল্পমূল্যে বিক্রির ব্যবস্থা হয় তা কংগ্রেস কর্মীদের দৈর্ঘ্যে হবে। সরকারী বরাদ্দ বাস্তবায়ন যাতে কোন প্রকারে চোরাখাজারে না বেতে পারে সেদিকেও কংগ্রেস কমিটি ও কংগ্রেস কর্মীদের বিশেষ নজর রাখা প্রয়োজন। আটা বা অন্য প্রকার বিকল্প খাদ্য তৈরী এবং গ্রহণ করা

সম্বন্ধেও কংগ্রেস কর্মীদের নজর রাখা প্রয়োজন। এবং সর্বোপরি তাদের কর্তব্য হবে গ্রামবাসীদের মধ্যে দৈর্ঘ্যের কথা সরকার পক্ষের দিকট পৌছানো এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সরকারকে তাগিদ দেওয়া। কংগ্রেস যে সভ্যকার অনুসেবার প্রতিষ্ঠান তা অরণ রেখে কংগ্রেস কর্মীদের এ সম্বন্ধেই সময় চলাতে হবে এবং কংগ্রেস সরকারকেও সেইভাবে চালিত করতে হবে।

স্বাধীনবাচিত পার্লামেন্ট

স্বাধীন ভারতের নতুন সংবিধান অনুসারে পার্লামেন্ট নির্বাচিত হয়েছে। সত্তেরো কোটি ভোটারের ভোটে ৪৮৯ জন সদস্য নির্বাচিত হয়েছে। আর ১০ জন সদস্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত হয়েছে। মোট ৪৯৯ জন সদস্য নিয়ে পার্লামেন্টের লোকসভা গঠিত হয়েছে। এর মধ্যে একশো পচিশজনের মত বিরোধী দলের সভ্য আছে। আর সবই কংগ্রেস দলভুক্ত। এই বিরোধী দলের তিতর ১০১২টি দল আছে। তার মধ্যে কয়লাশিট দলই সংখ্যায় সবচেয়ে বড়। সঠিক ভাবে তাদের দলভুক্ত ২৫ জন, এবং তাদের অনুগামী ৬ জন। কৃষক প্রজা মজদুর দল, সমাজতন্ত্রী (Socialist) দল, হিন্দু-মহাসভা, জনসংঘ, রামরাজ্য পরিষদ প্রভৃতি দলের কিছু কিছু সদস্য লোক সভার আছে। ভাস্কর্যে সমাজতন্ত্রী ও কৃষক প্রজা মজদুর দুই দলের মোট ২০২১ জন সদস্য হবে। আঞ্চলিক দল হিসাবে কাড়খণ্ড ও লোক-সেবক সংঘের নাম উল্লেখ করা উচিত। ছোট নাগপুরের অধিকাংশ আসনই কাড়খণ্ড দল অধিকার করেছে। ও মানকুং জেলার দুটি আসন হতে লোকসেবক দলের দুজন সভ্য নির্বাচিত হয়েছে।

বিরোধী দলের নেতা হিসাবে কোন বিশেষ ব্যক্তিকে নির্ধি করাবার চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সংখ্যার অসুতার জন্য কোন দলই বিরোধী দলের মর্যাদা পেতে পারে নি। পাঁচশো সত্তের মধ্যে অল্পতঃ পঞ্চান জন সদস্য বাঁকলে কোন দলকেই বিরোধী দলের মর্যাদা দেওয়া চলে না। তাই কোন দলই সে মর্যাদা পায় নি। কয়লাশিট দল

নিশেখ চৌধুরী করেছিল যাতে তারা বিরোধী দলের স্বাধীনতা লাভ করতে পারে। তাদের সে চৌধুরী সংখ্যাসত্তাব অল্প বার্ষিক হয়েছে। এ ভিন্ন বস্ত্র সত্তাব সংখ্যাও খুব কম নয়। বস্ত্র সত্তাবের মধ্যে এমন কয়েকজন আছে যারা ব্যক্তিগত মনীষা ও প্রতিষ্ঠার জন্যে লোকসত্তাব একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেন।

এতগুলি বিভিন্ন দল থাকায়, লোকসত্তাব একটা বিরোধী দল দানা বেঁধে উঠতে পারবে কি না সন্দেহ। পার্লামেন্টে গণতন্ত্র দুইটি দলের প্রতিযোগিতার গড়ে ওঠে ও কার্যকরী হয়। একদল—সংখ্যা গরিষ্ঠ দল—শাসনকার্যের দায়িত্ব নিয়ে সরকার পক্ষ হয়। অপর দল, —অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ দল—বিরোধী দল হিসাবে পার্লামেন্টেই কাজ করে। কোন কারণে সংখ্যা গরিষ্ঠ দল যদি তাদের সংখ্যা প্রাধান্য বজায় রাখতে না পারে তা হলে সংখ্যা লঘিষ্ঠ বিরোধী দল রাষ্ট্রের শাসনকার্য গ্রহণ করে। কিন্তু যদি ছোট ছোট কতকগুলো দলে পার্লামেন্টের বিরোধী সভাপন বিভক্ত থাকে, তা হলে কোন সময়ই তাদের পক্ষে রাষ্ট্রের শাসন ভার গ্রহণ করার সম্ভাবনা প্রায় থাকে না। সেখান থেকে বলা চলে যে কংগ্রেস দলের কোন বিকল্প দল পার্লামেন্টে নেই। এই অবস্থার সাধারণতঃ সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের মনে বিরোধী সভাপনের সহজে কোন আস্থা বা সম্মতির ভাব থাকে না। এবং সংখ্যা লঘিষ্ঠ দল সমূহের মধ্যেও দায়িত্বপূর্ণ আচরণের ও বাক্যের অভাব দেখা যায়; দায়িত্বহীন মনোভাবের সঙ্গে কাজকর্ম পরিচালনার দিকেই তাদের প্রকৃতি যায়, কারণ তারা জানে যে অল্প ভবিষ্যতে দেশের শাসনকার্য তাদের হাতে আসবার কোন সম্ভাবনা নেই। সংখ্যা গরিষ্ঠ বা সরকারী দলকে বঞ্চিত করে পালাপাল ও বিজ্ঞপ্তি করার দিকেই তাদের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে নিয়োজিত হয়।

ভারতবর্ষের এই নূতন লোকসত্তাব বিরোধী দল সমূহ কি ভাবে তাদের কার্য পরিচালনা করবে তা এখনও বলা কঠিন। -রাষ্ট্রপতির আদেশের উপর আলোচনার

কভাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রী জওহরলাল বিরোধী দল সমূহের সহযোগিতা কামনা করেছেন। কম্যুনিষ্ট দলের লোক-সত্তাব নেতা বাগদে বিবৃতি দিয়ে তার উত্তর দিয়েছেন। বিবৃতিতে বলেছেন কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে কোন ভাবেই সহযোগিতা করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। কাজেই পশ্চিমবঙ্গের অবস্থানে যে কোনও কল হয়েছে বা হবে এমন আশা করা বুঝা। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা উচিত যে কম্যুনিষ্ট দল গণতান্ত্রিক সংবিধানের পক্ষে সম্পূর্ণ অঙ্গপ্রাণী। কারণ তাদের ব্যবস্থার একমাত্র কম্যুনিষ্ট দল ভিন্ন অন্য কোন দলের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব নয়। এবং অপর কোন দল নির্বাচন প্রার্থীও হতে পারে না। কাজেই গণতান্ত্রিক সংবিধানের পার্লামেন্টে তাদের সহযোগিতার আশা নিতান্তই দুর্ভাগ্য।

ভারত পাকিস্তানের মধ্যে পানশাট প্রবর্তন

ভারত ও পাকিস্তান দুটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন রাষ্ট্র। সেই হিসাবে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে যাত্রী চলাচলের জন্য পানশাট বা ছাড়পত্রের প্রচলন ঘোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের ভৌগোলিক, প্রাকৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিস্থিতি এমন যে উভয়কে একেবারে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে কল্পনা করা কঠিন। একটা অস্বাভাবিক অবস্থার ভিতর দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, ভারতের সঙ্গে জৈবিক যোগাযোগ প্রায় নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পারস্পরিক ভৌগোলিক সম্পর্ক একেবারে অসীতার কথা সম্ভব নয়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে আছে একটা অনিষ্ট যোগাযোগের সম্পর্ক আছে। এই যোগাযোগ অভ্যন্তরীণ মন্দির—অর্থাৎ সংক্রান্ত পূর্ব বাংলার অর্থনীতি পশ্চিম বাংলার উপর বহুল পরিমাণে নির্ভর করে; তেমনি পশ্চিম বাংলার অর্থনীতিও বহুল পরিমাণে পূর্ব বাংলার উপর নির্ভর করে। উত্তর বাংলার সীমারেখা এখনও অনিদিষ্ট এবং সন্দেহে অতিতম। অধিকাংশ ভুলেই কোন

প্রাকৃতিক গীমারেখা নেই; হরত একটা রাস্তা বা একটা ছোট ঝাল কি ছোট নদী উত্তর বাংলাকে বিভিন্ন করছে।

এমনি অবস্থার উত্তর বাংলার মধ্যে ছাড়পত্র প্রবর্তন করা খুবই কঠিন এবং উত্তর বাংলার পক্ষেই হানিকর। গড়ে প্রায় দশ বাতো হাজার লোক প্রতিদিন উত্তর বাংলার মধ্যে রেলপথে যাতায়াত করে। তা ছাড়া ইটাপথে এপার থেকে ওপারে গিয়ে বেচাকেনা করে আয়োজক সহস্র লোক। যে ভাবে বাংলা বিভক্ত করা হয়েছে, তাতে নীমাত্ম অঞ্চলের প্রায় প্রত্যেক গ্রহণেরই বাড়ী ঘর বা আয়গা জমির কতক এ বাংলার কতক ও বাংলার পড়েছে। এক বাংলার হরত তাদের বাসভিত্তি, অপর বাংলার চাবের জমি বা ফলের বাগান—এমন ঘটনা খুব বিরল নয়। এই সব লোকদের অহরহই এপার ওপার যাতায়াত করতে হয়। তাছাড়া পূর্ব বাংলার কয়েক লক্ষ হিন্দু ও মুসলমান অধিবাসী কলিকাতা ও পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন স্থানে জীবিকা অর্জন করে। কলিকাতার আশপাশের কারখানাগুলিতে এবং বঙ্গের যাতায়াতকারী আফ্রান্সহুই পূর্ব বাংলার কয়েক লক্ষ মুসলমান বাস করে। ভারত সরকার এ পর্যন্ত এদের ঠিক বিদেশী হিসাবে দেখত না। কিন্তু পালপোর্ট বা ছাড়পত্র প্রবর্তিত হলে এই সব শ্রেণীর লোকদের জীবিকা অর্জনই কঠিন হয়ে উঠবে।

এসব সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে পালপোর্ট প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে ভারত সরকারের সঙ্গে কোন প্রকার আলোচনা তারা করে নি। তারা কেবল ভারত সরকারকে তাদের এই সিদ্ধান্তের কথা সরাসরি জানিয়ে দিয়েছে। ভারত সরকার এই প্রত্যাবে তাদের আপত্তি জ্ঞাপন করেছে। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে দুই প্রধান মন্ত্রীর স্বাক্ষরিত দিল্লী চুক্তির সঙ্গে এই ছাড়পত্র প্রবর্তনের কোনই সামঞ্জস্য নেই, এবং ছাড়পত্র প্রবর্তন করা হলে দিল্লী চুক্তি নাকচ করা হবে—ভারত সরকারের

এই অভিমতও পাকিস্তান সরকারকে জানানো হয়েছে। কিন্তু তা সম্বন্ধে পাকিস্তান সরকার তাদের এই সংকল্প ত্যাগ করতে রাজী হয় নি।

এই অবস্থার ভারত সরকারকেও নেনে নিতেই হয়েছে যে ছাড়পত্র প্রবর্তিত হবে। এমনি গুটিনাটি নিয়ম কাছন ঠিক করবার অল্প করাতীতে উত্তর সরকারের প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক বৈঠক হয়েছে। সেখানে উত্তর সরকারের মধ্যে মতের ঐক্য হয় নি। পোনা বার পাকিস্তান সরকার প্রস্তাব করেছিল যে উত্তর রাষ্ট্রের সীমান্ত অঞ্চলের লোকজন সহজে এপার ওপার যাতায়াত করতে পারে এমন কোন ছাড়পত্রের ব্যবস্থা সীমান্ত অঞ্চলের লোকদের অল্প করতে হবে। ভারত সরকার এতে সন্মত হয়ে প্রস্তাব করে যে ব্যবস্থা বাণিজ্য বা জমি জমার অল্প যাতায়াতও তেমন সহজ ছাড়পত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার তাতে রাজী হয় নি। করাতী বৈঠক হরত প্রধানতঃ এই কারণেই বার্থ হয়েছে। তবিশ্রুতে উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে আবার কোন আলোচনা হবে কি না সে সম্বন্ধে কোন ধরন এখনও নেই।

ছাড়পত্র প্রবর্তন করার চেষ্টার পিছনে পাকিস্তান সরকারের মনে হরত একটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে। বাংলা ভাষা নিয়ে আলোচনায় বাঙালী মুসলমানদের মনের যে ভাব ঘুটে উঠেছে তাতে পাকিস্তান সরকারের নজির হরণের কারণ আছে। কিন্তু এইভাবে চীনের প্রাচীর তুলে বাঙালী মুসলমানদের শক্ত করে রাখতে পারবে এটা হরত দুরাশা। উনবিংশ শতাব্দীতে রেটারনিক এমনি ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিপ্লবের গতিকে বোধ করতে পারেন নি। পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মনে বাংলা ভাষার প্রতি যে স্বাভাবিক প্রীতি আছে, বা তাদের মনে যে সব স্বাভাবিক রাজনৈতিক আশা আকাঙ্ক্ষা আছে, তাকে এমনিভাবে প্রতিরোধ করতে বাওয়া নিতান্তই ভুল। অনন্বর্ক সাধারণ লোকের জীবন যাত্রার বাধা সৃষ্টি করে পাকিস্তান সরকার পূর্ব

বাংলার মুসলমানদের মনে হরত অনন্তোদয়ই বাড়িয়ে তুলবে।

মুসল রাষ্ট্রপতি নির্বাচন

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বিপুল ভোটাধিক্যে আবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তাঁর নির্বাচন সম্বন্ধে কারো মনে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু তবু কনসিটিউশনের নেতৃশ্রেণী প্রায় ষোলোটি সাতকে ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল। পক্ষি পরীক্ষা নিশ্চয় এ প্রতিদ্বন্দ্বিতার উদ্দেশ্য ছিল না। কারণ পরীক্ষার কলাফল এখন একরকম জানাই ছিল। প্রঃ সাহা বেশের বহু লোকের প্রভাভাজন। তাঁর পাণ্ডিত্য এবং সততার কথাও সুবিদিত। এই নিম্নলিখিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার না অবতীর্ণ হলেই সম্ভবতঃ তাঁর পক্ষে শোভন হতো।

ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার আমরা তাঁকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আর একটা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। রাষ্ট্রপতির শপথ গ্রহণের দিনে যে বিপুল আড়ম্বর ও সমারোহ করা হয়েছে, এটা প্রাচীন যুগের ঐতিহ্য—যে যুগে শুধু জাঁক জনকে জনসাধারণের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করা হতো। ইংরাজ এ ঐতিহ্য বর্জন করে নি শুধু তাই নয়, বরং একে আরো পক্ষিশালী করার চেষ্টা করেছিল। কারণ জনচিত্ত জয় করার অস্ত্র কোন লম্বা ভাষেই ছিল না। কিন্তু কর্তৃমান রাষ্ট্রপতি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। জনচিত্তে লম্বার আসন লাভ করার অস্ত্র তাঁর কোন আড়ম্বরের আশ্রয় নিতে যাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া ব্যক্তিগত ভাবে রাজেন্দ্রবাবু গান্ধীজীর প্রধান শিষ্যের অস্ত্রভয়। লম্বা জাঁক জনকের মোহজাল ছিন্ন করে তিনি এদেশের সরকারকে এস দেশের আদর্শ অমূল্যবায়ী অনাড়ম্বর মর্যাদার প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করবেন এটা আমরা আশা করি।

তার ঠাকোড় ক্রিপলার বেহেত্যাগ—

তার ঠাকোড় ক্রীপস্ বিলাতের একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি। দেহাধী, সজ্জন এবং ভারতবন্ধু বলে খ্যাতি তাঁর অনেক কাল যাবতই ছিল। ভারতের গত ১০১১ বছরের ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ। ১৯৪১ সালে শাপন সংস্কারের এক প্রস্তাব নিয়ে তিনি এখানে আসেন। বিলাত থেকে রওনা হবার মুখে যে উক্তি ও ঘোষণা তিনি করেছিলেন পরে আস্তে আস্তে তাঁর বহু পরিবর্তন সাধন তিনি করেন, এবং এখান থেকে প্রত্যাবর্তনের মুখে ভারত ও ভারতীয় নেতাদের বিক্ষেপে কটুক্তি করে যান। আমাদের তখন সম্বন্ধ ছিল এবং আশঙ্ক্য তা আছে, যে আশা ও আদর্শ নিয়ে তিনি রওনা হয়েছিলেন, পরে চাটিল গভর্ণমেন্টের চাপে তা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি এবং ষাট রূটিশের মতো নীতির চেয়ে দেশপ্রীতি তাঁর কাছে প্রবল হয়েছিল। তাই ব্যর্থতার সমস্ত দোষ ভারতের উপরে চাপিয়ে যান। এর পরে '৪৫ সালে তিনি আবার ভারতের শাপন সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে ভারত সচিব পেরিক শরৎ ও দেশরক্ষা সচিব আলেকজান্ডারের সঙ্গে ক্যাবিনেট মিশ্যন (Cabinet Mission) নামে খ্যাত কার্ণে আবার এখানে আসেন।

এবারও প্রথম ঘোষণায় যে আদর্শের কথা বলেছিলেন কয়েক মাস পরে বিলাতের প্রমিষ্ট মন্ত্রী মতলীর একজন বিশেষ পাণ্ডা হিসাবে তা তিনি রক্ষা করতে পারেন নি। প্রথমকার ঘোষণায় ছিল কোন রকমেরই পাকিস্তান প্রস্তাব তাঁরা গ্রহণ করেন নি। কিন্তু ভারতের দুই দিকে দুটি পাকিস্তান সৃষ্টি করার দাবিও শেষ পর্যন্ত তিনি এড়াতে পারেন নি।

আজ তাঁর মৃত্যুর পর এমন কথার উল্লেখ করা হরতঃ শোভন নয়। কিন্তু এটা হ'ল গুটিশ চরিত্রের মূল কথা। সমস্ত ভালো ভালো কথা বলেও দেশ ও জাতির জন্ত রূটিশ জাতি সব কিছু বিসর্জন দিতে পারে। ক্রিপস্

তারই নিদর্শন। তিনি ছিলেন পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও বিশেষ আগ্রহ ছিল। এ সম্বন্ধে তিনি বহু পুস্তকও বিচক্ষণ ব্যক্তি। সন্ধান ও সং বসে যে তাঁর যে ব্যক্তি লিখেছেন। যাত্রা ৬০ বছর বয়সে তিনি পরলোক গমন ছিল, তাঁও আমরা শ্রীকার করি। উদার মনোভাবও করেছেন; এক হিসাবে এটা অকাল মৃত্যু। তাঁর মৃত্যুতে সংগ্রহ হানব সমাজ একজন হুদা, পণ্ডিত ও ভাণ্ড আনন্দের অধীকার করি না; বরং তাঁর আনন্দের মেনেই উদার মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি চাষিয়েছে। তাই তাঁর নিষ্কি সমাজতন্ত্রবাদের প্রচারের জন্য তাঁর একটা দৃষ্টির প্রতি আমরা আমাদের প্রভা জ্ঞাপন করছি।

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ঃ— হেড অফিস :—

৪ নং ক্লাইভস্ট্রাট স্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীমদ্বতী গ্লেন লিমিটেড, ৩২নং আপার সাকুলার রোড হইতে শ্রীঅবদান চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'বঙ্গিয়া' কার্যালয় ৩২নং আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

— ইন্দিরা —



পঞ্চদশ বর্ষ

আষাঢ়—১৩৫১

তৃতীয় সংখ্যা

ব্যক্তি ও বিপ্লব

শ্রীহেমন্তকুমার তরককার :

মাহুকের সমাজ, তথা প্রাণীজগত, বিশ্বপ্রকৃতির একটা অংশ। সুতরাং ব্যক্তি মাহুকের বিশ্বপ্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। কিন্তু মাহুকের শক্তির ও তার প্রয়োগ নৈপুণ্যের এমন কতকগুলি দিক আছে যা বেখে তাকে প্রকৃতির অকিঞ্চিৎকর অংশ মাত্র মনে হয় না; তাকে, প্রভু না হলেও, অন্ততঃ প্রকৃতির একটি সমকক্ষ শক্তি বলে মনে হয়। এর কারণ তার মন। মনশক্তির বিকাশ মাহুকে বহুল পরিমাণে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র করেছে, তাকে স্রষ্টার আগনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। মন—বিচিত্র পাণ্ডুরী-সম্বিশিত স্লেষের মত—বুদ্ধি, করণা, বিচার, ইচ্ছা, বুদ্ধি প্রকৃতির সহস্রের গড়া জটিল সদাৰ্থ; কিন্তু তার স্বর্ঘ হচ্ছে নিরন্তর স্বপ্নন করে চলা—নিজেকে এবং পারিপার্শ্বিককে। প্রকৃতি চলছে অন্ধ নিয়মের অংশে, একাংশের পৌনঃপুনিকতার ইশা পাবে। প্রাণী-জগতও তাই। বিশ্ব জগৎ নিশ্চল রয়েছে তা নয়। আকস্মিক বিশাল বিপর্যয়ে একদিনের মহাদেশ পরদিন মহাসাগরে রূপান্তরিত হচ্ছে নতুন গ্রহ নক্ষত্র, নতুন সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হচ্ছে, এক প্রাণী থেকে অন্তর্যকর প্রাণীর উদ্ভব হচ্ছে। কিন্তু ঘোড়ের ওপর প্রকৃতির আঙ্ক-প্রকাশের একটা অত্যন্ত হাল আছে, দিন, মাস, কত

স্মার, গ্রহ নক্ষত্রের উদ্ভবতন—একই কক্ষপথে অন্তরীণ গভাগতি। প্রাণীজগতেও এই অর্থাৎ গতির সীমা। কোন সৃষ্টির নৈপুণ্য নথেনা প্রকাশিত হয় নি তা নয়। মানুষই পাখী বাসা বেধেছে, মৌমাছি মৌ-তাণ্ডার চেনা করেছে—এর চেনাচাতুৰ্য অনেক দিক থেকে মাহুকের কাছেও বিস্ময়কর। কিয়তকু এ স্বপ্নন নয়। অঙ্ককারে কণবিল্বাতের মত একটুখানি স্বজনী প্রতিভা করে হঠাৎ চমকে উঠে আবার নিভে গেছে; তারপরে বা আছে সে শুষ্ক যুগ যুগান্ত করে সেই চকিত আলোর চেনা পথে অভ্যস্ত সঞ্চার। সচেতন সৃষ্টি জ্বক হোলো সেই দিন থেকে যেদিন প্রাণের সূত্রে মানস কুহুম বিকশিত হোলো, —প্রাণী হোলো দানব। বস্তু-সমীক ও আত্মসমীক—এই দুই পারে ভর করে মননশীল মাহুয় প্রকৃতির সামনে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে অত্যন্ত জীবনের কক্ষ থেকে বেহিরে পড়ার পথ অব্যবহণ জ্বক করলো। সহজ, সরল পথ, সঙ্কলের অবিরম্য পথ আছে। বেলে নি; কিন্তু পথের সঙ্কলন সূত্র করেছে সেই দিন থেকে, এবং সেই দিন থেকে মরু-মরী মাহুকের ইতিহাস। সে ইতিহাসের কিছু বা উজ্জ্বল পেছনে বৃছে গেছে, চিরুদীন ভূগর্ভের অঙ্ককারে চাপা পড়ে গেছে; কিছু আছে। পাণ্ডবা বার নির্জন অরণ্য

চায়ে, গহন পর্বত পুটে, কুব্জসাগরের তীরে তীরে— হৃৎকণ্ঠের মধ্য দিয়ে যদি মানুষের পথ পাড়ার সন্ধাননা
তাইগ্রিস, ইট্রুভিস, সিঙ্ক, গলা, সরস্বতীর বাহুতে— থাকে, কোন দুনিয়ায় কিং, সুনিশ্চিত পূণ্ডার দিকে,
বেখানে সূর্যের, ব্যাবিলন, জৌত, বিশ্ব, হারপা, মস্কো— তা হলে আশঙ্কার অন্তর্ভুক্ত পথকেপের কলে বিপ্লবান্তি
দড়োর কীটজলে অগণিত রাজী-মানুষের, পদচিহ্নের— নাশটে সে বিকে পৃষ্ঠি কানার অভ্যন্তর— এদোহনে আছে।
পদবলী।

এ বাজার কোন নিষিদ্ধ লক্ষ্য আছে কি নেই, এ প্রশ্ন
বার বার এসেছে। এর নির্ভরযোগ্য সমাধান হতে
এখনও হয় নি। আপন আপন সুসীকণ ও অভিজ্ঞতা
অনুসারে কেউ বলেছে লক্ষ্য আছে, কেউ বলেছে নেই।
আছে কি নেই তার চূড়ান্ত জবাব স্বতাবৃত্তই আছে।
কেউ দিতে পারে না। দিতে গেলেই বা তা মানতে কে ?
কিন্তু বলতে হলে **কুক্কী** জবাব, একটা বিশ্বাস প্রয়োজন।
চলার প্রেরণা দুই কারণে আসতে পারে, এক, আনন্দের
প্রেরণা, অর্থাৎ প্রয়োজনের ভাঙ্গিয়ে। একম। আনন্দের
পরিপূর্ণতার চলার অবসান হতে পারে, অথবা অভাবের
নিশ্চেষ্ট বিলুপ্তিতেও চলার অবসান হতে পারে। প্রথম
সম্ভাবনার মধ্যে আদিত্য হয়ে আছেন এমন লোকের
অভাব নেই, বিতীরাটিকেই অনতিবিলম্বে তবিতব্যতা
বলে দুইয় নিরোধছেন এমন লোকের সংখ্যাও কিছু ক-
নর। কিন্তু দ্ব্যম্বর্তী বাবা তাদের কাছে এ দুয়ের
কোনটাই বিশেষ প্রাধান্য বোধ্য নয়। এই দুই
সম্ভাব্যই কোনটাই আত্যাত্তিক সমাধি না তা নিয়ে
বহুট সন্দেহ থাকতে পারে। কিন্তু আত্মতার গোটা
যে অত্যন্ত সমাধি এ বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।
মুস্তফা লক্ষ্য, কোটি বছর পরে কোন ভবিতব্যতা
মাহুকের ভক্ত শবের ঝাঁকে গুণ পেতে রয়েছে, সে মুক্তি
হেতে, আত্মতার পলকপের দিকেই বিশেষ গুটি বোবার
প্রয়োজন আছে। বিশেষ এক ঝিক থেকে যেসে এ
প্রয়োজনটা আরোই স্পষ্টর দেখাবে। নৈসর্গিক
কারণে নিশ্চেষ্ট বিলুপ্ত যদি মাহুকের ভবিতব্যতা হয়,
তা হলে মাহুগ বাই কলক, কিছু এসে যায় না। কিন্তু
যদি তা না হয়, যদি এ চলার একটুকু লক্ষ্য থাকে, সত্য
ও অগোচী একদিনের বা এক সম্ভাব্যতার ঝিক, যুগ

এপ্র হুছে, কি ভাবে চলতে দিলে মানুষের কখনো-
শক্তি অস্বাভাবিক থাকবে? দুই তথ্যভূতের কোন পাঠ
হুইবি যখন (নই) মানুষের চোখের সমুদ্রে, তখন কি করে
জানি বাবে আজ কি ভাবে চলতে শুরু করলে আগামী
কাল কোবার পৌঁছানো বাবে?—এ প্রের জটিল সমস্যা
নই। আত্মবলিক আরো অনেক প্রেরের মত এও
চূড়ান্ত উত্তর দরত দর না। কিন্তু কার্বকী উত্তর একটা
চাই, নইলে চলিই সম্ভব নয়. এবং সে উত্তর লক্ষ্যন করতে
হবে ইতিহাসের কাছে।

মাহুয তার আপদ ভাগ্যের স্রষ্টা, একথা কতখানি
সত্য ?—নিশেপ একদিক থেকে যেখানে মনে হবে কণাটি
আগাগোড়াই কারজনিক। মাহুয জড় প্রকৃতির অংশ,
এবং এই প্রকৃতির অঙ্গ বাস্তবিক নিরবের অধীন। দেহের
দিক থেকে মাহুয যে জড় প্রকৃতির সঙ্গে লাড়ীর যোগে
থাকা এক শাখা চোখে দেখতে পাওয়া যায়। চন্দ্র সূর্যের
প্রভাবে সেহে জীবনী শক্তির কোয়ার ত্যাগী হচ্ছে।
‘প্রকৃতির অঙ্গ পর্বাতের তলে দেহের স্থান নিরূপিত হচ্ছে।
জগৎকণে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান তার সমস্ত জীবনের
গতিপথ বেঁধে দিচ্ছে। ল্যাংল্যাণ্ডের তুফান দ্রুতবেগে এক
মনোভুক্তি গড়ে ‘ওয়ে’, তাগীরবি তীরের উচ্চ আত্ম’

আবহাওয়ার অল্প মনোবৃত্তি গঠিত হয়—মাহুকের জীবনে
 প্রকৃতির প্রত্যয় শুধু এই টুকুতেই সীমাবদ্ধ নয়, একই
 পরিবারের ছন্দে মাহুকের জীবন অল্প লম্বের ছন্দেই
 ব্যবধানে সম্পূর্ণ তির্যুত্বী গতি অবলম্বন করছে কোটি
 কোটি আলোক বর্ষের আকাশচাষী নক্ষত্রের সংস্থান
 অহুসারে। ব্যক্তির মত গোষ্ঠিও প্রকৃতির সঙ্গে এমনি
 লৌহনিগড়ে বাঁধা। কলবাহুর প্রত্যয়ে, কলসংক্রমণের
 নিয়মাহুসারে ঘেঁষে গঠিত হয় এ বস্তুপাণি সত্য, সমগ্র
 পাদিপাণিকের প্রত্যয়ে মাহুকের সমাজ, সামাজিক মন,
 রীতিনীতি সভ্যতা, সংষ্টি গঠিত হয়, এও তেমনি
 সত্য। মাহুকে বাঁচতে হলে খেতে হয়, খেতে হলে
 খাড়া উৎপন্ন করতে হয়, উৎপাদন করতে হলে তার অল্প
 খুঁজতে হয়, খাটতে হয়, নানা মাহুকের সঙ্গে নানাভাবে
 সহযোগিতা করতে হয়। এই খুঁজবার, খাটবার,
 সহযোগিতা করার পদ্ধতি ও প্রয়োজন অহুসারে
 মাহুকের সমাজ ব্যবস্থা রচিত হয়, সামাজিক সম্পর্ক
 গড়ে ওঠে। আদিম যুগে মাহুকের সম্ভবতঃ গাছের ফল
 খেতে জীবন ধারণ করত। এই ফলের সম্ভাবিত
 ভাগীদার ব্যাধা তাদের সকলকেই সে শক্ত মনে করত।
 ঐচ্ছিকভাবে নিজেদের যৌন সহচরী এবং সম্ভাবন সন্ততি
 ছাড়া আর কোন বৃহত্তর সমাজ তার থাকতে পারে না,
 যেমন আফ্রিকার অঙ্গলে গরিলাদের। ক্রমে কলাহারী
 মাহুকের শিকারীর পর্দায় উদ্ভীত হোলো। অস্ত্রের সহ-
 যোগিতার প্রয়োজন তখন সে বুঝতে শিখলো। একটা
 স্যামথ বা গণ্ডার মারতে হলে অনেককি মিলে আক্রমণ
 করতে হয়, নইলে বাজ ক পায়ত্তা বাবেই না, প্রাণও
 খেতে পারে। আরো কতকাল পরে এককালে পণ্ড
 হননের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ড পালনের উপযোগিতা বুঝতে
 পারলো, পালিত পণ্ড রক্ষার অল্প নিষেধ লোকের
 সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন হোলো। রীতিমত গোষ্ঠিবদ্ধ
 জীবনের সম্ভবতঃ এই শুরু, এবং সম্প্রতি সক্ষমাবলম্বনের
 প্রেরণাই গোষ্ঠি সংগঠনের বনিয়াদ। আরো পরে
 মাহুকের চাষ করতে শিখলো; তখন আর হোলো দৃষ্টবত

সমাজ রচনা। চাষের-অল্প এক প্ররমায় স্বাধীনভাবে
 বসতি করতে হয়, চাষের কাজে অনেক লোক লাগে,
 নানারকম ভিণিব লাগে, ফল পাছায়া দেবারও বিশেষ
 ব্যবস্থা করতে হয়, কেত বাহার রক্ষার অল্প বাঁধে মাঝে
 লাড়াইও করতে হয়, খাওয়ার প্রাচুর্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
 লোক সংখ্যা বেড়ে চললো, কাজের বৈচিত্র্য বাড়লো,
 কর্মীদের শ্রেণী বিভাগ হতে থাকলো। সমাজের ক্রম-
 বর্ধমান অট্টলতার মধ্য দিয়ে মাহুকে মাহুকে বিভিন্ন
 সামাজিক সম্পর্ক স্থাপিত হোলো। ভারতবর্ষ, চীন
 প্রকৃতি কৃষি প্রদান দেশে এই সমাজ ব্যবস্থা অল্প বিস্তার
 আশো চাচ্ছিল। এর পরবর্তী যুগ হচ্ছে যন্ত্র দিয়ে
 যন্ত্র। যন্ত্র দিয়ে প্রসাধনের সঙ্গে পূর্বসূরন যুগের সমাজ
 ব্যবস্থা ভেঙে যাচ্ছে, নতুন ধরনের সামাজিক সম্পর্ক
 গড়ে উঠেছে। মনোরণ রূপান্তর হচ্ছে, চাষের মাটির
 প্রতি চাষীর যে মাহা, কারখানার শ্রমিকের মাহা থাকতে
 পারে না। এই মাটিকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে
 উঠেছে, যে আচার ব্যবহার, যে সংস্কার, নীতিজ্ঞান,
 ধর্মবিশ্বাস, জ্ঞা বিমিরের ভিত্তির ওপর রচিত হয়েছে
 যে শ্রেণী বিভাগ, মাহুকে মাহুকে যে ব্যবহারিক সম্পর্ক,
 সামাজিক ও রাষ্ট্রিক যে আইন-কানুন, রূহৎ যন্ত্রণার
 আওতার তথা বাণিজ্যজীবী যুগের ব্রূতান্তিক দীর্ঘতায়
 তার প্রায় সব কিছুই বহল পরিবর্তন পরিবর্তিত হতে
 বাধ্য। কৃষি যুগের মত, প্রুগেরও নিজস্ব সংস্কৃতি আছে,
 এর আছে স্বতন্ত্র সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি,
 স্বতন্ত্র নীতিবোধ ও জীবন দর্শন। এবং এ সবেরই
 বনিয়াদ হচ্ছে রূহৎ নিয়ম ও বাণিজ্য। এককালে কলাহারী
 মাহুকের জীবিকা হুনিশিত রাখবার অল্প সম্ভবত
 যুগের লোককেও শক্ত মনে করত, 'আজ যন্ত্রণারী মাহুকে
 নিষেধ জীবিকা হুনিশিত রাখবার অল্প সম্ভবত
 রাইল যুগের লোককেও মিত্র বলে ধরে রাখতে ব্যাহুল
 হয়েছে, স্মৃতিতঃ বগরা উচিত এটা অনেক উপলব্ধি
 করেছে। কারণ আজ প্রায় সব লোকের জীবনের সঙ্গে
 জ্ঞান আ কোন পার্থক্য এখানে বাঁধা। অর্থাৎ, সে

হুগের শক্ততা এবং এ হুগের নিষ্ঠা—এ সবইই কেন্দ্রস্থলীশক্তির প্রকাশের ক্ষেত্র-কোণেই ইতিহাসের হৃদয় বিদ্যমান। কল্পিত হওয়া বাবে, কল্পিত হওয়া বাবে। এটা মানব নয়, মানবীয়।

সুতরাং বহুতর দেখা যাচ্ছে তির তির হুগে মানুষ নতুন নতুন বস্তু ও ব্যবস্থা সৃষ্টি করেছে, তবুও মানুষকে সত্যসিদ্ধি প্রদায়ী আসন দেওয়া চলে না। কারণ, সৃষ্টি তার বস্তু স্বাক্ষর হোক, বিশাল হোক, বৈচিত্র্যময় হোক, এ স্বাক্ষর, স্বাক্ষরিত সৃষ্টি হয় না; এ হচ্ছে পারিপার্শ্বিকের চাপে বাধ্যতামূলক সৃষ্টি। আসলে মানুষ প্রকৃতির হাতের ব্যস্তিত ক্রীড়নক মাত্র। পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাকে যে পথ দেখাবে, সেই পথেই সে চলবে। সুতরাং তার একটা স্বাক্ষরী শক্তির কোন প্রদর্শনও নেই না।

তা ছাড়া, যদি স্বাক্ষর করার ব্যস্তিই ইতিহাসে প্রকার ক্রমিক মানুষের আংশিকভাবে আছে, কথাটা ব্যক্তি মানুষের সম্পর্কে কোনমতেই প্রযোজ্য হতে পারে না। ক্রমিকতা হচ্ছে সমষ্টি-ক্রমিক। হুগের পর হুগ সমাজে যে বিবর্তনের তরঙ্গ চলেছে, সেটা সমষ্টি-ক্রমিক ব্যাপার; ব্যক্তি হচ্ছে এখানে গৌণ, অকিঞ্চিৎকর, বৃহৎ সমাজ বস্তুর একটি ভূমিকা মাত্র। গণিতের ভাষায় বলতে গেলে, এক কোটি লোকের জনতাকে এক কোটি দিয়ে ভাগ দিলে বাতাকল্য তাই হচ্ছে ব্যক্তি।

ব্যক্তি হচ্ছে বিশাল জনসমূহের একটি বিমুখ। এ বিমুখ সৃষ্টি হচ্ছে কিন্তু নির্ভর বিমুখস্বাবে তার সৃষ্টিয়ের কোন সার্বজনীন নেই; তারপরে মধ্যে নিজেই মিলিয়ে দিয়ে বস্তু বাস্তবতাই তার সার্বজনীন। প্রকৃতির ওপরে কারিগরি করার, অর্থাৎ স্বাক্ষরীশক্তি ব্যবহার করার, যেই স্বাক্ষরীশক্তি মানুষের হাতে আছে সে ক্ষমতা ব্যবহার করবে এই জনতার একমুখ বা একজন প্রতি-নিধি বা নেতা। বিশাল জনসমূহ নিধিচারে শুধু নেতার আদেশে তরঙ্গ কুলে বাবে। নেতার কতখানি তরঙ্গ কুলতে হবে সেটা পারিপার্শ্বিক অবস্থার উপর নির্ভর করে নেতাই ঠিক করে নেবে। এই হচ্ছে মানুষ বিবর্তনের নিয়ম। এর মধ্যে স্বাক্ষরীশক্তি বা

বিশেষ সৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এ সিদ্ধান্ত সমর্থন-যোগ্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, এ ছাড়া অন্য সৃষ্টিকোণও আছে। মানুষকে বস্তু বা বস্তুর আংশিক-বলে কল্পনা করলে মনেতে হয় যে পারিপার্শ্বিকের প্রভাবে মানুষকে অবলম্বন করে নিত্য নতুন বস্তু ও ব্যবস্থার সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু ইতিহাসের দিক চেয়ে বলতে হলে স্বাক্ষর করার হতে হবে প্রাকৃতিক শক্তিকে অবলম্বন করে মানুষ নিত্য নতুন বস্তু ও ব্যবস্থার সৃষ্টি করেছে। হস্তা ও কলার মধ্যে যে পার্থক্য, প্রাণবর্তীশক্তির সঙ্গে বস্তুবর্তী মানবের সেই পার্থক্য। মনঃকণ্ঠ বাস্তবতার ব্যস্তিত পশ্চাদ্গমন নয়, মন একটা সত্তা, তার নিয়ম বৈশিষ্ট্য আছে, শক্তি আছে। মানুষের ইতিহাস এই শক্তির সাক্ষী ও সৃষ্টি। পরিবর্তনের প্রয়োজন হয় পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে, একথা সত্য। কিন্তু প্রত্যেক বস্তুসত্তাভেদেই, পুরাতনকে বর্জন করে নতুনকে আত্মস্থ করার প্রয়োজন বস্তুই উপস্থিত হয়, নতনের অনেকগুলি বৈকল্পিক রূপ মানুষের চোখের সমুখ থাকে। সেই অনেকগুলি বস্তু থেকে বিশেষ একটিকে বেছে নেওয়াটাই আগে থেকে স্থিরীকৃত হয়ে আছে। কালের কলাকল মানুষের হাতে নয়, কিন্তু কালের পথ নির্ধারণের স্বাধীনতা মানুষের অস্বাধিক আছেই। বাস্তব পাণীর একই ধরনে বাবা বাবুর চৌকি করা ছাড়া উপাচার নেই। কিন্তু ১৯০২ সালে রাশিয়া আক্রমণ হিলারের পক্ষে রাজনৈতিক বা সামরিক দিক থেকে ত নয়ই, এমনকি জ্যোতিষ শাস্ত্রের মতেও অপরি-হার্য ছিল না। চিড়িয়াখানার বন্দি গরিলা না খেয়ে যেহেতুগ করে। কথ্যচিত্র কোন চিড়িয়াখানার কৃত্রিম উপায়ে আয়তপরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে তাকে বাইরে বাচিয়ে রাখাও যায়। কিন্তু এই নয় বা বাচার কে-কোনটাই সংস্কারপন্থ ব্যাপার। কোন গরিলা বন্দি হয়ে মানুষের শাসন ব্যবস্থাই তেতেতুরে দিয়ে শুধু আর একটা প্রতিষ্ঠার পদ দেখেছে এমন এমন পাত্তা বা

নি। সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে বসে। এমন সুস্থ দেখতে পেরেছিলেন মাছুষ সেদিন। নির্বাসনের স্বাধীনতাই প্রথম সাময়িক জীবন থেকে সাময়িক জীবনের পার্থক্য স্থগিত করে। এবং সেই শক্তির ফলে এই পার্থক্য ঘটেছে—অর্থাৎ মনঃশক্তি, বস্তু-সমীক্ষণ ও আত্মসমীক্ষণের শক্তি—সেই হচ্ছে মানুষের সত্যতার, তার সব সৃষ্টির, বিনিয়োগ। নির্বাসনের অথবা প্রয়োজন যে হচ্ছে প্রধানতঃ আত্মশক্তি কারণ—ইনসপিরে পরিবর্তনে বা বিভিন্ন ব্যক্তি অথবা সমাজের সংঘাতের ফলে সৃষ্টিত চাপে—তাকে এই স্বাধীনতার স্বাধীন বা দারিদ্র্য কোন অংশে ক্ষুর হচ্ছে না।

এই নির্বাসনের স্বাধীনতার কথা দিয়ে মানুষের সমাজ এগিয়ে চলেছে। মানুষ তেওঁকে, গড়েছে, নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টির কাজে সাচল্য সব সময় হ্রস্ত আসে নি। বস্তুতঃ আত্ম পর্যন্ত কোন কালেই মানুষ তার প্রাথমিক প্রেরণা বা পরিকল্পনা অগ্রহণ্য সাক্ষ্য অর্জন করতে পারে নি। কিন্তু তার পরিকল্পনা প্রায়শ, তার সংগ্রাম, আংশিক সাক্ষ্য এবং বড় বড় ব্যর্থতা—এই সব কিছুই নয়া দিয়েই একদিকে যেন সমাজের রূপ বরলেছে, আর একদিকে এই পরিবর্তনের সমান্তরালভাবে এক অপূর্ব ঘটনার উদ্ভব হয়েছে—সে হচ্ছে 'ব্যক্তি', অর্থাৎ ব্যক্তিত্বশালী প্রাণী। যে কোন বাহুই শাখা মত যে কোন বাহুই শাখার মত। একটি বাহুই শাখা বৃহৎ বাহুই সমুদ্রের একটি বিন্দু। কিন্তু কোন চুজান মানুষ এক নয়। একজন মানুষ বৃহৎ জন-সমুদ্রের একটি বিন্দু মাত্র নয়। এমনি প্রত্যেকটি মানব বিন্দু এক একটি ব্যক্তি। প্রকৃতির বিশাল পরীক্ষা-শালায় ব্যক্তির অন্তরায় সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। পরবর্তী অংক বা কিছু ঘটনা সবই প্রধানতঃ এই মূল প্রবণনের শাখা-প্রাণা বা মাত্র। সমস্তির সঙ্গে পারিপার্শ্বিকের মাত প্রতিক্রিয়াতে মানুষ তাখা পেয়েছে, কাজের কৌশল, কাজের দক্ষতা লাভ করেছে, সমগ্র জীবন ও তার পারিপার্শ্বিকের নিত্য নানা পরিবর্তন করতে করতে

চলেছে—এটা ব্যক্তিগত ঘটনা। যোগ্যবর্তী যে শক্তি এই বিপুল সৃষ্টি সম্বন্ধ করে তুলেছে সেটা হচ্ছে ব্যক্তি। বস্তুসমীক্ষা ও আত্মসমীক্ষা এই 'ব্যক্তি'র আত্ম-বিকাশের উপাদান। বৃহৎ, স্ট্রোটা, নিউটন, আইনস্টাইন, বোল্টন, গাভী বদি নিছক জনসমুদ্রের নাম পরিচয়হীন এবং একটি বিন্দু হতেই মাত্র, তবে মানুষের ইতিহাস বলে কিছু গড়ে উঠতো না।

এই আত্ম-বিকাশের ফলে কোন প্রাক্তন অস্তিত্বের বা অবচেতন ইচ্ছাশক্তির খেলা আছে কি না সেটা জটিল তর্কের বিষয়। সে তর্ক এ প্রশ্নে অপ্রয়োজনীয়। এই আত্ম-বিকাশের প্রচেষ্টা যে ইতিহাস রচনা করেছে তার বহুক্ষেপে এই প্রেরণার প্রকৃতি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে, সেটা হচ্ছে ব্যক্তির আত্মজ্ঞা, ভাবমন্ত্রণ, পরিপূর্ণতার আত্মজ্ঞা ছাড়া একই। মানুষের সমাজে কতকগুলি পরিবর্তন ঘটেছে এত বিশাল এবং এত বিপুল সংখ্যক জনতা সে পরিবর্তনের সংঘটনের ক্রমে অংশ গ্রহণ করেছে বা সেই পরিবর্তনের ফলে জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে পরিবর্তিত হয়েছে, যে সেদিকে মনঃসংযোগ করলে ব্যক্তির ভূমিকা সহজেই স্পষ্টের নেপথ্যে চলে যায়। কিন্তু সেটা হচ্ছে যায় না। পারিপার্শ্বিককে বোঝবার প্রাকৃতিক শক্তিকে কাজে ব্যবহার করার প্রেরণা প্রধানতঃ এলোহে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা স্থানান্তরিত করার জন্য, এটা খুব সম্ভব। কিন্তু এ প্রেরণা যদি নিছক গ্রাসাচ্ছাদনে সম্প্রতি উদ্ভব হারাই সীমিত হতো, তবে সত্যতার এই বিপুল লৌহ গড়ে উঠতো না, অথবা নিরন্তর এত পরিবর্তনও হতো না। বরং গ্রাসাচ্ছাদন সমাজের সমাবান যোগে সমাজের গতি বন্ধ হতো বা গতিবেগ হ্রাস হতো। ইতিহাসে কোথা যায় নিপরিণতটাই ঘটেছে। ব্যক্তির জীবনে হোক বা সমগ্র জীবনে হোক—জীবিত্য সংগ্রাম যত কঠোর হয়েছে, জীবনের আত্মপূরণ তত 'জীবিত্য' হয়ে এসেছে। অপরদিকে অত্যন্ত দৃঢ় নির্দীপ্য অসমর্থ জীবন আত্মকরণ আত্মপূরণ হলে জীবিত্য, কেঁপে উঠেছে, বর্ধার নদীর মত প্রাণশব্দ

অবশ্যে বিজ্ঞপ্তি করে চলেছে। বিশ্বের পিরামিড, গ্রীসের ভাস্কর্য, ভারতের স্মিট সাহিত্য এই ঐতিহাসিক সত্যের নিদর্শন। যে কারণে এটা সম্ভব হয় সেটা হচ্ছে এই যে মানুষ শুধু টিকে থেকে, শুধু অস্তিত্ব বজায় রেখে সম্ভব হতে পারে না। সে তার অস্তিত্বের বর্ষ উপলব্ধি করতেও চায়। এক কথায়, সে চায় জ্ঞান। জ্ঞানের অর্থ আত্মোপলব্ধি—অর্থাৎ শুধু সমাজে নয়, নিরন্তর পরিবর্তনশীল এই সমগ্র বিশ্বে ব্যক্তি-সমগ্র বান, মূল্য ও তাৎপৰ্যের উপলব্ধি তার ধারা নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে পারিশ্রমিকের সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়—যে সামঞ্জস্যের গোমে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ব্যক্তি অতীত করতে পারে যে তার সব সংঘাতের অবশ্যন হয়ছে, সে এখন পূর্ণ-সম্পূর্ণ। ঐতিহাসিক ব্যক্তির মানসিক গঠন বড়ই। কিন্তু ঐতিহাসিকেরই জীবন জ্যোতকে প্রবাহমান রেখেছে এই পরিপূর্ণতার চেতন বা অবচেতনতার আকাঙ্ক্ষা। জীবনের নিত্য অতীত চকলতার মূলে রয়েছে এই আকাঙ্ক্ষা। মানসিক গঠনের পার্থক্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যক্তির চকলতা বিভিন্ন রূপ নিচ্ছে। কতকগুলি চকলতার অব্যবহিত লক্ষ্য আবিষ্কার করা যায়, যেমন কৃষার চকলতা বা যৌন চকলতা। এর এক একটাকে ভিত্তি করে একটা গোটা সমাজ বিজ্ঞান রচনা করাও সম্ভব। যেহেতু এই অতীতের কৃষা বা যৌন কৃষা ব্যক্তি সমগ্রই একাক, সেই কারণে এই সব সমাজ বিজ্ঞানে অনেক আংশিক সত্য থাকবেই। কিন্তু সে সব আংশিক সত্যই, তার কোনটাই ব্যক্তির সমগ্র সমাজ বা ব্যাখ্যা নয়। মানুষকে বাঁচতে হলে খেতে হয়, পরতে হয়, কোন আলসের থাকতে হয়, এটা অভিন্ন সত্য। কিন্তু যে নয়, নিরাহার মর্যাদা দ্বিপ্রহরের তপ্ত রৌদ্রে নিরাবরণ প্রান্তরে কষ্টকর ন্যায় নিশ্চল গুঁড়ে গাঁছে, এই সত্যটা সে জানে না তা নয়। তার এই অবিদ্যাত স্তম্ভ সাধনার মূলে রয়েছে নিছক বেঁচে থাকার অতিরিক্ত কিছু একটা পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। 'পাওয়ার উপায়' নির্বাচনে তার ভুল হয়ে থাকতে পারে। এমন কি প্রাপ্তবয়স্কের

সমাজও তার শোচনীয় ভাবে অশ্লষ্ট হতে পারে। কিন্তু সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। ঐতিহাসিকের লক্ষ্যনীয় বিষয় হচ্ছে এই যে এই স্তম্ভ—সীমন্ত একটা ঘটনা—যে সাধনার লক্ষ্য হচ্ছে এমন একটা কিছু পাওয়া যা গেলে আর কোন আকাঙ্ক্ষার সংঘাত থাকে না। সেই আকাঙ্ক্ষাটা শুধু দৈনিক জীবনের মানসরূপ নয়। শিক্ষার পা' ও চেম্বেরের পৃথিবীগ্রাসী বিজিগীষা, তাইদুর ও ফরাসী বিপ্লবী ম্যারক্সের সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, বুছের ও খুটের বিশ্বাসী ককণা শুধু প্রেমী সংগ্রামের ফল, বা মীরবাই ও সেট খেরসার তাবোখান্দা অববহিত যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ এ সিদ্ধান্ত বীকার করতে হলে পূর্বাঙ্কে যেমন নিতে হবে যে মানুষ নিছক একটা কাম-কৃষাকুর পণ ছাড়া আর কিছুই নয়। এটা যেমন নিলে রাজনীতিকের সাহসিক কিছু সুবিধা হলেও হতে পারে, ঐতিহাসিকের কোনই সুবিধা হবে না। কারণ ঐতিহাসিককে ব্যাখ্যা করতে হবে। অব্যুত জৈলম শাবীর আচার ব্যবহার নেবে তাঁকে উদ্ভাব, বলে উপহাস করা চলে; অবগমনের বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে এ উদ্ভাবনার পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও করা চলে। কিন্তু সে তব্বে জলের গুণের অব্যুতের নিরাশব্দ নিশ্চল বলে থাকবার সজির কোন ব্যাখ্যা নেই। অথচ জল প্রবাহের গুণের এমন নিরাশব্দ বলে থাকটা কোন একজন অব্যুতের কীতি নয় শুধু, এটাকে মানুষের আত্মতরীপ আশ্রয় আর একটা প্রতীক বলেও ধরে নেওয়া যায়। চকল জীবন প্রবাহের গুণের এমন নির্দিষ্ট অবস্থান,— এই সম্ভবতঃ মানুষের আত্মাত্মিক লক্ষ্য; তার বৃত্ত কিছু কাজ সব জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে এই লক্ষ্যে উপনীত হবার চক্র গড়তে।

এদিক থেকে দেখলে মনেতেই হবে যে আজ প্রেমী-সংগ্রামের নিশ্চিতি করে সামাজিক বনবটনের 'বিজ্ঞান সম্রাট' ব্যবস্থা করার কাজ—বদিত এটা অত্যন্ত অপরিহার্য একমাত্র কাজ নয় বা সমগ্র কাজ নয়। বাইরের জীবনে মানুষকে বাধ্যতা দেওয়ার কাজ যেমন জরুরী, অব-

চেতনায় রাজ্যে তার সত্যের শাখত সত্যের সন্ধানও কোন অংশে কম জরুরী নয়, বরং বেশী। এমনকি, প্রথমটির সাক্ষ্যের অপেক্ষায় দ্বিতীয়টিকে মূল্যবান রাখাও চলে না। এবং যেহেতু সে সত্যের উপলব্ধি মাত্র সনোরাঙ্কে পূর্ণ স্বাধীনতা অপরিসংখ্য, ব্যক্তির স্বাধীনতার সত্যোচন, যে কারণে বা বস্তু অল্প সময়ের জন্যই হোক, ক্রম বিবর্তনের মূল নীতির পরিপন্থী, এবং কাজে কাজেই সমাজ বিজ্ঞানের মিক থেকেও প্রতিক্রিয়া-শীল। একনায়কত্ব বা ব্যক্তি স্বাধীনতা সত্যোচনের নীতি শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য, কারণ মানুষের অস্বাভাবিক সত্য-পিশাশ, আত্মোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা এই প্রতিক্রিয়া-শীল নীতির ভিত্তিতে গড়া ইমারত একদিন ভেঙে চূরে দেবেই।

কিন্তু এ আশাবাদ মানব জাতির সম্বন্ধেই গ্রন্থক। ব্যক্তির পক্ষে বা মানব জাতির অংশ বিশেষ সম্বন্ধে সম্ভবতঃ জোর করে এমন কথা বলা যায় না যে, এক নায়কত্ব জোর ভেঙে গেছে। বরং এমন নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত কোন শাসন ব্যবস্থা ব্যক্তিকেই একবারে ভেঙে দিতে পারে। কোন সমাঙ্গে দীর্ঘ দিন ধরে এমন শাসন ব্যবস্থা চালু থাকলে সমগ্র জীবনকে পঙ্কু করে দিতে পারে, ইতিহাসে তার নজির আছে। মানুষ প্রকৃতির পিতৃ, অতঃপ্রকৃতির বস্তু কিছু মূলতা, অতঃঅত্যাচারের দাসত্বের সংস্কার, সবই তার মধ্যে আছে। তার মনের গতি হচ্ছে এই মূলতার এই অতঃসংস্কারের প্রত্যয় অভিক্রম করে শেষ পর্যন্ত প্রকৃতিতে বসীভূত করা—প্রকৃতি অর্থে বসি: প্রকৃতি এবং অন্ত: প্রকৃতি, দুই-ই। কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে এই আধ্যাত্মিক আত্মা এখনও অত্যন্ত কীণ। বহু মানুষই এখনও মূল ভোগের প্রাচুর্যের জীবনেই সম্পূর্ণ সাক্ষ্য রাখা করে, আত্মা বহুতর মানুষ এমনই জীবনেই চরম কাম্য মনে করে। এ জীবনের চেয়ে কাম্যাতর কোন কিছুই আত্মা চাহিতে যদি কোনদিন মনে ভেঙ্গে ওঠে, তাকে সে জোর করে তেলে দহিয়ে দেয়, কারণ সেই কাম্যাতরের প্রতি আকা

এখনও আছে নি। অতঃপ্রকৃতির বস্তু স্বাধীনতা স্বাধীনতার করে করে তবে—এই স্বাধীনতার অত্যন্ত হতে হয়। যে নির্বাচনের স্বাধীনতার কথা শুধুই বলা হয়েছে সে স্বাধীনতা বাস্তব জীবনের কাছাকাছি আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে স্বাধীনতার শিক্ষার অপেক্ষা রাখে। আরও সমাজ ব্যবস্থা হচ্ছে তাই বা এই স্বাধীনতাকে পূর্ণ স্বাধীনতার অতঃপ্রকৃতির পরিবেশ-কল্প করে দেয়। অপর দিকে, সোভিয়েট রাশিয়ার মত যে রাষ্ট্র প্রধানতঃ এমন নীতির দ্বারা পরিচালিত সেখানকার সমাজে ব্যক্তির স্বাধীন বিকাশের পন্থা অসম্ভব হয়েছে, দীর্ঘকাল এই নীতি চলতে থাকলে ক্রমে স্বাধীন সত্যের অতঃপ্রকৃতি ব্যক্তি মন থেকে হুড়ে যাবে। ব্যক্তি মন হবে প্রথম লাগা চাকির মত কঠিন। সোভিয়েট সরকারের নিষেধণ নীতির কলে কত লোক প্রাণ হারালো, কত লোক এখনও জেলে বা নির্বাসনে দিন যাপন করছে—এটাই সব চেয়ে বড় কথা নয়, যদিও চুপে পরিমাণে বিচারের মিক থেকে এর ভয়াবহতা মোটেই উদ্ধৃত করা যায় না। কিন্তু সব চেয়ে মারাত্মক কথা হচ্ছে এই যে এই সরকারের আওতার কাছে আজ পৃথিবীর আর অর্ধেক লোক—এ সরকারের বস্তুমান নীতির যদি কোন পরিবর্তন না হয় তবে এই বিপুল জনসমূহের মধ্যে ব্যক্তি ক্রমশঃ হুড়ে যাবে, হারিয়ে যাবে, নিঃস্বক হয়ে পর্ববসিত হবে। ব্যক্তির মনের সেই বস্তুবাহই সবচেয়ে ভয়ানক।

এক নায়কত্ব নানোপ্রকার হতে পারে। নায়ক একজন হতে পারে, কয়েকজন ব্যক্তির একটি দল হতে পারে, কোন প্রতিষ্ঠান হতে পারে, এমনকি একখানি দল হতে পারে। নায়কের পরিচয় বাই হোক নায়কত্বের রূপ একই—ব্যক্তির বিনাশ। আজ সমাজ-পৃথিবী দুই ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগে আছে এক নায়কত্ব, অন্য ভাগে আছে গণতন্ত্র। অন্য একদল বলা চলে না যে এক নায়কত্বের সবখানিই দুর্বলীকৃত এবং গণতন্ত্রের সবখানিই অত্যন্ত উচ্চ ধরনের

সম্মত। কিন্তু সমস্ত স্বত্বস্বত্বিকার সম্বন্ধে একনায়কতায়
মাহুদের কল্যাণ হবে না, একথা আশ্রয় করে বলার
সময় এসেছে। তার প্রধান কারণ একনায়কতায় ব্যক্তি-
স্বাধীনতার বিরোধিতা, বস্তুতে এক নায়কতায়ের
প্রয়োজনই কিছু ব্যক্তি স্বাধীনতা বর্ষ করার সম্মত। মাহুদ
প্রসঙ্গ মনে যে নীতি মেনে নেবে না সেই নীতি বহন
সম্মত চালাতে চেষ্টা করা হয়, তখনই এক নায়কতায়ের
প্রয়োজন হয়। এই মাহুদ অবস্থার কঠোরতা
ব্যতিক্রম-হৃদয় করে দেওয়ার সম্মত মাহুদকে নানা
বক্তব্যের লোভ দেখানো বা নানা কৌশলে মাহুদের
স্বাভাবিক ভোগ-প্রসঙ্গের প্রেরণ দেওয়া যেতে পারে।
এবং সাধারণতঃ এক নায়কতায় এই প্রেরণ থাকে। এ
প্রেরণের দ্বারা প্রয়োজন আছে তারা বিরোধিতা করে না,
বরং এটা সহজেই মেনে নেয়। এক লাভে ভোগ্যতার
আর এক হাতে উপহার—এই হচ্ছে এক নায়কতায়ের
পরিচয়।

বলশ্বেতিক নীতির সর্বস্বত্বতা দেখাতে চেষ্টা করেন
সমন নীতির কলে বাস্তবায়ন মাহুদের স্বত্বস্বত্বিক কোথাও
ব্যাহত হয় নি। প্রমাণ গত বিশ্বমুখের সমস্তকার তার
বিপুল শক্তি, বিপুল অস্বস্তিকার। আরো প্রমাণ তার
বিজ্ঞ বৈজ্ঞানিক সাক্ষ্য, বিরাট কলকারখানা, সাধারণ
মাহুদের স্বত্বস্বত্বায়ন নিরবচ্ছিন্নতা ও কর্মনিষ্ঠা,
ইত্যাদি। প্রসঙ্গতঃ বলা যায় যে হিটলার ও নাসী-
বাদের সম্বন্ধেই অবিকল এই বক্তব্য শুদ্ধি মিলে পাবেন।
ব্রহ্মসিংহের যুগ জীবনের দৃষ্টান্ত অনেক বললে গেছে,
কাজেই ব্যক্তিগত উৎকর্ষ ও নিম্ন কর্মনিষ্ঠা দ্বারা সভ্যতার
উন্নতি বিচার করার চেষ্টা আধুনিক পুণ্ডিতের বহু লোকের
কাছেই অত্যন্ত সূক্ষ্মরস্কর মনে হয়। কিন্তু এই
স্বত্বস্বত্বিক অস্ত্রশাস্ত্র চাকা পড়ে ব্যক্তিগত আসল কথাটা—
সেটা হচ্ছে এই যে মাহুদ বহু হাবহাব করে বসে
পারে তা হলে পুণ্ডিত বিশ্বমুখের কিছু একটা লে ধোঁসো
নিয়েছে, কিন্তু সে মাহুদ হইল না। ফলে স্বত্ব-
কর্মনিষ্ঠতার প্রতিযোগিতা বা বহু বস্তুর নির্ধারণ—

এর কোনটাই মাহুদের মাহুদ নর। অর্থ বলশ্বেতিক
স্বত্বস্বত্বিক কৈফিয়ত হিলাবে এই মাহুদকে ভুলে ধরা
হাড়া আর কিছু করার নেই। কারণ বিপ্লবের উদ্দেশ্য
ব্যর্থ হয়েছে।

গত আজাই মাহুদ বস্তুর ইতিহাসে চারটি বড়
বড় বৈশ্বিক আন্দোলন এসেছে; বৌদ্ধধর্ম, খ্রীষ্টানধর্ম,
ইসলাম ও কমিউনিজম। প্রথম দুটি বিপ্লবিতা লাভ
করেছিল প্রধানতঃ প্রেমের শক্তিতে, শেষের দুটি বিপ্লবিতা
লাভ করেছে ও করছে প্রধানতঃ শাস্ত্রিক শক্তিতে।
অবশ্য এ উক্তির মধ্যে কিছু অতি-সারল্য বোঝা যায়।
সম্মত। কাজেই বিবরণি আরো একটু পরিষ্কার করা
যরকার।

উপরে যে আলোচনা করা হয়েছে তার সারসর্ম
হচ্ছে: (১) মাহুদের মন স্বত্বস্বত্বিক স্বাধীন; (২) কিন্তু
মনের একটা নিজস্ব স্বত্বনী প্রতিভা আছে; (৩) এই
প্রতিভার ঐতিহাসিক গতি হচ্ছে বস্তুর আধিপত্য
অতিক্রম করার দিকে; (৪) কিন্তু বিবর্তনের বর্তমান
স্থর পর্যন্ত এখনও সমস্ত জীবনে এ গতিবেগ অত্যন্ত কীর্ণ;
(৫) নিশেষে বা প্রয়োজনে এ গতিপথের মোড়
এখনও ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে; (৬) সুতরাং ভাবী
সময় বাবদ এখন হওয়া প্রয়োজন যাতে ব্যক্তিগত
স্বত্ব স্বাধীনভাবে তার সৌরবহর ভবিষ্যৎব্যতির দিকে
অগ্রসর হয়ে চলতে পারে; (৭) আত্ম যারা বিপ্লবের
পরিচয়না রচনা করছেন তাঁদের হাতে মাহুদের সমস্ত
অনাগত ভবিষ্যতের শুধু দায়িত্ব স্তর রয়েছে; (৮)
ইতিহাসের কাছে সন্ধান করা প্রয়োজন এই দায়িত্ব-
বোধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিপ্লবের কি পরিচয়না রচনা
করা যায়।

এটা দেখা গেছে মাহুদের সমস্ত কোন স্বত্বস্বত্বিক
একভাবে মাহুদ মন বসে থাকেন না। এর অবিরত
পরিবর্তন হচ্ছে। একদিকে রয়েছে পরিবর্তনশীল
স্বাধীনতার দিক, আর একদিকে রয়েছে মাহুদের স্বত্বস্বত্বিক-
শক্তি। কঠিন যেমন দুটা পাতে মাহুদ তবো কাটে,

সমাজ বিবর্তনের মূলে রয়েছে মানব মন ও তার পারিপার্শ্বিকের পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া। কীটির যেমন ছুটা পাতের সমান জোর থাকে চাই, কৌশল একটা পাত ধারণ হলে গেলে বা একটার ওপর বেশী জোর পড়লে টিক বসে কাটবে না, সমাজেরও তেমনি স্বত্বার্থ ও মনোবর্ষের ওপর সমান জোর রেখে চলতে চাই, সামাজিক ভারকেন্দ্র এর কোন একটার দিকে বেশী ঝুঁকে পড়লে পথ ঠেঁই হওয়ার সম্ভাবনা আছে, যেমন হয়েছিল পশ্চিম-পূর্ববর্তী ভারতে বা ক্যাম্বলিক শাসিত ইউরোপে। কিন্তু ক্যাঁড়কান্ড বস্তু-গতীকী ও আত্মসমীকী সব ব্যাচার এগিয়ে চলে না, কখনো আধ্যাত্মিক রাজ্যে মানুষ বহু সম্পদ সৃষ্টি করে কেলেঙ্ক, বাস্তব জীবনের পথে সে তখন সিঁড়ির পড়েছে, কখনো বস্তু রাজ্যে জোর পারে এগিয়ে চলতে অসচ্ছন্দ আত্মজ্ঞান সেই পরিমাণে প্রসারিত। সত্য করে নি, ফলে নিজের সৃষ্টিত এত বৈতন্য নিয়ে সে কি করবে বিচর করতে পারছে না—যেমন সম্ভ্রান্ত হয়েচে। স্বত্ব সত্য ব্যক্তির এই অসঙ্গতি ঘটতে শুরু হলেই তার প্রতিক্রিয়ার সমাজে নানা অস্বাভাবিকতা দেখা দেয়, নাগরিকের অগ্রগতি রুদ্ধ হতে থাকে। এই অবস্থা এখন চরমে ওঠে তখন একটা আবুল পরিবর্তনের প্রয়োজন আসে। এই পরিবর্তনই হচ্ছে বিপ্লব।

ইতিহাসে বিপ্লবের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ, প্রত্যেক বিপ্লবোদ্যোগই বিশেষ এক একটি দার্শনিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রত্যেক বিপ্লবই মানবজাতিকে অগ্রবিত্তর প্রত্যাখ্যাত করে। কিন্তু আদ্য পর্বত কোন বিপ্লবেই এমন ঘটনা ঘটতে দেখা যায়—নি যে সে বিপ্লব যে দার্শনিক মতবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত অবিকল সেই মতবাদ অগ্রগতির সমাজ গড়ে উঠেছে। বিপ্লবের মুখে বহু কলরব শোনা যায়, বহু মত, চিন্তা, ভাবের প্রাচীন সমাজের ওপর বয়ে যায়। কিন্তু মানুষের বেঁচে যেমন তোলাবস্তুর আচ্ছাদ্যের দ্বারা পড়ে না, গড়ে তার নিজস্ব পরিণাম। শক্তি অগ্রগতির—তেমনি কোন নীতি সমাজেও কালক্রমে বসে বসে হয়, একটা বিরাট

স্বলবদ্ধ দার্শনিক তত্ত্ব থেকে সমাজ তার মূলী মত মানিক বেঁচে নেয়, বাধ্যবাধীতা পরবর্তী কালের পণ্ডিতদের চিন্তার খোরাক জোগাবার জন্য লাইব্রেরীর পড়ে থাকে।

দ্বিতীয়তঃ, বিপ্লব সংঘটিত হতে পারে নানা রকমে। প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার দ্বারা বাহ্যে লুপ্ত হতে উপকৃত্ত তাদের অসম্মিত বিজ্ঞোহের মধ্য দিয়ে বিপ্লব হতে পারে যেমন রাশিয়াতে হয়েছে। কিন্তু এ ছাড়া আরো বহু রকমে বিপ্লব হতে পারে এবং হয়েছে। একপাটা আশ্চর্য্য করে বিনে ভাল করে বোঝবার প্রয়োজন আছে বিশেষতঃ এই কারণে যে লক্ষ্যবদ্ধ অসম্মিতল প্রব্রের সাহায্যে রাষ্ট্রশক্তি করায়ত্ত করবেই, এটা যেন-যতঃশক্তি সত্য বলে কেমন নেওয়া হয়েচে। সমস্ত বিপ্লব হবে না, তা বলা আবাবের উদ্দেশ্য নয়। বিপ্লবের আরো নানাক্রম আছে এটা বলাই উদ্দেশ্য। যথা—সমস্ত বিজ্ঞোহের আশঙ্কায় শাসকশক্তির নিজের উদ্দেশ্যে সমাজে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হইতে পারে, যেমন গভ মতাকীর জাপানে হয়েছিল। সমস্ত বিজ্ঞোহে বিপ্লবীদল পরাজিত বা ধ্বংস হয়ে গেছে, কিন্তু তারপর শাসকশক্তি নিজের নেতৃত্বে বিপ্লবের মূল তত্ত্বগুলি সমাজে ধীরে ধীরে প্রয়োগ করতে পারে, যেমন ফরাসী বিপ্লবের পরবর্তী জাপানে ঘটেছিল। বহু বিভিন্ন লোকের নানা বিভিন্ন কাজের ফলে সমাজের নানাবিধে পরিবর্তন শুরু এমনভাবে হতে পারে যে শেষ পর্যন্ত এই সব বিভিন্ন কাজের সবথেকে প্রভাবশালী অসম্মিতল মতো সমাজ ব্যবস্থার একটা আবুল পরিবর্তন হয়ে যায়—যে পরিবর্তনের ফলাফল উক্ত সব লোকদের কারোই কোনদিন ছিল না। ইংল্যান্ডে এটা হয়েছে—যাকে বলে নির-বিপ্লব। কোন আত্মশক্তি সম্পন্ন পুরুষের শিকার—যে শিকার বস্তু বা ব্যবস্থা নিরপেক্ষভাবে সর্বসাধারণের ক্ষয়, পর্ব করে আধ্যাত্মিক আত্মস্বা অগ্রসর করে, তার দ্বারা—বিরাট বিপ্লব হতে পারে। যৌদ্ধ ও খৃষ্টান ধর্ম এর উদাহরণ। প্রথমোক্ত পদ্ধতির উদাহরণ—কিউনিজম্! ইসলাম প্রধানতঃ ধর্মবিপ্লব

ইসলাম এখনও অত্যন্ত সজীব; কোটি কোটি লোক আত্মা নৈরীকভাবে কোরাণ অধ্যয়ন করে চলছে বা চলতে চাইছে, কিন্তু বিশ্বের বিপর্যয় এই যে মানুষের ভাব ও চিন্তার অগতে বিগত কয়েক শতাব্দীতে নিরবচ্ছিন্ন মূল্যমান অধ্যাবিত কোন দেশের কোন অবস্থান নেই। হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান ধর্ম মতের বাহুবলকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ইসলাম কীভাবে থেকেও বাহুবলকে বেঁধে রেখেছে। এ ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, যে বিশ্বের সরাসরি বাহুবলের অন্তরে প্রবেশ করে আত্মিকতার উদ্দীপিত করে, তার শক্তি কখনো হারান না। যা শুধু বাহুবলের বাইরের কীমতকে স্পর্শ করে সামাজিক শোভাটাই হোক, আর আর্থিক শোভাটাই হোক, তার প্রভাব হঠাৎ চোখে ধাঁধা লাগিয়ে মিতে পারে, কিন্তু সে তেমনি হঠাৎই নিঃশেষ হয়ে যায়। আর এই ব্যাপার ঘটছে কমিউনিজম সাম্যবাদের আদর্শ যতক্ষণ পর্যন্ত নরম ও ভ্রাতার ওপর প্রতিষ্ঠিত, ততক্ষণ এ আদর্শকে শ্রদ্ধা করছে না এমন লোক সম্ভবতঃ নেই। বহুতঃ বৌদ্ধ যুগে যেমন অগণিত মানুষ বুদ্ধের শূণ্যবাদের অটল দার্শনিকভাবে মুগ্ধ হয় নি, মুগ্ধ হয়েছিল তাঁর প্রেমের আবেশনে, কমিউনিজমের ক্ষেত্রেও তেমনি—বক্তি ইচ্ছুর অস্ত্র ভ্রাতা ও নরম এ বিশ্ববের মূল কথা মনে করাই এর প্রতি আকর্ষণ হচ্ছে, এর কুটকর্ণপূর্ণ নিরীক্ষনবাদের ভালের কোন কাজ নেই। বাহুবলের জগৎস্তির ওপর জোর দিয়ে এ বিশ্ববের ময় প্রচার করা অসম্ভব ছিল না; বরং যন্ত্র সত্যতা নিজের অন্ধ পদক্ষেপে যেভাবে নিজের পথ হারিয়ে ফেলছে, হলিক শ্রেণীর মধ্যেও যে বকম নতুন আত্মসমীকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে ভ্রাতা ও প্রেমকে ভিত্তি

করে চালালে এ আবেশালনে আশঙ্কনপূর্ণ সাদা পাওয়ার খুবই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কুট্রিউনিজমের কাছে বাহুবলের লব্ধ হ্রাসবাহন, যা সে যুগ যুগ ধরে সবচেয়ে পালন করেছে তা হান্তস্পদ হোলো। সামাজিক ভ্রাতের দার্শনিক ভিত্তি হুঁড়তে গিয়ে যেখানে গেল-এর সোড়ায় রয়েছে শুধু শ্রেণীসংগ্রাম—অর্থাৎ নির্বিক্ত বিবেক—দললোক বহন পূর্বকার বুদ্ধবাসী বাহুব ভ্রাতা শ্রাব্য কল্লের সম্ভাবিত ভাগীদার রাজ্যকেই বিবেক নিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করতঃ শুধু তাই। অর্থাৎ জানা গেল, এই দীর্ঘ দশ লক্ষ বছরে মহত্ব কিঞ্চিৎ কষ্টনৈপুণ্য অর্জন করেছে রাজ্য—বাড়ী করেছে, গাড়ী করেছে, আর্থিক বোমা করেছে—কিন্তু মনোভগবতের পথে এক পাও অগ্রসর হয় নি। জানা গেল, যুগ-যুগান্তর ধরে বাহুবের এক প্রেম এত অতীন্দ্রা, আত্মমান, তপস্বী, সবই ব্যর্থ, সবই বৈজ্ঞানিক সত্যের অজ্ঞতা প্রসূত নিছক নিরর্থক চকলতা। সে পৌরবের অতীতকে, সে দীর্ঘ তপস্বীর পথে ব্যর্থ করতে যাদের লজ্জা নেই তাই বাজ নিঃসংশয় নির্ভরতার বলতে পারবে সংখ্য শরণ গচ্ছামি,—অর্থাৎ বলশেভিক 'প্যাটি'র একচ্ছত্র নেতৃত্ব বেনে নিলাম। কিন্তু আগের গজোতি উৎস থেকে মনলোকের ককর-কটক-পথ বেয়ে যে মানব বাড়ী চলছে উচ্ছলন্তর আলোক ভীর্ণের সন্ধান, সে এতাবৎকাল আরো ছুটি কথা বলেছে, বলেছে, বুদ্ধ শরণ গচ্ছামি, বলেছে ধর্ম শরণ গচ্ছামি। বুদ্ধ ও ধর্ম—এ কোন ব্যক্তি বিশেষ বা প্রতিষ্ঠান বিশেষ নয়, এ হচ্ছে বাহুবের জ্ঞানের ও মুক্তির তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বাহুব আজ নিঃশেষে ভুলে যাবে, এটা সম্ভব নয়।



অসংগতি

বিমল ভদ্র

জানালটা খুবই ছোট। তবু চাঁদের খানিকটা ফাঁকি দিয়ে আসে। আর চৈত্র শেখের বাতাস আসছিলো যেরকম। হারপোকা ভক্তি বিজ্ঞানার এগর গুণে বজ্রিনাথ, এগর গুণে কহছে। পেটা খড়িতে বারোটা বেজে গেলো। উদ্ভূত করে আর নড়েচড়েই কি কাটাতে হবে সারা রাত? বিজ্ঞী একটা বস্ত্রা করে বজ্রিনাথ। মাথার খানিকটা ও হাত দিয়ে ঠেলে দিলে। বিজ্ঞানার এক পাশে। উঠে বসলো। বেনো। বজ্রি হাতে পারলে কিছু হয় একটা, এমন অঙ্গী। অন্ধকারে হাতডাতে হলেও খুব অল্পবিশেষ হয় না। নেড়ে বেঁধে। বঙ্গসামগ্রী অবশিষ্ট আছে। কলসিতে জলও নেই। লাটু, ব্যাটা বস্ত্র কীক দিকে আলকস। বজ্রার হার খাবে একদিন। নির্মলা বহুটুকুই গিলে নিলো বজ্রিনাথ।.....

বিজ্ঞীটা বরাহে এমন সময় অনেকগুলো গলাব হরের একটা বেশ এসে বিঁধলো কানে। বরানো হ'লো না বিড়ি। জানালার কাছে এসে বুক পর্যন্ত হুঁকে ও চোখ কীক করে চেয়ে রইলো। স্পষ্ট হচ্ছে সেই বেশ। বজ্রিনাথ উদ্ভূত। কান ছুটো শানিয়ে বেবেছে। চোখ দুটোও ভীক। চাঁদের আলোর নিমতলা রীট বিবর্ণ দেখার, গোবুলের মোকামে কীপ ফেল। কাঠের কুঁড়িগুলো প্রাচীরমাঝে। কছপের বস্ত্র কিনে। রাস নাম স্নাত ফার...

বজ্রিনাথ কান ছুটো আরো খানিকটা এগিয়ে দিলো। বাতালে ৯ চোখ দুটোকে হুঁক বোজার বস্ত্র ক'লো ছোতালো।

রাস নাম স্নাত ফার।
কছপগুলো হিন্দুস্বামী আসরে খেঁ ছড়াতে ছড়াতে।
পাশেই করার বস্ত্র খেঁছলো এলোবোলা হ'রে বাতালে উঠে করে পড়ছে রাতারা।

শালা! বজ্রিনাথ রীক চেপে গালাগাল দিলো।
কাকে বৈ জানে।

বিজ্ঞী বজ্রিতে এসে বসলো। বিজ্ঞানার। না, এমন ক'রে আর চলে না। কালকের রাতটা নষ্ট হয়েচে নিজের বোনে। বেলায় খাঁচলে বোঁকের মাথার একটা ছোট নেটে বৈবে দিয়ে লাভের মধ্যে আর ফেরা হ'লো না বাড়িরে। তিন তিনটে খেঁছ চিত্ত শালা একলাই লুটেছে। আজ চিত্তর জ্বর, সবকটা লোটবার কথা ভারই, অথচ এখনও লুটলো না একটাও। বারোটা বেজে গেছে কখন—রাতেরই বা আর কতটুকু নেই। হঠাৎ আর এক শব্দ এলো জানালা ব'রে; খানিকটা চৈত্র শেখের বাতাসও এলো দমকা। খাটের ওপর কান খাড়া করে বসলো বজ্রিনাথ। 'আ—' চীৎকারটা ধামালো কেন ওরা? চালা নারে বাবা। একটা দিন আর একটু চিবোতে পারিস না?

বলো হরি, হরি বোল—

জানালার কাছে এসে হুঁকে গাড়লো বজ্রিনাথ গলা বাড়িয়ে; চোখ কান জাগিয়ে। অবশেষে তাঁদের চেঁহারাগুলো চোখে পড়লো। জন ধনেক লোকের ভীড়। কেমন নেই, নেই বৈ ছোঁড়াহুঁড়ি। ঠিক ঠাঙ্কর করতে পারা যায় না এরা কোন গুহের। আরো খানিকটা হুঁকলো ও।

বলো হরি, হরি বোল—

শব বাজা বোড় বুললো। বজ্রিনাথের চোখ আরও হলো দুতবেহের ওপর। সাধাসিবে শব-শব্দ। হু' এক হুটো হল ছড়ানো এখানে ওখানে। হুঁকে পড়ে ও শৌকবার চোঁটা করলো লামনের বাতাস। বদি সেক্টর গছ একটু কেসে আসে। না কোন গছ নেই।

বজ্রিনাথ কি বেন ভাবলো কিছুকণ। তারপর সেই কাডনটা গারে জড়ালো। বার একপাশে লাল একপাশে কালো। ইচ্ছে করেই ভীক নিলো ছমড়ে বাতে ছোট। রংই চোখে পড়ে। তারপর বীরে বীরে নেমে গেলো।

বা দিকে নিতে আসা একটি চিত্ত। নির্ভরভাবে

বোঁচানো হচ্ছে। তারই অধুরে একেবারে দেওয়ালের দিকে লজাগতরা খাটরা নামিয়েছে। ডান দিকে হিন্দুদ্বারী দলটি কর্তব্যপূর। এমিকটায় এরাই হেঁড়া হেঁড়া ভাবে দাঁড়িয়ে। কালো মতন ঘোঁটা লোকটিই বৃষ্টি এ ধরনের কর্তব্য। অন্ততঃ তার হাত মুখ নাড়া খেঁকে তাই প্রমাণ হয়। বজ্রিনাথ খিড়ি ধরিয়ে খুঁস খুঁস করতে লাগলো এমিক এমিক। গায়ের লাল কালো ঝাড়নটা নানা তংগীতে গায়ের এঁটে ঘের আর খোলে। গিঁথে আর ঝাঁক চোখে চেয়ে বার করেই গলা ঝেঁড়েও কোন রকমে দুগ্ধি আকর্ষণ করতে সে পারলো না। শেষ পর্যন্ত একবার পা পা করে এগিয়ে গেলো ও। এক কোণে দাঁড়িয়ে তীক্ষ্ণ চোখে ও ভাকালে মুক্তবেষের দিকে। পর্বাণ বোঁচন অটোমটী, বহায তত্ব, শরৎ পুর্নিবার মত লাবণ্য করা অতল চত্বানে। চুলের কালোর ওপর নিটোল নবর মুখখানা ভেসে উঠেছে ওলের ওপর পশ্চিম মতন। নিতের টোটে আশ্চর্য একটা চাঁপা হাসির আভাস। বজ্রিনাথ অতিমুগ্ধ হ'লো। মেরেটির আর জুকনো মাল। গলায়। টুকটেকে সিঁচুতেই আভা জলছে সিঁথিতে। চোখ নামিয়ে নিলো বজ্রিনাথ। কোর' শাড়িতে ঘোড়া। চওড়া লাল পাতটা আলা ধরিয়ে দেয় চোখে। বজ্রিনাথ সরে এলো আরো একটু। আলতা চোখানো পা দুটোও এক লহবা স্থির দুগ্ধিতে দেখে নিলো ও। তারপর বীরে বীরে সরে গেলো হয়ে।

মিনিট পনেরো হবে চকর মেরেও বখন ওপকের লাড়া শব্দ পাওয়া গেল ম্য ভাবলে বরাডটাই তার খাড়াপ। চট্টাৎ সে পেয়ে গেলো। ঘোঁটা মতন লোকটির সংগে একজন ছোকরা আসছে এগিয়ে। তারই দিকে। কাছে এসে থামলো ওরা। ছোকরাটি ওর লাল কালো ঝাড়নটার দিকে তাকিয়ে কিছু একটা অজ্ঞান করে বললে, 'এখানে কটো ভোলার ঘোকানটা কোথায় জানেন?'

বাধা নাড়লো বজ্রিনাথ।

আমারই কটোর ঘোকান আছে।

কালো তত্ব লোকটি কী বেনো ভেবে নিলেন। দুটো কটো তুলতে হবে। কত বেঘন!—

কতো আর বা রেট বড় সাইক হলে পনেরো টাকা। এঁা। ছোকরাটি বেনো আতকে উঠলো।

আজ্ঞে ওর কমে তো হয় না। বড় সাইক রাতে তুলতে হবে, স্নান চাই। তিনিই পত্রের দাম বা খুঁড়েছে জানেনই তো।

না হয় একটাই তোলাও অনুলা—কালো তত্বলোকটি বললেন।

হেলোটি মুখ নীচু করে কী বেনো ভাবলো—। বললে ছবি ভালো হবে তো?

তা হবে বৈ কি ভায়।

'না, মানে—ওর আর কটো নেই কিনা। ওই তো সেদিন বিয়ে—অনুলা হাত পথে খেঁবে গেলো। ওর শরের বিলুপতা বজ্রিনাথের কানে লাগে। রেট একটু বাড়িয়ে বলার অভ্যাস বে ওর নেই তার—তবু ও বললো, কটো বখন নেই তখন একটু ভালো করেই তোলানো ঘরকার ভায়। দু একটাকা কম হতে পারে কিন্তু সত্যতে আপনায় ভেঘন কটো ভাল হবে না।

অনুলা আর কালো তত্ব লোকটি মুখ চাওয়া চাওয়া করলো। বজ্রিনাথ ঠিক করলো, রাজী না হলে রেট একটু কমতে হবে তাকে। না পুথিরে সে নেবে পরে ঠিকই।

বড় হাই চার্জ। কালো তত্বলোকটি বললেন।

তা কী করা যায়? ছোকরাটি বললে, মালতীর তত্ব আর করনও খরচ করতে হবে না আমার—

আড়চোখে ভাকালো বজ্রিনাথ অনুলায় মুখের দিকে। লোকটিকে সজ মূর্তা মেরেটির স্থানী বলেই মনে হয়। তুলে দিন একটাই ভালো করে। ছোকরা বজ্রিনাথের দিকে তাকিয়ে বললে, কিন্তু কটোটা যেন সত্যি ভাল হয়।

সাধারণত নিশ্চয় হবে ভায়। তা হলে আমি আমার মিনিট পজগুলো নিয়ে আসি—মিনিট পনেরোর মধ্যেই এসে পড়বে।

দোকানে এসে রতনকে বাঁটা বেহে আঁগাচ্ছে—হলো।
মোবের মতন বুঝাচ্ছে। উঠে বললো রতন। নে গুহিরে
নে সব।

আড়মোড়া তেমে রতন—হাই তুললো। জড়ানো
গলায় বললে, একটা বিড়ি ধাও।

পকেটে হাত দিলো। বড়িনাথ—বিড়ি নেই একটাও।
হুহিরে গেছে। বাইরে চল সিগারেট খাওয়াবো।

রতন উঠলো। দোকান ঘরেই ও শোয়। ক্যামেরা
আর 'সবু' কিছু পানের ঘরেই থাকে। কতোকণ আর
লাগবে গুহিরে নিতে। ক্যামেরা খাড়ে করে রতন
দোকান ছাড়ার বাইরে এলো। ওর হাতে ট্যান্ডুললো
দিয়ে দোকানটার ভালো লাগলো। বড়িনাথ।

শ্রুপানে এসে এদিক ওদিক দেখে বড়িনাথ অমূল্যকে
বললে, আরগাটা ঠিক হুহিরে হচ্ছে না। চকুন না খাটের
সিঁড়ি নামতে বাহিরের যে আরগাটুকু সেখানে।
আসলে ওর নিজেরই কেমন একটু দুর্বলতা আছে আরগা
টুকুর ওপর। ভালো করে বেড়ি কটো তুলতে বললে
দানের সংগে এ আরগাটাও যে মনে করিয়ে দেয়। তাই
হলো। অমূল্য স্ত্রীর ভালো কটোর অল্প একটু কট
রাখলে না। গাছটার নীচে নামানো হলো খাটের।
আকস্মিক ভাবেই ছাচারটে পাতা পড়লো করে। স্ত্রীর
বাখার কাছে হাঁটু গেড়ে বললো অমূল্য চোখ রাখলো
হালতীর বুকে।

ক্যামেরা এডজাস্ট করছে বড়িনাথ—লাল কাল
কাজন মাখার চেহে। হ্রাস দিয়ে ইলার। মিছে রতনকে
আর একটু বায়ে। আলোটা তোল। রতন লঠন নিয়ে
একবার স্ক্রিনেবের পানের কাছে আর একবার মাখার
কাছে ঘুরঘুর করছে। আপনি আর একটু হুঁকে আহ্ন
ডানদিকে। ক্যামেরার বরা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত
ক্যামেরা এডজাস্ট হলো। আর একবার লম্বনে এসে
হুয়ে গেল বড়িনাথ। বললো স্ত্রীর নাখাটা আর একটু
লম্বনে ঘুরিয়ে দিতে পারেন? বাখা নাড়লো অমূল্য।
হালতীর কোলা কোলা ঠাণ্ডা পাল ছুটোর ওর হাত
থাকলো কপেকের অল্প জুড়ে। বীরে বীরে খুব সবর্ণে

হালতীর খাটটা একটু হুহিরে দিলো। বেন দুবর
কাউকে পাশ কিরিরে মিছে এমন নিটোল মনস্তার।
বড়িনাথ একপাশে সরে এসে পতিপূর্ণ রুটিতে একবার
জাকালো হালতীর মিকে।

টিকঠাক করে নিয়ে খাটার টিপলো। এক কলক
আলোর আরগাটা লম্বার অতঃ দীর্ঘ হয়ে উঠলো।
আর কেমন বেন শিউরে উঠলো বড়িনাথ। চোখের
তুল কি আলোর ব্যাজিকই হবে হালতী বেন অপরপ
হেনে নড়ে উঠলো হুহিরে র অল্প। বসতে চাইলো উঠে।
ভায়ণর সব দ্বিহ। বে যেমনটি ছিলো। মরা চোখের
আলোর মিন মিন করতে লাগলো আরগাটা।

ঠ্যাণ্ড খুপতে লাগলো বড়িনাথ; অমূল্য এসে বললে
কটোটা কবে পাবো?

পরন্ত।

কাল পাব না?

আজ্ঞে হয়ে উঠবে না। পরন্ত সজেবেলা আসবে।
কোর পথে রতন সোঝা দিকেই পা বাড়ানিছিলো।
বাখা দিয়ে বড়িনাথ বললে, চল একটু ওদিক দিয়ে ঘুরে
বাই।

নিজের আভানার ফিরে এলো বখন বড়িনাথ, তখন
পেটা বড়িতে ভিনটে বাজলো। জানালা দিয়ে বাতাস
চুকেছে বনকে বনকে; আলো গেছে সরে। আর নয়।
দুব পাচ্ছে তার। বেশটাও কেমন বেন একটু বেশী
হয়ে গেছে। সিগারেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে কেলে
বিছানার এসে ও ততঃ পড়লো। রতন নীচে আছে।
দরকার বলে ডাকবে। শিরশিরে হাওয়ায় ঘুরিয়ে
পড়লো বড়িনাথ।

এলোবেলো কতকগুলো টেটে ভেঙে পড়লো তার ঘুম-
ঘুম মনে। এলোবেলো বদ। বেলার হাতটা লম্বানো
র'রেছে তার হাতে হঠাৎ কোণ থেকে পালিয়ে গেলো
একটা বেড়াল যেখানে গিয়ে ও খেবে গেলো—বেল
কুলের মালা ছলছে বুকে; বুকের কাপড়টা খুলে কেলে
বেলা—মাসির বাগানের লামনে খাঁড়টা। শিং বাগিয়ে
ছুটে আসছে—তাকাতাড়ি ওর হাত মাড়িয়ে বড়িনাথ

পালাবার চেষ্টা করলো। শেহন থেকে টান পড়লো।
 গুর জামার। বুনে পাড়ালো বজিনাথ। একি—এতো
 বেশ্য নর—এ যে মালতী। সেই রূপ সেই অঙ্গ, আর
 আকরণ। বজিনাথের বিম্বিত চোখের সামনে মালতী
 অসংকেতে গাড়িয়ে রইলো। তোমার ক্ষত্রে আগতে
 হলো আবার। বড় কষ্ট হ'ল আবার কিন্তু উপায়
 নেই।

মালতী যে কেনো এসেছে বজিনাথ তা জানে না।
 চিন্তাও করতে পারে না। ক্যাল ক্যাল গুলিতে ও
 তাকিয়ে থাকলো।

কত দিন ধরে কটো তুলছো ?

অ-নেক দিন—ভা বহর সাতেক হবে কম ক'রে—
 যীরে যীরে বললে বজিনাথ। সাহস সংগ্রহ ক'রে।

তুলতে পারো ভালো না—এমনি যা তা ?

বজিনাথ নির্বাক।

চুপ করে থাকলে যে ? ভালো করে যদি তুলতে
 নই পারো কেন তুললে আমার কটো ? কেনো কষ্ট
 দিলে আমার ?

কষ্ট ?

‘কষ্ট নর ? কোথা থেকে আমি আসছি জানো ?
 আসতে কি যে কষ্ট হয় তুমি কখনা করতে পারবে না।
 বাক ওগর বুঝবে না তুমি। আমার আসতে হ'লো।
 এলাম তোমায় একটা কথা ব'লে দিতে। আমার
 কটোটা আমার মতন হওয়া চাই।

বজিনাথ পরিপূর্ণ চোখে তাকালো। আকাশের
 চাঁদকে চাঁদের মতন ক'রে আঁকা ?

তা কি ক'রে হবে ? বজিনাথ গলায় সাহস এনে
 ব'ললে, ক্যামেরার তো খুব ব্যাপণ উঠবে না ?

চাই উঠছে ওই তোমার কাঠের ব্যারে। আর
 তোমার বা বলি কি—সাক্ষিয়েছে আমার বা যা আমার
 মন ? মালতী এক মুহূর্ত ধামলো। কোব হর ওর
 নিখাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।

ভাগ্য হচ্ছে জন্মের মতন। কোথায়, কবে, কে

জন্মাবে কেউ জানতে পারে ? ভাগ্য ভেঁমনি জানতে
 পারিবে ? বিয়ের সেত বহরের কথা বাদ দি, শেষ
 দিনেও কি ওরা একটু সাক্ষিয়ে দিতে পারলনা ?

বজিনাথ সন্মোহিত। গুলিতে তাকিয়ে রইলো।
 মালতীর বাকানো ট্রাটে চাপা হাসিটা ও দৃশ্যে
 পেরেছে এতোক্ষণে। গরমির অস্তিত্ব।

এ সাম্রাজ্য কম দুন্দর কি ? যার যেমন ক্ষমতা ?

গোবর আর গাঁদার যেমন তত্ত্ব ? কে চেয়েছে
 বেশী ? চুয়া আর অগর, গরদের খান, গোড়ের খানা ?
 যা আছে তাই দিলেই তো পারতো। আঁস'লো না আছে
 হাত—না আছে চোখ। ধাত মেই বাহ সে বুঝবে
 ধাতের মর্যাদা। মালতী কথা বলতে বলতে আশ-শুকনো
 মালটি অ্যাকুণে অভালো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বেনো ছিঁড়ে
 ফেলবে।

আর পারি না কষ্ট হচ্ছে ভীষণ। শোনো, আমি
 যা ছিলাম তোমায় ভেমনটি রাখতে হ'বে। আমি যা
 নর তা রাখতে পারবে না তুমি। পাঁচ জনে তাকিয়ে
 ট্রাট বাকাবে—সইতে পারবে না। বুঝলে ?

বজিনাথ নিরল গলায় বললে, তা কি ক'রে হয় ?

‘কেনো ? দেখলে তো আমার। যদি বলো আরো
 বানিকক্ষণ থাকি ; দেখে নাও ভালো করে। পারবে না ?

বজিনাথ এমন কথার অবাক না হ'রে সবাক
 হ'ল, কি করে তাই বলি ?

তবে কি হাই শিবেছো ? মালতী বিরক হ'লো।
 তারপর চুপ চাপ। কেমন যেন অগোচাল অন্ধকার
 তাব জেলে এলো।

একটু একটু করে কখন বেনো ভ'রে গেলে সারা
 ঘরটা অন্ধকারে। তার পেরেই বড়মড় করে উঠে বলল
 বজিনাথ। চাঁদের আলো কখন সরে গেছে ঘর থেকে।
 চোখ রগড়ে বজিনাথ তাকালো। সেই অতি পুরাতন
 কাঠের বেড়াল আর মৃৎ তোর। কোথায় মালতী,
 লম্বা ঘটনাটা। ভাবতেই বজিনাথের পাটা নিউরে
 উঠলো। উঠে পাড়ালো ও।

ইস। মাথাটা বা ভাঙ হইতেছে। না নেপাটা বেশি করলে বহুলা কম নয়। বস আজ্ঞাপ্রতি বস, অনর্থক মাথা গরম। কটা বাঁজলো কে জানে? বাবে নাকি আর একবার শ্রমানে। মালতীর লোনার অঙ্গ কি আঙনে বললে ভাই হয়ে গেল?

বিন কুরের পরের কথা।

সবমাত্র লক্ষ্য লেগেছে। অমূল্য এলো বদ্যিনাথের ঘোড়ানে। এই যে আহুন—বদ্যিনাথ তাকে হাসিমুখে একটা নড়বড়ে টুল এগিয়ে দিলো বলতে। বললো, হবি আপনার হয়ে গেছে।

ভ্রমার খুলে ছ কপি কটা বের করলে বদ্যিনাথ। ভ্রমার নখ থেকে এক কপি এগিয়ে দিলে। বললে, কেমন হয়েছে?

অগঃ উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে অমূল্য ছবিখানা হাতে টেনে নিয়েছিলো। তার চোখের দৃষ্টিতে উত্তেজনা। মালতীর চিত্রের একটা স্মৃতি যেন হঠকৎ এলে ভর চোখেই টাই নিয়েছে।

বদ্যিনাথ তাকিয়ে তাকিয়ে বেবে। অমূল্যর উজ্জল উত্তর দৃষ্টি বীরে বীরে কিকে হয়ে আসে। আঙন যেন ছাই হয়ে গেছে। যে মন এতোকণ আশা আর কল্পনার আবেগভর্য ছিলো এবার সেখানে বিচার আর বিরোধ। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে অমূল্য ছবি দেখে, খুঁতখুঁতে গলায় অবশেষে বলে, বড় রাক্। কট কট করে চোখ।

কায় কিগারের কথা বলছেন? আপনারটা তো—

না, না, আমার নয়। বাবা দেহ অমূল্য, আমারটা ট্রিকই আছে। মালতীর মুখটার কথা বলছি, বড় কটকটে। "তাক। অমূল্যর গলায় বেরে বিষাদ।

তা ট্রিক। বদ্যিনাথ উত্তর দেয়, আসলে কিন্তু তনি ওতখোঁই ছিলেন। আমার লোব নেই। একটু খেবে মুহু হলে অস্ত্রের বলে, আপনার পঙ্খ হয় নি, কুবন্তে পেরেছি। আচ্ছা এবার দেখুন তো এটা? কথার পেনে বদ্যিনাথ তার হৃদয়ের কপিটা এগিয়ে দেয়।

বিভীর কটোখানা হাতে করে অমূল্য বিমুগ্ধ বিষয়ে বোঝা হয়ে গেলো। চমক জাপা চোখের পাতা তার খির। অনেককণ পরে তার বিম্বল হ্রস্ব শোনা গেলো, বাঃ, অমূল্য। আর তারপরই তীব্র অথক হয়ে বললে, আমার—এর মধ্যে আমি কই? আমার ছবিটা?

বদ্যিনাথ এতোকণ অমূল্যর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন এই এরেরই উত্তর দেবার জন্যে তৈরী হচ্ছিলো। বিনীত হ্রস্ব বললে, আর বলেন কেন? কেমিকলসের ব্যাগার। প্রথম ছবিটা আমার নিজেই তোলা লাগলো না। আপনি অন্তো করে বলেছিলেন। ভাবজ্বল ভেতলপ আর রিটাঙ টিটাঙ করে ছবিটা এমন করে দি যেন নমেই না হয় শ্রমানে তোলা। অনেক আশা নিয়ে কাজ করতে গেলাম, মশাই। একটু কী যে গড়বড় হয়ে গেলো নেগেটিভ গেলো নই হয়ে। এক কাজে হুসলেন মশাই, বদ্যিনাথ পালিতের নাম ডাক দিলো। নেগেটিভ নই হয়ে বাবে আমার হাতে? সেই আর নই নেগেটিভ নিয়ে বললাম পাক্সা একটা দিন। আপনার খ্রীকে উদ্ধার করলাম কিন্তু আপনারটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিলো, পারলাম না। বদ্যিনাথ গলার অনেক লজ্জা মুটিয়ে জানালো।

অমূল্য বিবাহমুগ্ধ, বিকিণ্ড হয়ে শুধু বললে, আমারটাই নই হয়ে গেলো!

এবার আর কোন জবাব দিলো না বদ্যিনাথ।

পকেট থেকে টাকা বের করলে অমূল্য, বললে, দিন, ছবিটা দিন। কতো দিতে হবে?

বদ্যিনাথ খামের মধ্যে দুটো ছবিই পুরে দিতে দিতে বললে, দিন, বা ট্রিক হয়েছে তাই দিন। আপনাদের সঙ্গে আমার বরাবরি কি?

অমূল্য বদ্যিনাথের হাতে একটা দশ টাকার নোট ভাঁজে দিয়ে রাখার সেনে গেলো।

অমূল্যর বাবার পক্ষে তাকিয়ে বদ্যিনাথ হঠাৎ হেসে উঠলো।

বসন্ত সামনে বসে কাজ করছিলো। বললে,—
কি হলো হালশে বে।

—এমনি। বসিনাথ একটা বিড়ি ধরিয়ে টাকাটা
ড্রয়ারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখলে।

যাই বলে। কাজটা তোমার ভালো হয় নি। ডাছা
মিথো কথাগুলো বললে, যাইরি। নেগেটিভিটা এখনো
শালা মিথি পাড়ে আছে। আর বেহালুর তন্ত্রলোককে
বা মনে এলো বলে দিলে। কি আকশোস তন্ত্রলোকের
দেখলে? ভালো ছবিটা থেকে বাদ পড়ে গেছে। যেন
শালা বউ থেকেই বাদ পড়ে গেছে এমনি মন মরা হয়ে
গেল। রক্তন উঠে এসে বিড়ি তুলে নিয়ে ধরালো,
তন্ত্রলোকের হুখ সেখে আমার কষ্ট হচ্ছে। তোমারই
বা কি যে গ্রেব, বুঝি নে। সারাদিন ধরে একটা ছবির
পেছনে বাটলে তাক বহি ছু পাঁচ টাকা বেশি আসতো!

বুঝতে বে। অনেকদিন ভালো ছবি তুলি না।
মড়া তুলে তুলে নিজের যেন মরে গেছি। তবু হাতটা
একটু বদলালো—বললে বসিনাথ। একটু থেমে
আমার ডিটার দেখা ভালো ছবিটার এনার্জিট কপি
থেকে বাদ গেছিল বলে তন্ত্রলোক মনে বড় কষ্ট
পেরেছেন না?

তা পায়ে না, বউয়ের সংগে ভালো, তুমি দিলে
তাকে বাতিল করে। এতে কার না কষ্ট হয় বাপু।

কি করবো। মালতীও কি কম কষ্ট পেয়েছে।
কী জানি, আমার চোখে পাশাপাশি ওরা কিছুতেই
মানলো না।

কথাগুলোর অব্যক্ত করতে না পেরে রক্তন
বসিনাথের হুনের দিকে তাকিয়ে রইল।

আবাতের প্রথম সন্ধ্যার

ঐক্যভিম্বী কর, ভারতী

নামহীন সুদূর অন্তীতে
কালের পঙ্খীভে,
মেঘনীল আকাশের ক্রান্তি ডারার
কবির ছন্দিল মস্ত্রে লেখনী মারার
লেখা পড়েছিল একবার,
প্রথম আবাত
অনন্ত কালের বুকে একটি লগন
খুঁজিবার তরে কোন নাহি পাওয়া
আপনার অন।
তারপর বীরে বীরে,
সে তিথি এসেছে ফিরে ফিরে,
সে মিশি পড়েছে ধরা ব্যাকুল বনভলে
বজ্রী গন্ধার গন্ধে বিবরী বেদন বিধুর
ঐক্যজল।

আজি সেই আবাতের প্রথম সন্ধ্যার
নিরাশা নিবৃত্ত ঘরে
মেঘছায়া লঙ্ঘকারে,
একটি সোপান কথা ভিজালি তোমার
হে চকল মনো মেঘ!
কেন এ চুক্তি বেগ?
ক্যার তরে হয়েছে পাগল?
ভেয়ে দিরে ছুপারে কড়োনা
বাস্তবের বাহার সৃষ্ণল!
ঘরছাড়া বাড়ির বেপে
টিকানা বিহীন নিষ্কণ্ঠে
যেতে চাপ্তে তেজে!
বীণাতে বেঁধেছে সুরধামি
শাস্ত্রতত্ত্ববদার লবঙ্গ রাগে

তাহারি কীপন হুকে লাগে

নিখিলের স্তম্ভ ধারায়

আপনা হাবায়।

দেখি' অন্ত সেট ব্যাখ্যায়

অন্তল পারাবায়

মনো মেখ! হুঁকে হুঁকে কোন দিন

পাবে কি তাহারে ?

অন্তঃপুরে বসি কাঁদো

কোন্ চির স্মিতনা লাগি'

নিশিদিন জাগি,

কোথা সে সলনা ?

হুলে হুলে প্রতীকার সেদিন গগনা

আজো কি পো ছুরালনা হার,

হুগে হুগে আবাড়ের প্রশম সফার

সজল'কাঁদল দিগি কাঁকে

ডাকে শুধু ডাকে।

পিছু পিছু ছুটে সেই আলোহার আলোক ধাঁধায়

মনো মেখ! হুঁকে হুঁকে কোনদিন পেরেছ কি তার ?

অনাদি কালের স্রোত বহি'

কবে ভুমি তাসারেছ তেলা,

অভিযান করেছ একেছা।

এ বিষের তালে তালে কালে কালে কত ভাঙ্গা পড়া

জাগ্রত জীবনের কত গুঠা পড়া

এই বরণীর হাটে তারি বাটে হাটে হাটে

ভিড়ে বারে বারে—

হুঁকেছ তাহারে

কোনদিন পেরেছ কি তারে ?

কোন নিম্ন বনে বুলবিত পাখা প্রশাখায়

উড়ে চলা স্থলন পাখায়,

বাসন্তী পূর্ণিমা স্নেহে বসু বসু বরষা নিশাতে

পলে পলে হাওয়ানো শিশাতে,

নিবিড় বাহুতে বাধি আপন স্মরণে রানি'

হিম্মত'বাঁকরে,

হুঁকিয়া কি পেরেছ তাহারে ?

অপত্যের মেহ দরিদ্রায়,

বহুর বধুর ঐতি ঘানে

চলিতে চলিতে পথ ধারে

পনরা তরিয়া ভারে ভারে

ভেঙ্গে বাওরা জোরবের টানে

কোন ঘানে ?

দিগন্তের সেই পরগারে,

হুঁকিয়া কি পেরেছ তাহারে ?

প্রণা কামনার

হুগে হুগে বিভিন্ন ধারায়

জীবনের কতনা সাধনা

শত কোটি দেবতার পূজা আরাধনা

গৃহেতে বসিয়ে বনে।

সহাস্তির চরম লগনে

অশানের চিত্তাভ্রমে সহাস্তির

সত্ত মুক্তিকার

হুঁকিয়া কি পেরেছ তাহারে ?

মেঘেতে ঢেকেছে গম্বুজ

ঘনায়েরে স্নায়

আবাড়ের এ আবারে ক্লান্ত পায়

কিরে এস কিরে এস আজ

হে অশান্ত মনোমেঘ মোর।

দোহ আধি-লোর

ঘন নিরাশার।

হুর্গব ছদর হুর্গে গোপন ছুরায়

আজো বহু স্রুস্তির চোরা কোঠাখানি

তেকে ফেল কব হানি' হানি।

বেখায় বিয়লে

কল্যাণ অকলে ঢাকা অনির্বাণ শীপখানি জলে।

বোঝো একবার

সেবা যদি মিলে কদু সজান তাহার

হে চির বিরহী! তব সে চির স্মরণে!

আব্রাহাম

(উপভাস)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বাহ্নয়তি]

দিন কতক লুণ পে পড়াশোনার একেবারে ভূবে
রইলো। ক্রাশেও খোলা বইয়ের পাতার সামনে কুঁকে
বসতো। এদিক শুদিক চোখ তুলতো না। চোখ
তোলবার জোও ছিল না। সামনে মা টিন, পিছনে
কমল বোস। মা টিন অবস্ত ফিরে চায় না কিন্তু ওর
দিকে নজর পড়লেই লুণ পের শরীর রিমকিম করে ওঠে,
ভারি হয়ে ওঠে চোখের জুটো পাতা। মা শিনকে পুরো
চায়পাতা চিপি লিখেছে। কলেজের কথা লেকচারারদের
কথা, কমল বোস আর তার বাপের কথা, ওর বাঁকবার
খরটার বর্ণনাও দিচ্ছে, মৈনলিন জীবনের একটা খলডা
পাঠিয়েছে, কিন্তু লাবণ্যনে এড়িয়ে গেছে মা টিনের কথা।
বেবেদের মনের কথা বলা বার না, তিলকে হরত তালই
করে বসবে। অভিমানে চিপি দেওয়াই বন্ধ করে দেবে
কিংবা বালিশে উপুড় হয়ে সারাবাসত কাঁদবে শুমড়ে
শুনড়ে। সত্যি, কি ঠুনকো মন বেবেদের, চীনাহাতির
পিরিচের মতন, একটু এদিক শুদিক হলেই কনকন করে
ভেঙে চুরবার হয়ে যায়।

কমল বোসকে অবস্ত এড়ানো সজ্জ হর নি। তবে
নেহাৎ সামনাসামনি হলে হুকি হেলে এড়িয়ে গেছে।
বিশেষ ঘরা হোঁরা দেয় নি। কমন ক্রমের একেবারে
কোণের দিকে নিঃশেষ আশে পাশে দরকারী অদরকারী
আচুর বই খাতাপত্র ছড়িয়ে ছুর্ভেদ প্রাণীর গড়ে তোলায়
চেষ্টা করেছে।

কদিন বরে কেবলই মনে পড়ছে সোরেবিনের কথা।
মৌর্য ধড় হাজার কাঠল ঘরা একরের পর একর জুড়ে
বাঝা মাঠ, একটি খালের চাবড়াও নেই, আব্রাহাম
ইরমার কালো পাখরের চাঙড়ঙলো ভেতে গরম হয়ে
উঠেছে, কোকোপিন আর কৌলমাঝিরি পাতাগুলো
পৰ্বত তকিরে দাল হয়ে উঠেছে। থু ছেটির কুরোয়

পাড়ে ঝাড়িয়ে বেয়েরা বালতি বালতি জল ঢালছে
নিজেরের মাথার। মা শিনও বাক নেই। কিন্তু এতে
রোদেও লুণ পে ছুটির দিন ঠিক এসে ছুটেছে মা শিনেরের
দাওয়ার। ৫ মাকে লুণ পাড়িয়ে লাবণ্যনে আগল বন্ধ করে
মা শিন বেয়িরে এসেছে লুণ পের সংগে। তারপর
একেবারে লম্বুরের হারে এসে ভলে পা ভুবিরে খটীর
পর খটী আঝোল তাঝোল গল্প করেছে। একটু ক্রান্তি
আলে নি, অবলাহ আসে নি। সত্যি, কতো তফাৎ
সোরেবিন আর রেজুনে।

মৈনলিন ক্রাশ শেব হতেই বারাকার কমল বোস লুণ
পের সামনাসামনি এসে ঠাড়াডো, 'কি ব্যাপার
আপনার। খুব পড়াশোনা শুক করেছেন বুঝি?'

লুণ পে পাল কাটাবার চেষ্টা করলো, 'খুব নয়,
সামান্য। ইতিহাস আর ইংরেজী দুটোতেই পিড়িয়ে
গেছি। ক্রাশের পড়ানো মনে লাগছে না তাই ভাবছি
খোটে খুটে নিজেই তৈরী হয়ে নিই, নয়ত ডিটোরিয়ারাল
ক্রাশে ইজ্ঞ থাকবে না-এ'

'বেশ লোক তৌ আপনি। একলা একলাই তৈরী
হয়ে নিচ্ছেন আমায়ের একটু পথ বাতলে দিন।'

'কি বে বলেন' লুণ পে বুখে ললচ্ছ হালি কোটাবার
চেষ্টা করলো, 'নতুন কৌন বই কোগাড করতে প্যরি
নি। ভই 'ব্রেট্টেই' পড়ছি।'

'যাকগে পড়ুন মশাই আপনি প্রাণ ভরে। পরীকার
ঘোড়সোড়ে আগে ছুটে গিয়ে বেড়া জিতিয়ে যান,
আমায়ের কিছু বলবার নেই।' কমল বোস পকেট থেকে
একটা কার্ড বের করে বললো, 'কাল আমার জন্মদিন।
অবস্ত সেজ্ঞ কলেজ বন্ধ দেখ না। বাবা বিশেষ করে
বলো দিইয়েছেন আপনাকে সংগেই কঁরে নিয়ে যেতে ছুটির
পরে। আপজি নেই তো?'

'না, না, আপত্তি কিসের, নিশ্চয় যাযো।' লুন পে কার্ডে ওপর চোখ বোলাতে বোলাতে উত্তর দিলো।

'তাহলে কাল আমি ছুটির পরে আপনায় হোটেলে যাযো। আপনি হাতখুব বুয়ে তৈরী থাকবেন।' কলম সিঁড়ি দিয়ে যাঠের দিকে নেমে গেলো।

হোটেলে গিয়ে লুন পে পোখাক বরলে নিলো। মধ্যে এক ঘণ্টা ছুটি। সে সময়টা নিজের কুচ ফিরে আসলো। সময় বিনের দেখা লেকচার নোটসগুলো মিলিয়ে নিলো। একবার ভাতপার পাখাটা পুরোমনে খুলে দিতে ইংরেজী কবিতার বই হাতে নিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলো। কলম বয়ে বাথার একটা খেরাল এসেছে। কলেজের নোটিশ বোর্ডে টাঙিয়ে দিয়েছে খবরটা। কলেজের ত্রৈমাসিক পত্রিকার জন্ম জেনারেলের কাছ থেকে দেখা আদ্যমান করা হয়েছে। লুন পের ভারি ইচ্ছা কিছু লিখবে। এক কপি পাঠ্যে উচান টিনকে আর এক কপি 'মা শিনকে। কিছু ইংরাজীতে লিখলে মা শিন কিছুই বুঝবে না। বমী ভাবার লিখতে লুন পের মন সরলো না। অনেকেরই নজরে আসবে না বিশেষতঃ বিশেষ লেকচারারদের। ইতিহাসের বিষয় লিখবে কিছু একটা। এসপের ইতিহাস, অজ্ঞাত অব্যায়গুলো ফুলে বরবে শোকের নাশনে, অব্যায় মনোনিপুণ কাহিনীগুলো যবে বেজে নিচলকে করে তুলবে। শেরাখীর কথাগুলো এর মধ্যে তো আর হারিয়ে যায় নি। ইংরেজী কবিতার বই মুড়ে রেখে লুন পে কাগজ কলম নিয়ে বসলো। বেশ জুতগই গালতরা নাম একটা দিতে হবে। ব্রহ্ম-সাবীনতার শেষ অব্যায়। বৃদ্ধ বিরতি বোধনা হয়েছিলো এই রেজুনে। বিদেশীরা নাম দিয়েছে রেজুন, কিন্তু এর আসল সৌর্যন 'ইয়ানড' অর্থাৎ লড়াইয়ের শেষ। বিদেশীর পৌর্বে আর বীর্বে পরাজুত হয়েছে বিবর বাহিনী, এদের ইতিহাসে এই কথাই আছে। কিন্তু সেখানেও বেতে পায়ে ধাপে ধাপে 'কিভাবে বিদেশীর বড়বড় আর সীন অভিলক্ষি এসপের শাসনের বিলানে ফটল হারিয়ে

ছিলো। উৎকোচে বনীভূত করে এসপের লোক দিয়েই এসপের স্বর্নাশ করার এচোটো চলেছিলো। স্থপালনের মুখোশ পঁরে উপজাতি এলাকার অমানুষিক অভ্যচার অপ্রতিত হয়েছিলো বহুরের পর বছর। এ সব বেশ শুধিরে দেখা যেতে পারে।

সুঁকে পড়ে লিপতে আরম্ভ করতেই লুন পে বাধা গেলো।

'আসতে পারি' মরজার গোড়ায় কে এসে ঝাড়িয়েছে। ঘাড় কিরিয়ে লুন পে দেখলো সেই বরগোস প্যাটা-পেরের ছেলেটি।

'আমুন' লুন পে বিরক্তির অরটু কুকেতে পারলো না। এখনি আবেল তাবেল বকবে বলে বলে ঐশ অতিত করে তুলবে।

ছেলেটি এগিয়ে এসে লুন পের পাশে গিয়ে ঠাড়ালো 'কি করছেন? ক্রাশ নেই।'

'না, এ পরিঘটে জিহোয়াফি। আমার ছুটি।'

'হোটেলে কিরে এলেন যে? পড়ছেন বুঝি না নোটস লিখছেন বলে বনে' ছেলেটি উঁকি দিয়ে দেখলো।

এই ভয়টাই লুন পে করেছিলো। নিঃস্বাং কেলতে যাবে না। বুঁড়িরে ঝুঁড়িরে বিরক্ত করে তুলবে। হাজার প্রশ্ন আর হাজার কৈফিয়ৎ। তার চেয়ে স্পষ্ট কথাটা বলে দেওয়াই ভালো, তাতে যদি রেহাই পাওয়া যায়।

'কলেজ পত্রিকার জন্ম কিছু একটা লিখবো ভাবছি। শুই খাতা কলম নিয়ে বসছি। সময়ও হাতে বেশী নেই, এ মাসের মধ্যেই দিয়ে দিতে হবে।'

ছেলেটির মুখ চোখ কৌতুহলে ফেটে পড়লো। একটু হাত একেবারে লুন পের কাঁধে রেখে বসলো, কি লিখছেন কবিতা বুঝি? দেখি কতটা হলো।

'কিছুই এখনও হয়নি, তাড়াতাড়ি কবিতাও আমি লিখছি না।'

'একটু ঝড়ান,' আমি এখনই আসছি ছেলেটি বল থেকে বেরিয়ে গেলো।' মিনিট দুইবেক, তারপরই যোটা একটা খাতা হাতে নিয়ে ছেলেটি আবার ঘরে

চুকলো। একপাল হেসে বললো, 'আমি লিখছি একটা কবিতা। কাল থেকে চেষ্টা করছি কিছুতেই ঠিক বাগে আসতে পারছি না। এইজন্য কাল থেকে কলেজ কামাই করছি। এখন বসে বসে লিখছি লুন হঠাৎ আপনার ঘরে খুঁটখাট আঙুরাণ শুনে ভাবলুম কি ব্যাপার কলেজ কামাই করে চলে আসলেন। বোঝ নিই একবার।'

লুন পে কাগজ পত্র গুটিয়ে ফেললো। উপায় নেই। এখন বসে বসে কবিতা ভুলতে হবে। একমাত্র অপার কথা, হাতে বেশী সময় নেই। ক্রাস আছে এই অভিলার উঠে পালাতে পাবে।

'শুধুম' গলা ঝাঁকানী দিয়ে হেলেনি তৈরী হয়ে নিলো, 'প্রথম কবিতাটির নাম 'শবের বাক'।'

লুন পে চোখ বন্ধ করে বসে বইল। কোথার কোন পথের বাক কণেকের অন্ধ দেখা অজানা এক স্রবরীকে উদ্দেশ্য করে কবিতানোচিত হৃদয়শূন্য। রীঘল আঁখির পল্লব আর সাজে বঁধার বরণ, কাবল কালো পেশের ভার, ঠাড়াবার বহিঃকণ্ঠি সব কিছু কবির বিচিত্র চোখের সামনে আছে। দেখা দেয় অন্ধকার রাত্রির আকাশে। মেয়েটির হাতে ছিলো ভিঘের সুড়ি। লুন পের মনে হ'লো আরো দু'একটা লাইন জুড়ে সেওরা যেতো, ডিম-গুলোর গম লুফে। স্রবরী খেরের চেয়ে আরো লোভনীয় হ'তো লজ্জা ভিঘের রাম।

হেলেনি আর একটি কবিতা পড়ার সুখেই ঘণ্টার আঙুরাণ শোনা গেলো। লুন পে বড়মড়িয়ে চেয়ার চেড়ে উঠে পড়লো 'বা: আপনার কবিতার হাত তো চমৎকার। ঘণ্টা বেজ গেলো, নইলে আরো গোটাকতক ভুলভান বলে বসে।'

বাটে পা দিয়ে লুন পে ঠাণ্ডে ঠাণ্ড চেপে বলে উঠলো 'জ্বালান, এমন লেখাটা গেলো নষ্ট হ'য়ে। হাজার বাধা চুকলেও আর লিখতে পারবো না।' জোরে পা ফেলে লুন পে ব্যারাকার উপরে উঠলো।

পরের দিন ক্রাস শেষ হবার সংগে সংগে কমল লুন-পের পাশে এসে ঠাড়াবোঁ। 'আজকের কথাটা ভুলে যাব নি সিন্ধু।'

'না না, ভুলবো কেন। লুন হোটেলে বাই, মুখ হাত ধুয়ে আপনার সংগেই যাবো।'

লুন পে হাত মুখ খোবার লজ্জা বাইরে বেরিয়ে গেলো।

কিনতে একটু ঘেরাটী হলো। হাত মুখ যোজনা নয়, একেবারে লান করে ফেললো লুন পে। এই পরের বেন আই-চাই ক'বে, বাবে ভাবব করে দেহ।

'বা ভাবি চমৎকার আরজটা করেছেন তো। লুন-প হ'য়েছে' কমল উজ্জ্বলিত হ'য়ে উঠলো।

কমলের হাতের দিকেই চেয়েই লুন পে লজ্জিত হ'য়ে পড়লো। ব'লে ব'লে খাতার ভলা থেকে ওর লেখাটা খের করেছে, রাত জেগে তিন চার পাতা মাত্র শেষ করেছে, এখনও অনেক বাকি।

'আপনার তো আজো চোখ। কোথা থেকে টেনে খের করলেন?'

'অজান্তা ঝাঁটি জিনিঘের মতন মেঘনং করে ব'লে ব'লে কবে লুদান পেরেছি। পাছে লোকের নজরে পড়ে বলে, আপনি তো আর লুকোতে কছুর করেন নি।'

'ফলেজ ম্যাগাজিনের লজ্জা লিখছি। সেখি যদি খেটে-খুটে শেষ করতে পারি দিয়ে দেখো লেটার বাসে। আমবা ফ্রেন্ডার, আমাদের লেখা কি আর ছাপাবে?'

'কেন ছাপাবে না? কমল উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো 'বা সব লেখা বেহোর। কেবল জোমের কবিতা আর ন্যাকা ন্যাকা গল্প।'

জুতো পারে দিয়ে লুন পে তৈরী হয়ে নিলো। ঘরজার তালি দিয়ে কমলের সংগে ির্জি বেয়ে নিচে নেবে এলো। বাঠের ওপাশে লুড খোণা একটা গাড়ীর সামনে এসে কমল বললো, 'মিন, উঠুন।'

লুন পে উঠে বসতে পিছন পিছন কমলও উঠে বসল।

'আপনার বাবা বাবেন না?'

'হ্যাঁ, বাবা আগেই চলে গেছেন। তিনিই তো সব করতেন। আমার জন্মদিনে আমার খাটা ঠিক নয়, কি বলেন?'

কমল আর লুন পে দুজনেই হেসে উঠলো।

প্রথম বোড। অ্যানকন্টের এলেনপ মাঝানো মিল কালো রাক্ষাস অঙ্গুর সাপের মতন। ছপাশে চওড়া ঘালের পাড়। বোডবোড়ের বাঠের ওপাশে সোয়েডাগন প্যাপেগভার বিরাট সোনালি দেহ অস্ত্রধর্মের আলোর স্বকমক করছে। ছপাশে ভালের সার। বিদ্যুৎগতিতে গাড়ী ছুটেছে, পিড মিটারে চল্লিশ শব্দার্থের মাঝখানে গতির কাটা ধরবত ক'রে কাপছে। ঠা মিকে বোড বুরলো গাড়ী। তারপর আন্তে আন্তে লাল কাঁকর বিছানো। হাজার ওপর বিকে ফটক পার হ'রে গেলো।

কাঠের মোতলা বাংলা। চারদিকে লুজ খালের ব্রাহ্ম, দিলী-বিলিতী কলপাছের সার। লনের ওপরে অনেকগুলো গোল গোল টেবিল আর চেয়ার পাড়া। ছ'তিনজন লোক ঠাড়িয়ে গল্প করছে।

গাড়ী থামতেই ডাঃ বোস এগিয়ে এলেন, 'এসো, এসো লুন পে। কমল ঠিক হ'রে নিয়ে এসেছে তোমাকে।'

লুন পে একটু হাসলো।

তিনজনে এগিয়ে একটা গোল টেবিলের কাছে গিয়ে ঠাড়ালো। 'তুমি লুন পেকে নিয়ে ব'সো কমল, আমি ভিতরের বন্দোবন্দ দেখি।' ডাঃ বোস প্যাপের দু'পকেটে হাত দিয়ে বিলিতী গুপ্তবীপাছের শিঠনে মিলিয়ে গুলেন। কমল লুন পের হাত ধ'রে সামনের একটা চেয়ারে বসিয়ে দিলো।

'বেশ ভার্সার বাজীটা আপনাদের। শহরের হৈ চৈ একেবারে নেই।' সত্যিই পরিবেশটা লুন পের তারি মনে লেগেছিলো।

'বাজীটা আমার বাহুর। বাজীটা বিরাট কিছু নেই অল্পপাতে কলিন্দা আমার মোটে তিনজন, দিদিমা, বাবা আর আমি। এমন কাঁকা কাঁকা লাগে।'

'কেন আপনার বা নেই?' কথা বলেই লুন পে অপ্রস্তুত হ'রে গেলো। হি, হি, এভাবে কথাটা না জিজ্ঞাসা করলেই হ'তো। অসত্যতাই হ'রে গেলো হয়ত।

কমল খাড় কিছু ক'রে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর বখন চোখ বুললো তখন চোখের পাঁতাছুটে তারি হ'রে উঠেছে, আর ঠোট দুটো কাপছে। ঠাত দিয়ে নিজের ঠোটটা কাবছে বরে কমল ভিজে গলার বুললো, 'হা, হা আমার নেই, বানে বারা গেছেন অনেকদিন আগে, আমি তখন খুব ছোট।'

লুন পে নিজের হাত দিয়ে করণের একটা হাত চেপে ধরলো, 'কিছু মনে করবেন না, আমার কথাটা জিজ্ঞাসা করাই অজ্ঞার হ'রেছে। তবে এ বিশ্বের আমাদের অবস্থা এক। আমিও বাকি হারিয়েছি খুব ছোট বেলার।'

ফটকের কাছে গোলমালা হ'তেই দুজনে হুণ্ডে উঠিলো। একমল হেসে হুলা করতে করতে গোট পার হ'রে এলো। কমল উঠে ঠাড়িয়ে বুললো, 'ওরা সব বাবার কাজ। অন্যস' জালের ছেলো।' এগিয়ে গিয়ে কমল তাদের অত্যাধনা করলো, লবলকে চেয়ারে বসিয়ে দিয়ে লুন পের কাছে এসে ঠাড়ালো, 'আপনি একটু বসুন। আমি আসছি এখনি।' কমল ধরের মধ্যে ঢুকে গেলো।

মিনিট দুই তিন, তার পরেই দু'তিন জন ছোকরা চাকর চা আরে খাবার নিয়ে এসে টেবিলের ওপর ট্রেপুলে রেখে কারদা মাফিক সার বেঁধে ঠাড়ালো। পিচনেই কমল, ডাঃ বোস আর একটা মেয়ে কোণের দিকে টেবিলের কাছে এসে ছেলেনের বিরে গল্প ভল্লব শুরু করলেন। এখিকের ছোট টেবিলে লুন পে একেবারে একা। কিছু হ'রে চারে চুরক দিতে দিতে বেরোটির দিকে চেয়ে দেখলো। লীর্থ একহারা চেহারা, জামাবাং, বুড়ীখণ্ড ছুটি চোখ, এক বাশ কৌকড়ানো চুল থাকে থাকে কপালার ছপাশে নেনে এসেছে, লাজ লজ্জার চটক নেই। পরণে লাল ধবধবে শাড়ী, হাতে একটা ক'রে পাভলা ছুটি, এছাড়া আর কিছু নেই। বাহলাবজিত কেমন নিস্তরংগ তার। ধবধবে নিস্তরতা বেরোটিকে গিরে। কে এই বেরোটী? কথটা তো কমল বলে নি কিছু। বরেন লুন পের চেয়ে হু এক বছরের বড়োই

হবে হৃদয়, কিন্তু মুখে এমন বরষার ছাপ পড়ে নি।

ভাষ্যে হেলেনের পাঁশে বলে পড়লেন। কমল আর সেই মেয়েটি লুন পের দিকে এগিয়ে আসলো। একটা অস্বস্তি, এ সম্বন্ধে সংশয় বিশেষ পরিচয় নেই লুন পের, ঠিক কি ভাবে কথাবার্তা শুরু করা উচিত, বিশেষতঃ মেয়েটির নামনে, এসব ভেবে লুন পে চিন্তিতই হ'য়ে পড়লো।

‘এই হচ্ছে মও লুন পে, জানো দিদি, এ বছরে প্রথম হ'য়েছে সারা বর্ষা।’ কমল লুন পের পরিচয় দিতে গিয়ে উজ্জলিত হ'য়ে উঠলো।

‘তোমাকে দেখবার বড়ো ইচ্ছা ছিল ভাই, বাবা আর কমলের মুখে এসে অবধি কদিন হ'য়ে কেবল তোমারই নাম শুনিছি। তোমার মতো ছেলে নাকি আর দুজনারে নেই, মেয়েটি ছেলে সামনের চেয়ারে গা এলিয়ে দিলো।

লুন পে অস্বস্ত্য করতে পারলো কাণ ছুটো গরম হ'য়ে উঠেছে, সারা মুখে একটা তীব্র তাঁজ। মেয়েটির গলার আত্মীয়তার দূরে লুন পে গভীরত খেয়ে গেলো।

‘কি মাথা নিচু করেই থাকবে নাকি? পুরুষ মানুষ এত লাজুক কেন?’ মেয়েটি কেক আর ক্রান্ত উইচের প্লেটটা লুন পের দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বললো।

কমল লুন পের বিব্রত ভাব দেখে ছেলে উঠলো, ‘ধাকড়াবেন না। এটি হচ্ছে আমার দিদি রত্না বোশ। বাহুবকে নাড়াছাড় করাতে ওত্থা। ভারতবর্ষে থাকে, বছরে একবার দুবার পুত্রস্বং পেলে আমাদের কাছে যেড়িয়ে যায়।’

লুন পে এবার মুখ তুললো। কমলের দিদি। কমলের মুখের সংগে বিশেষ মিল নেই, আল্লাই আসে না। কথার বার্তার একটা আন্তরিকতার হোঁচট, বাহুবকে কিছুতেই দূরে থাকতে বের না। হাতের টানে নর কথার টানে দূরে বাহুবকে কাছে নিয়ে আসে।

‘আপনি তো চমৎকার ইংরেজী বলতে পারেন।’ সত্যিই রত্নার ইংরেজী উচ্চারণ শুনে লুন পে আন্দর

হ'য়ে গিয়েছিলো। ‘আংলো ইন্ডিয়ান মেয়েদের নমন উচ্চারণের ভঙ্গী, কিন্তু আরো বেশ বেলায়েন, আভোন্দ।’

‘বাংলাতে চমৎকার বলতে পারি, কিন্তু তুমি তো বুঝবে না ভাই, নইলে তোমাকে বাংলা একটা শানই শুনিতে দিতাম।’

‘বোহাই তোমার দিদি, ও ব্যক্তি করে না,’ কমল বোশ ছুটো হাত জোড় করে ফেললো, ‘এতগুলো নিমজ্জিত লোক পালাবার পথ পাবেন না তাছাড়া জানো তো বিধিবার আবার হাটের অস্থব।’

‘শুনেল আমার তো তাইটির কথা’ রত্না কপট রাগে চোখ ছুটি ঘুরিয়ে বললো, ‘আমার গান শুনেল নাকি মাহুব পালায়।’

ভাই বোনের কথা বলার ধরণে লুন পে হেসে ফেললো। বললো, ‘বিবাস করুন, আমি পালাবো না, ঠিক বসে বলে আপনার গান শুনেবো।’

‘লক্ষী ছেলে। কমলকে বহুভাষ্য করে তোমাকেই ওর জাহগার বসাবো। তুমি হবে আমার বিদেশী ভাই কেমন? মেয়েটি হঠাৎ গলার জ্বর পাগটে ফেললো, লুন পের দিকে চেয়ে বললো, ‘কি, সব কিছু যে পড়ে রয়েছে। শুধু এক কাণ চা শেষ করে পা মতলব। শীগগির খাবারগুলো তুলে নাও।’

লুন পে কথার সংগে সংগে স্ট্রে থেকে খাবারগুলো তুলে নিলো। এই রকম একটা মিষ্টি ধমকুর অপেক্ষাই বৃত্তি সে করছিলো।

মেয়েটি উঠে ডাঃ বোলের কাছে গিয়ে গাড়িতেই লুন পে কথা বললো, ‘আপনার বা নেই, কিন্তু এমন বিধি রয়েছে, আপনি কিন্তু আমার চেয়েও এ বিষয়ে অনেক আগ্রহবান।’

‘তা সত্যি’ কমল হাসলো, ‘দ্বিধা মত মেয়ে দেখা যায় না। আদরা ছুতনে একসঙ্গে হলেই ঝগড়া আর টোকাবোচি করি। কিন্তু আপনি ধারণাও করতে পারবেন না আমার ছুতনকে ছুতন কি পরিমাণ ভালোবাসি।’

‘বাগদা করতে পারছি কিছু কিছু’ লুন পে মুখ টিপে হাসলো ‘উনি কিছুদিন থাকবেন তো এখানে?’

‘ওয থাকার কথা কেউ বলতে পারে না। জীবন খেরালী, ইচ্ছে হলো তো কালই আছায়ে গিয়ে উঠবে। কমলের গলার আঙুরাজ তেলে আসলো, তবে বনে হচ্ছে এবার হয়ত কিছুদিন থাকতেও পারে।’

কিছুকণ চূপচাপ। পানের টেবিল থেকে জাং বোস আর রত্নার হাসির শব্দ তেলে আসলো। চেলেদের দল উত্তেজিত হয়ে কি তর্ক করছিলো, এতদূর থেকে শব্দ শোনা গেলো না। কমল বোস একটু আনমনা। অনেক ঘুবে কাউ আর সিলতার ওকের পাতার আড়ালে বৃষ অস্ত গেছে, ওদিকের আকাশটা এখনও লালচে। বিকেলের বিরক্তির বাতাসে বিনীতি শুভ্রী পাচের পাতাগুলো কাঁপছে।

‘হিদি চলে গেলে ভালো লাগে না কিছু’ কমল বোস দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

‘সত্যি, দায়বদা চলে গেলে শুধু তার জিহর ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়।’ কথা বলার সময় লুন পের মনে পড়ে গেলো না শিনের চিঠি আসবার সময় পার হয়ে গেছে। কেন যে এত দেরী করে মেরেটা। কি এমন কাজের চাপ। আর থাকলেই বা কাক, কাজের একটু কতি করেও তো লিখতে পারে ওর চিঠি। অল্পকাজ সুরিরে বেরবে ওর কাজ করবে, তবেই তো না চিঠি পড়ে যুথ।

‘বাইরে’ থাকলে হিদি অবশ্য টিক নিরমত চিঠির উত্তর দেয়, কিন্তু তেলে তো আর ভেনন সুযোগ সুবিধা বিশেষ নেই।’

লুন পে একটু আনমনা হয়ে পড়েছিলো। গল্প শব্দ বাল বিল পার হয়ে মনটা অনেক ঘুবে চলে গিয়েছিলো ফেলে আসা গায়ের বাগিতে কমলের কথাগুলো টিক বুকে উঠতে পারলো না। কমলের দিকে কুঁকে পরে বললো, ‘কি সুবিধা হয় না বললেন?’

‘বাসে বছরের মধ্যে আট মাস হিদিকে জেলের ভেতরেই থাকতে হয় কিনা, সেখানে খুব কড়া নিয়ম।

বাসে দু একখানার বেনী চিঠি লেখবার ক্ষমতা নেই, তাও নিজের মনের কথা লেখবার তো আর উপায় নেই।’

লুন পে নড়ে চড়ে নোজা হয়ে বললো, ‘জেলে? কেন জেলে থাকতে হয় কেন?’

‘হিদিকেই জিজ্ঞাসা করবেন’ কমল আলতো উত্তর বললো, ‘ওই তো হিদি একিকেই আসতে।’

লুন পে চোখ ফিরিয়ে দেখলো, সত্যিই রত্না বোস চেয়ার ছেড়ে ওদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

‘কি খবর। দুই বছরে কি গল্প হচ্ছে?’ রত্না লুন পের পানের চেয়ারে বসে গড়লো।

‘আপনার কথাই হচ্ছে।’ নিজের অজান্তেই কথাটা লুন পের মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

‘আমার কথা? বটে?’ রত্নার সারা মুখ অল্পকণের জল্প রক্তির হয়ে উঠলো, ‘নিকে হচ্ছে। বুকি?’

কমল হাসলো, ‘তোবার কেন জেলে থাকতে হয় মত লুন পে তাই জিজ্ঞাসা করছিলেন।’

ভাই নাকি রত্না ভূক দুটি ভুলে লুন পের দিকে চাইলো, ‘জেম ছাড়া কোথায় থাকবে বনো? ইংরেজের জেল স্বত্তরবাড়ীর চেয়েও লোভনীর জায়গা, অবশ্য আমাদের স্বত্তরবাড়ী, ভোমাদের স্বত্তরবাড়ীর খবর জানি না। কি বিশ্বাস হলো না বুকি?’

‘আপনার কথাগুলো টিক বুকে পারছি না, লুন পে শব্দ কথাই বলে ফেললো, আপনি জেলে থাকবেন কেন, আপনি চোর না ডাকাত?’

‘তার চেয়েও চোর বেনী।’ রত্না হাসতে হাসতে বললো, ‘ইংরেজের আইনে চোর ডাকাতের চেয়েও আমরা তরানক জীব। তাদের তবু বিচার আছে অবশ্য। বিচারের ভুড়ৎ আছে একটা। কিন্তু আমাদের বেলা একবার দুঁতে পারলেই হলো, হিড় হিড় করে ঠেলে হাজতে পুরবে বিচারের বাগাই নেই।’

‘কিন্তু আপনাদের অপরাধ?’

‘অপরাধ, আমরা বেশকি ভালোবাসি। সাত ময়ূর ভের নরী পার থেকে এগে বাহা যোশের বুকে বলে দাড়ি ওপড়াচ্ছে তোযের চিনে কোলোই এই অপরাধ।’

প্রথমে বেশ বেলাটে তারপর একটু একটু করে সন্ধ্যা ব্যাপারটা বহু হয়ে আসলো। সুন পের কাছে। এসেবের সন্ধ্যা ওদের লোকেরাও তো পরানীন, তবে এ বিষয়ে এদের লোকের চেয়ে শুধা আরো বেশী সচেতন। খবরের কাগজে মাকে মাকে সুন পের চোখে পড়েছে। তারতবর্ষ পুলিশের জুনিয়র। বোম্বা বাক্সের সন্ধ্যা এলোপাখাডী খানাতল্লাসী আর অভিযাচ। ও পেরের ভেলেদের বেশকোটা মনোবৃত্তি। পুলিশের জুনিয়র লামনে আর কুঁদার মকে হাসতে হাসতে এগিয়ে যাওয়া। বিশর বিবরণ নয়, খুব গোড়ি করে খবরের কাগজের এককোণে ছোটকো ছোটকো খবর। বলা বাহ নাকি পাশাপাশি বেশ, একজনের খবর যদি ভেঙে ওঠে আর একজন। একজনের বোখাধেখি আর একজন যদি এগিয়ে আসে মরণ পণ করে। ছোক না হেইটি খবর, এক টুকরো আঙনের ফুলি কিছুর জালাবার কনভা কন নাফি তার। খবর আড়কাঠি পর্যন্ত পৌছে গোট। ঘরটাকে করে কুটো ছাই করে দিতে পারে। কিন্তু এ সংগ্রামে মেরেরাও এগিয়ে এসেছিলো। এ খবর সুন পে কোথাও পার নি। আশ্চর্য, মেরের দলও কাঁপিয়ে পড়তে পারে এ আঙনে। না পিন, আর মা টিনের দল রকতার হলে এগিয়ে আসতে পারে শিকল হেঁড়ার এই সংগ্রামে। ওদের পাশাপাশি টান হবে কাঁড়িয়ে বলতে পারে চীৎকার করে, আমাদের দেশে আমাদের বাঁচতে দাও। তোমাদের মুক্ত হাত সরিয়ে দাও আমাদের শশন থেকে, তোমাদের কলুবুড়ী অপসারিত করে। তাবজের সুন পের সারা গা শিউরে উঠলো।

'কতদিন এ লড়াই শেষ হবে বলতে পারেন? কতদিন লড়াইবেন আপনারা?' সুন পের মনে হোঁট একটা সকেছের কথা। আচ্ছ ব'লে নয়, মাঝে মাঝে বখনই এ প্রশ্নের কথা মনে হরোছে, ওর মনে এসেছে এই চিন্তা। একদিকে ইংরেজের সশস্ত্র শক্তি, তাদের বিরাট আত্মগার, আর একদিকে মুষ্টিযোদ্ধা কয়েকজনের মরণ ব্রত। এই অসম বুদ্ধ কতদিন চলতে পারে?

'কি জানি তাই কতদিন চলবে' রত্না হাত দিয়ে কপালে অর্ধে ওঠা খাবের কিছু বুঝে নিলো, 'কতদিন না ওদের শেষ লোকটি পর্যন্ত আমাদের উপস্থল জেড়ে যাবে। একটা বাহুবলক হস্ত বস্তুর বুলেটে শেষ করে দেওয়া বার কিছু-তার প্রেক্ষকে প্রেরণাকে তপস্বাকে নষ্ট করা যায় না তাই। তাদের রক্ত যে মাটিতে পড়ে যে মাটিতে হাজার শহীদ জন্মায়, তাহলে তব যে দেশে ছড়ায়, সে দেশে হাজার সৈনিক গড়ে ওঠে।' শেষ দিকে রক্তার পদার আওতাধ বহু হ'রে আসলো। সুন পের মনে হ'লো, চোখ দুটো কিনে হোঁদার জল জল ক'রে উঠলো। মুষ্টিযুদ্ধ ছুটি হাত কেঁপে উঠলো খব খব করে।

'কিছ মেরেরের কোলে ধ'রে রাখে কি ব'লে? সুন পের লম্বা হ'লো না, 'মেরেরের ওপর অভিযাচার করতে ওদের বাধে না।'

রত্না এবার হেসে উঠলো, 'তারি লরল মন ওদের। তেজ নীতির বালাই নেই। এই দেখ না' রত্না হাত দিয়ে কপালের বাঁ পাশের চুলগুলো সরিয়ে দিলো। ইকি ডিনেক আত্মগা জুড়ে গভীর কনভ। চারপাশের বাংলাগুলো উঁচক রয়েছে।

'মিস' সুন পে চনকে উঠলো, 'একি পুলিশের বুলেট?' 'না, এমন আত্মগার পুলিশের বুলেট হ'লে রত্না বোলকে অক এখানে ব'লে বিশেষী তাইয়ের সংগে আর কথা বলতে হ'তো না' রত্নার হুঁশের হাসি দিলো না, 'বুলেট নয়, লাঠি। বছর ছুরেক হ'রে গেছে। জালাটা রয়ে গেলো আর লাগটাও গেলো না।'

সুন পে অস্থভবে বুকতে পারলো নিজেব গায়েব পোষগুলো বাড়া হ'রে উঠেছে। আপনা থেকেই হাত দুটি মুষ্টিযুদ্ধ হ'রে আসলো। মনে হ'লো রক্তার কপালে নয়, লাঠি এসে পড়েছে সন্ধ্যা পরানীন আত্মগার লম্বাটে। এ দাগ মুছবে না, মোছবার নয়, কতদিন না ওদের লাঠি আমাদের হাতে আসে।

কমলের দিকে চোখ ফিরিয়েই সুন পে অবাক হ'রে

গেলো। হুতমিতে ছুটো হাত-রেবে পাখরের মূর্তির
বসন বস্ত্রার দিকে চেয়ে কবল চুপ কর'রে বসে রয়েছে।

কিছুক্ষণ ভিন জনেই চুপচাপ। ডাঃ বোস আর
হেলেনের ভর্তীর আগ্রহ্য কেসে আনলো। অনেক দূর
থেকে রক্ত তালিখার ডাক শোনা গেলো। কবল
বাগানের আলোটা অঙ্গে উঠেছে লুন পে খোয়াল
করে নি।

‘এবার উঠি,’ লুন পে চেয়ার হেড়ে গাড়িয়ে উঠলো।

‘বাবেন? গাঁতান বাবাকে ভেঁকে আনি’ কবল
ওদিকের টেবিলে চলে গেলো।

টেবিলের হুপাশে জ্বলন বস্ত্র আর লুন পে।

লুন পে লোকা চাইলো বস্ত্রার দিকে, ‘গড়াইয়ের এই
শুক? এখনও অনেক অনেক বছর লাগবে নিশ্চয়?’

বস্ত্রা মুখ তুললো। ‘কত চিহ্নটা চুলে ঢাকা পড়ে
গিরেছে। বোকাই বার না, অত গভীর একটা কত
বস্ত্রা ব'রে বেড়াচ্ছে। বললো, ‘অনেক বছরের কবানো
কালো কিনা, স্নায়ের সংগে একেবারে লেপটে গেছে,
কেড়ে ফেলতে সময় একটু নেবে বই কি তাই। কিন্তু
এ সংগ্রামের মুক নর, সংগ্রাম মুক হ'রেন্ধে আনামের
বেশে অনেক বছর আগে। জুনি তো ইতিহাসের
ছাত্র। আঠারো শো সাতার সাল নিশ্চর ভোলো নি।
আমরা সেই সংগ্রামের জের টেনে চলছি। হেঁচা

পুল, নেকাও শক্ত নর, তার গুপ্ত হাওয়াও কিছুটা
একটু, কিন্তু তবু বনে হচ্ছে পাণ্ডে আনাম। একদিন
পৌছবোই। মুখের কথা নয় লুন পে, এ আবার অস্ত্রের
বিবাদ।

লুন পের অবস্থি লাগলো। মনে হ'লো সত্যিই
বস্ত্রা বোসের একোন নিছক কীকা কথা নয়, প্যাগোডার
দিকে মুখ কিরিয়ে এবেশের বাড়িতে গাড়িয়ে নতুন ক'রে
বোন স্বাধীনতার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করলো, বজের বস্ত্রা
আঙড়ালো বেয়েটি। এ দেশের বাড়িতে গর লাল,
এ দেশের বাতাসে গর দীর্ঘশ্বাস ছড়িয়ে পড়লো।
লাগরের ওপারে অস্ত্র এক উপস্থলের মেয়ের অদৃষ্ট মরে
এ দেশেরও দুখ ভাজুক। পরাধীনতার নাগপালে

বেবনামজর দেহে কাতকজি উঠুক। অদৃষ্টব কবল এরা
আমরাও পরাধীন, আমরাও পরানত।

ডাঃ বোস এসে গাড়িতেই লুন পে সামলে নিলো
নিজেকে। ‘ভোমার সংগে কথাই হ'লো না মুন পে।
ওদের পরিচয় পড়ে ওদিকে আটকে গিয়েছিল। কিছু
মুখে গিরেছো তো।’

‘আজ্ঞে হ্যাঁ, বখেই বেরেছি। কবল আর বস্ত্রা বোস
সব সময় সংগে ছিলেন, কোন অস্থিবিধা হয় নি।’

‘আলাপ হ'রেন্ধে বস্ত্রার সংগে’ ডাঃ বোস একটা হাত
বস্ত্রার পিঠে রাখলেন, ‘এই বেরেটি কবল আনো
লুন পে? হাড়ই বাজী বেবেছো? বাড়ির লোকে
পড়ে, বাড়ির লোকে আশুন ছোয়ার, বাস, তারপর হাড়ই
আর বাড়িতে থাকে না, আশুন হুড়োতে হুড়োতে আকাশে
চলে যায়, কোন দিন যে বাড়িতে ছিলো মনে করাই
যায় না।’ শেষ দিকে ডাঃ বোসের কথাগুলো একটু বরা
বরা। লুন পের মনে হ'লো আশুন হুড়োতে হুড়োতে
আকাশে উঠে নিলে মুড়ে ছাই হ'রে যায়, এই বরণের
কথা বলতে গিরেই ডাঃ বোস বেন সামলে দিলেন
নিজেকে। নিশ্চিত পরিণতির কথাটা ভেপে গেলেন।

বস্ত্রার মুখের দিকে চেয়েই লুন পে অবাক হ'রে
গেলো। ভিমিত কান মুখের শব্দ ছুটি চোখ, ঠোঁটের
কোণে হাসির কিলিক। আশুন ছোয়ানোর আগের
মুষ্টি, বাড়ির হাড়ই, বুকি অঙ্গে গুঠবার আগের অবস্থা।

বিদায় নিয়ে লুন পে কটক পার হ'রে রাস্তার এসে
গাড়ালো। ‘চলুন আপনাকে চোরাস্তার বোড় অবস্থি
পৌছে গিয়ে আনি।’ কবল লুন পের পাশে এসে
গাড়ালো।

এদিকটার লোকজন কম। মাঝে মাঝে বিহুয়
গভিতে দু একটা খোঁটার ছুটে চলেছে। দু একটা বাড়ী
থেকে পিরানোর সংগে ইংরেজী গানের স্বর ভেসে
আনছে। পবচারীঘের দেখে বেড়ার ওপাশ থেকে
হুহর থেকে উঠেছে। মিলিত হুহর, মেশী লোক
বরদাও করতে পারে না।

(শেষাল ১৮০ পৃষ্ঠার প্রটীবা)



দ্বিতীয় অঙ্ক

[প্রথম অঙ্কের সারাগ্রন্থঃ—কীথির পুত্র তীরবর্তী শ্রীপুর গ্রামে মহাভারত বাইতি একজন সম্পন্ন চাষী। ১৯০৫ সনে বর ভক্ত আন্দোলনে ১৯১১ সনের ভিগেছর মাসে বর-ভক্ত-রূপে পর্ববসিত হয়। মহাভারত কিছু রাজভক্ত প্রজাই ছিল। সে দক্ষিণার নারায়ণের সহিত ভাষারই কথা তুলসীর বিবাহ দেয়। কিন্তু বাঘের ঘরেই যোগেশ বালা। মহাভারতের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম কলিকাতার 'বৃন্দাবন' পত্রিকা অফিসে পিরনের চাকুরী করিতে করিতে বিপ্লবীদের দলে যোগদান করে। সে পিতামহ্যের সহিত হুকাইয়া দেখা করিতে আসিলে ভাষার মাতা গঙ্গা দানীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও পিতা মহাভারত তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেয়। কিন্তু পুত্রের এই গৃহ-ত্যাগে মহাভারতের মনে দেশাত্মবোধ আগ্রস্ত হয়।]

[১৯২১ সালের এপ্রিল মাস, সকাল বেলা, মহাভারত চতুর্থমণ্ডল প্রাণগনে বসিয়া হুকা টানিতেছিল, যেন ছেলে নিবিরাম আসিয়া বসে দিল—নারায়ণ ও তুলসী আসিতেছে]

নিবিরামঃ বাবা—দাদি এসেছে, জামাইবাবু এসেছে, ঘোড়ার চড়ে নর গরুর গাড়ীতে।

মহাভারতঃ তোমার জামাইবাবু দক্ষিণার বলে ঘোড়ার চড়ে বেড়ায়, তাই বলে তোমার দিকিও ঘোড়ার চড়িয়ে আনবে? এক মেয়ের বাপ হয়েছ—এখনো তোমার ক্যাকলাপনা গেল না। জামাই-বয়ে আসছে, বাঙ তোমার মাকে নিয়ে বলা।—

নিবিরামঃ তা বলছি। কুমি বাবা এবার জামাই-বাবুকে একটু ধর—না হোক আমাকে একজন চৌকিদার করে দিক। আঃ চৌকিদার হতে পারলে গাঁয়ের লোকের আমি সব বেগে নিতাম।

মহাভারতঃ চৌকিদার! তিন ডুংকা যেতন! তাও আবার লোকে চৌকিদারী টাংকো বেবে না দিক করেছে উনি চৌকিদার হবেন!

নিবিরামঃ হবেই হবে—বেগে নিত।

[এমন সময় সঙ্গী নারায়ণ দক্ষিণারের প্রবেশ। উভয়েই মহাভারতকে প্রণাম করিল]

মহাভারতঃ এসো বা, এসো বাবা, এসো।

নিবিরামঃ (চীৎকার করিয়া) বা শিগ্গীর এসো জামাইবাবু এসেছেন। (নারায়ণকে) জামাইবাবু পেয়েছেন হই।

[ধূপ করিয়া নিবিরাম নারায়ণের পায়ে ধূলো লইল, গংগাও নিবিরামের স্ত্রী লক্ষী আসিয়া গাড়াইল, লক্ষীর আঁচল ধরিয়া আসিল ভাষার পাঁচ বছরের বৈরী ছেলে]

মহাভারতঃ (নারায়ণকে) তোমরা ভালো আছে তো বাবা?

নারায়ণঃ ভালোও আছি, আবার নাইও।

নিবিরামঃ জামাইবাবু আপনার ঘোড়াটা কেমন আছে? মরে যায় নি তো?

নারায়ণঃ মরবে? মরবে কেন?

নিবিরামঃ (হাত বাহির করিয়া হাসিল) গরুর গাড়ীতে এলেন কিনা তাই।

তুলসীঃ (অবাক দেখাইয়া) ওমা, মেঘনার মেয়ে

এতো বড় হয়েছে ? ওর নাম কি বেখেতো না ?

গংগা ॥ ও আমাদের 'মহা'—মা। মঙ্গলচৌর
পায়ের তুল। আর না হবে আর।

[তু নারায়ণ ও মহাতারত রহিল, আর সকলে
ভিতরে ঢিলা গেল]

মহাতারত ॥ গাঁয়ে তো বন্ধ গুণগোল বাবাণী।
সরকার থেকে ইউনিয়ন বোর্ড বসছে। চৌকীদারি
ট্যাক্সো হয়েছে বশস্ত। যে দুর্ধীন পড়েছে, তাত কাগজ
জোটানই দার—এতো ট্যাক্সো লোকে দেখে কি করে ?

নারায়ণ ॥ আপনিত কি ঘেবেন না ট্রিক করেছেন ?

মহাতারত ॥ কেন বেবো বলতে পারো ? লাভটা
আমাদের কি ?

নারায়ণ ॥ নোকেরা নিজেদের ইউনিয়নে নিয়েরাই
কর্তা হবে, পথঘাট করবে, স্থল করবে, হাসপাতাল
করবে। লাভ নয় ?

মহাতারত ॥ সে বা হবে জানি। চৌকিদার
দকারের বেতন মিটেই সব টাকা উড়ে যাবে।

নারায়ণ ॥ আপনি বুঝছেন না।

মহাতারত ॥ বেশ, আমি না হয় বুঝি না, কিন্তু
বীরেন শাস্ত্রীমল্লঃ কি বুঝবে না ? অতবড় বিলাতের
পার্শ্ব করা উকিল, অতবড় জমিদার, অতবড় বি,এ, এম,এ
পাশ, দেশের একটা বাবা—সেও বুঝে না ?

নারায়ণ ॥ তিনিই তো গুণগোল পাকিয়েছেন।
বুঝছেন কই ?

মহাতারত ॥

ভূমি নও বাপু।

নারায়ণ ॥ বেশ, কিন্তু এই ইউনিয়ন বোর্ডের ট্যাক্সো
আমাদের জন্য অনেক বন্ধুকারী পুলিশ আমদানী
হয়েছে। সে খবর রাখেন কি ?

মহাতারত ॥ খুব রাধি। পালা বটি বাটি গর
বাড়ি পাট বিছানা এত ক্রোক হয়েছে যে, তিনিবের
একটা পাহাড় অবশে উঠেছে।

নারায়ণ ॥ তাহলেই যেপন, লোকের কি কতিটাই
হোল।

মহাতারত ॥ কতি—কিছু না। বেবানকার মাল
সেখানেই পড়ে আছে। সরকার এ সব মাল বধন
নীলামে চড়াশো ওরন গোটা কাঁচি মহকুমার নীলাম
ডাকবার অত একজন গোঁকও এগিয়ে আসেনি। বোক
ঠেলা।

নারায়ণ ॥ আমরা বুঝি। এইবার আপনিও একটু
বুঝুন। এই ক্রোক পরোয়ানাটা যেপন। আমাই হবে
বক্তরের সম্পত্তি ক্রোক করতে না হয়, তাই চৌকিদার
সহরে রেখে আমি আগেভাগেই এসেছিলাম। এখন
শেব কথাটা বল দিন।

মহাতারত ॥ শেব কথাটা এখনো মুখে বলতে
হবে, খালি পা রেখে বুঝ না। বাড়ীতে কোনরিন
জুতো পরি নি ট্রিক—কিন্তু একতোড়া বড়ম তো পারে
ধাকতো। সে বড়ম কৈ ? ঐ বেব।

[এই বলিয়া বারান্দার লটকানো বড়মের দিকে
নারায়ণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল] তুলছে !

নারায়ণ ॥ ব্যাপারটা কি বুঝলাম না তো বক্তর
মশাই !

মহাতারত ॥ বার বছর দফাদারী করছ, আজ
বুঝেছি এত দিনেও কেন দারোগা হতে পারো নি।
বীরেন শাস্ত্রীমলের সংগে সংগে অনেকই পণ করেছে
—এ দুহুকে বতদিন ইউনিয়ন বোর্ড থাকবে ততদিন
সবাই খালি পারে থাকবে—এ কথাটা যেন নি বুঝি ?

নারায়ণ ॥ ও, তবে আপনি সেই খালি পারের দলে ?
তা ভালই। যেখনি আপনি আমাকে দারোগা না
করে ছাড়বেন না। বক্তরের সম্পত্তি ক্রোক করতে
পারলে আমার দারোগা হওয়া কেউ রুখতে পারবে না।
বেশ, ক্রোক বধন করতেই হবে তখন চৌকিদারদের
ডাকি।

মহাতারত ॥ কি ক্রোক হবে ?

নারায়ণ ॥ কেউল—যানে গর বাড়ুর।

মহাতারত ॥ গর বাড়ুর ! (হাসিয়া) তা কিছ।

কিন্তু খেতে বসে ছ না পেলে বেশ আমার রাগ করো

না বাবাভী। চলো। ঝড়কে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি না করে আমার লগ্নে চুপটি করে এসো দেখি।

নারায়ণ ॥ চুপটি করে? কেন?

মহাত্মারত্ন ॥ গরু বরতে এসেছ জানামানি হলে তোমাকে জানাই না বলে কসাই বলবে যে লবাই। এসো এসো—গোরাল বাড়ী এসো।

[উভয়ে বাহিরের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু শুধনই মহাত্মারত্ন নারায়ণকে একরূপ টানিরাই লইয়া আসিল]

নারায়ণ ॥ একি! ব্যাপার কি!

মহাত্মারত্ন ॥ উঃ খুব বেঁচে গেছ বাবাভী; ইঃ অল্পের অল্প বরা পড়নি, বরা পড়লে (মিত কানড়াইয়া)

নারায়ণ ॥ বরা পড়লে! মানে!

মহাত্মারত্ন ॥ তোমার ঝাড়ুড়ি ঠাকরুণ নিজে ছব পানাজেন তোমার অল্প গোরাল ঘরে। বাটের শব শুনেই আমি বুঝি কি না! তাই ঘোর থেকেই তোমার টেনে আনিলাম।

নারায়ণ ॥ কি—

মহাত্মারত্ন ॥ কিন্তু টিঙ্ক কিছু নেই। উনি চলে গেলেই, তোমার গোরাল ঘরের পথ খোলসা। কিন্তু ধবলদার জানাজানি না হয়। ব্যাপারটা নিশ্চুপ সমাধা করবে। এই গাঁয়ে আর কোন বাড়ীতে গোশন হরণ হবে বাবাভী?

নারায়ণ ॥ গোশন হরণ মানে? আমি কি গরু চুরি কর্তে এসেছি?

মহাত্মারত্ন ॥ এই এই! হলো তো! সরকারী কাজে মাথা গরম। তবেই ছুটি দারোগা হয়েচ। দিছি আমি সব ব্যবস্থা করে দিছি (উচ্চ কর্তে)। আরে ও নিবে, এই তুলসী বিন ছুপ্তে তোরা সব বুঝিতে পড়েছিলি নাকি? শুকনো হুখে জানাই এখানে বসে আছে—দুধ সরব টরবৎ নিয়ে আর।

নারায়ণ ॥ না, না, এ সব কি হচ্ছে। আমি কিছু খাবো টাবো না—কিনে নেই।

মহাত্মারত্ন ॥ আরে বাবা, টেটামেতি না করলে

তোমার ঝাড়ুড়ি ঠাকরুণের ঘান ভালবে না। ওর দুখ পানানো, সে এক ভগল্লা! তোমারি ঘের হবে। আর, কিনে নেই কি হে! বরসকালে বখন আমরা বস্তুরবাড়ী বেতাম, হুখে লবাই বলতো জানাই, মনে মনে বলতো রাক্ষস।

[গংগা সেখানে আসিয়া ঠাড়াইল, শিছনে ঠাড়াইল তুলসী।]

গংগা ॥ এসো বাবা...একটু ছুপটুপ খাবে এসো।

নারায়ণ ॥ না, আমি কিছু খেতে টেতে পারবো না।

গংগা ॥ কেন?

নারায়ণ ॥ না, আমার শরীরটা ভালো ঠিকছে না।

গংগা ॥ তবেই হয়েছে। এদিকে নিবে একটা খানি কেটেছে, আমার এখন গিরে পুতুরে ভাল ফেলেছে।

নারায়ণ ॥ (চট্টয়া গিয়া) এমন বজ্র ঝাড়বাড়ি হচ্ছে, আমি খাব না—খাব না—আমি এখানে খাব না—আমার কাজ আছে।

মহাত্মারত্ন ॥ ই্যা কাজ আছে। [নারায়ণকে ইদিত] ই্যা এই সময় এসো।

[নারায়ণ স্বরের বেগে বাহির ছইয়া গেল।]

গংগা ॥ ব্যাপার কি?

মহাত্মারত্ন ॥ জানাই তোমার নীশ্বরই দারোগা হবে, এটা দারোগা-গিরি মেজাজ, এমনি সেখনি, এইবার দেখবে।

[এইবার তুলসী আগাইয়া আসিল।]

ইয়ারে তুলসী, তোমার হাতটাও ভালো না তো? তুলসী ॥ আমার গায়ে হাত তুলবে? আমি মহাত্মারত্ন হাইতির ঘেরো না? যেদিন গুপ্তরজারার কাছে লাঠিরাটা খায়—সেদিন ওর এমনি মেজাজ হয়, আজ এই গাঁয়ে কি সব জোক করতে এসেছে। মেজাজ তাই তিরিকি হয়েই আছে।

[নেপথ্যে গাঁয়ের গায়েন ঐশ্বরের গান শোনা গেল।

গাহিতে গাহিতে সকলবলে ঐশ্বরের প্রবেশ]

শ্রীধর । এই যে মহাকায়তন্য, এই যে বৌঠান,
এই যে ভুলসীও হয়েছিল ! আরে নিবিতান যে ! না না
হাতে আর খাঁড়ি ধরো না । বেশে নতুন ভাবের নতুন
জোয়ার এসেছে । বলকাতা থেকে—নাগপুর থেকে
আমি সেই জোয়ারের এই গায়ে তালতে তালতে
এসেছি—

[শ্রীধর সদশবলে গাহিতে লাগিল ।]

এসেছে নতুন বাহুধ

তোরা কি জানিস নাহে ?

তনিস নি কি ?

বেশের নতুন ভাবের

আসলে জোয়ার

শে পাক্বী !

তনিস নি কি ?

উনিশ-শ-উনিশ সনে

হলো। রাউলাট

আইন প্রচার ।

লোকের হৃদয়ে আটক

ধরে খেয়াল মত

না করে বিচার ।

গাক্বী বলেন ভেকে

বে-আইনি আইন

আমরা মানবো

শ্রমের প্রতিবাদি ?

উঠলো হেঁকে

মানবো না মানবো না—

তনিস নি কি ?

ভাষার, ভ-ভাষার মিলে

জালিয়ানওয়ালা বাগের

গুকনে ডাকা—

নরনারী শিক্ত যেরে

তলী করে করলো

রক্তে রাতা ।

উনিশ-শ-উনিশ সনে

করলো রক্তে রাতা)

জড়িয়ে গেল দেশে

আর্জনার দিকে দিকে

শে ছাটাকার ।

গর্জে উঠলো লকে—

জালিয়ানওয়ালা বাগের

চাই প্রতিকার ।

(বিলাকতের অবিচারের

চাই প্রতিকার)

তনিস নি কি ?

উনিশ-শ-বিশ সনে রে

কংগ্রেসের অবিবেশন

নাগপুরতে ।

গাক্বী বলেন হেঁকে

নন্ কো-অপারেশন

চালিয়ে যেতে ।

(অসহযোগ আন্দোলন

চালিয়ে যেতে ।)

চিন্তারজন আর

মিল তার লাগপৎ রাহ

শে গজাবে ।

সারা দেশে মিল লাড়া

অসহযোগ আন্দোলন

চালিয়ে বাবে ।

(নন্ কো-অপারেশন

চালিয়ে বাবে ।)

তনিস নি কি ?

অহিংসার যজ্ঞবলে

বিলবীরা হিংসা ভুলে

জুটলো পতাকা তলে)

(কংগ্রেসের পতাকা তলে)

উকীল ছেড়ে গুকাবতী

গোলামখান্না হেঁড়ে এল

ছাত্রদলে ।

অদ্ভুত যুকে নিরে

গাভী বলেন দেশের কাছে

কেউ অণুচি নয় ।

কারা-তর ফুঙ্ক করে

চরকা হাতে লবাই হাঁকে—

ঘর গাভীর ঘর ।

তুলি নি কি ?

মহাত্মারত্ন । তুলি—তুলি—এসব কথা কিছুদিন থেকে তুলি । গাভীর কথা লোকে খুব বলছে বটে । লোকটির যা হোক বুদ্ধি আছে । আমাদের রামবাবুরা সব লড়াই করছেন—চাল নেই তরোরাল নেই নিধিরাম সর্দার । এঁর পুত্র বেথুছি আলাপা পুত্র—সোজা পুত্র ! তোমার চৌকিবার দফাদার হারোগা কে ? আমরা । তোমার সৈন্ত সামন্ত কে ? আমরা ! তোমার উকীল মোজার কে ? আমরা । তোমার চাকর-বাকর কে ? আমরাই সব । আমাদেরই ছাত্রছাত্রীরা গোলামখান্না পড়ছে, পাশ করে গোলাম হচ্ছে । আমরা যদি সব গরে ঠাড়াই—হাত গুটিয়ে নি—কোথার ঠাড়াবে তুমি বিদেশী তাই ? ভরীভরী গুটিয়ে এখন বিলেতের টিকিট কাটতে হবে না ? খুব বুদ্ধি বের করেছেন গাভীকী । বেঁচে থাকুন গাভীকী । উনি পারবেন ঐধর, উনি পারবেন ।

ঐধর । এই ওশে ভিলেথের মতোই অরাজক আসনে—গাভীকী বলেছেন । তার অল্প তিনি দেশবাসীর কাছে চেয়েছেন কংগ্রেসের এক কোটি টাকা, ভিলক স্বরাজ্য ভাঙার এক কোটি টাকা । আর চেয়েছেন—সবাই অস্পৃহতা ছাড়ে—স্বদেশী ধরো—চরকা চালাও ।

“তোমার গান গায় চরকার শোন তাই !

খেঁই নাও, পাঁচ দাঁড়, আমরাও গান গাই !

ঘর-বার করবার দরকার নেই আর,

মন সাঙ চরকার আপনায় আপনায় ।

চরকার ঘর পড়শীর ঘরঘর

ঘর-ঘর কীর সর—আপনার নির্ভর ।

পড়শীর কণ্ঠে কাগলো লাড়া

ঠাড়া আপনার পায়ে ঠাড়া ।”

[সত্যেন্দ্র দত্ত]

[গাছিতে গাছিতে ঐধরের গ্রন্থান । সংগে সংগে অজ্ঞাত সকলেও হাজতম হইল । রইল শুধু গংগা ও মহাত্মারত্ন । নিধিরামকে ঐধরের পশ্চাতে ছুটিয়া যাইতে দেখিয়া মহাত্মারত্ন তাহাকে বাধা দিল]

মহাত্মারত্ন । এই, কোথায় বাজিল ?

নিধিরাম । ঐধর কাকা গ্রামে ফিরে এসেছেন, আমাইবাবুকে বববটা দিয়ে আনি ।

মহাত্মারত্ন । গোয়েন্দা হয়েছ ! গোয়েন্দা ! দেশের লোক বাচ্ছেন এক দিকে, ওরা বাচ্ছেন আর এক দিকে । শালুক ভিনেছেন গোপাল ঠাকুর । ওসব হেঁড়ে ক্ষেত-খামারটা ঘর বেধি, চাকরিতে পেট ভরবে না ।

নিধিরাম । ক্ষেত-খামার দেখতে বলছো—দেখছি । তাই বলে চাকরিতে পেট ভরবে না বিদেশী । আমাই বাবুকে দিয়েই তো দেখছি । যেমন-তেমন চাকরি বি-ভাত ।

[নিধিরাম অন্যরে চলিয়া গেল]

মহাত্মারত্ন । বি-ভাত না বিব !

গংগা । কিন্তু তুমিও একদিন বি-ভাতই তাবতে ।

তাই না বেয়েকে বঙ্গানারের হাতে দেবার অল্প পাগল হয়েছিল । শিবং, ভালো মন্ড ওরাও শিবং । তবে ঠেকে শিবং । তুমি যেমন শিবং ।

[সুবিপ্লব হাতে নিয়া ছোট ছেলে বলরাম ও এক রাস খন্ডের ধান কাঁখে ফেলিয়া বড় ছেলে রাম বাড়ীতে হুকিল]

মহাত্মারত্ন ও গংগা । (বিস্ময় ও আনন্দে) তোরা ? রাম । হ্যাঁ, আমরা । আমার কাজকর্ম, ঐমানের লেখাপড়া সব লাগে হোল ।

[বলরাম বইগুলি বাগান্দায় ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল]

মহাতারত। ব্যাপার কি? গাড়ীখীর হাওরায় উড়ে এসে বুকি?

বলরাম। ইঁয়া বাবা, মন-কোঅপারেশন।

গংগা। সেটা আবার কি?

বলরাম। মন-কোঅপারেশন মানে—

মহাতারত। লংকাগ্রাশন। মানে—লংকা দখল, মানে রাবণ-রাজ্য আর থাকবে না। (রাবকে) কেন—এই তো?

রাম। কথাটা মিথো নয়।

মহাতারত। এই লংকাগ্রাশনে তুল কলেজ সব খালি হচ্ছে শুনেছি। বলরাম বাবাজী যে ভাবে পুঁথিপত্র ছুঁড়ে ফেললেন, বুঝলাম, সেই হাওরাতোই উনি উড়ে এসেছেন। (রাবকে) কিন্তু তুমি বাবাজীতো ভেলে ছিলে, আমার ধরনের খাতার লিখে রেখেছিলেন কিন্তু হঠাৎ আমার খাতার কি ক'রে ঢুকে পড়লে বল বেথি?

রাম। কিছুদিন আগে রাজ্যের পুড়ো আমাদের বেশে 'হু' এয়ার্লিন্স শাসন' চালু করলেন, তারই কল্যাণে বৈশ্বকোশ ট্রান্সবীরাই ছাড়া গেয়েছি। জেলের বাইরে এসে দেখলাম মহাত্মা গাড়ীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সারা দেশকে নাতিয়ে তুলেছে। ভারতের বিরাট জন সমুদ্র যেন অকুলে তুল গেয়েছে। দেশের সবচেয়ে বড় ব্যারিটার সি আর দাশ—চিহ্নরঞ্জন দাশ—দায়িক রোগাঘার ছিল ঝাঁর মাত্র পকাশ হাজার টাকা—

মহাতারত। মাত্র পকাশ হাজার টাকা, ওরে বাবা!

রাম। ব্যারিটারী তিনি ছেড়ে দিয়ে এই অসহযোগ আন্দোলনে নেতা হয়েছেন। তাঁর কথাকে বিলবীরও অনেকেই কংগ্রেসের পতাকাভঙ্গলে এসে ঝাঁড়িয়েছেন।

মহাতারত। হিংসার পথ থেকে একেবারে অহিংসার পথে? বলিহাতি গাড়ীখী।

গংগা। বাছ টাছ সব খাওয়া বেড়ে বিচেড়িল্ বুকি?

রাম। না বা, কিছুই ছাড়ি নি। তবে ইঁয়া—

বেল্লা বন্ধুগুলো! আপাততঃ শিকের তুলে বেবেছি। গ্রামে কাজ করবে বলে চলে এলাম। কাঁথিতে এসে দেখি শাসনাল সাহেবের অর লরকার। ইউনিয়ন বোর্ড তো বহুত হুরেচেই—তাঁর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনও কাঁথিতে জোর চলছে। তুল সব খালি হয়ে গেছে। আমাদের স্ত্রীমান বলরামও অসহযোগী ছাত্রদের একজন কুঁবে নেতা বনে গেছে। জোর শিকেটই চালাচ্ছে। শহরে আজ কখীর অভাব নেই। গ্রামে কাজ করবে বলে ওকেও সংগে এনেছি।

মহাতারত। ভালোই করেছ। ভালোই করেছ। কিন্তু সকাল থেকে এত সব বড় বড় কথা শুনে আমার মাথা শুশিরে যাচ্ছে।

[বলরাম ছুটিয়া দিতা লম্বাকে কোলে লইয়। আদর করিতে লাগিল। মিথিরাবের স্ত্রী ভাবুরকে প্রণাম করিল। বসন্ত প্রণামের ধুম পড়িয়া গেল। ছেলেরা বা বাবাকে প্রণাম করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে জামাতা নাট্য দক্ষতার আলিয়া উপস্থিত হইল। তাহার পশ্চাতে চারজন চৌকিদার]

নারায়ণ। এই যে রাহবা যে, বলরাম আর আপনি একসঙ্গেই এলেন বুকি?

রাম। ইঁয়া একসঙ্গেই এলাম, তুমিও এখন আমাদের সংগে এসো নাট্য। দক্ষাদারী তো অনেক কাল হলো, লোকের কোষরে হুড়ি বেঁধে বেঁধে ছাড়ে তো দেখছি কড়া পড়ে গেছে। এবার দুজোর বলে আমাদের সংগে ঝাঁপিয়ে পড় দেখি দেশের কাছে।

নাট্য। আজো বা ক'রছি দেশের কানই করছি। আপনার ট্যাংকো দিচ্ছেন, সেই ট্যাংকোই না আমাদের বেতন হচ্ছে। ট্যাংকো বড় ককন, বেতন বড় হোক। খণ্ডর বাজীতেই বর বাবেবা পায়া। (মহাতারতকে) আপনার গুরুগুলো আবার গোরাগলে তুলে দিয়ে এলাম।

[চালে লটকানো খড়মঝোড়া মহাতারতের পারের কাছে রাখিল।]

এবার আপনি খড়ম পারের দিন, কাঁথির অর হয়েছ—সরকার হয়ে গেছে।

মহাভারতঃ। য়ানে ?

নারায়ণঃ। যেদিনীপুর থেকে সরকার একদিনেই ২০৪টি ইউনিয়ন বোর্ড তুলে নিয়েছেন আর ক্রোড়ী মাল-পত্র সব কিরিয়ে দেবার হুকুম দিয়েছেন, এই হুকুমে ছোট দাবোবাগা নিজে চলে এসেছেন।

[সকলে আনন্দে আর লাফাইয়া উঠিল। বড়ম পারে দিয়া মহাভারত সোজায়ে হাততালি দিতে দিতে খটখট করিয়া হাঁটিতে লাগিল। বলরাম আঙুরাচ্ছ তুলিল—]

বলরামঃ। মহাত্মা গান্ধী কী জর। বীরেন শাসনল কী জর।

[সকলে ভারত পুনরানুষ্ঠি করিতে লাগিল।]

নারায়ণঃ। একটা হুকুম শুনিয়াছি, কিছু আয়েকটা হুকুম আছে।

রামঃ। আবার কি হুকুম ?

নারায়ণঃ। (গেজেট হইতে একটি ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া) তাঁখির তুলে শিকেটিং করার অপরাধে বলরাম হাইডিতে গ্রেপ্তারের পরোয়ানা। এলো বলরাম—তোমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে বাবার মজ কাবী থেকে ছোট দাবোবাগা সাহেব নিজে এসেছেন, বাইরে গাড়িতে আসছেন। এলো।

গংগাঃ। গীড়াও।

[সকলে বনকিয়া গীড়াইল]

(নারায়ণকে) তুমি কি শুধু পুলিশ ? আবার জামাই নও !

নারায়ণঃ। জামাই নই যানে ?

গংগাঃ। সে বিবেচনা তো তোমার দেখছি না নারায়ণ। নইলে কি করে নিজ হাতে গুলে ধরে নিয়ে থাকো ?

নারায়ণঃ। আজ্ঞে আমি হুকুমের চাকর।

রামঃ। নির্লজ্জ।

নারায়ণঃ। না, লজ্জা কি ! চাকরি করছি আপন-ঘরেই বেয়ের খি-ভাতের ওস্তাদ।

তুলনীঃ। না ওকে বলে দাও ওর জাত আমি

আর থাকো না।

বলরামঃ। (চীৎকার করিয়া উঠিল) মহাত্মা গান্ধী কী জর।

নারায়ণঃ। (তুলনীকে) তোমার এই বাড়ি কদিন টেকে আমি দেখবো।

গংগাঃ। তুলনী। তুমি তোমার স্বামীর সঙ্গে যাও না।

তুলনীঃ। না না, আমি যাচ্ছি না।

রামঃ। তুলনী তুই যা, তুই গেলে তবে হয়ত লোকটা আবার মজ্বল হবে।

নারায়ণঃ। বাপ করুন দায়া, আপনাদের তুলনী আপনাদের মকেই পোতা পাক।

(চৌকিদারদের প্রতি)

এই দেখছ কি, আসামী—

‘চৌকিদাররা ছুটিয়া আসিয়া বলরামকে ধরিয়া লইল। ‘মহাত্মা গান্ধী কী জর’ বলিয়া বলরাম নারায়ণ দফাদারের অস্থতী হইল। ‘মহাত্মা গান্ধী কী জর’ বলির মধ্যে মেহেরাও তাহাদের অস্থতর করিল। সেল না শুধু মহাভারত। সে খড়গোজা ধরিয়া আবার চালে তুলাইয়া রাখিল। দীরে বীরে বনিকো নাহিতোছে।]

ভূতার অজ

[১৯৩১ সালের ১০ই মে সকাল বেলা। মহাভারত হাইডির চৌকিগুপ প্রাণগণে প্রাণের হেলেমেয়ের উপস্থিত। বলরাম কংগ্রেসের পতাকা হাতে নিয়া গীড়াইয়া রহিয়াছে। শ্রীর সঙ্গ বলে গান বরিয়াছে]

‘আমরা পূর্ণ স্বাধীন হবে,

আমাদের অঙ্গগত অধিকার নেবোই আমরা নেবো।

(আপার করে নেবো :)

ঊনিশ-শ-উনত্রিশ সনে রে তাই

কংগ্রেস লাছোরে।

সিক হোল তার আওয়ান হোক

পূর্ণ স্বরাজ তরে ।

ছায়াশে আছারী সেই

উনিশ-খ-ত্রিশ লন

কংগ্রেসের পতাকাভলে

সাতা ভারতের পণ—

বেআইনি বস্ত আইন আর

ট্যাক্স বস্ত ছুঁব, হ,

ভাঙবে। আইন দেবো না ট্যাক্স—

করবো সত্যাত্মে ।

(আমাদের) দেশ ঘেরা এই অস্বাভাবিক

রয়েছে হুনে ভরা,

দেবতার এই নামের উপর

চলবে না ট্যাক্স করা ।

লুট আক্রাইন বড়লাটকে

গাড়ী চিঠি দিয়ে

জানিয়ে দিলেন—লণ্ডন আইন

ভাঙবে হুজী নিয়ে ।

সবরমতী থেকে দণ্ডী

গেলেন লুণ্ডনে ।

আইন ভাঙেন হুনে তৈরী

করে সাগর জলে ।

সাতা ভারত ছুঁতে আবার এলো

হুতন আগর, গ,

লবন আইন ভেঙে যেতে

করবো যে লবন ।

(পিকেটিং চলো চারিদিকে)

গাড়ীজীকে গ্রেপ্তার করে

বিল কারাগারে

ভায় গিছু বায় নরনারী লব

কাতারে কাতারে ।

ও তাই, কারাগারেই জন্মেছিলেন

কংগ্রেস নিধনকারী—

সেই কারাগারেই বেথা পায়ে

ভারতের ভাগ্য বিধাতারই ।

চল কারাগার পূর্ণ কঠি,

আগবে আত্মত্যাগ—

(সারা দেশ) কারার পানে এগিয়ে চলে,

হীকে—গাড়ীজী আর ।

[গান শেষ হইলো । বলরাম জনতাকে উদ্বেগ
করিতা বলিতে লাগিল]

বলরাম ॥ এই যে স্বাধীনতায় গাড়ীজী গ্রেপ্তার
হয়েছেন । ভারতের সর্বত্র হরতাল প্রতিপালিত হয়েছে ।
দেশবাসী গাড়ীজীর গ্রেপ্তারের ভীত না হয়ে মনের
যোকানে ও বিদেশী বস্ত্রের যোকানে পিকেটিং করতে
আর লণ্ডন আইন ভংগ করতে কৃত সংকল্প হয়েছে ।

সকলে ॥ আমরায়ও হয়েছে ।

বলরাম ॥ কাঁধি মহত্মার অধিবাসীরা চৌকিদারী
ট্যাক্স দেওয়া বন্ধ করার কাঁধিও বোলখানি গ্রামে গেল
ওই যে পুলিশ ঘেরেদের উপর যে অভ্যাচার করেছে
তার ভুলনা নেই । স্বাধীন পতাকা বহন করার অপরাধে
ঘেরেদের পাহার তারা বন্ধ করেছে ।

সকলে ॥ বিদ্ বিদ্..... ।

বলরাম ॥ ওয়াশিংটন কমিটির নির্দেশ মতো আজ
আমাদেরও সংকল্প বেআইনি আইন আমরায় মানবো না ।

সকলে ॥ মানবো না ।

বলরাম ॥ সরকারকে কর দেব না ।

সকলে ॥ দেব না ।

বলরাম ॥ লণ্ডন আইন ভাঙবো ।

সকলে ॥ আচ্ছই ভাঙবো ।

বলরাম ॥ মহাত্মা গাড়ীজী—

সকলে ॥ জয় ।

[বলরাম ও অন্যান্য সকলে গোভাবাজায় গ্রাম
প্রদক্ষিণে চলিতা গেল । বনিকা নামিতে লাগিল ।
এবার বনিকা উঠিলে দেখা গেল রাম বারান্দার বসিয়া
চরকা কাটিতেছে, নিধিরাম আসিতা পাড়াইল]

নিধিরাম ॥ দাদা আমাদের বাড়ীতে রোগী দেখতে
কবরেক মশাই আসবেন না ।

রামঃ যেন্দী দেখতে আসবেন না আমাদের বাড়ীতে কখনো মশাই? কেন? বাবার চিকিৎসা তো এদিন তিনিই করেছেন। আজ আসবেন না কেন?

নিখিরামঃ আমি পুলিশে চাকরী নিয়েছি। দফতর হরেন্দি, এই অপরাধ। আমাকে যদি তোমরা ডাঙিতে লাগে—তবে কখনো মশাই আসবেন এ বাড়ীতে, দয়া করে বললেন।

রামঃ তোমাকে ডাঙিতে দিলে কি বাবা বেঁচে থাকবেন? চিকিৎসাটা তখন কার হবে তুমি?

নিখিরামঃ না দাদা, আমার গুরু বাবার চিকিৎসা হবে না—মরণকালে পেটে একঝড় গুরু পড়বে না—এমন জুপুতুর আমি নই দাদা। আমি লম্বী আর কবাকে নিয়ে বাড়ী ছেড়ে চলে যাবি। বাবাকে বলা নিখিরাম বলি হবে চলে গেছে। আজ বাবার অস্থির হরেন্দি, কাল হরত তোমার অস্থির হবে। আমার গুরু তোমাদের চিকিৎসা হবে না—এ চলবে না।

রামঃ তার চেয়ে বরং চাকরীটা ছেড়ে যে না নিবে।

নিখিরামঃ চাকরী আমি ছাড়তে পারবো না—আমার এক সাথের চাকরী। ছোটবেলা থেকে আমার সাথ ছিল দারোগা হওয়া—ঘোড়ার চড়কো। আমাই-বাবুকে কত তেল বাশিল করে তবে না তার সুপারিশ এ চাকরী পেরেছি, মলেও এ চাকরী আমি ছাড়তে পারবো না দাদা। আমরাই বরং বাড়ী ছেড়ে যাবি।

রামঃ কিন্তু বাবাই বা কোথায়? কোথায় গিয়ে উঠি? কে তোকে বাড়ীঘর ছেড়ে দেবে? পুলিশকে এ ঘরকে কেউ চাই দেবে না।

নিখিরামঃ ভাগ্য তো বটে! তবে কি হবে?

রামঃ কি আর হবে? তুমি ভোর বাড়ীতে থাকবি।

নিখিরামঃ আমাকে বাড়ীতে রাখলে তোমাকেও একঘরে করবে দাদা, ঐ বলরাই করবে।

রামঃ কেন? তুমি পুলিশের চাকরী করে দেশের দত্ত অহিত করবি—বলরাম আর আমি দেশের কান্ন করে তার ভাতো প্রাপ্তি করবো। তুমি তিনটি ভাই—আমরা এক সংগেই থাকবো, বাপ মারের গিটেতে একসঙ্গেই বাচবো।

নিখিরামঃ দাদা, তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি দাদা, কিন্তু এই বলরাবটাকে বিশ্বাস নেই, ওটা সাপ, পরতান, আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে সব বেআইনি করছে। বাক মরহ গেলো আমি ভাকার এনে গাঁতের লোককে একবার দেখিয়ে দিই যে আমারও ক্ষমতা আছে।

রামঃ (হাসিয়া) তোমার ক্ষমতা আছে জানি। কিন্তু বাবার গুরুত্বের আর ধরকার হবে না। আর ছেড়ে গেছে। ভালই আসেন।

[ঘোমটা টানিয়া লম্বীর প্রবেশ। তারার হাতে এক গেলান ছুঁ, সে ভাবের সামনে রাগিত বাবিল]

রামঃ যুধেলে তারা, তোমার আমি দাদা বটে। কিন্তু বৌবার কাছে আমি এখনো থোক। সকালে এক গেলান ছুঁ না বাইরে ছাড়বেন না। পুলিশের লাঠি খেয়ে খেয়ে আমার শরীরটা নাকি ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু বৌমা, আমার ভায়েকেও রোজ এক গ্রাস ছুঁ বাইও, লাঠি চালাতে গেলে শরীরটা মজবুত রাখা চাই। তো!

[রাম ছুঁ বাইরা চলিয়া গেল]

নিখিরামঃ (লম্বীকে) বলরাবটা কোথায়?

লম্বীঃ কি জানি কোথায়? একেবারে বহে গেছে। রাত দিন শুধু দল পাকছে, আর হৈ হৈ করছে, কেউ-খাবার সব গেল। পায়ে না আঁজ করে টুকে দিতে?

নিখিরামঃ হচ্ছে—হচ্ছে, তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

লম্বীঃ জনলয় গোলাবাগি গাঁয়ে মেহেরদের পাঞ্জীর তোমরা বেত মেহেরো। আর একের বেলায় তোমরা লাঠি চালাতে পারো না?

নিখিরামঃ (ওগু সংবাদ দিবার ভঙ্গীতে) আজ লাঠিই চালাবো—আজ বিকেলে ও বখন দল বেঁধে সব আইন ভাঙতে যাবে—

লক্ষী ॥ কি সর্বনাশ! তুমি একা আর ওরা এতটা? তোমাকে তো পিষে ঘেঁষে ফেলবে। আমাকে বিধবা না করে ছাড়বে না দেখছি।

নিধিরাম ॥ দুব পাগলি। ঘটে একটুখুণ্ড যদি দুড়ি থাকে। আমি একা বাবো বৃষ্টি (দুব সোপনে) সন্ধ্যা থেকে বন্ধুকারী একদল পুলিশ নিয়ে জামাইবাবু আসছেন। তুলসী কোথায়?

লক্ষী ॥ বাবার কাছে। রাজকিন তিনি বাবাকে নিয়েই আছেন। বাপ দার হাতের লাঠি, খড়ি বেয়ে বাবা, এমনটি আর দেখি নি। লোটারীর খর নঃ করে বাপ মারের ভাতের পড়ে বইলি।

নিধিরাম ॥ আর এমন বাবী! দানার দারোগা! কি প্রভাণ! লক্ষীছাড়া তাকে চিনলো না, ওর কপালে অনেক দুঃখ আছে। দেখো'খন। বাবু, বলরামটার উপরে লজর রেখো, মানে আনা দরকার বোমাটোমা ওরা আমদানী করছে কিনা। আর শোন জবাটাকেও একটু চোখে চোখে রেখো। বলরামের কাছে বৈবন্তে বিভূ না। আর পাড়া পড়লীদের লংগেও বিশতে সিঙ না।

লক্ষী ॥ সে তোমাকে বলতে হবে না। যে টুকু রিশি পেটের খবর বের করে নেবার জড়ই বিশি।

নিধিরাম ॥ (লক্ষীর চিবুক নাড়িয়া) দস্যুরা থেকে যদি দারোগা হয়—তোমার জড়ই হবে লক্ষী—চলি।

লক্ষী ॥ এই অবলায় আবার চললে? তোমাকে যদি একটুও আমি কাছে পাই।

নিধিরাম ॥ পাবে—যখন দারোগা হবে—তখন পাবে, সন্ধ্যার বাবে—ভাণ্ড খোঁড়ার তুলে পাশে বসিয়ে নিয়ে বাবে। গাটা যুগে একবার সব সেখে আসি।

[নিধিরাম চলিয়া গেল। প্রায় লংগে লংগে জবা ছুটিয়া আসিল।]

জবা ॥ হা, বাবা এসেই আবার চলে গেলেন কেন? তোমাকে ছুপি ছুপি কি বলছিলেন?

লক্ষী ॥ বললেন যে বকব বিনোই হয়ে তুমি উঠেছ,

তোমাকে বিয়ে না মিলে আর চলে না। একটা চৌকিদার পাত্তা খুঁজলেন।

জবা ॥ ভালো হবে না মা—বলে রাখছি।

[“কি হোল, কি হোল,” বলিতে বলিতে বলরামের প্রবেশ।]

জবা ॥ দেখছো কাকাবাবু? মা কি সব যা তা বলছে!

লক্ষী ॥ বাপ ওর জন্তে চৌকিদার পাত্তা খুঁজছে। ঘরের ভাতের মন উঠছে না।

বলরাম ॥ এখন লাটসাহেব পাত্তা হলেও ওর মনে ধরবে না! কিন্তু আমার কি বলছে জানো—দেখ আগে স্বাধীন হোক। তখন চৌকিদার দুকোফরাস থাকে হলো বিয়ে করবে।

জবা ॥ বাও [জবা ছুটিয়া পলাইল]।

বলরাম ॥ বৌদি, দীপসির ভাতের ব্যবস্থা করো। আমি পাড়ার বেকজি, কিরে এসেই ভাত চাইবে। জানোতো আছ বিকসে...

লীক্ষ ॥ শোন ঠাকুরপো...

[লক্ষী সতর্কভাবে চাহিদিকে তাকাইয়া বলিতে লাগিল।] সন্ধ্যা থেকে বন্ধুকারী পুলিশ নিয়ে তোমার জামাইবাবু আসছেন। আজ শুধু লাঠি চলবে না—ভনীত চলবে। তোমরা আজকের দিনটা অন্তত ক্ষান্ত নও।

বলরাম ॥ বৌদি আছ বিকসে আমরা লগন আইন ভাতেরা বলে প্রতিজ্ঞা করেছি। সত্যগ্রহী হয়েও সত্য তংগ করতে হলো বৌদি?

লক্ষী ॥ অত আমি বৃষ্টি না। এমন করে তোমার আমি বরতে দিতে পারি না, ঠাকুরপো।

বলরাম ॥ [লক্ষীর ঝাঁচল টানিয়া] তবে তোমার ঝাঁচলের তলে লুকিয়ে থাকি, কি বল?

লক্ষী ॥ [ঝাঁচল টানিয়া লইয়া] হিঃ ঠাকুরপো, তা কেন? মরতেই যদি হয়, লড়াই করে মর।

বলরাম ॥ লড়াই করেই মরবে। কিন্তু কাউকে মারবে না। হিংসা আবারের পথ নয়। তুমি তো জানো বৌদি।

লক্ষী ॥ জামি কিছু মন মানে না। তোমাদের
সাহস খেতত বড়, তাত্ত নৃষি। তেবে অবাক হই।
পর্ব হয়। 'কিছু মন মনে না' ঠাকুরপো। না, না,
তুমি বাবে না।

বলরাম ॥ সে কি নয়! ছিঃ বৌদি।

লক্ষী ॥ সবাই এখন আমার দলবাহকের বৌ বলে
ঠাট্টা করে, তখন তা। গারে মানিয়া শুধু এই ভেবে
দলবাহকের বৌ বটে কিছু বলরামের বৌদি আমি—
সে আমি—আর কেউ নয়।

বলরাম ॥ তবেই যেথ—আজ যদি কাণ্ডকের
যতো তোমার আঁচলের আড়ালে পালিয়ে থাকি
তবে কি আমার ভালোবাসে বৌদি? না বৌদি
তোমার ঐতিহ্য, তোমার শ্রদ্ধা যাতে আমি পাই সে পথে
যেতে তুমি আমার বাধা দিও না। তোমার ভালবাসার
আনন থেকে আমার হৃদে ঠেলে দিও না।

লক্ষী ॥ এসো ঠাকুরপো।

বলরাম ॥ লক্ষীদেবী যদি ঠায় বাহন পেঁচাজি
যতো মুখ ভার করে বলেন 'এসো', তাহলে কি করে
আমি আসি বলো?

লক্ষী ॥ (হাসিয়া) পরম 'খিচুড়ী' তুমি ভালোবাসো।
চটকরে হবে। তুমিও চট করে চলে এসো।

বলরাম ॥ এইতো আমার বৌদি।

[এই বলিয়া বলরাম ছুটিরা চলিয়া গেল। অস্তিত্ব
হইতে ছুটিরা আবার প্রবেশ।]

জবা ॥ ম, ছোটকাবাবু কি বলে গেলেন?

লক্ষী ॥ বললেন—অবাক তৈরী রেশো, দেশ
দ্বানীন হতে আর দেবী নেই। রাজরানী কি বৈষ্ণবানী
একটা রাণী শুকে হোটেই হবে।

জবা ॥ বাণ্ড!

[লক্ষী চলিয়া গেল। জবা চরকার গিরা বলিল।]

জবা ॥ (গান)

চরকা আমার সোয়ামীপুত

চরকা আমার নাতি।

চরকার দৌলতে আমার

চরবে বাধা হাতি।

[নারায়ণ দারোগার প্রবেশ]

নারায়ণ ॥ এই বেগে শোন।

জবা ॥ শিলেমনাই, আহ্নন।

নারায়ণ ॥ না বলবে না, খুব ভাড়া আছে। শুধু
তোমার শিলিমার সংগে দুটো। কথা বলে চলে যাবে।
চুল করে তাকে এখানে একটু ডেকে লাগ দেখি।

[অথা চলিয়া গেল। গরুর গুহ্র এক ঐতিহ্য বড় লইয়া
বাড়ীর রাখাল গোরাল ঘরে বাইতেছিল।]

নারায়ণ ॥ কে? শব্দ না?

শব্দ ॥ আজ্ঞে কর্তা।

[নারায়ণের পায়ের কাছে বড়ের আঁটা রাখিয়া
তাহাতে মাথা ঠেকাইয়া উঠিল]

নারায়ণ ॥ কিরে তোরা নাকি আজ সব ছুন তৈরী
করবি।

শব্দ ॥ হুন। ওতো ভগবান তৈরী করেছেন কর্তা।

নারায়ণ ॥ আর—তাতো করেছেন, আমি তা
বলছি না। আমি বলছি শব্দের জল জাগ দিচ্ছে নাকি
তোরা আজ বে-আইনি ছুন তৈরী করবি?

শব্দ ॥ কি বললেন কর্তা? বে-আইনি ছুন?
সেটা আমার কি? নোন্তা নয় নৃষি?

নারায়ণ ॥ তোম মাথা। যা...

[শব্দ চলিয়া গেল। তুলসী আনিয়া ধাঁড়ালিল।]

তুলসী ॥ কি বলবে বণো?

নারায়ণ ॥ বসন্তেও বসন্তে নেই নাকি?

তুলসী ॥ বসন্তে বলবার সাহস নেই।

নারায়ণ ॥ বেশ, বোলবে না, বসন্তে চাইও না।

আর এও চাই না, তুমি এ বাড়ীতে আর এক মুহূর্তও
থাকবে। তোমাকে যেতে হবে।

তুলসী ॥ কোথায়?

নারায়ণ ॥ আমার গলে।

তুলসী ॥ তোমার সংগে? কোথায়? থানায়?

নারায়ণ ॥ আমার বাড়ীতে ।

তুলসী ॥ আমি ভেবে যেবেছি, তোমার বাড়ী আমার বাড়ী নয় ।

নারায়ণ ॥ নয় ? কেন নয় তুলসী ?

তুলসী ॥ বে বাড়ীতে আমার ভাইয়ের, আমার বোনের, আমার বাপের, আমার মাতার, আমার বোনের, আমার ভাইয়ের শত্রু বাস করে, সে বাড়ী আমার নয় ।

নারায়ণ ॥ আমি যে কি, আমি যে কে, একথা তুমি কোনকালেই আমার ঘরে এসেছিলে তুলসী ।

তুলসী ॥ সেদিন তুমি চেয়েছিলে গুপ্ত আমাকে । আমি চেয়েছিলাম গুপ্ত তোমাকে । আর যে কিছু চাই-বার ছিলো তা আমরা জানতাম না, আজ আমরা জানেছি, আজ আমরা শিখেছি দেশের স্বাধীনতার চাইতে বড় চাওয়া আর কিছুই নেই ।

নারায়ণ ॥ স্বাধীনতা কে না চায় ? আমিও চাই । কিন্তু স্বাধীনতা চাওয়া মানে স্বাধীনতার সম্পর্কে স্বীকার না করা তুলসী ? ঘর ভেঙে বেড়িয়ে আসা ?

তুলসী ॥ ঘর আমি ভাঙতে চাই নি ।

নারায়ণ ॥ তুমি ভেঙেছ । স্বাধীন ঘর ভেঙে এসে বাপের ঘর করছো । কিন্তু তোমার এখনও আমি ভেঙে দিতে পারি । ভেঙে দিতেই এসেছি । লগ্নে এসেছে বন্ধু নিয়ে আরো বনজন পুলিশ ।

তুলসী ॥ আমাদের গুলী করে মারবে ?

নারায়ণ ॥ আদেশ আছে আজ বাবা এখনে যেখানেই হুন তৈরী করবে, বরকার হলে তাদের গুলী করেও তা বন্ধ করবে ।

তুলসী ॥ এঁা বলবাম হুন তৈরী করবে আজ !

নারায়ণ ॥ হাঃ হাঃ হাঃ ।

তুলসী ॥ না না—সে কি । না না—তুমি—তুমি—

নারায়ণ ॥ হ্যা, আমি—আমিই তুলসী চালাবো ।

কেন চালাবো না তুলসী ? আমার ঘর তুমি ভেঙেছ, কোনও ঘর আমি রাখবো না ।

[কণকাল নিম্নততা]

নারায়ণ ॥ তোমাকে যেদিন বিয়ে করে ঘরে নিয়ে গিয়েছিলি—সেদিন ভেবেছিলিাম ঘরে আমার লক্ষী এসে । সেই লক্ষী যে এমন করে ছেড়ে বাবে তাতো কোনদিন শুনি নি ।

[তুলসী নীরব বহিল]

নারায়ণ ॥ তোমার ঘরে তুমি কিরে এসো । লক্ষী ! লক্ষী ! এই লক্ষীছাড়াকে বহা করে ।

তুলসী ॥ তুমি এমন করে বলো না । আমি বাবো । এখনি বাবো—বদি আমার নিয়ে, বন্ধুগণী পুলিশ নিয়ে, তুমি এখনি এ গাঁ ছেড়ে চলে যাও ।

নারায়ণ ॥ আমি রাজী । গিয়ে রিপোর্ট দেবো ।

আজ্ঞা সে বা দিতে হয়, দেবো । এসো । এসো তুমি ।

তুলসী ॥ আসছি আমি মা বাবাকে প্রণাম করে আসছি ।

[তুলসী ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল । শব্দ এই সময় ঐখানে দিরা বাইতেছিল]

নারায়ণ ॥ এই শব্দ শোন । এ বাড়ীর ছোটখাটু কোথায় ?

শব্দ ॥ ও সব খবর আমি রাখি না কর্তা । আমাকে জিজ্ঞাসা করেন গক বাছুরের খবর । আজ্ঞা কর্তা এক শালা বাছুর এক গরুর ছুঁ ছুরি করে খাশ, ঐ চোবের কি লাভা কর্তা ?

নারায়ণ ॥ তোর মাথা । বা ভাগ ।

[শব্দ চলিয়া গেল । এমন সময়ে তুলসী আসিয়া পাড়ল, সঙ্গে সঙ্গে আসিল বাড়ীর লবাই । নিখিরাম নারায়ণ শব্দ শাওড়ীকে প্রণাম করিল]

নারায়ণ ॥ (মহাত্মারতকে লক্ষ্য করিয়া) আমি শুকে নিয়ে যেতে এসেছি । আপনার শরীর এখন কেনন আছে ?

মহাত্মারত ॥ অরটা আজ ছেড়েছে । আর কি এখন গেলেই হয়, ঘরে বাইরে অশান্তি, এ আর ভালো লাগে না ।

গংগা ॥ পাওরা পাওরা করে বাবে না বাবা ?

নারায়ণ না বা। সে অস্তুরোধ আর করবেন না।

আজ্ঞা আসি। (তুলসীর প্রতি) এগো।

[তুলসী অগ্রসর হইল]

গংগাঃ দেহেটা কিছু মুখে দিবে গেল না। তুমিও না। এমন করে এসে এমন করে দিবে গেল, মনে বড় ব্যথা পেলাম বাবা।

নারায়ণ এ ব্যথা কোন ব্যথা নয় বা ঠাকরুণ। আজ বিকেলে এখানে বে-আইনী ছন তৈরী করবে গ্রামের ছেলেরা। পরকার হলে শুদী চালিয়েও তা বহু কঠোর হুকুম ছিল আমার ওপর। বোটের গাড়ী করে একবল বন্ধুত্বকারী পুলিশ নিয়ে আমি শুদী চালাতেই এসেছিলাম। তুলসী যদি আজ আমার সংগে না যেত আজ আমি এ গ্রামে কাউকে রেহাই দিতাম না। তুলসী থাক গেলো—তাই আজ আপনাদের বলগ্রাম বেঁচে গেলো। (তুলসীকে) এগো—মিটিং হবার আগেই আমার বোটের হাতড়ে হবে।

মহাভারত ৥ ইয়া, হবে, এইবার তোমার প্রমোশন হবে বাবা। গুনেন্ডিলাম তুলসী তোমার পর ছেড়ে আমার ঘরে এসে রয়েছে বলে সাহেবেরা ক্ষুণ্ণ হয়ে আছেন। তুলসীকে কত বলেছি যা—পোনেনি। এবার ওর অমতি হয়েছে। এগো বাবা এগো যা—

[তুলসীও মনে গভীর অতিক্রিয়া দেখা দিল। সে হুঁরিয়া গাঁড়াইল]

তুলসীঃ আমি বাবো না।

নারায়ণঃ বাবে না।

তুলসী ৥ না। তোমার মতলব আমি বুঝছি। আমাকে নিতে তুমি আসনি। তুমি প্রমোশন নিতে এসেছ। তা হবে না। নিজের দেশের লোকের উপর যে শুদী চালাতে আসতে পারে সে অবমান্ত। তার পর আমার পর নয়।

[এই বলিয়া মুখ ফিরাইয়া তুলসী অন্দের দিকে চলিয়া গেল। অস্ত্রান্ত লক্ষণে হস্তবাক হইয়া রহিল]

নারায়ণঃ বেশ, তবে আমার আর দোষ নেই। দেখা

যাক কে যায়।

[এই বলিয়া নারায়ণ চলিয়া গেল। লক্ষণে হস্তবাক হইয়া গাঁড়াইয়া রহিল। ববনিকা নামিয়া গেল। অপর পরে ববনিকা উঠিল]

[ববনিকা উঠিলে দেখা গেল—উঠানের একটি খাটিয়ার উপর বসিয়া মহাভারত হুকা টানিতেছে এবং শ্রীর তাহাকে একটি লংবাদপত্র পড়িয়া শুনাইতেছে]

শ্রীরঃ (খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল) “সরকার বিভিন্ন অভিজ্ঞান জারী করিয়া লভ্যাগ্রহ আন্দোলন থামাইয়া দিতে বহুপত্রিকর হইয়াছেন। প্রাথমিক ও জেলা কংগ্রেস কমিটিগুলি একে একে বে-আইনী ঘোষিত হইয়াছে। গুৱাকিং কমিটিও বাদ যায় নাই। পণ্ডিত মতিলাল নেহরু কারাক্ষ হইয়াছেন। গুৱাকিং কমিটির নির্দেশ ছিলো—বে-আইনী ঘোষিত হইলেও আন্দোলন যেন না থাকে। বিভিন্ন স্থানে জিজিটর অর্থাৎ নির্দেশক নিযুক্ত করিয়া আন্দোলন চালাইয়া দাইতে হইবে।” যেমন এখানে চালাচ্ছে তোমার বলরাম।

[মহাভারত হুকা টানিয়া দাইতে লাগিল]

মহাভারতঃ হ’।

শ্রীরঃ (আবার পড়িতে লাগিল) “এই পর্যন্ত বহুতরু জানা গিয়াছে—এই আন্দোলন দমন করিবার জন্য পুলিশের শুদীতে একশত সিনজল হত এবং চারিশত জন আহত হইয়াছে।”

মহাভারতঃ আজ এখানেও তাই হচ্ছে। জানি না—কে থাকবে কে বাবে।

শ্রীরঃ (খবরের কাগজ পড়িতে লাগিল) “লভ্যাগ্রহ আন্দোলনে ১৪৪ নম্বর অসম্মত করা দেশবাসীর একটি বিশেষ কর্তব্য হইয়া গাঁড়াইয়াছে। কলিকাতা, এলাহাবাদ, বোম্বাই—ভারতের আর লব্ধ ১৪৪ নম্বর অসম্মত করিয়া বহু জনগণ ও শোভাযাত্রা অসম্মত হয়। এলাহাবাদে মতিলাল গুহানী বহুপত্রিকারী নেহরুর উপরেও লাঠি চার্জ করা হইয়াছে। ২৩শে অক্টোবরী কলিকাতার

যেহেতু শ্রীযুক্ত মহাবল্লভ বহু আইন অমান্য করিয়া
পোক্তাযাত্রা বাহির করার পুলিশের লাঠিতে আহত
হইয়া গেলার হইয়াছেন।”

“সভাপ্রার্থনা আন্দোলন একদিকে যেমন প্রবল হইয়া
উঠিতেছে, অন্যদিকে ভেদনি, বিশেষ করিয়া বাংলায়
বিদ্রোহ আন্দোলন স্তব্ধতার আকার ধারণ করিতেছে।
বিদ্রোহীরা গত ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার
লুণ্ঠন করিতে গিয়া ঐতিহাসিক খ্যাতিলাভ করিয়াছে।
ব্যাপার জটিল হুজিরা শ্রমিক গভর্নমেন্টের নির্দেশ
ভাঙতের বড়লাট লর্ড আরউইন মহাত্মা গান্ধী এবং
কংগ্রেসের শ্রমিক কনিষ্ঠ নেতৃবর্গকে হুজিমান করিয়া
শান্তি স্থাপনের আদেশনা চালাইতেছেন। আইন
অমান্য ও নমনীয়তা কিন্তু এখনো পূরা হইতে চলিতেছে।”

[হঠাৎ বাহিরে একটি গুলীর আওয়াজ শুনিয়া
উভয়ে চমকিয়া উঠিল। মহাত্মার হাত হইতে হকা
পড়িয়া গেল]

মহাত্মারতঃ : ঐ! কে গেলো!

শ্রীধর ?

শ্রীধর : আমি গিরে দেখে আসবো?

মহাত্মারতঃ : না ভাই, তুমি থাক। বাড়ীতে আর
কেউ নেই। আমি একা থাকতে পারবো না শ্রীধর।
গড় তুমি কাগজ গড়।

শ্রীধর : “১৯৩০ সালে পেশোয়ারে নিম্নর জনতার
উপর গুলী চালাইতে অস্বীকার করিয়া একদল
গাড়োয়ালী সৈন্য বিজোহ ঘোষণা করে। এই অপরাধে
তাহাদের উপর কঠোর কারাদণ্ডের নির্দেশ হইয়াছে।

[‘মহাত্মা গান্ধী কী গ্রহ’ এই খনি সহকারে আহত
বলরামকে বহন করিয়া পাড়াপড়নিদের গ্রামে।
তাহাদের লগে গংগা ও জবা]

জবা : দাচ্—তাহকে গুলী করেছে, কী ভীষণ রক্ত
পড়ছে। তুমি এসো দাচ্, তুমি এসো।

[পাড়াপড়নিরা ও গংগা ইতিমধ্যে আহত বলরামকে
বারান্দার শোভাইয়া দিল। তাহাকে ঘিরিয়া ভীড়
জমিয়া গেল, জবাও সেখানে ছুটিয়া গেল।

মহাত্মারতঃ : বলরামটা তবে গেল! শ্রীধর, দেখো
তুমি, শুক দেখো।

[শ্রীধর বলরামকে দেখিতে চলিয়া গেল। মহাত্মারত
আবার সজোরে হকা টানিতে লাগিল। গংগা
মহাত্মারতের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল]

গংগা : ছেলেকে রেখে গেলাম। তুমি দেখো।

মহাত্মারতঃ : বেঁচে আছে?

গংগা : ইচ্চবে কিনা জানি না। কিন্তু আনাকে
বেঁচে হবে।

মহাত্মারতঃ : কোথায়?

গংগা : যেখানে গুলী লগছে—ছেলেটা যেখানে
প্রাণ দিচ্ছে—না সেখানে ঘরে বসে থাকতে পারে না—
পারবে না।

[গংগা চলিয়া গেল। মহাত্মারত আবার হইয়া
গংগার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া রহিল। যবনিকা
নাহিয়া আসিল এবং কিছু পরে যখন যবনিকা উঠিল, তখন
দেখা গেল মহাত্মারত একা বসিয়া হকা টানিতেছে।
লক্ষী এবং তুলসী বাহির হইতে নিঃশব্দে অবনত হুখে
মহাত্মারতের ছই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল]

মহাত্মারতঃ : তোরা কোথেকে এলি?

তুলসী : ছেল থেকে বাবা।

মহাত্মারতঃ : হেড়ে দিলে?

তুলসী : ইয়া।

মহাত্মারতঃ : কিন্তু আমার আর সব?

[লক্ষী ও তুলসীর হুখে কোন জবাব বোগাইল না]

মহাত্মারতঃ : তাদের ছাড়ে নি?

লক্ষী : ছেড়েছে সবাইকে বাবা। বড়লাট সাহেবের
সঙ্গে পাণ্ডীজীর এক ছুটি হয়েছে। সভাপ্রার্থীদের ছেড়ে
দিয়েছে। বামলা যোকদ্দা সব তুলে দিচ্ছে। বাজেরাও
জমি সব ফিরিয়ে দিচ্ছে। সব চেষ্টে বড় কথা—সবুজের
বারে বারের বাস তারা ইচ্ছামত লবণ তৈরী করতে
পারবে—বিক্রি করতে পারবে—সরকার আনাদের এ
অধিকার স্বীকার করেছে।

মহাত্মারত্ন। কুলসাম তোরা জিতেরিস্। কিছ
আমার আর সব কই ?

তুলসী। দাদা ছাড়া পেরেছেন। কিছ তিনি আর
এ বাড়ীতে আসবেন না।

মহাত্মারত্ন। কেন ?

লক্ষী। (ডুকরিয়া কাঁধিরা উঠিল) মাকে আমার
জেলে হারিয়েছি বাবা।

মহাত্মারত্ন। হঁ, হারিয়েছিল। তোমার মাকে
হারিয়েছিল। কিছ—তবে আমাকেও এ বাড়ী ছেড়ে
বেরে হয়। বলরাবকে আমি হারিয়েছি।

তুলসী। তুমি গেলে আমরা কার কাছে থাকবো
বাবা ?

মহাত্মারত্ন। তা বটে, তা বটে। তুলসী, লক্ষী,

আমাকে ডাক তোরা। আমার কুলে ধর, বরে আমার
নির্ভর কর। ~

তুলসী। কোথায় বাবা ?

মহাত্মারত্ন। সবুজের তীরে। তাঁরা মরে গেছে—
কিছ আমরা বেঁচে আছি। মরে গিরে যে অধিকার
আমাদের গিরে গেছে, সেই অধিকারে আমাদের
সবুজের জলে আমরা ছুঁন ভৈরী করব। সেই হবে
তাঁদের শ্রাদ্ধ—সেই হবে তাঁদের তর্পণ। আমার
বড়ন—আমার বড়ন ?

[কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিতে গেল। তুলসী ও লক্ষী
মহাত্মারত্নকে তুলিয়া বহিল। লক্ষী লটকানো বড়ন
আনিয়া তাহার পাঠের কাছে রাখিল। বহনিকা
নামিয়া গেল।]

(আগামীবারে সমাপ্য)

আরাকান

(১৭০ পৃষ্ঠার পর)

হুন সেই প্রথমে কথা বললো, ‘আপনার বিদিকে
আমার অদ্ভুত ভালো লাগলো।’

কমল অনেকক্ষণ পরে কথা বললো। হুন পের নেন
হঁলো ওর কথাগুলো হরত কমল শুনতেই পার নি।
রাখার বিদে চেরে আস্তে আস্তে বললো, ‘বিদিকে যে
দেখে সেই ভালবাসে। আমার বিবিরা একটু স্যাবেনি
ধরপের। তিনি বলেন, দিবি পুখিহীতে থাকতে আসে
নি। ও এখনকার নয়।’

চৌরাক্তার ঘোড়ে এসে কমল ঠাড়িরে পড়লো,
‘আমি চলি এইবার।’

‘বক্তব্যঃ অনেক বছর ধরে আপনাদের জীবনে এই
দিন কিরে আলোক, ফয়ার কাছে এই প্রার্থনা জানাচ্ছি’
কথার সংগে সংগে হুন পে কমলের হাতটা চেপে ধরেই
ছেড়ে দিলো তারপর হন হন করে হাস্য। পরে ধরে
এদিকের স্টপাতে এসে ঠাড়ালো।

পিচ ঢালা দীর্ঘ রাত্তা। হুপাশের বাস্তিতে চকচক
ক’রছে। সোভা পথ, একটু বাক নেই। কমল বোসের
অগম্যমান নান্দীর্ঘ দেহটা তারি ছোট আর অগম্য
বেগাছো। ক্রান্ত পদক্ষেপে—ছুটে। হাত প্যাণ্ডের হু
পকেটে ছুঁড়িরে কমল বোস অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

(ক্রমঃ)

ব্যথান-পূজা

যতীন চন্দ্র দাশগুপ্ত

(উপভাস)

[বারো—বেলাংশ]

বিনতির সঙ্গে দেখা করে আসবার পর বাধুরী কিস্ত কোন কাছেরই আর মন বসছিল না। যে বীরার সান্নিধ্য ছাড়া এক মুহূর্তও সে থাকতে পারতো না, সেই বীরাকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সে নিরালা ঘরগা ঘুঁজে নিয়ে, তার কলে আগা জীবনের সঙ্গে নিতাইয়ের কথা ভাবতে বসে। কেমন বেন উদাস অস্ত্রমনস্ত হয়ে পড়তো। একটা দিন সে কোন মতে লুকিয়ে লুকিয়ে কাটাগো, কিন্তু দ্বিতীয় দিন আর বীরার হাত থেকে রেহাই পেল না।

বিকলে সেদিন ছাত্তর এক কোণে বসে, নিতাইয়ের কথা, চাখাপটির বাসার কথা, আর বহির্দার প্রীত কথা ভেবে ভেবে চোখের জল মুচছিল বাধুরী; এমন সময় লক্ষ্য বীরা ছাত্তর উঠেই বরাবর তার কাছে গিয়ে বসে পড়ে বলে উঠলো—“আমি ঠিক হয়েছি। নির্দোষ জীবনের ওপরে তোমার অসুখি ধরে গেছে। লজ্জা ক’রে বসো দেখি, what wrong with you?”

কোন মতে হাসবার চেষ্টা ক’রে, বাধুরী জবাব দেয়,—“Nothing”

বীরা বলে—“একদম বাজে কথা। বলই না বাবা কার সঙ্গে প্রেমে পড়লে?”

চোক দিলতে গিরে হঠাৎ বিকস খেয়ে, বাধুরী হেসে বলে—“তোমার!”

সে কথার জবাবে চোখ পাড়িয়ে, হাসিয়ে হাসিয়ে, বীরা বলতে থাকে,—“প্রেমের ব্যাপারে ওলম ভক্তিকারী লম্বাই করে। তা বাই কতো বাপু, যেখা বেন কোন ভুলো মন্থনের প্রেমে পড়ো না। পায়ের বড় মরলা হোক কতি নেই, পৌরুষ ধ্বংসলেই হোলো—সেখা বেন আবার তাই বলে শুভা না হয়। গ্যারে জোর থাক

কতি নেই, কিন্তু মুখা হলেই মরবে। গোয়ার, হিংস্রটে আর ভীক লোকগুলোকে আমি ছুঁতকে দেখতে পারি নে। সে বাবা রাজপুত্র হলেও না।”

হাসতে হাসতে ইাকিরে উঠে, বাধুরী বলে,—“এ লোক তো বাপু দেখছি কখনাস দিহে তৈরী করতে হবে?”

উৎসাহিত হয়ে বীরা উত্তর দেয়,—“নইলে আর প্রেম বলেছে। দেখে শুনে, বাখিরে কাসিরে, দৌড়কাপ করে কিছুদিন আগে থেকে ঘোঝো, তবে তো একটা প্রেমিক জুটবে! বাবা বলেন, ওঠ ছুঁড়ি তোর বিহে। মা বলেন, পতি পরম শুক। ঠাহুমা বলেন, ধনে পুজে লক্ষী লাভ করে, অগুণ্ডি সন্তানের জননী হয়ে লুখে থাকো। এগুলো অত্যাচার নয়? বাজু হারো অমন বিহের কপালে। তাই বলছিলাম প্রেম বখন একটা করতাই হবে, তা দেখে শুনে কহাই ভালো। চোখ মুখ বিচিরে বস্তানিনীর বতো চং ক’বে লাভ কি?”

বীরার উজ্জ্বল বহন করবার জন্ত বাধুরী হাসতে হাসতে বলে,—“ঠিক কথা। কিন্তু তুমি মুগেন্দ্রপালের জবীদারীটা কেমন করে চালাছো তা তো কৈ একদিনও বলে না? সব সময় তো তোমাকে বাতীতেই দেখতে পাই। তা লুকিয়ে লুকিয়ে কি রাজ্যে বাও নাকি সেখানে তুমি? বল না গুনি?”

মহলা গম্ভীর হয়ে সে কথার উত্তরে বীরা বলে,—“মনের বড় দুর্বল স্থানে আজ তুমি আমাকে আখাত ক’রে বসলে দেখি। যেভাবে লক্ষী সাবু দাঁড় করিয়ে মা মুগেন্দ্রপালের লক্ষ্মিটা আমার নামে দিলেন, তাকে ভেবেছিলাম নিশ্চয় বড়ি পেটা। আমার হাতে বোমামুদ ছেড়ে দিলে মতে পাড়াবে। ওমা লাভ বিন না যেতেই দেখি, দিদি এখানে, ওখানে, সেখানে সব নতুন লোক

লাগিয়ে, মা আমাকে বলে কি না, চলো তোমাকে আর এ বাড়ীতে থাকতে হবে না! শোন কথা? বুড়ো তো মরলো সেদিন। অথচ সম্পত্তি পেছন আমি তার একমাস আগে—মার টেট ব্যাঙ্ক খালেন লম্বত। তারি স্মৃতি হতেছিল আমার। তুমি তো জানো, আমি তখন কিরকম মাতারায়ত করছিলাম বুড়োর কাছে? আর মনে মনে রোজ বুড়োটার মৃত্যু কাননা করছিলাম। ওমা সেই বুড়োও যেই মরলো, আর মা বলে কিনা তোমাকে আর ও বাড়ীতে যেতে হবে না! ভাবছিলুম কোথায় কাণ্ডারীণ দি গ্রেটের মতো দিন করেক একটু মজা দুটো, আর সে সব দিলে মা অমন ভক্তুল করে।”

গাফনার ভলিতে মাদুরী উত্তর দেয়—“তা তালই হয়েছে। কি দরকার ছিল তোমার জতো কানেনা পুইয়ে। মা বা করছেন তা তোমার ভাল, র অজই। মাসে মাসে টাকা পাওয়া নিয়ে তো কথা? তা টেট থেকে এসেই হোলো। তা হলে আর তোমাকে পার কে!”

অভিমান ভরা রগত হুঁততে, মাদুরীর দিকে চেয়ে বীরা অশ্বাশ বের,—“তাই বই কি! সিদ্ধকটি নামে রইল আমার, আর তার চাবি কাগি থাকবে মারের হাতে, কি রকমের টাকার জ্বিখেটা হলো আমার?”

“তা তুমি চাইলে কি আর মারের কাছে পাও না?”

“তা আর পাই নে? রাজার রাজার তিকে করলেও তো টাকা পরমা পাওয়া যায়। কিন্তু সেটা তো নিছক দান পরমাতের ব্যাপার। তা’ দিয়ে কি লাভ হবে আমার?”

আমতা আমতা করে মাদুরী উত্তর দেয়,—“আরে আগলে মা তোমাকে একটা পাকা পোক্ত লোকের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, তারপর সম্পত্তি তোমার জিবার দিতে চান। এ ক্ষেত্রে কুমারী যেহে তুমি, তা ছাড়া জমিদারী চালাবার মতো পাকা মাথাও তো তোমার নয়। সেই-অজই মা তোমার বকল চিন্তাতেই ঐ লম্ব করছেন। বিয়ে হলোই সটান একেবারে প্রাণেশ্বরকে নিয়ে গিয়ে জমিদারী চালাবে তুমি, সেজ্ঞ তাহলে কেন?”

বীরা উত্তর দেয়—“আমাকে বিয়ে না দিলে, বোতল হুঁকে কে আর জমিদারীটা ওড়াবে হলো? পেটে ভাত না থাকলে কি হবে,? দুখুঁজিতে এক একটা কি কম দিনগজ? তাতে যদি কোনও আটকুড়ের বাটা, কোনও মতে আনাই পেজে, কারো জমিদারীতে মাথা গলাতে পারব, তাহলে আর বন্ধা আছে? আজ্ঞা দিয়ে, বোতল উড়িয়ে, আর বাগানবাড়ীর প্রাচীর উপকটে দিন কাটাতে। মা আগে দিক না একটা বিয়ে কারো সঙ্গে আমাকে, দেখবে এক রাত্তিরেই এ্যামলা করবে। যে বাচ্চান বিদ্যানা চেড়ে পালাতে পথ পাবে না।”

গজীর রসিকতার তরীতে মাদুরী উত্তর দেয়—“তা এখন তুমি যা-ই বলো,—বিয়েটা হলে তখন তো প্রাণেশ্বর বলতে তোমার জিবার উপায় জল এসে পড়বে। বাগানীকে তুমি যতটাই বা বলো,—প্রেরের ব্যাপারে এঁরা একেবারে বাটা সোনা। মইলে আর একটা বাড়ি, একটা পিঠে করেও, আতীর স্বকনের কানেনা মাঝার কুলে নিয়ে, অকালে কুল ফেও এলি, পরবারের চিন্তা ক’রে মরে?”

অত্যন্ত ধোরে হেসে উঠে বীরা বলে,—“আর তার প্রের বাতা হচ্ছে বডো। হাফোর অকটি বৃদ্ধি হলো। ঐ মাতোবাজের বুড়ো বৃদ্ধি হলো বতখিন প্রেরেণ থাকবে ততদিন আর বেয়েদের নিস্তার নেই। ওগুলোকে শুদী করে মারা উচিত বুকলে।” তারপরে কিছুক্ষণ কি জেবে নিয়ে বীরা বলে ওঠে,—“তুমিও দেখছি চোরের লাকী পাট কাটা। বাইরে কেবিকের মেট্রিয়া বেচিকাটা পড়ে শেব করতে পারলে?”

কোন মতে নিজেই সামলে নিয়ে, মাদুরী উত্তর দেয়,—“অবশ্য কিছু কিছু পড়ছি, তবে সবটা পড়া কি পোছা কথা। তা ছাড়া আমার বুকে পড়তে হবে তো?”

“বুকতে পেরেছি তোমার দ্বারা ও লম্ব হবে না। বা মারাম্বক গেডি ভাক্তারের পামার পড়ছে, ও তোমাকে দুবোদন্তর খুদী না তৈরী ক’রে কিছুতেই ছাড়বে না। চলো এখন গিয়ে দুটি পেটে তো দিয়ে বাচি। রাত এখন

ন টার ক'ব নয়।"

সে দিন রাতে বিদ্যানার গুণে গুণে অনেক পুরোনো কথা মনে পড়তে লাগলো হাথুরীর। চাকা পল্লির সেই দুর্ঘর্ষ তান্ত্র লোকটার কথাই তার আগে মনে পড়লো। কি উৎপীড়নই না করেছিল সে হাথুরীকে বেশে আনবার জন্য। শেষ পর্যন্ত আর হুনিবে না পেয়ে, নিতাইকে নিয়েই উধাও হয়ে গেল। তবু ভাগ্যিস নিতাইকে যে ঘেরে ফেলেনি এইটুকুই রক্ষা। যদিও তাকে সেদিন উদ্ধার না করলে, তার জীবনে আবেগ তোড়া কি বিপত্তি ঘটতো: তার ঠিক আছে? কিন্তু বিনতিদি নিতাইয়ের সন্ধান পেলো কোথা থেকে? আর খেতে দিয়েই বা বাঁচালো কে তার অমন বোকা অর্থহীন ভাইটাকে! কতই বা বয়স তখন ওর? আট বছরও হয় নি। কি ভীতু আর কি বোকাই না ছিল! সেই লোক কোন বুদ্ধি খাটিয়ে এখনো কলকাতার বড়ো নগরে বেঁচে আছে তা হাথুরী কিছুতেই ভেবে পার না। বিনতিদি যেভাবে জোর দিয়ে নিতাইয়ের অবস্থিতির কথা বলেছেন, তাতে শুধু ভালভাবেই বেঁচে আছে, সেটা হাথুরীর বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় না। কিন্তু বে ছেলের, বাহুবের সঙ্গে কথা বলবার পর্যন্ত বুদ্ধি ছিল না, সে কি ক'রে বাঁচতে পারলো এই কলকাতার বড়ো নগরে? কথা বলতে বলতে কেবলি তার ছুই চকু স্ফুল হয়ে উঠতো, সেই লোক আকো বেঁচে আছে! নিচর তাছাড়া ওকে নগরের বাহিবে কোনও জায়গার ছেড়ে দিয়ে পালিয়েছিল। ওকে হাউ হাউ করে ব'লে ব'লে কাঁদতে দেখে, কোনও সন্ধানের লোক ওকে নিয়ে গিয়ে ২১ দিন বাসার প্রতিপালন করে, তারপর নিচর কোন অন্যথ আশ্রমে পায়েরেছিল। সেইখান থেকেই বিনতিদি নিচর গুর সন্ধান পেয়েছে। বাবু সে, সে তো রবিবার দিনই জানা বাবে। কিন্তু হাথুরী? সে হাথুরী তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে বাহুবের বড়ো জীবন বাঁচনের সুযোগ দিয়েছে, তার ধন্যও তো বিনতিদির জ্ঞানবার কথা। বিনতিদির কি একটা কাগজও তো

যেন হাথুরী চালাতো? কিন্তু তার কথা তো হাথুরীর একবারও মনে পড়ে নি বিনতিদির কাছে? অথচ তার তাইয়ের কথা সে তো ভিন চার বার জিজ্ঞেস করেছে! ছিঃ ছিঃ তারি অজ্ঞার করেছে সে! হাথুরীর কাছে, সে যে গোড়াতেই আশ্রয় পেয়েছিল, সে কথা বিনতিদিও জ্ঞানকরেই জানে। তিনিও তো তার কথা কিছু বলেন না? নিচর তার মনটা পরীক্ষা করবার জন্যই কিছু বলে নি বিনতিদি। মনে মনে সেবে বিনতিদি তাকে নিচর মহাশ্রাবণের মেহে বলে মনে করেছে। হাথুরীর পুরোনো বাসার গিহে, হাথুরী, বীণা বৌদির মৃত্যুর খবর পেয়েছিল। কিন্তু তার নতুন বাসার তো কোন সন্ধান সে আশ্রয় করতে পারে নি। নিজের প্রতি আকর্ষিক দৃষ্টি এবং লজ্জার হাথুরীর যেন সেই দুহুর্ভেদ যত্নে বেতে ইচ্ছে করছিল। কি ক'রে সে গিহে বিনতিদির রবিবার দিন দুখ সেখাবে? তাবতে তাবতে ভোর হয়ে গেল। হাসপাতালের ডিকটিতে বাথার জন্য সে তখন বিদ্যনা ছেড়ে উঠে পড়লো।

সরবের ভাসোটে সে দিন ভোর রাতেই হাথুরী ঘুম থেকে গেল। জেগে আনালায় ঠাঁড়িয়ে সে দেখলো অ্যাকাশ খেদাজর। ইতিমধ্যেই কখন যেন বিনতি এসে তারই বাটে আশ্রয় নিয়েছিল। শরৎ তখনও পাঁচ ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের সুবাসুটি জ্বলছিল; আর জুড়ের মতন বো বো করে শূন্যে বহছিল ঘরের বিরাট পাখাটা।

সহসা টেবিল সাইটটা ঝেলে, সুলাইট বন্ধ করে, পাখার মোশান কমিয়ে দিয়ে, কাগজ টেনে টেবিলের সামনে বসলো সে। কিন্তু লিখবার বড়ো কোনও স্রষ্ট, বা কাব্য রচনার উৎস তার মনে আগলো না। সহসা ডি, এল, রায়ের চক্ৰকণ্ট নাটকটা হাতের সামনে পেয়ে, তাই সে তখন পড়তে লুক করলো।

ঘুম ভেঙে টেবিলের দিকে নজর পড়তেই বিনতি তো অবাক! উঠে বসেই চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বললো, "কখনো তুমি বিদ্যনা ছেড়ে এখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছ?"

হনি জবাব দেয়, “আমি কি তোমার পাশ বাসিল নাকি? হাতের কাছে না গেলেই খুম ডেকে বার?” বলেই সে বইটা বন্ধ করে আবার জানালায় দিকে ফিরে চাইল।

যেকতে পা বাড়িয়ে হাই তুলে, মিনতি বলে—“নয় আবার! সে দিন বা স্তর দেখিয়েছ তার প্যামিৎ কি আজও আমাকে রেহাই দিয়েছে? নইলে আর নিজের বিদ্যনা ছেড়ে তোমার বিদ্যানার আন্তানা পেড়েছি। কিন্তু শরীরের ওপর এইসব অন্ত্যাচার তোমার ভাল হচ্ছে না কি?” বলেই সে, উঠে গিয়ে চেয়ারের পেশন থেকে, হনির গলাটা জড়িয়ে ধরে ব’ললো, “চলো না গো লম্বাটি স্তরে পড়বে চলো? নইলে কিন্তু সত্যিই আমার খুম হবে না।”

এমনি সময়ে দেয়াল খড়িতে টং টং করে ছুটা বেবে উঠতেই মিনতি একবার ঘরের খড়ীটা, টেবিলের আলোটা, আর জানালা দিয়ে বাইরের আকাশটার দিকে চেয়ে, বিম্বিত হয়ে বলে উঠলো, ওমা এ যে ভোর হয়ে গেছে। উঃ কি মারাত্মক রূপ করেছে আকাশে। তুমি তা হলে কতকণ উঠেছো গো?”

হনি উত্তর দেয়, “একটু আগেই।” বাইরে একবার বিদ্যা চমকে উঠলো।

মিনতি বললো, “আজ আবার বাধুরী আসবে। সত্যিই হনি ভেমন ঝড় বৃষ্টি হয়, তা হলে কি বেশেজারী হবে বলা দেখি?”

হনি বলে “তাকে আর কেলেঙ্কারী কি আছে। শুকে যেদিন প্রথম ঢাকাপটি থেকে পেরেছিলাম, সে দিনও আকাশ এমনিই বেবাজ্বর ছিল। আজ শুধু বিদ্যা চমকচ্ছে, সে দিন তড়ি তড়ি বৃষ্টিও পড়ছিলো। বড়ের পথের বাজী বারা, তারা কি আর বেব বারলাতে ভর পার।”

খুম শুকিয়ে মিনতি জিজ্ঞাসা করে, “তাকে তো তুমি তাম্বুৎ বেসে কেলেছিলে একটুখানি?”

হাতাবিক কষ্ট হনি জবাব দেয় “তা বেসেছিলাম

বৈ কি, একটা অলহায় বেনকে লোকে বেমন করে ভালবাসে ঠিক তেমন।”

মিনতি মুচকি হেসে বলে, “কতো অলহায় খুমও তো বিপবে পড়ে, তাদের কাউকে কি অমনি বিপবে পড়লে ঐ ব্যক্তিতে তুলে বাসার নিয়ে যেতে?”

“হরতো যেতার না। কারণ ঠিক ঐরকমের বিপবে তো কোনও খুমকের পড়া সম্ভব নয়।”

মিনতি কথা বাতায়—বলে, “কোনও খুড়ি বা আধা বয়সী যেতে হলেও বোধ হয় অমনি করে উদ্ধার করবার দুঃসাহস তোমার হতো না। হাজার হোক একটা খুমতী বলেই তো বাধুরী তোমার সাহায্য পেরেছিল, নইলে কি পেতো? উদ্ধার করেছিলে ক্ষতি ছিল না, কিন্তু বাসার নিয়ে না তুললেই পারতে। আরি যদি বলি তোমার দ্বীর্ঘ অকাল মৃত্যুর ঐটেই বড় কারণ, তা হলে কি কখনো সমর্থন করবে?”

“আজ স্টো নিচরই করবো। কিন্তু সেদিন সত্যিই শুভটা না ভেবেই, বাধুরীকে বাসার নিয়ে তুলেছিলাম, এবং তার পরেই বুকেছিলাম আমার তুল। এবং সেই জেডেই তো বাধুরী আমার বাসা ছেড়ে বাবার পর, আর একদিনও তার বোজ নেই নি।”

“আবার মতে কিন্তু ছুটা কানই তুমি অস্তায় করেছিলে। তার চাইতেও বেশী অস্তায় করেছিলে তুমি বাধুরীকে স্থান দেবার জন্য আমাকে অজ্ঞারোপ করে। সমাজের স্থানীভিকে আমরা না মানতে পারি, কিন্তু তাই বলে তো তাকে অবহেলা করা চলে না। দেশের কাজে নেবে, জঘেপের মেয়েরা যে লাহনা ভোগ করেছে, তাদের তুলনার বাধুরীর লাহনা মোটেই বেশী ছিল না। কিন্তু তবুও তারা শুধু বেশ হিঁতমায়ের সাহায্যেই গলারের জহতাবে বেঁচে থাকবার পথ পেরেছে। তুমি বাধুরীকে সাহায্য না করলে, হয়তো সে পড়ের অভল শুধু কুবে যেতো, নরতো ভেদন লোকের সাহায্য পেলে অনেক ওপরেও সে আত্মকে উঠে যেতে পারতো। খুম-রেজো বাহু বোধ হয় আবার কখনো জেন?”

“বৌবনের অভিমান থাকলে রাগ হুগুটাই তো আত্মবিক ছিল; কিন্তু আজ তো আমার সত্যিই রাগ হচ্ছে না?”

“ওটা যে তোমার ঘোষ, তা কিন্তু আমি বলছি না। শুধু দেখাবার চেষ্টা করছি, সংসারী লোকের তুলনায় তোমাদের শুকাওয়া কোষায়। আমাদেরও ভুঁই সৈনিক থেকে সংসারী মেয়ে হিসেবেই ধরে নিতে পারো। হয়তো দেশের কাজে নেমে, বহু বিভিন্ন নরনারীর সংলগ্নে এসেই, আমরা মনের অবস্থাটা একটু পাণ্টে পিঠে থাকতে পারি, নইলে আর বুড়ো বয়সে তোমার প্রেমে পড়ি? কিন্তু তবুও বেশ সবাকের অল্পশয়ন কিন্তু আমাদেরও মানতেই হচ্ছে।”

“তা হানো কতি নেই, কিন্তু সত্যিই আমি বুঝতে পারি না। আমার প্রতি তোমার এই প্রেমটা ধরা না ভালবাসা? খেয়াল না ভাগ্য বিড়ম্বিতকে সাধনা বেগুনা।”

“সে কি ভুঁই এতদিনেও বুঝতে পার নি? বেহের ভালবাসার বয়স যে আমার পেরিয়ে গেছে এটা তোমার খুব সহজেই ধোঁকা উঠিত। কিন্তু সে ক্ষত যেমনি আকাঙ্ক্ষার হুঁচু হর নি, তেমনি হুঁচু হয়নি আমার মনের। আজ তোমার ক্ষত আমার যে আকৃতি, এটা শুধু একটা মানসিক অবস্থারই মানসিক রূপাকর হার। ওতে আকিঞ্চন আছে কিন্তু আকাঙ্ক্ষা নেই, প্রেম আছে—কিন্তু তাকে সন্বেহ দিয়ে ঘাটাই করবার প্রয়োজন নেই। এও কি ভুঁই এতদিন বুঝতে পার নি?”

একটা গুলীও নিশাস বোচন করে বণি উত্তর দেয়, —“এতদিন ঠিক বুঝতে না পারলেও আজ যে বুঝলুম এই ভক্তই আদম উপভোগ করছি। কিন্তু বাইরে ভাবন বড় উঠলো যে, অন্ততঃ জানাশার শালিগুলাও তো বড় করে বেগুনার প্রয়োজন।”

শুধু শালি কেন, কাঠের পাটগুলোও বড় করে দিয়ে তারপর এলো ছুঁতনে কড়ের পতি নিরীক্ষণ করি।”

সবস্ত জানালাগুলো বড় করে দিয়ে, একটা দার

ভাঙ্গা শালির কাঁকের কাছে গাড়িয়ে গাড়িয়ে, মিনতি বাইরের বড়ের পতি নিরীক্ষণ করছিল। বীরে বীরে পেছন থেকে মনি গিরে তার গলাটা জড়িয়ে ধরে, বাইরের দিকে চেয়ে ব’লে উঠলো,—“এইটেই হচ্ছে আমাদের জীবনের একতরঙ্গ মনোভাব। জীবনের বিকল্প গতিক্ষেত্রের সঙ্গে, এই এলোমেলো কড় যে আমাদের জীবনে কতো বাস্তব—কতো সত্য, তা কিন্তু আমরা যোজাই কুলে থাকি।”

“আর তাই কুলে থাকতে পারি বলেই আমরা পথ চলতে পারি। নইলে কি আর আমাদের এক পাও এগুবার উপায় থাকতো?” হৃৎকেন্দ্রে হৃৎকেন্দ্রে তখন নিশ্চিত পতীর ভাবে বার বড়নে আবদ্ধ করে, আত্মল আবেগে কড়ের ছুর তাকুব নিরীক্ষণ করছিল।

বেলা সাতটার ভেতরেই আবার বধন বড়ের আকাশটা উজ্জ্বলিত হ’ল রক্তিমালে সুখরিত হয়ে উঠলো, বণি আর মিনতি তখন বলে বলে চা পান করছিল। মনি বললো,—“কি অদ্ভুত বেশ প্রকৃতির এই খেয়াল, একটু আগেই যে ধরনী রঙাভালে বাক্সিল, সেই ধরনী এখন কেমন শান্ত সমাধিত বেশ ধারণ করে হৃৎকেন্দ্রে বিস্তরণ করেছে।”

“আর তার সঙ্গে আমার খেয়ালটারও ভুঁই আজ ব’লো যেবে কি না জানি না, তবুও বা বলছি তা সত্য।” এই বলে, নিতাইকে সে কি করে কুড়িয়ে ধরে স্থান দিয়েছিল, তার সম্পূর্ণ ইতিহাস বণির কাছে বিবৃত করে, শেষে বললো,—“ভুঁই বধন সাধুরীকে স্থান করে দেবার ক্ষত আমাকে লীড়াপিড়ি করছিল, ঠিক তার পূর্বেই আমি নিতাইকে পেয়ে আশ্রয় দেই। অথচ এই নিতাই-ই কিন্তু সাধুরীকে হারাণো তাই এবং আমাদের পোবিন্দপুর ট্রেটের সরকারের একমাত্র পুত্র। আমার এখানে থেকেও কি আজ পর্যন্ত তা টের পেরেছে ভুঁই?”

বহা বিম্বিত হয়ে মনি বললো,—“তা তো পাই-ই নি, কিন্তু সাধুরীকে আশ্রয় না দিয়ে, তার ছোট তাইকে যে যেন ভুঁই সত্যমেনে রূপে স্থান দিয়েছিল, সেইটেই তো আমার কাছে আশ্চর্য মনে হচ্ছে।”

“এতে আশ্চর্য হবার একেবারেই কিছু নেই। নিতাই আমাদের টেটের একজন বিখ্যাত কর্তব্যচাষীর পুত্র। এমনিসেই তার, এবং তার নিমি বাধুরীর প্রতি আমাদের একটা কর্তব্য ছিল। কিন্তু তার অর্থ এ নয় যে, নিতাইকে আমি সম্মানের রূপে নিজের বাড়ীতেই স্থান দেবো। আমার মনের যে জ্বলন্ত দুঃখের্ত, যে অবস্থার একে আমি বাড়ীর দরজার শেষে আমার আগাধার করে বাড়ীতে ঢুকিয়েছিলাম, সে অবস্থাটা ছিল লক্ষ্যের চাইতেও বড়, উপলক্ষে পৌঁছবার এক অস্বস্তিক্রমের চেষ্টা। কিন্তু বাবা আমাকে সেজন্য কেউ দিল না। এই জন্য যে, দাদা বৌদি সমস্ত বাঙ্গা মুক্ত লোক জানতো, নিতাই আমাদের সরকার মশায়ের ছেলে। জুনি লক্ষ্য করেতো কিনা জানি না, নিতাই কিন্তু আমাকে বায়ের মতনই ভয় ভক্তি করে। এবং জুনি শুনে আশ্চর্য হয়ে বাবে, যতদিন দাদা বৌদির ওখানে আমি ওকে নিয়ে ছিলাম, ততদিন আমার নির্দেশ ছাড়া ও কিন্তু আমার দাদার ছেলেদের সঙ্গেও কোথাও বাইরে বাবার সাহস পেতো না। আমি তো আর ওর মানই, কিন্তু ওর কাছে, ওর যত্নের স্বভাবের অন্তই, আজ আমার রক্তিম বাসেতে থাকবার এই যে আকাঙ্ক্ষা, একে বাঁচাতে আমার যে কতদিকে কতভাবে হাঁসিয়ার থাকতে হয়, সে কথা শুধু আমিই জানি। কিন্তু এ অপত্য রেহ তো আর আমার বাধুরীর প্রতি খাটতো না? নিতাইয়ের ব্যাপারে উপযুক্ত আশ্রয়ের একান্ত প্রয়োজন ছিল,—নইলে ও বের যেতো; এবং তার কপে একটা ভয়ঙ্কর সমস্ত অতীত স্নান এবং সন্ন্যাস হসাতলে যেতো। কিন্তু বাধুরীর ব্যাপারে বরং বাওয়া না বাওয়াটা ছিল তার সম্পূর্ণ নিজের হাতে। আমাদের সাধ্য্য নেওড়া বাধুরী প্রয়োজন মনে করলে, সে তোরার সাহায্যে আমার কাছে আবেদন পাঠাতে। না,—বরাবর নিজেই সে টিকানা নিয়ে আমাদের কাছে চলে আসতো। কিন্তু তা না এসে, সে বা করবে, তা তার বিভাবুতি অস্থায়ী যুব ভালিই বলতে হবে। ইচ্ছে করলে সে তো পড়ের অন্তর ভলেও ভুবে যেতে পারতো।”

“কিন্তু এই ভুবে বাওয়া না বাওয়ার ভেতরে ওর বা অপরাধ, সবটাই কি তার নিজের প্রাপ্য? ওর জন্য কি আর কাউকেই দায়ী করা চলে না? পদাশ্রয়টা কি সব সময়ই মেয়েদের নিজেদের ওপরেই নির্ভর করে? বাবা ওকে বিপথে সেবার চেষ্টা করেছে, তাহা কি অপরাধী নয়?”

“অপরাধী তো বটেই। মুক্তি, আত্মোপায় এবং আইনের নজীর দেখিয়ে, যুব লহজই তারের দায়ী এবং দোষী করা চলে। কিন্তু সেটা তো মিথ্যা। আত্মিক ইচ্ছার বিরুদ্ধে আজ পর্যন্ত কোনও সাংবাদিক মেয়েকেই বিপথে নিয়ে কারো সুবিধে হয় নি, যতকণ না মেয়েরা নিজেদের পরাধীন নিজেরাই পরিপূর্ণ প্রেরণ দিয়েছে। সেক্ষেত্রে বাধুরী চমৎকার আত্মরক্ষা করেছে।”

যদি শুধু বিবর্তের মতো একাধি দৃষ্টিতে মিনতির দুখের সিক্রে চেরে হইল, কথার উত্তর নিতে পারলো না।

মিনতি বলে চলে,—“সেখের হাওয়া এখন প্রতিদিন বদলাচ্ছে। আজ যেয়েনের ভেতরে যেটুকু বাতাবাড়ি বেগছে। এর মূল রয়েছে সমাজের অব্যবস্থা, যার ফলে অশিক্ষিত মেয়েরাই আজ সংসারের দীর্ঘ স্থানে বসে কঠোর খাটতে পারছে। কারণ সংসারে কঠোর খাটতে তাহা পুরুষের চাইতে বেশী ওস্তাদ, অগত বিধান সেবার বেলায় কিন্তু তাহা রীতিনীতি এলিয়ে পড়ে। এইখানেই অশিক্ষিতা মেয়েদের কাছে তাহাদের একটা বিরাট অসহায়তা, দিনে দিনে অসহায়তার এক বিরাট প্রাচীর গড়ে তোলবার স্বেচ্ছা পাচ্ছে। তাই এতোকটা পরিবার আজ কিং কর্তব্যবিমূঢ়। একে আত্মবিক্রম অবস্থার আনতে হলে, আজ চাই মৃত্যু করে সমাজের আত্ম সংস্কার করবার ব্যবস্থা, আর সেই সঙ্গে চাই মেয়েদের গড়ে তোলবার অন্তর শিক্ষা ব্যবস্থা। নোট্রুপ করা ডিক্রীর মোহের দুর্নীতি, দেশের দুঃস্থ হুস্তীকে আজ ওর অপরাধী করে তোলে নি, সমূলে ভাসিয়ে আঁবনের সুই কাঠাঠোকাতে তাকে চুরমার করে

দেবার চোঁটার উঠে পড়ে লেগেছে। আর তার প্রশ্রয় দিতে চলেছো তোমরা! অজান্তে সমাধে। তাই কালের যাত্রার চাইতে, কুচক্রী শাস্ত্রবের ভীড় বস্ত্র বেশী বাড়তে, ভতো। বেড়ে উঠছে মেয়েদের তেতরে অর্থহীন স্বাধীনতার বোহ।” এমন সময়ে পাঁচির বা কন্দের সমুখে হাজির হতেই মিনতি বোললো,—“আজ একটু পোলাও মাংস টাংল আমাদের খাওয়ারে পাকো পাঁচির বা ? একটি বেরকে আজ নেমস্তর কহেছি কিয়, সে জুসুয়েই এখানে থাকে।”

একগাল হাসি হেসে পাঁচির বা জবাব দেয়,—“আপনার ইচ্ছে হলে তাতে আর আমাদের আপত্তি কিসের বা। আমি এজুনি ঠাকুরকে সব ব্যবস্থা করে দিছি।” বললেই সে চলে বাহিরা। মিনতি তাকে ডেকে বললো,—“তুমি একবার নিতাইকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিবে বাঙ তো।”

“এজুনি ডেকে দিছি বা।” বলতে বলতেই পাঁচির বা চলে গেল। বনি বললো,—“গভাই তোমার জ্ঞানের গভীরতা দেখে আমি আজ খুঁচ হয়েছি মিনতি। মেয়েদের সম্পর্কে এতখানি নিরপেক্ষ নৃষ্টি, আর কোনও মেয়ের স্বাধীনতা, ঠিক তোমার বক্তো করে ব্যক্ত করার সংসাহস বোধ হয় অনেক মেয়েরই নেই। তোমার এই বচসা থেকে, অভিজ্ঞতার ব্যাপারে অবন্ত: আমার আজ কিছুটা উপকার হল।”

উজ হাত করে মিনতি উত্তর দেয়,—“ঠাট্টা করছো তো ? তা বাই করো, আমার মেনের মেয়েদের উন্নতি আমি সর্ব্বাধিকারবেই কামনা করে থাকি। কিন্তু সে কথা বক্তো জোরেরে ঠেঁচিয়ে বলি না কেন, কারণেই তাতে কোন উপকার হবে না। বাধুদীর কথাতেই এতভলো কথা। আজ আমার খুঁচ থেকে তোমার কাছে বেরিয়ে পড়লো।”

এমনি সময়ের বরজার সমুখে নিতাই এসে দাঁড়াতেই মিনতি তাকে ভেতরে এসে বসতে বোললো। এতো বহু সময় জাকের নিতাই কিছু বলি আর মিনতির

কাছে চেয়ারে উপবেশন করতে লজ্জা লালস পেল না। সে ভুপ করে মিনতির পাশে এসে দাঁড়িয়ে যেরে একটা ছবির দিকে চেরে বইলো।

মিনতি তার হাত ধরে টেনে, একটা টুলে বসাতে বসাতে বললো,—“অজ্ঞা বোক: ছেলে তো। বোলো এইখানে, আজ তোমার দিদি আসবেন।”

অতি অবসাদ কেনন যেন বিজ্ঞ হতে গিয়ে, বিম্বিত নৃষ্টি বলে, নিতাই বলে উঠলো,—“দিদি ?”

“হ্যাঁ তোমার দিদি। যে দিদির কাছে খাবার জ্ঞত একমিন তুমি আমার কাছে কতো কৈদেছিলে মনে নেই ? সেই দিদি আজ তোমাকে নিতে আসছে।”

কথা শুনে নিতাই বেন আকাশ থেকে পড়লো। আর সেই সঙ্গে লকেই তাহবার কথা এবং দিদির কথা তার এতো বেশী মনে পড়তে লাগলো যে, তাতে তার মনে শুভুর আর দৃষ্টিভাটাই প্রবল হয়ে উঠলো। খুঁচ শুকিয়ে নিতাই বললো,—“জামাকে কি আর আপনার কাছে রাখবেন না বা ? তা হলে কে আমাকে এত যত্ন করে লেখাপড়া শেখাবে ?”

“কেন তোমার দিদিই শেখাবে। সে এখন খুব বড়লোক। তোমাকে সে কত ভালবাসে জানো না তো ? এজুনি এসেই দেখতে পাবে। তুমি যাবে না তার সঙ্গে ? সে তো তোমার দিদি, আমার চাইতেও সে তোমাকে বেশী আর মত্ন করে মাহুত করবে।”

লজল চক্ষে, কীদো কীদো হয়ে নিতাই বলে ওঠে,—“তা হোক গে, তবুও আমি আপনার কাছ থেকে কোথাও যাবো না কিছু, দিদি এসে তাই বলে দিল না আপনি ? আপনার বক্তো করে দিদি কোন দিন আমাকে লেখাপড়া শেখাবে না।”

এমনি সময়ে যদি উঠে বগলো,—“আমি একটু বাধকম থেকে আসছি।” তারপর সে চলে গেল।

মিনতি শুখন শাখনার দলে নিতাইকে বোঁসালো,—“লেখাপড়া শিখতে শিখতে, তুমি কি দিন দিন বোক: হয়ে যাচ্ছে ? তোমার দিদি যদি তোমাকে তা নিতে

চায়, বা নিয়ে যদি লেখাপড়া না লেখাতে পারে, তখন আবার ভূমি আবার কাছে চলে আসবে। মিত্র ওদের যেমন আমি স্থল ছোট্টলে রেখে পড়াছি, তোমাকেও তেমন পড়াবো। সেমত তাবছো কেন? চুপ করে বসো, একুনি তোমার দিবি এসে পড়বে। খবরদার তার মনে কষ্ট দিবে কিন্তু কোন কথা বলবে না। তা হলে আমি কিন্তু ভয়ানক রাগ করবো।”

বেলা প্রায় নটার সময় মাধুরী এখন এসে মিনতির পেটের কলিৎ বৈল টিপলো, তখনো তার মন শশের মৌলার উৎকিষ্ট বিকিষ্ট বোল বাচ্ছে। সেডি ভাতারের কাছে অস্থবতি নিয়ে আসবার মুখেও মাধুরী তাঁকে বড় গলায় বলে এসেছে যে, সে তার ছোট্ট ভাইয়ের সন্ধান শেরেছে। মিনতিদির বাড়ীতে থাক তার নেহয়র। সন্টার পুর্বেই আত তার ভাইটিকে সে মিনতাই নিয়ে কিরবে। কিন্তু যদি আত নিতাইকে না পাওয়া যায়? যদি মিনতিদির ব'লে বসে, ‘আরও দিন করেক দেখী হযে তার ভাইকে পেতে।’ তা হলে কিরে গিরে সে কি বলবে তার সেডি ভাতার বাকে?

সহসা বিগতরক গেটের কাছে উদর হতে দেখেই সব কেমন বেন তাল গোল পাকিয়ে গেল মাধুরী। বোললো,—“ভূমি এই বাড়ীতে থাকো? আমি তোমার মাইজির কাছে বাবো:।”

হাত ব্রু নেড়ে বিগতর উত্তর বের,—“মাইজী কুখা? এখানে মাইজী টাইজী থাকে নি। এটা দিদিমনির বাড়ী আছে। তার সঙ্গে বোখা করিবে তো এসো।”

মাধুরী বুদ্ধি খাটিরে এগ করে,—“তোমার দিদিমনি নীচে নামবেন না?”

বিরক্ত হয়ে বিগতর উত্তর বের,—“উপরের লোক নীচে থাকিবে কেন? দেখা করিবে তো চলো। আমি দাঁড়াই থাকি কথা বলিতে পারিব না।”

মাধুরী তখন সংশ্লিষ্ট মন নিয়ে অগত্যা বিগতরের পিছু পিছু উপরে উঠতে লাগলো।

উপরে, মিনতির ঘরের দরজার সামনে মাধুরীকে পৌঁছে দিবেই, কড়ের বেগে বিগতর এক দিকে নিরুদ্দেশ হয়ে গেল।

কয়েক পদার্পণ করেই, মিনতির দিকে চোখ পড়বার সঙ্গে সঙ্গে নিতাইকে তার পাশে বসে থাকতে দেখে, আনন্দ বিশ্বরে মাধুরী মনটা কেমন বেন রোমান্সিত হয়ে উঠলো।

মিনতি হেসে বোললো,—“কি দেখছো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে? এইখানে এসে বসো, তাইকে কি চিনতে পারছো না? এই তোমার নিতাই।”

মিনতির কথাশেব হতেই নিতাই গিরে তার দিদির চরণে প্রশান করে যেমনি উঠতে যাচ্ছে, অমনি মাধুরী তাঁকে নিজের মুকের কাছে টেনে গিরে, দেখেই মনেই যেতেই চুপ করে ব'লে পড়লো। ছোট্ট দিগুটির মতন কোলের উপরে উপুড় হয়ে, নিতাই তখন দিদির কোলের জিতবে মুখ মুকোবার চোঁটা করছিল। ভাইয়ের কোমল অঙ্গোল দেখেই প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, পিঠের ওপর ঘেঁষ করম্পর্শ বুসিয়ে দিতে গিরে, চোখের জলের আঁকুল অঙ্গ সহজে সহসা বিশেষহার; হয়ে পড়লো মাধুরী। মিনতি বাইরে গিরে ততক্ষণে পাঠির বাকে জলযোগের করমান দিবে নিজের সিটে এসে বসেছে। বাবরুম থেকে এসে, যদি ঘরের ভেতরের সেই সব দেখে, সহসা কেমন বেন বেরাকুল বনে গিরে, জবুজবু বতো দেখে ইজিতেরারে গিরে উপবেশন করলো।

নিগিষ্ট বিশ্বরে হতবাক মিনতি, এক সময়ে চেয়ে দেখলো, নিতাইকে কখন কোল থেকে সরিয়ে দিবে, মাধুরী গিরে যদি পা ছুটোকে অড়িরে বরে হুঁপিরে হুঁপিরে কাঁদছে।

বেগে চলমান দিল্লি ক্যানের একটানা বোঁ বোঁ শব্দের সঙ্গে, মাধুরীর অতীতের অবলম্ব বেননার কাগা-সর মিনতির নিভৃত একোঠা তখন হারাগো সুরের নুঁনার সুধর হয়ে উঠছিল।

পুস্তক পরিচয়



লাল মাটি—ঐনাবাহন গল্পোপাখ্যায়। প্রকাশক :
 গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০০/১১ কলকাতা
 ট্রাট, কলিকাতা। দাম—চার টাকা আট আনা।

সাম্প্রতিক কালে বাংলা কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভাল উপজ্ঞানের প্রকাশ কমাবিধি চোখে পড়ে। যুগোপযোগী দৃষ্টিভঙ্গি ও মননশীলতার সঙ্গে সংবেদনবহী প্রকাশ-কুশলতার সার্বিক সম্বন্ধের অভাবে বহু শক্তিশালী সাহিত্যিক আত্ম সমাজ সচেতন বাঙালী পাঠক সাধারণের দাবী ও প্রত্যাশা পূরণে অক্ষর। এই অক্ষমতা ও অকৃত্রিম, কোমল ও হতাশার মধ্যে বাঁকে বাঁকে হুঁএকটি উপজ্ঞান সাহিত্য্য রসিকদের মনে প্রচণ্ড নাড়া দিয়ে যায়—পাঠক সাধারণের মধ্যেও উদ্ভীপনার সাজা জাগিয়ে তোলে। প্রখ্যাত কথাসিঙ্গী নারায়ণ বাবুর নতুন উপজ্ঞান 'লাল মাটি'তে সেই বিরল দৃষ্টি নৈপুণ্যের বসিষ্ঠ স্বাক্ষর আছে। কয়েক বছর আগে 'সম্রাট ও শ্রেষ্ঠ'র লেখকের মনস্কে সমাজ বিবর্তনের যে অসংগত রূপের আভাস পুড়িত হয়েছিল—উত্তর বঙ্গের লাল মাটির পটভূমিকার সেই প্রত্যাসর শ্রেণী সংগ্রামের প্রসঙ্গটি লজ্জাবন। এই উপজ্ঞানে সার্বিকভাবে চিত্রিত হয়েছে। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী অধ্যাত্ম বিদেশী শাসন-যুক্ত বিভক্ত বঙ্গ ভারত ও পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ স্বদেশী শোষণের ধাতাকলে আতঙ্ক সমাজিকভাবেই নির্মিষ্ট হয়ে চলেছে। উত্তর ও পূর্ববঙ্গের হরিত্র মূলধাম জনসাধারণ যে স্বাধীন পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখেছিল একদিন—এ সে স্বাধীনতা আজ পাকিস্তানের হনিক-শ্রেণীর কবরস্থ। শোষণ ও শোষিতের মধ্যে শ্রেণী-সংগ্রামের শেষ যোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই ব্যক্তিগত সোভ

ও লালসার কবরের উপর সর্বমানবের সমষ্টিগত কল্যাণের স্বামী বনিম্বাধ রচিত হতে পারে এই বিশ্বজনীন সত্যোপলব্ধির সাধনা উত্তর বঙ্গের লাল মাটিতেও একদিন সিদ্ধিলাভ করবে, এ আশা মোটেই ভ্রমশা নয়। কিন্তু এই আশাকে বাস্তবে রূপান্তরের দায়িত্ব শুধু রাজনৈতিক কর্মীদের নয় মানবাত্মিক শিল্পী ও সাহিত্যিকদেরও। আলোচ্য উপজ্ঞানের মধ্যে নারায়ণ বাবু সেই বহু দায়িত্ব পালনের চেষ্টার দক্ষতা ও আত্মবিকার পরিচয় দিয়েছেন।

নারায়ণ বাবুর পূর্ব-প্রকাশিত উপজ্ঞান 'শিলালিপি'র নায়ক চরিত্রে অকলম্বন করেই 'লাল মাটি'র কাহিনী রচিত হয়েছে—কিন্তু পূর্বোক্ত উপজ্ঞানের সঙ্গে আলোচ্য উপজ্ঞানের কাহিনীগত সংযোগ এতই কীণ যে, 'লাল মাটি'কে বহুসংশ্লিষ্ট উপজ্ঞান বলেই গণ্য করা চলে। দু'থকে লেখক নিজেও তা স্বীকার করেছেন।

কর্মী রজন চট্টোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অজ্ঞানত্বানের কথা দিয়ে উপজ্ঞানের আরম্ভ হলেও—কাহিনীর নিজস্ব শ্রেণীভাবে আদর্শবাদী তুলনাটার আলিঙ্গনীর চরিত্রই এই উপজ্ঞানে প্রাধান্য লাভ করেছে। সেনের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন পর্বায়ে রাজনৈতিক ও সামাজিক জটিলতার আবর্তে এই আদর্শবাদী স্বদেশাত্মিক মূল-মান কর্মীর স্বীকৃতি, যে তাল। গড়ার খেলা চলেছে—কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পূর্বকাল পর্যন্ত বিভিন্ন অভিজ্ঞতার

আলোকে তার মানসিক চিন্তাব্যবহার ক্রম-পরিবর্তনের ইতিহাস এবং পরিণেবে পোষণ হুজ্ব শ্রেণীধীন সমাজের প্রতিষ্ঠা কাব্যনার এই অধ্যাত গ্রাম্য শিল্পকের আত্ম-বিস্তারনের সৌন্দর্য—সমাজ-সচেতন সাহিত্যিকের লেখনীতে নিপুণভাবে বিমোচিত হয়েছে। আলিহুদীর চরিত্র চিত্রণে নারায়ণ বাবুর কৃতিত্ব সত্যই অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভের যোগ্য। কিন্তু সেই ছুসনার উপজ্ঞানের অজ্ঞাত পার্থ চরিত্রগুলি সর্বাঙ্গীন বিকাশের সার্থকতার তেমন উচ্ছল হয়ে উঠতে পারে নি। হুজ্ব রাজবন্দী রজন চট্টোপাধ্যায় এবং কুব্জ-সংগঠনের নেতা নগেন ভাস্কর ও তার যোন উত্তমার কর্মজীবন সম্পর্কিত ঘটনা বিবরণে বরতা—পার্থকের মনে অতৃপ্তির ছায়াপাত করে। ইচ্ছা-ভারতীয় গোত্রের ক্যাক-মল্লতির দারিদ্ৰ-বিভূষিত বিরোগাশ্রয় প্রায়-কাহিনী উপজ্ঞানের মূল ঘটনা প্রবাহের সঙ্গে প্রায় সম্পর্কহীন এবং সেই কারণেই প্রাক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। যেসের ঘেরে কালাপানীকে কাহিনীর শেষ পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়ে এক নাটকীয় রোমাঞ্চিক পরিবেশ সৃষ্টি করারও কোন প্রয়োজন ছিল না। অপর দিকে, সমাজের শোষণ শ্রেণীর প্রতিিনিহি হিসেবে হিন্দু অবিদ্যার কুমার ভৈরবনারায়ণ ও মূলমহান ভাস্করকার কান্তে না পাঠানের চরিত্র চর্চাতে আবিপত্য-দোষী কাহিনী সার্থপরায়ণতা এবং লালসাকুর শঠতার বর্ণনা বহুদূর উপযুক্ত হয়েছে। ধর্ম ও সমাজের নির্বিপেয়ে প্রাক্ষিপ্তের প্রথমাবধি সাধারণ মানুষের শোষণ ক্রিষ্ট জীবনের সনিকরণের বলে যে বিরাট দুর্ঘটিত সংঘটনীয় শক্তি অত্যাধিকার ঘটে পারে—এই উপজ্ঞানের মধ্যে ছুদী, আহীন, সাঁওতাল ও মূলমহান বাহিরী সমাজায়তন বহির্ভূত বর্ণনাব্যবস্থার সেই সম্মিলিত অভ্যুত্থান ও গণ-চেতনার উদ্বোধন মূলক ঘটনা পরম্পরায় বর্ণনাও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

উপজ্ঞানের কাহিনী বিভাগে নারায়ণ বাবুর অঙ্গন ভাষা ও বর্ণনাত্মক পঠক চিত্রে যথেষ্ট-প্রাচুর্য বিস্তার করতঃ এ কথা সত্য। কিন্তু ভাষার সজ্জিত ও বর্ণনার

মনোহাযিৎ ছোট গল্পের সার্থকতা ও রসোত্তীর্ণতার বাহনরূপে বর্তমানি কার্যকরী উপজ্ঞানের ক্ষেত্রে ঠিক সেই পরিমাণে নয়। উপজ্ঞানের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষিতে, বর্ণিত চরিত্রগুলির বিকাশ ও পরিণতির ক্রমপর্ষায় মূলক ঘটনা নির্ভর হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ঔপজ্ঞানিক নারায়ণ বাবুর রচনারীতিতে এই ভাবনামা সর্বত্র সুস্থিত না হওয়ার অভিযোগ উপেক্ষণীয় নয়। কাহিনীর পটভূমিকে ব্যাপক ও বিস্তৃত করে তোলায় দিকে তিনি বর্তমানি প্রাঙ্গণশীল, চরিত্র ও ঘটনার ক্রমবিকাশের তৎপর্ষে বিলম্বণে পত্তীয় অভিনিবেশের পরিচয় দিতে তিনি ভক্তবানি সজেই মন। 'লাল মাটি' উপজ্ঞানের বিবরণত উৎকর্ষ সত্ত্বেও রচনারীতির এই দুর্বলতা কথেক কথেকে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। বাস্তব জীবনের মূহু ও গ্রামি অর্জবিত কাহিনীর বর্ণনাকালে উপজ্ঞা ও উৎকর্ষের অভিরিক্ত প্রয়োগ বর্ণিত বিবরণের সহজ স্বাভাবিকতাকে অনেকাংশে হ্রাস করেছে। কানারহাটের ডাঁড়ার মুখে বাঁধ রেবার সংকল নিয়ে কাহিনী প্রাঙ্গণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে উত্তম বিকৃত অন্তার বর্ণনা প্রসঙ্গে, অত্যাধিকার আকাশ থেকে বিদ্যুতের তরোয়াল হাতে কৈবর্ত বিদ্রোহের নারক হিম্মোহের আবির্ভাবের বর্ণনা অহেতুক ভাবপ্রবণতার পরিচায়ক। সমাজের আকর্ষণীয় জীবন বাস্তবকে দেখে গোরস্থানের শব-সন্ধানী শিরালের হঠাৎ চমক লাগা ও অপরীক্ষী প্রেতমূর্তির সঙ্গে পূর্ণাঙ্গ নিম্নগণে সংশয়গ্রস্ত হওয়ার বহুচিহ্নিত বর্ণনা বাস্তবের চূড়ান্ত উদাহরণ। অতি নাটকীয় চমকপ্রদ ঘটনা সর্বোপদেশের বৃষ্টাৎ হিসেবে ক্যাক সাহেবের অপমৃত্যু হুজুর দৃষ্টটি উল্লেখ করা চলে। কাহিনীর উপজ্ঞানকে দেখকের আত্মবোধবাণ্ড অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে।

নারায়ণবাবু শক্তিমান সাহিত্যিক—তার কাছে বাঙালী পাঠক সাধারণের প্রত্যাশা অনেক। তাই একপ্রান্তরকৈ কাননা করি—তার লেখনীর সৃষ্টি মূলমহান নিম্নলিখিত সৌন্দর্যের সঙ্গে সহজ স্বাভাবিকতার বিবরণিত

হরে উঁকু এবং তবিলত উপভাস রচনার উঁচর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে অধিক বোধের সঙ্গে তার কল্পনার বাস্তবায়নিত হ্রদ প্রকাশ নৈশুণ্যের সম্বন্ধে হুঁক।

সংজ্ঞাব্যবহার

জেলখানা কারাগার—বুঝি কথা। লেখক—
শ্রীনিবাস সেন। গণনীপাষণ পাখিসিলাস, ১৭০-এ,
আখ্যায়িকা সাহু'র যোগে। সূত্রা তিন টাক।

নিঃসন্দেহে লেখক নবায়ন, কিন্তু বইখানি পড়ে
মনে হোল, তিনি বাংলার পাঠক সাধারণের খুবই
কাছের মানুষ। এমন স্বল্প সাবলীল লিপিক্রমলতা
বহুকাল চোখে পড়েনি। ১৯৩০-৩১ সালের বাংলার
বিদ্যাবী ভীত ইংরেজ সরকারের অসংখ্য সর্বভাষ্যগম্যতার
মধ্যে অল্প রামপুস্তানার সেউলীর বন্দী নিবাস একটি
স্বরসীর কীতি। লেখকের লেখনে রাজবন্দী হিসাবে
স্বাধীনতাবাদী দাবীকার সৌভাগ্য হয়েছিলো, (সৌভাগ্যই
বলবে, না হ'লে এ প্রকৃতি আশ্রয় তাঁর কাছ থেকে
উপহার পেতাম না) তাঁর সেই কাব্যজীবনের ক্ষু-
বেদনা অর্জিত ক্লাস্তিকর দিন বীজার মধ্যে ব'লে অপর
হাস্যরস ধারার অতিবিক্ত ক'রে যে কাহিনী তিনি
আমাদের পরিবেশন ক'রেছেন, তার ক্ষেত্রে তাঁকে
আমরা অন্তরের অভিনন্দন জানাই। একেকটি চরিত্র
তাঁর বর্ণনা ভঙ্গীতে পাঠক পাঠিকার মনে অক্ষর আসন
অধিকার ক'রে থাকবে। হারাণ, নকলী, রামপুস্তানার
দুর্ভাগ্যবান সর্গার জামিনে হাফি, কালুয়া, সুহ, কিলক
এরা অবিদ্যমান। আর বেলব দেশপ্রেমিক রাজবন্দী-
দের কেন্দ্র ক'রে এরা আবর্তিত হ'য়েছিলেন, তাঁদের
মধ্যে কণীবাস, বাজুবাস, জ্যোতিষবাস, ক্যান্টন,
জীবনবাস, হেমবা, বাটলিওয়ালা, কোহিনুরবাস উচ্চল
নক্ষত্রের মতো জ্বলছেন। ভবলা তরঙ্গিনীর কাহিনী
বাজুবাসের শিশুরহস্যের ঠিকানা, জ্যোতিষবাসের চিত্র
ভাবা, কণীবাসের টেলিগ্রাম, নকলীর মশারী টাঙানো,
সুহের পাট সরানো, জ্যোতিষবাসের হিন্দী কথা, কোহিনুর
বাসীর রাজ্য প্রদেশে হুঁকালগড়ান, ভিলকের বেড় টা

বাঙালানো, কণীবাসের হাংগার ট্রাইক, নকলীবাসের
এক স্বাধীনবাসের হিন্দী পাঠ, জীবনবাসের 'সকলিতা
পান', পুণ্ড্রবাসের জ্যোতির 'শিঙালা সিংহের রচনা',
ভিলকভাই প্যাটেলের বোমা, 'দ' বাবুর স্বপ্নালায়ে
সিঁদে ছুটবল খেলার কথা, কারিগর বিন্দুগজের
গণেশের মূর্তি নির্মাণ, সকলের শেষে স্বল্প লেখকের
'গোলকীপার' হুঁকাল কৃষ্ণেশ্বর বর্ণনা অনাবিল
হাস্য হাস্যর পাঠক পাঠিকাকে অতিভূত করে। ঠিক
তারই পাশাপাশি মৃণালকান্তির আত্মহত্যা, ফিলে
সাহেবের 'ডকলমার্চ', সুহের বৈশব ইতিহাস, শ্রীমুখ
সতীল সেনের নির্ভাতন, মন্টু ও হুম্মার দাদার কাহিনী,
সকলের শেষে শ্রীমুখ হরিণর বাগীচীর নীরব অপসরণ
ভেতন বনকে বিবর ও ভারাক্রান্ত ক'রে তোলে। হাসি
এক অক্ষর কতিন এক কোমলতার অপরূপ সমাবেশে লেখক
সমস্ত গ্রন্থের মধ্যে একটি চমৎকার স্রেরের বসি ক'রেছেন।
কোন কোন আরগার রচনার মধ্যে সামান্য ক্রান্তির স্পর্শ
থাকলেও, মূল স্রের কোথাও বাধা পড়েনি। লেখকের
'ছর ছোট' কথা ছুটির প্রতি একটু দুর্বলতা আছে দেখা
গেলো। হুঁকাল প্রমাণ প্রায় নেই বললেই চলে।
প্রজ্ঞদশট চমৎকার। এই গ্রন্থের মধ্যে বেলব চরিত্রের
আনন্দ সামান্য পেরেছি তাঁদের মধ্যে মন্টু ও হুম্মার
দাদাকে আমাদের অন্তরের নমস্কার জানাই, আর
নমস্কার করি শ্রীমুখ সতীল সেনকে। এই রচনার মধ্যে
যিরে খেটুই দেখেছি, তাতে মনে হয় কিছুকাল বা বহি
শ্রীমুখ সেনের জীবনী রচনার কাজ হাতে নেন, তা
হ'লে বাংলাদেশ আরেকটি ভাল গ্রন্থ উপহার পাবে।

নারায়ণ বসোপাধ্যায়

বাংলার জীবনীকা—(১৮০০-১৮০১): জীবনোপল
চন্দ্র বাগল। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। আট আনা।

বিষয়বস্তু সংগ্রহ নিরীক্ষার অন্তর্গত আলোচ্য
বইটিতে ইংরেজী ১৮০০ থেকে ১৮০১ সাল পর্যন্ত বাংলার
জীবনীকা আলোচনার ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।
তদানীন্তন সামাজিক পরিস্থিতির এই আলোচনার

ইতিহাস বাংলার সমাজ বিবর্তন সম্পর্কে অগ্রদূত সাধকের কোকুহল অনেকাংশেই চরিতার্থ করবে। বঙ্গ পরিদর্শনে উন্নতিশীল শতাব্দীর ত্রীশিকা আন্দোলনের স্বরূপটি স্পষ্টভাবে উন্মোচিত হয়েছে। শিক্ষা বিস্তার বিধানে ইংরেজের যিন্দারীদের কাছে আমাদের ভুলভ্রান্ততার অন্ত নেই। তাদের উদ্বেগ সত্যকে বৃত্ত বৃত্তেই থাকনা কেন।

১৮১৬ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে অল্পতম লড়াই শিক্ষা খাতে বাৎসরিক এক লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সেই তুলনায় বাবীন ভারতের বাজেটে শিক্ষা খাতের ব্যয় এমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

আরও একটা মজার ব্যাপার যিন্দারী মহিলা পরিচালিত স্কুলে ভদ্র বংশের বেতেরা কেউই পড়তে যেত না। ছাত্রীদের অধিকাংশই আসন্ন নিরপ্রেমী থেকে। এরপর বেতন স্কুলের অধ্যক্ষ-সভা কর্তৃক প্রচারিত বিজ্ঞপ্তির একটি অঙ্কচ্ছেদে দেখতে পাই, 'ভদ্রাভি ও ভদ্রবংশের বালিকারা এই বিদ্যালয়ে প্রবেশ হইতে পারে তদ্ব্যতীত আর কেহই পারে না।' নিম্ন শতকের পঞ্চদশশতকেও এই মানসিকতার হাত থেকে শিক্ষা বিতাগ পুরোপুরি মুক্তি পায় নি।

অল্প আয়ালে ত্রীশিকা বিজ্ঞানের গোড়ার কথাটুকু দ্বারা জানতে চান সেই কৌতূহলী পাঠকমানিকেই পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

একক : শুদ্ধস্ব বহু ও বীরেন্দ্র বাল্লিক সম্পাদিত। একাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। ৪৪০।১, কালিঘাট রোড। কলিকাতা-২৬। মূল্য আট আনা মাত্র।

কবিতার পাঠক সমাজ যখন বিশ্বের সর্বত্র সীমাবদ্ধ, কাব্যের মূল্যায়ন যখন হ্রাস পাচ্ছে তখন সেইরূপে বসে 'একক' পত্রিকাখানি একাধি নির্ভালসকারে কাব্যের

প্রচার ও প্রচারককে নিঃসংশয়ভাবে এগিয়ে চলছে দেখে বিস্মিতই হতে হয়। অথচ অবশেষা পেরেও হতোভয় হয়ে পড়েনি, দীর্ঘ এগার বছর কাব্যের চক্রে টকল দিয়ে নতুনদের খাব এনেছে কাব্যরসিকদের কাছে। কবিতার কাগজের এত দীর্ঘদিন আত্ম আয়াদের দেশেও সম্ভব হলো চাক্ষুষ দেখে অবস্থান করার কারণ থাকে না। সংপাঠক লবকাশে, লবদেশে কিছু না কিছু আছেই তার প্রমাণ 'একক'। নির্ভালসকারি পড়েনি বলেই কাগজখানি দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়েছে, নিজেও বক্তব্যের জোরে নিজের স্থান দখল করে নিয়েছে। এখিক থেকে তাকে আদরা কল্লোলের পরিপতি বসতে পারি। কল্লোলযুগে দ্বারা একবর্ষের সংগত করতেন, এককে উদ্বাহই পরিপতি বসলে অল্প হ্রস সংগত করতেন দেখতে পাই। কাগজ-খানিতে কোন গোছাই প্রদান নয়, সব সাহিত্যিকের একত্রীকরণ হয়েছে কাব্যের বিরতি চক্রে। এখিক থেকেও 'একক'-এর ভূমিত্ব লক্ষ্যনীয়।

বর্তমান সংখ্যার প্রদান-নবীন কবিদের লেখার লেখার প্রমাণ মেলে। লেখানে শিবরাম চন্দ্রবর্তী, বিনলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র, ভাঃ লীলারঞ্জন রায়, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়, শুদ্ধস্ব বহু, হুম্মিল রায়, বীরেন্দ্র বাল্লিক, রমেন্দ্র আচার্য চৌধুরী, তবানী মুখোপাধ্যায়, নির্মলকান্তি মুখোপাধ্যায়, রমেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অসিত বেন, উপেন্দ্র নাথ সেন প্রভৃতি একত্রিত হয়ে এককের অভিনব বঙ্গার রেখেছেন।

কবিতাপত্রের প্রচার এবং পাঠক সংখ্যা অল্প লব দেখেই। আদরা পত্রিকাখানির বহুল প্রচার কামনা করি। পরিচ্ছন্ন কাগজের প্রয়োজন খুবই, সেখিক থেকেও 'একক' লক্ষ্যভেদ করেছে।



জাগতিকি

বহুদিন পরে আগতিবি সিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে পৃথিবীর রাজনৈতিক অবস্থার কোনরূপ উন্নতির আশা দেখিতে পাওয়া যায় না। বহু অবস্থা দিন দিন ক্রমশঃ গতিতে তৃতীয় মহামুদ্রের দিকে আগাইয়া চলিতেছে। যাকে যাকে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির ভিতরে খোলাপুঁচি আলোচনার প্রস্তাব উত্থাপিত হইলেও বিশ্বের সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহ সেই বিষয়ে কোনরূপ আগ্রহ দেখাইতেছে না। একদিকে যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহার সমরসজ্জার ব্যয়ভার প্রোতিলম্বিত্রাসনত সাপিতিক সংখ্যার বাড়িয়াই চলিয়াছে, অপর দিকে তেমনি সোভিয়েট রাষ্ট্রে জাতিপুঞ্জ প্রতিনিষ্পষ্ট ভাষায় বলিতেছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক অস্ত্রসজ্জার প্রাধিকার দাবী অস্বীকার। গত ডিসেম্বর মাসে সোভিয়েট পররাষ্ট্র মন্ত্রী মঃ আক্রে তিসিনিভি বলিয়াছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা উৎপাদনে পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে; এ কারণে জুল। প্যারিসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণ সম্বন্ধে যে আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বিষয় বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে। ব' তিসিনিভি একস্থানে বলিয়াছেন, মার্কিন সমস্ত জাঃ কিলিপ জেসপ্-বে কর্তৃক মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতে এই ব্যরণাই সঠিক হয় যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার মনে করেন, আণবিক শক্তিতে তাহাদেরই প্রাধান্য। "কিন্তু সরকারের এই ব্যরণাই কি সত্য? মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সরকার পূর্বে তাবিয়াছিলেন, আণবিক শক্তি উৎপাদনে তাহাদের একচেতীরা অধিকার আছে। কিন্তু তাহাদের সে ব্যরণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইয়াছে, পুনরায় এই ব্যরণা মিথ্যা প্রতিপন্ন হইবে।"

সুতরাং প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্র ক্রাসের সংগে সংগে আণবিক অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ করার যে ব্যরণা স্তব্ধ হইয়াছে, তাহাও সত্য, কারণ-আণবিক বোমা উৎপাদনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাধান্য এবং অস্ত্রের নির্বাণ ও সশস্ত্র বাহিনীতে সোভিয়েট কশিয়ার প্রাধান্য এই দুই তথ্যের উপর উক্ত ব্যরণা প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তথ্য দুটিই সত্য।

এই ইচ্ছিত ও প্রাক্কর তর প্রাণনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হইতে পারে তাহার প্রমাণ স্বরূপ নিম্নলিখিত সংবাদটি উদ্ধৃত করা গেল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিদেশে মূল, নৌ ও বিমান বাহিনীর বাট্ট নির্বাণের মন্ত ২৭৮,০১৮,০০০ ডলার ব্যয় ব্যয়াক অল্পমোদন সম্পর্কিত বিলটি অল্প মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদে বিনা পরিবর্তনে গৃহীত হয়। পরিষদে এই ব্যয় ব্যয়াক হ্রাস করিবার কোনও চেষ্টা হয় নাই। স্বদেশে এবং বিদেশে সামরিক ব্যয় সম্পর্কিত ইহা তৃতীয় এবং সর্বশেষ শাসনসামাজিক বিবেচক।

এই সময় সজ্জার প্রতিবোধিতার জর পরাজয়ের উপর তৃতীয় মহামুদ্রের নব্বা আবির্ভাবের দিনটি নির্ভর করিতেছে। আণবিক বোমার প্রাধান্য কে লাভ করিবে তাহা লইয়া যেমন প্রতিবোধিতা চলিতেছে তেমনি আবার নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের কাজও চলিতেছে। সম্মতি প্রার্থীতার এই বিষয়ে প্রস্তাব সোভিয়েট রাশিয়া অগ্রাঙ্ক করিয়াছে, বৃহৎ শক্তি সমূহের সর্বোচ্চ সৈন্য সংখ্যা স্থির করিয়া দিবার জন্য প্রতিষ্ঠা রাষ্ট্রসমূহ যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, সোভিয়েট রাশিয়া অল্প উচ্চ কার্যের অল্পমোদনী বলিয়া অগ্রাঙ্ক করে। বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহের বিমান শক্তি বা আণবিক শক্তিকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করা হয় নাই—ইহাও প্রস্তাব অগ্রাঙ্ক করার একটি কারণ।

অল্প নিরস্ত্রীকরণ কমিশনের বৈঠকে সোভিয়েট প্রতিনিধি ব' জ্যাকব মালিক সোভিয়েট সরকারের এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইহা সুবিদিত, সোভিয়েট রাশিয়া আণবিক অস্ত্রকে বেআইনি ঘোষণা না করিলে নিরস্ত্রীকরণের কোন প্রস্তাবেই সম্মত হইবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও অস্ত্রহ্রাস ও অস্ত্রনিষেধ প্রমাণ অস্ত্ররূপে আণবিক বোমার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অস্ত্রের নিরস্ত্রীকরণ ও স্থায়ী শান্তি স্থাপনের আশা। কিন্তু সে শোষণ করা ব্যয় তাহা পূর্ণাঙ্গ, বৃহৎ, অসংখ্য সৈন্য প্রেসিডেন্ট হুইলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যুদ্ধোত্তরকালে আশানের প্রথম বাস্তবত্ব নিঃ আই কিচ আকার্যকে ব্যাপ্ত সজ্জাণ জ্ঞান উপলক্ষে ঘোষণা করেন যে, অ-কমিউনিষ্ট দেশগুলি

সাহস, দৃঢ়সংকল্প, এবং পারম্পরিক সহযোগিতা লইয়া কমিউনিষ্টদের ভীতি প্রদৰ্শন এবং আক্রমণের সম্মুখীন হইবে। হোরাইট হাউসে এক অচুতানে উক্ত রাষ্ট্রদূত তাঁহার অভিজ্ঞান পত্র পেশ করেন। তিনি বলেন যখন আক্রমণ ও আক্রমণের ভয় ভীতি প্রদৰ্শন চলিতেছে সেই সূত্রে অংগান জাতিসংঘে পুনরায় প্রবেশ করিতেছে। তাঁহার এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে জাপান ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের অত্যন্ত স্বাধীন জাতিগুলির সহযোগিতার সাহস সঙ্কট লইয়া এই বিপদের সম্মুখীন হইতে পারিবে।

নিবেদের প্রচার ব্যবহার সাহায্যে পরস্পরের প্রতি বিরোধীতা করা এই ছই বিরুদ্ধ শক্তির দৈনন্দিন কর্ম তালিকার প্রধান বিষয়, এ ছাড়াও যে যে ক্ষেত্রে একে অন্নের সংস্পর্শে আনিতেছে সেখানেই এই বিরোধ চরমে উদ্ভিষ্টেছে। সম্প্রতি নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েট রাশিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে ইউ এন এ সভ্যরূপ কোনও প্রটোকল মানিয়া লইতে প্রতিশ্রুতি দিবেন। এই প্রটোকল অস্বাভাবিক রোগ বিজ্ঞান অল্পকালে ব্যবহার করা নিষেধ। পরিষদের আলোচনার প্রকাশ পায় ত্রৈলীল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই প্রটোকল গ্রহণ করে নাই। প্রসঙ্গত বলা যাইতে পারে, কমিউনিষ্ট জাতিসমূহের অভিযোগ এই যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সৈন্য বাহিনী কোরিয়াতে ব্যাপকভাবে বিজ্ঞান অল্পকালে ব্যবহার করিতেছে। এই অভিযোগই পরোক্ষভাবে এই প্রস্তাবের কারণ বলিয়া মনে করা হয়। এবং মার্কিন প্রতিদ্বন্দ্বি মিঃ এল বলেন যে শত্রুশক্তি ইউ এন ওর সম্মুখে কোনরূপ সাক্ষী প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই, বাহার বলে এইরূপ অভিযোগ করা সমীচীন। নিরাপত্তা পরিষদের বর্তমান সভাপতি মিঃ মালিক বলেন যে রাশিয়ার প্রস্তাবে কোরিয়ার নাম উল্লেখ নাই। অতএব, মিঃ এলসের এই কথার উল্লেখ বৈধতা বিহীন। এতদ্ব্যতীত আর দুইটি মিঃ এল ওয়াল-একটি অর্থাৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোনও

প্রটোকল মানিয়া নো লওয়ার কথাটি এড়াইয়া যাইতে-ছেন। মিঃ এল বলেন, এইরূপ প্রশ্ন আলোচনার উপযুক্ত স্থান হইতেছে নিরস্ত্রীকরণ কমিশন। পরস্পর বিরোধী মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গীর সামঞ্জস্য করিয়া নিরাপত্তা পরিষদ সুনির্ভর নিরাপত্তা বেনীদিন বজায় রাখিতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না।

প্রচারবস্ত্র ও বিভিন্ন জাতিগুরু প্রতিষ্ঠানের দ্বিতরে যে বিরোধ হুখে ও তারবার্জার মাধ্যমে চলিতেছে বাহিরের বিভিন্ন ক্ষেত্রেও সেই বিরোধ স্পষ্টতঃ আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। তাহার উদাহরণ কোরিয়া যুদ্ধ, বানরুলজলে এই বিরোধ মিটাইবার ক্ষমতা যে আলোচনা বহুদিন ধরিয়া চলিতেছে তাহা শেষ পর্যন্ত এখনো আলিয়া পৌঁছায় নাই। যুদ্ধ বিরতির দিন হইতে আজ পর্যন্ত এখন কোন সমস্তা উপস্থিত হয় নাই বাহ্যতে উভয় পক্ষের মতানৈক্য প্রকট হইয়া উঠে নাই। বন্দী বিনিময় যুদ্ধ বন্দীদের প্রতি ব্যবহার লইয়া মতের অমিল ও অসঙ্গতি, তাহা ছাড়া সাংবিধি প্রশ্ন লইয়াও কোনরূপ বীভৎসতা হওয়া সম্ভব হইতেছে না। কোরিয়া হইতে কিংবা সৈন্য অপসারণের প্রশ্নটির বীভৎসতা হইবার সম্ভাবনা আদৌ আছে বলিয়া মনে হয় না। এই ত পেন কোরিয়ার কথা, পশ্চিম ও পূর্ব জাতিগোষ্ঠীকে এক করিবার প্রশ্ন লইয়াও অল্পকাল মতানৈক্য বর্তমান।

এশিয়ার প্রধান সমস্তাগুলি ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, ইন্দোচীন ও মালয়েশিয়া সমস্তা মিথিবার সম্ভাবনা প্রত্যাশ্য। অসংসারমূল্য করাণী সাম্রাজ্যের পক্ষে ইন্দোচীনকে মধ্যল রাখিবার সমস্তা সমীচীনরূপে বাহন করিয়াছে, কমিউনিষ্ট প্রস্তাব ও হস্তক্ষেপের অজুহাতে এই পটভোগ্য সাম্রাজ্যকে কীরাইয়া রাখিবার ক্ষমতা মার্কিন যুক্ত ও অল্পকালের অল্পকাল হতে সম্ভব হইতেছে। এমনকি মার্কিন পর্যবেক্ষণ ও পরিচালনার দ্বারা সৈন্যবাহিনী গঠনের কৃৎস ও তদা হইতেছে। ইহাতে না মুলাইলে শেষ পর্যন্ত মার্কিন সৈন্য হস্ত ইন্দোচীনে অবতরণ করিবে।

মালয়ে ইংরেজ সরকার নির্ধারিত চালাইলেও এখন পর্যন্ত কোনরূপ স্বাধীন শান্তি প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সেখানে দেখা যাচ্ছে না। ইংরেজ শ্রমিকদের অধুনাতম প্রত্যাবলীনের একটিতে বলা হয় যে, ইংরেজ শ্রমিকদের মালয়ে সমতা বিস্তারিত পারে না। কারণ একমাত্র মালয়বাসীই সেনেগে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে পারে, কিন্তু শ্রমিকদের আনিয়া ভূমিরা এই কথাটি উল্লেখ করিতেছেন না যে তথাকার শোষণ প্রণালী বন্ধ না হইলে শান্তি কোনদিনই প্রতিষ্ঠিত হইবে না। অথচ ভারতীয় ইংরেজের পক্ষে ভাষার আরও অন্ততম প্রাণে বাণিজ্য সামগ্রী। এই রবার প্রতিষ্ঠানগুলি একদিকে যেমন ইংরেজের হাতে প্রচুর অর্থ আনিয়া দিরাছে, অন্যদিকে তেমনি এই রবার শোষণের ফলে মালয়ে অশিক্ষা, বারিত্র্য ও অস্বাস্থ্য প্রভৃতি সামাজিক দুরবস্থা তথাকার অধিবাসীদিগকে দুঃখের ও অসংপত্তনের নিয়ন্তরে টানিয়া দিরাছে। রবারের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, ইরাপের তৈলসের মত এই রবারও তথাকার অধিবাসীদেরই সম্পত্তি। যে পর্যন্ত না এই রবারজাত আর মালয়বাসীদের কিছু প্রয়োজনে ব্যয়িত হইবার ব্যবস্থা হইতেছে ও তদনুসারে রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিতেছে, সে পর্যন্ত তথাকার সমতা কখনো বিচিৎরে না।

করানী সাম্রাজ্যের আর একটি কেন্দ্র হইতেছে আফ্রিকা মহাদেশ। টিউনিসিয়ার অধিবাসীগণ নিজদের বেশ হইতে করানী সাম্রাজ্যবাহ উচ্ছেদ করিতে চক্ৰবাক্ত। কিন্তু পশ্চিমী রাষ্ট্রসমূহের চোঁটার টিউনিসিয়রণ ইউ, এন, ও শাখা প্রতিষ্ঠানগুলির নিকট হইতে কোনরূপ ভাৱ বিচার এখনো পায় নাই। তাই উর্জতন প্রতিষ্ঠানের নিকট এই সমস্তটি তুলিবার কথা হইতেছে। প্রথম ট্রাষ্ট অব ইজিয়ার বিশেষ প্রতিদ্বন্দ্বি আসাইয়াছেন যে, নিউইয়র্কে এশিয়া ও আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের একটি দলীয় অধিবেশন হইবে এবং জুলাই মাসের শেষেই রাষ্ট্র সম্মেলন সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন

অনুষ্ঠানের নিমিত্ত বিশেষ সতর্কতা সহকারে রচিত একটি কূটনৈতিক চালের কার্য আরম্ভ হইবে এরূপ কথা আছে।

গত এপ্রিল মাসে যে এগারটি রাষ্ট্র টিউনিসিয়া সংক্রান্ত অভিযোগ নিরাপত্তা পরিষদে উপস্থাপন করিয়াছিল তাহারা হাভাও সিরিয়া ও লেবনন আর এইরূপ আখ্যায় দিরাছে যে, তত্ত্বাবধায় সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ ট্রিগভি লাইয়ের নিকট যে পত্র প্রেরণ করা হইবে, তাহাতে তাহারা স্বাক্ষর দান করিতে প্রস্তুত আছে। অতএব রাষ্ট্রসম্মেলন সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আয়োজনের দ্বারা তেরটি রাষ্ট্রের দ্বারা সমর্থিত হইবে। এশিয়-আফ্রিকান দলের আরো কয়েকটি রাষ্ট্র সম্ভবতঃ এই দাবী সমর্থন করিবে। সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট প্রেরণীয় পত্রের বসান এবং পনের পূর্বাভাসী একখানি ব্যাখ্যাত্মক স্বাক্ষরিত এশিয়-আফ্রিকান রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আগামী কল্যাকার অধিবেশনে স্থগীত হইবে।

১৯৪২ সালের ১৯ আগস্টের নিরাপত্তা পরিষদের সতাপতি বধন টিউনিসিয়ার প্রাণে যত্নের আবেদন সম্মেলন টিউনিসিয়া সম্পর্কে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া রাষ্ট্র সম্মেলন সম্বন্ধে সেরিটি টিউনিসিয়া সমস্তার ইতিহাস, টিউনিসিয়ার প্রায় আলোচনা দ্বিতীয় অন্তর্ভুক্ত করিতে নিরাপত্তা পরিষদের অস্বীকৃতি প্রভৃতি বিষয় উল্লেখ করিয়া সেক্রেটারী জেনারেলের নিকট প্রেরিত পত্রে বলা হইবে যে, সাধারণ পক্ষসমূহের এই বিষয় সম্পর্কে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা আছে।

চিঠিতে আরো উল্লেখ করা হইয়াছে যে, ১৪ই এপ্রিল হইতে টিউনিসিয়ার অবস্থার আরো অবনতি ঘটনাতে এবং শান্তির পথে বিপদ আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পত্রের সর্ম্মানের সংক্ষিপ্ত বর্ধ মোটামুটি নিম্নোক্ত প্রকার হইতে পারে। "ক্রমশঃ এই সমস্ত ক্ষেত্রের হইয়া উঠিতেছে যে, স্বস্তি পরিষদ টিউনিসিয়াকে প্রায় আলোচনা

করিতে দিতে অস্বীকার করার অতুতপূর্ব ও অসুস্থপ্রায়ী সম্পর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। রাষ্ট্র সংঘ এই বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বনে বিলম্ব করিলে আঞ্চলিক বিরোধ নীমাংগা ও শান্তি সংরক্ষণে রাষ্ট্র সংঘের যোগ্যতা সম্পর্কেই সন্দেহের উত্থেক হইবে। এই বিষয় বিবেচনা করিয়াই রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন অস্থগানের ক্ষত্র অগ্ররোধ করা হইতেছে।

সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ টিগতি লাইয়ের রাষ্ট্র সংঘ হেড কোয়ার্টার হইতে অতুপস্থিতর দক্ষ অধারী সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ গিলোস জয় পিকট (জ্ঞান) হইতে এশিয়-আফ্রিকান বলের পত্র সম্পর্কে বর্ণাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন এবং রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশন অস্থগানের রাধী সম্পর্কে রাষ্ট্র সংঘের যাটটি সদত রাষ্ট্রের মতামত সংগ্রহ করিবেন।

এশিয়-আফ্রিকান রাষ্ট্রসংঘ ৩১টি রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিতে পারিবে কিনা, তাহা বলিতে এই রাষ্ট্র

সমূহের মূখপাত্রগণ অস্বীকার করেন। উক্ত রাষ্ট্রসংঘ ৩১টি রাষ্ট্রের সমর্থন জ্ঞাপক স্বাক্ষর সংগ্রহের চেষ্টা করার পরিবর্তে সেক্রেটারী জেনারেলের মারফত সমর্থন লাভের চেষ্টা করিলেই সুবিধা হইবে।

ইতিপূর্বে এশিয়-আফ্রিকান রাষ্ট্রসংঘ যে ৩১টি রাষ্ট্রের সমর্থন লাভ করিতে পারে নাই, তাহার কারণ স্বরূপ বলা হইয়াছে যে, কয়েকটি দেশ যেনে কহিরাজিস যে, প্রচেষ্টার প্রারম্ভস্বরূপ যে পত্র দেওয়া হইবে, তাহাতে স্বাক্ষর দান করিলেই উহাতে উল্লিখিত অভিযোগগুলি তাহাদেরও অভিযোগ, একথা প্রমাণিত হইবে। পক্ষান্তরে সেক্রেটারী জেনারেল যদি রাষ্ট্রসংঘ সাধারণ পরিষদের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের ক্ষত্র কোনও আবেদন প্রচার করেন, তাহা হইলে ঐ সকল রাষ্ট্র টিউনিশিয়র সমস্তার প্রতি তাহাদের মনোভাব পরিবর্তিত না করিয়াই উক্ত আবেদন সমর্থন করিবে। শেষোক্ত মতাবলম্বী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্রেন্সীল, চিলি প্রভৃতি দেশও আছে বলিয়া আশিতে পারে গিয়াছে।

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

—ঃ হেড অফিস :—

৪নং ক্লাইভস্ট্রাট স্ট্রীট, কলিকাতা।



পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত সমস্তার প্রথম অবস্থা।

যাহীন ভারতে অস্তিত্ব বহু সমস্তার মধ্যে উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন প্রারম্ভ প্রথম স্থান অধিকার করে। পশ্চিম পাঞ্জাব ও পশ্চিম পাকিস্তানের অস্তিত্ব অংশ থেকে উদ্বাস্তরা ১৯৬৭ সালেই আসতে শুরু করে। তখন ভারত সরকারের আর্থিক অবস্থা অনেক স্বচ্ছল ছিল। এবং বিভীষিত, বিন্ধিত ভারতের পশ্চিম অংশ থেকে প্রারম্ভ সমস্তার স্থলপন পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যাওয়াতে আর্থিক ও সামাজিক ব্যবস্থার এমন একটা শূন্যতা (vacuum) ছিল যা পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্তগণ পূরণ করতে পেরেছিল। এই দুই কারণে পঃ পাকিস্তানী উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের কাজ অনেকটা সহজভাবে সম্পাদিত হয়েছে। তা চাড়া অনেকেরই ধারণা ছিল যে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার অধিবাসীদের মধ্যে যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমঝাওের বন্ধন ছিল, তাতে পূর্ববাংলা থেকে উদ্বাস্ত বিশেষ আসবে না।

বঙ্গ বিভাগের পরই কয়েক লক্ষ উদ্বাস্ত পূর্ব বাংলা হতে পশ্চিম বাংলায় আসে; আসার ও ড্রিপরা রাজ্যও কিছু যায়। তখন পঃ বাংলার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ডাঃ আবুলক্বাছ খোব। তিনি বরাবরই পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্ত সমস্তা অবস্কার ক'রে চলেছেন। তাঁর হস্তধারণা ছিল যে একবার উদ্বাস্ত সমস্তা অবস্কার ক'রে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা অবলম্বন করলে, এই স্থযোগের লোভে পূর্ব বাংলা থেকে দলে দলে উদ্বাস্ত আসতে শুরু করবে। তাই বতরিন তিনি প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ততরিন উদ্বাস্ত পুনর্বাসনের প্রার কোন ব্যবস্থাই পূর্ব বাংলার করা হয় নি, এবং ভারত সরকারের নিকট তিনি এই ভাবেই

ব্যবহার মতামত পাঠিয়েছেন। সবত ভারত সরকারও তখন পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত সমস্তাকে অবস্কার করতে প্রস্তুত ছিল না। তাদের মনে একটা আশা ছিল যে বঙ্গ বিভাগ প্রস্তুত ভারের প্রথম দ্বাড়াটা কেটে গেলে হিম্মতগণ স্বাভাবিক ভাবে পূর্ব বাংলার বাস করতে পারবে। হস্ত তাদের এই মনোভাব টের পেয়েই ডাঃ আবুলক্বাছ খোব পশ্চিম বাংলার উদ্বাস্ত সমস্তা অবস্কার ক'রে বিবরণী পাঠাতেেন এবং তাঁর এইসব মতের ফলে ভারত সরকারের মনে আরও বৃহৎ ধারণা আসল যে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত সমস্তা অবস্কার ক'রে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ।

এ সমস্তার স্বীকৃতি

১৯৪৮ সাল থেকে ভারত সরকার পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত সমস্তা অবস্কার করেন। এবং তারপর থেকে প্রতি বছর ৯১০ কোটি টাকা ক'রে বছরে একল্ল ভারত সরকার ব্যয় করেছে। তাছাড়া চলতি বছরের ল্ল ১১১২ কোটি টাকা ব্যয়াদ করা হয়েছে। গত বছর পর্বন্ত মোট একশো ছেঁচরিশ কোটি টাকা উত্তর পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের ল্ল খরচ করা হয়েছে; তন্মধ্যে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের ল্ল কমপক্ষে ৩০ কোটি টাকা। গত বছর পর্বন্ত খরচ করা হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বাস্ত সংখ্যা ৪২ লক্ষ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্বাস্ত সংখ্যা ২৬ লক্ষ। পূর্ব বাংলার সংখ্যা লক্ষ লক্ষের বর্ধেট অবকাল আছে। এ প্রসঙ্গে মাত্র একটা কথা উল্লেখ করতে চাই;—বঙ্গ বিভাগের সময় ৪১ সালের আদন সুমারি অনুসারে পূর্ব বাংলার হিম্মত সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৩৪ লক্ষ। একাল সালের আদন সুমারিতে পূর্ব বাংলার হিম্মত সংখ্যা বেধাবো) হয়েছে প্রার ৩৩ লক্ষ।

এই হিসাব অনুসারে অন্ততঃ ৪০।৪১ লক্ষ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে এসেছে বলে অনুমান করা চলে। দশবছরে আনুমানিক লোক সংখ্যা বৃদ্ধির কথা ধরলে আরো কয়েক লক্ষ বরা উচিত। তাতে আর ২০ লক্ষ হিন্দু পূর্ব-বাংলা থেকে এসেছে এমন অনুমান করা চলে। কিন্তু আমরা সে দাবী করতে চাই না নিম্নোক্ত কারণে— ১৯৪১ সালে বাংলার আদম শুমারিতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই নিজ নিজ সংখ্যা কিছু বাড়িয়ে দেখিয়েছিল বলে অনুমান করা যায় এবং ১৯৪১ সালের আদম শুমারিতে পূর্ব বাংলার সরকারের পক্ষে হিন্দুর সংখ্যা কমিয়ে দেখান খুব অস্বাভাবিক নয়। দুইদিকের বাড়তি ও কমতি হিসাব করে একথা সহজেই অনুমান করা যায় যে, অন্তত ৩০।৩২ লক্ষ হিন্দু পূর্ব-বাংলা থেকে উদ্ধৃত হয়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে এসেছেন করেছে।

পূনর্বাসন ব্যবস্থার স্রষ্টা—

বে সংখ্যাই দূরা হোক, সমস্ত দিক হিসাব করে সহজেই বলা যায় যে সংখ্যার অল্পপাতে পূর্ব বাংলার হিন্দুগণ ভারত সরকারের কাছে থেকে পর্যাপ্ত অর্থ সাহায্য পায় নি। অর্থের সামিতিক হিসাবই অবশ্য বড় কথা নয়, সত্যি কথা বলতে গেলে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের কাজ এখন পর্যন্ত সঠিক ভাবে গ্রহণ করাই হয় নি। যে টাকা খরচ করা হয়েছে তার একটা বৃহৎ অংশ ব্যয় হয়েছে আশ্রয় শিবিরে দীর্ঘকাল বলে হাছার হাছার উদ্বাস্তুকে খরসতি সাহায্য বাবদ—এটা কেবল অর্থের অপব্যয় নয়, মানুষের শক্তিও অপব্যয়। এক একটি আশ্রয় শিবির স্থাপিত হয়েছিল সাময়িক ভাবে উদ্বাস্তুদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য; সেজন্য কি বড় ভোর ছুমাসের বেশী কাউকে সেখানে রাখা হবে না এই ছিল তখন সিদ্ধান্ত। কিন্তু কার্যতঃ ১ বছর কি তারও বেশী সময় হাজার হাজার উদ্বাস্তু এই সব শিবিরে আগতে দিন কাটিয়েছে। এর ফলে কর্মবিমুক্ততা, উত্ত্রুতি, দারিদ্র-হীনতা প্রভৃতি সমাজ বিরোধী সর্ববিধ প্রকৃতি এদের চরিত্রে দেখা দিচ্ছে। মহান স্বদেশপ্রেম অবতার বাস,

যে অবস্থার ভিতর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস এই সব উদ্বাস্তুদের থান করতে হয়েছে তাতে এই সব দোষ ভাষের চরিত্রে প্রবেশ করা অনস্বয় নয়।

এ ছাড়া পুনর্বাসনের যে সব ব্যয়স্ব্য হয়েছে, তাও স্পষ্টভাবে পরিচালিত হয় নি এবং প্রায় ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ হয়েছে। সরকার তরফ থেকে যে সব উদ্বাস্তু উপনিবেশ স্থাপন করা হয়েছে, তা প্রায় অমিকাংশই ব্যর্থ হয়েছে। পুনর্বাসন বিভাগের কর্মচারীদের সন্তোষ এবং কার্যক্ষমতা সম্বন্ধে সন্দেহ আজ সর্বজনবিস্তৃত। এক একটি উপনিবেশ বা কলোনির তত্ত্ব লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। কিন্তু পুনর্বাসনের কাজ তাতে সামান্যট হয়েছে। পুনর্বাসন দপ্তরের ও বিভাগের অধিকাংশ কর্মচারী পূর্ব বঙ্গের অধিবাসী ও উদ্বাস্তু। তারাই উদ্বাস্তুদের প্রতি দরদী হবে এবং নিজেদের কাজ মনে করে পুনর্বাসনের কাজ অসুভাবে পরিচালনা করবে এ আশায় সরকার তাদের হাতেই পুনর্বাসনের কাজ দিয়েছিল, কিন্তু তারা যে দুরদর্শীতা অসন্তোষ ও অযোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে তা পূর্ব বাংলার অধিবাসীদের পক্ষে লক্ষ্য ও পরিতাপের বিষয়।

প্রায় প্রত্যেক উদ্বাস্তু উপনিবেশে ও শিবিরে ২৪ জন করে দালাল আছে, যারা সর্ববিধ সমাজবিরোধী কাজে সিদ্ধান্ত এবং বাংলার সাহায্য ব্যতীত সরকারী অফিস হতে কোন টাকা বা কোন সরকারি পাণ্ডুরা প্রায় অনস্বয়। সরকারী পরিকল্পনার ব্যর্থতার এটা একটি অন্ততম প্রমাণ কারণ। কোন এক কমির দালাল বা মাসিকের সাথে ব্যবসায় করে ২৫ বা ৫০ টাকা মুদ্রার ছদ্ম ১৫।২০০ টাকা মুদ্রা উদ্বাস্তুদের কাছে বিক্রী করে উপনিবেশ স্থাপন করা হোলো, তাদের গৃহ নির্মাণের খণ ৫০০ টাকার মধ্যে প্রথম কিস্তির ২৫০ টাকা বাবদ দালালের দালালী দিয়ে হয়ত ২০০।২২৫ টাকা পাওয়া গেলো। গৃহ নির্মাণের কাজ শুরু হোলো, তারপর এক বছর কি ১৫ মাস পরে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা পাওয়া গেল। ছোটখাট ব্যবসার বাবদ ৫০০ টাকা কণ্ড এমনি হ'

কিত্তিতে সেওয়া হয়। এইভাবে এক বছর মেড বছর অল্পের দুই কিত্তিতে ১০০ টাকা পেলে কোন গৃহ নির্মাণও হয় না, কোন কারবার বা ব্যবসায় গড়ে তৈরি হয় না। বাধ্য হয়ে উচ্চতর গৃহ নির্মাণের টাকা বা কারবার প্রতিষ্ঠার টাকা খেয়ে উড়িয়ে দেয়, তখন সে উচ্চতর উপনিবেশ পরিত্যাগ করে অল্পের চলে যায়—হয় পূর্ব বাংলা ঘুরে না হয় সরাসরি কোন আশ্রয় শিবিরে গিয়ে অপর নামে আশ্রয় নেয়। সরকারী অর্থের এমন অপচয় কল্পনা করা কঠিন। আশ্রয় এখানে কোন বিশেষ উপ-নিবেশের নাম করতে চাইনে। কিন্তু বনগ্রাম মহকুমার অন্তর্গত রায়চন্দ্রপুর উপনিবেশের প্রাচীন সরকারের গৃহীত আকর্ষণ বর্ণ্যতে চাই। পালিশারমেটে এক প্রেমের জবাবে পুনর্বাসন নবী বলেছেন যে পশ্চিম বাংলা সরকার বিশেষভাবে তদন্ত করবে। আশাকরি এমনি তদন্ত অস্তিত্ত সরকারী উপনিবেশ সফলকও করা হবে।

ইউনিয়ন বোর্ড পরিকল্পনা নামে উচ্চতর পুনর্বাসনের একটা ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কত টাকা ভাতে বরচ হয়েচে, কি পরিমাণ উচ্চতর সেখানে পাঠানো হয়েছিল এবং কত সংখ্যক উচ্চতর পুনর্বাসন পরেচে, সে সফলকও অল্পসন্ধান হওয়া সরকার। যে সব কর্মচারী এই সংকাজে সরকারী অর্থের অপচয় করিয়েচে, তাদের আচরণেরও অল্পসন্ধান হওয়া প্রয়োজন। বলে রাখা সরকার যে কোন পণ্ডিত বা অল্পের কহিতে ৩,৭,৫ কাঠা জমি দিয়ে ও ১০০ টাকার কুড়ে বরের ব্যবস্থা করে দিলেই পুনর্বাসন হয় না। পুনর্বাসনের প্রকৃত অর্থ হোলো উচ্চতরকে আদিক হিসাবে আবলকী করা অর্থও তার পরাণ জীবিকার ব্যবস্থা করে দেওয়া।

বাংলার বাইরে পুনর্বাসন ব্যবস্থা—

এ পর্যন্ত আবরা যা বলেছি, তা সবই পশ্চিম বাংলা সফলক। পশ্চিম বাংলার বাইরে আসামে বহু উচ্চতর গেছে। আসাম সরকারের হিলাব অল্পসারে পৌনে তিন লক্ষ উচ্চতর সেখানে গেছে। কিন্তু আনাদের মনে হয় পূর্ব কম হলেও ৩৭ লক্ষ উচ্চতর আসামে গেছে। আসাম

সরকার পূর্ব বাংলার উচ্চতরের সফলক এপর্যন্ত ভেমন কোন অল্পসুল মনোভাব দেখায় নি। বহু এই ধারণাই সফলক মনে আছে যে আসাম সরকার পূর্ব বাংলার উচ্চতরের পুনর্বাসন চায় না। কাছাড় খেলা বাংলা ভাবাতারী অল্প। সেখানে পূর্ব বাংলার উচ্চতর পুনর্বাসন সফলক আসাম সরকারের কোন আপত্তি থাকার কারণ নেই। কাছাড়ের পুনর্বাসন ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারত সরকার প্রত্যক্ষভাবে নিজের হাতে নিয়েছিল। চা বাগানের মালিকদের সহযোগিতার ভবানে একটি বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। গত দু'বছরে এক কাছাড় খেলার প্রায় ২ কোটি টাকা বরচ করা হয়েচে। কিন্তু আজ বলা চলে যে সেখানকার পুনর্বাসন পরিকল্পনা প্রায় আগাগোড়াই ব্যর্থ হয়েচে। অগণিত মানবের দুঃখ কষ্টের বহু কাহিনী আনরা সেখান থেকে পেতে থাকি। কত শিশু অকালে মৃত্যুমুখে পণ্ডিত হয়েচে। অন্যদিকে বা অপর্যাপ্ত আহারের কলে কত অকাল মৃত্যু হয়েচে, সে সব কাহিনী বহুত সরকারের দপ্তরখানাতই আটকা আছে। আসাম সরকারের বিকল্প মনোভাব পূর্ব করার ব্যবস্থা অবিলম্বে ভারত সরকারের করা প্রয়োজন এবং কাছাড়ের সমস্ত পরিকল্পনা কেন ব্যর্থ হোলো তারও অল্পসন্ধান করা প্রয়োজন।

বিহার সরকারের মনোভাব আসাম সরকারের চেয়েও কঠিন। বিহারের পূর্বপ্রান্তে অনেকখানি অংশ—যথা মানিকুয়, ধলভূম, সাঁওতাল পরগণা, পুর্ণিমা প্রভৃতি—বাংলাভাবী অল্প। বিহারের আজ চৌহা হচ্ছে একসোকে হিন্দী ভাষা অকলে পরিণত করা। তাই বাঙালী ও বাংলা ভাবাকে ওই অল্প খেবে উচ্চতর করাই হচ্ছে বিহার সরকারের উদ্দেশ্য। কাজেই কোন বাঙালীর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা সেখানে হতে পারে নি। সুরকার পশ্চিম বাংলার পূর্ববাংলার সমস্ত হিন্দুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হওয়া সম্ভব নয়। আসাম ও বিহারকে এ দৃষ্টির অংশ গ্রহণ করতেই হবে।

সরাইকেলা, বহুতল প্রভৃতি কুতপূর্ব দেশীয় রাজ্যে বহু

পতিত জমি আছে। বাঙালীর পুনর্বাসনের পক্ষে ওই সব স্থান অসুস্থ। ভারত সরকারের চেষ্টা করা প্রয়োজন যাতে ওই সব অসুস্থ অঞ্চলে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হয়। ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ বৈদ্য বাহু বার পালার্মেন্টে ঘোষণা করেছেন যে বাঙালী উদ্বাস্তরা বাংলার বাইরে যেতে রাজী নয়। একথা সত্যি নয়। বাঙালীকে মাইশোরে বা হায়ড্রাবাদে নিয়ে যাবার প্রস্তাব হয়, তা হলে বাঙালী নিশ্চয়ই আপত্তি করবে। কিন্তু বাংলার সংসদ আগাম, বিহার, উড়িষ্যার মধ্যে যে সব অঞ্চল আছে সেখানে বাঙালী উদ্বাস্তর পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় নি কেন এ প্রশ্ন আমরা জিজ্ঞাসা করতে পারি। '৪৭ সাল থেকে '৪৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসনের যে ব্যবস্থা হয় তাতে বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে তাদের না পাঠানোর সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হয়েছিল; কারণ ভই অঞ্চলগুলি পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের প্রত্যেকজন হতে পারে। আজ তারা নৈতিক হুক্তি দেখিয়েই পূর্ব বাংলার উদ্বাস্ত গ্রহণে অসম্মত হতে পারে না।

আমি একটা অঞ্চলের কথা আমরা উল্লেখ করতে চাই। সেটা হোলো আন্দামান। আমাদের বিশাল আন্দামান পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী হবে। প্রায় ৩০০ পরিবার সেখানে পুনর্বাসিত হয়েছে।

পূর্ব বাংলার এক একটি জেলা হয়ে ধরে ১০০।১৫০ পরিবার আন্দামানের এক একটা অঞ্চলে অনারসাই পাঠানো চলে এবং যদি ভারত সরকার এ সম্বন্ধে একটা সংকল্প গ্রহণ করে, আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে কেবল মাত্র পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের জন্য আগাধা রাখে, তা হলে কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তর সংস্থান সেখানে হতে পারে। আমাদের যতটা জানা আছে, এ সম্বন্ধে ভারত সরকারের মন ষিরাগস্ত। কেবল পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের জন্য স্থান করে রাখতে যেন তাদের আপত্তি আছে। পশ্চিম বাংলা সরকারের নিকট আমাদের অনুরোধ ভারত সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তদের জন্য স্থান রাখার যেন ব্যবস্থা করেন।

ভবিষ্যতের কথা—

আজ ভারত সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে পূর্ব বাংলার হিন্দুগণ সাধারণ নাগরিক অধিকার পায় না। একথাও আজ অনেকেই কার্ণভঃ যেন নিয়েছে যে পূর্ব বাংলার হিন্দুদের বাস করা সম্ভব হবে না। প্রায় ১ কোটি হিন্দু এখনও পূর্ব বাংলার আছে। এদের অবস্থা কি হবে? ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত দেহরু একাধিকবার ঘোষণা করেছেন যে এদের রক্ষণাবেক্ষণ সম্বন্ধে ভারত সরকারের একটা দায়িত্ব আছে। হয় তাদের নিজ আবাসস্থলে, অর্থাৎ পূর্ব বাংলায়, না হয় অন্তত অর্ধাৎ ভারতে তাদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব ভারত সরকার গ্রহণ করেছিল। সে দায়িত্ব আজ ভারত সরকার স্বীকার করতে পারে না।

২৪৩০ লক্ষ উদ্বাস্ত পূর্ব বাংলা থেকে ইতিমধ্যে এসেছে, এখনও আরো আসছে এবং ভবিষ্যতে আরো আসবে। এ গতি কেউ ঠোকা করতে পারে না। ভারতের অর্থ এরা খাচ্ছে এবং খাবে; ভারতীয় সমাজের অর্থ হিসাবেই এরা এখানে বাস করবে। আজ প্রশ্ন হচ্ছে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে এদের যোগ্য নাগরিক করতে হবে, যাতে এদের পরিশ্রম ও কর্মপাতিভাষা এরা দেশের রাষ্ট্রে ঐশ্বর্য বৃদ্ধি করতে পারে। যদি পুনর্বাসনের ব্যবস্থা উপযুক্ত রূপে না করা হয়, তা হলেও এরা ভারতেরই থাকবে, ভারতের অর্থই খরচ করবে এবং ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা করতে বাধ্য হবে। হয় যোগ্য নাগরিক হয়ে পরিশ্রম করে এরা সমাজের উন্নতি করবে, না হয় ভিক্ষুক, ভবধুরে চোর ডাকাতি হয়ে এরা সমাজের অনিষ্ট সাধন করবে। কিন্তু ভারতের ভিতরই এরা থাকবে। পূর্ব বাংলার উদ্বাস্তগণ ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। গত তিন বছরের ভিতর ভারতে পাটের উৎপাদন প্রায় তিনভাগ বৃদ্ধি পেয়েছে—এটা প্রধানতঃ এদের কর্মক্ষমতা ও পরিশ্রমের অর্থ।

কলকাতার আশপাশে এঘের পরিপ্রাণে পঞ্চাশ শাকশালী উৎপন্ন হচ্ছে। এবং একটা প্রোডাক্টরী ব্যক্তিত্বের উৎপাদন এরা বাড়িয়েছে। আমাদের মনে হয় অতি সহজেই এঘের পরিপ্রাণের দ্বারা পশ্চিম বাংলায় মাছের উৎপাদন অনেক বাড়ানো যায়। তাতে কতক লক্ষ হীঘর উৎপাদন পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হতে পারে।

এই সমস্ত বিবেচনা করে আমরা আশা করি ভারত সরকার ও পশ্চিম বাংলা সরকার একটা পরিকল্পনা করে কাজে অগ্রসর হবে। পশ্চিম বাংলার আইন সভায় সুদীন ঘোষণা করা হয়েছে যে পুনর্বাসন প্রকল্পের পুনঃ সংগঠন (reorganisation) করা হবে। নতুন পুনর্বাসন মন্ত্রী যদি সভা সভাই তাঁর প্রকল্পটি সংগঠন করে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে পুনর্বাসনের কাজ শুরু করেন তা হলে আমরা সুখী হবে।

বাজেট হিসাবে গরমিল—

গত সেক্রেটারি মাল অর্গানিসিভ প্রিন্সিপাল ডায়রেক্টর বাজেট সাময়িকভাবে পার্সিয়েন্সে পেশ করেন। নতুন নির্বাচনের পর যে মাসে আবার পাকাপাকিভাবে তিনি পার্সিয়েন্সে বাজেট পেশ করেছেন। অন্তর্বর্তী তিন মাসে বিশেষ ও ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেছে। কোরিয়ার যুদ্ধ জিক্ত অবস্থার আশার কালে আন্তর্জাতিক ব্যাংকারে বহু প্রবোধ চাওয়া কবে দিচ্ছে। তার কালে বহু প্রবোধ হুলা নৈবে পিরেছে। রপ্তানী প্রকল্পে হাব অনেক ক্ষেত্রে বিশেষভাবে কমানতে হয়েছে। এ সব কারণে সেক্রেটারি ও যে মাসের উৎপাদিত বাজেটের মধ্যে বেশ একটা পার্থক্য দেখা যায়। সেক্রেটারি মাল বোটি বাজেটের পরিমাণ দ্বা হরেছিল ৪২৫ কোটি, এবং বরচের পরিমাণ দ্বা হরেছিল ৪০১ কোটি টাকা। তাতে বঙ্গের শেষে উৎপাদিত ব্যাকার কণ্য ছিল প্রায় ১২ কোটি টাকা। কিন্তু যে মাসে যে বাজেট পেশ করা হয়েছে, তাতে মোট বাজেটের পরিমাণ দ্বা হরেছে প্রায় ৪০৪ কোটি, এবং বরচের পরিমাণ দ্বা হরেছে ৪০১ কোটি টাকার কিছু

উপরে। বঙ্গের শেষে এ থেকে উৎপাদিত ব্যাকারে মাল পৌনে চার কোটি টাকার মত। যে কারণেই দ্বা ব্যাক না কেন, তিন মাসের পার্থক্য হিসাবের মধ্যে এতটা ব্যবধান ঘূষ আত্মবিক এবং সম্ভব নয়। তা হুড়। ১৯৪১-৪২ সালের যে হিসাব পূর্বে পার্সিয়েন্সে পেশ করা হরেছিল তাতে দেখানো হরেছিল ৪০১ কোটি টাকা। রাজস্ব আদায় হবে এবং ৩৭৪ কোটি টাকা বরচ হবে, কিন্তু বঙ্গের শেষে দেখা গেল যে রাজস্ব আদায় হরেছে ৪২৭ কোটি এবং বরচ হরেছে ৪০৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ রাজস্ব দ্বা দ্বা হরেছিল তার চেয়ে প্রায় ১০০ কোটি টাকা বেশী আদায় হরেছিল। এখানেও হিসাবের একটা সম্ভবতঃ গোলমাল দেখা যায়।

বাজেট আতির আর্থিক অবস্থার একটা প্রতিচ্ছবি এবং নিয়ন্ত্রক। বাজেটের সঙ্গে এতটা ব্যতিক্রম দেখা গেলে সম্ভবতই সোকার মনে একটা প্রান্ত বারবার ফুটি দ্বা। এবং আতির আর্থিক ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণও গোলমাল হওয়া আত্মবিক। অনেকের মনে এমন সন্দেহেরও উজ্জেক হরেতে যে সরকার ইচ্ছা করেই ভুল হিসাব বাজেটে দিচ্ছে। এটা সরকারের পক্ষে গারিষ দ্বা সম্ভবতার পরিচায়ক নয়।

সরকারের হাতে জমানো ভুদ্বিল ও উন্নয়ন ব্যয়

ভারতবর্ষ বখন স্বাধীন হয় তখন সরকারের হাতে ২৭০ কোটি জমানো টাকা সম্ভূত ছিল। এই চলতি বছরের শেষে জমানো সম্ভূত টাকার পরিমাণ মাত্র ৮৩ কোটি টাকার গাড়ায়ে। যে সরকারের সাময়িক আয় ও ব্যয় প্রায় ৬০০ কোটি টাকার ওপর (বেল ও সাধারণ বাজেট দুটা মিলিয়ে) তার পক্ষে সম্ভূত টাকার পরিমাণ কত বাক্য সরকার সে সম্ভূত বহু বিস্তারিত অবকাশ আছে। জমানো টাকার এমন অগচর নিতে অনেক সরকারের নিষ্কা করছে। আত্মবিক অবস্থার সরকারের হাতে জমানো টাকার (ক্যাপ বালেন্স) পরিমাণ হয়ত এর চেয়ে বেশী থাক্য উচিত, কিন্তু যদি গত পাঁচ বছরে সরকারের স্বাধী উন্নয়ন বায়ন বরচের পরিমাণ হিসাব করা যায় তাহলে এ নিষ্কার বিশেষ কারণ আছে বলে

মনে হয় না। কেবল উচ্চাভাসের জন্তই চলতি বছরের হিসাব নিয়ে প্রায় ১০ কোটি টাকা খরচ হবে। বিভিন্ন নদী উপত্যকা বাসন খরচ-ও হয়েছে এখন পর্যন্ত ১০০ কোটি টাকার কম নয়। লিম্বুগ্ৰী সাবের কারখানার খরচ হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। চিত্তরঞ্জন ইন্ডিয়ান সৈন্যের কারখানাতে খরচ হয়েছে ২০ কোটি টাকার উপর। এমনি আরো বহু কারখানা স্থাপিত হয়েছে যার জন্য আরো ২৫০০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। এ সব খরচ চলতি রাজস্বের থেকে সাধারণতঃ হয় না। জমানো টাকা বা ঋণ করে সংগৃহীত টাকার থেকেই করা হয়। ইচ্ছা ব্যতীত এই কয় বছরে দাঙ্গতল আমদানী করে ক্ষতি মানে বিক্রী করার দরুন ১০০ কোটি টাকার উপর খরচ হয়েছে। এটাও সাধারণ খরচের বাইরে। পঞ্চাবিক্রী পরিবহন গৃহীত হয়েছে তার জন্য চলতি রাজস্ব হতে প্রতি বছর ২৬ কোটি টাকা বেওয়া সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ-সবই জাতীয় সম্পদ ও রাষ্ট্রের আর বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভের পর থেকে প্রতি বছরই চলতি রাজস্ব বেশ ভাল পরিমাণে কিছু বাড়তি (surplus) হয়েছে। এবং মনে হয় আগামী কয়েক বছরেরও চলতি রাজস্ব বাড়তি হওয়ার কোন আশংকা নেই, হয়ত বাড়তিই হবে। এই হিসাব থেকে রাষ্ট্রের আর্থিক ভিত্তি সবচেয়ে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া যায়। কিন্তু বাজেটের বাড়তি বা বাড়তি দিয়েই আভিতির বা রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থা নির্ণয় করা চলে না। রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার প্রকৃত কতিপাশ হচ্ছে জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা। সে দিক থেকে আমরা তবিশ্রম সত্যকে খুব নিশ্চিত হতে পারি না। যে পরিমাণ সম্পদ দেশে উৎপন্ন হয় তার প্রায় সবই আমরা খরচ করে ফেলি। জাতীয় সম্পদের দিক থেকে এমন কিছুই আমাদের সক্ষম থাকে না। ১৯৫০-৫১ সালে দশ হাজার চারশো কোটি টাকার সম্পদ (উৎপন্ন প্রব্যাদির মূল্য) ভারতে উৎপন্ন হয়েছে। তার মধ্যে ৯ হাজার ৩শো কোটি টাকার মূল্য আমরা খরচ করেছি। বোম্বের উপর লক্ষ্য উৎপন্ন

প্রখ্যার শতকরা সাত্বে সাত ভাগ আভিতির তবিশ্রম উন্নয়নের জন্য সক্ষম করা সম্ভব হয়েছে। পঞ্চাবিক্রী পরিবহনকার বরা হয়েছে ১৯৫৬-৫৭ সালে আভিতির সমগ্র উৎপন্ন প্রব্যাদির মূল্য হবে ১১ হাজার ৫০০ কোটি টাকা, খরচের হারও সেই পরিমাণ বেড়ে শতকরা ৭ ভাগ মাত্র সক্ষম করা সম্ভব হবে। এটা আভিতির তবিশ্রমের পক্ষে সন্তোষ। আভিতির বা আর তাই যে প্রায় ব্যয় হবে বাজে এবং প্রায় কিছুই যে সক্ষম থাকছে-না তার পরিচয় পাওয়া যায় সরকারের ঋণ গ্রহণ প্রচেষ্টার ব্যর্থতায়। এর মধ্যে একটি। শুভলক্ষণ দেখা গিয়েছে যে ১৯৫১-৫২ সালে সরকারের ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের তাক্যারে (Small Savings Campaign) সাত্বে চলিণ কোটি টাকা পাওয়া গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে অর্থ মন্ত্রী শ্রীবেশব্রুথের একটি উক্তি এখানে উল্লেখ করতে চাই যে, রাষ্ট্রের আর্থিক অবস্থার পরিচয় হোলো তার ঋণ তোলার ক্ষমতা। প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহের একটি উক্তিও এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, "সাধারণ লোকের উপর কি পরিমাণ হুবিণা বর্ডাচ্ছে তা দিয়েই রাষ্ট্রের স্বত্বকার্যতা নিরূপণ করা উচিত।"

বৈদেশিক ঋণ

উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য ভারত সরকার বিদেশ থেকে এবং প্রধানতঃ আমেরিকা থেকে কিছু আর্থিক সাহায্য অর্জন ঋণ পাচ্ছে। তা নিয়ে পার্লামেন্টের কমিউনিটি সভাপন তীক্ষ্ণ প্রতিবাদ জানাচ্ছে। মানা উপলক্ষে প্রাসঙ্গিক ও অপ্রাসঙ্গিক ভাবে তারা এটাই বলতে চায় যে বৈদেশিক ঋণ বা অর্থ সাহায্য গ্রহণ করা অত্যন্ত অন্তিম, এবং আমেরিকার কাছ থেকে এই সাহায্য পাওয়ার জন্য ভারত সরকারের সার্বভৌম স্বাধীনতা আমেরিকার নিকট বন্ধক রাখছে। সংসারে অর্থবর্ষ হওয়া পূর্ব বে প্রাচ্যের বিবরণ নয়। সকলেই স্বীকার করবে। কিন্তু বর্তমান আর্থভীতিক অগতে বিদেশের সাহায্য না নিয়ে পূর্ব অর্থ দেশই তাদের পুনর্গঠন কার্য চালাতে পারে। বর্তমান দুনিয়াতে হয় রাশিয়া না হয় আমেরিকা, এ দু'দেশের কোন একটি দেশ থেকে অর্থ

সাহায্য না নিয়ে ভারতের পক্ষে পুনর্গঠন ও উন্নয়ন কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। আমেরিকার কাছ থেকে অর্থ সাহায্য না নিয়ে রাশিয়ার কাছ থেকে নিলে কমুনিষ্টরা কই না হয়ে ভুট্টাই হোতো। এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা উচিত যে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কঠোরতার বিষয়ে যে দেশের সঙ্গে আমাদের সাদৃশ্য যে পরিমাণে থাকবে সেই দেশের সঙ্গেই সেই পরিমাণে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্য ও আর্থিক লেন দেন হবে। রাশিয়ার সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের পন্যতাত্ত্বিক রাষ্ট্রের কোন সাদৃশ্য নেই, সে বিষয়ে আমেরিকার ও ব্রুটনের সঙ্গে ভারতের সাদৃশ্য অনেক পরিমাণে আছে। অর্থনৈতিক ব্যাপারেও রাশিয়ার রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের রাষ্ট্রের সাদৃশ্য নেই। আমেরিকা বা ব্রুটনের সঙ্গেও যে আমাদের এ ব্যাপারে খুব বেশী সাদৃশ্য আছে তা নয়, তবু কিছুটা সাদৃশ্য আছে। কাজেই আমাদের আর্থিক লেন দেন আমেরিকা ও ব্রুটনের সঙ্গে বেশী হওয়া স্বাভাবিক। তা ছাড়া রাশিয়ার থেকে যে সব রাষ্ট্র অর্থ সাহায্য পায় বা পাচ্ছে তারা প্রায় সবাই রাশিয়ার ভাবেই বাহ্যিক বলে আঁক পরিচিত। আন্তর্জাতিক বহু গুরুতর ব্যাপারে ভারতবর্ষ আমেরিকার বিরুদ্ধে মত দিচ্ছে, এবং তার অনেকগুলিতে আমেরিকার দ্বারা বিশেষ তাগে সংশ্লিষ্ট ছিল। কিন্তু রাশিয়ার সাজ্জবাসাও কোন রাষ্ট্র কোন গুরুতর বিষয়ে বা রাশিয়ার দ্বারা সংশ্লিষ্ট কোন আন্তর্জাতিক বিষয়ে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস পায় না। কাজেই আমেরিকা থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে ভারত তার স্বাধীনতা বিক্রয় করছে এ অভিযোগের কোন মূল্য নেই।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা উচিত যে রাশিয়ারও তার বিপ্লবের পর বহু বৎসর পর্বে বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণে আপত্তি করে নাই। বৈদেশিক ব্যবসায়ীদের একত্র নানানিধ বিশেষ জুটিয়া বেগুয়া হয়েছিল। এমন কি বৈদেশিক বাণিজ্যে রাশিয়ার রাষ্ট্রের একচেটিয়া অধিকার পর্বে পর্ব করা হয়েছিল। বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার ক্ষমতা একটা বিশেষ যন্ত্র এক সময় সোভিয়েট রাষ্ট্রের করা

হয়েছিল। ১৯২৯ সাল থেকে ১৯৩২ সালের মধ্যে রাশিয়ার বৈদেশিক ঋণ লাগে এক চল্লিশ কোটি রুবল থেকে লাগে সাতাত্তরশই কোটি রুবল বাড়িয়েছিল। তা ছাড়া বহু বৈদেশিক বিশেষজ্ঞকে রাশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য আনা হয়েছিল। এক সময় এই সব বিশেষজ্ঞের সংখ্যা ৪০০০ হাজার পর্যন্ত উঠেছিল। কাজেই রাশিরা আমেরিকা ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশ থেকে আর্থিক ও কারিগরী বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণে কোন সংকোচ দেখায় নি। আশ্চর্য্যের সঙ্গে আমেরিকার যেমন কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি (Technical Co-operation Agreement) হয়েছে। রাশিয়ার কারিগরী সহায়তার চুক্তি করে (Technical Aid Contract) বৈদেশিক সহায়তা সংগ্রহ করেছে। আমাদের এখানকার কন্যুনিষ্ট বহুগণ বৈদেশিক সহায়তার ব্যাপারে এমন একটা আভ্যন্তরীণ মনোভাব নিয়ে চলছে যে সাময়িক উন্নয়ন ব্যবস্থার (Community Project) অবিনাশক শ্রীএল, কে, দে নামক বাঙালীকে আমেরিকান বলে পার্লামেন্টে অভিহিত করেছে। আমেরিকার সঙ্গে ভারতের যে কারিগরী সহযোগিতার চুক্তি ও গম বাবদ ঋণগ্রহণের চুক্তি সাধারণের নিকট প্রকাশ করা হয়েছে তাতে ভারতের ওপর আমেরিকার কর্তৃত্বের কোন আভাসই নেই। যে গম আমরা আমেরিকা থেকে এনেছি তা এখানে বিলি করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব ভারত সরকারের। কিন্তু ১৯২২ সালের রাশিয়ার বধন দুর্ভিক্ষের অবস্থা এলোহিল তখন আমেরিকার সহায়ক সংস্থা (American Relief Administration) নিজেদের পরিচালনার ও লোকজন দিয়ে রাশিয়ারে দৈনিক ১ কোটি ২০ লক্ষ লোককে খাবার দিয়ে বাড়িয়েছে। এতে রাশিরা যে কোন অন্যায় করেছে এমন কথা আমরা বলি না। কিন্তু তার চেয়ে অনেক ভাল ও সম্মানজনক সর্ভে ভারতবর্ষ বৈদেশিক সহায়তা গ্রহণ করছে—এতে দোষ বরাটা নিতাইই হুই হুডির পরিচায়ক।

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আগার সাকুলার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত এবং 'হুমিদ্দা' কাৰ্যালয় ৩২নং আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

— ইন্দিরা —

পঞ্চদশ বর্ষ

আবণ-১৩৫৯

চতুর্থ সংখ্যা

কাল-পরিচয়

(দ্বিতীয় প্রের)

শ্রীশশীকমোহন চৌধুরী

বঙ্গদেশের অনন্ত কর্ষক্ষেতে আমরা ভেসে চলেছি। একটানা মোড় বেশ চলে, আবার কখনো তা বাত্যা সংকুচ হ'য়ে ভরল তালে। এমন একটা সময় এসেছিল যখন আমাদের ছোকরাদের বলে নিয় চেতনার খাত প্রতিধ্বস্তের বালাই ছিল না। অর্ধ, বর্ষ, প্রতিবর্ষিকতার অপোভনতা, অরোজন-অগ্রয়োজনের সাংসারিক বুদ্ধিগত বিচার আমাদের মধ্যে গুলু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ঐ যে বলেছি এক এক সময় হঠাৎ বা কোথাও ভরল উঠতে। এবং তা হট্টকে গিরে পড়তো কোথাও বুঝে।

সত্যোৎপাদ বহু এমনি একটি ভরল পড়লো হট্টকে। হঠাৎ একদিন আমরা তাকে হারালামি। সে গিরে যোগ দিলে ইংলিশম্যান পত্রিকার। স্মরণ দোহারা চেহারা ছিল তার। গায়েন কর্ণা রঙে রক্তাক্তা মিলে তার স্বাস্থ্যকে উজ্জল করে বরতো। খোপ ছুরত ওল বন্ধেরে খুঁটি পাঞ্জাবী উড়ানি ছেড়ে ইংলিশম্যানে যোগ দিবার কিছুকাল পরে সত্যেন বখন একদিন আমাদের ঘরে খাঁটি ইংলিশম্যানের বেশে পা কীক ক'রে পাড়ালো তখন আমরা তো অবাক। এক হাত তার পাংজুনের পকেটে ঢোকানো, আর এক হাতে সিগ্রেট জ্বলে।

"How do you do?"—বলে যুগ্মানের সঙ্গে এমন চিহ্নেরে আমাদের স্তম্ভভরতের গ্রন্থটা। সে বৈদেশিক ভাষার করে বদলো যে তা আমাদের কারো খারাপ লাগে নি। তখনকার দিনে বৈদেশিক সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিবার কলে সত্যেনের যে আর্থিক প্রাচ্ছল্য হটেছে তা আমাদের কাছে অপ্রত্যাশিত ছিল। তবু তার ইংরেজি-হিনার মধ্যে আমাদের প্রতি তার কোন করুণা প্রকাশ পাঠনি কিংবা আমাদের মধ্যে কোন ঈর্ষার ভাব জাগেনি। প্রাণের ঢাকলো তার বহুবৎসল্য উজ্জল হয়ে উঠছিল। তুলে গিরেছিলাম সে আদর্শব্রত হয়েচে, তুলে গিরেছিলাম সে ক্ষুদ্র ঐক্য ব্যবহারে আর্থিক ত্যাগের মহিমাকে স্মরণ করেছে। হাসিতে মুখিতে ইংরেজিয়ার এবং বচন ভক্তিয়ার বস্টাখানেকের মধ্যে বহুদের প্রাণে মূলকৃষ্ণার করে সত্যেন নিশ্চিন্ত হলো।

কিন্তু সত্যেন ইংরেজী আবহাওয়ার বেশী দিন কাটাতে পারে নি। আমাদের অফিসে আনা গোনা আবার তার বদ হয়ে উঠলো। এত মূলকের মধ্যেও কোথায় তার পীড়িত মন ব-হু হবার ক্ষেত্রে যেন ক্রন্দন করছে বুঝতে পারতাম। তারপর একদিন যেন সে

হঠাৎ আশ্বাসের বন্ধন ছিন্ন করে চলে গিয়েছিল তেমনি হঠাৎ আবার একদিন সে আশ্বাসের মধ্যে ফিরে এলো—নোঙর ছেঁড়া নৌকো আবার কেন ফুল পেয়েছে।

ইংরেজী ভাষার থাকে বলে 'স্মার্ট' সত্যোদ ছিল তাই। প্রাণের প্রাচুর্যে আশ্বাসের মধ্যে তার জুড়ি আর কেউ ছিল না—বসিও "আমার্গো ইনে"কে তার সঙ্গে ডিফিরে দিয়ে আবার একটা কাছাকাছি তুলনা খাড়া করবার যর্থ চেষ্টা থাকে থাকে করেছে। শতীন প্রাণবান হলেও দৈনিক গুরুত্ব্যে বোধ হয় অবসর এবং সেই হেতুই চিলে স্বভাব এবং একটু মদ্যাস ভাব।

যেটা গ্রেট এটিক টাইপের ভিন কলম হেডিং বৃত্ত একটা 'গেলি' গ্রেস কাইলে রাখবার জন্তে একটা পিভলের শলাকার বিবে হয়তো সত্যোদ গেয়ে উঠলো—La-La-La-La-La-La-La-La!

অর্থ কী তা কে জানে। নাচের ভঙ্গীতে তার একখানি পা ঐ ছুরের কটারের সঙ্গে তাল রাখতো।

শতীন হয়তো বলে উঠতো—আ—রে ইলে কয়ে কি?

সত্যোদের পরশে আবার খুঁটি পাঞ্জাবী উঠেছে। রাখার চুলভালি তার আরই থাকে নব্ব আনুখানু বিস্তৃত। ঢাকা জিলার বাড়ী হলেও তার সেখানকার উচ্চারণ ভঙ্গীটা প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে, তার ক্রিয়ার শেষে 'দু'র অভ্যয়ের বাহুল্য আর সহজে কানে বেহুরো থাকে না। তার টেলিগ্রাম সম্পাদনের ক্ষিপ্রতা অসাধারণ। সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী, কলিংবেল, চোনের উপরে ফুলে পড়া ফুলের গন্ধ কাঁকি ঘেরে কপাল থেকে শিছন দিকে ছড়িয়ে যেওয়া, কলর ঢালাবার কীক কীক রবি ঠাকুরের ছ'এক কলি গান অনুবৃত্ত করে গেয়ে নেওয়া—সবটা মিলিয়ে সত্যোদ খুঁটি করতো এক অদ্ভুত মনোহারিত্ব। কিন্তু চাকলা প্রকাশতির বর্ষ বলে কবিরা প্রচার করে এসেছেন, আশ্বাস তাই সত্যোদকে ভাবভার 'Butterfly' সত্যোদ খুঁটি হয়ে বলতো—Really? এই really শব্দটা তার মুখে বেশ শুভ্যতো। শতীনের

'ইনে'র মতো এটাই ছিল তার মুজাদ্দোহ কিন্তু আশ্বাসের পক্ষে প্রাণভোব।

বিকালের দিকটা থেকে সেদিন আকাশে মেঘলা মেঘলা ভাব ছিল। রাত্রি বোধ করি তখন আটটা বেজে গেছে। সত্যোদের টেবিলে টেলিগ্রামের সংখ্যা অনেক কমে এসেছে। কাকের লম্বুতার সঙ্গে তার মনটাও হয়ে এসেছে হালকা। এমন সময় বৃষ্টি এলো আকাশে ডেকে। আর সত্যোদকে পার কে। অমনি মুক্ত হলো তার রহস্যনা—

"এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘনঝোর বরষা।"

আশ্বাসের এথিকিও প্রিটোর অরহাৎ ভেমন তাত্ত নেই। রয়টার প্রেরিত বৈদেশিক সংবাদের এক চ্যলান যা এসেছিল তা সব শেক করে বসে আছি। স্ত্রী প্রেসের সংবাদের তাত্তার মধ্যেও এমন কিছু আর নেই যার জন্তে ভাবনার প্রয়োজন আছে। এখনকার মতো টেলিপ্রিটোরের চলন তখন হয় নি। ডাক পিওনের মতো বাধকতা এসে তখন থাকে তরা টেলিগ্রামের তাত্ত কেলে যেতো। স্ত্রী প্রেস, এলোসিয়েটেড প্রেস ও রয়টারের সংবাদ বাধকদের মধ্যে রয়টারের পিওনের ছিল একটু আভি-জাত্য। সাকিকেল থেকে বাতিটা বসিয়ে নিয়ে তুতার পটখই শব্দ করে সে ঘোড়বার ঘরে সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসতো বেন 'ডেঞ্জার সিগন্যাল'।

আশ্বাসের ঘরের সামনেই একতলায় অনেকখানি ছাদ উন্মুক্ত। বিশাল বরজাগুলি বড় করতে কারখানা জানা চাই, গায়ের মোহেরও প্রয়োজন। বেরায়া এসে বড় করতে গেলে সত্যোদ বাতপ করলে। বৃষ্টির জড়ো এসে পারে লাগছিল, তা লাগুক, বড়ের কাপটা তো এখনো লাগে নি।

মতি এসে চা দিয়ে গেল আশ্বাসের টেবিলে। তার বৃষ্টি ছিল বড় সময় লম্বা। মেঘলীলা নারীর মতো ছিল তার স্বভাব। শতীনবা বলভেন খিঁচাতা ফুল করে তাকে গুরুত্ব করে গাটিয়েছেন। সত্যোদ 'লা প্রাতি'

বলে চীৎকার করে উঠে চোট ছুঁধানা ছুঁড়লো। করে চারের পেরালায় একটা চুপক বেরে 'আঃ' বলে মতির দিকে চোরে বললে—“That's why I love you so dearly, Mati!”

আমাদের খেলার রিপোর্টার রবেশ গাঙ্গুলী মোটা মোটা ভাৱিক গোছের লোক। তার চোখের চশমা ব্রাচ ছুঁধানা বেশ পুরু, বিজলী বাতির আলোর আয়োজলল করে উঠছিল। খেলার বাঠি থেকে এসে সে তার রিপোর্ট শেষ করে ফেলেছিল। হাত খালি হলেই মনটা হালকা হয়। সত্যেনের সঙ্গে প্রায়ই হতো তার ইংরেজী বুলির বাণ বারাদারি। তার বলার ভঙ্গীটা ছিল ফেরম বরণের এবং তা হুটতো বজললতায়ে। একটা লম্বা বর্ষা চুকট ঘুচে পুরে সে এসে আমাদের মধ্যে একটা চোকার দলল করে ধপ্প করে বলে পড়লো। সত্যেনকে লক্ষী পেলে এই মোটা লোকটা কি করে যে এমন হালক হয়ে যেতো তা বলা যায় না। তার বলবার ভঙ্গীতে মনে হলো চুলোর যাক রিপোর্ট আর চুলোর যাক সব টেলিগ্রামের গালা, আজকের দিনের এমন ঘন ঘোর বরষার উড়াই যাক না একটু হালকা হাওয়ার। চারের পেরালায় ছুটি চুপক বেরে চুকটটা ধরিয়ে সে বললে—
মুখর বিধে অমৃতত পুত্রাঃ একটি নহুং অথচ কল্ল গল।
You may call it a story but it's the story of a life that's still burning. Believe it or not.

রবেশ লুপ করলে :

চৌরঙ্গীতে গ্র্যাণ্ড হোটেল হাড়িরে কিছুটা দুঃ-এগিরে গেলে গারি গারি বাড়ীর মধ্যে একখানা তেতলা বাড়ী বেধতে পারে। ঐ বাড়ীটা ছিল এক বিখ্যাত ইংরেজ ব্যবসায়ীর। দেশ বিদেশে তাঁর ক্রারবার। কলকাতা কেন্দ্রে ঐ বাড়ীটার একতলা আর দোতলা ছিল আকস। অনেক লোক কাজ করতো সেখানে। বলাই বাহুল্য বাঙালীর সংখ্যাই ছিল বেশী। এই বাঙালীদের মধ্যে একজন গুণু কোহালী হলেও হয়ে উঠেছিল সাহেবের অত্যন্ত প্রিয়। লীধ, বলিষ্ঠ চেহারা,

গায়েব রঙা কিন্তু কালো। কালো হলেও সাহেবের ভণে লোকটিকে বেশ প্রীতি দেখাতো।

এই গুণু কোহালী দিনে দিনে পশিকলার মতো বেড়ে সাহেবের এমনি বিশ্বস্ত হয়ে উঠলো যে, তাকে ছাড়া আর সাহেবের চলতো না। অফিসের কাজের মলে কোন সম্পর্ক নেই এমন অনেক ব্যক্তিগত কাজে সাহেব তাকে পাঠাতেন বহু তত্ত্ব। লোকটিও সব কাজে অতি হুটুকাবে লম্বাঘা করে আসতো। সাহেব প্রায় বিস্মিত হয়ে বলতেন—splendid! he can work wonders।

এমন একটা কাল ছিল যখন সাহেবের নজরে পড়া মানে ব্রীতিমত দ্রাঘার বিশ্বর এবং তা ছিল পরম সৌভাগ্যেরও হেতু। আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য এবং সেই সঙ্গে নানান আরাম-বিবাহের ব্যবস্থা তার হয়ে গেল দেখে থাকী লকলের হলো ঈর্ষ। লকলেই তার দিকে কটাক্ষ-পাত করে নিজেই নিজের ভাগ্যকে দিক্ত দিক্তার। বলাই তাকে লম্বাই করে চলতে থাকে—কি জানি কারও কোন বেচাল যদি সাহেবের কানে গুটে তথ্যই লব্ধনাশ। হঠাৎ সে যেন হয়ে উঠলো সাহেবের পরেই ছোট সাহেব। বড় সাহেবকে বহু পুণী করা চলে কিন্তু তার আগে ছোট সাহেবকে হাত না করলে যে নিষ্কার নেই।

এ যেন অবস্থা হলে বা হয় তাই হলো এই বেচারীর, অর্থাৎ মাথাটা গেল বিগড়ে। দুস্তর বিচার বুদ্ধির প্রয়োগ সে জ্বলে গেলো; সাহেবের আত্মকুলো সে নিজেকে এতদূর উঠে তুলে ধরেছিল যেখান থেকে তার নিজস্ব জ্ঞানী বিচ্যুতি আর তার কাছে অশোভন বলে মনে হতো না, তার আত্মবিশ্বাস যে আত্মবিশ্বস্তির নামান্তর তা ধরবার নজির সে হারিয়ে ফেলেছিল। ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কোথার গিরে ঝাঁড়ালো তাই বলছি এইবার।

বিলান্তী জীবন ব্যাভার মধ্যে বোটা আমাদের কাছে দুজের সেটা হজ্জে লব্ধ স্বাচ্ছন্দ্য। মেয়ে পুরুষের মেলা মেলায় সঙ্গে প্রাণবন্ত লম্বাঘের যে দিকটা লহজে পরিচুট,

স্বপ্নের তার সঙ্গে পরিচয় আবারের নাই বললেই চলে। এখানে ওখানে দু'চাষটি জটিল উল্লেখ করে আবার যে কালিয়া লেপন করবার চেষ্টা করি তার মধ্যে পাই আমাদের স্বপ্নেরের প্রতি স্মৃতির সত্য।

সাহেব গ্রহণ করেছিলেন এই ব্যক্তিটিকে আপনার জনের মতো। তাকে ঘিরেছিলেন তাঁর পরিবারের অবাধ মেলামেশার অধিকার। সাহেবের বহর কুড়ি বরগের কড়া লিপি ছিল অসামান্য সুন্দরী। এমন অনেক দিন গেছে যখন সাহেব এই লোকটিকে পাঠিয়েছেন তাঁর কন্ঠার সঙ্গে হরতো কোথার বাজারে কিছু কিনবার জন্তে কিংবা হরতো আরো কোথাও। লিপি চাল-চলন, সংলাপ, হাসি-ঠাট্টা, কৌতুক বিষয় এমনকি হাং হাং জুজ একটু অভিমানে তাকে এমন ভাবে আকৃষ্ট করে তুললো যে, সে ভাবতেই পারে না তাঁর জীবনে এই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার ঘটতে পারে।

লিপির কথা বলার ভঙ্গীতে ছিল যেন সঙ্গীতের বিষ্ঠে আলাপন; চলন-ভঙ্গীতে ছিল বুড়োর লাভ; বিষয়-প্রকাশে হুটে উঠতো হৃদর কোন্ বসন্তাচ্ছন্ন যেন মদির আভাস; চোটে একটু অভিমানের নজি এমন প্রচণ্ড ছিল যে তাতে সে ভেবে চুববার হ'রে যেতো—মনে হতো এই মুহূর্তেই যদি তার প্রাণট: নিশ্চল, শুষ্ক হয়ে যায় তবে বোধ হয় সে তার এই অপরূপ থেকে চিরকালের জন্তে মুক্তি পেতে পারে। "No, no, how can I start at this late hour, you see? Couldn't you be a bit punctual?"—লোকটির মনে হতো এ তিরস্কার শোনার আগে কেন সে মরেনি! জীবনের স্রোত সম্পদের একটা টুকরো বুঝি আজ সে হারালো!

'কিন্তু লিপি যে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল সহজাত, যে সৌমন্ত্র ছিল তার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অঙ্গ তাকে তুল বুঝে বললো এই লোকটি। সে ভাবলে লিপি তাকে ভালো-বেসে কেলেঙ্কে এবং সে, ভালোবাসা ঐকান্তিক এবং নৈসর্গিক—যা সমাজ-বন্ধনের কঠোরতাকে বুঝে করে যেত, যা অন্ধ ভয়সার মধ্যে গলে ওঠে আপনার দীপ্তিতে।

আপনার মনে সে কেবলি কল্পনার আলি বুনতে থাকে। লিপি তার চিন্তাকে নিয়ন্ত্রাণ্ডি আচ্ছন্ন করে থাকে, তার উদ্দেশ্যে তার মন কেঁদে বলে—

"তুমি কি বন্দী, আমি কুরর
তুমি বন্দি, আমি পতঙ্গ!"

লিপির সেতর কোন চেতনাই ছিল না, বাঁকবার কথাও নয়, কারণ—সে পরিবেশও কোথাও ছিল না। কিন্তু আমাদের ছোটসাহেব আপনার মনে মনে যে কাল বুনছিল তার মধ্যে সে লিপিকে ধরে ফেলেছিল। বলতে পারো এটা বিকার কিন্তু এই বিকারই হ'রে উঠলো তার কাছে সভ্য। এই ব্যাপার যখন সে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন সেই সময় একদিন সাহেবে ভর ক'রে সে সাহেবের সঙ্গে দেখা করে সরাসরি প্রস্তাব ক'রে বললো যে সে লিপির পাণিপ্রার্থী।

সাহেব এইরকম অসম্ভব, অপ্রত্যাশিত প্রস্তাব শুনে বিষয়ে হতবাক হ'রে গেলেন। তিনি কিছুক্ষণ এই শ্রেমিক প্রবণের সুখের দিকে শুধু চেয়ে রইলেন। বলে কি লোকটা। তাঁরই কার্যের একজন সামান্য কেরানী তাঁর কড়া লিপির পাণিপ্রার্থী! এটা যে তিনি কল্পনাও করতে পারেন না।

সাহেব বললেন—"What do you say?"

লোকটি বললে—"I say what I mean."

সাহেব প্রথমে মনে করলেন লোকটির বক্তৃতির বিকার ঘটছে। পরক্ষণেই যে চিন্তা তাঁকে আকুল করলো সেটা এই যে, লিপি কি এই প্রস্তাবের মূল্য আছে? সে কি সাড়া দিয়েছে? নইলে লোকটার এতখানি সাহস আসে কোথেকে? সাহেব একটু বিচলিত হ'রে উঠলেন, কিন্তু তাঁর অকৃত্রিম ছিল বীর, বীর শাস্ত; তাই তিনি নিজেই সামলে নিয়ে অতি সহজ কণ্ঠে ভাব দিলেন—"You are serious, I see, my boy! Let me think over it. See me afterwards."

সাহেব এই বুঝকে, ভাঙাভাঙি বিদায় দিতে চাইলেন। তিনি তাঁর কন্ঠার জন্তে শক্তি হয়ে উঠলেন।

লিলির কাছে এই লোকটি কি সত্যিই প্রেরণ পেয়েছে ?

সেমিন সাহেব আর বেশীকণ আকিণে অপেক্ষা করেন নি। লিলির কাছে তাঁর সবটা শোনা দরকার। তাঁর জীবনে এই স্বাভাবিক অভিজ্ঞতা কি তাঁকে সত্যিই বহন করতে হবে ?

লিভার এমন অস্বাভাবিক নৃতি লিলি আর কখনো দেখেনি। সাহেবের মুখটা নীল হ'য়ে গিয়েছিল যেন কোন্ ঘোর দুর্বোলের ছায়া তাঁর মুখে ঘনিয়ে এসেছে। লিভা কি অসুস্থ ? লিলি লহসা কোন প্রশ্ন করতে সাহস করেনি। একটা অজানা আপদার তার শরীর কপিত হচ্ছিল।

নির্বাক লিভা বানিকন্দণ বাদে বাতস্থ হ'লেন। তারপর কস্তার মুখের দিকে চেয়ে বিষ্মের অথচ বেহেশের মূরে ভিষ্মেণ করলেন—“Lily, are you.....are you betrothed ?”

Betrothed ! বাবা বলেন কি ? বাবা কি পাগল হ'রে গেলেন না কি ! কবে কোন্ সে প্রশ্নটা তার প্রশংসিত্য করেছো বাকি সে কথা দিয়ে কেলোছে ? কলকাতা নহরে তার অন্তরী এমন কোন ব্যক্তির সঙ্গে তার এরকম ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তা তো সে মনে করতে পারে না। সম্ভ্রতি কিংবা কিছুকাল আগে কিংবা আরো অতীতে কিরে গেলে কোন ব্যক্তিরই হবি তো তার চিত্তে জ্বলে উঠেছে না। ভেতন মনোযোগ তাঁর কখনো নিলেছে বলে তো মনে পড়ে না ; তা হাড়া এই চেতনাও কি তার জেগেছে ? লিভার সমস্ত প্রশ্নটাই তার কাছে ঘোর রহস্যজনক মনে হলো। “What nonsense you are talking papa !”—লিলি হঠাৎ একসময় ব'লে উঠলো।

সাহেব এইবার সাহস সঞ্চয় ক'রে তাঁর বাতালী কেরানীর ছঃসাহসিক প্রত্যাবের কথা কস্তাকে জানালেন।

“Good Heavens ! How dare he—”লিলির মার্গার যেন বজ্রাঘাত হয়েছে। এই অপমান, এই লজ্জা তাকে বহন করতে হবে ? না, কখনো না। মিঃস্টার

নতো সে গর্জন করে উঠলো। লিভাকে সে পরিকার জানিয়ে দিল যে, তার মনে আজ পর্যন্ত এ ভাবের কোন ছায়াপাতও হয়নি ; আর, তা হাড়া এই ব্যক্তি ! এমন বুধ্য ধারণা যদি তার মনে উঠতো, তবে সে ভুলভ্যাগ করতো !

সাহেব তাঁর কস্তার কাছে অস্বপূর্ণিক সুব স্তনে আশ্রয় হলেন। তাঁর মুখের আত্মবিক তার আবার কিরে এলো। কেরানীগৃহকে তিনি অত্যধিক বেহে তাঁর পরিবারে অবাধ মেলাবেশার সুযোগ ও অধিকার দিয়েছিলেন, তার পরিণাম এই ? তাঁবের সমাজে এ ধরণের ব্যাপারে বিভিন্ন স্তর আছে—যেমন সখা, ‘কোটসিপ’ নহ-নাতীর মিলনের পারস্পরিক ইচ্ছা ও সম্মতি অন্তঃসের উত্তরণক্ষেত্র অভিতাবকদের সম্মতি ও প্রত্যজ্ঞা। ঈর্ষ স্তরে উঠতে এতখানি অধাবসার দরকার। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে-সবের কোন বালাই নেই। এক পক্ষে এ সম্বন্ধে কোন চেতনাই নেই অথচ অপর পক্ষ এতদূর এগিয়ে গেছে ! লোকটার কোন নিকা নেই, সত্যতার ধারণাও তার অদৃষ্ট। কিংবা তার নৃত্তিক বিস্তৃতি ঘটতে, এইটাই বোধ হয় সত্য। ফিলান্তী সমাজ জীবনের সঙ্গে অনন্তান্ত এই ব্যক্তিকে তাঁর পরিবারে অবাধ অধিকার দিয়ে তিনি ভুলই করেছেন। বাই হোক, সাহেব তাঁর কস্তার অদৃষ্টের ভবিষ্যতের বে করনা করেছিলেন তা থেকে তিনি মুক্তি পেলেন, তিনি বাতস্থ হ'লেন।

পরের দিন ডাক পড়লো প্রেমিক প্রবরের সাহেবের কামদার। সাহেব তাকে অতি শান্ত কণ্ঠে ভিষ্মেণ করলেন—“Are you serious about your proposal ?”

প্রেমিক বললেন—নিশ্চয়, নইলে তাঁর জীবন-ধারণের কোন অর্থ হয় না। লিলিকে তাঁর চাই-ই চাই।

“That's true. But what about the other side ?”—সাহেবের কণ্ঠ তখনো শান্ত, কোমল।

অপর পক্ষের কথা ! অপর পক্ষ তার সঙ্গে হেসেছে, খেলেছে, কথা কাটাকাটি করেছে, রাগ করেছে, অন্তিমান দেখিয়েছে এমনকি কোথাও বায়ান সময় গীতান্দিত্তি ক'রে

তাকে স্পর্শও করেছে। অপর পক্ষের চিত্তবৃত্তি সম্বন্ধে তার ধারণা এখনো ভুল? প্রেমিক কেরাণীর মূঢ় ধারণা থেকে বিচ্যুতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। সে অখাব মিলে—অপর পক্ষও তাকেই চায়।

সাহেব তথাপি লাভ অর্জন গজীর কণ্ঠে প্রেরণা বুঝককে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি তাকে তিনদিন সময় দিচ্ছেন; এই তিন দিনের মধ্যে তার বক্তিত্ত থেকে যদি এই উন্নতি করনা হয় না; হয় তবে তাকেই এখন হইতে দূর হতে হবে।

বাফাদী বুঝকের যুক্তিত্ত উর্বর ছিল। এই তিন দিনে তার করনার পাখা প্রেরণা হুল ফুটে গেছে। এমন উৎকট প্রেম কেউ কখনো রেখে নি। তিনদিন পর যথা-রীতি সে সাহেবের কাবরার স্থায় উপস্থিত হয়ে বললে—
“Well, Mr.—I must have Lily. She also does want me. I know.”

সাহেব তাঁর চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বললেন—“you are violently in love, I see. But I, too, know how to be violent.”

সাহেব কর্তিন হতে বুঝককে অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করলেন এবং দারোয়ানকে নির্দেশ দিলেন—এ পাগলা আসবাবকে তিত্তরহে আনে কতি মং বেও।

বাসু। প্রেরণীর প্রের সাধনার অপসূত্বা এইখানেই ঘটলো।

রমেশ কিছুকণ চুপ করে থাকার পর একটা সিগারেট ধরিয়ে উদাস ভাবে টানতে টানতে অতি গজীর ভাবে আবার শুরু করলে:

আমি বললুম প্রার বক্ত বিবেক আগেকার ঘটনা। কিন্তু তাই আদর্শ এই যে, ঐ বিভাভিত, সাহিত্ত বুঝকটির মন থেকে গিলি আদর্শ মুছে যায় নি। লোকটি সেই থেকে প্রতিদিন সকালে এসে সাহেবের ঐ বাড়ীটার দিকে কিছুকণ অপসক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে, তারপর আরও কিছুকণ পাখচারি করে চলে যায়। সুখীর্ষ কাসের মধ্যে এর বিদায় নেই। প্রের প্রের হয়তো এর মানে

ছিল—যদি পাখ সে যেখা গিলির একটা বুঝকের অর্ধ, পাখ সে দেখতে তার একরূপ রেশমের মতো হুল বাতালে আদ্যোপিত হতে, পাখ যে দেখতে তার বিশেষা হিরোল যেহের বুদ্ধন সকার, যদি কানে আসে তার এক টুকরো হালির সুবধুর ককার! সাহেব তিনেজি মারা গেছে অনেকদিন হলো, আর গিলি কোথায় তা কে জানে! কিন্তু লোকটির নিত্য আবার বিদায় নেই। বিশ্বাস না হয়, যে কোন দিন সকালে চৌরালীতে বেড়াতে এসে দেখে যেরো।

আদর্শ এই যে, রমেশের এমিনকার এই গরের আদ্যের সেদিন ছিল বিজয়লালও। নারীর প্রসঙ্গে সত্যত শূহাধীন এই লোকটির কিছু বিশ্বাস্য অর্ধি দেখা যায় নি সেদিন; কাফিনীর পুরু থেকে শেষ পর্বে সে ছিল অন্তরনা প্রোভা। প্রকৃতিই প্রোভা বোধ করি সেদিন সে আর এড়াতে পারে নি। জিজ্ঞা বাতালের হোয়া আর অবিশ্রাস্ত বর্ণের অমি হয়তো তাকে করে দিয়েছিল উদাস। হয়তো তারও চিত্তে সেদিন থেকে উঠেছিল কবির ক্রন্দন অমি—

“(আমি) বরখা গাচতব

বিবিজ কুতলসব,

যেখ নাখিরছে যখ

হইটি ভীরে।”

রমেশ আবার একটা সিগারেট ধরিয়ে নোটার কুতলী ছাড়তে লাগলো। এবার তার দৃষ্টি আদ্যের কাহো দিকে ছিল না, ছিল অর্ধ কোথাও।

অবিশ্রাস্ত বর্ণ এবার আদর্শ হরে এসেছে। রোটারি সেদিনটার কর্তন অমি এতকণ চাপা পড়ে ছিল, আবার তা কানে আসে, রাত্রি শুধন প্রার এগারোটা। আদ্যের বয়ের নিশাচর বন্ধনীযাবু আর শু দরহ “নাইট এডিটর” ঘোষিত মৈত্র ইতিমধ্যে হাজির হয়ে গেছেন—একজন বিদ্যাল-ভেদা, অপরজন শু ভৈষক।

‘বলুইন, সাহেবের বক্ততার গিতি চট্টকে কোথায় রেপেছি। আর গাফী মদ্যারের সবরমতী আদ্যের

নয়া বিশ্বেশ্বরী লীলাচকলা নাগিনী দেবীর হৃদয়-
সংশ্লিষ্টের চটকদার বিবরণীটা কতদূর গেছে তা হৃদয়ে
স্বাভাবিক ভাবে বোধ করিনি।

হঠাৎ এর পরে আকাশে আবার ছ'একটি কবে
তারকা দেখা দেবে। আশাধর তারাক্রান্ত মন হঠাৎ
সেই দিকে চেয়েই আশ্চর্যের এই বর্ষণ সুপার রাত্রির
করণ কাহিনীটার ল্যবকের জীবনের ব্যর্থতার যে
খুঁজবে।

সেদিন ঘরে কিরোহি কিন্তু কিরবার পথে রেহের লগে
মনের সংযোগ খুব কমই ছিল।

রমেশের কাহিনীটা শুনে কাহিনী কিনা তার প্রমাণ
নেবার অন্তে তার পরের দিন চৌরঙ্গীর বায়ে ছুটবার
ভাগির বোধ করি নি। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম
সে কথা।

এর ঠিক কদিন পরে মনে নেই। একদিন তবাসীপুরে
স্বাভাবিক ভাবে ছিল। ভোরের নিকটবর্তী বয়েছিলাম
কলেজ ট্রাফিক থেকে। এগিয়েচলছিলাম, ভোরের মিটে
বাতাসে গা এলিয়ে
দিয়ে বসেছিলাম। হঠাৎ বা দিকে নজর পড়তেই জ্ঞাত।
হাতে একটি লোককে দেখতে পেলাম স্বাগুণ নামে

একটা বাড়ীর দিকে চেয়ে আছে। চট করে রমেশের
কাহিনীটা মনে পড়তেই আমি ট্রামটা আর একই এগিয়ে
গিয়ে আসতেই নেমে পড়লাম। ঘুরে এসে দেখি
রমেশের বর্ণনার সঙ্গে লোকটির মত মিল। শাদা
বস্ত্রবে একটি পাঞ্জাবী গারে কালোবরণ এই প্রেমিক
'লেসলী হাউস'এর দিকে অলসক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে।

আমি প্রায় মিনিট বেশক এদিক ওদিক পারচাতি
করে ফিরেছিলাম ঐ লোকটির দিকে চোখ রেখে। তার
কিছুনায়ে বৈলক্ষ্য্য প্রকাশ পায় নি। ঠিক একই ভাবে
দ্বিগতীত দৃষ্টিতে লোকটি চেয়েছিল ঐ বাড়ীটার দিকে,
মাকে মাকে শুধু মন একটু হাসির মত কম্পন কালে
মুখখানিতে কি একটা অনির্বচনীয় দীপ্তি এনে দিচ্ছিল।

ভেবে পাইনি একী ভগবান তার। একি বিস্ময়, না
নিষ্ঠা? তার বাহু তলে বিকিরের কোন চিহ্ন আমার
চোখে পড়ে নি। বিভিন্ন মন বাহুবোহ, এই লোকটির
মন কোন্ অচল আবেহনীতে বাধা পড়ে কিলের বস
দেখছিল মনের পর মিন, মাসের পর মাস, বছরের পর
বছর?

আমি আর অপেক্ষা করি নি বেশীকণ। রমেশের
কাহিনী কল্পিত নয়।



আত্মশ্রবণ

(উপভাস)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্ণাছব্দি]

বই গুলেই লুন পে চোখ বন্ধ করে ফেললো। শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমা হলো। ছুটো কানের মধ্যে শব্দ আসা। মনের এ অবস্থার পড়াশোনা অসম্ভব। টেবিলের ওপর পা ছুটো। কুলে দিয়ে লুন পে চেয়ারে ফেলান দিয়ে বসে রইলো।

‘আসতে পারি?’ বাইরে থেকে দরজার কে টোকা দিলো। ‘আমুন, দরজা খোলাই আছে’ লুন পে টেবিল থেকে পা ছুটো নানিরে বসলো।

দরজা খুলে পর পর স্তম্ভ তিনেক হলে ঘরে ঢুকলো। সব চেয়ে আগে হুক লিথ, পিছনের ছেলেগুলোর মূখ চেনা, কিন্তু অলাপ নেই লুন পের সংগে।

‘কি ব্যাপার?’ লুন পে উঠে দাঁড়ালো।

‘আপনাকে অনেকবার বঁুজ দিয়েছি, বাইরে গিয়ে-ছিলেন বুঝি,’ হুক লিথ একটা কাগজ হাতে এগিয়ে আসলো।

‘হ্যা, নেবস্তর ছিলো কমল বোলের বাড়ী’ এ কথা বলতে গিয়েই লুন পে চেপে গেলো। দরজার নেই এসব কথা বলে। কার মনে কি আছে, কে জানে। বুকের ওপর হস্ত বলেই বসবে, কিলের অত মাথামাখি কালোয়ের সংগে? উড়ে এসে জুড়ে বসেছে গদ্যপাদ্যের নতুন আবিষ্কার পাকা। কসলের ওপর অত লোক-লৌকিকতা কেন তাদের সংগে।

‘ভাগ্যবান লোক, আবাসের কেউ ভাঙেও না’ হুকলিথ একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো, ‘কেউ নেবস্তর করে না বলেই তো আমরা নিম্নেরাই শিকনিকের বন্দোবস্ত করেছি কোকাইল লেকে।’

‘তাই নাকি, কবে?’ লুন পে উৎসাহিত হয়ে উঠলো। এ বরপেরই একটা হৈ চৈ দরকার, বনকে সবপে নাড়া দিতে হবে, নয়ত কিছুতেই মন বসবে না কাজে। কেবলই

চোখের সামনে তেলে উঠছে রক্তার গভীর অস্তরেখা, বিশেষীর অভ্যাচারের রক্তাক্ত স্বাক্ষর।

‘পরন্তু, রবিবার, আপনার আপত্তি নেই তো। এই বোটেলেস চার পাঁচ জন ছাড়া, আর সবাই যেতে রাজী হয়েছে। ভোর বেলা বাস ছাড়বে এখান থেকে। আপনি তাহলে তৈরী থাকবেন।’ হুক লিথ কথার সংগে সংগে কাগজটা নই করার অস্ত্র লুন পের দিকে এগিয়ে দিলো।

ছেলের মল বেহিঁরে বাবার পর অনেককণ পর্যন্ত লুন পে খোলা বারান্দার দাঁড়িয়ে রইলো। হোটেলেসের অনেকগুলো ঘরে আলো জ্বলছে, কাঁচের শাশীরা কঁাক দিয়ে আলোর বেধা বাগানে এসে পড়ছে। সবাই পড়া হুক করেছে। অথচ কিছুতেই লুন পে মন স্থির করে উঠতে পারলো না। বইয়ের পৃষ্ঠা। লুলেই কালো কালো অক্ষরগুলো সারি সারি জনতার রূপ ধরে গুর চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। হাজার লোকের মিছিল। রক্তের বদলে রক্ত চার তারা, প্রাণের বদলে স্বাধীনতা।

বাবার ঘন্টা বেজে উঠতেই লুন পে বারান্দা থেকে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকলো। খেতে বাবার বালাই নেই। পেট একেবারে ভর্তি। হুঁকো থেকে মল গড়িয়ে নিয়ে, মুখে চোখে কাপটী দিলো অনেককণ ধরে, তারপর পুরোঘরে পাখাটা চালিয়ে দিয়ে বিছানার চিং হয়ে গুরে পড়লো। পালি বইটা লুলে গুলু গুলু করে পড়তে হুক করলো। চুপ করে থাকলেই যত রাজ্যের উদ্ভট সব চিন্তা এসে মাথার চোকে। লুগু শিরা নিঃশব্দ করে দেহ।

‘অজ্ঞাতেন জিনে কোথং অদ্যাপুং সাধুন জিনে?’

জিনে কমরিরে যানেন সর্জেনাথলকবায়িলং

লুন পে বার বার উচ্চারণ করলো। নীতিবাদের

কথা, হস্ত বর্তমান পরিবেশে এর কোনই প্রয়োজনীয়তা নেই। ক্রোধের দ্বারা ক্রোধ, হিংসার দ্বারা হিংসা, আশ্রয়ের দ্বারা অস্ত্র এই নীতি ছাড়া হৃদয়ের পথ কোথায়। জাতকের দিন আর নেই। বেরখেরী দ্বারা আর সংগণ হতে আর মানুষ তোলে না।

সেদিন সারাটা দুপুর ঘুমের বিকেলের দিকে লুন পের শরীরটা ম্যাচ ম্যাচ করতে লাগলো। কিছু ভালো লাগলো না। পাখার হাওয়াও গরম। রাসের পর রাস জল খেয়ে তৃপ্তি হলো না। রাতের তাপ কমতেই লুন পে চট্ট গায়ে বেরিয়ে পড়লো। অনেকখানি লম্বা পাড়ি মিটে হবে, নরত স্নাতিকর জাকটা পুর হবে না কিছুতেই। শহরের দিকে নয়, লুন পে খোদ সৌভের মাঠ ধরে সোজা হাঁটতে শুরু করলো। বাঠে বাসের চিহ্ন মাত্র নেই। শুকনো খটখটে মাটি, চুলের মতন অসংখ্য কাটল ঘরেছে বাটির কুকে। হাওয়ার সংগে ধূলার ধূনি উড়ে চারিদিক অন্ধকার করে ফেলছে।

সোজা অনেকখানি হেঁটে একবারে সোয়েডাগন প্যাগোডার সিঁড়ির চাতাল বরাবর এসে লুন পের খোয়াল হলো অনেকদূর এসে পড়েছে। এতটা যখন এসেই পড়েছে, তখন প্যাগোডার মধ্যে একবার বেড়িয়ে যাবে। কিছু হুল আর ঘোমবাতি কিনে দিবে বাবে করার সামনে। এত কাহ্নে এগে কিরে বাওয়া ঠিক হবে না।

একবারে সিঁড়ির কোণ বেঁধে বস। মেজেরি লাফ থেকে কিছু হুল আর ঘোমবাতি কিনে লুন পে ওপরে উঠে গেলো। সেইম নজের সংগে হেজুনে আলার দিন করেক পতে লুন পে একবার প্যাগোডার এসেছিলো। উচান টিনের নির্দেশ ছিলো অকতঃ লগ্নাহে লগ্নাহে করার সামনে পুন্ডো দিবে দার যেন লুন পে। বর্ষে বিশ্বাস না থাকলে, অীবনে কিছুই হয় না এ উচান টিনের একবারে প্রত্যক্ষ দেখা লভ্য। লগ্নাহে লগ্নাহে অবজ হরে ওঠে নি, কিন্তু লুন পে কেবে রেখেছিলো, অকতঃ রাসে একবার ফল পুন্ডো দিবে যাবে।

প্যাগোডার প্রশস্ত চাতালে অনেক লোকের জীভ। বিরাট বুদ্ধবৃত্তির লাবনে কয়েকটি মেয়ে পা খুঁড়ে বসে আছে। লারি লারি ঘোমবাতি লগ্নাহে। বাসিক্ত হুল। ঘোমবাতির রান আলোর বাবের কাঁচগুলো চিক চিক করে জলছে। অনেকদিন আগে যখন এ দেশের রাজারা এ বেশ শাসন করতো তখন এই সব বাবের গায়ে মহাৎ বশি মুক্কা বসানো ছিলো, কিন্তু দেশ জয়ের সংগে সংগে স্থানচ্যুত হলো রক্তজ্ঞান, নানা বর্ণের কাঁচের আবধানী হলো তাও তাদেরই বেশ থেকে। আশ্চর্য রত্নের চেয়ে আরো এরা দীপ্তমান আরো বর্ণাঢ্য। রত্নের পরিবর্তে কাঁচ, বাবের পরিবর্তে দাম, মহত্বের পরিবর্তে দাসত্ব এই বিনিময় নীতিতে বণিকের কারবারের পত্তন হলো।

প্রশস্ত বৃত্তি ভগ্নপত্তের। অধঃশীলিত জট্টা চোখে অনন্ত আশ্বাস। মাটিতে দাখা লুটিয়ে লুন পে স্তিনবার 'সিকো' করে উঠে গাড়ালো। অনেকদূর থেকে বুদ্ধ বর্টার লব্ব জেলে আসলো। লুন পে আভে আভে বাইরে এসে গাড়ালো।

একবারে পাঁচিলের দ্বারে গাড়ালে সবট পহরটা নজরে আসে। শেপ্ট পল্‌সের কোড়া গির্জার চুড়ো, স্থলে প্যাগোডা এমন কি দিরিরমের তেলের ট্যাংকও অশ্লষ্ট দেখা যায়। কার্টের লম্বা বেঞ্চে হেদান দিবে লুন পে চূপ করে বসে বইলো। তারি হুম্বর কাগগা। নিজেকে ভোলাহল, বোঁরা ধুলো সব কিছুই ওপরে মনে হয়। পুরাণে এক দুর্গের প্রাকার থেকে নতুন গড়ে ওঠা কোন শহরের দিকে দৃষ্টি দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনি বসে হলো লুন পের। কিছুই বলা যায় না। এক সময় এই প্যাগোডা তো ভগ্ন ছিলো হয়ত এখানে বসে স্বাবীন কোন রাজা এইভাবে শহরের ওপর নজর রাখতেন, বিদেশীর বাসিক্যপূর্ণ শহর নয়, স্বাবীন দেশের স্বাবীন শহর, মানুষ লেগানে পরাবীন নয়।

হঠাৎ দ্বিষ্ট দলার আওয়ানে লুন পে বৃথ কিরিরেই অবাক হয়ে গেলো। ঠিক পিছনেই বা টিন একটিল্লোট ফেলেক হাত ধরে গাড়িরে।

‘কি ব্যাপার, এখানে?’ শুন পের গলার আঙুরায়ে বিশ্বাসের আঘাত।

‘ওত পাবেন না, ইতিহাসের নোটস চাইবো না,’ মা টিন ভরল হেসে আরো। এগিরে এলো, ‘আপনি যে লেখাপড়া ছেড়ে এখানে?’

‘কি আশ্চর্য, আপনাদের কি ধারণা আমি দিনরাত কেবল বইরে মুখ দিই পড়ে থাকি?’

‘হ্যাঁ, থাকেন বৈকি তা না হলে ইংরেজী টিউটোরিয়াল ক্লাসে সন্তর নম্বর পেলেন কি করে?’ ওঃ আমি চল্লিশ ক্লাসে হিমসিম খেয়ে গেছি।’

মা টিনের কথার ধরনে শুন পে হেসে কেলসো, ‘কি যে বলেন তার ঠিক নেই। যাকগে, হঠাৎ এথেকে?’

‘ও এম্মা! আমিই কিছ আপনাকে আগে কবেছিলাম, জবাব পাই নি।’

শুন পে থেকে ছেড়ে পাড়িয়ে উঠলো, ‘এমনি ছোট্টলে বড় গরম লাগছিলো। শহরের পোদমালা ভালো লাগছিলোনা, তাই ভাবলাম নির্জন কোন আরসায় গিয়ে বসি। আনমনে ঘুরতে ঘুরতে প্যাগোডার চাতালে এসে ঠেকলুম।’

‘সত্যি কি বরাত আপনার, কোথার নির্জনতার ঠাঁকে হৈ চৈরের হাত এড়াতে এত উপরে উঠলেন, কিছ ঠিক পিছন পিছন আনমনাও এসে ছুটলাম। আপনার শান্তিতে থাকবার উপায় নেই।’

‘না, না, একি বলছেন। এখানে এসে একলা একলা খুব ভালো লাগছিলো না, বন একটা সংগী খুঁজছিল। বসুন না। এটি কে?’ শুন পে লগের ছোট ছেলেটির দিকে আঙুল দিই দেখালো।

‘এটি আমার বোনের ছেলে। শেত থেকে বেড়াতে এসেছে।’ মা টিন থেকে বসতে বসতে উত্তর দিলো।

শুন পে বার দৌঁবে বললো।

‘কি দেখছিলেন এক মনে এথেকে চেরে’ মা টিন গলা বাড়িয়ে উঁকি হুঁকি দিলো।

‘দেখছিলাম আমার রাজধানীর বিস্তার’ নকশাকের

আক্রমণ থেকে বাঁচবার ভক্ত আরো। ‘কিন্তাবে একে সুরক্ষিত করা যায় তাই পর্যবেক্ষণ করছিলাম,’ মুখ টিপে হাসলো শুন পে কথাগুলো বলার সময়।

মা টিন তুক ছোটো কুচকে কিছুকণ চেয়ে বইলো শুন পের দিকে তারপর বললো, ‘ব্যাপারটা কেমন গোল-মেলে ঠেকছে। শহর রক্তার তারক কি আপনার ওপর পড়েছে নাকি?’

শুন পে মুখ কেরালো, ‘এক সময়ে আমার হাতেই ছিলো, আজই না হয় বিবেচনা ছিনিয়ে নিয়েছে। চিরদিন কিছ লাস আতি ছিলাম না।’

‘ইতিহাস পড়ে পড়ে আপনার মাথার রোগ পাড়িয়ে গেছে। যাবে না, ওই সব কিছুত কিম্বাকার নাম বিনরাত মুখব করা। ইজিপ্টের ইতিহাস আবার বাহুবে পড়ে।’ মা টিন লুচচোবে একটা বিরক্তির ভাব আনলো।

‘মাহুবেই তো পড়ে। মাহুদ যদি মাহুদকে মনে না রাখবে, তার কীতিকলাপ না পড়বে, তা হলে অবস্থা কি জীবন হবে বসুন তো। আমাদের দেশের স্বাধীন রাজ্য-দের নাবহলো অত দেশের লোকের কাছে খুব দুমিট ঠেকার কথা নয়, কিছ তা বলে কেউ পড়বে না, চান শিটা, মিন জন মিন, পলং কথা, মহাবাহুল্যার নাম? কেউ জানবে না আমাদের দেশের সোনালী দিনগুলোর কথা?’

‘ও, এতক্ষণে বুঝছি। আপনি সুস্থি এখানে বলে সেই পুরানো দিনের স্বপ্ন দেখছিলেন? নিম্নকে স্বাধীন রাজ্য বলে করনা করে নিয়ে শহর রক্তার মাহুদেবের কথা ভাবছিলেন?’

‘হ্যাঁ, তাই। মাঝার পোষাক হয়ে ঠিক মানাছিলো না আমার পরীয়ে কিছ বিভাগ ককন এইখানে বলে আমি পিছ হেঁটে সেই সব যুগে ফিরে গিয়েছিলাম। এক সময় এইখানে বলে কত রাজ্য সাম্রাজ্যবিভাদের স্বপ্ন দেখেছিলেন তো?’

‘তা হলে এমন একটা ঘোরতর সময়কার মধ্যে আমার এগে পড়া তো খুবই অজায় হয়েছ। আপনার রাজ্য কার্বে বাবা দেবার আমার কোন অবিকার নেই। ভর

হচ্ছে, হয়ত নির্বাসন হুইই দিয়ে বলবেন।’

যা টিনের কথা বলবার ধরণে লুন পে হেসে কেলসো, ‘হাউঃ আপনার প্রথম অপরূপ কথা করলাম। কিন্তু আপনি অভ্যন্তর কথা মনে করেন কোনদিন।’

যা টিন পা ছাটো হুইয়ে বেকের ওপর ভালো হয়ে বসে নিলো। ছোট ক্রমশ বের করে কপাল আর মুখ হুইয়ে নিয়ে বললো, ‘হঃ, অভ্যন্তর কথা, নিজের তথ্যিত ভেবেই বলে চুল পাচ্ছি না। টার্নিনাল পরীক্ষা তো এসে গেলো, অঘট বিবাস করুন ইংরেজী আর ইতিহাস কিছু তৈরী হয় নি।’

হাটুর মধ্যে মুখ ভেঁজে লুন পে চুল করে রইলো পাশাপাশি মনে পড়ে গেল রক্তা বোলের কথা। সেও মেয়ে, কিন্তু সে ভাবে একটা আড়ের তৈরী হওয়ার কথা আর এরা ভাবে ইংরেজী আর ইতিহাস তৈরীর কথা। এত তথ্যে লম্বুরের এপারে আর ওপারে!

যা টিনের মুখের দিকে চেয়ে এক সময়ে লুন পে বললো, ‘এদেশের সমস্ত লোক যদি মাথা তুলে গাডায়, কদিন টিক থাকবে ইংরেজেরা? পাহাড়ে, উপত্যকার, হাটে, গঞ্জে, শহরে গ্রামে লব্ধ আরগায় যদি আমরা কথো কাঁড়াই লাখ। কি ওদের একটা বিনও এদেশের নাতি আকড়ে থাকতে পারে?’

যা টিন হেসে উঠলো, ‘হাস্যলেন আপনি কি দিয়ে সব কথো গাড়াবে, না আর অভাবী নিয়ে? না মোটা দেখে বাঁশের লাঠি নিয়ে ভাই বোরাবো আর বন্ বন্ করে আওরাজেই ইংরেজ জীরবেগে পালাবে এ দেশ ছেড়ে। একটা রিকলডারে পরপর পাঁচবার ভলি ছোড়া যায়, আর হাত ঠিক থাকলে পাঁচজনকে মারেল করা যায় অনায়াসে। এই রকম কত রিকলডার ইংরেজের আছে হিসাব রাখেন?’

‘থাকলোই বা। বুগেটের ভরে ল্যাক্স গুলি নিয়ে গর্তে চুপ চাপ বলে থাকতে হবে? একটা ছুটো মাল্লকে হয়ত বুগেটে শেষ করা যায়, কিন্তু গোটা ভাঁটকে নিঃশব্দ করা যায় কি এমনি ভাবে? ওরা তো বুল্লিদের, আজ

যদি তারা দেশের ছেলে বেয়ে বুড়ো জোহান সবাই কাতার দিয়ে গাড়িয়ে চাঁৎকার করে বলি ‘ডোয়াহা,’ তাহলে ওদের হাত কীপে রিকলডার মারিতে চিটকে পড়বে। টিগার টেপবার অবকাশ ওরা পাবে না।’ লুন পে নিজেই বুকতে পারলো, খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। আঙ্লুর ডগাভলো কীপে উঠলো আর আলঃ করে উঠলো ছুটি চোখ। নিশ্চেষ্টতাই তো নির্বীণ করে মাল্লকে নয়ত উপসাগরের ওপারের ছেলে মেয়েরা! যা পারে, কেন তা পারবে না এ দেশের ছেলে মেয়েরা? রক্তা বোল যে আঘাত সইতে পারে, তা কেন পারবে না যা টিন আর না শিন?’

যা টিন কোন কথা বললো না। নিশ্চলক দৃষ্টিতে লুন পের দিকে চেয়ে রইলো। এ চিন্তাবাহার সংগে যা টিন পরিচিত নয়। মাঝে মাঝে মনের কোণে এ ধরণের চিন্তা এলেও যা টিন ভুলতেই চেষ্টা করেছে এসব। ম্যাগিষ্ট্রেটের বাংলায় এসব চিন্তা করা অপরূপ।

‘কি আমি এসব কথা কোনদিন ভাবি নি। মরছি পরীক্ষার চিন্তায়, আপনি এসব ভাবনার আর আমাকে অভ্যবেশন না।’

‘আমি কি আর ভড়চ্ছি। আমি কে। কিন্তু সত্যি মাঝে মাঝে তারি ইচ্ছা করে, আবার বকি ঢাকা গুহে যার দেশের স্বাধীনতা কিংবদন্তি, আমরা আবার মাথা তুলে পৃথিবীর লোককে বলতে পারবো আমরা স্বাধীন দেশের মাল্লব।’

হঠাৎ ছোট চেলেটির চাঁৎকারে লুন পের চমক ভাঙলো। মোটা মোটা গোল হাত ছুটি নেড়ে চেলেটি আকাশের দিকে আঙুল দেখিয়ে চেষ্টা করে উঠলো। লুন পে মুখ তুলে দেখলো ডালার দিকে আকাশের কোলে পাঙুর চাঁদের কালি। আশে পাশে তারার কাঁক। কালো আন্তরগ দেখে এলোকে স্নান সহরের ওপর। স্নান চাঁদের আলোর চিক চিক করছে পেইংয়ের জল।

‘কো মত ঠিকই বলেছে, এমন হৃদয় সন্ধ্যাটা রাজ-নীতির কচকচানিতে নষ্ট করা উচিত নয়। দেখুন তো

কি হুকুর চাঁদ আর তারার মালা, কি জ্বলন্ত লেইংয়ের ঘোলাটি অলের রেখা। এরা কিন্তু বয়সার নি, কি ইংরেজ আমলে কি স্বাধীন যুগে, কি বলেন ?' বা টিন হেসে উঠলো।

লুন পে চুপ করে রইলো। অনেক, অনেক দেবী, এ সুবুর্জাত চট করে যে কোন আছান্নে লাড়া দেবে এ মনে করার কোন কারণ নেই। সত্যিই তো এ দেশের গাছপালা, জল আকাশ কিছুই তো বয়সার নি, তবে হেঁচকি করার কি দরকার, কি দরকার বাছুরের দুই ভেঁজে ওঠাবার। বেশ তো ঠিকই আছে, কেবল হুকুর্জাত নিজেই হয়ে আছে দেশের আছান্ন। দেশের মাছর আছান্ন দূতগ্রায়।

লুন পে নিজেই সামলে নিলো। বা টিন, বস্তু বোস নর। এ সব কথা নিয়ে এর সংগে আলোচনা না করাই উচিত ছিলো। কিছু হুকুর যথোত্তর একটা বাধা, এমিক ওমিক করতে গেলেই চিনচিন করে ওঠে, রক্তে একটা উদ্ধার প্রথমত্ব, মনে হয় শিরার বাধন ছিড়ে সমস্ত রক্ত জ্বার বেগে বেরিয়ে আসবে। রানি রানি ডিকা মাথা হুঁড়ে মরে হুকুর দেয়ালে, বাইরে আসতে চার তারি, মাছর খোঁজে থাকে উদ্ধার করে দেওয়া যায় ওমড়ে মরা হুকুর সমস্ত কথা। কমল বোস আর বস্তু বোস একি আঁচড় কেটে দিলো তার জীবনে, সমস্ত জীবনের রূপ বদলে দিলো, মনের পিকড় বেরে লেগে নাড়া দিলে দিলো, জীবনযাত্রার মোড় ঘুরিয়ে দিলো।

'এবার উঠি, লম্বা হয়ে এলো' লুন পে লম্বা হয়ে এলো।

'এর যথো ? বস্তু না একটু।' এইবার বিরক্তির হাওয়া দিতে শুরু করেছে। অন্ধকারে বা টিনের মুখ দেখা গেলো না। সেপ্টের উগ্র গন্ধ ব্যতাসে ভেসে আসলো। কানের সাধা পাখর হুটো জলজল করে উঠলো।

'আপনার বাড়ীর কথা মনে পড়ে না ?' বা টিনের গলার অন্তরংগতার আবেশ, 'কে আছেন বাড়ীতে ?'

'মনে পড়ে বৈ কি। সর্বথাই পড়ে। বাড়ীতে বাবা আছেন, এক ছুড়ী বিধিবা আছেন, মা শিন আছে—'

নিজের অজানিতেই মুখ থেকে কথাগুলো বেরিয়ে গেলো।

'না শিন কে ? ছোট বোন বৃতি ?' এবার বা টিনের হুটী চোখ জলে উঠলো অন্ধকারে।

'না ছোট বোন ঠিক নয়, তবে ছোট বোনের মতনই, আমাদের বাড়ীর কাছেই থাকে। হেসেবেলা থেকে আমরা এক সংগে মাছর হরিছি।'

'বাড়ী ছেড়ে কোথাও গিয়ে থাকতে হবে জানতেই আমার কাজা পাখ। কি করে যে মাছর থাকে,' বা টিনের গলার আঙঠা জেতে আসলো।

'আপনি বোধ হয় বাড়ী ছেড়ে থাকেন নি কোনদিন, তাই এরকম বলে হচ্ছে। থাকতে থাকতেই অত্যাশ হয়ে যায়। আশিও এক সময় ভেবেছিলাম সোরেবিন ছেড়ে থাকবো কি করে পহরে ?'

অন্ধকারে বা টিনের দীর্ঘ নিঃশ্বাস শোনা গেলো। আঁতে বসলো, 'কাউকে ছেড়ে থাকতে হবে মনলেই আমার কষ্ট হয়। এই দেখুন না কোমর পেতে থেকে এসেছে দিন চারেক, ওর বাবার সংগে কালই চলে যাবে এ কথা তাবতেই আমার কষ্ট হচ্ছে।'

লুন পে কোন উত্তর দিলো না। বনীর দুলালী বিলাসের কোলে মাছর, একটুতেই ছোট মেয়ের মতন ঠোট হুলিরে হুলিরে ওঠে,—কারণে অকারণে মুখ তার করে থাকে। এও এদের একটা বিলাস, একটা সৌখিনতা। তিরহিন কিছু এমনি যাবে না, বিরাট আঘাতে পলকা ভাসের পর বাড়িতে জুড়ির পড়বে, পারের তলার মাটি কেটে চৌচির হয়ে বাড়ার কারাগারস্থ পর্বত কেড়ে নেবে, তখন ছুটকো কারণে মুখ তার করা আর ঠোট হুলিরে কাজা কোথায় ভগিরে বাণে ঠিক আছে।'

প্যাগোজা থেকে বৃহৎ বস্তীর আঙঠা হতেই লুন পে উঠে বাড়ালো, 'উঠি এইবার, কবার কবার অনেক রাত হয়ে গেলো। হোটেলও তো কম দূর নয় এখানে থেকে।'

'না, না আর একটু বসুন।' বায়েনই তো এক সময়, থাকতে, তো আর আসেন নি,' বা টিন যাত্রা পল্লার বন্ধলো।

‘সামনে টার্মিনাল, পড়াশুনা কিছুই হয় নি, কথাটা হরত আপনি বিষাসই করবেন না।’

মা টিন অত্যন্ত এক কাণ্ড করে বললো। পাড়িয়ে উঠে লুন পের একটা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিলো। নরম হাতের চাপে লুন পের শরীরে মানকতার ছোঁয়া মনে হলো। মা টিনের বুকের মধ্যে ওর হাতটা থর থর করে কেঁপে উঠলো।

‘বাবা, বাবা, পড়াশুনার কথা ছাড়া আর যুঁজি ছুঁয়ার কিছু ভাবভেদও পাবেন না। না হয়, মনে করবেন হুটু একটা বেঘের পাল্লার পড়ে একটা দিনের পড়া নষ্ট হলো।’

লুন পে, মা টিনের মুখের দিকে চেয়েই অবাক হয়ে গেলো। মানে জোৎস্নার চিক চিক করছে তার চোখের কোণ। ঠোট হুটু আবেগে কাঁপছে। কি যুঁজি মা পিন বলতে চায়? হরত চিরকাল সেই দেওয়া নেওয়ার কথা, কিংবা হরত গভীরতর কিছু।

‘রাত হয়ে গেছে, এখানে বসে আর কি হবে। তার চেয়ে বরং চলুন আপনাকে বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসি।’ লুন পে নিজেই সামলে নিয়ে কথাগুলো বললো।

মা টিন জোর করে হাত ধরে টেনে লুন পেতে বসিয়ে দিলো। নিজেও পাশে বসে পড়ে আগুে আগুে বললো, ‘আপনার গায়ের কথা বলুন, গায়ের কথা শুনতে আমার ভারি ভালো লাগে, বিশেষতঃ এই ঠাণ্ডারাত্রে।’

‘মহরের বেয়ে আপনি, গায়ের কথা কি আর আপনার ভালো লাগবে? বন জল, যেটে রাস্তা, লেখাপড়া না জানা জঙ্গী সব জেলেমেয়ে, না জানে সাজগোজ করতে, না জানে ফিটকাট থাকতে ওরা আপনারের মতন মেয়ে-

দের আলোচনার অযোগ্য।’ কথার সংগে সংগেই লুন পে উঠে পাড়ালো, ‘আমার আর থাকা সম্ভব নয়। আপনি যাবেন তো চলুন, পৌঁছে দিয়ে আসি।’

মা টিন কো মন্তের হাত ধরে পাড়িয়ে উঠলো। ‘না পৌঁছে দেবার দরকার হবে না, নিচে আনাবের পাড়ী রয়েছে। আপনার এভাবে সময় নষ্ট করার অল্প মাপ চাইছি।’

অনেকক্ষণ লুন পে চুপ করে পাড়িয়ে রইলো। সিঁড়ির ঠাঁকে মা টিন আর কো মন্ত অল্প হারে বেতে গুর বেয়াল হলো। বাড়াবাড়ি করে কেলেছে একটু, এতটা করার প্রয়োজন ছিল না। কিন্তু এ ছাড়া উপায়ই বা কি ছিলো। বিনিময়ে বিনিময়ে কতকগুলি হারে রতীন কথাবার্তা চালালো বার, টাহের আলো আর তারার মালার দিকে চেয়ে করনার জাল বোনারও তো নীমা আছে একটা। ভালো লাগলো মা লুন পের। পৃথিবীর সৌন্দর্যের দিকে চোখ ফেরাতে খেলেই রক্তা বোনের গভীর ক্ষতরেখা চোখের সামনে ভেসে আসে। পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্য নিঃশেষে মুছে দেয়। কি অধিকার আছে পরাবীন জাতির রূপ বসে বিজোর হয়ে থাকবার? বুকের বিরাট আশা এত সহজে ভুলতে পারে মানুষ? নিজের বেশের গাছপালা, পাহাড় নদী, মাছবছনকে পর্যন্ত পরের ধরে বাঁধা দিহে আমন্য পার কখনো সৌন্দর্যের উপাসনার? মা টিন মরে থাক। লুন পের জীবনে গুর মত বেঘের কোনদিনই প্রয়োজন হবে না।

হাত ছুঁটা পিছনে রেখে লুন পে বীর পায়ে চাটাল বেয়ে নেবে পড়লো।

(ক্রমশঃ)



সঙ্গম

মানবেন্দ্র পাণ্ডা

এ বাড়িতে প্রত্যেক বিকেলবেলায় একটা নম্র অতিথি আছে, বোতা বায়। অর্থাৎ অল্প অল্প বাড়িতে কখন কোন কীকে বেলা গড়িয়ে যে লড়ে হয়ে পড়ে বাড়ির কর্তা থেকে শিঙটি পর্যন্ত তা টের পায় না।

বেলা দশটার মধ্যে কর্তা চলে যান কর্তৃকেন্দ্রে, হেলেরা বায় তুলে। বাড়ির কর্তা সারা সকাল ধরে রান্নাবান্না করে দুপুরের দিকে বলেন ছেঁড়া আমায় তালি দিতে কিবা আটা গম রোগে দিতে। এরই কীকে কখন বেলা পড়ে আসে—রোগ মিথিয়ে বায়। তড়াতাড়ি করে আবার রান্নাঘরে ছুটেতে হয়। স্বামী আসবে সারা দিনের পর পরিল্লাভ হয়ে—ছেলেরা ফিরবে খুশত হয়ে তুল কলেক থেকে। রান্নাঘরের ঘোঁরাহ আর ইলেকট্রিকের খোলাটে আলোর কোন কীকে বিকেলের অপসূতা ঘটে বায়।

বাড়ির কর্তা যখন কেবন শুখন লছোর আলো জ্বলে গেছে। বিকেলের রোহিৎসু ভালচৌনী কোয়ারে ট্রাক-টেপেজে গাড়িয়ে থাকার সময় কখন পিঠের ওপর দ্বিগে গড়িয়ে গিয়েছে।

ছেলেদের চুর্ভাগ্য শুভনি। সংসারের খুটি নাটি কাই-ফরমাস খাটেতে গিয়ে বাড়ির হোমস্টার আর হয়ে ওঠে না। মাষ্টার মশারের কাছে ইচ্ছা রাখতে গিয়ে বেচারাদের এই অবেলার অবসরটুকুই কাছে লাগতে হয়। চোপ টন টন করে ওঠে, বাবা হয়ে বায়। কোপের অন্ধকার ঘরে বলে পঁচিশ পাণ্ডারের ম্নান আলোর এরা অন্ধ কবে—মুখই করে এ্যাংজেন্ডার ফরমুলা।

এইসব বাড়িতে তাই বিকেল বলে কিছু নেই। এগানে দিনান্ত নায়ে কুনারী মেরের অকাল মৃত্যুর মতো—মহু, বিবধ, পাণ্ডুর বীভৎসভায়া।

কিন্তু এ বাড়িতে প্রত্যেক বিকেলবেলায় একটা নম্র অতিথি আছে।

হালকা হাল ক্যাসানের ছোট একতলা বাড়ি। চণ্ডা

পাটিল বিয়ে ঘেয়া এর কল্যাণ্ডিত। মধ্যে লাল কীকড বিছানো সরু পথ। দুধারে তার কুলের বাগান—লন-মৌর বিরে প্রস্ফর করে ছাঁটা সবুজ বাস।

এরই মধ্যে রোজ বেলা লাড়ে চারটের চোটে ছোটো চোরার পাভা হয়। মধ্যে থাকে বড়ো গোল একটা টেবিল। তার ওপর হয় তো কুল্যানিতে থাকে নাগকেশরের খাড় কিবা রজনীগন্ধার।

মিসেস নাহা গ্রিক বেলা পাচটার ঘর থেকে বেরোন। সঙ্গে লিলি, রেবা, হাসি, কেকা আর অতী। তা ছাড়া পানের বাড়ির বীরা আসে সেতার নিয়ে, বীনা আসে গীটার হাতে।

মিসেস নাহা ঘর থেকে বেরোন—সঙ্গে বেরোর বেরোর। অতী, গুতুল এরাও। গুদের কলকর্তে বিকেলের বাতাস মহু হয়ে বায়, বাগানের ছোটো পাতার সবুজ রঙ বেন আরও নম্র হয়ে ওঠে।

মিসেস নাহার হাতে লক্ষ্মিতা। উনি নিজেই আগুতি করেন—কোনদিন নিষ্ঠুরের স্বপ্নতক, কোনদিন বা স্ত্রাঘনী।

বাগানে এসে বেথেন, কখন মি: নাহা চুপটি করে এসে ইন্ডিয়েয়ারে গা ভূবিষে চুকট বাজেন চোখটি বুজিয়ে। মুখে মুহু হাসি—বেন কিছুই জানেন না।

—এ কী আশ্চর্য ব্যাপার। মিসেস নাহার কুলমেহ ছলে ওঠে ক্রিমি কোপে।

—তুমি আগে থেকে এগে থাকার টেবিলটি দখল করছ। অমৃত লোভী তো!

মি: নাহা গড়মড় করে উঠে বলেন। বলেন এক মুখ বোঁধা ছেড়ে—তাবতি, অ্যাক আমি একটা recite করব।

—করো না বাবা লক্ষীটি, সেই যে—Many a festi-val day comes to you in silence, deity of the

ruined temple. Many a night of worship goes away with lamp until....

—বাৎ বাৎ, আর তাঁকে recite করতে হবে না, এগুলি চাঁদকাবের ঠেলার লোক হবে যাঁবে।

মিসেস নাহা হাসলেন।—তুমি বয়স ভালো বাহুবের মতো আবারের প্রোগ্রাম ফলো করো। তারপর এক এক ভিউ আবারের পরিবেশন করে সভাপতির কাজ শেষ করো।

মিঃ স্নাহা বললেন—তাতে অবশ্য আমার আপত্তি ছিল না, কিন্তু—

কথা শেষ না করেই তরে তরে দরজার দিকে তাকালেন।

মিঃ নাহার এই ভয়ের সঙ্গে অবশ্য বাড়ির সকলেই পরিচিত। ক'কিছু এতকণ নতুন প্রোগ্রামের কৌকে সে ভয়ের কথা কারও মনে আসে নি।

মিঃ নাহার কথার সঙ্গে সঙ্গেই হাসি চমকে উঠলো, —তাই তো। আশ্চর্য যদি সে আসে ?

মিসেস নাহাও তুচ্ছ কৌতুকালেন—আসবেন না আবার ? এতুনি এস বলে।

লিলি বললে—আজ এসে কিছু বাবা, সুখের ওপর কথা শুনিবে দেখ। স্পষ্ট বলব, কী রকম তত্ত্বলোক বসাই আপনি ? যেক ট্রিক এই খাবার শব্দ আবারের—

কথা শেষ হল না। বাইরে জুতোয় পদ শোনা গেল। দরজা খুলে সুখ বাড়িরে বললেন তত্ত্বলোক—
May I come in ?

লিলি সুখ বোরালো, কেঁকা ট্রোট ওলটালো, অতী ফুলপ্যাণ্টের ইন্ড্রি পরীক্ষা করতে লাগল আর মিলে নহা ওপাশে গিরে সফরিতা সুখ করতে লাগলেন।

মিঃ নাহা তখু এগিরে গিরে বললেন—আমুন, আমুন, আপনার জেডেই অপেক্ষা।

একজুঁ হাঙ্গলেন তত্ত্বলোক। পুরনো বয়সী ইন্ড্রি ওটা ফুলপ্যাণ্ট—পারের হিটের বয়সী সার্ট। টকটকে কল্যাণ রঙ—আর বাঁধা কোঁড়া তকতকে টাক। তারই

জুতে বসে সর্বদা পয়েন টুপি।—পুরনো কালো টুপি। সবারে তার কালো জুতোয় অপটু হাতের রিপু।

মিঃ নাহার পাশে বসে তত্ত্বলোক তাকালেন মিলেস নাহার দিকে—এই যে নমস্কার ! Good after-noon ! আজ আমার আসতে একটু দেরি হয়ে গেল। ভাবলাম বুঝি চাঁদকাবের আশ্রমের সমাধান হয়ে গেছে।
লিলি থাকতে পারল না।

বললে বিজ্ঞপ করে—তাতে ভয়ের তো কাবদ দেখি না। চারের পাট চুকে গেলেও আপনার বস্ত্র বাদ পড়বে না। আবার বল চড়বে।

তত্ত্বলোক হো হো করে হেসে উঠলেন,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। এ আমি বলেই তো তোমাদের পর বলে ভাবতে পারি না।

কথা শেষ করে তত্ত্বলোক কেঁকার কাছে এগিরে গেলেন। গুর স্প্রাঙ্গু করা' হালকা বেশমের মতো নয়ম চুলে হাত দিরে বললেন,—কী গো ছোটো না, তুমি যে বড়ো আবার সঙ্গে কথা বলছ না ?

কেঁকাও জুতোয় ছাড়ল না কামড় দিতে।

বললে—আমিও নিশ্চয়ই কোনো বাড়িতে আপনার এন্ট্রেন্সমেন্ট ছিল ?—ব্যাক্সিটার না আই. সি. এস এর বাড়ি ?

তত্ত্বলোক পিঠ চাপড়ালেন—বুঝছি, আজ আমার ঘেরির জুতে দেখছি তোমরা সবাই রাগ করেছ। কি করব ? বেশো ? আসতে আসতে বীণনারায়ণের সঙ্গে দেখা—

—সাহিত্যিক বীণনারায়ণ ?

—ইয়া গো, ছাড়লে না কিছুতেই। বললে, চলো কে, অনেককাল পরে দেখা, আজ একবার আমার ওপাশ থেকে ঘুরে আসবে। কী করি। গদ্য বাঁজ ব্যক্তি,—তার বক্তৃৎলোক। কথা এড়াতে পারি না। বেতে হল। বক্তৃৎর আবার বক্তৃৎর করেছেন, একটা ভালো কবিতা লিখে দেবার জুতে।

—বাঃ এতো উত্তম প্রস্তাব। হাসি বললে।

—কিছু সময় কই? জানো, আমার সময় দিনের
প্রোগ্রাম?

—বাক, পরে শুনব।

—সেই ভালো। কিছু, তোমাদের টেবিল এখনো
শুভ্র যে?

মিসেস নাহার গাভ কড়মড় করে উঠল।

বললেন—আপনি ধরা করে আসন গ্রহণ করলেই
আমরা কাজ শুরু করতে পারি।

—আচ্ছা, আচ্ছা, আমি বসছি। মিন ভাড়াভাড়ি
সাক্ষণ দেখি। আমি বহুক্ষণ নাহাকে তত্ত্বক্ষণ তত্ত্বক্ষণ
ওপর দেখা আমার একটা প্রবন্ধ পড়ে শোনাই।

কথা শেষ করে তত্ত্বলোক মিঃ নাহার টেবিল থেকে
একটা চুপট তুলে নিলেন।

সন্ধ্যার সময় সভা তত্ত্ব হলে তত্ত্বলোক করমর্দন
করলেন মিঃ নাহার সঙ্গে—নমস্কার জানালেন মিসেস
নাহারকে আর প্রশংসা করলেন লিঙ্গি হাতে-ঠেঠী
চারের।

বললেন—কাল বিকেলে ছোটো মাথের হাতের
পুড়ি চাই।

তত্ত্বলোক চলে গেলেন। এঁরা তখন মোগল হয়ে
বললেন এক একটি চোরায়ে।

লিঙ্গি বললেন—মাটি, মাটি, এমন বিকলগুণে একে-
বারে মাটি। উঃ!

সীনা বললে—তত্ত্বলোকটিকে কার সঙ্গে তুলনা করা
যায় বল 'দিকি? কবি Saxe এর সেই চিরপরিচিত
বস্তুটির সঙ্গে—

Again I hear that creaking step?—

He's rapping at the door!—

Too well I know the budding sound

That ushers in a bore.

তৎকাল আবার হাসতে পারিল না। শুধু বললে—
কী নিলজ্জা লোভী মাছুষ! এরকম আমি জীবনে
কখনো দেখিনি।

আর কী বড়ো বড়ো চাল! বললে অতী—আজ
এর সঙ্গে এন্ট্রেন্সের সঙ্গে কাল উঠে যাবে। বিশ্বস্ত
বহাজারী মহাজন বেন সব ওর রূপ ক্ষেত্র!

মিসেস নাহা চুপ করে ছিলেন। এবার মুখ
খুললেন।

—এ সবই হচ্ছে তোমার প্রায়ের।

—আমার। মিঃ নাহা চমকে উঠলেন।

—নিশ্চয়ই।

—বাঃ রে, আমি কি করলাম? তত্ত্বলোক এলে
ওঁর সঙ্গে কথা বলব না!

—না। এ বকম লোকের সঙ্গে আমার উত্তর্য কী?
বিশ্বস্ত্র বাব শিষ্টাচার নেই, কালচার নেই, চম্পলজ্জা
নেই তিনি হলেন তত্ত্বলোক! এই সব ক্রটের সঙ্গে
অন্তরমন্তঃ করতে প্রোগ্রামে বাধে না তোমার? লজ্জা
করে না?

কিছু লজ্জা করত এক জনের,—বালভীর। ঘরের
কোণে বসে ছুঁয়েলা শাক ভাত বাঁধতে বাঁধতে তার
কানে এসে পৌঁছত সব কথা। বাবা বলত তারা যে
ঘরের কাছে পিতৃনিদ্রা করত তা নয়, কিন্তু যে
ভালীতে কথা বলত—যে নাকল ঘরে তারা যত্নব্য করত
তাতে যে কী দারুণ বিরুদ্ধ লুকনো বাঁকত মালতী তা
বুঝত মর্মে মর্মে।

কেউ এসে কড়া নাড়লেই পাশের ঘর থেকে রোগ-
শয্যার ওরে ওরে মালভীর মা বলতেন,—ওরে ও
মালতী দেখনা কে ডাকছে।

মালভীর ভাড়াভাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিত,—কাকে
চাই?

—হুজুকে মশাই আছেন?

—বাবা? না তো,—এই একটু কাকে বেরিয়েছেন।
এমনি কিংবদন্তি। এলে কি বলব?

অপেক্ষা বুড়ো-আমুলের ভগ্না গিয়ে 'সিঁকি' হুলকে
বলত—না, কিছু বলতে হবে না। পক্ষিতত্ত্বলোক হয়েতো
একবার দেখাই করতেন না।

এক মুহূর্তে মালতীর মুখ ক্যাকাশে হরে যেত।

হৃদয়—দীনভা আবার হরার কাছে বাধা বিকিরেছে।

মুখে বলত—ও বেলা তা হলে আসবেন, বাধাকে
বাক্যে বলব।

আগন্তুক গালে টোল-গাওয়া-হাসি হাসত।

ও বেলা—ও বেলা তো মুখেরে মশায়ের বাধা নেমন্ত
নাহা-বাড়িতে। সে নেমন্তর ঘেড়ে কি—

পা টলে উঠত মালতীর। কোনো বকমে দরজা
জীকড়ে নিজেই পালন নিত। কিন্তু মুখ থেকে কথা
বার হত না।

আগুন মনে বির বির করে কী বলতে বলতে
আগন্তুক চলে যেত। মালতীর মনে হত—যদি
ওত্রলোক পাল দিচ্ছেন—হি হি করছেন মুখেরে বাড়ির
মহাপাশে।

এমনি সময় হর তো। মালতীর মা ডাকতেন,—কে
এসেছিল রে মালতী? কী বলে গেল?

মালতী তাঁক গিলে বলত—এই এমনি একজন লোক
এসেছিল বাবার সঙ্গে গর করতে। আবার পরে
আসবে।

—গর করতে এসেছিল না ছাই। কিন্তু কোনো
কাজের খবর দিতে এসেছিল। দেখা না পেয়ে চলে
গেল। হার—হার! ঐ মাহুতটাকে নিয়ে আমি কি
করি বলুকি?

মালতী আবার একটা মিথ্যা কথা বলে,—বাবা কি
আজ্ঞা মারতে গেছে? তোমারই সঙ্গে গেছে
ভাত্যারখানার।

হুট্টা কেঁপে ওঠে—হি হি, এও পাপ। সকাল
বেলায় একটা বড়ো মিথ্যা মারের সঙ্গে!

সে তো জানে, বাবার চাকরি বাবার পর থেকে
এই আর ক'বছর বাবার হাতে যে কী জুত চেপেছে
তার টিক সেই টিক বা পড়েছে দীর্ঘকাল অগুণে।
লম্বা হৈয়ার। আর বাবা মুক করেছেন পালিয়ে
বোঁটায়। কোথায় থাকেন সারাদিন, কোথায় যান

কিন্তু বলেন না। সকালে উঠে একটা টাকা বেলে
বিয়ে বলেন, এতেই আচ্ছ ঢালাও।

বলেই-মরে হুকে জুঁজি চেড়ে সাবান কাটা ফুল-
প্যাঁট পরে নেন আর গায়ের চড়ান ছিটের একটা লাট।

মালতী ভাড়াভাড়ি ছুটে আসে,—একি ঘেঁষিয়ে
বাজ? কিছু বাবে না?

এক মুহূর্তে ভেবে মুখেরে মশাই জিগ্যেস করেন—কি
আছে?

মালতী একটু হেলে বলে—আছে বৈকি। কাল
বিকলে যে হুড়ি খারনি যা। সেই ভাগটা।

—তুই খারি নে?

মুখেরে মশাই ব্যত হরে জুজোর মুকল চালাতে
থাকেন।

—আমি! বা গো! হুড়ির নায়ে ঘোড়া। আমার
একটু চা হলেই হয়ে বাবে।

মুখেরে মশাই বলেন—কিন্তু আমার যে সকাল
বেলায় একটা পাঁচ আছে যে, ভট্টর অধিকারীর বাড়ি।
এখন হুড়ি খেলে আর ওখানে কিছুই খেতে পারব না।

মুখেরে মশাই আর দেখি না করে হন হন করে
বেরিয়ে যান। মালতী চুপ করে গাড়ির থাকে।

তবে—সত্যিই কি তার বাবার হোক হোক এমনি
নেমন্তর থাকে? তবে যে লোকে এত ঠাট্টা করে!

মনকে প্রশ্ন বের—অসম্ভবই বা কি? বাবা তো
তার যে সে লোক নয়! বি, এ, পাল করেছেন
কোন ছোটো বেলায়। সংস্কৃতি পেয়েছিলেন মেডেল।
তারপর কত মুকল মুকল কবিতা লেখেন।—কত বড়ো
বড়ো লোকের সঙ্গে আলাপ। আশ্চর্য কি, এই
কলকাতার বড়ো শহরে তাঁর অগণিত সন্ধ্যা পরিচিতির
ঘরে নিত্য নিমন্ত্রণের ডাক আসে।

খুশি মনে মালতী সেদিন গায়ে হুড়ি তিখিয়ে
প্রাত্যহাস গারে।

কিন্তু দিনে দিনে মালতীর কাছে এ মিথ্যার ভাল
মরে গেল। যে একটু বীভৎস সত্য মালতীর কাছে বরা

পতল তাতে তার নরাল শিউরে উঠল—আজ্ঞা-অবমানিনীর
হুট্টে গড়ল তার মাথা। এও কি সম্ভব ?

—তোমার বাবার আজ সকাল বেলায় কোথায়
বেঁধেছ আর নাকি ? বিকেলে তো নাহা-বাড়িতে।

কপাট। জিজ্ঞাসা করল পূর্বাধিকারীর বিধবা কজা
নরাল।

মাগতী গজীর হয়ে বললে—জানি নে।

—জান না ? বলেন নি বুঝি ? তা যেহেতু কাছে
বাগ আর নিজের শব্দের কথা কী বলবে।

কাল সকালে তোমার বাবা গিয়েছিলেন একেবারে
তার চৌধুরীর বাড়ি। (নয়দুইটা অবস্ত তোমার বাবাই
আমার করেছিলেন নিজে গত রবিবারে। একেবারে তার
চৌধুরীর সঙ্গে একটু পরিচয় ছিল বোধ হয় আগে থেকে।
অনেক দিন পর দেখা। তোমার বাবা গর করতে
করতে বললেন—বিরাট বিজ্ঞানস চলেছে তোমাদের—
একটা বাড়িও নাকি কিনেছেন রাজ্য বীনেজ স্ট্রীটে।
বহু লোক খাটছে তোমাদের কারবারে। উনি আর
কোন বিক সামলাবেন ? এ বিকে রওয়ে আমায়
সাহিত্য চর্চা। টাকটাই তো অগতে সব চেয়ে বড়ো
জিনিস নয়।

• আজ তো তার আমার কী একটা লেখা নিয়ে বাবার
কথা যেসোমশাই-এর কাছে।

মাগতী হঠাৎ চনকে উঠল।

—কী আশ্চর্য হলো ? একেবারে তার চৌধুরী যে
আমার নিজের যেসোমশাই। তোমার বাবা এখন
অপুণ্ডলে তোমাদের বীনেজ স্ট্রীটের নতুন কেনা বাড়ি-
টার গর করছিল, তখন আমি পার্শ্বের ঘরে পরীর
আড়ালে। উঃ কী সে ঘুঘুর গল্পী—কী অপরূপ বানিয়ে
বদায় ক্ষমতা ! আমি তো হাসব না কখন তেবে
পাই নে।

মাগতীর স্বাভাবিক পূর্ণ হাস্য করে কাপছিল। বললে,—
নরাল দি, একই ভরতীবে কথা বলা।

নরাল, টোয়েন্ট গণের একটা কৃত্রিম হাসি হুট্টে

বললে,—তখনই যে যেসোমশাই-এর কাছে তোমার
বাবার সভাকার পরিচয়। মিহিনি—সেইমিহিনি কি আমার
ভরতীর বধেই পরিচয় নয় ?

এখন তোমার গায়ে পড়ে বলতে এলাম এইভাবে
যে, দয়া করে তুমি তোমার বাবাকে নিবেদন কোরে
বেন ভবিষ্যতে তিনি আর যেসোমশাই-এর বাড়ি না
যাবেন। নইলে বান নিয়ে টানাটানি আমায়েরই।
তোমাদের আর কি বলে ?

নরাল কথা শেষ করে ঝড়াল না, চলে গেল।

মাগতী মাটিতে বসে রইল। নিশ্চয় অক্ষপাতে
তার দুই গাল তুং হয়ে গেল।

মনে মনে তাবল—এ কথা তো অধিদ্বারের নয়।
বাবার প্রত্যেক দিনের কথার বার্তা, চাশে চলনে
এমনি থারাই কেন বেন একটা সম্বোধন ছর যেতাল
হয়ে থেকে উঠেছে। হি হি হি।

আবার জুটল নতুন চিন্তা। তা হলে ওবেলা
বান নাহাদের বাড়ি, সেও কি এমনি ছরবেশে ?
—এই কুণ্ডিন রত-কজা ভাগ্যবানের মুখোশ এঁটে ?

মাগতী তাবল—বীনা, গিনি, কেকা—এদের গুহু
কত গরই যে করেছেন, সে কি তবে সব মিথো ? মিসেস
নাহার যোক্ত বিকেলে বাগানের আসর—সেও কি
কামনিক ? সেখানে রোজ বাবাকে সভাপতিত্ব করত
হয় এও কি সম্পূর্ণ বানানো ?—মিথো লাঞ্ছনা ?

পাশের ঘর থেকে এমনি সময় মাগতীর মা বললেন
কিনমিনে গলায়—কী যে সবু তিবি নে ? বেলা
হুপু হয়ে গেল।

—বাই।

—বাড়ি-উলির মেয়েটা কী বলছিল যে ?

মাগতী শিউরে উঠল। বলল—কী কিছু না তো ?
এমনি গর করছিল।

কোনো রকমে কথা শেষ করে মাগতী উঠলেন বাতাল
মিতে লাগল। হোণীর এখনো পথা হুঁমনি।

গজীর বিকে হুগুকে বশাই ফিরলেন। রাত

দরবার—আমাতা ডিজে গিরেছে যামে। টুপিটা গুলে
দরবার পাজার হুলিয়ে রেখে ডাকলেন,—ওরে, এক
গেলাল জল সে দিকি।

আজ সমস্ত দিন যুদ্ধে তাঁতের গ্রাসটি পৰ্বত তোলে নি
মালতী। নরনার কথা শুলো এখনো বিঁধে রয়েছে
বুকে। সমস্ত ছুপ বোতের ওপর উপড় হয়ে গুয়ে
কৈবছে। এখনো পৰ্বত মালতীর চোখের পাতাগুলো
ভারি হয়ে রয়েছে—বুকের তেতরে এখনো অনেক
কাজা হুগিরে উঠছে।

মালতী লাড়া দিল না।

হুগুজে বশাই নিজেই রায়। ঘরে চুকে পড়লেন।
হাসিমুখে বললেন—আজ তোমার জন্তে কী এবেছি দেখ।—
একবারে বাত্মা কেন্দ্র। চট করে চাঘের জল চাপা।
কথা শেব করে হুগুজে বশাই প্যাণ্টের পকেট থেকে
কাগজেই বাত্মা কতগুলো ভাঁড়ো কেকের অংশ বের
করলেন।

—এঃ ওড়িয়ে গেছে একবারে। আজ মিসেস
নাহা কিছুতেই ছাড়বেন না। ভোর করে তোমার জন্তে
কেকগুলো হাতে ভাজে দিলেন।

এ যা তা কেন্দ্র নয়—একবারে মিসেস নাহার
পিনে হাতে তৈরি। কী কথা বলছিস না যে? কী
হয়েছে?

মালতী এবার মুখ তুলে চাইল। দুই চোখ জবা
ফুলের মতো লাল। ফর্সা গাল দুটো ঢক ঢক করছে
চোখের জলে হয়ে।

মালতী বাবার হাতে থেকে কেকগুলো নিয়ে ছুঁড়ে
কৈলে দিল নরনার। দুই চোখে দল করে জলে উঠল
আজ্ঞন।

—তোমার লজ্জা করে না বাবা?

কেপে উঠল মালতীর গলা। বুক খানার হাঁক
বরতে লাগল।

—লজ্জা করে না, এমনি করে নিজের আত্ম-সম্মান
বিসর্জন দিয়ে মোজ মোজ পরের ব্যক্তিতে খাবার জন্তে
ছুটতে?

—কী বলছিস দুই?

—আমি ঠিক বলছি—সব ঠিক বলছি। আজ
তোমার একটা ছেলে থাকলে পারতে ছুনি এমনি করে
আমাদের গোটা পতিবাহের মাথা হেঁট করে দিতে?
পারতে?

ছুনি ভেবেছ আমি ঘেরে বলে কিছু খবর রাখি না—
কিন্তু ভাবতে পারি না?

একেশ্বর রায় চৌধুরীর বাড়ি কী বলে পরিচয়
দিচ্ছে ছুনি? সে কি আমি জানি না? দিন রাত
এ বাড়ি ও বাড়ি বাত্মা, সে কি কেউ তোমার ভাতক বলে?
কেউ ভাতক না—কেউ ভাতক না।

পাড়ার লোক দু'বেলা বাড়ি বয়ে এগে টিটুকিরি
দিয়ে যাচ্ছে। সে টিটুকিরি তোমার স্তন্যে হয় না—
স্তন্যে হয় আমাদের।

হুগুজে বশাই একটু চোক গিললেন।

বললেন—এ সব বাত্মা কথা তোমার কে বললে?
মিঃ নাহা আমাদের যে কত শ্রদ্ধা করেন—

—শ্রদ্ধা করে। মালতী গোছা হয়ে উঠে পাড়ালো।
তোমার শ্রদ্ধা করে বিশ্ব জগতে এমন কেউ আছে নাকি?
তোমার জন্তে আজ আমাদের পৰ্বত মাথা হেঁট।

মালতী হাঁকতে লাগল।

হুগুজে বশাই একত্রে একটা দীর্ঘশ্বাস কেললেন।
বললেন—বেশ, আমাদের শ্রদ্ধা করতে না পার, আমার
কথা কোরো তোমরা। মেয়ে হলও বরেন হয়েছ
তোমার—কমা চাইছি।

মনে আগল তাঁর গভীর বেদনা—বরা পুড়েছেন
এতদিনে, হাতে-নাতে বরা। কিন্তু বল যে সে তাঁর
হৃদয়ীত হুশোচটাই আবদ্ধে বয়ে বইল—হুগের দিকে
কিরে ভাকালো না।

হুগুজে বশাই সেই লজ্জাতে যেমন এসেছিলেন
তেননি হঠাৎই চলে গেলেন।

পাশের ঘর থেকে—মালতীজী, বা বললেন,—একটু
দুশবো তুমি কো নেই। কী এত জগড়া হাঙ্গল তোমার?

ঐ বাহুটা যে খেটে খেটে ভেঙ্গে পড়ল—তাও
আবার কুই ক'বা নোনাবি! হা—কপাল!

বিসেস্ নাহার বাড়িতে যোদ্ধার মতো বৈকালী
আগল-বসেছে।

বিসেস্ নাহা একে একে নাম ডাকছেন—মিসি—
তাল, হানি—সবীজ সংগীত, কেকা—আবুতি—

চাপরানী টেবিলে মেট সাঝাচ্ছে। অতী আত্ম
সেতার বাজাচ্ছে ব্যাক ব্রাউণ্ডে।

বীনা বললে—কৈ আর একটা মেট, আবারের
মুহুর্তে সাহেবের?

—সে আবার আত্ম আসবে নাকি? আমি তো
তোষেছি আপন বিসেস্ হেরকে ভগ্নের মতোনি। বললেন
বিসেস্ নাহা।

মিঃ নাহা যুগ থেকে চুকট নামিয়ে বললেন,—আই
সি, ম্যাক তিনদিন করে মিঃ বুখার্মিকে দেখছি না তো?
কী ব্যাপার? অস্থিরে পড়লেন না তো?

মিসি বিল বিল করে ঘেসে উঠল—উঃ, বাবা যে
ভেবে আকুল! বাত, বাত, এগুনি গাড়িখানা নিয়ে
মুহুর্তে সাহেবের বাড়ি থেকে ঘুরে এসো। গিরে
দেখবে—সাহেব একেবারে লম্বাশাখী ডায়রিয়া কিংবা
কিছুকিছুতে।

—কি করে জানলি?

—বাঃ রে সেদিন অবন হাত সাকাই করে এক মুঠো
কেঁক পকেটে পুরে নিলেন—বলতে বলতে মিসি
হেসে গুন।

—সে চোরাই মাল কি হজম করা অভই লক্ষ?

বিসেস্ নাহা কপলেন—আর করছে বহু সময় তাঁ
করতে হবে না। এগুনি হয়তো শরীরেই হাজির
হবেন। তা হলেই সব ঠাঠি।

বিসেস্ নাহার কথা শেষ করতেই বাগানের দরজার
শব্দ হল।

অবশেষে বিসেস্ নাহা—কী! বা কপলেন—

মিঃ নাহা লাকিরে উঠে ইডোলেন,—আহ্ন মিঃ
বুখার্মি—

কিছু পরকশেই বিশ্বরে ভক্তিত হয়ে গেলেন।

—আপনি?

—আমি উঁরই ঘরে মালতী।

এক মুহুর্তে বিসেস্ নাহার বৈকালী অল্পটান স্বচ্ছ হয়ে
গেল। ঘেবে গেল অতী হাতের সেতার। দূর থেকে
ককুটি করে তাকিরে রইল মিসি, রোনা, হানি আর
কেকা।

মিঃ নাহা এগিরে এসে বিড় কঠে বললেন,—তুমিই
বুঝি মিঃ বুখার্মির বেয়ে? বাঃ সুন্দর!

মালতী এগনি করতে গিরে নিজেকে সংবত করে
নিল।

বললে—বাবা এখানে আসেন নি?

মিঃ নাহা বিস্মিত হয়ে বললেন—কৈ না তো? আগে
তো বোঝেই আসতেন। আবারের এই বৈকালী আগের
তিনি ছিলেন একজন বস্ত্রখড়ো পুষ্ঠগোবক। কিছু আজ
তিনদিন হল তিনি তো আসছেন না।

—ওঃ! মালতী কর্ণকাল চূপ করে রইল।
তারপর বললে—আজ তিন দিন তিনি বাড়ি-ছাড়া।
তোষেছিলার—

—সে কী! কোনো সংবাদই নেই নাকি?

মালতী এক মুহুর্তে নিজেকে সামনে নিল। মুখে
একটা হাসির রেখা ছুটিরে বললে,

—না, জা নর। মানে—বাবাকে তো জানেনই
একটু ঐ রকম বরপের। ক'দিন ধরেই বলছিলেন কী
একটা কন্ট্রাস্ট পেয়েছেন। নীপগিরি বাইরে যেতে
হবে। তাই হয়তো হটাৎ চলে গেছেন।

জুই তাৎপাল্য, বাই একবার দেখা করে আসি—বদি
আপনার কাছে কিছু বলে গিরে থাকেন। বড় ব্যাক
মাহুয়—কখন কী করেন মিঃমিঃ ঠিক করতে পারেন
না। মালতী একটা বীথি নিঃশব্দে জেঁকল।

—তা এটা তো একটা বড় জুখের। বেশ চক্কর।

উনি, ফিরলেই আবারের সঙ্গে দেখা করতে বোলে।

—নিশ্চয়ই। জাঙ্গা, জাঙ্গা আলি ভবে।

—সে কি বলবে না ? এবার এসে একটু দিগ্বিশুণ ?

এই দেখো না তোমার বাবা আসবেন বলে স্টেট পর্বত

বৌডি। আর এই যে কেক্ দেখছ—এটা তোমার ঐ

কাফীবান হাতে তৈরী। একটু টেট করবে না ?

অকুস্মিক মালতীর ছুই চোখ জ্বালা করে উঠল।

দুধের হাসি ঢাকা গড়ে গেল কাশো ছায়ার। হঠাৎই

ধেন বুকেটা তার ব্যথিরে উঠল।

বললে কোনোরকমে—আজ থাক কাফীবানু, আর

একদিন আসব বাবার সঙ্গে।

মালতী আর গাভালো না। চলে গেল।

অপরাধী

মাস্তুলী কাল

তোমারে ভালো বেসেছি কিনা জানিতে চাও শ্রিয়,

তোমার লাগি রুচেছি কিনা গান ;

হরেছে কিনা মনের কোনে পছনে অরণীর,

জানি তে বুঝি আত্মল ভব প্রাণ ?

আমার মনে গোপন কোনে একেছি বত কবি,

তাহার নামে পেরেছ কিনা ঠাই,

ছবর বোর উঠেছে রাতি সে কোন বাধা নতি,

তরেছে হিমা তোমার বেনাই।

তোমার লাগি রুচেছি গান, বেসেছি তোমা ভালো,

তোমার ছবি একেছি বাধে বায়ে ;

তোমার বাধা আমার নামে জ্বালেনি শ্রিয় আলো,

তোমার নামে পাইনি আমি ভায়ে।

নিশ্চি করে ছবরখানি অকিরে আছে কে যে,

বুঝেই নতি, পাই না পরিচয় ;

তোমার কাছে রইছ শ্রিয় অপরাধীই লেকে,

দুখ কি বোর আমার বোলা নয়।

কতো

ঐশ্বরিকজন চৌপাখ্যার ।

পুরোশো একটা চিঠি খুঁজতে গিয়েই ছবিটা হাতে এলো ততোয়ার। বছর তিনেক আগের তোলা। কিন্তু দেখে মনে হয়, যেন এইবার টুঁটিও থেকে ডেভেলপ করে আনা হয়েছে। তেমনি আনতারা, তেমনি স্পষ্ট।

চিঠিটা আর খোঁজা হোলো না। সেখানেই বসে পড়লো ততো চিঠিটা হাতে নিতে। খানিক চুপ করে বসে ভাবলে, তারপর বেশ করে খুঁরিরে ফিরিয়ে দেখলে ছবিটা অনেকক্ষণ ধরে।

এক সময় চোখ কেবালে বাইরে। একবারে আনালাত ওপারে। কুকুড়া গাছটার যেন আঙন লেগেছে। ভরা বসন্ত, যৌবনে কলকল করছে সারাটা গাছ। ছড়ান সম্প্রদায়ের সমারোহ তার প্রতি করে। সড় সড় পাতাগুলির ঝাঁক ঝাঁক ফুলগুলির যেন আপনা হতেই ঢেঁকনাই বেড়েছে। অন্যত্রাণে যে কোন নারায়ের নৃষ্টি টেনে নিতে পারে তার রূপ, পারে নৃষ্টি বিদ্রব ঘটতে।

আজ যেন আবার নতুন করে ভালো লাগলো সে নৃষ্টি ততোয়ার চোখে। নতুন এক সজাবনার ইংগিত পেলো। খুঁজটা নামিয়ে এক কলক ব্যাধার বেশানো দীর্ঘবাস ফেললে সে।

বন্ধন খুব ভুললো, যেন হোলো চোখের তারার যেন কিলের একটা লুহ পরণা পড়েছে। পূব লুহ—উজল। চোখে হাত দিতেই অথাক হয়ে গেল সে। আশ্চর্য! অকারণেই হুটি হুটি করছিল ক' কোটা অল।

হাতের ছবিটার প্রতি এক নজর নৃষ্টিপাত করে উঠে থর থকে বেরিয়ে এলো সে। ব্যস্তটা খোলাই পড়ে রইলো সব্বরে।

পথে পথে যথেষ্ট খুঁজে বেড়ালো খানিক। প্রাপনপ চৌটা করলো অহেতুক জলতাইকু কাঠিরে উঠতে। যেন যেন বন্ধ করে খেজার নিচিরে দেবার চৌটা করলো অতীত নৃষ্টির রূপ। কিন্তু না—কিছুতেই

যেন চাপা অস্বস্তিটা বাজে না যন থেকে। কোবার যেন এক টুকরো যেন, এক কণা বেদনা লুকিয়ে থেকে। বার বার নীচন করছে তার মনকে। অসহ—বড় অসহ যেন হচ্ছে অতীতের একটাতাকে।

সেসিন বেশ রাত করেই বাতী ফিরলো ততো। কেমন যেন ক্লান্ত, পরাজিত যেন হচ্ছে নিজেকে। খুঁকের তেতটটা অসহ ভাপে জলছে পিথা বিস্তার করে। বাধ যানছে না যন। কোনো প্রলোভনেই নয়।

খাওয়া দাওয়ার শেষে একখান বই নিয়ে ইস্তকতঃ নাড়াচাড়া করার পর শুঁতে বাবে, ঝড়িরে গেল হঠাৎ দীপ্তর প্রেরে।

'তোমার কি হয়েছে বলতো? সেই লড্ডো বলা ব্যস্তটা খোলা রেখে না বলে করে কোবার চলে গেলো। এলে এই রাত্রে, তাও খুব তার করে।'

'কিছু হয়নি তো?' দীপ্তর কঠে উৎকর্ষার সঙ্গে অভিমান বেশানো।

সহসা কোন উত্তর দিতে পারলে না ততো। শুধু দীপ্তর মুখের দিকে চেয়ে খুঁক চেপে দীর্ঘবাস নিলে, একবার।

'উত্তর বিচ্ছ না বে? না বেলে ঝাড়িরে আবার প্রশ্ন করলে দীপ্ত। 'তখনতে পেলো না আবার কথাটা?'

'তেনেছি।' খুঁজটা নামিয়েই উত্তর নিলে ততো।

তবে বলা।

'কি?'

'এমন খুব তার কেন তোমার। কি হয়েছে।'

কৈ কিছুই না তো?

'উহ—কথাটা বিশ্বাস হোলো না দীপ্তর। পাশে বসে পড়ে ততোয়ার খুঁজটা টেনে খুঁরিরে এনে বললে 'বলবে না তো?—বেশ।'

যেন হোলো, যেন চোখ ছটোও তার হুগহুগ করে উঠলো ঐ মুখে।

এবার হৈলে কেবলে ততো। অকথাৎ যেন যুব
সহজ, স্বাভাবিক মনে হোলো নিজেকে। বললে
‘ভাবছিলাম—’

‘কি।’

‘তোমার কথা।’

‘হা—সত্যি?’

‘সত্যি! তুমি আ

টিক তেমননি।’

মুহুর্তে খুলীর হাসিতে উজ্জল হয়ে উঠলো নীপূর
মুখ চোখ। ছোট্ট করে ছুঁটো টোল খেলো রাঙা
পাল্পে। হাতটা নেড়ে বললে ‘তুমি এত রুই—আর
এদিকে আমি ভেবেই নরি।’

শুভোৎসে সে হাসিতে যোগ দিল। কিন্তু প্রাণ দুলে
যেন হাসতে পারলে না। হাসিটুকু যেন নিজের
কাছেই বড় বেশী কৃত্রিম, জোর করে চোনে আনা
বলে মনে হলো।

গুরে যুব এলোনা সহসা। চোঁট করেও বোঝানো
যাচ্ছে না ছুঁচোখের পাতা।

নীপু যুধিরে পড়ছে অনেককণ। একই মতো বার
ছুই কেঁপে উঠে তার হাত ছুঁটো অড়িয়ে ধরেছে
‘ভিত্তিকে।’ একবার চাইলে তার মুখের দিকে ততো।
যেন একটা স্বপ্নিল, বিজুয়িত মিড রূপ খেলা করে
যেচ্ছাচ্ছে তার সারা মুখময়। ছোট্ট ছুঁটো খুব স্নানভাবে
কাঁপছে। এক টুকরো হাসির রেখাও যেন অড়িয়ে
রয়েছে ওর কাঁকে। মনে হলো নীপূর এ রূপের তুলনা
নেই। ছুঁবি করে হেখের আনন্দ।

সহসা আরো একটি মুখ জেসে উঠলো শুভোর চোখের
ওপর। বড় চেনা, বড় আদরের সে মুখ।

পুরোপুরি যিনের কথাগুলি মনে পড়লো শুভোর।
মনে পড়লো যিনের পরের সেই প্রথম আনন্দের
সিনটার কথা।

অকস্মিক কেরত নাসিং হোয়ে নীপূর ধর নিতে গিয়ে
আকস্মিক ভাবে এ মুখটাই সেবিন স্ক্রোয়ে পড়ছিল

তার। অবশ্য, ঠিক এমন করে নয়। নাসের সঙ্গে
নীপূর কেবিনের তেতর চুকেই এক মুহুর্ত—যমকে
ধাড়িয়েছিল ততো। ঠিক বুঝোনি বসে নীপু। বড়
দীর্ঘ, বড় স্নান তার মুখ চোখ। তবু যেন মনে হচ্ছিল
অনেক, অনেক বেশী স্নানর আশ্বকের এই নীপু।
ছোট্টের কোণে তার ললাট হাসি। আর—কোলে
একটি ছুঁটুটে লতান। অতিরিক্ত দুরন্তপনার তরে
ফুলেছে না’র অনভ্যাসী কোল।

নাস একটু মুচকি হেসে গলে যেতেই নীপু মেয়েটাকে
বেগ বানিকটা তার মুখের কাছে ফুল বলেছিল
‘বেগতো চিনতে পার কি না?’ এক মুহুর্ত চুপ করে
থেকে আবার বলেছিল ‘মুখ ঠেকেছো কিন্তু। হেসে
নয়—মেয়ে।’

প্রথমটা উত্তর পেওয়া হয়নি। হিঁতে পারেনি সে।
তবু মুখ টিপে হেসেছিল।

‘লজ্জা হচ্ছে?’ কার মত হয়েছ বলেতোপু’—মিটি
মিটি হেসে প্রশ্ন করেছিল নীপু। ‘বাই বল, না’র মত
কিন্তু কিছুতেই নয়।’

আবারও প্রথমটা মুখ টিপে হেসেছিল শুভো। পরে
বলেছিল ‘তবে বাপের মত?’

‘বাপের মত?’ আক্ষে না মশাই—মোটেই নয়।
‘বরং—’ হঠাৎ যেন হোঁচট খেয়েই যেমে গিয়েছিল
ততো’র প্রশ্নটা।

‘বরং—অনেকটা ওবাড়ীর মেজ বো’র মত। সেই
লকাল থেকেই খুঁটির খুঁটিয়ে বেখছি। অনেকটা আসে।
পায়ের হেঁটা লম্বা তেমননি।’

কথাটা এমন কিছুই নয়। তবু যেন এক স্নানক
তাঁকা রক্ত খেল গিয়েছিল তার মুখের ওপর দিয়ে
মুহুর্তের অকরে। সহসা তাই কোন উত্তর দিতে
পারেনি।

তারপর থেকে বাপ না’র আদর সোহাগে একটু
একটু করে বড়ই হয়ে উঠছিল মেয়েটা। বা আদর
করে না’র মাঝে অমন। ডাকতো বোনী বলে।

বেশ দৃশ্যই হয়ে উঠেছিল বেবী। আর স্পষ্টাও তো কম নয়। হোয়ার লামবে বৈকি। যেন একই বেবীই লেগেছিল। আর একটু বড় হবার মুখে যেন হয়েছিল, ও বাড়ীর মেজ বোঁর মত নয়, দীপ্তই খানিকটা আবল স্পষ্ট হয়ে উঠছে ওর মুখে চোখে—সমস্ত সুখখানার আনাচে কানাচে। তেমনি ছোট্ট দৃশ্যর নাক, টানা-টানা ছুটি চোখ, পাভলা কাঁপা ঠোঁট, ফুলি দিয়ে আঁকা দুটো নিকল কালো জুজ। অনেকটা ঠিক দীপ্তই মত।

কিন্তু তবুও বিশ্বাস করতো না কখাটা দীপ্ত। উটে মিল হুঁজে বেড়াতেও শুভার আপন বোন থেকে সম্ভার পাভার ভড়ানো আত্মীয়দের মধ্যে।

একটা বছর পরে কিন্তু বেধা গেল শুভার কথাই সত্যি। ঐ সাথে আরো একটু আবিক্ত হোলো। যেন তবুও খানিকটা পেরেছে বেবী। খুব দৃশ্য অথচ স্পষ্ট ছাপ ওর দেহে।

এইই মধ্যে কথাও ছুটি ছুটি করছে বেবীর। স্পষ্ট নিষ্টি করে ডাকতে শিখেছে যাকে। হুঁ এক মাসের মধ্যে বাবা ডাকবারও পূর্ণ সম্ভাবনা।

দীপ্ত বলতো ‘সেখবে, বেবী আমার সাক্ষ্য সম্বলী হবে। দেখে শুনে পছন্দ মত ওর বিয়ে দেবো আমি।’

শুভো হাসতো, খুসীর বজার কথাই হুটতো না মুখে। বড় ভোর বেবীকে কোলে তুলে অস্থির, রাডা করে তুলতো আদবে আসরে।

দেই বেবী তেরটা মাস পেরতে না পেরতেই হুঁ যিনের জরে মারা গেল। অথচ আছো যেন সে কখাটা বিশ্বাস হয় না। জ্বরই মনে হয়, এই মুখি পায়ের মল বাকিরে হান্যভক্তি খেয়ে সামনে এসে পথ আড়াল করে ঠাড়াবে। এখুনি অভিমান করতে গিয়েও ফিক করে হেসে উঠবে চুইর মত। তার পরশের তীব্রতা যেন আছো গ্রেহ মন জুড়ে আছে।

কিন্তু দীপ্তর মুখের ফিকে ভাকালেই সে তুল ভাঙতো শুভার। সব হোতো না সে কথা। দীপ্তকে সামান্য দিতে গিয়ে নিজেই হারিয়ে যেতো গভীর কারার। শুধু কাঁদতে পারতো না ওর সামনে। তাই আড়ালে পালিয়ে যাওয়া। কাঁদতে সে চায় না। তার তুলতে চার পরিপূর্ণ বিম্বত হতে।

ক্রমে সহন হয়ে এলো সে অব্যথাটা। কিন্তু দীপ্তর বড় একটা পরিবর্তন চোলো না। ক্রমশঃ যেন হারানোর বেদনাটা তাকে চাহুক যেরে ছুটিয়ে দারতে লগিলো। কোন সামান্যতাই প্রতিক্রিয়া করা যেতো না তাকে। প্রবোধ পেলেই কাঁদতো, বুকু পূর্ণ করতো—আঁর, শেষ পর্যন্ত রহতো বেবীর মুখের কাছে তাকেই নির্ভরের মত দাবী করে বসতো।—

দীপ্তকাল ফেলে পান কিরে শুভো শুভো। আঁর তার একি দুর্বলতা এলো? ভাবতে গিয়ে আরেক যিনের কথা মনে পড়লো।

ও বাড়ীর মেজ বোঁর ঘেরোটাকে কোলে নিয়ে এসেছিল শুভো। বেবীর চেহারা আঁড়াই বাসের বড় বেরেট। কচি তুলতুলে মুখ চুইর মত, বড়ব অনেকটা মার মতই মুখ চোরা গোছের। তাকেই বুকে জড়িয়ে একটু রক্ত করবার জন্তে রান্নাঘরের সামনে ঠাঁড়িয়ে হুচকি হেসে বলেছিল—‘মেখেছে: কাকে এনেছি?’

হাসি মুখটা কিরিরে চেয়েই হঠাৎ দীপ্ত গভীর হয়ে গিয়েছিল। কোন উত্তর দেয়নি। হয় তো ইচ্ছা করেই ঘের নি।

শুভো তবু হেসেছিল মুখ টিপে। নিচু গলায় বলেছিল—‘বাই বল, মেজ বোঁর মেয়ের রূপের তুলনা দেই।’

গোটা দুটোটা শুভার মুখের ওপর ফেলে চোখ নামিয়ে বলেছিল দীপ্ত ‘বার বেয়ে তার কোলেই মানার।’ —‘আমার বেবীই বা কম কিলে রূপে?’ তারপর খানিকটা চূপ করে থেকে আবার বলেছিল ‘অন্ত রূপের বড়াই ভালো নয়। গম্ভীর তোবার মুখে শোভা পায় না। তারপর আর কোন কথা বলে নি দীপ্ত। শুভোও আঁজি শূঁধাধি থেকে পালিয়ে যেতেছিল।

সেনিই লজ্যোবেলা বৌবীকে ফোসে নিয়ে, এক গাল হেসে ভক্তোর গা খেঁসে ঠাড়িয়ে বলেছিল লীপু 'তোমার কামল বুকে পাউটার মাথার কুঁকচুড়া আর গলার সোনার হার পরে কেমন লেজেছে সেখেন্তো ভোবার ঘেরে ? বেশ রাজরানী।'

ভারপর ভক্তোর বিকে মিটমিটি চেয়ে, চুমোর চুমোর বৌবীর গাল দুটোকে রক্তা করে, তাকে কোলে নিয়েই বেরিয়ে গিয়েছিল ঘর থেকে পরমুহুর্তে।

রাতে পেতে বসে রসিকতা করে প্রশ্ন করেছিল ভক্তো 'ভখন তো বেগেই উঃ। কিন্তু নিজের ঘেরেকেই যে অত আদর দেখা হচ্ছে, ব্যাপারখান কি।'

'হিঙ্গে হচ্ছে বুঝি খুব ?' হেসে চোখ নাচিয়ে উত্তর দিয়েছিল লীপু।

'ভর হয় শেষে না সামালানো দার হয়ে ওঠে।'

'সে আমি বুঝবো। আদি যা।'

'ঘাট বানলু।' হেসে বলেছিল ভক্তো। 'কিন্তু বিয়ে দিতেই বুকেব ঠালা। ভখন কিং আবার দেখ দিতে পারবে না। বুকেব ?'

'খুব বুকেছি। দার মন ভোবাদের আগে থেকেই গলব বুকে রাখে।'

'ওঃ একটিকে নিয়েই মাড়ুখের বড়াই ? বাহাদুর খটে। আরো গুট কর থাকলে না হয় বুকেভন।'

'বটে ?' বড় বড় তোমের হুঁইমি বিশিয়ে কৃত্রিম হাসের তান করেছিল লীপু সে কথা।

বেশ বানিকটা হেসে নিরেছিল ভক্তো। বলেছিল 'বুঝলুম বাবা, বাজালী ঘরের মেয়েরা যা হাতে পারলে আর কিছুটি চার না।'

'জীং আগো একটা।'

'আবার কি ?'

'বুঝিনা।'

ভারপরই দুহনের কলহাসিতে বুঝর হয়ে উঠেছিল অশ্রুশত দারাবরখান।

শোবার বুকে লীপু বাই বসলে বৌবীর একখান হুঁই কুলতে 'হবে। তখাভু। পরদিনই বাজ থেকে নতুন

ময়েলের বিভিন্নর কোড়াক ক্যামেরাটা টেনে বের করলে ভক্তো। কলেক ভীবনে কেনা ছিল ওটা। প্রথম প্রথম ছবি তোলায় বাতিকে পরলা আর ঘাপের ল্যাক্স করেছিল। বিয়ের পরও কটা দিন সেটা কাঁধে কাঁধেই সুরেছিল। তারপর আর সন্তান হয় নি। হয় নি অনেকটা নতুন করে আশালা লংগার পাতবার ভক্তোই। ক্যামেরা তো নয় বেন হাতীর খোজাক।

অকিস থেকে কেতার পথেই কিনে নিয়ে এলো এক রিল ফিল্ম। শনিবারের অকিস। একটু বেলাই ছিল তখনো। বিকেলের সেই পরম রোমে পরম কৃত্রিমতা ছবি কুলে শেষ করলে রিলটা।

সে ছবি হাতে গেয়ে খুশী আর ধরে না লীপু। দেখে দেখেও বেন আশ মেটে না। আশে পাশের ভাড়টে-ঘের দেখিয়ে বেড়ালে: বৌবীর ছবি। নিজের ছবি। যা আর মেয়ে বেন ছবিতো ধারা পড়েছে। কটা দিন কাটলো সেই আনন্দেই।

১. কিন্তু বৌবী দিন তা দ্বারা হয় নি। ছবি গুলিও নয়। বৌবীর সঙ্গে লজেই সেগুলিও উঠলে আর বেশলাইর কাঠির আশনে গুড়ে শেষ হয়ে গিরেছিল ভক্তোর নির্দু-রতার। কি লাভ কৃতজনের ছবি কাছে রেখে সে-ই বহি না রইলো ? হাতে পড়লেই তো মন খারাপ হবে, টেনে আনবে বুঝ মিঃডানো চোখের জল। ফেলেনাছয়ের বক্ত কাগা জুড়ে সেবে লীপু। আর সে কাগাও শেষ হবে না হুঁএক দিনে।

ক্যামেরাটাও বিক্রি করে গিরেছিল নগণ্য মাংষ এক বছর কাছে। বড় সখের ক্যামেরা ছিল 'ওটা ভক্তোর। কিন্তু সেদিন বেন ওটাও বড় অসহ্য জলাল মনে হয়েছিল তার কাছে।

বনে পড়ছে। স্পষ্ট মনে পড়ছে সে সব কথা আজ। আশ্চর্য তাই 'ভারা খুটে উঠে চোখের সামনে। আজ বেন সেদিনের চেয়েও বাখাটা টানটান করছে বুকের মধ্যে। অথচ কম তো নয়। পুরো একটা বছর কেটে গেছে। ভাষতে গিরে আবার আনন্দনা হয়ে পড়ল ভক্তো।

ভেবে ঠিক করতে পারলে না। কোথা থেকে এ ছবিটা এলো। আর কি করেই বা তার দৃষ্টি আড়াল করে একদিন শুটা বান্ধের মধ্যে আচ্ছাদন করে ছিল। সেদিনের ভো। কোন স্মৃতিই সে রাখেনি। রাখেনি ইচ্ছে করেই।

হোচট্টু খেয়ে খেয়ে গেল তার চিন্তা দীপ্ত কথাত। মনে পড়তেই, সেই কি চুরি করে ছুঁয়ে রেখেছিল এটা। অন্ধকারেই ছবিটা খুঁটা খুলে একবার দেখবার চেষ্টা করলো শুভা। তারপর এক সময় মাথাটা উঁচু করে চাইলে দীপ্তর দিকে।

এবার যেন আবার বেশী করে ভালো লাগতে দীপ্তকে। নিটোল, নিশ্চিন্ত মুখের ওপর অজ্ঞান আর কোন বেননার চিহ্নই নেই। পরম স্তম্ভিতে সে বুকের ওপর হাত ছুটো রেখে মুখের কোণে দ্বিতীয় হাসির রেখা টেনে বুলছে। আজ যেন আবার নতুন করে ভালো লাগলো তাকে শুভার।

কখন হুনিরে পড়েছিল শুভা খেয়াল করেনি। অকস্মিক এক সময় দীপ্তর ডাকে বড়কড় করে জেগে উঠে বসলো সে। চোখ দুটো ভালো করে রগড়ে নিয়ে বললে 'কি হলো হঠাৎ। এমন ভাড়া কেন?'

'ভাড়া স্থাবার কোথায়। উঠবে না? ক'টা বেজতে খেয়াল আছে?'

'ক'টা? তুঝিই বল তুমি।'

'এঁা বল কি। আটটা!' শুভা বেন হঠাৎ আকাশ থেকে খসে পড়লো। পর দুহুর্ডে লাফ দিয়ে নেমে পড়লো খাট থেকে। 'হুগা হুগা—এত বেলা হয়ে গেল! সর্বনাশ—অকসিে বাবো কখন?'

কোন প্রকারে চোখ বুজ খুঁয়ে চা-টা চক্চক্ করে গিলেই ছুটলো ব্যাকারে। ন'টার বেজতে হবে। নইলে দশটার অকসিে পৌঁছানো সম্ভব নয়। আধ ঘণ্টার ওপর ভো লাগবে টেনেই।

ঝাঝারে ঢুক পকেটে হাত দিতেই মনে পড়লো, আজ আবার মাইনের দিন। অন্তএব দেবী করা কিছুতেই চলতে পারে না।

একটু ভাড়াভেড়ি আক খেললো শুভা। চরকি বাজীর মত আশ্চর্যভাবে বাজার করে, ম্যান-আহার পর্যন্ত সাব্রা হয়ে গেছে ন'টার আগেই। ট্রেনে বসে আগাগোড়া ভাবতে গিয়ে নিজেই হেসে কেলেলে এক সময়। শুভা মাঝিত কেরানী জীবনে মাইনের দিনটা কি উৎকর্ষার ভরা, কেনন কিছু কর চকল।

অকসি থেকে বেরিয়ে একবার বুক পকেটের স্পর্শে নিহরম জাগলো তার সাব্রা দেখে। ঐ মাঝে মনে পড়লো দীপ্তর সেদিনকার কথাটা। —নাঃ ছোড়া না হোক অন্ত একখানা শাড়ী নিতেই হবে ওর জন্তে। কতদিন থেকে বলছে।

অর্ধকরী চিত্রার নাকে খুব সহজেই হারিয়ে গেল কাল রাঙের কথাটা। আজকে, এই দুহুর্ডে সে অজ রাছব। অন্ততর জীবনের স্পন্দন তার বুক।

একটু হেঁয়ীই হলো সেদিন শুভার বাড়ী কিভাবে। হু'টা পকশের ট্রেনটা বরা হয়নি। দীপ্ত শাড়ী কিনতে গিয়েই ওটু হেঁয়ী হোলো।

ট্রেন থেকে নেমে ছালকা খুলী রেশ নিয়েই পা চালালো শুভা। শাড়ীটা পেলে কি খুলীই না হবে দীপ্ত। দানটা একটু বেনীই পড়েছে। তা হোক। একবার বই তো নয়। দীপ্তর বহনিকার সাব্রা ভরেলের শাড়ী কেন। আজ এই যে খুলী হাসি ছুটে উঠবে দীপ্তর মুখে, এটাই কি নয়?

বাড়ীর দরজার পা দিয়ে একটু অবাক হোলো শুভা। অজদিন এমন দেবী হলো বীভিমত মনে-বাইরে ছুটোছুটি ছুড়ে দেব দীপ্ত। কিন্তু আজ তার কোন লাভাই নেই।

সামনের ঘর ক'টা পেরিয়ে পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল সে। একবার ভাড়ার বাড়ী। নিশ্চিন্ত হবার পূর্বে, ইতিমধ্যেই জীবন বাহরের ভাঙনের কারা বাড়ীটা দখল হয়ে উঠেছে।

হঠাৎ বনকে দাঁড়ালো শুভা। দরজার পাশা হু'টো হা করে খোল। ভেতরটা অন্ধকার। কুকাটা কেমন

ধ্বংসক্ করে উঠলো একবার। ধানিক ইতস্ততঃ করলো। কান পেতে শ্রুত হয়ে শুনবার চেষ্টা করলো দীপ্তর গলার দ্বারা। কিন্তু না—কোন সাড়াই কান পড়ল পৌছলো না। তার। নাম ধরে ডাকলো আর কহে। তবু কোন উত্তর নেই। •

অগত্যা একান্ত বিরক্ত হয়েই ঘরে ঢুকে হুইচ্-টীপে আলোটা জ্বাললো। পর মুহূর্তে চমকে ছুঁ পা নিচিয়ে এলো।

বিজ্ঞানার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, আছে দীপ্ত থেকে থেকে কুলে কুলে উঠেছে তার দেহটা। মনে হচ্ছে বেশ নিউরে উঠছে।

ঠার দাঁড়িয়ে রইলো অনেকক্ষণ শুতো। এক সময় কাপড়টা আলনার ওপর টাঙিয়ে, কাছে গিয়ে পিঠের ওপর ডান হাতটা রেখে ডাকলো ‘দীপ্ত—দীপ্ত।’

কোন লাড়া পেলো না প্রথমটা। অনেক ডাকা-ডাকির পর উঠে বসলো দীপ্ত। কিন্তু কোন কথা বলতে পারলো না। তবু কান্নার কুলে গুঠা চোখ দু’টা মেলে চেয়ে রইলো শুতোর মুখের প্রতি।

তারপর অবশ্রান্ত শুতোর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হ হ করে কেঁদে ফেললো। বললে ‘কেন—কেন তুমি একান্ত করলে?’

সহসা বুকে উঠতে পারলে না ব্যাপারটা শুতো। হৃৎকম্পিত হয়ে প্রশ্ন করলে ‘কি—কি দীপ্ত?’

‘কেন—কেন তুমি—’আর বলতে পারলো না দীপ্ত। কেঁদে মুখ লুকালো তার বুকে। অনেকটা সময় ভেতম

পাড়ে থেকে আবার হুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললে ‘কে বলেছিল—বল কে বলেছিল, গুঠা তোমাকে বের করতে। তুমি—তুমি—তুমি কি লাফান?’

হঠাৎ যেন চাবুক খেয়ে, নিউরে উঠলো শুতো। স্পষ্ট হয়ে এলো দীপ্তর কথাটার রহস্য। মনে পড়লো, দেবীর ছবিখানা গল্পকাল রাতে জ্বল করে সে বাসিনের নিচেই লুকিয়ে রেখেছিল।

দেগতে দেগতে চোপের তারা ভেদ করে নেমে এলো জল। বড় অসহ্য, বড় তীব্র, তীক্ষ্ণ মনে হোলো দীপ্তর বিনিময়ে কান্নার রেশটা।

দেবীকে যেন আবার মনুন করে লেগতে পেলো লাবনে। সেই ছোট্ট স্তন্যর নাক, ভাঙ্গা ভাঙ্গা গভীর চোখ, পাতলা কাঁপা ঠোঁট, তুলি দিয়ে আঁকা দু’টি নিকল কালো কুঁক। ঠিক সেই আগের মতই।

মুখ কুলে একবার ভাবালো দীপ্তর দিকে। হ্যাঁ ঠিক সেই মুখ, চোখ, নাক—ঈশ। হৃদয় এক। কোন তফাৎ নেই। দেবীর সেই কটি দুখানা যেন আরও—আরও স্পষ্ট, উজ্জল মনে হোলো আজ।

আর ভাবতে পারলে না শুতো। দুখটা নাথিয়ে, আরো কাছে, একেবারে বুকের মধ্যে টেনে নিলে দীপ্তর আবেগ কম্পিত দেহটা।

জলেরের লাড়ীর বিনিময়ে সে রাতে আর দীপ্তর হালি ভরা দুখানা দেখা হোলো না শুতো। কোথায় যেন ধানিকটা অদৃশ্যপূর্ণতা, এক টুকরো ভেদ পড়ে গিয়েছে ইতিমধ্যেই।



পুরুষ ও নারী

ঐন্দ্রজ্যোতীশাল রায়

পণ্ডিতেরা বলেন সৃষ্টির গোড়ার নারী ও পুরুষ দুই দেহ ছিল না। দেহ ছিল একটি, কিন্তু নারী ও পুরুষের বিভিন্ন চিহ্ন ছিল। একই দেহে উভয়ের—অর্থাৎ এই দুই শক্তির—মিলন হইত। কিন্তু ক্রমবিবর্তনের ফলে কালে এই দুই শক্তির ভাগাভাগি হইয়া গেল—দুটি দেহের জন্ম হইল। কেন? শিরোবর্ণ করিলে মনে হইবে মিলনের পরিপূর্ণতার জঙ্কই এই বিচ্ছেদের প্রয়োজন হইয়া পড়িল।

সৃষ্টির ইহা বহুত। বহুতও যেমন—কবিতাও তেমন। বহুতই পুরুষ হইতে নারী আর নারী হইতে পুরুষ ভিন্নতর পথে বিবর্তন (evolution) পরিগ্রহ করিতে লাগিল, ততই উভয়ের মিলনের আকাঙ্ক্ষা তীব্রতর হইয়া উঠিল। বিবর্তন একদিকে যেমন পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রভেদ বাড়াইতে লাগিল—অপরদিকে তেমনই উভয়ের মিলন পূর্ণতর করিতে লাগিল। প্রভেদ যত বেশী মিলন তত পূর্ণ, তত স্পন্দন।

অতি নিম্নস্তরের জীবের মধ্যে পুরুষ ও নারীতে বৈজ্ঞিক প্রভেদ সাধারণ। তাহাদের মিলনও মাহুদের—এমন কি উচ্চ স্তরের পশুর তুলনায় অসম্পূর্ণ। ঐ স্তরের জীবের দেহ আছে—কল্পনা নাই। মিলনও শুধু মৈত্রিক—অনেকটা বহুচালিত প্রাণ। কল্পনাবিহীন এই মিলন অধিকাংশক্ষেত্রেই স্বকৃত প্রভাবে, প্রকৃতির তাড়নায় বংশধরের মধ্যে সময় বিশেষে একবার কি দুইবার হয়। তাই ইহাকে ব্যাক্তিক মিলন বলা বাহিতে পারে।

ক্রমবিবর্তন বা ক্রমবিকাশের আর একস্থল আগাইয়া আসিলে উচ্চস্তরের পশু পক্ষীর মধ্যে দেখা যায় প্রকৃতির তাড়নায় সঙ্গে মিলনের আকাঙ্ক্ষা আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে নারী পুরুষের দেহের প্রভেদ স্পষ্টতর হইয়াছে—তাই ইহা বা পুরুষ ও নারীমূলক আকাঙ্ক্ষা ইহা পেরম্পর নিশ্চিত হয়। প্রভেদ স্পষ্টতর করিয়া বিবর্তন ইহাদের মধ্যে ব্যক্তন্য আনিয়াছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যেও প্রভেদও

যেমন মিলনও তেমনই পূর্ণতা লাভ করে নাই। মাহুদের তুলনায় পুরুষ পশু ও নারী পশুর স্বভাবের মধ্যে পার্থক্য কম—যেমন কম তাহাদের দেহের পার্থক্য। উভয়ের জীবনধারণের প্রণালী এক, প্রকৃতির সঙ্গে যুদ্ধ করিবার সার্বক এক, দেহ গঠনের পার্থক্য নয়। প্রভেদ পূর্ণতা লাভ না করার মিলনের অন্ত পশু পক্ষীকে স্বকৃ বা বহিঃ প্রকৃতির প্রভাবে উপর নির্ভর করিতে হয়। তাই তাহাদের মিলনও অস্পষ্ট।

ক্রমবিবর্তন চলিতে লাগিল—প্রভেদের পথে বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ। মাহুদে আসিয়া উহা পূর্ণতা লাভ করিল—হয় তো এখনও আপেক্ষিক পূর্ণতা। মাহুদের বেলায় পুরুষ ও নারী যেন দুইটি বিভিন্ন প্রকারের জীব। দেহের দিকে—চোখ বিভিন্ন, ঠোঁট বিভিন্ন, গ্রীবা বিভিন্ন, কটি বিভিন্ন। পুরুষের বগটিবন্ধ বৃহত্তর—নারীর স্তন্যতর। শুধু হাতের অঙ্গুলিনিচের দ্বারা পুরুষ ও নারী চেনা যায়। হৃদয়ের চলনভঙ্গীতে, হাসিতে, কঁদুবারে শুধু পার্থক্য—অনিত স্পন্দন স্পন্দতি। এই প্রভেদ যত বেশী—একের অন্তকে চাওয়া তত বেশী—মিলনের পূর্ণতা তত বেশী—মিলনের আনন্দ তত নিবিড়। বিবর্তন আনিয়াছে প্রভেদ—আর প্রভেদ আনিয়াছে মিলনাকাঙ্ক্ষার তীব্রতা, আর তার সঙ্গে ব্যক্তন্য ও কবিতা—“প্রতি অঙ্গ কাঁদে যোর প্রতি অঙ্গ লাগি।” পুরুষের প্রতি অঙ্গ লাগি পুরুষের প্রতি অঙ্গ কাঁদে না, বা নারীর প্রতি অঙ্গ লাগিও নারীর প্রতি অঙ্গ কাঁদে না। এই প্রভেদ বা পার্থক্য মিলনেরই রূপান্তর—ইহাই বিবর্তনের রহস্য, যে বিবর্তন মাহুদকে প্রায়গতিভাগিক যুগের একই দেহে বন্দী পুরুষ ও নারীকে মুক্ত করিয়া ছুটি বেধে রূপ দিয়া উভয়ের মধ্যে প্রভেদের অনন্ত পরাবার সৃষ্টি করিতেছে।

প্রকৃতি হইতে শক্তি নকর করিয়া মাহুদ আঙ্গ লভ্যতা গড়িয়াছে। মানব লভ্যতা মূলতঃ প্রাকৃতিক বিবর্তনের পথেই চলিতেছে। কিন্তু এই চলার পথে মাঝে মাঝে

উন্মাদবৃত্ত বা বিকৃতির (perversion) অন্বেষণ হয়। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই বিকৃতি বা উন্মাদবৃত্ত বিবর্তনের গতি রোধ করিতে পারে না—ওধু সাময়িক প্রতিরোধ (antithesis) সৃষ্টি করে মাত্র। বিবর্তনের সংঘাতে আবার সংশ্লেষণ (Synthesis) আসে—চলিবার পথ আবার লক্ষ্য হয়।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে প্রত্যেক—বৈবিক ও মানসিক—বিবর্তনের নিয়ম, প্রকৃতির ধর্ম। কিন্তু যাকে যাবে দেখা যায় মানবদৃষ্টিতে। এই প্রাকৃতিক নিয়মকে বিকৃত করিতে প্রয়াস পায়—নারী পুরুষমূলক আচরণ করিতে আর পুরুষ নারীমূলক আচরণ করিতে চায়। অথবা এই প্রকার আচরণ হয়তো পুরুষ ও নারীর মিলনাকাঙ্ক্ষার বিকৃত (perverted) অভিযুক্তি। এই বিকৃতির ফলে হয়তো রহিয়াছে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাক্তন প্রকৃতি—যে প্রকৃতির জন্য হইয়াছিল একই দেহে বন্দী পুরুষ ও নারীর মিলনাকাঙ্ক্ষার মধ্যে। নারী যেখানে নিজের সেহকে পুরুষের মত করিয়া পড়িয়া তুলিতে চায়, বা পুরুষোচিত আচরণ করিতে প্রয়াস পায় অথবা পুরুষ যেখানে নারীমূলক তরঙ্গ পরিগ্রহ করে, সেখানেই বিবর্তনের দ্বারার বিকৃতির (perversion) পথে সাময়িক প্রতিরোধের (antithesis) সৃষ্টি হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এই বিকৃতি পুরুষ ও নারীকে পরস্পরের কাছে টানিয়া আনে না—তাহাদের গোপন আকর্ষণকে নিখিল করে মাত্র। পেলব রায় বা লালিমা পাল (পুত্ৰ) হইবার বাসনা অনেক পুরুষের মধ্যে দেখা যায়। কিন্তু বাহ্যিকের জন্য এই অপক্লম লাল সেই নারী তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিমুগ্ধ হইয়া পড়ে। পুরুষের যেয়েলী নাম, যেয়েলী কর্তব্য, যেয়েলী আচরণ, যেয়েলী গোপ্যক কোন নারীই পছন্দ করে না। কারণ কি? পুরুষ পুরুষোচিত না হইলে—নারী হইতে বোহে ও মনে পার্থক্য অর্জন করিতে না পারিলে যেয়েলা সেই পুরুষের প্রতি আকর্ষণ অল্পতব্ব করে না। কারণ এই পার্থক্য পুরুষ ও নারীর মিলনের পূর্ণতার জন্য বিবর্তনের পথে প্রকৃতির লীলা।

নারীর বেলায়ও ঠিক একই কথা। অনেক যেরে পুরুষোচিত আচরণ বা তরঙ্গ পরিগ্রহ করে। ইহার ফলে তথাকথিত হীনতাতত্ত্ব (inferiority complex) রহিয়াছে। কিন্তু এই হীনতাতত্ত্ব নেহাৎ প্রান্তি হইতেই জন্ম লইয়াছে। নারী পুরুষের তাক করিতে না পারিলে সে পুরুষের তুলনার হীন বা ছোট হইবে এইজন্য দারদার ফলে কোন বৃত্তি নাই। এখানে হীনতা প্রকাশিত হয়না—প্রকাশিত হয় পার্থক্য বা প্রভেদ। নারী পুরুষের চালে চলিতে চাহিলে, বা তাহারই সঙ্গে সমান তালে চলিবার যোগ্যতা অর্জন করিবার প্রয়াস করিলে নিজের স্বাভাবিক বাধুধুই হারাইবে। ফলে তাহার প্রতি পুরুষের স্বাভাবিক আকর্ষণও নিখিল হইবে বিবর্তনের ফলে বাহুযতো। আজ শুধু বাহুযই নয়—সে যে কবিও। বাহুযের স্তম্ভের সহিত কবির সৃষ্টি মিলাইয়া আর সে ঐ পুরুষোচিত নারীর পানে চাহিতে পারিবে না—চাহিবে শুধু সে তাহার প্রাক্তন পঙ্কজস্নেহ চাহনি লইয়া মিলন যেখানে বয়তালিতব্ব ওধু প্রকৃতির স্মৃতি নিবুতি মাত্র। বাহুযের বেলায় মিলনের পূর্ণতা আসে প্রভেদের চেতনার পথে। আমি নারী এই চেতনা নারীর মধ্যে। আর আমি পুরুষ এই চেতনা পুরুষের মধ্যে লম্বাক ভাগ্রত হওয়া দরকার। এই চেতনা ভাগ্রত করিতে হইলে প্রভেদের পথে উভয়ের ক্রমবিবর্তনকে ক্ষুণ্ণিতলাত করিতে নিতে হইবে। কি দেহে কি মনে কথামাত্র পুরুষ বা নারী হইয়াছিলও তাহাদের মিলন অপূর্ণ রহিয়া যাবে। প্রভেদ বত বেনী, কাছাকাছিতও তাহার গিত্তই বেনী।

কিন্তু প্রভেদ কি শুধু দেহের কিনারাই আবদ্ধ? তাহা নয়। বাহুযের মনোভাষ্য বিবর্তনের অঙ্গীত কেন্দ্র। নিয়মাতীর প্রাণীর মন ভেড়েরই অল্পরূপ—না আছে সেখানে কল্পনা, না আছে চেতনার পথে রসবোধ—আছে শুধু অল্প প্রকৃতির ভাঙনা। অল্প মন একটা পঙ্ক পঙ্কীয়ও আছে—কিন্তু বাহুয পাইল তাহার সঙ্গে আশ্চর্যচেতনা। নতুন খাতে বাহুয প্রকৃতিকে ঢালিয়া

সইল—বৌন আকাক্সা নবজন্ম লাভ করিয়া হইয়া
ফাফাইল গ্রেম। এইভাবে বেহে ও মনে আত্মচেতনার
পথে বিবর্তনের নিয়মে পুরুষ ও নারী বেন সম্পূর্ণ ভিন্নতর
জীবের রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে—উভয়ের মধ্যে
প্রত্যেকের বিবহ পারাবার—দুই পাত্রে দুই জনে বসিয়া
দুই কাঁদে দুই লাগি মিলনের তরে। তাই তাহাদের
মিলন এক মুগ্ধ—এক পরিপূর্ণ।

ক্রমবিবর্তন বা ক্রমবিকাশ পুরুষ ও নারীর বেহের
বতথানি পার্শ্বক্য সৃষ্টি করিয়াছে—অন্তরের ও ভাবরাজ্যের
করিয়াছে তাহার শতভঙ্গ। নারী বলিতে বেহের দিক
দিয়া পুরুষ হইতে বিভিন্ন চিত্র ভাসিয়া উঠে,—কিন্তু
নারীক বলিতে বাহ্য কল্পনা করিতে বাই তাহা। বেন
পুরুষের নাগালের বাইরে—এই অমৃত পান করিবার
জন্ত পুরুষ যুগযুগান্তর ধরিয়া সাধনা করিয়া আসিতেছে,
কিন্তু আজীবন শুধু নিফল সাধনা করিয়াই সে মহিমা-বিস্ত
হইতেছে। এই অমৃত তাহাকে সিক্তি করিয়া দিয়াও
তাহার নাগালের বাইরে রহিয়া বাইতেছে। মহানৃকের
কোল হইতে যে অমৃতভরা করিয়া পড়ে তাহার
উৎস খুঁজিতে বাইরা চাতক আপনাকে হারাইয়া কলে—
মহানৃণ্য শেষ খুঁজিয়া পায়না—উৎসও অনাবিষ্কৃত রহিয়া
যায়—কিন্তু অমৃত করিয়াই পড়ে।

নারী প্রধানতঃ আবেগপ্রধান—আর পুরুষ বাস্তবসৃষ্টি
সম্পন্ন, বসিও প্রত্যেক বাস্তবই—কি নারী, কি পুরুষ—
বাস্তবতা ও আবেগের সম্মিশ্রণ। কিন্তু নারীর বেলার
আবেগ দৃঢ়, অপরটি পৌল—এবং পুরুষের বেলার ঠিক
তাহার বিপরীত। এই কারণেই আবেগপ্রধান পুরুষের
চেহে বাস্তবসৃষ্টি সম্পন্ন পুরুষের প্রতি নারী অধিকতর
আকর্ষণ অনুভব করে এবং পুরুষও চার আবেগের
মাধ্যমে হস্তিত নারী। বেহের দিক দিয়া যেমন নারী
চার পুরুষের পুরুষরূপে বেহ, মনের দিক দিয়াও
তেমনি সে চার পুরুষের পৌরুষ। বিকৃত পৌরুষ
তাহার কাম্য নয়। সেইরূপ পুরুষের অবচেতন মনও
চার বেহে ও মনে হৃদয়ভী সম্পূর্ণ নারী।

প্রাচীনমতাবোধ এবং বিকৃত চেতনা হইতে অনেক
নারী মনে করে পুরুষ চার শুধু নারীর উপর আধিপত্য
বিজ্ঞার করিতে। কিন্তু মনজন্মবিধি কবি সত্যের সন্ধান
করিয়াছেন—“তোমার কাছে যে দার মানি, সেই ত
আমার জর।” পুরুষের চেতন মন চার নারীর উপর
আধিপত্য, কিন্তু তাহার অবচেতন মন চার নারীর আধি-
পত্যের কোলে শান্তি—যেমন বৃদ্ধ ক্ষেত্র হইতে প্রত্যাগত
বোঁটা চার তাহার গৃহকোণে শান্তিতে বিশ্রাম। অপর
দিকে নারীর চেতন মন চার পুরুষের আধিপত্যে
নিরাশর আশ্রয়, কিন্তু তাহার অবচেতন মন চার পুরুষের
উপর পূর্ণ আধিপত্য বিজ্ঞার করিতে—তাহার উপর
একচেটিয়া বশল বজায় রাখিতে। পৌরুষ বা নারীত্বের
বিকৃতি (perversion) ঘটিলে পরম্পরের উপর এইরূপ
মধুর প্রভাব সঞ্চার নয়।

পুরুষ যখন কোন নারীকে ভালবাসে তখন তাহার
নিকট বহির্জগৎ তুচ্ছ হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক নয়,
কিন্তু নারী যখন ভালবাসে তখন তাহার নিকট বহির্জগৎ
তুচ্ছ হইয়া যায়। ইহাই বেন প্রকৃতির নিয়ম। এই
নিয়মের আভাল আলসভাবে ছুটিয়া উঠিয়াছে ব্রাহ্মক্কের
প্রহের উপাখ্যানে। যেখানে স্ত্রীতাহার অন্তর কাঁদিয়া
বলিতেছে “আমার মতো তুমিও শতক বহনী,
তোমার মতো আমার তুমি শুধু নারী।” প্রেম উঠিতে
পারে, তবে কি পুরুষের ধর্ম বহর মধ্যে এবং নারীর ধর্ম
একের মধ্যে প্রোথাক্ষ। ক্রমবিবর্তন মনোও অনবলুপ্ত
প্রাক্তন প্রবৃত্তির দিক দিয়া বিচার করিতে গেলে—
ইয়া, তাহাই। পুরুষ স্বভাবতঃ বহুতোয়ী (poly-
gamous), আর নারী স্বভাবতঃ একনিষ্ঠ (mono-
gamous)। কিন্তু অপর দিকে বিবর্তনের পথে
মাত্রের পর্যায়ে আসিয়া জীবন্তে আর শুধু প্রবৃত্তি চেতন
(instinctive being) জীবই নয়—সে যে এমন
আত্মচেতন জীবও (spiritual being)। এই আত্ম-
চেতনার অসুশীলন দ্বারা সে তাহার প্রবৃত্তি চেতন সম্বন্ধে
সংযত করিতেছে, কলে তাহার প্রবৃত্তির রূপান্তর

হইতেছে—অপর দিকে তাহার অন্তঃপ্রাণের আর একটা বৈশিষ্ট্য বিবর্তন সংঘটিত হইতেছে—বাহ্যিক বলা যায় দেবত্বের (divinity) অনুমান, বা মহত্তম পরিপূর্ণতার পথে ব্যাক্ত। আদিম প্রকৃতি যেমন সনাতন, তেমনি এই দেবত্ব বা মহত্তম পরিপূর্ণতার বীজের অস্তিত্বও জীবের মধ্যে সনাতন। এই দেবত্বের বীজ আদিম সৃষ্টি হইতেই প্রত্যেক জীবের মধ্যেই বর্তমান রহিয়াছে বলিয়াই পশু বা অতি-মানব হইতে ঐতিহাসিক যুগের দেব-মানব (divine man) বা অতি-মানব (super man) মানুষের ক্রমবিবর্তন (evolution) সম্ভব হইয়াছে। প্রত্যেক জীবের অন্তর্নিহিত এই দেবত্বের কবাই স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—“Every soul is potentially divine” এবং কালচক্রের আবর্তনে বিবর্তনের পথে সেই দেবত্বের ক্রমবিকাশ হইতেছে। তাই মানুষের যে জ্ঞান বৃদ্ধি হইতেছে সেই জ্ঞানও স্বামী বিবেকানন্দের মতে “manifestation of knowledge already in man,” বিবর্তন বা ক্রমবিকাশ বলিতে আনকোরা নূতন সৃষ্টি কিছু ‘বৃত্তার না—বাহ্য আছে তাহারই ক্রমোন্নতি বৃত্তার (evolution)। বহির্গত যেমন, অন্তর্গত তেমন কিছু না হইতে (out of nothing) কিছু’র সৃষ্টি হয় নাই (অন্তর্গতের বেলায় জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেক ইত্যাদি)। সৃষ্টি এবং ক্রমবিকাশ (বিবর্তন), বা creation and evolution, এই দুইটা শব্দের অর্থগত পার্থক্য এইখানে। মানুষ নামক বর্তমান জীব পণ্ড হইতে মনুষ্যে পৌঁছিয়াছে—মনুষ্য হইতে দেবত্বের পথে অগ্রসর হইতে প্রয়াস পাইতেছে। তাই আত্মচেতন মানুষে আসিয়া আত্মা পাই—একদিকে স্বা, প্রেম, কৰ্তব্য, তত্ত্ব, বিবেক প্রভৃতি মনোবৃত্তির—অপরদিকে বুদ্ধির ক্ষেত্রে বিজ্ঞান দর্শন ইত্যাদির উদ্ভব। অথচ তাহার প্রাক্তন প্রকৃতিও মরিয়া যায় নাই। কিছু উচ্চ মনোবৃত্তি ও বুদ্ধিবৃত্তির উদ্ভবের ফলে মানুষ প্রকৃতিকে সংযত করিতে শিখিয়াছে। সংযত করিতে

শিখিয়াছে বলিয়াই প্রকৃতির রূপান্তর বা রূপান্তরিত অতি-ব্যক্তি হইতেছে। তাই বহু মধ্যে প্রেমাধেবনের প্রাক্তন প্রকৃতি (polygamous instinct) পুরুষ আর রূপান্তরিত করিতেছে সনাতনের বিভিন্ন কালের মধ্যে নিজেকে বিস্তার করিয়া। এই লড়াই—অর্থাৎ উচ্চ প্রাক্তন প্রকৃতির রূপান্তরের অল্প পুরুষের প্রয়োজন অসংখ্য পরিধির মধ্যে (extensive existence) নিজেকে বিস্তৃত করা। সমাজ, দেশ, জগৎ, সৌরজগৎ, অধ্যাত্ম-জগৎ, বিজ্ঞান, দর্শন—এইসব হইল তাহার বিস্তৃত পরিধির ক্ষেত্র। এইরূপ বিস্তৃতির ফলে বহুমুখী প্রতিভার (versatility) অনুভবের মধ্য দিয়া পুরুষের সংযত প্রকৃতির যেমন রূপান্তর ঘটতেছে—তেমন এইভাবে বিস্তৃতি লাভ না করিলে অর্থাৎ বহু-ভাঙ্গী প্রকৃতির রূপান্তর করিতে না পারিলে আত্মচেতন পর্যায়ভুক্ত পুরুষের আর ক্রমবিবর্তন হইবে না।

নারীর মধ্যে যুগপৎ বহু মধ্যে প্রেমাধেবনের আদিম প্রকৃতির অভাব। তাই বিস্তৃতির পথে ঐ প্রকৃতির রূপান্তরও তাহার পক্ষে সম্ভবপর নয়। নারীর প্রকৃতিগত বর্ষ একের মধ্যে প্রেমাধেবন (monogamy)। যুগান্তে এই বর্ষের অনুশীলনের মধ্যেই তাহার নারীত্বের ক্রমবিকাশ বা বিবর্তন। একবার ভাগবৎ ইহা নয় যে, সে নিজের চারিপাশে প্রাণীর চুলিয়া বলিয়া থাকিবে—সমাজ, দেশ বা অল্প কোনও বৃত্তের পরিধির দিকে সৃষ্টি দিবে না। কিন্তু তাহার লক্ষ্য হইবে সৃষ্টি এককেন্দ্রীভূত করা—বহুতা বিস্তার নয়। তাহার উদ্দেশ্য গ্রহণ করা—পুরুষের উদ্দেশ্য বিস্তার করা। চাঁদ স্থব হইতে আলো গ্রহণ করে—গ্রহণ করিয়াই তাহার মাহু ও সৌন্দর্যের পূর্ণতা। সেও আলোক দেয়, কিন্তু তাহার আলোক রশ্মির এককেন্দ্রীয় লক্ষ্য—পৃথিবী। আর স্থব আলো ও তেজ বিকিরণ করে দিকে দিকে—গ্রহ-উপগ্রহে। সেইরূপ সমাজ, দেশ ও জগতের বহুবিধ সমতা শুদ্ধিভাষণের মধ্যে নিজেকে যুগপৎ বিস্তার করাই পুরুষের ক্রম-বিকাশের বর্ষ। শুধু সাহিত্য বা কবিতা, শুধু রাজনীতি

বা সমাজনীতি, শুধু দর্শন বা বিজ্ঞানের একটীমাত্র ক্ষেত্রের পরিধির মধ্যে পুরুষের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখা আর সম্ভব নয়—যেমন সম্ভব হয় নাই রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিতে। বিবর্তনের কালে আধুনিক বহুভাগী প্রকৃতি রূপান্তরিত করিয়া প্রতিভার হুগলং বহুবাহী বিস্তারই (versatility) ভবিষ্যৎ যুগের পুরুষের পরিচর্য হইবে—তাহার সূচনা বহুদিন হইতেই শুরু হইয়াছে। ইহাই বিবর্তন নিয়মের ভ্রাসনত ও অনিবার্য পরিণতি (logical and inevitable conclusion of the law of evolution)। কিন্তু বিতৃষ্ণি নারীর ধর্ম নয়—তাহার ক্রমবিকাশের অস্বকুলও নয়— কারণ রূপান্তরের পথে বিস্তার করিবার উপায়—অর্থাৎ বহুভাগী প্রকৃতি (polygamous instinct) তাহার কোন কালেই ছিল না, আদমও নাই। নারী যদি তাহার

নারীত্ব ও মাতৃত্ব বজায় রাখিরা ক্রমবিকাশের পথে অগ্রসর হইতে চায় তবে তাহাকে একটীমাত্র হাতার নিজেই চালিয়া দিতে হইবে—পুরুষের মতো হুগলং অথবা বিতৃষ্ণি প্রকাশ করিলে হইবে তাহার নারীত্বের বিকৃতি এবং ক্রমবিকাশের অবসান। প্রগতির পথে নারী ও পুরুষের মধ্যে এই পার্থক্য এবং প্রকৃতির রূপান্তর আনিয়াছে বিবর্তন।

সৃষ্টি ও অন্বেষন ক্ষেত্রেও যেখি পুরুষের ধর্ম বিস্তার নারীর ধর্ম গ্রহণ। পুরুষ তাহার প্রকল্পন শক্তি প্রকাশ করে শক শক ভীষণ সৃষ্টি করিয়া বিস্তারের পথে—আর নারী তাহা প্রকাশ করে একটীমাত্র ডিম্বকোষ সৃষ্টি করিয়া গ্রহণের পথে।

পুরুষ ও নারীর মধ্যে এই প্রভেদই তাহাদের মিলনের সেকু।

প্রতীক্ষা

ঐশ্রভাকর বাধি

আমরা স্বপন দেখি প্রাত্যহিক বেদনারে তুলি,
আসিছে নূতন দিন পৃথিবীতে সূর্যকরোচ্ছল।
বসিবার ঘরে ঘরে নিশেবিত প্রাপ্পপ্পগুলি
নূতন পাখীর গানে, নূতন আদমের কলোবল।
আখিনের নীল নভে, হেমবের রান গোখণিত,
সবুজ-খোড়ন ঘাসে নৃত্য-সব শিগির-কণার—
নদীর করোল-গানে, বিহনের ব্যাকুল সখীতে,
আমাদের স্বপ্ন-কণা আধিসত্ত উড়ে উড়ে যায়।
প্রাগৈতিহাসিক শোভা অবলুপ্ত হলে টিমতারে,
নতরূপে হিঙ্গোবেদ অন্ধকারে বায়ে নির্বাগন।
কুটবে মিলন হাত বকিতের বিত্ত অধরে
মাছবে করিবে বন্ধী অন্ধরের নিষিদ্ধ বন্দন।
জীবনের ঝাঁকলোভ উচ্ছিন্ন। কুটবে খণ্ডলোকে,
পূর্ণাশার চেয়ে বাধি আঙোঁ তাই স্বপ্নাতুর চেয়ে।



মহাভারতী

বাস্তবাত্মিক নাটক

—সম্পাদ্য—



চতুর্থ অঙ্ক

[১২৪২ সন বহনিকা উঠিলে দেখা গেল মহাভারত
এক বসিয়া হুকা টানিতেছে । মলবলসহ শ্রীধর আসিল ।]

শ্রীধর । [মলবলের প্রতি] এসো, এসো—মহাভারতদা,
নুতন গান বেঁধেছি, লবার আগে তোমার শোনাতে
এসেছি ।

মহাভারত । গাও তাই ।

[শ্রীধর লবলবলে গান করিল ।]

শ্রীধর । ইংরাজ আর অর্ধাঙ্গনে
আবার বাৎসো মহারণ,
কেউ ইংরাজ, কেউ অর্ধাঙ্গন
শক নিলো বিশ্বজনে ।

বাৎসো দ্বিতীয় মহারণ ।

গাঙ্গীতী বলেন ডেকে
আমাদের ভারতক্ষেপকে
'না এক পাই, না এক তাই'—

এই আমাদের পণ ।

আবার বাৎসো মহারণ ।

আমাদের স্বাধীনতার লড়াই আবার
নুতন বুসো ।

গাঙ্গীতী ইংরেজকে বলেন হেঁকে
'ওরে তাই' তমি তোলো ।

ভারত ছাড়ো ভারত ছাড়ো
বড়ই ভাড়াভাঙি পায়ে ।

উনিশ-শ-বিংশিশে তাই "

কংগ্রেসও তাই বললো—
ইংরাজ তমি তোলো ।

জনগণ লম্বুরে লপথ করে

গেই লংগে ।

ভারত ছাড়ো ভারত ছাড়ো

কংগ্রেসে ইয়ে মরংগে ।

আগষ্টের আন্দোলনে

যতো নেতা গাঙ্গী লনে

কাড়াবাস করলো বরণ

বাৎসো লড়াই নুতন রংগে

কংগ্রেসে ইয়ে মরংগে ।

এক গাঙ্গী তেল দিল

লাখে লাখে গাঙ্গী হলো ।

[তখন] সরকারী নমন নীতি ভারত জুড়ে

[ওরে তাই] কোর চললো,

ভবলুক, কাঁদি, বাপুহাটে

গুটিন শালন—দিকল কাটে ।

[সেবার] মহানরণ তুচ্ছ করে

জাতীর সরকার হলো ।

ইংরাজ তমি তোলো :

যখন বাৎসো বিশ্বরণ ।

শ্রীধর । [দলের প্রতি] বাও, তোমরা! এগিয়ে বাও,
আমি দোদার কাছে গিরে একটু বসি ।

[মলবল চলিয়া গেল]

গান আর আগের মতো জনে না দাড়া । বুড়ো
হয়েছি, গলার জোর নেই, কলবানের কাছে কাঁদি, বলি
—চারদিকে এত অত্যাচার এত নির্যাতন চলছে, ইচ্ছে হয়
গানে গানে আঘাত আঘাত আসি।'' এলেন আবার
নব এসেন ।

[সবলবলে একজন পুশি ইমপেক্টরের প্রবেশ।
সংগে নিবিরাম।]

পুশি ইমপেক্টরঃ দেখছি দুই বুড়ো। মহাতারত
হাইডি কে ?

মহাতারতঃ আমি।

পুঃ ইঃ। ক' বিয়ে জ্বনি চাপে করে। ?

মহাতারতঃ পকাশ বিয়া।

পুঃ ইঃ। বছরের ক'ষণ ধান পাও ?

মহাতারতঃ তা আদিত্তে ন-মণ পাই।

পুঃ ইঃ। মিছে বলে না।

মহাতারতঃ কি করে মিছে বলবে ?

পুঃ ইঃ। হঁ, এখনো বিবাহিত ভাঙেনি দেখছি।
তোমার ক'র ছেলে ?

মহাতারতঃ হুঁ ছেলে, কিন্তু তার নেই সাহেব।
ভাতা আর নেই। বড় ছেলে রাম—'৩২ সালে স্কুল
থেকে ছাড়া পেয়েই নিরুদ্দেশ। ছোট ছেলে বলরাম ঐ
বক্ত্রিশ সালেই পুলিশের গুলী খেয়ে মারা গেছে।

নিবিরামঃ বাবা মিথ্যা বলছেন সত্য, আমিও গুঁর
এক ছেলে।

পুঃ ইঃ। কি হে ?

মহাতারতঃ হ্যাঁ ছেলে ছিল। কিন্তু এখন আর
আনার ছেলে নয়। বাড়ী, ঘর, জোত জ্বদি, সব আলাদা
করে দিয়েছি।

পুঃ ইঃ। (নিবিরামের প্রতি) কি হে ?

নিবিরামঃ তা দিয়েছেন। কিন্তু আমার বেয়ে-
টাকে নিজ সবলে রেখেছেন।

পুঃ ইঃ। (মহাতারতের প্রতি) কি হে ?

মহাতারতঃ তা ঘটনাটা কি, ঐ জবাই হলুক।

পুঃ ইঃ। কে জবাই ?

[জবাই আসিয়া আসিল]

জবাইঃ আমি।

পুঃ ইঃ। ঐ বুড়ো জোয়ারকে জোর করে ঘরে
রেখেছে ? বাবা মারের কাছে বেতে দেয় না ?

জবাইঃ বাবাকে বেঁধেই গুঁর বা আছেন। কিন্তু
দাড়কে দেখবার কেউ নেই। তাই আমি বাই নি। দাড়র
কাছে থাকি। হাঁড়িই শুধু ভিন্ন। মইলে এক
বাড়ীতেই আছি।

পুঃ ইঃ। [মহাতারতকে] তোমার আর কেউ নেই ?

মহাতারতঃ থাকবে না কেন ? সবই ছিল।
আমাই ছিল ছোট দারোগা। বক্ত্রিশ সালে নিজের
বউকে গ্রেপ্তার করে। বেহেটা আমার এমন
আখাত পেলে যে পাগল হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেলো।
সেই শোককে আমাইও ইত্তফা দিয়ে—এখন গুলি বুঝাবন-
বানী—

পুঃ ইঃ। ওহে নিবে। দেখো তুমি আমার তোমার
পরিবারকে গ্রেপ্তার করে কানীবানী হলো না।

নিবিরামঃ না হজুর—আমার পরিবার নাকেও লম্বী,
ওপেও লম্বী। যখনই জিলীমানভেঙে গে নেই হজুর।

পুঃ ইঃ। বেশ ! বেশ ! তোমরা যোগ্য হ'র গুনেছ—
জাপানীদের সংগে আমাদের লড়াই চলছে, জাপান বাড়ে
আমাদের দেশ নষ্ট না করতে পারে সেক্ষত আমাদের
সব রকম চেষ্টা করতে হবে। আমাদের সৈন্যদের সব
যোগ্যে হবে। তাই জোতনাঘরের কাজ থেকে ধান
কিনতে এসেছে সরকারের কন্ট্রোলটাররা। খোরাকীর
ধান রেখে বাকী সব ধান তোমাকে দিতে হবে
মহাতারত। লোক তো দেখছি মাত্র তোমরা দুটি। তা
পশ্চিম মন রেখে বাকী পচাত্তর দাও।

মহাতারতঃ প্রায়ের বাইরে ধান চালান দিলে
গাঁয়ের লোক না খেয়ে মরবে। গাঁয়ের লোক তাই
মিটিং করে ঠিক করেছে—ধান চালান দেওয়া হবে না।

পুঃ ইঃ। সরকারের হুকুম—ধান দিতে হবে।
লড়াইটা তো মিততে হবে।

মহাতারতঃ না, এ লড়াই আমাদের লড়াই নয়।
লড়াই বিপাক সংগে সংগেই কংগ্রেস ইংরাজ সরকারের
হুকুম উপর বলে দিয়েছে—“না এক পাই, না এক তাই।

[হঠাৎ বাইরে বিশাল জনতাধ্বনি শোনা গেলো— ২ ১

“করংগে ইরে করংগে। ইংরাজ ভারত ছাড়ো।”

গুঃ ইঃ। ওমা আবার কারা ?

[ছোট লাভোগা এবং করেকজন চৌকিদার ছুটিয়া আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।]

ছোট লাভোগা। ঐ—নীলগিরি আহ্ন। বান না দেওয়ার ভয় থাকেব জেগেব করছিলান—পাঁচশ লোকের এক জনতা ত্রাবের চিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এসে দেখুন, শুণী না চালিয়ে আর উপায় নেই।

গুঃ ইঃ। কথায় কথায় তলি ! ইঁচিট, তনহ না “করংগে ইরে করংগে” ? বাবা ঠাণ্ডা করে এসো।

[পুলিশের দল চলিয়া গেল ওখানে জবাব নেতৃত্বে সকলে ধনিকিতিয়া উঠিল।]

অবা। ইংরেজ—

সকলে। ভারত ছাড়ো।

অবা। করংগে ইরে—

সকলে। করংগে।

[অবা এবং অজ্ঞাত সকলে এই ধ্বনি করিতে করিতে বাহির হইয়া গেল, তত্ব হইল মহাতারত আর শ্রীধর।]

মহাতারত। পাঁচশ লোক সাহস করে এসিবে গেছে বন্ধুকের সাহনে ! সত্যিই অবা কই শ্রীধর। কে এদের নেতা ?

শ্রীধর। নেতা নয় মহাতারত না, নেতা-টেতা ছিলো আনাদের মুগে। এখন নেতাকে বলে ডিক্টেটর। ডিক্টেটর এধানকার এখন আনদ।

মহাতারত। তা বলবো যেলে তোমার মুখ রেখেছে। আমার বলারমটাও এমনি ছিল। তা যাবে এক তলিতেই যাবে।

শ্রীধর। বুড়ো হয়েছি, দুঃখ এই যে নিজে কিছুই করতে পারলাম না। তবু হেলেনেরেদের এই সাহস—এই দেশ তলি দেখে একটা আকাংখা আজ মনে জাগে মহাতারতনা—পর্যবী ভারতে করেছিলান কিন্তু স্বাধীন ভারতে বেন করতে পাই।

মহাতারত। বাচতেই হবে, স্বাধীনতা না বেখে মরলে আনাদের প্রারম্ভিক হবে না শ্রীধর। চৌকিদারকে সেলাম করেছি, মফাখারের সঙ্গে দেবের বিয়ে দিয়ে জাতে উঠতে চেষ্টেছি। সাহেব জুবোর প্রসাদ পাবার ভয়ে পাগল হয়েছি।—এন্তহর নীচে বেবে গিয়েছিলান আমরা।

[হলধর খেলের প্রবেশ, হাতে ভারত একটা নোটিশ।]

হলধর। এই বে শ্রীধর বুড়ো। এনার হেলেন নিবে মফাদার নোটিশ জারি করল—তিন বক্টার মধ্যে আবার নোকা আশী বাইল হুরে সাগরদাড়ির খাটে নিয়ে যেতে হবে।

শ্রীধর। তিন বক্টার আশী বাইল ? তোর নোকাকে খুব খাতির করতে রে হলধর।

মহাতারত। তা করেছ, উড়ো জাহাজ বানিয়ে চেড়েছে, তা চলে যাত।

হলধর। চলে যাত ? মগের দুহুক নাকি ! কেন যাব বলতে পার ?

শ্রীধর। আপানীয়া আসছে বে। কিন্তু এসে তারা যাতে একবানি ধাম না পার—তোমাদের ডিকি নোকা চড়ে বাজ করতে না পার—একেবারে বেজুব বনে যায়—বুড়িমান কর্তাদের তাই এই ব্যবস্থা। আজ দুহুক ধরে কাঁদি, ঢাকীগ্রাম আর ময়না ধানার এই নোকাশাপন যত চলছে। মানে নিজের নাক বেটে পরের ব্যাড়া ভাগ করছেন এরা, বুহলে হলধর।

হলধর। যদি আমি নোকা না সহাই।

শ্রীধর। শুভা জলে ডুবিয়ে বেবে।

হলধর। তাই দিক। দুহুক—সব ভালো করই দুহুক।

[হলধর চলিয়া গেল। অধুরে ‘মহাতা গাঙী কি জর’ ‘করংগে ইরে করংগে’, ‘ইংরাজ ভারত ছাড়ো ধ্বনি’ শোনা গেল, করেকজন লোক এখিকে আগিড়েছে বলিয়া খোব হইল।]

শ্রীধর। শুণী গোলাবর দল বখন ‘পাণ্ডা গেল না’ মনে হচ্ছে আজকের দিনটা কোন মতে—মফা হলো।

বহ্যভারতঃ - কীই বা কথ্য পাবে? থাকবার যথো
রয়েছে আশার নিবন্ধজির লগতে জ্বাট। বাপ যা
বেকও বেয়েটা অমান, আমি আজ আহ্নি কাল নেই।
কেবলই জাবি—যেয়েটাকে কে বেখেবে—কে ওর
তার নেবে। শ্রীধর ভাই, আনন্দ যদি ওর চিঠিখিনের
তার নিত আমি—নিশ্চিত মনে মরতে পারতাম।

শ্রীধরঃ আরে এতো সত্যি সত্যি আনন্দের কথা,
বহ্যভারতবা।

[আনন্দ ও জ্বাটের প্রবেশঃ]

কি, সরর পুণিশের বল চলে গেল ?

আনন্দঃ ই্যা এখন গেল। কিন্তু মনে হচ্ছে বড়
রকম কোন মন্তলব আছে।

জ্বাঃ আনন্দবাবকে ওরা রাখবে না। হর ওলী
করে মারবে—না হর খেলে খুববে। এ গ্রাম ওরা
নিরানন্দ করবেই করবে।

শ্রীধরঃ থাক থাক, ও সব কথা থাক। বহ্যভারতবা,
তুমি ওঠো দেখি, আজ যে দুর্গাপুজা—সে কথা সবাই
ভুলে গেছে দেখছি। আরে আজ যে মহাষ্টমী।

বহ্যভারতঃ পূজা আর কোথার হচ্ছে যে মনে
পড়বে। গাঁয়ে পূজা হচ্ছে কি ?

শ্রীধরঃ ঠাকুর বাড়ীতে কোনমতে একখানি পূজা
হচ্ছে। শুধু তো হচ্ছে। চল প্রণাম করে আসি।
বহরকার দিন—যন খাড়াপ করে ঘরে কদে থাকতে নেই।
এলো—এলো বাক্যে প্রণাম করে আসি—ভেলে বেরেদের
জড় প্রার্থনা করে আসি :—

রূপং বেধি—জয়ং বেধি

এলো বশো বেধি—বিবোধি।

বহ্যভারতঃ চল।

[শ্রীধর বহ্যভারতকে একরূপ কোর করিয়াই লইয়া
গেল]

আনন্দঃ সত্যিই তো পূজার কথা আবহা জুড়েই
পিরেছিল।

জ্বাঃ কুলব কেন, পূজা এবার হচ্ছে ঘরে ঘরে।

আনন্দঃ তা সত্যি। এত বড়ো পূজা আর কখনো
হয়নি। বাত্তুকুমিকে বিয়েশী-মানন থেকে মুক্ত করে
আমরা বাড়ীর লোকের প্রতিষ্ঠা করব।

[কতকগুলি কাগজপত্র বুকের তেতের হইতে বাহির
করিয়া] এই বেখ—তার সব আয়োজনই আমরা করে
কেনেছি জ্বা।

জ্বাঃ সর্বনাশ ! এসব কাগজপত্র তোষাকি কাছে।
বাঘার কাছে ছুটব এগেছে এসব কাগজপত্র ধরতে—
বরকার হলে খানাতল্লাস করতে।

আনন্দঃ আজ রাতেই পাশের গাঁয়ে এসব কাগজ-
পত্র সরাব। কিন্তু বিশদ হয়েছে, চৌকিদার দকাদারের
কড়া নজরে পড়ে গেছি। কিন্তু তেবে না, 'ছোটবেলা
থেকে কত বিয়েটার করেছি—একবার জৌশনী সেজে
ছিলাম, কেউ চিনতে পারে না যে—সে আমি। সেই
বিছাটা আজ রাতের অন্ধকারে কাছে লাগায়ে।
আমার বুকের ঘন—তোমার রাখতে দিছি।

জ্বাঃ আমাঠো বুকের ঘন হয়েই থাকবে।

আনন্দঃ রাত বায়েটার আসন।

জ্বাঃ এসো।

[আনন্দ চলিয়া গেল। অতঃপর পূজার বলির বাত
বাজিয়া উঠিল। জ্বা ঔৎকর্ণ হইয়া গাঁড়াইয়া ভনিতে
লাগিল। বীরে বীরে বনিকা নামিতে লাগিল। বনিকা
উঠিলে দেখা গেল বহ্যভারতের বাড়ীর পূর্বোক্ত প্রাঙ্গণ।
তন্ত্রির অন্ধকারে আলো বিশাইয়া বাত নাই। লম্বা
গুলিগ সহযোগে ময়রের পূর্বোক্ত ইনস্পেকটর
বহ্যভারতের বাড়ী খানাতল্লাসী করিতেছেন।
ইনস্পেকটর প্রাঙ্গণে গাঁড়াইয়া আছেন, তাহার
পার্শ্বে নিবিড়ান বকাবার গাঁড়াইয়া আছে, দুইজন
লম্বা গুলিগসহ একজন ছোট মারোয়া বহ্যভারতের
বৈঠক-ঘানা হইতে কয়েকটি কাজপত্র নিয়া বাহির
হইলেন।]

গুঃ ইং। গেলো না ?

হোট কাহোপা। না।

শুঃ ইঃ। এতদো কি?

হোট দাঃ। সব অশাখরতের খাড়াপাত।

নিবিরামঃ। আমি বলছি তাত, এ বাতীতেই আছে।

দুঃ পুঃ হাতও আমি তার পলার আঙাখ তুলেছি। কিন্তু
কিন্তু করে তলাটিটারের কি বলছিল। তারপর থেকে
চৌকিয়ার দিগে আমি দারা হাত বাতীঃ চারিদিকে
পাহাড়া রেখেছি। 'হটকে' দেখেছি বলেই না হুজুরের
ক্যাম্পে খবর পাঠিয়েছি।

শুঃ ইঃ। দেখা যাক।

[আরে হুইজন লম্বা পুলিসদহ আর একজন হোট
দারোপা মহাকব্যের খবর হুইতে আসিলেন। পন্দাতে
মহাকব্যের।

শুঃ ইঃ। গেলে না?

হোট দাঃ। না তাত। এ ঘরে কো নেই।

শুঃ ইঃ। এই বুড়ো, আনন্দ হাইজি কোথায়
গুঁড়িয়ে আছে বল।

মহাকব্যঃ। গুঁড়িয়েই যদি থাকে—কাটিকে বলে
করে মুকোবার যেনে লে নর।

শুঃ ইঃ। তোমার বিবর্তন না ভেবে, আমি ছাড়া
না বুড়ো। (চপেটাঘাত করিল) তোমার সেই বিকী
নাভুলীটা কোথায়?

মহাকব্যঃ। কোথায়—বুঁয়ে বেগো।

শুঃ ইঃ। কোথায় ঘরে গেল?

নিবিরামঃ। এ পানের ঘরে তাত।

শুঃ ইঃ। নবাবনগরী কি এখানে বুলুজেন? তাকে
তোল। কিন্তু ছোট্টার খবর জানে।

[হুইজন পুলিস অফিসের দিকে গেল। পন্দাতে
পন্দাতে সেখানে পুলিস ইন্সপেক্টর। লম্বাকভিত্তে
নিবিরাম তাহার অনুসরণ করিল। পুলিস হরজার লাখি
যাতিতে লাখিল। হরজা পুলিসা মিল অবা। সব
নিরুপেক্ষতা অবাৎ কলকতঃ কল। হুইজন পুলিস ঘর
হুইতেছিল।]

শুঃ ইঃ। হোতাঃ; ওর বামাকে সঙ্গে লগত।
(নিবিরামকে) বাত।

[নিবিরামের পুলিস হুইজন ঘর হুইল।]

অবাঃ (ইন্সপেক্টরকে) কি হয়েছে?

শুঃ ইঃ। আনন্দ হাইজিকে চাই।

অবাঃ আনন্দ হাইজি কাকবে হুজুরী দেবের
ঘরে—রাতে?

[হুইজন পুলিসের নিবিরাম বাহির হুইল। আসিল।]

অবন পুলিস। না নেই। আর একটি কোন ঘরে
ওর বিজানার বুলুজেন।

নিবিরামঃ। ও আমায় এক ঘেরে—মানে পালীর
ঘেরে উপর। কাল পুজো বেগতে এসেছে।

[পুলিস ইন্সপেক্টরঃ হাপ করিয়া আগ্রহে নাহিল।
আসিলেন। সংগে সংগে অস্ত সকলে আসিল। শুধু
অবাঃ বামাকার হোতাঃ। রহিল।]

শুঃ ইঃ। অনর্থক শব্দ রাতে আমায়ের খুব তাড়িয়ে
টেনে নিয়ে এসেছে। ইন্ডিট! প্রমোশন! প্রমোশন!
প্রমোশন চাই তাত। সাতা কীকেনেত তোমার বাকানারী
হুজুরে না। চলে।

[ইন্সপেক্টর লম্বাকভিত্তে চলিয়া গেলেন। নিবিরাম
তাহারের পন্দাবলুজী হুইল। কিন্তু বানিকদূর সিদ্ধা
পায়ে আর কোর পাইল না। উল্লিতে উল্লিতে বামাকার
আলিয়া বসিয়া পড়িল।

মহাকব্যঃ। (অবার প্রতি) উপরটা কে? ওর
কোন্ পালীর ঘের? কখন এসে?

অবাঃ কুমি থাকো দাঃ!

[নিবিরাম কোন ঘরে উঠিয়া হোতাঃ। এবং মহাকব্য-
জের কাছে আসিয়া হাত কোক করিয়া বলিল।]

নিবিরামঃ। বাবা চাকরী পেলে চাকরী পাবে।
কিন্তু হাত পেলে হাত কীর পাবে না। এবার হুজুরে
ঘিরে ঘিরে হাত।

মহাকব্যঃ। কাদের ঘিরে?

নিবিরামঃ। অবার লগে আমায়ের।

মহাতারত । কোথায় আনন্দ ?

[গরুড়া খুলিতে খুলিতে আনন্দের প্রবেশ ।]

আনন্দ । আতি বাহু । আর কোন উপায় ছিল না ।

জ্বাৰ বুড়িতেই আজ বেঁচে গেছি, রক্তা পেয়েছে আনা-
দেব গোপনীয় কাগজপত্র ও অস্ত্র অক্ষরী দ্বান ।

নিবিরাম । বিয়ে তোমাদের হোক । কিন্তু তোমার
বাবা তোমাকে আশীর্বাদ করতে পারলেন কি না ।

[এই বলিয়া নিবিরাম চলিয়া গেল ।]

মহাতারত । না পক্ষ্মণ । বাবার বাবা আশীর্বাদ
করছে ।

[জবা ও আনন্দ মহাতারতকে প্রণাম করিল ।]

নিশ্চিত হলার—আজ আমি নিশ্চিত হলার । তুমি
কুৎস এই—আজ আমার বুড়ীটা নেই—বলহামটা নেই—
স্নানও নেই । কুৎস এই—এক বড় একটা শুভ কাজে
শাণ বাজবে না—উল্ল পড়বে না—পুস্তক আসবে না—
চাতিবিকে পুলিশ ঐত পেরে রহেছে । তা আজ আমি
তোমাদের দু'হাত—এক করে দিচ্ছি ।

[মহাতারত দুইজনের হাত এক করিয়া দিল ।
বনিক। নাহিতেকে । বনিক। উঠিয়া গেল । একটি
লঠন বারান্দার ঢালে ফুলিতেছে । তাহারই আলোতে
স্নানোক্তিত প্রাঙ্গণ । লঠনের গ্রিক নীচে বারান্দার
একটি খাটটার বসিয়া হু। টানিতেছে মহাতারত ।
আকাশ মেঘাচ্ছন্ন । ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাইতেছে ।
প্রতির গভীরতা এবং এই আলোছায়া বৃত্তটিকে রহস্যময়
করিয়া ফুলিতেছে, মহাতারত কলিকাতা কুঁ বিয়া
ভালো করিয়া আসেন বরাইয়া লইল । সেই আলোতে
তাহার চোখের প্রোত্ত হইয়া উঠিতেছে । এমন সময়
বীরে বীরে লক্ষী মহাতারতের সামনে আসিয়া
হাঁড়াইল । তাহার হাতে একটি টর্ড ।]

লক্ষী । বাবা ।

মহাতারত । কে ? লক্ষী ।

লক্ষী । হ্যাঁ বাবা ।

মহাতারত । কি মোমা ?

লক্ষী । এতটা রাত হয়ে গেল, তার উপর আকাশে
কি তীব্র মেঘ করেছে ।

মহাতারত । হ্যাঁ কত উঠবে । বিদ্যুৎ চমকাবে ।

লক্ষী । জবা ভো এখনো কিরদো না—আনন্দও
ও না ।

মহাতারত । ওরা পুজো দেখতে গিয়েছিলো না ?

লক্ষী । না বাবা । ওরা আজ এক সর্বনাশের কাজে
গেছে । একজন গেছে পথঘাট কেটে নষ্ট করতে—বাতে
পাঁয়ে মিটিটারী না চুকতে পারে । আরেক দল গেছে
ভরাডুঙ্গার ইউনিয়ন আগুিস পোড়াতো ।

মহাতারত । জ্বাৰ বাবা কোথায় ? দফাদার
সাহেব ?

লক্ষী । আজ নাকি এ পাঁয়ে মিটিটারী আসবে ।
তারই খবরদারী করতে সারাদিনই তো আজ বাতী নেই ।

মহাতারত । মিটিটারী তবে আসছে ? আকাশে
তাই এত দুর্ভোগ । হঁ ! ঘন বগছে মহাপুজার না ভানি
কি মহাপ্রলয় হবে ! তা জেবে কি করবে ? তুমি যাও
না । গিয়ে শোধ । তবে জেগে থেকে—সাবধানে
থেকে । মিটিটারি আসছে ।

লক্ষী । আপনি আমার লজ্জ ভাববেন না । গাঁয়ের
লব্বী-কিরা আমার ঘরেই আজ টাই নিয়েছে । আনন্দ
আমাদের লব্বীকে এক একখানা ছোরা দিয়ে গেছে ।

মহাতারত । মিটিটারীর বশুকের কাছে ছোরাতে
আর কি হবে না ?

লক্ষী । না বাবা । মেয়েদের ওটা মেয়ে ফেলতে
চায় না—চার অপমান করতে । আনন্দ বলেছে—হাতে
ছোরা নিয়ে দল বেঁধে থাকলে মেয়েদের কাছে ওরা
এগোতে সাহস পায় না । শুক্লকে মেয়েরা এখন একনি
করেই ইচ্ছা রক্তা করছে । আজ বাবা—আমি চলি ।
জবা কিরে এসে তাকেও আজ আমাদের কাছে পাঠিয়ে
দেবেন বাবা ।

মহাতারত । হেব । যদি কিরে আসে মেবো ।
কিন্তু—কিন্তু মিটিটারি আসছে—সে কি আর কিরক
পায়বে ।

[লক্ষী চলিয়া বাইতেছিল এমন সময় অত্ৰের ক্রমাগত কলীর শব্দ শোনা বাইতে লাগিল।]

লক্ষী। (কিহিয়া ঝাড়াইয়া) বাবা মিলিটারী এসে পড়েছে।

মহাতারত। হুপ, শীশির চলে বাত্ব ধরে। কেউ কোন শব্দ কোরো না।

[লক্ষী চলিয়া গেল। মেঘ পর্জন হইতে লাগিল। কড়ের লক্ষণ হুশ্ট হইতে লাগিল। জবা স্ল্যাগ হাতে ছুটিয়া আসিল।]

জবা। দাছ মিলিটারী—মিলিটারী আমাকে ভাড়া করেছে। এলা বলে। দাছ সর্বনাশ হয়েছে। আনন্দ ভনী খেরে পড়ে গেছে।

মহাতারত।। হয়েছে।

জবা। বেচে আছে কি মারা গেছে জানি না। জীবনের চেরে তার স্ল্যাগ বড়। সেই স্ল্যাগ গুয়া পুড়িয়ে কেলবে বলে আমার হাতে তুলে দিয়েছে। স্ল্যাগ দিয়ে আমি ছুটে আসছি। মিলিটারী আমাকে ভাড়া করেছে।

মহাতারত।। তুই ভোর বার কাছে চলে যা এছনি।

জবা। না, পাড়ার ঘেয়েবা সেখানে রয়েছে। আমার একবার জন্তে তাদের আমি মরতে হবে না। না—না—না। ওরা কিন্তু পণ্ড, ওরা সুরতনে—আমার সন্ধান থাক কিন্তু স্ল্যাগের সন্ধান রাখতেই হবে। (অর্ন্তন্য করিয়া) আসছে।

[জবা লঠনটি নিভাইয়া দিয়া অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। কয়েকটি ভারী হুটের পদশব্দ নিকটবর্তী হইল। বিদ্যুৎচমকে বেগা গেল—মহাতারত মরার মত পড়িয়া আছে।]

চার পাঁচজন মিলিটারী ভিতরে ঢুকিয়া টর্চ কেলিয়া জ্বলিত ব্যাক্সের দৃষ্টিতে তাহাদের শীকার খুঁজিতে লাগিল। মহাতারতকে দেখিয়া লাথি মারিয়া অস্ত্রদিকে চলিয়া গেল। লাথি মারিয়া ঘরের বরফা জানালাগুলি ভাঙিয়া কেলিয়া ঘরে ঢুকিল। কিন্তু শীকার না পাইয়া তখনই

বাহির হইয়া আসিল। “এইদিকে শুধন সাইক্লোন গ্রুপ হইয়াছে। মিলিটারীদের একজন টীফার করিয়া উঠিল “Cyclone, Cyclone, clear out, Hey, clear out.”

মিলিটারী ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। কড়ের বেগ ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল। মনে হইল এদের মৃত হইয়াছে। মহাতারত হাবাখড়ি দিয়া কিছুক্ষণ গিয়া উঠিয়া ঝাড়াইতে চেষ্টা করিল। কিন্তু পড়িয়া গেল। আবার উঠিল। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকে বেগা গেলো। গ্রাংগপনিত পাভকুয়া হইতে শিককনন। জবা স্ল্যাগ হস্তে উঠিয়া আসিল এবং মহাতারতের কাছে ছুটিয়া গেল এবং গ্রাংগপন চেষ্টাতে পতাকাটি বাটিতে পুড়িয়া ছুইজনে পতাকার দুই পার্শ্বে নোঙা হইয়া ঝাড়াইল। মহাতারত আকাশের দিকে তাকাইয়া অষ্টবাক্ত করিতে লাগিল এবং এলয়কে আহ্বান করিতে লাগিল গ্রাংগপণে আওরাক তুলিয়া।

—“আও—আও—আও।

...হাঃ—হাঃ—হাঃ।] [বহনিকা পতন]

পঞ্চম অঙ্ক

[পূর্বদিক দৃশ্য। ১৯৪৫ সাল, জুলাই। মহাতারতের সেই গৃহ-গ্রাংগপ। কিন্তু তাহা আজ চিনিবার উপায় নাই। পূর্ববর্তিত সাইক্লোনের একোপে বরফলি পড়িয়া গিয়াছে। বস্তার একোপও হুশ্ট। অত্ৰের যে দাছগুলিমেগা বাইত থাক তাহা নাই। একটা বড়গাছও গ্রাংগপের উপরে ভাঙিয়া পড়িয়াছে। এতদিনে অবশ্য তাহার জালপালা শুকাইয়া গিয়াছে, গত সাইক্লোনে কাঁথি মহুকুয়ার সে বিপর্যয় ঘটয়া গিয়াছে তাহা। এই দৃশ্যটি বেশিলেই বানিকটা আভাষ পাওয়া যায়। একজন্মের সেই ভাওব যে এলয়-মৃত্যু হক করিয়াছিল, আজ তাহা শান্ত হইলেও কাঁথিবাদীর জীবনে তাহার হুশ্ট দৃশ্য স্থাতিয়া গিয়াছে।

বানিকতক টিন দিয়া একটি ভাবনা বাধা হইয়াছে, তাহারই তলে ঘর সংসারের সামান্য দাছ। অবশিষ্ট আছে তাহা স্থান পাইয়াছে। শোটা ছুই খাটিয়া গ্রাংগপে পড়িয়া রহিয়াছে; তাহার একটিতে জবাঈর্ষ মহাতারত পড়িয়া রহিয়াছে। জীবিত কি মৃত ভালো

বোকা বার না। ভূপতিত বৃষ্টি-কাণ্ডে বসিয়া রহিয়াছে
বিদ্যা। জবা—এবং খান ছই হাফুয়ে গ্রামের একমল
কমী বসিয়া রহিয়াছে। তাহারের হাতে কিছু কাগজ-
পত্রও রহিয়াছে। গ্রামের বর্তমান কংগ্রেস সেক্রেটারী
রজন খানা একটা লিখিত আবেদন পড়িতেছেন।

রজনঃ (একটি ভিণেট পড়িতেছিল।) দেশবাসীর
নিকট আশাধের আবেদন—“১৯৬২ সালের ১৯ই
অক্টোবরের নিম্নলিখিত বৃশীবাভ্যাস মেদিনীপুর জিলায়
গ্রাম ৩৫ হাজার লোক মারা যায়। লক্ষ
লক্ষ লোক পৃথহীন হর এবং পতাদি নষ্ট হওয়ার
অন্যভাবে কষ্ট পায়। এদিকে জাপানের অগ্রগতিতে
বুটিন কর্তৃপক্ষ আভ্যন্তরীণ হইয়া পড়েন। সৈন্তদের রস
যোগ্যিহাও অল্প এবং জাপানীরা বহি আশিয়াই পড়ে
তাহারের তাতে বাহিবার অল্প লোকের সুখদুঃখের বিবে
না ত্যাকইয়া। শত্রুপু জিলাগুলি হইতে পতর্ঘমেটে উঠ
বুলো খাণ্ডপত্র জয়ের ব্যবস্থা করেন। এই সব ঘটনার
অবজ্ঞানী পরিণতি হইল '৪০-এর মতরস। প্রাচুর্যের
মধ্যেও বেবা বের মতরসই হুতিক।

আগষ্ট আন্দোলনে মেদিনীপুরবাসীর উপর যে হমন-
নীতি চলিতেছিল—এত বিপর্যের কিছু তাকা কিছুমাত্র
হ্রাস হয় নাই।

জবাঃ জার্মান অধিকৃত দেশ সমূহে জার্মানদের
অত্যাচারের কথা বুটিন প্রভুরা তারখরে প্রচার
করেছেন—কিছু মেদিনীপুরে তারা নিজেরা যে অত্যাচার
চালিয়েছেন, তা জার্মান অত্যাচারকেও হার বানিয়েছে।

রজনঃ “কোন সভ্য দেশে একথা শোনা যায় না
যে—পোটা গ্রাম লৈত্তরা খিরিয়া কেলিয়া বাজীর পুষ্ক-
দের হর প্রেস্তার করিয়াছে নতুবা ভলি করিয়া মারিয়াছে।
তাহার পর বেরেয়ের উপর অকথ্য অত্যাচার
চালাইয়াছে।”

লক্ষণঃ বুটিনরাজ কলং হোক।

বুটিনরাজ কলং হোক !!

বুটিনরাজ কলং হোক !!!

রজনঃ “এই ভবত, অত্যাচারে, জমিদারদের
সংস্দের বাৎ জাতিরা দার। তাহারাত-নাশকতা-
বুলক কার্যের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া ইহার উত্তর
দেয়। খানা চড়াও করিয়া তাহার অগ্রপ্ত
কাড়িয়া পর এক খানার কর্মচারীদের প্রেস্তার
করে। সরকারী ও আধা সরকারী থরগুলি পোড়াইতে
থাকে। টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কাটিয়া
যেও চলাচলের বিষ স্তম্ভ করে। বহু খানার ধারোগা
এবং সেপাইশাহীকে তাহার প্রেস্তার করিয়াছে। বহু
সরকারী কর্মচারী কাছে ইজফা দিয়াছেন। বুটিনের
শালিনয় বিকল করিয়া পটানপুর, খেজুরীতে, রাহগড়,
ভগবানপুর, জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
দেশবাসী তাই সব, জাতীয় সরকারের পতাকাতলে
সমবেত হও। জাতীয় সরকারকে ধীরেধীরে কর।”

সমবেত জনিঃ জাতীয় সরকার জিন্দাবাদ!

জাতীয় সরকার জিন্দাবাদ !!

বিদ্রব ধীরেধীরে হউক !!! ইত্যাদি।

[৪১৭৭ অধুং একটি বন্ধুর ওদীর শব্দ শোনা
গেল। লক্ষণ চমকিয়া উঠিল।]

জবাঃ তোমরা দেখ। রজন, তুমি থাকো।

[জবার আবেশ পাইয়া লক্ষণে বাহিরের দিকে
ছুটিল, জবার আবেশে রজন খামিল।]

জবাঃ আমি অনন্তান রজন, সদর থেকে পুলিশ
আজ এ গা বেরাও করবে। তারা বহীরা হয়ে এসেছে,
কিছু আমাদের আজ বহীরা হয়ে নেতাজীর সম্মান রক্ষা
করতে হবে।

রজনঃ নেতাজীর সম্মান? আপনি কি বলছেন
কবাবি?

জবাঃ রজন ভেতরে থাক।

রজনঃ কেন?

জবাঃ কবার সময় নেই। গিয়ে দেখে এসো
ওখানে কে রয়েছে।

[রজন বিনা বাক্যবাহ্যে বলের মধ্যে ছুটিয়া গেল এবং পরক্ষণেই বাহির হইয়া আসিয়া: সন্ধ্যায় জবার মুখে দিকে তাকাইয়া রছিল।]

রজনঃ একটা অপরিচিত লোক অকাতরে বুকছে। আমি চিনতে পারলাম না। কে ?

জবাঃ শুকে যথেষ্টই সন্ধ্যা থেকে সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর এই প্রথম গুতাগমন রজন।

রজনঃ কিন্তু কে উনি ?

জবাঃ আমার জ্যেষ্ঠাংশাই রাম রাইতি, ব্রহ্মপথ-বস্ত্রী বুকের জ্যেষ্ঠ পুত্র।

রজনঃ তার কথা শুনেছি বটে, কিন্তু তিনি তো '০২ সালে নিরুদ্ধ হন।

জবাঃ হ্যাঁ, আত্মীবন বিপরী ছিলেন জ্যাঠামশায়। লম্বা সত্যায়ুতে ছোট তাই আর মায়ের বুকুতে মর্মান্বিত হতে সাপের পাড়ি দিয়ে চলে যান ভাপানে, আমার বিপ্লবের পথে। টোকাগড়ে গিয়ে রাসবিহারী বজর বলে যোগ দেন।

রজনঃ এ সব কথা তুমি জানতে ?

জবাঃ কি করে জানবো ? বাড়ীর সংগে কোন যোগাযোগই উনি রাখেন নি। কাল রাতে বাড়ীতে এসে আত্মপ্রকাশ করতে ভবেই না জানতে পেরেছি তারতের বাইরে তারতের স্বাধীনতার অস্ত্র কি বিরাট আয়োজন হয়েছে।

রজনঃ সে না হয় পরে শুনবো, কিন্তু পুলিশবাহিনীর হাত থেকে শুকে কি রক্ষা করতে হবে না জবাদি ? উনি কি বুঝিয়ে থাকবেন ? আমাদের কি কোন কর্তব্যই নেই এখন ?

জবাঃ যারা গেছে তারা ফিরে আসুক, সব কিছু না জানা পর্যন্ত শুকে এখন থেকে সরিয়ে দিলে দ্রুত শুকে বিশদের মুখেই ফেলে দেওয়া হবে। ঠিক পরীক্ষার অবস্থা বা বুকেছি, তাতে নড়বার শক্তি আর ঠিক নেই। বুঝটাই এখন সব চেষ্টার বড় প্রয়োজন।

রজনঃ ঠিক বলেছ, এইবার বসো ঠিক সব কাহিনী।

জবাঃ '০১ সালের ২০শে অক্টোবরী আদিনে দুস্ত থাকাকালে দুস্তাঘর কলকাতা থেকে অকস্মাৎ উঠাও হন।

রজনঃ আদি। তখনই জনেছিলোম জার্মানীতে তিনি ছিটলাবুর সংগে দেখা করেছিলেন।

জবাঃ বার্লিন থেকে তিনি চলে যান টোকাগড়ে।

ব্রুটশের বিরুদ্ধে তারতের স্বাধীনতার লক্ষ্য দৃঢ় করতে।

'০৩ সালের ২১শে অক্টোবর সিংগাপুরে রাসবিহারী যোগ প্রকৃতি বিপরীদের সহযোগীতার 'আজাদ হিন্দ গভর্নমেন্ট' গঠিত হয়। তার সর্বাধিনায়ক হন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। জ্যাঠামশায় এই আজাদ হিন্দ কৌন্সিলের দৌ-বাহিনীতে যোগ দেন।

চট্টগ্রামের দিকট আরাধান অকলে, চট্টগ্রামের ২০শে মার্চ 'দিল্লী চলো' এই আওরাক তুলে আজাদ হিন্দ কৌন্সিলী সীমান্ত অভিযাত্রা করে তারত-ভূমিতে আমাদের স্বাধীন পতাকা তুলে ধরে। তারপর লক্ষ হর 'ইন্ডল অভিযান'। প্রথমে ব্রুটিশ হেরে বার কিন্তু উপযুক্ত প্রস্তুতি আর রসদের অভাবে আজাদ হিন্দ কোন বাধা হয়ে পিছু হটে। এসব কাহিনী জ্যাঠাম হিন্দ বেড়িগড়ে প্রচার করেছিল—কিন্তু আমরা গ্রামে বসে তা পাইনি।

রজনঃ কিন্তু জ্যাঠামশায় এখানে এলেন কি করে ? কোথেকে ?

জবাঃ নেতাজীরা একটা গুপ্ত সামগ্রিক সংবাদ বহন করে এক সাবমেরিনে এসেছেন নেতাজীর বিশ্বস্ত চারজন লোকের। সেই সাবমেরিনে আমাদের লুক্কায়িত উপকূলে ভিড়েছে চারদিন আগে। সেই সাবমেরিনের একজন চালক আমার জ্যাঠামশায়।

রজনঃ এখনো কেউ বরা পড়েনি ?

জবাঃ কেউ কেউ বরা পড়েছে। আজ জ্যাঠামশায়ের পালা। কিন্তু ওদের ভিতরে এতো খেয়াল হচ্ছে কেন রজন ?

রজনঃ দ্রুত পুলিশবাহিনী এদিকে না এসে অস্ত্র দিকে চলে গেছে। ওরা তাদের পিছু নিয়েছে। জবাদি যোদ্ধার শব্দ শুনি।

জবা। তোতার শব্দ! বোড়া! তবু হঠাত সন্ধ্যারোগ-গিরিতে প্রবেশনশ্রান্ত পিতৃদেব। রিতলবারটা বাসিরে ঘরের ভেতরে চলে বাও। জ্যাঠানশায়ের কাছেও অশ্রুপত্র কিছু আছে। আমি 'তুটু' না বললে তোমরা ভুলি চালাবে না।

[বন্ধন ছুটিয়া ঘরের ভিতরে চলিয়া গেল। জবা চুটু করিয়া মহাতারতের কাছে গিয়া বসিল এবং তাহাকে এক খানি পাখা দিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। অপরূপে ছোট দারোগা নিরিয়াহের প্রবেশ।]

নিরিয়াহ। বাবাকে দেখতে এলাম জবা। বাবার নাকি এখন তখন?

জবা। রোগই আর হচ্ছে কিনা; বড় দুর্বল হয়ে পড়েছেন।

নিরিয়াহ। তিকিৎসা কিছু হচ্ছে?

জবা। গাঁয়ের কবরেজ নশাই যা করছেন।

নিরিয়াহ। তোমার গর্ভাধিনিগী বিশেষ করে বলে দিয়েছেন কাঁথিতে তোমাদের নিয়ে যেতে।

জবা। ভিটে ছেড়ে উনি বাবের না। ঐর প্রতিজ্ঞা।

নিরিয়াহ। তাহলে আর কোন আশাই নেই। কি বলিস জবা?

জবা। কিছু ঐর এখনো আশা আছে। উনি বেশের স্বাধীনতা দেখে তবে দরবেন।

নিরিয়াহ। ভালো, ভালো। স্বাধীনতার পথে তোমারো অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। গাঁয়ে গাঁয়ে সব জাতীর সরকার হচ্ছে। তোমারো আমাদের আর মানভেই চাগ না। তা তোরা বানিস আর না বানিস আমরা আছি আর থাকবোও। জার্মানীর নাকিখাল কুলে গিয়েছি, এবার ভাপানের পালা।

জবা। টেডিও না বাবা, যদি বাপের নাকিখাল না দেখতে চাও।

নিরিয়াহ। ও, তাওতো বটে। যাক্ ডেকে আর বিরক্ত করলাম না। বসিল আমি এসেছিলাম। প্রণাম জানিয়ে পেশি। হাঙ্কার হোসেও বাপ কো।

জবা। কিন্তু বাপের দেব কাছটা করতে পারবে তো? আমার একবার উপর ও ভারটা ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থেকো না বাবা। উনি আমার একটা উইল করে রেখেছেন।

নিরিয়াহ। উইল?

জবা। হ্যাঁ, উইল।

নিরিয়াহ। ওর আমার কিছু আছে নাকি?

জবা। নেই? আর কিছু না থাক একটা সেনাক তো আছে? যে সেনাক ছিলো আমাদের বীরেন শাস-বলের। বীরেন শাসবলের খেতাই দাঁড়ুও উইল করেছেন জীবনে কে-নাথা কারো কাছে নোহান নি-প্রশ্নানেও সে বাবা বেন খাড়া রেখে তাকে দাঁহ করা হয়।

নিরিয়াহ। এটা উইল করেছেন?

জবা। হ্যাঁ বাবা।

নিরিয়াহ। [হেসে উঠে] ও বাবা। তা বেশ, তাই হবে। দেখ, টাকা-পরলা তোদের আমি কিছু দিয়ে যেতে পারি—যদি কাউকে তোরা না বলিস।

জবা। না বাবা, জানাজানি হলে তোমার প্রবেশন বন্ধ হবে। থাক।

[একটি অতাবনীর ঘটনা ঘটিল। ঘরে বাহ শুনাইতেছিল কিন্তু তাহার নাসিকা গর্জন হঠাৎ এতো প্রবল হইয়া উঠিলে যে তাহা কেহ আশংকা করে নাই। নিরিয়াহের কাণ খাড়া হইল। চোখও ঘরের দিকে কণকালের জন্য নিবদ্ধ হইল। কিন্তু দৃষ্টিদ্বারা হইতে সন্ধ্যা প্রবেশনশ্রান্ত এই দারোগা তাহার ভাবাবেগ দমন করিতে সক্ষম হইল বিশেষ করিয়া এই অস্ত্র যে, সে শুনিয়াছিল বাহার খোঁজে দে আসিয়াছে তাহার কাছে দারাজ্ঞ অস্ত্রপত্র আছে।]

নিরিয়াহ। হ্যাঁ, তোর হুঁচি আছে বলতে হবে। হারে এ গাঁয়ে কোন নতুন লোক যেনেখিল আশকাল?

জবা। নতুন লোক? না।

নিরিয়াহ। বাপের কাছে মিথ্যা বলতে নেই জবা। তোমাদের গাঁয়ের কোন লোকের কথা তো জিজ্ঞাস

করতি না। বিদেশী কোন লোক এলোছে কি না তাই জিজ্ঞেস করছি। তা বলতে বাধা কি? বিদেশী লোক—বার সংগে ভোয়ের কোন সম্ভব নেই—এমন কোন লোক বেবেঙ্কিন্স এই গাঁয়ে?

জবাঃ বাবা, তুমি বিশ্বাস করছ না? বেবেঙ্কি?

নিবিরামঃ আমার গা ছুঁয়ে বলতে পারিস?

জবাঃ কেন পারবো না? [আগুইয়া আসিল]

নিবিরামঃ থাক, তবে ঠিক বলেছিল। টাকা পরমা খরচ করে কি যে সব স্পাই রেখেছি আমরা! আমি রিপোর্ট করব। আচ্ছা তবে চলি। সব সাবধানে থাকিস।

[নিবিরাম বাইবার সময় ঘরের দিকে একবার ডাকিয়া গেল। অব্যবসায়িক দৃষ্টি তাহা লক্ষ্য করিল। ঘোড়ার পদশব্দ মিলাইয়া গেলে রজন ঘব হইতে বাহির হইয়া আসিল।]

রজনঃ জ্যাঠামশাইএর নাক ডাকছিলো। জনতে পাওয়া গেছে কি?

জবাঃ তা আর বাহনি। সর্বনাশ হোল।

রজনঃ কিছ তোমার বাবা হরত শোনেন নি। জনলে কখনো চলে যেতেন না।

জবাঃ চলে গেছেন মলমলকে নিয়ে আসতে। স্পাইদের কাছে হরত এ খবর পেরেছেন—বাক খুঁজছেন তাঁর হাতে মারাত্মক অস্ত্রপত্র আছে।

রজনঃ তা হলে জ্যাঠামশাইকে এখনি তুলতে হয়—সরিয়ে দিতে হয়।

জবাঃ সরিয়ে দিলে হরত বাঘের মুখে ঠেলে বেওয়াই হবে। আনিয়া ওয়া কোথার ঠিক পোতে বসে আছে—হরত কাছেই আছে। জনেছো তো?—স্পাইরাও সংগে আছে। আমাদের আটঘাট পুলিশ নিশ্চয়ই জেনেছে। উঃ আমি একটা ভুল করেছি। কী ভুল করেছি রজন!

রজনঃ ভুল করেছো! তুমি! কি ভুল করেছো মিদি?

জবাঃ বতকণ বাবা টের পাননি তত্তকণ কোন

ভুল করিনি, কিছ বাবা যখন টের পেলেন ভুলটা করেছি তখন।

রজনঃ বাপকে তলি করে মারোনি। এই ভুলটা কি মিদি?

জবাঃ বাপকে তলি করার মতো ভুল আমি করবো না রজন। তুমি শবে পুলিশ বাহিনী ছুটে আসতো। শুধু বাপকে হারাতান না, জ্যাঠামশাইকেও। না, না সে ভুল নয় রজন।

রজনঃ তবে?

জবাঃ মার কাছে জনেছি—প্রাণের ভালোবাসা তিরকাল ছিল এই ছই ভাবে। জ্যাঠামশাইও সে কথা বলেছেন কাল রাতে। বলেছেন, তোমার বাপের সংগে যদি একটি বার দেখা হতো একটি চড়ে আমি ওর চাকরী বুঁচির দিতাম। কতখানি ভালোবাসা! থাকলে একথা বলা চলে রজন! বাবা যখন টের পেলেন ঘরে কেউ রয়েছে। কেন আমি বলিনি? “বাবা সে তোমারই ভালোবাসার তাই।” হরত বা জ্যাঠামশাই বেঁচে যেতেন। বাবাকেও আমরা ক্ষিরে পেতাম।

রজনঃ কিছ জ্যাঠামশাই-এর পরিচয় বাবাকে তো এখনো দিতে পারো জবা!

জবাঃ পারি—যদি তিনি একা আসেন। আসেন—পাশে তার মলমল কেউ না থাকে। কিছ তা হবে না, তা হবে না রজন! তুমি বাও, তুমি বাও রজন!—জ্যাঠামশাইকে তোল, তৈরী হও।

[রজন ছুটিকা ঘরের ভিতর চলিয়া গেল। এদিকে মহাত্মারত্ন একখানি হাত তুলিয়া জবাকে কীণ কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল। জবা ছুটিকা তাহার কাছে গেল। ওদিকে ঘরের ভিতরে রজন ঘরের ঘুব তাড়াইবার সাধনার নিযুক্ত হইল। তাহার লক্ষ্য আভাস পাওয়া বাইতেছিল।]

জবাঃ কি নাছ?

[মহাত্মারত্ন কীণ অশ্রুত কণ্ঠে কি বলিল তাহা অস্ত্র কেউ না বুঝিলেও জবা বিব্রত বৃত্তিতে বিলম্ব হইল না। জবা বখাসম্বব তাহার কাণের কাছে মুখ লটাই বখাসম্বব

উজ্জ্বল উত্তর দিকে গাশিল ।]

জবা ॥ হ্যাঁ, বাবা চলে গেছে । না জ্যাঠামশাইকে
ঘরেনি । ...হ্যাঁ জ্যাঠামশাই খুব থেকে উঠেছেন । ...হ্যাঁ
খাবার এনে রেখেছি... হ্যাঁ শাবের ট্রেব দেবো । ...না,
সেখ এখনো স্বাকীন হয়নি...না না, বরলে চলবে-না...
হ্যাঁ, বেশ স্বাকীন হলোই আনাবো । ...হ্যাঁ, উইসের কথা
সবাইকে বলেছি—হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তোমাকে খাড়া করে
গাভ করিয়েই আমরা শোড়াবো । ...আচ্ছা, আচ্ছা, আমি
তোমার মুখে আভন দেবো ।

[হঠাৎ বাহিরে একটি ছইসিল বাড়িয়া উঠিল ।
সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীর চারিদিক ছইতেই পুলিশ ওলী বর্ণ
করিয়া বুঝাইয়া দিল বাড়ী ঘেরাও হইয়াছে । একজন
আর্দ্র পুলিশ ভিতরে ঢুকিয়া প্রাংগণে আসিয়া পাড়াইল ।
সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর ছইতে একটা ওলী ছুটিয়া
আসিয়া তাহাকে ভূপতিত করিল । তৎক্ষণাৎ আরো
ছইজন সশস্ত্র পুলিশ বাহির ছইতে সেখানে ছুটিয়া
আসিল । কিন্তু তাহারাও ভিতর ছইতে নিকিণ্ড অবার্ষ
ওলীতে ভূপতিত হইল । সঙ্গে সঙ্গে ভিতর ছইতে
প্রথমে রান ও তৎপরে রজন পলাইবার উদ্দেশে
প্রাংগণের দরজার দিকে ছুটিল । সেখানে পাড়াইয়াছিল
নিবিহান । রান তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ওলী করিতে
উঠিয়াছে এমন সময় নিবিহান চীৎকার করিয়া উঠিল—]

নিবিহান ॥ দাধা ! ছুনি !

রান ॥ (তৎক্ষণাৎ তাহাকে চিনিতে পারিল । ওলী
করিতে উক্ত হাতটি রান নাবাইয়া দিল । সে আবেগে
চীৎকার করিয়া উঠিল)

নিবে ॥ তাই, ছুই !

[সঙ্গে সঙ্গে ভূপতিত এক পুলিশ উঠিয়া পক্ষাৎ
ছইতে রানকে বহিয়া কেলিল । রজন এই পুলিশটিকে
ওলী করিবার সুযোগ পাইতেছে না এইজন্য বে রানের
সহিত তাহার ধন্যজ্ঞতি ছইতেছে । ওলী করিলে রান
রানও বার্য বাইতে পারে । এমন সময় ভূপতিত আরো
একজন পুলিশের ওলীতে রজনও ভূপতিত হইল । রান
তৎক্ষণ বদী হইয়াছে । অস্ত পুলিশ আসিয়া তাহার

হাতে হাতকড়ি পরাইয়া দিয়াছে । এমন সময় এক
অষ্টন খটিল । উদ্ভাসের বতো নিবিহান তাহার পোষাক
হুলিয়া কেলিল এবং সে চীৎকার করিয়া উঠিল ।]

নিবিহান ॥ দাধা, আমি প্রারম্ভিত করছি । এই
শরতানী নোকরী আমি তেড়ে দিলাম ।

রান ॥ তবে টেটিরে বল নিবে—‘দিল্লী চলো,’
‘চলো দিল্লী’, ‘জর হিন্দ’ ।

নিবিহান ॥ ‘দিল্লী চলো’, ‘জর হিন্দ’ ।

জবা ॥ ‘দিল্লী চলো’, ‘জর হিন্দ’ ।

[যহাভারত বাক্স উত্তেজনের বতটা সত্ত্ব টেলিয়া
উঠিয়াছে এবং তাহার কণ্ঠমানে বক্ষিণ হস্ত উর্ধ্বে তুলিয়া
পুত্রদের আশীর্বাদ জানাইল । বীরে বনিকা পড়িয়া
গেল ।]

[বনিকা পুনরায় উঠিলে সেবা গেল যহাভারত
পূর্ববৎ খাট্রায় তইয়া রহিয়াছে । প্রায় দুই’ অধা ।
পার্শ্ব রহিয়াছে শ্রবর । শ্রবর গাছিতেছে ।]

শ্রবর ॥ সুরলোকে বেছে ওঠে নং

নরলোকে বাজে অরভংক

এলো মহাঅননের দায় ।

আজি অমরাজির দুর্গে তোরণ বতো

হুলি তলে হয়ে গেল গর ।

উদয়নিধরে আগে মাইতে মাইতে বন

নবজীবনের আশাশে ।

অর অর অর রে বানব অদ্যাবর

বহি উঠিল মহাকাশে ।

[বাহির ছইতে জবা কিছু কলহুল, কিছু ছুব এবং
একখানি সন্যাসপত্র হাতে লইয়া স্বভিৎপদে আসিয়া
পাড়াইল ।]

জবা ॥ (শ্রবরকে) আছেন ?

শ্রবর ॥ বিদী, ব্যস্ত হয়ে না । ছুব এনেছো ?

জবা ॥ এনেছি । এখনি সূটেরে দিচ্ছি । কলকাতা

থেকে কোন বড় নেতা আসছেন । গায়ে সজা করবেন ।

সবাই বলে—‘ছুনি থাকো, অত্যাধনা করতে হবে ।’ আমি
বললাম—বাহর এখন জখন, আমি পারবো না, বতবত

জাগতিকী

মিশর :—

বর্তমানে সবচেয়ে চমকপ্রদ ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা মিশরের অর্থবিপ্লব। জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহের গোড়ার দিকে হঠাৎ অগত্যা জড়িত করিমা নাটকীয়ভাবে ঘোষিত হইল যে জে. নাভাইয়ের নেতৃত্বে মিশরীয় হল-বাহিনী বিনা হস্তক্ষেপে শাসন ক্ষমতা হস্তগত এবং রাজধানী অবিকার করিয়াছে। বাহিনীর পক্ষ হইতে এই তদস্য দাবী করা হইয়াছে যে, সামরিক কতৃপক্ষীয়দের মধ্যে যে সকল অবাঞ্ছিত ব্যক্তি আছে তাহাদের বিতাড়ন করিতে হইবে এবং দেশের রাজনৈতিক জীবনকেও কলুষভুক্ত করিতে হইবে।

মিশরের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অবস্থা কিছুদিন হইতেই চূর্ণাঙ্গপূর্ণ হইয়া উঠিতেছিল। কিছুদিন পূর্বে কায়েদা সঙ্ঘের যে পাক্ষাহালাসা সংগঠিত হইয়াছিল তাহার দমন ও পরবর্তী সরকারী বৈরচাচের ফলে রাজশক্তির প্রত্যাবস্থা ঘূর্ণ হইয়াছিল। স্বাধীনতা গঠনের ব্যাপারে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অগ্রোহ করিয়া রাজকীয় দপ্তর নিজেকেই ইচ্ছামত ক্ষমতা পরিচালনের ব্যবস্থা করিয়াছিল। তামাসেও তীব্র অসন্তোষের সূত্র হইয়াছিল। ইসরাইলের মুক্ত পর্যাঙ্কিত হওয়ার স্মারি মিশরীচরণ ভুলিতে পারে নাই। এত সম্বন্ধে সরকারের গলদ ও সংশ্লিষ্ট সামরিক ও রাজ পরিবারের লোকদের দুর্নীতির প্রচাণ ও তদনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণে ও অপর্যায়ীসনের দাতি বিব্রানে নৈমিল্য—এই সব কারণেও ভক্তগণ সৈনিক কর্মচারীদের ভিতরে তীব্র প্রতিবাদ ও প্রতিকারের দাবী দান ব্যাবস্থা উঠিয়াছিল। সর্বোপরি কাইরোর রাজ পরিবারে চূর্ণাব বিটরাছিল যে বৈদেশিক প্রত্যাবের ইয়াই কেন্দ্রস্থল। এবং রাজ্যশাসন ব্যাপারে সামরিক শক্তি ও রাজনৈতিক শক্তির পরস্পর বিরোধী বনোভাবের দৃষ্টি কলে দেশের রাজনৈতিক তারকেক্সের অলদ

হইয়াছিল। এইসব বিভিন্ন কারণ পরস্পরার জড় পরিণতির ফলেই এই বিপ্লব সংগঠিত হওয়া সম্ভব হইয়াছে।

জে. নাভাইব কঠিন হাখে তাঁহার ক্ষমতা পরিচালনা করিয়াছেন। কোথাও কোন চূর্ণলতার স্বেপাণ তাঁহার পক্ষপক্ষ পার নাই। অলেকজান্দ্রিয়া হইতে রাজ্য কাকককে কারগোতে চলিয়া আসিতে বাধ্য করা হইয়াছে। এবং সর্বশেষে গত ২৭শে জুলাই রাজ্য কাকককে তাঁহার শিত্ত গুত্তের পক্ষে সিংহাসন ত্যাগ করিতে বাধ্য করা হইয়াছে। সিংহাসন ত্যাগ করিতে ও নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দেশ ছাড়িয়া চলিয়া বাইবার জড় যে চরমপদ তাহাকে দেওয়া হইয়াছে তাহাতে রাজ্য কাককের বিক্ষে অত্রী স্বাধীনতার অভিযোগাবলীও উল্লিখিত আছে।

রাজ্যকে বিভাডিত করিয়াই নুতন ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত দলটি কাত্ত হন নাই। তাঁহার্য সরকারী দপ্তরগুলি হইতে এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি হইতে দুর্নীতি পরাধন ও আশঙ্কনক ব্যক্তিগণকে বিভাডিত করিয়া সরকার ও রাজনৈতিকদলগুলি দুর্নীকরণ প্রচেষ্টার তৎপর হইয়াছিল, এই নুতন প্রেরণার ফলে আশা করা বাইতেছে মিশরের এক নুতন জীবনের সাত্তা পড়িয়া বাইবে। মিশরকে নুতন করিয়া গড়িতে দেশ হইতে বিদেশী প্রভাব ও দার্ষ সম্পূর্ণ নিবুল করিতে ও গোটা মিশরকে একতাহুয়ে গাঁথিতে এই সব উত্তম নীতি বদ্ধ পরিকর।

পারিত—

পারিতও অল্লভগ, যদিও তাহার একাশ প্রত স্পষ্ট নহে। সেখানেও কর্ম প্রেরণার আভাস পাওয়া বাইতেছে। সেখানে সুলতানের অত্যাখান ও সনত ধর্মবাপী জন বিকোত

ও তাহার ফলে গেভানের পদত্যাগ ও পলায়ন এবং বোসান্স্কেবের ক্ষমতার পুনঃ প্রতিষ্ঠা এই দুইজন লোকের জ্যেষ্ঠত্ব। শাহ প্রথমে বোসান্স্কেবের হস্তে দুইটি প্রধান যন্ত্রী বশুর হাতিয়া দিতে অস্বীকার করার এই রাজ শক্তি ও জাতির নেতার বিরোধ চরমে উঠে। গেভানের সাহায্যে এই বিরোধ একাইবার চেষ্টা করিয়া শাহ বিফল মনোরথ হন। বোসান্স্কেবের ক্ষমতার প্রতিষ্ঠিত হইয়াই সব প্রথম শাহের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করেন। এক সরকারী মূষণত্রে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পারস্যের শাহ এবং বৈদেশিক কূটনীতি-বিদগণের ভবিষ্যৎ লক্ষ্যাবলম্বনের সুস্থ কেবল রাজ প্রধান যন্ত্রীর অঙ্গসাহায্যক্রমেই অগ্রসৃত হইবে বলিয়া শাহ ও ডাঃ বোসান্স্কেবের গভর্নমেন্টের মধ্যে একটা চুক্তি হইয়াছে। উক্ত রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, বৈদেশিক কূটনীতিবিদগণের পরিচরমণ পেশের সময়ও উহার অঙ্গত্বদের ব্যবস্থা পররাষ্ট্র সচিবের মারফৎ হইবে এবং অঙ্গত্বদের সময় পররাষ্ট্র সচিব উপস্থিত থাকিবেন। এই রিপোর্টে আরও বলা হইয়াছে যে, স্থানীয় পার্লামেন্টারী ও রাজনৈতিক নেতারাও কেবল রাজ শাহ'র অঙ্গরোধক্রমেই শাহ'র সহিত লাক্ষ্য করিতে পারিবেন। কিন্তু এই লাক্ষ্যাবলম্বনের সময় কোন প্রকার রাজনৈতিক আলোচনা করা চলিবে না। অবশ্য শাহ'র সহিত লাক্ষ্যাবলম্বনের ও প্রধান যন্ত্রীদের নিকট হইতে অঙ্গমতি গ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপ ক্ষমতা হ্রাসকারী চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া শাহ অসুস্থিতির পরিচয় দিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বিশ্বের উদ্যতরূপ অকম্পিত অঙ্গুলি সংক্ষেপে বৈরাগ্যেরী শাসকের অঙ্গুঠ নির্দেশ করিতেছে, রাজকীয় ক্ষমতা সত্ত্বাচের সঙ্গে সঙ্গে ডাঃ বোসান্স্কেবের নয় বলা কর্তৃপক্ষী কার্যকরী করিবার অঙ্গ তাহাকে হ্রাসের অঙ্গ পূর্ণ ক্ষমতা দানের প্রস্তাবও উপস্থাপিত হইয়াছে, ভেগুটনের পরিবর্তে তিনি যে কর্তৃপক্ষী পেশ করিয়াছেন, তাহাতে তিনি নিরাপত্তা আইন, বিচার বিভাগ, শিক্ষার ব্যাপক সংস্কার ও অনগণের

অবস্থা উন্নতির প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। আন্তর্জাতিক বিচারালয়ে পারস্যের বিরুদ্ধে তৈলগণি লুণ্ঠীর বিরোধের বিষয়, ইংলণ্ড যে সামলা দায়ের করিয়াছিলেন উক্ত আদালতের বিচারে সে সামলা তাহাদের এক্টিয়ার বহিস্কৃত, কাজেই যদি কোন নীমাংনা কার্যকরী হইতে হয় তবে তাহা অঙ্গ পথে হইতে হইবে।

এসিয়া ও আফ্রিকা এই দুইটি স্থানীয় দেশের উপর সাম্রাজ্যিক প্রভাব বিস্তার ও বজার রাবিবার অঙ্গ বুটেনের চেষ্টার আশঙ্কা বিদ্যমান নাই। বুটেনের প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামরিক। ইরানের তৈলগণি ও সুমধ্যাগারের সিংহদ্বার স্বরণ প্রয়োজন বলা এই উপরোক্ত কারণে তাহার পক্ষে অসম্ভাব্য। তাই এই দুই অঙ্গলে আশিষতা বজার রাবিতে তাহার প্রয়াস ব্যর্থাবিক। কিন্তু এই অঙ্গলের স্থানীয় অধিবাসীরা তাহাদের সার্বভৌমত্বের দাবী ও মধ্যমা আশঙ্কা হইতে দিতে রাজী নহে। তাই এই বিরোধ। এই বিরোধে ঐ সব দেশের আভ্যন্তরীণ যে সব শক্তি বিদেশীয় অঙ্গুল তাহাদের শক্তিশীন করার চেষ্টাও ব্যর্থাবিক। ইরানে ও মিশরে এই চেষ্টা বঙ্গলাশে লক্ষ্য হইয়াছে।

এসিয়ার এই সব ভাগরণের টেট ঔপনিবেশিক শক্তিশূলের অধিকৃত অঙ্গলেও বিস্তারলাভ করিতেছে। ইউ, এম, ও প্রতিষ্ঠানের অঙ্গলুর্জিত বিভিন্ন শাখা সমিতিতেও ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা যাইতেছে। পরাধীন আভিসমূহকে গণভোটেব দ্বারা আশ্বিনহরণের অধিকার প্রদানের অঙ্গ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীকে অঙ্গুরোধ জানাইয়া রাষ্ট্র সত্ত্বার অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিমর্মে যে প্রস্তাব পেশ করা হয় গন্তকলা ভঙ্গসম্পর্কে আলোচনা হয়। মানবিক অধিকার রক্ষা কমিশন তাহাদের গন্ত জুন নামের অধিবেশনে প্রস্তাবটি অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের নিকট প্রেরণ করেন। সাধারণ পরিবর্তে প্রস্তাবটি প্রেরণের কথা অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তন বিবেচনা করিতেন।

প্রজাতির ভূমিকার বলা হইয়াছে যে বিদেশীদের শাসনাধীনে কোন আত্মির থাকার অর্থ হইল 'দাসত্ব', তারতই প্রজাবের প্রধান উজ্জ্বল্য কিন্তু বুটেন প্রজাবের বিরোধিতা করিতেছে। তারতের প্রতিনিধি শ্রী পি, কে, ব্যানার্জি প্রজাবের সমর্থন প্রসঙ্গে বলেন যে, পরিবদ বোধের জ্ঞানেই যে এশিয়া ও আফ্রিকার অনসাধারণের এক বিরাট অংশ আজ মনোভাগরণ ও নব বহুভূতির মধ্য দিয়া চলিয়াছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার সকল অধিবাসীরা আজ নতুন শক্তিশালী চেতনার উদ্ভূত। অনগণ আজ আসিয়া উঠিয়া নিখিল বিবে উন্নত ভাবন ও জ্ঞান অধিকার দাবী করিতেছেন। তাহাতে ভীত না হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্রগোষ্ঠিতে তাহাদের আদর অন্তর্ভুক্ত করা হউক। রাষ্ট্রসম্ম সনদের নীতি তাহাতে পূর্ণ ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবে, বুটেনের প্রতিনিধি প্রাব স্যাদুইনে শেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিষদে বিরুদ্ধি প্রসঙ্গে বলেন যে, রাষ্ট্রসম্মের সাধারণ পরিষদ পরাধীন আত্মিকবুদ্ধের সম্ম দিয়গ্রণের অধিকার স্বীকার করিয়া লইলে শাসকগোষ্ঠী ভৎপ্রতি কোনরূপ ক্ষয়ব দিবেন না এবং দ্বিভে পারিষেন না।

শাসকগোষ্ঠীর এই মনোভাবই এশিয়া আফ্রিকাব্যাগী বিরোধের মূল কারণ। কিন্তু আফ্রিকা টিউনিসিয়া মালয় ইন্দোচীন ও অন্যান্য ক্ষেত্রে এই বিরোধই সর্ব-প্রকার উপগ্রন্থের মূলে রহিয়াছে। বহি তৃতীয় মহা-যুদ্ধের সর্বশাসী কথনে বিশ্ব কবলিত না হয়, তবে আচিরে হয় ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিশালিক আপন। হইতে আপোষে এশিয়া ও আফ্রিকা হইতে তাহাদের শাস্তাত্মকি ভটাইতে হইবে অথবা চরম দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে হইবে ও নিঃশেষে এই দুই মহাদেশ হইতে নিচ্ছিন্ন হইয়া বাইতে হইবে।

প্রাচ্য বৈঠক—

প্রশান্ত মহাসাগরীয় শক্তি দুকরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও মার্কিন দুকরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র বক্সির হুজুগুতে চঠা আগষ্ট এক বৈঠকে মিলিত হন। প্রশান্ত

মহাসাগরীয় চুক্তিপরিষদের প্রথম আহিবশন যৌথ আশ্রয়ক। পরিচরনা দেখ করিবার অন্ত তাঁহারাই সভার প্রজাব করেন। গত সেপ্টেম্বর মাসে লান্সডাফিস্কেতে শক্তিমন্ত্রের মধ্যে এক চুক্তিবলে উত্তর অতলাতিক চুক্তি গংহার অল্পকুল প্রশান্ত মহাসাগ-রীয় পরিবদ গঠিত হয়।

মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব মিঃ একিনস তাহার বক্তৃতার এশিয়ার বিভিন্ন বিপদ ক্ষেত্রগুলির প্রতি তার সহযোগী-দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহার বক্তব্যের সারমর্ম নাকি এই যে তাহাদের সর্বপ্রধান কতব্য উত্তর অত-লাতিক সচিব ব্যবস্থাপতির সহিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের আশ্রয়ক। ব্যবহার পারস্পরিক সংযোগ ও সাযুজ্য বিধান। এই সম্বন্ধে মার্কিন নীতির সহিত অন্ত দুইটি সম্মিষ্ট ঘোষণা সম্পূর্ণ মতানৈক্য বর্তমান। যদিও এমন কোন নিশ্চয়তা নাই যে বৈদেশিক যন্ত্রীর নিয়মিত মিলিত হইবেন তথাপি ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা যে, অষ্ট্রেলিয় বা নভেবর মাসের যে কোন সময় নিউইয়র্কের আন্তর্জাতিক বৈঠক বসিলে যন্ত্রীর তাহার জ্ঞোষণ লইতে বিরত থাকিবেন না। হুজুগুতে উপস্থিত কোন এক প্রতিনিধিসম্মলার একজন সভা এই উক্তি করিয়াছিল যে মিঃ একিনসের এই অভ্যন্ত শোচনীয় বিবরণীর প্রত্যেকটি শব্দের মূল্য এক গিনি করিয়া কিন্তু আশ্বাদের মনে হয় এই বিবরণীর প্রত্যেকটি শব্দের মূল্য নিরূপিত হইল লক্ষ লক্ষ নিরূপণ অনগণের রক্ষে। এই বৈঠকের উদ্বোধন করিতে গিয়া অষ্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্র বক্সি মিঃ আর, জি, কেলি বলেন প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার নিরাপত্তা বিশ্বত হইবার আশঙ্কা পূর্ব হইতেই বিস্তারিত আছে। তিনি বলেন, “আমার সরকারের এই অভিমত গোষণ করার মুক্তি এই যে আমরা যখন কোরিয়ার আক্রমণ প্রতিরোধে নিযুক্ত, কমিউনিস্ট সৈন্য বাহিনী তখন অন্যান্য সম্মিলিত দেশ সমূহে তদু-কর্মতৎপরই রয়ে, মারমুখীত বটে।” মিঃ কেলি বলেন যে, নিরাপত্তা চুক্তিতে আবদ্ধ অষ্ট্রেলিয়া,

নিউজিল্যান্ড হাঙ্কিন বুজরাষ্ট্র এই তিনটি রাষ্ট্রের কোন একটির নিরাপত্তা প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার বিস্তৃত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলেই পারস্পরিক আলোচনার ব্যবস্থা এই চুক্তিতে রাখা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন, “এই আলোচনা অত্যন্ত বনিষ্ঠ ও ধারাবাহিকভাবে চলি। সমস্ত বলিয়া আমরা মনে করি। সাম্প্রতিক ও সাময়িক বিষয় সম্পর্কে পারস্পরিক আলোচনার পথ সুগম করার জন্য পরিষদ গঠনই বর্তমান সময়েলনের অগ্রতম উদ্দেশ্য”, তিনি বলেন, “ওগু সংঘ গঠনই আমাদের লক্ষ্য নহে, প্রশান্ত মহাসাগরীয়

এলাকার সকলের নিরাপত্তা বিস্তৃত হইবার মত যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে তদসম্পর্কে পারস্পরিক মত বিনিময় আমাদের প্রাথমিক কাজ হইবে”, তিনি আরও বলেন, “প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার আক্রমণ হইলে উৎক্ষেপ সাধারণভাবে বিশ্বযুদ্ধের সূচনা বলিয়া মনে করিতে হইবে এবং এরূপ ক্ষেত্রে সমগ্র পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হইতে পারে।” তিনি আরও বলেন, “আমাদের স্বাধীনতার উপর কোন আক্রমণ প্রতিহত করিতে আমরা কৃতসংকল্প।”

আমি

শ্রীঅমিলেন্দ্র চৌধুরী

কক্ষ-এ ধরার কুকে রেখে দিয়ে বাব মোর রক্তের আঁকর,
প্রমত্ত ঘুগির মোতে এসেছিল আমি-এক ছত্র আগন্তুক,
ভেঙেছি নির্মম হাতে অবকল্ল পুনিবীর প্রচণ্ড কোকুট—
অস্থির পঙ্করে গাঁবি’ লিখে রেখে বাব তার প্রতিটি অক্ষর !
যত বার্ব হাচাকার অন্তর-গল্লরে মোর তিলে তিলে জমা,
এতিটি হেথায় তাই দেগে দিয়ে বাব ললাট পুখীর,
অশান্ত চরণে মোর উড়িয়ে ধরার ঘুলি ঢকল অস্থির,—
দুরত চিত্তের তলে দিলিবেনা এক কথা কল্লণার কমা !

আমি দুর্ভ বিত্তীষিকা দুর্নীতি-পথিল এই রিক্ত ধরণীর,
যন কক্ষ মেঘাধরে কবে কবে চমকিত বিদ্যুৎ-কলক,
আমার দুর্বীর বেগ ভগল আতঙ্ক-ভ্রাসে তরিয়ে কুলোক—
পাষাণ-গল্লরে তেবি’ বজ্রাঘাতে উত্তলিলে তপ্ত রক্ত-নীর !
আমি সুধ-সারবীর প্রথম-প্রাথম-দল্ল ব্যাপ্ত মহাকাল,
আমি দীপ্ত মহাকাল-দল্লদুগ-ওজ্জ্বলিত প্রথম মৃদল,
আমি রিক্ত বিশ্বকূকে অবিরাম দু-ধু-জলা দশান-অনল,—
তির শতাব্দীর মুক্ত মানবের বকতরা বার্ব দীর্ঘদাল ।

ইনসিওরেন্স অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড

—ঃ হেড অফিস :—

৪নং ক্লাইভস্ট্রাট স্ট্রীট, কলিকাতা ।



বাড় পরিষিতি

ভারতীয় রাষ্ট্রের প্রধান সমস্যা বাজার সমস্যা। গত কয়েক দশকের মধ্যে বাজার ব্যাপারে ভারত সর্বাঙ্গ ছিল না। গত দু'শতাব্দী বহু কাল পূর্ব থেকে দরিদ্র থেকে বড় হয়ে প্রায় বেড়শো কোটি মণ চাল আমদানী করতে হতো। ভারতের একদিকে বেড়েছে লোক সংখ্যা, প্রতি মণ ৭৪০০ থেকে এক কোটি করে; তাতে খাদ্যের চাহিদাও বেড়েছে। অপর দিকে খাদ্যের উৎপাদন কমেছে। ভারত বিভাগের ফলে বাজার ও গমের অধি দু'ব বেনী পরিমাণে বেরিয়ে গেছে পাকিস্তানে। ফলে খাদ্যের ব্যাপারে সমগ্রভাবে ভারতবর্ষ হচ্ছে খাদ্যের অভাব। তার উপর প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতি বছরই বহু লক্ষ নষ্ট হয়। বাংলা দেশেও গত বছর কয়েকটি জেলায় অনাবৃষ্টির ফলে ফসল হতে পারে নি। তাই বাংলার বাজার পরিষিতি এ বছর যে সংকটজনক হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। অবস্থার গুরুত্ব অস্বত্ব করে কেন্দ্রীয় সরকারের নতুন বাজার নীতি প্রায়শই আহসান কিসোরাই কলকাতার গিরে নিজে চর্চা করত অল্প পরিবেশণ করে বাংলার ভিত্তি এক নতুন বাজারীতি ঘোষণা করেন।

এই নতুন নীতিকে তিন ভাগে ভাগ করা গেল: প্রথম, পাঁচ হাজার মণ চাল ও পাঁচ হাজার মণ গম দু'পর্বত অঞ্চলের অভাব পরীষদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হবে। দ্বিতীয়, মণ হাজার টন চাল ও মণ হাজার টন গম,—অর্থাৎ প্রায় দু'লক্ষ পঁচাত্তর হাজার মণ করে চাল ও গম,—দু'পর্বত অঞ্চলে ১৫ টাকা মণ দরে বিক্রী করা হবে। তৃতীয়, কলকাতা এবং পাখবর্তী ইত্যাদি অঞ্চলের লোকদের বাণিজ্যের ভার কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করবে।

সেখানে রেশনের বরাদ্দ ব্যতীত ৩০ টাকা দরে অতিরিক্ত চাল বিক্রী ব্যাবস্থা করা হবে, এবং এই চালও কেন্দ্রীয় সরকার সরবরাহ করবে। কলকাতার বাইরে গ্রামাঞ্চল থেকে প্রত্যাহ কলকাতার বহু চাল চোরাই বাজারের অল্প আমদানী হয়—৪০৫৫ টাকা মণ দরে এই সব চাল বিক্রী হয়। রেশনের বরাদ্দে কোন বাঙালীর চালের প্রয়োজন ঘটে না; তাই তারা সবাই চোরা বাজার থেকে যে কোন মূল্যে চাল সংগ্রহ করে, এবং চোরাকারবাণীরা অতিরিক্ত মুনাফার আশার পরীক্ষণ থেকে কলকাতার চাল আমদানী করে। পরীক্ষণে চালের অভাব ও দু'পর্বতের এই ই প্রধান কারণ। রেশনের অতিরিক্ত চাল যদি সরকারী হোকান থেকে ৩০ টাকা দরে সরবরাহ করা হয়, তা হলে মজবুত থেকে চাল এনে অতিরিক্ত মুনাফার সুযোগ কেটে পাবে না।

আলাদা অঞ্চল হিসাবে কলকাতার দারিদ্র কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করার পর সমগ্র বাংলা দেশকে বাজারিয়ারে একই অঞ্চল বলে গণ্য করা হবে, এবং কলকাতা ব্যতীত অন্যান্য অঞ্চলে খাদ্যের অবাধ গতিবিধি দেওয়া হবে। তাতে চাহিদা অনুযায়ী সব জেলার বাজার মূল্যের নান্য স্থাপিত হওয়া সম্ভব। এতদিন কোন জেলার চালের মূল্য ৩০৫৫৫০ টাকা পর্যন্ত চলছিল। আবার কোন জেলার চালের মূল্য ২০ টাকার কাছাকাছি ছিল। একই প্রদেশে বাজার মূল্যের এই বিরাট পার্থক্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক এবং চোরাবাজার ও ব্যাপক অসন্তোষের পরিণাম। কিসোরাই নাহেবের এই বাজারীতির ফলে পশ্চিম বাংলার বাজার কাঁধে: বিনিয়ন্ত্রিত হবে। যে দিনটি ধাপ দলা হয়েছে, তার প্রথম দুটি সরকার পুরাপুরি পালন করেছে।

বহু বিদায়সূচী বিতরণের ক্ষত পাঁচ হাজার নগ চাল ও পাঁচ হাজার নগ গমের স্থলে ১৪ হাজার নগ চাল ও ১৪ হাজার হুই গম সরকার বিরুদ্ধে। এবং ১৫ টাকা মত্রে বিক্রীত অল্প ১০ হাজার টন চাল ও ১০ হাজার টন গমের স্থলে ১৪ হাজার টন চাল ও ১৪ হাজার টন গম সরকার বিরুদ্ধে। কাজেই বহুবল অল্প লব্ধে প্রতিশ্রুতিমত চেষ্টা বহু অনেক বেশী লাভজনক বিরুদ্ধে। কিন্তু কলকাতার ব্যবস্থা নিয়েই বিরোধী দলের অসন্তোষ ও আন্দোলন শুরু হোলো। তাদের অভিযোগ এই যে পশ্চিম বাংলা সরকার কলকাতার ব্যবস্থাকে ইচ্ছা করে বানচাল করে দিচ্ছে। এবং ১০ টাকা মত্রে চাল বিক্রীত ব্যবস্থা না করার ফলে লক্ষণগণ থেকে কলকাতার চালের চোরা আন্দোলনী বন্ধ হবে না এবং বহুবল লব্ধে যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাও কার্যকর হবে পড়বে। পশ্চিম বাংলা সরকার কৈফিয়ৎ মিচ্ছিল যে কেন্দ্রীয় সরকার কলকাতার অল্প পরাপ্র বাধ্য লক্ষ সরকারই করে নি; তাই কলকাতার অল্প প্রত্যাবর্তিত ব্যবস্থা পূরণের প্রবর্তন করা সম্ভব হচ্ছে না। এ সম্বন্ধে কিংবদন্তি পার্লামেন্টে বলেছেন যে বেশনের বাইরে বিক্রীত অল্প চাল ও গম কলকাতার অল্প বরাদ্দ করা হয়েছে এবং ২ লক্ষ টন চাল কলকাতাকে দেওয়া হবে ঠিক হয়েছে। কিন্তু ২ লক্ষ টন চাল একদিনে কেউ নিতেও পারে না, কেউ বিতেও পারে না। ৪৪ হাজার টন জুন ও জুলাই মাসে খেওয়া হয়েছে। চীন থেকে ১ লক্ষ টন চাল পাওয়ার কথা; সে চাল সবই কলকাতার অল্প বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে, এবং যেমন যেমন আসবে, তা কলকাতার অল্পই পাবে।

বাংলা আন্দোলন

পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল বাঙালি-হিত্তির সুযোগ নিয়ে বাংলা সরকার ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটা জন-আন্দোলন গড়ে তোলবার প্রয়াস করেছে। তাদের মধ্যে একদল সংযুক্ত হৃতিক প্রতিরোধ নগ্না নাম দিয়ে, দাবী উঠালো যে বাংলা সরকার কিংবদন্তি পলিকল্লা কার্বে পরিণত করেছে না। আমরা এ দাবী

করি না যে পশ্চিম বাংলা সরকারের ব্যবহার কোন দোষ ত্রুটি ছিল না; বরং এ কথা রাস্ততে সাক্ষী আছে যে কিছু ত্রুটি হয়ত ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা নিঃসংশয় বলা চলে যে বাঙালি পরিহিতিক একটা রাজনৈতিক অল্প পরিণত করতে ঐ সব লক্ষণ কখন দিবা করে নি। অল্প দ্বিরোধী রাজনৈতিক দল হিসাবে তাদেরও যে এমনি অধিকার আছে, তাও স্বীকার করে লাভ নেই। বেশের শাসন দারিদ্র্য যে দল গ্রহণ করবে, এ সুদৃষ্টি এবং আশঙ্কা তাদের দরপ রাখা উচিত। জনসংসারের শাখে সংযোগ দ্বারা রাখা হচ্ছে এর শ্রেষ্ঠ প্রতিকার। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিপক্ষের যে একটা বিশেষ সুযোগ আছে তা স্বীকার করতেই হবে। তার কোন দারিদ্র্য নেই; কাজেই সরকার পলিকল্লা দোষ ত্রুটি দেখিয়ে লম্বা লম্বা করবাইল করতে তার আটকান না।

দেশে বাস্তব বাস্তব; এবং সমস্ত হুমিয়ারতে আজ বাস্তব বাস্তব। বিশেষ থেকে বাস্তব ত্রুয় করা পূর্বের মতো অসম্ভব ও সম্ভবভাবে সম্ভব নয়। কংগ্রেসের খোলা বাজারে চালের যে মূল্য, সে মূল্যে ভরতবর্ষ দেশান থেকে চাল কিনতে পারে না; প্রায় ভবল মূল্য বিতে হয়। এবং তাও কোন বিশেষ নমুনা অল্পবাহী সরকারই পাওয়া যায় না। এ অবস্থার বাস্তব মূল্য, পরাপ্রতা ও ভাল বন্ধ কিংবদন্তি বিবরণ কোন সরকারই আজ প্রতিশ্রুতি দিতে পারে না। বিরোধী গম জনসংসারের কাছে এসব কথা বলবে না। বরং এসব কথাই গোপন করবে, এবং সরকার পক্ষ বাই ব্যবস্থা করুক তারই দোষ ত্রুটি দেখিয়ে একটা দোষ রচাতে চেষ্টা করবে। বেশনে যদি কেউ প্রতিপক্ষকে নীতিবাহী পোনাক্তে বার যে বাস্তবকল্পী রাজনীতির উর্ধ্ব রাখা উচিত, তা হলে সেটা বিতোপ-বেশের ব্যাপকে ধর্মোগবেশ দেওয়ার মতোই বার্থ হবে। পশ্চিম বাংলা সরকারের এমনি একটা পরিহিতির ত্রুয় প্রস্তুত পাকা উচিত ছিল। ব্যবস্থা পরিহিতের সামনে ও কলকাতা শহরের উপর করবিন ধরে যে কাজ কারখানা চলেছে—তাতে বাংলা সরকারের কর্তব্যমত ও দূরদৃষ্টি

পরিচয় লাভ করা যায় না। হুম্ম আইনগত দৃষ্টি নিয়ে সব ব্যাপারের সমাধান করা চলে না। একটা বিজ্ঞত জনতা খোঁটামোটি নিরুপদ্রব অবস্থায় একটা দাবী নিয়ে বসন আসে, তখন তাকে মাছুষের সমষ্টি বিনামূলিই দেখা উচিত; আইনের ভাবার তাকে খে-আইনী জনতা বলে একটা জড় শব্দার্থের বস্তু ব্যবহার করা উচিত নয়। তাও যদি শেষপর্বত বিধানগত কাটিক্ত বজার রাখতে পারত, তা হলেও কতকটা কৈফিয়ৎ থাকত। দুদিন পরেই সবাইকে ছেড়ে দিয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা আলোচনা করার ব্যবস্থা করতে হোলো। এবং তাদের আগ্রহ ও বিশ্বাস লাভ আকার করা হোলো। তাদের কার্যপদ্ধতি ও রাজনীতি যে কলগ্রহ এইটাই প্রকারান্তরে যেন নেওয়া হয়েছে। খোটের ওপর এ ব্যাপারে বাংলা সরকার হুঁশিয়ার অত্যাধিক এবং দ্রুততার পরিচয় দিয়েছে। এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলা প্রয়োজন। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার রাষ্ট্রপতির উৎস হোলো বৃহত্তর জনতা—কেবল সরকারি মন্ত্রণালয় বা দলীয় মন্ত্রণালয় বলে শাসনকার্য পরিচালনা করতে সেলে শেষপর্বত ঠকতে হবে। জনসংযোগের ব্যাপারে বিভিন্ন বিরোধীদলের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সরকার ও সরকারি দল যদি জিততে না পারে, তা হলে এমন মূল অনিবার্য।

বিক্রম কর—

পার্লামেন্টের বর্তমান অধিবেশনে বিক্রম কর সম্পর্কিত অল্প প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিল পাশ হয়ে গেছে—এই বিলে সাধারণ আদর্শ, পরিচ্ছন্ন, কল্যাণ, পেট্রোল, গৃহশাসিত পুত্র আদর্শ ও শোহা এবং ইশাতি প্রভৃতি করেকটি অগ্নিহর্ষ বস্তুকে বিক্রম করের আগুনে তেঁকে দাও দেওয়া হয়েছে। এই বিল অনুমোদন অতঃপর কোন প্রাদেশিক সরকার রাষ্ট্রপতির বিশেষ অনুমোদন ছাড়া উক্ত তালিকাভুক্ত কোন বস্তুর উপর বিক্রম কর দাবী করতে পারবে না।

হুজুর এতে সাধারণ লোকের কিছু ছবিমা হোলো বাটে, কিন্তু কার্যতঃ বিশেষ কোন ছবিমা হবে না। কারণ

তালিকাভুক্ত বস্তু জিনিষের উপরই বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার আগে থেকেই কর দাবী করে বেবেছে। এইসব কর বাড়িল হবে না। এমনকি পার্লামেন্টে এই বিল বসন আশোচিত হুজুর তখনই বাবে সরকার নুতন বিক্রম কর সম্বন্ধে এক আইন পাশ করে নিয়েছে। বিভিন্ন রাজ-নৈতিক দল, এবং বাবে প্রাদেশিক কংগ্রেস পর্বত এই আইনের বিরোধিতা করেছিল,—কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই কেন্দ্রীয় আইন সম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকার কর্তৃক চালু বিক্রমকরের কোন দৃষ্টবল হবে না। ভারতীয় সংবিধানে (constitution) যা বলা হয়েছে, তাতে বিক্রম কর প্রাদেশিক শাসনের হাতে। তবে অল্প প্রয়োজনীয় জ্ঞান খ'লে যোগ্য করে কোন কোন জ্ঞান সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার আইন পাশ করলে যে সব জ্ঞানের উপর প্রাদেশিক সরকার বিক্রম কর বসাতে পারবে না। কিন্তু এই কেন্দ্রীয় আইন কেবল তবিলে প্রসারী; অতীত প্রসারী নয়—অর্থাৎ চালু কোন কর এতে রহিত হবে না। কাজেই এই আইনের কার্যকারিতা অত্যন্ত সীমিত। তাই পার্লামেন্টের আর কোন সম্বন্ধই এতে সম্বন্ধ হতে পারেন নি।

বিক্রম কর জিনিষটাই মূলতঃ অবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত। আরকরের পিছে একটা হুজুর আছে। সেটা প্রথমতঃ সর্বসাধারণকে স্পর্শ করে না। নির ও নিরক্ষর আরের লোক দাও, তাদের আরের আর সমস্তটাই খরচ হয়ে যায় বৈশ্বিক জীবনের চাহিদা মিটাবার জন্য। এদের উপরে দাও আছে তাদের আর থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃত্ত বাও—এদের থেকেই আরকর স্রুত হয়। আর বস বাও উদ্ধৃত্ত ও তত বাওবার কথা; হুজুর আরকরের দাওও তত বাও। এই নীতি অত্যন্ত হুজুর সঙ্গত; এর মধ্যে কোন বৈষম্য নেই।

বিক্রম করের গতি ঠিক উঠে পড়ে। কারণ প্রকৃত-পক্ষে বিক্রম কর আরের উপর কর নয়, দাওের উপর কর। জিনিষ কিনতে যলই কর দিতে হবে; হুজুরা যে দাও জিনিষ-ই কিনবে, তাকে তার-ই উপর কর দিতে হবে।

এতে আরের অল্পপাতে নির ও মধ্য আরের লোকের উপর করেন হার বেড়ে যায়, কারণ তাদের উপার্জনের সবটাই তারা নিজে ব্যবহার করতে শুরু করে। তা ছাড়া কনের পরিমাণও ক্রমশঃ আর নিরপেক্ষভাবে শূন্য। অর্থাৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ বস্তুর প্রভু বনৌ নির্ধন বস্তুকেই একই পরিমাণ কর দিতে হয়। এতে প্রকৃত পক্ষে বস্তুটির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়।

অতঃ পরে বিক্রয় কর একেবারে উঠিয়ে দেওয়ার কোন উপায় নেই। কারণ সরকারের পরিচালনার যে সব জন কল্যাণ-মূলক কাজ অব্যাহত হচ্ছে সে সবই প্রচুর ব্যয়-সাপেক্ষ। বিক্রয় কর থেকে সরকারের একটা ঘোটা রক্ষণ আয় হয়। এই আয় ব্যয় হিসেবে সরকারের কাজ চলবে না। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় থেকেই তাই ক্রমে পুঁজিব্যায় সব রাষ্ট্রই আর বুদ্ধির এই পন্থা অবলম্বন করেছে। আমেরিকার বেশেও তাই বিক্রয় কর থাকবেই। তবে সাধারণ লোকের পক্ষে যে সব জিনিষ নিত্য অপরিহার্য তার কতকগুলিকে যে এই কনের আগুনে থেকে থাকে দেবার চেষ্টা হচ্ছে, এটার মধ্যে সন্দেহ ভাল। আমেরিকার বেশে প্রায় ৪০ কোটি টাকা বিক্রয় কর থেকে আয় হয়। এ সবই প্রাথমিক সরকারের। কেন্দ্র থেকে সরকারি এমন আইন করতে পারে না, যাতে প্রদেশ-গুলির আরের পথ হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। সেজন্য এই আইনের কোন অভ্যন্তর-প্রসারী (retrospective) প্রভাব থাকবে না। এর ফলে যে সব অব্যক্ত প্রয়োজনীয় প্রবোধ উপর বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় কর চাণু আছে, তা চলতেই থাকবে। এই আইনের এবং ব্যতিক্রমের যে দ্বারা অল্পসারে এই আইন হ'ল সেই দ্বারা উদ্বেগ হ'ল বিভিন্ন প্রদেশের বিক্রয় করের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনা। কিন্তু সে উদ্বেগ এই আইনের ফলে লাভিত হ'ল না।

এখন প্রশ্ন ওঠে—তা হলে এই আইন প্রণয়নের সার্থকতা কি? এই আইনে যে সব ক্রয়কে সরকার পক্ষে অব্যক্ত প্রয়োজনীয় বলে তালিকাভুক্ত করেছে, তার

অনেকগুলির উপরই বিভিন্ন প্রদেশে বিক্রয় কর বার্য করা আছে। পার্লামেন্টে বহু কংগ্রেসের সভ্যও এই বিবরের উল্লেখ করেছেন। শ্রীঅরুণ চট্টাচার্য এবং অরুণ বহু সভা প্রত্যাখ্যান করেছেন যে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী যেন সম্বন্ধই প্রাথমিক অর্থমন্ত্রীর এক সংশ্লিষ্ট আদর্শন করে এর একটা সীমাংসা করেন। সরকার পক্ষ থেকেও এই প্রস্তাবে সম্মতি জানানো হয়েছে। আশাকরি অতি সম্বন্ধই এমনি এক সংশ্লিষ্ট আদর্শন করে এই বিসমৃদ অবস্থার অবসান ঘটানো হবে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষদ—

পশ্চিম বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্ষদ বিভাগগুলির অল্প নুতন মূল কোড বা বিধান প্রণয়ন করেছেন। যদিও জনসাধারণের দ্বারা এই কোডের সঙ্গে যথনিতভাবে অভিত, তবু এই কোড আদ পর্ষদ সাধারণে প্রচারিত হয় নি। শিক্ষক মহলে এই কোডের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হচ্ছে তা থেকে এর সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যাচ্ছে। এক কথায় বলা-যায় যে, বর্তমানে আমাদের কানেতে পেরেছি, তাতে আমরা সুখী হতে পারি নি।

শিক্ষাবিদগণ সকলেই স্বীকার করেন যে, প্রদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা আরো অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। একটা পড়াছ-পড়িত ব্যক্তিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে; তার মধ্যে থেকে বুদ্ধি ও শক্তি অল্পসারে যে বর্তমানে শিখে নিতে পারে—এমনি একটা নিশ্চয় বনোত্তর এই শিক্ষাব্যবস্থার সমস্তটা ব্যাখ্যাত করে আছে। শিক্ষার্থীর প্রকৃতি বিচার করে কাকে কি শিক্ষা দেওয়া উচিত, কতটা শিক্ষা দেওয়া উচিত, কিতাবে শিক্ষা দিলে তা কার্যকরী হবে—ইত্যাদি সম্বন্ধে কোন বিশদ পরিকল্পনা হয়েছে বলে আমরা জানি না। কিন্তু তা করার প্রয়োজনীয়তা আছে এটা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এবং সে রকম কোন পরিকল্পনা না করে শুধু মধ্যশিক্ষার তার বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে থেকে ছিনিয়ে অত একটা সংস্কার ওপর প্রভু করলেই শিক্ষা ব্যবস্থার দ্রুত উন্নতি হতে থাকবে, এটা মনে নেওয়ারও কোন কারণ নেই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ এবিষয়ে

কোন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে আনিবেন কিনা আমরা জানি না। কিন্তু তাঁদের প্রণীত অল্প দুই একটি নিয়ম কাহ্ননের বা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে আশা করবার কোন দল্প ক্ষতি নেই।

দুর্ভাগ্যবশত বলা যেতে পারে, স্থল কমিটির সংগঠন সম্বন্ধে নিঃস্বের কথা। এখানে এই সব ম্যানেজিং কমিটিতে শিক্ষক ও সরকারি প্রতিনিধি ছাড়া অধিকাংশ থাকতেন অতিভাবকদের প্রতিনিধি—অতিভাবকরাই তাঁদের মনোনীত করতেন। কিন্তু পোনা থাকে বর্তমান কোড অনুসারে সব অতিভাবকদের প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার থাকবে না; যে সব অতিভাবক বৎসরে ১০০ টাকা করে দু বৎসরের ২০০ টাকা চাহা দিয়ে সভা ভাসিকাক্ত হবেন, তাঁরাই প্রতিনিধি মনোনীত করবেন। বিভাগের বা শিক্ষা বিভাগের আর বাক্যাবার পক্ষা হিসাবে, এ নিঃস্বের মধ্যে দুই আছে; কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থা করার মিক থেকে দেখলে বলা যায় এতে বিবেচনা বেই। অতিভাবকদের ম্যানেজিং কমিটিতে নেওয়ার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যাতে বিভাগের পরিচালনার কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে। পর্বদের বিবেচনায় দেখা যাচ্ছে ধারা দুটি টাকা অগ্রিম পরত করবার শক্তি রাখেন, বিভাগের পরিচালনার জ্ঞানও তাঁদেরই আছে। বম্বালের সম্বন্ধের প্রণীত চাতে বিভাগেরগুলির নিঃস্ব পরত করবার পক্ষে এ ব্যক্ত্য প্রায় অসুপলীর মানতেই হবে। কিন্তু একে শিক্ষা ব্যবস্থা বলে মানবার কোন হেতু পাওয়া যাচ্ছে না। এখানে বলা সরকার যে, সম্বন্ধিত প্রণীত বর্তমান আদিত অস্বাভাব্য হুং বেদী লোক এই দুটি টাকা পরত করতে পারবে না। কল্লজই দুটিবের হাতেই এই অধিকার হবে; দুটিবের অপেক্ষাকৃত ধনীরা এই সব কমিটি গঠন ও অধিকার করবে।

আর একটা দৃষ্টান্ত বরা। যাক। শিক্ষকদের প্রতি বাধা নিঃস্বের নুতন কোডে শিক্ষকদের যোগ্যতার মান বাড়ানো হয়েছে এবং নিঃস্ব করা হয়েছে এখান শিক্ষকের অসুস্থতি ব্যতীত কোন শিক্ষক গৃহ শিক্ষকতার কাজ

করতে পারবেন না। চাইই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় নীতি সম্বন্ধে নেই। বস্তুতঃ যারা বর্তমানে শিক্ষকতার কাজ করছেন তাঁদের মধ্যে এমন বহু লোক আছেন যাদের শিক্ষক হিসাবে যোগ্যতা অত্যন্ত নীচু করের। যোগ্যতা বাধের আছে তাঁরাও অনেক নারায়িন এবং রাজেরও কিংবংশ সমর প্রাইভেট টুইশানি করে এত ক্লান্ত হয়ে আসেন যে বিভাগের ছাত্র-দের প্রতি নিঃস্ব একটা স্টান যাকিক ব্যবহারের বেদী আর কিছু করে উঠতে পারেন না। এর ফলে বর্তমান যাকিক ব্যবহার বধা থেকেও বহুটুকু শিক্ষা বিভাগীয়ের হাতে পারত তা-ও হয় না। স্মরণ্য পর্ব যে এদিকে দুটি দিয়েছেন এটা ভালই। কিন্তু পোনা থাকে যে শিক্ষকদের বেতন দুইর কোন ব্যবস্থা এই নুতন কোডে নেই। শিক্ষকরা নারায়িন সম্বন্ধে থাকিরে বা সমর কাটাবার অল্পই পুঃশিক্ষকতা করে বেতান বলে পর্ব ভেবে নিঃস্ব-ছেন কিনা, তা ঠিক বোকা যাচ্ছে না। তবে প্রকৃত ব্যাপার যে শিক্ষকতা করে অধিক সম্বন্ধের আসে না তারও কারণ এই। যোগ্যতা ও কর্ষজির মান বাড়ানো অত্যন্ত সরকার সম্বন্ধে নেই। কিন্তু সমাজে লবাই বদন ব্যবস্থাক্তি নিঃস্ব নিঃস্ব জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর কাজে উল্লাস তাতে দুটা দুটি করছে, একবার শিক্ষকরাই আর কোনকিছু দুটিপাত না করে পরহিস কামনার অর্ধাচারে অন্যায়েরে নারা জীবন বিভাগবিতরণ করতে থাকবেন—এটা স্মরণ্য যাক্তি আশা করা যায় কিনা, তাতে সম্বন্ধ আছে।

আরও নাকি এই শিক্ষা বিভাগে বলা হয়েছে যে কোন সমিতিতে, প্রতিষ্ঠানে বা ক্লাবে যোগ বিতে হলে ছাত্রদের পূর্বাচ্রে অসুস্থতি নিতে হবে আশা এইটা জানি যে ছাত্রদের উপর অনেক প্রকার অন্যায়ের প্রভাব অনেক বিস্তার করে, এবং তার ফলে তাদের শিক্ষা ও নৈতিক চরিত্রের মানি ঘটে, শিক্ষালয়ের সৃষ্ণার ক্ষতি হয়। কিন্তু তার প্রতিকার এই তাতে পাইকাতী নিঃস্বাঙ্ক। দিয়ে হতে পারে না। শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বা তার শিক্ষকগণ

যদি ছাত্রদের সঙ্গে আকস্মিক যোগ দ্বারা করতে পারে— তবেই এর প্রতিকার সম্ভব। শিক্ষাপর্ষদের কর্তৃপক্ষ হস্ত আনেন যে বহু সমিতি আছে যাদের কাল-কর্ম অনেকটা গোপনতার আশ্রয়ে সাধিত হয়। এক কালে কমুনিষ্টবল থে-আইনী ছিল; তাদের কোন প্রকার কাল-কর্ম হতে পারত না। কিন্তু তাদের প্রত্যেক ছাত্রদের উপর বেশ প্রভাব ছিল। আর-ও আগে বাংলার বিভিন্ন বিদ্যাবীথল গোপনে ছাত্রদের প্রভাবিত ও চালিত করত। কাজেই এই নিয়মের সার্থকতা যে বিশেষ আছে তা মনে হয় না। বরং যে সব প্রিন্সিপাল ছাত্রদের যোগ দিতে নিষেধ করা হবে, ছাত্ররা তাদের প্রতি-ই বিশেষ তাগে আকৃষ্ট হবে।

সামাজিক বিধি ব্যবস্থার মূলে কীকৃত বাস্তব বুদ্ধি থাক। প্রত্যন্ত বাহ্যিক। পর্যবেক্ষন নতুন কোডে এরকম বুদ্ধি নেই তা বলা আশাযের উদ্দেশ্য নয়। বরং থাকারটাই স্বাভাবিক। সাধারণের আলোচনার ক্ষত কোড এতদিন প্রকাশ করাই উচিত ছিল। তাতে হস্ত শেষ পর্যন্ত পর্যবেক্ষন কালেরই সন্নিবিষ্ট হতো। কিন্তু পর্যন্ত সন্তুষ্টতা মনে করেন না। কাজেই কোড সম্বন্ধে আত্মবে ইঙ্গিতে বটটুকু আনি গেছে তারই গুণর আশাযের আলোচনা করতে হচ্ছে। আশাযের সিদ্ধান্ত যদি ভুল হয়ে থাকে, আশাযাই সব চেয়ে সূখী হতো। এই পর্যবেক্ষন কাহে আশায অনেক কিছু আশা করি। বেশের শিক্ষা বিষয়ে বহু যোগ্য জ্ঞতি আছে—পর্যন্ত সে সব বুঝ করবে—এই আশাযের আশা। কিন্তু তাদের নূতন কোডের সম্পূর্ণ আশায ঘেঁষাবাসীর সাধনে উপস্থিত করে অনসাধারণের হস্ত নিয়ে তবে নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তন করা তাদের অবস্ত কর্তব্য।

কান্সিট্র—

আম্র প্রায় পাঁচ বছর যাবৎ কান্সিট্র ভারতের গকে একটা বিশেষ সমস্তা হয়ে আছে। সাময়িক অভিযান যদিও এখন বন্ধ আছে, শুভ্রত পৈঙ্গ সন্যবেশন ওখানে রাখতে হচ্ছে এবং তাতে প্রতি বছর করেক কোটি টাকা খরচ হয়। তা হাড়া সংযুক্ত জাতি সংঘের কাছে কান্সিট্র নিয়ে ভারতকে বহু হোনাবা পোরাতে হচ্ছে।

আমেরিকা ও ব্রিটেন এই ব্যাপারে ভারতের প্রতি কর্তকটা 'বিশ্বল বহনাতাব নিয়েই' চলছে। ভারত গলে জাতি সংঘের হাতে এই সমস্তা বেশ কিছুটা জটিল হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে কিছু অপপ্রচারও এই উপলক্ষে হয়েছে।

এসব প্রারম্ভিক কথা বাস্তব এখন আবার এক নূতন সমস্তার সৃষ্টি হয়েছে। কান্সিট্র ভারতের অংশ, কিন্তু পুরোপুরি নয়। কেবল বৈদেশিক, যোগ্যতা এবং যোগাযোগ (Foreign Defence and Communications) এই তিনটি বিষয়ে কান্সিট্র ভারতের অংশ; অন্তর্ভুক্ত বিষয়ে কান্সিট্র ভারতীয় বলায় রেখে চলবে। বর্তমানে কান্সিট্র এক গণপরিষদ (Constituent Assembly) চলছে—কান্সিট্রের সংবিধান তৈরী করার ক্ষত। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে কান্সিট্রের রাজবংশ উৎসাহ করা হবে, ভারতীয় জাতীয় পতাকার প্রভাব যেনে নিয়ন্ত কান্সিট্র তার বস্ত্র পতাকা বলায় রাখবে, বিবর সম্পত্তি সম্বন্ধে ভারতীয় সংবিধানে যে মৌলিক অধিকার স্বীকার করা হয়েছে তাও ওখানে পুরোপুরি মানা হবে না ইত্যাদি। নানাদিক থেকে এ নিয়ে প্রতিবাদ উঠেছে। এই সব প্রতিবাদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—(১) অন্তর্ভুক্ত পদেপ বা রাজ্যের চাইতে কান্সিট্রকে অন্তর্ভুক্ত অধিকার দেওয়া বুদ্ধি সংগত হয় নি (২) রাজ বংশ বর্ধাধিকারীদের অধিকার প্রাকৃতিক 'দোশ করা ভারতীয় সংবিধানের বিরোধী। (৩) অন্তর্ভুক্ত পতাকা এবং কান্সিট্রের সাধারণতাত্ত্বিক বর্ধাধা ভারতের সংহতির বিরোধী।

এর কোন আলগতি-ই শুরুতর বা-বুদ্ধিসংগত বলিয়া মনে করি না। ভারতবর্ষ একটি যৌগ রাষ্ট্র (Federal)। এর অন্তর্গত বিভিন্ন প্রদেশ বা রাজ্যগুলি নিজ নিজ অধিবাসন্ত যৌগ রাষ্ট্রের সাথে সমযুক্ত হওয়ার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল নয়। যৌগ রাষ্ট্রের মূল কথা হলো যে, অন্তর্গত রাজ্যগুলি প্রত্যেকেই স্বাধীন। কিন্তু তাদের স্বতন্ত্র ক্ষমতা তার যৌগ রাষ্ট্রের নিষ্কট হওয়ার করে

যেন। কাজেই বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের সম্পর্ক বিভিন্ন হ'তে পারে এবং পৃথিবীর অনেক দেশেই তা হয়েছে। যৌথ রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলি কেতাকেই সাধারণতঃ হতে পারে এবং হওয়াই আত্যাবিক। কাজেই কান্সিওর যদি ভারতীয় রাষ্ট্রের অন্তর্গত সাধারণ রাষ্ট্র থাকে তা হলে আপত্তির কোন কারণ নেই। যৌথ রাষ্ট্রের অন্তর্গত রাজ্যগুলি নিজ নিজ সংবিধান গড়ে নেয়—এমন দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বহু আছে। কাজেই কান্সিওর ব্যাপারে এতে বিশেষ আপত্তির কোন কারণ নেই; কান্সিওর ভারতীয় পতাকার প্রেক্ষে যেনে নিচ্ছে। ভারতের তার আভ্যন্তরীণ ব্যাপারের ক্ষেত্রে সে যদি আলাদা পতাকা রাখে তাও ইতিহাসের নবীচ-বিরুদ্ধ নয়। স্বাভাবিক লোপ করার ক্ষমতা জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করার ক্ষমতা কোন আপত্তি উঠার কোনই বুদ্ধিসংগত কারণ নেই। ভারতের সংবিধানে এ সম্বন্ধে প্রতিবন্ধক-মূলক যে বাবদ্য আছে তা আদরা প্রতিজ্ঞা-শীল বলে মনে করি। আজ ভারতের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো জমিদারী প্রথা লোপ করে নতুন-করে ছুটি কটন করা। ভারতীয় সংবিধান এর পক্ষে কিছুটা প্রতিবন্ধক। বিভিন্ন ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্য সমূহের বৈক্য রাজ্যেরা আজ রাজপ্রত্নরূপে থাকেও পোতা বদল করছেন। তাঁরা বোটা ভাতা পান, আরলও অনেকটা পান। কিন্তু ক্ষমতা ও দায়িত্ব কিছুই নেই। কান্সিওর যদি সাহস করে রাজপ্রত্ন ও জমিদারী লোপ করতে পারে তার ক্ষমতা কান্সিওর বক্তব্যে যেওনা উচিত। কান্সিওর দৃষ্টান্ত অত্যন্ত রাজ্যেও অপ্রতিষ্ঠ হ'বে এবং ইতিহাসেই ভূতপূর্ব দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিদ্বন্দ্বিতা

পরিমিত হবে দাবী করেছেন যে তাদের সব রাজ্য হতে রাজপ্রত্ন লোপ করা হ'তক এবং এ দাবী ভারত সরকারকে মানতেই হবে। এ বিষয়ে পথ প্রদর্শক হওয়ার সৌর্য কান্সিওরই থাকবে।

যৌথ রাষ্ট্রের সংবিধান কতকটা নিখিল স্বকমের হওয়াই বাঞ্ছনীয়, অল্প মূল ঝাঁটি ঠিক রেখে। এমন অবস্থা বা সময় আদরা করনা করতে পারি যখন তাহতকে কেন্দ্র করে পার্থক্য। অজ্ঞান দেশ যৌথ রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তর আসতে ইচ্ছুক হ'বে। আজ কান্সিওর ক্ষমতা যখন একটা বড়ই বাবদ্য করা হলো এমনি বড়ই বাবদ্য হ'রত প্রতিবেদী আরো কোম কোন দেশ বা অকলের ক্ষমতা করার প্রয়োজন ভবিষ্যতে আসবে। কান্সিওর বিধি আলোচনা করতে গেলে একটা কথা বিশেষভাবে আলোচনা করা কর্তব্য। বর্ধের ভিত্তিতে দেশ বিভক্ত হ'য়েছে। সেই অবস্থার পতকরা সমস্ত আশি জন মুসলমান অধিবাসী থাকা সম্বন্ধে এবং পার্শ্ব-স্থানের সংযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে কান্সিওর যে পার্শ্বস্থানের সংযোগ না গিয়ে ভারতের সংযোগ আসতে রাখী হ'য়েছে এটা একদিকে বৈক্য ভারতের পক্ষে গৌরবের অপর দিকে কান্সিওর মুসলমান অধিবাসী ও ভারতের নেতাদের পক্ষেও কম গৌরবের নয়। ভারত যে ধর্মমূলক রাষ্ট্র নয়, এখানে যে ধর্ম নির্বিশেষে সব সম্মানার্থে, লোক-দায়িত্ব অধিকার লাভ করতে পারে—কান্সিওর মুসলমান অধিবাসীরা তা গ্রহণ করলো। তারা আশঙ্কিত এগিয়ে গেল না এই অজ্ঞান দেশে নিজে তাদের নিষ্কা করা অধিবাসনের কাজ। তাই ভারত ও কান্সিওর মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপিত হচ্ছে আদরা তার সমর্থন করি।



— ইন্দিরা —

পঞ্চদশ বর্ষ

তারিখ—১৩৫৯

পঞ্চম সংখ্যা

কাব্যসাহিত্যে শাক্ত পদাবলী শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ দে

ধর্মকে আশ্রয় করে সাহিত্যরচনার গোটেটা আটান-কাল থেকে আমাদের বেশে প্রচলিত আছে। এ সাহিত্যের উদ্দেশ্য ঠিক চিত্তবিনোদন নয়—জ্ঞান, সত্য, বিশ্বাস প্রভৃতির মধ্য দিয়ে সম্প্রদায় বিশেষের ধর্মবোধ জাগিয়ে ভগবৎ আরাধনার ঐকান্তিকতা সৃষ্টি করা এবং য য ধর্মের মৌলিক বৈশিষ্ট্য লম্বচ্ছে পাঠককে সচেতন করে তোলারই হচ্ছে ধর্মীয় সাহিত্যের মূল মসপ্রেরণ। এই ধর্ম অবলম্বিত সাহিত্যের স্রোতঃ একমুখী নয়। জ্ঞান, কর্ম ও তত্ত্ব—এই ত্রিস্রোতে ভগবৎ আরাধনার পূর্ণ নিদ্রিষ্ট হংরে আপন আপন পরিপতির পথে অগ্রসর হংরে এসেছে সাহিত্যের মধ্য দিয়ে।

একমুগে একমল সাধকের বিশ্বাস ছিল, জ্ঞানই ভগবানকে লাভ করবার একমাত্র পথ। তাই জ্ঞানের উপরই তাঁরা জোর দিয়েছেন বেশী। শংকরাচাৰ্য এই জ্ঞানের পথেই ‘সোচ্ছং’ তংরে পৌছতে পেরেছেন। শিখ জ্ঞানের মাধ্যমে ভগবানের উপাসনাকে অনেকটাই স্বীকার-যোগ্য বনে করেন নি। এবং তাতে পরিতৃপ্তও হতে পারেন নি। তাই গীতার কর্মবার স্বীকৃত হয়েহে। কর্মই ভগবানকে লাভ করবার স্রষ্ট পথ। লম্বগ্র জীবন আপন আপন কর্তব্য সম্পাদন করে কলামলের

জন্ত ভগবানের উপর নির্ভর করাই সমীচীন। বিশ্ব গীতা অমুখ্যাবীদের সিদ্ধান্তঃ শেখলব্ধ চরম বলে স্বীকৃত হয় নি। পরবর্তী এক মূগে আর একমল সাধকের উত্থব হয় বীরা। একাধারে কবি এবং সাধকও হটে। এই মলের শীর্ষস্থানীয়েহা ব্রহ্মতে পারলেন, জ্ঞান এবং কর্ম এই উভয় পথই জীবাত্ম পরমাত্মার মধ্যে একটা মূখ্য স্থটি করে। তাই এই মূখ্য বৃত্তিরে ভগবানকে নিকট করতে হংবে এবং নৈকট্যের মধ্য দিয়ে তত্ত্বির যে উপাসনা তাই হংবে ভগবৎ আরাধনার স্রষ্ট পথ। বলা বাহুল্য, এঁরাই বৈকব এবং শাক্ত। জ্ঞান এবং কর্ম মিশে গিয়ে এক অভিনব তত্ত্বিমার্গ স্থটি হলো।

ঐক কখন এঁদের উত্থব হয়েছিল এ কথা নিশ্চয় কংরে বলা কঠিন। পত্তিতত্ত্বের আসংরে শাক্ত এবং বৈকব উভয় সমগ্রাই যত কটকিত। তংবে আটানকাল থেকেই বে বৈকব কবিতার পাশাপাশি শাক্ত কবিতার ধারাও চলে এসেছে এ লম্বচ্ছে সফলেই নিঃসংগ। কিন্তু তা হলেও উভয় ধারার মধ্যে একাংশতঃবীর একটা ব্যবধান থুব ল্পট ছিল। বৈকবদের তাব প্রকাশের বাহন ছিল গীতিকবিতা কিন্তু শাক্তদের বাহন ছিল কাহিনী ও উপাখ্যান। শাক্ত, দাসা, মধ্য, বাৎসল্য, মধুর ইত্যাদি

মানব চিত্তের কোমল বুদ্ধিগুলো ছিল বৈকুণ্ঠের প্রাণের
বিষয়। তাই নীতিকবিতাই এর পক্ষে, অক্ষয়
ছিল। শাক্তদের পক্ষে যেটির 'ভরানং জীবন' রূপ
বর্ণনা করে প্রোক্তা বা পাঠকচিত্রে প্রকৃত আশ্রয় কবিতার
অন্তঃসংলগ্ন কবিতার কাহিনী উপাখ্যানই উপযুক্ত ছিল।
কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে বারংবারের আবির্ভাবে প্রচ-
লিত এই বারংবার পুনর্বর্ণন ঘটলো। দ্ব্যর্থবোধক এবং
ভীষণ অসুখকী কবিতাকল্প, নিধু বাবু, নীলু ঠাকুর প্রভৃতি
কবিগণ এই সময় থেকে নীতিকবিতার বারংবার উত্তর
জন্মগ্রহণ করতে লাগলেন এবং তাতে শুধু একাধিক
ভাষ্যের দিক থেকেই নয়—ভাবের দিক থেকেও বৈকুণ্ঠ
কবিতার সংগে তাঁদের নিকট সাদৃশ্য ফুটে উঠলো। এই
ভাবে শাক্ত পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীতে নবময় লাভ
করলো। দ্ব্যর্থবোধক অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত সাহিত্যে যে
নব জাগরণ হুঁত হলে এবং এই নব জাগরণের ফলেই
তখন থেকে নতুন যে শাক্ত সাহিত্যের বাবা ভরা বৌ-
নের নবীন উল্লাসে ছল ছল কল কল করে প্রবাহিত হয়ে
এলো শাক্ত সাহিত্যের বিচারের আপাততঃ সেইটুকুই
গ্রহণ করা যাক।

বৈকুণ্ঠ সাধকগণ অসুখকে আনন্দের গুহের আভিনায়,
অসীমকে চাইলেন সীমার মধ্যে দেখতে। কল্প হলো
ভাবের নিকট আত্মীয় প্রেমিক। প্রেমিকরূপে পর-
বাস্তবকে—আত্মাধীন করার সাধন পথে যে বৈচিত্র্যের সৃষ্টি
হুঁত—তারই হুঁতরূপ হলো বৈকুণ্ঠ পরাবলী। প্রাকৃত
প্রেমের রূপকে অপ্রাকৃত প্রেমের যে চিত্র ভাষা অংকন
করেছিল 'অধ্যাত্ম', সাধনার অসুখকে তার মূল্য বাই থাক
বাংলা তথা বিশ্বের সাহিত্যের জা অমূল্য সম্পদ। এত
চমৎকার প্রেমের কবিতা পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যেই
কদাচিত্বে দু' একটি মেলে।

গ্রিক একই উপায়ে শাক্ত সাধকগণও ভাবের সাধন
জীবনের উপলব্ধির মুহূর্তগুলো কাব্যে রূপান্তর করে
বাংলা সাহিত্যের আর একটা দিক উজ্জ্বল করে রেখেছেন।
শাক্তগণ ভাবের ভাষা হৃদয় শক্তিকে কল্পরূপে ও
সাক্ষরূপে আরাধনা করেছেন।

• কল্পরূপে পরবাস্তব সীমা চিত্রিত করতে গিয়ে
শাক্ত সাধকগণ বাংলার ঘরের ছবিটি পরিমুদ্রিত করে
খুলেছেন। চিত্র দ্বিতীয় বাংলাী গৃহের পিতৃভাবাত্মক
নিবেদনের শক্তিকল্পকে অস্ত্রের হাতে সমর্পণ করে যে
অসুখ হুঁতবাতা ও দুঃসং উৎকর্ষের অক্ষয়মূল চিত্তাকুল
জীবন ব্যাপন করতেন বাংলার আগমনী বিজয়া গান
তারই হুঁত' প্রতীক। সংসারভিত্তিক অপরিশুদ্ধতাই
উমাকে একাকিনী হরের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে বা যেনকার
যেহ ব্যাকুল চিত্তে হুঁতবাতার অর্থ নেই। কখনো
বলছেন—

শিখি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকের মন্দ, কারো কথা শুনব না
যদি এলে মৃত্যুঞ্জয়, উমা নেবার কথা কর—
এবার আর কিয়ৎ করবো বগড়া, জামাই বলে মানব না
(রামপ্রসাদ)।

আবার কখনো বলছেন—

হর-জামাতা করে রাখবো কুন্তিবাস,
গিরিপুত্র করবো বিত্তর কৈলাস।
হর-গৌরী চকে দেববো বার মাল,
বৎসরান্তে আনতে যেতে হবে না (অজাত)।
যেনকা' বদ্র দেখছেন, উমা 'ওমা' বলে' তাঁকে
ডাকছে। আশংকাব্যাকুল চিত্র তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে
উঠেছে। তিনি বলছেন—

উমার কারণে প্রাণে যে বাস্তব নিশিখিনে,
মা হতে মুক্তি চিত্তে, হলিতে না,—বিত্তে এনে।
প্রাণ কানে তাই লগাই কাদি, কৈলাসে তাই যেতে গাদি,
যেবেতে তো বহুবাংবি প্রোবাংবি হল বচনে।
উমা তাহে বা পাবানী, লোকেরও কর পাখানী রানী,
আমি যে পাবান অধিনী, এ কাহিনী বেউ না জানে
(রসোমোহন বসু)।

দ্ব্যর্থ-পূর্ব থেকে উমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য
শিখিবাজার নিকট কান্তর অস্থায়ী আনাচ্ছেন—

'স্বাধিক বাও হে শিখি, তোমার করণে যদি
(নিধু বাবু)।

গিরিরাজ উনাকে আনতে গেলেন। সাবাবৎসর পরে উমা আর ফিরে আসবে। বাতৃহৃদয়ের আক কত আনন্দ। কত উল্লাস। কত আয়োজন। যেনকার চোখে নিস্তা নেই, মুখে আর অন্ন ঘোচে না, মুকে উৎকর্ষা সেগেই আছে। অংশবে সপ্তমীর প্রভাতেই উনার দর্শন পাওয়া গেল। চতুর্ভিক আনন্দে মুগ্ধিত। যেনকা উমাকে জড়িয়ে বরলেন মুকে। মেহবুদুস্ত বাতৃহৃদয়ের যেন অকস্মাৎ বাহিতাকে বকে পেয়ে পরিতৃপ্তির বীর্ষবাস কেলে বাটোলে। আনন্দের অস্ত্র দুহুতের জন্ত অংবাং হয়ে উঠলো। অক্ষয় প্রায় এসে উঁকি মারতে লাগলো যেনকার বনে—

ওমা, কেনন করে পরের ঘরে,

ছিলি উমা, বল মা তাই।

কত লোকে কত বলে, শুনে তেবে ম'রে বাই।

মা'র প্রাণে কি ঘেঁষে বরে,

আমাই নাকি ভিনা করে।

এবার নিতে এলে, বলবো—হরে,

উমা আবার ঘরে নাই।

(গিরিশচন্দ্র ঘোষ)।

স্বামী-গৃহের সুখ হৃৎকের সমস্ত স্ববরাধবর সংগ্রহ করে তেবে স্তার হতাশার বোলায়মান বাতৃচিত্ত সাধনা লাভ করলো। কিন্তু দুটো দিনের মধ্যেই সমস্ত আনন্দের অবসান হয়ে গেল। নববীর নিশি উপস্থিত হলো। বাতৃচিত্ত হাহাকার করে উঠলো—

ওরে নববী নিশি, মা হইওরে অবসান।

জনেছি বারুণ ছুনি, মা রাখ সন্তের থান।

খলের এখান বত, কে আছে ভোষার মন্ত—

আপনি হইরে হত, বধের পরেরই প্রাণ

(কবলাকান্ত ভট্টাচার্য)।

কিন্তু নববী নিশি যখন সত্যি পোছালা তখন যেনকার বক স্থানিষ্ঠিত গেলের সুকটিন আঘাতে চিরে থান থান হয়ে গেল—

কি হলো নববী নিশি হৈলো অবসান গো।

বিদ্যাক ভদ্রক বন ঘন বাজে, গুনি জনি বিবরে প্রাণ গো।

(কবলাকান্ত)।

অংশবে বিবাদের ককণ হাসিনীটিত বেলে উঠলো।

বুকভাঙা হাহাকারে অম্ববে, উঠলো যেনকার বক।

চতুর্ভিক হলো নিতম্ব; আবার একটি বহর।

যেনকার হৃদয়ের এই tragedy শুধু হিমালয়ের যেনকার tragedy-ই নয়—সমগ্র বঙ্গদেশের ঘরে ঘরে প্রতিটি যেনকার হৃদয়েরই tragedy। বাংলার বৃন্দের অন্তরে ককণার এই বাতা কতদিন কত অবসর দুহুতের ঘরে থাকে কে বলবে? যেনকা বাঙালী গৃহেই অস্ত্রসিদ্ধা মা; উমা শুধু হিমালয় স্তম্ভা পাৰ্বতীই নয় সংসারের আভিনায় বাঙালী দুহিতা। 'মানসিক সম্পর্কের মাধ্যমে দেবীর কস্তারূপ চিত্রণে শাক্ত সাধকগণ অপরিণীত কন্যার পরিচয় দিয়েছেন। শৈব কাহিনী অবলম্বিত আগমনীর ব্যাক্য যে কোন পাঠকের চক্ষুই অস্ত্রসিদ্ধ করে তোলে।

এরপর দেবীকে বাতৃরূপে অংকিত করা হয়েছে।

কিন্তু এই মা বিহু থেকে পৃথক নন—উভয়ে এক এবং অবিভীত। এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে আসল শাক্ত-পরের জন্ম। অষ্টাদশ শতাব্দীতে দিল্লীর বাঘশাহের সংগে বাংলার নবাবদের অধিকার নিয়ে বিবাদের উপস্থিত হওয়ার কলে দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার যে ভাঙন হয়েছিল তার কলে কাকপ্রসাদ প্রবৃত্ত শাক্ত পদকর্তাদের কাব্যে হৃৎখেবাদের হচনা হয়। এই হৃৎখেবাদের অন্তরালেই প্রকৃত হয়েচে শাক্ত দর্শন ও শাক্ত পদাবলীর স্বসংগঠন।

অষ্টেত ব্রহ্মার মধ্যে আত্মাকে মীন করে দেওয়াই হচ্ছে শাক্ত দর্শনের মূল কথা। এই পঞ্চভূতের জগৎ আত্মার জীবনকে পীড়ন করে। কিন্তু জগতের কেন্দ্রপদ শক্তিকে আত্মা করতে পারলেই পঞ্চভূতের পীড়ন থেকে পরিমুক্ত লাভ করা যায় এবং তখন সমস্ত সুখ হৃৎকের বহন থেকে মুক্ত হয়ে, সীমার সংকীর্ণতাকে উপেক্ষা করে আত্মা ব্রহ্ম শক্তি লাভ করে এবং তখনই ব্রহ্মের সংগে মিলিত হতে পারে আত্মার কৈবল্য প্রাপ্তি ঘটে। শাক্তের আকাংক্ষা এই কৈবল্য প্রাপ্তি।

কিন্তু পক্ষভূতের অগতঃ উপেক্ষা করা অথবা
ঐচ্ছিক লোপ করা—কোনটাই তো তত সহজ নয়।
তাই তরফায়ে নীকার এক অভিনব ব্যাখ্যা করা
হয়েছে।

প্রথমতঃ মূল্যবোধ এবং সহ্যবোধ এই দু'টো তত্ত্বের
অন্তর্নিহিত অর্থ ভ্রমশূন্য করা সম্ভব নয়। মূল্যবোধ হচ্ছে
মনের নিরন্তর প্রযুক্তি বা পক্ষভূতের অগতঃের প্রতি
আলোচনা—সহ্যবোধ হচ্ছে মনের উচ্চতম প্রযুক্তি বা
পক্ষভূতের অগতঃের উপরে সমস্ত বৈচিত্র্যের পরপারে এক
নির্মলের অগতঃের অস্ত্র ব্যাকুলতা। অসুস্থত্ব করে।
স্বভাবতঃই আনন্দের বন মূল্যবোধে থাকে—সহ্যবোধে
মনকে নিয়ে যেতে পারলেই বন নির্মল হয়। আত্মত্যাগ-
ভাবে নীকার প্রহণাতে মনকে কিছুতেই মূল্যবোধ গত
করা হবে না বলে সাব্যস্ত করতে হয়। কিন্তু মনকে
মূল্যবোধগত করা হবে না বললেই যদি সহ্যবোধে
শৌঙ্কল্যে যেতে তা হ'লে সে সাধনপর্বটাও
অত্যন্ত সহজ হয়ে দাঁড়াতে। অতঃ কোন সাধনার
পক্ষেই যে এমন কথা বলা চলে না! তাই সাধক
চিত্তের মূল্যবোধ সূক্তি অতঃ সহজে কোনদিনই সম্ভব
হয় না। কলে মূল্যবোধ থেকে মুক্ত হবার প্রযুক্তিজনিত
বহির্জগতের প্রতি তাঁদের বৈরাগ্য সত্ত্বেও সাধকের বন
বার বার সেই মূল্যবোধে আলো গ্রহণ করে। এখানেই
শাক্ত বেদনা—যে বেদনার মূলে রয়েছে বৈরাগ্য।
এখানেই দেখা গেল শাক্ত দর্শনে কাব্যেরও সম্ভাবনা।

সাধারণতঃ ধর্ম সাধনার মধ্যে সাহিত্য বা সংগীতের
কোন প্রেরণা হ'লে পাওয়া কঠিন। এ হচ্ছে কঠোর
যোগসাধনার ব্যাপার। এ নিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করা
একরকম অসম্ভব বললেও অসুজি হয় না। সাহিত্যের
নির্ভরতা মানব-জীবনের অন্তঃস্থ চিত্তজন বেদনাবোধের
উপর। বৈকুণ্ঠ ধর্মে বিরাগমুক্ত বীকৃত হয়েছে বলেই
ঐচ্ছিক ভাবে মনে তা এত সহজ। সৃষ্টি এবং স্রষ্টার
মধ্যে যে একটি চিত্তজন বিচ্ছেদের সম্পর্ক আছে বৈকুণ্ঠ
দর্শন তা বীকার করে নিয়েছে। তাই বৈকুণ্ঠের লক্ষ্য

বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি নয়—ভাব সন্নিহন।

শাক্তধর্মের বৈধি সাধনার মধ্যেও আত্মা বেধেতে পাই
একটি বৈরাগ্যবোধ এবং বেদনাবোধ আত্মগোপন করে
আছে। পরবেশের মীন হবার অস্ত্র সাধক চিত্ত
ব্যাকুল—বাগবন্ত, জিহ্বাকর্ষ, আচার-অর্চন সকল
আত্মজনই ব্যর্থ হয়ে থাকে—মন বার বার সেই
নির্মলের রাক্ষস থেকে নেমে আসছে। ব্যাকুল আত্মকা
নিরে সাধকের বাক্সা মুক্ত হচ্ছে—ব্যর্থতার, হতাশার
তার পরিসরাণি ঘটছে। মূল্যবোধের মন থাকতে চাচ্ছে
না—নির্মলেও আলো পাবে না। নীচের অগতঃের
প্রতি এই বৈরাগ্য এবং বৈচিত্র্যের পরপারে অবৈত
সত্তার মীন হতে না পারার অস্ত্র এই বেদনা শাক্ত
সাধকের চিত্তে এক অসুখ আধ্যাত্মিকভাবে আগ্রত
করে রেখেছে।

নির্মলে আসবার পূর্বে মনের রাক্ষস শাক্তের এই
দুই বৈরাগ্যবোধ এবং নির্মলে শৌঙ্কল্যে না পারার অস্ত্র
শাক্তের এই যে বেদনাবোধ—তার উপরই শাক্ত পদা-
বলীর নির্ভরতা। বৈরাগ্যবোধের মধ্যে সংগীতের
সুচনা, বেদনাবোধের মধ্যে নির্মলের ব্যক্তনাতে সংগীতের
পরিসরাণি।

এ পর্যন্ত শাক্ত দর্শন এবং শাক্ত পদাবলীর রসপ্রেরণা
সম্বন্ধে আলোচনা করা হলো। এবার কাব্যের মধ্যে
শাক্তের বেদন প্রতিলাভ ব্যক্ত হয়েছে তার অমূল্যজন
করা ব্যক্তি। প্রথমতঃ প্রশ্ন হবে শাক্তধর্মের 'মা কি ও
বেদন।'

দৃষ্ট বস্তুর আড়ালে যে এক মহাশক্তি নিরন্তর কাঙ্ক্ষ
করে চলেছে, পৃথিবীর কর্ণ কোলাহল, আনন্দ নিরানন্দ,
সৃষ্টি, স্থিতি এবং লয়ের পঞ্চাতে যে এক দুর্দীপিত
দেবতার নীরব সজ্জিয় রয়েছে—সেই দেবতার স্বরূপ
উপলব্ধি করে তাঁর সংগে নৈকট্য স্থাপনই হচ্ছে শাক্ত
কবির উদ্দেশ্য। সেই শক্তিইই তাঁরা মাতৃরূপে কল্পনা
করেছেন। তাঁদের বাগবা ছিল, বাস্তবাবে আত্মবিশ্বাস
করলেই ভগবানকে অতি সহজে কাছে পাওয়া যেতে

পারে। কাব্য সত্ত্বানের আত্মতা উপেক্ষা করা যারের
শকে সাধ্যাতীত—অন্ততঃ প্রাপ্তত অগন্তে। তাই
মাতৃঙ্গলিনী কালী তাঁদের কাছে একটি ভাবমাত্র নয়—
কালী 'is not an abstract symbol but it becomes
the means and end of a definite realisation'
(Dr. S. K. De)

কমলাকান্ত লিখেছেন—

সবে মাত্র তুমি বস্ত্রী, যন্ত্র আনন্ড তরে চলি

তুমি যেমন রাখ ভেমনি থাকি, যেমন বলগত

ভেমনি বসি।

অর্থাৎ এই বিশ্ব অগন্ত স্তারই নির্দেশকরূপে পরিচালিত
হচ্ছে। তিনিই বস্ত্রী—আনন্ড যন্ত্র মাত্র। পানীর গানে,
হরের তালে তিনিই কন্ঠত হচ্ছেন। বাহুবীর যুগ দিয়ে
তিনিই কথা বলছেন, তাঁর ইচ্ছাতেই আনন্ড ইচ্ছিত
হচ্ছি।

এই বিশ্বমাত্রা অসীম কনভ্যালান্সি। অন্তর্য,
অবিচার যেখানে বাহুবীর জীবনকে শব্দ করে রাখছে,
যর্বের মুখোশ পরে ভক্তাবীর রূপধারণে দ্বারা অপর
বাহুবীর অনিষ্ট সাধনে ভৎসন—তিনি তাদের উপযুক্ত
শাস্তি বিধান করছেন। পলকে করছেন অস্ত্র বধ,
অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারীকে করছেন পথের কাঙাল,
আবার পথের কাঙালকে করছেন বিশ্বের অধিপতি—
সর্বজন নমস্ত। তাই তাঁর চশা-কলা বাহুবীর শকে
দুর্ভোগ্য। একটিকে যেমন তিনি অগন্তকে ভাঙছেন—
অপরটিকে ভেমনি গড়ছেন। তাই সাধক গোবিন্দ
চৌধুরীর কণ্ঠে অক্লান্ত হয়েছে—

এম্বা কারে করের রাঙাঘর না অতুল ধনের

অধিকারী,

কারে করেই পথের কাঙাল হুঁসের অরের ভিখারী,
কেউ বা মুখে কাটার দিলি পূর্ণ শব্যার মরন কবি,
কেউ বা গাছের তলার তুণ শব্যার মুখে কাটার না

বিত্যবরী—

শাক্তগণ বৈকুণ্ঠবিশেষী।

কিছু এটা নিতান্ত অসংগত অনবদ্য। শাক্তগণ শ্রী
ভগবানেরই লীলাতন উপলব্ধি করতে চেয়েছিলেন।
সেই অজ্ঞতগণনা যে ভক্তের কাছে যখন যে ভাবে
প্রকাশিত হয়েছে তাঁকে সেইভাবে গ্রহণ করাই ছিল
তাঁদের উদ্ভ। শাক্ত কবি রঘুনাথ রায় (নেওরান)
গেয়েছেন—

তুমি রাধা, তুমি কৃষ্ণ, মহাবর্ষা, মহাবিশু

তুমি যে না বামচন্দ্রিনী, তুমি অনিত্য।

রাধা, কৃষ্ণ, মহাবর্ষা, মহাবিশু প্রভৃতি যেব দেবীরা

যে একই শক্তির বিভিন্ন প্রকাশ, একথা তাঁরা অকুণ্ঠচিত্তে
স্বীকার করেছেন। শ্রুতরাং বেদান্তে শাক্তি, দেবতাকে
তাঁরা বিশেষ কোন রূপের মধ্যে আবদ্ধ রাখতে চান নি
—নিবিশেষের মধ্য দিয়েই গেতে চেয়েছেন। কালীকল্প
তাঁদের সাধনার উপায় মাত্র—কিন্তু এটাই ভগবানের
একমাত্র পরিচয় নয়। বিশেষ করে সাধক কমলকান্তের—

আন না রে মন, পরম কারণ, কংসী কেবল যেয়ে নর,

দেখের বরণ করিয়া ধারণ, কখন কখন পুঙ্খ হয়।

পাঠ করলে শাক্তদের বৈকুণ্ঠ বিষয়ের কোন সংগত
কারণ বুঁজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে।

এই মহালক্তি কারো কাছেই সম্পূর্ণরূপে বরা দিচ্ছেন
না—সেই অজ্ঞত ভুল করে অনেকে ঐর মধ্যে পার্থক্য
স্থাপন করেছেন। বিশেষ একটি রূপের মধ্য দিয়েই
পার্থক্যকায়ীরা তাঁকে গেতে চেয়েছেন। কিন্তু এমন
করে তো এই শক্তিকে আরও করা যায় না। তিনি
যে রূপ হয়েও অরূপ, সীমার বন্ধন স্বীকার করেও
অসীম। বিশেষ কোন রূপের মধ্যেই যেমন তিনি
নিঃশেষিত নন—ভেমনি সংকীর্ণ কোন স্তার যথেষ্ট
তো একে ধরে রাখা সম্ভব নয়। বাহুবীর সংগে তিনি
একটানা কৌতুক করে চলেছেন—সাধকগণও তাঁকে
শাওনার আশায় নিশ্চিন্দ আহারে নিজা প্রতিভা প্রকাশ
করার তিত্তিকার আশ্রয়নিয়োগ করে আছেন, বিশ্বজনন
তাঁর সারিধোর অল অতুল ক্রন্দন করে চলেছে। তিনি
সকলকেই বরা দিচ্ছেন—অথচ কাউকেই দিচ্ছেন না,

ধরা দেবার ভাণ করে আবার অতর্কিত হুজেন, অগত্যাতে
যেন একটা হুজেন কুহেলিকা কাণে আবদ্ধ করে রেখে
তিনি নানা হুজের নানা হুজ লীলায়িত হুজেন। তাই
সাধক কবি রামপ্রসাদও বলেছেন—

এতের ভাবিলে বার্থ, বুঝা সে বলাদসি—
ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিব, রাম, হুর্গা কালী রাধা শ্যাম,
সবে এক, একে সব, একের বলে সবাই খলী।

ভগবানের এই যে পরিপূর্ণ উপলব্ধি এটা একবার
শাক্ত ছাড়া অন্য কেউ ভেদন করে উপলব্ধি করতে
পারেন নি। ভগবানের সংগে নৈকট্য স্থাপনই ছিল
শাক্তদের উদ্দেশ্য। সেইজন্য ভগবানের সত্যকার রূপ
যে বিষময়াণী অসংখ্য ঐতিহ্যের মধ্যেই মুকিয়ে আছে
একথা তাঁরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। এদিক
থেকে বিচার করলে শাক্ত সাধকদের অত্যন্ত সংকীর্ণ চিত্ত
সাধকদের তুলনায় উন্নত এবং মহাশুদ্ধ বল সর্ব প্রথমে
স্বীকার করে নিতে হয়।

মহাশক্তিকে প্রাণ ভরে 'মা' ভেবে শাক্ত সাধকগণ
পরম পরিকৃষ্টি লাভ করেছেন। ভগবানের সংগে
নিজের যোগসূত্র স্থাপনের এত বড় সহৎ এবং পবিত্র
কল্পনাই তাঁদের কাণ্ডে অকৃত্রিম আধ্যাত্মিকতা ও ভাব-
গভীরতা এনে দিয়েছে। মাক্তত্ব বুদ্ধিগম্য নয়—
বোধগম্য। বুদ্ধির আকাশে পড়ারূপে ঈশ্বর বিরল—
বোধের নতোলোকের সারিরা তাঁর প্রায় নিবিড়।

শাক্তদের 'মা' ভাবটির মধ্যে যে কত আনন্দ, কত
উন্নতি—ভক্তিভাবের কত বিস্তারতা আছে তারই
প্রকাশ হলো শাক্ত পদাবলী। তাই শাক্ত পদাবলীর
রস গ্রহণ করতে হলে সর্ব প্রথমে শাক্তদের 'মা' কে
বুঝতে হবে। স্বরূপের 'মাতা' উৎসারিত এই 'মা' ভাবই
শাক্তপদাবলীর সংলীভ বর্মের (Lyricism) মূল।
'মা' অত্মকৃতির বুদ্ধনাই শাক্তপদ। 'মা' ভাবের মধ্য
নির্দেশ্যের সর্বত্র ভক্তিহীন বেন তাঁরা উন্মাদ করে
যেন—ভগবান বেন অত্যন্ত নিকটে চলে আসেন। তাই
নয়ন ছক, স্ববীজনাথ বেনন বলেছিলেন, আবারের যেনের

বর্ষবোধের ইংরেজী ভাবনা ঠিক 'religion' নয়—তার
চেয়েও বৃহৎ কিছু।—শাক্তদের 'মা' ও ঠিক ভেদনি
ইংরেজী 'mother' নয়—তবৎপেক্ষা বৃহৎ কিছু। এর
অন্তরালে একত্র আছে বহু যাক্তগতা, উৎকর্ষা, জীতি,
দেহ, ব্রহ্মা, ভালবাসা—এমনকি রাগ, অতিমান, অতি-
বোগ, আশ্বাস।

চতুর্দেবীর ভক্তগণ যখন অবিকাংশ সময়েই তাঁকে
জীভিত্তনিত ব্রহ্ম জ্ঞানান, দেবীকে প্রায় রাখবার মত
অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাধ্য হয়ে পূজাগুলি অর্পণ করে তবে
বর প্রার্থনা করেন—শাক্তদেবীর ভক্তগণকে যুগাক্ষরেও
তার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না। অগজানন্দীর সংগে
জীবের একান্ত আত্মীভাব। তাই এক সময়ে তাঁরা
যেমন বলেন, 'অন্ন জরা মৃত্যু হরা তারা নামে ছেঁচলে
বাঁচে', অন্য সময়েও ভেদনি কি। সংকোচহীন ভাবে
বোধগ্য করেন—

আমার কি ধন দিবি, তোরা কি ধন আছে ?

তোমার রূপাণী পাবন, বাঁধা আছে হরের কাছে।

—রামপ্রসাদ।

দেহকে শক্তত্বের আশ্রয় করে বিষমাতাই
মাহুৎকে এই পৃথিবীতে প্রেরণ করেছেন। এরা সর্বমাই
মাহুৎকে দৃঢ় করে রাখে, নানাদিকের প্রলোভন কাগ্যার।
তক্ত নীলাধর মুখোপাধ্যায়ের কাছে তাই শোনা গেছে—

হিরে নারা বেড়ি পথে, কেলোহ বিপদে,

সম্মেই হারালেম বোক কল।

এবার হলো না সাধনা, ওমা মর্যাদনা,

সংসার বাসনা বড়ই প্রবল।

ভক্তের আশা দুই সামান্য। বস নয়, ঐশ্বর্য নয়,
সন্মান নয়—অতিশক্তি নয়—তত্ত্ব মায়ের চরণ ছুঁতি।
কিছু 'মায়-বেড়ি' থেকে হুজ হ'তে না পারলে ভো
'চরণ' পাওয়া যাবে না। তাই 'মায়-বেড়ি'র বিনি
মতী—সেই পরমাত্মা দেবী—তাঁর কাছেই ভক্তের
আশ্বাস—

একবার খুলে যে বা চোখের হুঁসি,
দেখি শ্রীপদ যনের মত।

—হামগ্রাসাদ।

কিন্তু সহস্র আকৃতিও যে অগম্যজনীর কৃপা অর্জন
করতে পারছে না, তিনি তো তক্তের চোখ 'হুঁসি' মুক্ত
করবার প্রয়াসী হচ্ছেন না। তাই তো তক্তের অতিমান—
বা বলে চাকিস না রে মন, থাকে কোথা পুঁথি তাই,
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই।

—নরচন্দ্র রায়।

বেঁচে নাই অর্থাৎ সত্যই যদি তিনি তক্তের ছবরকে
জানতেন, তাঁদের দুঃখ দুর্ভাগ্য সববেদনা বোধ করতেন
তা হ'লে অবশ্যই তিনি তক্তকে ত্রিপুর পুংখল মুক্ত
করতেন।

বা বলে কাঁদিলে ছেলে, জননীর কি আগে নয়।

যেয়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কর।

—বিষ্ণুধার চট্টোপাধ্যায়।

অগত্যা তাই মায়ের সংগে তক্তের বিদ্রোহ—

যে ছর পাখানের বেয়ে, তার ছুরে কি দরা থাকে।

দয়ালীন না হলে কি লাগি মায়ের মাথের বুকে।

—নরচন্দ্র রায়।

অথবা—

নিবন্ধে ক'রে নৃশানবালী, সন্ন্যাসী তার লাগিয়েছে।

নাম কেবল কল্পপাবনী, কল্পপুত্র হ'য়েছে।

—একুনি লাহেন।

কিন্তু তাত্ত্বিক মায়ের লাড়া পাওয়া বাচ্ছে না।
সম্পূর্ণ আত্মনিবেদন করতে হ'লো তাই ভক্তকে সংসার
দুখে, বিবর সম্ভোগে, সাধক কথির অন্তরাবস্থা মুক্তির
আশার হটকট করছে। তাই কল্প আকৃতি জানালেন
ভক্ত—না বদন পর অর্থাৎ হে নিরাশ্রয় ঐশ্বর্য! তুমি
আকার ধারণ কর। তুমি নাকার হও এক—

এখন সন্ধ্যাবেলায়, কোলেরে ছেলে, ঘরে নিরে ঢল।

—হামগ্রাসাদ।

চন্দ্রনাথ দাশের—

লাস্যাদিন করেছি বাগো। লংগী লয়ে খুঁটা খেলা,

খুঁটা কেঁচে কোলে নে বা, এসেছি গো সন্ধ্যাবেলা।

কত ভাই বাড়ি দেখ গায়ে তক্তেছে,

গা দিয়ে বা বাঘ ছুটেছে,

খুঁয়ে যে বা ঠাণ্ডা জলে, পুঁছে যে বা গায়ের হল।

পদটিতে আত্মসমর্পণের একটি অতি বিবর্ত কল্প 'ও
গতীর রূপ ধারণ করেছে। লক্ষ্য করবার বিষয়, পদটিতে
সহস্রাবের ব্যঙ্গনা অত্যন্ত লুক্করভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

আমরা যখন বলি শাক্ত পদাবলীতে কাব্যরস নেই
তখন আমাদের কল্পিতভাটাই দূর পড়ে যায়। অর্থাৎ
আমরা ভুল নই। কিন্তু ভুল না হয়ে তক্তের কথা
ব্যাখ্যা করতে যাওয়াই দুঃস্থ। বৈষ্ণব পদাবলী
আমাদের করবার পূর্বে মনে দেয়ন একটা বৈষ্ণবী ভাব
আনবার প্রয়োজন হবে গড়ে, শাক্ত পদাবলী পাঠ করতে
মেলবে তেমন কিছুকে শাক্ত হয়ে তবে পাঠ করতে
হয়। তা হলেই আমরা দেখতে পাব, কাব্যরস পরি-
বেশন করবার জন্য শাক্তগণ কবিতা রচনা করেন নি।
তাঁদের পদ সৃষ্টির আদল উদ্দেশ্য হচ্ছে ভক্তির কথা,
ভক্তির কথা, উপলব্ধির কথা সহজ সরলভাবে প্রকাশ
করা। বোধ সাধনায় বর সাধক কখন ভঙ্গুত ভিজে
গেয়ে উঠেন—

কালীপদ আকাশেতে মন খুঁড়ি খান উড়িতেছিল

কল্পেরে কৃ বাতাস গৈয়ে গৌড়া খেয়ে পড়ে গেল।

এখানে কাব্যসৃষ্টির কোন সেরণা নেই, বদন্ত-
বাহারের স্বর যোজন্য করবার কোন প্রয়াস নেই—
নেই অলংকার সম্পদ পদকে সযত্ন করবার কোন চেষ্টা।
সাধন পথ থেকে বিকল্প চণ্ডার চিত্রের যে অবস্থায়
এই বেধনার উপলব্ধি—গেই অবস্থার মনকে উন্নীত
করতে না পারলে এই পদের রস উপলব্ধি করা কষ্টকর—
'সদস্য' ভক্তই শুধু নিজের অগ্নির অগ্ন তক্তের বেধনাকে
উপলব্ধি করতে পারেন।

সহজ, সরল এবং অত্যন্ত গ্রাসলতাবে বর্ণিত হয়েছে
যেদেই শাক্ত কবিকে 'হর বিদ্য' 'শকুন্তল' 'নরটি' ইত্যাদি
ঐক্যিত্ব রূপকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে, 'শাশা শেলা'

‘সভরক খেলা’ ‘কদুর দানি’ ‘তোজবাড়ী’ ‘আলাদী’ প্রভৃতি উপন্যাসে পল্লীজীবনের আবেশী থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে, ‘ঘর সংসার’ ‘হাট বাজার’ প্রভৃতি বাংলায় কীর্তনের নিত্য ব্যবহার্য অনাড়ম্বর ভাষাগুলোকে মঞ্জিত করবার কোন প্রয়োজন অনুভূত হয় নি। এই জন্যই শাক্ত পদাবলী আপাততঃ বাংলায় কানে মনপ্রিয়তা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে।

কিন্তু এটা হলো সম্পূর্ণ পক্ষপাতপূর্ণ বিচার। অবশ্য একথা বলতেই হবে যে শাক্ত পদাবলীর নিবিড় উপলব্ধি করতে হলে পাঠকের পক্ষে শাক্ত বিশ্বাসী হওয়ার প্রয়োজন যথেষ্টই আছে। কিন্তু যেহেতু সাধনার বিষয়কে কাব্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে সে হেতু এর কাব্যিক বৃণ্যও অবশ্যবিচার্য। একাংশে যে কাব্যের universality বা সার্বজনীনতা থাকে সে কাব্যের আশ্বাসনে বিশেষ কোন বর্ষ বর্ণনাকে অবশ্য প্রয়োজন না দিলেও চলে—বৈষ্ণব কাব্যই তার প্রমাণ।

শাক্ত পদাবলীর ভাবসৌরভ অধ্যাষ-সাধনার বিচারে যতই উন্নত হোক কাব্যরসের পরিচুটনে তা নিতান্তই চূড়। এতে কল্পনার এমন কোন ঐশ্বর্য নেই, ভাবের এমন কোন হৃদ বৈজিয়া নেই যার দ্বারা কোন হৃদয় কাব্যরচনা সম্ভব হতে পারে। বৈষ্ণব পদ যেমন সাধনার সংকেত করেও কাব্য হ’লে উঠতে পেরেছে শাক্ত পদ তা পারেনি। এর কাব্যিক বেটুকু তা হচ্ছে আশ্বাসের অধ্যাষ অনুভূতির নিবিড়বে এসাদী সুরের ককাবে। এসাদী সুরই শাক্ত পদাবলীর মনপ্রিয়তাকেও বহিষ্ঠ করেছে। শাক্ত-কবি সাধন-জীবনের উপলব্ধির সত্যকে সংসীতের মাধ্যমে অকৃত্রিম এসাদী সুরে কল্পিত করেছেন—বাংলায় অস্তঃস্থল পর্যন্ত শাক্ত পদ তাই অন্য সবচেয়ে স্পষ্ট করতে পেরেছে। এসাদী সুরে আছে সারল্য, আছে দাবলীলতা, আছে মন মাতানো মধুর, আছে না বলা কথা বুঝিয়ে দেবার সুর। কিন্তু একাংশ মহিমার দিক থেকে পদাবলী—সমস্ত পুণ্য উন্নত ধরনের কিছু নয়—সম্মত চরন, উপমা প্রয়োগে যথেষ্ট পৈথিল্য লক্ষ্য করা যায়, স্থানে স্থানে তবু একাংশের জায় এত

একটু হয়ে পড়েছে যে উৎকট চর্যাপদকে পর্যন্ত অরণ্য করিয়ে দেয়। লক্ষ্যসংকারণের বহুল প্রয়োগ পদের মিষ্টত্ব নষ্ট করে যিরেছে বহুবার। তাহা কোথাও কোথাও আড়ম্বর কাট্টিরে উঠতে পারে নি—হৃদয়ের বৈজিয়া-হীনতা তো এখন সূর্য্যই অন্তর্ভুক্ত। মোট কথা কাব্যিক উৎকর্ষ শাক্ত পদাবলী লাভ করতে পারে নি—অবশ্য রামপ্রসাদের দুর্ভাগ্যই কবিতার ব্যতিক্রম স্বীকার করতেই হবে।

বৈষ্ণব কবিতার পাশাপাশিই শাক্ত কবিতার দ্বারাও প্রেরিত হয়ে এসেছে অল্প কেন যে এগুলো স্তোম উৎকর্ষ লাভ করতে পারে নি তার কারণ দেখা যায়—প্রথমতঃ বৈষ্ণব বর্ণনের অনুরাগে প্রবৃত্ত রোমান্টিকিজমের অন্তর্নিহিত পক্ষের পক্ষে এত মধুর কাব্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। সূর্য্যের প্রতি অন্ধরীণ আকর্ষণ (the desire of the moth for the star) এবং চির রহস্য প্রিয়তার (mysterious aspiration) রোমান্টিক কবির চিন্তে একটা অতৃপ্ত ব্যাধার সুর ক্রমাগত কল্পিত হয় বলে রোমান্টিক কবির কাব্যও হ’লে উঠে মধুর। বৈষ্ণব কবিতা অবশ্য রোমান্টিক ছিলেন না। কিন্তু বৈষ্ণব বর্ণনের রোমান্টিকিজমই তাঁদের কাব্যকে মধুর করে তুলেছে। বৈষ্ণবদের ‘কৃষ্ণ’ নামটির মধ্যেই রয়েছে মধুর রহস্য এবং কৃষ্ণের আকর্ষণেরও অন্ত নেই। সূর্য্যের কাছে মঠা চির রহস্যময়, চির অজানা—তাই বৈষ্ণব কাব্যের কৃষ্ণ এত রহস্যময় এবং কৃষ্ণের আশ্বাসনের ও পরিচুতি নেই। পরিপূর্ণ মিলনেও এখানে ব্যাধা, ‘চই কোড়ে দুই কাঁধে বিচ্ছেদ ভাবিয়া’, একান্ত নিকটে গেলে ও এখানে প্রায় উঠে, ‘তুই’ কৈছে মানব কহ তুই’ রেহে’ অর্থাৎ হে চিরস্বপ্নর! তোমার মধ্যে কি অপরূপতা তুমি গোপন করে রেখেছ ব্যাধা এত কাছে গেলেও তোমাকে আমি চিনতে পারছি না। এত স্নেহেও তোমার জানতে পারছি না—এত আশ্বাসন সত্ত্বেও তুমি আমার কাছে চিরস্বপ্নর, চিরদূরত্ব রহে ব্যাধা। তোমার স্বপ্ন আমার ব্যাধুলতার পরিসমাপ্তি ঘটছে না; বাৎস! বল তুমি কে? এই যে ‘কে’ প্রায় এর কোন লীলাংগা

নেই। বৈষ্ণব কাব্যের শেষেও তাই পদ্যকার বলেছেন—
জনন অবধি হয় রূপ নেহারলু নরন না তিরপিত ভেল।

কিন্তু শাক্ত দর্শনের ক্ষেত্রে এ ধরনের কোন
রোমান্স আছে নেই। মহাদেবের আকর্ষণের অস্ত্র একটা
অতুল্য ব্যাকুলতা। অস্ত্র আছে, কিন্তু এই ব্যাকুলতা
রোমান্সিজমের ব্যাকুলতা নয়—একে সাধক চিত্তের
সাধন-ব্যাকুলতা বলাই সংগত। বৈষ্ণব প্রাণ্ডিতে
শাক্ত সাধনার শেষ—তাব সন্নিহনেও বৈষ্ণব সাধনার
বিস্তি নেই। বিস্তারিতঃ বৈষ্ণব সাধনার বৈচিত্র্যের
রূপবিলাসকে সাধনার পরিপন্থী মনে করা হয় নি।
এইজন্য তাঁদের কাব্য বৈচিত্র্যের স্রোত মনোহর। কিন্তু
শাক্ত সাধনার বৈচিত্র্যের রূপবিলাসকে অবীকার করা
হয়েছে। তাঁদের দৃষ্টি একের অভিমুখে। জীবনপথে
বিচিত্র আকর্ষণ তাঁদের একের পর থেকে বিচ্ছিন্ন করতে
চাইলেও একই তাঁদের কাছে পরম এবং চরম সত্য।
তৃতীয়তঃ বৈষ্ণব কাব্যের প্রধান অবলম্বন মধুর রস।
শাক্ত কাব্যের অবলম্বন বাৎসল্য রস। স্বামী-স্ত্রীর
সখ্যের মধ্যে যে নিবিড়ত্ব আছে তাতে যেমন চাওয়া
পাওয়ার কোন শেষ নেই, তেমনি হল চাকুরি রাস
অভিমান কোথাও কতি স্বীকার করে না—পরম্পরের
অন্তরের কথা কখনো শেষ হতে চায় না। বৈষ্ণব কাব্যে
স্বামী-স্ত্রীর এই সখ্যের মাধ্যমেই কাব্য সাধনাকে
রূপায়িত করা হয়েছে বলে কাব্যে যেমন বাধুধ্বের অর্থ
নেই প্রকাশেরও তেমনি শেষ নেই। কিন্তু যা এবং
মহাদেবের সখ্যটি বত নিবিড়ই হোক, আশা আকাংক্ষা
তাতে অর—গম চাওয়াই একটা আত্মবিক পরিমার্গ
আছে। তাই মাতৃরূপে কল্পিত শক্তি অল্পকৃতি বাৎসল্য
রসের সংকীর্ণ সীমার আবদ্ধ—ওম্ব পুনর্জন্মের কল্যাণ।
চতুর্থতঃ বিভাপত্তি, চণ্ডীবাদ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞানদাস
প্রভৃতি অনন্ত সাধারণ শক্তি সম্পন্ন কবিগণ বৈষ্ণব কাব্যের
রচয়িতা ছিলেন। কিন্তু শাক্ত কাব্যের রচয়িতাদের
মধ্যে একমাত্র রাধাপ্রসাদের মধ্যেই কিছুটা কবিত্ব শক্তি
ছিল। অস্ত্রে কবিতা শুধু গভীরগভিক পন্থার ভাব

প্রকাশ করতেন। তাই বৈষ্ণব কাব্যের পাশে শাক্ত
কাব্যের স্থান একটু সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। পক্ষমতঃ
বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ঐতিহাসিক যখন ক্রমশঃই বুদ্ধি শেতে
থাকে তখন একপ্রকার সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উদ্ভব
হয়। এই সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসে ঐতিহ্যের শক্তি
চৌকর্ণ হওয়ার শাক্তদের পক্ষে কোথাও পাতা পাতায়
হ্রস্ব ছিল। তাই শাক্ত পদাবলীর এতলমত তেমন
ভাল ছিল না। ফলে বৈষ্ণব কাব্যের প্রসারই বৃদ্ধি
পায়—শাক্ত কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী অবশেষে অক্ষমতার নীর্ণা
হয়ে যায়। যতঃ মহাপ্রভুর আবির্ভাব বৈষ্ণব কাব্যের
পক্ষে একটি স্বরলীর দুর্ভাগ্য। মহাপ্রভুর জীবনের সীমাই
অধিকাংশে বৈষ্ণব কবির অবলম্বন হওয়ার বৈষ্ণবদের পক্ষে
কাব্যচর্চার বেশ একটা দুবিধা হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু
শাক্ত কাব্যের ভাগ্যাকাশে ঐশিত্য দেখবার এমন কোন
সীমারূপ কোন সাধকের মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় নি
বলে নিষেধের জীবনে উপলব্ধ তাকেই মাত্র কবিতার
রূপায়িত করা সম্ভব ছিল। ফলে কাব্যের প্রসার সম্ভব
হয় নি। শব্দমতঃ বৈষ্ণব কাব্যের কাব্যিকতা সাধক
ছাড়াও সাধারণের কাছে প্রত্যয় বিস্তার করতে
পেরেছিল। কিন্তু শাক্ত কাব্যের কাব্যিকতা অপেক্ষা-
কৃত অর বলে জনসাধারণের কাছে বৈষ্ণবের মত প্রভাব
বিস্তার করতে পারেনি।

কিন্তু তবুও বলা যায়, বাংলা সাহিত্যে শাক্ত পদা-
বলীর স্থান শুধু আভ্যন্তরীণ জগৎই নয়—অনন্তকালের
জগৎই। বাক্যে ‘ম’ বলে ডাকতে হলে শাক্ত পদাবলীর
এক স্বীকার করতেই হবে। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক
আলোচনায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত সাধকের আবির্ভাব
একটি স্বরলীর স্তম্ভ। শিবসু সত্যসু হৃদয়বের আবেশন
নিরে বাংলা সাহিত্যের আসরে যে সবস্ত রচনা আশ্রয়-
প্রার্থী হয়েছে—আপনাতেই তারা আপনাদের বিশিষ্ট
আলন নির্দিষ্ট করে নিয়েছে। শাক্ত পদাবলীও যে
বাংলা সাহিত্যের বাৎসল্য রসের বিশিষ্ট স্থানটি অধিকার
করে রেখেছে এ কথা অনস্বীকার্য।

আল্লাকান

(উপভাস)

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বাহ্নবৃত্তি]

টানিলাল পরীক্ষার আর দেহী নেই। হৃৎক'রে দিনগুলো কেটে গেলো। তাবতেই কেমন লাগলো মুন পের। গোয়েবিন হাড়ার আর হ'মাস হ'রে এলো এর মধ্যে মা শিনের চার খানা চিঠি এসেছে। উটান টিনের এসেছে পোটা বাহো। এতোয় চিঠিতে তিনি মুন পেকে সাবধান করে দিয়েছেন, পহর বড়ো বিশ্রী জায়গা, কত ভালো ভালো ছেলে মলে মিশে হৈ চৈয়ের মধ্যে পড়ে নিজেই সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে। মুন পে বেন সর্বদা বনে কাঁধে, বাছব হ'তে হবে তাকে। শেখ চিঠিতে এ বিষয়ে উটান টিন বিশেষ করে লিখেছেন, এর মধ্যে শেরাজীর সংসে আকিরাব নহর বেখা হয়েছিল জার। উটান টিন নহরে অস্ত্র কাল সেবে, ও মিন বুজীর ভক্ত ওহুধ নিতে ডাক্তারখানার লেবেছিলেন, দরজার পোড়াতোই শেরাজীর সংসে বেখা হ'য়েছিল। শেরাজী চোখের অল্পে ফুসছেন। একটি চোখে ভালো ক'রে দেখতেই পারেন না। উটান টিনকে সেখে এগিরে এসে মুন পের বোঁজ খবর নিয়েছিলেন। বলেছিলেন, নহরে' দুর্গির মধ্যে মুন পে বেন নিজেকে হারিয়ে না কলে। আরাকানের ছেলে আরাকান ইয়হার মন্তন সব কিছুতে অটল থাকে। প্রথম হ'তে হবে তাকে, এবেশের লোকের- প্রথম সারিতে এসে গাঁড়াত্তে হবে। মুন পে জনতার কেউ নয়, মুন পেকে খিরে জনতা, একথা বেন কোনদিন না তোলে। উটান টিন এতোয়কটি কথা মাগ দিয়ে লিখেছেন। পরীক্ষার ভালো করতে হবে, শেরাজীর অহুজা।

শেরাজীর কথা অবহেলা করার সাহস মুন পের নেই। সবজ কোলাহল থেকে মুন পে নিজেই সরিয়ে নিয়েছিলো। খয়ের মেঘালে নিজে হাতে লিখে একাঙ নোটটিপ টাইপিয়েছিলো, 'ন অবি বিত্তা সবং বিত্তং'

কমল বোসকে নিরালাহ ডেকে বলেও দিয়েছে, পরীক্ষা পর্বত ওর বাঁবা শড়ক। ঠুলি পড়া পনিষোড়ার মন্তন এদিক ওদিক চাইবে না, একদমে সমস্ত পথ ছুটে যাবে।

মুন পে করলোও তাই। নিয়ম ক'রে ছুবেলা পড়া শুরু করলো। এমনকি ক্লাসের মধ্যে পর্বত একমনে নিয়ম লেকচার নোটস পাতার পর পাতা টুকে গেলো। শেরাজীর নির্দেশ। জীবনে আর কোন প্রব্রই থাকতে পারে না।

শেখ পরীক্ষার দিন এককাঙ ঘটলো। পালি পরীক্ষা শেষ ক'রে মুন পে বাইরে আসলো। আর দিন দুই পরেই গোয়েবিন বাঙরার তোড়মোড় করতে হবে। কেনাকাটা সব শেষ করতে হবে এর মধ্যে। ব'ট্টে নেমেই মুন পে গাড়িরে পড়লো। সামনে গাড়ানো একটি মোটর থেকে বে ডকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। কে বে ডাকলো তা বুঝতে মুন পের দেহী হ'লো না। পায়ে পায়ে মোটরের কাছে গিয়ে রক্তা বোসের হুখোহুখি গাড়ালো।

'কি তাই, তুমি ন্যাকি জীবন তপস্জা শুরু করেছো। জীবন পূর্ণ ক'রে লোপাপড়া আরম্ভ করেছো।'

মুন পে উত্তরে মুখ মুচকে একটু হাসলো।

'গতি্য খুব ভালো। তোমার অস্ত্র ক'দিন বক্ত মন কেমন করছিলো, চলে বাহার আগে তারী দেখতে ইচ্ছা করছিলো তোমাকে। কমলকে ক'দিনই ব'লে- ছিলাম, কিন্তু সে বললে, মুন পে বেদকম গম্ভীর মুখ ক'রে বইয়ের গোছা নিয়ে ক্লাসে বাঙরা আনা করছে, এখন ডাকে আমি কিছু বলতে পারবো না। তাই তাবলায়, পরীক্ষাটা শেষ হোক, আমিই তার সংসে গিয়ে দেখা করবো। পড়ার হাংগামা নেই, বেশ অনেককম ঘরে কথা বলা যাবে, কি বলো।'

রত্না বোসের সুখের দিকে কি তেবে লুন পে চাইলো,
যেটোরের ফুটবোর্ডের ওপর নম্বর বেখে বললো,
'জাপানি আবার ভারতবর্ষে চলে যাবেন বুঝি? কবে
যাবেন?'

'এ মাসের শেষে, মাসে আর দিন ছয়েক আছি।'

'আবার কবে আসবেন' লুন পে বুধটা তুলেই মাঝিরে
ফেললো। চোখ দুটো ভিক্কে ভিক্কে ঠেকলো।

'বাবার কথা বলতে পারি তাই, আসবার কথা
বলতে পারি না।' রত্না বোসের সুখের হাসি অমান,
'এবারে খুব ছুটিগের মতের ক্রীপিরে পড়তে হবে।
এলপার মর ওলপার। লাঠিতে কুলোবে না, ললাটে
বরত কুলেটের চিকিই আঁকতে হবে।'

লুন পের সমস্ত শরীর হঠাৎ দুলে উঠলো। এক
হাত দিয়ে যেটোরের দরজাটা ধরে সে টাল সামলানো।

'তুমি হোটেলে ফিরবে নাকি এখন?'

'না মার্কেটের দিকে যাবে। বাড়ী কেরবার আগে
কিছু কেনাকাটা করবো।'

'তাই নাকি, এলো, আমায়ও মার্কেটে কাজ রেরে'
রত্না হাত দিয়ে দরজা খুলে বিলো।

লুন পে উঠে পাশে গিয়ে বসলো।

'আর তু মাসের কাছাকাছি ছুটি, বেশে গিরে সমস্তটা
কিভাবে কাটাবে?' রত্না বোস পরনের শাড়ীটা উছিরে
দিয়ে গিটে হেলান দিয়ে বসলো।

'বজ্র সজা হয়ে গেছি এ ক'মাসে। ইচ্ছা আছে বেশে
গিরে এই সমস্তটা আঁপ তরে ছুটোছুটি করবো, কাছা
মাক্খো আর চোঁচোমিটি করবো,' কথাগুলো বলতে পেরে
লুন পে হাঁক ছেড়ে বীচলো।

রত্না হেসে উঠলো, 'পারবে না তাই, কদিনেই ক্রান্ত
হবে পড়বে। বৈ চৈ আর ভালো লাগবে না। শহরের
জন্ত আবার মন কেমন করবে। শহরের নাগপাশ বড়
জীবন বীচন। আমায়ের দেশের ছেলেবেলারের ছুটির
সমস্তটা কিন্তু অজ্ঞ কান দিই।' রত্নার গলার আওয়াজ
গঞ্জীর হয়ে উঠলো।

লুন পে নড়ে চড়ে ঠিক হয়ে বসলো। সাগরের
ওপারের ছেলেবেলার কি তাবে কাটার মূল কলমেজের
ছুটি, শোনাই যাক।

'এই সমস্তটা প্রত্যেকটি ছেলে আর মেয়েকে গাঁয়ে
কিরে গিরে অগ্রস্ত: পাঁচজন নিরক্ষরকে লেখাপড়া
শেখাতে হয়।'

লুন পে এবার রত্নার দিকে কিরে চাইলো, 'লাভ
তাতে? বিদেশী শিক্ষা, বিদেশী সংস্কৃতি গাঁয়ের লোক-
দের তেতরে চুকিরে লাভ কি?'

রত্নার চোখদুটো ককক করে উঠলো। খুব অল্প-
কণের অজ্ঞ। তারপরই শব্দ গলার বললো, 'না লুন পে
বিদেশী শিক্ষা নয় নিজেদের দেশের ভাষা শেখাতে হয়।
মুদতাতার মত বলতে হয় কানে কানে—অনেক বছরের
গঞ্জীর খুন। ভোমাদের চেহেও আমাদের দেশের অমত
আরো মারাত্মক। বেশীর ভাগ লোকই অশিক্ষিত। জ্ঞান
কই দারিত্র্যের মতন অশিক্ষিত নিজেদের অগ্রগত অধি-
কার বশে যেনে নিজেতে, অমত তেবে বেধো দেশের
এই সব লোক লোক অজ্ঞাত লোক যদি সভ্যতারের শিক্ষা
পায়, তাহলে এদের মধ্যে কাজ করারও আমাদের কত
সুবিধা হয়। পা বরে নাড়া দিলেও এদের খুন তাতে না
তাই, এর চেয়ে ছুখের কথা আর কি বলবো?'

'ওখের কথা আর কি বলছেন? দেশের শিক্ষিত
লোকের খুনই বা ডাকছে কই। আপনাদের দেশের
কথা জানি না, আমাদের দেশের লোকের খুন দেখে
মনে হয় যেন বরকিরা গিরে তাদের খুন পাড়িরে
রাখা হয়েচে।'

'কিছুটা তাই, কিছুটা আবার কপট নিস্ত্র। এ নিস্ত্র
ভাড়াবার ওখু অমত আলাবা?'

ফট মার্কেটের সাহনে যেটির ধামতে লুন পে দরজা
খুলে নেমে পড়লো। রত্না নামলো পিছনে পিছনে।

'কি কিনবে তুমি' রত্না ঠাড়িরে পড়ে পাখের চটিটা
ঠিক করতে করতে জিজ্ঞাসা করলো।'

'এই ছুটোকা চাটকা জিনিষ। বাবার জন্ত ফুট এক

বাক্স, এজির কাগজ এক টুকরো আর এমিক ডমিক
হু একটা জিনিষ। আপনি কি কিনবেন ?'

'আমি' রক্তা দুখ টিপে হাসলো, 'আমি বিশেষ কিছু
কিনবো না। তোমার কেনা হ'লে ব্যাক্স তারপর আমার
কেনা সস্তা হবে।'

চুট, এজির কাগজ, বেতের ছড়ি, কখনো লখ কেনা
শের ক'রে লুন পে কিরে গাড়াগো, 'ওই দিকটার চুন
একটু। কতকগুলো কানের পাখর কিনবো।'

'কানের পাখর কার গজ ?'

'মা শিনের গজ' লুন পের দুখ থেকে নামটা ছিটকে
বেগিয়ে গেলো।

'মা শিন ? মা শিন কে, তোমার বোন ?'

ঠোট কাহড়ে লুন পে কিছুক্ষণ চুপ করে গাড়াগো।
কি ভাবলো মনে মনে, তারপর বললো, 'মা বোন নয়,
আমার বোন নেই। মা শিন আমার পরিচিত মেয়ে—
পাশাপাশি থাকি।'

রক্তা দুখ টিপে হাসলো, 'সর্বনাশ। পরিচিত মেয়ে
আমার পাশাপাশি থাকো ? বাত্বী নয় তো ? মেয়েটাকে
তারি বেগতে ইচ্ছা হচ্ছে কি ?'

রক্তা লুন পের দিকে চেয়ে রইলো। 'তা কি সম্ভব।
দেখা হ'তে পারে কখনো রক্তা বোশ আর মা শিনের !
রক্তার বুকের আগুনের হোঁচকার স্তোভে লাগ হ'লে উঠতে
পারে আরাধ্যানের নিকন্তে পাড় বেগেটি। সোদে-
বিনের গাছপালা নদী জল ছাড়িয়ে ভাঙতে পারে
বিরাটভর কিছু। দেশের যথাকে উপলব্ধি করতে
পারে নিষের ভবশিঙের সারিয়ে।

'দেশবাস মতন যেতে নয়। এমন এ দেশের হাজার
হাজার মেয়ের মতন, নিষের বাতী আর নিষের মাছবেই
সম্ভট। যা চোখের সাধনে নেই, তার অভিশপ্ত করনা
করতে পারে না। দেশের বাটিতে জুই বাটিই খুঁজে পার
দেশকে দেখতে পার না।'

'কিন্তু এইসব মেয়ে কিরে গাড়াগো কি ভীষণ হয়,
তা জুই ভাঙতে পারবে না তাই। আমি জানি, নিরীহ

একতির মেয়ে, খাবী সংসার সব কেসে এই দুর্গীর মধ্যে
কাঁপিয়ে পড়েতে, বাত্বীস চেরেও তারা জুইস, বুক
কোমলরুতিগুলো নিষের হাতে উপড়ে কেলছে।'

লুন পে লাগ ছোটো পাখর কিনলো। রক্তাই বেছে
গিলো নিষের হাতে। হেসে বললো, 'কর্না মেয়ে তো ?
রক্তা গালের পাশে লাগ পাখরই ভালো মানাবে
কি বলো ?'

লুন পে লম্বিত হয়ে পড়লো, 'কি আমি অত শত
জানি না। বা হয় একটা নিয়ে গেলেই হবে।'

'তা ছাড়া রক্তার হটাই আমার বেনী পছন্দ' বোকান
থেকে সরে আসবার হুখে রক্তা বললো।

ছলনে রক্তার এগে গাড়াগো।

'এখনই ছোট্টেলে কিভাবে মা কি ?' রক্তা বোটের হুট
বোর্ডে একটা পাড়লে দিয়ে লুন পের দিকে চাইলো।

'না, তাড়া নেই কোন।'

'তবে চলো নদীর ধারটা একটু ঘুরে আসি। আমার
কতদিন পরে দেখা হবে টিক আছে, আদৌ দেখাই হবে
কিনা তাই বা কে জানে।' রক্তার নিষেজ গলার বর।

'আপনি এখন তো থাকলেই পারেন কিছুদিন। সাত
তাড়াভাড়া বাবারই বা কি ধরকার। আপনি যদি
থাকেন তো আমিও না হয় সোয়েমিন বাগড়া গিছিরে
দেখা কিছুদিনের গজ।'

ঘুর তা কি হয়।' রক্তা লুন পের কাঁধে আসতো হাত
ঠেকালো, 'তোমাকে আটকে রেখে তোমার বা শিনের
অভিশাপ ফুড়েই আমি বসে বসে তার গাল মধু বাই'
রক্তার গলার আগুয়ান খাদে নাহলো, 'উপায় নেই তাই
বেতেই হবে, হুসু এসে গেছে।'

কটগোমারী ষ্ট্রিট দিয়ে ডান দিকে ঘুরে বোটের পার্ক
ষ্ট্রিটে ঢুকলো। বা দিকে সেন্ট পল্লুর গীর্জা। কিছু
পরেই সেক্রেটারিয়েট। ভীড় কাটিয়ে বোটের সোফা
চললো। লুন পের মনে হলো যিন ঘুরেই পরেই এই
পথেই তাকে কিরে বেতে হবে। এই কণার পাশাপাশি
আবো একটা কথা মনে পড়লো। কিছুদিন পরে রক্তা

বোসও এই পথেই ফিরে যাবে। আশ্চর্য, ওর আর রক্তার একই পথ না কি যাবার ?' যাবার পথ হয়ত এক, কিন্তু লক্ষ্য এক নয়। ও ফিরে যাবে গ্রাম্যবাসের শান্ত পরিবেশে আর রক্তার ধূরন্ত জীবনের মুকুট হতে তপু।

দুখনে বেনে একেবারে জেটির ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। অনেকগুলো শাম্পানের তীড়। ইরাবতী জেলায় কোম্পানীর ছুটো ট্রাম্বা ফিরাচ্ছে। হাতিবার দেহী আছে বোধ হয়। ছোট ছোট ঘোলাটে রংয়ের চেট হাঁড়ের ধারে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে পড়ছে। ওপাশের জেটিতে একাঙ একটা টানে আছাছা বাড়িয়ে। বালিফ্য করতে এসেছে এদেশের বন্ধুরা। এমন কত দেশ বিদেশের বন্ধুরা নোঙর ফেলে নিষেধ সেনের জিনিষ বিলিয়ে ফেড়ার পরিবর্তে হয়ত বেশ বিদেশের বাড়তি জিনিষ নিষেধ সেনের আছাছার খোলে ততি করে নিয়ে যায়। যাবীন দেশ। ওদের ইচ্ছাই আসা।

'শাম্পানে চড়তে ওর করে না কি ?' রক্তার গলায় আঙুরায়ে মুন পের চমক ভাঙলো।

'হাসালেন' সত্যিই মুন পে খুব জোরে ছেলে উঠলো 'এ আর কি চেট। লম্বাতির চেটরের ওপর নিজে শাম্পান নিয়ে বেড়াতে যিনের পর দিন। সে এমন ঘোলাটে জল নয়, ঘন নীল জল আর কি গর্জন। জলে আবার ভর নেই।

'গর্জনে যখন ভর পাও না তখন 'হলেও তোমার ভর নেই' মুন পের কথার মাঝখানেই রক্তা হাত নেড়ে একটা শাম্পানের বালিকাকে ডাকলো।

কাল্য মাঝি। ঘুমে ছুটলো বাড়ি। ছেড়া লুংগো প্যাগডীর বরাশে মাথার জড়ানো। ইংগিত মাঝেই কোড়া দাঁড়ের ধারে অল কেটে কেটে জেটির ধার বেলে শাম্পান নিয়ে আসলো।

'কতদূর যাবেন ? তালা ?'

'না' রক্তা এ পাশের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে 'বললো, 'পার হবো না বাক নদীতে একটু ঘুরবো শুধু।'

'ওঃ, বিকেলের হাওয়া যাবেন। আছেন আছেন' দুজো মাঝি আড়চোখে মুন পেতে বেধে নিলো।

রক্তার শিছন শিছন মুন পে শাম্পানে গিয়ে উঠলো। হাত বরাবর গিয়ে মুন পের লোভ হ'লো। অনেকদিন বৈঠা ছোঁষ মি। হাত ছুঁটা নিগণিস করত লাগলো। মাঝির বস্ত গিয়ে ধরলে হয় বৈঠা। 'বৈঠা হাত না তাই একটু, ঢালাবার চেষ্টা করি' মুন পে মাঝির হিকে ফিরে বললো।

মাঝির কোশের ঠাঁক দিয়ে মাঝির মাথা দাঁড়ের পার বেধা গেলো, 'কুলালেন আপনি। বৈঠা অমনি ধরলেই হ'লো। একি আপনাদের সাইকেল ঢালানো, পা ঘোরালেই চাকা ঘুরবে। চেটরের মাথার ওপর দিয়ে বেড়ানো লম্বক কথা! তারপর শালা এই টাম্বারের গাড়ার ঠেলার চোখে অচকার বেধেবন। তার চেয়ে বান, আপনি ওর পাশে গিয়ে বসুন। বিকেলের সুরসুরে হাওয়ায় বোসে গর করুন দুখনে।'

শিছন থেকে রক্তা ব'লে উঠলো, 'চট্ট ক'রে নিজের দাঁড় কি সের কেট কাউকে ? এ বিষয়ে লবাই নহান। কেড়ে নিতে হয় কিংবা তুলিয়ে নিতে হয়।'

মুন পে মাঝির পা বেলে বসলো, 'তোমার ভর নেই তাই, শাম্পান ঢালানো আমার খুব অভ্যাস আছে। তা ছাড়া ভয়ের কি আছে, তুমি তো রইলে পাশে। দরকার হ'লে শক্ত হাতে বিপর ঠেকাতে পারবে না ?'

মাঝি বোধ হয় শুনাই হ'লো। এক গল ঘেসে বললো, 'আপনাদের যখন পথ চেপেছে, তখন কি আর ছাড়বেন। নিরু বাপু, কোড়া দাঁড়, লাবধান ধরবেন।'

মুন পে দাঁড়ে গিয়ে বসলো। প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা, সামান্য আড়ষ্টতা, তারপর সমস্ত জড়তা কাটিয়ে উঠলো। শাম্পান একটুও ছুললো না, হেললে: না এদিক ওদিক, দিগ্বিদ্য সোঝা নদীর মাঝ বরাবর চলতে মুক করলো।

'আপনার হাত তো ভালোই, দিনদুয়েক আমার কাছে থাকলে ঠিক হ'রে যাবে' মাঝিকের মুন পের স্তুতির স্বীকার করতে হ'লো।

‘গাড়ি আর হাল ছুটো বরাই তোমার কাছ থেকে ভালো ক’বে শিবে নেবো। ভালো ক’বে যাবে তো। শিথিরে, তুফানে যাতে পাড়ি বিতে পারি, মার দরতার যাতে শাস্তান না বানচাল হ’বে বার।’

‘এই তো তুফানের সময় আসছে। কাঁড়ির মুখে শাস্তান নেওয়াই দুরুর। খুব জোর তুফানের সময় আসছে।’

সুন পে আড়াচোখে রক্তার দিকে চেয়ে দেখলো। শাস্তানের পাটান্ডানে ছেলান দিগে রক্তা ওপারের গাছ-পালার দিকে চেয়ে রয়েছে। হাছ ছুটো মাথার নিচে আড়াআড়ি রাখা। বিকেলের শান্ত আলোর অপভ্রম দেখালো শ্যামাংগী মেরেটির মুখ।

‘কি ভাবছেন? আমায়ের কথা কিছু শুনছেন না বুঝি?’ সুন পে অভিযোগ করলো।

রক্তা কিংবা চাইলো, ‘শুনছি তাই, তোমাদের কথা শুনেই একটু আনমনা হ’রে পড়েছিলেন। সত্যি, খুব জোর তুফানের সময় আসছে। কাঁড়ির মুখে বারা শাস্তান নিয়ে এগোবে, তাদের কথা ভাবছি।’

হঠাৎ শাস্তানটা ছলে উঠলো। সুন পের হাত ছুটো ভীষণ কাঁপছে। দূর দিগে একটা দীমার চলেছে, তারই ছেউ এসে লাগলো শাস্তানের গারে। শাস্তান উলমল ক’রে উঠলো। ‘তোমার গাড়ি জুনি বরো তাই, আমার বারা হ’বে না।’ সুন পে গাড়ি ছেড়ে দিগে রক্তার কাছে গিয়ে বসলো।

‘আর আপনার ভয় নেই। কাঁচা মাঝি সরে দিগে পাকা মাঝি শক্ত হাতে গাড়ি ধরেছে, শাস্তান ছুলাবে না।’

রক্তা হেসে ফেললো, ‘না তাই, শুর চেয়ে তোমার ওপর আত্মাই আমার বেশী। এদেশের শাস্তানের গাড়ি এদেশের ছেলের হাতে থাকাই তো ভালো। শাস্তান একটু হুঙ্ক না, হু একটা কৌটা হল চলকে শাস্তানের তেতর চুকলোই বা, মাঝি লক্ষ্য হারাবে না। ছল ক’রে চোরাখালির চরে শাস্তান নিয়ে বাবার চৌটা করবে না।’

‘এ দেশের ছেলেরা কোনদিন গাড়ি ধরবে ব’লে মনে

হয় আপনার?’ সুন পে সোজানুজি এর করে ফেললো।

‘ধরবে বৈ কি তাই, নিশ্চয় ধরবে।’ রক্তার চোখ ভালের দিকে।

‘আমার কিছ তঃ মনে হয় না। এ দেশের ছেলেরের এদিকে চিন্তাও নেই। এই তো এতদিন কাটানাম ঢেলেয়ের সংগে, সিনেময়া, সার্কাস আর পোয়ে নার অবধি এদের জীবনের পরিধি। এর বাইরের অগতের সংগে এদের কোন পরিচয়ই নেই।’

‘বাহুবল লকলের হাতে থাকে না তাই। গোটা ভগন্তের মধ্যে দুজন কি এক জন সেই বাহুবল হাতে নিয়ে ভগ্নার। যুযুত বাহুবলের কাণে সজীবনী সর উজারণ করে, গেছে বাহু মগ্নের স্পর্শ বুদিরে, অর্ধভূত অগন্তের মধ্যে চেতনা আসে। ইতিহাসের পাতায় পাতায় এই দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তোমাদের অগন্তের মধ্যে যেখানে এমন একটা বাহুবলের আবির্ভাবের অপেক্ষাতেই রয়েছে তাই।’

ও শারের গাভপালার শিঙনে সূর্য অস্ত গেলো। পন্ডিরের আকাশ লাল, জরম আর লীত রংয়ের ছোপ। মিল কারখানার টিমনিগুলোতেও রঙের স্পর্শ। গাড়ের মুখ আর চেউয়ের চুড়োর লক্ষ সূর্যের দীপ্তি। বিরাট সোয়েভাগান প্যাগোডার অর্ধাভ দীর্ঘ অন্ধকারে স্তম্ভল ক’রে উঠলো। এতো আলো আর বর্ণের মাঝখানে লুকানো অগন্তের অন্ধকার মিনগুলোয় অবলান বার্তা ঘোষণা করতে মহানবনের আবির্ভাবের অপেক্ষার মূলেতলে একটা ধমধমে নিশ্চলতা। আগামী দিনের অলঙ্কার দিনের প্রতিচ্ছবি বুঝি পড়েছে এ দেশের মাটিতে আর জলে।

‘শাস্তান ফেরাত’ অন্ধকারে রক্তার গলা গেলো।

‘আপনার সংগে আবার কবে দেখা হ’বে?’

‘আগেই বলেছি তাই, দেখা বেগুনার মালিক আদি নেই। যদি কোনদিন এদেশে আসি, নিশ্চয় দেখা করবে।’

অবশ্য জুনি যদি বললে না বাও।’

‘আমি বললে যাবো একথা কেন বললেন?’ লুন পে রত্নার দিকে ঘেঁষে বললো।

‘মাহুদই তো বলায় তাই।’ বলা যায়, হরত স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে থাকিতে জুনি গৃহীর জীবন বাপন করছে, সেই স্বচ্ছ পরিবেশের মধ্যে উদ্ভার মতন আমার প্রবেশ একটু নাটকীয়ই হবে।’

লুন পের মুকটা মোড়ক দিয়ে উঠলো। আনন্দে খড়কায়ে ঢুঁ রত্না বোসের নিকব দ্বিটি চোখ জলজল করছে। ঢেউয়ের আছড়ানি আর বাতাসের ঝোঁপানী। এ দেশের নিকব, আশ্রয় কাছাকাছি, মুক্তি চাই, মুক্তি চাই।

‘বিশ্বাস করুন, আপনাকে ছুঁয়ে শপথ করছি—’ লুনপে একটা হাত রত্নার হাটুয় ওপর রাখলো।

‘ছি তাই!’ রত্না বোস আছে হাটু সুরিয়ে নিলো, ‘আমি তো তোমার মতনই মজির মাছ। আমার হুঁয়ে শপথ করবে কেন তাই। ওই দেখো।’ আজুল দিয়ে রত্না গোয়েতাগন প্যাগোভার কলমলে সুকুটের দিকে দেখালো।

‘আমি করার দিকে চেয়েই বলছি, এ দেশের মুক্তি সংগ্রামে সব ছেড়ে আমি কাঁপিয়ে পড়বো। এর জন্য আমার জীবন পণ।’

‘কেউতে এসে গেছি। নায়া বাক এবার।’ শব্দ নিঃশব্দে রত্নার গলার আওরাজ। লুন পের কাঁখে ডর দিয়ে সাবধানে খেঁচির শিঁকিতে লাফিয়ে পড়লো।

আহাজে উঠে কখাটা প্রথম লুন পের মনে হ’লো।

সেদিনের উজ্জ্বলের আভিষেবা হরত মনে মনে রত্না হেনেই ছিলো। কিন্তু বাই মনে ককক রত্না, সেদিনের আবেশে এক বিস্ম তেজাল ছিলো না হরত প্রকাশের তাবা একটু নাটকীয় হ’য়ে গিয়ে থাকবে, কিন্তু গোহুদির আশ্রয় আলোর কশ্মলান শাস্ত্রানের উপর ব’লে লুন পে খুবই বিচলিত হ’তে পড়েছিলো। নিজের কুকুর মধ্যে গতি্যই অহতব করেছিলো যেন বিরাট একটা দৈত্য বাঘন হেঁড়ার অজ আকুলি বিকুলি করছে। বাইরে

আসতে চার নিম্নেই মুক্ত ক’রে সকলের সামনে এসে ঠাড়াতে চায়।

আহাজে ভাঙার সংশয় সংশয় রেলিংয়ের দ্বার খেঁকে লুন পে নয়ে এসে খেঁকের চোয়ালে বসে পড়লো। ভেতরটা তাবে রোদ এসে পড়লো কেঁকের ওপরে। ম্যাগাজিন-গুলো কোলের ওপর রেখে লুন পে চুপ চাপ বসে রইলো। কলম ম্যাগাজিন এখনও বেয়েযনি। কলম বদ্ধ হ’বার আগেই বেয়েযার কথা ছিলো। বেয়েলো বেশ হ’তো, ম্যাগাজিনটা হাতে ব’রে নিয়ে বাঙলা যেতো গোয়েতিনে। উতান টিন খুদীই হ’তেন।

যথি পথেই ভাঙার সংশয়ই লুন পে কেবিনে গিয়ে চুকলো। চাহনিকে কেবল আল আর জল। ভাঙার চিহ্ন নেই। ভারি একঘেয়ে লাগে। ভার চেয়ে এই সময়টা বিভ্রান্তির গড়িয়ে নেওয়াই ভালো।

পথের মিন ভোর বেলা লুন পে বিজানা হেড়ে উঠে ডেকে গিয়ে ঠাড়ালো। খুব আশ্রয় কালো মেবার মতন মেবা গেলো আরাকানের ঘাটি। রামহি আর বেদুবা বীপের গাছপালা কোণ বাড়লো। মেবার পুঞ্জের মতন মনে হ’লো। আর দণ্ডা পানেকের মধ্যেই ভাঙাজ কেউতে ভিড়বে।

ইজিবের হুঁ হুঁ শব্দ। দাড়ীর বাততা। মোট-ঘাট বাবা ছাদির ধূপ গাপ আওরাজ। আকিয়ার বন্ধর আশ্রয় হ’য়ে উঠতে লাগলো।

লুন পে একটুই কেঁটির দিকে চেয়ে রইলো। একদূর থেকে নজর গেলো না, তবে খুব বেশী লোকের জীড় নেই। সেইন মত নিম্নর আসবে কেউতে।

আহাজে একটু এগোতেই সব আশ্রয় হ’য়ে এসে। একেবারে কোন ঘেঁষে জীড়ের থেকে আলাদা হ’তে মেইন মত বাড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু ঠিক তার শিঙনে রত্না নিম্নের গাড়বার্ডে জড়ানো, মেবার শিঙের ছড়ি হাতে ঠাড়ানো মোকটিকে দেখেই লুন পে আশ্রয় হ’য়ে গেলো। একি উতান টিন নিম্নে এসেছেন আকিয়ারে? সোয়েতিন হেড়ে হেলেকে নিয়ে বেতে একদূর জিদি

আলোক, লুন পে এটা করনাও করতে পারেনি।

কেহিত ভাড়া লাগতেই লুন পে পকেট থেকে কলম বের করে লাভে লাগলো। উচান টিন সেইন বস্তের দিকে কিয়ে কি বললেন, সংগে সংগে সেইন মস্ত হাতের মধ্যে ধরা খবরের কাগজটা সবগে লাভে লুক করলো। কোলানো সিঁড়ি বেয়ে নেমে, মোটরটি বাথার ফ্লির পিছন পিছন লুন পে কেহিতে নামলো।

'সাতার কোন কই হু নি?' কই কাপটার সমর আলুবিবে হরনি তো কিছু?' সেইন মস্ত এগিরে এলে লুন পের কাঁধে হাত রাখলো।

'না মস্ত্রের অবস্থা শাকই ছিলো।' লুন পে সেইন বস্তের কথার উত্তর দিলেও একপুটে উচান টিনের দিকে চেয়ে রইলো। হুঁটিয়ে হুঁটিয়ে দেখলো আপায়মস্তক। চোখের কোণের মাংসগুলো কুঁচকে গেছে, কপালের গুণের বসিরেখাগুলো আরো পড়ায়। বার হ' সাত বাসের ব্যবধান, এর মধ্যেই কেনন বুড়োটে হ'য়ে গেছেন।

'টিন ভাঙের হুন জমির এলাকা নিয়ে জরি খুঁজিলে পড়ে গেছি', উচান টিন ভাড়াভের কানেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'এক তরলোক বানের কল বসাজেন আমার জরি খেঁসে। ব্যাপার দেখে বনে হ'চ্ছে হাত ভিন চার জরি বেমান্ন বেড়া বিয়ে নেবার মতলব ক'রেছেন, তাই গ্রান নিয়ে উকীল বাড়ী এসেছিলাম। আজ তোমারও আগার কথা, তাই ভাবলাম কেটিটাও যুয়ে বাই একবার।'

লুন পে হুপ টিপে হেসে কেলো। প্রবাসী ছেলে বের কিয়ে আসছে সেজ্ঞ বেন যোটেই উৎকর্ষা নেই উচান টিনের, কেবল শুই হাত ভিন চার জমির ব্যাপারে ব্যতিব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। উকীলবাড়ী বাথার মুখে বুকী ছোটার মতন ক'রে ছেলেকে একবার দেখে বাওখা। আর কিছু নয়।

উচান টিন বললানি নি।

ভিনজনে পাশাপাশি হেঁটে বাইরে চলে এলো।

'ভাঙ্লে ভোমরা বাও,' উচান টিন বেবে পড়লেন, 'আরি উকীল বাড়ী নেরে বিকেলের দিকে বাও।'

সোবরিন গাঁবে চোখার মুখে স্বব্ব ক'রে বুকী নামলো। বর্ষার মৌসুমী বুকী অনেক আগে থেকেই আকাশে কালো বেখে বন বন করছিল। একটু বাতাস নেই। গাছের পাতাগুলোও স্থির। গাছোয়ান ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। গাড়ী থামিয়ে নিজে বাণের টোকা বাথার দি়ে গাড়ীর পিছন দিকের আবরণ নামিয়ে দিলো।

লুন পে ছইয়ের কাঁকে চোখ রেখে দেখতে লাগলো। বড় বড় কৌটা ছইয়ের কাঁক দিয়ে জীরের কলার মত গারে এগে বিগতে লাগলো। লুন পের জ্ঞপেন নেই। আতাকান ইমসা দেখে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। পথের দুপাশে বোলা জলের স্রোত। মাকে মাকে গাছের নিচু ডালগুলো সবগে আছড়ে পড়ছে গাড়ীর ছইয়ের গুপার। বস বস লব। হেঁচট খেতে খেতে গাড়ী এগিয়ে চললো।

বাহার তলার কাজ বরাবর আসতে বুকী একটু বের আসলো। নাবালা জমি বেয়ে গাড়ী কটক পার হ'য়ে ঐঠানের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো। হুঁতিন জন চাকর ছাড়া হাতে এগিয়ে আসলো। লুন পে লতগুণে কাল। বাঁচিয়ে ছাতার তলার গিয়ে দাঁড়ালো।

বরের চাতালে গিয়ে উঠতেই ত বিন বুকী লুন পেকে হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরলো, 'দেখি, দেখি, আমার লুন পের নহরে থেকে কেনন চোখা হ'য়েছে?'

বুকী লুন পেকে কৌচকানো চোখের সামনে টেনে এনে বীজ বুকীতে দেখতে লাগলো। মাংস কুলে পড়া ছুটো হাত দিয়ে গুণ কপাল, গাম, নাক, মুখ সমস্ত টিপে টিপে দেখে চোঁচিয়ে উঠলো, 'আহা হা, কি শরীর হ'য়েছে বাজা তোমার! একবারে অর্ধেক হ'য়ে কিয়েতো। ক্যাকালে হ'য়ে গেছে গারের হং, গলার কঁটা বেরিয়েছে পেট ভরে ভাড়া খেতে বের না মাকি?'

লুন পে হেসে নিষেধে চাঁড়িয়ে দিলো,

কাহিরে যেনেছিলো ভাই-তো। ভুলি কবার আগে লগেই
শালিরে এলাব তোবার কাছে । এখন অন্ধতঃ মাল দুই
তোবার কাছে থেকে শরীরটা ঠিক ক'রে নেবো ।'

ও দিন খুব খুশী হ'য়ে উঠলো, আর তোমার লেখানে
সিরে কাজ নেই । মাহুদের শরীরইতো সব । সেই
শরীরের ফাইলি না হ'লো, তবে ফলকান সেই আবার
লেখাপড়ার ।' বুড়ী কিছু কিছু করতে করতে খবর
যেহা চুক পড়লো ।

দুপুরে সিরে আবার জোর কুঠি লামলো । যখন
কুঠির ভেতর, তখনই হাওড়ার জোর । লামনের বাসিন
গাছটা মুঠোপুঠি খেতে লাগলো ।' মনে হ'লো ভালপালা
গুলো ভেঙে ছিটকে পড়বে চারদিকে । জানালা খোলার
যো নেই । কুঠির ছাটে সব জিনে বাবে । লুন পে
কড়কড়ি ঠাক করে বেখতে লাগলো ।

শিহনে খুট করে আঙুরান হতেই লুন পে খুব ফিরিরে
বেখলো, ও দিন বুড়ী এসে চুপছে । গারে তারি একটা
'পাওয়া' জড়ানো । বুড়ীর শরীর সত্যিই খুব ভেঙে
গিয়েছে । মুখের নীল শিরাতুলো স্পষ্ট হবে উঠেছে ।
আবছা অন্ধকারেও দেখা গেলো চোয়ালে ঠেলে ওঠা
শক্ত হাড় দুটো । দুপালার মাংস কুটকে লুপে
পড়েছে ।

'কি বিস্তি বিস্তি গো, তোমাদের যেনে' লুন পে চেয়ার
ফিরিরে নিরে বসলো ।

'অনুগ্রহে বিস্তি । আজ তিন দিন আর সেবেছে ।
মাকে মাকে একটু খর, অন্ধকারেই বসে বসে ক'রে
আবার লুক হয় । কাদার মলে হাঁটাঘাটি করাই দায়'
ও দিন নিচু টুলে ব'লে হাঁপাতে লাগলো ;

'গায়ের কি খবর বলো । বাবার শরীরও বেন ভালো
ঠেকলো না ?'

'ভালো ঠেকবে কি ক'রে ? দিনরাত কাজ আর
কাজ । দুই চলে বাবার পর থেকে বেন কাছের হিড়িক
কেড়েছে । সমরে নাওয়া নেই, পাওয়া নেই, মাহুদের
শরীর থাকবে কি করে ?'

মদের হাট আছছ । লুন পে কড়কড়ি বসে ক'রে
দিলো । বেশ অন্ধকার । শিহনের শরীরে মিরে বা
শ্যামল-একটু আলো আলজে ।

লুন পে চেয়ার টেনে নিরে ও মিরের আড়ো কাজ
বেগে বসলো, 'গায়ের আর লম্বাই কে কেমন আছে
বলো ? হাটের গায়ের চোরে মত্তা কেমন আছে ?
ওই যে লম্বাও আছে মারে মারে ঠাকা ধার চাইতে
আলতো ?'

'ওটা চলে গেছে এখন থেকে । কোথার কাঠের
মিরে বুড়ি চোরে মত্তের চাকরি হয়েছে । ওটা লেখানেই
উঠে গেছে । আলখ গেছে বাপু, বেবনি কল, তেমন
বউ । লেশা ক'রে এসে দিন নেই রাত নেই কি
চুলাচুলি । পেটে ভাত কোটে না, লেশার খরচা
ঠিক হয়ে যায় । আর মত্তা নাশিন কি আবার কাছে ।
লকালে বর আসছেন, তো বিকেলে বো—'

লুন পে ও দিনকে তাকাতাড়ি বামিরে দিলো ।
একবার লুক হ'লে আর বসে আছে । বউা বানেক
বরে বকবকানি চলবে ।

'বুড়ীর খবর কি ? আসে টালে তোমার কাছে ?

'কোন বুড়ী ? ও দিন চোব দুটো কুটকে চেয়ে
রইলো ।

'বুড়ী মানে—' লুন পে জিত বিরে ঠেঠেটা চেটে নিলো
একবার, গলাটা গরুর ক'রে নিজে বসলো, 'ওই বা
শিহনের কা-আবাকি ?'

'ওঃ বা শিহনের বা, দিন কয়েক বেন দেখিনি তাকে ।
বা শিহনকে সেদিন হাটে দেখলাম । দিখি লুকবী
হ'লেছে । সোয়েবিন গারে খবর মেয়ে আর নেই ।'
ও দিন উঠে পড়লো, 'চলি, এ বিস্তি বাসবার নয় । শহর
থেকে চান টিন যে কখন ফিরবে ঠিক আছে । এ
বাসলার খবরই কই হবে আসতে । দুই একটু গুয়ে নেনা
লুন পে । শরীরের গণর দিরে এই বকল গেছে ।'

'হ্যাঁ গুই, লুনপে দাঁড়িয়ে উঠলো তারপর ও দিন

চৌকাঠ পাথ হ'তেই বদলা বন্ধ করে চেঁচাবে এলে বসলো। হট্টকেশ স্থল বা শিনের জন্ত কেনা লাগ কাপের পাথর ছুটো বের করলো। ঠিকই বলেছিলো।

রক্তা বোস। হজের মত রং। অন্ধকার ঘরে যেন আরও গাঢ় লাগ দেখালো। কসাঁ গালের পাশে ভালোই দেখাবে। নিষেধ হাতে বা শিনের কাশে পরিচয় দেবার সময় ওর ছুটো লাগ পাথরের হংরের চেয়েও আরো নিবিড় লাগ হ'য়ে উঠবে, সমস্ত রক্ত এসে জমা হবে বা শিনের ছুটি গালে।

পাথর ছুটো গোল টেবিলের ওপর রেখে লুন পে হাতড়ে লক্ষণে একটা প্যাকেট বের করলো। বা শিনের জন্ত এনেছে। নীল রংয়ের চিঠির কাগজ আর সেই হংরের বাঘের গোছা। কাগজের কোণের দিকে সোণালী খাঁচড়ে নিশাখী ফুল খাঁকা। চিক চিক ক'রে উঠলো ফুলের পাপড়িগুলো। এই কাগজে আর এই বাঘে বা শিন ত্যাকে চিঠি লিখবে অশ্বিন হস্তার একখানা করে, হস্তার একখানা না পেলে ওঠে, মালো ছুখানা।

করে তো মিছর। আরাকান ইরমার পাথর ছুঁইরে লুনপে বা শিনকে লগথ করিরে নেবে। কোন ওজর আপত্তি শুনবে না।

খুব জোরে বাজের আঙঠকে। লুন পের মনে হ'লো। জ্ঞানলাগ পাল্লাতলো বর বর ক'রে কেঁপে উঠলো। শারা সোয়েবিন পাঁ তির খেয়ে কেটে গেলো। খড়খড়ি ক'কে ক'রে লুন পে চেয়ে বেরলো। হুলসবারার কুটি নেবেছে। হু হাত হুয়ের গাছপালাও নজরে পড়লো না। কুটির কণাগুলো লুন পের মুখে চোখে এসে লাগলো। একটা ঠাণ্ডা স্পর্শ। নরম তুলতুলে হাত দিয়ে কে যেন শারা খীবনের ক্লাস্তি মুছে দিলো। কুটির কৌটার সংগে মাটির সৌধা গড়। বারাম্বার রেলিংয়ের ওপর ছাদ থেকে গড়িয়ে আসা। জলের কৌটার টুপটাপ শব্দ। সাধনের উঠানে অনেকখানি জল কবেছে। কতকণ একটানা কুটি চলবে কে জানে। বিছাভের কিলিক দিতেই লুন পে খড়খড়ি বন্ধ ক'রে ঘরের মধ্যে সরে এলো।

(ক্রমঃ)



নীলপদ্মের পক্ষ

চিত্তব্রজের ভট্টাচার্য্য

আলোর আলোর গলে পড়ছে আকাশ। ক্রমে
পড়ীর হয়ে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে সুখিণী।
আলোর খড় উঠছে, পথেরদূর কুহাশ। ধোনা এক নরম
নীলাভ আলো। অন্ধের আগের নিজেকে খুঁজে পাওয়া
যাচ্ছে না। হাত যেন হাত নয়, আঙুল দিয়ে টিপে টের
পাওয়া যাচ্ছে না। নিশ্চয় পরীক্ষা, হন যেন বন নয়, চেনা
যাচ্ছে না, হৃদয় হৃদয় নয়, উপলব্ধি হচ্ছে না নিজের
বিশেষে। উড়ে চলছে, তেলে চলছে যেন। গানের
নীচে ঠাণ্ডা মিষ্টি মাটির হোঁচকা লাগছে না।
একটা অদ্ভুত গন্ধ তেলে আসছে, কোনো শেষ হাত
যে গন্ধ তাকে নি। যে গন্ধে ঘোষ আসে বৃষ্টি সূত্র।
উপরে, কত উপরে আলোর দাপ্তর মগ্ন করে একটি বহু
বিন্দু। ক্রমে বিন্দুটি বড় হলো, ছুটলো। জ্যোতির্বিদ্র সাহি
মঞ্চল বরাহত প্রদাহিনী, দ্বিত্বাঙ্গি নিয়ে কে, কে
আলচেন মহিমময় দক্ষিণ ছত্তের বহি বর্ণণ, আনীর্বাণ
গভীর কে নেমে আসছেন।

শাখাধিন জল পটি বিরহে মিনতি বিস্তর কপালে।
এখন জ্বরে রাগ কর। যুকে কপালে হাত দিয়ে দেখল
মিনতি। রূপের দিকে জ্বর বেশী ছিলো। অন্ন একটু
হুঁব খেয়ে লবটা বসি করে বিরহে বিস্ত। তারপর থেকে
চোখ বন্ধ করে আছে। এখন চোখ মেলে চাইছে
একটু একটু। একটু লম্বা বেগুনা নরকার।

রান্না ঘরে দুকলে কি বেজার বন্ধকার আর ঠাণ্ডা।
সিনেট উঠা নেকট; সব সময় ভিজে জিহ্বে। কিন্তু
উগ্রনের পাশে বন্ধক করে জলে উঠলো কী ছুটে চোখের
মতন। হ্যাঁ, চোখই ত। ছুটে বেরিয়ে এলো মিনতি।
কিন্তু মরলো ভেলটিটে কাগা বাগিশের পাছাড়ে বেশলাই
টা তো খুঁজে পাচ্ছে না চাই। ভাকের উপর ভাঙা
চোয়ারটার নীচে বসি পড়ে গিয়ে থাকে। কই না—
কোথাও না। সর্বশেষে বেশলাই টা সাঙা গোলা
বিস্তর খিঙ্কানাই বাগিশের নীচে। কিন্তু, যাঃ বেশলাইট

খালি। তবে উপায়? স্বাক্ষরে দেখলে, নড়ছে
একটা কাঠির মতন নড়ছে ভিতরে। একটা কাঠি। বসি
নিতে বার, করে বার বহা লেগে জিহ্বে বারন। কিন্তু
মিনতির হাত নিপুণ।

কাঠিটা হললো। হুপি টা বহিরে রান্নাঘরের দরজার
এলে ঠাণ্ডালো।

কালো হললো বেড়াপটা ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে, বে
হললোটা। মিনরাত আলার এ পাড়ায়। দ্বিত্ব বার করে
ঠোট দুখ মুহুর্তে মুহুর্তে চলে যাচ্ছে। বাড়ি বেয়ার ভক্ত
লাঠি খুঁজতে পারলো না—কপালে লাগলো মিনতি।

হা তগবান, কড়াইটা একদম খালি। হুঁবটু, হুঁ
পুছে খেয়ে পেছে হললোটা। ভুলে হুপু বেলো ঢাকনাটা
যেহ মিঁ মিনতি কড়াই এর উপর। উগ্রনের পাশে বসে
পড়ল মিনতি।

এখন কী করবে মিনতি, কী করবে জ্বরে কুহার
কাতর ছেলেকে নিয়ে। কী করবে খালি কড়াইটা
নিয়ে। কপাল খাবড়াতে লাগলো মিনতি। কী
করবে কপাল খাবড়িয়ে, খালি কড়াইটা বাহার ভেঙে।
কালো বাহা মানছে না, আর পাগবে না মিনতি।

পাঁচ সিকে সেতের বেড় গো হুঁব। হাতে বাত্র দশটা
পরলো আছে। হন পরলার কলটু হুঁব আনতে পাগবে
মিনতি।

মহু আর সুনীতি এলে ঠাণ্ডিরেছে। কাল ক্যাল
করে চেয়ে আছে, বুদ্ধতে পাগবে না, মা কালচে কেন!

মা, মাগো—

বিশ্ব ডাকছে।

মহু বাপ আবার, সুনীতি খাত যে তোমরা একটু
ওর কাছে, বাতাল করো দিয়ে চাইয়ের মাগার আমি
আসটি একুনি।

মিনতি : চোখ মুছে ঠাণ্ডালো। টুফনের ঘরে কিংবা
মহুদীর কাছে চাইলে কেনন হুঁ। বসি একটু হুঁব থাকে

ওদের ঘরে, আরে কাতর বিত্তর ভক্তে একটুকু লোকের না থাকে—এই কথাই ভেবে কাতর ভক্তে পড়লো মিনতি।

পাশাপাশি ঘর। ইহুদের ঘরে ঢুকলো মিনতি।
গেলো মহদির কাছে।

একটু দূর আছে বিধি।

চোখ ঠেলে জল বেরিরে আসে দিনতির।

সেউপো দূর, সেউপো খেয়ে বিরছে সবটা। একটু
দূর যদি আপনাদের কাছে থাকে আবার বিত্তর ভক্তে,—

ইহুদের দূর নিজে গেলো। স্তব্ধনো হাসি
হাসলো মহদি।

কে কার দূর দেখে? পানসে ভালের জল পুই
চক্ষুরি আর নটে শাকের মহিয়ার ঘানের উত্তর পত্ত, সাধা
পাশির বাদ আদ্য শতকর পরে তাদের কাছে যেন
রূপকথা।

কোনের পরে বুড়ো মনন যত আকিৎ খার। আকিৎ
খেলো দূর না খেয়ে পাবে? একটা হেলোকে পাগিয়ে-
ছিলো মিনতি। শুনিয় শুনিয় বুড়ো বলে, দূর খাবার
পরশা থাকলে আকিৎ কিনে কেন খাওয়া না!—

কি করে বুকেব মিনতি এসে, মিনতির বাড়ীতেও
গোয়াল ভরা গর ছিল। বহর ভক্তি অন্ততঃ দুটো তিনটে
গরর দূর থাকতো ঘরে। কি করে বুকেব, চার দেয়
সাড়ে চার দেয় দূর ভক্তি কড়াই জুড়ে পড়ত হলাহে আর
ইকি পুত লর।

পাশের দেয়াল সেওয়া উই বাড়িটার চাক বাজছে,
বাজছে বাণী। আজ লগ্নবী পূজা। ওদের বাড়ী গিরে
একটু দূরের ভক্ত বলে মিনতি? বলে, ছেলের অল্পর,
জর, পুখার কাতর। আর একটু দূর যদি তারা পরা
করে যেন।

না, না, ছিঃ ছিঃ, ভিখ যাগতে পারবে না। ঘরে
পেলো পায়বে না মিনতি।

আজ্ঞা বিধি, আনা পাঁচেক পরশা হবে। উনি এগেই
দিয়ে দেব। লোকান থেকে কাউকে দিয়ে যদি একটু
দূর আনিয়ে নিই, পরম দূর একটু।

ইহুর দূর কাছ থেকে আনা; ভিন আনা বহুবিদ

না, না, পুখার কই পাখ, কাছক বিত্ত—দূর আনবে
না মিনতি, দূকিরে রাখবে না গটনাটা। তারচেয়ে বাস-
দেব আনুক, সব কথা খুলে বলবে ওকে, তার অপরাধের
সব কথা। ছেলের আরের পথের দাঁহার দূর ইহু না
চাকবার অপরাধে শাস্তি হোক মিনতির। বলে,
আর পারি না, তুমি আবার ছুটি ছুটি করে ফেলো কেটে
শাস্তি হোক আবার।

বাসুদেব ফিরলো অনেক রাতে। ছুটি কটা খেয়ে
বিছানার এসে পড়লো। সারাদিন খেটেখুটে চোখ
লেগেছে মিনতির, বিত্তকে জড়িয়ে শুয়ে আছে। কপালে
হাত দিয়ে রেখলে বাসুদেব, জর এখানে; বেশী কমে নি।
যন্ত্রণার ছ একবার কৈশে ওঠতে চাইল। দূরত মিনতির
দুখটা নজরে পড়ে হঠাৎ যেন কেমন ভাল লাগছে না
বাসুদেবের।

আজ আবার কগড়া হয়েচে মাসিকের সংগে। সহ-
কর্মী একজন কিছু পাতা আর লুখা চুরি করছে গিরে
এরা পড়েছে।

দূর আসছে না বাসুদেবের। পাশের উই বাড়িটার
চাক ঢোল উত্তাল, আরতি চলছে। বাওয়ার ভেসে
একটু একটু যেন লগ্নক আসছে খুশের। বাবার চিঠি
এসেছে আজ, কুশল সংবাদ জানতে চেয়েছে। এদিক-
কার নানান কল্যাণে এতদিন চিঠি লিখতে পারে নি
বাসুদেব। আর দেবী করবে না। বিত্তর শরীরটা
একটু সারসেই উত্তর দিয়ে সেবে।

চাকটা চমকবার বাজাচ্ছে। অনেকদিন পরে কথাটা
আবার বনে পড়ল আজ। খট খট করে উঠলো
কাটাটা। না বাসুদেব জুগে নি।

মণ্ডপের ভিটার সারা ঘরে গর্ত খুঁড়েছে ইহুর।
এখানে ভোলের নীচে এক কাড়ি ঘনানো ইহুরের সারা
একটার পর একটা গর্ত। উপরে ভোলে থেকে পড়ে
যিকিঙ্গার ভালে আটকানো চোকল, কচিং এক আর টা
ধান, অদকার, তিজে ত্যাগনা গর। নীচে কোন গর্তিকে

হাত দিতে গা হুঁহুধর করে; অনাথাগন্তের ভিতর হাতে
কখন কাছ রাপ হয়ে, মাসী কাঁপানো যবে কৌশ করে
উঠে। জান দিকে অনেক বহর আসে, কত বহর
আহ্নুলের কড়ে গুনতে হয় উপরে 'জিরের' অজ্ঞার
গোদাই করা, সিঁদুর বেতরা, কালি কুল ঢাকা সন জারি
গুলো মেখে, চৌচালা বিরাট ঘর ছোট। বানতে যে কাঠ
খানা হয়েছিল তারই কিছু চেমাই বাক্য তেছরা টুকরা,
দোকান বরা পামাইর লোহাকাঠগুলো একসঙ্গে গাথা-
গাথি করে গড়ে আছে। গুড়ির তক্তাভঙ্গোর গিঠে
এখানে সেপে আছে বিশ বহর অপেক্ষার গায়ে লাগা
মাটি। উপরে তিন তিনটে 'জিরে' লজালাখি করে বোটা
বোটা আঁঠি বেঁধে বাধা শোলা, সাঝা বহরের আলানি।
ভালের একপাশে ক্রিবিরে পড়া ঢেকিটার পা বেঁধে
ঘেটে তেল বেওয়া বালোর চকৎকার ভরজার কাজ করা
যেজাতি কালক্স হলে সেহে উইপোকার। একটু মনোবোপ
দিলে দেখা যাবে উইপোকার শিরকর্ম নানা আকারের
বানচিরে লভিরে ঢালের কাছাকাছি পৌছেছে। একটু
উঁচুতে লোহা কাঠের খুঁটিতে বাঁধা বাঁশে গড়ি দিয়ে
কুলানো নৈবেদ্য রাখার কাঠের ছোট বড় ঘলঘলটি ত্রিপুরী।
অন্ত ঝলটায় কুলছে আটটি লম্বা শিকা থাকে থাকে
সাজানো ছোটবড় হাড়ি-পাতিল, উপরে জমে ছোট
গলায় লতা-পাতা, পাঁরের চিহ্ন ঝাঁক। অনেকগুলো
ঘট—গুঁকিরে আছে ঘটে আঁকা সিঁদুরে পুতুলটা।
মনের ভূলে এক ঘটের আরপায় অটটায় হাত দিলে
বেসিরে পড়বে অনেক দিনের গুঁকনো মচমে চন্দন-
ছিতানো এসাদী বেলপালা, হরিতকী, তিল। কোনটার
বেধা যাবে সাধা ধান, গাওয়া কয়েক মাসীর ছোট ছোট
শিকলিক, সেটে সিঁদুর, আলতা-পাতা, কাগজের
পেটলিঙ্গ গোবোচনা, লম্বাজের ফেনা। নীচের বড় হাড়িতে
পাওয়া যাবে পঙ্ক-বীণাধার হাতে নাচের তপসীতে ছোট
পিতলের মেরে, শংখ সোটা চারেক, খেত-চন্দন রক্ত
চন্দন কাঠি, গংগা-বৃত্তিকা, কুড়ি-কুড়ালি ছোট ছোট
পাখর কাঠি। 'কাগজের পোটলার সবচেয়ে রক্ষিত বোথার
দুর্ভাবের পবিত্র মাটি, বহা-পুলার অলিঙ্গার উপকরণ,

বেটাক-মণি' আনতে গিছে বাঁয়ের দিকান্ত আহ্নক
কে একঘনকে বিশি বেওয়া হাতেত, মোটা মোটা এক
কানোবোরের হাতে প্রুর ঝাঁটা বন্ধিমা ছুটেছিল।

পীতাম্বর চক্ৰবর্তী হলে বান্দেব। সেই বাহুবোবের
শাই মনে আছে তার ছোট বেলার একটা বিশেষ দিনের
কথা যেদিন প্রথম পূজা আরম্ভ হয় তাদের বাড়িতে।
কিন্তু সেদিন তোর হাতে কেন যে অর উঠল তার।
কাজের বাড়ি ছুটাছুটি করছে সবাই। বড় খারাপ লাগছে
বান্দেবের। বা সেই তোর হাতে বিছানা ছেড়ে উঠে
গেছেন বাড়ির প্রথম উৎসব, নানান দিকে তাড়া,
কাজকর্ম গোছাটা করা, পূজার ঘরের কাজকর্ম, পটিন-
তিরিশটা নৈবেদ্য সাজানো, ভোগের অব্যবহান বেওয়া,
ওদিকে অতিথি-অভ্যাগতরা আছে, লোকজন আছে,
কে খেলো, খেলো না কে, মচবার কুক্কুৎ নেই মার।
বাবাও পূজার ঘরে, পূজার প্রার সব কাজই বাবা
হাড়ে। নিজে তরবারী হয়ে সাহাব্য কচ্ছেন পুস্ত
বশাইকে, কাছে কাছে বেঁকে এটা ওটা গিচ্ছেন।
জোঁদামাধরাও বাইরে, পূজা-বস্ত্রের সবুধে চেঁচায়ে
বসে। লোকজনের সংগে কথাবার্তা বলছেন, গল্প
বলছেন বহুরে।

বিছানার তরে তরে আর ভালো লাগে না। কখন
না এসে ঘরের উপর কুঁকে পড়লেন। ভালো লাগছে না
খুঁচি বাবা,—

চোখ ঠেলে অল বেরিয়ে এলো বাহুবোবের। লাল
পেড়ে শাড়ী পরা, চান করে এলোহেন, বিছানা ছোঁবেন
না। শুধু ঝাঁক দিয়ে চোখ মুছিয়ে গিলেন, হাত
কুলালেন বাথার। লম্বী শোণা আমায়, ছিঃ বাবা
কামে না, আঁক পূজার দিনে কাঁধতে আছে নাকি ?
আজই ত ছেড়ে যেবে অর। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলছি আমি
ছেড়ে দেবো। ঠাকুর কে বলতি আমি। কেদোনা
লম্বীটি,—বাই আমি, কেমন ?

শিলীম এলে কোলে নিয়ে গেলেন। কোলে নিয়েই
উঠানে ছোট অলটোবিত্তে বসে বসিতে ঢাল কুখা।

কাটকেন ঢাকা ঢাকা করে—পিতলের ভাগ্যীতে ঢাকা ঢাকা করে কাটা মিষ্টি কুন্ডা, সুখীকনু, কাল কলুর ভগ্নায় সংগে। সেদিন থেকে চাল কুন্ডা, মিষ্টি কুন্ডা আর কালকলুর ভগ্নায় দিয়ে লাকড়ার আছে একটা আশ্চর্য লোক এখনো জেগে আছে বাহুরেবের।

তারপর বড় হয়ে পুঙ্কায় বাজার করতে বাবার সংগে সহরে গেছে বাহুরেব। দুয়ারাই তিন-তিনটা নাও নিয়ে বাইল লাভের দুরে, শিমুলকান্দির স্থান পেয়ে, কৈবর্তপাড়ার বে ঘাটে তিনভাগের চোট আড়াই খেরে পড়ত চলাং হলাং, আচরকা কলসী কাঁধে হাওয়ার চুল উড়িয়ে নেওয়া কোনো মেয়েকে ঘেঁষে অদ্ভুত ভালো লেগেছিল, সেই ঘাট পেছিরে রেলের সাইডে, লালটনের গুদাম, রূপচাঁচ পালের পাটের গুদামকে পাশ কেটে, পাড় থেকে কয়েক-দেখা এগিরে থাকে বুধে মহাশেব না'র আর 'হানী বার্ক' কোয়ার্টারের গুদাম থেকে বে লগা কাটলাটা বালের কোলে এসে দিগেছে সেখানে এসে নাও বাঁধত। লোকজন নিয়ে সারাদিন বাবা বাজার করতেন। নাও যে বোকাই হত সুন্দো নারকেল, আম, নাসপাতি, আপেল, গুটিন-ভিগিনটা, কলার ছিট, আর ছোট খাটো নানান কল-কলারি। মধুপর্ক বাটি থেকে আরম্ভ করে পুঁতির মালা, হুয়ের পাখা, মনকুয়ার মন বকনের বকরকে অন্ন, বকল, বখা, চকু,—গুপকাটি, মুতি শাজীতে বড়ো এক পাটরি কাপড়, গামচা, চিনির ঝিল, বাতাসার জালা। সন্ধ্যার একটু পরে পাল ফুলে নাও ছাড়ত ভাটি হাওয়ার। হালকা চোট ভেঙে পাতের সাধা বুধ হাংকো। চিড়া ভিজিয়ে গুঁড়-টেঁতুলে খেয়ে দুধ আসচে, গম্বুরের কাছে বসে আশিক করতেন বাবা।

বেলা রাত্রে নাও এসে লাগলো বিলের ঘাটে, ক্রোট বটগছের নীচে। সেখান থেকে কয়েকটা ক্ষেত পেছিয়ে ভোলাফি জলা ঘন অন্ধকার ঠেলে, আনগাছ, পিঙ্কুল পাত, বাঁশ কাড়ের নীচে দিয়ে রাজাহুই হেঁটে সেলোই বাড়ি। চার-ভোড় পাঁচ ভোড় করে নারকেল বয়ে এসে উঠানের কোণে ছুঁড়ে ফেলা হ'ত। বেকশো

খোঁজা সুন্দা নারকেল কোলার আঁধারে দুধ জেতে উঠেছে। পাতার লোক। খেতে খেতে করে উঠে কুহুরগুদো। তারপর আরেকদিনের কথা ফুলতে পারেনা বাহুরেব। ফুলতে পারে না নর, মনে পড়লেই ঝুঁকু করে উঠে কাটাটা ফুকের ভিতরে কোথায় বের বিঁধে ক্রমেই বিঁধে। নুরি বের করার উপায় নেই।

বাড়িতে কি একটা বেয়েলী বগড়ার বেঘটা হুড়াম, কালো কুহুটি বেগুলা বেঘটা। সেদিন সকালের জুকে চিটি এসেচে।

টাকা পরমা হিতে পারবেন না সের্তামণাইরা। অন্তঃস্থ পুখা বড় এবার।

রাত্রে বাবা খেলেন না, কথা বললেন না লোকজনের সংগে। কতবার বে গুণু তারাক খেলেন। মা আচলে চোখ মুহলেন, তারও খাওয়া হল না। পরদিন দুধ জেতে ভনেছে বাহুরেব, বাবা সারারাত্ত সুদান নি, অস্থিরভাবে পারচারি করেছেন উঠানে।

জিম করার উপায় ছিল না বাবার।

সপ্তমীর দিন সকালে জান বেয়ে বাবা হওঁশে গিরে চুকলেন। পত্নীর উম্মাৎ কর্তে ততীর রোকের মধ্যে বাবার দর তেলে আসতে লাগল। রাত্রেও খেলেন না কিছুই শুধু একটু ভাবের জল, পুঁজার প্রসাধ একটু। ঐকী মবনী দিন ও ভেহনি কাটল।

মবনী দিন রাত্রে কাছে ভাকসেন বাহুরেবকে, আছে আছে বললেন, বরি বাহুর হোল বাবা, আবার এ ইজাটা কুলিস নে।

ফুলে নি বাহুরেব। বাটা থেকে ভিটা ছেড়ে পালানোর ঝড়ার বেগে বাবা তাকে একদিন ঠেলে দিলেন সংগে দিলেন হিনতি আর বাজা ছোটোকে। সেদিন থেকে হাকা খেতে খেতে এখানে আজ বালিকের নোকানে শালপাতা কাটে, খুঁবা ঠেলে দেয়, হাজার-সেড় হাজার বিজি বানার হোজ, হুঁবেলা তথি হকব করে বালিকের। কিন্তু কুলেনি সে বেশপুজা পণ্ডিত তর্কালকারের আশি, পরম ভায়বান পীতাম্বর চক্রবর্তী,

হেলে যায় নাথে এখনো এ ভরাটের লোক বাধা নোহা, চোখে চোখে রেখে কথা বলে না, সে তৎপের পবিত্র বক্তৃতার শিরায় শিরায়।

ভুলনি বিশ্বব্রহ্মের রাতে ভিত্তিতে ন্যূনকে নিয়ে গ্রামের বাইরে পদদ্বিত্যে পদ নিতে আসা,—অল অল করছে তারাগুলো আকাশে, কোথায় সাপে ব্যাঙ গিলেছে, গলায় ভিতর আটকে গিয়ে ডাকছে—অনুভূত হয়ে ডাকছে, উত্তর পারের স্থানানের দিক থেকে পেচা-চী ডাকছে নিম্ন—নিম্ন—নিম্ন।

ভুলনি, চণ্ডীর মন্ত্যাকারণের মাকে নীতাধর চক্রবর্তীর অটল বৈরাগ্য কেঁপে-উঠা।

ভাই লহায়েই ভুলতে পারে লহকরী লালু, আমজাদ, ককির, বাঘন আর বংশীকে। বন খুলে হাশে না, হাশতে পারে না বাঘের সংগে, তাবের দাব দেওয়ার কোনো মানে মেই, মনে হয় বাহুসেবের। সেদিন বিড়ি বাখাটা কুসই হয়নি। খুশ সেকতে অলে গেছে বেনী। খুঁব খুঁব করতে লাগল বাহুসেব।

আরে সে সে, শালা, শালা, দেখতে হবে নি অন্ত। কুকে নে' নৌকে চুপ রে—একদম ভিরি থেয়ে যাবে, আমজাদ বলে।

কি বলনি, খুঁসে উঠেছিল বাহুসেব।

আমজাদ তড়কে গিয়েছিল, আর বাটার নি। আড়ালে বলেছে বাঘকে, বাঘা, অন্ত সাহানসার মজি নিয়ে আবার এ শাইনে আসা কেন।

তবু নিম্নের জায়গায় চুপ করে বলে থাকতে পারে না বাহুসেব। ককিরের চুরি নিয়ে মালিকের সংগে কগড়া করতে হয়েছে ভাঙেই। ককির চুরি করেছে,—চুরিটা না হয় গ্রিক হয়নি। কিন্তু ককিরের বউয়ের অস্থ—এখনো দুবানের আগের এক হুগারি মজুরি আটকে রাখবে কেন? কিন্তু বাহুসেব সহ্য করতে পারে না এরকম। এরা রাতদিন হাশাছাশি করে, জব্বর গমজলো কাশিরে বের, নতুন পদ দাঁবার। ঠাট্টার একের বউ অপরকে গিয়ে কোকন কাটে, হালিকতা

করে। আমজাদটা তো হোম্বাডাফি গিলে দাল করে আগে চোখ। বাহুসেবের পা জালা করে। নোহো হাড্ডার বেন হন বড় হয়ে আগচে; এবাবে এই ইতরদের মধ্যে আটকে থাকতে পারে বাহুসেব। নীতাধর চক্রবর্তীর হেলে বাহুসেব। বংগের কলকে হয়ে? কণে জালা করে বাহুসেবের। এবান থেকে বেরিয়ে যাবেই ও, রক্তের গুণেই ওকে বেরিয়ে যেতে হবে। এদব সে সহ্য করতে পারে না বেনীমিন।

কিন্তু এ বাসেঙ একটু অস্থবিধারই কাটাতে হবে। ইচ্ছা ছিল হেলে দেহেদের নতুন জামা দেবে পুজার। মিনতির নীল হং-এর ভূরে শাজীটাও ছিড়তে শুরু হয়েছে। হাত থেকে টাকা গুলো কি তাবে যে বেরিয়ে গেলো। ভাঙারের গুলুবেই তো নেমে গেলো আমজাদ। কর্ত টাকার কিছুটা ঘিরে দেবে মনে করেছিলো সেটা এ বাসে আর হয়ে উঠবে না। বাসের পর হাশ বরে ক্রমে ভূবে বাজছে নাকি বাহুসেব? না, না, নীতাধর চক্রবর্তীর হেলে বাহুসেব অন্ত মনকা নয়। করটা দিন লপুর করে। আর। এ তাবে চুপ করে থাকবে না বাহুসেব। ছোট মত একটা ঘরের মডানেও আছে। এ শাইনের আটবাট ভ তার জামা। ঘন ছই লোক বেখেই প্রথমে কাববার শুরু করবে। নিকোঙুলংগে খাটবে বৈকি। একটু স্থবিধা হলেই ঘর দেখতে হবে দুখানা ঘর। আশো হাড্ডা আসে এ রকমের। ভিআ প্রান্তরাত্রে এ ঘরটার মিনতির কই হয়। বেশ থেকে বাবাকে নিয়ে আগতে হবে। একা লেশে বাবার কম কই হয়।

কলকাতার আশ্রীর বক্তৃতা বাহা আছে, বাসের কছ থেকে গালিরে গালিরে এগেতে একঘিন তাবের সংগে দেখাশোনা করবে। আসা বাগরা না থাকটা ভালো নয়। লৌকিকতার একটা মানে আছে জো। আর বক্তৃতা পুজার আগে সবাইকে নিয়ে গেলে যাবে। হোক না বিদ্যাভি, তবু তো নিম্নের বাড়ি। আবার পুজার মণ্ডল হয়ে পরিদর্শন, মণ্ডলের রাত্রি হবে দিন। ছোট

শেষোক্তাদের আলোয় স্নানকেন হাতা ধাক্কিটার বাল
জড়ের নীচ অবধি লম্বা হয়ে উঠবে। ঘুম ভেঙে জেলে
উঠবে কালো। হাসকের সলজা লালচে কুলগুলো।
লোকজনকে গভীর করবে বাড়ি, হাসি-হাসি সুখ দেবীর।
জন্মানি নয়, জন্মানি নয়, সব ব্যাঘা নিজেই, এত
বাহুবলবের।

বাবার ইচ্ছাকে অসুখী রাখতে পারে বাহুবলব ?

দিন তত ঘুম, হাসি সুখ—বুঝেছে বিত্ত।

হুগুর কোলা ভাঙার এলে স্বভাবিকি কল্প দেখে।
গুণ্ঠা বনন এমনি পাণ্ডা বাজে না তখন একটু বেশী
হাসি কিয়েই কেনা হয়নি কেন ?

তার দুই বাগার নিয়ে বুরাফির পর হাসিক
কালীবাবুর দেখা কিলেছে। আশা বিরোধিতা কাল,
আজ কিছু দেখে। কিন্তু আজ নাকি বড় অসুখি, হাস
কাটেনি—বেজার বাকি পড়েছে বালোয়। অসুখ কাল
হুগুরের দিকে ঘুরি হয়। কিন্তু সত্যায় একর আমলন
বদন কল টাকার মোটটা ভেঙে বিসাদ বাহুবলবের হাতে
তখন যেন বুঝে পড়ল বাহুবলব। কই, সে ত
আনন্দ্যের কাছে টাকা চায়নি। বড় জ্বল বদন হতে
লাল স্নিগ্ধকে বাহুবলবের। উঁচু বন, উঁচু বুঝটা নীচু
জাতের নীচু বনের একটা লোকের হসিকতার হাতায়
বুঁতবুঁত করতে লাগল। নিজের উপর ঘুগার হিংস হতে
চাইল বদন টাকটা। কিয়দে বিত্তে পারলো না বাহুবলব।
টাকামণ্ড প্রয়োজন, বড় প্রয়োজন ভাঙ। পেবে মনে
হল, টাকটা। আসায়া বেবে দেবে, খরচ করবে না।
কাল কালীবাবুর কাছ থেকে পেলেই আনন্দ্যকে
কিভাবে দেবে তার টাক।

জুখ নিয়ে বাগার ফিরতে একটু রাত হল। কিন্তু
কিন্তু চোখবুখ বেবে জ্বতে গেল বাহুবলব। বাবাটা
যেন পুড়ে বাজে, বাগারীটিয়া হিতে গিরে হাতটা
যেন কাপড়ে।

কত দেখলে গো—

ভাঙারকে একই-একর বেডরা দরকার। ভাঙেবটা

হিতে বেছে নাক। আশি পাত্রেই বেতে পারবে ঘুম।
কিন্তু এখানে থাক। বেশ আনন্দ্যবলব।

কত দেখলে গো অর, বলল না কেন ?

নিমতি অসুখ-হুগুর উঠেছে।

জল আনো শীগগির—ঈয়া, বাসভিটাই গিরে এলো।

জল ঢালবে বাহুবলব বিত্তর মাঝায়, কপালের উপর
কানের পাশ গিরে। বাহু বাহু কেঁবে ঝিকিরে উঠতে
বিত্ত। বাসভিতে জল পড়ার শব্দ হুগুরে একটানা।

আবার পায়খানা কল বিত্ত। হুগুরে পর এই
নিয়ে বার ছর হলো। পাখানায় এখনো কাটা কোটা
কোটা হুগুর মতন ভাসছে আলোর মত। কিন্তু এর
কি হবে আসরে না ? বাহুবলবের মন হুগুর, একটু
একটু করে করে আসছে, ঘুর বীরে-বীরে। ভাঙার
কাছে-আজ রাতে আর সাধনা বাহুবলব। ভাঙার
এসেই তো আবার ভিনটে টাকার হাত।

এক কীকে অসুখীভিত্তে এলে টেনে কুলস নিমতি।
হেঁচা বাহুবলবের অসুখির পড়েছে, কিন্তু হুগুরি।
ঘুমিয়ে গেলে গুয়ের খাড়াবলো এক শব্দ ব্যাপার।
খাড়াই আক হবে না রাতে জলের।

বরাহের এলে ভাত বেড়ে দিয়েছে নিমতি।

হুগুরি নাশি কর, দেখেছে না, স্বত ভাত কেলেছে
অর পাতের কিনার।

লম্বিত অর বাসিন্দা জাত কুলে গিরে মুখে পরে।

ভাত ফেলতে নেই বাবা, ঘোষ। তোমরা খেয়ে
এলো ত চট করে। তাইএর কাছে আমি চলে বাই,
কোন !

চক চক করে ঘটি থেকে জল খেলো নিমতি। অর
আটা ছিল, কট ঘে করলো হুগুরে বাহুবলবেরই
লাগবে। বা হাতা কিনে বেশ একবন হেঁ।

জল ঢালছে, পাখা করছে। নিমতি একবার জল
ঢালে, একবার বাহুবলব। হাত ঘরে গেল-অর ঢাল
কেবে পাখার হাত পালটা। হাত কত এখন—যুগ
বাজে না। ঝিল্লি আনছে নিমতির, আবার আনন্দ্য
জন্ম মনে খেলো উঠেছে।

হুঁপের মাতে হঠাৎ হাসতে আরম্ভ করে বিজ্ঞ, 'হি-হি-হি। হাসতে হাসতে নেভিয়ে পড়ে। গায়ে কাঁটা ধরে দিনতিরি। যেটে কলসী থেকে ঠাণ্ডা জল এনে ঢালতে আরম্ভ করে বাহুদেব। মাথা নাড়তে থাকে বিজ্ঞ, অবিহাষ মাথা নাড়ে, কান্নার মত অশ্লষ্ট আঙরাক করে।

স্বাধীতে মিনতি বিধানার একপার্শ্বে ঘুমিয়ে পড়েন।

শেষ রাতে শুধু খাওয়ারতে গিয়ে 'অহির হয়ে উঠে বাহুদেব। আরও ঘোর মাথা নাড়ে, বিজ্ঞ বলে, বাবা, বেগুন ঢাকা খাবো, বেগুনঢাকা, বেগুনঢাকা—

কবে খাবার সময় পাতে বসে বড় জালিগেটিল বিজ্ঞ বেগুনঢাকা খাবে বলে। বেগুন ঢাকা বেগুনার ঘসে বিজ্ঞর গালে ঠাস করে চড় কবিরে দিয়েছিল ছুটে।

মাকি মূর্তে অনেক পূর থেকে বের বলে, বাবা, বেগুনঢাকা খাবো, বেগুন—

মাথা নাড়তে নাড়তে হাতের ওহু ভর্তি স্নানট: 'ফেনে দেয়। রাগে কেটে পড়ে বাহুদেব। 'আরে পাশ, পাশ তো নিজেও যাবে, আনারেরও খেয়ে যাবে। বড়মজ করে উঠল মিনতি।

কী বললে, কী বললে গো, বাপ হয়ে কী হয়ে ছুনি বিজ্ঞকে আনার—

মিনতি কৌপাচ্ছে।

কৌপাক মিনতি। বাহুদেব আর পাড়বে না।

বিহিরে আনছে চোখ দুটো ক্রমেই।

আলোর আলোর গলে 'পড়ছে 'আকাশ'। ক্রমে পড়ীর হয়ে তোখার যেন মিলিয়ে বাচ্ছে পৃথিবী। আলোর বড় উঠেছে, পদ পেরুর সুরাশা কোন এক নরম নীলাভ আলো। বড়ের অধুরে নিজেকে খুঁজে পাওয়া বাচ্ছে না। হাত বেন হাত নয়—আঙ্গুল দিয়ে টিপে টের পাওয়া বাচ্ছে না নিকের শরীর, মন বেন মন নয়—চেনা বাচ্ছে না, ছবর ছবর নয়—উললছি হচ্ছে না নিজের বিশেষে। উড়ে চলেছে, তেলে চলেছে বেন। পায়ের নীচে ঠাণ্ডা দিল্লি বাটির ছোয়াও লাগছে নু।

একটা অদ্ভুত গন্ধ তেলে আসছে, কোনো শেষ রাত বে গন্ধ শুকেনি। বে গন্ধ বোহ 'আসে নুতুর। উপরে কত উপরে, আলোর সাগর মদন করে একটা বন্ধ বিষ্ণু। ক্রমে বিষ্ণুটি বড় হল, ছুটল। জ্যোতির পরিনতলে বরাক্তর প্রোয়ানী, সিত হাসি নিয়ে কে, কে আসছেন? মহিমবর হকিম হুতের বড়ি বর্ণে, আশীর্বাদ ধারার কে নেবে আসছেন?

শ্লষ্ট চিনতে পেরেছে বাহুদেব, জ্যোতিছারার আসছেন, নেনে আসছেন মহিমবরী না কনকুশা, হল-প্রমথধারিনী, মহিমবরিনী। নেবে আসছেন সিংহ-বাহিনী, বক্ষ্যন্ত অম্বর নেবে আসছেন পূবের বরে বস্তপে।

গান গাইছে কারা, মনর?

আর চারবারে কি এক পরম গন্ধ ছুটল বে মুছিত হয়ে পড়তে ছুটি? সেই জ্যোতিছারাতলি ঘিরে লাখো লাখো নীলপত্র মহল্লসল নীলপত্রেয় কলম, বে হুলের আকর্ষ গন্ধ বুকে বরে আছে পৃথিবী আকাশ লুই বন। যে হুল না হলে মহাপুন্ড্রা পূর্ণ হয় না, পূর্ণ হয়না দেবী পাদপদমে গুণাঙ্গলি।

নারীক হয়েছে তবে এতদিনের অপেক্ষা, কান্তর নিবেদন। সিদ্ধ হয়েছেন তবে বাবার একাধ আকাংক্ষা।

কৃত্যঙ্গলিপটে উজারপ করতে চাইছে বাহুদেব, ও আরাহি বরবে ঘেবি—

ওগো ওঠো, ওঠো, বেথো বিজ্ঞ কেমন করছে, কৈশিন ঐকিছে 'বিত্ত আনার—একটা 'আত' টাংকারে ভেঙ্গে পড়ল, আত্মাও খেয়ে পড়ল মিনতি।

যুৎ তেলে বাহুদেব এক হুত' তাবতে পারলে না। বিজ্ঞর চোখ দুটো ক্রকুটি ঘিরে শেষবারের মত ঘির হয়ে বাচ্ছে। নীল হয়ে বাচ্ছে বিজ্ঞ, কুকড়ে বাচ্ছে নীল পত্রেয় কলিটা।

আরে—আরে, বরো থরো, বাইরে, বরোর বাইরে—আঃ।

টীংকার করে উঠল বা

বিত্তৰ বুকুৰ উপৰ আছিকে পড়ল মিনতি, বিত্ত,
বিত্তৰে, বাপ আবার—

কুটিৰি এক টানে কেঁচে নিলো বাহুদেব, নাভা
কোলা কৰে অন্তৰিক্ত ঠাঙা শৰীৰটুকু নিৰে ধৰ
থেকে বেগিৰে এলো। আন্তে আন্তে কলতলাৰ কাছে
উজৰ শিৱিৰি কৰে পোৱালো।

তুলসী, তুলসী—একটা তুলসী গাছ, বিত্তৰ শিৱৰে
কাছে তাৰাৰ ভক্ত একটা নবুজ ছোট তুলসীগাছ—

চুটাইটি কৰল, তুলসীগাছৰে ভক্ত অচক্যে এমিক
ওমিক হাততাত লগল পাপলৰ মতন। পেলো না।
ছোট তুলসীৰ চোৱাটা ক'হিন আগুই মৰে পেচে।

বাহুদেবৰে হেলে নৱ, পৰম ন্যায়বাপ পীতাম্বৰ
চক্ৰবৰ্তীৰ নাতিটা আকাশৰে দিকে হুৰ ভ্যাংচে আছে।

বাইৰে এসে হঠাৎ নজৰে পড়ল কাপড়ৰে গুটে
বীণা আমজাদেৱ টাকোটা। ওটা ব্যবহার কৰা হয়নি।
ইছে কৰেই ব্যবহার কৰে নি, কুটিতে বাধে বলে,
আমজাদেৱ টাকো গৰচ কৰে আমজাদেৱ কাছে কুন্তল
থেকে বাটো হৰাৰ তৰে। মিনতি কেঁদেছে—সাক্ত
জল ছাড়া কিছু দিতে পাবেনি বিত্তকে, দিতে পাবেনি
একটু বেগানার হস। ঢাকা, অমন টাকার এংগোজন

বেন না হৰ। খুলে ছুঁতে কেলে বেবে, হঠাৎ মনে হল,
না, না—কাজে লাগবে টাকোটা, কাঠি আনতে হবে না?
কাঠেৰে দাম দিতে হবে না? আমজাদেৱ টাকোটা
দিৰে শেখ কাজ হবে বিত্তৰ, নৱম বিত্তকে আগুনে গৰম
কৰে, সিদ্ধ কৰে অন্তিৰে হাওগাৰ উজিৰে দিতে।

কিন মিনতিৰ দিকে না তাকালে নৱ। বিত্তকে
একা ফেলিই মৰে বাবে বাহুদেৱ, গভীৰতাবে ওকে
জড়িৰে ধৰে লাথনা বেবে, জলমাথা পালে চুই খেৰে
বলবে, কেঁদো না, আনাৰ দিকে চাপ, আহি ক আঁচি,
তুকিৰে এনেছি চোখৰ জল।

না, পাত কণাটি লেগে আছে মিনতি।

মাত শেখ হতে বুজি এখনো দেৱী আছে। আন্তে
আন্তে বাইৰে এলো বাহুদেব। উপৰেৰে দিকে হুৰ
তুলে চাইল, মিলগত জুড়ে বেন একটা বিৰাট উপুৰ কৰা
নীল পদ্ম, পাপড়িগুলো কাপছে না, ক্ৰমে পাতৰ
হৰে আসছে নীল পদ্মটা, ছাই হৰে আসছে বং। নীল
পদ্মৰ কাশা নকল গছটা আৰু ইতৰ আমজাদেৱ টাকাক
কাছে ধৰা পড়ে গেছে। তবু শেখবাৰেৰে মত হুৰ
তোলে ছুচোৰ শক্ত কৰে বাহুদেব গছটা, সেই আন্দৰ
গছটা শুকতে তেঁটী কৰছে নীল পদ্মৰ।



ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣାୟ ନମଃ

সাংবাদিকগণ অন্তঃপুর ভূমির কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত
হলেন। ভূমির সমিতির মৈত্রীকে এই হীনতার
প্রতীকারের কথা উঠলো এবং শেখশর্মা একটি সাং-
বাদিক গঠন করে তার উপর তার দেওয়া হলো বখা
কর্তব্য স্থির করতে। এই সাংবাদিক প্রবাসী সম্প্রদায়
বাহিন্য চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে ইন্ডিয়ান এসো-
সিয়েশন হলে এক সভা আহ্বান করলেন। এই সভার
নিষ্পত্তি, এডভোকেট, আনন্দবাজার পত্রিকার স্তবক থেকে
জানানো হলো গণবর্ষের এই অবমাননা সহ করার
চেষ্টা বরং কাগজ বন্ধ করে দেওয়া চের ভালো।
আমাদের গানের জ্বালা ছিল সব চেষ্টা বেশী। ই. আই,
রেশমের মধ্যে বাহিন্য আমরা অনেকটা নির্জন হয়ে
পড়েছিলাম। আমাদের প্রতিষ্ঠানে তখন তিন তিন
থানা কাগজ চুস্তরাং আমাদের টাকার অভাব ভয়,

যাৰা পেনেই আঁহাও বেঁহাৰা পড়বোৰে-নাহে। সত্য বাবু জেলে, মোহিত বৈদ্য তখন নিৰাতিৰ সন্ধ্যাক। তিনি এংক বন্ধাণীৰ সন্ধ্যাক গোপাল সাত্ৰাল বিশেষ কৰে এই ব্যাপাৰে উৎসাহী হৈছিলেন। আনন্দবাবুৱাৰে তৰফৰে যখন সেনও ছিলেন আঁহাৰে মতাবলী। মৃণালকান্তি বন্ধ পড়লেন বিপদে। তিনি সাবকমিটিৰ সভাপতি হলেও অমৃতবাবুৱাৰ পক্ষিকাৰ চাকৰী করেন—অৰ্থাৎ তাঁৰ কৰ্তৃপক্ষ কাগজ বন্ধ ৰাখাৰ যোৱাত বিৰোধী। আঁহাৰে পক্ষে মত দিতে গেলো তাঁকে চাকৰীটা খোৱাতে হয়, তা তাঁৰ পক্ষে যখন সম্ভৱমত তখন কৰ্তৃপক্ষৰ মতটোৰ উপৰিও তাঁকে কৌণ দিতে হলো। বাহাৰবাবুৱাৰে যাকো তখন তৰফাৰ নীমা ছাড়িয়ে হাতাৰাতিৰ উপক্ৰম হয় হয়। আঁহাৰে গোপাল সাত্ৰাল গেলেন জেপে। তাৰপৰি একটা হট্টসোলেৰ যাকে কী বে হৈ গেল তা বলা বাহ্য ন। মৃণালবাবুৱাৰে যোগ কৰি জোৰেৰ চম্বা গেলো জেপে কিংবা কী বেন একটা হলো। কটিকাণী শাক ৰামানন্দবাবুৱাৰ জীৱনে এখনভৰো ঘটনা বোৰ হয় আঁৰ কখনে ঘটে নি। তৰফাৰেৰ কাণ্ড দেখে তিনি একেবাৰে হকচকিৰে গিৰে সভা ভাঙা কৰে গেলেন। সভা পণ্ড হৈ গেলো।

বহুমতী নিৰ্মিত একাশিত হছিল। তাৰ সন্ধ্যাকৰে লাহনা হলো যখন সেনেৰ হাতে জ্বাৰাবাবুৱাৰে বোডে। তখনকাৰ দিনে সে একটা চাকলাকৰ ঘটনা।

অমৃতবাবুৱাৰ পক্ষিকা কিংবা বহুমতীৰ একাশ বন্ধ হয় নি। কাগজ বন্ধ ৰাখাৰ পক্ষপাতী বাঁহা তাঁহা যোগ হয় সন্তোষ দুই কোন একাৰে কাটালেন। বেঁহা গেলো এই পথে বাঁহা পা ৰাডিয়েছেন তাঁহা অচিৰে বহু জুত হবেন। তবু একেবাৰে অকাৰে চেয়ে বেঁহা বহাই ভালো যোগ হৈছিল তখন। হুতৰাং অমৃতবাবুৱাৰে পহাৰ-সৰণে পুনৰ্ভিক হতে হলো। ইতিমধ্যে কিছু উত্থান পতনেৰ চাকা ঘূৰে গৈছে।

আঁহাৰেৰ সত্যিকাৰ বিপৰ্য্যয়ৰ জুৰি বোৰ হয় এই-বান্ধেই। কিছু তখন সে বিখ্যে-পৰেতন হুঁহাৰ মতো

যেনেৰ অৰ্থাৎ আঁহাৰেৰ ছিল না। তখনকাৰ দিনে ৰাজনৈতিক শক্তিৰ কেন্দ্ৰ ছিল এইবান্ধে, আঁহাৰে পহাৰা কৰি কাকে? এডভাণ্ডো ভো সবে সে যিনি জুনিট হৈছে অনগণেৰ শুভমুটি আছে আঁহাৰেৰ দিকে, আঁহাৰেৰ দাবিৰে উপৰে উঠবে কে?

আঁহাৰেৰ পৌৰ এতিজান কৰ্পোৱেশন সূত্ৰেৰ বাঁহুৰেৰ কল্যাণে গবৰ্ণমেণ্টেৰ কৰল-মুক্ত হৈছিল। বেশবন্ধ এই এতিজানটিকে 'ক্যাণ্টাৰ' কহৈছিলেন ১৯২৪ সালে। তাঁৰ মৃত্যুৰ পৰি তাঁৰ নিমন্তাই এটি ক্যাণ্টাৰ কৰে আলছিলেন। এই এতিজানেৰ 'বেহাৰ' হুতৰাটা ছিল অত্যন্ত গৌৰবেৰ নিমন্ত। সেন গুপ্তকে গান্ধীজীই দেশবন্ধুৰ উত্তৰাধিকাৰী হিলাবে বে জিহুৰুট পৰিৱেছিলেন তাৰ মতো এই গৌৰবেৰ হুটুটিও একটি। তিনি বাৰ পাঁচেক বেহাৰ হৈছিলেন। যাকে একবাৰ কসকে গিৰেছিল ১৯২৮ সালে, তাৰ কাৰণ বাংলা কংগ্ৰেছেৰ এই দলাবলি। অকংগ্ৰেছী বিজয় বন্ধ সেবাৰ হুটুটি নিৰেছিলেন কেড়ে। ১৯২৯ সালে সেনগুপ্ত আঁহাৰ হলেন বেহাৰ। ভালো বে ভালো। তিনি বে পথ ছাড়তে নাহাক। আল কবা শুধু পদ-গৌৰৱ নহ, কৰ্পোৱেশন হাতে এলে শক্তিও আহৰণ কৰা বাৰ অকেনবাণি। দলীৰ লোকসেৰ পুষ্টিসাধনেৰ জন্তে এংক সেই সকে পৌৰজনসেৰ জুষ্টিসাধন কৰতে হ'লে এই কামছাৰা বংশে বাণা একাৰ হককাৰ। হুতাবজ্জৰেৰ অধ্যবসাৱ, অকণেৰ সফল হলো ১৯৩০ সালে।

আঁহাৰাও বেন একটা নতুন শক্তি পেলাব। যেন আছে সে নহৰ কৰ্পোৱেশনেৰ সভাৰ কাউন্সিলৰ শৰৎ বোসেৰ বক্তৃতা হ'লে আঁহাৰেৰেও হতো সে যিনি বিপদ। বেন না, তাঁৰ পূৰ্বা বক্তৃতা ছাপতে আঁহাৰেৰ কাগজেৰ তিনি চাৰ কলম ছাপিৰে বেতো। হতোতো এমনও হ'তো যে শৰৎ বোসেৰ বক্তৃতাৰ স্থান কৰতে আঁৰ একটা হককাৰী সংবাদকে দূৰে ঠেলে রাখতে হয় অৰ্থাৎ সেটো, যে যন্তো হককাৰ। বিপদটা হ'তো এইবান্ধেই। কবি গোবিন্দৰালেৰ মতো আঁহাৰেৰেও যেনেৰ অৰ্থাৎ তখন হ'তো এইতপ:—

"বাদিকা বুড়ী হুঁ,

কারে রেখে কারে হুঁ !"

বিশব্বর আত্মক কিছু আবারের বাবে কে? আশা ছিল অনন্ত, নৈরাশ্রে অভিভূত হবার মতো উত্থনও যে কিছুই ঘটে নি।

এখন সন্ধ্যা এই ১৯৩০ সালেই আনন্দের আশা একজন বিশিষ্ট বক্তৃতা দাখলায়। তিনি হচ্ছেন নবশক্তি সম্পাদক শ্রীমান সেনগুপ্ত। তাঁর সঙ্গে আবারের বিচ্ছেদ নতুনই বেদনামায়ক। বিশেষ করে বাণিত হ'য়েছিলেন উপেনদা, কেন না তিনিই তাঁকে এনেছিলেন এই প্রতিষ্ঠানে। তিনি পরোক্ষ করতেন না কাউকেই একথা আগেই বলেছি। সম্পাদক হিসাবে তাঁর স্বাধীনচিত্ততার তুলনা ছিল না, তিনি বা সত্য বলে বুঝতেন তা প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হতেন না, নির্ভীকভাবে তাঁর মতামত তিনি ব্যক্ত করতেন। কিছু দলগত একটা কাগজের সম্পাদককে নির্ভীকভাবে যে সংঘবের বাবে বেঁধে রাখতে হয় তার কোলপটা উপেন দাখল্যে শ্রীমান সেনগুপ্তকে ছোঁ করেও পেছাতে পারেন নি। চাকরীটা যে তিনি রাখতে পারবেন না সে আশাটা উপেন দাখল্যের যেমন হয়েছিল তেমনই হয়েছিল আবারেরও। তাঁর সম্পাদকীয় নেতৃত্বের দু'একটা নমুনা আগেই দিয়েছি। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর নামে জবাব আছে অভিযোগ তারী হয়ে উঠেছিল। তার জের চলেছিল অনেকদিন হয়ে এবং আর বছর খানেক পরে তার পরিণতি আবার বেধতে পেলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীমান বোসের নোটিশ। নোটিশখানি অফিসের সাইকেল পিছনে শ্রীমান সেনগুপ্তের বাসার মাসের শেষ দিন রাতিতে দিয়ে দিয়ে এগেছিল। নোটিশের বক্তব্য এই :—

19, British India Street, Calcutta.
30th September, 1930

"Dear Sir,

In view of the situation created by the Press ordinance. I have decided to effect

reduction in our establishment. Among others, I have decided not to continue the post of Editor of 'Nabashakti' as a separate entity. I regret therefore that I have to give you notice that your services will not be required from tomorrow (the 1st October, 1930) you will, of course, be entitled to one month's pay (that is for the month of October) and I am instructing the office accordingly.

I have to thank you for the services you have rendered to the Company during the period you have been Editor of 'Nabashakti' and I can assure you that is with regret that I have to part company with you.

yours truly,

S. C. Bose

Managing Director, Liberty Newspapers Ltd.

তারিখ এই—

গ্রন্থ অভিভাষণের কালে যে অবস্থা পাড়িয়েছে তাকে ব্যঙ্গলচোচাই বিবেচ্য বলে পরবর্ত্তাব্দে স্থির করে কেলেছেন এবং এও স্থির করেছেন যে নবশক্তির সম্পাদকের পদ আর তিনি স্বতন্ত্র রাখবেন না। কাজেই পরদিন থেকে শ্রীমান সেনগুপ্তের আর এ অফিসে আসার প্রয়োজন নেই। অবশিষ্ট উপবন্ধ এক মাসের বেতন তাঁকে দেওয়া হবে।

শ্রীমান সেনগুপ্তকে বিদায় দিয়ে পরবর্ত্তাব্দে তাঁর সেবার কথা অগ্রণ করে বস্তবান জানাবার কালে দুঃখিত হয়েছেন।

যখনটি আকস্মিক হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। শ্রীমান সেনগুপ্তকে কতৃপক্ষ কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর বিরুদ্ধে কী ভাবে অভিযোগ করা হয়েছিল তা তাঁকে লিখিত প্রত্যক্ষের একখানি চিঠি থেকে জানা যায়।

চিঠিখানা এই—

r, Woodburn Park,
Calcutta
9. 10. 29.

My dear Sachin Babu,

I have been receiving complaints regarding the editorial policy of Nabashakti for some time past. I ignored these complaints at the beginning, because I frankly wanted to give you a free hand in the matter, But you have alienated so many important individuals and parties that I am forced to take action now. Your article against the Sarda Bill which goes against the policy followed by the Congress and by our paper also calls for serious notice. I shall therefore be glad if you kindly let me know what policy you have followed on the following topics :—

- (1) Political
- (1) Economic
- (3) Literary
- (4) Social

Re : literature, I understand you have taken up a point of view opposed to Sarat Babu (Chatterji)

Re : politics and economics, the propaganda carried on by Nabashakti is slightly anti-Congress. I understand that in some of the writings of this character, important individuals connected with the Congress have been ridiculed.

I have not the least desire to suppress freedom of opinion—but you will certainly

realise that the editor of a paper is not altogether a free-lance and he has to adopt a certain policy on certain important questions of the day. After I hear from you, I shall be in a position to realise how far your policy departs from ours—if at all. One thing is clear—viz that our three papers must follow a uniform policy with regard to the important questions and problems.

Please treat this as strictly confidential,
yours sincerely
Subbas Ch. Bose

PS kindly send me the back issues of Nabashakti from the very first issue.

S. C. B.

প্রত্যাবর্তন বক্তব্য এই—

কিছুকাল থেকে তিনি নবশক্তির সম্পাদকীয় নীতি সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ পাচ্ছেন। প্রথম প্রথম তিনি এসব উপেক্ষা করতেন, কেন না সম্পাদককে তিনি এবিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সম্পাদক মশায় এক বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বলকে ইতিমধ্যে হারিয়েছেন যে, সেখটার বাণ্য হয়ে তাঁকে এবিষয়ে হতবাক করতে হচ্ছে। সম্পাদক মশায় দরদা বিল সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখেছেন তা কংগ্রেস এবং তাঁদের নিজস্ব সংবাদপত্রের নীতিবিরুদ্ধ, এটাও বিবেচ্যভাবে বিবেচ্য। কাজেই সম্পাদক মশায় রাজনৈতিক, অর্থ-নৈতিক, সামাজিক এবং সাহিত্য বিষয়ক ব্যাপারে কী নীতি অঙ্গীকার করেন তাই প্রত্যাবর্তন জানতে চান।

সাহিত্য বিষয়ে সম্পাদক মশায় শরৎ চাট্টোয়ার নীতির বিরুদ্ধবাদী বলে তিনি মনে করেন।

রাজনীতি এবং অর্থনীতির ব্যাপারেও নবশক্তি সম্পাদক কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই কতকটা যাচ্ছেন এবং এ ধরনের কয়েকটা লেখার নাকি তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে উপহাসই করেছেন।

অন্তঃপূর সুভাষবাবু বলছেন যে, স্বাধীন বস্ত্র প্রকাশে বাধা দেওয়ার ইচ্ছা তাঁর আরো নেই, তবে সম্পাদকের এটা নিশ্চিত জানা দরকার যে, তিনি একেবারে খেচ্ছাচাট্টা নন, তাঁকেও বর্তমান কালের কয়েকটা প্রবান প্রবান বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট নীতি মেনে চলতে হবে। এলব বিষয়ে সম্পাদকের অভিমত জানতে গেলে তিনি যুক্তিতে পারবেন তাঁদের মতের সঙ্গে সম্পাদকের মতের আরো কোন পার্থক্য আছে কিনা। বস্ত্রতঃ প্রবান প্রবান বিষয় ও সমস্যা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে তাঁদের ভিনখানা কাগজকেই একই নীতি অবলম্বন করে চলতে হবে।

সুভাষবাবু নবশক্তি সম্পাদকের নামে যে সব অভিযোগ এনেছিলেন তা বিশ্লেষণ করতে গেলে এর পিছনকার ইতিহাস একটু জানা দরকার। যতদূর সম্ভব মনে করা যাক।

আমাদের কাগজ ছিল কংগ্রেস-পন্থী। কিন্তু কংগ্রেস পন্থী বলেই কংগ্রেসের কোথাও কোন ক্ষুদ্র বিদ্রোহ ঘটলে সেটা উল্লেখ্য করতে পারবেন না সম্পাদক এমন দাসত্ব দেখে যেন নি। আদর্শ ও পন্থার মূলমন্ত্র এলে কাজ সহজ সাধ্য হয়—সম্পাদকের কাজ সেইমতো দৃষ্টি ক্রিয়ানো। কংগ্রেসের অস্থায়ী কোন পন্থা জন কল্যাণের পরিপন্থী হ'লে সম্পাদক মশায় বধি তার উল্লেখ করে থাকেন তবে তাঁকে কংগ্রেস-বিরোধী বলতে পারি না। দেশবন্ধু স্বরাজ্য দল গঠন করে গান্ধী-বিরোধী হ'য়েছিলেন, কংগ্রেস-বিরোধী হ'ল নি; সুভাষচন্দ্রও তখন কোন কোন বিষয়ে উগ্র মনোভাব পোষণ করলেও তিনি নিজেকে কংগ্রেস-বিরোধী বলে মনে করতেন না। নবশক্তি সম্পাদক স্বর্ষকেজে নেমে একথা বলছেন যেখানে দি ঘটে কিন্তু লেখনীর দূষণও কি এমন কিছু তিনি প্রকাশ করেছিলেন যাতে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ কংগ্রেসের বিরোধী বলা যেতে পারে? মনে তো পড়ে না।

মনে পড়ে একটা সামাজিক ব্যাপারের কথা।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে Age of Consent Bill সম্পর্কে একটা কমিটি বসেছিল। তাই কমিটির সমগ্র রিপোর্টটি নিয়ে নবশক্তি সম্পাদক তাঁর সমালোচনা করেছিলেন। Age of Consent এর বাংলা হরফিসহ সম্বাস সম্বন্ধির বয়স। যৌন সম্পর্কের ব্যাপার স্তব্ধতা এই নিয়ে একটা হৈ চৈ পড়ে গিয়েছিল চার দিকে। বাহা 'অঙ্কুরে বহু-করা খাঁচার' তাঁরা হঠাৎ নীতিবাগিন হ'য়ে 'খর্ব মসাতলে গেলো' বলে চীৎকার শুরু করেছিলেন, আর ধারা সংস্কার-পন্থী তাঁরা একটু বেনী উৎসাহী হ'য়েছিলেন। এই দু'চর মাঝখানে যৌন-বিজ্ঞানের দ্বারা শরীর সেনগুণ বেশ-কাল-পাঞ্জের বিচার করে এ বেশে যৌনবোধের বয়স ঠিক করার প্রয়াসী হ'য়েছিলেন। আমাদের সহোদর দার চৌধুরী সুভাষচন্দ্রের দ্বারা, সুভাষা এ ভেঙ্গে দে শুকর মতোই ছিল অনভিজ্ঞ; শরীর সেনগুণ তাকে এই সময় মাঝে মাঝে গড়ের নাঠে টেনে নিয়ে গিয়ে এই তত্বকথার জালিম দিতেন। এমন সময় ঐ বিলটির উত্থাপন হওয়ার তাঁর পক্ষে তা নিয়ে গবেষণা করা স্বাভাবিক হ'য়েছিল।

কিন্তু সন্তান মিত্র ছিলেন Consent Committee-র সভ্য। শরীর সেনগুণের গবেষণার তিনি আহুত হয়ে সুভাষ বাবুকে এক পত্রাব্যক্ত করেছিলেন। সুভাষ বাবু অন্তঃপূর সেই চিঠি নবশক্তি সম্পাদককে দেখিয়ে তাঁর কৈফিয়ৎ দিতে বলেন। সম্পাদক মশায় বলেন—এবং তিনি যা লিখেছেন তার অভিরিক্ত আর তাঁর কিছুই বলবার নেই।

কিশোরগঞ্জে একবার এক হিন্দু জনসাধারণের বাড়ীতে মূলস্ফোটার হানা ঘেঁর। টাকাকড়ি ইত্যাদির সঙ্গে হলিল পত্রাব্যক্ত তারা লুট করে নিয়ে গিয়েছিল। এটা হিন্দু-মুসলমানের দ্বারা বলে প্রচারিত হয়েছিল, ওখানকার কংগ্রেস কর্মীরাও বলেছিলেন তাই। শরীর সেনগুণ এই সংবাদের উপর যে মতব্য করেছিলেন তাতে তিনি এই কথা বলেন যে, ওটা আসলে দামা নয়, অর্থ নৈতিক

সমস্যা কলে যে সংঘর্ষ অবতরণী তাইই হুঁচনা মার।
কিশোরপুত্রের কংগ্রেস কর্মীরা চটে গিয়ে হুতাঘবাবু
কাছে নালিশ করেন। হুতাঘবাবু নবজন্ম সম্পাদকে
ফলসেন—কংগ্রেস কর্মীরা চটে গেলে তাঁর পক্ষে কতি
হবে। সম্পাদক সম্মত বললেন—আমি নাচার। যা
সত্য বলে বুকেছি তাই লিখেছি।

হুতাঘবাবু পর৫৫শ্রেয় সাহিত্য নীতি বলে যা উল্লেখ
করেছেন তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য কারণ এরকম
কোন নীতি তাঁর ছিল কিনা তা আমাদের জানা নেই।
তাঁর যা নীতি ছিল তা তো “সবার উপরে মানুষ সত্য”
এবং সেই সত্যই তিনি তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রচার
করেছেন। শতীন সেনগুপ্ত সেই নীতি থেকে ষ্ট্র
হ’রেছিলেন কিনা তা বুঝতে পারি নি। তবনকার
কালে কল্লোল সাহিত্য চক্রের একমল ভঙ্গু পঞ্জিপালী
লেখক উঠেছিলেন তাঁদের লেখার সত্য প্রাণবর্ধের
লক্ষ্য প্রকাশ পেয়েছিল। তাঁদের কারো কারো কোন
কোন লেখার ‘কামবর্ধ নাহি তার’ এমন সজ্জিততার
সার্ভিকিট বহুতো ছিল না, কিন্তু তাই বলে তাঁরা
অপারাজেব হবেন কেন? তাকশোর বোমকটী সবেও
তাঁরা কি অভ্যর্থনার বোণা ছিলেন না? বহুতঃ তাঁরা
অপারাজেবই হ’রে ছিলেন। একমাত্র তাঁদের নিজেদের
কামবর্ধ ছাড়া অন্তর তাঁদের লেখা প্রকাশিত হ’তো না।
শতীন সেনগুপ্ত তাঁদের বলকে তাঁর কামবর্ধের লেখক
করে নিয়েছিলেন সামরে। অন্তঃপর ভারতবর্ষ সম্পাদক
অলমর সেনগুপ্ত শতীন সেনগুপ্তের নীতি অলমর করেন
এবং উত্তরকালের ইতিহাস না বললেও চলে। এই
মলের প্রতি ব্যক্তি বিশেষের আক্রোশ শরৎ চাট্টোয়ার
নাশে চলে যায় নি তো? কারণ, পর৫৫শ্রেয় যে এই
বলকে তাঁর পক্ষপটে টেনে নিয়েছিলেন। হুতাঘব
অভিব্যোমকটী দুর্বোধ্যই হয়ে গেলে।

আর একটি বড় ঠকরের সংঘর্ষ হ’রেছিল—সেটা নব-
জন্ম সম্পাদকের সঙ্গে বোম হুতাঘবচক্রের। ১৯২৯ সালে
অভ্যর্থনার অধিন ভারত দুই সপ্তাহের বে অধিব্যোম

হ’রেছিল তাতে নকুতা দিবার সময় নীতাপতি হুতাঘব
বলেন যে, বেশে দুটি School of Thought পড়ে
উঠেছে—একটি হচ্ছে সমরবর্তীতে আর অন্যটি হচ্ছে
পঞ্জিতবর্তীতে। এই উত্তর দানের তাব-পঞ্জীতের
‘Propaganda’ সেপের ঘোর অমিই লাবন করেছ,
তাঁদের চিত্তার বারঃ বেশে নিষ্কিন্ততা হুতিয়ে দিচ্ছে।
এই নিষ্কিন্ততাও যে কি বরণের তারও উল্লেখ হুতাঘবাবু
করেন। বলা—It is the passivism, not philo-
sophic but actual, inculcated by these Schools
of Thought against which I protest. বলা
বাহলা, সমরবর্তী হচ্ছে মহাশয় পঞ্জীত আশ্রব আর
পঞ্জিতবর্তী শ্রীঅবিন্যের লাবনপীঠ। এই আক্রমণের
পিছনে হুতাঘবাবু মনে খোঁব করি ‘এই ভাবটা ছিল যে,
সমরবর্তী পঞ্জীতাবে রাজনীতির সঙ্গে অহিংসার যে
অপাখিটি আছে তা নিষ্কিন্ততারই নামাকর, আর
পঞ্জিতবর্তী আশ্রববর্তী বা তা কেবল কর্মবর্তী
সম্মান ছাড়া আর কিছুই নয়—অর্থাৎ ‘সামান্যসিং
অধিন।’

পঞ্জীত রাজনীতি ক্ষেত্রে অহিংসার অবতারণা
করেছিলেন এবং লক্ষ্যকে কারেনবনলাবাচা অহিংস
হবার ক্ষেত্রে যে প্রোপাগান্ডা করেছিলেন তাও ঠিক,
কিন্তু তাই বলে তিনি নিষ্কিন্ততার উপাসক ছিলেন এ
অপবাদ তাঁকে কেউ দিতে পারে নি। তিনি বেশে যে
কিন্দু কর্মপ্রেরণা সৃষ্ট করেছিলেন হুতাঘবচক্রের রাজনীতি
ক্ষেত্রে প্রবেশ তাইই হল।

শ্রীঅবিন্যের জীবন-বর্ণন যা তা কর্মকে ‘অবীকার’
নয়, পর৫ কর্মকেই বীকার এবং তারপক্ষে তাই নিষেধ
প্রতি। কিন্তু কী সেই কর্ম? নিভান নিভানক কর্ম
—বা আশ্রোপলভ জ্ঞানের দ্বারা হয়েছ তাবহ, সত্য।
সেই পীতোক ‘কর্ম যার ভয়ে কলাকাজ্য রহিত হতে
হবে—‘যা’ কলেবু কদাচন।’ শ্রীঅবিন্যের সত্য পথের
লভান দ্বারা কথকি করেছেন তাঁরাই বলতে পারেন
শ্রীঅবিন্যের অধিন কী।

সম্পাদক শ্রীমত সেনগুপ্ত স্বয়ং মুক্তাব্যবস্থার উজ্জ্বল একটি ছোট্ট প্রতিবাদ করে যোগ দেন এই কথাগুলিই জাতির দিলে। অন্তঃসার পণ্ডিত্যের থেকে গুরুত্বপূর্ণ চক্রবর্তী একটি বড় প্রতিবাদ লিখে পাঠান। এই প্রতিবাদে মুক্তাব্যবস্থার প্রতি তাঁর ভাবনা ছিল এবং তা ছিল যুক্তি-বদ্ধ দিয়ে অকাটা। সম্পাদক স্বয়ং সেটি মুক্তাব্যবস্থাকে দেখিয়ে জানতে চান সেটা তিনি চাপাবেন কিনা। মুক্তাব্যবস্থা কি ছুই বলাগেল না। এতে মুক্তাব্যবস্থার মনোভাব কি তা বুঝতে পেরে সম্পাদক স্বয়ং আর একটি প্রতিবাদ এমন ভাবে লিখলেন যাতে স্ত্রী ও স্ত্রী উভয়ই রক্ষা হয়। এই লেখাটি গুরুত্বপূর্ণ চক্রবর্তীর লেখার সঙ্গে জুড়ে দিয়ে একসঙ্গে প্রকাশ করতে চাইলে এইবার মুক্তাব্যবস্থার সম্পাদককে মত দিলেন।

মুক্তাব্যবস্থার সাম্প্রতিক কর্মী অবশিষ্টকে বুঝতে পারতেন, গ্রামীণ অবশিষ্টকে বুঝতে পারেন নি। তাই তাঁর বক্তৃতার Life of contemplation নিম্নলিখিত হয়েছিল। কর্ম কর্ম করে ছুটছুটি করে লাভ নেই। কর্ম হওয়া চাই জ্ঞানের দ্বারা। সত্য, তবেই তা হবে আসল কর্ম এবং সেই আসল কর্মের অস্ত্রে অবশিষ্ট ব্যান্ডে বসে-ছিলেন—বোগ্য হয়েছিলেন। স্বয়ং বাবু তাঁর লেখার মুক্তাব্যবস্থার উজ্জ্বল কেটে কেটে বিবেচনা করে গঠন করেছিলেন এবং বিবেচনা করে শ্রীঅবশিষ্টের লেখা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন—

“মুক্তাব্যবস্থা যদি অবশিষ্টের বে কোন একধারা খই পড়তেন তবে তিনি পণ্ডিত্যের School of Thought এর বিচ্ছেদ যে অভিযোগ এনেছেন সে অভিযোগ জানতে তাই মনে হিমাশ্রয়ের প্রধান দ্বিধা হতো। কেন না পণ্ডিত্যের School of Thought শ্রীঅবশিষ্টেরই চিন্তাধারার চার পাশে পড়ে উঠেছে। এখানে জীবনকে জাগ্রত করার কোন কথাই নেই—তবে তাকে বোগ্যবৃত্ত করার কথা আছে বটে। কেননা বোগ্যেই মানুষ আপনায় গভীরতম সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ করতে পারে। তাই বোগ্য বান্ধা গম্য্যাস নর, বাগ্যব্র নর, নির্বাণ নর।”

মুক্তাব্যবস্থা বুঝলেনতার লভ্যপন্থি রূপে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। তার চোখে ছিল ‘তত্ত্বের স্বয়ং’ তিনি নিজেও তখন তখন, তাই তার তত্ত্বের লক্ষ্য যে চাক্ষুষতা প্রকাশ পেয়েছিল তার বক্তৃতায়। স্বয়ং স্বয়ং হুজির মতো তিনি যে অন্তঃসারের চক্রে হয়ে উঠেছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তিনি চেয়েছিলেন অবশিষ্টের গড়ে উঠতে এক মনোভাব—যুক্ত ও মনোভাবের সত্য To create a new India at once free and great.

আবার কিছু মনে হয় স্বয়ংমতী বা পণ্ডিত্যের ভাব-পন্থীর বিচ্ছেদ মুক্তাব্যবস্থার বে বিবেচনার করেছিলেন তা ছিল নিত্যজীবী বাহু, তাতে তার আসল মনের চেহারা ঢাকা পড়েছে। মুক্তাব্যবস্থার মনে তত্ত্বমুগ্ধতা কম ছিল বলে আমি মনে করি না। তিনি বাল্যকালে যে বিবেকানন্দের ভাবধারণে মগ্ন হয়েছিলেন সেই বিবেকানন্দের শুধু কী জাতীয় কর্মী ছিলেন তা মুক্তাব্যবস্থার অজানা ছিল না। তবু মুক্তাব্যবস্থা যে অধীর হয়ে উঠে-ছিলেন তার কারণ আছে। কারণটা আবার মনে হয় সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক। পান্ডিত্যের মনস্তাত্ত্বিক হয়েছিলেন ইংরেজের বিরুদ্ধে, কিন্তু অধিঃস তাৎ—এটা মুক্তাব্যবস্থার কাছে ছিল চূড়ান্ত। স্বয়ংমতীর প্রতি আক্রোশের হেতু এইখানে। আর পণ্ডিত্যের প্রতি বক্তৃতাক্রিয় মূলীভূত কারণ মুক্তাব্যবস্থার অন্তঃসার বুদ্ধি মিলীপ্ততার রাহের পণ্ডিত্যের আশ্রমে বোগ্যমান। তবু তাই নয়, বিশিষ্ট কংগ্রেস কর্মী অনিলবরণ রাহও হয়েছিলেন আশ্রয়মণী। একজন বন্ধু, অপরজন সহকর্মী—এই দুয়ের বিচ্ছেদ বেদনা তাকে বিচলিত করেছিল, বিস্ত্রিত করেছিল।

সম্পাদক স্বয়ং গুরুত্বপূর্ণ চক্রবর্তীর প্রতিবাদে সঙ্গে নিজের লেখাটা লেজুত বেঁধে দিয়ে বাগ্যব্রবাদের ব্যাপারটা যদি এইখানেই দাঁড়ে টেনে ধরে ইতি করে দিতেন তবে ল্যাটা চুক বেতো। কিন্তু ব্যাপার হলো এই যে, স্বয়ং চক্রবর্তী আবার একটি দেয়গমী প্রতিবাদ পাঠিয়েছিলেন। এইবার সম্পাদক স্বয়ং কিংবদন্তি সাহস দেখিয়ে কেললেন। তিনি মুক্তাব্যবস্থাকে কিছু না

জানিয়েই দিলেন লেখাটা ছাপিয়ে—বা থাকে বরাত্তে।
বরাত্ত বে নেহাৎ রক্ষণ পেরে টের পাওয়া গেলো।
সম্পাদকের স্পর্শ দেখে জ্ঞানেশ্বর শব্দ ছুই ভাই-ই কষ্ট
হলেন।

কলটা প্রকাশ পেলে প্রায় বছর ধানেক বাবে।

একটা বিষয় এখানে খুবই লক্ষ্য করবার মতো।
জ্ঞানেশ্বর যে স্বয়ং শতীন গুপ্তের লেখা পড়তেন না এবং
তিনি যে পনের মুখে কাল খেতেন তা স্পষ্ট। কেন না
তিনি সম্পাদক মশায়ের কাছে একেবারে গোড়ার সংখ্যা
থেকে কাগজ চেরে পাঠিয়েছিলেন।

নবমুখি সম্পাদকের পদ আর স্বতন্ত্র রাখা হবে না
পরবাস্থ্য এই আত্মা বিয়েছিলেন তাঁর পক্ষে কিন্তু তা
যে লভ্য নয় তা প্রকাশ পেলে বখান সরোজ রায় চৌধুরী
শতীন সেনগুপ্তের হৃদয়বিজিত হলো। উপেনদা একে

ব্যবহৃত হয়ে বলেছিলেন সরোজের ঐ পদ গ্রহণ করা
টিক হয়নি কারণ তাঁর মতে আনন্দের বাঁধা শতীন সেনগুপ্তকে
ভালোবাসতাম তাঁদের কেউ ঐ পদ গ্রহণ করলে তা
আত্মসম্মতির হবে না। শতীন সেনগুপ্তকে উপেনদাই
এনেছিলেন তাই তাঁকে হারাবার ক্ষেত্র ছিল তাঁর
আনন্দের চেয়ে তীব্রতর।

শতীনদা তাঁর দৃষ্টি নিয়ে বসলেন হাতীবাগান
বাগানের পাশে স্ট্রীটের উপরে ঐ দোতলা বাড়ীটাকে
তাঁর রাজ্যের দিকের বরখানায়। অন্তঃপুর চূড়ার
দুর্ভবদ্বার মধ্যে কী কঠোর কৃষ্ণদান তাঁর বেগুনি।
হুসি-মলিন উইপোকা বহল বরখানার মধ্যে ইস্তকতঃ
বিক্ষিপ্ত কাগজপত্র ও বইগুলির মধ্যে তাঁকে দেখতে
পেতান অনমনীয়—আত্মশক্তি সম্পাদকের আত্মশক্তিতে
অবিচলিত। তাঁর দৃষ্টি তাঁকে ছোট করেনি, তাঁকে
উপরেই তুলে ধরেছে।

অন্ত-স্বর্গ

প্রিয়মিলেজ চৌধুরী

অন্ত-স্বর্গ দেখেছি কি কোনদিন,
চিত্তাবহির কিছু দ্রাণ অবশেষ,
নিতে দাওয়া শেষ পিছা সে নীপ্তিহীন—
রক্ত-আখরে বিলাসে জ্বরের রেশ ?
পাতা-তরা কতু বেগে বনম্পতি,
তুনেছি কি তার চৈতন্যের গুহন,
কতু নিখর কোন জীবনের গতি,
ধেন-বাওয়া প্রাণ বীণিকার স্পন্দন ?

শিশেব কোন জীবনে অঙ্গ-গাথ,
অঙ্গ-ব্যথার ক্রান্ত কালিদা আঁকা,—
মৃত্যু-ভিধির অগণন পরমাদ,
শেষ বিদ্যারের হলিন চিত্র রাখা ?—
তা' না হ'লে কতু ব্রিবেব না কোনদিন
অন্তুট বোর জীবনের কোলাহল,
কোন বাতুতে অঙ্গ-গাথব লীল,
করনা বোর কোথায় মেলেছে বল !

রবীন্দ্র সঙ্গীতের রস ও প্রচার

শ্রীজয়দেব রায় এম. এ, বি, কম।

রবীন্দ্রনাথের গানের সংগৃহীতকার কলে তাঁহার সমস্ত গানের হিসাব নিকাশ রাখা অতি দুঃস্থ কাজ হইয়া পড়িয়াছে। কবির আড়াই হাজার গানের অল্প কয়েকটি বাস্তবিক প্রায় সকল গানই রসের দৃষ্টিতে কোন না কোন বিশেষ শ্রেণীতে পড়িতে পারে; যেন হয় এইভাবে শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাঁহার গানের সংরক্ষণ করা উচিত। শান্তি নিকেতনের বিশ্বভারতী কতৃপক্ষ অনেকটা যেন সম্প্রতি হিসাবে রবীন্দ্রনাথের গানের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, কিন্তু স্বরলিপি সম্পাদনে সুবুদ্ধি, গায়কের standardized রীতির গ্রহণ, কেন্দ্রীয় সুর পরিচালন সমিতির স্থাপন, গানের সুরের ও রূপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রচার, সুর শিক্ষার ক্ষুদ্র বৃহৎ শিক্কের নিয়োগ, তাঁহার সুর বৈশিষ্ট্যের পাতিভাষিক সংজ্ঞার সৃষ্টি এবং তাঁহার সমগ্র গানের সমগ্রগত ও তাৎপর্য্যক. পারম্পরিক সম্বন্ধের নির্ণয়, ত্যাদিগির এবং সুর বিহারের অধ্যয়ন এক কথায় কোন কিছুইই সম্ভব নয়। আত্মা হয় নাই। তবেই তাঁহার সুরের মধ্যে গায়কের বেজ্যচারিত্য বাড়িয়া বাইতেছে।

তাঁহার গান শিখাইবার ও সুর পরিচালনের যদি কোন কেন্দ্রগত সাহায্য সম্ভব না হয় তবে সুর অন্ত-নীলনে সর্বত্রই গায়কের পূর্ণ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হইবে। এক হিসাবে অল্প ভালোই হইবে, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রচারাভিযান মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতেও মঙ্গল কামতা স্থাপিত না হইলেই নয়। যেমন ইউরোপের অনেক গানে আকস্মিক সুর বহিয়াছে। যে কোনো গানকে গায়ক যেমন খুসী করিয়া গাহিতে পারে অর্থাৎ গানে গায়কের গণতন্ত্রী স্বাধীনতা, তাহা যখন, স্বীকার করা হইতেছে না তখন সাধারণের আবৃত্ত্যজনক এক বিশেষক মন্তব্যের হাতে তাঁহার গানের পরিচালনার ক্ষমতা বেগু উচিত। আবার যেন রাখিতে হইবে

স্বরসৌন্দর্য্য চাতি এবং সুরসাহায্যের অভাব হইলেই রবীন্দ্র সঙ্গীত তাহার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য চিত্রকালের ক্ষমতা হারাইবে।

রবীন্দ্রনাথের এক শ্রেণীর গান গাওয়া খুব সহজ নয়। আশ্রিত্যে গৃহীতে সুর কৌশলের অভাব বলিয়া যেন হইলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁহার সুরে অটলতা অল্প নয়। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী, যিনি সুর নাথ হইতে শ্রীমোহন নাথ পণ্ডিত কবির ব্যক্তিগত সুরের ভিত্তি সবাই সে কথা বলিয়াছেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী বহু দিন পূর্বে হইতেই সে কথা একালের ছাত্রদের বাহ্যিক বলিয়াও আশিত্তেছেন—“তান কর্তব্য নেই বলে লোকের মনে করে কবির সুর গান শোনা শোনা, কিন্তু তাঁর সুর যৌক্তিক ও বোধ ব্যক্তার মধ্যে গভীর। মোটেই নোকা নয়; তাঁর সঙ্গীত বোধ হয় তাঁর গানের ভাষায়। শ্রীমান যিনি সুর ও তাঁর ভাষাভাষীগণ যিনি পারবেন। সুরটি এই যে, স্বরলিপিতে সে সুর কাঠীগরী দেখানো শক্ত, এবং দেখেও না দেখা সহজ; আত্মকল আদর। সকলেই সহজিয়া শব্দী। তাই স্বরলিপি দেখে তাঁর গান শিখলে কল সবশেষ ভাল হয় না, বিশেষ শিক্ষা-নবীনের বেলা।

রবীন্দ্রনাথের নিজের কাছে নীচাশ্রয় শিক্কের সংখ্যা বড়ই কম। আশিত্তে, গান সম্বন্ধে এ ভয়ের কারণ ততই বাড়িতেছে—কেন স্বরলিপি তো একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিবে।

তাঁহার গানের কথা বার দিয়া একমাত্র সুর ও তালের বৈচিত্র্যই এতো বেশি যে বিশেষক মন্তব্যে সর্বদাই তাহার স্বাধাযোগ্য স্বাধাচার ব্যক্তার রাধিকার ক্ষমতা সত্যক থাকিতে হইবে। কেন্দ্রমাত্র ভাল বিচারই তাঁহার চিত্রকালের আশ্রয় কথা এখানে প্রসঙ্গক্রমে তোলা যায়। “অনেক দিন হইতেই কবিতা লিখিতেছি, এই

জন্ম যতই বিনয় করি না কেন, এটুকু না বলিরা পারি না যে, ছন্দের তত্ত্ব কিছু কিছু বুঝি। সেই ছন্দের ঘোষ লইয়া বখন গান লিখিতে বলিলাম, তখন চাঁদ মদ্যগরের উপর মনসার বে রকম আক্রোশ, আবার রচনার উপর তালের দেহতা ভেমনি কৌল করিয়া উঠিলেন। আবার জানা ছিল ছন্দের মধ্যে যে নিয়ম আছে তাহা বিবর্তার গড়া নিয়ম, তা কাব্যেরের গড়া নিগড়নয়। প্রত্যহ ভাব সংঘমে সঙ্গীত করে না, তাহাতে 'ইতিহাস'কে উদ্ভাটিত করিতে থাকে। সেই কথা মনে রাখিয়া বাংলা গানে ছন্দকে বিচিত্র করিতে সফলতা ঘোষ করি নাই।"

অন্য ঠাহার তালের বিশেষত্ব সহজে করির অন্তরকরাও বিশেষ সঙ্গা ছিলেন না। একথা তিনি যিনেত্র নাথকে এ লইয়া অধ্বোণগত করেন। "আমি যে গান তৈরি করি তুই বলি তার ভাল কান্দীরি খেট।" এই কান্দীরি খেট। ঠাহার গানে কির অরই আছে ; তাহার মধ্যে একটি গানের উল্লেখ করিতেছি।

নিজা তোবার বে-তুল কোটে ফুলবনে—

বিশ্ব বিতাল : কান্দীরি খেট।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতের আঙ্গিক বা Technique লইয়া পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে—কত বিভিন্ন তরীত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন! হিন্দী, খারাজী, পাঞ্জাবী, গুজরাটী, মাজারী ভাষার গানকে বাংলা ভাষার রূপান্তরিত করিয়াছেন, ইংরাজী গানের ভাব ও রূতকে বিচিত্রভাবে অঙ্গরূপ করিয়াছেন, Iris Melodies ঐকৃতিকে বাংলার গল্পকরণ করিয়াছেন, কীর্তন-বাউলের সুরের এবং ভাবের সঙ্গে তাহার আঙ্গিক গ্রহণ করিয়াছেন, নৃত্যের ছন্দকে গানে রাখিয়াছেন, কবিতার ছন্দকে ছবই গানে বজার রাখিয়াছেন। তাঁহার গানে দেব নবনয়ন প্রবর্তন গল্প হলে গান রচনা। বহুদিন ধরিয়াই তিনি গল্প কাব্য রচনার সঙ্গে সঙ্গে গানেও তাহার ব্যবহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১৯০৬ সালের একটি পড়ে কবি কেবল গান নয়

কথিকাত্তেও সুর বলাইবার ইচ্ছা। একথা করিয়াছেন—
"কখনো কখনো গল্প রচনার সুর সংযোগ করবার ইচ্ছা হয়। লিপিকা কি গানে গাওয়া যায় না তাবৎ প" কবির আকস্মিক স্মৃতি না হইলে হর তো তাহার সে আশা পূর্ণ হইত। গল্প ছন্দের এবং মিলহীন গানে তাহার সহ পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের গান আয়ুতি করিলেও চলে, তাহাতেও রস পাওয়া যায়—প্রচলিত উক্তিটি এখানে বার্থ। তাহার এই শ্রেণীর গান না গাহিয়া: পড়িলে ছন্দ মিলের অভাবে পড়ে পড়ে বাধা পাইতে হইবে। কথকতায় সুর তিনি দিরাহিলেন 'কৃতকলি' গানে। তবে তাহা কবিতাই গল্প তরীতে রচিত। এই শ্রেণীর গল্প গানের: পর্বরে পড়ে (১) এ তাঁরতে রাখে নিজা প্রভু, তব গুত আশীবার (২) বিশ্ববীণা হবে বিশ্ব-জন ঘোহিছে (৩) মন ঘোর ঘেঘের সঙ্গী (৪) নোর ভাবনায়ে কী হাওয়ার ব্যস্তালো (৫) নীলজন চায়া (৬) বেদনা কী ভাবার রে (৭) শুগো স্বপ্ন স্বল্পিনিী প্রকৃতি গান। আগের দুগের এই শ্রেণীর একটি গান কুসিরা দিলাম—

ছুঁছু করিলে, ঘরশন ঘিরে ঘোহিলে প্রাণ।

গল্প লোক ভুলে লোক, তোমারে চাহিয়ে—

কোথার আছি আমি দীন, অতি দীন।

কেবল গল্প ছন্দই নয় কেবল মিলহীনই নয়, একেবারে গল্প ভাষার যেন রচিত এই গানটি—

দিনান্ত বেলায় শেষের কল দিলেন তরীপরে,

এ পারে কুবি হল মায়া,

বাব ওপারের বাটে।

হলে বলাকা উড়ে যায়

হুরের তীরে, তাহার আলোর,

তারি ডানার ধনি থাকে ঘোর অন্তরে।

ত টোরা মণী বার সাগর পানে কলতানে,

ভাবনা ঘোর তেলে বার তারি টানে।

নৃত্যানাট্যগুলির অবিকার্য অংশই এই আঙ্গিকে রচিত।

স্বরের ছায়া ও আভাস দিরা কবিতা আবৃত্তি রবীন্দ্র-নাথ এক সময়ে পরীক্ষা করিয়াছিলেন। কল্পনা কাব্য গ্রন্থের বহু কবিতার উপর হর ও তালের নির্দেশ দেখিয়া আছে, যেন হর সেগুলি ঐক্যেই রচিত হয়, যেমন হস্তকাণ্ডের গান (বিভাস একতাল্য) বিদায় (বিভাস) ভগ্নমন্দির (বিভাস)।

ভারতী মাসিক পত্রিকার (৪২শ বর্ষ ১৩৩২) গ্রন্থসমূহ পাত্যার কাভিক-অগ্রহারণ-পৌষ বুধ সংখ্যার পরের গানটি এই বোঝার লক্ষ্যে প্রকাশিত হয়—“কবি একখানি নুতন নাটক লিখিতেছেন, ইহা তাহার আঁরতের প্রত্যাশনা গীতি “জলের রাণী”!

ওগো জলের রাণী, চেষ্টে দিয়ো না, চেষ্টে দিয়ো না গো

আমি যে ভর মানি ॥

পরে জানা যায় রবীন্দ্রনাথের ‘দালিয়া’ গল্পটি শ্রীমধু বসু এবং তাহার সঙ্গীতার কর্তৃত্ব নিউ এম্পায়ার বিটরেটারে ১৯ই ফেব্রুয়ারী ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে অভিনীত হয়; পূর্বের গানটি এবং ও ‘জলের রাণী’ আর ভর নেইয়ের তোমের নেইয়ের ভর’ গান দুইটি কবি ‘দালিয়া’র অভিনয়ের প্রসঙ্গই রচনা করেন। জলের রাণী দুইটি গানই একই ভাবের রচনা মনে হয় একটি অল্পটির পরিপূরক মাত্র—

ও জলের রাণী,

ঘাটে বাঁধা একশো ভিড়ি—কোয়ার আগে যেবে,
বাভাস ওঠে দখিন হুখে।

ও জলের রাণী,

ও তোর চেষ্টেয়ের নাচন নেচে যে—

চেউকুলো সব কুটীরে পড়ুক

বাশির হুখে কালো কলী ॥

ওগো জলের রাণী,

চেউ দিয়ো না, দিয়ো না চেউ

দিয়ো না গো

আমি যে ভর মানি।

কখন কুনি শান্ত গভীর,

কখন টলো মলো

কখন আদি অধীর হাজ্র মন্দির,

কখন চুলো চুলো

কিছুই নাহি জানি।

বাও কোথা বাও, কোথা বাও যে

চকলি।

লও গো ব্যাকুল বকুল বনের মুকুল

অঙ্গলি ॥

রবীন্দ্রনাথ নিজেই ছিলেন তাঁহার গানের প্রচাষক শব্দক। তাঁহার কণ্ঠ তিল নধুর, কিন্তু সেই লক্ষ্যে উদ্দীপনাময় উবাচ। গ্রাম্যকোমর রেকর্ডের দৌলতে তাঁহার নিজের গাওয়া কয়েকটি গান প্রবর্তিত আছে, সে কয়টিই তাঁহার ললিত নধুর কণ্ঠস্বর এবং গীতিকল্পতার পরিচয় দেবে—(১) অন্ধজনে দেকো আলো বৃত্তজনে বেহো প্রাণ (২) আমি লংসারে মন দিগেছি (৩) আমারে কে নিবি তাই (৪) কণ্ঠে নিলেম গান আমার শব্দ পারাপার কড়ি (৫) আমার পরাণ লরে কি খেলা খেলাগে—সবগুলিই তাঁহার গ্রন্থসমূহের রচিত গান। হিন্দুগান রেকর্ডের প্রথম গান—“তবু মনে রেখো” গানটির মধ্যে তাঁহার যে আবেগ কল্পিত কণ্ঠস্বর শোনা যায়, রবীন্দ্র সঙ্গীতের -সহস্রাব্দিক রেকর্ডের একটিকেও তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। শিল্পার অস্বল্পপে তিনি সঙ্গীতকে গণ্য করিতেন, জাতীয় আত্মবিকাশের মুখ্য উপায় বলিয়া তিনি সঙ্গীতকে মর্যাদা দান করিয়াছিলেন সঙ্গীত এবং ললিত কলাই যে জাতীয় আত্মবিকাশের প্রকৃত উপায় একবার পুনরুত্থেব করাই বাহ্য। যে জাত এ ছুটি বিভা থেকে বঞ্চিত তাহা চির মৌন থেকে যায়।

ললিতকলার চর্চা মনের সুকৃতির পরিচায়ক, তাহাকে বিশেষতঃ সঙ্গীতকে সম্মানের আসনে বসিবার ভক্ত কবি শেষ বয়সে উদ্গীত্ব ইহা উদ্গীত্বাছিলেন। তাঁহার মতে—“শিল্পার এইরূপ সংকীর্ণতার মধ্যে আমাদের জীবন ক্রমে বিকলায় হয়ে পড়েছে। অতঃপর একে প্রস্তর ফেঁদরা কোনো মতেই আর উচিত হবে না। আমরা

এই যে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করছি সেখানে সঙ্গীত এবং লিপিতকলাকে সম্মানের আসন দিতে হবে।

কেবল সঙ্গীত নয়, নাটক অভিনয়ের বিষয়েও তাঁহার হাখেই আগ্রহ ছিল। তাঁহার নাটকের এবং গীতোৎসবের তিনিই ছিলেন কর্ণধার এবং প্রযোজক। অভিনেতা হিসাবেও তাঁহার দক্ষতার কথা শোনা যায়। কাঞ্চনীর অঙ্ক বাউলের ভূমিকার ডাকঘরের ঠাকুরদা, বিসর্জনের কয়সিংহ এবং রথুপতির ভূমিকায় এবং গীতি-রক্তের রা'ঠাকুরের ভূমিকায় তিনি যথার্থ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

শোনা যায় তিনি নিজেই তাহার আশ্রয়ে অভিনয় এবং সঙ্গীত শিক্ষাদান করিতেন। নিজে নাচিতে না জানিলেও তাহার নৃত্যনাট্যজ্ঞান নৃত্যকলা এবং সৌন্দর্য সৌষ্টবের দিকে তাহার নাকি সর্ক পুষি ছিল। উত্তরাবিকার সূত্রে তিনি লিপিতকলায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ তাহার পারিবারিক পরিবেশ হইতে যে কেবলমাত্র সঙ্গীত রচনারই উৎসাহ পাইয়াছিলেন তাই নয় গীতি অভিনয়ের অন্তর্গ্রেহণও লাভ করিয়াছিলেন। কবির ছোট্টা ওস্তী সৌদামিনী দেবী তাহার বালা-দুতিতে বলিভেছেন—‘আমাদের বাড়িতে নাচ বা লুচি বিতন্ড বাজা প্রভৃতি নিবিড় ছিল কিন্তু পরিবারের মধ্যে বিতন্ড আবাদ প্রমোহে পিতৃঘর কোনাধীন বাধা যেন নাই। বাড়ীর ঢেলেমেহেরা বিলিয়া আপন আপনির মধ্যে অভিনয় করিবার উদ্দেশ্যে বাহিরের বড় ঘরে ঠেক বাহিবার অঙ্ক বধন তাঁহার অল্পবয়স প্রার্থনা করিও। পজ লিখিয়া পাঠাইল, তখন আমাদের মনে আনন্দা ছিল, কি জানি পাচে তিনি বিরক্ত হন। তিনি সন্নতি প্রকাশ করিয়া পজ লিখিলে পরে সকলে নিশ্চিন্ত হইলেন।

এই বকর পারিবারিক বঙ্গমঞ্চেই প্রথম অভিনীত হয় তাহার ‘বাস্তবিক প্রতিভা’ ‘কাল যুগ’ এবং ‘মহার ‘বেলা’। তাহার পরিবারেরই সরল্য দেবী, প্রতিভা

দেবী, ইন্দিরা দেবী, সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাহার গীতি রচনার পণ্ডরক সাণী ছিলেন। আর কবির গুরু ভ্যোতিরিঙ্গনাথ ঠাকুরের কাছে তাহার রূপের তো আত নাই! (জয়ন্তী এবং বহুযতী পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) কবির সমস্ত গানের স্বরলিপি এখনও প্রকাশিত হয় নাই! তাহার প্রকাশিত সমস্ত গানেরই স্বরলিপি তাহার অন্তরঙ্গরাই সম্পাদনা করিয়াছেন। তাহার ব্রহ্মসঙ্গীতগুলির স্বরলিপি করেন ব্রাহ্মসংসদের সঙ্গীত শিক্ষক কাঙালীচরণ সেন। ভ্যোতিরিঙ্গনাথ ঠাকুর তাহার প্রথম যুগের সমস্ত গানের স্বরলিপি করেন। কবির হিন্দী ভাষা গানগুলির স্বরলিপি বিষ্ণুপুর যরোরানার শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীমোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তাই অবিকার্য সম্পাদিত হয়। যারারগেলার স্বরলিপি শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী করেন, সরল্য দেবীও কবির বহু গানের স্বরলিপি তাঁহার ‘মতগানে’ করিয়াছেন। পণ্ডিত জীয়ারও সঙ্গীত রচয়িত্রের লোক, শাবিকিকেন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষালয়ের প্রথম অধ্যাপকরূপে তিনি কবির সঙ্গে যোগদান করেন, তিনি দেবনাগরী ভাষার গীতাল্লির গানগুলির স্বরলিপি করেন ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে। ডক্টর আবদুল বাক ওলফাং দেবীর সঙ্গীতঅধ্যাপক, তিনিও ছিলেন কবির সুরের গুণগ্রাহী; তিনি রবীন্দ্রনাথের ২৬টি গানের ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার স্বরলিপি করেন (দীপালীতে প্রকাশিত আমার প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়া তাহার সবচেয়ে বেশি গানের স্বরলিপি করিয়া গিয়াছেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। একটি মাত্র গানের স্বরলিপি রবীন্দ্রনাথ নিজের হাতে করিয়া গিয়াছেন।

এ কি সত্য্য সকলি সত্য্য, যে আমার চিরভক্ত

আরো কয়েকটি গানের কবির নব্যঙ্কিত স্বরলিপি ‘বীণা বাহিনী’ এবং ‘অনন্স সঙ্গীত’ পত্রিকায় পাওয়া যায়—তবে শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী প্রভৃতি সেগুলির সত্যতা বিষয়ে সন্দেহ। তিনি বলেন,—‘হয়তো অঙ্ক কেউ করে তাঁর নাম বসিয়ে দিয়ে গিয়েছেন। কবি তো কোনাধিন সে কথা বলেও যান নি!’

রবীন্দ্র সঙ্গীতের রসোপভোগ্যতা সমালোচকদের মধ্যে নাম করতে হয় ঐর্ধ্বজিপ্রসাদ বুথোপাধ্যায়, ঐন্দ্রিনীপকুমার রায়, ঐহেবেন্দ্রলাল রায়, প্রভৃতির। ঐর্ধ্বজিপ্রসাদ বুথোপাধ্যায় অবশ্য ত্রিক সমালোচক ন'ন সমগ্রদায়ই বেশি। তিনি কবির গানের সম্বন্ধে শেষ কথা বলিয়াছেন—“সে প্রয়োজন (৭) রবীন্দ্রনাথ দিষ্ট-রয়েছেন হিন্দুবান্ধী স্তরপদ্ধতির abstract natureকে concrete করে; এক কথায় স্তরকে humanise করে, অশচি তাকে আঁট থেকে artificialের নীচু পংক্তিকে নামতে না দিয়ে। তুনেছি ও পড়েছি বিশেষে বীট হোফেন এই কাণ্ড করেছিলেন। যদি সত্য হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে তাঁরই সঙ্গে তুলনা করা চলে, আমাদের দেশে তাঁর সমতুল্য composer জন্মায় নি।”

রবীন্দ্রনাথের গানের স্রেষ্ঠ ভাষ্যকার কিন্তু কবি নিজেই বরণ। তাঁহার বহু প্রবন্ধে এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে নানা প্রসঙ্গে নানা উক্তির মধ্যে কবি নিজের গানের রূপ এবং অঙ্গপর্ণ সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাব্যর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। ঐর্ধ্বজিপ্রসাদ এবং ঐন্দ্রিনীপকুমার তাঁহাকে নানা প্রশংসা করিয়া তাঁহার গানের উপর নানা তুল্যাবান সম্বন্ধ সংগ্ৰহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার গানের ‘জ্ঞান’ বা ‘শাসন’ যে সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ইচ্ছিত প্রথম তাঁহাদের কাছেই করিয়া গিয়াছেন। এই ‘জ্ঞান’ যে কি জিনিষ একটি উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্ট হইবে—ভাঁহপল্লী এবং মূলতান, গৌরী কিংবা পূর্ববী, আশাবতী কিংবা তৈরবী এই সব রাগিনীর মধ্যে তাঁদের জ্ঞানে পার্থক্য নাই, কিন্তু নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে ইহারা উদ্ভাসিত। ব্যক্তনার তাহার। সম্পূর্ণ বসন্ত, ধ্রুৱ তরীতে যে আখ্যাত তাহার। হানিবে ভাষান্তেও মিল থাকিবে না। প্রত্যেক রাগিনীর মধ্যে এমন একটি গর্ভ আছে বাহ্যের মিল অস্তর রাগিনীর সুরে লত বোঝ করিলেও ছুটিবে না; সেটাই সে রাগিনীর একান্ত নিজস্ব বা-গুণাদী পরিভাষার রাগিনীর ‘জ্ঞান’।

রবীন্দ্রনাথের গানেও সেরকম একটি জ্ঞান বা প্রাণ-শাসন পড়িয়া উঠিয়াছে, এটাই রবীন্দ্রনাথের গানের অন্তর্য সম্পদ। এটাই তাঁহার নিজস্ব সৃষ্টি।

রবীন্দ্রনাথের গানে নানা রাগরাগিনীর রসপ্রোত আবেগিতা উঠিয়াছে, উচ্ছলিত স্রোতে স্রবস্তর নতিয়া উঠিয়াছে, স্রোতাঙ্গা গানের বেগে যেন নিরুদ্ধে তাগিয়া চলে—

বানে বানে ফিরে ফিরে তোমার গানে

দিবাযাত্রি চেষ্টারের মতো চিত্ত বাহু হানে।

মজব্বানি ছেগে ওঠে উল্লাস তুলানে

রাগরাগিনী উঠে আবেগিতা তরঙ্গ নতিয়া

গহন হতে উচ্ছলিত স্রোতে।

তৈরবী রামকেনী

পূর্ববী কোমরা উচ্ছলি বার বেশি,

কেমিরা ওঠে জয়জয়ন্তী, বাগেশী কানাকা গানে গানে

তোমার আহার ভেসে

গানের বেগে বাব নিরুদ্ধে।

বিদেশ হইতে সুরের রামপুর আসিয়া সোনার কাঠির পত্র করিয়া এদেশের সুরের গুহক রামকন্তার নিভ্রা তানাইরা যেন এই আশান্তেই কবি তাঁহার গানের ধোয়া লইয়া বসিয়া বহিয়াছেন।

“সম্প্রতি আমাদের দেশে জিরকলার যে নবজীবন লাভের লক্ষ্য দেখছি তার মূল্যে সেই গগরপাতের হাফগুজের সোনার কাঠি আছে। কাঠি ছোতার এবং অবস্থার সুরের ঘোরটা যখন সম্পূর্ণ কাটে না, তখন আমরা নিজের শক্তি পুরোপুরি অপ্রভব করি, তখন অহঙ্করুটাই বড় হয়ে উঠে, কিন্তু ঘোর কেটে গেলেই আমরা নিজের জোরে চলতে পারি।

আমাদের শাঙ্খিত্যে চিরে সমুদ্রপাথের রাগপূজ এসে পৌঁছেছে। তিনি সঙ্গীতে পৌঁছেননি। সেই জন্যই আজও সঙ্গীত আগতে ঘেরী করচে। অশচি আমাদের জীবন ভেগে উঠেছে। সেই ওঠে সঙ্গীতের খেতা টলমল করছে।”

স্বপ্নশেষ

অমলেন্দু ঠাকুরদাস

ছোট ভাই মন্টু। বোনটা আরও ছোট—লতা।

“ভোর কি হয়েছে রে দিদি। বাপ করেছিল কী?”

সুপ করে কর্ণার কোলের ওপর তালিমে পড়লো মন্টু।

“কই, না তো। কিছু তো হয় নি আমার।” ঘোর করে হাসবার চেষ্টা করলো কর্ণা। তাইকে আরও নিবিড় করে কাছে টেনে নিলো কর্ণা।

“তবে এমন করে বলে আছিল কেন?”

মন্টুটা যে কি। ঘরের কোণে পুতুলের সংসার নিয়ে ব্যস্ত ছিলো লতা। হঠাৎ ঘুম ভুললো—“বডো বোকা তো তুমি মন্টু। জানিস নে, দিদির বিয়ে হবে শিগগির। মার মতো বউ হবে, বোনটা দেবে, সিঁচুর পরবে। না রে দিদি?” বলেই বিল বিল করে হেসে উঠলো লতা। সেতুলেরের পুতুলের গায়ে ছোড়া শাড়ীর পাড় জড়াতে জড়াতে।

“শক্তি দিদি, তুই আমাদের মা হয়ে যাবি।” চিৎরিত মুখে ছোট হাতখানা কর্ণার গালে ত্যাগলো মন্টু।

“য্যেৎ। বডো ভাংবেও বুকে কেটে হাসি বেরিয়ে এসে। কর্ণার—ওগু বল না মন্টু। পাপ হয়।”

“শক্তি দিদি এতটুকু যদি বুদ্ধিভক্তি থাকতো মন্টুটার। মার না বেঁচু।” পুতুল কেসে উঠে এসে লতা। দু হাত নেড়ে ভারিভায়ে বোকাতে শুরু করলো—“মারে, বিয়ে হলোই আমাদের মা হবে কেন? আমাদের জামাইবাবুর বউ হবে। আচ্ছ তাই দিদিকে বেগতে আসবে। কত-লোক আসবে যেহিস।”

“লতা।” ছুটে গিয়ে ছোট বোনের বচ্ছটা চুল চেপে ধরে কর্ণা। সত্যোরে একটা চড় কবিরে দেহ পালে—“বেশ ভেঁপো হয়েছিল না? যা বেরো।” একটা দাঁড়া বেরে কিছুদূরে গুকে সরিয়ে নিলো কর্ণা।

নিম্নো কথা বলা পাপ কিং এমন সত্য কথা বলার

যে কি দোষ থাকতে পারে তা ভেবে পেল না লতা।

অবচ প্রতিবাদ করার মতো। তাহা বা সাহসও নেই ওর।

উপারম্বর না দেখে তাই কেঁদেই ফেললো হঠাৎ। যেজিরে

পেলো কাঁদতে কাঁদতে। হঠাৎ মার কাছে নালিশ জানাতে।

লতা বেরিয়ে গেলে তাইকে আবার বুকে টানলো কর্ণা। খাটের ওপর বললো।

“ওকে মারলি কেন রে দিদি।”

“এমনি।” ছোট ভাইয়ের নরমচুলে হাত বুলাতেও বুলাতে এগ্ন করলো কর্ণা—“আজ্ঞা মন্টু, আমি চলে গেলে খুব কষ্ট হবে তোমার? কাঁধবি।”

“বাতর, চলে যাবে কেন? কোথায় যাবে?”

এবারে দীর্ঘর হতে হয়। কোথায় যাবে? সে কি কর্ণা: নিজেই জানে চাই।

“বলনা দিদি, কোথায় যাবি?” মন্টুর আবেগ—

“আমার নিবি ভোর লকে। সেই সেবারে যেমন কামা-বাড়ী গিরেছিলাম আমরা সবাই।”

“এতো আর কামাবাড়ী নয়।” মন্টুর গালে আবার ক’রতে ক’রতে বললো কর্ণা। মনে মনে হাসলো।

“ভবে।”

এবারে এককোটা শিশুর কাঁচের লজ্জা পেলো কর্ণা। মন কুণ্ঠিত হলো। কি ক’রে বোকায়ে ওকে কোথায় যাবে ও। কোন বাড়ী। তাইয়ের কপালে ছোট একটা চুই এঁকে বললো কর্ণা—“খাচ্ মন্টু, খান করো। ফুলে যাবে না?”

সুপ! কর্ণা নিজেই যেন চমকে উঠলো শব্দটা শুনে। “হাচ্ ইরানী” পরীক। কবে শেব হ’য়ে গেছে।

হুসতো খাড়া দেবারও সময় হয়েছে এখন। আজকাল সেবে। ইতিহাসের নবর অবজ ইতিমধ্যেই জেনে

কেলেছে ও—কাই। কাই'গাল' শিয়ার চেয়ে ছ' নম্ব
বেশী, অঙ্কে চৌষট্টি, শিয়ার চেয়ে পাঁচ নম্বর কম।
তা হোক, সব মিলিয়ে শিগ্রাকে পেছনে রাখতে পারলে
তো কথাই নেই কোন। সে এক চরম আশ্চর্যসাগ।

মন্টুর হাত ধরে নিজের উঠে দাঁড়ালো কর্ণ।
কোণের আলনা থেকে শাভী, ব্লাউজ আর সারা টেনে
নিলো। মন্টুর জন্তে একটা প্যান্ট। সাবান' আর
গামছাটাও। তারপর পাপা বাড়ালো রান্নাঘরের দিকে।
ভেল আছে বাথরুমে।

"কোণার বাড়িল।" রান্নাঘরে ছিলেন মা। গ্রন্থ
করলেন।

"মনে করতে।" নরম গলার বললো কর্ণ।

"মন্টু আর লতাকে দান করিয়ে বে। চুই পুর
করিগ।"

আখ্যাত গেলো কর্ণ। হিম হয়ে গেলো সারা
শরীর। এ আপত্তা অনেক আগেই হয়েছিলো ও।
আজকে কেউ ওকে যেতে দেবে না স্থলে। বাবা হবে।
কিন্তু ওকে যে যেতেই হবে। হরতো নতুন কোন খাতা
দেবে আজ।

"মা।" রান্নাঘরের দরজার এসে দাঁড়ালো কর্ণ।
মিনতি জানালো, অশ্বমেধ—"আমার একটু দরকার
আছে মা। বাই।"

"না।" উজুনটা কাণামাটী দিয়ে নিকোতে নিকোতে
বললেন শান্তি দেবী—"অকিলে বাবার আগে উনি
আমার বরণ করে গেছেন। বাসনে। ফিরে এসে
তোকে যদি দেখতে না পান তবে ভীষণ রাগ করবেন।"

"বাবা আসবার আগেই আমি ফিরে আসব মা।"

"উনি একটু ভাতাভাতাড়িই ফিরবেন আজ। ছুটি
নেবেন অকিল থেকে।"

আরও কিছুক্ষণ শুভ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কর্ণ।
সব খুঁটলো দিতে—"আমিও বারটার আগেই ফিরব মা।"

"হেঁজু কি এসব?" হাতের কাছ বহু রেখে উঠা
হবে উঠলেন শান্তি দেবী। বিম্বস্ত হলেন—"এত বে

মানা করছি কানে বাজে না? নিজের জেদটাই যদি
রাখবি তবে আমার ভিজেন করতে এসেছিল কেন?
হা না, হা।"

এরপরে আর কথা বাড়ালো না কর্ণ। ঘরে ফিরে
এলো শান্তি পারে। সর্বস্ত বুক উজাড় করে কাঁদতে
ইচ্ছে করছে ওর। মনে হচ্ছে চীৎকার করে কাঁদতে
পারলেই বৃষ্টি বজ্রি পেলত। শান্তি পেলত। সারা
ব্লাউজ শাভী খাটের কোণে ছুড়ে ফেলে দিয়ে ভেঙে
পড়লো কর্ণ। গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। কাহার
কাহার ও মরে যেতে চার আজ। তবু হরতো এ
নিশ্চিত আহতির হাত থেকে মুক্তি পাওয়া বাবে না।

অনেক কেঁপেছে কর্ণ। চোখের জলে উজার করেছে
মুক। কিন্তু আশ্চর্য, কেউ এগিয়ে আসেনি। সমবেদনা
নয়, সাধনা নয়, লিটেও হাত রাখেনি কেউ কোনদিন।
ওর জীবনকে জ্বর দিয়ে অশুভব করার মতো একজন
মানুষও নেই পৃথিবীতে। হাতে আশ্রয় করেও অসন্তঃ
এ সবটুকু থেকে বাঁচাতে পারে নিজেদের। গ্রাণ পেতে
পারে। শীতের শিশিরে ভেঙা নেভানো লতা যেমন
প্রভাতী রোয়ের ছোঁওয়ার সজীব হয়ে ওঠে। বলদলার।
আজ নেই অশ্ব এক বহোর আগেও ছিলেন
একজন।

হুবোদবা শিশুতো তাই ওর। উত্তর তিরিশ
দীর্ঘাণী পূজব। বইয়ের পোকা। অধ্যাপনার কাজ
ছাড়াও বেটুকু সময় হাতে থাকতো তাঁর সেটুকু সময়ও
জীকে ধরে বলে বইয়ের অক্ষর গুণতেই যেখেছে কর্ণ।
বেশ বাহুব। আজও মনে আছে মাঝে মাঝে এসে
ওকে গড়িয়ে যেতেন। পড়ানোর চলে আজব
পৃথিবীর অনেক বিভিন্ন খবর শুনিবে যেতেন রোজ।
বলতেন—"আমু লম্বুছব জন্তে পড়াশুনোই যদি না
করতে পারিল তবে হবে বাস।"

তাই ক্রাস নাহিনেই যখন কথা কুললেন বাব, তখন
হুবোদবা বললেন—"আপনারা কি পাগল হয়েছেন
বাবা। এটুকু মেরে, গুরোপুত্রভাবে জীবন লয়েছে

একটা জ্ঞানও হয়নি এখনও আর এরই মধ্যে—”

“না বাবা, বুড়ো হয়ে গেছি। চোখের ওপর মেয়েকে আর কতো বড়ো করবো বলে।” বাবা বললেন পান চিবোতে চিবোতে—“যেহে বড়ো হলে বুড়োদের পাক। ফুলে আরও পাক হবে।”

“এত ভয় কেন আপনাবোত। বরষা বাড়ছে বলে কি অপরাধ করেছে কণা? পড়াশুনা করতে চাইছে বরষা। যেহে হুগে জন্মেছে বলেই কি ওর জীবনের কোন মূল্য দেবেন না? ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে, জোর করে ওকে নিয়ে পুতুল খেলতে চান।”

বাবা হরমোটা এরপর কিছু বলেন নি সেদিন। পানের বরে বইয়ের ওপর চোখ রেখে উৎকর্ষ হয়ে সব স্তম্ভিত কণা। চুপ করে কথাগুলো শুনে নিয়েছিলো।

“সেখাপড়া করে কি হবে বাবা।” বাবাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন মা—“যেহেমান্ন হুগে জন্মেছে, সেটা জীবনটাই তো শেষে বরষা করে কাটাতে হবে। ইাড়ি ঠেলেতে হবে আমাদের মতো।”

“মোটাই না।” সুবোধনা প্রতিবাদ করলেন—“যব তো করবেই কিছু সে তো অনেক পরের কথা। আগে পান টান করুক।”

“আর কতদিন? আমকা কিছুই করিনি সারা জীবনে সেমজে কি ঋণ পেয়েছি কোন।”

বড়ো খেচো যুক্তি। সুবোধনা হাসলেন—“আপনাতা যে সময়ে করবার মতো ছিলেন সে সময়ে তো চেলেয়াই পান করতো একশোর একজন। আপনি সহর দেখেছেন বিরে হুগরার পর আর কণা সহরের বেয়ে, ফুলে পড়ে কলেমটা। না যেহে কি চাডবে? আর আপনাতাই বা বাধা দেবেন কেন? আপনাবের যুগ মিরে তো করবার দিনক বিচার করা যায় না মায়ীবা।”

বাত চুপ করলেন। বাবা মৌন।

“অমো বাত হুজেন কেন। আর তো বাত চুটে। হুজার ভাষার না হুগে ভাবে দেখা যাবে। অন্ততঃ ফুলের পড়া শেষ করুক।” সুবোধনা বোকােলেন সহজ

ভাষায়—“পান করে ও যে সুখ পাবে এখন কি তার চেয়ে বেশী সুখ ওকে দিতে পারবেন আপনাতা?”

মা চুপ করলেন। বাবাও মুখ ফুললেন না আর।

উজানমোত্তের মুখে বাঁধ থাকলেন সুবোধনা। ঢকা করলেন কণাকে। কিং শান্তি পায় না কণা, ব্যক্তি পায় না এঁতে। ও জানে, আবার তাকে বাঁধে এ বাঁধ, বড়-কুটোর মতো ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে অব্যাহিত লোকের বিকে।

“ওহা আমার যেহাই দেখে না সুবোধনা।” সমস্ত শরীর চেলে দিয়ে থোপা বইয়ের ওপর একমিনি মুষ্টিয়ে পড়েছিল কণা। চোখের লালকে ঝুঞ্জে পাবে নি—“বাবাকে আপনি চেনেন না। আপনাকে না জানিয়ে ভেতরে ভেতরে তিনি যৌজ নিচ্ছেন এখানে ওখানে।”

“কি করে জানলি তুই? কে বলেছে তোকে।” ওর লুটোনো বাধা আস্তোতোভাবে ফুলতে চাইলেন সুবোধনা—“ওসব তোর কুল ধারণা।”

“আপনি জানেন না।” আস্তে আস্তে মুখ ফুললো কণা। চোখ ফুটলো আঁচল দিয়ে—“বেড়ানোর ফুলে কাল বিকেলে মাগীবাড়ী নিয়ে গিয়ে আমাদের ঠাণ্ড করিয়েছে কতোগুলো লোকের সামনে। ওদের অনেক বাজে প্রেরণও উত্তর দিতে হয়েছ, গানও পোনাতো হয়েছ।”

“হঁ।” কিছুকণের ভজ্ঞে বুকি জ্বক হলেন সুবোধনা। চোখের মণিতে হঠাৎ যেন আভনের হুতা দেখা গেল—“তুই পড় কণা। মন দিয়ে পড়। তোকে ভালো পান করতে হবে। আমি থাকতে তোর কোন ভয় নেই।”

“কিন্তু কি পড়ব সুবোধনা; মন নেই। ফুলের যেহেহে হালাতে দেখলে ফুলে হয় আভকাল। আবার মতো হুগতো এত কষ্ট করতে হয় না ওদের।”

“তুইও খুসীমতো চলে কণা। কোন ভয় নেই।”

এমনি ক’রেই একমিনি ওকে সাহস দিয়ে এসেছেন সুবোধনা। প্রেরণা ছুঁয়েছেন।

সেদিন কিছ একটি লাইনও পড়তে পারলেন না

সুযোগ্য। গজীরাবুথ উঠে গেলেন। বেশা আর
বৃত্তান্তিত জ্যামিতির পাতার চোখ রাখলো কর্ণ। মনে
হল, অক্ষরগুলো যেন গলছে ওর দিকে চেয়ে।
স্নেহের হাসি।

“আপনারা কি চান হামাবাবু।” মেয়েটার ভক্তি এত
টুকু যায় হয় না। ও কি কেউ নর আপনায়ের।” পমকে
ধাকালো কর্ণ। ঘর থেকে যেড়ির হাত্যায়ের বাড়িল
কি কাছে যেন। খাবলো, কান পাতলো। সুযোগ্য
বলছেন—“কাইতাল পরীকার আর মায় ছু’মাল বাকী
আছে। এখনও কি একটু লড়তে দেবেন না ওকে?”

“পড়ুক না।”

“অসম্ভব।” সুযোগ্য আজ বেশ শান্ত মনে হলো—
“আপনারা যা শুরু করেছেন তা’তে কর্ণ। কেন শুধু, কোন
বেরেই পড়তে পারবে না।” একটা অল্পবোধ করি
হামাবাবু, আমার জন্তে নয়, কর্ণার জন্তে—ওকে পড়তে
দিন। বড়ো ভালো মেয়ে, পড়লে অনেক ভালো কল
করতে পারবে বড়ো হয়ে। অনর্থক জোর করে বাজা
বেবেটাকে কষ্ট দেবেন না এভাবে।”

“তোমরা ছেলেকাছব সুযোগ্য। বুঝবে না এ সব।”
বাবাও আজ শান্ত মন খুঁ—“কেন, এ সব ব্যাপারে যাবা
খামাতে এসেছো বলোতো। তুমি কি মনে করো, বাপ
হুয়ে আবি যা করছি সে আমার মেয়ের সর্বনাশের জন্তে?
আজ বাবে কাল যদি ওর কোন বিপদ ঘটে যায় তখন
কে দেখবে? এ’ বুড়োকেই তো পাশের শান্তি ভোগ
করতে হ’বে তখন।”

“বিপদ?” চমকে ওঠেন সুযোগ্য। বিস্মিত হন।
বাইরে দাঁড়িয়ে কর্ণ। যেন শিউরে ওঠে হঠাৎ। রাগে,
অপমানে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। সুযোগ্য বললেন—“আপনি
কি বলতে চান হামাবাবু? স্পষ্ট বলুন।”

“তোমরা তো সেদিনের জেলে কতটুকুই বা জানো।
সোমর বেয়ে ঘরে রাখলে কতো বিপদ বে হু ত’র
উদ্যায় তোমার অনেক দিতে পারি। কতো চাপ।”

“ওদের লম্বা আপনায়ের এ অকারণ ভীতি, নিষে

আশতাই তো বড়ো সর্বনাশ করে। ওরা যদি সব মনে
কিছু করতে চায় তবে সেটাকেই আপনায়। সুযোগ্যের
চোখে দেখবেন অমর ভাবেন না যে নিষেধের জীবনের
অন্তে ওদেরও একটা মায় আছে। হঠাৎ কিছু করতে
ওরাও তার পার।”

“এমন যে হয় না সেটা বলতে পারো।”

“হু। কিছু কর্ণ। লম্বা এসব কথা আপনি কি
ক’রে ভাবেন। এতো ওকে অপমান করা। না, না
ওকে অতো ছোট ভাবেন না। ওর ওপর আমার
অনেক বিশ্বাস আছে।”

তারপর হয়তো অনেক কিছুই বলেছিলেন সুযোগ্য
কিন্তু সে সব আর মনেতে পারেনি কর্ণ। হরকার
অ্যাডলে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ যা শুনলো তারপর আর
দাঁড়তে পারেনি ও। সব এসেছিল। বই পড়ার
জুটিয়ে লম্বাপারে এসে দাঁড়িয়েছিলো রেলিংয়ের ধারে।
আজকের মতো কতোক্ষণ যে দাঁড়িয়েছিলো এমন ক’বে,
মনে মৌ ওর। তবে এটুকু মনে আছে মনে মনে
ও লম্বা নিরোজিলো সেদিন—বুড়ার লম্বা। পড়াশুনা
যদি নাই হু জীবনে তবে মরবে। আত্মহতী হবে।

সেই লম্বার চারের দিকে তাকিয়ে থাক। হুমারী
কজার শুঁটুটি চোখের দিকে চেয়ে অনেকই হয়তো
অনেক কথা ভাবতে পারতো সেদিন। অল্প ব্যাখ্যা
দিতে পারতো মন বল এ ব্যক্তি দীর্ঘজীবনের আর আবার
আকাশের মতো অল্প লম্বা শুঁটু চোখের।

উদয় পড়ার মাক ধরিরার ভেসে বেড়ানোর মতো
শক্তি জীবন নিয়ে আরও করেকটা দিন ভরতে কর্ণ।
পরীকার আগে রাত বেগেতে কিছুদিন, দিন দুপুরে
নব ভুলে আপন মনে শুধু বইয়ের পাতা উন্টেছে। সে
সবের রোজই আসতেন সুযোগ্য। পড়াশুনা, বলতেন
—“তামো করে পড় একটা দিন। কাই’ হওয়া চাই-ই।”

পরীকা দিলো কর্ণ। হোগ লম্বার নয় কিন্তু কয়
দেহ আর অহ মন নিয়ে। খাতার পর খাতা লিখে এলো
পর পর পাঁচ দিন। কিছু পারলো না শিখ্রাকে পেছনে

রাখতে। দু'নম্বর সেবা হাজী হয়ে নতুন রূপে উঠলো।
কর্ণা। কুলগজীর সর্বশেষ সীমার। আর মাত্র একটা
বহোর বাকী। শুধু একটা বহোর।

পুণী হলেন সুবোধদা। মা-বাবাও কৃত্ত হলেন।
সোহাগ করলেন বুকে জড়িয়ে।

সুবোধদা বললেন—“আগছে বাবে কিছু এর প্রতি-
শোধ নিতে হবে। কাঠ হওয়া চাই।”

“নিশ্চয়ই” মনে আছে কর্ণার। বাবাও সেদিন
সুবোধদার কথার সাথ মিরেছিলেন। তারপর দিন
কয়েক সুবোধদাকে আগতে যেতে দেখেছে কর্ণা। সে
সময় এশে বাবার সঙ্গে কি বেন কথা বলাবলি করতেন।
কতো কিছু বোঝাতেন। আশ্চর্য, শুদ্ধত ক্ষমতা ছিলো।
সুবোধদার। বাবা একদিন নিজে ডেকে নিলেন কর্ণাকে।
মাথার ব্যত দুপুরে আদর করে বললেন—“তোমার কোন
তর নেই বা। তুই পড়। অন্তত একটা মাকী থাক।”

অনুবে ধাড়িয়েছিলেন বা, পাশে ধাড়িয়ে হাসছিলেন
সুবোধদা।

উঃ, সেদিন কি ভালো লেগেছিলো মাকে, বাবাকে।
নতুন ক'রে বাঁচবার প্রেরণা পেয়েছিলো কর্ণা। কড়
যেমে গেছে, আর তর নেই।

নতুন রূপের পড়াভরো আরম্ভ করে দিলো নতুন
উত্তম। আর মাত্র একটা বহোর বাকী। সে তো
মাত্র একটা দিন। মেথতে মেথতে ছুরিয়ে বাবে।
এই তো সেদিন ও ‘এইট’ থেকে ‘নাইনে’ উঠেছিলো।
মনে হয় দিন কয়েকের আগের ঘটনা।

হঠাৎ।

সত্যি আকস্মিকভাবে সেতারের সাত তারের পঞ্চম
তন্ত্রী শিথিল হয়ে গেলো। জমজমাট আগের হঠাৎ
ছন্দপতন বেন।

সুবোধদা থিরে করলেন। পূর্ব পরিত্তিকোন এক
ঘেরেকে। এর, এ পাশ, এখন মাঠারী ক'রে। কর্ণা
জবাব হয়নি ধবরটা শুনে। অনেক আগেই ও শুনে-
ছিলো সব। কিন্তু নাক কুটকোলেন মা-বাবা। সরবে

শুণিত মন্তব্য করলেন—“হি হি, কুলীনের ছেলে হয়ে
শেবে কোন এক মিস্তিরের ঘেরেকে—”

“মেথো, এই তো লেখাপড়া দেখার ফল। নাও,
ঘেরেকে তো পরী করে তুলেছো এবারে কিরিকি করো।”
মার সক্রোধ হাজার।

কর্ণা জানতো—এ অসামাজিক ব্যাপারটাকে আর
সকলে সহনভাবে গ্রহণ করলেও ওর মা-বাবা সহ্যেবন
না। কিন্তু ওর তো মনে হয় ভালোই করেছেন সুবোধদা।
লোকের ভরে তো আর আশ্চর্যবশিত হতে পারেন না
তিনি। এই বেশ। ছুজনের ঘর, ছোট পরিপাটি।
বই আছে মন ভালোবার আর বুক ওরা প্রেম রয়েছে
ঘর বাঁধবার। না, কোন ভুল করেন নি সুবোধদা।
অসবর্ণ আবার কি? জাত কি কারও গারে লেখা
থাকে? তাই যদি হবে তবে ব্রাহ্মণেরা সব কর্তা হ'লো
না কেন, অব্রাহ্মণেরা কালো। কমেই যেমন মাহুঘ মাহুঘ
আর পণ্ড পণ্ড হয়ে থাকে।

সুবোধদাকে সন্মর্দন করলেও কর্ণার মন ভীত হয়ে
ওঠে। একে কেন্দ্র করে আবার যদি আগের পর্বত
লজীব হয়ে ওঠে। সুবোধদা অনেক ঘুরে। কে শুকে
সাহায্য করবে আম, রক্ষা করবে কে?

হলোও তাই, সুবোধদা প্রথম যেদিন এলেন বিরে
ক'রবার পর সেদিন বাবা যেন কেটে পড়লেন তাঁর
‘ওপর’। ‘অনর্গল বকে গেলেন। সুবোধদার মুক্তি
টিকলো না। তারপর সেই যে গেলেন সুবোধদা আর
আলেন নি কোনদিন।

তারপরই কড় উঠলো আবার। ‘স্তর পেলালো ডানা-
তাজা চিল। এ ঝড়ের অপর নাম মুহুরী। প্রথম প্রথম
কানাকানি। বা আর বাবার জল্পনা। তারপরই বেধ
ঘনালো পরিচ্ছন্ন আকাশে, নাও আকাশে আকস্মিক
শব্দসর্জন।

পরন্তু রাতে কুলের দেওয়া শুকনো ক'বছিলো
কর্ণা। পাওয়া লাগলো শব্দে লম্বাই বখন গুঁহরে থাকে
তখনই নিবিবিলা আর মৌন মুহুর্তে কুলের দেওয়া

বাড়ীর কাজ করে কর্ণী। এক নর তো গ্রাম্যর
ট্যানয়েনন। সেদিনও ও ব্যস্ত ছিলো আশন কাছে।

“একটু তুনে বা কর্ণী।” না এসে ডাকলেন হঠাৎ।

মক্টু-আর লতা অঘোরে ঘুনেছে এক পাশে।
অগ্রথরে বাবা। অবাক হলো কর্ণী—এতরাতে হঠাৎ
কেন না। “কিছু বলবে?”

“শোন।”

কর্ণী উঠে এলো। করিডরে গাড়িরে কর্ণার কানে
বিধ চাললেন না। সবশেষে বললেন—“তোরা বাবা
কথা দিয়েছেন। পরতুদিন বিকেলে আসবে ওরা
হুদি।”

নিউরে উঠলো কর্ণী। বুকটা হটাৎ হ্যাৎ করে
উঠলো যেন। হাতে ট্রট চেপে বাবুফল হলো।

“বা বেনী রাত করিনসে! হুমে শিরে।”

চলে বাচ্ছিলেন শান্তি দেবী। হঠাৎ দুহাতে
নাকে জড়িয়ে ধরলো কর্ণী। সমস্ত বুকের রস নিঃড়ালে
কারার তেজে পড়লো হঠাৎ—“আবার আবার তোমরা
স্বত করিলে না।”

“তুই তাবিস নে না। আশ্রয় কি তোরা মন চাই,
বল। তুই তো আশ্রয়ের ঘরে।” চলতে চলতে
থেকে পাড়ালেন না। বেবের মাথার হাত বুলালেন
আদর করে—“ভালো ছেলে দুহাস। আমার মেজবাকে
তুই চিনিস তো। ওর শালা। বেশ ছেলে। ব্যবসা
করে, বাড়ী আছে কলকাতায়। বিয়ে করে নাকি গাড়ী
কিনবে গুনেচি। এমন ছেলে কি সহজে বেলো না।
এখন তোরা ভাগ্য আর আশ্রয়ের কপাল।”

আরও বোরে নাকে হ’হাতে চাললো কর্ণী—“না না
না। পারবে না, পারবে না, আমি। অসম্ভব। আমার
রক্ষা করে। বাচাও না।”

“কি পাগলামী হচ্ছে কর্ণী। ছাড়।” নিজ হাতেই
ঘরের আবেষ্টনী থেকে নিষেকে ছাড়িয়ে নিলেন শান্তি
দেবী—“এখনই কি তোরা বিয়ে হচ্ছে নাকি? ওরা শু-
ভালো করে সেখে বাবে একবার। অবস্ত দুহাস ভোকে

অনেক আগেই দেখেছে। ওর ভালো লেখেছে বলেই
তো বেজবাকে দিয়ে খবর পাঠিয়েছে। তাই তো বলি,
এ তোরা ভাগ্য, জোর বরাত।”

“না না, এখন নয়। রাত একটা দিখ।”

“রাত হয়েই কর্ণী। ঘরে বা।” নানন, পালেশ
ঘর থেকে বাবা হাঁকলেন। শ্রমণ জহতীর সিংহনাদ
মনে হলো যেন।

“বা না ঘরে বা।” কিসকিসিরে বললেন না
তারপর ত্রুণায়ে নিচ্ছেই গরে পড়লেন। হাতে হাত
চেপে আরও কিছুক্ষণ গাড়িরে রইলো কর্ণী। নীরব কারার
বুক ভরে গেলো। রাতের অন্ধকারে সে অল দেখলো
না কেউ। নরম বুক জলে জলে উঠলো। আর গাড়িরে
থাকতে পারলো না কর্ণী। ছুটে এলো ঘরে। হাত
পা ছড়িয়ে গুরে আছে লতা আর মক্টু। পড়ে আছে
খোলা পাটীগণিত, আবকবা সরল কুশীল বৃকে নিয়ে তেমনি
গুরে আছে বাতাতা। বুকটা যেন আবার একটা হাক
বেলো হঠাৎ। কীকিরে উঠলো। নীরবে নয়, হুশিরে
হুশিরে কাঁদলো কর্ণী। প্রুুর কাঁদলো। বাসিনে মাথা
ভাঙ্গে বাসিন ভেজালো। রাত দুপুরে কে যেন এসে-
ছিলেন ঘরে। বাতি নিভিয়ে আবার চলে গেছেন।
হরতো বাবা।

সে রাতে ঘুঘোর নি কর্ণী। কেলেছে। সারারাত
খেগেছে।

পরতুদিন। অর্থাৎ আজ।

আজকের মতো এতক্ষণ গুরে ছিলো কর্ণী।
হুচোখের জল কখন বে মাথার নীচে বাসিনের কিছু অংশ
গোল ঘরে ভিকে গেছে থেরাল করেনি ত্রু। আজ ওর
আলবে। আসবেই। বিকেল চারটের বাবা আসবেন।
হৈ হুতোড় করে কিছু বিক্রি আনবেন, ঘর লাগাবেন।
দলবল নিয়ে ঘর বেশে এসে হুকবেন সবাই। তারপর
স্বত হবে কনে সাঝাবার পালা। কোনদিন হুখে
পাউডার না মাখলেও ওকে মাখতেই হবে আজ। চোখে
কাঁদল টানতে হবে। অডি পাড় লাগ শাড়ী ওকে তোরা

কৰে পৰাবে লুকাই। বিহেৰ অজ্ঞে কৰে বাৰা অলভ্যৰ
জলো গায়ে তুলতে হ'বে। এত আভুৰ কেনিহিন কৰে
নি কৰ্ণ। মনে মনে দুপাই কৰেছে এতকাল, এড়িবে
চলেছে। কিন্তু আজ সব কৰতে হ'বে। ভাৱপৰ হাঁচি
হাঁচি পায়ে বসতে হ'বে আগন্তুকদেৱ হুঁহুহুহু। অবাৰ
এৰ আসবে নহ, বাদে শতীৰ পুড়ে গেলেও সে বদেৰ
উত্তৰ দিতে হ'বে। বাৰ শেখানো হতো আৰ্হেক হুঁহে
য়েথ আৰ্হেক উচ্চাৰণ কৰতে হ'বে অৰ্হ'ফুট হ'বে।
গোভাবীৰ হতো বাৰা নেটা বুঝিহে নোহন তাহেৰ।
ভাৱপৰ অহুৱোহ আসবে গান শোনানোৰ। সেও
শোনাত্তে হ'বে। কুলেৰ ক্লালে শেখা গোটা পাঁচেক
গান জনো আছে ওৰ। বাৰা বলেছেন—এই বধেই,
আত মৰকাৰ নেই। ভাৱপৰই শেষ হুৱেছে গানের ক্লাপ
কৰা। এৰপৰ শেষ হ'বে ওদেৰ জলবোদেৰ পালা।
কনে দেখাৰ আলোৰ লগ উৎসে গেলে পৰ বিষ্টি হাসি
হুঁহুৰে একে একে বিহাৰ নেবে লুকাই। বলে বাবে
পৰে জনানো হ'বে। হুঁহুৱাৰে অভিজ্ঞতাৰ আজ
পুৱাপুৱি অভিজ্ঞ কৰ্ণ। অচল টাক। বাজিৰে সেৱাৱনত
ওকে বাজিৰে যেনেও ওৰ। বহাৰুপেৰ কীত-বিকীত
কীতদাগদেৰ হতো। লজ্জাৰ অপমানই শুণ নহ,
কোণেও গাৰা শতীৰ তি তি কৰে কৰ্ণাৰ। শিউৰে ওঠে।
ছিঃ ছিঃ এ আৰাৰ কী বীতি। চেনা নেই, শোনা নেই,
কতগুলো পৰপুত্ৰেৰ সামনে একটা মেৱেৰে সাভিৰে
দেখানো! বৰি বিহে না হ'ব কোনহিন। তবে তো
সে বাহুবগুলো কোনহিন আপন হ'বে না আৰ। একটি
জন্তু কৰ্ম্মাক অপমান কৰাৰ পুৰোণ পাৰে শুণ। কি বোৰ
কৰণো তবে হেতোৱা আৰ হাত্তাৰ পাশেৰ লোণগুলো!
ছিঃ ছিঃ কৰ্ণাৰ সাৰ। শতীৰ দিন বিন কৰে ওঠে। লজ্জাৰ
নহ, শুণাৰ। কুল হুৱে ওঠে ওৰ বন।

কিন্তু উপাৰ নেই। ও বড়ো অসহাৰ আজ।
নিৰুপাৰ। পুৰোণবা কাছে নেই, কেউ বন্ধা কৰবে না
ওকে, বাঁচাবে না কেউ।

ওৰা এলো। এখামতো লুকাই হলো। পৰে কবৰ

দেবাৰ এতিহাসিত দিহে বিহাৰ নিলো। সাতটা নাগাৰ
পৰও এলো কুহিন পৰে। হাতে নহ ডাকে।

হুলে বাওৱাৰ অজ্ঞে বোৱোজিলো কৰ্ণ। একগনো
বই-খাতা বুকে চেপে। সৰে লতা। বৰজাৰ হুঁহুই
শিঙনেৰ সৰে বাক বাওৱাৰ উপক্ৰম। বাৰা চিঠিটা
হাতে পেলো কৰ্ণ। অপরিচিত হস্তাক্ষৰ। কেমন
বেন সন্বেহ হলো ওৰ। বড়ো পাকা মেৱে লতা। হ'ব
তো বাকে বুলে যেনে বন। কৰ্ণ বলগো—“তুই একটু
গাভা লতু। বাকে আমি দিহে আসছি চিঠিটা।”

হ'বে কিহে বাৱেৰ হাতে কিন্তু চিঠিটা দিলো না
কৰ্ণ। আড়ালে এসে বইৱেৰ তাকে রাখলো। ভাৱপৰ
কুল এসে সতীৰ্বাদেৰ চোখেৰ আড়ালে লুকিৰে পড়তে
হলো। নইলে ভৱ আছে! বলবে—প্ৰেৰণাৰ।

একি ?

চমকে উঠলো কৰ্ণ.....“অমত কৰিহাৰ কি আছে
বহুন। গাৱে বধন নিজেই হতোপ্ৰাপোষিত হইয়া
এজোৰ পাঠাইয়াছে তখন আমাৰ আৰ কি কৰিয়া অপহৰ্ম
কৰি। এখামতো একবাৰ বেৰিতে থিয়াছিলাম বাঁহ।”
পড়তে পড়তে যেনে উঠলো কৰ্ণ। চোখ জলে উঠলো।
ভাৱপৰ আৰাৰ লুটি বুলিৰে গেলো ক্লন্ত—“তবে সেইজন্তু
নহ, আপনাৰ কৰ্ম্ম আৰাদেৰ সত্যই মনঃপুত হইয়াছে।
একপে বহাবিহিত অহুষ্ঠানাদি নিশাৰ হইলেই বহল...”
বাহুহাতে চিঠিটা বন্ধ কৰলো কৰ্ণ। মৰকাৰ নেই
আৰ পড়বাৰ। হুচি হুচি কৰে ছিড়ে তাকালে
চাৰিহিকে। কেউ নেই। নিশ্চিন্ত বনে তিনতলাৰ
য়েদিংগে হুঁকে হুঁকে দিলো আকাশে। অনেকখানি
ভাৱাৰ জুড়ে দুলতে দুলতে গোল হ'বে নেমে গেলো
নীচে। সেহিকে তাকিহে কৰ্ণ হাসলো মনে মনে।
উঃ, বাঁচা গেলো। তাগিয়া ওৰ হাতেই পড়েছিলো
চিঠিটা। পৰিতৃপ্ত মনে ও ক্লালে এসে বসলো। আৰ
জন্তু নেই। যেন কেউ গেছে।

কুল থেকে কিহে নিজেৰ হ'বে চুকছিলো কৰ্ণ।
বহকে গাভালো। পাশেৰ হ'বে কাপ্ৰেৰ কম্বিক্সানি

বেন। সব কিছুই আত্মকাল বড়ো সন্ধ্যের চোখে দেখে কণা। ছুটি ছুটি পায়ে এগিয়ে এল ও। কান পাতলো। আবার ভর গেলো ও। কিন্তু হয়ে গেলো। না আর যেমননা।

“ওরা বলছে অস্বাভে।”

“অস্বাভে।” না ধামশেন—“কিন্তু ওর বড়ো ইচ্ছা স্ট্রাক্টকটা পাশ করে। ওদের কলো না আর ক’টা দিন অপেক্ষা করুক।”

“পাশ!” মেজমামা অবাক হলেন বেন—“বলতিস কি? তাহলে কি এ ছেলে পাশি ভেবেছিল।”

“কেন?”

“কেউ কি আর নিজের চোরে বটকে ওপরে উঠতে দেয়? যে না।”

অসহ। আর গাড়ালো না কণা। আন্তে আন্তে নিজের ঘরে ফিরে এলো। না, এরা বাঁচতে বেবে না শুকে। যেবেই ফেলবে। অগতঃ এভাবে কোন যোগ করেনি কণা, অপরাধও নর। একটি শুধু একটি, অস্বগত একটি। হেলে হয়ে অস্বাভে পাতেনি, বেয়ে হয়ে অস্বাভে ছিলো।

বেশটা বখান বাংলাবশ তখন এটা একটি নর—পাশ।

বুক থেকে বইয়ের খোঁজ টেবিলে নামালো কণা। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে ওর মনটা বেন কেমন করলো হুঁতৎ। ওমরে উঠলো। বুকের আশ্রয় মতো সবরে এগুলো বুক চেপে রেখেছে এতকাল। এগুলোকে আত্ম বুঝি সরিয়ে দিতে হবে। বুক চেপে রাখতে চাইলেও বুঝি টেনে নেবে সবাই। লেখনা ভাবলেও কণার চোখে অলংকার পড়ে। প্রাথমিক নায়ে বেন।

ঘর বন্ধ করে সেদিন অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলো কণা। প্রাথমিকের শুভোটি ঘর। একা একা বসে আপন মনে আকাশ পাতাল ভাবলো কান্দলো। কিন্তু কেউ বুঝলো না; ওর বন, ওর ব্যথা। বাইরে সেই বড়বন, ওর বৃষ্টির ঢাকনা।

সেদিন পড়ার বীরে বীরে মার কাছে গিয়ে গাড়ালো

কণা। রাগেরে নিজের কাছে ব্যস্ত ছিলেন না। ধরলার ঘরে গা ছুঁয়ে আলতোভাবে গাড়ালো কণা। ভাবলো—“না।”

“কিন্তু বলবি।”

“তোমরা কি সত্যি সব ঠিক করে কেলেঙ্কারি।”

আচল কোণে চোখের জল মুছলো কণা—“আর ক’টা দিন তোমরা পারলে না অপেক্ষা কর্তে। আর বাড়ি বাস হ’য়েক।”

“ওসব আবার বলতে এসেছিল কেন। বাপকে গিয়ে বল।”

“অমন করো না না। দোহাই তোমার, একটু শোন—আরও একটু এগিয়ে এলো কণা। মার কাছে এসে বললো—আমি তোমার কথা দিচ্ছি না, পরীক্ষা দিতে মিলে আমি ভালো পাশ করবো। হুঁটা মাল অপেক্ষা করো শুধু, আর বাড়ি হুঁটা মাল। তারপর আমার নিয়ে তোমরা যা খুশী ভাই করো, কিছু বলবো না। বাবা যেব না।” বলতে বলতে লুটিয়ে পড়লো কণা। বাহুর পা জড়িয়ে বসলো।

“এই দেখো, কি হচ্ছে এসব।” বলতে বলতে নিজেই ছ’পা সরে বান শান্তি দেখী—“বিরের নামে অমন অমনকি মেরেকেই কান্দতে দেখেছি বাপু কিন্তু এমনটি দেখিনি। আরে আমার বখান থিয়ে হঠাৎছিল তখন তোমার বাপের বয়স কত ছিলো জানিস? বাড়ি উনিশ।”

“তা হোক না।” কণা মাথা তুললো আবার—“এ বিয়ে করবো না আমি। এখন তো নয়।”

“করবি না তো করবি কি?”

“পড়বো।”

“পড়বো।” বড়ো শ্রীহীন একটা অকতরী করলেন শান্তি দেখী। বড়ো বিদ্রী় টেকলো কণার কাছে—“পড়ে পড়ে তো মেরে ওই সুবোধদা হবেন। লেখা-পড়ার পৌড় চের চের জানা হয়ে গেছে। যেমনি ছেলে-সুবোধর তেমন বিয়েও করেছে একটা—”

ক্রমে ক্রমেই বা উগ্র হয়ে উঠছেন, কল্যাণার্ভার সংঘর হারাচ্ছেন। লক্ষ্য করলো স্বর্ণা। কিন্তু কি ক'রে তাঁকে বোঝাবে স্বর্ণা—লেখাপড়া না দেখার কল তিনি নিজে, আর হুমিত্রা বৌদি যে কতো উঁচু জাতের বেয়ে সেটা বোকার কলভাও নেই কারো। আর, আর—

রাগাঘর থেকে উঠে এলো স্বর্ণা। নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করলো। আর কি করেই বা বোকাবে ও মাকে, বাবাকে—জুগেবাবা আর বাই কখন তাঁর মত বাবী পেতে সব মেয়েই চার। সেজন্তে হুমিত্রা বৌদির মতো নিজেকে গড়ে তুলতে হয়। স্বর্ণা তো ভাই চায়।

অফিস থেকে ফিরে এসে সবই ভুললেন বাবা। সত্যের সঙ্গে মিথ্যে মিশিরে কি বলছেন হাতা মবস্ত জানে না স্বর্ণা। তবে ভুললো, গুর বন্ধ দরজার কাছে এসে চৌক্যার করে বসছেন বাবা, ওকে শোনান্ধে—“আমি কিছু ভুলবো না, অনেক প্রেরণ দিয়েছি, এবার আর নয়। এ বিয়ে হলেই আসছে অর্যানে। হ'তেই হবে।”

কি বেন মনে হ'লো। চোখের জল দুড়ে উঠে দাঁড়ালো স্বর্ণা। মনে মনে শক্ত করলো নিজেকে। ছুটে এলো দরজার কাছে। বাবার পা জড়িয়ে ধরবে ও আজ। চোখের জলে পা ভিজিয়ে দেবে, প্রাণভিক্ষা চাইবে। দরজা খুলে বেরিয়ে এলো স্বর্ণা।

ছুতো পবে কোথায় বাবার ভক্তে বেন তৈরী হচ্ছিলেন বাবা। গভীর হাছব। আজ বেন আরও গভীর। চোখে চোখ পড়তেই জিজ্ঞেস করলেন—“কি চাই?”

অনেক বলার ছিলো স্বর্ণার। একটু তর পেলো বেন। মৌনমুখে মাথা নোরাঙ্গো।

“শাক, তোমার মা'র কাছেই গুনেছি সব।” ছুতোয় ক্রিতে বেঁধে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন বাবা—“দোনো আমার হকুম, কাল থেকে তোমার কুলে বাঙরা বন্ধ। বাইরেও যেখানে পায়বে না কোথাও। মনে রেখো, কালকে অর্যানেই তোমার বিয়ে।” স্বর্ণাকে কিছু বলতে

না দিচ্ছেই ব্যস্তপায়ে বেরিয়ে গেলেন বাবা।

স্বর্ণা পারলো না কিছু বলতে। বাবার ব্যক্তিত্বের সামনে কেন এমন গুর গুর চিরকালের।

কিন্তু তারপর।

স্বর্ণা বামলো না। আবার খিল তুললো কপাটে। আলো আললো। বুধে আঙ্গুল দিয়ে কি বেন ভাবলো আপন মনে। স্বচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তারপরই পাগলের মতো ছুটে গেলো টেবিলের কাছে। তুল থেকে ফিরে বইগুলো সামান্যে হরনি এখনও। হাতের মুঠো পড় ক'রে তুলে নিলো একটা বই। ইংরেজী পত্র লখনন। স্বর্ণার চোখে ভবন আগুনের হলুদা, বুকে উদ্দামতা। দুহুর্ন্তে কর্তব্য স্থির করলো ও। না, ওখাই জিজ্ঞাস। স্বচ্ছমুঠো হয়ে ও লড়বে না জোতের বিরুদ্ধে। পারবে না। একটা পাচমকা টানে ও ছিড়ে ফেললো বইটা। তবু ছুটো টুকরো নয়, একটি একটি করে প্রতিটি পাতা ছিড়লো। একটা বইই তবু নয়, একটা একটা ক'রে টুকরো টুকরো করলো বইয়ের পর বই। বামলা, ইন্ডিহাল, বীজগণিত আর ভূগোল। হেঁড়া কাগজের অজাল বেন ছড়িয়ে দিলো সারা ঘরে। বুকের আঙ্গিকে কুচি কুচি করলো। তারপর স্বপাকার কাগজের বোকা হাতের মুঠোর নিয়ে ছুটে গেলো রান্নাঘরে। মা'র পায়ের কাছে সব ঢেলে দিয়ে বললো—“নাও, নাও, উত্তন ধরানোর কাগজ দিখুন তোমার। বেশ কিছুদিন চলবে।”

শান্তি দেবী বিদ্রিষ্ট হন—“এত কাগজ কোথায় পেলি তুই? কিসের কাগজ!”

“কেন, আমার বইগুলো তো তোমাদের শক্ত। এবারে এগুলো পুড়িয়ে বুক ছুড়োও।” দরজার ওপর ঢলে পড়ে আবার কীমতে অক্ষ করে স্বর্ণা। হুঁশিয়ারে হুঁপিয়ে কাদে।

“একি, কি করেছিল তুই।” শান্তি দেবী এগিয়ে এসে ম'য়ের দিকে—“এত টাকার বইগুলো পুই নষ্ট করলি এমন ক'রে? মটু লকুমও তো কাজে লাগতে পারতো কোনদিন।”

“না বা, না। কোন দরকার নেই।” বা’র পায়ে হঠাৎ ছুটিয়ে পড়ে রুণী—“লজ্জকে আর পড়িত না বা। ফুলে যেতে আর কি ও না ওকে। এ’ বড়ো ভীষণ জ্বালা। ও গইতে পারবে না। ও পারবে না। মোহাই তোমার। ওকে বুঝ করে।”

বিশ্বের হস্তব্যক না। নৃত, নৃত।

এরপর ইচ্ছে করেই ছুদিন ফুলে বাধনি রুণী। তৃতীয় দিনে বাবা বললেন বা’কে ডেকে—“গিরেছিলোয় গ্রন্থপত্রের কাছে। পান্ডি যেখে দিনও ঠিক করে এলাব। আসছে বিশেষ কাস্তিক পাকা দেখা আর পাঁচই অস্ত্রাণ বিয়ে।”

“এত ভাড়াভাড়ি ?”

“উপায় কি ?” বাবা সন্ধ্যাতে উত্তর দিলেন—“যে যেতে তোমার। আবার হরভো দ্রাব্যবদাকে ডেকে টেকে আনবে। তার চেয়ে এখনই বড় ভাড়াভাড়ি সম্ভব কাজটা শেষ করা ভালো।”

বেশিরের কোণে অন্ধকারে গাড়িয়ে ছিলো রুণী। গুনছিলো বব। সরে এলো এবার। অসহ। বা-বাপ হরে শেষে এরনি করে শুকে জ্বালাবে ওর। এদিকের ঘরে বেরোতে বাছুর ছড়িয়ে পড়ছিলো মকু আর লতা।

“বিধি।” রুণীকে কুকতে দেখেই লতা বললো—“গীতাবি আক ভোর কথা জিজ্ঞেস করছিলো আমাকে।”

“কে ?” হঠাৎ থকতে গীতালো রুণী।

“গীতাবি। সেই যে ভোর খুব বহু। বাসি শিকের শাড়ী পরে। খুব বড়লোক।”

“ওঃ।” গভীর একটা দীর্ঘবাস উথলে উঠলো রুণীর মুক টেল—“কি বললো ?”

“জিজ্ঞেস করলো, তুই ফুলে বাজিসনে কেন। তোদের পরীক্ষা নাকি খুব কাছে এসে গেছে। মাত্র এক বাস বাকী। সেইটেই জানাতে বসেছে তোকে।”

এক বাস ? ক্যালেন্ডারের দিকে তাকালো রুণী। পাতা ওটালো। পাঁচই অস্ত্রাণের আর কতো দেবী ? সেও একবাস।

“আবার যদি কেউ ভোর কথা জিজ্ঞেস করে তবু কি বলবো বিধি ?” লতা আবার গ্রন্থ করে।

ক্যালেন্ডারের অক্ষরগুলো খেকে চোখ ফিরাব রুণী—“বাক কিছু বলতে হবে না তোকে। বলিল, অসহ ক’রেছে আমার।”

ঘর থেকে দ্রুত বেরিয়ে আসে রুণী। ছুটো মাত্র ঘর একটা কুয়াটে। একঘরে বা বাবা অস্ত্র ঘরে লতা। ন’ বহোরের এই এককোটা দেহেটাই যে কি ভীষণ তা আক ভালোভাবেই বুঝছে রুণী। বিয়ে ব্যাপারটা যে অকারণে বেরোদের বেহে একগাবা লজ্জা এনে দেয় সেটা পৃথক বুঝছে মেহেটা।

বিশেষ কাস্তিক।

সোনা বাপড় হয়ে গেলো দ্ব্যর্থীতি। শাঁখ বাখলো, উল্লসনিত সুখর হলো বাড়ী। সোনার হার কয়েক গাছা চুড়ি আর বেনারসী লিঙ্গ জর্জেটের বিনিময়ে রুণীর উত্তর জীবন নির্ধারিত হলো।

গীতা এলো পরদিন দুপুরে। বললো—“গুনলাম অসহর ইয়েছে ভোর। ফুলে এখন অনেক কাজ। পুরো-দম্বর পড়াশোনা চলছে। তাই এতদিন আসতে পারি নি। আজ শনিবার। তাই এলাম।”

ওকনো হাসি হাসলো রুণী। অভ্যর্থনা জানালো—“বোল।”

“গতি, ভীষণ খারাপ হয়ে গেছে ভোর চোখা। বজ্জা শুকিয়ে গেছিল।” গীতা বললো চোকারে। তাকালো বাছুরী দিকে—“কি হয়েছিলো রে ?”

“কিছু না। এমনি জর।”

“ফুলে ঘাবি কবে খেকে। টেই তো এসে গেলো। কল্যাণীদি, উমিলাদি ভোর কথা বলছিলেন গেলিন। এসবের এভাবে ফুল কাবাই করাটা খুব খারাপ।”

নীতা, বিক্রা, হাসি, বোলা, মীনা, কল্যাণীদি, উমিলাদি, দুবাবি। সকলের কবাই মনে পড়ে রুণীর। ফুলের ছবি তেনে ওঠে চোখে। কেমন যেন করে মনটা।

"কি রে, এমন গভীর কেন ? খুব পড়ছিল বুঝি ?"

"নাঃ ।" হঠাৎ বেন সব হাল ছেড়ে বের কর্ণা—

"কই আর পড়ছি, মন বদলে না ।"

"পড়, পড় ।" গীতা মিসি লাগলো। এবার—"মিঞা কিছ খুব খাটছে । এবারে যদি ওকে হারাতে না পারিল তবে আর জীবনে সুযোগ পাবিনে । এরপরে কে কোথায় হাড়ির পড়ব কে জানে ।"

আহত হলো কর্ণা । কে বেন সজোরে ওকে আঘাত করলো তুকে । থান্, সব কথা ওকে খুলেই বলা বাক । তাহলে হয়তো এমন করে ও ব্যাধ বেবে না ওকে । পীড়ন করবে না ।

"ওকিরে কর্ণা । তোম চোখে জল ।" গীতা অবাক হয়ে তাকায়—"কি হয়েছে তোম ?"

"কিছু না । ও কিছু না ।" হঠাৎ ভেদে পড়ে কর্ণা । তুকে পড়ে ছহাতে মুখ চাপে আচলেন—"তুই আম বা গীতা । চলে যা ভাই । পরে বলবো, সব বলবো ।"

বিস্মিত হয় গীতা । যাবার ভয়েই প্রস্থত হয় । কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে আসে । হাত রাখে বাত্বীর শোভরানো মাথায়—"কর্ণা শোন ।"

"জলে ভরা চোখ তুলে তাকায় কর্ণা—"বণ ।"

"কিছু মনে করিলেনে ভাই ।" গীতা বললো বীরে বীরে—"তোম ইংরাজী খাটাটা একটু মিসি দিন করেকের জন্তে । সেই যে তোম দাদা না কে বেন লিখে দিয়েছিলেন ।"

"নেঃ," টেমলের কোণে তেমনি পড়ে আছে খাতাগুলো । বই নেই একটাও । গীতা ভাবলো, হর তো অজব্বরে । একটা খাতাই শুধু নয়, অনেক ; খাতাই কর্ণা মিলে গীতার হাতে—"নে এগুলো । পড়া-তুনো তো আর হচ্ছে না এখন । নিয়ে যা, তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিস ।"

সেব । বুদীবনে চলে যায় গীতা

ফিরিয়ে অন্যত দিয়েছিলো গীতা । সত্যার হাতে আবার সেগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে কর্ণা । সে সঙ্গে সত্য

কথাটাও জানিয়ে দিয়েছে—"আসছে পাচই অন্ন্য আবার বিয়ে । আসিস ।" এগিয়ে আসতে পাচই অন্ন্য ।

কর্ণা পারলো না নিজেকে বাঁচাতে । নিরস্তির হাতে থেকে পারলো-না রক্ষা করতে । ঠিক এমনি করে একদিন আশুন জলেছিলো কতালী কুমারী কোয়ানের চোখের সামনে । মুহুর মশাল । কিন্তু সে আশুনে বড় হয়ে বুজি পেয়েছিলো জোবান ।

কিন্তু ।

এ মুহুরতে নিষ্ঠিত পাবে না কর্ণা । এ জীবনের পরেও আরেক জীবন আছে । স্বপ্নরাশি । এ জীবনের ভয় হয়ে বৈতে থাকতে হবে ।

সানাই বাজলো নির্ধারিত দিনে । লোকজন এলো, হৈ হলোড় বাড়লো । কোন জটি নেই মাকলিক অছটানামির । না বাবা, আহত আত্মীরস্বজন সবাই আজ কর্কটকল । ত্রিগলের হাউনি পড়েছে ছাদে, বাইরের দরবার সম্মিত তোমর । বিজয়ের আনন্দে অনেক খরচ করেছেন কর্ণার বাব । প্রথম যেরে বলেই হয়তো উজার করেছেন সব ।

অনেক কেঁদেছে কর্ণা । শেব তিনদিন উপোষ করে কেঁদেছে, নিজাহীন বিগত স্বাতন্ত্রলো বড়ো অলঙ্ মনে হয়েছ ওর । কান্নার মাত্রাটা আজ বেন বেশী । সবাই বললো—ওটা স্বাভাবিক, বিয়ের রাতে সব মেয়েই কাঁদে এমন করে । স্বাক্ষিকে আপন করে তিনিতে পারলেই এ কান্নার কথা তুলে যায় সবাই । ও-ও তুলবে ।

সত্যি, এ মুহুর্তেও কেউ হাসলো না ওকে । ডেটাও করলো না কেউ কোনদিন ।

বখারীতি সবই হলো । প্রথম মুহুর্তে অবিবাহ, ছুপুবে হলুদ ছান, আরও এটা গুটা, উপবাসে ক্রাঘ, বনোবাথার গুণ ঘেরোটাকে নিয়ে সারাধিন বেন ছিন-মিসি খেললো সবাই ।

লগ এলো । বর বলে গেছে বিয়ের আগরে । বরের ভেতর তখন মুহুর প্রতীক । এই বুজি ডাক এলো । এখনই বুজি নিয়ে যাবে ওকে । রক্ত রংয়ের কর্ণাকে

অজ সাঝিয়েছে সবাই। লাল রাউন্ডের ওপর লাল বেনারসী। সর্বাঙ্গে স্বর্ণকাস্তির কলকানি। চন্দন চিত্রিত ললাটের মধ্যস্থিত রক্তসিঁদুর, বাঁশ ডানা জর-নীচে কাকলটানা চোখ। গলায় হুলের সোলা আর গাছ কোটো হাতের। আলপনা আঁকা গিড়ির ওপর ধানবগা মূর্তি। চোখের জলে কাকল কালো চোখের কালিনা মুছে যাচ্ছে মুক্তি। পরিত্যক্তা বেরেরা অবাক হলো হেসে। মন্থন করলো অপক্লপ রূপসী স্বর্ণা। এ রূপ এতদিন যেন হুকোনো ছিল কোথায়।

হঠাৎ কলকটে কাকলি চড়িয়ে কতগুলো বেরে এসে চুপলো ভেতরে। নানা রংের রঙীন এককাক প্রজাপতির মতো। ওরা ঘিরে বসলো স্বর্ণাকে। হেসে উঠলো। হাসি নয়, সেতারের সাত তারের ওপর নির্ভাকটা কে যেন বুলিয়ে দিলো হঠাৎ।

“কি রে।” স্বর্ণার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়লো গীতা—“কি মম্বা। এত জাড়াভাড়া ব্যবস্থা করে কেলি। আর মুক্তি সবুজ লইছিলো না।”

রস হসিকতার ধার খেললো না স্বর্ণা। ওদের লালিখে যুগটা যেন আরও ক্লপ হতে উঠলো ওর—“এত দেবী করলি যে।”

“দেবী হলো। আবার আবার এমুনি চলে যাব কর্তা কাল আবার পরীক্ষা আছে। টেই চলছে কি না।”

“কি বলি ? হঠাৎ নির্ভরভাবে কে যেন চাবুক মারলো স্বর্ণাকে—“ও, টেই চলছে মুক্তি।”

“হ্যাঁ।”

“আজ কি ছিলো ?”

“ইংরেজী।”

“কাল।”

“বাংলা।”

“ও।” একটা গভীর বীর্ঘবাস স্বর্ণার মুকটা ভেঙ্গে ওড়ো করে দিলো। বিহিগলায় প্রব্র করলো ও—“কেমন দিছিল তোরা।”

“ভালোই,” বললো বেলা—“সত্যি, প্রব্র এত সহজ হয়েছিলো, কি বলবো। তুই দিলে নিশ্চয় খুব ভালো করতে পারতিস।”

আবার, আবার আবারকটা চাবুক। স্বর্ণার চোখে তখন অশ্রুপ্রবাহ। চুপেই কাঁদছে ওই মন। বাইরের দরজার দুটো ছায়া এসে পড়লো। কনে নেবার সময় এসে গেছে।

মিনতি

শ্রীমিনতা মুখোপাধ্যায়

একটুখানি রাড়িয়ে থেরো এ-পথ দিয়ে বেচে
একটিবার আনার পানে তাকিয়ে শুধু হেসো,
চাই-না আমি তোমার বাহ ব্যাকুল দেখে দিচে—
পথিক, শুধু আমার ধারে একটিবার এসো।
আনার চোখে আঁধার নেই, লুপমা নেই দেখে,
অশ্রুজল রঙীন পায়ের বাঁখে না শিক্রিনী,
বর্ণহীন গন্ধহীন হুলের বোকা নিয়ে
কোন শে হাটে বেসাতি করে সোনার প্রেম কিনি।

অথচ এই ভরাট বৃক্ষে অনেক কথা আছে,
যে সব কথা রাত্রি ভেগে হয় নি কারো শোনা—
তরুণিত কাবনা সব বুঝাই যাবা বুড়ে
যদেছে, হার বেহেব সাধ খীনে মিলল না !
মিনতি করি, পথিক, তাই একটিবার এসে
সোনার ভরী ভরিয়ে থেরো অশ্রু জলে ভেসে।

জাগতিকী

ঐশ্বর্যীর স্বামী চৌধুরী

এসিয়া—

ইউরোপের শিরশিরের খুচনা জগতের ইতিহাসে এক যুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণ, এই সময় হইতে ইউরোপীয় শক্তিপুত্র নানাদিকে তাহাদের স্বকীয়প্রতিভা কাজে লাগাইতে আরম্ভ করেন, এর ফলে তাঁহারা এসিয়া মহাদেশে উর্বর নদীমাতৃক দেশগুলির উপর তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করে, ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদের উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা এইভাবেই হইয়াছিল। অর্থনৈতিক কারণে ইউরোপীয় অধিকৃত দেশগুলির আভ্যন্তরীণ অবস্থা বখন চরমরূপে চূর্ণত তখন হইতে তথায় জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি হয়, অশেষ অত্যাচার উৎপাদন, পেষণ ও শোষণের বাধা অভিক্রম করিয়া এই দেশগুলি মুক্তি সংগ্রামে আগাইয়া যায়। বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপীয় সভ্যতার সম্মোহন ও চাকচিক্য অনেকটা হুড়িয়া যায় এবং এসিয়া মহাদেশের জাতিকুলি স্বাধীন হইবার চেষ্টার বহুপরিচর হইয়া উঠে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে গোটা এসিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতার সূচনা হয়। চীনের জনগণ সার্বভৌম গণতন্ত্রে পরিণত হয়। তথা হইতে চিরন্তনের সর্ববিধের পরমুখাপেক্ষী চিয়াং সরকারের অধিপত্যের সম্পূর্ণ নিষেধ সাধন করা হয়। থাইল্যান্ড চীনের আত্ম নুতন করিয়া নিজেকে গভিয়া ভূগিবার মহাপ্রয়াসে কর্ষরত। এই অক্লান্ত কর্ম-প্রচেষ্টা সফল হোক, মানব যংগলকামী প্রত্যেক বিশ্ববাসীর এই কামনা হওয়া উচিত।

ইরান বিদেশী প্রভুত্বের প্রতীক স্বরূপ ইর-ইরান তৈল কোম্পানীর কর্তৃত্ব হইতে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎপাদন কেন্দ্রকে হস্ত করিয়াছে এই মুক্তি তাঁহার জাতির মুক্তির নিরিখ। অশেষ অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইলেও সে আজ স্বাধীন। নালার বৃষ্টি প্রভুত্ব কতদিন স্থায়ী হইবে সে সম্বন্ধে বোরস্তর সন্দেহের অবকাশ আছে। ভিয়েতনামে করাচী প্রভুত্বের স্বান্ত্রি আর বেনীদিন হারী

হইবে বলিয়া মনে হয় না। এসিয়ারাসীর এই যে আগরণ, এই জাগরণের মূল কোথায়? যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রপুত্র ঐ-বি, আর, সেন অক্লান্ত কথার মধ্যে বলেন যে, ভারত এবং এসিয়ার অক্লান্ত দেশগুলিতে জীবনধারণের মানের সমতাই মূল সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, তাহারা উন্নততর জীবনধারণ করিতে চায়। সেইজন্য তাহারা শান্তি চায়। যদি আর একটি যুদ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাদের উন্নততর জীবনধারণের চেষ্টা ব্যর্থ হইবে এবং তাহারা দুইশত বৎসর পিছাইয়া বাইবেন, এসিয়ারাসীর স্বাধীনতার সংগ্রাম বস্তুতাত্মিক দৃষ্টিকোণ কর্তে এইরূপ প্রতিভাত হইলেও উহা মূলতঃ তাহাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন সেই আত্মপ্রতিষ্ঠারই দ্বিঃপ্রকাশ।

ইউরোপীয় জাতিপুত্রের শক্তি হ্রাসের সংগে সংগে এসিয়ারাসীর মুক্তির আশোলান আরও তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছে। ইউরোপীয় জাতিসমূহের এমন শক্তি নাই যাহার সাহায্যে এই আশোলান প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব। তাই আর কমিউনিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা সংস্থা গঠনের নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বিবিধ গ্রহণ করিয়াছে। তাই মার্কিন সাহায্য ইন্দোচীনে এবং এসিয়ার অক্লান্ত স্থানে অব্যাহত যোগান হইতেছে। শুধু এইখানেই এই প্রচেষ্টা ক্ষয় হয় নাই। ইরানের মার্কিন রাষ্ট্রপুত্র মিঃ ওয়াই, বেরী এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যথ্যপ্রাচ্য প্রতিরক্ষা বোর্ড গঠন মার্কিন নীতির অন্ততম প্রধান উদ্দেশ্য তিনি বলেন যে, গত তেরতর মাসে পশ্চিমী রাষ্ট্রপুত্র ও সুস্বত্ব বখন এই প্রতিরক্ষা বোর্ড গঠনের প্রস্তাব প্রণয়ন করে, তখন যথ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলি তাহাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মূল হুঁসিয়াছিল, কিন্তু যথ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে আনৈরিক আন্তরিক আগ্রহ এবং কমিউনিষ্ট

প্রাচ্যের প্রতিরোধে তাহাদের অভিপ্রায় দেখিয়া যথা-
 প্রচেষ্টায় রাষ্ট্রগুলির ভুল তাহিরাহে। আর্থিক-রাজনীতিক-
 দৃষ্টান্তেই বাণিজ্যিক বৃত্তির উন্নতি বর্তমানে গুরুতর দায়িত্ব
 বহন করিতেছে। তাহা বৈদেশিক ইচ্ছা তাহাদের কোনদিনই
 ছিল না। কমিউনিজমের প্রসারের বিপদ হইতে বিপদ
 রক্ষা করা যে একান্ত কর্তব্য, তাহা বৃত্তির উন্নতির জন্যে
 উপলব্ধি করে বলিয়াই বৃত্তির উন্নতি এই দায়িত্ব গ্রহণ
 করিয়াছে। ইহাই এই দায়িত্ব পূরণের একমাত্র কারণ।
 ভুল বুঝাবার অবকাশ কোথায়? এতদিন পর্যন্ত ইউ-
 রোপীয় "সাদা আদমী" এসিয়াবাসীর বোকা নিষেধ
 কাণে বহন করিয়াছে। সেই ভার বহনের সুযোগ আজ
 সে হারায়েছে বলিয়াছে। তাই বলায় মহাভারত বাণিজ্য
 "সাদা চাচা" নিষেধ কাণে সেই বোকা বাচিয়া লইতেছে।
 ইহাতে ভুল বুঝাবার কি আছে। নির্দিষ্ট কল্প ইউরোপ-
 গামী বাণিজ্য জাতিভাষার এই উদারতা কি তাহা গ্রহণ
 করিতেছেন তাহাই বিচার্য।

গুরু মহাপ্রাচ্যেই নয় প্রাচ্য মহাসাগরীর অকলেও
 ব্যাপক ভিত্তিতে এইরূপ প্রতিরোধ ব্যবস্থার আয়োজন
 চলিতেছে। ইতিমধ্যেই হনস্ফোর্ডে ত্রিশজন সম্মেলনে
 অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড ও বাণিজ্যিক বৃত্তির "একাদশ"—
 বৃত্তির এই সভা জুড়ে আবেদন হইয়াছে। প্রাচ্য মহা-
 সাগরীর জাতি সমূহের নিকট প্রস্তাব করা হইয়াছে যে
 এইরূপ সভার হাফে চাচা ও অন্তর্জাতিক চুক্তির সহায়
 অল্পবায়ী একটি প্রতিরক্ষা সংস্থা এই অকলের অস্ত
 গড়িয়া তুলিতে হইবে, তারতম্য কিন্তু এইরূপ চেষ্টার
 পূর্ণাঙ্গী নহে। বৃত্তির উন্নতি ভারতীয় রাষ্ট্রের শ্রী-বি,
 আর সেন তীহার উল্লিখিত বৃত্তির একাংশে বলিয়াছেন
 ভারত গণতন্ত্রী চীনের প্রতিনিষিদ্ধ হাড়া প্রাচ্য মহা-
 সাগরীয় রাষ্ট্রগুলির সম্মেলনের বিরোধী। আকলিক
 সহযোগিতার ব্যাপারে আপত্তি না থাকিলেও তিনি মনে
 করেন চীন হাড়া কোন সম্মেলন অস্বীকার হইলে অপর
 একটি মোটের সৃষ্টি হইবে। শ্রী সেন বলেন যে, ভারত
 কোন বিশেষ গোষ্ঠীর সহিত বর্তমানে সংযুক্ত না হইবার

যে নীতি গ্রহণ করিয়াছে এই সম্মেলন সেই নীতির
 বিরোধী হইবে। সুতরাং এই ব্যাপারে ভারত কোনরূপ
 সক্রিয় সহযোগিতা করিতে অক্ষম। এবং ভারত সেই
 আবেদন হইতে চূড় হইয়াছে। প্রাচ্য মহা সাগরী শ্রী সেনের
 ভবিষ্যৎ আশ্রমের প্রতি ভারতের বনোত্তর সম্প্রতিভাবে
 ব্যক্তি করিয়াছেন। যেখানে তাহার স্বাধীনতা ব্যাহত
 হইতে পারে সেখানে ভারত নিরপেক্ষ থাকিতে পারে
 না। তিনি বলেন যে ভারত কোনরূপ আকলিক চুক্তির
 সহিত সংযুক্ত না হইয়া রাষ্ট্রসমূহের মারফতে শান্তি প্রতি-
 ঠার চেষ্টা করিতে পারে।

আফ্রিকা—

এসিয়ার মত আফ্রিকাও বিজিনীযু ইউরোপের
 একটি বিকার, ইউরোপীয় ভৌগলিক পণ্ডিতদের মতে
 আফ্রিকা অন্ধকারময় মহাদেশ, এই মহাদেশকে অন্ধকার
 হইতে আলোকে লইয়া আসিবার প্রথম ইউরোপীয়
 আভিসমুখ তথ্য উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন।
 তাহাদেরই সেই মহতী চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে তাহা
 আফ্রিকার অগণিত জনগণ একমাত্র সাক্ষী। কিন্তু
 তাহার গুরু অল্প দিন হইল মহৎ অবস্থা পরিহার করিয়া
 বাতাল হইয়া উঠিয়াছে। টিউনিসিয়া হইতে আরম্ভ
 করিয়া বাকি আফ্রিকা পর্যন্ত আজ যে আগুন, এই
 বাতালতা তাহারই বহিঃপ্রকাশ।

টিউনিসিয়ার করাদী অধিকারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ
 চলিতেছে তাহাকে আগোণের তলসিকনে শীতল
 করিবার চেষ্টা চলিলেও তাহা ব্যর্থ হইতে বাধ্য। তথ্য-
 কার সাধারণ রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন জনগণের বনো-
 ত্তর নিরনিষিদ্ধ বিবরণী হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।
 হোসেনী যে (টিউনিসের বৈদেশিক চতুর্থ উত্তরাধিকারী)
 যাকেটার গাভিয়ান পক্ষিকার নিষিদ্ধ এক পক্ষে নিষিদ্ধ
 হেন যে টিউনিসিয়ার শাসন সংস্কার প্রেরে স্ফাল ও
 টিউনিসিয়ার বনো আগোণের দফার সন্ধানী কন।
 টিউনিসিয়ার করাদী কতক প্রতিষ্ঠার পরে সরকারীভাবে
 ঘোষণা করা হয় যে টিউনিসিয়ারবাসীদের আত্মপাল-

নের সঙ্গে পরিচালিত করাই জাঙ্কোর উদ্দেশ্য। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সার্বিক করার জন্য শাসন সংস্কার প্রথমে করা দরকার। কতৃৎপক্ষ সর্বত্র বিলম্ব করিয়া আসিয়াছেন। গত ১০ বৎসর কাল ধরিয়া করানী কতৃৎপক্ষ শুধু বরন নীতি চালাইয়া আসিয়াছেন। ডিউনিগারের আর একটি ধর্মের প্রকাশ যে ডিউনিগারের বের পার্লামেন্ট করানী শাসন সংস্কার প্রস্তাব প্রস্তাব করিয়াছেন বলিয়া বিঃ ভাষ্যে সালিস তার পাইয়াছেন।

মধ্য আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র পঠনে পরিকল্পনা সম্বন্ধে তথাকার অধিবাসীদের মত কী, তাহারা এই পরিকল্পনাকে কি চোখে দেখেন কোরিয়া আইন সভার আফ্রিকান সংস্কারের নেতা ডি. ডব্লিউ. মার্শার বক্তৃতা হইতে স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে। তিনি বলেন, মধ্য আফ্রিকার যুক্তরাষ্ট্র পঠনের যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে তাহার উদ্দেশ্য অংশীদারিত্ব নহে, আধিপত্য। আফ্রিকানরা ইচ্ছাতে সম্মত হইবে না। তিনি আরও বলেন যে, মধ্য আফ্রিকার আধিপত্য করার ইউরোপীয়ানদের উদ্দেশ্য, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয় তাহা হইলে যুক্তিযুক্ত যেভাবে বল কি করিয়া লক্ষ লক্ষ কৃষকের উপর আধিপত্য করিতে পারে? আফ্রিকা যে ভাগিরা উন্নীত হইতে তাহা ইউরোপীয়ানরা যুক্তিতে পারিয়াছে। এবং সেই জন্যই তাহাদের এই ব্যক্ততা। তাহারা এসিয়া, মিশর ও অন্যান্য স্থান হইতে বিভাজিত হইয়াছে। এখন আফ্রিকার উপরেই তাহাদের তথ্যই নির্ভর করিতেছে। ইহা বিলম্ব সত্যকী; কিন্তু ইউরোপীয়ানরা যে নীতি অনুসরণ করিতেছে তাহা যোক্ত্য সত্যকী। তাহারা পূর্ব ও পশ্চিম আফ্রিকা হইতে আমাদের ক্রীতদাসদের বস্ত চানিয়া লইয়া গিয়া গল্প শুদ্ধার বস্ত বিক্রয় করিতেছে। এই অবস্থার প্রত্যাবর্তন যুক্তরাষ্ট্রে যাবা সেওয়াই আমাদের একমাত্র উপায়।

মিশরের রাজ্য প্রভৃতির অবস্থান হইয়াছে। এই রাজ্য প্রভৃতিকে কেন্দ্র করিয়াই তথাকার বিদেশী প্রভাব আশ্রয় দিগ্ভিরা ছিল। বিজোহী মিশর রাজ্য প্রভৃতির

অবস্থান করিয়াই কার্য হয় নাই। সে আশ্রয়কে নানা দিক দিয়া নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। করিতেছে। সমস্ত বেহে যে পশ্চিমতা ও আধিপত্য। হারী বাগা বাহিয়া ছিল তাহার অবস্থান বটাইতে সে বস্ত পরিবর্তন। শুদ্ধ, মধ্য সভ্য গড়িয়া তুলিবার জন্য চাই সং উদ্দেশ্য অনুপ্রাণিত যুক্ত জনগণ। অর্থনৈতিক কাঠামোর ভিত্তি সুস্থিত আত্ম তাহার দৃষ্টান্ত প্রতীতির নিকট অবস্থিত নহে। তাই সেদিকে তাহার প্রথম প্রয়োজন তুলি ব্যবহার আবুল পরিবর্তন। এক্ষেত্রে কিন্তু তাহার মনোভাব আপোষ পক্ষ অনুসরণ করিতেছে। কারণ তুলি মধ্যবিত্তদের কতিপয়ংশের ব্যবস্থা করিতে সে যিগা যোগ করে নাই। কিন্তু বৈদেশিক নীতিতে স্পষ্ট তাহার সে আশ্রয় দিগ্ভিরা কোনরূপ আপোষ দেখে চলে না।

দক্ষিণ আফ্রিকার মানান সরকারের আভি বৈবচন-মূলক নীতি ও আইন আজ সমস্ত দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিরুপদ্রব আইন অস্বাভাবিক সমস্ত ক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এই আইনগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়া যেন যেন করা বরণ করিতেছে ও অন্তরঙ্গ নির্ধাতনের সম্মুখীন হইতেছে। যুক্ত হইতে আজ পঞ্চম প্রায় চারি বছর আইন অস্বাভাবিকী প্রেরণ হইয়াছে। তারতবাহী সর্বপ্রথমে দক্ষিণ আফ্রিকার বৈবচনমূলক আইনের বিরোধিতা করিয়াছে। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। আজ যখন যুক্তিযুক্ত ইউরোপীয় দাঁড়া আফ্রিকাবাসী ও ভারতীয় নিবিশেষে এই বৈবচন-মূলক ব্যবহার বিরুদ্ধে বিজোহী যোগ্য করিয়াছে 'এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানেও সফলত্বমূলক বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হইতেছে তখন জানিতে পারা যেন, যে ভারত সরকার রাষ্ট্রপতি সাধারণ পরিষদের আগামী অধিবেশনে, দক্ষিণ আফ্রিকার বর্তমানে যে নিষ্কির প্রতিরোধ আন্দোলন চলিতেছে তাহা যে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশে এমনকি বিশ্ব শান্তি স্বাক্ষর প্রেরণ দিক হইতে অন্তরঙ্গ ওষধপূর্ণ তৎপ্রতি কাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণের

সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ভারত সরকার এই প্রসঙ্গে সত্তর সমস্তক্ষেপে উত্থাপন করিবেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সমস্তার সম্বন্ধে ইহার কোনও সংশয় থাকিবে না। শোষণ সমস্তাটি গত ৬ বছর ধাব্য রাষ্ট্রসংঘের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ভারত সরকারের দাবীয়ার অ-ইউরোপীয় জনগণের সম্মিলিত শক্তি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের নবন নীতি এবং পক্ষপাতবূল্য জাতিবৈষম্য আইনের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চালাইতেছে আফ্রিকার সর্বত্র এবং সমস্ত স্থানে তাহার গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। ভারত রাষ্ট্রসংঘের এগিয়া আফ্রিকা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সহযোগিতা অর্জনের চেষ্টা করিবে। এবং রাষ্ট্রসংঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি ঐ এইচ. ক্যামালেক উক্ত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আগামী কল্যাণের বৈঠকে এই প্রস্তাব উপস্থাপনের ক্ষমতা উপস্থাপন দেওয়া হইয়াছে।

দক্ষিণ দক্ষিণাফ্রিকার প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ গোটিয়েট ও তাহার মৈত্রীবদ্ধ জাতিসমূহের ভিতরে যে কর্তৃত্ববন্দিতা অবস্থান করিয়া তাহার দৃষ্টান্ত হইল মস্তোতে চীন সরকারের এক শক্তিশালী প্রতিনিধি দলের আগমন। এই প্রতিনিধিদলের উদ্দেশ্য কি তাহা লইয়া বিশ্বের রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মহলে নানাতরপ প্রশ্নঃ কল্পনা চলিতেছে। একথা অব্যাকার করা যায় না যে চীনকে ব্রহ্মবর্ষ, ব্যাপী অত্যাচারিত হেতু হুয়ান্সা বুর করিঃ নতুন করিয়া গড়িবার ক্ষমতা বাহিরের সাহায্য নিভাও প্রয়োজনীয়, এই উদ্দেশ্যে ইতিপূর্বে গোটিয়েটের সাহায্য সে লাভ করিয়াছিল। কিন্তু কোরিয়া যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করিবার ফলে এই সাহায্যের একটা ব্রহ্ম অংশ মূল গঠনবূল্য কাজ হইতে মিশ্ররূপে ব্যয় করিতে হইয়াছে। তাহা হাড়া দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়া ব্যবহার প্রতীক স্বরূপ

দমনলুর চুক্তি ও তদনুসারে বাপকতর সম্ভাব্য চুক্তির ফলাফল সম্বন্ধে বিবেচনা প্রয়োজন, এইসব কারণেই প্রধানতঃ এই প্রতিনিধিদলের মস্তো প্রাণ।

তাহা হাড়া 'টাল' আত্ম ঘোষণা করিয়াছেন যে আগামী এই অক্টোবর গোটিয়েট ইউনিয়ন কমিউনিষ্ট পার্টির কংগ্রেসের অধিবেশন আয়োজন করা হইয়াছে। পররাষ্ট্র নীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন অনুসন্ধান, এমনকি পরে যে মার্কস টালিনের পরে স্লামাভিবিজ্ঞ হইবেন তাহা বিশ্ব করিবার আদ্যকারও এই কংগ্রেসের থাকিবে, ১৯৬০ সালের পরে ইহাই কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন। 'টাল' আরোও জানাইয়াছেন যে গোটিয়েট রাশিয়া ১৯৫৫ সালের ক্ষমতা নতুন পক্ষাব্যবস্থিক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছে। পরিকল্পনার প্রস্তাবগুলি সরকারী পরিকল্পনা কমিশনের ডিরেক্টর কংগ্রেসের এই উদ্বিগ্ন অধিবেশনে প্রেরণ করিবেন। রাশিয়ার প্রথম দুছোত্তর পক্ষাব্যবস্থিক পরিকল্পনা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে সম্পন্ন হইয়াছে। দুস্তরায় ইহাকে দুছোত্তর বিতীরা পক্ষাব্যবস্থিক পরিকল্পনা এবং ১৯৫৮ সালের পর হইতে খরিলে পঞ্চম পক্ষাব্যবস্থিক পরিকল্পনা বলা যায়। দুছোত্তর প্রথম পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হওয়ার পর দুস্তর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কোন ঘোষণা প্রচারিত না হওয়ার অনুমান করা হইতেছিল যে, রাশিয়া সে পরিকল্পনা ত্যাগ করিয়াছে। টাল ঘোষণা করিয়াছেন চতুর্থ পক্ষাব্যবস্থিক পরিকল্পনা সাক্ষ্য যুক্তিত হওয়ার এখন জাতীয় অর্থনীতি, জনকল্যাণ স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এবং সামাজিক মান আরও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে নতুন পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করা প্রয়োজন হইয়াছে, চতুর্থ পক্ষাব্যবস্থিক পরিকল্পনার রূপায়ে সম্পূর্ণ হইতে মাজ-চাঙ্গ বৎসর জিন মাস সময় লাগিয়াছিল, এবং নির্ধারিত লক্ষ্যের তুলনার উপস্থাপন হইয়াছিল ১৭ শতাংশ অধিক।





ঐবেশ পত্র ও ছাড়পত্র—

১৯৪০ সালে পূর্ববঙ্গে ও ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ফলে নেহরু নিরাকং আলি চুক্তি হয়। সেই চুক্তির সর্গাধারী ভিত্তর একটরই মাত্র সাক্ষ্য প্রায় সকলে স্বীকার করে—পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তর কতকটা অব্যাহ বাতান্ত। সে চুক্তি দুই পক্ষ একত্র আলোচনা করে বদ করে নাই, তবু পাকিস্তান সরকার গত এপ্রিল মাসে ভারত সরকারকে জানিয়ে দেয় যে, তারা পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভিত্তর ঐবেশপত্র ও ছাড়পত্র প্রথা অবর্তন করবে। এতে ভারত সরকারের সম্মতিরও তারা অপেক্ষা রাখে নাই। কোনো আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ব্যাপারে এই বঙ্গের ব্যবহার অশোভন ও অসৌকর্যকর। অথচ একথা সর্বত্রই সর্বত্র যে, দলে দলে বাঙাল্যাদীরা পাকিস্তান ঐবেশের দরুণ রাষ্ট্রের উপর অসহনীর তার পড়ার কলেই জ্ঞানব নিরাকং আলি সহজেই পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হ'তে এগিয়ে এসেছিলেন। সম্মতি ঐবেশপত্র চালু করার সিদ্ধান্ত করে পাকিস্তান সরকার একতরফা সেই চুক্তির সকল অংশটিকেই বাতিল করে দিয়েছে।

দু'টি পৃথক রাষ্ট্রের ভিত্তর ঐবেশপত্র প্রথা নতুন কোনো ব্যবস্থা নয়, পৃথিবীর সর্বত্রই এ প্রথা চালু আছে। কাজেই এই প্রথা চালু হওয়া উপলক্ষে যে চাকলা ও ভীতি দেখা দিরাছে, স্বাভাবিক অবস্থার এর কোনো ছেঁড় ছিল না। কিন্তু যে পরিবেশের ভিত্তর এই প্রথা চালু হ'তে চলেছে, তাকে কোনো রকমেই স্বাভাবিক বলা চলে না। ইতিহাসের অগ্রগতির ভিত্তর যে দুরদৃষ্টির লগার হয়, দু'বেশ বিঘর, ভারত বিভাগের

কালে আমাদের নেতৃবল সে দুরদৃষ্টির পরিচয় দিতে পারেন নাই। জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে যেখানে কোনো সংখ্যালঘুর তরফ থেকে বেশ বিভাগের দাবী ওঠার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে সেই সম্ভাব্য নীমাংসা করে লেনিন এক নীতির অবর্তন করেন—সংখ্যাগুরু সেখানে অস্পষ্ট বোধ্যা করবে, সংখ্যালঘুর পৃথক রাষ্ট্র গঠনের পূর্ব অধিকার আছে; সংখ্যালঘুই বরং তার দৃঢ় সংকল্প জানাবে যে, সে পৃথক হ'তে চার না, একরাষ্ট্র-ছুতই থাকতে চার। এই নীতি লেনিন বোধ্যা করেন বলশেভিক বিদ্রোহের কালে, ভারত বিভাগের ত্রিশ বৎসর পূর্বে। ইতিহাসের এই শিক্ষাকে অবহেলার ফলে অমানুষিক হিংসারোষ ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ড, দাঙ্গা-হাঙ্গামার ভিত্তর রিবে বেশ বিভাগ হয়। সে হিংসারোষের জের আশেও মেটে নাই; এক সম্ভাব্য আর এক সম্ভাব্যকে ঘির দুটিতে দেবে—কোথাও কোথাও সরকারী কর্মচারীদের এবং কর্তৃপক্ষীদের ভিত্তরও এই পাপদৃষ্টি বহুতুল এবং নিরন্তর সক্রিয়। ফলে সংখ্যালঘুর বন প্রাণ, আত্ম সম্মান অনেক ক্ষেত্রেই আশেও বিলয়।

এই সব কারণে বেশ বিভাগের কাল থেকে দলে দলে পূর্ববঙ্গের কিছুটা বেশভ্যাগী হ'তে বাধ্য হচ্ছে। বর্তমান যুগের নেতৃত্ব শহরে। সেই শহরের বাড়ী ছত্ৰম-দখল, জবর দখল এবং নেতৃত্বানীরদের লাঞ্ছনা ও ধর-পাকড়ের ফলে পূর্ববঙ্গের কিছুদের নেতৃত্ব তেলে পড়েছে। সাধারণ লোক উপশেষ পরামর্শের অজ্ঞ উকিল, যোক্তার, ডাক্তার, শিক্ষক, অধ্যাপক, বাস্তবিক কর্মী এবং অপরায়ণ শিক্ষিত লোকের কাছে যার।

এই সব শ্রেণীর হিন্দুবা আজ পূর্ববঙ্গে প্রায় নেই। বারাহা, তারাপ ও উপদেশ পরামর্শ দেখার সাহসও পায়ে না, ভরসাও রাখে না। এইরকম পরিবেশে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের ভিতর প্রবেশপত্র ও ছাড়পত্র প্রথা চালা হ'তে চলেছে। সুতরাং 'স্বাভাবিক' কারণেই পূর্ববঙ্গের হিন্দুবা নিজেদের অত্যন্ত অসহায় বোধ করছে। অবিকার্য লোক প্রবেশপত্র ও ছাড়পত্রের দ্বারা বারহা, সে অসহায় ও আজ আর নেই। শিকাবিশপর্ষে, অর্থনৈতিক বিশপর্ষে ও অন্তর্বিধ সামাজিক উচ্ছ্বলতার বহু পরিবাহই আজ আর পুরোপুরি দূর হ'রে বসে নেই; ছেলেদেরকে অনেককই একত্র পাঠাতে বাধ্য হয়েছে, অনেক পরিবারের উপার্জনকর লোক আগে থেকেই কলকাতায় বা ভারতের অন্তর ছিল, পরিবার ছিল পূর্ববঙ্গে; আজও সেই ভাবে চলেছে, বহু এইরকম বিধা বিতর্ক পরিবারের সংখ্যা অনেক বেড়েছে। বনিঅর্জার বোণে টাকা পরস্যা লেন দেন বহু। এই সব কারণে এই সব পরিবারের লোকের পক্ষে গমনাগমনের প্রয়োজন সহজেই অনুমান করা যায়। কাজেই বর্তমানে যে ভীতির সন্ধান হয়েছে তা ব্যাপক। আত্মীয় বহু প্রতিবেশী ছাড়া মানুষ বাল করতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে বহু লোক অনেক নামে বাড়ী ঘর বিক্রি করে চলে আসছে, তবিশ্রুতের ভাবনা ভাববারও তারা দ্বিধা পাচ্ছে না। অল্পকাল পরে এবং প্রতিশোধের আশংকার ভারতীয় মুসলমানদেরও অনেক ক্ষেত্রে একই দৃষ্টির সম্মুখীন হ'তে হচ্ছে।

অথচ এই প্রবেশপত্র প্রথা চালা করার জন্য পাকিস্তানের এই চরম আগ্রহ কেন? পাকিস্তানে রাষ্ট্রের ভাষা উর্দু হ'বে কিন্তু পূর্ববঙ্গের সরকারী ও বেসরকারী ভাষা বাংলাই থাকবে—এই দাবীতে গন্ত ক্ষেত্রসীমার দ্বারা সমগ্র পূর্ববঙ্গে বিশেষতঃ ঢাকা সহরে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, সুলি-চলে এবং কিছু সংখ্যক লোকের আগ্রহান্বিত হয়ে। বাংলা ভাষার এই দাবী সমগ্র পূর্ববঙ্গবাসী হিন্দু-মুসলমানের দাবী, 'কিন্তু

মুসলমানরাই এই দাবী প্রতিষ্ঠা চেষ্টায় ও সক্রিয় সত্য, শোভাবাজার অগ্রণী হয়, হিন্দু কারও দাবী যে এ সম্পর্কে শোনা যায় নাই তার হেতু কখনো করা মুসলমান নয়, কেননা তারা বিনা দ্বিধার বন্দী করার বেলার অনেক সুপ্রসিদ্ধি হিন্দুর দান পাওয়া গেল। এর পর পূর্ব পাকিস্তান ও কেন্দ্রীয় সরকারের কোন কোন মুখপাত্রের মুখে শোনা গেল যে বাইরের লোকেরা ভাষা আন্দোলন সৃষ্টি করেছে বা তাতে উত্থান দিয়েছে; আবার অবিকার্য সংখ্যক সমর্থনকারী দীর্ঘ নেতারা ব্যবস্থা পরিচয়ে ও বাইরে প্রকাশ করলেন যে, বাংলা ভাষার দাবী বাঙালী মুসলমানের মৌলিক অকৃত্রিম (genuine) দাবী। কার কথা সত্য, কার কথা মিথ্যা—বিচার করার মাল মশলা নেই, কিন্তু অনুমান যা করা যায়, কাস্তুরার (commonsense) সঙ্গে তার সংগতি আছে এবং তা নির্ভুল না হবার কোনও সংশয় কারণ নেই। ব'রং যদি নেতারা যাহা যে, স্বাক্ষরিত বা তৎপ্রদীপ্ত কোন ছল কৌশল পরায়ণ (adventurist) স্বাক্ষরিত হ'ল সেলালো অলো নাহ বহুতে চেষ্টা, তা হ'লেও স্বাভাবিক অবস্থার যে কোনো রাষ্ট্র তাহেরই ধ'রে লাকা দিতে চেষ্টা করতো, এটাকে অস্বাভাবিক ক'রে একটা সুদূর দৃষ্টি নতুন নীতি গ্রহণ করতো না; শিকা দীক্ষা, অর্থনীতি প্রভৃতি সবদিক দিবে সমস্বার্থ বিশিষ্ট ও অস্বার্থী ভিত্তি দুই বাংলার খোঁজ ভাঙতে চেষ্টা করা হ'ত না। বিশ্বস্ত হ'লে শোনা যায়, লম্বা বক্তব্য, বহন ভারত বিভাগের দাবী করেন, 'তখন কেবল রাষ্ট্রনৈতিক বিভাগই চেষ্টাছিলেন, অল্প সকল রকম সম্পর্কেই অটুট রাখতে চেষ্টাছিলেন। বাংলার আজ তার যে কলনার চরম সার্থি হ'তে চলেছে।

প্রবেশপত্র ও ছাড়পত্র প্রথা চালা করা হ'বে—পাকিস্তান কতৃৎ একতরফা এই সিদ্ধান্ত ক'রে গ্রহণতঃ ভারত গবর্নমেন্টকে জানায়। ভারত গবর্নমেন্ট একান্ত অনিচ্ছাস্বপ্নেও সেই সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে প্রবেশপত্র ও ছাড়পত্রের

বিভিন্ন সর্ভ ও নিরমাবলী আলোচনা করতে এসিয়ে যায়। এমন খবর বেত্রিহেতে, এই আলোচনার পর স্থির হয় যে উক্ত পর্বমেন্টে একত্রে প্রবেশপত্র ও ছাড়পত্রের নিরমাবলী সম্বন্ধে একটা কন্যামিকে বের করবে, কিন্তু ভারত পর্বমেন্টকে কিছু হাত না জানিয়ে গত ১৯ই আগস্ট পাকিস্তান পর্বমেন্টে তার কন্যামিকে বের করে বের, অথচ তাতে প্রবেশপত্র ও ছাড়পত্র নেওয়া পাওয়ার বিস্তারিত নিরমাবলী প্রকাশিত হয় নাই। ভারত পর্বমেন্টে কিন্তু পাকিস্তানকে বিশ্বাসের সাথে অঙ্গমরণ করে, ২০শে জুলাইয়ে যে কন্যামিকে বের করে তাতে সব নিরমাবলীই ছিল। পাকিস্তানের নিরমাবলী ২০শে আগস্টের পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই। তাও বের হইলে ভারত সরকারের তরফ থেকে। সে দাই হোক, মধ্যের দিনগুলি জনসাধারণের অভ্যস্ত উৎসাহের ভিত্তর কেটেছে। ভুক্তভোগী ছাড়া অপরের পক্ষে সে উৎসাহের রকম বা গভীরতা বোকা শক্ত। এর পর প্রবেশপত্র এবং ছাড়পত্র পাওয়ার 'বেলাতে কি হবে—এটাকে তার একটা নির্ধারিত হিসাবে নিয়ে অনেক ভিটামারি দ্বারা ভাগ্য করেছে। যে পরিবেশের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, তার উপর এই অনিশ্চয়তার উৎসে বাস্তবভাগের হিড়িক লেগেছে। কিন্তু সবচেয়ে মারাত্মক অবস্থা দাঁড়াতে ছাড়পত্রের অফিস সংক্রান্ত যে ব্যবস্থা হয়েছে তার কপে। ভারত পর্বমেন্টের তরফ থেকে বলা হয়েছে যে, পূর্বপাকিস্তানগামী ভারতীয় নাগরিকদের সুবিধার জন্য পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন কেন্দ্রে ছাড়পত্রের অফিস খুলতে চেষ্টাছিল, তাতে পাকিস্তান সরকার রাজী হয় নাই; একমাত্র ঢাকা সহর থেকেই কলম্বাকার, বোম্বেরগজ, মহাদেবপুর প্রভৃতি সব আরমার গন্ত ছাড়পত্র দেওয়া হবে, তারা এই ব্যবস্থা করেছে। হুস্তরাং ভারতগামী পূর্ববঙ্গবাসীরাও যেখান থেকে যেখানেই যেতে চাইবে, তাদেরও ছাড়পত্রের একটিমাত্র অফিস হবে কলম্বাকার। যেন বাধতে হবে যে আসান, ত্রিপুরা প্রভৃতি স্থানও এই অফিসের অন্তর্গত। তারপর দরখাস্ত করে কে কতদিনে প্রবেশ বা ছাড়পত্র পাবে বা আদৌ

করার পর্বমেন্ট পাবে কিনা, সে প্রশ্ন তো আছেই। 'এতে উক্ত দেশে যাত্রাভাঙের প্রয়োজন চিরদিনের মতোই অনেক দেখ করে দিতে চাইবে। অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতনাকে দূরে ঠেলে রেখে কর্মতার আসনকে একচেটে করে রাখবার আশার পূর্ববঙ্গ পন্ডিত বঙ্গের সম্পর্ক দ্বারা একেবারে বুড়িয়ে দিতে চার ভাঙেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের ভিতর যাদের প্রয়োজন এবং কিংবা কর্মতা আছে, তারা আর পূর্ববঙ্গে থাকবে না।

লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে অধিকসংখ্যক ছাড়পত্রের অফিস খুলবার ভারতের এই যে অঙ্গুরোধ তা-ও অর্থাৎ অংশীদারের (junior partner) দাবীর মতো উপেক্ষিত হয়েছে। এখানেও একতরফা ব্যবস্থা। ভারতবর্ষের 'দর্শনগণক চরিত্রের সম্পর্কে পাকিস্তান আজ এতই নিষ্ঠুর। আরও লক্ষ্য করবার বিষয় যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু নাগরিকরা দলে দলে দেশত্যাগ করে আসছে অবর্ণনীয় হুংস বঠের মধ্যে, তবু পাকিস্তানের রাষ্ট্রতন্ত্রীয় সংখ্যালঘু মজী বা অস্ত্র মজীরা তাদের কোনরকম আশ্বাসমাত্র যোবারও প্রয়োজন যোগ করছেন না। কিন্তু ভারত সরকারের মনোভাব ব্যঙ্গ জনসাধারণের কাছে ছুঁর্বোধ্য। প্রতি ব্যাপারেই পাকিস্তানের হুজি-ড-সৌজন্যহীন ব্যবস্থা ও আচরণ নভবন্তক যেনে নেবার এতই কি প্রয়োজন ছিল? আশ্চর্য্যজনক কথা ছেড়ে দিই, কিন্তু জনসাধারণের সুবিধা, অসুবিধা জীবনমরণ সম্রা কি এতই নগণ্য? পাকিস্তান যখন ভারতের সঙ্গে আলোচনা রাষ্ট্রও না করে প্রবেশপত্র প্রণা চলু করার দিচ্চা করলো, তখন তাদের একতরফাই সেই প্রণা চালু করতে বেওয়া উচিত ছিল। তা'তে এক অভিনব অবস্থার সৃষ্টি হ'ত। হুস্তরাং কিছুদিনের মতো গমনাগমন একেবারে বন্ধই হইত যেত। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, অগ্রহিনেই পাকিস্তান তার অর্থোজিক আচরণ সম্বন্ধে সজ্ঞান হ'ত, ছুটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নিরন্ত বিবোধ যে কা'ও পক্ষেই স্বলগনক-নয়—এই সহজ কথাটার উপলব্ধির প্রয়োজন।

ভারত গবর্নমেন্ট যে দাখিল বাড় পেতে যেনে নিল সে সম্বন্ধে সে যথেষ্ট সজ্ঞান কিনা জানি না। বহু লক্ষ উষ্মা গন্ত পাঁচ বছরে পূর্ববঙ্গ থেকে ভারতে এসেছে। আগামী ১৫ জাভুয়ারীর মধ্যে—আরও বহু লক্ষ ভার সঙ্গে যে যোগ দেবে—একথা অব্যাহিত। বক্তৃতা গেলে ভারতগবর্নমেন্ট প্রবেশপত্র প্রণা যেনে দিয়ে পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত হিন্দুক উষ্মা হ'তে আস্থান জানিয়েছে। উপক্রম উৎসাহীদের কথা বাদ দিয়ে শুধু মাত্র প্রবেশপত্র ও হাউপত্রের নিয়ম কানুন বা উত্তর রাষ্ট্রে হয়েচে তাতে উত্তরবঙ্গের অবস্থা বিচার করলে দেখা যায় যে, হিন্দু। পূর্ববঙ্গ হাড়তে বাধ্য। চিরকালই বাংলার কোনো জেলার বখন অবৈতিক অবস্থা বারাপ হ'য়েছে বা লোকে বেকার হ'য়েছে, তারা চাকরী বাকরীর বোঁধে কলকাতার এসেছে, চাকরী না পেলে কিংবে গেছে অবস্থা পেলে সার্বম্যমতো পরিবাহকে টাকা পাঠিয়েছে। পূর্ববঙ্গে এককাল পরশা আসতো পাট থেকে। এখন যা গাড়িয়েছে, তাতে হুনিয়ার বাজারে পূর্ববঙ্গের পাটের চাহিদা সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সবুজি চিরদিনের মতো শেষ হ'তে চলেছে। পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী প্রায় পাট চাব বন্ধ করারই উপদেশ দিচ্ছেন। অথচ এর পর চাকরীর সন্ধানে যে একবার কলকাতার আসবে, বিভিন্ন জায়গার ঘুরবে, দু'মাস দু'মাস থাকবে, প্রবেশপত্র ও হাউপত্রের নিয়মকানুনের কল্যাণে তাকে ভারতীয় নাগরিক হ'তে হবে। আরও পুষ্টিস্বত্বপত্র ছাড়ারের কথাটা ধরা থাক। পূর্ববঙ্গ থেকে বাপ না বাবের কলকাতার গড়তে পাঠিয়েছে যদি তারা ভবিষ্যতে চাকরী বাকরী করতে চায় বা উচ্চতর ব্যবহারিক শিক্ষা পেতে চায়, অনিবার্য কারণে তারা ভারতীয় নাগরিক হয়ে যাবে। এটা অবজ্ঞাবাহী যে প্রবেশপত্র প্রণা চালু হবার কিছুদিনের মধ্যে বাস্তব-তাপী সম্পত্তিবিষয়ক আইন পূর্ব পাকিস্তানেও চালু হবে। তখন বর্তমানের এই সব ভাবের বাপ না ও অল্প নিকট আশীর বা বৌধ সম্পত্তির মালিকরাও বাস্তবত্যাগী ও বাস্তবত্যাগেচ্ছু (intending evacuees) ব'লে ঘোষিত

হবে। এবং তখন তাদের পাকিস্তান হাড়তে হবে। ঘোড়ের উপর এখন থেকে পূর্ববঙ্গের প্রায় সকল হিন্দুকই ভারতে স্থান ক'রে দেবার অল্প ভারত গবর্নমেন্টকে প্রস্তত হ'তে হবে।

পাঠি'ও সত্তর্গয়েক—

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির আগামী ইন্সার অধিবেশনে কংগ্রেসের এক নতুন গঠনতন্ত্র আলোচিত এবং সত্তর্গয়েক: গৃহীত হবে। নতুন গঠনতন্ত্রের বসতা প্রণয়নের অল্প যে সাবকমিটি গঠিত হ'য়েছিল, তার রিপোর্ট ওয়ার্কিং কমিটির গত অধিবেশনে আলোচিত হ'য়েছে। গঠনতন্ত্র পরিবর্তনের প্রধান উদ্দেশ্য কংগ্রেস সংগঠনের সর্গে কংগ্রেস গভর্নমেন্টের সম্পর্ক নির্ধারণ। দেশের শাসনভার বখন কংগ্রেসের উপরই প্রস্ত, তখন এই সম্পর্ক অনেক পূর্বেই স্পষ্ট করা উচিত ছিল। কিন্তু তারও পূর্বে প্রয়োজন কংগ্রেস সংগঠন উদ্দেশ্য নির্ণয়, অস্তত: তার পুনর্বিচার ও তাকে পুনরায় ব্যক্ত করা (re-statement). কংগ্রেস এক বিশেষ আদর্শের ধারক ও বাহক হিসাবে ভারতীয় বিপ্লবে নেতৃত্ব করেছে ও ভারতে ইংরেজ শাসন খিলোশে সাহায্য করেছে। কিন্তু শাসনভার কংগ্রেসের হাতে আসবার পর থেকেই যেন কংগ্রেস সংহার আর কিছু করণীর নেই—নির্বাচনের সময় ভাড়া বহুরের পর বহর কংগ্রেস সংস্থা অলস। এর অর্ধ গাড়ার, আজ নেতৃবর্গ ও কংগ্রেস কর্মীদের চোখে কংগ্রেসের আদর্শ অনেকটা নিশ্চয় হয়ে পড়েছে। এরই অনিবার্য ফল হিসাবে গত কয়েক বছর ধরে কংগ্রেস শাসকমণ্ডলী কংগ্রেস সংস্থাকে নানাবিধ উপায়ে আশ্রয় ক্ষুণ্ণিত করে তুলেছে—কংগ্রেস যেন হয়ে পড়েছে একটা নির্বাচনের ঘর বাজ।

এই প্রতিক্রিয়া হ'তে বাধ্য। এই প্রতিক্রিয়ার ফলে এককল কংগ্রেস সৌরী গাড়িয়েছেন বারা চাল কংগ্রেস সরকারকেই পুরোপুরি কংগ্রেস সংহার অবধানে আনতে। এই স্বল্প ক্রমে এস্ত প্রবল হয়ে উঠছে যে কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আজ অনেক চিন্তিত। গত সাধারণ

হচ্ছে ব'লে প্রতি ব্যাপারেই অল খোলাস হচ্ছে এবং পাটিকে সাধারণ লোকের চোখে ছোট ক'রে তোলা হচ্ছে এবং এ কাজ প্রধানতঃ নেতারা করতেন। সম্রাট বিক্রম কর নিয়ে বোম্বাই প্রদেশের জবান মন্ত্রী ও গুণাকার প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতির ভিতর যে প্রকাশ্য বামোহুমান হয়েছে, সেটি এর একটি দৃষ্টান্ত। কেউ কেউ হয়তো এখানে ডিমোক্রাসির মোহাই পাড়তে পারেন। কিন্তু আমাদের মতে এ ডিমোক্রাসির লক্ষণ নয়, এ জাতির তবিশ্বাস নিয়ে ছেলেখেলা এবং জাতিকে কানিষকের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া।

আর একটি দৃষ্টান্ত বলব, বর্তমানে বাংলা ও বিহারের নীমানা নিয়ে যে আত্মঘাতী বামোহুমান চলছে সেটি। এই আশোজন ও একান্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিবিহীন যে কলহ, আমরাঃ প্রাণের সাপে বলব, এতে প্রাদেশিক মন্ত্রীরা এমনকি প্রাদেশিক কংগ্রেস সভাপতিরাও সব সময় পদোপযোগী সংঘব, আত্মলজ্ঞান জ্ঞান এবং অস্ত্রের সম্মান জ্ঞানের প্রতি প্রছা দেখাতে পারেন নাই। অথচ এঁরা সকলেই কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতা ব'লে পরিচিত। যে পক্ষ বস্তু সত্ত্ব উচ্ছেদই সাধন করতে চান, সব সমক্ষে এই কথা কাটাকাটির কলে ভিত্ততা সৃষ্টি ক'রে অথবা, অপর দলগুলিকেও আত্মলজ্ঞান চালাবার প্রেরণা হুগিয়ে কি সেই উদ্দেশ্য সফল হবে? উত্তর পক্ষের কংগ্রেস নেতারা এবং মন্ত্রীরা একত্র হয়ে কংগ্রেস সভাপতি এবং গুণাকার কনিষ্ঠের অস্ত্র দায়িত্বশীল সভাপতির নিয়ে দিনের পর দিন, প্রয়োজন হ'লে বাসের পর বাস আলোচনা ক'রে একটা নীমাংসা করা এবং একটা নীতি নির্ধারণ করা উচিত ছিল না? এবং তার পর সেই নীতি ছুই প্রদেশেরই কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের দ্বারা প্রচার করান ও জনপ্রিয় ক'রে তোলা উচিত ছিল না?

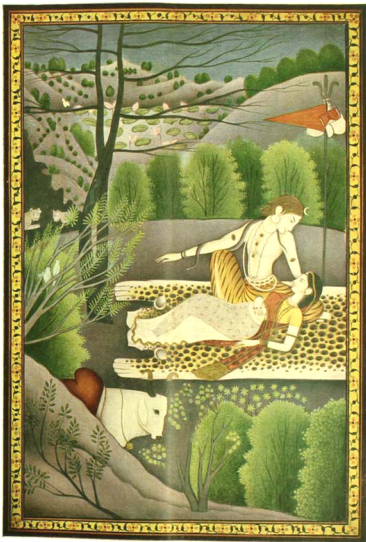
এই রকম ঘরোয়া আলোচনার নীতি কান্দীরের ব্যাপারে কতোটা সফল হয়েছে তা আজ কারও জানতে থাকি নাই। ঐ নীতির ফলে শেখ আবদুল্লা এমনকি ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি এবং শ্রীনিবাস চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মত নেতৃবর্গেরও সমর্থন লাভ করেছে। সোভিয়েটের বর্তমান গঠনভঙ্গ প্রদেশগুলির এমনকি

সাধারণ ও পররাষ্ট্র সম্পর্কের ব্যাপারেও স্বকিয়ত্তাধিকার স্বীকার করে। কিন্তু কোনো প্রদেশই যে সে অধিকার ব্যবহার করে না, বরং তারা পুঙ্ক্তর যোগস্বত্বেই আশ্বই হয়েছে এবং হচ্ছে, তাও পাটির নেতৃবর্গ ও কর্মীদের কাজের ফলে। এখানেও নীতি নির্ধারিত হয়েছে লোকচক্ষুর অমরালে। নীতি তির্যক এইভাবেই নির্ধারিত হয়—বিরাট সভাসমিতিতে তাকে জনপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে।

কংগ্রেসের আদর্শ ও মর্যাদা এবং পাটির দর্শ ও নীতি সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতৃবর্গ সচেতন থাকলে তারা এই লড়াই অবলম্বন করতেন। এই রকম মনোভাব নিয়ে যদি কংগ্রেস চলে, তা হ'লেই রাজ্য কংগ্রেসের গঠনভঙ্গ পরিবর্তনের উদ্দেশ্য সফল হ'তে পারে। বর্তমানে বিধান সভার নির্বাচক মণ্ডলী ও প্রাদেশিক কংগ্রেসের নির্বাচক মণ্ডলী এক করে দেওয়া হয়েছে। এর উদ্দেশ্য যদি শুধু নির্বাচনে সাক্ষ্যেই পর্ববসিত হয়, তা হ'লে আমাদের মনে হয়, সে উদ্দেশ্য বার্থ হ'তে বাধ্য। একই ব্যক্তি দুই বারনই থাকতে চাইবে এবং ঈর্ষাযবে কংগ্রেসকে ক্ষত বিক্ষত ক'রে তুলবে। আর, উদ্দেশ্য যদি হয় পাটির ভিতর অধিকতর সম্ব-যোগিতার মনোভাব সৃষ্টি ক'রে বিলম্বকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তা হ'লে বর্তমানে যে প্রস্তাব হয়েছে—লোকসভার কংগ্রেস সভ্যদের প্রবেশ কংগ্রেসের এবং বিধান সভার সভ্যদের ফেলা কংগ্রেসের সভ্য ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া, তার অর্থ ল্পট হয়ে ওঠে। হয়তো বিধান বা লোক সভার সভ্য হবার ফলে ঈরা এই সব উচ্চতর কংগ্রেস সংস্থার সম্ব হবেন, কোন কোন ব্যাপারে প্রাণের ভোট দেবার অধিকার নীমাষ ক'রে দেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। কিন্তু এই ব্যবস্থার ফলে কংগ্রেস নেতৃবর্গের ভিতর উচ্চতর নীতি নিয়ে সত্যাবশ্যক আলোচনা ও পরামর্শের ক্ষেত্র প্রসঙ্গ হবে। তা সম্বন্ধে বলব, মন্ত্রীদের গুণাকার কনিষ্ঠের অর্ধেক সীট দেবার প্রস্তাব হয়েছে—এর ভিতর যে সম্ভালালুপতার ও বৈষম্যের পরিচয় আছে তা আমরা কোনো কংগ্রেসকর্মী বা নেতার ভিতর আশা করি না।

শ্রীমতী গেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সালু'লার রোড হইতে শ্রীমতী চন্দ্রবতী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মন্দিরা' কার্যালয় ৩২নং আপার সালু'লার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

ସନ୍ଧ୍ୟା—ଆଶ୍ବିନ, ୧୦୫୯



ହସ୍ତ-ମୋହୀ

ପ୍ରାଚୀନ କାହାଣୀ ଚିତ୍ର ।

ବ୍ରହ୍ମ ଓ ଶୂନ୍ୟ ମିଳିତରୁ ମୋହ ମିଳି

କାଳକାହାଣୀ—୧

— ইন্দিরা —

পঞ্চদশ বর্ষ

আধুনিক—১৩৫৯

ষষ্ঠ সংখ্যা

স্বদেশী যুগের স্মৃতি

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

বঙ্গীয় চরপ্রশাসন শাস্ত্রী বলে গিরেহিলেন, বাঙ্গালী আত্মবিশ্বস্ত জাতি। তিনি কথটা বলেছিলেন বাংলায় দুঃশাসনার ইতিহাসের দিক থেকে। কিন্তু বাংলার আধুনিক ইতিহাসের দিক থেকেও বাঙ্গালী লম্বা ঐ অভিমত প্রকাশ করা চলে। ইংরেজ আমলের শুরু থেকে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে বাংলা কতটা অংশ গ্রহণ করেছে সে লম্বা সাধারণ বাঙ্গালীর মন একদিকে একটা অঙ্ক অহংকারে পূর্ণ। অপরদিকে সঠিক বিবরণ লম্বা অঙ্ক। সাধারণ বাঙ্গালী যুবকও জানে গোথলে বাঙ্গালী লম্বা বলেছিলেন “আজ বা বাংলা চিন্তা করে, আগামী কাল তারা ভারত তাই চিন্তা করবে”। কারণে অকারণে উক্ত ব্যক্তিকতার অপর প্রবেশের লোকের যুগের উপর গোথলের এই উক্তিটি ছুড়ে মারতে তারা ইতস্ততঃ করে না। কোন উপায়ভাষণ বিদেশী যদি কোন একটা বিশেষ উপলক্ষে আমাদের স্মৃতি করে থাকেন বা স্মৃতি করেন, তবে তাঁকে যে দিনরের সঙ্গে গ্রহণ করতে হয় এবং অপরদের যুগে ছুড়ে মারতে হয় না, সে শিক্ষা আমাদের যুবকদের নেই। অথচ তারা জানে না বারমোহন গাছের লম্বা হতে দেশবন্ধু দাশ বা সত্যাবজ্ঞা পর্যন্ত বাংলা বর্তমান ভারতকে গঠনে কতটা সহায়তা

করেছে। বর্তমানের উজ্জ্বলের বাহিরে আমাদের যুবকদের মন যায় না। অতীতের দিকেও যেমন তারা তাকাতো রাজী নয় ভবিষ্যতে কোন দিকে তারা দেশকে নিতে চায় তাও তারা জানে না।

কিছুদিন পূর্বে মৌলবী মুজিবুর রহমান সাহেবের দান শ্রমিকী স্মৃতি সভার সভাপতিত্ব করার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ষটিহাট মহন্তমার রহমান সাহেবের প্রগ্রাম নেহালপুরে এই স্মৃতি সভার আয়োজন হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পরে এই প্রথম স্মৃতিসভা। শ্রীহুজ সজনী দাশ ও অধ্যাপক নির্মল বোস এই সভার উদ্বোধন ছিলেন। আয়োজক দিনে মুজিবুর রহমান সাহেব হারত অপারাজের ও কালবহির্ভূত (out of date)। বিভক্ত ভারত ও বিভক্ত বাংলায় হিন্দুসুলভমানের ঐক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত আত্মরতবোধী মুসলীম নেতার হান কতটুকু তা লম্বাঙ্কই অনুমান করা চলে, তবু সেই স্মৃতি সভার বলে বাংলার অতীতের দিকে মন লম্বাঙ্কই গেল। আবদুল রহুল ও লিডাকৎ হোসেনের নাম বাঙ্গালীর মানসপট হতে হারত আজ আর সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েচে। অথচ বাংলার জাতীয় জীবন গঠনে এরা একদিন পুরোধা ছিলেন। পুরোধা যুগের যে করজন লোক এখনো

বেঁচে আসেন তাঁদের স্মৃতির হারহুৎ আত্মও এসেছে
যেটুকু স্থান বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে আছে তাইদের
স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গেই তা লোপ পাবে।

কিরিয়ার পথে সত্যের সহযাত্রীগণ আবার সঙ্গে ঐ
হুগের আলাপ শুরু করলেন। প্রথমেই মনে হলো
ব্রহ্মাঙ্কব উপাখ্যায়ের কথা। তাৎপাষণ পূর্ণ এই বনীবী
কর্মবীরের জীবনী বাঙ্গালীর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক
ইতিহাসে একটি বিচিত্র অধ্যায়। উপাখ্যায় মহাশয়
কেবল যে একজন উগ্রপন্থী রাজনৈতিক নেতা ছিলেন
তা বললে তাঁর স্মৃতির প্রতি অঙ্গমান করা হবে। এক-
ধারে তিনি ছিলেন হর্ষস্বভাবক, পণ্ডিত, হাশমিক এবং
রাজনৈতিক নেতা। পরাধীন দেশের সংঘর্ষমূলক রাজ-
নৈতিক আন্দোলনের সময় তাঁর জীবনকাল কেটেছে,
তাই তাঁর সমস্ত প্রতিভা কর্মক্ষেত্র তাৎপাষণ—সব কিছু
নিরোক্তিত হয়েছিল সেই সংঘর্ষমূলক আন্দোলনকে গড়ে
তুলবার কাজে। ষ্টুটবার্গ, ব্রান্সবার্গ, বৈদ্যাসিক বিংশ এবং
শেষ পর্যন্ত হিন্দু আচ্যোর এই সবটার সমন্বয়ে তাঁর জীবন
গড়ে উঠেছিল, সেই হিসেবে বর্তমান বাংলার স্মৃতির
তিনি প্রতীক।

এর সাংস্কৃতিক নাম ছিল তবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
যৌবনে তিনি কেশবচন্দ্রের নববিধান সমাজের দিকে
আকৃষ্ট হন। নববিধানের বার্তা প্রচার করতে ইনি বান
লিছু হেশে। সেখানে তিনি ষ্টুট বর্ষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে
রোমান ক্যাথলিক গুটান হন। কিছুদিন পর হলেন
প্রোটেষ্ট্যান্ট গুটান। তিনি গুটান সমাজী হলেন
এবং ব্রহ্মাঙ্কব উপাখ্যায় নাম গ্রহণ করলেন। লিছু দেশে
তাঁর বহু ভক্ত ও শিষ্য বহুদিন পর্যন্ত ছিল। সাধু টি এল,
ভাস্বানী তাঁদের অগ্রদূত। কিছুদিন পর তিনি বিদেশে
বান। বিলাতের অরসফোর্ড এবং কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে
তিনি ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা দেন।
ইউরোপের বিভিন্ন দেশেও ইনি বহু বক্তৃতা দেন। বলা
যায় যে পাশ্চাত্য দেশে ভারতীয় ধর্ম সম্বন্ধে যে অজ্ঞান
আজ দেখা যায়, ব্রহ্মাঙ্কব মহাশয়ের এই প্রচেষ্টা সে

পক্ষে অনেকটা সহায়তা করেছে।

কথা শু শোখা ভাবার বিতর্ক করেক বছর পূর্বে আমবা
তখনেচি, কিন্তু উপাখ্যায় মহাশয়ের প্রথমে কথা জন্মকে
রাজনৈতিক আসরে নামান। তাঁর সম্পাদিত ‘সন্ধ্যা’ কথা
ভাবার লিখিত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে বিপ্লবের আভ্রন
ছড়িয়েছে। আজ পর্যন্ত সন্ধ্যার মত জনপ্রিয় কাগজ
বাংলা দেশে বের হয় নি। “কালিঘাইকি বোমা”,
“এবার গড়ে গেছে প্রেমের কাঁদে” প্রভৃতি প্রবন্ধ তখন
জনতার মনে যে চাকলোর সৃষ্টি করেছে, যোবহর, আর
কোন বাংলা কাগজ সেই গৌরব লাভী করতে পারে নি।
শেবোক্ত প্রবন্ধটি লিখবার জন্য ব্রহ্মাঙ্কোই অভিযোগে
তিনি অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু সত্যবাদী সমাজীর কথাই
মতা হলো;—

কিরিয়ার কোটে তাঁর বিচার হতে পারলো না।
জেলে তাঁর দেহাবসান হলো। কিন্তু ব্রহ্মাঙ্কবকে আজ
যে বাংলায় প্রায় ভুলে গিয়েছে এটা তাঁর আত্মবিশ্বাসেরই
পরিচয়। বনীর সাহিত্য পরিষদ বা প্রাসেলিক কংগ্রেস
কমিটি বা পশ্চিম বঙ্গীক-সরকার এই মহাপুরুষের স্মৃতি
রক্ষার জন্য আজ পর্যন্ত কোন আয়োজন করেনি।
পুরানো “সন্ধ্যা”র কবিল হরত গুলে একমো পাওয়া
যেতে পারে; তার একটি সন্ধান প্রকাশ করা এমন
কিছু কঠিন কাজ নয়। তাঁর অবধান জীবনী প্রকাশ
করায়ও প্রয়োজন আছে—কেবল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা
সেবার জন্য নয়, আতীত চরিত্র গঠনের দিক থেকেও
এই প্রয়োজন আছে। আজ হরত অনেকই জানে না
বনীব্রহ্মাঙ্কবের বিশ্বাসভীর পরিচয়নার সঙ্গে উপাখ্যায়
মহাশয়ের যোগ কত ঘনিষ্ঠ ছিল।

ঐ হুগের আরও বহু লোকের স্মৃতি আজ অবলুপ্ত।
মনোরঞ্জন, স্বর্ষ ঠাকুরতার নাম হরত এখনকার যুবকগণ
প্রায় কেহই জানে না। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই বোধ
হয় প্রথম আন্তের ব্যবসায়ের বান এবং ভাঙে সফল হন।
কিন্তু বনীবী আন্দোলনের দ্বাধানে, তাঁর ব্যবসায় ভেঙ্গে
পেল;—বনের পরিচর্যা ছেড়ে তিনি এসে মেশের

পরিচয়ই দিকে। মনোরঞ্জন শুধুটুকুরতা ছিলেন ধর্মগান ব্যক্তি।—তিনি বিজ্ঞকল্পক গোবামীজীর শিষ্য ছিলেন। ‘ধর্মচর্চা’র চেয়ে তাঁর নিকট বড় হল দেশের পরিচয়। সাহিত্যিক হিসাবেও তাঁর কিছু খ্যাতি ছিল; তাঁর প্রণীত “মনোরমার কথা” ও ‘অজ্ঞ হু’ এক খানা বই ব্যাকারে কিছুটা চলত। সে সব ক্ষেত্রে তিনি যেতে উঠলেন বেশ সেবার ব্রত নিয়ে। “সন্ধ্যা”র অভিজাত সংস্করণ “নবশক্তি” বৈদিক কাগজ হল তাঁর বেশ সেবার বাহন। নবশক্তির ভাষা ছিল শুষ্ক অর্থাৎ লেখা—একটু শুষ্কগছীর কিন্তু তেজস্বী। বরিশাল প্রাদেশিক সংস্কলনে পুলিশের লাঠির ঘারে আতঙ্ক তার জ্যেষ্ঠ গুণ চিত্তরঞ্জন, অগারক ব্রজেন গাঙ্গুলী, রম্যা সাধা প্রভৃতি ছেজ্জালেকদের সামনে রেখে তিনি যে তেজস্বিনী বক্তৃতা দিয়েছিলেন তা আর সব জ্যোতার মনেই বেশ সেবার লুপ্ত সংকল্প কানিয়েছিল। মনোরঞ্জন বাবু ছিলেন অভ্যস্ত সুবক্তা, প্রকৃত জনতার বক্তা—হোট হোট কাহিনী ও উপাখ্যান দিয়ে তাঁর বক্তৃতাকে চিত্তাকর্ষক করার অদ্বুত কন্মতা তাঁর ছিল।

আর একজন ছিলেন কালীপ্রসন্ন কায়্য বিশারদ্য—তিনি ছিলেন সুরেন্দ্রনাথের অস্বরণ শিষ্য। শবেদী আন্দোলনের পূর্বেও কাব্যবিশারদ মহাশয় শক্তিপালী লেখক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন খোরতর রবীন্দ্রবিরোধী এবং সামাজিক বিষয়ে পোড়া লান্যন্ত পক্ষী। ইংরাজী ও বাংলা উভয় ভাষাতে তিনি তেজস্বী লেখক ও বক্তা ছিলেন। “হিতবাহী” কাগজের সম্পাদক হিসাবে তিনি বিশেষ যোগ্যতার পরিচয় দেন। এর পূর্বে এলাহাবাদে একখানা ইংরাজী কাগজের সম্পাদক হিসাবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। হিতবাহী কাগজে “কচি বিহার” নামে এক ব্যঙ্গাত্মক কবিতা বের হয় বেনারীতে। এ নিয়ে মানহানী মাঝলার কাব্য বিশারদের কারণও হয়। রবীন্দ্রনাথের “কচি ও কোমল” কাব্য প্রবন্ধে এক ব্যঙ্গ অঙ্কুরণ (parody) “মিঠে ও কড়া” নামে তিনি প্রকাশ করেন। এই বইতে

তাঁর কবিতা রচনার শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শবেদী যুগে তাঁর রচিত বহু সঙ্গীত বিশেষভাবে লোক প্রিয় হয়েছিল। প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাগিষ্ট্রেট কিংসফোর্ডে ভরপ সুকল্প সুনীল সেনকে বেজাখাতের আদেশ দেয়, ‘প্রকাশ্যে হানে ঐ সুকল্পকে বেস্ত মারা হ’ল অপর দল জনকে শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে। সুনীল বীর হির তাবে ঐ দণ্ড গ্রহণ ক’হল এবং প্রতি বেজাখাতের সঙ্গে বেস্তমারতম্ জ্ঞানি করেছিল। সেই উপলক্ষ্যে কাব্য বিশারদ সঙ্গীত রচনা করেন—“বেস্ত নেবে কি না তোলানি। আমি কি মারের সেই ফেলে!” তাঁর অপর ছুটি জনপ্রিয় গান ছিল—“শবেদীর বুলি স্বর্গ রেণু বসি, রেখো রেখো জুনে এ প্রব জ্ঞান।” এবং—“আজ বরিশাল পুণ্যে বিশাল হ’ল লাঠির মারা।” বরিশালে প্রাদেশিক সংস্কলনের অধিবেশন উপলক্ষে পুলিশের জুলুম, লাঠি চালনা, কংগ্রেস ছেজ্জালেকদের আতঙ্ক করা ও সায়েলন পণ্ড করে বেগুনার পর শেখোক্ত গানটি রচিত হয়। কাব্য বিশারদ মহাশয় কাব্যাত্মরাগী ছিলেন এবং তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়—“বিভাগপতি”র ‘পদাবলীর সম্পাদনে। তিনি আপন ভ্রমণে যান এবং প্রত্যাবর্তনের পথে তাহাকে মারা যান। প্রথা রক্তে তাঁর বেহ সমুজ্জের বলে সমাহিত করা হয়।

বংশ পরিচয়ে তাতা উপাধি ছিল না। কোনো মহাবীর নয়, বাঙালী আত একদিন সত্য ডেকে একজনকে “রাখা” উপাধি দিয়েছিল, তাঁর কথাও বাঙালী আত ভুলে গেছে। ইনি রাজা সুবোধ বস্তুিক। বিভাগ, বুদ্ধিতে, বাগ্মিতার ইনি ছিলেন সাধারণের বাইরে।

বিভাগ্যচক্র নিয়ে থাকতেই ভালবাসতেন। কিন্তু শবেদী যুগে দেশের স্বাধীনতার সাধনার একটা প্রচেষ্টা চলছে যেদিন থেকে জানতে পেরেন, নীরবে সেদিন থেকে সেই সাধনার তিনি যোগ দিলেন। বাদিকতলার বোমা তৈরীর কারখানায়ও যেহন ইনি অকাতরে গান করতেন, জেখনি করতেন বেস্তমারতম্, বুগাধর, সন্ধ্যা, নবশক্তি প্রভৃতি কাগজ পরিচালনাও। এইসব কাগজের এক

পরিচালক সমিতি ছিল। সেই সমিতিতে তিনি শ্রীব্র-
বন্ধের সহযোগী ছিলেন। এসব ছিল লোক চক্ষু
বাহিরের ব্যাপার। কিন্তু বেদিন জাতীর শিক্ষা পরিষদ
গঠনের প্রস্তাব হ'ল, সুবোধ মল্লিক প্রস্তাবের সাফল্যের জন্য
এক লক্ষ টাকা দান করলেন। এই দানের জন্য ইংরেজ
সরকার তাঁকে খেতাবে লেবে না, তাই জাতির ভরফ
থেকে বিভিন দ্বারাও সভা ডেকে সুবোধ মল্লিককে
'রাজা' উপাধি দেওয়া হ'ল। এখনও তিনি রাজা
সুবোধ মল্লিক ব'লেই পরিচিত। অবশ্য, আজকের
সমাজে কখন আর তাঁর নাম জানে?

আর একজন নেতা ছিলেন শ্রাবজ্ঞের চক্রবর্তী।
কীকর রাজগণি তেজস্বীতার বৃদ্ধপ ছিলেন।
অবিরোধের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে শ্রাবজ্ঞের অনেকটা
তাঁর অচ্যুত বা সহচরভাবে জীবন বৃদ্ধ করেন।
ইংরাজী বন্ধনান্তর্য কাগজের সম্পাদক মণ্ডলীর তিনি
ছিলেন অল্পতম। শ্রাবজ্ঞের ইংরাজী ও বাংলা উভয়
ভাষাতেই সমান ভাবে লিপিতে পারতেন। তাই
মনোরঞ্জন ও ঠাকুরতার নবমল্লিক ও ব্রজবান্দ্য উপাধার
মহাশয়ের 'গজ্য' কাগজের লগেও তাঁর বোগ ছিল।
শ্রাবজ্ঞের ছিলেন প্রকৃতপক্ষে আত্মভোলা বাক্য।
সামান্য আর থেকেও অব্যক্তের দ্বারা রাজনৈতিক কর্মীর
জন্য তিনি দান করতেন, নিজের ঘরে খাবার আছে
কি না, সে বিচার করার অবসর তাঁর হ'ত না।

বাংলার নর জন জনপ্রিয় নেতাকে ১৮৮৮ সালে ৩৯
আইন প্রেক্ষতার ক'রে রাজবন্দী করা হ'ল। শ্রাবজ্ঞের
জীবন অল্পতম ছিলেন। পূর্বে উল্লিখিত মনোরঞ্জন ও
ঠাকুরতাও তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। শ্রাবজ্ঞকে
ব্রজসেনের খেইটনিও জেলে আটক রাখা হয়। আর
দেড় বছর জেলবাসের পর এঁরা সবাই মুক্তিলাভ করেন।
শ্রাবজ্ঞের তখন বেশ একটু আর্থিক অনটনেই
পড়েন। সেই অবস্থার সুরেক্ষনাও তাঁকে আশ্রয় দেন
'Bengali' কাগজে নিজের সহকারীরূপে। এখানে
সুরেক্ষনাওয়ের চহিদ্দের একটা বিশেষ পরিচর পাওয়া

যায়। তিনি জানতেন শ্রাবজ্ঞের ছিলেন অবিরোধ কর্মী
গোষ্ঠীর লোক এবং উগ্রপন্থী। তবুও নরনগরী বা
উদারপন্থী সুরেক্ষনাও নিরীহ ও দুঃখ শ্রাবজ্ঞেরকে
নিজের সহকারী করে নিলেন।

Bengali থেকে কিছুদিন পর 'বাকালী' নামে এক
বাংলা দৈনিক কাগজ বের হয়। কার্যতঃ শ্রাবজ্ঞেরই
তাঁর সম্পাদক ছিলেন। ১৯১৬ সালের জুলাই মাসে
পুলিশ জুর্জুরের এক বীভৎস অধ্যায় তখন কলিকাতার
বুদ্ধের উপর চড়িত হচ্ছিল। টেপার্ট কিন্তু হেরেছে—
তাঁর অল্পতম সহচর বসন্ত চ্যাটার্জীর হত্যার প্রতিশোধ
নিতেই হবে। প্রতিদিন গলে গলে বুদ্ধ এবং কিছু
প্রাণ বরফ বাকি থাকা পড়েছে এবং তাঁদের উপর অকথা
অত্যাচার চলছে। পুলিশ অফিসের অফিসার ককে যা
চলছে—তাঁর প্রতিজ্ঞা নিহতের প্রতি ধূলিকণা থেকে
বেঁকেছে। সেদিন ১ই জুলাই,—শ্রাবজ্ঞের ঐ সব
জনজীবিত করার পাগল হয়ে উঠলেন। যাহুরের উপর
এই অত্যাচার, মনুষ্যত্বের এই অপমান! পরদিন
'বাকালী'র সম্পাদকীয় হস্তে শ্রাবজ্ঞের অত্বয়ের জ্বালা
আগুন চড়িয়ে পড়ল। ছুঁতিন দিনের মধ্যেই শ্রাবজ্ঞকে
গ্রেপ্তার করা হ'ল। তিন বছরের উপর কলিংগতে
অবরোধে আবদ্ধ থেকে তিনি মুক্তি গেলেন—অসহযোগ
আন্দোলনের প্রাকালে।

তিনি 'Servant' কাগজ বের করলেন—অসহযোগ
অভিযান চালাবার জন্য। কিন্তু কাগজ পরিচালনা
করতে যে বৈবরিক বুদ্ধির প্রকার, তা তাঁর ছিল না।
কাগজে লোকসান হ'তে লাগল। এদিকে অসহযোগ
আন্দোলনেও তাঁরা পড়ল। স্বরাজ্য আন্দোলন শুরু
করলেন দেশবাসী চিত্তরঞ্জন, শ্রাবজ্ঞের এর বিরোধী
হ'লেন। এর পর তাঁর রাজনীতি বেন একটা ঘোরাণা
পথ নেয়। শ্রাবজ্ঞের শেষের জীবন বিপ্লবী সুরের
রাজনৈতিকের বার্থতার পরিণামের দৃষ্টান্ত বলে বনে
করা যায়।

যে দুঃখ ও লাঞ্ছনাধরণ ঐ যুগের রাজনীতিতে কর্তে হইছিল তা অনেক সময় কোকের মাথায় বা একটা উদ্ভেজনার বশে বহন করা হয়; কিন্তু তার আঘাত মনের উপর যে লাগা রেখে যায়—তা থেকে মনকে মুক্ত রাখা সকলের পক্ষে সম্ভব হয় না। উৎসাহ ও উদ্ভেজনার বশে যে দুঃখ ও লাঞ্ছনাকে আঁমরা বরণ করি, স্বাভাবিক অবস্থার তাকে লক্ষ্যভাবে গ্রহণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। ভাবন মুক্ত হয় এক প্রকারের হিসাব দিলানো—কি ঘিরেছি, আর কি পেয়েছি এবং অপরেই বা কি দিয়ে কি পেয়েছে। এর পর আসে অবসান—ব্যক্তিগত বিবেচন এবং হরত বা খেঁচ।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে লিরাফৎ হোসেনের কথা। শ্যামসুন্দরবাবুর একজন অহংকৃত এই ভক্ত মুললয়ান নেতাটি বঙ্গেশী যুগের এক প্রকার প্রতীক। ত্যাগে, নিষ্ঠায়, আত্মবিক্রমে লিরাফতের তুলনা কম। স্বাধীনতান প্রথাকে জিইয়ে রাখার একটা প্রয়াস তিনি বরাবর করেছেন। সবাই ভুলে গিয়েছে, ৩০শে আশ্বিন তাইয়ে তাইয়ে রাবী বন্ধন করতে হয়, কিন্তু লিরাফৎ ভোলেদে নি। বাংলার মাটি, বাংলার জল, এক হোক, এক হোক

—এই মন্ত্র গান করতে করতে চারপাঁচটি মুখ নিয়ে লিরাফৎ বের হ'তেন মঠদানে রাবী বাধতে। বিদেশী জব্বা লিরাফতের নিকট পাণ ব'লে গণ্য হ'ত। বড়রের পর বড়র জীব পারিতোষের মধ্যে পেকেও মনের ভেজ ও আদর্শের প্রতি-নিষ্ঠা হারান নি। যেমন যেখাছি তাঁকে ১৯০৬-৭ সালে। তেমনি যেখাছি তাঁকে ১৯২৮-২৯ সালে। বহিরাগে একবার তিনি গুত হন এবং দুই বছর কাখাসের আবেশ পান—অপরাধ ছিল বিদেশী জব্বার পরিবর্তে স্বদেশী জব্বার প্রচলনের জন্ত তিনি প্রচেষ্টা করছিলেন। কলিকাতার মেথেন্ডি—পার্ক পার্কে একদল ভেলে নিয়ে যুরতেন। বন্ধেমাস্তরম্ ও স্বদেশী প্রচেষ্টা করতেন। আর প্রতি বছর ৩০শে আশ্বিন এলেই তিনি রাবী হাতে নিয়ে বের হ'তেন। কীদকার, স্বাধীনতা, দীর্ঘ পক্ষপাত সম্বন্ধিত যেখাটি বাধাকোর চাপে যেন হয়ে পড়েছে;—তবু রাবী নিয়ে বেরতেন এবং তাঁর অহংকৃত পাঁচটি মুখের সঙ্গে বলতেন—বন্ধেমাস্তরম্ এবং গান করতেন—“বাংলার মাটি বাংলার জল পুণ্য হোক পুণ্য হোক হে ভগবান—বাংলাদীর ঘরে বসে তাই খেদে এক হোক এক হোক হে ভগবান।”



অশান্তি ত্রিবিধ নিম্ন

একজন উঠে গাড়িরে বসলেন—সকলের অসুযোগে
কুমারী বাণী সেন এবার আর একখানা ভজন গান
গাইলেন—

চারিদিকে পটাপট হাততালি পড়তে লাগলো।
ছোটখাটুই হুজু করলেন গ্রন্থমে। তারপর হরিপ্রবাস
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্তে ছ'হাত দাবার ওপর
তুলে হাততালি দিলেন। বুদ্ধ যাত্রণ ব্যোমকেশবাবু
রেকর্ড সেকশনের ক্রান্ত। বাস্তব 'বাথ' হাত নাড়তে
পারেন না। গ্রাণের দ্বারে তিনিও হাততালি দিতে
লাগলেন। ওখান থেকে কেদার, শশিকান্ত, বিনয়,
বেদান্তন সবাই হাততালি দিয়ে উঠলো। চাকরির ভয়
বার গ্রাণে আছে সে কি হাততালি না দিয়ে পারে।
সবাই কম বিস্তর ঢালোক চতুর। শেষ কালে কেউ
হস্ত তাল অফিসে গিয়ে বড়খাবুক ফুটল করে
লাগাবে—জানেন স্ত্রীর, কাল আপনার মেয়ে এমন
চমৎকার গান গাইলে, জামরা তো একেবারে বোধিত
হয়ে গেছি, আর আমাদের শশিকান্ত কী করছিল
জানেন ?

বড়খাবু জিজ্ঞেস করলেন—কী করছিল ধো ?

—শশিকান্ত একবার হাততালিও দেয়নি স্ত্রীর—কিন্তু
না হয় জিজ্ঞেস করবেন আর কাউকে—তা চুকলি দাবার
লোকের অভাব নেই এ অফিসে। ওই যে সাম-হেড
নটরাজন। বাজাজীর বাজা। বাংলা গানের কিছু
বোঝে না, তবু বলে বলে বড়খাবুর মেয়ের গান শুনছে
কী বৈধ ধরে। কীধের আশ্রয়। ওরাই খোসাবাদ
করতে পারে বটে। আসছে মাসে ইনক্রিমেণ্ট-এর
লিট দেবে। শশিকান্তর নাম যদি সে লিটে থেকে বাদ
পড়ে বার তো অবাধ হবার কিছু নেই। তা ছাড়া
সামনেই চেয়ারের ওপর বড়খাবু নিজে বসে আছেন।
চারিদিকে তীক্ষ্ণ নজর দিচ্ছেন এক একবার। বার বার
লক্ষ্য করছেন—সবাই এসেছে তো! সামনে বসতবু

নজর চলে—সবাই তাঁর অফিসের দোক। নিজের
রাজত্ব। এমনকি বিনোদ চাপরাশিটি পর্যন্ত তাঁর গাড়িরে
বড়খাবুর মেয়ের গান শুনছে। না শুনে কি পারা থাকার
কো আছে।

কোলিয়ারী অফিসের দুর্গাপুজোর হলুদ। সব
ঢালোরা স্তরকি পড়েছে। ওপরে সেরপল। এতকাল
গান বাজনা বা কিছু হয়েছে, কোনও রকমে নাক কান
বুঝে নক করা গেছে। কিন্তু এবার বড়খাবুর মেয়ের
গান। এ গান না শুনে চলে দাবার উপার নেই। খুব
শেলে চলেবে না এখন। হাই তুলতে পারবে না, চুপ
করে কান খাড়া করে, শিরশীড়া সোজা করে শেষ পর্যন্ত
শুনতে হবে। একখানা গানের পর হাততালি দিয়েই
কর্তব্য সমাধা করলে চলবে না। আর একখানা গানের
অন্তরোধও জানাতে হবে।

নিবারণেই কষ্ট হচ্ছিল বেশি। ডেস্প্যাচ সেক্-
শনের নিবারণ হাজরা। কদিন ধরে আশাশ চলছিল।
আজ সকালে বাজা রায়াল পাতার কোল দিয়ে ছুটি
ভাত খেয়েছে। এখনও পেটটা ভালো করে আঁটে নি।
বাবে বাবে এখনও তলপেটটা ফুল ফুল করে বাবা
করে ওঠে। তার ওপর এত রাত পর্যন্ত না-খাওয়া
না-দ্রাওয়া না-খুব। ছুতোর চাকরি। ঝাড়া হাত পা
হলে কী এই রকম করে ওই বাতো বহরের এক ফুটকে
মেয়ের গান শোনে সে! তা ছাড়া গান জিনিবটাই
কোন দিন বিশেষ ভালো লাগে না নিবারণের। ও সব
বধ নেশা কোনও দিনই নেই তার। সিগারেট, সিঁড়ি
পানের মেলাই নেই, তো গান। যে সব গান শুনে
লোকের চোখ দিয়ে কল কল করে জল পড়েছে, সেই
গানই কখনও ভালো লাগতে পারেনি তাকে। নেহাৎ
চাকরির দ্বারে পড়ে আজ এখানে আসতে হয়েছে।
নইলে কত রকমের চুকলি ধোর লোক আছে অফিসে।
বড়খাবুর কানে তুললেই হলো।

দরকার কি পড়গোলে। নিবারণ হাফরাও সকলের
সঙ্গে তাল দিয়ে হাততালি দিয়ে উঠলো।

মধুরেশবাবু পান থেকে চুপি চুপি বললেন—কেমন
ভালো নিবারণ?

নিবারণ বললে—আহা চমৎকার—

মধুরেশবাবু আবার বললেন—গতি বলছো না
মিথো বলছো?

নিবারণ এবার ভালো করে চেয়ে দেখলে মধুরেশ
বাবুর দিকে। কী মতলব কে জানে। মধুরেশবাবু
আবার বললেন—গতি কথা বলতে কি তাই, আর
পারছি না আমি, আককের তাল খেলাটাও মাটি হলো—

এর থেকে হুঁগান খেললে কার মিত্তো—

পাশে ভানিটারি ইন্সপেক্টর রায়লিঙ্গম্ বসে ছিল।

মধুরেশবাবু বললেন—আপনি কেন বসে আছেন
রায়লিঙ্গম্ সাহেব, আপনাদের সঙ্গে বড়বাবুর কীসের
সম্পর্ক—আপনি তো সি-এম-ও'র আঙারে—

রায়লিঙ্গম্ হাসতে লাগলো। কিছু উত্তর দিলো না।
নিমজ্জিত হয়ে ছুঁ চার জন রেলের অফিসার এসেছিল।
তারা বগাসবরে চলে গেছে। মনোজ্ঞগড় থেকে স্ব'জন
মার্কেটও এসেছিল। তারা বড়বাবুর ঘরের পান আরম্ভ
হবার আগেই চলে গেছে। কিন্তু বিপদ হয়েছে
কোরানিরা কোলিয়ারির কোরানীসের। রাত এগারোট
থেকে গেছে। বারোটাও বাজতে চললো—এখনও পান
শেষ হবার নাম নেই। একটার পর একটা চলেছে
তো চলছেই।

হরিশবাবু পাকা লোক। পানের মধ্যেই একবার
আবেগের ঝোঁকে বলে উঠলেন—ও হো-হো-হো—

ওপাশ থেকে কেরানও একবার খানিক পরে বলে
উঠলো—আহা-হা-হা—

চারিদিক নিভুন্ড। দুই শব্দটি করবার সাহস নেই
কারো। বড় বড় গুজর এলে আগে সেয়ে গেছে
এখানে, তখনও এখন মনোযোগ দিয়ে কেউ পান পোনেনি।
নিবারণ হাফরাব পুন আশ্রিত। চোখ দুটো একেবারে

মুখের ষোরে ঝড়িয়ে আসছে; হঠাৎ বড়বাবুর দিকে
নজর পড়তেই সোঁদা হরে বসলো সে। তার দিকেই
চেয়ে আছেন বড়বাবু। সর্বনাশ! সেখানে পেরেছেন
না। নিবারণ হাফরাও হঠাৎ পানের তালে তালে
মাথা ঘোলাতে লাগলো।

এবার একটা পান শেষ হতেই মধুরেশবাবু
হাততালি দিয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে
হাততালির বড় বয়ে গেল।

মধুরেশবাবু উঠে বললেন—এবার একখানা রবি-
ঠাকুরের পান খনি.....

নিবারণও চমকে উঠেছে।

মধুরেশবাবু বললেন—কিছু মনে করোনা তাই—
আবার তিন বছর ইন্ডিয়ান ট্রিনি—এই লাঠি চাল—
কেরান তখন থেকে দেখছি বেশি হাততালি দিচ্ছে—
আমাকে ভাই-ই উপক যাবে দেখছি—

আবার পান শুরু হলো। এবার নিবারণের পেটটা

আবার কুল কুল করে উঠলো বেন। বেশ যদি দিন
কতক ছুটি পাওয়া যেত তো কিছুদিন কোথাও বাইরে
মুয়ে এলে সারতো পেটটা। ছুটি চাইতেও তার করে।
বড়বাবু বা ব'বেজারী লোক। সারাদিন মুখ খিঁচিয়েই
আছেন। কিছুতেই আর তাকে মুখী করা যায় না।
সেবার বেশে গিয়ে বেড় সেরটাক নকুন শুভের পাটালি,
ইলিশ মাছ আর পটল এনে দিয়েছিল বড়বাবুকে।
নিবারণ ভেবেছিল অমৃত; তার সঙ্গে ব্যবহারটা ভালো
করবে। ভালো ব্যবহার করতে পয়সা খরচ হয় না।
একটু বিষ্টি কথা, একটু হাসি মুখ। তা হলে কান করেও
আনন্দ। হাসি মুখের কাগাল নিবারণ। একটু হাসি
মুখে কেউ কথা কইলে নিবারণ হাফরা তার জুতো
পরিস্কার করে দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু অত পাটালি
দিয়েও খুঁট করতে পারেনি বড়বাবুকে।
কমলা বলেছিল—সব শুড়টাই বেশে বড়বাবুকে?
হেলেনদের ক্ষেত্রে একটু খাখলে ভালো হতো—

তা সেই শুড় বেয়ার পরখিনিই বড়বাবু ভেবেছিলেন
নিবারণকে।

নিবারণ ভেবেছিল বোঝার গুড়ের দামের কথাটা জিজ্ঞেস করবেন। গুড়ের দামের কথা জিজ্ঞেস করলে নিবারণ বলতো—দামের কথা আপনাকে আর ভাবতে হবে না তার। তুমি আমারের গাছেরই কিম্বা, ওর অজ্ঞান দাম কি নেব—

কিন্তু বড়বাবুর কাছে যেতেই বলেছিলেন—মিন মিন কী হচ্ছে তোমাদের বলো তো—একটা চিঠি বেকর্ড লেকশন থেকে এখানে আসতে পনেরো মিন লাগিয়েছে—আর এখান থেকে বিলতে যেতেও যে তিন মিনও লাগে না যে—

নিবারণ চুপ করে ছিল। বড়বাবু কিন্তু খামেন নি লেখানে। আবার বলেছিলেন—আর বেশ দিখিনি আমারকে, সকাল সাতটায়ে এসেছি আর সেই রাত নটার বাড়ী বাবো—এ সব দেখেও তোমাদের আঁকল হয় না—আজ্ঞা বেশ, ইনক্রিমেন্ট হলোনা বলে যেন শেষে আকাশোষ করা না বলে দিচ্ছি—

সেবার পল্টু যেদিন মারা গেল কয়লা তিন দিন কুঁট হয়ে পড়েছিল। অকসেসে একটা বগরও পাঠিরে দিয়েছিল যমুরেশবাবুর হাতে। তিন দিন নিবারণ নিজেই হাতে রান্না করে খাইয়েছে ছেলেপুলেদের। অজ্ঞান সব নিষ্ঠ। তাদের কি বোঝবার বয়স হয়েছে। তিন দিন পরে অকসেসে যেতেই বড়বাবু ডেকেছিলেন।

বড়বাবু বলেছিলেন—নিবারণ তোমার একটা কথা জিজ্ঞেস করি, তোমার চাকরি করবার ইচ্ছে আছে, আর ইচ্ছে না থাকে তো তাত বলো—

শেষে বলেছিলেন—দশ গজা ছেলেরপিলে হলে একটা ছুটো মারা যায়ই—তা নিয়ে কষ্টও হয় জ্ঞানি, আমারও মারা গেছে, আমি নিজেও ছেলোবনের বাপ, সব জ্ঞানি, কিন্তু.....

কিন্তু বলে বড়বাবু নিজের মূর্তি ধরেছিলেন। বলেছিলেন—তোমার বাপের বরদী আমি, একটা উপদেশ দিই কিছু মনে করো না—কথাটা এই যে নিজের পায়ে নিজে হুকুল মেরো না—

তা নিবারণ নিজের লক্ষ শক্তি দেখে নিজেই আবাক হয়ে যায়। বড়বাবুর কথাগুলোও তো আশাশর ব্যবার চেয়ে কম কষ্টদায়ক নয়। ছুই-ই সমানে লক্ষ করে এসেছে নিবারণ। আর কেউ হলে ছুই বুনি বনিরে দিত বড়বাবুর নাকে। তারপর যা হয় হোক। তা সেবার কেনারও তো ঠিক করেছিল বড়বাবুকে খুন করে ফেলবে। বড়বাবু তিনদিনের মাথানে কেটে নিয়েছিল কেনারের।

কেনার বলেছিল—কাউকে বলিসনি ছুই নিবারণ, ওই বোতাকে আমি খুন করবো, নির্দাং খুন করবো—বলে পকেট থেকে একটা ছোরা বার করেছিল।

নিবারণ চমকে উঠেছিল—সে কি!

একটু যেন আনন্দও হয়েছিল নিবারণের। বড়বাবুর অসুস্থস্বাস্থিটা তাবলেই কেমন যেন সন্ধ্যার নিঃশব্দ বেরিরে আসে যুক থেকে। বললে—ছোরা কোপার পেলি?

কেনার বললে—কাটনি থেকে পাঁচ টাকা চার আনা দিয়ে এনেছি—একদিন যদি পাই বাপে তো দেখে নিল ছুই, আমি খবর নিয়েছি, বড়বাবু থাকে মাঝে চিরি-মিরির দিকে বেড়াতে যায়—

সেই ছোরা নিয়ে কতদিন কেনার পাগলের মত অঙ্ককারে অঙ্ককারে ঘুরে বেড়িয়েছে। হয়ত খুনও করতো। সন্তা সন্তা বাপে পেলো। কিন্তু মার্চ মাসে নতুন ইনক্রিমেন্ট জিও কেনারের নাম বেরোতে কেনার মনে গেল। বললে—যাক গে, বোটা খুব বেঁচে গেল এবারে, কিন্তু আর যদি কখনও পেছনে লাগে আমার তো দেখে নিল—

তবু কেনার নয়। ওই শশিকান্ত, মিনর, বেচারাম, হরিশ বাবু, সকলেই বড়বাবুর ওপর খাপা। যেদিন বড়বাবু চোরার থেকে লকবেন সেইদিনই ইক ছেড়ে বাঁচবে সবাই। বুড়ো ব্যোমকেশ বাবু, হাতে বাস্তের বাধা, বড়বাবুকে গালাগালি না দিয়ে অলগ্রহণ করেন না তিনিও। অথচ আজ সবাই গান শুনেছে বড়বাবুর বয়ের! প্রাণের দায়েরই বটে। দোষ কারোই নয়!

বড় বাবুর বেয়েরও নর, বড় বাবুরও নর, কোরাসিয়া
কোলিয়ারীর কোরানীদেরও নর। দোখ অদুতের। ডেল-
প্যাচ লেকশানের কোরানী নিবারণ হাজরা বড়
অষ্টবাহী।

নিবারণ প্রথমে তেবেছিল—আসবে না সে গান
জনতে।

মধুরেশ বাবু জিজ্ঞেস করেছিল পরও দিন—গান
জনতে থাকো তো ইনস্টিটিউটে—

নিবারণ বলেছিল—না মধুরেশ বাবু। আমার নিজের
গান কে শোনে তার ঠিক নেই—আজ সাতদিন ধরে
নিজে বারাবার করে চালাচ্ছি, ছোট খুঁকীটার অস্থ-
নিজেও আমাণ্যের ভূগছি শুধু গানালের কোল খেয়ে
আঁচি কদিন—

মধুরেশ বাবু বলেছিলেন—না হে না, এমন পাগলামী
করো না, ও গিয়ে তোবার আমাণ্যই হোক, আর
বাড়িতে বৃত্তাই হোক—ও যেতেই হবে—মরে মরেও
যেতে হবে—নইলে বেটা সব মনে রাখবে—ওর নিজের
মেরে গান গাইবে বগেই বলছি, ওর বেয়ের গানটা
তুনেই ছুঁই বরং উঠে পড়ো—কেউ কিছু বলবে না—

শুধু মধুরেশ বাবুই নয়। কেদারও ওই কথাই বললে।
তেতো ওষু খাওয়ার মত বড় বাবুর মেরে গানটা
কোনও রকমে একটু ধৈর্য ধরে জনতে হবে। গানের
সময় ছুঁ'একবার না হয় বাহবাও বেওয়া গেল। হাততালি
দিতেও আগতি নেই। নিবারণও ভেবেছিল—কথাটা
নিখে নয়। অবস্ত গান কোনও দিন তালো লাগে না
নিবারণের। এর আগেও কত তাল তাল গাইয়ে এসেছে
এখানে। নিবারণ কোনও দিন দায় নি সে সব জনতে।
ও সব দেশার বগেবগাল নেই তার। কিন্তু আজকের
কথা আলাদা।

কবলা বলেছিল—কখন কিরবে?

নিবারণ বলেছিল—রাত আটটার মধ্যেই এসে থাকো।
আমি কি আর গান জনতে বাড়ি—

কবলা বলেছিল—বেশী দেয়ী কুরো। না। পুঁচির

আজ দশবার দাত হয়েচে, রাত্তিরে যদি কাঁদে তো আমি
একলা বাহলাতে পারবো না—

কিন্তু বড় বাবুর মেয়ের গান শুধু হতেই রাত দশটা
বাঞ্ছলো। বড় বাবুই নাকি হুতুম ছিলো আমার মেয়ের
গানটা সকলের শেবে নিজে তোমরা। ও সব উচ্চাঙ্কের
সমীচ খেবে হওয়াই ভালো—ওর পরে আর কোনও
গান জমে না—

তা সেই রাত দশটা থেকে শুরু করে এখন প্রায় রাত
একটা বাজতে চললো। প্রথমে খেদার না কি চরেছিল
একশতী ধরে। তারপর ফুঁকী। ফুঁকীর পর শুকন।
শেবে মধুরেশ বাবুর অস্থতোধে করেকটা রবি ঠাকুরের
গান।

গান বখন শেষ হলো নিবারণ হাঁক রেড়ে বাতলে
যেন। এবার বাড়ী যেতে পারবে। মধুরেশ বাবু ওই
সিকেই যাবেন। নিবারণ জিজ্ঞেস করলে চলুন বাবা—
বাড়ী চলুন এবার—একসঙ্গে বাই—

মধুরেশ বাবু অবাক হয়ে গেলেন—। বললেন—
সে কী হে, আসল কাজটাই যে এখনও হয় নি—

—কীসের আসল কাজ? নিবারণ বুঝতে পারলে
না কিছু।

মধুরেশ বাবু বুঝিরে বিলেন। বললেন—আমরা যে
এসেছি, শেষ পর্যন্ত বসে গান জনেছি, ওর মেয়ের গান
আমাদের ভালো লাগেছে এটা বড় বাবুকে বুঝিরে দিতে
হবে না—চলো দেখা করে আসি—

অগত্যা যেতে হলো। কিন্তু বড় বাবুর কাছে
পৌছার শুধন কার সাধি। সবাই ঘিরে রয়েছে তাঁকে।
কেদার সকলের আগে। বলছে—ভার, আপনার মেয়ে
একটা প্রতিভা—কী গানই জনল—

বোম্বকেশ বাবুও এগিরে গিরে বললেন—ভার এ
আর অস্থের সাধনা না হলে এমন হয় না—পূর্বজন্ম আর
কেউ বাহুক না বাহুক আমি বানি তার—

মধুরেশ বাবুও সাধনে গিয়ে হাজির হলেন—ভার
সাধনে বলছি বলে খোলাখোদ করছি মনে কহবেন না,

এ গানের কাছে কোথায় লাগে বলের গান—

বেটারাম বললে—যেতিমতে আমার জানাশোনা
লোক আছে তার আপনি বলি বলেন তো—

বড় বাবু বড় বড় হাসছিলেন। আর দেখছিলেন
চারদিকে। হঠাৎ একবার বললেন—নিবারণকে দেখছি
না, ভেনপ্যাচ সেকশনের নিবারণ হাজরা...

নিবারণ ভাড়াভাড়া নামনে এগিয়ে গিয়ে বললে—
এই যে তার আমি—

বড় বাবু তুট্ট হলেন।

—ও তুমি এসেছ? কিন্তু সুবোধকে তো দেখছি

২ না, সুবোধ কোথায়?

সবাই চারিদিকে চেয়ে দেখলে। লভিই তো সুবোধ
আসেনি। ছোঁকরার সাহস আছে বলতে হবে। তানি-
টারি ইনসপেক্টর রামলিঙ্গ আর সাব-হেড নটরাজন
জনম বড় আয়ুকে দিয়ে বোঝাতে শুরু করেছে। মাজাজী
ইন্ট্রিজিতে বিনিয়ে বিনিয়ে বলছে—তার, গানের
ব্যাপারেও বেকলই দেখছি কাঠ, মাজাজী নিউজিক
ভালো। কিন্তু বেকলের সঙ্গে পারবে না—গণিটিজই
বলুন, পোইটিভেই বলুন—বেকল হচ্ছে ল্যাভ অব
জিনিয়স...

তুঁ নিচু রাজা। কোথাও চক্কাই, কোথাও উৎসাহ।
পাশে জেনারেল ম্যানেজারের বাতলো। চারিদিক
সিঁদ্ধ। দুই চিরিমিরির পাংড়টা হেঁচা আছে।
আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। কির কিরে
হাওয়া। বেশ ঠাণ্ডা পড়তে শুরু হয়েছে। ওরা সব
চলে গেছে যে বার রাজার। কোরাসিয়া কোলিয়ারীর
ভেনপ্যাচ সেকশনের কেরানী নিবারণ হাজরা আর
এক্সপোর্ট সেকশনের মধুরেশ বাবু পাশাপাশি চলছিল।
এতক্ষণ কারো মুখে কথা নেই। নিবারণের বেশ
ভালো লাগলো হঠাৎ। পেটের আশাশর কুন কুন
বাগাটোও বেশ এখন সেয়ে গেছে।

নিবারণ একবার বললে—সুবোধের এবার চাকরি
দিয়ে টানাটানি হবে—কী বলেন দাদা—

মধুরেশ বাবু বললেন—আরে রামজি, সুবোধকে
চাকরি ছাড়ার কার বাপের সাধি—ও জেনারেল ম্যানে-
জারের হেলেকে হিঁসী পেয়ার—ওকে কিছু করতে
পারবে না বড় বাবু—নইলে অস্ত্র বুকের পাটো—

নিবারণ আবার বললে—কিন্তু আমাকে আপনি খুব
বাড়িরে দিয়েছেন দাদা—আপনি না বললে আমি তো
গানের পর বাড়ি চলেই থাকিলাম—

আবার বানিকন্দন চূর্ণাণ। হুঁ একটা শুকনো পাটা
পড়ার শব্দ। হুঁ একজন লোক চলেছে। ভিউটিতে।
হাতে গ্যাস বাতি।

নিবারণ হঠাৎ বললে—আমেন দাদা কমলাও এক-
কালে খুব ভালো গান গাইতো—

—কমলা কে? চিনতে পারলেন না মধুরেশ বাবু।

নিবারণ বললেন—আমার স্ত্রী—

মধুরেশ বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন—ওঃ বাবা,
তুমি আমার বউয়ের নাম ধরে ডাক নাকি? আমার
বউয়ের নাম তো আমি কুলেই গেছি কবে—

নিবারণ কেমন লজ্জিত হয়ে উঠলো। আর কিছু
কথা বেকল না তার মুখ দিয়ে।

বাড়ির সামনে এসে মধুরেশ বাবু বললেন—কিন্তু
কান্ডটা দেখলে ওদের ওই নটরাজন আর রামলিঙ্গদের—।
বেটারা ট্রিক বড় বাবুর দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে
আর রামলিঙ্গদের আঁকলটা দেখলে—তুঁই কাজ করিস
দি-এম-ও'র আঙায়ে, তার বড় বাবুকে বোশাখোদ
করবার কী দরকার—

তারপর হঠাৎ কী খেন তেবে নিয়ে বললেন—ওঃ
এতক্ষণে বুঝতে পেরেছি—তাই বলি দাদা রাজাটা
জেবে জেবে কুল কিনারা পাচ্ছিলাম না—এতক্ষণে
বুঝতে পারলাম, ওর একটা জানাই আছে বেকার,
তাকে আমাদের আগিসে ঢোকাবে—

বাড়ির দরজার গিরে আস্তে আস্তে দাঁকা দিতে
লাগলো নিবারণ। দুটি কেমন আছে কে জানে।
সবাই বোধ হয় অধোরে ঘুমেছে।

অনেকজন ডাকার পর দরজা খুললো। কমলা ঘুম চোখে এসে দরজাটা খুলেই আবার গিরে চুকলো বিরাট মশারিটার ভেতরে। খুব ঘেন তার তার। কমলার পিঠের জাঁচলটা ঘলে গিরেছিল এক নিমেষের জন্য। কমলা ঘেন আগের থেকে অনেক রোগা হয়ে গেছে মনে হলো। কিন্তু কিছু কথা বলতে সাহস হলো না নিবারণের। সত্যিই এক রাত করে কেদা অস্তায় হয়ে গেছে। কিন্তু গান শুনেতে না গেলেও তো আরো অস্তায়ই হলো। কোনদিকই বা সাবলানো যায়। একবার মনে হলো—জিজ্ঞেস করে পুঁটি কেনম আছে। কিন্তু হাত খুব ঘুরে নিবারণ চাকু খুলে ঠাণ্ডা তাত ক'টা খেতে বসলো। আজ গাঁদালের কোলটার একটু হুন বেশি হয়ে গেছে। বাকু পে, নিবারণ তাত খেতে খেতে ভাবলো—খেতে যে পাচ্ছে এই-ই তো যথেষ্ট। চাকরিটা না থাকলে খেত কী।

বাগরা সেরে হাত খুব ঘুরে এসে আর একবার কথা বলবার চেষ্টা করলে নিবারণ। কিন্তু কোনও কথা বেরল না খুব গিরে। আস্তে আস্তে ঘরের কোণে নিজের বিছানায় এসে বসে আলোটা নিভিয়ে দিলে। আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় বসে একবার কীপ করে আস্তে আস্তে ডাকলে—কমলা—

ওঘার থেকে কোনও সাড়াশব্দ নেই। আছা, বেগু হয় ঘুমিয়ে পড়েছে। দশটা ছেলে বেয়ের তাল সামলাতে সামলাতে সাতা বিন ব্যস্ত—ঘুমেরই বা অপরাধ কী।

অন্ধকার ঘর। কোথাও কোনও সাড়া শব্দ নেই। শুধু ওপাশে মশারির ভেতর থেকে দশটা গ্রাবীর মিখাস পতনের শব্দ শোনা যায়। দশটি শিশু। পল্টুটা মাংস পেছে। সে থাকলে এগারোটা হলো।

অনেকক্ষণ পরে অন্ধকার ঘরের ভেতর বিছানায় বসে বসেই নিবারণ আবার ডাকলো—কমলা—

—উ—

—ঘুমলে নাকি ?

—হ্যাঁ, কিছু বলবে ?

কমলার গলার আঙুরাজ শুনে মনে হলো সে ঘেন এখনও বেগে আছে।

নিবারণ বললে—পুঁটি কেনম আছে ?

কোনও উত্তর এল না। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে রইল নিবারণ। কিন্তু কোনও উত্তর নেই।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তবু দেই বিছানায় ওপর নিবারণ জখনও বসে।

আবার ডাকলে নিবারণ—ঘুমলে নাকি ?

—না, বসো, আবার কী চাই—

নিবারণ গলার স্বর খুব নিষ্ঠি করে বললে—আজ্ঞা কমলা, চোট বেলায় তুমি খুব ভালো গান গাইতে, না ? জনৈছি মাঠার রেখে গান শিখেছিলে.....

—হ্যাঁ, তা কি হবে ?

নিবারণ গলার আরো বহু চেষ্টা বললে—না, সেই যে বাসর ঘর তুমি একটা গান গেয়েছিলে না, 'তোমারেই ভালো বেসেছি কীবনে, তোমারেই ভালো বাসিযো,—সেই গানটা অনেকদিন পরে আজ শুনলুম কি না, বড়বাহুর মেয়ে গাইলে যে, আছা তোমার গান, আর এই গান, ডি, ডি.....কানে আনুল দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল...আজ্ঞা কমলা গানটা তুমি ছাড়লে কেন, চর্চা রাখলে এতদিনে...

কথা শেষ হলো না নিবারণের। পুঁটি হঠাৎ ঘ-জান-আকান জাতিয়ে তীব্রকার করে উঠলো।

ওঘার থেকে তীব্র কঠে শব্দ এলো—হলো তো, হলো তো এখন, এখন সামলাও, এই সব কত কঠ করে একই খুব পাড়িয়েছি—তা নয় রাত জুড়ে গান শুনে বাড়ি এসে বাঁড়ের মত চাঁৎকাং হুস করলে—সারাদিনের পর রাত্তিরে যে একটু হুঁচোপ এক করবে, তারও উপায় নেই তোমার জালায়—কেবল ভেলর, ভেলর...

কড় বরে বেতে লাগলো কমলার কথা। যা নয় তাই বলে কমলা নিজের অনুষ্টকে বিকার দিয়ে কাটা ছুড়ে দিলে।

নিবারণ এক মুহূর্তে চোবের মতন নিজের মশারিট।
ক্লপ করে ফেলে দিগে বিছানার চিং হয়ে শুয়ে পড়লো।
পুঁটির চীৎকার, কথলার আভ্যাস সব মিলে সে এক
অজ্ঞান্য কাত। শুধু মশারির তেত্তরে আত্মগোপন করে
নিবারণ যেন নিজেকে নিশ্চিন্ত নিরাপদ বোধ করলে।
সেই রাতে ঘুম আসবার আগে নিবারণের যেন দার্শনিক

হতে সাধ হলো। ডেনপ্যাচ লেকপুটের কোণা
নিবারণ হাজরার মনে হলো—যশ্যরি কে আবিষ্কার
করেছে কে জানে। যে-ই আবিষ্কার কইক, এই রাতের
মতন দিনের বেলাটাও যদি মশারির তেত্তর থাকে যেত।
শুধু দিনের বেলাটাই বা কেন, সাহাদিন, সাহায়াত,
সাহা সপ্তাহ, সাহা মাস, সাহা বছর—সাহা জীবন!

কীর্তিনাশার কুলে

ঐশ্বরী বাণী রায়

সেই বিখ্যাত ব্যক্তিটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে জনসাম।
কলিকাতার যেতার কক্ষে। সাহিত্য বাসরের
আলস: তখন সকাল বেলায় অল্পস্বপ্নিত হ'ত দীর্ঘতর
অধুনা।

আমি তখন 'পুনরাবৃত্তি' প্রকাশের কিংকং খ্যাতি
অর্জন করেছিলাম। আমার রচিত ছোটগল্প 'লক্ষ কল্প'
'সেদিন পঠিতব্য ছিল।

বিখ্যাত ব্যক্তিটি পাঠ করলেন অবনীন্দ্রনাথের
'রাজ কাহিনীর' বাগ্মনিত্য।

নির্দিষ্ট সময়ে লাল টেবিলের দুধারে দুধনে বসেছি
'একবারে দুধোবুধি। প্রৌঢ় ব্যক্তিটি। ধূতি পাঞ্জাবীর
সঙ্গে সামন্ত রান্না হয়েই হুল সেহের। বর্ণকৃত।
মুখ চোখে ইচ্ছা উগ্র ভাববাক্য।

প্রথমে তিনি পাঠ করলেন আবৃত্তির কুলে অবনীন্দ্র-
নাথের অমর সৃষ্টি—প্রায় কবিতার লেখা খোলাকি
কুমারী ও বাগ্মনাতের প্রেমকাহিনী। মধুর ভাবার
আবৃত্তি হ'ল মধুরতর। আমার কান জুড়িয়ে গেল।

তত্ত্ব ব্যক্তিটির সম্পর্কে বহুদিন বটেই নানা তথ্য
বিদিত ছিলাম। তাঁর রচনা পাঠ করেছিলাম। তাঁর
সম্পর্কে নানা বিষয় শুনে শুনে গারদা একটা হয়েছিল

যে, তিনি বুঝে ভাল আবৃত্তি করেন। আত্ম প্রকাশিত
হয়ে গেল। মন অভিভূত হয়ে বার ঠার আবৃত্তি শুনেছে
পেলে।

একটু আগে বেডিঙর অপেক্ষাগৃহে তীক্ষ্ণ দৃষ্টির
লক্ষ্য হয়েছিলাম। প্রায় না করা লক্ষ্যের দৃষ্টি। এমন
তিনি নিজের পাঠ্যবস্তু নিয়ে বাস্তব। লক্ষ্যের দিকে
ভাবাবার অবকাশ নেই।

তিনি আমাকে চোখে না দেখলেও চিনতে।
কিছুদিন পূর্বে 'পরিবারের চিঠিতে' আমার 'প্রেম'
উপভোগ্যখানি ধারাবাহিক প্রকাশিত হ'তে হ'তে লক্ষ্য
বদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সম্পাদক ঐশ্বরীকান্ত দাস
মহাশয়ের নজির দেখিয়েছিলেন যে, হুজুর বাজারে পেপার
কটেলা এর কারণ। প্রমোদার্থ তিনি দেখিয়ে দিয়ে-
ছিলেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর 'শিশু' উপভোগ্য ও
ভারতীয় বন্দোপাধ্যায়ের 'শিশুপুত্র' (ছুই পুত্র)
নাটক সমভাবে মধ্যপথে বিরতি লাভ করেছে। সেটা
বাংলা ১৩৩৯ সাল।

পরে, বিষয়বস্তু শুনেছিলাম উপভোগ্য তত্ত্ব ব্যক্তিটি
আমার 'প্রেম' উপভোগ্যখানি বদ্ধ করে দেবার নির্দেশ
দিয়েছিলেন সম্পাদককে। সম্পাদক মহাশয়ের নির্দেশ

পালন করেছিলেন। অবশেষে আমার কাছেও সম্প্রদায়ক স্বীকারোক্তি কামলেন একদিন। কারণ তবু ব্যক্তিটি নিজেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে বলে দেন—“আমিই বাণী হারের বইখান; সম্বলীকে বলে বন্ধু করাই। কি যে একটা বই দেখেছে!”

‘গ্রেম’ আমার কলেক্ট জীবনে রচিত। কৈশোর রচনার পর্যায়ে পড়ে। কোন বই কাকুর ভাল না লাগলে কিছু বলবার নেই। তবে, আমার সেদিন মনে হয়েছিল, তবু ব্যক্তিটি বিরাট সমালোচক ও সাহিত্যিক সত্য। কিন্তু, হাজি এক সংখ্যা রচনা পড়ে কেন মত দিলেন? দিলেন কি করে?

এই ছলে আমি নিজের বিভ্রাটের দিতে বসিনি। কেন একথা লিখলাম একটু পরেই বোঝা যাবে।

সেদিন দেখলাম কপালের নিষ্ঠা। চট্ট করে একটি ছুটি বাগানো গীত তিনি খুলে নিয়ে এসেছেন হ’লেন। একনমে সমুদ্রে খোলা ‘হাজি কাহিনী’ তিনি মনে মনে অনুধাবন করে চলেছেন। তাঁর লবঙ্গ সত্য। সংহত হয়েছে যথাযথ ভাবে অংশটুকু যেতারে প্রচার করার মধ্যে। নির্দিষ্ট সময়ে হরবার মাঝার রক্তিম আলো দেখা ছিল। পড়া আরম্ভ হ’ল।

প্রতিটি শব্দ তিনি রস গ্রহণ করে উচ্চারণ করছেন। প্রতিটি পংক্তিতে নিজের কাব্য রসিক বন উন্মাদ কণ্ঠে দিয়েছেন। ভোক্তা স্বভাব যেমন ভাবে লালায়িত রসনার আশ্বাস করে করে তবে পলায়করণ করে, ঠিক তোমনি ভাবে তিনি যেন সাহিত্য আহার করছেন— শুক পাঠ মাত্র করে বাচ্ছেন না যন্ত্রের বোহুলাভার সমুদ্রে। তাঁর পড়ার ভঙ্গি মনে পড়ছে এগনও স্নোকার্বে—

“আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ!

ফুলত ফুলনে স্নাহরচন্দ্র।”

পাঠান্তে আমার শুক পদ ‘পক কস্তার’ কাহিনী শুরু হল—“না, না আমি পুরাণখাতা চিরমরণীয়া পককস্তার কাহিনী লেখবার উদ্দেশ্যে কলম ধরি নি।”—১০৪৩ সাগে

পরদীয়া ‘শনিবারের চিঠিতে’ গল্পটি প্রকাশিত হয়। হুতরাং অনেক পূর্বে যেতারে পাঠিত। সে সময়েওই রকম সুবন্ধ ব্রত্ৰাণ্য ছিল না।

তবু ব্যক্তিটি চোখ তুলে তাকালেন। সমাগ হয়ে উঠল চোখ। তবুনি রেডিওর একজন এসে তাঁকে বাইরে নিয়ে গেলেন। তাঁর পোনা হল না। হয় তো, ইচ্ছাও ছিল না।

আমি আমার রচনা পাঠান্তে বাইরে এসে আর তাঁকে দেখলাম না। বাঙালী ফেরার পথে কানে বাজতে লাগল “আজু কি আনন্দ, আজু কি আনন্দ! ফুলত ফুলনে স্নাহরচন্দ্র।”

উল্লিখিত তবু ব্যক্তিটি বনাবন বোহিতলাল সমুদ্রবার।

বর্ণগত বোহিতলাল সমুদ্রবার বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ একজন সাহিত্যিক। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ও বোদ্ধা। তিনি ছিলেন বরীজ পরমভী শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি ছিলেন প্রাজ্ঞ সাহিত্য সমালোচক। তাঁর রচিত সমালোচনা গ্রন্থ বাংলা সাহিত্যের সম্পদ। তাঁর কবিতা ভাবের দিক থেকে নবুগ এনেছিল নিঃসন্দেহে। তবে তাঁর ভাষা রবীন্দ্র ঐতিহ্য পরিত্যাগ করে নি। নূতন ভাষা প্রাচীন আদিকে লেখা—বোহিতলালের কাব্য।

ফুলের সামান্য বিক্ষকতা থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষার অধ্যাপকপদ লাভ করেছিলেন। লোকমুখে শুনেছি তিনি অধ্যয়নশীল ও মনীষী ছিলেন। তাঁর স্বাধার সাহিত্য বোধ ছিল। তিনি সাহিত্যে অহু-প্রাণিত জীবন বাপন করেছিলেন।

‘শনিবারের চিঠির’ সমালোচনার চমৎকারিত্বের লক্ষ্য সে যুগে দারী ছিলেন প্রবাসন্ত: বোহিতলাল। ‘চিঠির’ মৈশব থেকে তিনি কাড়িত ছিলেন ‘চিঠির’ লগে। সত্যস্বন্দর দাস ছদ্মনামে, বনাবে, অন্যমে ব্যঙ্গ রচনাও সমালোচনা তাঁর প্রকাশিত হত ওযানেই। কবিতাও ছিল প্রচুর।

অধ্যাপনার অবসর গ্রহণের পরে বোহিতলাল কিছু-

যিনি 'বাগদানে' বাস করেছিলেন শুনেছি। শেষের ৭ হেরেছেন, সে উপভাস তাঁর! ছাঁপাতে পারবেন না। কয়েক বৎসর তিনি কলিকাতার উপকণ্ঠে বেহালায় ছিলেন। অবশি সারা মহানগরীর সঙ্গে তাঁর বিবাদ বেধে গেল।

তিনি ছিলেন দুর্ব্বল। অল্প আলাপে তরুই হোক আলাপিতের। তবে সাধনা তাঁর ছিল অকপট। সঞ্চিত সাহিত্যাত্মবাসী এমন ব্যক্তি চোখে পড়ে না। দুর্ব্বল সন্ধ্যাপেক্ষের মধ্যে সর্ব্বদা প্রেমে থাকত একজন কবি। সুপ্রের সাহসিকতা হয় নি তাঁর জীবনে। সেটাই ট্রাজেডি।

শেষ জীবনে তিনি অতি রুঢ় ভাষায় বহুজন শু বাবতীয় সাহিত্যিকের নিন্দা করে পেছেন। প্রকৃত্তরে অনেক তাঁকে বাধ বিজ্ঞপ করেছেন। তবে, প্রেরাজন ছিল কি ?

আমার প্রথম দেখা 'প্রের' উপভাস তিনি বন্ধ করে দিয়েছিলেন সত্য। সম্পূর্ণ পড়ে সেবার প্রবৃত্তি তাঁর হয় নি। লেখাটি আখিন 'চিঠিতে' গছিরে শেষে দিতে বাই নি। সম্পাদক বহাণের চ্যুতভাঙেই দিয়েছিলেন। আগে আমার কয়েকটি ছোটগল্প যাত্র প্রকাশিত হয়েছিল। আখিন নবাগত নাত্র। খ্যাতনামা লেখকের রচনার নিন্দা-প্রশংসার তাঁর কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু, আমার ওই উপভাস যিনি কারণে বন্ধ হওয়ার আখার অবস্থা হয়েছিল গুরুতর। পাঠকের ভাগিদে সজ্ঞী বাবু 'চিঠির' সম্পাদকীয়তে লেখেন "বৈশাখ হইতে প্রের চলিবে।" (১০৪২ চৈত্র 'শনিবারের চিঠি')।

সে বৈশাখ কোনদিন এল না। বোহিতলালের প্রোভাবপ্রসূ 'শনিবারের চিঠি' শুধন। ধারাবাহিক সন্ধ্যাপেক্ষের তিনি 'চিঠির' মান রুচি করেছিলেন।

অপারাজেয় নবীন লেখকের রচনার দাবী অপারাজেয় পাঠক সন্ধ্যাপেক্ষ করে থাকলেও উপেক্ষা করা চলে। আখিন নিজের মান রক্ষার জন্য 'প্রের' ফেরৎ নিয়ে এলাব।

তারপরে অন্তর্য অন্তরিত্ব আমাকে পড়তে হয়েছিল। বহুদৈব সুখে তিনি, বিভিন্ন প্রকাশকেরা আপত্তি জানান যে, সজ্ঞী দাস যে উপভাস বন্ধ করে দিতে বাধ্য

হয়েছেন, সে উপভাস তাঁর! ছাঁপাতে পারবেন না। সেটা ১০৪০ সাল—'শনিবারের চিঠি' শুধন সাহিত্য ক্ষেত্রে অগ্রতিহ্যবী।

বীরবেই ছিলাম। 'পুনরায়ুত্তির' বিজয়, দেখে 'জেনারেল প্রিটোপের' শ্রীযুক্ত হরেশ দাস মহাশয় বক্তঃপ্রবৃত্ত হয়ে 'প্রের' প্রকাশ করলেন।

আমার প্রথম সাহিত্য জীবনের দারুণ ক্ষতি যিনি না জেনে অতি ভাঙিলো করেছিলেন, আখিন তাঁর বিরুদ্ধে একটিও অসংযত বাক্য উচ্চারণ করিনি। কারণ তাঁর ছিল অসামান্য প্রতিভা। প্রতিভার সঙ্গে রুঢ়তা মিলিত থাকে। অনেক সময় বক্তাবের দৈহিক থাকে। কিন্তু আমাদের উচিত সেগুলি উপেক্ষা করা। আমাদের উচিত প্রতিভাকে সন্মান দেওয়া, যদি সে প্রতিভা কিসকংশ বিকৃত হয়েও থাকে।

তাই বলি, বোহিতলালের তুচ্ছ ব্যবহারিক ক্রটি বা অবস্থা রুঢ় ভাষণে কিছু আগে বার নি। ধারা তাঁকে বিজ্ঞপ করে আনক পেয়েছিলেন তাঁরা নিজেদেরই অপমান করেছিলেন। একথা বদবার সাধন আখিন আগে।

বোহিতলালের সঙ্গে আমার বিতীর্ণ সাক্ষাৎ বঙ্গবাসী কলেজের সারস্বত সন্মেলনে শ্রীপক্ষীর পরের দিনে। অধ্যাপক অগদীশ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে সত্যটি বিবৃদ্ধন পরিবৃত্ত হয়। সেবারে সভাপতি ছিলেন বোহিতলাল। দীর্ঘ অল্পটানের পরে বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত তিনি লিখিত স্মরণীয় ভাষণ পাঠ করলেন। সাধুভাষায় লেখা তাঁর ভাষণ বর্তমানে অতিশয় বোমানান লাগছিল। বাণীর গুণে বেলা একটার দূর্ব চক্ষাতলের ক্রোধে উত্তাপ বিকীরণ করে যাচ্ছে। বীরে বীরে সভা অনশ্রুত হতে লাগল। বোহিতলালের কোনদিকে ক্রোধের নেই। যে নিষ্ঠার সঙ্গে তিনি বোভার-পাঠ করেছিলেন, সেই নিষ্ঠাই দেখলাম সভাপতির ভাষণে। তাঁর মতে, ভাষা সর্বদা সাধু হওয়া উচিত, ক্রিয়াপদ হওয়া উচিত বিতুচ্ছ 'কতিয়াদি', 'হইয়াছি' ইত্যাদি। ছাত্রদের প্রতি

সাহিত্য বিবরক উপদেশ ছিল সে ভাবধে। সর্বাধিক বিখ্যার কথ্য ছিল একই ব্যক্তিগত ইতিহাস। ব্যক্তিগত ক্ষেত্র ও প্রতিপক্ষের প্রতি আক্রমণ ছিল। অনেক দিনের কথা। সামান্য অংশ মনে আছে—‘আমি লোক চক্ষুর অগোচরে নীরবে বাস করিতেছি। একমল ব্যক্তির আবার প্রতি অবধা বিধেয়ের কারণ হুঁকিতেছি না।’ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য বস্তুর তালিকা থেকে তাঁর একখানি বই বাইরে রাখার কথাও ছিল।

সভাপতির ভাষণ আরম্ভ হওয়ার প্রাকালে শ্রীযুক্ত রাজনী দাস সুবল বন্দ্যোপাধ্যায় সহ এসে বসলেন সম্মুখের আসনে। সভার শেষে মোহিতলালের কাছেই তিনি বসেছিলেন। কিন্তু মোহিতলালকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে দেখলাম না।

সভাস্থে জননীশব্দ ত্যাগ্যভাতি নিজের বসবার ঘরে সভাপতিকে নিয়ে গেলেন। জনযোগের আরোজন ছিল। মোহিতবাবু তখন সম্পূর্ণ স্তব্ধ নর। মাথায় তিনি ক্রমাগত বল দিচ্ছিলেন ও গভীর ক্ষোভের ঘরে “ব্যঃ, ব্যঃ” এই আকোষ্যকি করে যাচ্ছিলেন। অত্যন্ত অজরিত, বহুমহলে অগ্রিম, উজ্জ্বল বিফলিত একটি নিস্তব্ধ প্রতিভার মর্মভেদী কাতরোক্তিই সেদিন শুনেছিলাম আমি—কোন শারীরিক ব্রহ্মণ্য প্রকাশ নয়।

তাঁর কাছে এসিরে গেলাম। মকে আমি পিছনে বসেছিলাম। তিনি আমাকে দেখতে পান নি। গভীর নিশ্চিন্ততার একধর লোকের মধ্যে মোহিতলাল বসে আছেন দেয়ালদেখা সোকার ওপরে। চারপাশে অনেক সাহিত্যিক, অনেক স্ত্রী। সম্মুখে প্রতীক্ সজলীকাত। কোনদিকে মোহিতলালের দৃষ্টিপাত নেই। উভাপের ক্ষয় ধব অন্ধকার রাখা হয়েছে। পাখা ঘুরছে। অগণিত জনতার বাতাসোতে চিকিত আরগতি।

মহিলাবৃন্দ কিকিৎ বিব্রত। মোহিতলালের ভাবভঙ্গি আশ্রয়নক।

মুখেচোখ লাগ। “ভীত নেত্র। ভিতরে যেন একটা অবাক জালা হচ্ছে। সেটি তিনি চোঁটা করছেন ধমন

করবার। অসহ্য কোন কষ্ট। গভীরস্থরে প্রার নিস্তব্ধ ঘরে তাঁর দীর্ঘ উচ্চারিত ‘আ-আ’ ধ্বনি একটা অস্বাভাবিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। সভাপতির ভাষণে অনেকটাই বিব্রত ও আহত। জননীশ বারু ও ভবী সঙ্গীতবিনী মিছুরেই তিতাবিপণ্ডত।

মোহিতলাল সোচ্চার হয়ে বসে আছেন। মৈত্রীকিক তকি তাঁর অটলদৃঢ়তার পরিচায়ক নিজ মতবাদে। যে বাই বলুক না কেন, কখনও তিনি নিজের মত বা পথ থেকে ভিন্নমাত্র বিচ্যুত হবেন না। তাঁর বক্তৃতিই হোক না কেন, তিনি compromise করতে রাজী নন। গলে যেখান উন্নয়নিক অবজ্ঞাও একটু। নীরব উপবেশন তাঁর বহুহে যেন—

“I am lord of all I survey.

My right here is none to dispute
From the centre all round to the sea,
I am lord of fowl and brute.”

তাঁকে বিশ্লেষণ করে এই ক’টি তাবপ্রকাশ পাওয়া গেল সেদিন।

তবু, আমার মনে হল, এই আপাতবচ্যের মাছবটির কোথাও আছে নিবিড় কোমলতা। কোথাও আছে আকাশের মণি বাতাস। তিনি লিখেছেন—

“বস্ত ব্যথা পাই—তত গান গাই, গাঁবি যে সুরের মালা,
ওগো স্নহর! নরনে অঝোর নীল কাবলের জালা।
এই অবনী বেননা নিবিড় লুক অন্ধকারে

পথ ভুলি বাধে বাধে,

কটকে কোটে রক্তসুহ্ম বসনা সুরতি চালা।”

ধীর লেনবী এক বেদনা ও যুগ্ম বাহক, তিনি অন্ধরের কোন যোগন অধারে নিস্তর সূক্তিত রেখেছেন কমনীয় কবিশ্রুতি। চেয়ে নিলে এখানে হুহুতো স্নেহ পাওয়া যাবে। আমার মধ্যে যে কাব্যপিপাসা আছে, অবশ্যই তার সম্বন্ধে মিলবে ওই কঠোরবচ্যে অতিনিহিত কবিশ্রুতির কাছে।

কবেকবার দৃষ্টিবিনিময় হল। আমার মনে আভাস

পেয়ে কাছে গেলাম। পরিচয় দিতে হল না। অতি সহজে পোকার হাতলে হাত রেখে নিকটস্থ হয়ে বসাম “একদিন আপনায় কাছে বাব।” তিনি নীরবে মাথা হেঙ্গলেন। মনে হল তিনি আমার প্রতি আপন।

শ্রীযুক্ত পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় আমাকে পৌছে দেবার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমি চলে এলাম। জনতার নধ্য থেকে বার হতে হতে ভাবলাম, কে বলে বোহিতলাল রুক্ষ, অনমনীয়? তিনি সহজেই আপন হতে পারেন। সুগায় সজিত শিল্পীর অকথিত অতিমান কবিরূপ কণ্ঠস্বর করে রেখেছে। বিস্তৃত অতিমান রূপ ধরেছে অহঙ্কারের। ক্ষুণ্ণতার আবরণে আবৃত আবৃত মনকে আবৃত রেখেছেন তিনি। কাছে যেতে হবে। তাঁকে সমাহার জানাতে হবে। তবেই, মন বেলে দেবেন তিনি।

কেটে গেল দীর্ঘদিন। কথ্য নৈকর্ষ, প্রবাস, অনুভূতায় মধ্যে সমস্তের দ্রুত গতি—বস্তুচিহ্নিত পরিভ্রম। নয়। বেহালা অনেকদূর। বেহালায় পথ চিনি না। গাড়ী চলে না সেখানে। কবির কাছে যাওয়া হয় না।

ইতিমধ্যে কল্যাণ হুক ডিপো থেকে আমার ‘সপ্ত সাগর’ নামে একখানি অমনিবাস পুস্তক প্রকাশ আরোজন হচ্ছিল। সেখানে কবির পুস্তকে দেখলাম। বাঙালার ভাগিহ পেলাম। কল্যাণ বোহিতলালের বিদেশী গল্পের অহুবাধ শুই একসময়ের প্রকাশ করছিলেন।

সুযোগ মিলে গেল বাবার অকস্মাৎ। ক্যালকাটা হোটেলে ভবন বসন্ত ‘উচ্ছিন্নী’ ক্লাব। শব্দগুণিত রিনে সূতানেক্ষ করতে বেয়ে আলাপ হয়ে গেল ‘বাতায়ন’ পত্রিকার দলের সঙ্গে। পূর্বে ‘বাতায়নে’ লিপ্যন্তর লসকে চিন্তায় না। তাঁরা আলাপ করে বাতায়ন করতে লাগলেন। স্তন্যার বোহিতলালের ওখানে আর প্রতিরবির তাঁরা বান। তাঁদের নাম রবেশ চট্টোপাধ্যায়, গৌণেশ্বর দাস, অমরেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ। বধ্যবনি ছিলেন স্বর্গগত বিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়।

তাঁরা আমাকে জানালেন, বোহিতলাল কথ্যগ্রন্থকে বলেছেন, “কই হে তোমাদের বাণীরাহ তো এল না? আসবে যে বলেছিল?”

আজ্ঞান এসেছে। এক রবিরার বহির্গত হ’লাম কবিত্তীর্থে। বাস, সাইকেল রিক্সার শরণ নিয়ে পেলাম পল্লীগ্রামের একটি উজ্জান বাড়ীকার। শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন পরিবেশ। একতলা বাড়ী, চার-বারেই গারগালা। উঁচু রোয়াকে কিছুকণ অপেক্ষা করতে হ’ল।

স্তন্যার কলিকাতা থেকে বহুলোক এখানে আসেন দেখা করতে। বোহিতলালকে ঘিরে একটি জটলা বলে নির্জন বনালয়ে। তিনি যথেষ্ট আতিথ্য করেন।

ঘরের মধ্যে বোহিতলালের ছোট ছেলে বসাল আবারে—বোধ হয় বেহেতে সত্তরক পাতা ছিল। আরও কেউ কেউ এসেছিলেন দেখা করতে। কবির প্রোক্তন হ্রাৎ একজন সত্ত পরিণীতাকে নিয়ে সন্ধ্যায় হাতে এসেছিলেন। চন্দ্রকার চা, কিসিন্দু বাদ্যযন্ত্র বোহনভোগ, পাণরভাজা এল সবায় জন্ত। সিগারেট সেবীদের জন্য সিগারেট।

কবি এসেছিলেন নন্দমত্তক বইখাতার চোখ রেখে। ঘরোয়া বেশ তাঁর। বা হাত স্তন্যায় অবগপ্রায়। তিনি যে অত্যধিক রক্তচাপে বিপন্ন, পরে বুঝলাম।

প্রথমে সাংসারিক ও জাগতিক কথা চলল অভ্যাগতদের সঙ্গে। নিদ্রাভুত হয়ে উঠল রসনা তাঁর। সুখ জুধ। গোথে আলা। আবেগবস্ত রুক্ষ ভাব্য। এক একটি নববয়স উগ্রতার শিকরে উঠতে হয়।

সংক্ষেপে বুঝলাম। তিনি কংগ্রেসে অবিবাহী। গাভীদী বাংলা ও হিন্দুর প্রতি করেছেন বলে তিনি জুধ। নেতাজী তাঁর আদর্শ পুরুষ। রাজনীতির বিতর্ক তাঁর মনোমত্ত বস্ত। পরিষদের সাংসাহ সাধারণ মধ্যে আলাপের ভাষায় অজল কথা বলে গেলেন তিনি। ঘেরের বর্ডমান পরিবর্তিত, সতকারী নীতি, বাংলা বিভাগ ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর কঠিন মতামত ছিলেন সমালোচক বোহিতলাল।

সাহিত্য অধোগতিগ্রস্ত। সাহিত্যিকেরা দুর্খ। রবীন্দ্রনাথের পরে কিছু আর দেখা হয়নি। তথাকথিত প্রগতি সাহিত্য দেশের সর্বনাশ সাধন করছে। বাংলা ভাষা বিপন্ন। নৈয়াত্র হত্যাকাণ্ড হয়ে নিতুচ্চ রইলাম। ইংরেজি ভাষার নাকি দাঙ্গা করছি আমরা। তবিস্ততে কোন আশা নেই।

ঊষ্ম বৃত্তি বঞ্চিত করা যেত বহু ক্ষেত্রে। কিন্তু, ঊষ্মি নীরব রইলাম। মনে হ'ল তিনি স্নেহ মন্ডিকে নেই। বিস্মৃত প্রতিভার সঙ্গে বিভক্ত নিম্নল।

কিন্তু, আশা বুঝেছি তিনি সেদিন ধীরে সঙ্গে কথা বলছিলেন, ঊষ্মা সেই ঘরে উপস্থিত ছিলেন, সাহিত্যিক মোহিতলালের বেগা সঙ্গী ঊষ্মা কেউ নন। ঊষ্মা অধিকাংশ অক্ষিমে লেগার টিক রাখেন। বড় কর্তার পরলেহন করেন। বড় ছোর না পড়া বইএর বিষয়ে নতুন পাশ করেন। ঊষ্মা মহোজ্ঞাসে পরচর্চা ও পর-নিম্মা কীর্তনে অভ্যস্তভাবে সময় কাটাচ্ছিলেন। মোহিত লালকে ঊষ্মা উত্তেজিত করে কবির উত্তেজনা উপভোগ করছিলেন। ঊষ্মা যা; সেইমত পরিবেশ রচনা করে নিচ্ছিলেন। প্রতিভার পক্ষেও সব নির্বাচন আরোজন হয়।

সেদিন আমার চোখে জল এসেছিল। যিনি বাংলা দেশের স্রোত মনীবী পতিবৃত্ত, সম্পদখ্যাতিমুখর শান্ত জীবন যাপন করবেন, আজ ঊষ্মা এক পরিণতি ?

মোহিতলালের প্রতিভাবীর্ণ, লক্ষ্য মধ্যমিনের ইতিহাস আমার জানা নেই। তখন ঊষ্মা তবগুণন করতেন, ঊষ্মা বলতে পারতেন। আমি দেখেছিলাম জ্যোৎস্নাখুঁচী প্রতিভার শেষ কয়েকটি দিনের অন্তরাগ। চরম কেননার বিলপিত প্রতিভাত জীবনের অস্ত্রিম প্রটো। আমার নিজের চারণাশে নুতন স্রোত সমাবেশ, আমার সাহিত্যের নবীনরূপ প্রদান।

ঊষ্মা হুংব, ঊষ্মা অত্যাধের অস্ত্র তিনি নিজে নাকি দারী। একথা ঊষ্মা বহুজনের মুখে শুনেছিলাম। আমি সত্য মিথ্যা কিছুই জানি না।

সেদিন প্রথমে আমার ভাল লাগেনি, স্বীকার করি। কোনক্রমে আলোচনার যোড় কিছিরে বাচলাম।

তারপরে দেখা দিল অস্ত্র লোক—কবি মোহিতলাল। নিজের রচনার দৃষ্টান্ত মণিযুক্ত। তিনি নিষ্কণ্ট করলেন সেই লোকগুলির কাছে। আমার সেই আবৃত্তি শুনলাম।

রাজি গভীর হয়ে গেল। তিনি বিদ্যারে অনিচ্ছুক। এর মধ্যে অন্তরুরে কবিশ্রিয়ার স্নেহর হাসি খুব দেখে এলাম।

আমার লেখা সনেট-কবিতা দেখে মোহিতলাল বলেন, "টিক সনেট হরোহে তো ?"

বললাম, "বেখুন না।"

অতি আগ্রহে কুঁকৈ তিনি শুণে দেখে বলেন, টিকই আছে। তারপরে প্রসঙ্গ হয়ে নিজের কবিতা পড়তে আরম্ভ করলেন—কালাপাহাড়, দুঃখাহান, শব্দাহান ইত্যাদি। ধীরে ধীরে কোমল কবিতার নেমে এলেন।

কোন কবার তিনি আমাকে বলেন, "তোমরা আধুনিক যেরোরা কিছুই বোঝনা।"

তারপরে, দারার স্তম্ভ দর্শনে আশুরাজ্যের উপরে একটি কবিতা পাঠের পরে উপস্থিত সকলের মত জিজ্ঞাসা করলেন। আমি চুপ করে রইলাম। অবশেষে তিনি আমাকেই প্রশ্ন করলেন, "তুমি চুপ করে আছে কেন ? এর মধ্যেই অর্থ কি বুঝেছ, বল দেখি ?" আমি উত্তর দিলাম, "আমি তো বুঝিনা কিছু। তবে, জিজ্ঞাসা করছেন কেন আমাকে ?"

উপস্থিত একজন বললেন, "এবার মোহিত বাবু টিক মুখের মত জবাব পেরেছেন।"

মোহিতলাল হাসি গোপন করে পরাজিত ভক্তিতে মাথা নাবালেন। পরাজয় ঊষ্মা ভাল লাগল, ভাল লাগল অভিমান। বাহুব মোহিতলাল।

আমি চিরদিনের উদ্বৃত্ত। মোহিতলালের ব্যবহারে প্রব্রম্ব ছিল। যেন ঊষ্মা প্রকৃত সত্যটি আমি বরি ধরি করছি সে সত্য মোটেই কক সমালোচকের নয়। তবু চলে

গিরেছিল। অনেক স্পষ্টভাবপূর্ণ আমি করেছিলাম। তাঁর ব্যবহারের সমালোচনার স্পর্শও ছিল। আচ্ছ, যেন করে ছাৎ হয়।

আমি বলেছিলাম, “বে বা ইচ্ছা করুক না, আপনি তোতে এত উত্তেজিত হয়ে নিজের কতি করছেন কেন? আপনি সাহিত্যিক, আপনি পাগলের মত হচ্ছেন কেন?”

এই কথার সত্যই তিনি পাগলের মত চীৎকার করে উঠেছিলেন, “কি বলছ তুমি? আমার বেতন? যখন সর্বত্র অপমানিত হচ্ছেন, তখন আমি চুপ করে থাকতে পারি।”

সাহিত্যবেতনের অপমান চিত্তা করেই তিনি প্রায় উদ্ভ্রান্তের মত ব্যাকুল হয়ে চীৎকার করেছিলেন। অত্যধিক রক্তচাপ যে তাঁর আছে, তখন বুঝলাম।

প্রতিক্রিয়া দেখে অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে চুপ করে হইলাম। উপস্থিত ব্যক্তিরা তাঁকে প্রকৃতভিত্ত করলেন।

ভাবলাম, ইনি কি করে মিথেনে—

“মিসস হিয়ারি চুড়ে অলিরাছে হর-কোপানল, মন হরেছে ভব, রতি কীরে গুহরি’ গুহরি’।

উন: সে গিরেছে কিরে, অকচোখ স্নান চলল—

হলগুলি ফেলে গেছে ঈশানের আসন উপরি;

আখিতে আকিয়া গেছে অধরোষ্ঠ পক্ষ বিফল।

অপানে পালায় বোণী তারি তরে, ব্যান পরিহরি’—

ববুর দুইলে তবু বায়ছাল বাবা প’ল—আহা, নরি মরি।”

আমার লজ্জিত মুখের দিকে চেয়ে মোহিতলাল বললেন, তুমি জান না, যখন সাহিত্যের অবনতি দেখি, আমি পাগল হয়ে যাই। বর্তমান অসন্তোষ কোথাও দুশ্বরের আহ্বান নেই। আধুনিক একটি ছেলেমেয়ের মধ্যেও প্রকৃত সাহিত্য বোধ নেই। থাকবে কি করে? কোথাও গভীরতা নেই। কোথাও পড়াশোনা নেই। বর্তমানের জীবনে সাহিত্য জন্মাতে পারে না।”

ক্রমপতিভে বলে চলেন, “কেমন করে কোথা থেকে ছিটকে এসে তোমার মধ্যে একটা আসল জিনিষ পড়েছে। কি করে এটা সম্ভব হল আমি না।”

অন্তর্যমণ ভাবে বার দুই বললেন, কি করে যে এল বুঝতেই পারছি না। সাহিত্য কেমন করে খেন তোমার মধ্যে এসে গেছে। দেখবার ক্ষমতা এ বুৎ এল কি করে?”

মোহিতলালের এই কথার বর্তমানে তাঁর গভীর অবিশ্বাস বুঝলাম। আধুনিক ছেলেমেয়েরা যে লেখক বা সাহিত্যিক হতে পারে এ তথ্য তাঁর মনে স্থান পায় না।

এ ছাড়া, দেখলাম তাঁর গুণগ্রাহিতা, অহুসঙ্কিত। সমানোষ্য সহকারে অস্ত্রের লেখা শোনা, সমালোচনা করা, উৎসর্গবিধানের পথ বলে দেখতা সর্বোপরি ভাল দেখলে অস্ত্রের প্রশংসা, এমন কোথাও আমরা পাই না। এই বিম্বন বনালর তাঁর বোণা নর। তিনি শিশুপরিবৃত্ত সাহিত্যগুরু হ’লে তবেই তাঁর বখাযোগ্য স্থান বেলে। তিনি ছোটকেও সমাদর করতে জানেন। তাঁর জীবন-বেদ সাহিত্য। সামান্যর মধ্যেও অনান্যকে খুঁজে দেখবার প্রবৃত্তি আছে তাঁর। কিন্তু, তাঁকে মিতে হবে আত্মগত্যা, তবেই তিনি নিজটে আসবেন।

সাহিত্য বিষয়ে সেদিন মোহিতলাল অনেক আলোচনা করেছিলেন। রচনার শৈলী হওয়া উচিত স্নেহ। ব্যাকরণগত দোষবৃত্ত রচনা হওয়া চাই। ভাবার দৈন্ত্য ভাবকে আঘাত করে। অনাবশ্যক কয়েকজন লেখকের দোষত্রুটির উল্লেখ তিনি করে গেলেন উদাহরণতঃ। বাংলা ভাষা সম্পর্কে তাঁর মতামত অকাটা। তিনি শুধু ভাবার পক্ষপাতী হলেও চলতি কথার দাবী অস্বীকার করেন না। ইতিমু ঠিক থাকলে আপত্তি নেই।

দেখলাম তাঁর মন শিক্ষকের মন। শিক্তাদেবার অনন্য ইচ্ছা সে মনে সর্বদা আগরুক। তিনি বিভ্রান্তবাহী। ব্যঙ্গের সঙ্গে মজ ও রসিকতাও ছিল কথার স্তর। কিন্তু মনের তত্ত্ব আশা, সহনশীলতার অভাব ইত্যাদি অবিকাশ সময়ে তাঁকে নির্মম বিচারক করে তুলেছিল। প্রতীহত বাসনা কিরে এসে নিজেকেই আঘাত করে বাজিল বার বারে।

যে শুধুকেই মল তাঁকে তোরাও করতেন, তাঁরা
অধিকাংশই ছিলেন জীবনে বিফল। বিফলতার কারণ
তাঁদের শাক্ষ্যের বোধ্যতা ছিল না। ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব
হারা তাঁরা নিজেদের গজদাহ নিশ্চয় করতেন।
পরস্পরের মধ্যে কথা লাগানো ছিল তাঁদের stock in
trade, এঁদের আঙুতার বিচ্ছল, অষ্ট মনীষীকে দেখবার।
শেখনী অক্লপভাবে সমালোচনা-সাহিত্য লুপ্ত করে
চলেছে তখনও। কিন্তু, হার, কবি যে হারিয়ে গেছেন।

সেদিন কিন্তু সেই গুলা বাজির চম্বিকাঙ্গাযিত বাদে
কবি আবার জেগেছিলেন। বাগানবাড়ী বহুর অত্যন্ত
অরণ্যে পরিণত হয়েছে। তবু খোলা জানলার বাতাপি-
গায় উপহার পাঠাচ্ছে বৃহৎ গজ। কবি তাঁর তিনখানি
কাব্য এছ ‘বর্ণন পদ্যসী’। ‘বিশ্বদী’ ও ‘স্বপ্নগরল’
থেকে কবিতা শোনালেন। পাণ্ডু পিণ্ডির ও সাময়িকীর
পৃষ্ঠা থেকেও কাব্য পাঠ হ’ল। ‘স্বপ্নগরল’ বইটিই বেনী
পড়েছিলেন। দেশের বর্তমান অবস্থার শব ও স্পর্শ
নিরে কবিতা পড়ছিলেন। হঠাৎ স্বপ্ন করলেন—

“বহুর আবার দেখিনি তো চোখে শুনেছি তাঁর
অপকল্প রূপ, চোখের চাহনী চমৎকার।”

মনে হ’ল, এমন কবিতার এমন পাঠ তিনি আগে।
তখন চাঁদের আলোর সঙ্গে উতলা বাতাস মিলেছিল।
সেই কবিতা আজ এখনও, এই মুহূর্তে আবার প্রথমদ
আচ্ছন্ন করে বাজছে—

“অপকল্প রূপ চোখের চাহনী চমৎকার।”

বাক্সি গ্রায় দশটার বিহার নিলাম। গেটে এলেন
কবি। জিজ্ঞাসা করল, “এখন কি করবেন?”

ছাত্র দেখিয়ে বললেন, “বৃহৎ হাত বুয়ে একা কিছুকণ
ছালে বসে থাকব। এই ছাত্রটুকু আছে, তাই বৈচে
আছি।”

বিদ্যায়ের আগে বললাম, “বতাই বজুন না কেন,
জীবন এখনও আপনাকে অনেক কিছু বিস্মে পারে।
ছাত্রগণটি দুর্বলতার সময় এখনও যায় নি।”

মোহিতলাল হাত গোপন করে বললেন, “আমিই
আমার একমাত্র বালিক। পৃথিবীতে কারুর কন্যতা

নেই আমাকে দুর্বল করে। স্বয়ং বিধাতাও নয়।”

আমি বলেছিলাম রাত্তার নেবে, “
beware!”

মোহিতবাবু হাসতে হাসতে কাত কূলে বলেছিলেন,
“কখনই না।”

সেই সময়ে এই কটকানী, কঠোর নৃতি, প্রৌঢ়
ব্যক্তির বিশাল গভীর চোখ দুটিতে দেখতে শেরেডিলাস
সহস্র ভাব্য ও প্রেমময় কবি ভয়।

সেই শব্দ দেখা। আগ কোথাও তিমি বহুরের
মধ্যে তাঁর দেখা মেলেনি। আমি চেষ্টাও করিনি।
চাঁদের আলোর, বিভন বনালয়ে কণ্ঠকালের অন্তঃসে
কবি বাহুবলি জেগে উঠেছিলেন, তিনি হয়তো দ্বিতীয়
শাক্ষ্যেতে নবেন ভিন্নরূপ। শাক্ষ্যেতে প্রথমবারের
অগ্রিম সমালোচক হয়তো আবার ফিরে আসবেন।

আর, একদিনের অন্তরাল ও দীর্ঘ আলাপ বাহুবলি
বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। আলোচিত একটি কণের দেখা
বৃগব্যাপি শুভলার অন্তরমতা পড়াই করে। মোহিত
লালের কাছে শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারতাম।
কিন্তু, চেনার পক্ষে ভই যথেষ্ট।

বাতাপিগজ সুরভিত বাতাসে গ্রাম্যশব ধরে ফিরে
এলাম অনেক লম্পদ নিরে। তিনি আমাকে কবিতা
তুলিয়েছেন। খেজুরগাছের পাশে, চাঁদের ঘরের ছায়ায়,
পানী পুতুরের ধার ঘরে চলেছে বড়িয়ার পথ। পারের
পারে বেছে উঠছে রাস্তা মধুর কবিকণ্ঠ—

“আমাদের তোমরা কূলে বসে থাই!

এসেছি পথ কূলে—

পান করিবারে জাহ্নবী বারি

কীৰ্তিনাশার কূলে!

বহু জনমের বার্ষ পিপাসা

এবার পুরিবে, মনে ছিল আসা,

ভাঙা মন্দিরে বেধেছি পাপা

পুরাণে বটের কূলে;

প্লাবনের বুধে ভেসে গেল সব

কীৰ্তিনাশার কূলে!”

নিদ্রা

প্রভাত বেবসরকার

ক'দিন কেবল দেখা যায় নি।

তারপর আবার দেখা গেল অল্প দূরত্বে, মাথার সিঁদুর, হাতে সোনার চুড়ি, সন্কে রক্ত। বহিষ্ঠ গর ঐত গতি।

আগে বাসে টানে উঠতে নামতে নিজেই পথ করে নিত, এখন পথ করে দিতে হয়—সরে ঠাড়াতে হয়, ওকে বহিলা আসনে পৌছে দিতে। পথ না পেলেও চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকে, অপেক্ষা করে, মুখ খুলে সহযাত্রীদের ব্যস্তিবাঙ্ক, পরিস্কার করে না। পরতাপ নবলসবারি মিত্ত হেরেছে।

বত না ওকে দেখে ভক্ত ওর বেশবাসের নতুনবে বাসের সকলে চোখ ফেরায়। বৃষ্টির স্লাউক, চণ্ডালাড় জরিয়ার শান্তিপুরি শাড়ী, মূল তোলা বাগরা, বোপার জরির লাল কিত্তে, কপালে সিঁদুর। মুখটাও মনে হয় সিঁদুর।

আজ বধু বেশে স্নেহা চাকরি করতে থাকে। ওর প্রথম দিনের চাকরি করার সঙ্গে আজকের দিনের চাকরি করার যে অনেক তফাৎ। সন্দের হেলটিকে পাশে বসিয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। পরিচিত পথ নতুন মনে হয়। খুব ভাঙা নতুন।

ক'দিন বা ভবু যেন বত বললে গেছে সব ইতিমধ্যে। সহযাত্রীদের অনেকে স্নেহাখার মুখ—চেনা, বহুবাব এক সন্কে একই বাসে ট্রাবে বাতারাঙ্ক করেচে, চোখ চাওয়া চাওয়া, হয়তো বা কোনদিন হোঁচাকুসিত হয়েচে—মনে মনে সংবর্ধও কিছু। ভবু একই পথের যাত্রী বলে সবার সঙ্গে অল্প একটা বোগহুজ ছিল। 'সন্ক' বলে, ভ্যানিটি ব্যাগের মুখটা সলীন করার আগেই ভাবা পথ করে দিয়েছে, মনে মনে চটে গেলেও অপ্রত্যাভের মত হেসে লেডিজ সিট খালি করে দিয়েছে। সে গহবো আসবার আগেই কে যেন নিজে থেকে ষটি দিয়ে বাস খান্নিয়ে দিয়েছে। বতই বাবোনা হোক সে প্রতিদিন বাস খান্নিয়ে

নামবার সময় লঙ্কার একশেষ হরয়ে স্নেহা—যেন একটা দাবী তারি তিনিই অনেক মিলে স্তম্ভে নামিয়ে নিচ্ছে। সবার ওপর কণ্ঠাকটারগুলো লঙ্কা দিতে বেনী করে—একদম বাঁকে খেনানা! মনে মনে খুবই রাগ হতো স্নেহাখার সহযাত্রীদের তার নিমিত্ত এই অশেষ সন্তর্ভার জন্তে। কি পরকার, সে কি নিজে বাস খান্নিয়ে নামতে জানে না? ওদের মত মাথা বাথা কেন! কিন্তু মুখে কিছু স্নেহা বলতে পারে নি কোনদিন এর বিতক্ষে। হয়তো লাভ কিছু নেই। পুরুষের গারে-পড়া স্বতাব ভাল করার তার ক্ষমতা কি! হুমি বাও বা না বাও, ওরা। কিন্তু তোবার এতটুকু অস্থবিধা হতে বেবে না। বতই একলা হও ওদের সহস্র দৃষ্টি তোমাংকে ঘিরে থাকবে, পাহারা বেবে।

আজ যোগ কর সহযাত্রীদের ব্যবহারের কিছুটা তারতম্য লঙ্কা করে থাকবে স্নেহা। আর পাঁচদিনের মত সহস্র নয় তা। চেনা পরিবেশ কেনন অনেকের মত মুখ। মাঝপথে বাস খান্নিয়ে ভিত্ত ঠেলে এগিয়ে আসন নিতে আর তেমন সগর্ভ আগ্রহ নেই। সিংসাড়ে এগিয়ে এসে সিটে বসতে হলো। সহযাত্রীরা এদিক ওদিক নিঃশব্দে সরে দাঁড়া—কে তো কে!

স্নেহা দিচ্ছ আজ খুব বেনী আশ্বসচেনন। তাই বোধ হয় বাইরে থেকে চোখ দুটো কিছুতে বাসের ভিতরে খান্নতে পারছে না—চেনা লোক যদি দেখে কেলে কি ভাববে?

গতি কেউ কিছু ভাববার আগেই স্নেহা অনেক কথা ভাবছে, প্রবর ওজননের মত অস্থ একটা লঙ্কা, তার চারপাশে অরক্ত হয়ে উঠেছে। মাথার সিঁদুর যেন সর্ব অঙ্গে লেগে গেছে।

এখন যে কথা ভাবা উচিত তা না ভেবে স্নেহা সহযাত্রীদের কথা ভাবছে কেবল—যেন প্রথম নারী প্রথম পুরুষের সাহচর্য লাভ করেছে! নারী পুরুষের প্রথম লঙ্কা, প্রথম অপরাধ।

কানে না শুনেও স্নেহের মনে হয়, বুধেনা অনেকই চোখের ইলারার তার লম্বকে আলোচনা করছে—নেত্রটার অব্যাহার বিয়ে হয়েছে দেখ! কোথায় বিয়ে হ'লো? কার সঙ্গে? তা হ'লে সব দিক বজায় রাখলে, চাকরি, বিয়ে দুই-ই? মাথার সিঁচুরটা কি চণ্ডা! হাতে অব্যাহার চুড়িও উঠেছে! আর চাকরি কেন করা তবে?

হঠাৎ কিছু না বলে মাঝ পথে স্নেহা নেমে পড়ল। এম্প্লয়ান্টের অফিস এখনো অনেক দূর। কে জানে কি মতলব তার। অফিস বাবে না নাকি? দশটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি।

রাড়ার ওপর খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো স্নেহা। অদূরে ট্রেট বাসগুলো হুত মত, বিরাটহীন গতির ঠেলাঠেলি, অফিস টাইমে দুঃখপ্লের কঙ্কাল। বড়ি পুরচে, বাহুব ছুটছে। পালাই পালাই ডাক।

সন্দের ছেলেটিকে স্নেহা বললে, তুমি বাও। আমি আজ অফিস যাব না। সেটা হ'য়ে গেছে।

ছেলেটি কি বুঝলে কে জানে। বললে, কোথায় যাবেন?

অজমন্দের মত স্নেহা বললে, বাড়ী কিংবা। তুমি বাও।

ছেলেটি বললে, আমাদের ওখানে চলুন না।

স্নেহা হাসলে, একটু আরক্তও হ'লো বোধ হয় ছেলেটির আঁখাবে। বললে, এখন কি আর এমনি যেতে পারি। ভোমাসের বাড়ী থেকে কেউ নিলে না গেলে লোকে নিষেধ করবে যে!

ছেলেটি বললে, চলুন আমি সঙ্গে করে নিলে বাড়ি।

তুমি নর, আর কেউ—স্নেহা বুধ টিপে হাসলে।

‘আর কেউ’-এর ধবরটা জানা নেই বলে ছেলেটি চুপ ক'রে থাকে। তখনটা কাঁচুমাচু দেখায়।

স্নেহা বললে, ভোমাকে আর বউ ক'রে রোজ আগতে হবে না তাই।

ছেলেটি মাথা চুলকে বললে, দাদা বলে দিয়েছে।

স্নেহা বললে, আমি বলে দেব'খন...তুমি বাও।

সোজা স্নেহা বাড়ীতে ফিরে আসে। মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ পেটিক ক'রে রাখে অঙ্গমরে বাড়ী ফেরার জন্যে। না নিশ্চয়ই ভিজ্ঞান করবেন।

বাড়ীর দোর গোড়ার এসে ম'নে ম'নে স্নেহা হাসে, এমনি আর সে ক্ষতদিন করতে পারবে, এমনি লোকের ওপর রাগ, এমনি অফিস কা'রাই। বিয়ে করেছে বলে চাকরি করতে পারবে না এতো একটা কথা নয়! বিয়ে করেছে তো অনেকে তার মত চাকরি করেছে। বিয়ের সঙ্গে চাকরির লম্ব কি?

তখনই হিমাংক বলেছিল, ভাল ক'রে ভেবে দেখো, চাকরিটা ছেড়ে বিয়ে করবে, না, বিয়ে করলে চাকরি করবে। আমি ভোমাকে চাকরিটাই ছাড়তে বলি।

স্নেহা রাগী হয়নি। বলেছিল, বিয়ের সঙ্গে চাকরিটা না মেশালেই হ'লো। বিয়ে করার পর আর কি কেউ আমার মত চাকরি করে না! হোব কি।

পারলে হোব কিছু নেই, বরং লাভ। মাসে মাসে অনেকগুলো টাকা ঘরে আসবে, গ্রুপ বাড়ানোটা আরো বাড়বে। তা ছাড়া—

হিমাংক আর কিছু বলেনি, স্নেহাও চাকরি করার পক্ষে আর বুক্তি দেখাননি। বুধে হিমাংক বলেছিল, পার করবে, আমাদের বাড়ীর কারো আপত্তি নেই।

না কোন কথাই ভিজ্ঞান করলেন না। একবার শুধু ভোম ভুলে বেরিয়ে দেখলেন। স্নেহা এখনে দাঁড়াল, অঙ্গমরে বাড়ী ফেরার কৈফিয়ৎ দেখার জন্যে।

না, তার চাকরি করা না করার জন্যে মার আর কোন আগ্রহ নেই। কেমন যেন নিষ্কিঞ্চ মনে হয় তাঁকে।

তবু স্নেহা কিছু একটা শোনাবার আশার দাঁড়িয়ে থাকে। চাকরে মেরে এমনি অঙ্গমরে ফিরলো কেন। নতুন ক'রে তার লম্বকে মার বুধে আগ্রহ একশ পাক। চাকরি নতুন না হ'ল সে তো নতুন আশ।

শুধু ক'রে না ভিজ্ঞান করলো, কি রে ফিরে এলি? ছুটি হয়ে গেল?

কোথার বেন কি একটা পোশাকাল হয়ে বাত, মূলেখা
সহজভাবে উত্তর দিতে পারে না—কর্তব্যের বিরুদ্ধে, জট
শোনার : ছুটি হ'তে বাবে কেন ?

তা হ'লে ! বোধ হয় না একটু চমকালেন।

এমনি ! মলকসহীম মূলেখার উত্তরটা শোনার।

না আর কিছু বলেন না। নিজেই কান্দে মন ধেন।

নিজের ঘরে এসে মূলেখার মনে হয় ওভাবে উত্তর করাটা
ভার টিক হয়নি। 'এমনি !' মানে ? বা নিশ্চয়ই একটা
এমন অর্থ করেছেন যা তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে ঝাপ
ধায়। আগে 'এমনি' বলে' মূলেখা কোনদিন রেহাই
পায় নি—না গায়ে মাথার হাত দিয়ে পরীক্ষা করেছেন,
নানা ঔষে অর্থ বুঝতে চেয়েছেন !

আর আশ ? আরের আগ্রহ নেই। মূলেখার ইচ্ছে
করে বিজ্ঞানায় হয়ে গড়ে আনিকটা উঁ-হা করে—
সাড়ঘরে শরীর ব্যারামের ব্যস্ততা দেয়।

সার এই উদ্যোগের ক্ষেত্রে নিজেকে পীড়া দেয়।

মূলেখার ঘরটা এর মধ্যেই বেসমতলের ব্যবস্থা হ'য়ে
গেছে। যেখানের বস্তু কিছু আবর্জনা এখানে এসে জড়
করা হয়েছে। এ সংসারের এত দিনের ইচ্ছেটাই প্রকাশ
পেয়েছে—মূলেখার চাকরির খাতিরে তাকে একখানা
আলাদা ঘর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, না হ'লে—

এ সংসারে নিজের মূল্যটা বেন হঠাৎ মধ্যস্থিক ভাবে
বরা পড়ে—সে কেউ না ! সে কেউ না ! স্বার্থের খাতিরে
কেবল !

অতদিন হ'লে টান ধেরে মূলেখা জিনিষগুলো বাইরে
ফেলে দিতো, চোঁচামেচি করে' বাড়ী মাথাব করতো।

আজ মাথা নীচু করে মূলেখা ঘরে ঢুকলো। হাত
পা বেন তার অসাড় হ'য়ে গেছে। অবশ হ'য়ে গেছে
সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ।

বিজ্ঞানায় অবস্থাপ্রাপ্ত ভেননি, খাটা-বন্ট—চিমটা
কাটলে বরদা ওঠে। এমনটা আর কোনদিন হয় নি,
ছোঁড়দির পর বলে ভরে কেউ কোনদিন চোকেনি ছোট
ভাই বোনরা। এতটুকু বরদা, এতটুকু অপোছাল,
মূলেখা সহ্য করতে পারে নি কোনদিন।

তার বলতে কেবল বিয়ের তোরম আর মুটকেশটা
আছে এ করে। তাও এমন তাখে বাধা হয়েছে বেন
নেহাং বরা করে।

হাতের ব্যাগটা মূলেখা খাটের ছত্ৰবিত্তে মুলিয়ে
রাখলে। অকস্মে জামা-কাপড়-শাখা ছেড়ে আট-
পৌরে কানড় জামা পরলে, লাল জরির কিতে খুলে
চুলটা পিঠের ওপর ছড়িয়ে দিলে, চন্দ্রচল চুড়িগুলো
হাতের কহুই-এর ওপর ঠেসে তুলে দিলে।

বিজ্ঞানটা কেড়ে মূলেখা ভয়ে পড়ল। এত অবসার
বেন আর কোনদিন বোধ করেনি মূলেখা, এত নিশ্চিন্ততাও
আর কোন অবসরে।

ঘুম এলো না কিছুতে। বিজ্ঞানার গছটা কেমন
অচেনা-অচেনা, নাকে বড় লাগে। না, তার ঘরের
গছটাই বদলে গেছে, চোখে ঠুলির বস্তু ঘরটার আবছা
অন্ধকার চোখে আরো বেন অস্বস্তিকর লাগে। মাথাটা বার
করে আপাদবক্ষ চাপর মুড়ির বস্তু একটা গুপ্ত ছায়া
ঘরের চতুর্দিকে ঘনিয়ে আছে। পারের তলার কিছু
থোকা বার না, ঠাঠর না করলে।

আলো-চলকান জানালার কাছে মূলেখা উঠে আসে।
পাল্লাগুলো ভাল করে খুলে দিলে হয়তো আরো আলো
হুটবে, অন্ধকার দূর হ'বে।

জানালার পাল্লা ঠেলতে গিয়ে হাতটা খেঁবে গেল।
মনিবকে চুড়িগুলো চমকে উঠলো। জানালার গরাদে
মাকড়সার জাল বোনা হয়ে গেছে এমাথা ওমাথা
বিশুদ্ধ।

ঐ হস্ত জালের তেজর গিরে চেয়ে দেখে মূলেখা।
অন্ধ, বিবর আকাশের মুখ। বাঁ বাঁ ছপূর লুটিপথে
কোন এক নারকেল গাছের মাথার কীপছে। এ সময়ে
নিজেকে ভুলে গেলে বেন ভাল হ'তো।

কিন্তু কিছুতে একটা সরল ব্যাখ্যা করা যায় না।
পূর্বপরের সামঞ্জস্য বিধান হয় না। বা কি ভাবলে ? আর
সে কি ভাবলো ! আগের বস্তু বহুদূর অকস্মে যেতে
পারল না কেন ? মাথার সিঁড়ির বাধা কি হয়েছে !

কখন অস্ত্রমন্ডল হয়ে জ্বলধা নাকড়শরি জালটা খেড়
কুচোর মত ডান হাতের তর্জনীতে জড়িয়ে ফেললো।
মুখটা পর্যায়ে চেপে ধরলে—সারা বেহ অবশ হয়ে
গেল যেন।

নিঃশব্দ দুপুরে আর কি করে জ্বলধা। জানালা
থেকে সরে এসে টেবিলে বসল। হিমাংগকে প্রথম
চিঠি লিখলে।

প্রিয়তম,

আজ অফিস হাইনি। না, হাইনি ঠিক নয়, ব্যক্তিলাব
কিন্তু বেতে বেতে কিরে এসেছি। কি মনে হলো, মাত-
পথে বাস থেকে নেমে পড়লুম। কিশোর জন্তে বলতে
পাড়িনা—বাল্যের সকলে আমার দিকে হাঁ করে
চেয়েছিল—বড় বিস্মী লাগছিল। তোমার ভাইকে
কি দিয়ে দিয়েছি, মিছিমিছি ও বেচারাকে কষ্ট দিই কেন।
মলে দিয়ে আঁর আসতে হবে না। কি হয়েছে আমার
যে সঙ্গে তোমার ভাইকে নিয়ে চলা করা করতে হবে।
একলা আমি খুব বেতে পারবো আগের মতো। তোমার
ভয়ের কোন কারণ নেই।

এখন মনে হচ্ছে না কিরে এলেই ভাল হ'তো।
অফিসে তবু সময়টা কাটতে, কি মনে হচ্ছে জান যেন
একটা অপরূপ করে কেলেছি সবায় কাছে। বিয়ের পর
এই প্রথম অফিসে বেরিয়েছিলাম হঠাৎ অসময়ে কিরে
আমার জন্তে ভেবেছিলাম, না হরতো খুব বিস্মিত হবেন—
অল্পখ-বিস্ময়ের নানা প্রশ্ন করবেন। কিন্তু কৈ, না যেন
হাতারাতি বললে গেছেন। আমাকে দেখে চুপ করে
রইলেন, যেন আমারই মা ন'ন। কি হলো মুকুতে
পারলুম না। মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল। নিজের
জন্তে যত না মার জন্তে বড় কষ্ট হলো—বলে আছে,
বরকড়া বিলায়ের সময় মার কাছা। আজ মা যে রকম
জান করলেন নেহাৎ পরও বোধ হয় অসম করে না। যেন
মুকলুম, মা অসহ্য হয়েছেন। কেন বলতে পার ? আমি
কি হোব করেছি ?

তোমার কথাই বোঝার ঠিক। বিয়ে আর চাকরি

এক লগে করা চলবে না—হরতো...

চিঠি লেখা বন্ধ করলো। হঠাৎ মোর গোড়ার মত
হতে জ্বলধা চিঠি লেখা বন্ধ করলো না হাড়িরে আছেন।
বোধ হয় তখনকার অটীটা বীকার করতে এসেছেন।
এতকণে মনে পড়েছে যেরের কথা।

চিঠিটা ভাঙাভাঙি চাপা দিয়ে জ্বলধা উৎসুক ভাবে
মার দিকে চেয়ে রইল—হরতো অপেক্ষা করলে, মার
সময় আদরান শুনবে বলে।

কিছুক্ষণ নীরবে বার। উত্তরের উত্তরকে যেন চিনতে
সমর লাগে, এই আবহা আলা আবারে, তিনিম পত্রে
ঠানঠানি সতীর্ণ ঘরে হারিয়ে বাগরা কিছুর সন্ধান চলে
বোধ নয়। না মেরের দৃষ্টি সন্ধানী।

মা বললো, বরটা কি করে রেখেছে এক হাঁটু।
কদিন দেখিনি তোলাস্ত্রীহাডাখা সব উঠে দিয়েছে।

কে জানে, মা মেরের মন বুকে কথাটা বললেন
কিনা। আবর্জনা অভ্য করা, বর মথলের কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন
বোধ হয়।

জ্বলধা আর্খ্য হয়। এতকণের অব্যব অভিমান
নিরুদ্ধ অস্ত্রকণার দেখা দেয়। মা ম'ই আছেন, তার
বোঝবার ভুল।

টেবিল ছেড়ে জ্বলধা উঠে দাঁড়াল। হাতে তুলিয়ে
এলো চুলটা সামলে নিয়ে বলল, কিছু বলবে না ?

মা তখনও অল্পপহিত আত্মজনের উদ্দেশে বলতে
লাগলেন সাপের পাঁচ পা দেখলে সব ! কদিনে বরটাকে
উঠে দিয়েছে। ছোড়মি নেই খুব মজা!

চোখটা এবার জ্বলধার চল চল করে উঠলো।
যেদ-রোজ হাসি হেসে বললে, তুমি ব্যস্ত হরোনা মা,
আমি সব ঠিক করে দেব'ন।

কথাটা মার কানেই গেল না বোধ হয়। বললো
আমার হয়েছে এক আলা, বেশিক না দেখি সে দিক
জলে পুড়ে বার। শুধু কি তোর ঘর সব গেল এক
এক করে—

জ্বলধার মনটা ছাপ কবে ওঠে,

কি? কু দিয়ে আলো নিভানোর মত খুঁটা তার কাশো হয়ে যায়।

মা খাটে এসে বললেন, জ্বলখা নীরবে পাড়িয়ে থাকে। এরপর কি কথা বলা উচিত কেউ যেন ভেবে পার না—সেই হারান অপ্রস্তুত বা মেয়ে।

চোখের কোণে জ্বলখা লক্ষ্য করে মা নিবিলে মনে ঘরটা পরীক্ষা করছেন—কি যেন খুঁজছেন। আতিপাতি করে।

এক সময় বা আলগোছে ভিজেল করলেন, তোর ছুটি কুরিয়ে গেল?

কিছু খুঁজে না পেরে কিছু একটা বলার মত নিরর্থক প্রশ্নটা। তবু জ্বলখা মাথা নাড়ে।

মা নিজের মনে বলেন, এর মধ্যে কুরিয়ে গেল, মিন যাচ্ছে না ভন যাচ্ছে। আর ক'দিন ছুটি নিলে পারতিস।

জ্বলখা বললে, আর ছুটি পাওনা নেই। তবু এক মাস তো ছুটি নিয়েছিলুম আর ছুটি কি হবে?

ছুটির এখন কত সরকার তোর? ছুদিন জিরোবি, তা নয়—মার মত করে বা বললেন।

কাজের মেয়ে জ্বলখা মার কণার বলে: আবার কত জিরোবা অনেক জিরিতেছি।

হঠাৎ মার যেন মনে পড়ে গেছে কথাটা—এতক্ষণের আলোপটা যেন সেই বিবৃত কথাটা উদ্ধার করতে। মা বললো, তোর শাওড়ী আসবার সময় কিছু বলে নি? ক'দিন তোকে এখানে রাখবে বলেছে?

বাপের বাড়ী আসবার সময় কোন কথাই হয় নি জ্বলখার তার শাওড়ীর সঙ্গে। এ ব্যাপারে হিমাংগই সব। সেও কোন কথা বলে দেয় নি, কোন কড়ার করে নি জ্বলখার সঙ্গে।

জ্বলখা বললে, না।

বোধ হয় একটু অপ্রস্তুত বোধ করেন মা। বলেন, না, তাই ভিজেল করছি। এখন তো ওদেরই লাভ।

হঠাৎ যেন বুঝতে দেহী হয় কথাটা জ্বলখার। এতে আবার লাভালাভের প্রশ্ন কি? যেহেতু এখন যেখানে

খুশী বাবুজি না, ভাবনার কি।

বুঝতে পেরে জ্বলখা তক্ত হয়ে যায়। তার ভাবনার প্রতিচ্ছিন্ন মার কথাবার্তার স্পষ্ট। এ সংসারে লাভের আছে বিবৃত হ'য়ে আর এক সংসারে লাভের আছে মুক্ত হ'য়েছে সে। নতুন সূত্রে তার চাকরিটা আর সম্মতি আনবে না—লাভ কতির অক কথাকবি আত্মহু থেকে যাবে। তাই কি হিমাংগ বলেছিল, চাকরিটা তুমি ছেড়ে দাও।

বিরের সেনা পাওনার জ্বলখার চাকরির কথাটাই কেবল উঠে ছিল, কোন লক্ষ্য একথা তোলেম নি, বিরের পরও মেয়ে চাকরি করলে তার উপস্থিত কে ভোগ করবে? কত। সম্মতানের সঙ্গে ওটাও দিয়ে দেওয়া হয় কি না?

আগে পরে জ্বলখা এ নিয়ে অনেক ভেবেছে—কুল কিনারা কিছু পারনি। পাবেও না বোধ হয় আর কোনদিন।

মার কথার জ্বলখার রাগ হয়। মার-ই অজ্ঞান, তাঁর পক্ষে এখন ও কথা অশোভন। মেয়ে যখন দিয়েছেন তখন—

মেয়ের মুখের দিকে চেয়ে মা যেন বুঝতে পারেন।

কথা বুঝিয়ে বলেন, না, তাই বলছি এখন ওদের যদি।

উত্তরটা জ্বলখার বোধ হয় রক্ত পোনার। বলে, যদি আবার কি, তবেই যখন সরকার হবে নিজে যাবে।

মা হুশ ক'রে যান। হঠাৎ বলবার কিছু খুঁজে পান না। বাও বলবার ইচ্ছে ছিল প্রাণ খুলে, তাও গুলিকে কেলেম মেয়ের স্বত্তর বাড়ীর প্রতি টান দেবে। মেয়ে তার সে-মেয়ে আর নেই।

বড় কঠিন আর অনমনীয় মনে হয় তার জ্বলখাকে।

মা চলে যেতে অনেকক্ষণ জ্বলখা নিজের মনে কাঁদলো। একি করলে সে! বাপ, মা, তাইবোন এদের মুখের আর আঁখি সে কোন অজুহাতে কেড়ে নেবে? গত পটিল বহুরের মারী জীবনের জ্বল মুখে বেহনায় লম্বা বোধ কোন মহৎ জীবনের আশায় জলাঞ্জলি দেবে?

চাকরি যদি করে কেন তা? আঁজ এদের ভয়ে করতে পারবে না সে? বহু হিসাবে সে হিমাংকদের সংসারের দায়িত্ব নিতে পারে, বিয়ের মত উচ্চারণে তার নির্দেশও আছে—কিন্তু তা ব'লে তার চাকরিটাও কি তাদের সেবার নিয়োগ করতে হবে? কেন?

খানিকক্ষণ পরে করার শেষ হ'লেও এর হিমাংকা সুলেখা করতে পারে না। সালসারী কস্তা ধানের যন্ত্রোচ্চারণে তার চাকরির উল্লেখ নাই থাক, তার ইতিকর্তব্য বেন ঠিক হ'য়ে গেছে—বাবা তার লিখিত অলিখিত সমস্ত সম্ভাটাই দান করেছেন। সুলেখার অমত করবার কোন অবিকারই নেই।

সত্যি কোন উপায়ই কি নেই তার? এদের মূখ চেয়ে কিছু কি করবার নেই তার? একান্তভাবে আজ সে হিমাংকর ঘরগী, অন্তঃপন্ন সব কিছু তার হিমাংকরই প্রাপ্য—দেব, মন, সেবা, মেহ, ভালবাসা। কিন্তু চাকরিটা সে বাপ দার জেজেই সরিয়ে রাখবে। বতদিন পারবে আজ পাঁচ হ' বছরের আর্থিক সাহায্যটা। সে বন্ধ করবে না কোন কারণেই। এতে যত কিছু বিব্রত সমালোচনাই হোক সে অসুতোত্তরে মাথা পেতে নেবে।

আবার বোধ হয় সুলেখা চিঠি লিখতেই বসে। হিমাংককে সব কথা স্পষ্ট করে বলা উচিত। চাকরি সে তাদের ভয়ে করবে না, করবে যে সংসার তাকে খাইয়ে পরিবে এতখানি করছে তার ভেত্রে। এতে বেন হিমাংকর আত্মীয় স্বজনদের লোভ না থাকে।

কিছুক্ষণ আগের লেখা চিঠিটা ভাড়াভাড়ি সুকিরে কলার দলপ কি রকম ছুড়ে ছমড়ে গেছে। কারগার কারগার কানীও বেবেড়ে গেছে। পড়তে চেষ্টা করলে সুলেখা চিঠিটা ভাঁজ খুলে। প'ড়ে হাসি পেল—কি যা তা লিখেছিল সে একটু আগে।

‘আমাকে দেখে বা বেন সত্যতাযাতি বললে গেছেন’—বারবার লেখাটা সুলেখা পড়লে। সত্যি কি বা-বাপ কখনো বলার, না তা কেবল আবারের দেখার ভুল। হি, হি, কত বড় সোখের ভাগী হচ্ছিল সে। হিমাংক

তাকে কত ছোট ভাবতো।

লেখা চিঠিটা সুলেখা ছিড়লে না, ডানে হাতের তর্জনী ঘলে ঘলে লেখাটা বুজিয়ে দিলে, অশ্লষ্ট ক'রে দিলে। আশ্চর্য লেখা-কালীর কাঁটে কখন সুলেখার চোখ বাপাঙ্কল হয়ে উঠেছে সে টের পারান।

অনেক করে সুলেখা লিখলে স্বামীকে :

‘কাল যদি পার একবার এসো। কিছু ভাল লাগছে না। অনেক কথা আছে। যেতুকে আর পাঠাতে হবে না। শরীরটা কেমন করছিল, আজ অকস্মিক বাঁহিনী।—’

লেখাটা আবেল তাবোল হচ্ছে তেবেই বোধ হয় সুলেখা চিঠি লেখার কাগজখানা ছিঁড়ে ফেললে, কলমটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে; তারপর স্বামীর মনোমত প্রথম পত্রালাপে অপারগ হয়ে কোত্রে ছুঁয়ে ছাল ছেড়ে দিয়ে খাটের ওপর গিয়ে শুয়ে পড়ল। না, কিছুই সে করবে না, কিছুই সে দেখবে না, বা হচ্ছে হোক। তার কি।

বতীনবার কিছু রেখে ডেকে বললেন না। প্যাকলে প্যাকলে কখনো কীট ঝোলে চুবিরে গিলতে গিলতে গ্রীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার বড় পুত্র তো। গিখেছেন, এখানে এক পরসো পাঠাতে পারবেন না—ঘরচ বেছেছে।

বত ঘরচ আমারই কম দেখেছে সব। বুড়ো বয়েলে হচ্ছে বেশ। হোক, হোক, কত হবে হোক।

জীর কোন লাভ না গেয়ে বতীনবার খানিকটা হম নিয়ে বলতে লাগলেন, হ' হ'বো! আর কি! বহু! বদিন চলে চলবে, তারপর না চলে—

হঠাৎ বতীনবার ঘেমে যান সুলেখাকে সামনে আসতে দেখে। পাস্তের দালার বাপাটা বেন তাঁর বিশেষ যার। সন্ত বিবাহিতা কস্তাকে এসব কথা শোনাবার ইচ্ছে তাঁর ছিল না। তাঁর সংসারের চুপের কাহিনী এখন ওর প্রবণ গোচর না হওয়াই উচিত। ও জনে কি করবে?

কথা চাকতেই বতীনবার বলেন, আর, কখন এনি। সুলেখা মনে মনে হাসে। মুদ্র কঠে বল, কেন কাল

তো এসুন। ভুলে গেলে বাবা!

প্রাণো জিনিষকে নতুন করে দেখার বোধ হয় এমনিই ভুল হয়। আর তা ভাড়া যেহেতু বতীনবাবু এমনি বেশে যেখনতিনি যেন—মাথার সিঁচুর, চোখে চুড়ি, পরনে ঢাকাই শাড়ী, চকিত চরণ। এ তাঁর সংসারের কলা কলা স্নেহখাই নয়। আর একজন।

ফোকা মুখে রান হেসে বতীনবাবু বলেন, ঐ দেখ আমি ভুলেই গেছি! কুই এসেছিল কখন একদম মনে নেই। কাছে ব'সে স্নেহা বললে, আমি যে পর আমার কথা কি আর ভোকারে মনে থাকবে এখন।

বতীনবাবু মাথা নাড়লেন, না, না—ভুলে যেতে আমার পর হয় না কি। দু—র—র!

যেন একটা মর্মান্তিক সত্য কথাকে বিধোয় আবরণে ঢাকবার চেষ্টাতেই মানুষের আলোটা যুদ্ধের কভে কৈলে উঠল। ফিউজ হ'তে হ'তে বালবটা বেঁচে গেল।

স্নেহা বললে, দাবার কথা কি বলছিলে যেন মাকে।

বতীনবাবু উড়িয়ে যোবার মত বললেন, ও কিছু না, লিখেছে ভরা কুলোতে পারবে না। বিশেষে কুলোবে কি ক'রে ঐ মাইনের—সঙ্গে ছোটো বাজা। চাট্টিখানি কথা তো নয়।

স্নেহা বাপের হয়ে কথা বলে, তা হ'লেও দাবার কথা উড়িত। হঠাৎ বন্ধ করে দিলে চলবে কেন, দাবার বোকা উড়িত।

নিজের হ'রে এ পরশের ওকালতিতে বোধ হয় বতীনবাবুর জ্ঞান আর বাবে। তিনি মুখ ভুলে বললেন, কারো পরেরা আমি করি না। আস লম্বী বাও খালাই। এই যে তোমার রোজগারটা গেল, কি হ'লো আমার। করে গেছি না উপোস করছি?

বৌকের মাথার কথাটা ব'লে ফেলে বতীনবাবু যেন প্রজ্বরীভূত হয়ে যান। বা এককণ চাক্ষুতে চাইছিলেন তা অলসক মুহুর্তে অত্যন্ত করতাবে একট হ'রে গেল। একটা নিশেষ হি হি তাঁর কাণে তাল লাগিয়ে দিলে। অতঃক ঠাঙ্কিয়ে স্নেহাবার বা বধনী দিবা হওয়ার প্রার্থনা

করলেন। বয়েস হচ্ছে না ভাব পাচ্ছে। সন্ত দিবাহিতঃ যেহেতু কেউ এমন ক'রে বলে। ঠিক পাগল হয়ে গেছে লোকটা।

বাপের শাপে বলে স্নেহা কাঠ হয়ে ওঠে। হয়তো বা আচমক আঘাতে তার জ্ঞান লোপ পেয়েছে।

মাগ কাবারী মাইনে পাওয়া পর্যন্ত স্নেহা বাপের বাড়ীই রইল। একটা কঠিন পরীকার অন্তে সে যেন নিজে একে এ ক'দিন প্রস্তুত করেছে। বাসে ট্রানে বন্ধক চলাফেরা করেছে—যেন তার কিছুই হয়নি। কেউ যদি কিছু মনে করে সে কেরার করে না। বিয়ে হয়েছে তার হয়েছে কি।

শুভর বাড়ী বাবার অন্তে করেকবার তাগিদ এগেছিল সে বামনি। এই নিয়ে হিম্মতের সঙ্গে বোধ হয় রাগা-রাগিত হয়ে গেছে তার। ছুদিন এসে বাপের বাড়ী থাকবারও উপায় নেই—বিয়ে হয়েছে বলে কেনা গোলাম নাকি।

বতীনবাবু দু'খাল চোখে দেখেন নি যেহেতু এই চড়ওয়া হ'রে পিতৃগৃহে বাস। সত্যিই তো বিয়ের পরে যেরে বেশী দিন বাপের বাড়ী থাকবে কেন। ছ'মাসা দিয়ে সাহায্য করবার কেউ নয়, আদিখোতা করবার বেলায় সবাই।

যাকে স্নেহা সবই, কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বলে না। নেহাৎ অলস হ'লে সত্যি পরটার এসে বাধা চুল খুলে ফেলে আবার বাঁধতে বসে। নরতো যে চিঠি কোনদিন ডাকে দেবে না সেই রকম চিঠি লিখতে বসে হিম্মতকে। মেয়ে কি তার, না তার বরাতের?

মাইনের টাকাটা ব্যাগে পুরতে পুরতে স্নেহাবার একবার শুভর বাড়ীর কথা মনে হয়েছিল। পরশ হুপের মত মনে খটক সেগেছিল তার। নিজের দেহটার মত আর যেন এ রোজগারে কোন অধিকার নেই। কার টাকা কাকে দেবে সে?

স্নেহাবার কেমন বারনা হয়—দুখে বাই বলুক,

হিমাংক ঠিক আসবে আ পাকে প্রকাশে টাকাতা
হাত করে নিচে বাবে—সে না করতে পারবে না।

অফিস ফেরৎ এলেই চোরাই মাল হস্তান্তরিত করার
মত নাটকীয় সব টাকাতাগুলো জ্বলখা মার হাতে তুলে
দিলে কল্পিত হাতে। পঙ্কিত মনে মার মনের প্রতি-
ক্রিয়ার দৃষ্টি মুখে দেখবে বলে, জ্বলখা অপরকে চোরে
মইল—চোখ দুটো বাম্পাকুল হয়ে এল; হঠাৎ কোথা
থেকে একটা ভীমহস্ত প্রসারিত হয়ে মার চাত খেকে
টাকাতাগুলো ছোঁ মেরে তুলে নিলে।

জ্বলখা হাত তুলে বাবা বেবার আগেই ভৌতিক
হাতটা সরে গেল। ছ' একটা পাঁচ দশটাকার নোট
উড়ন্ত পার্কার পালক ধসার মত মার পারের তলার
করে পড়ল। মার ক্র ক্রুদিত হয়ে উঠলো তিরহায়ে।

মারের ডাকে বড়মড়িয়ে উঠে পড়ে জ্বলখা। হুহাতে
চোখ রগড়ে চেয়ে দেখলে। অবেলার ঘুমিয়ে লজ্জাটা
উৎরে দিয়েছে। ঘুমের রাজ্যে আবহা।

মাথার কাছে ঝড়িয়ে মা বলছেন, অসুখ বিস্ময় কিছু
করেনি তো তোর? অফিস থেকে লকাল লকাল কিরে

গেই যে জলি গুঠবার নাম নেই। তাবনার মরি। গুঠ,
চা হয়ে গেছে।

কিছুই জ্বলখার মাথার চোকে না।

করে মার ঘুমের দিকে চেয়ে থাকে।

সরে এলে মা গারে হাত দিয়ে ডাকলেন, ওঠ, কি
লেখছিল অমন করে? বুখে জল বিহে বাইরে একটু
বেড়িয়ে আর শরীর ঠিক হয়ে বাবে। ওঠ, ওঠ।

মা চলে যেতে জ্বলখা উঠে বলল। আতপাত্ত তার
মনে পড়ল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতকল স্বপ্ন দেখছিল সে।
আশ্চর্য স্বপ্ন, অবাক কাহ্ন! দিবা স্বপ্ন নয় তো?

আজ্ঞে আজ্ঞে উঠে এসে আরনার সামনে দাঁড়াল
জ্বলখা—নিজেকে সে চিনতে পারছে না, চোখ মুখ
তোলা কোলা, আবুলারিত কেন—সবের জ্বলখার একি
ছিন্ন হয়েছে?

চোখ চেয়ে চেয়ে বোঝ হয় চোখের জারা। নিশ্চয়
হয়ে আসে জ্বলখার—লীমছে এতটুকু সিঁদুৰ রেখার
চিহ্ন খুঁজে পায় না সে।

মারের ডাকে সাড়া দিতে গিরে বুক ঠেলে একটা
দীর্ঘ নিশ্বাস বেরিয়ে আসে জ্বলখার। তাত্পন্ন মত
ঘেরে আর বিয়ে করেছে কোনদিন!



জল ছবি

হুম্মিল রায়

কথা বলে কন, আর কাজ করে বৈশি—রেবতীর চরিত্রের এইটাই নাকি বৈশিষ্ট্য। কিন্তু তার চরিত্রের মধ্যে বিশিষ্টতা যদি গেছে থাকে তা হলে তা অল্প—কাজে বা কথায় নয়।

রেবতী খুব ভালো কটোগ্রাফার। আলো আর ছায়া সবচেয়ে তার বোধ খুব সুস্থ। নিজের চোখ দিয়ে তাকিয়েই সে আলো-ঐশ্ব্যের বিচার করে অল্প, কিন্তু তার সুস্থ-বিচার এবং তার ফলাফল দেখে মনে হয়, আলো সে খেয়ালবোঝার লেন্স দিয়েই দেখে। তা না হলে এমন ছবি নাকি হতে পারে না। ঝাঁঝ ছবি-তোলায় কিছুটা অজ্ঞ, এ মত তাঁদের।

ঝাঁঝ গান-বাজনার সাইনে আছেন, তাঁরা বলেন, রেবতীর গলাটা বিগ্নি না, কিন্তু হাত খুব মিষ্টি। আর একটু নিষ্ঠার সঙ্গে সেগে থাকলে অন্নদিনের মধ্যেই তার নাকি নাম করা সেতারী হয়ে উঠার ব্যবস্থা সম্ভাব্য।

তার তৃতীয় গুণ হচ্ছে বাগান চর্চা। বসন্ত সব কাটা গাছ, বাগের বাগানী নামে ক্যাফটাস, রেবতীর তা সংগ্রহ করা চাই। ফ্রাট বাড়িতে থেকেও যে উজানের শখ নেটানো যায়, রেবতী তা নাকি প্রমাণ করার ক্ষমতা ব্যত। যেখানেই একটু আয়গা পেয়েছে, সেখানেই বসিয়েছে সুদে সুদে টব—আর কতকটা বড় টব বসিয়েছে সংকীর্ণ ছায়ে।

তার চরিত্রের বৈশিষ্ট্য তা হলে তার কাজে বা কথায় নয়, এ বৈশিষ্ট্য তার শৌখিন মেজাজে।

সব সময় পরিচার পরিচ্ছন্ন। ছিবচান কেতাদুরস্ত—মেথলে সত্যিই সস্তম হয়। এত বকনের কাজ করে, কিন্তু এতটুকু কাজের বাগ পড়ে না শরীরের কোথাও। চলার ভাড়াহাড়ে নেই, কখনো কাঁধে ক্যামেরা কুড়িয়ে কখনো নীল কাপড়ের বলির মধ্যে সেতার নিয়ে সে ধীরে ধীরে হাটতে হাটতে চলে। মেখে মনে হয়, সময়ের ও খেয়াল নয়, সময়ই তার কাছে বাসবৎ লিখে

দিয়েছে। অথচ সময় বেঁধে চলতেও তাকে হয়। সে চাকরিত্ত করে। দশটা থেকে পাঁচটা। ড্র্যাফটম্যান। একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্মের নকশা আঁকিরের কাজ শেয়েছে বন্ধর করেন হল। এই কাজ পাওয়ার আগেও যেমন, তার পরেও তেমন—তার নতি আর তার গতি আছে একই রকম। কথা কন বলছে, কাজ বেশী করতে কটো জ্বলছে, ক্যাফটাস বঁড়ছে, সেতার সাধছে। টিক সময় বস্তু পরিচার পরিচ্ছন্ন হয়ে একই ভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে থাকে, আবার ফিরে আসছে।

এর পর তার ঘরে এল নুপুর। সকলে ভেবেছিল সেতারের সঙ্গে হয় তো এবার বেঁধে উঠবে নিকণ, কিন্তু তার বললে বা বাজল তার নাম কংকার।

নুপুর বলল, এর মানে ? তবে আমার আনলে কেন ?

ঘরের এক কোণে কাঠের পাটপান দিয়ে ও কালো কাপড়ের পর্দা দিয়ে ডার্ক রুম বানিয়ে নিয়েছে রেবতী। কোনো কথা না বলে সে সেই নিরাশা ঘরে ঢুকে পড়ে।

রেবতীর সাধনে জলে একটা লাল আলো, তার নীচে সে ছবি ভেঙলপ করে। বাইরের কোনো আলো এখানে ঢোকে না, কিন্তু বাইরে থেকে শব্দ এসে ঢোকে।

নুপুর বলে, পালিয়ে গিয়ে ভিতরে ঢুকলেই রেছাই পেয়ে গেলে ভেবেছে ? এ ভাবে পালিয়ে বেড়াতে কদিন ?

রেবতী গুনতে পার, উত্তর দেয় না। কথা বললেই কথা বেড়ে যাবে, এই হয় তো তার ভয়। কিংবা কথা বলা তার খতাব নয় বলেই কিছু বলে না।

কিন্তু নুপুর বলে, হয় ক্যামেরা নয় কাটাগাছ। বিরক্তও লাগে না এতটুকু ? সারাবিন আপিলে মাথা শুঁজে নকশা কেটে ঘরে ফিরেই আরম্ভ হল ডার্ক রুম। চোখের মধ্যে না হোক, মনের মধ্যে অস্তিত্ব একটু আলো বাড়ায় তো মরকার। বাইরে কি বেহতে নেই একদিনও। একদিনও কি আমার ইচ্ছে করতে নেই—

রেবতী বেরিয়ে এসে বলল, ঝাণ্ডা। এই যেখ তোমার ছবিটা।

অলস সারা বাজুদের নীচে ফিল্ম দেখে সে যেখায় নুপুরকে। বলে, ভিজে কাপড়ের এফেক্টটা এসেছে খুব নীচ। লজ্জার তো অফোসডো হয়ে বাজিলে তখন, এবার দেখ—এটা আর এখন চুপি না, এটা আট হয়ে গাড়িয়েছে।

ভিজে ফিল্মটা আলগোড়ে ধরে নুপুর, মনও হয় তো তার ভিজে যায়, কিন্তু কথার ঝাঁজ কমান না। উল্টো ছবি দেখে সে সবটা বুঝতে পারবে না, এ নিয়ে কোনো মতবাত্ত করে না।

রেবতী বলে, নেগেটিভ বেখে সবটা বুঝবে না। গাভাও, প্রিন্ট করার ব্যবস্থা করি।

সব বসেবসন্ত তার নিজের। হাতের পাঁচটা আঙ্গুল ছড়িয়ে দিলে বস বড় হয়, অবিকল সেই যাপের একটা। টেবিল ক্যান আছে ডার্ক রুম, এই পাখাটা চালিয়ে দিয়ে তার হাওরার বেলে রাখে ভেজা ফিল্ম—চটপট শুকিয়ে নেবার ভস্তে।

কালো পর্দা সম্বর্পণে তুলে নুপুর চুকে পড়ে সেখানে, রেবতীর কাঁধের উপর ভর দিয়ে গাড়িয়ে বলে, তোমার মথ তো মিটেছে, আমার কি কোনো মথ থাকতে নেই?

—মথ? সে আমার কি? রেবতী বেন আশঙ্ক হয়ে যায়। নুপুর বলে, মথ মথতো কি? খালি কলসী ঝাকালে তুলে দিয়ে, ভিজে কাপড় পরে ঝড় করিয়ে কত কলসৎ করলে, ছবি তুললে। বালা করি নি, অরাজি হই নি। তাবলাহ, আমার সাধোর মধ্যে বসটা আছে তা দিয়ে বসি তোমার সাধ মেটাতে পারি। এবার মিটল তো?

—সাধ? বল কি? এটা সাধ নয়, একসুপেরিমেন্ট।

রেবতী নেগেটিভে হাওরা খাণ্ডরাতে লাগল। আর সেই হাওরার নুপুরের মনের আন্তরতা ক্রমশঃই জলে উঠল।

বলল, ছিঁড়ে ফেলব, ছিঁড়ে ফেলব আমি। আমার

শরীর নিয়ে তোমার এ গবেষণা বরদাশ্ত করব না কিছুতে।

রেগে বেরিয়ে এল নুপুর, তার সঙ্গে বেগে বেরিয়ে এল রেবতীও।

নুপুরের হাত চেপে ধরে বলল, রাগলে কেন?

রাগ হবে না কেন? আজ লাভ মাল হয়ে গেল সে বিবাহিত হয়ে এগোছে রেবতীকে এখানে, এয় মধ্যে লাভটা মিনিট সে রেবতীকে ঝিক মনের মত করে কাছে পেরেছে কিনা দেখেছ। রাজের সারিধাটা সে হিসেবের মধ্যে হবে না। সে-ও তো একটা ডার্ক রুম মনের লালসার লাল আলো জ্বলে সবর কাটানোর মতন। তখন সে রেবতীকে পার না, পার তার গায়ের তপট্টা, আর উচ্চ নিখাসের হাওরা। এমন পাণ্ডরার মন ওঠে না নুপুরের। তার মনে আছে আরো আকাঙ্ক্ষা, আছে আরো অনেক বাসনা। খোলা হাওরার খোলা চোপ নিয়ে বসে, শরীর নয়, মন আহুল করে দিয়ে কথা বলা।

হাত ভাড়িয়ে নিয়ে নুপুর বলল, রাগি নি। অবশ্য রেগে করব কি। নিজের হাত কামড়ে লাভ আছে কোনো?

রেবতী বলল, বুঝতে পারছি নে কিছু।

কোনো জটি—

বেন মুখ চেপে ধরল নুপুর, বেন আকাশ থেকে পড়ল সে, বলল, বল কি! তোমার জটি কেন? জটী খান্নারই। আমাকে তুমি নিয়ে করে বস্ত্র কবেছ। এখন আমি তোমার স্ত্রী হতে চাচ্ছি, এ কি আমার কম অপরাধ?

বিরক্ত হয়ে পড়ল রেবতী, নুপুরের কথার অর্থ ঠিক বেন বুঝতে পারল না। বলল, স্ত্রী তো হয়েইছ, আমার হতে চাওরার কথা ওঠে কিসে?

নুপুর বলল, তা হলে তুমিও আমার স্ত্রী হত। কেবল আমার কাছে একটা পুরুষ থাকবে হয়ে বেক না।

রেবতী বলল, বুঝলাম না।

—এতেও যদি না বুঝে থাক, তা হলে আমার আর বোঝাবার দাখা নেই।

রেবতী বলল, সত্যিই বুঝতে পারলাম না।

সুপ্ত তখন হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। কি যেন ভাবতে লাগল সে। তার যেন মনে হচ্ছে তার জীবনটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেছে। জীবনের পথ কারোই নিয়ন্ত্রণে নহ, কিন্তু তার জীবন যে এভাবে ক্যাঁকটাসে আর ক্যানেরার পূর্ণ হয়ে উঠবে—এতটা সে কল্পনা করে নি কোনো দিন। কি রকম যেন হয়ে গেল সব। এতটা হুস্টাট আলোর ও সূর্য্য আলোর দ্বারা সে তার জীবনকে উজ্জ্বল করে তুলবে এই রকম চিন্তা এক কালে সে করেছে তার অবিদ্যুৎ জীবন সঞ্চার; কিন্তু এখন তার জীবন যেন একেবারে নিরাপেক্ষ আর নির্বাক হয়ে আছে।

রেবতী বলল, কই, বললে না তো, গুলে বল।

—কী বলব বল? যা বলেছি, তাতেও যদি না বুঝে থাক, তা হলে আর কী ভাবে বোঝানো যায়?

রেবতী বলল, সত্যিই বুঝতে পারলাম না।

সুপ্ত বললে না? আমাকে স্ত্রীর বর্ষা দাত। কেবল তোমার ঘরে একটা বেহেলায় কবে বেহে রেব না।

এবার চমকে উঠল রেবতী, বলল, এ কি কথা বলছ?

—সত্যি কথাটা বললে তুমি। এত কণ্ঠ করে বলার ইচ্ছে আমার ছিল না।

সুপ্তর কথা শুনে রেবতী চিন্তিত হয়ে পড়ল। কিন্তু কি ভাবে নিজের বিবাহিত পত্নীকে স্ত্রী করে তোলা যায় তা সে ভেবে পেল না। স্ত্রীর বর্ষা জিনিষটা ঠিক কি, ঠিক যেন জানেনা রেবতী।

বলল, বিয়ে করেছি এতেও যদি স্ত্রী না হয়ে থাক, তা হলে স্ত্রী হবে কিসে?

সুপ্ত বলল, সেইটেই একটু ভেবে দেখ। বতকণ বাইরে থাক, ততকণ তুমি শুকাতো, বতকণ ঘরে থাক তখনো তো কখনো কাছে আস না।

—তোমার কাছে কাছেই তো থাকি।

—জাকামি ক'রো না আর তুমি, জালান আর ক'রো না আমাকে। কংকর দিয়ে উঠল সুপ্ত।

রেবতী বলল, এসব ভাব ছেড়ে দেব, বলছ। এই গাছ, এই টব, এই সেতার, আর এই ছবি? এত দিনের অভ্যাগে এসব যে মজাগত হয়ে গেছে।

একটু যেয়ে বলল, আমি পাঁচ জনের বড় সাধারণ একজন নই সুপ্ত। তুমি তুল করছ। আমি আর্টিস্ট, আমি নিদ্রী।

বিল বিল করে বেলে উঠতে ইচ্ছে করল সুপ্তের। কিন্তু সে কোনো শব্দ করল না, টোট চোপে মনে মনেই হাসল।

আর্টিস্ট রেবতীর জীবনে কোনো পরিবর্তন এল না। হিম্মত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক পরে নিরবমত সে ঘেরিয়ে বার বাড়ি থেকে, নিরবমত ফিরে আসে, নিরবমত তার ঘরে বেলে উঠে সেতারের তার।

কাটাগাছেও হল কোটে। রেবতীর আনন্দ ঘরে না। ছাতের উপরে যে বড় টব সে ঘিরেছে কিছুদিন আগে, সেই টবের ক্যাঁকাস রঙিন হয়ে উঠেছে ফুটে মজার। ক'দিন হাতে বাড়ি হয় নি। আজ কি খোলা হ'ল, সকালে হাত জ্ঞান করতে করতে সে উঠে এল ছাতে। হঠাৎ এই ফুলের সমারোহ দেখেই সে তত্বত করে নেমে এল নীচে, ডাকল, সুপ্ত, সুপ্ত। ছুটে এস।

ছুটে গেল না সুপ্ত। বীর পায়ে হেঁটে সে উপরে উঠল, পেল। বেগতে তার বাগান লাগল না, কিন্তু উল্লাসে সে চীৎকার করে উঠল না রেবতীর মত। বলল, বেশ, সত্যিই বেশ। ফুলে যদি কাটা হয়, তাহলে কাটার স্থান হবে না কেন? আশ্চর্য হবার আছে কি?

রেবতী তার উল্লাসে উৎসাহ না পেয়ে বিরক্ত হ'ল, বলল, বলেছি তোমো। তোমাকেও আমি মূল মনে করেছিলাম, কিন্তু কাটা হয়ে বড় খোঁজা দিল।

রেবতীর চোখের দিকে তাকাল সুপ্ত, বলল, কিন্তু

তোমাকে আমি কাটা মনে করি নি। তাই কোনো দিন ফুলের প্রত্যাশা করি নে।

কণা কম বলে রেবতী, কাজ করে বেশি। তাই সে কাছে জুবে গেল, একবার একটাও কথাই মিল না। সে ডার্ক রুমে গিয়ে ঢুকল না, আজ সে বলল সেতার নিয়ে। গলা তার মিষ্টি না, মিষ্টি গলা হল গান পাইতে পারত, কিন্তু হাত দিলি। সেতারের তার বিরে আজ সে যেন তার মনের বিশালটাই প্রকাশ করার ক্ষমতা বসেছে।

পাশের ঘরে বসে নুপুর চিঠি পড়ছে; আর রেবতীর সেতার শুনছে। কানের মধ্যে সুস্পষ্ট দুটো জ্বনি বেজে চলেছে তার। প্রথমটা, সেতারের কংকার; দ্বিতীয়টা স্বপ্নার গলা।

স্বপ্না লিখেছে—‘বেশ সুখে আছি ভাই। অনেক বলে, ছেলের বিয়ে দিলে ছেলে পর হয়ে যায়; মেয়ের বিয়ে দিলে মেয়ে কষ্টে পড়ে; কী জানি ভাই, কুন্নি নে ভুলব কথা। গত নীচে গিয়েছিলাম পুতী, এবার পুকুর বোধ হয় দেয়াছুনে বাব। দিল্লীর গরম তেমন আনিল নে তো! ভাঙা ভাঙা অবস্থা। ভাই সুযোগ পেলেই এখান থেকে পালাই। উনিও যেভাবে খুব শুভাব। হৈ হৈ টই টই করে মুখেই আছি বলতে পারিল। তারে খবর কি?’

কী খবর যে সেওয়া তার তাই ভাবতে নুপুর। তার চিঠির অক্ষরের মধ্যে দিয়ে স্বপ্নার উচ্ছল চেহারা যেন ফুটে বের হচ্ছে, আর তার সেই উল্লাসে উত্তরোল গলাও যেন শোনা যাচ্ছে স্পষ্ট। রেবতীর সেতার বত কোরেই কংকার বিরে উঠুক না কেন, স্বপ্নার গলা কিছুতেই চাপা পড়ছে না।

স্বপ্নার স্বামী নাকি টিকাদার, পরশা কানার পুং। কিন্তু পয়সাটাই কি বড় কথা? স্বপ্না একখাটা জানাবার ক্ষমতা এত ব্যস্ত হয় কেন? তার জীবনের খানকটাই যে আগল, সেতার উপর তার মের না কেন সে?

রেবতী উঠে এসে বলল, হাতে কি শুটা?

—কিছু না। বিষয় মুক্তিতে বসে রইল নুপুর।

গলের মধ্যে সেতার রাখতে রাখতে রেবতী বলল, তোমার কি হয়েছে সবতে পারছি নে কিছু।

—পারবে কী করে? কুন্নি যে শিল্পী, কুন্নি যে আর্টিষ্ট।

খোঁচা খেয়ে সোজা হয়ে পাড়াল রেবতী। একটা অকথ্য কণা এসে থিরেছিল তার ঠোঁটের কিনারে, জিত দিয়ে চেটে সেটা সে মুখের মধ্যে কেবল নিয়ে নিল, দখল করল, হাঁ।

সারাদিন নিমজ্ঞ বাড়িতে বসে থাকে একা নুপুর। লভয়ে সে তাকাল ডার্ক রুমটার বিকে, আতঙ্কের সঙ্গে তাকায় কাটাগাছের দিকে, সেতারের ঢাকনার দিকে তাকিয়ে ধীরে নিশ্বাস ফেলে। এই তিনটি পদার্থ তার জীবনের অভিশাপ হয়ে দেখা দিয়েছে। চারদিকে তাকাতো তাকাতো হঠাৎ চোখে পড়ল বড় গুই ছবিটার দিকে। কবে এনলার্ক করল, কবে বাঁদিয়ে দিয়ে এল, কবে গুটি টাঞ্জিরে রাখল শুধানে? ভিত্তে কাপড় উলছে তার শরীরের চাকচাক্য হং যেন দেখা যাচ্ছে, কংকালে কলসী নিয়ে অবনতাবে পাঁড়ির আছে একি লজাই সে নিজে?

উঠে গিয়ে কাছে পাড়াল, মুখের মাত্র একটা পাল দেখা যাচ্ছে, কিন্তু আরো যা দেখা যাচ্ছে তা তো কেবল রেবতীর একাংর দেবার ক্ষমতা—কেন তবে রেবতী তা এমন প্রকৃতি এভাবে কুন্নির রেখেছে? সংকোচে কাটা দিতে লাগল নুপুরের সারা গায়ে। ছবিটা নানিরে যেখে সে ভিত্ততা বহি করতে চার না, তাই সে তোমালে দিয়ে ঢাকা দিয়ে রাখল মাত্র।

স্বপ্নাকে সে চিঠির উত্তর লিখে দিল, লিখল, ‘হুখের কথা বলছিল? আমার বত সুখী আর কে আছে ভাই? আমার স্বামী শিল্পী, আমার স্বামী আর্টিষ্ট। সারা বাড়ি কুল দিচ্ছে সাকোনে, সন্ধ্যায় বেছে সেতারের আলো দিয়ে বাতাস মাখাবাখি।’

রেবতী অকস্মেৎ কিসের বিজ্ঞান ক’রে সেতার নিয়ে বসতেই নুপুর বলল, এর মানে?

—একটা নতুন আলোপ শোনো, চমৎকার। রেবতী হাসিতে মুখ আলো করে বলল।

মুগুর বলল, আলোপ তো রোজই শুনছি। কিন্তু এটা কি ?

হাবির গুপের থেকে তোরাশে লরিহে বিহে মুগুর কাঁধ দিহে বলল, এও যানে ?

কোশ থেকে সেতার নামিয়ে রেখে রেবতী উঠে এসে পাশে ঝাঁড়াল, বলল, তোমার ছবিটা।

—তা, আনি। কিন্তু লজ্জা করে না তোমার ? মিথের স্রোত—

আজ বীথ ভেঙে গেছে মুগুরের। কংকার আল সে তুলে গেছে। ইঁপিয়ে কৈলে উঠল সে। ঘন নিরে বলল, এতটুকু বর্ষাধা দিলে না আমাকে। আমাকে স্রী বলে গ্রহণ করতেই পারলে না কিছুতে ?

—তার যানে ? রেবতী হুঁহাত দিহে মুগুরের ছই কাঁধ বঁরে টেনে তার মুখোমুখী ঝাঁড় করাল তাকে, বলল, যানে বল।

মুগুর বলল, বা বলছি ওই পঞ্চতই থাক। এর আর টাকা চেয়ে না, ভাতা চেয়ে না। কবরী কথা আর বলিয়ে নিয়ো না আমাকে দিহে।

—হঁ। নাকের মতো দিহে একটা আগুয়াক করে রেবতী মুগুরের কাঁধ ঝেড়ে ঘিল, বলল, বর্ষাধা কেউ কড়িকে দিতে পারে না, সেটা অর্জন করতে হয়।

চলে ব্যজিল রেবতী, কিরে এসে বলল, যোগদে এই বে পজালাপ কর তুমি। সেটা কার সঙ্গে, একদিন খুলে বলো আমাকে ? আমার মনে খটকা কি লাগতে নেই। ওই ছবি ওখানে ঠাঙিয়ে আনি আমার প্রতিবার

আনিরেছি। কবরী কথা বলিয়ে নিয়ো না আমাকে দিহে।

ডাক কবের পর্বা তুলে দিহে জোহালা আলো জেলে দিহেছে রেবতী, মেঝের সড়কির উপর পড়ে আছে সেতার চিং ঘরে, ছোট ছোট টব থেকে ক্যাকটাসরা কতকিত হয়ে চেয়ে আছে এই দিকে। আজ একটা ভয়ংকর কাণ্ড যে হয়ে গেছে এখানে, তার সাক্ষী হয়ে বেয়ালে ঠার ঝাড়িরে আছে সিন্ধবলনা ছবিটা।

উগ্র চুকটের গড় আলছে মুগুরের নাকে। সেদিকে মন নেই তার। বুক বালিশ দিহে সে পাশের ঘরে গুয়ে খস খস করে চিঠি লিখেছে করণাকে। পাতার পর পাতা সে লিখে চলেছে, কোনো দিকে মন নেই। হঠাৎ কানের কাছে গরম নিখাল পড়তেই সে চমকে উঠল।

রেবতী হাতের চুকট ছুঁড়ে ফেলে হেসে উঠল, বলল, এত তাপ জমা রেখেছ ; আমাকে খুঁলে বলনি কেন ? উঠে এস, উঠে এস মুগুর। এগ !

এ বে নতুন গলা, নতুন মাহুদ ! আজ মুগুরকে কেন রেবতী ডাকতে না, ডাকছে তার স্বামী।

রেবতী বলল, বেরাড়া কথা বলে কেলোছি রেগে। কিছু মনে ক'রো না।

মুগুর কানতে লাগল, সে কাছা কিছুতে থাকে না। কিছুতেই থামতে পারল না রেবতী। রেবতীর অজস্র অছন্নর বিনয় আশ্বাস আরোহ—সব ব্যর্থ করে দিহে মুগুর হুঁপিয়ে উঠতে লাগল, কেবল এর মধ্যেই একবার বলল, করণা এসে দেখে থাক, আজ সত্যিই আদি রক্ত পুখী।



গান্ধী বিপ্লবের সমাপ্তি ?

নিবন্ধক

বিপ্লব কথাটি নিয়ে এক দিকে আতঙ্ক ও সংশয়, অপর দিকে বীর্য ও বজ্রাঘবেরের আশ্রয় নেই। তাই কথাটি পাড়তে গিয়েই ভয় হয়—কে কি বুঝবে। সমাজের শীর্ষে ছিল রাজা, হয়ে উঠলো খেজুরাণী, অভিজাতরা দেখল একে সংঘত করা সরকার। হলো বিপ্লব, হুঁসিয়ার দেখা দিল আভিজাত্যের শাসন। গ্রন্থ সুবিধা তারা একচেটে করে রাখতে চায়, অগ্নয়ের জ্বলে বাই হুটক—আবার এল বিপ্লব, ইতিহাসে গেলাম মধ্যবিত্তের শাসন। আজও হুঁসিয়ার জুড়ে আর তাই চলছে। মধ্যবিত্তদের সুখপাত্র রেখে অভিজাতরা শাসন শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে। শাসন শোষণটি এল পড়ে ভাঙেরই উপর তারা সমাজের জন্ত উৎপাদন করে। তাদের হাতে বিপ্লব কোথাও হুঁসেছে, অস্ত্র হবার চেষ্টা চলছে। হলো বা গাঁড়াবে তাকে সেই বিপ্লবের পুরোহিত স্যার স্যারিই অতিরিক্ত করেছেন Dictatorship of the proletariat (সর্বস্বতার একনায়কত্ব) বলে। অবশ্য একথাটি নিয়ে একটু ভুল ব্যোভাসি আছে। কথাটা ধারা চাণু করেছেন তাঁদের মনের কথা ছিল সমগ্র সমাজের সাহসকেই প্রোলিটারিয়েটে পরিণত করা, কাজেই ডিক্টেটরশিপ দেখানো অর্থ মূঢ় হয়ে পড়ে। আজ কিন্তু সেকথা খাটে না।

প্রোলিটারিয়েট কথাটিকে বাংলার সর্বস্বতা গাড় করে, কথাটিকে তার গোড়ার অর্থ থেকে অনেকখানি সরিয়ে নিয়ে বাওয়া হয়েছে। সর্বস্বতা অর্থ আর সব কিছু ছাড়াও যেমন কাজ ছাড়াও জেদনি। কিন্তু Communism এর চিন্তা নারকেয়া প্রোলিটারিয়েট বলতে বুঝেছেন তারা কাজ করে যেতে পারে। এখন কাজ করে তারা থাকে তাইই বহিঃসমগ্র সমাজ ধাপা হয়, তাহলে ডিক্টেটারি কে কার উপর করবে ?

কিন্তু কথাটা যখন স্পষ্ট হয়েছিল, ইতিহাস সেই দিনে গাড়িয়ে নেই—অনেক দূর হয়ে গেছে—তার সত্যতা সবার কাছে আরও অনেক বেশী দূরে। ইতিহাসের এই

অগ্রগতির মুখে সমাজের উৎপাদন শক্তি। গোড়াকার দিনে একখানা কাপড় দিয়ে অথবা তারপরে একখানা লাঙ্গল দিয়ে একটি মানুষ যখন জীবিকা অর্জন করত, সেই দিনের পরে তবুও তবুও এসিগের আজ যখন দু' পাঁচ দশ জন বা দু' পাঁচ দশ হাজার লোকের আর্থিক শক্তির বলে সমগ্র সমাজের জন্ত উৎপাদন করতে পারে এমন সত্যতা দেখা দিয়েছে তখন প্রোলিটারিয়েট অর্থ কাজ-ছাড়াও হেরে পড়ে অনেক বেশী ক'রে। অর্থাৎ বর্তমান সমাজের কাঠামো বহিঃসমগ্র থেকে তা হলো একতরফ প্রচণ্ড উৎপাদন শক্তি বেকারের সংখ্যা—কাজ ধার্য করে যেতে পারে তাদের ভুলনার সহায় গুণ বেড়ে যায়। সমাজের সাহসে এই সত্যতা যখন এল পড়েছে তখন রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, মধ্যবিত্তের শাসন—বাইই অপর নাম Parliamentary Democracy এমন কি, Dictatorship of the Proletariat বা সর্বস্বতার একনায়কত্ব সম্পূর্ণ অচল হয়ে গেছে। কমিউনিষ্ট মতবাদের ধারা মার্ক্স শেনিনকে পুথোখা রেখে বর্তমান সমাজকে সাহায্যী শাসনতন্ত্রের দিকে নিয়ে যেতে চান তাঁরাও তাই হয়ে পড়েছেন প্রান্তিক পন্থী।

আর্থিক উৎপাদন শক্তি কমানার বহু বৎসর পূর্বে গান্ধীজি সন্ধানে অথবা অজ্ঞানে Consciously বা Sub-consciously ইতিহাসের বা উৎপাদন শক্তির এমন কোন সত্যতা কল্পনা করতে পেরেছিলেন এমন মনে করলে অসত্য হবে না। শেখবার যখন তিনি জেলে ছিলেন তখনই তিনি মার্ক্সের ক্যাপিটাল গ্রন্থ পড়েন। তারপর কমিউনিষ্ট মতবাদ লম্বা তিন বৎসর যে এই মতবাদের দিন জেলে গেছে। কমিউনিষ্ট পন্থীরা হেগেলের ডায়ালেকটিক মতবাদকে মার্ক্স যে রূপ দেন তার অমূল্য করে গান্ধীজির কথাটিকে একটু হুটকি হেসে উড়িয়ে দিতে পারেন না ; বশত পারেন না যে ইতিহাসের গতি তাঁদের মতবাদে এসে থেমে গেছে, এর আর কোন বিকল্প রূপের প্রয়োজন নেই।

ইতিহাসের অভিব্যক্তির ধারা ধরে ধারা চিত্রা করতে অভ্যস্ত নন। তাঁরা আজ এমন কপাও বলতে পারেন যে, তাঁদের খেলায় খুদী বড় একটা হাওয়াই হোক, অভিব্যক্তিতেই হোক, পার্লামেন্টারী ডেমোক্রেসিই চোক বা ডিক্টেটোরশিয়াম অব দি প্রোলিটারিয়েটই হোক—বা হোক একটা কিছু সমাজের উপর চাপিয়ে দিলেই হল। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে কমিউনিষ্ট বা সাম্যবাদী শাসনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়া হিসাবে দেখা দিচ্ছে ক্যান্সিট শাসনতন্ত্র। করালী বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার যেমন দেখা দিয়েছিল যেটানিকের জুর বৈরতন্ত্র, তেমনই রুশিয়ার কমিউনিষ্ট শাসনতন্ত্রের প্রতিক্রিয়ার দেখা দিচ্ছে হুসেগিনি এবং হিটলারের ক্যান্সিটন্ত্র। এই তন্ত্রের নিকা ধারা বা যে সব রাষ্ট্র বড়ই কতক আসলে সাম্য-তান্ত্রিক শাসনের ভরে ক্যানীতন্ত্র আজ প্রায় দুনিয়ার সকল দেশকেই পেয়ে বসেছে। সাম্যবাদী শাসনতন্ত্র ও ক্যান্সিটন্ত্র এ দুটির বাহ্যিক একটা হিল আছে এক জায়গায়। সেটা হচ্ছে—totalitarian state বা সর্ব-ব্যাপী একনায়কত্ব, হরত ব্যক্তির একনায়কত্বের বলে পাঠিয়ে একনায়কত্ব।

আজকের দিনের যে কোন চিত্তাশীল লোকের কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, রাষ্ট্রবৈর হাতে যখন বিরাট উৎপাদন শক্তি তখন যে কোন ব্যক্তির, ক্রয়ের (class) বা পাঠের একটা ডিক্টেটোরী মেনে নিলে অধিকাংশের ভাগ্যে জুঁবে খেদ্দাভাণ্ড, অন্ত্যাত্য, দারিদ্র্য এবং বেকারের ভীড়। জীবিকার উপায় যে মূল সংশোধকের হাতে, কর্তৃক তাগাই একচেটে করে রাখবে। গোড়া কমিউনিষ্ট মতবাদের লোকেরা এটা দেখতে চাইছেন না, বলবেন উৎপাদন শক্তি বেশী হলেই বেকারের সংখ্যা বেড়ে যাবে—এমন কি কথা আছে? আট বড়ার জায়গায় রাষ্ট্রকে ভিন বকী বা দুই বকী পাঠালেই তো চলে। কথাটা ভনতে বেশ, কিন্তু এর ভিতর ইতিহাসের ব্যস্ত পরিণতির দিকে দৃষ্টির পরিচয় নেই। ডিক্টেটোরী দিয়ে আর গোড়া গুণন ভা কখনো অধিকাংশের দিকে চোরে নিষেধ অভিন্ন বিপ্লব করে দেয় দি।

গান্ধীজি এবং কমিউনিষ্ট পন্থীরা উভয়েই সমাজের একটি আদর্শ পরিণতিকে মেনে নিয়েছেন—সে হচ্ছে নৈরাত্য বা withering away of the state। কিন্তু withering away of the state সম্ভব নয় যদি এই পরিণতির পন্থা হিসেবে আমরা কোন তরোই ডিক্টেটোর-শিপটা মেনে নিই। গান্ধীজি এই অস্ত্র বিপ্লবের পন্থা হিসেবে অবলম্বন করেছেন ডেমোক্রেটিক বা গণতন্ত্র সমস্ত পন্থা। লেনিনের একটা কথা আছে সোভিয়েট+ইলেক্টিসিটি=কমিউনিজম। সেই ধারা ধরে বলা চলে কমিউনিজম+গণতন্ত্র ও অহিংসা=গান্ধীবাদ।

ইতিহাসের পরিণতি ও ধারার দিকে বাদেই দৃষ্টি আছে তাঁদের একথা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন হয় না, ডেমোক্রেসির নামে আজ বড় রকম শাসন পদ্ধতি পূর্বদিকে রুশিয়ার পশ্চিমে আমেরিকা পূর্বে প্রচলিত আছে, তার সাধারণ মূল থেকে পাঠের নগ পন্থা বিচার বেশাতি। তোটের দিনে সব নাগরিক কলনার চোখে দুই বধু থাকেন। কিন্তু তোট হয়ে যাওয়ার পর তাদের ভাগ্যে দারিদ্র্য, বুদ্ধতা অথবা খেলবাস এবং বন্দুকের জলি। একে ডেমোক্রেসি বলে অভিহিত করার চেয়ে সর্বাঙ্গিক বিধা আর কি হতে পারে। একথাও বিবেচন করে দেখিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে, প্রতি দেশেরই আজ রাষ্ট্রের বা রূপ ভা সেই দেশের সঙ্কিত হিংসাবৃত্তির পরিপূর্ণ প্রতীক। এই অসত্য এবং হিংসার আবিপত্য দুনিয়ার বেড়েই চলেছে এবং বেড়ে চলতে বাধ্য বতদিন দুনিয়ার উৎপাদন শক্তির সংগে তার সমাজ ব্যবহার কাঠামোর সামঞ্জস্য বিধান না করা যাবে। কোন রকম ডিক্টেটোরী শাসনকে মেনে নিয়ে এই সামঞ্জস্য বিধান করা যাবে, বা বিধা ও হিংসাকে দূর করা যাবে, এটা বর্তমান দুনিয়ার অনুরোধের কথা। বিপ্লবের পন্থা যদি ডিক্টেটোরি হয়, যদি বিধা ও হিংসা আচরণের পন্থা হয় সেই নিম্ন দিয়ে বারা ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হবে তারা কখনো সফলের আর্থে নিজেদের অসুখের পথে নিয়ে যেতে পারে না—এই ইতিহাসের শিক্ষা।

সমগ্রের ব্যার্থে দেখানে বিপ্লব এবং যে বিপ্লবের সকল পরিণতিতে সমগ্রের হাতে আসবে ক্ষমতা। তখন বিপ্লবই আজকের দিনের উৎপাদন শক্তির সংগে যাপ্য, এবং সেই বিপ্লবের পদ্ম। কোন ডিক্টেটোরী বা হিংসা বা অসন্তোষ পদ্ম হতে পারে না। আধুনিক শক্তিতেই হোক আর যে শক্তিতেই হোক উৎপাদনও যেমন হবে সমগ্রের অঙ্গ ক্ষমতাও তেমনই আসবে সমগ্রের হাতে। বলশেভিক বিপ্লবের পর লেনিনের ইচ্ছার ও ইংগিতে যে সব বিরাট শিল্প ও কৃষি প্রতিষ্ঠান সোভিয়েট দেশে গড়ে উঠেছে, এর ভিতরই তার বিচ্ছিন্ন সমালোচনা শোনা গেছে যে সেদেশে হয়েছে ম্যানেজেরিয়েল রিকোপ্তা-নাম বা পরিচালক মন্তলীর বা নিম্ন শ্রমীদের হাতের ক্রীড়নক স্বরূপ বিপ্লব। এটাও অতি সহজ কথা যে একটি বিরাট যন্ত্রশিল্প কি ভাবে চলে সে সবকিছু সাধারণ শ্রমিকের দ্বারা। খুব অল্পই থাকে—শিল্পে কাজ করার সংগে সংগেই শিক্ষা। তাকে বতই এবং বত রকমেই বেওয়া হোক। এরই কলে গিড়ায়, আজ আমাদের দেশে বা অন্তরে যেমন অবিকাংপের দাসত্ব চলছে বুদ্ধিমত্তার চাপকের চোটে তেমনই ওদেশের শ্রমিকের দাসত্ব চলছে শিল্প ও যন্ত্র সবকিছু তার অজ্ঞানের দ্বারকত। শোনা যায় সোভিয়েট কর্তৃপক্ষ এদিকে উদ্বাসীন নন। Sobhoz বা রাষ্ট্র পরিচালিত সমস্ত কৃষি প্রতিষ্ঠানগুলোকে তেঁকে টুকরো টুকরো করার দিকে নজর গেছে। কেন্দ্রীকৃত বিরাট শিল্প প্রতিষ্ঠানের পুরানো পরিকল্পনাও কতক কতক পরিভ্রান্ত হয়েছে। কিন্তু এ দ্বারা সাধারণ শ্রমিকের হাতে কোন কৃষি বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব আসবে না। কারণ পণ্ডা বরা হেবেছে উল্টো। ম্যানেজারদের ডিক্টেটোরিয়েল প্রতিষ্ঠিত করে এখন এমন অবতার সৃষ্টি করা চলবে না যাতে করে প্রতিটি শ্রমিকই কোন না কোন সময়ে ম্যানেজারের পদে উন্নীত হতে পারে, বা তারা স্বাধীনতা উপভোগ করতে পারে। এই অঙ্গ গান্ধীজি মোড়া গেছেই শিল্প ও কৃষিকে বিকেন্দ্রী করনের পক্ষপাতী—যেন প্রকৃত উৎপাদনের চেয়ে প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীনতা বড়

হয়ে দেখা দেয়—যেন জীবিকার স্বাধীনতা। যে বিপ্লবে সাধারণ মানুষকে এনে দিবেতে সেই বিপ্লবের উৎসাহে প্রেরণার নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে পারে—সকল প্রতিবেশীদের সহযোগীতার সাহচর্যে।

এই বিপ্লবের আদর্শ নিয়ে গান্ধীজি যে দিন ভারত-বর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন, সেদিন ভারতের অপর নেতার বা বিপ্লবীরা যে করেন। দ্বারা নিয়ে কাজ কর-ছিলেন সেটা হচ্ছে একটা নেতিভুলক করেনা—ইংরেজের স্বাধীনতার অবদান। অধিকাংশ কংগ্রেস নেতা বা বিপ্লবীরা গান্ধীজির সংগে এক বৎসর কাজ করেছেন। কিন্তু এক পৃথক আদর্শ নিয়ে। আজ তাই গান্ধীজির স্মৃতির পরই যেন হয় যেন গান্ধীবাসেরও স্মৃতি হয়েছে এই সব নেতা ও বিপ্লবীদের হাতে।

গান্ধীজি ১৯২০ সালের পূর্বে ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে নামেন নাই। তার আগেও কিন্তু একটা বৈপ্লবিক আদর্শ নিয়ে তিনি চলেছিলেন, সেই আদর্শ রূপ নেবার পথে অনেককক্ষ পরিবর্তনের ভিত্তর দিয়ে হরত গেছে। কিন্তু মূল লক্ষ্যটি একই আছে। আদর্শকে ভারতবর্ষে তিনি প্রচার রূপ দিতে চেষ্টাছিলেন। কিন্তু এখন দ্বারা তিনি দেখলেন ভারতবর্ষে ইংরেজের আধিপত্য। তাই এই দাসত্ব সরানো উন্নয়ন পক্ষে হয়ে পড়লো আদর্শ উপলব্ধির পথে একটা পদ্ম মাত্র—means to an end—চরম আদর্শ নয়।

বিপ্লবোত্তর ভারতবর্ষ বা বিপ্লবোত্তর পৃথিবী কি হয়ে গিড়াবে সে সবকিছু অস্তের কি দ্বারা ছিল বা ছিল না তা জানা নেই। তবে আজ যে সব Experiment বা পরীক্ষার ভিত্তর দিয়ে ভারতবর্ষে চলছে তাতে যেন হয় অঙ্গ নেতাদের বা বলগুলির তেমন কোন পরিকল্পনা ছিল না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কয়েক বছরের ভেতর দেখা গেছে গান্ধীজি যে কোন রকমেই হোক এবং যে কোন রকমের হোক একটা আত্মীয় সংস্কার চেষ্টাছেন। উদ্বেগ—যাতে বান্ধিকটা ক্ষমতা হাতে পেলো সমাজকে নতুন

আদর্শে ভেঙ্গে সাহসে পাবেন—ইংরেজ রাষ্ট্রের হাত থেকে বীনের হাতে ক্ষমতা আসবে তাঁরাই ক্ষমতা আঁকড়ে পড়ে থাকবেন না। ক্ষমতা তখনই বস্তুর সত্ত্বা জনসাধারণের পক্ষাভেদের হাতে ভুলে যাবেন, খালিকটা দারিদ্র্য নেতৃত্বের শক্তি দেখালেই ক্রমে বৃহত্তর ক্ষমতাও সেই পক্ষাভেদের হাতেই যাবে। গ্রামের কংগ্রেস কনী এই পক্ষাভেদের উপদেষ্টার কাজ করবে। শনৈঃ শনৈঃ ক্ষমতা হাতে পেয়ে বহুশতাব্দীর নিষ্কৃতি আশা ভরসা খুলে জনসাধারণের ভিতর বৈপ্লবিক আদর্শপ্রীতি, উৎসাহ ও উত্তেজনা দেখা যাবে। অবিকল্পিত ক্ষমতা পরিচালনার শক্তি দেখাবে। জাতির তুষ্টি স্বাধীন করবে ব্যক্তি নয় সমগ্র জাতি স্বাধীনতার ফল ভোগ করবে। সমগ্র জাতির ভিতর প্রেরণা আসবে—ব্যক্তির স্বার্থ খুঁজে পুঁজে একাত্ম বিজয় জাতি বিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়বে না, পরম্পরের সহযোগীতার সাহচর্যে নিঃশরায় শক্তিমান হবে, জাতকেও শক্তি করে গড়ে তুলবে। এই ছিল গান্ধীজির বিপ্লব সাধনার আদর্শ, জাতীয় সরকারের আদর্শ। কিন্তু গান্ধীজির হাত দিয়ে বীরা ক্ষমতা পেলেন, ক্ষমতা তাঁরা নীচের স্তরে নাবতে দিলেন না। ক্ষমতার বদলে হৃৎ-সুবিধা বন্টনের আশা দিলেন। আসলে দুঃ দুঃ ধরে জাতকে যেমন দুর্বল করে রাখা হয়েছিল তেমনই দুর্বল করে রাখার হাতাই ধরলেন—বিপ্লব বাহ্যত হল, কত যুগের জর কে আনে?

এদিক দিয়েও গান্ধীজির হাতে তৈরী বীরা তাঁরা গান্ধীজিকে বোঝেন নাই অথবা 'বুকতে চান নাই। অর্থাৎ বিপ্লবী গান্ধীজি সবার স্বাধীন পরিভাষ্য হয়েছেন। সেবাস্ত্রী গান্ধীজিকে হরভো কেউ নিয়েছেন, অনেকেই তাঁর পাড়া কলটিই শুধু খেয়ে তৃপ্ত হয়েছেন, তারপর নিজের নিজের রাস্তা ধরেছেন। গান্ধীজির বিপ্লব আন্দোলন চলতে চলতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যের এমন দুর্বলতা বহা পড়লো যে তাকে ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে যেতে হলো। এটা গান্ধীজি লড়াইয়ের কালে যা চেয়েছিলেন তার চেয়ে অনেকখানি বেশী।

তাঁর তখন আশা ছিল প্রায় ৩০ বছর ধরে বীরা তাঁর হাতে হাত মিলিয়ে সংগ্রাম করেছেন তাঁরা। তাঁর বিপ্লবাব্দর্শের খালিকটা ছোঁরাচ অস্তিত্ব পেয়েছেন। তিনি তাঁদের হাতেই জাতীয় সরকার গড়বার ভার দিলেন। কার্ব কালে দেখা গেল তিনি ভুল আশা করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীরা অধি মজার, রক্তে রুটিপ পাল্লোমেটরী শাসন বা পাল্লোমেটরী ডেমোক্রেসী হাড়া ডেমোক্রেসির অস্ত্র কোন অস্ত্রপ চেনেন না। নিপ্লব সফলও তাঁদের আদৌ কোন ধারণা নেই। বিপ্লবে আহাত নেই, তাই তাঁরা পুরানো বুগোজেক্টিক শাসন-ব্যবস্থাকে আগাগোড়া বজায় রাখলেন। তুষ্টি খেতাক ব্যক্তিগুলি বদলে সেই জায়গার বসিয়ে দিলেন তাম্রবর্ণ বুগোজেক্টিকদের। আর তার মাঝার বসালেন বিপ্লবপন্থী, কংগ্রেসী স্বাধীনতার সংগে আদর্শ প্রতিবিম্বী স্বাধীনতার—রুটিপ পাল্লোমেটরী ডেমোক্রেসীরও এক অগাধিভূক্তী রূপ। নেহরু প্যাটেইল-পাশাপাশি বসলেন স্ত্রীমঙ্গলাদ, আবেদনকর। যোগ বিহোঙ্গে বিপ্লব শক্তির ধরে পড়লো খুল। বিপ্লব প্রতিহত হলো।

গান্ধীজির সংগে শেখ বখশ দেখা বেলেবাটার তখন অনেকের সংগে তাঁর অনেক আলাপ আলোচনা তুলনাম, তখন বুঝলাম তিনি খুদ, খুদ, কিন্তু—নতুন বিজ্ঞোহের কল্পনা করছেন তিনি তাঁরাই প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সরকারের বিরুদ্ধে, তারপরই খাতকের স্তম্ভিতে তাঁর হত্যা। হরত তাঁর বিপ্লবেও হত্যা সংগে সংগে।

এমনটা কিন্তু ভাবতে পারা যায় না। মানবজাতকের 'অবিদ্য' এখানেই এমনি করেই সন্ধানিত হবে? ইতিহাসের এই চরম পরিণতিতে কি হিন্দু শাস্ত্রের কঙ্কি অবতারের কল্পনাই সত্য হয়ে উঠবে? -

স্ত্রীমঙ্গলাদ আবেদনকর গেছেন, কিন্তু শাসনব্যবস্থা ও স্ত্রীমঙ্গলাদ সেই একই চলছে—গভাভগতিক, এর ভিতর বিপ্লবের কল্পনা কোথাও বাহো আছে—এমন বনে করবার কোন যেতু খুঁজে পাওয়া যাবে না। শাসন কর্তারা খুদ হয়ে আছেন, খুদ করে তুলতে চাইছেন।

ঊর্ধ্বা পঞ্চবার্ষিক, বর্ষাবার্ষিক বা আর যে সব পরিকল্পনা করছেন তাই দিয়েই বিপ্লব সফল হবে সার্থক হবে। জনগণের হৃদয় দৈন্ত হুতবে। পরিকল্পনার আমেরিকাকে রাশিয়ারকে অঙ্কুরণ করে নিচ্ছেদের মনে নিজেরাই বিপ্লবের সৃষ্টি করছেন দেশকে ঊর্ধ্বা। আমেরিকার মত সমৃদ্ধ করে তুলবেন, জনগণকে রুশিয়ার মত ভাত্তে কাশড়ে কাজে পূর্ণকাম করে তুলবেন। তদিকে দৃষ্টি নেই—হুনিয়া জোড়া কি শক্তি গড়ে উঠছে, কি শক্তি ভাত্তে কোন আমেরিকার তিরস্ত ঊর্ধ্বা কাজ করছেন, কোন মতো ইতিহাস চলচে, কোন আশর্মে বিপ্লবের ক্ষেত্রে গান্ধীজী ঊর্ধ্বের লীক্ষা দিয়েছিলেন। সরকারী পরিকল্পনার অনেকগুলি লিনলিথগোর আমল থেকে যায় করা। সেগুলি ভারতবাসীর স্বয়ং সমৃদ্ধির লক্ষ্যে তৈরী হয় নি, হয়েছিল এই লক্ষ্যে—বুড়োত্তর বুটেনে যে বিরাট বেলার সমস্তা দেখা দেবে ভাব আংশিক সমাধান—বুটেনের বৃহৎ বৃহৎ শিল্প গড়ে তোলা। পরিকল্পনা কাজে রূপ দিতে তার রক্ত বহুপাতি বা প্রয়োজন হবে তা তো ভারতবর্ষ বুটেনের কাজ থেকেই নেবে। সেই পরিকল্পনাগুলি গ্রহণ করার বেলায় হাতীর সরকারের খোতা উচিত ছিল ভারতবর্ষের মত দরিদ্র দেশের পক্ষে বহুবৎসর ধরে এক একটা পরিকল্পনার রক্ত টাকা ব্যয় করে যাওয়া অসাধ্য না হলেও নিত্যন্ত দুঃসাধ্য ব্যাপার। এতো বৎসর ধরে অগণিত লোকের বেকার সমস্তা ও দারিদ্র্য বাড়বে এবং দলে দলে লোক বুদ্ধকার মরবে। উচিত ছিল ছোট ছোট পরিকল্পনা করা যা থেকে অল্প সমস্তের তিরস্ত অনেক গোকে অল্প ব্যয়ে, কাজ পায়। এগুলিকে পরে ছুড়ে নেওয়া চলতো এবং গান্ধীজির পরিকল্পিত মুক্ত সমাজ-ব্যবস্থার সংগেও এর সামঞ্জস্য থাকতো। কিন্তু সরকারের expert দের মত আলাদা, উপদেশ আলাদা। এই expert দের উপদেশই গ্রহণ হয়ে দেখা দিয়েছে, একমাত্র গ্রহণীয় বস্তু হয়ে উঠেছে—বিশেষ করে এই বস্তুটি বেখে গান্ধীজি দিন দিন বর্ষাহত হয়ে উঠেছিলেন সে কথা আশ্চর্য্য জানি। এই expert দের একাধিপত্য তিনি বুচাতে চেয়েছিলেন। বাংলার ব্যাপারে কন্ট্রোল সমাধার

অন্ত গান্ধীজি কবে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন। তার প্রমাণ জনসাধারণের জন্যে কথার তিরস্তও পাওয়া যাবে।

অপরদিকে, বিপ্লবের বয় হিসেবে গান্ধীজি গড়ে তুলেছিলেন কংগ্রেসকে। ভারতীয় সরকারের পত্তনের পর বরাবরই কংগ্রেস ক্যাবিনেটের কতৃপক্ষের কাছ থেকে সাবধান বাণী শোনা গেল, শুকাৎ! সরকারী বৈমম্বিন কাজের তিরস্ত হাত দিতে এশো না। এটা হুজিসমত কথা। কিন্তু বিপ্লবের উত্তরদাবক যদি কংগ্রেস হয় তাহলে এই কংগ্রেসের সংগে কংগ্রেস ক্যাবিনেটের যোগ কোথায় থাকবে? না, পালিয়ারমেন্টারী বোর্ডের নার-কৎ অর্থাৎ কংগ্রেসকে একটা ইলেক্শন বেসিনারীতে গাঁড় করাতে হবে। তার বেশী দাবী দারিচ্ছ তার কিছু থাকবে না। বুদ্ধি পরামর্শ নীতি বা কিছু ক্যাবিনেটের একচেটে, কংগ্রেসটাকে জীইয়ে তোলা হবে এবং কাজে লাগানো হবে বহন নির্বাচনের হুজিক পডবে। এরকম ব্যবস্থা ঠিক নয়—অহরলালের বিবেকে যেন নাহে হাতে আঘাত পড়ে। কিন্তু ঐ পণ্ডই, এইই হুবেগে ক্রমে আশ দাড়িয়েছে কংগ্রেস পকারেৎ ও কংগ্রেস কমিটিগুলি আর আশা থেকে গোড়া পণ্ড পারমিট ও লাইসেন্সের আড়ৎ। সেই পারমিট লাইসেন্সের বেলায় ব্যাপাব দেখানে চলতে পারবে না, তেমন কমিটি ও পকারেৎ-গুলি যিনে দশটা হারে বাস্তিল হয়ে যাচ্ছে। ফলে আশ হুহুর লেজকে নঃ নেড়ে, লেজই হুহুরকে নাড়াড়ে। কংগ্রেস পকারেৎগুলি কংগ্রেস ক্যাবিনেট ও মন্ত্রিষের শেরায়া-পাইকে পরিপত হয়েচে। অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার সোমোজুজি হুওনিংটাং সরকারের হাতা ধরেছে। পরিপত্তিও আলাবা কিছু হবে এরকম আশা বা বজ্ঞনা ব্যক্তুরে।

এই সমালোচনারই বহুবিশ রূপ নানা ডালপালা ফুল-ফলে দেখা যায় ট্রান্স-বাসে, গোল দীঘির কোণে কোণে, বাসগল্লীঘের আজ্ঞার আজ্ঞার। এমনকি কংগ্রেস কমিটি ও কর্মীদের ঘরে ঘরেও। অর্থাৎ "যে এক ভরতী লক্ষ মানবের নির্ভর, তার ভলার কংগ্রেসী অকংগ্রেসী

সকলে মিলে কৌকর খুঁড়ছে। ফলে ফুণ্ডমিটাংএর চেয়ে কংগ্রেসের গতি আলাদা কিছু হবে এমন ভাববার কারণ নেই। কংগ্রেসের যদি এই গতি ও পরিণতি পাড়ার তাহলে কমিউনিষ্ট পার্টি আশাবাদী পাচ বৎসরে অথবা দ্বাদশবৎসর করবার প্রবোধে গেলে তার চেয়েও অমূল্য—হয়ত বড় জোর দশ বছরে ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অধিষ্ঠিত হবে। এ আশঙ্কা আজ কংগ্রেসী অকংগ্রেসী অনেকের মনে এসেছে। মাওৎসেতুং-এর হাতে কমিউনিষ্ট শাসন চীনে বা রাডিকালে তা যদি হয় সে পরিণতিতে হয়ত অনেক বেশী শঙ্কিত হইবেন না। কিন্তু মনে রাখতে হবে মাওৎসেতুং স্বাধীনতা পেয়েছেন চীনে প্রায় দিকি শতাব্দী ধরে রক্তস্রাব ও মানুষের অপরিসের হুংস সেগের পরে।

ইতিহাসের বিশ্লেষণের যে আভাস গোড়ার দিকে দিতেছি তা ধারা মানবেন তাঁরা বুঝবেন যে আজ যদি ভারতবর্ষকে কমিউনিষ্ট ডিক্টেটরী মেনে নিতে হয় তাহলে এক স্তর বিশ্লেষণের দিকে না এগিয়ে ভারতবর্ষকে প্রতি বিশ্লেষণের দিকে এক স্তর পিছিয়ে যেতে হবে। এতে যে জনগণের হুংস বৈশ্ব বাঙবে রুশিয়ার ইতিহাসের অতিব্যক্তিগত চাচ্চা মাওয়েই তাতে আশ্চর্য হবার কিছু বুঝে পাবেন না।

এখন প্রশ্ন—কঃ পদ্মা? আজমুখ সবাই ব্যর্থতার হাহাকার করছে—কেউ পথ দেখায় না, পথের আলোর নিদান কোথায় নেই। এটা ফ্রাস্ট্রেশন। এই Frustration বা সর্বব্যাপী ব্যর্থতার বোধ জাতক কোথার টেনে নিয়ে চলছে তা ভাবতে নিউরে উঠতে হয়। জাতির যৌবন শক্তির মধ্যেও জাতির ভবিষ্যতের জন্ত ব্যর্থতার ইচ্ছা, উত্তম কৌশল থেকে কৌশল হারে আসছে। পথের চিত্তারও যেন কোন বালাই নেই। অপর দিকে আত্মকেন্দ্রাভিগ যে চিত্তার ধারা বর্তমান শতাব্দীর প্রথম চার দশকে এদেশে বিশ্লেষণের পোড়া পত্তন করেছিল, তা যেন আজ জাতকে ছেড়ে গেছে। আবার সেই “আপনি বাঙলে বাপের নাম” বা “চাচা আপনা আণ বাচা” “সুখের চেয়ে

শোখাভি ভালো” প্রভৃতি আদর্শের জাতির পরিচর বস্ত্র জাতির নীতিবাক্যগুলি যেন সেই বিগত সব শতাব্দীর ধারা ধরে আদর্শের হৃৎক সুবর্তীদেব যেক যজ্ঞকে শিথিল ও প্রহর করে তুলেছে।

ভাবনা চিন্তার দার দায়িত্ব নাই। এক কথার কংগ্রেসের বেটারা সব অজ্ঞার করছে, মাও কংগ্রেসটাকে তেজে, না পারলে চল কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে। এতেই যেন সর্বাধিক দ্বিগত হয়ে গেল। কংগ্রেসকে তেজে দিলে বা কংগ্রেসের বাইরে গেলে অপর গতি কি?—যে যা হবার হবে। নরত একটা নতুন পার্টি করবো। এবনি ধরে ধরে নতুন পার্টি বাংলা দেশের নবীর কচুড়ীপানার মত গজিয়েছে। এর কোনটার কি কৃপা তা গত নির্বাচনে বাংলার জনসাধারণ বুঝিয়ে দিয়েছে। কংগ্রেস ছাড়লে অজ্ঞ গতি কমিউনিষ্ট পার্টি। কারণ কংগ্রেসের মতোই তার নিজস্ব একটা মতবাদ ও পদ্ধতি আছে—হোক সে আজকের দিনে প্রাচীন ও প্রতিপ্রাচীন মতবাদ ও পদ্ধতি। অজ্ঞ পার্টিগুলি ভাঙতা, শুধু লোক তুলাবার জন্ত কতকগুলো ছিঁচো কথা—এর বেশী ওয়ের আর কোন-টারই কোন দান নেই, সফল নেই। দলে দলে কংগ্রেস ছেড়ে গেলে বা তাকে তেজে দিলে কমিউনিষ্ট পার্টিরই অধিগ্রহণ ঘড়ে তোলা হবে। সেই হিসেবে ইলেকশনের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যে সব নামকরা নেতারা ও গান্ধীপন্থীরা কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন তাঁরা দেশের বা জনগণের ভবিষ্যতের দিকে ভাবনা নাই—হয় তাঁরা বিপ্লবী গান্ধীকে এবং বিপ্লবী কংগ্রেসকে বোকেন নাই, বুঝতে চেষ্টা করেন নাই, মরত নিজেদের প্রতিষ্ঠা ও স্বার্থ খুঁজেছেন।

কিন্তু কংগ্রেস কর্তৃপক্ষতো আদর্শের ধাক্কাতে দেবে না। এ কথার সোখা স্বাধীন—কংগ্রেস কি কারো হস্তের সম্পত্তি? কংগ্রেসকে গড়ে তুলেছিলেন গান্ধীজি—বিপ্লবী ভারতবাসীর সংস্থা হিসাবে। আজ যদি সেটাকে প্রতিবিপ্লবী পার্টি হোস্তায়ের দল জবরদখল করে থাকেন তাহলে বিপ্লবী ধারা আকো বৈতে আছেন তাঁরা কি ধরে ধরে গিয়ে ভারতবাসীকে সে কথা বলছেন? যদি

না বলে থাকেন তাহলে বিপ্লবী হিসাবে তাঁদের কর্তব্য
তাঁরা কতটুকু করেছেন ? দিন এগেছে—আত্মপরীক্ষার
—নিষেধক প্রয় করা, আত্মিক তবিশুদ্ধতার দিকে আর
একবার উনার উদ্ভূত দৃষ্টিতে দেখার। গান্ধীজি বিপ্লবী দৃষ্টি
করেছিলেন—তাঁদের কর্তব্য কি শেষ হবে গেল একবার
জগৎহরলাল নেহরুকে, একবার কংগ্রেসের নেতাদের
গালগাল করে ? কংগ্রেস পক্ষান্তরে পাঁচজন লোকট
ঐ পাঁচ হাজার লোকের দত্তবৃত্তের কর্তব্য হবে—না ঐ
পাঁচ হাজার লোকের স্বার্থে পক্ষান্তরে চলবে ? ঐ পাঁচ
হাজার লোক যদি আজ জানে, বোম্বে দেশ বিপ্লবের
দিকে যাচ্ছেন, যাচ্ছে প্রতি বিপ্লবের দিকে, এট পাঁচটি
লোককে লগতে কতজন ? কথা উঠবে, কংগ্রেসে
রসিদ বই দেবে ? রসিদ বই বিপ্লব ঠেকিয়ে রাখে
এসব কথা চলে কেবল আত্মদের এই সনাতন নাবালকের
দেশে। মারখরের কথাও উঠবে না—গান্ধী বিপ্লব একান্ত
ভাববৈ অহিংস, এ অহিংসা লোক বোম্বো অহিংস
নয়। মুক্তিযোদ্ধার স্বার্থের বিক্ষেপে লস্করের ইচ্ছা, লস্করের

স্বার্থের প্রতিষ্ঠা। '৪২ সালের ভারত ছাড় বাঙ্গালার
পেছনে হিংসার কলন। কিন্তু কলতার প্রতি-
ষ্ঠিতক মরির কলগলকে কলতার প্রতিষ্ঠা করার কলনা
ছিল। আরও কলনা—প্রথমতঃ বিপ্লবের যন্ত্রটিকে বিপ্লবী
কলগল হস্তগত করবে। তারপর কলগল তার আদর্শ
পথ বুঝে চলবে। বিপ্লবের যন্ত্রটিকে ঐ পাঁচজন পার্লামেন্ট
হোল্ডারের হাতে যখন যেতে দেখি তখন আমি
আমার বিপ্লবীর স্বর্ষ হারাইছি। বিপ্লবের যন্ত্র পাঁচ
হাজারকে চেভে পাঁচজনের হাতে যেতে দেওয়া নানে
বিপ্লবকে বাহত করা, প্রতিবিপ্লবকে ডেকে আনা।
সর্বপ্রথমে এই বিপ্লবের যন্ত্র পাঁচ হাজারের প্রতিষ্ঠা হিতে
হবে। তারপর দেখা যাবে কোথাকার কলতা কে ভোগ
করে। জগৎহরলাল গান্ধীজির উত্তরাধিকারী। তিনি যদি
আজ বিপ্লবী গণস্বার্থ ভুলে গিরে পার্লামেন্ট তাহলে
বিপ্লবকে চলতে হবে জগৎহরলালকে চেভেই যদি সন্তুষ্ট
হয় সে চলবে জগৎহরলালকে নিয়ে। কিন্তু এ কথা ভুললে
চলবে না যে জগৎহরলালকে চেভে জাত অনেক বড়।



ইসারা

তুফান বহু

বার বার মনে হ'ত বার্ষিকি এ জীবন, হায় !
অন্ত নত অহুৰোধে গরে গঠে সমস্ত অস্তর ।
এ সংসার মলমুনি বেন তাই প্রাণের নিকজ
পার না বাচাব রস—ভেবা বাঁধে স্বস্তির ছাত্রায় ।
অর নেই, বস্ত নেই—চারিদিকে হাঙ্কার ডের
অক্টোপাসেরই মতো আবারের প্রাণকে ঘড়িরে
বেরেছে অতাব, মৈত্র । ছোট বড় অলসান দিরে
প্রাত্যহিক গড়া—তবু আশা নেই কোথাও প্রাণের ?

হাঙ্কার মরণ ছুঁয়ে বার বার মরিনি আনর,
আনর; কবেছি দয়া মানবের লোলুপ আগুন
প্রাণের অবৃত্ত দিরে নিতিয়েছি । পরম আমরে
মাছুবে মাছুবে লখ্য রচে পক্তি জীবনের ভিত্ত ।
হৃদিত্ত রয়েছে ছুঃখ, অবকন, হাঙ্কার মিত্তার,
—তবু তাকে রোধ করা একমাত্র প্রাণের ইসারা ।

আজকের প্রার্থনা

ত্রিপ্রভাকর মাঝি

পৃথিবী উজ্জল হোক, পৃথিবী আনন্দে ভরা হোক,
যুগিতে উঠুক নেচে ঝিলিঝিলি ঘাসের শিথির ।
আন্তরক সবুজ বেশ। সূর্য চোখে পানকোড়ির—
রাখির ভপড়া শেষে তুচ্ছ-তল্লা নাদুক আলোক ।
দুবত যুগের কণ্ঠে আহুক কিরিয়া পুনঃ আল,
নব বোবনের সেই অনর্গল গানের কোমার ।
নীল-ছুঁয়ে-গার-বেঁধে-উড়ে-চলা হংস-বলাকার
পক্ষ্মশনি কেতে নিক আমাদের প্রাত্যহিক কাজ ।
আগৈতিহাসিক পণ্ড কিরে যাক গুহামধ্যে ফের,
লোভহীন পথ্য হোক—অস্তরেরতে সত্যের প্রকাশ ।
বক্তিতের চোখে বুখে দেখা দিক পরম উজ্জাল,
জর হোক, অব হোক, ব্যাধাবিহ্ন আর্জ মানবের ।
মাছুবের মনোপোকে হোক পুনঃ মৈত্রীর বোধন,
লব্ধে জীবনে পুনঃ ছেরে যাক কুহ্মনিত্ত বন ।

অন্যাকৈ

ঐগুর্গাদাস সরকার

তুমি ছিলে কোন্ অঝোনা দেশের কুন্দকুম্ভ রাত্তা কস্তা,
একরা ভোমাকে এনেছি বিকটে। বাসিনিক বড় বস্তা।

তোমার তটপত্ৰ

অপত্ৰপ, আশ্রয়।

(আহা) আনতাম 'সুফলাং' দেশে তুমিই হব অন্তা।

আজ দেখি হায় এখানেই মাটি কঠোর কঠিন কক,
কুধা-কুকার ভিলে ভিলে বাড়ে এই জীবনেরো হুংখ।

বস্ত্র জীবন নয়তো

এতো নির্ঘন; হতে

নিজেকে বাচালে পরম ভাগ্য : সেই কিগজকি হুম্ম !

তবু তুমি আমি, আমি আর তুমি সকলের লাগি অত
এ-মাটিকে ফের লব্ধে প্রাণে করবোই অনবস্ত্র।

তোমার রূপের কাহিনী

এখন লিখিতে চাহিনি।

তুমি অনন্তা। তোমাকে নিরেই মাটিতে ফলাবো পত্ন।

বাড়

এডিথ্‌ সিট্‌ওয়েল : যুগলকাঞ্চি সুবোশাখ্যায়

হোম্যান হাঙ্গপথ থেকে সোনার ঘোড়া ভৌতিক-আত্মা

দীর্ঘাঙ্গ ছেড়ে গন কেতে বলে :

"ভয় নেই, আমার পদকানি আর উছান ল্পর্শে

আমার অর্শনর উচ্ছল প্রভার—

(বাতাসের শব্দ আর গমের কম্পন)

আমার চীৎকারে আজ কোন ভয় নেই.....

আজ ভয় শুধু রক্ত-রাগী সূর্যেরে

যে সূর্য চকল করেছে বক লগ্ন প্রিয়ারে আমার।

ভয় শুধু রক্ত-কৈটী সোনার বৃষ্টির,

যে তোমার সৌন্দর্য করিবে নিশেষ, ও আমার

দীর্ঘকারা শব্দের রাণী, তুমি, আমার যেহের হুহিতা,..."

তাই তো বড় হৈকে বলে, "বিভ্রান করো গিয়া!"

ধূসর হপগাজে তারপর বড়

ধূসর হপগাজে তারপর বড়

হুংখতরা মন নিয়ে গনকেতু ছেড়ে "বুরে চলে যাব.....

....যেন বক্ত নিঃসহায় হতভাগ্যের মত।"

লাভ ম্যারেজ

[নন্দা]

মদ্যখ রায়

[প্রজাপতি কাঁধায়। লাইন বোর্ড হুলিতেছে—
"২৪ খণ্ডায় বিবাহ সংঘটন হয়। ঘটক কুল শিরোবনি
শ্রীপ্রজাপতি ভট্টাচার্য্য ৭)"

প্রজাপতি ভট্টাচার্য্য একটি কোটি পরীক্ষা করিতে
ছিলেন। মহিমবাবুর প্রবেশ।]

প্রজাপতি ॥ আহুন—আহুন—বসুন।

মহিম ॥ আপনিই তো প্রজাপতি ভট্টাচার্য্য ?

প্রজাপতি ॥ প্রজাপতি লাভ ভট্টাচার্য্য। যানে
আমাদের লাভ পুত্র থেকে ঘটকের ব্যবসা। আমার
বাবা ছিলেন প্রজাপতি ছর, তাঁর বাবা ছিলেন প্রজাপতি
পাচ। যানে—বুকেছেন—আজকাল যে রকম ভূঁইফোড়
প্রজাপতির হল গজাচ্ছে, এখানে তা পাবেন না। এ
হচ্ছে আদি ও অকৃত্রিম প্রজাপতির বংশ।

মহিম ॥ তা শুনেছি। আমার বুকেলেন কিনা—
একটা পাত্র চাই। নিষেধ ঘেরে বলতে নেই—তবে
লোকে বলে রূপে লক্ষী, শুণে সরস্বতী।

প্রজাপতি ॥ ও সবাই বলে, টাকা পরমা যদি ভালো
দিতে পারেন—ও আরো বলে। সেইটে বলুন...

[খাতা টানিয়া নিলেন]

মহিম ॥ ঐ তো হয়েছে মশাই বিপদ। একটি মাত্র
ছেলে সুরেশ—ক্রিস্টিয়ান্ট ছেলে মশাই—বেত্রীভূত
আমার লরনের ভেলের ব্যবসা দেখেছে, তা সে ছেলে
কিনা গেল যানে হঠাৎ কলেশের দারা গেল। আমার
পরে বলিয়ে গেছে মশাই। পাঁচ হাজার টাকার লাইক
ইনসিওর করেছিল। মরবার সময় নাকি বন্ধুদের বলে
গেছে আমি যেন ঐ টাকা দিয়ে রবার নিয়ে দিই।
একটা মাত্র যেন। বড় ভালবাসত মশাই। একটি ভাল
পাত্র দেখে দিন, যে আমার সুরেশের অস্ত্র পূর্ণ
করতে পারে।

প্রজাপতি ॥ আজকালকার বাজার জ্বালেন ত
মশাই। সেদিন লক্ষী নার্সারি 'অনিক কলস ফ্লাভে'
একজোড়া বলদ কিনল মশাই—দাম যোলপ টাকা।
এই তো হলো গিয়ে বাজার। তা বেশ—আপনি নাহ
টিকানা বলুন আর রেজিষ্ট্রি ফি বাবদ হশটা টাকা দিন।
যদি কিছু সুবিধা করতে পারি—তখন খবর পাবেন।
এখন আপনার বরাত আর আমার হাত বশ। নাম ?

মহিম ॥ শ্রীমহিম চন্দ্র রায়।

প্রজাপতি ॥ আপনারা ?

মহিম ॥ কারু, শান্তিলা গো

প্রজাপতি ॥ টিকানা ?

মহিম ॥ লাভ নবর গিরিবাসু লেন, বোম্বায়ে...
এই অগণনার দশ টাকা ফি। আচ্ছা, তাহলে উদি।
একটু দেখবেন মশাই। মম্বার।

[মহিমবাবুর হাত হইতে প্রজাপতি টাকা লইলেন]

প্রজাপতি ॥ দেখব বৈকি। এ আমাদের অগ্র।

একটু গরম। গাটির গোলাড় রাখবেন।

[মহিমবাবুর গ্রহণ। নবদীপবাবুর প্রবেশ।]

প্রজাপতি ॥ আহুন, আহুন নবদীপবাবু সুসংবাদ।

ওঁরা কাণ এসেছিলেন—তা নগর লাভ হাজার বিতেই
রাখী আছেন। আপনার ছেলের কপালটি সত্যিই
ভাল।

নবদীপ ॥ ছেলের কপাল ভাল কি মন্দ জানি না
মশাই। কিন্তু আমার কপাল পুড়েছে। আপনি আমি
তো এদিকে সব ঠিকঠাক করে বসে আছি। ওদিকে
খাটোছেলে আমাকে কলা দেখিয়ে রেজিষ্ট্রি অফিসে
কাজ সেয়ে কেনেছে।

প্রজাপতি ॥ লাভ ম্যারেজ !

নবদীপ ॥ লাভ ম্যারেজ।

প্রজাপতি ॥ এ—হে—হে—এত বড় পাওটা
ডমকে গেল। আপনায়ত্ত—আমায়ত্ত।

নবদীপ ॥ হাতে না ফসকাই তাই করে দিন না
নশাই। ভেলে না হয় বিরে করল না, ছেলের বাবা তো
হয়েছে।

[প্রজাপতি কিছু বলিতে উত্তত হইতেই] না, না—
গিন্নী অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন।

প্রজাপতি ॥ আপনি—সে কি মশাই।

নবদীপ ॥ চালিয়ে গিন মশাই। এ বরসে কলকাতা
নহের কত লোক বিয়েই করে নি। কিছু না হয় কমই
হিতে বলবেন। এত বড় পাওটা হাত ছাড়ি করবেন না
মশাই।

টু পারসেন্ট কমিশন না হয় বেশী নেবেন আপনি।

প্রজাপতি ॥ তাইতো বড়ই মুন্ডিল ফেললেন।
আচ্ছা দশটা টাকা বেবে যান তো—দেখি।

নবদীপ ॥ আবার টাকা? একবার তো দিয়েছি।

প্রজাপতি ॥ দে তো দিয়েছেন মশাই ভেলের ভক্ত।

নবদীপ ॥ ও বাবা—বাগের ভক্ত আবার দিতে
হবে? তা নিন,—দেখবেন মশাই একুল-ওকুল ছুঁকুল
বেন না চারাই।

প্রজাপতি ॥ [টাকাটা লইয়া] দেখি চেষ্টা করে।
তারপরে আপনার বরাত আর আমার হাতবন্দ।

[নবদীপের প্রস্থান। রমেশবাবুর প্রবেশ]

প্রজাপতি ॥ আর রমেশবাবু যে—আমুন,—আ

—বমুন, অনেক দেখলাম—কিন্তু দিনকাল যা পড়েছে
—তা আমাদের ত মশাই—পাতভাড়া ভেটোতে হয়।
আট ঘণ্টা হাজারের নীচে বরের বাপ তো কথাই কইতে
চার না। তা মশাই, তাই বলে কি বিয়ে হৈকে রয়েছে? বরের
বাপকে কদা দেখিরে এম্বার লাভ ম্যারেজ হচ্ছে।
লাভ ম্যারেজ যেনেই ঝাঁকি মশাই—চারদিকে ঝাঁকি।
কতি কি বজুন.....তা থাকবে। আর দশটা টাকা
দিন—দেব চেষ্টা করে দেখি।

রমেশ ॥ কষ্ট করে আর চেষ্টা করতে হবে না
মশাই। মনের মত পাত্র বরে বসে পেরেছি। একেই
বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ। এখন একটা দিন বেখে দিন।

প্রজাপতি ॥ বুঝলাম। তার মানে এও বরের
বাপকে কদা দেখিরে লাভ ম্যারেজ। দেখছি—খুব বেঁচে
গেছেন। বরাত—বরাত। তা প্রাবণের ১৮ই মানে
এই শুক্লবারেই দিন আছে। কিন্তু ঘোটক টোটক
বিচার.....

রমেশ ॥ রাগুন মশাই ঘোটক বিচার। এখন চার
হাত এক করে দিতে পারলেই বাঁচি—তারপরে দার
বেঘন বরাত।

প্রজাপতি ॥ বটেই তো—বটেই তো, কিন্তু আমার
দিন দেখার দিটা...

রমেশ ॥ একটা দিন বেখে দেবেন—তারও আবার
কি? এই সব পাণেই এই সব লাভ ম্যারেজ হচ্ছে
জানবেন। আচ্ছা, নবদীপ।



শিম্পের ক্ষেত্রে জনপ্রিয়তা

অচ্যুত গোস্বামী

অল্প কয়েকদিন আগে বাংলার গিনেমা আকাশে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হয়েছিল। আমি 'পাশের বাড়ী' ছাড়া হবির কথা বলছি।

হবিখানা হঠাৎ এমন অস্বাভাবিক রকমের জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল যে স্বয়ং প্রযোজকও এতখানি সাফল্য আশা করতে পেরেছিলেন কিনা সন্দেহ। অল্প খবরচার নিত্যন্ত সাধারণ পরিবেশের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক করেও জনপ্রিয়তার সাহায্যে তোলা এই হবিখানা শুধু হাজারশায়ক বলেই এত সমাদর পেয়েছে এমন অনুমান করা যায় না। তবে এ বই এর মধ্যে এমনকী ছিল যা অন-মনকে এতখানি আকৃষ্ট করতে পারল।

হবিখানি আমিও দেখেছি। কাহিনীটি কোন নিখুঁত কাহিনীকারের লেখা বলে অন্ততঃ আমার মনে হয় নি। কাহিনীকার জানেন না যে সাধারণ বাস্তব বোধের বিরুদ্ধে গিয়ে কখনো রস-সৃষ্টি হয় না। তা সে হাজারসই হোক বা অল্প কোন রসই হোক। নন আর কল্পনের ঐশ্বর্যে যে চিত্রিত একেবারেই রিফ্রেশ সে সেই কারণেই কোন প্রথম-কাহিনীর নায়ক হতে পারে না। নারকেচ চরিত্রের অনেক অসংগতিকে কেন্দ্র করে অনেক হাসির খোরাক ছোটানো চলতে পারে কিন্তু তাই বলে তাকে একেবারে নির্বোধ বলে চলে না। তা ছাড়া অভিনয়ের দিক দিয়ে বলতে পারি যাত্রাবকে হাঙ্গামার অল্প অভিনেতার যে উৎকর্ষ অক্লান্ত প্রচাণ করেছেন তা যেসে হাসি আমার বস্তুর না এগেছে তার চেয়ে হাসি পেয়েছে অনেক বেশী।

তবু একথা অস্বীকার করবার কোন উপায় নেই যে চব্বিটি নিঃসন্দেহে জনচিত্তকে জয় করেছে। আমার প্রতি সহানুভূতিশীল সমালোচকেরা হয়তো বলবেন যে কিসে কে কখন জনচিত্তকে জয় করে বলবে তা অনুমান করা ভগবানেরও অসাধ্য, কারণ সাধারণ বিচার বিবেচনার পথে তারা চলে না।

আর একটি চিত্র-নাট্যের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে। সেটা 'বরষাক্তি'। সে হবিখানাও হাজারশায়ক এবং তার কাহিনীও এই ভবিষ্যৎ মতই মনোহর যৌন কামনাকে কেন্দ্র করেই লেখা। সে হবিখানাও জনপ্রিয় হয়েছিল কিন্তু 'পাশের বাড়ী'র জনপ্রিয়তার সাঙ্গে তার তুলনা হয় না। অথচ 'বরষাক্তি'র কাহিনীকারের নিজ বোধ অনেক বেশী। এই বইএর বিভিন্ন ঘটনার সমাবেশ যদিও যথেষ্ট হাত উত্তেজিত করে তবু সেগুলো স্বাভাবিক বাস্তববোধের সীমাকে লংঘন করে নি। তার স্ফলপ অনেক বেশী খারাপো। আর বানিতকটা চরিত্র-রূপের কৃত্রিমতা আছে তার মধ্যে।

অথচ 'বরষাক্তি' বেশী জনপ্রিয় না হয়ে 'পাশের বাড়ী' বেশী জনপ্রিয় হল কোন মতো? এ কি শুধু হজুগের ব্যাপার? আর হজুগও যদি হয় তবে সে হজুগেরও কি কোন নিয়ম কানুন নেই।

গিনেমার রাজ্যে তেড়ে এবার সাহিত্যের রাজ্যে আসা যাক। সাধারণ পাঠকেরা ভিটেকটিক উপভোগ পড়তে খুব ভালবাসেন এ কথা সবাই জানেন। কিন্তু নশ্বর হস্তের যোহন সিরিজের বইগুলোর মধ্যে এমন কি আছে যত্নম তো বার কত ভিটেকটিক বই এর ক্ষেত্রে বাংলা দেশে তাঁর স্থান এখনও আর অপ্রতিদ্বন্দ্বী বললেও চলে। তাঁর ভাষা সেকেলে, তাঁর স্ফলপ চ্যতুর্ভুজিত, তাঁর ঘটনা সূত্রের মধ্যেও নিচক হঠকাহিতা ছাড়া হৃদয় বৃদ্ধির প্রতিবোধগিতা খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়। তবু তো যোহন সিরিজের বই পুরো একটা তাকে জড়িত করে থাকিয়ে না রাখলে কোন লাইব্রেরীই চলতে পারে না।

এ বইগুলোর সঙ্গে তুলনার নীহার অন্তের ভিটেকটিক বইগুলো অনেক বেশী উচ্চাঙ্গের। তাঁর ভাষা স্নাতক, তাঁর স্ফলপ গভীর তৎপর-পূর্ণ, তাঁর ঘটনা সূত্রে অল্প-সল্প করে আমরা বসম যেখ সমাধানে এসে পৌঁছি, তখন তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সেই আবিষ্কারকে আমরা অভিনন্দন-

না জানিয়ে পারি না। তবু আমার আশংকা জনপ্রিয়তা সন্দেহে বোহন সিবিয়ের মত অত চাহিদা তাঁর বই এর এখনো হয় নি।

তবু ডিটেকটিভ বই-এর ক্ষেত্রেই নয়, সাহিত্যের অন্তর্বিভাগেও এক একখানে বই চুটাই এমন অবাধ্যবিক বকয়ের জনপ্রিয় হয়ে পড়ে যে তার কারণ বৃত্তিতে গিয়ে সমালোচকেরা দিশাহারা হয়ে পড়েন। এটি একখানে বই 'বায়ারের দৃষ্টিপাত'। অনেক বলেন বইখানার প্রধান আকর্ষণ তার অত্যন্ত ধারালো এবং সুনির্ভর ভাষা। আবার অনেক বলেন, জনপ্রিয়তার আসল কারণ নাকি নাহে প্রবন্ধের বই হলোও বই-এর মধ্যে যে একটি চমৎকার রোমাঞ্চের মিলি কাহিনী আছে বাঙালী পাঠকের রোমাঞ্চপ্রিয় মনে তাই এতটা লাড়া ভাগ্যতে পেয়েছে। না হলে এ বই এ লেখকের আন্তরিকতা চাড়া আর কোন কিছুই প্রকাশ হয় নি। যে বই এ দিল্লীর সমাজ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেখক শুধু ধারালো ভাষার তাঁর তেঁতীতা চিত্রাধারাই পরিচর দিতে পেরেছেন, এবং পরিশেষে যে বই এ কোন মনের সংগে কোন মন নিশিরে এবং তার সংগে কোন জিনিষ পাক করলে সব চেয়ে ভাল কন্টোল হয় এ ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সে বই-এর অকস্মাৎ এত জনপ্রিয় হওয়াটা আতর্বিজনক বই কি! এই বই-এর চেয়ে রাননাথ বিশ্বাসের কোন কোন প্রথম কাহিনীর বই-এ যে সমাজ বিশ্লেষণের পরিচর পাওয়া যায় তা অনেক বেশী স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ, নির্বৃত্ত, এবং লেখকের একটা সবল দৃষ্টিকোণ আশ্রয় বহন করে। কিন্তু রাননাথ বাবু এতদিন ধরে লিখেও জনপ্রিয়তার দৃষ্টিপাতের চেয়ে অনেক পিছনে পড়ে আছেন।

উদাহরণের সংখ্যা আর বাড়ির লাভ নেই। বোটের উপর এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে সমালোচকের দৃষ্টিতে যে শিল্পরত্ন স্টেটসম্যান দাবী করে তা যে জনসাধারণের কাছেও ভাল লাগবে এ কথা একেবারেই ছোঁর করে বলা যায় না। আবার কোন

শিল্পরত্নকে যে জনসাধারণ অত্যন্ত আগ্রহের সংগে গ্রহণ করবে তা ভবিষ্যদ্বাণী করা অসাধ্য বসিমা না হয় তো দুসোধ্য যে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। জনসাধারণের এ ধামধেমালীপন্যর কারণ কি তা একটু আঙুলি সরুসন্ধান করে দেখা বোধ করি খুব অসংগত নয়।

সিনেমার একটি উদাহরণ দিয়ে এসংগত। শুরু করে- ছিলাম, তার কারণ জনপ্রিয়তা জিনিষটা প্রযোজকদের কাছে সবচেয়ে প্রয়োজনীয়। একখানে ছবিতে তাঁদের অনেক টাকা বিনিয়োগ করতে হয়, কাজেই ছবিখানা জনপ্রিয় নাও হতে পারে এ দুঁকি নিয়ে তাঁরা কোন ছবিতে হাত দিতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে জনপ্রিয়তার ব্যাপারে প্রযোজকদের খুব একটা বৈজ্ঞানিক অহুসীলন আছে এ কথা বলে বললে ভুল হবে। একটা কথা তাঁরা সাধারণতঃ ঘরে বসে থাকেন যে সাধারণ লোক সারাদিনের স্রাবির পর সিনেমাগৃহে আসে খানিকটা আনন্দ পেতে, জীবনের অপরিবৃষ্ট হাসনা কাশনাগুলোর খানিকটা কল্পনিক চরিতার্থতার বোঝে। কাজেই কিছু কিছু বৌন আবেগন বহল নাচ গান রোমাঞ্চ এ সব যেখানে ছবিতে দিতেই হবে। কিন্তু তবু এ সব দিয়েও যখন কোন কোন ছবি দর্শকদের ব্যাপকভাবে আকর্ষণ করতে পারে না তখন প্রযোজকরা চিন্তিত হয়ে পড়েন। তখন তাঁরা বাজারের হাসচাল বুকতে চেষ্টা করেন। যখন দেখেন বাজারে দেশপ্রেমের খুব হুজুগ চলছে, তাঁরা রোমাঞ্চের কাহিনীর মধ্যে খানিকটা দেশপ্রেম জুড়ে দেন। যখন দেখেন, কেমন আশকাল হামেশা হচ্ছে, বাজারে বনিক বিশেষটা প্রবল, তখন রোমাঞ্চের কাহিনীতে তাঁরা পরিচর অন্তর্বিভাগ গামতরা কথা জুড়ে দেন।

কাজেই জনপ্রিয়তার প্রাপ্ত প্রযোজকদের কাছে থেকে খুব বেশী আলোচনাপাতের আশা করা বুঝা। সে চেষ্টা নিজেদেরই করতে হবে। উপরের উদাহরণগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যাক কোন মত পাওয়া যায় কিনা।

'পাশের বাড়ী' আর 'বরষাজী' এই দুখানি ছবি

মধ্যে 'পাশের বাড়ী'তে ঘটনা ও চরিত্রের অসংগতি বস স্পষ্টরূপে বাহ্যত করেছে। দুখানি বইএরই মূল কথা অতৃপ্ত বোন বাসনার চরিতার্থতা গোঁবা। কিন্তু 'বরবাড়ী' বইতে এই বোঝাখুড়ির অস্ত্র কাহিনীকার যে সব পরিবেশের মধ্যে আশাদের নিয়ে যেতেন তার সবগুলিই আমাদের পুরোণো সমাজের অতি পরিচিত, অতি রাস্তাব কতকগুলো হাতকর ঘটনা, যেমন বরবাড়ীদের বাসর ঘরে উঁকি দিতে যাওয়া, যে কোন একটি চলনসই মেরেকে ধ্বংসে পাওয়ার ব্যাকুলতা এবং সেজন্য দগ্ন পরিচয়ের কদে দেখতে যাওয়া ইত্যাদি। আশরা আজও বহুলাংশে এই সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে বাস করছি বলে, কিন্তু কখন যে নতুনতর সামাজিক চিন্তাধারা আমাদের বর্তমানের এই ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ করে তুলেছে তা হয়তো আশরা নিজেরাও জানি না। কাজেই 'পাশের বাড়ীতে' বসন দেখা যায়, নারক একটি সুনির্দিষ্ট মেরে নির্বাচন করে বসে আছে, এবং নায়িকাও দু'তিনজন পানিশ্রাবীর মধ্যে একজনকে নির্বাচন করার স্বাধীন অধিকার ভোগ করছে, তখন জনসাধারণ স্বভাবতঃই এই অধিকতার গণতান্ত্রিক কাহিনীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হচ্ছে।

সাধারণ মানুষের যা কিছু জ্ঞান যা কিছু বিচার বিবেচনা, সবই আসে কর্ণ ও অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে। তাদের উপভোগের বস্তুকেও গেতে হয় শ্রমের মিনিমরে। সেইজন্যই লোকে সাহিত্যেও কর্ণবহুল বা ঘটনা বহুল কাহিনী ভালবাসে, বিশেষ করে সে কর্ণের পিছনে যদি চাতুর্য, বুদ্ধি, দক্ষতা ও শক্তির পরিচয় থাকে। সেইজন্যই কোন উচ্চতর আবেগন ছাড়াও ডিটেকটিভ বই জনসাধারণের এত প্রিয়। কিন্তু এই শ্রেণীর বইএর মধ্যে মোহন সিরিজের অনেক জটিল সমস্যাও অধিকতর জনপ্রিয়তার একটি সহজ কারণ আবিষ্কার করা যায়। আজকের সমাজে ধনী আর গরীবের মধ্যে ব্যবধানটা এত বিরাট হয়ে উঠেছে যে ধনীদের বিরুদ্ধে একটা ব্যাপক তৃণা আছে, বিশেষ করে সেই ধনী যদি আবার অস্ত্রায় ভাবে

ধন উপার্জন করে থাকেন। সেইসব ধনীদের থেকে ধন কেড়ে নিয়ে সেই ধনের দ্বন্দ্ব বসন্ত সকলেরই মনের কথা, আর সেই কাঙ্ক্ষা মোহন করেছে বলেই মোহন সিরিজ এত জনপ্রিয়।

অবিস্ত্রি 'পাশের বাড়ী' বা মোহন সিরিজে যে সমাজ চেননার পরিচয় আছে তা অতি সিরম্বরের কিন্তু সমাজাতীর অস্ত্র বই বা ভবিষ্যৎ তুলনার এইগুলোতে যেটুকু সমাজ চেননার আভাস পাওয়া যায় তাই গণচিত্তকে আকর্ষণ করেছিল।

হামনাথ বিশ্বাস বাবাবরের বস্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেন নি তার কারণ তিনি সত্যিই ব্রহ্ম-কাহিনী লিখেছেন, তাঁর পেয়ার সমাজ সচেতনতার প্রকাশ থাকলেও অনেক ক্রান্তিকর বিশ্লেষণ ও তথ্যের ভিত্তর দিয়ে তিনি তাঁর শিষ্টান্তে পৌঁছেছেন। আর বাবাবর ব্রহ্ম-কাহিনীকে উপলব্ধ করে অভ্যন্তর চটকতার ভাবার রাজধানীর সমাজের আপাততঃই কিন্তু তাৎপর্যহীন সমালোচনা করেছেন, আর বর্তমান সমাজের উপর বিরূপ আধুনিক পাঠক তো সমালোচনাই চায়। আর একটি সম্পূর্ণ কারনিক শ্রবণ রোমান্সের কাহিনী, অসম্ভব হলেও, যে তার কাজ করেছে তা বলাই বাহুল্য।

তা হলে কি আশরা এই শিষ্টান্তে আসতে পারি যে জনসাধারণ চায় সহজ এবং সুবর্ণা অথচ চাতুর্যপূর্ণ বা অমকালো ভাষা। কর্মবহুল কাহিনী, জীবনের অতৃপ্ত কামনা বাসনার কারনিক চরিতার্থতা এবং এসবের সংগে ধানিকটা সামাজিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত বা সমাজ চেননার স্বীকৃতি ?

আর একপাঙলি কিন্তু মোটেই নতুন নয়। আজ কালকার অধিকাংশ ডাইনের এবং বায়ের লেখকরাই এ ক্ষমত্বা জানেন। সেইজন্যই আজকাল অনেক শিল্প-সর্ব্ব লেখকরাও, অর্থাৎ বাঁদা কাঁপন্তঃ সমাজের স্থিতি-স্থাপকতার পক্ষপাতী, জনপ্রিয়তার সোঁতে মাঝে মাঝে সমাজ সমালোচনা করে অনেক সময়ে সামাজিক পরি-

বর্ষের ইংগিতও দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে অনেক বানশয়ী, বাঘের ভীষন গুহু বড় বড় তথাপূর্ণ বই পড়েই কেটেছে, বাস্তব ভীষনের সংগে বাঘের সম্পর্ক শিথিল, জীরাও বই-এ পূজা বাস্তবিক জৈনসংগ্রামকে অবলম্বন করে কোন কাহিনী লেখার সময় মনে রাখেন যে জন-সাধারণ সাহিত্য পড়ে উপভোগের ভক্ত। কাজেই কিছু কিছু জী-চরিত্র এবং কিছু কিছু রোমাঞ্চ কাহিনীটির মধ্যে হিঙেই হবে। এই ধরনের সুবিধাবাদীদের মধ্যে সাধারণতঃ দক্ষিণেশ্বরীরাই সাকল্য অর্জন করে থাকেন বেশী। কারণ এ বিজ্ঞানীর চর্চা তাদের অনেক দিনের, অভিজ্ঞতা প্রচুর।

জনপ্রিয়তার উপরি উক্ত দুটো কিছু তাই বল মিথ্যা নয়। কিন্তু সেটা মিথ্যা হবে দাঁড়ায় যখন আমরা ভিন্ন ভিন্ন লোকে আলাদা আলাদা করে চিন্তাক্রিয়া বাস্তব ভীষনে যেমন এতলোকে আলাদা আলাদা করে নেওয়া যায় না, সবগুলো অভ্যাসভিত্তিক ঠেলাঠেলি করে থাকে, সাহিত্যকেও

তেতিভাবে গ্রহণ করতে হবে। যেমন শারাদিনের বাড়তাল। খাটুনিকে বাদ দিয়ে রাজের আহার্য উপভোগের কথা কল্পনা করা যায় না, যেমন খ্রী-পুত্রের জরণ-পোষণের নিম্নাযাতক চুক্তিতা। চাড়া খ্রী-সন্তোষের কথা ভাবা যায় না, এ-ও অনেকটা তাই। একজন লোক স্বাধীনতার ভক্ত সংগ্রাম করছেন, আবার তিনি প্রেমের পড়ছেন, একটা কাজ আর একটা কাজে ব্যাঘাত করছে, এল দ্বন্দ্ব; তার থেকে ছুটো কাজেরই প্রকৃতির কিছু কিছু রূপান্তর হতে শুরু করে। আর তারই ফলে সংশোধন হয়তো একটা উন্নততর কর্মের জন্ম হয়। কিন্তু এইভাবে উদাহরণ দিয়েও আমি ঠিক স্মরণটাকে বোঝাতে পারি না, যদি পারতাম তো আমিই সেই প্রগতিশীল লেখক হতে পারতাম, যাঁর আবির্ভাবে আশ্বকের সব সুবিধাবাদীর মল লক্ষ্যের মুখ লুপ্ত, আর যাঁর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার সংগে এই সুবিধাবাদীদের জনপ্রিয়তার কোন তুলনাই হবে না।

ছাত্রাশ্রম

মেঘনাস পাঠক

কাল ললিতা আসছে। কাল সকালে, হাতের পাইগে টান দিতে দিতে চললেন প্রমোদ মায়া। বিকেলে যদি দফা করে একবার আসেন আমার ওখানে ভালো হয়। আলাপ করিসে দেব। আর সত্যি কথা বলতে কি আপনি এখানে আসছেন বলেই শুঁকে এসবের নিয়ে এসাম। আপনায় সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে হয়তো অনেকটা আনন্দটা থাকবে। আমি কাঠগোড়া লোক, সংসার আর লোহালকড় ছাড়া অন্য কোন বিষয়েই তো কথা বলতে পারিনা। অথচ ওর পক্ষে এমন সেইটাই প্রয়োজন। আপনি আসবেন কিছ। মিসেসকেও নিয়ে আসবেন।

আসব, নিশ্চয়ই আসব। অতকরে বলতে হবে কেন? সুশোভন বিব্রত বোধ করল। আচ্ছা তাহলে এখন বাই, একটু বেতোতে হবে। মোটের ওঠে ঠাট্টার টিপলেন প্রমোদ মায়া। সুশোভন বাড়ীর বিকে পা বাড়াল।

আশ্বক লোক এই প্রমোদ মায়া, সুশোভন ভাবছিল। কি এক অদ্ভুত আকর্ষণ আছে ওর। সুশোভন যে এখানে, তার খ্রী মাধবীর অপচয় এই না শহর অকলে, অরণ্য। কিনে বাড়ী করল তার কারণও প্রমোদ মায়া। মানে, তাঁর বাড়ী। লক্ষ্য বস। অথচ তাই দিয়েই বাড়ী করতে হবে। বাবা হয়েই তাই



ବିରାଟୀ

শহর কলকাতার বাইরে আসতে হয়েছিল। শহর-
তলীতে। কিন্তু আশ্চর্য্যে ভালো আয়গা ছিল।
ইসেক্ট্রিক লাইট আর ভলক্লগরাদা মিউনিসি-
প্যালিটির চৌহদ্দি।

তারই কোন আয়গায়ে হরতো দু'তিন কাঠা আয়গা
কিনত সুশোভন। কিন্তু মুখিল করল প্রবোধ সাহায়ে
বাড়ী। বাসালের সঙ্গে আয়গা বেধতে এগে ওই বাড়ী
দেখে মন ভুলল সুশোভনের। জল কাঠায় পিছল কাঁচা
হাতায় কাগড় বাঁচিয়ে পথ চলতে চলতে মোড়ে এগে
হঠাৎ পলক ঝাড়িয়েছিল। বাঁকের মুখে ছোট্ট বাড়ীটির
থেকে কিছুকণ আর চোখ ফিরিয়ে নিতে পারে নি।
মনে হয়েছিল সবুজ স্ক্রেনে বাঁধান কংক্রীটের একপানা
ছবি। বাড়ী যে এত সুন্দর হয়, তুলিতে আঁকা ছবির
মত, এক মুহূর্ত আগেও সে কথা ভাবতে পারত না
সুশোভন। ছবি দেখা এককালে দেখা ছিল সুশোভনের।
ইদানীং অধ্যাপনা আর টাইশান তার সব সময় কেড়ে
নিলেও ওই নেপাটাকে জম্ব করতে পারে নি। মাঝে
মাঝে কেমন বোড়াভাঙে মাথা ঝাঁকানি দেয়। আজ
এখন জল কাঠায় কাঁচা হাতায় কাগড় বাঁচিয়ে পথ চলতে
চলতেও সেই নেপাটা অব্যাহত পেয়ে বসল। সন্দের
মাশাল একটু এগিয়ে গিয়েছিল। পিছনে তাকিয়ে বসল,
কী হলো, কাঁদার না গড়ল মাকি? তা এই আর ক'টা
দিন। মিউনিসিপ্যালিটি এ আয়গা নিয়ে নিল বলে।
তখন একবারে পৌঁচ ঢালা হয়ে যাবে।

সুশোভন অন্তরমন্ড ভাবেই উত্তর করল হ। কিন্তু
স্বানোমাহায়া আর বর্ণনা করতে হলো না দালালকে।
সুশোভন একেবারে বারনা করে বাড়ী ফিরল।

জী বাব্বী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, শেকি, একেবারে
বারনা করে এলে। আমাকে একবার দেখালে কতট
কি ছিল তনি?

পন্ডির পরিমাণটা মনে মনেই হিসেব করল সুশোভন।
বাইরে বসল, না, কিনতে যখন হবে—কিনে ফেলাই
তালো। সুবি একবার অবসর সময়ে দেখে এলেই হবে।

আয়গাটা শহর না হলেও ভাল। নীলগিরিই মিউনিসি-
প্যালিটি নিয়ে নেবে।

বলা বাহুল্য আয়গা বেধে দুখ তার হয়েছিল বাব্বীর।
বলেছিল, তা একেবারে সুন্দরমনে গেলেই হতো।
বাগপ্রহর বিকে এগিয়ে থাকা যেত ছুপা।

সুশোভন উত্তর দেয় নি। কী বলত? ওই বাড়ীর
কথা! আরও অনর্থ করতে মাথো। তার চেয়ে এই
তালো। এই যেন।

বাড়ী যখন করতেই হবে, তাকাতাড়িই তালো।
সুশোভনের আর তার নইছিল না। প্রের বাস থেকেই
কাজ শুরু হলো।

বিকেল বেলা কলেজ ফেরত একবার ডানারক করে
যেত কাঠের আর অব্যাহত চোখে তাকিয়ে থাকত ওই
আশ্চর্য বাড়ীটার দিকে। কেমন যেন নিশ্রাণ ও নিরানন্দ।
কারা থাকে ও বাড়ীতে। মিস্ত্রীদের কাছে ভিজ্যাস
করেছিল সুশোভন। ওরা বলেছে ইঞ্জিনের লাইন
অব্যাহত এতদিনের মধ্যে একবার দেখা হলো না ডান-
লোককে।

সুশোভনের কোকুৎস মিটল।

গাড়িয়ে গাড়িয়ে বাড়ী তৈরী করারক করছিল,
চোখ ছিল বোড়ের সেই ছবিটির ওপর। পিছন থেকে
কে বলল, নমস্কার, আপনিই সুশোভনবাবু?

চব্বকে পিছন ফিরল সুশোভন। কালো, বেঁটে মত
ডানলোক। মাথায় ক্রেট হ্যাট, পরনে হাক গ্যাট আর
শোটিং গেলি। দূর কর লস্টাটনগের।

সুশোভন বিস্মিত হলো। বলল, হ্যাঁ আমি। কিন্তু
আপনি—

আমার নাম প্রবোধ সাহায়ে। ওই বোড়ের বাড়ীটা
আমার।

কিন্তু আমার নাম—

বাহে, সুশোভনের দুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে
বললেন প্রবোধ সাহায়ে, অতিবেশীর নামটাও জানতে
পারব না, তাহলে আর পাশাপাশি থাকা কেন?

হো হো করে বেলে উঠলেন প্রবোধ সান্যাল। এটা আর এমন কি কপিন কাছ হবাই। অধ্যাপনা করেন, এই শান্তিতে আর না হলে হুপটি ছাড় আছে আপনার। ভয়টি ভাবের কাছ থেকেই সংগ্রহ করছি।

সেই প্রবণ আলাপ। তারপর নিজের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে চা পাতারলেন প্রশোভনকে। চায়ের টেবিলে আলাপ দীর্ঘতর হলো।

কথার কথার ভিজালা করলেন প্রবোধ সান্যাল, বাড়ী বে কনট্রাস্টকে ছেড়ে দিতেছেন, খরচ সাবলীমতে পারবেন? চোর বুঝাই, এক একটি নিম্নে চোর। আমি নিজে বিন্ধ্যী, কোম্পানীর টিকেটারকে দিয়ে সব করিয়েছি; তবু কি কম দেয়ছে শুভা বনে করেন?

কিন্তু কী করব বসুন, নিজের আবার অভিজ্ঞতাও নেই এসব বিষয়ে। তাছাড়া সময়ই বা কোথায়? বাধ্য হয়েই তাই গুনের গুণ সব ছেড়ে দিতে হয়। প্রশোভন আর জুড়িয়ে আগা চায়ের কাপে চুমুক দিল।

কিছু খাবড়াবেন না, প্রবোধ সান্যালের মুখে অন্তঃ-বাসী উচ্ছ্বাসিত হলো। আমি রয়েছি কী করতে। সত্যিকার সেবি একমুঠো বালি। পনের বছর এই কাছ করে আসছি হুপাই। সব ঠাণ্ডা করে দেব।

প্রশোভন আগন্তিক করেছিল। না না, আপনি কেন আবার অনর্থক বসে করবেন?

কই বানে, উজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিলেন প্রবোধ সান্যাল। নিরীহ পেরে ব্যাটার। আপনাকে ঠকাবে আর প্রতিবেদী হয়ে তামি তা চেয়ে দেখব। সাহচর্যনিমিত্ত। পাইপের গুণে মল্লর বেশলাইএর কাঠি চেপে বেরিয়েছেন ইংলিয়ার।

তারপর থেকে আর বাড়ী নিয়ে যাবা বাবাতে হয়নি প্রশোভনকে। সব কিছু তার বেজার নিজের কাছ তুলে নিয়েছিলেন বিঃ সান্যাল। কৃতজ্ঞতার রক্তে হাত পা বেঁধে কেদলেন প্রশোভনের।

তারপর বাড়ী শেব হলো। ভালো একটা দিন বেধে ছেলেবেলায়ই আর বাড়ীকে নিয়ে নতুন বাড়ীতে

উঠেও এলো প্রশোভন। পরিচয় খনিষ্ঠ হলো প্রবোধ সান্যালের সঙ্গে, তার পারিবারিক সব কথাও জানল প্রশোভন। সান্যালের স্ত্রী ললিতা বসন্ত ভূগড়ে হ' সাত বছর। কখনও একটু ভালো থাকে, কখনও খারাপ। এ-স্যানিটারিয়াম থেকে সে-স্যানিটারিয়াম ক্রীড়াকালে কাশিমাং তো শীতের কড়াবাটুর। এই করেই কেটেছে সাত বছর। ছেলেবেলায় ছুটি কনভেন্টে পড়ে। ছুটিতে এসে থাকে বিদ্যাবার কাছে।

আমার কথা না বর ছেড়েই দিন, বলেছেন বিঃ সান্যাল, ছেলেবেলায় দুটোর কথা তাকলে বড় হুং হুং। কতটুকু পেলেও গুণার বার কাছ থেকে। ললিতার মত বা। আমার কথাই বসুন, এ বাড়ীতে একা থাকতে কি আমায়ই বন টেকে। আমি তো যে কোন হোটেল গিয়েও থাকতে পারি। ললিতার কাজেই তো বাড়ী করলাম। পহরের হৈ চৈ ভালো লাগে না গুণ। একটু নিবিবিলি থাকতেই ভালবাসে। তাইতো এই জনমানব-মুখ্য আরগার বাড়ী করলাম। আরগাটা অবশ্য বাবাই কিনে রেখেছিলেন। বানিকম্প চুল করে পাইপ টানলেন বিঃ সান্যাল। তারপর এক সময় নিঃশব্দ কেলে বললেন, অথচ কোন দিন যে এখানে এসে থাকতে পারবে এখন ভরসাও ডাকারহা দিতে পারছেন কই? এক এক সময় তামি কি জানেন, যদি আমি ইঞ্জিনীরর না হয়ে ডাক্তার হতাম ললিতার চিকিৎসাটা নিজের হাতেই করতে পারতাম। রোগটার সাথে একবার বোকাখিলা হতো। নিজেকে এত অবহাং বনে করতাম না।

কোন দিন হয়তো প্রশোভনের গর বেলে চা খেতে খেতেই কথা হয়েছে। হুঁ চাবখানা ভালো ছবির প্রিন্ট ছিল প্রশোভনের ঘরে। হুঁ একখানা ওরিয়েন্টাল। পাইপে ঘোঁরা হাড়তে হাড়তে বলেছেন প্রবোধ সান্যাল, আচ্ছা ছবির মধ্যে কি এমন হল পান আপনার। বসুন তো? ললিতাকেও দেখেছি এমনি। আপনারাওর দুজনে মিলবে ভালো। আপনার কথা সবই নিবেছি শুকে।

ললিতার যেদিন আসবার কথা তার সাত দিন আগের থেকেই বাড়ী নিয়ে উঠে পড়ে লাগলেন মিঃ সায়্যাল। কেবল লজা আসলনার শেষ রেখাটি টানবার আগেই না সূর্য্য ঠাঁকুর সময় হয়ে গেছে বলে গুমোর বসে পড়েন। এটা টানেন ওটা সরান। একভাবে সাকানো লোকা সেটি ঘুরিয়ে আর একভাবে সাকান। আর বন বন ডাক পড়ে সুশোভন আর বাবীর।

সকাল নটা নাগাদ ললিতা এলো। বিকেলে ওরা বাবার আগেই মিঃ সায়্যাল এসে গল্পের নিয়ে গেলেন।

ইমিডেগারে গুরে একখানা বইএর পাচা ওটা ছিল ললিতা। একরাশ চুল শিঠের নীচে খুঁপ করা। রং এককালে হরতো উজ্জল ভাষা ছিল, এখন কেমন বিবর্ণ। মাঝারি ছোটো চোখের গভীরতার স্রাভ সমাহিতি।

সুশোভনরা ঘরে যেতেই চোখ তুলে তাকালেন।

এই যে ইনিই মিঃ সুশোভন যেন আর ইনি বাবী সেন। ওঁর স্ত্রী। এদের কথাই বলছিলেন তোমাকে।

এসার হাসিতে তারের অন্তর্ধান করল ললিতা। আপনাতের ছদ্মনের কথা এত ভনেছি যে স্বাস্থ্যের দেখা হলোও বোধহয় চিনে নিতে পারতাম। একি ধাঁড়ির রইলেন কেন? বহুন। চেয়ার ছুটো ঠেদের এগিরে দাঙ না।

পাক।

এনোব সায়্যালকে বাড়িয়ে দিয়ে ছদ্মনে ছুটো চেয়ার নিয়ে বলল।

আপনি তো এখন সম্পূর্ণ সুস্থ। ভালোই হয়ে আর এ বাড়ী ছেড়ে যেতে হবে না। এবার আর এনোব বাবুর কোন কোড থাকবে না।

কোড। বুদ্ধ একটা নিঃশ্বাস ফেলল ললিতা, সুশোভনের চোখ এড়াল না। কে জানে, ডাক্তারদের কথার আবার আর বিশ্বাস নেই। ওদের তো দেখছি এতদিন ধরে। তবে কিরে আর আমি বাব না। ওরা বললেও না। স্রাভ গলাধ কথা শেষ করল ললিতা।

না, না কিরে আর তোমাকে যেতে হবে না। দেখনা

যেটুকু হুঁপলতা আছে ছদ্মনেই গেরে যাবে। কী মেথকার আরগাটা বেথহো? তার ওপর সুশোভন বাবুরা করেছেন। আর একটু সুস্থ বোধ করলেই একটু একটু করে ছবি আঁকতে আরম্ভ কর। সুশোভন বাবু এবিষয়ে তোমাকে অনেক সাহায্য করতে পারবেন। কথা শেষ করে সুশোভনের দিকে তাকালেন মিঃ সায়্যাল।

সুশোভন লজ্জা পেল। বলল, না না কিবে বলেন। আমি ঠিক কী সাহায্য করব। একবারে দেখে ছাড়া। ইহুলে নীচের ক্রাশে একটা বিষয়ে বরাবর ফেল করে এসছি, সে হলো ডুইং।

স্বাস্থ্য হুঁপেই হাসি ফুটল।

আর কিছুকণ পরপর করবার পরই সুশোভনের ডাক এলো। একটি ছাত্র এসে বলে আছে কি দরকারে। সুশোভনের সঙ্গে বাবীও উঠল।

ললিতা বলল, আবার আসবেন কিছ।

হ্যাঁ, হ্যাঁ নিশ্চয়ই।

পরের দিনও বিকেলে এলো সুশোভন। একা। বাবী ছুপুরে একবার এসে ঘুরে গেছে। বিকেলে আর আসতে পারল না।

মিঃ সায়্যাল তখনও আসেন নি।

চেয়ার পেতে বলল ছদ্মনে।

—বাড়ী আপনাদের কেমন লেগেছে মিলেস সায়্যাল? সুশোভন জিজ্ঞাসু চোখে তাকাল ললিতার দিকে।

ভালো। ললিতার ছোট উত্তর।

সত্যি, আমি তো ভেবেই পাই না এত সুস্থক বাড়ী কী করে তৈরী করা যায়। যেন লম্বক জেমে বাঁধান কজৌটের ছবি। মিঃ সায়্যাল নিম্নে কলেন লোহা-লকরের মিত্রী, অথচ শিল্পী না হলে এবাড়ী তৈরী করা কী করে সম্ভব হয় বহুন তো? ললিতার টোটে বুদ্ধ হাসি ভেঙ্গে উঠল।

এখানে তো আমাকে এই বাড়ীই টেনে এনেছে। তখন অবশ্য জানতাম না যে বাড়ীর চেহারা বড় আকর্ষণ

তার শিল্পী মিঃ সাম্রাণ। সুশোভন তাঁর প্রথমদিনের সেই অভিজ্ঞতার কথা বলল ললিতাকে। ললিতা কিছু বলল না। কেমন উদাস চোখে তাকিয়ে রইল সুশোভনের দিকে। সুশোভনের মনে হলো ললিতা কিছু শুনেছে না।

—আপনার কি কোন অশ্রুবিধে হচ্ছে মিসেস সাম্রাণ ?

—না, না আমি তো আপনার কথা শুনছিলাম। এরকম খেয়ালের কথা খুব কমই শুনেছি। কিন্তু আপনার ক্রীত তাকেই সার ছিলেন ?

সুশোভন একটু চুপ করে রইল। বুখে একটু অসহ-
স্তের হাসি টেনে বলল, একখাটা মাথাকে আজও বলা
হয় নি।

কি দুয়ল ললিতা কে জানে। কোন কথা বলল না।
সত্যার মোটরের দল শোনা গেল। একটু পরেই গেট
দিয়ে গাড়ী নিয়ে ভিতরে ঢুকলেন মিঃ সাম্রাণ।
সাম্রাণের সঙ্গে দেখা করেই সেদিন উঠল সুশোভন।

ললিতা বলল, বড় ভালো কাটল বিকেলটা। কাল
আবার আসবেন কিন্তু।

হ্যাঁ, সুশোভন ঠাণ্ডা।

এবার থেকে ললিতার কাছে বিকেলে একবার
হাজিরা দেওয়া নিত্যনৈমিত্তিক কাজ হয়ে ঠাণ্ডাল
সুশোভনের। কোনদিন মাথাকে নিয়ে, কোনদিন
একা। একথা থেকে লেখা। লেখা থেকে ছবিতে
এসে পৌঁছেবেই। কতদিন ছবি দেখিনি ললিতা। মিঃ
সাম্রাণ অল্প মাঝে মাঝে এল্লিবিশন থেকে ছ একখানা
করে ছবি ওকে কিনে পাঠাতেন। কিন্তু তাকে কি হয়।
এমোদ বাবু ছবি কিনেছেন অল্পের চোখে দেখে।
আর তাইবা কখনো কেনা যায় ?

সুশোভন বলল, আচ্ছা এখন তো আপনি সুস্থ।
এবার আমি নিয়ে বাব ফাইন আর্ট এল্লিবিশনে।
কেমন ? কিন্তু তার আগে ত্যাভাভাডি এই দুবলভাটুকু
করে ফেলুন তো।

হঁ। আপনারা দুজনে নিলে তাহলে এবার আসাকে
সুস্থ করে তুলবেই মনে হচ্ছে।

—ভ্যানভো কি ?

আলাপে আলাপে এই দিন গনেরতেই সহজ একটা
অস্বস্ততা গড়ে উঠেছে দুজনের মধ্যে।

সপ্তাহ ধানেক পরে সুশোভন একদিন হাসিমুখে
এলো। চলুন মিসেস সাম্রাণ কাল আপনাকে একজন
নতুন আর্টিস্টের এল্লিবিশন দেখিয়ে নিয়ে আসি। এঁর
ছবি এই প্রথম এদেশে দেখান হচ্ছে। এর আগে ফ্রান্স
আর ইটালিতে উচ্চসিত প্রশংসা হয়েছিল এঁর ছবির।

ললিতা ডেকচোরের তব্বিহিল। হাতে গর দিয়ে
বসল। চোখ ছুটো উজ্জল হলো। বলল, আপনি
নিকে বেখেছেন ?

হ্যাঁ, সেই জন্মেই তো সাহস করে আপনাকেও নিয়ে
যেতে পারছি। সেখা খুদী হবেন।

কী নাম ? ললিতা ভীত চোখে তাকাল।

এবীয় সোম। এতদিন কটিনেটেই ছিলেন। এই
প্রথম কিয়লেন দেশে। শুনেছেন গর নাম আগে ?
আমি খবরের কাগজে দেখছি আগে গর ছবির সমা-
লোচনা। কিন্তু ললিতা ভতকণ আবার গুরে পড়েছে।
চোখের দুটো উজ্জল দীপ কে বেন হুঁ দিয়ে নিভিয়ে
ছিল।

সুশোভন ব্যস্ত হয়ে উঠল। বলল, আপনি কি
অল্পই বোধ করছেন মিসেস সাম্রাণ ?

বাইরে তখন ছ একটোটা বৃষ্টিও পড়ছে। সুশোভন
বলল, চলুন ঘরে গিয়ে বসি। এখানে ঠাণ্ডা লাগবে।

সুশোভনের হাত ধরে ঘরে এলো ললিতা। ডকে
খাটে শুইয়ে গিরে পাশেই একটা চেয়ার টেনে সুশোভন
বসল। আর চেয়ারের বসতেই চোখ পড়ল দেয়ালে
টানান একখানা ছবির ওপর। চেয়ার হেড়ে উঠে
ঠাণ্ডাল সুশোভন। এগিয়ে গেল দেয়ালের দিকে বেখানে
ছবিখানা টানান আছে, একপুটে তাকিয়ে রইল ছবি-
খানার দিকে। কী আশ্চর্য ! নিজের মনেই বলল কথাটা।

কী হলো আপনার ? উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল
ললিতা।

—না কিছু না। কিন্তু কী আশ্চর্য এ চবি আমি কোথায় দেখছি বলুন তো? দেখেছি নিশ্চয়, কিন্তু কোথায় সেকথাটা? কিছুতেই মনে করতে পারছি না। এ ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

কিন্তু এ চবি তো কোথাও প্রিট হর নি। কোন এগজিভিশানেও দেখান হয় নি। এটিই ওভিসিটল। আর প্রথম শেখই আমার কাছে আছে। আতাই কেবল বের করে টাঙান হয়েছে। কথা বলতে যেন কষ্ট হচ্ছিল ললিতার।

কিন্তু তা হলে, তা হলে—

আপনি এ চবি দেখেননি, দেখেছেন এর অঙ্করণে তৈরী একটি বাড়ী। বীরে বীরে কথা বলল ললিতা।

সুশোভন তখন সব কথা হারিয়ে কেলোছে। কেবল নিজের মনে বলতে লাগল—কী আশ্চর্য, কী আশ্চর্য! এ কথাস্তো আমার এববারও মনে হয় নি। বিশ্বাসের গাভী সামলাতে না পেরে ললিতার পাশে নিজের পরি-ভ্যক্ত চেয়ারটিতে বসে পড়ল সুশোভন। হঠাৎ একসময় বলে উঠলন্ত প্রমোদ বাবু এতদিন আমাকে কী ঠকানটাই ঠকিয়েছেন।

কী করে? ললিতা মাথাটাকে একটু বাড়ী করল।

—বাঃ এইযে তা হলে আমাকে ধোঁকা দিয়েছেন ছবির কিছুই উনি বোঝেন না। এখন তো দেখছি উনিই সত্যিকার শিরী। এজিনীয়রতা করে ডিজাইন। উনি এঁকেছেন চবি। এমন আশ্চর্য রঙের ব্যবহার আমি কখনই দেখেছি। আর কেবল তুলিতে এঁকেই কাজ হননি, তার ইটকাঠের নির্মিত একটি বাস্তবত্বপূর্ণ দিয়েছেন। অপনিও তো আমাকে কোনদিন বলেন নি একথা মিসেস সান্যাল!

—বলবার তো কিছু ছিল না। চবি থেকে বাড়ীর আইডিয়া উনি নিয়েছেন, কিন্তু ছবিতো গুরু আঁকা নয়।

—তবে? সুশোভনের চোখ দুটো কৌতুহলে পানিত হয়ে উঠল।

—তবে কার?

প্রবীর সোমের। ললিতা আবার গুরে পড়ল।

—কে! প্রবীর সোমের সঙ্গে আপনার এত পরিচয় অবশ্য—সুশোভন নিজেই সামনে নিয়ে বাহল।

—অবশ্য কি সুশোভনবাবু?

—আমাকে বাপ করবেন মিসেস সান্যাল। আমার কৌতুহলের জন্ত আমি লজ্জিত।

ললিতার মুখ মুক্ত হাসিতে দিগ্ধ হয়ে উঠল। বলল, আপনার কোন আচার কৌতুহল প্রকাশ পাবনি। আর দিনের আলাপ হলও যেটুকু বস্তু আমায়ের মধ্যে হয়েছে তাতে এ প্রশ্ন অশোভন নয়। হয়তো কথা শ্রুতলে আমিও একদিন বলতাম একথা, ললিতা একটুকু বলল। আঙুল দিয়ে কপালের ওপর থেকে চুলগুলো সরিয়ে দিল। উপরের টোটে জিভটা বুলিয়ে নিল একবার। বলল, প্রবীরের সঙ্গে যখন আমার প্রথম আলাপ ও আট ফুলের ছাত্র। বাবার এক বন্ধুর ছেলে। সেই কবেই পরিচয়। তখন থেকেই ও ভালো চবি আঁকত। বেশ ভালো। গুর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল নতুন কিছু করার চেষ্টা। আর ছিল আত্মবিশ্বাস। সময় সময় সেটাকে অবধা অহমিকা বলেই মনে হতো।

ছবির ওপর আমার খোঁক ছিল ছেলেবেলা থেকেই। বাবার প্রস্তাবে তা ক্রমাগত বেড়েই চলছিল। টিক করেছিলাম, আমি আর বাবা, যে ম্যাট্রিকটা পাশ করেই আট ফুলে চলে যাব। চবি আঁকার প্রথম পাঠ আমার ততদিনে প্রবীরের কাছেই নেওয়া হয়েছে। এবিষয়ে ওরও উৎসাহের অবস্থা ছিল না। কিন্তু গোলামাল করল আমার পরীক্ষার ফল একটু আশাতীত হকম ভালো হয়ে গিয়ে। ভালোমান আট। এটা গড়ি। বাবারও তাই মন্ত। তবু প্রবীর অমত করেছিল। বলেছিল এর থেকে প্রমাণ হয় নিজেকে তুমি গ্রাম দিয়ে ভালো-বাস না। শিল্পের দাবী সবার আগে। শিল্প তোমার জন্তে নয়। সেদিন আশাত পেরেছিলো, কিন্তু প্রবীর যে সত্যি কথাই বলেছিল এটা বৃহত্তে পেরেছিলো তাহলে অনেকদিন পরে।

কলেজে ভর্তি হলাম। হৈ হল্লা করে কখন হুটো বহর শেষ হলো। এবার কিন্তু আর আমাকে ছবি আঁকা দেখাত না। বলত আগে জিজ্ঞার সৌভাগ্য শেষ করে নাও। যদি দেখ ভারত পরে ছবি আঁকার মন থাকে তাহলেই আরম্ভ করে। তবে আমাকে ও ছবি দেখাত। এ এল্লিবিমান থেকে সে এল্লিবিমান। আর গুর নিজের কাছে ছিল সেরা শিরীষের ছবির প্রিন্ট, আমাকে ও ছবি চেনাত। দেখাত কী করে ছবি দেখতে হয়। গুর তাব বেধে মনে হতো আমি যেন ছবি দেখার খ আ ক খও জানি না। অবশ্য এইখানে আমার একটু পর্ব ছিল।

আমার পরীক্ষার ফল বেবোল। এবারও ভালো হলো। আর বাতাবিক নিয়মে বি, এ, ক্লাসে ভর্তি হলাম। আট ফুলে পড়বার কথাটা ততদিনে চাপা পড়ে গেছে।

এবীরের সেটা কাইজাল ইয়ার। টিক করল গুর নিজের ছবির একটা এল্লিবিমান করবে। বাবা ছিলেন সবচেয়ে বেশী উৎসাহী। গুরকে সত্যিই দেখ করতেন তিনি। টিক হলো; আমায়ের হলখরই এল্লিবিমান হবে।

এবীর বলছিল, দেখো সবাইকে চবকে দেব। এরকম ছবি আজও পূর্বত আমায়ের ঘেঁষে আঁকা হয়নি। আমাকেও একখানা ছবি দেখতে দেয় নি। বলেছিল, তুমিই লগার আগে দেখবে, তবে বিজিহ্নভাবে একখানা একখানা করে নয়। সব ক'খানা সামান হল একসঙ্গে। সামানি হল বহর দরজা বন্ধ করে ছবি সামানি ও।

বিকলে ডাকল আমাকে। বেধে বাও। ঘরে ঢুকে মেয়ালের দিকে তাকিয়ে হতভম্ব হয়ে পেলাম আমি। ছবি চিনি বলে মনে যেটুকু পর্ব ছিল এক বহুর্ভে ফুলের মিলল। বহুভে পারছিলাম এবীরের জীব ছুটো চোখ তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমার বুকের প্রতিটি রেণা গুর চোখে বরা পড়ছে। সেই অবস্থায় সবগুলো ছবির ওপর চোখ বোলালাম। তারপর কখন যে হলখর ছেড়ে বেরিয়ে এলেছিলাম মনে নেই।

এবীর আমাকে ভাবেনি, একটা কথাও বলেনি আর। সারাটা রাত আমার ঘুম হয়নি। ছবি সপর্কে যেটুকু জান আমার ছিল, তা দিয়ে এবীরের ছবির ভাষা আমি বুঝতে পারি নি। হয় সাংঘাতিক কিছু হয়েচে, অথবা কিছুই হয়নি, একবারেই কিছু না। আর এই কথা ভাবতেই আমার হৃৎ টন টন করে উঠল। সারা রাত আর ঘুম এলো না।

বেগম সমালোচক আর শিরীষের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল স্মৃতি বিবেকে এলেন। বাবা তাঁদের চা পানে আগায়িত করলেন। তারপরে হলখর ঢুকে ঘুরে ঘুরে চবি দেখলেন তাঁরা। আমার বিশ্বাসের অল্পরূপ দেখলাম তাঁদের আর লকলের মধ্যেই। ছবি বেধে তাঁরা চলে গেলেন। বাবা ভিজাল। করেছিলেন কেমন লাগল? গুরা মন্তব্য করেন নি। বলেছিলেন এখন একটু ভাড়া আছে, পরে বলব। এবীর এক কোণে চুপ করে বসেছিল। একটা কথাও বলে নি।

তাঁদের কথা তাঁরা বলেছিলেন। কেউ লিখে, কেউ মুখে অভ্যক্ত শিরীষের কাছে। জোকরা একেবারে পাগল। সবচেয়ে নারকরা হাসিকে তখনকার লন্ডের চিত্র সমালোচক এবীরের পিঠ চাপড়ে বা বলেছিলেন তা পড়ে আমিও কঁপে কলেছিলাম।

তার পরদিন থেকেই এবীরের দেখা নেই। গুর বাড়ী গিয়েও পাওয়া যায় না। আর কেউ তো ছিলও না গুর। বা মারা গিয়েছিলেন ছেলেবেলায়। বাবা আট ফুলে ভর্তি হবার পরেই।

মাস খানেক পরে একদিন নিজেই এসে হাজির হলো। উত্থুতু চেহারা। বলল, সব টিক করে কলেছি লজিত।

অবাক হলাম একটু। বললাম, কি টিক করে কলেছ?

পারি বাবার।

আমি বললাম, সেকি? এ যুদ্ধি তোমাকে কে দিল? আর তোমার পরীক্ষাও তো সামনে।

এবীর হাসল। বলল, পরীক্ষা, এখানে—এই আর্ট ফুলে? ওরা ছবির কী বোকে?

আমার বিশ্বাসের তখনও বাকী ছিল। এবীর বলল, ক্রান্ত ব্যক্তি, কিন্তু একা বাথ না। তোমাকেও খেতে হবে আমার সঙ্গে।

বললাম, সে কি করে হয়? তোমার সঙ্গে আমি কী করে বাথ? আর সবাইবা তাতে রাজী হবে কেন? ওদের গরমাজীতে কী এসে বাথ? তুমি খেতে পারবে না আমার সঙ্গে? এবীর আমার চোখে চোখ রাখল।

আমি চোখ নামিয়ে নিলাম। এরকম পরীক্ষার পড়তে হবে কখনও ভাবিনি। এবীরের সঙ্গে আমার বিরুদ্ধে কারও কোন আপত্তি ছিল না। বাবা খুশীই হতেন। আমাদের সম্পর্কে কোথাও কোন রকম গোপনতা ত ছিল না। কিন্তু সবীরের এ প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত। আমি জানতাম এতে কেউ রাজী হবে না। আমিও কি যানতে পেরেছিলাম ওর খেয়াল।

আরও কিছুক্ষণ বসেছিল এবীর। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, এর বেশী কিছু ক্যান্য করিনি আমি। আজ আমি চশমি। হিসেব করে পা কেগো তুমি। ঠিকবেনা কোন দিন।

এর পরে আবারে চড়বার আগে বসে থেকে একখানা চিঠি লিখেছিল এবীর, আর ওই ছবিখানা পাঠিয়েছিল। সে চিঠির এক আরগাথ ছিল—“জানি তুমি সাধারণ। তবু ভালো না খেলে পারি নি। কোন দিন তোমাকে যেব বলে একখানা বাড়ীর নম্বা করেছিলাম জল রঙে। পিট্রার ছবি। এজিনীরদের প্রায় নম্বা। বাড়ী আর দেখরা হলো না, ছবিখানারও তুমি ছাড়া কোন শিল্পীরা নেই। তাই তোমাকেই পাঠালাম।”

বাবাকে সবই বলেছিলাম। তিনি কিছু বলেন নি। তবে ঊর চোখের জল লুকোন থাকে নি আমার কাছে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল আমার বাবাকে আমি চিনতে পারি নি। হয়তো বা এবীরের প্রভাবে রাজী হলেই

তিনি খুশী হতেন। কিন্তু তখন ঘেরী হয়ে গেছে।

খাড়া ইয়ার থেকেই কলম ছেড়ে দিলাম। তত্তি হলার আর্ট ফুল।

একটা জিনিষ লক্ষ্য করছিলাম, এবীর চলে বাবার পর থেকেই বাথর সঙ্গে আমার সহজ সম্পর্কের মাত্রথানে বীরে বীরে একটা পর্বা নেমে আসছিল। এক্সিরাটা সম্পূর্ণ হলো মাল চরেক পরে। বাবা একদিন ঊর ঘরে আমাকে ডেকে নিয়ে বললেন, ললিতা, এবীর সায়ালের সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক করে ফেলেছি। সাতই বাথ বিয়ে।

বাপারটা এমন আকস্মিক যে আমি একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারলাম না। বীরে বীরে বাবার পর থেকে ঘেরিয়ে এলাম।

এবীর গাফতেই উনি আমাদের বাড়ীতে আসা যাওয়া করতেন। তখন সব খিলত থেকে কিরেছেন এজিনীরর হয়ে। এবীরের সঙ্গে আমার সম্পর্কের কথাটা ঊর জানা না থাকবার কথা নয়। তা সত্ত্বেও উনি……। কিন্তু এত কথা আমি আর ভাবতে পারিনি। বাবার ওপর প্রচণ্ড অভিমানে আমি একেবারে কথা বন্ধ করলাম। মনে আছে কেবল বিয়ের পনের দিন বাবাকে প্রণাম করে বসেছিলাম, চলি। বাবা আমাকে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, খুঁকি, আমি আজ তুমি অভিমান নিয়ে ব্যাছিস। কিন্তু একমিনি বুকবি আমি ভুল করি নি। কেবল দেখবি এবীর যেমন তোকে নিয়ে অসুখী না হয়। ওই মত ছেলে হয় না।

বাবা মাহুয চিনতে ভুল করেন নি। কেবল চিনতে পারেন নি নিজের বেয়েকে। আমি পারলাম না। কিছুতেই পারলাম না নিজেকে ওর কাছে পৌছে দিতে। অথচ কোন দিন এতটুকু অভিযোগ দেখিনি ঊর চোখে মুখে। আমি আরও অপরাধী হয়ে উঠলাম। আমি জানি ঊর ভালোবাসার ভুলনা হয় না, কিন্তু আমি, আমিতো নিজেকে কখনও নিয়ে যেতে পারলাম না ঊর

কাছে। চার বছর যুদ্ধ করেছিলাম নিজের সঙ্গে, আর পাংলায় না। দেহ তেড়ে পড়ল। একদিন ডাক্তার বলল, বাইসিন্। আমাকে হাসপাতালে দেখে না, বাড়ীতে নার্গ রেখে নিজেই চিকিৎসা করবে ঠিক করল। কিন্তু আমি হাকী হই নি। কেন, কিসের বিনিময়ে আমি এতখানি দেব। ছোঁর করে চলে গেলাম স্ত্রীনাট-রিয়ায়ে। ছেলে বেয়েদের আগেই বাবা এসে নিরে গিরেছিলেন। তারপর এই তো। চলছে আট বছর। এখনও বেঁচে আছি। আর দেখুন আমাকে বাঁচিরে হাথতে এখানে কে বিপুল আরোজন। আমার পুরণো ছবির মধ্যে খুঁজে পেরেছে স্রবীরের ছবি। তাই দেখেই গ্লান করেছে এই বাড়ীর। আমি খুশী হব। বলুন,

আমি কী করব। আমি কী করব? কিসের বিনিময়ে এত সব দেব? লিখিতা ডুকরে উঠল।

আপাতত লম্বী মেয়ের মত উত্তবে।
বলেছ আর।

চমকে মূগ তুললাম। এতকণ চোপ বন্ধ করে গর তুলিলাম। ছাত্রস্বাক্ষরে কখন এসেদবাবু এসে স্রীর শিরের ঝাড়িয়েছেন লক্ষ্য করেনি হুশোভন। তাড়াতাড়ি উঠে পাড়াল। বলল, হ্যাঁ এখন আপনার একটু বিশ্রাম সরকার। আমি উঠি। হাতীর সেই বাঁকের মুখে এসে আবার লিখন কিসের বাড়ীটার দিকে তাকাণ হুশোভন। আবছা আলোর অসুত একখানা ছবি।

লেখকবন্ধুদের প্রতি নিবেদন

নারায়ণ চৌধুরী

বাংলার আধুনিক সাহিত্যিক, বিশেষ করে সাহিত্যিক-দের মধ্যে ঝাড়া কাব্য গল্পোপস্তাস রচনা ইত্যাদির অল্পসীমানে নিয়োজিত আছেন, তাঁদের প্রতি বর্ধমান প্রবন্ধ লেখকের কিঞ্চিৎ নিবেদন আছে। হাল অবস্লে বাংলায় ঝাড়া লিখছেন তাঁদের অনেকেরই সঙ্গে আবার পরিচয় সম্পর্ক বিবিড়। নবীন হোক প্রবীন হোক সত্যিকার সাহিত্য সৃষ্টি প্রয়াসী ব্যক্তি মাত্রকেই আমি সন্মানে চক্ষে দেখে থাকি এবং তাঁকে বহু স্রবীর মধ্যে গণ্য করতে পারলে খুশী হই। সাহিত্যমহলের পোষক ঝাড়া রাখেন তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন, কলকাতার সাহিত্যিকদের অনেকগুলি গোষ্ঠী আছে, রাজনৈতিক এবং অন্ত্যস্ত কারণে এরা প্রায়শঃ পরস্পরের থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করেন, এঁদের একের প্রতি অপরদের মনোভাব যুব অস্বকুল নয়। কিন্তু, কথ্যটির দৃষ্টো আত্মাভিমানের আবেল লাগবে তা হলেও না বলে পারছি না যে, আমি সাহিত্যিকসকলকে ওই রকম দলগত

ভাবে বিচার করি না। আমার সর্বদা চেষ্টা থাকে রাজনীতি ও এই জাতীয় অন্ত্যস্ত বাহু বিবেচনা বাদ দিয়ে সাহিত্যিককে কেবল মাত্র সাহিত্যিক হিসাবে বিচার করা, এবং সাহিত্য বিচারের এই নীতি আমি সকলেরই পক্ষে সম্মান গ্রহণীয় বলে মনে করে থাকি। রাজনীতি আধুনিক জীবনে একটা মণ্ড বড়ো স্থান জুড়ে থাকলেও রাজনীতির মাপকাঠিতে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের বিচার প্রাপ্ত নয়। এই জাতীয় দুপায়নে প্রায়শঃ ভুল হবার সম্ভাবনা, ভুল হয়েও থাকে। কেন না শিল্পী সাহিত্যিক মূলতঃ ও স্বভাবতঃ স্রষ্টা; সৃষ্টি শীলতার বিচার ছাড়া আর যে বিচারের আদর্শ তাঁদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করি না কেন তা লক্ষ্যই হতে বাধ্য। সাহিত্যিক যদি সংবাদপত্রের লেখক হতেন, আর কিছু না হতেন, তা হলে শুধু মাত্র তদায়ের নির্ভরতা আর তদায়ের বৌদ্ধিকতার মানদণ্ডে তাঁর রচনাবলীর বিচার হতে পারত, কিন্তু তিনি যে স্বাভাবতঃ বসন্ত, তাঁকে তথ্য

ঐত্ত্বের বৈজ্ঞানিক দ্বিধা দূরীভূত করে। সাহিত্য সৃষ্টির বৈজ্ঞানিক তথ্য ও ভিত্তির প্রয়োজন নেই তা বলি না, তবে সে প্রয়োজন গৌণ প্রয়োজন, রস বিচারের পাশে তার স্থান হতে পারে না।

এই কারণে সাহিত্য ও সাহিত্যিকের মূল্যায়নে আমি রাজনৈতিক মতাদর্শের তেজোভেদকে খুব বেশি মূল্য দিই না। ধানের লব্ধে আমার আগ্রহ ও কৌতূহল তাঁরা বলব মানবিক মূল্যবোধগুলির প্রতি আত্মাশীল কিনা এবং তাঁরা স্বজনমূল্য কিনা এই দুটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে পারলেই আমি খুশী, সাহিত্যিকদের কাছ থেকে আমার আর কিছু চাইবার নেই। যদি কোন রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে এই দুটি মৌলিক আদর্শের সংঘাত ঘটে, যুক্তিতে হবে সেই রাজনীতি দৃষ্ট। তেমন রাজনৈতিক দলভুক্ত শিল্পীর লব্ধে ভরসা কিংবদন্তি কিছু নেই, তাকে উৎসাহ দানেরও কোন বৌদ্ধিকতা নেই। কোন শিল্পী সাহিত্যিকের বেলায় বক্তৃতা না এই বিসম্মত বিপরীত অবস্থা। সভা প্রদানিত হচ্ছে শুভকণ তাঁর লব্ধে আশা পোষণ করতে আমার বাধ্য। এই দিক দিয়ে শিল্প বিচারে অগ্রগত হলে বহু ভিত্তিকতার হাত এড়ানো যায় বলে বিশ্বাস করি। সাহিত্যের তাতে বহু কল্যাণ।

সাহিত্য ও সাহিত্যিক লব্ধে এই মনোভাব পোষণের ফলে, বলাই বাহুল্য, সর্বাধিক সংখ্যক সাহিত্যিকের সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের পথ খোলা। সেই সুযোগের ব্যবহার ব্যবহারে আমি সর্বদাই সচেতন এবং আমার সৌভাগ্য এই যে, আমার লেখক বন্ধুরা আমার এই বন্ধুত্বপূরাকে সর্বাধা দিয়ে থাকেন। তাঁদের অনেকেই বন্ধু শ্রেণীতে আমি গণ্য। একত্রে তাঁদের নিকট আমি হুজুজ। প্রাণ এবং নবীন ছুই মহলেই আমার বাতায়াত অবস্থিত। বরসবর্ষে প্রাণী লেখকদের সঙ্গেই আমার লম্বিক মানসিক সাক্ষ্য হওয়া উচিত তাই বলে নবীন মহলে আমি কিছুমাত্র অবজ্ঞানতা বোধ করি নে। সাহিত্য বিচারের যে সত্ত্ব সাপকাটি আমি আমার

চোখের সামনে তুলে ধরছি সেইটাই আমার নবীন প্রাণী উত্তর মহলে প্রাণীক করে তুলেছে বলে মনে করি। বন্ধুত্ব কামনা বৈজ্ঞানিক বিপাকিক সেখানে পারম্পরিক বৈজ্ঞানিক মানসিক বাধ্য। সামাজিক উপস্থিত থাকে। এই দিক দিয়ে আমি পরবর্তমান যুগে জীবনে বন্ধুত্ব পেয়েছি প্রচুর, সেই তুলনার বাধ্য—বন্ধুত্বের পথে বাধ্য পেয়েছি সামাজিক। সংসারে বন্ধুতাণ্যের মতো আত্মবিশ্বাস আর কী আছে?

লেখক বন্ধুদের সঙ্গে আমার যোগাযোগের একটা বহু নিশ্চয়ই আছে, সে বহু হল আমার সাহিত্য সমালোচনামূলক রচনাতত্ত্বগততা। নিষেধ কথা নিষেধ ভালো বলতে পারব না, তবে বন্ধুরা বলেন আমার মধ্যে নাকি বৈজ্ঞানিক স্বাভাবিক সমালোচনা ক্ষমতা আছে এবং এই ক্ষমতার প্ররোণে আমি কদাপি ব্যর্থকৃত নই। বন্ধুদের বর্ণনার প্রথম অংশের সত্যাসত্য তাঁরাই ভালো বলতে পারবেন, তবে শেষ অংশের খাণ্ডার্থ আমি নীকার করি। সমালোচনার আমি কতিং ব্যর্থকৃত, লেখক বন্ধুদের সেখান সামাজিকতম প্রশংসারও উপলব্ধি পেলে আমি সেই উপলব্ধির সত্যবহার করে থাকি; তবে প্রয়োজন হলে যে আমি সচ হতে পারি আশা করি তার প্রমাণও বন্ধুরা বহুবার পেয়েছেন। মুক্তি রচনার প্রশংসা এবং অগ্রগত—আমার ক্ষুদ্র বিবেচনার বৈজ্ঞানিক যেটি প্রশংসা—দুইই আমার হাতে নবান খোলে। এই বিশ্বাসিতার জন্তে সন্তোষের কারণ দেখি না, কারণ ঠিক এই বৈশিষ্ট্যের জন্তেই আমার লেখক বন্ধুরা আমাকে সর্বাধা দিয়ে থাকেন। আমার সচ তাৎপনের জন্ত অসন্তুষ্ট হয়ে কোন লেখক বন্ধু আমার সঙ্গে বন্ধুত্বহীন দ্বিধা করেছেন এমন সংঘটন অভাবমি ঘটে নি।

এ তো গেল সম্পর্কের ব্যক্তিগত দিক, তার একটা বৃহত্তর দিকও আছে। আধুনিক বাঙালী লেখকদের ক্ষমতা সম্পর্কে নানা ভনের নানারকম মত থাকতে পারে, কিন্তু এ কথা তাত্ত্বিক যে তাঁরাই বাংলা দেশের শিল্প সংস্কৃতির বীণ নৃত্যকাকে আলিঙ্গিত রাখার চেষ্টা করছেন।

বিশেষতঃ সাহিত্যের স্বকলনশীল বিভাগে বাংলা অঙ্গ-
নীলননিরত আছেন তাঁদের ব্যক্তিত্বের বিপুলতা কে
অবাক্য করবে? বাংলা বেশ আজ নানাতাবে বিপণ্ডিত
—নানা কারণে সাহিত্যপ্রীতি আজ দেশবাসীর মন থেকে
দূরে যেতে বসেছে। এই বিকল্প অবস্থার মধ্যে খাল
করে বাংলা জাতির মনে সাহিত্যবোধ, যেখানে তা নীপ
হয়ে এসেছে, সজীবিত করার চেষ্টা করছেন, যেখানে
তা অহুণস্থিত, সকারিত্ত করবার কাজে জড়ী, তাঁদের
সাধনার কি ফুসনা হয়? তাঁরা যে সম্মিলিত ভাবে
জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জালরক্ষক, তাঁদের সম্বন্ধে
অনবহিত থাকবার যো কি? আজকের দিনে কণা
সাধনার ক্ষেত্রে আর একটি রবীন্দ্রনাথ কেন অস্বাভাবিক
না, গল্প রচনার ক্ষেত্রে আর একটি শরৎচন্দ্রের কেন
অভাবগ্রহণে না এই নিয়ে বাংলা আক্ষেপ প্রকাশ করেন
তাঁরা যে শুধু বর্তমান লেখকদেরই প্রতি অবিচার করেন
তাই নয়, রবীন্দ্র-শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির প্রতিও অবিচার
করেন। রবীন্দ্রনাথের মতো প্রতিভা বহু শতাব্দীর
ভিতর একবারই নাত্র উদয় হওয়া সম্ভব। শরৎচন্দ্রের
সমকালীনসম্পন্ন সত্যবতুলন লেখক কোন দেশের
সাহিত্যেই ঘন ঘন জন্মায় না। অবশ্য এ থেকে এমন
কথা বলা চলে না যে, শরৎচন্দ্রের জায় ক্ষমতামালী
লেখকের অভাবের বাংলা দেশে আর অধুনা কালে সম্ভব
নয়, শুধু এই বলা যেতে পারে যে বর্তমান বাংলা সাহিত্যে
তাঁর জুলা কুশলী গল্পলেখক কেউ নেই। এতে
নিরাশা হবার কী কারণ থাকতে পারে? আধুনিক
বাংলা সাহিত্যের পরিধির ভিতর রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের
জায় প্রতিষ্ঠার অসম্ভাব আছে বলে অন্তিমানের বশে
সেই পরিধিকে স্তব্ধিস্থিতে সংকুচিত করে আনতে
হবে এমন কোন কথা নেই। রবীন্দ্ররচনার জুলা সম্বৎ
রচনা কারণে লেখনী থেকে নির্গত হচ্ছে না বলে আধুনিক
বাংলা সাহিত্য শুষ্ক হয়ে থাকবে, তার কাছ থেকে
আমরা কিছু আশা করতে পারব না? রবীন্দ্র সাহিত্যের
প্রাণদগ্ধ মন বহি আজ রবীন্দ্রাহরণের আতিশয্য

বশতঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রতি ভাঙ্কিয়া
প্রেরণন করে, সে কি শুধুই নিষ্ফল পরাধীনতা? সে কি
আধুনিক সাহিত্যের সক্রিয় বিলম্বচারণ নয়? রবীন্দ্রনাথ
কি বাংলা সাহিত্যের last word?

আধুনিক বাংলা সাহিত্যিকদের রচনাপ্রবাহের প্রতি
মনোযোগ আরও বিশেষ ভাবে আপত্তি হওয়া উচিত
এই কারণে যে, তাঁরা কতকগুলি কার্যকারণের সমন্বয়ে
সমাজজীবনে কোণঠাসা হয়ে আছেন, এই অবস্থাপ্রতি
শক্তি তাঁদের মোটেই প্রাণায় নয়। সাহিত্যিক শ্রেণী
যেন আজ বড় বেশী স্বসামান্য হতে পড়েছেন, অজ্ঞান
দশটা সৃষ্টিভাবী শ্রেণীর মাত্রের মতো নিঃশব্দের চৌহ-
দ্বির মধ্যেই যেন তাঁদের গতিবিধি সংকুচিত, তাঁরা যেন
একটা বিশেষ সমাজধার, একটা স্বার্থচেতনা সম্পন্ন বিশেষ
গোষ্ঠীর মানুষ। অজ্ঞান দশটা সৃষ্টির মতোই যেন সাহিত্য
একটা সৃষ্টি। এই সৃষ্টির মধ্যে যে সমস্ত প্রতিবোধিতার
ভাব বিভ্রমাদি সেট যেন সাহিত্যকেও স্পর্শ করেছে। তাঁর
সৃষ্টিভাবী যেন আজ সাহিত্যিককে অজ্ঞতর প্রতিবোধীর
অধিক মর্যাদা দিতে নারাজ।

সাহিত্যকে যেখানে এইরূপ সঙ্কীর্ণ সৃষ্টির দ্বারা বিচার
করা হয় সেখানে সাহিত্যিক মানসের সম্ভারগণ ঘটে
পারে না। একটা নির্দিষ্ট সীমার সৃষ্টিগত স্বার্থের
প্রাচীরে সাহিত্যিক মানস কেবলই বসি প্রতিহত
হতে থাকে তবে তার ঔদার্য ও কল্পনাপ্রবণতা ক্ষুণ্ণ
পাবে কী করে? অথচ এক সময় ছিল—সেদিন খুব
আগে নয়—যখন বাংলার সাহিত্যকে আর দশটা সৃষ্টি
থেকে কিঞ্চিত আলাদা চোখে দেখা হত; কলতঃ, সৃষ্টির
দ্বারগাই তখন সাহিত্যে প্রবেশ করা হত না।
আর দশটা সৃষ্টির অতিরিক্ত স্বদ্বাভাবিত্য ও সীমার
স্বার্থচেতনার আধর্শের দ্বারা সাহিত্যের পরিমাপ করলে
যে সাহিত্যকে খাটো করে দেখা হয় এই বোধ তখনকার
লোকের মনে ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে
লেখকের অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁরা সকলেই যখন
প্রধান ছিলেন, একান্ত সীমার সৃষ্টিগত স্বার্থের দ্বায়ে

তীৱা পরস্পরকে জড়ান নি। এই অবস্থার তালোমশ
হুই দিকই আছে। আজকের দিনের trade-unionism
এর মাপকাঠিতে বিচার করতে গেলে সংহতির অভাব
সম্ভবত্বতার অভাব একটা সম্ভবত্ব ক্রী সন্দেহ নেই, কিন্তু
সম্ভবত্বতার চাপে অনেক সময় স্বাভাব্য নষ্ট হয় সে কথাও
সমান সত্য। তা ছাড়া, লেখকদের উপর ক্রমাগতই
যদি বাইরে থেকে এই ধারণা চাপানো হয় যে, সমাজ
জীবনে তাঁদের অপ্রতিনিয়ত্বক বিশেষ কোন মর্যাদা
প্রাপ্য নয়, তাঁরা অপর মনোজন বৃত্তিজীবীর মতো সামান্য
বৃত্তিজীবী মাত্র, অপ্রশ্রীত মাহুবেই হল জীবন সংগ্রামের
ক্ষেত্রে তাঁদের প্রতিযোগীর অধিক মর্যাদা না দিলে
তাঁদের বলবার কিছু নেই, সেই ক্ষেত্রে লেখকদের গাড়া-
বার জারগা কোথায় থাকে? সমাজের সকল স্তরের
মাহুবে ও তাঁর স্বার্থকে খেঁদন করে যদি লেখকের কর্মনা
বিকশিত হতে না পারে, লেখককে কেমনই যদি স্বীয়
গোষ্ঠীবর্ষের প্রতি অবহিত হতে বাধ্য করা হয়, তা
হলে সমাজজীবনে লেখক তাঁর মহৎ ছুমিকা পূরণ
করেন কী উপায়ে।

স্বীকার করি দুকঠোর অর্থনৈতিক নিয়মের নিগড়
দ্বারা বর্তমান জগতের সকল তৎপরতা বন্ধ, এবং তৎপর-
তার এক একটি ক্ষেত্র এক একটি বিশেষ গোষ্ঠীর এলাকা-
ভুক্ত, লেখক সম্ভার এই জাতীয় একটি বিশেষ গোষ্ঠী
বিহার তাঁদের বেলায় সাধারণ অর্থনৈতিক স্বত্বের
বাডিক্রম হওয়ার কোন কারণ নেই; তা হলেও বলতে
হয়, লেখকদের নিরবচ্ছিন্ন ঐ দুটিতে বিচার করলে তাঁদের
প্রতি যেন ঠিক হুবিচার করা হয় না। লেখকরা বৃত্তি-
জীবী মাহুবে যদি কি, এ কথাও অনস্বীকার্য যে অল্প মশটা
মাহুবেই মতো তাঁরাও সমান অর্থনৈতিক নিয়মের অধীন,
কিন্তু তাঁদের বৃত্তির বৈশিষ্ট্য অরণ করে তাঁদের একটি
আলাদা মর্যাদা দিতেই হয়। তা না করে তাঁদেরও যদি
অল্প মশটা শ্রমীর সঙ্গে এক করে মিলিয়ে ফেলা হয়,
তবে আর হুড়ি মিলিতে কোন ভকাত থাকে না। শিল্প
মাহুত্যাগেচ্ছিতিনিষ্ট মাহুবে আর, ঘরা বাক, মদাগবী

আশিদের কোণী কিম্বা টামতের মজুর কি এক পর্দায়-
ভুক্ত হবার যোগ্য?

অগচ্চ বাংলা দেশে ঠিক এই অবস্থাই আজ ঘটছে।
লেখকের মল নিতাইই যেন স্বীয় সর্দার বর্ষোত্তমানসম্পন্ন
একটি বিশেষ সম্ভার। সংহতির দীপনিধা আতির
মনে অনির্বাণ শিখার আলিয়ে রাখার পবিত্র দার যেন
তাঁদের নয়। Trade-Unionism-এর নিচ্ছরণ বিধি
বিধানের আঘাত যেন তাঁদের উপর বড়ো বেশি ভরসায়ে
আপত্তিত হচ্ছে। মালিক শ্রমীর প্রয়োজনসিদ্ধি গাড়া
যেন তাঁদের আর কোন কাছ নেই, তাঁরা যেন স্বাতন্ত্র্য-
চেষ্টানাসম্পন্ন এক একটি বিশেষ সম্ভারসিদ্ধি স্বাকীন
মাহুবে নয়। মালিকের উৎপাদ, কখনও প্রকাশকের রূপ
যে আসছে, কখনও সম্পাদকের, কখনও প্রচারকর্তার,
কখনও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের। প্রত্যেকেই
লেখকদের দিয়ে যে বার কাছ হাঁসিল করে নিজে
তৎপর, লেখকের মর্যাদা বা লেখকের নিচ্ছরণ প্রয়োজন
যেন নিতাইই গৌণ বিষয়। অর্থনৈতিক মাহুত্যাগেচ্ছিতিনিষ্ট
আম্বলত করবার অল্প নিরোগকারীত্বের মধ্যে প্রতিযোগি-
তার অল্প নেই। বিশেষ বিস্তার ক্ষমতাসম্পন্ন কাহিগরকে
হাত করবার অল্প যেমন বিভিন্ন প্রতিযোগী অমনিরোগ-
কারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়, তেমনি
লেখকদের মধ্যে ধাঁহাই মালিকটা গতিভার পরিচর
দিয়েছেন কি মালিকটা প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছে তেঁদেরকে
মুকিগত করবার অল্প অল্পকার তথ্যাবধিত সাংস্কৃতিক
প্রতিষ্ঠানগুলি উঠে পড়ে লেগেছেন। 'দেখ, আমার
তীব্র একগুলি লেখককে এনে অড়ে। করেছি, তোমার
সংগৃহীত সংখ্যা তার নিকর নিকিও নয়—মালিকের
তথ্যখানা যেন অনেকটা এইরকম। লেখকরা কখনও
জালায়ে কখনও অজ্ঞাতসারে এই গুপ্তরিক্সিত শোষণ
প্রক্রিয়ার নিকট আত্মসমর্পণ করেন। আর্থিক প্রয়োজন
তাঁদের আর কারও চাইতে কিছু কম নয়, বরং বেশি।
মুত্তরায় ইচ্ছার হোক অনিচ্ছার হোক তাঁদের অধিকাংশই
যে সেই বড়বড়ের শিকার হবেন তাতে আর আশঙ্ক্য কী?

লেখকের এই অবস্থার অবস্থা থেকে আন্তরিক
তত্ত্ব উপভুক্ত বনাবল সংগ্রহ করা সরকার। নিরোগ-
কারীদের এটা হৃদয়ের দেওয়া আবশ্যিক যে টাকার দ্বারা
তারা বড়তোর লেখকের লেখনমূল্য) আশ্রিত করতে
পারেন, কিন্তু লেখকের বিবেক নয়। লেখকের বিবেক
সম্পূর্ণ তাঁর নিজস্ব জিনিষ—লেখালে হস্তক্ষেপ করতে
সিবেক কি তোমার অধিকারসীমা সম্পর্কে তোমাকে
অসৌগে সচেতন করে দেওয়া হবে। উপকার করবার
নামে মানুষ অনেক সময় মানুষের সব চাইতে বেশি
ক্ষতি করে। সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের মালিক, প্রকাশক
প্রতিষ্ঠান, সম্পাদক ও প্রচারক লেখকের আর্থিক
অসহায়তার অবস্থানের সূত্র। তবে বিচ্ছেদ করে দিন,
সেই স্থানে তারা অবশেষেই কৃতজ্ঞতা দাবী করতে
পারেন; কিন্তু সেই নজীরে তারা যদি মনে করে থাকেন
যে লেখকের বিবেককে যত্নে চালনা করবার অধিকারও
তারা এই ক্ষেত্রে পেয়ে গেছেন তবে তারা মন্ত তুল করেছেন।
তাদের সেই তুল অতিরিক্ত ডেকে দেওয়া সরকার।

উপরে যে অবস্থার বর্ণনা করা হল বিশেষ ভাবে সেই
কারণে, এবং সাধারণ ভাবে অজ্ঞাত কারণে, লেখকের
সমস্ত সম্পর্কে পরিবেশ অবস্থিত হওয়ার সময় হয়েছে।
লেখকের সমস্ত নিয়ে আনি নিজে তাবি এবং অপরকে
ভাবতে বলি তার কারণ সমাজজীবনে লেখকের বর্ণনা
সম্পর্কে আনি সচেতন। আনি জ্ঞানি শিল্পী সাহিত্যিক
কবি যে সুবহান দারি পালন করেন আর কোন প্রেমীর
মানুষের দ্বারাই জাতির জীবনে সেই দারি পালন সম্ভব
নয়। বাংলার সব চাইতে গর্বের বস্তু তার শিল্প, তার
সাহিত্য, তার সংস্কৃতি। শিল্প সাহিত্য সংস্কৃতির দারক
ও বাহকের দল নিজেরা এ বিবরে কতটা সচেতন আনি
না, তবে একথা সর্বৈব সত্য এবং সে কারণে গৃহচূড়া
থেকে বাহ্যিক বোঝিত হওয়া প্রয়োজন যে, শিল্পী
সাহিত্যিকেরাই জাতির সর্বাধিক গৌরব বৃদ্ধির কাজে
প্রতী। বাংলার দ্বারা জাতির বর্ণনা অস্বিকৃত হওয়ার
পথ দুইটি হচ্ছে তারা নিজেরা অবদান নিয়োগ

আগুন হয়ে থাকবেন এটা, স্তব্ধতা, কোন ক্রমেই বান
চলবে না। তাঁদের প্রাণা বর্ণনা তাঁদের দিতে হবে।
রাষ্ট্র ও সমাজজীবনে অজ্ঞাত তৎপরতার বর্ণনাবর্ণনা
বুঝা অধিকার কবি না, কিন্তু যে বাই বলুন, সাংস্কৃতিক
তৎপরতার নিয়ন্ত্রণের স্থান। সাংস্কৃতিক তৎপরতার
মূলতঃ কী লক্ষ্য? তার পরিণাম কলটাই বা কী?
এক কথা এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে বলতে হয়,
সাংস্কৃতিক তৎপরতার ফলে মানুষের কতি পরিণীতি
ও উন্নত হয়, তার মধ্যে সত্যতা সৌন্দর্য শান্তি ও পরা
পরতার আদর্শের বোধ উচ্চকৃত হয়, বৈশিষ্ট্য জীবন
যাত্রার উর্ধ্বে মানুষের জীবনের যে একটি বৃহত্তর স্বার্থ-
কতার ক্ষেত্র আছে সে সবকিছু চেতনার সূত্র ঘট,
মানুষের ব্যবহারে আসে নব্রতা, বিনয় ও শালীনতা,
মানুষের চরিত্রের সহজাত আদর্শবাদ ও কর্মপ্রায়ের
সংসারিতোর সংস্পর্গে প্রভাবে বহুগুণে মজিত ও
শাসিত হয়, তার চরিত্রের অন্তর্নিহিত সৃষ্টি, বর্ণা
শ্রীতি, প্রেম, মেহ, দয়া, মাতা, মনতা, কল্যাণ, শুভেচ্ছা
প্রভৃতি গুণের বরাহিত বিকাশ ঘটে—এক কথা, যে
সকল গুণের সমাবেশ জীবন মনোর, বরনীর, সোভানীর,
সুস্থনীর হয় সে সকল গুণের চেতন; একমাত্র সাংস্কৃতিক
তৎপরতার দ্বারা উচ্চকৃত হওয়া সম্ভব। কলতঃ সমস্ত
ব্যাপারটাই দাঁড়িয়ে আছে গুণিতার প্রসঙ্গ কেন্দ্র করে।
উল্লিখিত মহৎ বলাবোধ্যগণিক যদি জীবনের সর্বাঙ্গকে
জড়িত গুণ বলে স্বীকার করা হয়, সে ক্ষেত্রে শিল্প
সংস্কৃতিকে সকলের উর্ধ্বে স্থান দেওয়া ছাড়া আর পথ
থাকে না। ধর্ম এবং মর্যাদাটির চেতনার দ্বারা মানুষের
সত্যের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ গুণের বিকাশ হয় সত্য, কিন্তু
ধর্ম এ গুণে অহঙ্কারবাহী, সাম্প্রদায়িক স্বার্থসম্বন্ধীদের
হাতে পড়ে নানা অনর্থকারের কারক হয়ে উঠেছে।
আর মর্যাদাটির সবকিছু বলতে গেলে বলতে হয় যে,
তত্ত্বমাত্র মর্যাদাটির চেতনার দ্বারা মনের সমস্ত বৃত্তির
পরিচিতি কোন ক্রমেই সাধিত হতে পারে না।
স্বনীতিবোধমাত্র সত্যতা ও শ্রীতি এবং অজ্ঞাত তৎপরত

প্রবণতা বড়ো বেশি বিগত যাপার, তার ভিতর অল্পকৃতির সেই স্নহুনারথ নেই বা একমাত্র সংজ্ঞা-নিষ্ঠার দ্বারাই অধিগত হওয়া সম্ভব। মরাগিটির ভিতর কর্তব্যবোধের ধারণা প্রবল; এই মানবতে জীবন যেন কতকগুলি বিগত বস্তুকর্তব্যের সমষ্টি মাত্র; ফলাফল বাই হোক কোনক্রমেই এই সকল কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হওয়া চলবে না। নীতিবাহীর এই হল অলঙ্ঘ্য নির্দেশ। বলাই বাহুল্য এই আদর্শের দ্বারা জীবনের সকল কোণ ভরে না। নীতিবাদের ভিতর অন্তরের স্বতঃস্ফূর্তি কোন কথা নেই, নেই সৌন্দর্যের আশাস, নেই কল্পনা প্রিয়তার ক্ষুধা মেটাবার প্রতিক্ষণ। এই কারণেই তা শিল্প সংজ্ঞার চাইতে নিরন্তরের বস্তু। শিল্প সংজ্ঞার প্রতি আন্তরিক অনুপ্রাণের দ্বারা বাস্তবের মনে যে সকল সৃষ্টির চেতনা আক্রেত হয় কর্তব্যবোধ তার মূল নয়; পরন্তু অন্তরের মূলগতীয় সর্বমূল হ'তে স্বতঃস্ফূর্ত তাৎবে উৎসাহিত কল্যাণের ধারণা থেকে তারের উদ্ভব। এই হেতু শিল্প সংজ্ঞাভিত্তক শুভ প্রত্যাব বস্তুদ্বারী হয় আর কিছু তেমন হতে পারে না।

শিল্প সংজ্ঞা সাহিত্য ইত্যাদিকে কেন আমরা এত মূল্যবান মনে করি উপরের বস্তুব্যাক্রমকে তারই ব্যাখ্যা মনে করা যেতে পারে। পৃথিবীকে বাসযোগ্য ও জীবনকে সুস্থ আর স্বাচ্ছন্দ্যর করে তোলাবার অস্ত্রে আর যেসকল তৎপরতা আছে তাদের মূল্য অস্বীকার করি না, কিন্তু স্পষ্টতই তাদের স্থান সাংজ্ঞিক প্রায়শঃ তুলনায় সৌণ। বস্তু নিয়ে তাদের কারবার, টাকা আনা পরসার হিসাবে তাদের হিসাব, মনের সঙ্গে পাল্লা বেখে এমন মূল্য কি তাদের আছে? কথাটা এ দুইয়ের প্রবল-মান ধ্যানধারণার মানবতে প্রত্যাহ্বানবোধ এবং কতকটা প্রতিক্রিয়াশীল মনে হতে পারে তবু বলি, মনের প্রয়োজনটাই জীবনে সব চাইতে বড়ো প্রয়োজন। সুস্থ ও সুন্দর তাৎবে বেঁচে থাকবার জট্টেই মানসিক ঐশ্বর্যের উপর জোর দেওয়া দরকার। দেহগত ও বস্তুগত প্রয়োজন অবিস্মরণীয় তাতে সন্দেহ কী, কিন্তু মনকে উপবাসী রেখে

বস্তুগত উপকরণ স্বপীড়িত করবার কোন সার্বকতা দেখা যায় না। মানসিক প্রাণবন্ততা পরিমিত ও পরিচ্ছিন্ন সুন্দর জীবনযাত্রা আর মূল স্বর্ধবৎ জুঁড়িয়ার হিংস্রানী শেঠের প্রাচুর্যময় জীবনযাত্রার মধ্যে যদি একটি বেছে নিতে হয় তবে আমরা কোনটি বেছে নেব? বাঙালী সমাজ; এ বিষয়ে উত্তরের অস্ত্র জুবার চিন্তা করবে না।

সেই কারণেই আমি আমার লেখকবন্ধুদের বলি তাঁরা বর্ধাবন সর্ধাবোধে ধারা উদ্ভূত হোন, আত্মপ্রত্যয়নীল হোন, তাঁদের উপর যে শুধু দারিত্র্য ব্রজ সে বিষয়ে তাঁরা সচেতন হোন। তাঁরা যেন নিজেদের ছোট করে না যেনে তাঁদের প্রতি সহমর্মী সমালোচকবন্ধুর এই সনির্ভক অহুরোধ। আত্মপ্রত্যয়নীলতা বহু রোগের মহৌষধ—অন্ততঃ তার একটা মহৎ ফল এই যে তা বাস্তবকে অপরের প্রয়োজনশিদির যন্ত্র হতে ধের না, আত্মপ্রত্যয়নীল বাস্তবের নিকট খাঁচ সাধনাই সব চাইতে বড়ো সাধন। কথাটা আপাতবিচারে স্বার্থমুখিটুই মনে হতে পারে, কিন্তু তাতে আশঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। আমার আদর্শের গুণকরতা সম্পর্কে আমি নিজে যদি নিঃসংশয় হয়ে থাকি, যদি বুকে থাকি আমার অহুসৃত পথেই সমাজের সর্বাধিক কল্যাণবিধান সম্ভব, তবে কোন স্ববহারই সে পথ থেকে আমার স্রষ্ট হওয়া উচিত হবে না—অপরের প্রয়োজন পূরণ করতে গিয়ে স্বীকৃত কর্তব্যসাধনার পথ ত্যাগ করবার মতো মানসিক দুর্বলতা যেন কখনও আমাদের পেরে না যসে। শিল্পীর পক্ষে কিতং স্বার্থপর হওয়া ভালো, কেন না সেই স্বার্থপরতার পথেই তার শিল্পসাধনার পথ—‘স্বার্থ’ কথাটাকে যদি আমরা দৌকিক অর্থে ব্যবহার না করে আধ্যাত্মিক অর্থে ব্যবহার করি তবে দেহবৎ যার ভিতর স্বার্থবোধ বস্তু প্রবল তার দ্বারা সমাজসংস্কারের শুভ বেশি কল্যাণ। সন্তানমূল্য ব্যক্তি স্বীকৃতি শিল্প সম্পর্কে প্রবলরূপে সচেতন এবং সৃষ্টি-প্রেরণার দ্বারা গভীর তাৎবে অনুপ্রাণিত হলে তবেই না তার হাতে মহৎ সৃষ্টি সৌন্দর্যিত হয়ে ওঠা সম্ভব।

মোটামুটি শিল্পী সাহিত্যিকদের আত্মসর্ধাবন বদীয়া

হতে হবে এবং হীনতাবোধ মন থেকে নিঃশেষে কেড়ে
 কেলেতে হবে। হীনমুগ্ধতার তুল্য পাপ নেই। তা
 মানুষকে অবধা অপরের অহংকারের নিকারে পরিণত
 করে। বিনয় ও নম্রতা মহত্বই সন্দেহ নেই, সেই সঙ্গে
 ইতি কিস্তি অহংবোধও থাকে ভালো। সেই অহংবোধ
 আর কিছু পাকক আর না পাকক, মানুষকে অকারণ
 লাজিনার কবল থেকে বহু ক্ষেত্রে রক্ষা করে। মানুষ
 অপরের স্বভাবে দুর্বলতার রক্ত, অস্বপ্নে সদা ব্যস্ত।
 একটু কোথাও দুর্বলতার আচ্ছাদন পেলেই কি তাকে চেপে
 ধরে। পারম্পরিক আচরণনিরত একজোড়া মানুষের
 মধ্যে একজনের ভিতর কোনক্রমে যদি এই বোধ
 একবার মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে যে অপর ব্যক্তির মনে
 আত্মপ্রচার ভাব যথেষ্ট প্রবল নয়, তা হলে বর্তই তাঁর
 গুণগণা থাকুক তাঁকে পাকেচক্রে অহংহেলা করবেই।
 এই কারণে অহংবোধ কিছু পরিমাণে থাকা ভালো বলে
 মনে করি। বাংলার শিল্পীসাহিত্যিক লেখকদের নিয়ে
 এই যে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাক্সিলাকর ছিনিমিনি খেলার
 নিয়োজিত তা থেকে এই কথাই শুধু প্রমাণ হয় যে
 আমাদের লেখকবর্গের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় যথেষ্ট পরিমাণে
 প্রবল নয়। তা যদি হত, লেখকদের প্রতি মনজ্ঞার
 মনোভাব বৈলিক পরিবর্তন সূচিত হত, লেখকরা আর
 মাসিক শ্রেণীর নিরঙ্ক প্রয়োজন পূরণের বহু হয়ে থাকতেন
 না, তাঁদের ক্রীড়নকথ খুচে যেতো।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের মতো
 শিল্পীর আবির্ভাব ঘটছে না বলে আক্ষেপের কারণ নেই।
 তার অস্ত্রে বর্তমান লেখকদের হীনমুগ্ধতারও কোন
 কারণ দেখা যায় না। বর্তমান বাংলার মাক্যারি শক্তি

সম্পন্ন বহু লেখক বর্তমান। ব্যক্তিগত জ্ঞানে তাঁদের শক্তি
 ও প্রতিভা অশাষ্টিরূপে চিহ্নাকর্ষক মনে না হতে পারে,
 কিন্তু তাঁদের সম্মিলিত ক্ষমতার দ্বারা পূর্বত পূর্বত টলানো
 যেতে পারে। এঁদের ভিতর সকলেই যে স্বভাবতঃ
 মাক্যারি শক্তির অধিকারী তা নয়, কারণ কারণ ভিতর
 প্রাথমিক শ্রেণীর শক্তি ছিল, কেবল বর্তমান বাংলার
 মানাচরণ বিপর্যয়কর অবস্থার চাপে সে শক্তির বিকাশ
 চিরন্তনের রুদ্ধ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের আমলে
 বাংলার এ অবস্থা ছিল না। লেখকদের কৌশিকার
 প্রয়োজন চরমো সে সময়ে এমনি তীব্র ছিল, কিন্তু অতীতের
 শোষণপ্রক্রিয়া তখন ছিল না। লেখকদের আত্মবিকাশের
 সুযোগ না দিয়ে তাঁদের নিরঙ্ক উদ্বেগপূর্ণের উপায়বদ্ধপ
 জ্ঞান করবার যে বানিজ্য মনোভুক্তি, সেই অন্ধের প্রবর্তা
 তৎকালে অগ্রপন্থিত ছিল। আজকের লেখকদের
 অসুবিধা বহু, সুবিধা সামান্য। তবু এরই মধ্যে তাঁদের
 কাম করে যেতে হবে তাঁদের আত্মবিশ্বাস হারালে
 চলে যাবে। একক রবীন্দ্রনাথের গোবর্গীর্ণানো উচ্ছ্বাস
 বাংলার সাহিত্যে আজ না-ই থাক, বহু দীপকগুলোর
 সম্মিলিত দ্বাতির দ্বারা অন্ধকার বিদূরণের আরোহনে
 কিছু অপরূপতা নেই, বরং আগের চাইতে আরোহন
 পূর্ণতর। রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান বিরাট প্রতিভার অভাবে
 বাংলা সাহিত্যের যে বৈজ্ঞানিক দেখা দিয়েছে অনেকাংশে
 লেখকের প্রয়াস দ্বারা সে বৈজ্ঞানিক বহুলাংশে পূর্ণ হয়েছে।
 সুতরাং লেখকদের স্বীয় মান সম্পর্কে অপ্রচার মনোভাব
 পোষণের কারণ নেই। আত্মমর্গীর্ণাবোধের দ্বারা সত্যক
 উদ্ধৃত হলে বর্তমান লেখকের মনে যে কী না করতে
 পারেন তেবে পাওয়া যায় না।



প্রথম পাঠ

নিখিলেন্দু রাজা

সন্ধ্যাত গছার পরম লগ্ন মুহূর্ত্তটুকু বৈদিন রক্তে বসে অপূর্ব হয়ে উঠল।

ঐতিপদের স্বেচ্ছা গাছের ডগা ছুঁয়েছে, বাগানের বন শান্তিভালের ভেতর আলো অন্ধকার জড়িয়ে রয়েছে, শান্ত সন্ধ্যা পুঙ্খের ভগ্নর এখনো এক স্নানক রূপালি আলো এসে পড়েনি, একটা মলিন আবরণ পড়েছে শুধু নাকীপা জলের ভগ্নর। শাসনসময়ের বাগানবাড়ীর পুঙ্খের ধারে আজ ছুটি মাত্র লোক বসে, এক কর্তা নিষে, আর একজন—

আর একজন ?

কর্তার শাকা মাথাও তার হালি দিতে পারে না।

দুর্দীর্ঘ বাট পরবট্ট বছরের জীবনে কত লোক যে এসে গেল, তাদের কোনো পরিচর কি কখনো দেখা সম্ভব ! তাদের মধ্যে কত লোক যে কপোতের ভক্তে আপন রক্তের সম্পর্কের চেয়েও গভীর আত্মীয়তা স্থাপন করে গেল। এ লোকটি হয়তো তাদেরই শেষ ঐতিমিথি, চূড়ান্ত ঐতিহ্য।

পুঙ্খের এক কোণে বড় হইলটি কেসে কতটা চূপ করে বসেছিলেন। দূরে আলোহীন বাগানবাড়ীটা বোবা হয়ে আছে। তার চারপাশে নরপত্নী স্থলের গাছগুলো বছরের অত্যাধিক জরোবশীর ঠাঁয়ের মত শীর্ণ হয়ে গেছে। পুঙ্খের চারপাশের নারকেল গাছগুলো রক্তিম হোনতার নিঃস্রুয় মেঘে আছে। মাঝে মাঝে এক আধ স্নানক বাতাস বইছে আর গাছগুলোর মধ্যে সন্নিবিষ্ট স্বরা কলকোলাহল পড়ে বাজে, এমন বিকৃত পুঙ্খের আরত দেহখানা ছন্দ ছন্দ করে উঠছে, কঁপে কঁপে শিউরে উঠছে বার বার।

কর্তা ডাকলেন, অবিনাশ—

যে লোকটি বাটের পইঠার বসে ছিল কেসেছিল, এক লক্ষ্যে চেয়েছিল কলকান কান্ডার দিকে, এই ডাকে চট করে উঠে পড়ল, হিপ ছেড়ে দিয়ে ক্রান্ত চলে এসে কোণের

এক বন কোণের পাশে, যেখানে কর্তা হাত খাটিয়ে চূপটি করে বসে আছেন।

কে ? অবিনাশ ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ বড়বাবু।

আমার পাশে এসো, যে তক্তাটা আঁতেই ছুজনের কুলিয়ে বাবে।

বড়বাবুর পাশে গিয়ে অবিনাশ বসল, প্রায় গা ধেসে। তার দেহে যোমাক দেখা দিয়েছে। এই তো সেদিন স্কলরবনের লাটে সামান্ত প্রজা ছিল সে এঁর। বড়বাবু জমিদারী দেখতে গেলেন, সেই সঙ্গে বেছে নিলেন স্ত্রীকে। সেই থেকে সে পার্শ্বচর। কিন্তু আজ যে একবারে পাশে।

—বাটে কিংবা বাগান বাড়ীতে গেলে হোতো না ? অবিনাশ সুনিনয়ে জিজ্ঞাসা করলে।

—আমার কষ্ট হচ্ছে বদছিল ? বড়বাবু মুখ না তুলেই মুখ হাসলেন। ক্রান্ত বার্কোর ছবি সেই হাসিতে উঁকি ধরে গেল।

অবিনাশ চূপ করে রইল।

হঠাৎ কি মনে করে বড়কর্তা হেসে উঠলেন, লক্ষ্যের সন্ধ্যা। সে হাসির উজ্জ্বল উজ্জরক চারিদিকের স্থান নিতম্বতাকে হাতুড়ি পেটা করল ভব ভব করে।

হালি খামিয়ে কর্তা উম্মলত চোখে চাইলেন অবিনাশের দিকে, মুখে ঠার সংগ্রামীর প্রান্ত দীপ্তি, একটু থেমে অকৃত স্বরে বললেন, আনি একবার বস্ত্রোপ-সাগরে ছিল কেসেছিলুম, আনি চেয়েছিলুম সেই মাদ্রব থেকো হাতেরটার তাক। রক্ত—

স্বক কহতে গিয়ে কর্তা থেমে গেলেন, অবিনাশও কি একটা বলতে গিয়ে চূপ করে গেলো, উভয়েরই কাণে একটা তৃতীয় মাদ্রবের স্বর এসে থেকছে, সে স্বর যেন কত চেনা। অশ্রু কত অশ্রুত, অশ্রুচিত। ছুজনেই উৎকর্ষ হলে সে স্বরের ত্যাগপথ খুঁজতে লাগলেন—

সীতারাম—জয় সীতারাম—সীতারাম—জয় সীতারাম
হৃৎকেন্দ্রই বিজলভাব কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত
পরে। বুড়ো কর্তা হেসে বললেন, ও কিছু নয় আশ্বিনের
নেপালে বাগদীর গলা।

ও কিছু নয়, কত অবলীলভাবে বললেন তিনি, অথচ
কেন জানেন না, তাঁর মনে হোল ওইটেই সব, ছিল
অমাণ আত্মর, তাঁর বাগানবাড়ী পাহারা দেবার ক্ষেত্রে
একটুখানি ঘর বানিয়েছিলেন একে। সে আজ ক-তো
বছর আগের কথা। তারপর নেপাল কঠোর পরিশ্রম
করে বাচল নিজে, বাচালো তার আপন পরিজনকে।
এখন, এই সজ্জার উত্তীর্ণ মুহূর্তে স্তম্ভ নাম হুড়িয়ে দিল
আকাশে বাতাসে। হুঁহী ঐ নেপালে বাগদী। আর
তিনি?

কর্তা তারপর?

একটু প্রাকৃতিক হয়ে মুগ্ধ অথচ উত্তেজিত কণ্ঠে
জ্বক কহলেন, জোনপুটে গবর্ণমেন্টের কিংবদী হাউস
আছে কানিস? আমি সেইখানে আস্তানা নিগুন।
রক্তখোকা হাতের রক্ত চাই।

কর্তা বামলেন। দূর থেকে ভেলে আগছে পুণ্যনার
সঙ্গীত, জয় জয় করে দেব মহেশ্বর, জয় হর সৌমী...

তিনি কি ঐ সঙ্গীতম্নে অসজোড়ে ধোঁগ দিতে
পারেন না। হঠাৎ মনে এল একথা। সেটাকে কেন
ক্রমে চাপা দেবার ক্ষেত্রেই বেন তিনি বলে চললেন, তার
কিছুদিন আগে পর্যন্ত গেছে, বিশ্বর লোক সমুদ্রে হান
করছিল, তার তেতর থেকে একটা বাচ্চা ঘেরের একটা
পা হাতের কেটে নিয়ে গেল। আড়ার এনেও মেয়েটিকে
বাচানো গেল না। আমি তখন সব একটা কুখীর
নিকার করে দেখানে বেড়াতে গিয়েছি। কুখীরটা
লগায় ছিল, মানে তার লেজ থেকে নাকের ভগ্ন অববি
বেগে দেখুণ্য...

হাতেরটা ধরা পড়ল কর্তা? অবিনাশ উৎসুক হয়ে
উঠেছে।

ওই দেখ, কি কথা বলতে কি বলে চলেছেন তিনি,

সত্যি বলত অল্পমনস্ক হয়ে পড়ছেন বার বার। তাঁর মনে
চলে গেছে ঐ একটা শব্দের শিখনে, সীতারাম—জয়
সীতারাম—জয়ই যথো তিনি আগামী জীবনের ছবি
আঁকছেন। কিন্তু কেউ তা জানে না। এবার যে তিনি
তীর্থ ভ্রমণ করে বেড়াবেন ঠিক করেছেন, একথা স্বপ্ন
তাঁর পরিচিত লোকেরা শুনবে খুব অবাক হয়ে বাবে
নিশ্চয়, বিশেষ দারাদীকে কেবল দুর্গই শিকারী আর
বিলাসী জমিদার বলে জানে।

হাতেরটা কি হল কর্তা?

কর্তা হাসলেন, না, হাতেরটা ধরা পড়ল না, অনেক
চেষ্টা করলুম না। তবে কুখীরটা আমি একাই বেয়ে-
কিনু।

আর কিছু বললেন না, হুপ করে রইলেন। কেন
এই অহেতুক আত্মপ্রচার? এই বিকশিত যৌবনের বৃত্তি
রোমন্থন?

কোনখানে কর্তা?

না? কোনো কথা না বললেই নয়, কিছু কথা উচ্চারণ
করতেই হবে। নইলে এই ভিঁ ভিঁ জাকা রাজিতে তাঁর
সমগ্র জীবনটা ব্যর্থতার আবর্জনাভূষণের মত মনে হবে
আর যত বিকৃত অহুশোচনা, বিলাস অভিমানে সব একে
একে ক্ষয় কালো করে দেবে।

তাই কথা না করে থাকতে পারলেন না তিনি,
তোষেরি মেখে রে, প্রহরবনের কি একটা নদীতে।
আমি তখন বোটের করে বাজিন্দুর বাঘ মারতে। এক
জারগার দেখি লোকের মধ্যে কান্নাগোল পড়ে গিয়েছে।
কী ব্যাপার? না, তারের এক বুড়ো নদীতে নেমেছিল,
একটা কুখীর তাকে খেয়ে কেলছে। এই একটু আগেই
ঘটে গেছে ব্যাপারটা। জেলেশের কাছে লক্ষ্যন নিয়ে
কিছুদূর বেতে না যেতেই দেখুণ্য লোভের টানে কুখীরটি
গা তাসিয়েছে। আমি তখন তার চোখে গুলী করলুম।

বরলো? বরলো তবুনি?

না, বারেল হল। জল ডোলপাড় করে ছুটল দক্ষিণ
দিকে। আশিও শিছু নিতে ছাড়লুম না।

শেষ পর্যন্ত মরল কতটা ?

মরল বৈকী। পেট চিরে পেগুম সোনাখানা, হীরের আংটি, অনেক বাতুর খেয়েছিল কিনা।

আহা !

ছুতনে চূপ। গর হাড়িরে গেল, মিলিরে গেল স্তুতি-কথা। জ্যোৎস্নার ঘরিতে ভরিতে একচিমরি সুর পাক খেয়ে বেড়াতে লাগল—রাধা, কৃষ্ণ রাধা—রাধা, কৃষ্ণ রাধা—

—সেই ব্যাঘ্র ছোটো বাবুও মেরেছিগুন, আত্ম রসাল বেলল—যুড়ো কর্তা বলে চললেন, যেন না বলে তাঁর স্তুতি নেই, যেন না বললে এই কৃষ্ণনার তাঁর কর্তব্যে করবে, তুই আনিস আমি মাচান বেঁধে শিকার করি যুব কম। সেবারে কি আনি মাচান আনো বীথলুন না। তখন কৃষ্ণশব্দে শেষ রাত্রি। ঘোপের আড়ালে অপেক্ষা করে করে স্নান হয়ে পড়েছি, হঠাৎ টের পেগুম সহ্যরাজ আঁসছেন।

বাঘটা মরল ?

মরবে না ? আমার হাতের দার। কাত হয়ে সোজার ভাপটা ভারতে লাগল। কিন্তু আসল বিপদ ছিল তার পেছনে। বাঘের আড়ালে ছিল বাঘিনী।

তারপর ? তারপর ?

আমি যেই বাঘটার দিকে এগিয়েছি অমনি বাঘিনী লাফ মারল আমার দিকে। আমি তখন অস্বস্তত। একটা বাঘার কীবের এক বাঘল হাংস বিল ডিঁড়রে। আমি বুধ বুধে পড়ে গেলুম। বাঘিনীর হুহুকারে নিশ্চয় বন কঁপে উঠল।

বাঘটা আপনাকে খেয়ে ফেলল কর্তা মশায় ?

রাধা কৃষ্ণ রাধা,

কৃষ্ণ পাভকী তরায়

কৃষ্ণ গোখন চরায়

ওই, আবার সেই স্বর শ্রবণ করে কানে বাজছে। কর্তামশায় কেমন যেন উদাসীন উদাসীন হয়ে গেলেন। ঠিক ভদ্রি হয়ে উত্তর দিতে পারলেন না, আমি তখন প্রায়

অচৈতন্য অবস্থার কোনরকমে পাশ থেকে রক্তভারটা টেনে তুললুম, নলটা তার পেটে ঠেঁকিয়ে পরপর ছোটো গুলি করলুম। উপস্থিত বুদ্ধি লোপ পারিনি বলেই রকে গেবেছিলাম কিন্তু তারপর কেমন করে বে অসাড় দেহটা টানতে টানতে একপাশে সরে আসতে পেরেছিলাম তা আজ আর মনে পড়ে না, জ্ঞান হল যখন তখন শব্দরবনের কাছাকাছিতে জরে, পাশে ডাক্তার, সর্বাক্ষে ব্যাণ্ডেজ।

তাঁর কথা ধামবার আগেই ঘাটের কাছটার কড় কড় করে একটা বিশ্রী আঁতরাক উঠল। তারই সঙ্গে ভাল বেধে দূরে একটা পাঁচটা হুম হুম করে ডাক তুলল। একটা বড় মাই ঘাই মারল জলের ওপর। মিহি কাঁচ জড়োর মতো জ্যোৎস্নার জপোলি গুড়না কিকিরে উঠল সেখানে।

অবিনাশ ব্যস্ত হয়ে বললে, বড় হুইলটার মাছ খেয়েছে বাবু।

কর্তা বললেন, খেয়েছে থাক না, কি হবে আর ওকে ধরে।

অবিনাশ কোত্তের সুরে বলল, তা বলে হুইলটাও যাবে জলের তলায় ?

আজ্ঞা, বেশ তবে, নির্বিকার গলার বললেন তিনি।

অবিনাশ ছুটেছে ঘাটের দিকে। ছুটুক। তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না এই দ্বীপ কোথা তাঁর উপলক্ষ্য, একটা ছল মাত্র। সময় প্রয়োজনের অতিরিক্ত। অতাবিক ধীরে বলে মনে হয় এই জীবনকে। তিনি যেন একটু বেশীদিন বাঁচছেন। তাই নিজের হাড়িরে বাগুরা ঘোঁষনমর্গের হাতল গুণে দিতে হচ্ছে কর্মহীন নিশ্চল গহুড়ায়। কি করবেন আর কি না করবেন তা এই মুহুর্তে ঠিক করে ফেলতে না পারলে তিনি যেন বাঁচবার অধিকার হারাবেন।

কর্তা উঠে পড়লেন, আস্তে আস্তে ডাকলেন, অবিনাশ।

দূর থেকে উত্তর এস, হুইলটা পেগুম না কত।

এবারে কর্তার গলার যেন খুঁী ছুটে উঠল, বেশ হয়েছে, তুই শোন না এখানে।

অধিনাশ ছুটে এসে, বললে, আপনার ছইলটা গুটিয়ে ফেলি ?

বাকসে পড়ে, তুই আমার কাছে আর না, তোমার কাছে ভর দিয়ে ছাটি। স্বাধ, আমার ডান পারের পকাবাড়টা আমার বেড়েকে কেন জানিস ?

অধিনাশ নিরুত্তর।

গগনান রাগ করেছেন যে, তাঁর একবার নাম নিশ্চয় না ইচ্ছা করেন। কর্তা হাসলেন। দুজনের কানে শুধন রেসে আসছে একটি শব্দ স্বর-লম্বী, কে যেন হ্রস্ব করে করে সেই বাক্য মনের অতীত লকল ধুংসে ছুঁড়তি বিনাশ-কারী কৃষ্ণের নানোজ্ঞারণ করতে।

অধিনাশ, চম্, নেপালের কাছে গিয়ে বসি, ভর হুখে দেবতার পুণ্যনাম শুনে আসি, লঙ্ঘ্য তলীতে বললেন কর্তা। গুলীটা এত শব্দ যেন তাঁর আন্তরিক-তার লম্বা করা চলে না একভিল।

কাঁধে ভর দিয়ে বীরে বীরে এগোতে লাগলেন তিনি। তাঁর মুখমণ্ডলে শুধন বাক্যের বিতীর্ণতা মুছে গিয়ে বীরে বীরে স্বর্গীয় শাস্তির আভাস ছুটে উঠেছে। একটু থেমে বললেন, কি ঠিক করেছি জানিস ? রাধাকাক দেবের মন্দির জুগল আমার বাড়ীতে, নিত্য ছুবেলা পুরোহিত এসে ভোগ দেবে ঠাকুরকে আর প্রসাদ পাবে ওই নেপাল। নেপালই আমার হয়ে ঠাকুরকে রোজ প্রণাম জানাবে আর আদি বেরিয়ে বাব ভীর্ণ প্রদশে। অধিনাশ, তুই যে মনন অবাক হয়ে আমার দিকে তাকা-জিস, কেনের আমার কি পুঙ্খো করতে নেই ? আরো পুণ্য করব না ? বয়েসটা কি কম হলো, দেখি, এই বলে হাথছি, এবার থেকে সাধুসন্ন নিম্নন আমি।

কর্তার গলায় স্বর নিভে গেল। নেপালের বাড়ীর কাছে এসে গেলেন।

জীবনের বাক্য বাক্য কত নিত্যানুন্ন পাঠে বীকা নিলেন তিনি। সে সন্ধ্যা আজ মুছে গেল বন থেকে।

পুনর্ব্ব প্রথম পাঠ মুক্ত হল।

নেপাল বসেছিল দার বাওরায়। সংসার জাগে অজিত বিপন্ন প্রৌঢ়। কর্তা যেন আজ নতুন চোখে তাকে দেখতে পেলেন, ভরে নেপাল, প্রণাম করতে হবে না আর, তাঁর ঘরের বাওরায় এখন বসে একটু, এতক্ষণ ধরে তুই যা করলি...

নেপাল জিত কেটে বললে, কি করব বাবু আপনি মালীটাকে ছাড়িয়ে দিলেন আমি সব গাছ বাঁচাতে পারলুম না।

না রে না, কর্তা হেসে বললেন, তুই যা ঠাকুর দেখ-তার নাম শোনাসি আমার...

এবারে নেপালের মুখ চুপ হয়ে গেল। বাবু হাসতে হাসতে বললেন বটে কিন্তু এখন কেপে উঠবেন। ওইটি স্বভেদে ইঙ্গিত। সত্যিইতো খেয়াল-ছিল না যে বাবু আজ ছিপ কেলতে এসেছেন, সত্যিইতো, বহুত দুশ হয়ে গেছে, কর্তা বাবু যে ঠাকুর দেবতার নামে আত্মীয়ন চটা।

একটা ঢোক গিলল নেপাল, শুকনো হুখে বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু ঠাকুর দেবতার নাম শেখাচ্ছিলাম। বেশ ভালো জাতের ময়না পেরেছি একটা। বুলি বলাতে পারলে ছুনো নামে বিক্রী। শুই অতাই এত কষ্ট করছিলাম আর কি, নইলে কে আর অতক্ষণ ধরে চাটাত।

বাওরায় আসন পাটাই ছিল। এবার কর্তা বসে পড়লেন। শ্রুতি ধরে ধরে টলতে টলতে বসে পড়লেন। কে যেন বাবার প্রাণ্ড এক হাড়ুড়ী পিটিয়ে খোস করিয়ে দিল।

নেপালে বাসী উৎসাহিত হয়ে বললে, ঐ যে ঘরের ভেতর কালো পর্দা ঢাকা পাঁচার রয়েছে, কেন পড়ে দেখবেন ? অবিশ্তি এই পেরেব পাঠ।

খিগু উৎসাহে সে মুক্ত করল, পড় ময়না পড়, বল, রাধা কৃষ্ণ রাধা.....

সুইজারল্যান্ডের চিত্র

শ্রীঅরুণ চন্দ্র গুহ

.....ছোট সুইজারল্যান্ড দেশটা—অত্যন্ত ছোট। তাতে আছে ২৬টা canton লম্বাই স্বাধীন। বার্ন (Bern) হ'ল একটা canton বা মহকুমা এবং সুইস সরকারের কেন্দ্রীয় রাজধানী। সুইজারল্যান্ডের কেন্দ্রীয় সরকার লম্ব প্রতিিনিধিদের দ্বারা একটা Excursionএর ব্যবস্থা করেন—Bern Oberlandএ নিয়ে বাবার দ্বারা। Bern হ'ল জার্মেন ভাষী ক্যান্টন এবং এই স্থানের ভাষা হ'ল জার্মেন, বার্নান হ'ল Bern, ফরাসী ও ইংরাজীতে Berne লেখে। বার্ন ক্যান্টনের পার্শ্বভাগে অনেক আশ্রমের নিয়ে গেল। যে ছোট্টোলে থাকি সেটা রেল ষ্টেশনের একেবারে সামনে—রাবার তিক এপারে ওপারে। তার নটায় train-এ উঠবার কথা, সময় মতো ষ্টেশনে গেলাম। কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হ'ল না—কেন পথে যাব। বাড়ির তলা দিয়ে (under ground gangway) এখার থেকে ওখারে গিরে গাড়ীতে উঠলাম। সবই electric train, এদেশে করলার অভাব, কিন্তু ছোট্টো বাটো পাহাড়ে নদী নালা বরণা আছে বহু। এসব জলস্রোত থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করার ব্যবস্থা করেছে এবং দূর দূর গ্রামে ও পাহাড়ের উপরেও বিদ্যুৎ চলছে।

গাড়ীতে ১২ শ্রেণী আর নেই, খুব সামান্য হাটটা থাকে, হস্ত বিদেশাগত স্রমকারীদের (tourist) জন্য। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীই এখানকার রেলগাড়ী এবং এমনকি train-এও তাই। আমাদের দেশে নুতন রেল-মন্ত্রী প্রস্তাব দিয়েছেন প্রথম শ্রেণী তুলে দিবেন। তা নিয়ে ঠাট্টা ভাষাঙ্গা পার্লামেন্টেও গুনেছি। তা হ'লে দ্বিতীয় শ্রেণীই কি আমাদের সর্বপ্রথম পাকবে? এরকম যে হ'তে পারে এবং তাতে যে বিন্দুশ কিছু হয় না—তা হস্ত এখানে এসে বেথলে বৃদ্ধিতে পারবে।

রেলগাড়ী চলতে শুরু করল। আবার সঙ্গে ষ্টেশনে জুটে গেল স্রমদেশের প্রতিিনিধি দল। গাড়ীতে তাদের সঙ্গে অনেক আগাণ হ'ল। এঁদের যিনি নেতা (leader)

তিনি হেলুগ উকীল এবং আরাকানের একজন মুসলমান। আরাকানের ভারবন্দী মুসলমান, কতক স্থানীয় মুসলমান ও চট্টগ্রামের কিছু মুসলমান ওখানে পাকিস্তান দাবী করছে, ইনি তাদের বলের ও গোষ্ঠির নন। ইনি ভারবন্দী নন, ওখানকার খাল বন্দী মুসলমান। আমাদের থেকে একটি খুবক বলে ছিল, সে ফরাসী ভাড়া দ্বারা জায়ে না। তার সঙ্গে আগাণের চোঁ হ'ল, আর তুলে বাওয়া পুঁজিগত ফরাসী জায়েনের সাহায্যে রীতিমতো কলং করে তার সঙ্গে আগাণ জমালাম। মাত্র ২১ বৎসর বয়স, তার বাবা না লম্বই আছেন পাশের এক থেকে বলা। বাবা হ'ল বেলজিয় (Belgian) পার্লামেন্টের Secretary—একটা উচ্চপদের লোক। এই স্থানে ছেলটি fini l'ecole মূল শেখ ক'রেছে। এখন ডিসেম্বর পর্যন্ত সে দেশে আছে, তার পরই সে চলে যাবে আফ্রিকা—বেলজিয় কলোতে (Belgian Congo) চাপ করতে, তার ভাই চাষের কাজ ওখানে করছে। আমাদের দেশে এত দূর দেশে চাষের কাজ করতে যাবে—এত বড় একটা পদস্থ লোকের ছেলে—এত কলংকার বাইরে।

এমনি ভাবে আগাণ করতে করতে সুইজারল্যান্ডের গ্রাম্য পুস্ত বেথলিলাম। হাটা-বাট, বাড়ি-ঘর সবই কেমন পরিষ্কার। আমাদের দেশের কোন শহরে—কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী প্রভৃতি যাব দিয়ে এমনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা দেখা যাবে না। ফুড়ে ঘর নেই, থাকে ওরা cottage বলে—তা গ্রামই কাঠের ঘর—কিছু ডাঙা-চুয়া ঘর নয়। রেল লাইনের দুপাশে বেথলাম

মতান্তর মুসলমান ও স্থানীয় বন্দীদের সংযোগে যে সব মুসলমান সন্তান জন্মেছে, তাদের ভারবন্দী বলা হয়। বন্দী মেয়েদের প্রতি অনেক বিদেশীয়ই আকর্ষণ যায়। এই মিশ্রিত অধিবাসীরা ইংরাজ রাজের সমর্থক ছিল আরই।

কৃষির প্রাচুর্য। বাবাকপি প্রচুর দেখতে পেলাম, কলের মধ্যে দেখলাম—মেশপাতী (Pears এবং খুব ভাল জাতের) পিচ, আপেল, আখুর প্রভৃতি। আগুচা ও আড়ু এখানে দেখতে হয়। বিছাতের মেলপাতী, প্রথম শ্রেণী নেই—খুব বিশেষ প্রয়োজনে হাটটা প্রথম শ্রেণীর বদলার ব্যবস্থা থাকে। সবই দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণী। এখানকার tramও প্রথম শ্রেণী নেই, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীই আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যে পার্থক্য হ'ল—পরিষ্কার ও না থাকে। বেশ পরিষ্কার গাড়ীগুলি, সবটোতেই স্ক্রুয় কাঁচের জানালা।

গাড়ী থেকে পাহাড়ের সারি দেখা বাড়িল। পাহাড়ের গার গার চাষের ক্ষেত—সঙ্গে ঘোচারণের (Grazing Ground) ভবিষ্যৎ আছে। পাহাড়ের সরগা বহু দেখা বাড়িল। গাড়ী থুন (Thun) নামক স্থানে থামল। আনরা একটা motor launch উঠলাম,—আনরা ৪ শতের বেশী ছিলাম—প্রায় ৪০০ হবে। লক্ষটা বেশ বড় ছিল। Thuner See বা থুন হ্রদে লক্ষ লগতে লাগল। জলটা একেবারে কালো, আনাদের দেখনার বা বনুনার চেয়েও কালো। লকে যেতে যেতে তার পাড়ে পাহাড়ের সারি দেখেছিলাম। পাহাড়ের গার নেব একটু একটু জমছিল। আর দেখা বাড়িল রূপালী বরফের প্রদেশ। বরফের গার তৌর পড়ে বেশ কক্ককু করছিল। তারতবর্ষে এমনি বৃষ্টি বহু স্থানে দেখা যায়। কিছু বা তারতে দেখা যায় না তা হ'ল সমস্ত বৃষ্টিপটের দিগন্ত বা বাহুব পরিপ্রসন্ন দিয়ে বর্ষি করেছে। একই ভিনিব বিভিন্ন বৃষ্টিপটের আখকে বিভিন্ন রূপ নেবে। স্ক্রুয় প্রাকৃতিক দৃষ্টের সঙ্গে যদি দেখা যায় নোবো আয়েটন, নোংরা অব-উলক, অব-বুড়ু ককালসার বাহুব—তবে চোখ ও মন ক্রীত না হয়ে বরং হৃৎপিণ্ডই হয়। দুইবারদ্বারের পাহাড় তেমন কিছু উঁচু নয়, ভারতের বিশালকার ও অতলতলী পাহাড়ের কাছে এগুলি টিলা বলে প্রতীত হবে। কিন্তু ঐ নানি উচ্চ ও হোট পাহাড়গুলির সঙ্গে বাহুবের যে দৃষ্টির পরিচয় আনরা

পাই—জাতেই মন আনন্দে ভরে যায়। এরা প্রকৃতিকে স্মরণের কয়েছে, আনরা প্রকৃতিকে কর্তব্য করেছে।

থুন হ্রদ পার হয়ে লক্ষ ছুতল—থালে ছুতলাম। থুন ও জিরেজকে (Briens) সংযুক্ত করা হয়েছে এই থাল দ্বারা। থাল দিয়ে বেশী দূর যেতে হ'ল না, কিছুদূর দিয়ে ইন্টারলেকেন (Interlaken) পর্য্যন্ত দুই হ্রদের মধ্যবর্তী শহরে আনরা নামলাম। ট্রেন থেকে দল বেঁধে শহরের দিকে আনরা বাড়ি—আর সবাই হাত্তার পাশে বাড়ির দেখছে। হাত্তার দুপাশে কেবল হোটেল, রেস্তোরাঁ, কাকে এবং কিছু মোকান। সমস্ত শহরটা এবং পাশে পাশের গ্রামগুলিও নির্ভর করছে কেবল বিদেশী ভ্রমণকারীদের উপর। তারা আসে—হোটলে থাকে ও তার এবং ঐসব মোকান থেকে ২৮ টাকা করে ভিনিব ২৮ টাকা দিয়ে কিনে। পূর্বে এখানে ইংরাজ ভ্রমণকারী বহু আসত, এখন ইংরাজের হাতে তত পরসা নেই—বিশেষত বিদেশে বরচ করার মতো। এখন ভ্রমণকারী খুব বেশী আসে আমেরিকা হ'তে। যাকে বলে "আজাদের পরসা"—তা এখন কেবল আমেরিকার সংযুক্ত রাষ্ট্রের লোকদেরই আছে। বার্ষ শহরে হোটেল বরচ অল্পব বেশী, কেবল থাকা ও প্রাতরাশ (breakfast) এর জন্য দৈনিক ৪০-৮৫ টাকা করে দিতে হয়, দুপুরের ও রাতের খাওয়া বাবদ আরও ২০-২২ পাগবে। তার উপর লতকরা ১০ নেবে পরিবেশন (service) বাবদ। দৈনিক যদি ৬০-৭০ সর্ব সামুণ্যে হয় তবে পরিবেশন বাবদ আরও ৬৮ টাকা নেবে। এর উপর যদি বরো খাওয়া আনানো যায়, বা যদি তাদের লিষ্টের বাইরে কোন খাবার নেওয়া হয়, তার জন্যও আলাদা চার্জ দিতে হয়। একদিন দুপুরে ডিমের অরলেট, আলু সিদ্ধ, beans সিদ্ধ খেলাম—ফ্রিট ও না, তাতে চার্জ করল ১০ ফ্রাঙ্ক—অর্থাৎ ১২৪০ টাকা এবং তার সঙ্গে একটু দই নিয়ে আরও গুণগারি দিতে হ'ল ১০০। বাজেই সংজ্ঞেই অস্বাদন করা যায়—বিশেষী ভ্রমণকারী-সেত কাছ থেকে এই বেশ কত টাকা দেয়। বা চার্জ

উপরে বদলান—তার উপর আবার নাগরিকটেক্স (city tax) একটা নের—তা-ও দৈনিক ১ টাকা হবে।

অবাস্তব কথা ছেড়ে আবার আমাদের ভ্রমণের কথা বলি। Interlaken এ Victoria Hotel এর ৫০০ লোকের খাবার ব্যবস্থা হ'ল। আমাদের বেশ নর—বে কলাপাতা বা শালপাতা; পেতে মাটিতে বসিয়ে দিল—শত শত লোক থাকে—উঠে থাকে—আবার একদল বসছে। এই ৫০০ লোককে একসঙ্গে টেবিল ও চেয়ারে বসিয়ে ভরসাভাবে খাওয়ানো হ'ল। অর্থাৎ চেয়ার, টেবিল, বাসনপত্র সব কিছুই ৫০০ লোকের মতো ওখানে যোগাড় ছিল। হোটেলটার নাম Victoria, এই নামের আরও বহু হোটেল সুইজারল্যান্ডের অন্তর্গত দেখেছি। এতে অল্পমান করা চলে—ইংরাজ ভ্রমণকারী এখানে বহুদিন যাবৎই আসত এবং ইংল্যান্ডের দিষ্টাভিয়ার নামে হোটেল করা হয়েছিল রাজ-ওজ ইংরাজ ভ্রমণকারীদের আকর্ষণ করার জন্য। আমি খুব বেশী ভীড় প্রায়ই এড়িয়ে চলতাম; তাই ২১৩ জন বর্ষী ও ভ্রমী সহযাত্রী নিয়ে এক পাশের এক ছোট টেমিলে বসে ছিলাম, এমন সময় loud speaker এ নির্দেশ এল—কার্যকরী সন্নিহিত সভ্য এবং বিভিন্ন দেশের এতিমিহিদের নেতাদের স্তম্ভ বড় টেমিলে সভাপতির সঙ্গে স্থান দেওয়া হয়েছে। আমি এই পর্বতের মধ্যেই পড়ি। কাজেই নিম্নিহি টেমিলটা ছেড়ে বড় টেমিলে যেতে হ'ল। সভাপতির ডান দিকে একটি বয়স্ক ইটালীয় মহিলা—আমাদের কনফারেন্সের সভ্য, তাঁর পরই আমার স্থান; এবং আমার ডান দিকে একটি সুইস মহিলা। এভ্যাকের নামে টিকেট লাগানো ছিল। ছুটি মহিলাই ইংরাজী জানে, সুইস ভাষাটী বেশ ভালই ইংরাজী জানেন। কাজেই তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা হ'তে লাগল।

একটা বিষয় লক্ষ্য করেছি সবাই ভারতবর্ষ সফরে আসতে চায় এবং ভারতবর্ষ সফরে কিছু যে জানে—তাও

অনেকে দেখতে চায়। ভারতবর্ষকে শান্তিরও করে এবং সেজন্য আমরা এবং যুক্তিসত্ত তাই আমি—অনেক স্থানে একটু শান্তির পেরেছি—তারতের এতিমিহি বলে। এই ছুটি মহিলাও ভারত সফরে অনেক প্রশ্ন করছিলেন। সফরেরই আগ্রহ দেখেছি—কহানিই প্রত্যয় কতটা এবং কি প্রকারের। সকলেরই তথ—পাছে ভারতবর্ষও চীনের মতো কহানিই হয়ে যায়। আমাদের বর্তমান সমস্যা, পুনর্গঠন (reconstruction) এবং উন্নয়নের (development) কাজ কিরকম চলছে—এ সব নিয়ে কথা হ'ল। আর শু ভারত সম্পর্কে গান্ধী ও রবীন্দ্র আছেন—এ ছুটা নাম প্রশ্ন সবাই জানে। সুইস মহিলা-টির শান্তকী নাকি রবীন্দ্রনাথের স্তম্ভ এবং কবে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা হয়েছিল—সে সব কথা বেশ গৌরবের সঙ্গে বলছিলেন। খাবার ঘরে আমাদের টেমিলের সামনে বহু পতাকা ফুলানো ছিল, প্রথমে মনে করেছিলাম যোগ্য হর বিভিন্ন দেশের সব পতাকা। তাকিরে দেখলাম—না, তা নয়। তখন বুঝলাম সুইজারল্যান্ডের বিভিন্ন ক্যান্টনের (canton) সব পতাকা। শুধু দেখলাম—পতাকা আছে ২৫টা, কিন্তু ক্যান্টন হ'ল মাত্র ২৬টা—কাজেই সে হিসাবেও মিলছে না। পাশে সভাপতিককে জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি বললেন—তাঁদের বিভিন্ন ক্যান্টনের পতাকা। আমি বললাম—তা ত নয়, এখানে পতাকা আছে ২৬টা—কেন্দ্রীয় সরকারের একটা চান্ডা, —কিন্তু ক্যান্টন শু মাত্র ২৫টা। তিনি তখন পতাকাগুলি শুধু বললেন—হঁ, ঠিক হয়েছে, আমাদের কয়েকটা ক্যান্টনের আবার sub-canton বা অর্ধ-ক্যান্টন আছে, এবং তাদেরও আলাদা পতাকা আছে। আমি তখন ভাবলাম—কান্সির একটা আলাদা পতাকা নিজে চাচ্ছে, তা নিয়ে আমাদের কত বিতর্ক ও সন্দেহ, বেন এক রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় পতাকা ভিন্ন আর কোন পতাকা রাখা যায় না—এমনি একটা প্রত্যয় আমাদের আছে। সুইজার ল্যান্ডের এই ২৬টি পতাকা দেখলে হয়ত কান্সির প্রস্তাবকে কেমন অসম্ভব বলে আমরা মনে করব না।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার গিয়ে রেলগাড়ী। এবার বার্ষিক মালত্বদিতে (Bernese Oberland) উঠতে লাগলাম। বিদ্যুতের রেলগাড়ী পাহাড়ের উপর উঠতে লাগল। আমাদের দেশে পাহাড়ে চড়বার রাস্তা প্রায় সবই বিন্দু (spiral) গতিতে উঠেছে; কিন্তু এখানে দেখলাম—সিঁথে চলে গিয়েছে—বিন্দু গতিতে নয়। যাবার মুখে যখন সামনের পাহাড়ের গার রেলের রাস্তা দেখেছি তখন সেখানি কেমন খাড়া রাস্তাটা উঠেছে, কিন্তু নিকটের গতি গাড়ীতে বসে ঠিক বুঝতে পারি নি। মন্থ গতিতে গাড়ী চলছিল, সাহির পর সাহি পাহাড় বেয়ে উঠেছে—গতি তার দ্রুত হতে পারে না। রেল লাইনটি ঠিক সোজা যায় নি। এই সব পাহাড়ে স্থানও বোটের উপর ভাল রাখাই আছে—গাড়ী চলবার ও পারে হাটবার। কোথাও কাঁচা রাস্তা বা গরুর গাড়ী যেখিনি। ঘোড়ার গাড়ী লোক ও মাল বইবার—কিছু দেখেছি। আমাদের দেশে যাকে গরুর গাড়ীর রাস্তা বলে—তা কোথাও দেখি নি। পাহাড়ের গার সাদা বরফ জমে আছে, আদ্য তাতে সূর্য রশ্মি পড়েছে কিন্তু এই ব্রহ্ম নষ্ট করে মিল নেই ও বৃষ্টিতে। তার আগের রাত্রি থেকেই বৃষ্টি হুক হতেছিল। তাই বর্ষাতি (water proof) সঙ্গে নিয়েছিলাম, পরব জামাও। উঁচু পাহাড়ে চড়ছি, তাকে বৃষ্টি; কাকেই সতর্কতা নিজেই বেরিয়ে-ছিলাম। স্কাইপ (Scheidegg) নামক স্থানে আমরা নামলাম।

এখানেও বহু হোটেল ও রেস্তোরাঁ আছে, স্থানটা ৬০০০ ফুট উঁচুতে। ভ্রমণকারীদের কাছে বিক্রি করার জন্য হাতের তৈরী কিছু দ্রব্য, সিগারেট ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যের আটা ঘোড়ান বা store আছে। এক টাকার জিনিষ অল্পতঃ ২৪০ টাকার এখানে বিক্রি করে। তবুও ছাছবিণ্ডি ও হিদিমগিদের জন্য ২০০টা হাতে তৈরী টুপি কিনলাম, প্রায় ১০০ দাম পড়ল। হস্তত বাংলাদেশে ঐ জিনিষ ৩০ টাকারও কিনতাম না। এখানে ৫০ খাবার ব্যবস্থা। খাবার ব্যবস্থা দেখানে বাই থাক

বিভিন্ন দ্রব্যের মূল্য থাকবেই এবং তা চাইতে হবে না, কেবল না খেতে হ'লে প্রতিরোধ করতে হবে—hard drink চাই না, soft drink এই আমার পিপাসা মিটেবে। বার্ষিক হোটেলের খেতে বেশি; সহযোগী বন্ধু আকতার হোসেন কতকটা খুক। সব হ'ল বোতলের অ-মত পানীর কিছু পান করবেন। খাও রকমের বোতল নিয়ে এল, পরিবেশক (waiter) বলল—এতে মদ নেই। কিন্তু বিশ্বাস হয় না। ওর গার বা দেখা তা সব করাসী ও জার্বেন তাবার। "liequor" শব্দটা ওতে আছে, যেহেতু খাঁৎকে উঠান। তারপর প্রায় বিশ্বস্ত করাসী এবং বিশ্বস্ত জার্বেন বিজ্ঞা দিয়ে আনিষ্কার করলাম—করাসীতে liequor শব্দটার পূর্বে আছে "sans" অর্থাৎ ব্যতীত এবং জার্বেনে ঐ শব্দটার পরে আছে "freit" অর্থাৎ মুক্ত। তারপর সেই আঙ্গুরের ও আপেলের রসের বোতল খোলা হ'ল।

স্কাইপের রেস্তোরাঁতে চায়ের আসন। ৬০০০ ফুট উঁচু স্থান—বেশ বৃষ্টি পড়ছে। কাকেই সহজেই অনুমান করা যায়—মতপান দেখানে অব্যবহাবে লেগেছিল। নিগ্রো, ফিলিপিনো প্রভৃতি অশেষতাল প্রতিনিহিতাও বেশ মন চালাছিল, এবং এদের রেস্তোরাঁ পর্বত ফিলিপিনোর প্রায় সব রকমেই আবেশিকার অনুগামী। প্রায় সবাই নিজ নিজ স্ত্রীকে সঙ্গে করে এনেছিলেন। ওষ্ট-রজিকা, কপোল-রজনী, নন-রজিকা—সবই এরা প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করে। সঙ্গে সঙ্গে পোষাকেও এরা আবেশিকার অনুগামী, রাজনীতিতে ত নিম্নতর। টোটে, গালে ও নখে রঙ লাগানোর কি সার্থকতা আছে—ঠিক বুঝি না। তবুও ধন্যবৎ সাদা রঙের উপর হস্তত এসব কিছুটা নান্য, কিন্তু কালো বা অতীত রঙের উপর এতে যে বিশেষ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তা মনে হয় না। ইন্টার লেকেনে যে ছুই বহিলা আমার চুপাশে বসে-ছিলেন—তারা খাবার পরই ঐ টেবিলে বসেই গলিয়া থেকে একটা কেটা বের করলেন, তার ঢাকনিতে আরনা লাগানো আছে। তা দিয়ে খুব দেখে, গালে

ও টোটে রক্তের একটা পেন সাপ্লাসেন। একতলো লোকের সাধনে এটা করলেন—এতে কোন সফলতা এসেছে নেই। জাহান তেবা দুটি ভেদা—তাদের পরিবর্তনে লোকের দেখবার ভঙ্গি বদলে যায়।

চায়ের টেবিলে দুটি আমেরিকান ও আমি বসলাম। গল্প করতে করতে ৩ খণ্ডা হল। ওরা বেশ প্রচুর খেল—কেক, বিলুট প্রভৃতি। আমার পেটে তখনও ইন্টারলোকেনের খাত কিছু ভরে ছিল। অবশ্য সেখানেও কিছু খাবার বিক্রাট গিয়েছে। ডাক্তারী নির্দেশে মাংস খাওয়া আমার নিষিদ্ধ। কিন্তু এক খাবালা একটা মাংসের টুকরা মেটে এল। ভটা যে খুব ক্ষুধার জ্বর মাংস নয় তা বুঝতে পারলাম। তবুও মাংসটার ক্ষয় পত্রিকা নিয়ে আলোচনা না করে মহিলাদের সঙ্গে গল্প করতে করতে ২৪ বার ছুবি দিয়ে কেটে তা খেলাম, কিন্তু বিবেশে ডাক্তারী অমুশাসন অমাত্র করতে সাহস হল না। মজুর নির্দেশ অমাত্র করে অখাত মাংস খেলে পরলোকে কি হবে—জানি না; কিন্তু ডাক্তারী নির্দেশ অমাত্র করলে যে সজ সজ মধ্যা এহণ করতে হতে পারে সে ভয়টা ভুলতে পারলাম না। বাব—আবার বিভাগের রেকর্ডারের আসা থাক। আমেরিকান একটু ত এক গালা কেব ইজ্যাবি নিয়ে বসেছিল, শেষ পর্যন্ত আর সব সাবাত করতে পারল না। পরে যোজী ভাবে আমার বললো তার মেটের তার লাগব করতে; আমি পেটের ভাবের ঘোহাই দিয়ে “বাকি মারলাম”। সবাই খুব শ্রীত—এই অভিযানে; কিন্তু অনেকেই হুংহ তরছিল—এমন দুলর দৃষ্টটা নষ্ট করল যেন ও রুটতে।

প্রায় বেড় গুটা ওখানে কাটিয়ে আবার এলে রেল-গাড়ীতে উঠলাম। বার্ষ থেকে রওনা হবার সময় এক-খানা টিকেট প্রত্যেকের হাতে দিগেছিল—বাওরা আসার ফেরত টিকেট। তদনিক বাওরার সময় একবার এলে একজন দেখেছিল; কাকেই টিকেটটার বিশেষ মূল্য অমুত্তব করি নি। ভটা ফেরত টিকেট (return ticket) ভা-ও খেয়াল করি নি। কোথার গুটা পড়ে গিয়েছে।

ফেরবার বুধে গাড়ীতে উঠতেই T. T. checker এসে টিকেট চাইল; সবে বিদেশী (Swedish) দুটি লোক এবং একটি মহিলা ছিলেন। সব খুঁজে checkerকে বুললাম নেট, হারিয়ে গিয়েছে। ওখান থেকে গাড়ী ছাড়ার পূর্বে আরও দু'বার checker এল। শেষ পর্যন্ত বুললাম—এই দেখ নিমন্ত্রণ কার্ড আছে; তাতে বহি না হয় পরলা দিঞ্জি টিকেট যোগ। চলে গেল। সুইডিশ সহযাত্রীরা সবাই বেশ সহজ ভাবে রসিকতা করতে লাগল। এর পর আর এক গাড়ীতে গেলো। তখন পাশে একজন ইংরাজ—গাড়ী এক টেপনে বহলাতে হল। আবার টিকেট চেকার, ইংরাজ সহযাত্রীটি বললেন—“তুমি চূপ করে বসে থাক”—তবুও আমি সেই নিমন্ত্রণ কার্ডখানা হাতে নিয়ে বসেছিলাম। বেকের এখনে ইংরাজটি ছিলেন; তার টিকেট দেখেই চলে গেল। এর পর আবার বিক্রাট হল—বার্ষে নাম্বার আর পূর্বে। আবার চেকার; সহযাত্রী—ওরা পরলা নিয়ে টিকেটও দিবে না—আর কেবল টিকেট চেকার! থাক—এবার সঙ্গে ছিলেন সুইস বৈদেশিক বিভাগের একটি কর্মচারী—যিনি এই বহিঃসম্পন্ন চার্জে ছিলেন। তিনি আমার চিন্তেন। ওরা আসতেই বলায়—বাপু, আমার টিকেট হারিয়ে গিয়েছে, যা হয় করো। ঐ কর্মচারীটি হেসে বললেন—“Are you sure you have lost your ticket? It might be in your pocket.”—বলেই আমার কোটের বুক পকেটে হাত দিগেন হাতে একখানা টিকেট। তার বা হাতে আরও টিকেট ছিল; বুললাম আমার মতো অবস্থা আরও লোকের হয়েচে এবং তাদের ব্যবহার অল্পই কর্মচারীটি করেখানা অভিহিত টিকেট সঙ্গে নিয়ে চেকারের সঙ্গে লকে ঘূরতলেন। ঐ স্থানে সব টিকেট ওরা নিয়ে নিষিল। এই ভাবেতো টিকেট বিক্রাট থেকে পাঠ গেলো। এর পর পূর্বে সুইডিশ সহযাত্রীদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, তারা বেশ আনন্দিততার সঙ্গে ভিজালা করাছিলেন—টিকেটের কামেলার কি হল। আমি ওাদের বললাম—হাসতে হাসতে তারা চলে গেলেন।

এবার সমস্ত পথই রেলপাড়ীতে এলাই, ঐ ২টা ক্রমের জপের পরে দিচ্ছে। সন্ধ্যার পর ক্রমের পাশে এসে ও নব্বইর আলো জলে উঠল—সবই বিদ্যুৎ। আর তার চুন গিরে পড়ছিল ক্রমের কালো জলের বুকের অভ্যন্তরে। কালো বেরেটাও হুৎ হুৎে খেন নীপ মালা পড়ানো হয়েছে।

বার্ষিকের এলাই—হাত পোশে ২ টায়। ঐশনের একেবারে উঠে দিকেই আবারের হোটেল। সবাই পরিতৃপ্ত হয়েছে নাইন সরকারের আভিষেক এবং ততো-বিক পরিতৃপ্ত হয়েছে ঐ অকালের প্রান্তিক শৌকর্ষে। ৫০০ লোক—বিভিন্ন দেশের—দিল্লী থেকে হুৎ করে নাক উঁচু ইংরাজ ও আমেরিকান পর্বত এক সঙ্গে চলেছে, ফিরেছে, খেয়েছে। অথচ কোন বৈ হলো নেই,—কোনোও কিছুমাত্র নেই। ইন্টার লোকের হোটেল যেতে বাবার সময় টুপি, লাঠি, বর্ষাতি প্রকৃতি বাইরে বেখে বেখে ছেয়েছে। ৩৪ টি ঘরে এর তার মিত্রে; প্রত্যেককে একটা করে নব্বই হাঙ্গা (slip) স্লিপ দিচ্ছে। ইচ্ছা করলে একটা স্ট্রেটে ৫১০ সেন্ট (cent) দিয়ে যেতে পার—বোধ হয় কোন charity fund। এত লোকের এত ক্রিনিস হেবেছে—ভাঙেও কোন গোলমাল বা হলো নেই। এই যে শুমলা গোধ ভা যেমন বেখেছি এদের লিভ্যাকার আচরণে, তেমনই সেগেছি এদের বাবদ্য এবং এমনকি প্রান্তিক পরিসেবে। সবই জ্ঞানো।

এ বিবরণ এখানে শেষ করি।

কাল সন্ধ্যার ও আভিষেক দেবদ্যায়ীরা চিঠি বার্ষ থেকে redirected হয়ে এসেছে। এখানকার ট্রিকানার সন্ধ্যার কোন চিঠি এখনও পাই নি। তুমি বিজ্ঞানের কথা লিখেছ—এখানেও সারা! দিনই বিজ্ঞান। কাল Dr. Buchman lunch এ গিয়ে গিয়েছিলেন। আবারে তাঁর ট্রিক ভান দিলে seat দিয়েছিল এবং বা দিকে ছিল তার্ণব। তার্ণবের প্রতিনিবিরের বেশ খাতির এখানে করছে। বুক্যান ৭৪ বছরের হুৎো, ভাঙে ভানু হুৎো-হুৎো, কিন্তুমার বা হাঙের চেয়েও। খাবার সময় আখি

বলদ্যাব—“Doctor, shall I help you?” তিনিও রাষ্ট্রী হলেন—কারণ waitress দের dish থেকে একহাতে খাবার তুলতে পারছিলেন না। আখি প্রত্যেকবার হুৎে দিলাই, বা হাঙে খাচ্ছিলেন।

এখানে কোন paid servant বা maid নেই। সবই বেঞ্চালেশবকরের করতে হয়। কাল আবারে সব জায়গা ঘুরিয়ে দেখাল। kitchen এ অল্পতঃ ৩০-৪০ জন কাজ করছে—বিভিন্ন দেশের দেহেই বেশী। সবাই প্রায় ভালবরের একা পিকিত। প্রায় হোজই ১০০০ লোক খায়। এদের পরিবেশন করে একপাল বেহে, এরাও সবাই বেঞ্চালেশবিক। এবং ভাল ঘরের। সাধারণতঃ নিয়ম হচ্ছে breakfast, lunch, tea, dinner ও supper সবই নীচে গিয়ে খাবার। একজন ইংরাজ Ex-captain আবারে খাতির করে break-fast টা ঘরে গিয়ে বার ৭ টা আকাজ। নীচে এর সময় হল—৮—৯। ভয়ের দ্বিতীয় হাতস্বররা আবারে সবচেয়ে কিছু লিখেছিল আখি। হুৎে সেজন্তও আবার একটু বেশী খাতির করে।

কাল এক লেটতির অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হল, কুপুংরে আবার ঘরে এসেছিলেন। একজন ইনি refugee, Sweden এর Gottenberg University তে professor বলে পরিচিতি করিয়ে দিল; কিন্তু তত্ত্বলোক বললেন—তিনি অধ্যাপক নন বার্ষ একজন assistant। মনে পড়ল—আবারের বেশে অধ্যাপক পদবীটা নামের আগে লাগাবার কি আগ্রহ! তিন মাসের জন্ত এক কলেজে lecturer বা demonstrator থেকে স্থায়ী ভাবে Prof. Guba বলে খ্যাত হয়। কংগ্রেসের বেঞ্চালেশবকরের Major হয়ে ২৪ বছর পরও সে “major”। তত্ত্বলোক লেটতির অনেক হুৎের কাহিনী বললেন; ৪ খানা বই দিলেন। তিনটি বলটিক দেশের ইতিহাস (Baltic countries), Philology প্রকৃতি নিয়ে কথা হল। পরে বললেন—তুমি এখনও তবিকে খাতির নি—অথচ এত জান—আবারে খুব লজ্জা হচ্ছে তোমাদের এত বড় দেশ সবচেয়েও ত কিছুই আখি জানি না। কেবল

আমি বুজা (বুজ) ও গাভী (গাভী)...। মণি আবেগিক।
সঙ্গে একজনকে সঙ্গে রাখার টেবিলে আলাপ হবার পর
জিজ্ঞাসা করল—আমি কবে গম্বিকে গিয়েছিলাম। অব্যব
তনে আশ্চর্য হল—এত সব কথা কি করে জানলাম।
তোমার ভর ছিল হরত সর্বত্রই জানাতি বলে বরা পড়ব ;
বোধ হয় তা হতে হয় নি। কেনাইটার করেকটি নিঃশব্দ
সঙ্গে কাল আলাপ হল। একদিন এক টেবিলে খাবার
অজুগোষ করেছে ; বোধহয় আজই তাদের সঙ্গে lunch

খাব। আরও কিছু কিছু বেশের লোকের সঙ্গে আলাপ
করব। বার্ণে ফিলিপিনো এবং প্রানী প্রতিিনিবিরের
সঙ্গে খেপ ভাব হয়েছে। Philippines leader ও
আমার বক্তৃতা শুনে ঠিক করে নিঃশব্দ—আমি একজন
লেখক। ইনি আগামীবার President এর অগ্র দাঁড়িয়ে
এবং হরত নির্বাচিত হবেন।.....

২৪ পেন্সিওর

১৯৫২

তোমার,
অরুণমা।

কুমার

সারারপ গল্পোপাখ্যান

কার্তিক মাসের নবী একথানা নীল চাদরের নতুন

অতাব নেই।

পড়ে আছে। অলে ডেউ নেই, বাতাল পর্বত বইছে না।
সকালের দিকে বরং একটু শীত শীত করছিল, কিন্তু
এখন রোষের তাপে সারা গা অলে আছে।

ছোট, ছোট টুকুর ভেতরে আমি আর মজুমদার বলে
ছিলাম। পাশেই পড়ে আছে বন্ধু দুটো—আর
সারাটা দিন আলাপ আলাপ শুনের টেনে আনাদের হাতে
আর কাঁধে কড়া পড়ে গেছে। এখন হাল ছেড়ে গিয়েছি।
বতহুর মনে হচ্ছে, অবধাই বাবে দিনটা।

ছাইয়ের ভেতরেও রোদের ঝাঁক আসছে—আমি আর
মজুমদার চাননেই শাট খুলে ফেলেছি। তবু বাবে ভিজে
উঠছে গায়ের গেঞ্জী। ভারী বিরক্ত হয়ে আছে মন।
শিকার পড়ুক বা নাই পড়ুক, অতন্ত দুটো একটা ফারার
করতে পারলেও মন তৃপ্তি পেতো থাকিত। কিন্তু
কোথায় কী।

পূব গাল গর শুনিয়েছিলেন মজুমদার। এই নদী
নাকি কুমীরের আড়ত। একবার নৌকা নিয়ে বেরো-
লেই দুটো চারটের সন্ধান বেলে। এক সঙ্গে দল বেঁধে
ভরে থাকে বাশির ডোরা, রোপ পোয়ার। বাজী থেকে
আরন্ত করে ডিমকোটা বাজা পর্বত কোনো কিছু

শুনে লোভের টানে বেরিয়ে পড়েছি। কিন্তু উজান
তাঁটিতে লম্বানে বাইল মশেক পাড়ি দিয়েও কুমীরের
সন্ধান পাওয়া গেল না। মজুমদার বলেছিলেন, মেরে
আরাম পাবেন মশাই, করেকটা মান-ইটারত হয়েছে
ইমানী—কিন্তু দেখা যাচ্ছে সবই অলোয়। কুমীর
তো দুরহান, বড় গোছের একটা সাইপের ঝাঁক পর্বত
পাওয়া গেল না যে ফিরে গিরে আরন্ত; যোষ্ট খেয়েও
শোত বেটানো থাকে।

তার বললে মজুমদার টিকিন ব্যারিয়ার খুললেন।
বেল পাউকটি টুকরো, লেড ডিম, একটুবাশি আলুর
দধ, হাল আর লতার ভাঁড়ো। বললেন, একটু রস
নেওরা থাক—আমুন।

আমার বিরক্তি ঘোব হচ্ছিল।

—শিকারের নামেই দেখা নেই মশাই, বেলা
বারোটোর সময় আর পাউকটির শুকনো টুকরো দলা
দিয়ে নামবে না। তার চাইতে চলুন, ফিরেই বাই।

—শিকারের অভিজ্ঞতা আপনাদের অন্ন—একটা
উজানের হাসি হাসলেন মজুমদার : তাই বৈধ হারাজেন
একটু অপেক্ষা করুন না, বেরিয়েছি যখন, পাইব।

মজুমদারের চাইতে শিকারের অভিজ্ঞতা আমার কম কি বেশি, সে নিয়ে তর্ক করতে ইচ্ছে হ'ল না। কিন্তু সত্যি সত্যিই আমার বিরক্ত লাগছিল। আরো বিস্তীর্ণ লাগছিল যারা আমাদের নৌকো বাইরে তালের দিকে তাকিয়ে। একজন বলবর, আর একজন তাঁর ছেলে বন্ধু। হাল ধরে বলে আছে জলধর, রোদে তাঁর মাথার লাগা চুল ঠিক ঠিক করছে, তার মুখের ওপরে স্পষ্ট স্মিট স্মিটের ছায়া, স্বর্ঘ একেবারে তার চোখের সামনে জলছে—তাকে আড়াল দেবার জন্য একখানা হাত গ্রাউন্ড তুলে ধরছে কপালের ওপরে। উজানমুখী নৌকাকে সামনে এগিয়ে দেবার জন্য প্রাণপনে ঠাঁড় টেনে চলেছে চৌদ্ধ বছরের বন্ধু—প্রত্যেকটা টানের সঙ্গে পেটের চামড়াটা নেমে বাজে পিঠের দিকে, পাঁজরের ছাড়গুলো ঠেলে ঠেলে ওপরে। কালো গা বেরে ধর ধর করে ঘাম ঝরে পড়ছে।

আমাদের ডিব কটির দিকে বার বার ক্ষুধার্ত পুষ্টি পড়ছে তার। এমনিতেই শুকিয়েআশা গলাটা সে পুষ্টিতে বেন জুড়ে আসছিল আঠার নতো। একবার তাৎলায়, তকেও তকে খেতে নিই, কিন্তু সত্যোচ বোণ করলাম। জামি, মজুমদার সেটা পছন্দ করবেন না। খাস ভালুকের প্রকারে অভখানি প্রায়ের দিতে তাঁর মর্যাদার কাছবে।

—কিছুই যে খাজেন না মশাই।—একটা আছো ডিমকে গিলতে গিলতে অবসর স্বরে মজুমদার বললেন।

—বাগ করবেন, ভালো লাগছে না খেতে।

—সারাদিন না খেয়ে থাকবেন? তা হ'লে তোঁ ফিরে যেতে হয়—মজুমদারের মুখে কোন্ডের ছায়া পড়ল। ডেলেটার দিকে পিঠ করে বসলাম। কিন্তু কটি আর নামতে চায় না।

—ওই জলধর আর বন্ধুকে খাইয়ে দিন না কিছু, সকাল থেকে তোঁ সামনে নৌকো টানছে।

মজুমদার চক চক করে ওষাটার কেরিয়ারের গ্রাউ অধেকটা নিঃশেষ করলেন। তারপর কৃষ্টির একটা

চৌকুর তুলে কপাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বললেন, তবেই হচ্ছে। ওদের এখন খেতে বলা মানে কী আদেশ? নৌকো বেঁধে সেড় বক্টা বরে মুড়ি চিবোবে, আরো আধ বক্টা হ'কো টানবে। তারপর আলসেমি ধরলে আর উজানমুখী বাইতেই চাইবে না। না-না, ওসব করবেন না।

—কিন্তু লোকগুলোর কষ্ট হচ্ছে বোধ হয়।

—কষ্ট? মজুমদার হাসলেন: ওদের এখন অভ্যাস আছে মশাই। দিনান্তে একবার পেট পুরে ভাত আর পেঁয়াজের তরকারি খাইয়ে দিন, ব্যাল, আর বেগতে হবে না। বন-বাগাড় জলাভক্ষণ—সামনে ঠেলে নিয়ে যাবে। বেশি খেতে পেলেই এরা অবেলী হয়ে যাবে—দেখবেন ঠাঁড় ঝাঁড় ছেড়ে দিয়ে কিছুতে আশঙ্ক করবে। বেড়ালের ব্যাপার জানেন তো? তর পেট খাবার জুটলে ইঁদুর ধরবার নাম করবে না আর।

মুড়িটা চমৎকার। আর প্রতিবার করেই বা আমি কী করব? এ ভ্রাতার অনেকগুলো মাটির নাসিক মজুমদার মশাই, দিনরাত এমিকের লোক চরিয়ে খান তিনি। হুস্তমাত্তার জুরো মর্শনের ওপর আমার কী বক্তব্য থাকতে পারে? আমি তাঁর আমন্ত্রিত অতিথি—দিন করেকের জন্য এখানে প্রকৃতিবিলাস করতে এসেছি। একটা সুবীরের চামড়া যদি কাউ জুটে যায়—একটা ম্যান ইটারের চামড়া, তা হলে সন্ধ্যাবে সেটাকে নিয়ে বসকাতার ক্রিতে পারব। এখানকার লোকের বনজর কিংবা উদরভৃত্ত নিয়ে গবেষণার কাজ অন্তত আমার নয়।

কিন্তু জলধরের দিকে চোখ পড়তেই আমার শরীর কুঁকড়ে আসছে। তুল বেগছি কিনা জামি না—লোকটার মুখে চোখে বেন অসহ একটা বয়সার ছায়া; রোদে চক চক করা চুলগুলোর মধ্যেও যেন সেই বয়সার জালা জলছে। হাতের এঁটিল শিরাজলো জুটে উঠেছে তকের ওপর—যেন এই অক্ষণের বক্তৃতাতে বড় বড় পানি জেঁকি রক্ত শুবে বাচ্ছে তার।

নদীর দিকে দৃষ্টি সরিয়ে দিলাম। গ্রাম নাক্ষবান দিবে চলছে। এক দিকে হিমালয়ের কালো অরণ্যের রেখা—অন্য দিকে আরো অস্পষ্ট হুঁহুয়ী বনের ঠাঁকে কীকে কাশ হুলের গুচ্ছ। নাক্ষবানে নিম্নস্তর কিম্বদন্ত নদী—ধর রৌদ্রে দানিত। অশ্বপাশে ছুঁচাবটে ক্ষুদ্রাংগাশালিক আর সাহসাত্তার আনাগোনা।

মজুমদার হঠাৎ ধমক দিয়ে উঠলেনঃ—
—এই বন্ধা ? টান—ভালো করে টান—

বন্ধা নড়ে উঠল। বাঁড়ের টানে ছুটেওঠা পাঁচরা-জলাতে মট মট করে শব্দ হল, হাত ছুটো বেন আশা। হয়ে ছিঁড়ে পড়তে চাইল কাঁধ থেকে। একটা ক্যাক্সিন থেকে হাত তিনেক আর পাকিয়ে নেগ নৌকো।

—এই তো মরবের মতো টান—মজুমদার উৎসাহ দিলেন। টেনে যা। বিলিভী সিগারেট বক্সিস্ দেব একটা।

কিন্তু বিলিভী সিগারেটের প্রলোভনও যে বন্ধা বুঝ উৎসাহ পাচ্ছে না, স্পষ্টই দেখা গেল। তেরো চৌদ বছরের শীর্ণকার ছেলে—বেলা আটটা থেকে এই বাঘোটা লাড়ে বাঘোটা পর্বত সমানে টেনে চলেছে। লম্বাহ হচ্ছে, সুখীর শিকার হবার আগেই আদম্য মামুদ শিকার করে বসব একটা।

বলতে বাজিলাম, সুখীর শিকার থাক মশাই, ফিরেই বাওয়া থাক। কিন্তু তার আগেই চকল হয়ে উঠল জলধর। নিভস্ত চোখ ছুটো চকিত হয়ে উঠল তার, চাপা উত্তেজনার বললে, হজুর—ওই যে—

—কই, কোথায় ?—মজুমদার নড়ে চড়ে উঠলেন, চোপে ধরলেন বন্ধুট।। সঙ্গে সঙ্গে আঁবিল।

জলধর বললে, ওই যে—ওধারের চড়ার গুপ্তর—

গুর আজুল লক্ষ্য করে আদম্য দেখলাম। হোগলা বনে ছাওয়া চড়ার গুপ্তরে বেষ্টানে একটুখানি লাল বাতির ডাঙা বলের মধ্যে নেবে এসেছে, ওইখানেই কালো কালো ছুটো কাঠের গুঁড়ির মতো পাশাপাশি জুয়ে আছে—হ্যাঁ, এক ছোড়া সুখীরই বটে। দাদা চোখেই দেখা

বাছিল, তবু মজুমদার বাইনা কুলার কবলেন একবার। জু বুরির ফোকাস টিক করতে করতে তার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলঃ—বেশ বড় লাইভের মশাই। ছুটো না হোক—একটা পেলেই পরিভ্রম সার্গিক হবে।

বন্ধা জলধরের কথা ভুলে গিয়ে আমি তখন বন্ধুকের লেকটি শরাছি। মনের মধ্যে অন্তর প্রতিক্ষিতার উত্তেজনা এসেছে একটা। শিকারের গর প্রারম্ভ করেন মজুমদার, কথাবাতার আরোই প্রাণ করতে চান তার লক্ষ্য নাকি অপ্রাণ। কিন্তু কলকাতার মামুদ হলেন বন্ধু ধর; আবারও যে কিছু কিছু ভানি, সেটা কতক বুরির মেগুয়া দরকার।

—আজ্ঞে আজ্ঞে টান বন্ধা—মজুমদার ধমক দিলেন। বস্ত্র আওরাজ হচ্ছে যে।

নিঃশব্দে নৌকো এগোতে লাগল। বন্ধু হাতে নিজে লক্ষিত বুক প্রতীকার বললাম আমরা। রেজের মধ্যে পেলেই হয় একবার। আমি ভাইবেরটা, মজুমদার বীরেরটা। দেখা থাক—কার শিকার পড়ে।

পাত্র নদীর জল নৌকো সত্ত্বর্ণে এগোতে লাগল। শিকারীর হিংস্র তত্ত্বরতার মজুমদারের চোখ গ্রন্থর হয়ে উঠেছে। হাতের তেতরে বন্ধুট। কাঁপছে অর অর। মাথার গুপ্তর গাংগালিকের ডাক ছাড়া কোথাও আর এতটুকু শব্দ নেই। হত্যাঝাড়ের পূর্ব মুহুর্তে চার দিকের পৃথিবী বেন নিঃশব্দ বন্ধ করে অপেক্ষা করছে।

কিন্তু শিকারেরাও বোধ হয় আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস পেল। ওদের একটা স্বাভাবিক জ্ঞানব বোধ শক্তি আছে—ছাওয়া ওবা বন্ধুকের নলের গন্ধ পায়। একটা সুখীর বেন আচমকা ছুঁতে ভেগে উঠল। তারপর অতিক্রম একটা টিকটিকির মতো ছোট ছোট পা কেলো নামতে লাগল জলের দিকে—ল্যাঞ্চট: নড়ে উঠল একবার।

—পালার মশাই, আর বেঁচি না—মজুমদার আমাকে কহুইয়ে থাকা দিলেন। অসহ উত্তেজনার ছোবলের আওরাজের মতো শিশু টানল তার বর—

—হু—হু—হু—হু—

ছুটো! বন্দকের গর্জন শ্রুত নদীর ওপরে বাঘের ভাতের মতো প্রতিধ্বনি তুলে তেলে গেল। নৌকাটা একবার ঘোলা খেল আঘাতের, বড়া ঝড়টা ছেড়ে দেওয়ার তর তর শিড়িরে গেল হাত পাঁচেক। চারদিক থেকে ভীক কর্কণ চিংকার করে পাখির হল উড়ল আকাশে, কোথার এক জোড় চণা চণী ছিল, কড়ের মুখে ছুটো! শাখা শুড়ির মতো ভার! ছিটকে পড়ল নিগড়ে।

সামনের খোঁরাটা সরে যেতেই দেখা গেল যেটা জলের দিকে এগোচ্ছিল, অর্থাৎ আঘার শিকার—সেটা সেইখানেই থমকে গাড়িয়েছে। বাঘেরটা ততক্ষণ জলে নেমেছে—মুহুর্তের মধ্যে তেলে উঠেই টুপ করে মিলিয়ে গেল।

মজুমদার বললেন, আপনাতাই ভিত মশাই—আপনিই পেলেন। কিন্তু এখনো পালাতে পারে—ভাড়বেন না— ছাড়লার না—আর একটা ওলী করলাম। একবার থর থর করে অবল খেপে কেঁপে উঠেই কুদীর তার চারটে পা ছড়িয়ে মিলে বাসির ওপর। শুধু লাগলো! তখনো অস্তির আকোশে আছড়ে আছড়ে পড়তে লাগল, বালি উড়তে লাগল চারদিকে—ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যেতে লাগল হোগলার বন।

—চল, শিগুগির নৌকা তেড়া—মজুমদার হাঁকলেন।

পাগলের মতো ঝড় টেনে চলল বড়া—পাঁজরগুলো নট নট করছে তার। ছুটোবে তার হত্যার মন্ততা। নৌকা আরো কাছে আসতে পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল তাছাড়া রক্তের ধারা আছে আছে গড়িয়ে আসছে জলের দিকে।

সত্যিই বেশ বড় কুদীর—সেজ হাড়া হাত লাগে ক লম্বা হবে আর। ছুটো! শুনিই আর পাশাপাশি বোন্ধন আরগার লেগেছে—এরই মধ্যে নদে পাথর হয়ে গেছে কুদীরটা।

লগি পূঁতে ভাঙার লাফিয়ে পড়লাম আমরা।

মজুমদার এত জোরে আমার হাত ধরে কাঁকিয়ে দিলেন যে, আমার কাঁধ পর্যন্ত টন টন করে উঠল।

একটা খোঁড়া পা নিয়ে জলধর আর সঙ্গে বড়া কুদীরটাকে ঠেসতে লাগল। কিন্তু সে জগদল আর নড়ে না। শেষকালে চার জনকেই হাত লাগাতে হ'ল, তারপর অলে নামিয়ে বোটা কাছ দিয়ে ওটাকে বেঁধে দেওয়া হ'ল নৌকার সঙ্গে।

মজুমদার আমার একটা উঁচু মরের হাসি হাসলেন : দেখলেন তো মশাই, বৈধ চাই।

কিরতে ফিরতে বেলা পড়ে এল। রাজ্য রোদের রঙ।

মজুমদার বললেন, কান্ধারীতে ফিরতে তো রাত হয়ে বাবে মশাই। তার আগে একটু চা খেয়ে জিরিয়ে বাই।

—এখানে আবার জিরোবেন কোথায়? লম্বিরে জানতে চাইলাম।

—কেন, জলধরের বাড়িতে।

—জলধরের বাড়িতে। আমার বিশ্বাসের বাড়া ছাড়িয়ে গেল। মজুমদার চা খাবেন জলধরের বাড়িতে! অভিজাত মজুমদার শেষ পর্যন্ত—

কিন্তু দেখা গেল, জলধর জানে। কোনো কথা তাকে বলবার দরকার ছিল না। ছোট একটি ঘাটে সে নৌকা তেড়ালো। দেখান থেকে আর একটু এগোতেই নারকেল বনের মধ্যে জলধরের আরো ছোট বাড়ি। যেটে বন—বড়ের ঢালা। এইখানেই চা খেতে চান মজুমদার।

মিশ্রিত হওয়ার তরুণ বাতী ছিল খানিকটা।

মজুমদার হেসে বললেন, আখিন এ ঘরে।

ঘরে ঢুকে চমকে যেলাম একেবারে।

এতক্ষণ ঘরে আর নর সেহ যে জলধর নৌকার হাল ধরে ছিল, রোগ চিক চিক করছিল বার বকবকে শাখা চুলে, বার বুকের ওপর জুবার বস্ত্র; থেকে থেকে পাগের মতো নড়ে উঠছিল—এ তার ঘর! পরিষ্কার চান্দর

পাতা গদীওঝালা একটা বিড়ানা, একটা ছোট টেবিলে নীল টেবিল রুখ, টাঙের বেড়ার গায়ে সৌমিন একটা ওয়াল ল্যাম্প, একপাশে কাঁচের কুন্ডা আর দুটো ফুল কাটা মাস।

মজুমদার ইমিত ভরা হাসি হাসলেন, শিকার করতে বেরলে আমি এখানে এসেই একটু জিরিয়ে বাই। তাই এ সব ব্যবস্থা রাখতে হয়েছে। নিদ্-ভালো করে শুই।

সবে বলে একটা হাত পাখা ফুলে নিয়েছি, হঠাৎ মেয়েটি গলার অলুবাগ শোনা গেলঃ বা—রে বেশ তো। আমাদের বৃষ্টি একেবারেই—ওবা—

দেখটা। আমরাই লক্ষ্য করে। কিরে চাইতেই দেখি, কুড়ি বাইশ বছরের একটি মেয়ে উঁচুপাশে ভেতরের দিকে পালিয়ে গেল। তারি মধ্যে চোখে পড়ল, জলথরের ঘরের পক্ষে যেহেঁটা একটু বেশি নাজির সন্দ্বী, আঁহা আর যৌবনে সর্বাঙ্গ চুল্ল করছে তার।

—কে মেয়েটি? জিজ্ঞাসা না করে থাকতে পারলাম না।

চোখের কোণা দিয়ে মজুমদার কেমন বিচিত্র ভঙ্গীতে তাকালেন। মুখে হাসির রেখা লেগেই ছিল, টোঁটের ছায়ে তা তির্যক হয়ে উঠল। বললেন, জলথরের মেয়ে।

খাল বিধবা।

বহুর্ভে বিশ্বের পরীটা ছিঁড়ে উড়ে গেল হাওয়ার। রণার শিউরে উঠল নরী।

এমনিই ধরতো পাড়িরে উঠতাম, কিন্তু লাফিরে উঠলার তার আগেই। দুই করে একটা বন্দুকের আগুয়াজ উঠল বাইরে। একটা টোটা কড়াই ছিল মজুমদারের বন্দুকে—আর আনলোড করা হয়নি। দুটো বন্দুকই বয়ে আনতে দেওয়া হয়েছিল বন্ধাকে।

দু জনেই দুটে বেরিরে এলাম।

অনুভূত পয়ত্ত্ব হুখে বন্ধা পাড়িরে। একটা বন্দুক তার পারের কাছে, হাংসটা উঁচু হুখী নল থেকে তখনো নীল ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে। বাতাসে তীব্র বাত্বের গন্ধ।

এগিরে গিরে বন্ধার গালে ঠাস করে একটা চড় বসালেন মজুমদার—ঝাঁকুনি দিরে কেড়ে নিলেন বন্দুকটা। গর্জন করে বললেন, বাচ্ছেল। সেফটি সরিয়ে ইচ্ছে করেই ট্রিগার টেনেছিল তুই।

ইচ্ছা করেই ট্রিগার টেনেছে বন্ধা—আমারও সন্দেহ নেই। কাগার আর কুমীরের শুকনো রক্তে বীভৎস দেখাচ্ছে ডাকে—পড়ন্ত গোবে চোখ দুটো তার অতুত দানবীর দেখাশো। এ্যাক্টল করছে নাকি বন্ধা—ও-ও কোনো কুমীর শিকার করতে চার ?

“স্বাধাধিনোদ” মার্ক্স স্মৃতি সন্নিধান তৈল

ব্যবহার করুন

সর্বমঙ্গল অয়েল মিল

১৭৭ হালসী বাগান রোড

কলিকাতা

ফোন : বড়বাজার ২৬২১

রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথা

মীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

রবীন্দ্রসঙ্গীতঃ যে ছুটি যৌগিক লক্ষণে লক্ষ্যশীল তা হলো তার গাভীর এবং বিস্তার। প্রতিভার সেই গাভীরে আমরা অভিভূত হয়েছি, বিভায়ে বিশ্বরাশি হয়েছি। আদো! শিশুর এই বারশে যে, শিল্পকর্ষের সত্যরসতা এবং শিল্পীমীবনের বৈচিত্র্যে তিনি এক আশ্চর্য সমরর খট্টয়েছিলেন। এ যোগাযোগ অপূর্বরূপে তবে অহেতুক নয়। বস্তুতঃ রসদৃষ্টিতে গভীর নিখিড়তা-সকারের একাধ্রুনিষ্ঠা সত্ত্বেও রবীন্দ্রসঙ্গীতঃ এতই বিরাট এবং ব্যাপক যে, অনবিক একটাইমাত্র ক্ষেত্রের স্রস্পদিসর আরতনের মধ্যে—অর্থাৎ শুধুইমাত্র সাহিত্যে—তার সমাক স্ফুটি সঙ্গব ছিল না। বৈচিত্র্যের বহুঃ পথেই তাই তাকে আত্মপ্রকাশ করতে হয়েছে। সঙ্গীত তার অন্তরতম।

রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীতপ্রহ্লা। সুসংষ্টিয় নবনব পরিকল্পনার ভারতীয় সঙ্গীতের কঠোরপরিচি কল্য তিনি একটি নূতন যাতায়াত উদ্বৃত্ত করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তাঁর নিরলস পরীক্ষানিরীক্ষালব্ধ লক্ষ্য আবারের সাম্প্রতিক জীবনে যে একটি অভাবনীরপ্রার চারিত্র্য যোজন্য করেছ সে কথাও অনস্বীকার্য। এবং শুধু সুরসৃষ্টিই নয়, সে সুরের সর্বাঙ্গপরিধান প্রায়োগলপ্রাপ্তিও তত্ত্ব সঙ্গীতের ব্যাক্যসরীতে নির্বাণ করে নিতে হয়েছে তাঁকে। সুর-সংযোগ এবং কথা সৃষ্টি, একইলগে তিনি এক বিশ্বব্য সাধনার নিমগ্ন হয়েছিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরবৈচিত্র্য সম্পর্কে সুদীর্ঘ আলোচনার অবকাশ রয়েছে; আপাততঃ কথার কথাই আসা যাক।

একটি বিবর বিশেষত্বসম্বন্ধে লক্ষ্য করবার ক্ষেত্র, ভারতীয় সঙ্গীতে কথা কখনও খুব বেশী প্রাধান্যলাভ করেনি। করতে পারে নি। সুর সেখানে অভ্যন্তরই বড়ো একটা অংশ অধিকার করে রয়েছে, এবং তারই চাপে পড়ে সঙ্গীতের ব্যাক্যসরীর প্রার নিশ্চিষ্ট হয়েছে বললেও খুব বাড়িয়ে বলা হয় না। সুরের লব্ধ সকারের

অন্ত নেহাৎই একটা অবলম্বন প্রয়োজন, কথাকে সেই অবলম্বন হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে মাত্র, তার বেশী সম্মান সে কখনোই পায়নি। রবীন্দ্রনাথের হাতেই সর্বপ্রথম তার এই অসম্মানের অবসান ঘটলো; তিনি যে শুধু সুরবিগ্নবই ঘটালেন তা নয়, সেই লগ্নে সঙ্গীতের ব্যাক্যংলও তিনি এক অপূর্ব সাধুর্ববত্তিত কাব্যরস সকার করে দিলেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুধু আবারের সঙ্গীতস্পৃহাই পরিচূর্ণ হয় না, কাব্যস্পৃহাও পরিচূর্ণ হয়। অত্র আর যে কোনও গানেই এই শ্রেণোক্ত সম্মান্য বোধ হয় সুরপরাহত।

কথাটা তাহলে কী ঠাডোপো? এ সেশের সঙ্গীতে কি এর আগে আর এই কাব্যরসের নামগড়ও ছিল না? উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে ছিল না। তবে অজ্ঞ ছিল। বিভিন্ন প্রদেশের লোকসঙ্গীতে আর তখনে, এবং বিশেষ করে এই বাঙাল্যদেশের ভাটিয়াসঙ্গীতে আর কীর্তনে আর বাউল-গানে বরাবরই একটি সুনিখিড় কাব্যরসের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গিয়েছে। বাংলায় বাউলের মুখে যখন শুনি,

'কাজলে আর কয়েব কতো

হদি নরনে নজর না থাকে,

প্রেম যদি না মিললো সখা,

(ওতোরা) সাধনপূজন কহি রাখে।'

আবারের সারা জগতখন শুধু সুরই প্রানিত হয়ে যায় না, এক অনির্বাচনীয় কাব্যরসের আব্বাবনেও পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। লোকসঙ্গীতের অন্তর্নিহিত এই কাব্যরসটি এখন বেদন আছে, আপগেও ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম সেই রসকে একটি পরিমার্জিত ঠাঁচে ঢালাই করে নিলেন। যা ছিল শুধুই কাব্যরসাপ্রিত, কাব্যরসী-রেন্ডত সম্পূর্ণতা প্রদান করলেন তাকে। পরিণামে এমন সমস্ত গান আমরা লাভ করেছি যা শুধু গানইমাত্র নয়, আশ্চর্য এক একটি কবিত্যও। এমন গান তিনি অজ্ঞত রচনা করেছেন। সুর এবং কথা, দুই তার মধ্যে একটি পরিপূর্ণ সার্বকতা লাভ করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের মধ্যে যে একটি শৃঙ্খলাশাসিত এবং সংযমকঠোর চারিত্র্য বর্তমান, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তার দৃঢ়সংবদ্ধতা স্বয়ং বিনষ্ট হয়েছে, এমন কথা কেউ কেউ বলে থাকেন। এ বড়ো ভ্রমাত্মক উক্তি। ভারতীয় সঙ্গীতের সংহতি এতে কিছুমাত্রও বিনষ্ট হয় নি; নবতর সুরশালিত্যে এবং কাব্যরসের অপভ্রংশ হোয়ার বরং তার মুক্তি ঘটেছে। ভারতীয় সঙ্গীতকে তিনি ভাঙেন নি; ভাঙবার সতো। ইচ্ছেও তাঁর ছিল না। তিনি তার জড়ত্বের অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন মাত্র। যে অন্তর্জাতিক্তের মধ্যে এদেশীয় সঙ্গীত তার পথ হারিয়ে ফেলতে বসেছিল, সেই কাটিক্তেরই অবসান ঘটিয়ে তিনি তার সৃষ্টিসজ্জান করে গিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং বলেছেন, 'গান লিখতে যেমন আমার আনন্দ হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।' 'গান লিখতে' কথাটি এখানে বিশেষভাবেই লক্ষণীয়। ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে গান এতদিন গাওয়াই হয়েছে, লেখা হয় নি। শুধুমাত্র সুরের উপরেই সে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিল, কথার উপরে নয়। রবীন্দ্রনাথ সুরমন্ডা, কিন্তু সর্বাঙ্গো কবি। সুতরাং সঙ্গীতের ক্ষেত্রে কথার এই বৈশেষ্য প্রতি সহজেই তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। কথা এবং সুরের একটি সার্থক সমন্বয় ঘটিয়ে সঙ্গীতের আশকে তিনি কাব্যের কাঠামোর পরিপূর্ণ করে তুলেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্বত্রই এই কাব্যচারিত্র্য লক্ষণীয়। কথার ঐশ্বর্য সেখানে পূরই বেশী। সুরের বিশাতির মধ্য দিয়ে কখনো ভালবাসা, কখনো বা ভক্তি, এবং কখনো বা ভালবাসা এবং ভক্তির সমন্বয়ে গঠিত নিবিড়তর কোনও ছবিসৃষ্টির বৈশীমূলে তিনি কথার সেই ঐশ্বর্যকে উৎসর্গ করে দিয়েছেন।

শুনতে অথবা লাগতে পারে, শুধু সত্য যে, রবীন্দ্রনাথের যে দিকটি সম্পূর্ণই মানবিক তা তাঁর গানের এই কাব্য কাঠামোর মধ্যে বক্তব্যধারী স্পষ্টভাবে ধরা

দিয়েছে, এমন আর অল্প কোথাও নয়। অজ্ঞান—কবিতার গল্পে, উপজ্ঞানে, প্রাচ্যে—তিনি যেন বড় বেশী প্রসার, বড় বেশী বিহীনিক্রম। সর্ব আনন্দ এবং সর্ব বেদনার সমন্বয় অস্থিরতাই যেন সেখানে ব্যানমৌম একটি অশুভ পাণ্ডুর মধ্যে গিরে নির্গল্লাত করেছে। অবিকল্প এই সমাহিতিকে আমরা শুদ্ধ করি; কিন্তু যদি বলি যে অবিকল্প ক্ষেত্রেই সেই শুদ্ধ অনাশ্রীতাবোধেরই ভোক্তা, বোধ হয় অন্যায় কিছু বলা হবে না।

কপাট: আর একটু বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। আমার বক্তব্য এই যে, কবিতা-গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রসাহিত্য যে পরিমাণে বিশ্বজনীন, সে পরিমাণে ব্যক্তিগত নয়। ব্যক্তিগত সৃষ্টিধর্মের অস্থিরতা সেখানে নেই এ কথা বলি না, তবে সেই অস্থিরতার মধ্যেও প্রাত্যহিক জীবনের আরতাত্ত্বিক একটি নিত্য-বালীন বিশ্ববোধই সেখানে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। শব্দকালের আনন্দ অথবা শব্দকালের বেদনার মধ্যেও সেখানে তাই এক অশব্দকালের হারাই প্রতিনিবৃত্ত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সেখানে গভীর, কিন্তু নিবিড় নয়।

অথচ আমরা—শব্দকালের সৃষ্টিধর্মের মধ্যেই যার: আকর্ষণ নিমগ্ন—গভীরতাকে বিনষ্ট শুদ্ধ করি, ভালবাসি নিবিড়তাকে। রবীন্দ্রনাথকে শুধুমাত্র শুদ্ধ আনিতেই আমরা পরিতৃপ্ত থাকতে চাই না, যথোচিত একটি নিবিড়তাও মধ্যেও তাঁকে আমরা গ্রহণ করতে চাই। ভাবতে চাই যে, বিশ্বজনীনই শুধু নয়—তিনি ব্যক্তিগতও, অশব্দকালের ব্যানমৌমতাই শুধু নয়—শব্দকালের অস্থিরতাত্ত্বিকতার মধ্যে বর্তমান।

কবিরাসের যে অংশ সেই অস্থিরতার স্পর্শলাভ করেছে, সঙ্গীতই তার স্রষ্টা অভিজ্ঞান। তাঁর গানের যেটুকু কাব্যোৎসব, কবি সেখানে আমাদের আরতাত্ত্বিকত নন, আনন্দন। এবং সেইখানেই বোধ হয় তাঁর নিবিড়তম সামগ্রিক পাণ্ডুরা যার।

সমাজ সংগঠন : উদ্বোধনপর্ব

অধ্যাপক বীরেন ভট্টাচার্য্য।

পুরাতন সমাজ ব্যবস্থার একটি বিদ্যুতি নিচা বহু আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এখানে তাহার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না। বাকী শাসনভবের নির্দেশক নীতিগতলিক সমুদে রাখিয়া কি তাবে নতুন সমাজ গড়িয়া তোলা যায়, জাতির নিকটে ইহাই আশ বড় প্রশ্ন। কিন্তু সমাজ সংস্কারের নানা প্রস্তাব, বহুবিধ আয়োজন অতীতেও ছিল। কেন সেই সকল প্রস্তাব কার্যকরী হয় নাই, কিংবা সেই সকল আয়োজন কলগ্রন্থ হয় নাই, সে সম্বন্ধে প্রশ্নই দায়গা থাকে। তাহা। সমাজ গঠনের নতুন পথ রচনা করিতে গিয়া পুরাতন ভুল-ত্রুটির মধ্যে পা বাঁজানো কোনো কালের কথা নয়।

আমাদের দেশে বর্তমান বিদেশী শাসকের অধীনে ছিল, ভতবিন সরকারী শাসন-ব্যবস্থা ছিল নতুন সমাজ গঠনের অন্তরায়। সেই শাসন-ব্যবস্থার ইচ্ছায়া অবিচ্যুতা তাঁহার সমাজ গঠনের সমিয়ার গড়িবার অস্ত্র সাধারণ মানুষের সহায়তা চাহিতেন না কিংবা চাহিয়াও পাইতেন না। তাঁহার নিজেদের বিজ্ঞাত্ব অহুসাতে সমাজ চালানার নীতি নির্ধারণ করিতেন। সাধারণ মানুষের অস্তিত্বকে তাঁহার বড় একটা আদলে আনিতেন না। আর সাধারণ মানুষকে সরকারী কর্মচারীকে তির জাতের লোক বলিয়া মনে করিত। কোনো বিন তাঁহারে কানে নিকেরে কথা পৌছাইয়া দিবার কলনাও করিতে পারিত না। গ্রামের চাষীর কাছে দারোগা বা গার্ডেন-অফিসার ছিলেন নাগিকের প্রতিভূ, নিজেদের হুখ দুঃখের অংশীদার নয়। এ অবস্থার সরকারী শাসন-ব্যবস্থার সাহায্যে সমাজ সংগঠনের আশা নিতুল হইতে বাধ্য ছিল।

সরকারী নীতির মধ্যেও একটি বিদ্যুতির অস্ত ছিল না।

সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণ নিজেদের সংকীর্ণ গভীর মধ্যে কাজ করিয়া যাইত, কিন্তু এগিলত পদ্ধতির বাহিরে গিয়া নতুন পরিকল্পনার সন্ধান বেওয়া তাহারে কর্তব্যের

অন্তর্ভুক্ত ছিল না। শাসন-ব্যবস্থা বিভিন্ন মন্ত্রণের ভাগ করিয়া দেবার কলে তির তির বিভাগের মধ্যে বন্টিত সহযোগিতা গড়িয়া উঠিতে পারিত না। একই নীতি বিভিন্ন বিভাগের কতৃপক্ষের হাতে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করিত। সমর-নিষ্ঠা কিংবা কর্তব্য-নিষ্ঠা সম্বন্ধে বিশেষ আশ্রয় কোনো বিভাগেই প্রায় দেখা যাইত না। বরক অস্ত্র বিভাগের তুলনায় নিজেদের বিভাগের কাজ বস্ত বেনী ইহা প্রতিপন্ন করিবার অস্ত্র নাশাত্রপ অব্যক্ত ও অপ্রয়োজনীয় বিষয়ের অবতারণা করা হইত।

যেবা যাইতেছে, শাসন-ব্যবস্থার প্রতি জনসাধারণের আস্থার অভাব এবং শাসন-ব্যবস্থার বিভাগ-নীতির অবর্তন, এই দুই একটি বহুকাল যাবৎ আমাদের সমাজ গঠনের প্রচেষ্টাকে শাকসোর পথে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। ইহা ছাড়া বিদেশী শাসন যত দিন সম্ভব আমাদের আর্থিক জীবনকে নিজেদের দেশের আরতে রাখিতে চেষ্টা করিয়াছে। সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন দ্বারা আমাদের আর্থিক স্বাভাব্য প্রতিষ্ঠা করিবার অস্ত্র বস্ত চেষ্টাই আমরা করি না কেন, পুরাতন আমলে সে সমস্ত চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে। বিদেশী শাসনের শেষ কয় বৎসরে যেনে কিছু কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতে সমাজের প্রধান সমস্যাগুলির কোনো সমাধান হয় নাই।

এক্ষেপে সমাজ-সংগঠনের অর্থ প্রধানতঃ গ্রাম-সংগঠন। গ্রাম-সংগঠন বলিতে শুধু কৃষি-ব্যবস্থার উন্নতিই নয়, গ্রামের সমাজীয় উন্নতির অস্ত্র সকল প্রচেষ্টার একত্র সমাবেশকেই বোঝায়। বর্তমান গ্রামের অধিকাংশ লোক সামান্য পৈত্রিক জোতের উপর নির্ভর করিয়া কিংবা অনেক ক্ষেত্রে শুধু মাত্র অস্ত্রের ধান্যে কাজ করিয়া অস্ত্র কষ্টে সৈন্যবিন জীবিকা নির্বাহ করিবে ততদিন এ দেশের কোনো উন্নতি লক্ষ্য করা সম্ভব নয়। স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাগদান এই সকলের দান উন্নয়নের অস্ত্র

এখনেই অবজ্ঞা, গ্রামের অধিকাংশ যোকেৰ কৰ্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা—তাহাদের আর বুদ্ধির পথ করিয়া দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে গ্রামবাসীরা পক্ষে উপযুক্ত ক্ষমতাভি শিল্পমুহু উত্তোাগের এটোজনীহতা সর্বাঙ্গে স্থান পাওয়ার উপযুক্ত। এই সঙ্গে কৃষি-ব্যবস্থার সংস্কার, কৃষি-পদ্ধতির আত্ম পরিবর্তন এবং দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যথোপযুক্ত বাণিজ্যিক সংযোগ স্থাপনও স্থানীয় গ্রামের লোকের কৰ্ম আনিয়া এখানে আনয়িত। কেন না, উপর হইতে চাপাইয়া দিয়া কোনো আদিক ব্যবস্থাকে দীৰ্ঘকাল রক্ষা করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ যে বহুদূর সংগঠন কামনা করে এবং নিজেদের ক্ষমতা দিয়ে রক্ষা করিতে পারে, সেই বিশেষ সংগঠনেই আনয়িত কাম্য হওয়া উচিত।

একথা বুঝি সত্য যে, গ্রামের সাধারণ লোকের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব আজ বহুদূর। শিক্ষিত শ্রেণী গ্রামের বাইরে নিজেদের জীবিকার সন্ধানে ঘুরিয়া ঘুরিতেছেন। ইহাদের অভিজ্ঞতা, উত্তোাগ ও কর্মপদ্ধতিকে গ্রামের কল্যাণের জন্য নিয়োগ করিবার কথা উল্লিখ্যে এবং নতুন উদ্ভবে গ্রামের সহিত শহরের সংযোগ স্থাপনের এটোটা চিন্তাভেদ। এই ধরনের এটোটা পূর্বেও কিছু কিছু হইয়াছে। ১৯৩০ সালের পর যখন অধিকাংশ শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে বেকার সমস্যা অত্যন্ত প্রবল, তখন তাহাদিগকে গ্রামে ফিরাইয়া বাইবার কথা বলা হইত। বর্তমানে যেভাবে শহরকে গ্রামের নিকটে আনিবার ব্যবস্থা হইতেছে তাহা অবশ্য সৌন্দর্য সম্ভব হয় নাই। কিন্তু শহরে শিক্ষিত শ্রেণীকে গ্রামবাসীর উপকারে লাগাইবার এই যে প্রশংসনীয় এটোটা, তাহা যদি গ্রামের সাধারণ লোকের উৎসাহ ও আগ্রহের অভাবে নষ্ট হইয়া যায়, তবে বড়ই পরিভ্রাণের বিষয় হইবে। সেইজন্য গোড়া হইতে গ্রাম ও শহরের পারস্পরিক সংযোগকে কিছুতে পুট ভিঙির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় সে কথা চিন্তা করিতে হইবে। ইহার জন্য গ্রামবাসীর দৈনন্দিন অভ্যাসের তালিকা সবে মিল রাখিয়া নতুন শিল্প ব্যবস্থার পত্রম করিতে হইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম্য কৃষকের ক্ষমতা বাড়াইতে হইবে। সমাজের বিভিন্ন তরের লোকের মধ্যে হারা সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হইলে, সমাজ

ব্যবস্থা পুটপুট হইতে পারে না।

এই সকল সমস্যা ছাড়াও জনসংস্থানের সমস্যা, কৃষিক্ষেত্রে কৃষকের কর্মসংস্থানের সমস্যা এবং ক্ষমতাভি শিল্পের স্থাপন ও বিকল্প ব্যবস্থার সমস্যা এই বিশেষভাবে মনোযোগ দিয়া নতুন সমাজ সংগঠনের পদাটাই করা সম্ভব। দেশের কয়েকটি অঞ্চলে পূর্বে অবলম্বিত নীতি অনুযায়ী গ্রাম ও শহরের মিলিত সংগঠন স্থাপন করিয়া কিছু দিন উদ্যোগকে বাহিরের সাহায্য দিয়া জীয়াইয়া রাখা অসম্ভব নয়। কিন্তু সমাজ সংগঠন যদি তাহার পরিবেশ হইতে আপন আপন সংগ্রহ করিতে না পারে, তবে কৃষি উপায়ে তাহাকে বাঁচাইয়া রাখার লাভ কি? ইহা ছাড়া সমগ্রভাবে দেশের আদিক সংগঠনকে নতুন রূপ দিতে না পারিলে শুধু বিক্ষিপ্ত কয়েকটি শহর বা গ্রামে কোনো বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন আনা সম্ভব হইবে কি?

সর্বাপেক্ষা বড় আশংকার কথা এই যে সমাজ-সংগঠনের নতুন পরিকল্পনা সেই পুরাতন ছাঁচে-ঢালা শাসন ব্যবস্থার মাধ্যমেই কার্যকরী করিবার ব্যবস্থা হইতেছে। দেশ স্বাধীন হইয়াছে বটে, কিন্তু পুরাতন আমলের শাসন পদ্ধতিব ঘাটিকতা আমরা এখনও নিশ্চেষ্টে মূঢ়িতা ফেলিতে পারি নাই। ইহার জন্য শুধু শাসন কর্তৃপক্ষকে যথেষ্ট বেতন দাও না। আমাদের ইতিহাস শাসন ব্যবস্থার সহিত অসংযোগের পক্ষা আমাদের সম্মুখীন করিয়া দিয়াছে। জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতার প্রবৃত্তি প্রস্তুত করিবার জন্য শাসন যন্ত্রকে বড় দূর সম্ভব নমনীয় করা আজ একান্ত আবশ্যিক হইয়া পড়িয়াছে। ইহাতে গোড়ার দিকে শাসন কর্তৃপক্ষের একটু আদর্শ অনুযায়ী হইতে পারে, কিন্তু নিজেদের পদসৌরব বা মধ্যবিত্ত অভিজ্ঞানে দেশের সত্যকার সমস্যা হইলে তাহা বড় কঠিন রাখা সম্ভব হইবে না। আমাদের মনে হয় বর্তমানে জনসাধারণ শাসন ব্যবস্থাকে নিজেদের বলিয়া মনে করিতে না পারিলে শুভদিন সমাজ সংগঠনের উত্তোাগ পর্যন্ত দূর হইবে না। এখনই অবস্থানের এই দুস্তর ব্যবস্থার দূর করিতে হইবে এবং কেবল তাহার পরেই প্রকৃত সংগঠনের কাজ হইতে নেতৃত্ব সম্ভব। ইতিমধ্যে সরকারী শাসনব্যয় বড়ই সমাজ ব্যবস্থার উপায় আনিতে চেষ্টা করুক, তাহাতে স্বাভাবিক পদ্ধতি পাওয়ার আশা অতি লাভ।

ছদ্ম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

‘ও নিশ্চয়, তুমি এখনো উঠিল না? এখনো পইরা পইরা ঘুসাইতেছিল। জাপ উইঠা, কি সন্ধান পাইয়া গেছে। সব গেছে। কিছু নাই। সব নিয়া গেছে একেবারে।’

বায়ের চীৎকার আর বিলাপোক্তিতে ঘুম ভেঙে স্নেহ নির্মলের। চোখ রূপডাঙতে রূপডাঙতে বিছানার ওপর উঠে বসল। একবার ঘরের চারদিকে তাকিয়ে দেখল। কাপড়চোপড় বাক্স বইয়ের আলমারী সব ঠিকই আছে বলে মনে হচ্ছে। বায়ের সুখের দিকে চেয়ে বসল, ‘অইহে কি, এমন চেঁচাইতেছে ক্যান লকালে উইঠা।’

‘ক্যান চ্যাচাইতেছি ভাষা আইসা, ভাষলেই সব ট্যার পাবি আনে। একেবারে নিম্মল কইরা নিয়া গেছে।’ মহানারা ছেলের হাত ধরে টেনে ভুললেন, ‘আর বাইরে আইসা ভাষ।’

নির্মল মনে মনে একটু আশঙ্ক হোল। চুড়িটা ভাঙা হলে ঘরে হর নি বাইরেই হয়েচে।

তরুণোষ বেকে নেবে গাড়াগাল নির্মল। পুজির কসিটা ভালো করে এঁটে এলো বাইরে। তাদের সমস্ত পরিবারটি বারান্দার এসে জড়ো হয়েচে। ঘোবের কাছে গাড়িয়ে রয়েছে নির্মলের বিবধা বৌদি অহুপনা। দুটি ভাইপো শব্দ আর অশ্রু, তিন বছরের ভাইকি টুনি। নির্মল এলে গাড়াতেই লম্বাই সম্বন্ধে বলে উঠল, ‘কাঁকা, ঠাকুরদার গাছের সব ফুলড়া নিয়া গেছে, চাইয়া ভাষ।’

তবরদশল করা এই পাঁতি পুতুর কলোদীর ভাগের ভাগ তিন কাঠা জায়গা পেয়েছে নির্মল সুখোষ। এক-বানা শোবার ঘর আর তার পাশে একখানা রান্নাঘর ভোলবার পথও বেশ পানিকটা জায়গা বেঁচেছে সামনে। সেই জায়গাটা বাবারির বেড়ার ঘিরে তাতে ভাটা, উল্লে গাছ, লতার চারা আর ফুলড়া গাছ লাগিয়েছেন, মহানারা। তিনি নিজের হাতেই তাঁর এই ভরকারি ব্যপানের পরিচর্যা করেন। নির্মলের এসব দেখবার

সময়ও নেই, সে পায়েরও না। মহানারার ফুলড়া গাছে তিনটি ফুলড়াতেই বেশ বড় ধরেছিল। তেবেছিলেলে গাড়ে একেবারে পাকিয়ে ঘরে ফুলবেন। কিন্তু কাল রাঙে কে খেন কেটে নিয়ে গেছে সেই ফুলড়া। তিনটি ফুলড়ার একটিও বেধে বারনি। মাতা একেবারে খালি। মহানারা হার হার করতে লাগলেন।

নির্মল থাকে সাধুনা দিয়ে বলল, ‘গেছে তা আর কি-কতা বাবে। আমি তোমাকে বলকাতার বাজার থিকা আইনা দেব ফুলড়া।’

মহানারা তাতে পবোধ মানলেন না, চৌড়িয়ে বলতে লাগলেন, ‘ঈশ কত টাকা রোজগার কইরা আনিব ঘরে যে তিন তিনটা ফুলড়া তুমি একদিনে বাজার থিকা কিনা নিয়া আগবি। মালো নি আনতে পারবি তিনটা ফুলড়া। তোর গারে লাগবে ক্যান, তোর মনে মনে লাগবে ক্যান, তুমি তো নিজের হাতে গাছ লাগাইল নাই, বাংলা দিল নাই, তোর চৌড়ের সামনে তো ফুলড়াওলা তিল তিল কইরা বাইড়া ওঠে নাই, তুমি কি বুঝি আমার ফুলড়ার মশ, তুমি কি বুঝি আমার মনের ফুল?’

নির্মল বলল, ‘আইছা তুমি বইলা চেঁচাইলে কি জিনিষওলা কিনা পাবা? বাত ঘরে বাত।’

মহানারা বললেন, ‘কান থাকে তুমি বাইরা ঘরের কোণায় বই নিয়া বর গিয়া, আমি বাবনা। আমি এয়ার একটা তথ্য ভালো না কইরা বাব না। তোর মত তো আমি মালো বইয়া বাই নাই। নির্ভর পাবাণ। আবার কথ কিনা বাজার থিকা তোমারে ফুলড়া কিনা দেব। আমি মরলে বাজার থিকা আর একটা বাত তুমি তাইলে কিনা আনতে পারবি।’

বাগারির বেড়া খোঁচা উঠানের ওপারে রাস্তা। তাতে বি প্লটের প্রায় সমস্ত লোক এসে জড়ো হয়েচে। ঘুরিয়ে তুলিয়ে বউদি আর ভাইপো ভাইকির ঘরে পাঠিয়ে দিল নির্মল। কিন্তু মহানারা কিছুতেই ঘরে গেলেন না।

জিনি সামনের দিকে আজুল দিছে আর একখানা বরকে দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'ওই ওরাই নিছে। ওই শশধর দাসেরই এই কাণ্ড। কাজ নাই কন্স নাই, পরের জিনিষ কাইড়া চুরি কইরা খাণ্ডাডাই আইছে এগন ব্যবসা। পরত দিন দুই টাকা। আর চাইছিল আমার কাছে, আমি খেদাইরা দিছি। গারের আশার কুমড়া। চুরি কইরা নিছে।'

হাত বানেক চণ্ডা রাস্তার ওপারে নির্মলদেব ঠিক সামান্যামনি থর কুলেছে শশধর বে। বাড়ি ছিল একই করিবপুর জেলার পাশাপাশি গায়ে, চোমরাহি আর বগিতে। মাঝখানে ছোট একটা মাঠের ব্যবধান। সেই ব্যবধান এলে গাড়িহেছে হাতখানেক চণ্ডা রাস্তায়। কিছু লিফা দীক্ষা অবস্থার ব্যবধান আরো বেশি। চক্ৰিণ পঁচিশ বছরের যুবক নির্মল মুণ্ডো বি, এ, পাস। শ্যান-ঝালার হুই কুলে মাঠারী করে। গোটা দুই টুইসদও আছে। আর লক্ষণ বছরের শ্রৌট শশধর বে ব্যবসা কববার জন্তে যে সরকারী ষণ কুলেছিল তা বলে বলে শেখোছে। এখন কাজকর্ম কিছু নেই, মাঝখানে কি একটা কাপড়ের দোকানে খাতা লেখবার কাজ পেয়েছিল নিজের স্বভাবের দোষেই তা হারিয়েছে। অথচ মংগার লোক কখনও, বউ আছে, চারটি ছেলে মেরে আছে। তাদের মধ্যে আঠের উনিশ বছরের সরস্বতীই সবচেয়ে বড়। গায়ের রঙ খোর কালো, চোখ দুটো ছোট ছোট, নাকটা চ্যাপটা, মেহের কোথাও কোন লাকবোব চিহ্ন মাত্র নেই সরস্বতীর। যেমন চেহারার স্বভাবখানাও তেমনি। তারি সুব্রতা আর কই ভাবিণী। হু' একবার বিয়ের সংকল্প এলে তেঙে গেছে। পড়শীরা বলে ছুটা সরস্বতী। ওকে সাধ ক'রে বাড়ি চাশাবে কে।

মহামায়ায় গলাগাল আর অভিযোগ শুনে সরস্বতী যদ থেকে বেরিয়ে এল, স্বক গলায় টেঙিয়ে বলল, 'শশধরদার, না দেউখা না ওইনা বাইনদের নামে বদনাম দেবেন না। ভাল অবস্থা জাইলে। আপনাতাও যেমন তন্দরলোক, আমরাতও তাই, কুমড়া আনাগো নিতে

দেবেছেন নাকি আপনে যে অমন বদনাম দিতেছেন।'

মহামায়া বললেন, 'চুরি কি কেউ দেখাইরা কবে, যে দেখব।'

সরস্বতী নির্মলের দিকে তাকাল, 'আপনে তো খুব সাধু বামুদ নির্মলদা, আপনে তো কলোনীর লীডার। আপনার মা'রে থামাইতে পারেন না এখন? আমরাত তন্দর লোক না, যে আপনাতাও জিনডা কুমড়া চুরি করব।'

নির্মল এবার সাকে লটাই দমক দিল, 'তুমি যত্নে বাও যা, যা কবাব আমি কবনে তুমি বাও, তুমিও যত্নে বাও সরস্বতী, তোমার বাবার পাঠাইরা দাও। যা বলবার তাঁকেই বলি।'

সরস্বতী বলল, 'বাবা সকালে উঠাইই সরকারী কাছে গেছে কইলকাতায়। ঘরে নাই।'

মহামায়া বললেন, 'সকালে যাবে ক্যান, কুমড়া বেচতে রাইতেই গেছে।'

বলে ঘরে চলে গেলেন মহামায়া।

সরস্বতী বলল, 'শোনলেন কথা আপনার মায়ের? খুব তো লীডার আইছেন, নিজের মায়েরে থামাইতে পারেন না?'

নির্মল হেসে বলল, 'মা'রে তো পারিই না, তোমারেরেই বা থামাইতে পারলাম কই, বাও ঘরে বাও।'

সরস্বতী তখনকার মত ঘরে গেল। কিছু নির্মল কুলে বেরিয়ে গেলে কের আবার কুমড়া হোল দুই পরিবারে। শশধর ফিরে এলে শাদিয়ে বলতে লাগল, তন্দর লোকের নামে অবস্থা চুরির অপবাদ দারা বের তাবের বিল্ডে মনি হানির যোকদ্দমা করবে। সরস্বতী আর তার মা চাকরীলা ছুটেনেই গলা ছেড়ে নির্মলকে চৌক পুরুষ উদ্ধার ক'রে তাকে নির্বংশ হওয়ার অভিশাপ দিতে লাগল।

পরদিন থেকে কথা আর মুখ দেখানোবি বন্ধ হোজ দুই পরিবারের।

এতে কতি অত্যা সরস্বতীদেই হোল। ঠেকে পড়লে ওরাই নির্মলদেব কাছে এসে হাত পাগুত, টাকা

ধাঁচাইত। নির্মলের বোধিত কাছে চাইত এক সের চাল, কোন দিন এক গো ডাল, কোন দিন বাঙোট শিমির আধ শিশি তেল। নিত, কিন্তু কেবল দেওয়ার নাম করত না। সব প্রতিবেশীই ওদের উৎপাতে অস্থির হব উঠেছিল। ধার দেওয়া সবাই বন্ধ করেছিল, কেবল নির্মল আর তার বোমিই দয়া করে কিছু কিছু দিচ্ছিল ওদের। কিন্তু কুমড়ো চুরি বাওয়ার পর থেকে তাও বন্ধ হোল।

মহামায়া দিন রাত্ত বাঘিনীর মত পাহারা দেন। সন্ধ্যা, তার মা, তার ভাইবোন কেউ বেড়া ডিঙিয়ে এ বাড়িতে ঢুকতে পারে না। ওরা কেউ আসতে চাইলে ঝাঁটা নিয়ে লাঠি নিয়ে ভেঙে বান মহামায়া—‘খুঁ-খুঁ’

আরো ছুটো কুমড়ো বাতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কেটে ধরে নিয়ে গেলেন মহামায়া, গাট পাকা কুমড়ো খাবার সাব তাঁর বিটেছে। কুমড়োর আর কেউ হাত দিতে পারল না। কিন্তু দু'চার দিন অল্পর পতর ছুটো উচ্ছে, গোটা করেক লড়া, কি একখানা ভাটা চুরি যেতেই লাগল তাঁর বাগান থেকে। এ চুরি আর রোধ করার উপায় নেই।

মহামায়া বললেন, ‘না চিঁচকা চোরগো জালায় তো আর পারলানই না। ওরাগো কাড় ওকা চোর। ঠাঁকাব কেনে। একটা বাখা কুতা আনতো ভাল দেইখা, পুঁবি।’

নির্মল হেসে বলে, ‘বাখা কুতা ক্যান বা। নেপালী কি ভোজপুত্রী জন দুই দারোয়ান রাইখা দেব ভোমার বাগান পাহারা দেওয়ার অস্ত্রে. করটা দিন লব্বর কর।’ তারপর কের বাক্যে সাধনা দেয়, ‘দুইটা কাডা বরিচ কি দুইটা উইঙ্কাই তো। তা বদি নের নেউক মা, জুমি ভা জা নিয়ে জুংখ কইরো না, মাসের বখো পোমনের দিন ওরা উপাস কইরা থাকে। তা তো জানো।’

মহামায়া বলে, ‘হ উপাস কইরা গাকে না আরো কিছু। তোমার মত সাধু বর্ষপুত্র বৃষ্টিয়রাই উপাস করে। চোরগো উপাস করন্ত হয় না। ওরা তোমার

চাইয়া অনেক ভাল খায়, ভাল পয়ে।’

নির্মল বলে, ‘না মা, জুমি ষ্টিক আন না। ওরা আগলে মহা দুঃখী।’

অল্পপনা ডালেও কোড়ন দেয়, কথারও কোড়ন দেয়, ‘আমার ঠাকুরপোর কাছে ওসব কথা পাড়বেন না মা, ওর আইল দয়ার শরীর। ভাল চায়ন তো। এখনও হাওয়াগের বিহা, বা দেয়ন, নইলে সব দান ধ্যানেরই বাবে।’ মহামায়া ছেলে সার দিয়ে বলেন, ‘তাই দিতে হবে। নইলে ওয়ার মতিগতি বদলাবে না কউনা।’

কুমড়ো চুরির দিন সাত আট বাদে বাস বরবার জন্তে হন হন করে ছুটে চলেছে নির্মল, শশধর পিছন থেকে ডেকে ডেকে পামাল, তারপর একথা ওকবার পর বলল, ‘দুইটা টাকা দেবা নির্মল, বড় ঠেইকা পড়ছি।’ নির্মল কঠিন অরে বলল, ‘না টাকা নাই আমার কাছে।’

সে বেঁচে নিয়ে জানতে পেরেছিল সত্যি। শশধরই চুরি করেছে কুমড়ো। শ্যামবাজারের বাজারে নিজের গাছের তরকারী বলে দু'টাকার বিক্রি করেছে। যে লোকটির কাছ থেকে নির্মল তরকারী কেনে সেই জুগিরেছে এই ধর। ওর তার কুমড়োই যে চুরি গেছে তাই নয়, কলোণীর আরও দুই চার গুহবের বাগানের কুমড়োও সরিয়েছে শশধর। বলকাতার ও আজকাল ওই ব্যবসাই করে। বাছের মোকাদে, তরকারীর মোকাদে, ফুটপাতে জামা কাপড়ের যে সব টেল গুলে বলে হকারো তার কাছ দিবে খুয়ে বেড়াই, ঠাঁক পেলেই হাত সাকাই করে। ছ' একবার নাকি আরও বেয়েছে; তবু শভাব বললার দি।

কলোণীর লোকেরও খুব উত্থাপ হয়ে উঠেছে। পাড়ার ছেলোয়া সেদিন বলছিল, ‘বইরা মাইর লাগাইয়া বেব নাকি নির্মলদা?’ নির্মল নিবেদন করেছে, ‘না মাইরা মরকার নাই, ওরা তো এমনিত্তেই মইরা আছে।’

নির্মলকে ছেলোয়া সবাই মানে। ও কলোণীর এসোসিয়েশনের সেক্রেটারী। অল্প সময়ের মধ্যে কলোণীর উন্নতির অস্ত্রে যথেষ্ট করেছে তাদের এসো-

সিয়েলন। একটা স্থল খুলেছে, বিভিন্ন কন স্থলেছে, বাস করেছ হোল একটা নাসিং হোমেরও ব্যবস্থা করেছে। আর সপ্তাহে একবার করে ছেলেমেয়েদের মিটিং ডাকে নির্মল। ভালো ভালো বই পড়ে শোনায়, তাদের নৈতিক চরিত্র উন্নত করার উপদেশ দেয়। কিন্তু সপ্তাহে একদিন উপদেশে কি কাজ হবে। ওরা বাপ-মার ঘরে বা বেথে ভাই শেখে। শশধর হাস তো আর সন্তা সন্তা কলোনীতে একজন নয়। কিন্তু যখন গ্রামে থাকত তখন শশধরও তো সব ভদ্র জীবন বাপন করত, কলোনীতে এসে সেইখা এমন হোল কেন। ভাই ওকে মার হেওয়ার প্রস্তাবে মার দেয় না নির্মল। তবে শুধু ওকে ঘেরে কি হবে।

এর মধ্যে পোনা গেল সরস্বতীও চুরি বিজ্ঞার হাত পাকছে। সেদিন পহেন দশের ঘরে ঢুকে তার বউয়ের একখানা শাড়ী গ্রাফ লুকিয়ে এনেছিল। পরেশের দশ বছরের ছেলে হাতে হাতে ধরে ফেলেছে। তারি নাকাল হয়েছে সরস্বতী।

সকালে এসোসিয়েলনের মিটিং ছিল, নির্মল বেরোবার পথে দেখল তাদের বাড়ীর সামনে লক রাস্তাটির পাশে সরস্বতী মুখ নিচু করে কি যেন তুলছে।

নির্মল বলল 'কি করতেছ সরস্বতী।'

সরস্বতী মুখ তুলে তাকাল, 'ছদ্মা তুলি। আইক বিয়ুংবার, সস্তী পুজা আছে মাগের।'

নির্মল বলল, 'ভাতো আচে, কিন্তু এসব কি শোনতেছি। কি অলসীর কাণ্ড কারখানা আরম্ভ করছ তোমরা। ছিছি ছি।'

সরস্বতী হঠাৎ কোন ভাব দিতে পারল না। ছদ্মা তোলায় ভান করতে লাগল।

নির্মল বলল, 'তুমি স্থলে বাত না ক্যান। মেয়েদের জন্মে বে নতুন স্থল করছি আমরা সেখানে 'গেলেই পার, মারনা লাগবে না।'

সরস্বতী একটু হাসল, 'বই পড়ত তো লাগবে। কিন্তু বর্ণবোম আর রাস্তাপাত শড়বার বরস তো আমার নাই

বে আপনাঘের স্থলে বাব। যদি গল্পের বই ছই একখানা দেয়ন তো পড়ি।'

নির্মল বলল, 'বেশ, গল্পের বইই দেব। বাইরো আমাগো বাড়িতে।'

দিন কয়েক বাবে মহামারা কালীঘাটে তাঁর মামাত ভাইয়ের বাগার বেড়াতে গেলেন। বেরনের ছোট স্ত্রীটির বয়ের বেলা তার শুভানেই গাকে। এবার নাকি ম্যাট্রিক বেবে। বেখে তনে যদি পছন্দ হয় কথাবার্তা পাকা করে আসবেন এই উদ্দেশ্য। মামাত ভাই হরেন গাঙ্গুলী তাঁকে ছেড়ে মিল না। ছুদিন বাবে গ্রহণের মনে। সেই মনে সেয়ে মহামারা ফিরবেন বলে পাঠালেন। আসলে বেলায় বাবা আসবে গ্রহণের দিন, তার লকে কথাবার্তা বলবেন এই ইচ্ছা মহামারার।

রবিবার। স্থল ছুটি। বাঙালি মাস্তার তাতা নেই। সকাল বেলায় সেগর আর ছেলেমেয়েদের চা অলখারার বাইরে বাড়ির শিফনের পুকুরটিতে মরলা জাবা কাপড় কাচতে খেল অল্পমরা। নির্মলও সমিতির কাজে বেরোবার জন্তে পা বাড়িরেছে সরস্বতী এসে ঘরে ঢুকল, 'কই বই দিতে চাইছিলেন দেয়ন এগন। কয়দিন খইরা আসব আসব করতেছি মাসীমার তরে আসতে পারি না, কালীঘাটে কয়দিন থাকবেন তিনি।'

নির্মল হেসে বলল, 'বেশি দিন থাকবেন না।'

মেয়ে এসে ভিমে চুল পিঠের শুপর এলিয়ে দিয়েছে সরস্বতী। শাড়ীখানা পুরোণ, আটপোরে। কিন্তু পরেছে খুব কারবা ক'রে। কপালে একটা খয়েরী টিপ পরেছে। নির্মলের দিকে চেয়ে সরস্বতী বলল, 'কই বই দেয়ন।'

নির্মল বলল, 'বইগ।'

সরস্বতী বলল, 'কোখার বসব। আপনাব চেয়ারে না বেছানার।'

নির্মল বলল, 'তোমার বেখানে ইচ্ছা।'

সরস্বতী বলল, 'চেয়ারেই বসি।'

ছোট একখানি টেবিলের সামনে হাতলহীন একটি চেয়ার। টেবিলের শুপর সমিতির খাতাপত্র, ছবিকে

স্বপ্নের জুপ।

সরস্বতী বলল, 'সবই দেখি ইংরেজী।'

নির্মল বলল, 'বাংলা বইও আছে। বাইরে বিস্তেতি তোমারে।' তাকে সরস্বতীর উপস্থাপী বই কিছু আছে কিনা দেখতে গাড়িল। নির্মল, হঠাৎ সরস্বতী ওর হাত টেনে ধরল, তাবধর তরল স্বরে বলল, 'গাড়ান, বই বই কইরা অত বাত আইতেছেন ক্যানে, আমি কি সত্যিই আপনায় মত বই পাগলা নাকি।'

নির্মল এক সটকার হাত ছাড়িয়ে নিরে বলল, 'হিঃ, এত লম্বা আইতে তোমার সরস্বতী। তুমি কি তাবছ আন্যারে।' নির্মলের চোখ থেকে যেন আশ্রন করছে। সরস্বতী মুখ নামাল।

একটু বায়ে উঠে গাড়িয়ে বলল, 'আমি বাই।'

নির্মল বলল, 'না বই শিরা বাও।'

সরস্বতী কের বলল চেয়ারে।

তাকে ওর বোণ্য বই পাওয়া গেল না। ব্যস্তব্যস্ত, তাকেও কিছু বই আছে, সেখানে বই খুঁজতে গেল নির্মল। নিমিট পাচ ওর বায়ে ফিরে এল বীজনাথের একখণ্ড গল্প শুদ্ধ হাতে নিরে। সরস্বতীর গিবে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'নাও।'

সরস্বতী ওর হুখের দিকে না তাকিয়ে বইখানা নিরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

নির্মলও চলে গেল সমিতির কাজে।

পরদিন বরা পড়ল চুরিটা।

অনুপমা বলল, 'তোমার হাতের আংটি কই ঠাকুরগো।'

নির্মল বলল, 'দেহাতের ম্যো আছে। আংটিটা

একটু চিলা চিলা লাগতেছিল, দুইলা রাখছি।'

অনুপমা বলল, 'দেহাতো তো চাষি নাই। দামী জিনিষ অমন খোলা দেহাতো রাখে। তোমার আংল জানা কি।' ঘরে এসে দেহাত খুলল অনুপমা, বলল, 'কই আংটি তো নাই।'

'সে কি', নির্মল এসে ঘরে ঢুকল।

ওখু দেহাতোই নয়, বকের কোথাও পাওয়া গেল না, আংটি। অনুপমা বলল, 'গেছে সে জিনিষ, ঘরে আইছিল কেউ, সত্য কইরা কও দেখি।'

নির্মলকে লজ্জিত ভাবে স্বীকার করতে হোল। সরস্বতী এলোড়িল।

কালীঘাট থেকে মহামায়া ফিরে এসে পথর ভ্রমেন বাড়ি মাঝার করে তুললেন, ওদিকে হেরেনের স্ত্রানীর ঘরের সঙ্গে সখচটি হয় নি। বেলায় লম্বা নাকি আগেই দ্বির হয়ে আছে কোন এক খেড়ল টাকা বাইনের সরকারী চাকুরের সঙ্গে। মাঝার তুলনাটোরকে তারা গুরুবে কেন। মেয়েও খুব মৃদু। ছেলে নিজে দেহাত পছন্দ করেছে। ওদিকে লম্বা হাতছাড়া হোল, এদিকে আংটি মহামায়া রেগে আশ্রন চলেন, পাগলের মত হুলেল আর। সরস্বতীদের অকণ্য অম্মল ভাবার গাল দিতে লাগলেন। নির্মলকেও গাল দিতে ছাড়লেন না, বললেন, 'ক্যানে ওই লজ্জীভাতীর ঘরে ডাইকা আনবার কি সরকার ছিল। ওই বকম খেদী বুঢ়ী চোর বদমাইল বউই তোর কপালে আছে। ওই সরস্বতীরেই বিয়া কইরা আন কুই।'

নির্মল হেসে বলল, '। তুমি যদি অনুমতি দাত না, আমি আনতে পারি।'

পাড়ার লোকজন সব নির্মলদের পক্ষে। তারা উদ্ভোগী হয়ে লম্বার দানের ঘর খোলাস্ত্রানী করল। মহামায়া নিজে ওদের বিধানা হাতড়ে বেগলেন, সরস্বতীর শাড়ি ব্লাউজ হাতড়ে বেগলেন। কিন্তু কোথাও আংটি নেই। মহামায়া বললেন, 'মেয়েটার সঙ্গে লবে খেইচা খাইছে। ওহা কি কব মরতান।'

সরস্বতী তারঘরে প্রতিবাদ করতে লাগল, আংটি সে নেয় নি। মিথামিহি নির্মল তাকে চোর বদনাম লিজে। যানয় তাই বলে সেও গালাগাল দিতে লাগল নির্মলকে। লম্বার তর দেখাল সে পুলিশ ডেকে আনছে। কলো-দ্রীর সব কাটি লোককে তারা বেধে নেবে। আর লম্বার কালই গিয়ে মানহানির মানলা দায়ের করবে নির্মলের

দৈনিক জীবনব্যাপী কষ্টে বিরহে ফলে এবার আর হারাবে না।

কিন্তু এবারও সে সব কিছু হোল না। দিন কয়েক রাতে দুট পক্ষই চুপ করে গেল। শুধু মাঝে মাঝে আংটির সঙ্গে শোক করতে লাগলেন মহানারী।

কিছুদিন পর আর একটা নতুন খবর শোনা গেল। অনেক রাতে কলোনীর কোন কোন ছেলে সরস্বতীদের ঘরে যায়। শশধর তখন অজ্ঞাতভাবে বাইরে থাকে। সরস্বতীর মারও ঠিক তখনই পুরুষ ঘাটে বাগদার এরো-
জন হয়। সবাই লক্ষ্য করতে লাগল ব্যাপারটা। মহা-
নারী বললেন তাঁর চোখে পড়েছে, অহুপমা বলল তারও।
সে আরও বলল নির্মলদের লিভিত্তির সহকারী সম্পাদক
মিত্তেন সেনও নাকি আছে এই দলে। তাকেও অহুপমা
বেহোরাতে বেধেছে গভীর রাত্রে ভদ্রের ঘর থেকে।

তুনে নির্মল গভীর হয়ে গেল। সহকারী সম্পাদককে
পছন্দ করা হোল পরের ব্যস্তের মিটিং। কিন্তু এতেই
কি সমস্যা মিটেবে?

নির্মল তার সহকারীদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা
চালাতে লাগল। ঠিক হোল তাঁরা তুলে সরস্বতীর বির-
য়ে ঘেঁষা হোক। নির্মলরাই লম্বা আনল খোজ
খবর করে। পাশের নেতাজী কলোনীতে থাকে বীরেন
দে। বরল চল্লিশ বিরাগ্লি। আগের পক্ষের জী ছুটি
ফিলেমেরে বেধে বাসা গেছে। তাদের সেখবার শোনিবার
জতে ঘরে আর একটি বউ দরকার। শিয়ালদহ একটি
মিটির নোকানে কাজ করে বীরেন। মাইনে বা পার
জাতে খেয়ে খরচে কোন রকমে থাকতে পারবে। লম্বা
অপছন্দ করার মত নয়।

কলোনীর সবাই শশধর দাসকে চোখে বরল, 'মাইরা
পার কর নইলে এখন বিকা তোমারো আমরা পার
কইরা ছাড়বো।'

টাকা নির্মলরাই সংগ্রহ করে বেবে। শশধর দাসের
আপত্তি নেই। কিন্তু থেকে বরল সরস্বতী। সে নাকি
বিরে করবে না।

কিন্তু নির্মল আর তার দলিত্তির সম্বন্ধে
তাকেও রাণী হতে হোল। শুভদিনে পোড়ালিরে আর
বিরে হয়ে গেল বীরেনের লম্বা।

পরদিন বীরেন তাকে নিয়ে নেতাজী কলোনীতে
চলে বাবে। না, বাস নয়, ট্যাকসীই ভাড়া করে এনে
ব্যক্তার আয়োজন চলছে সরস্বতীদের ঘরে।

'নির্মলদার সাথে আমার একটা কথা আছে।'
হঠাৎ সরস্বতী রান্ধা পার হয়ে সোভা চলে এল নির্মলদের
বাড়িতে। আচ্ছ আর ওর কোন সংকেত নেই, হুঁ
নেই।

নির্মল বিমিত্ত হয়ে বলল, 'কি কথা তোমার।'
সরস্বতী বলল, 'ঘরে চলেদে, তারপর বলব।'
ঘরে অহুপমা ছিল। তার দিকে চেয়ে সরস্বতী
বলল, 'আপনে দয়া কইরা একটু বাইরে যাবেন বউদি।
আমার কথাটা গোপন।'

স্মরণ্য দেব মেহেটার। কিন্তু অহুপমা কি তবে
বাইরেই গেল শেষ পর্যন্ত।

সরস্বতী নিজের হাতে ঘরের দোর কেঁদিয়ে দিল।
আচ্ছ আর ওর কোন লক্ষ্য নেই, তর নেই।
সরস্বতীর পরণে মাল রঙের শাড়ি। দি বিতে দিল্লের
মাগ। মাঝার আঁচল ফেলে নিয়ে নির্মলের মুখোমুখি
গাড়াল সরস্বতী।

নির্মল একটু ধাবড়ে গিয়ে অক্ষুট করে বলল, 'কি
কথা তোমার।'

সরস্বতী কোন কথা বলল না। রাউলের ভিত্তি
লম্বা একটা আংটি বের করে বলল, 'দেখি তোমার
হাত।'

তোমার! কথাটা কানে লাগল। কিন্তু এতিবার
করবার শক্তি হোলনা নির্মলের।

ওর হাতখানা তুলে নিল সরস্বতী। তারপর আংটি
অতি ঘরে পরিচয় দিল তার অনামিকার। নির্মল দেখে
তাই সেই চুরি বাগদা আংটি। কিন্তু আচ্ছ যেন শুধু
তার আংটিই নয়।

নির্মল বলল, 'সিহিলাই যদি কিয়াইয়া যাত কান।' কিন্তু এই অলঙ্কার ইচ্ছাকে রক্ষা করল নিম্নলিখিত। অনেক
সরস্বতী একটু হাসল, 'কি করব। এ খাণ্ডি হাতে ইচ্ছাকেই জীবনে দমন করতে হয়।

দিয়া তো আর স্বামীর ঘর করতে পারব না। সরস্বতী আর কোন দিকে না তাকিয়ে দোর খুলে
হঠাৎ নির্মলের ইচ্ছা হোল দুহাতে সরস্বতীকে বুকে ধরিয়ে এল ঘর থেকে।

চোপে ধরে বলে, 'তোমারে ঘাইতে দেব না।' নির্মল বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

উল্লেখ্য :—আন্তর্জাতিক পানিরামেন্টারি কনফারেন্স এবার হ'ল সুইজারল্যান্ডের বার্ন শহরে। সেখানে
ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করেছেন শ্রীঅরুণ চন্দ্র গহ। সেখান থেকে সুইজারল্যান্ডের Caux (কো) নামক শহরে
Moral Rearmament Conference এ ৯ ইংলিশ ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। সেখান থেকে
উক্ত এক বক্তৃকে লিখিত এক চিঠির অংশ এই সংখ্যার ৩২৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হোল।

আবদী টাম্পা
আপনার প্রিয়জনকে হস্তি দেন।
ইন্দিরিয়াল
৪ নং রাজা উম্মল্ট ট্রীট, কলিকাতা




শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার লাক্সার রোড হইতে শ্রীঅমরনাথ চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'হিন্দীরা' কাথালর ৩২ নং আপার লাক্সার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

— ইন্দিরা —

পঞ্চদশ বর্ষ

কার্তিক—১৩৫৯

সপ্তম সংখ্যা

কাল-পত্রিক্রম

(উপেন বাঁড়ুয়ার গ্রাম)

শ্রীলক্ষ্মীমোহন চৌধুরী

বিজয়লালের অস্তবর্ণনের পর তাঁর বদলে যিনি এসে হাজির হ'লেন তিনিও নামে বিজয়। পূর্বগামীর মতো। অতটা লাল না হ'লেও বিজয় ছিল তাঁর ভূষণ—পূর্বা নামটা বিজয়ভূষণ দান গুপ্ত। বরিশালবানী, হুত্তরা: সত্য বস্তীর সঙ্গে ছড়তা হুত্তরা স্বাভাবিক। হুত্তরায় সত্যবাবুই তাঁকে এনেছেন। বরিশালে বিজয়ভূষণের একটা ছোটগাটে ছাপাখানা ছিল এবং মকঃবলে চাণু 'বরিশাল' নামে একখানা সাপ্তাহিক সংবাদপত্রও তাঁর ছিল এবং সে কাগজে 'বরিশাল-হিটৈবী' সম্পাদকের মতো নীলাম ইত্তাহার ছাপবার ভজ্জে তিনি ল্যাপারিত ছিলেন না ব'লে গর্বও অধুস্তব করতেন।

বিজয়টাই যে তাঁর ভূষণ তা চাঁচাবদিন বায়েই টের পেয়ে যেগাম। হুত্তর: ইংরেজী টেলিগ্রামের অধুবার করাটাই লক্ষ্যকারী সম্পাদকের কাজ। একাজে বিজয়-ভূষণ বিরক্তি প্রকাশ করে বেঁকে বসলেন। অবিত্তি তাঁর বাঁক। হুত্তরার কাজটা আমাদের অলক্ষ্যেই হ'য়ে গেল সত্যবাবুর কাছে। সেখানে গিয়ে তিনি অভিযোগ করলেন এই গাধার খাটুনি খাটবার জন্তে তিনি তাঁর অধুৰ মকঃবলের কাজ-কারবার তত্ত্বিরে এই কলকাতা

শহরে আগেন নি; ওসেহেন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখবার জন্তে। সত্যবাবু এই মকঃবলভাণীর প্রতি কল্পার বিগলিত হ'লেন, বিজয়ের বিজয় হ'লো। অতঃপর তিনি তাঁর কামা কর্ণে প্রবৃত্ত হলেন।

মাঝায় বিজয়লালের প্রায় সমান সমান হ'লেও বিজয়ভূষণের দেহটা অমন বলিষ্ঠ ছিল না; ভিগ একটু টিলে গোড়ের। বিজয়লালের মতো অমন পৌরুষ-বাক্ক কষ্ট কিংবা অটোজব তাঁর ছিল না। তাঁর হাসিটা ছিল একটু বেঙ্গ বরণের আলতো করে ঠোটে মাখানো আর গলায় ঘরটা ছিল একটু মেহেলী বরণের নিরি। মোটামুটি পরিচ্ছন্ন ভ্রমরভাবের লোক কিছ ভিতরে ছিল তাঁর একটা প্রথর চাতুহ, বাইরের পাশিলে তা সব সময়ে ঢাকা থাকতো।

যাই হোক, আমার সঙ্গে বিজয়ের কিন্তু বনিষ্টতা হ'য়ে উঠলো খুব। কিছুদিন বায়েই কী একটা প্রবন্ধের জন্তে গোপাল সান্তালকে খেতে হলো খেলে। এই ঠাক বিজয়ভূষণের 'নামই বহুবানীর সম্পাদক বলে ঘোষিত হলো। গোপাল সান্তাল আর বিজয়ভূষণই এখন সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখতেন। গোপালবাবু খেলে

ব্যক্তিগত বিজয়ভূষণ একা পড়ে গেলেন। ছুটি গ্রন্থ এবং গুটিকয়েক ক'রে প্যারা লেখা তাঁর পক্ষে হুগো হ'লে উঠলো। কাজেই বিজয়ভূষণ টেনে নিলেন আশ্বাসে। মাকে মাকে নরেন্দ্র লেনগুপ্তকে ছু'একটি প্যারা তিনি লিখতে দিতেন। এই সময় বেথুঁহি বিজয়ভূষণ একটু অভিতাবকণ্ঠ করতে ভালোবাসেন, উপদেশ তাঁর মুখে সব সময় লেগেই আছে। মাকে মাকে শীড়ারোহণ করলেও তাঁর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা ক্রমেই বেড়ে গেল। সরকারী জাবে না হলেও গ্রন্থ বা প্যারা লিখে বিজয়ভূষণকে আমি সাহায্য করতাম এবং এ অধিকার তিনিই আমাকে দিয়েছিলেন।

বছর গড়িয়ে আসতে আসতে যেন নীচে গড়িয়ে বাড়ি টের পেলাম। এর আগে বা কখনো মনে হান পারিনি তা এমন মনে বাসা বাঁধছে। এডভান্স বেশ চালু হ'লেও, অনুভবাত্মকের আবার উদ্ভৃতি অবস্থা, আনন্দব্যাক্যের অবস্থাত ভালো হ'লে উঠলো। আমাদের সুযোগ ভাঙন ঘরেছিল। এডভান্সের পতন হ'লে আমাদের ভিতর থেকে লোকের গিরে যোগ দিয়েছিলেন পি, কে, চক্রবর্তী, যাদের সেন—সাংবাদিক মহলে তাঁদের যোগ্যতা ছিল সর্বজনস্বীকৃত। সুখী পরিবারের গীরা ছিলেন উপরের গরের লোক। এই ভাঙনে আমাদের মনেও কিছুটা ভাঙন ঘরেছিল বৈকি।

আমাদের কর্তৃপক্ষও শঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। বছরের শেষের দিকটার হঠাৎ যেন নৈরাজ্যের ঢাওয়া ঘনিয়ে এলো। দুবিনের অনিশ্চয়তার কল্পনা শঙ্কিত হ'য়ে উঠি। কর্তৃপক্ষ নতুন করে পরিকল্পনা করেন, নতুন পরিবেশে নতুন সম্ভার আবার নব উৎসাহ প্রাপ্ত করা যার কিনা তাঁর বিনয়ের গীরা সচেষ্ট হ'য়ে উঠেছেন। তারি মাকে আলোর একটুখানি চাকচিক্য অনেক দোলা দিয়ে ওঠে কিন্তু বল পাইনা বুকে। সত্যিই কি এই সুখী পরিবারের স্বল্পসৌভাগ্যকে একদিন চুহুয়ার হ'য়ে বাঁধে? হরতো লেগিলেন আর বেনী দেবী নেই।

আমাদের কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অগ্রযাত্রী ত্রিটপ

ইতিহাস ট্রিটের প্রেক্ষে গেলো এখান থেকে সরে আসতে। ১৯৫১ সালে আমরা উঠে এলাম আমার সাকুলার রোডে নিরালম্ব হৈমেনের কাছে হেলগারে কলোনির বাগে বেখানটার কবরখানা আছে তারই নামে। বৃকলাম আমাধেরও কবরের ঘিন ঘনিরে এসেছে।

এই বাড়ীতে আমার পর অস্থায়ের বোকা আর বেনী দিন বইতে হরনি আমাকে এই বা সৌভাগ্য। সেটা বোঝে হর বিজয়েরই কল্যাণে। অতঃপর গোপাল মান্যাল, বিজয় আর আমিই সম্পাদকীয় গ্রন্থ লিখতাম। আমাধের পণেশ-বিজ্ঞা। ভট্টাচার্য্য এ সময় মাকে মাকে সম্পাদকীয় ভূত্রে তাঁর কলম চালিয়ে আমাদের সাহায্য করতেন। বিজয় কিন্তু অভিতাবকণ্ঠ ছাড়েনি। এ অকলে আমার পর বিজয় তার বাসা বাঁধলো আমারই বেসের কাঠাকাড়ি। ছ'জনে প্রাইই এক সঙ্গে কিরি রাত্রি দশটা সাড়ে দশটায়। একটা অভাৱা আসক্তা মনে আসে, তাই কিরবার মুখে ছ'জনে হুগের গান গাই, বিজয় ক্রমাগত উপদেশ বর্ণন করে। বাঁটি পূর্ববন্ধের লোক হলেও বিজয় বাড়ি তিনিয়ে তিনিয়ে কথা বলে। পূর্ববন্ধের কথা টানটানে অতি অগাৱসার সহকারে চাল্য দিয়েছিল, সহজে ঠাৱে করা সম্ভব ছিল না। কথা বলবার আগেই সে 'এ-ই-ই' শব্দটা একটা বেরেলী বরপের সযোৱন হিনাবে ব্যবহার করতো বিজয়ের এই বর্ণচোরা আম হবার একটা কারণও ছিল। বরিশালবাগী হলেও সে জীবনসঙ্গিনী এনেছিল নবীয়া থেকে, বোধকরি তাঁরই প্রভাবে বিজয় বিসর্জন দিয়েছিল তার আকস্মিক ভাবাকে। এই ভ্রম বহিলায় সৌরব প্রাইই বিজয় আমার কাছে করতো। অসাধারণ সাহায্যবৃত্তি ও কর্তা ছিলেন এই নারী। বন্দনকার কথা বলছি তখন প্রায় পোণে এক ডজন সন্তানের জননী হলেও এই ভ্রম বহিলায় সাহা ছিল অষ্টট, এ আমি চোখে দেখছি। সন্তান কুম্ভিত হ'বার মাল খানেক পরেই হৈবেল ঘরে তাঁর বাস্তৱতা দেখে কেউ মনে করতে

পারতো না যে এই তরুণহিলা কিছুদিন আগেই
খাঁড়ত ঘরে আবদ্ধ ছিলেন। আমার নিজের জিলায়
যেহে বলে আবারও কেনন বেন একটা গর্ব বোধ হতো
কেনন বেন আত্মীয়ভাণ্ড বোধ করতাম। বিজয় এ
দিক-দিয়ে পুই ভাগ্যবান ছিল। অনেক দিন এই
তরু মহিলায় হাতের তৈরী নারকেলের চিড়ে আর
ধানকুনির বড়া খেয়ে এসেছি। স্তম্ভরায় বিজয়ের কথা
ভুলতে পারি না।

ও বাড়ীতে থাকতে উৎসাহ ছিল অনেক। আমাদের
কাগজের খ্রীষ্টি কিসে হবে তাই চিন্তা করতাম।
লেখার প্রলাপঞ্চ বিভিন্ন তরির খোঁজকের জন্যে
বিভিন্ন বিষয়ের সন্নিবেশ আমাদের কাগজের অবয়ব
সাম্মিমে তোলাবার দিকে আমাদের-কৌক ছিল। সেই
সঙ্গে এই বোধও আমাদের ছিল যে, বাহুবের কটিকে
যেন আমরা বিকৃত না করি। পাঠকুলসাহায্যের মনকে
উন্নত করে ভুলে বরাবর তার যে আমাদেরই উপর,
এ দায়িত্ববোধকে আমরা আদর্শ হিসাবে গ্রহণ
করেছিলাম।

যতদূর মনে পড়ে আমাদের কাগজেই আমরা প্রথম
সিনপত্রীর সন্নিবেশ করি। একাদশী, পূর্ণিমা, অমাবস্তা
ইত্যাদি তিথির প্রয়োজন অনেকেই, এদিকে আমাদের
খোঁজ ছিল। দোয়ার-ভাঁটার খবরও আমরা দিতাম
আর সেই সঙ্গে হাঙড়ার গুল কখন খোলা থাকবে
তাও আমরা জানিয়ে দিতাম, কেননা তখন হাঙড়ার
গুল বা ছিল তা কখন খোলা থাকবে আর কখন
জোড়া লাগবে তা জানা না থাকলে হাঙড়া ট্রেনগারী
বহু লোককে পূলের হুপে হাঁ করে বাঁড়িয়ে চরম
জর্জর ভুগতে হতো। রবিবারের কাগজটার কিছু
অংশ সাহিত্য বিষয়ে তরিরে তোলাতেও ছিল আমাদের
আনন্দ। আজকালকার বাংলা কাগজে এসব জিনিষ
অতি সহজ হয়ে গেছে। তবু বিবর্তনের গোড়ার
ইতিহাসটা স্মরণ করলে পুরাণো দিনের স্মৃতির মধ্যে
আমাদের প্রবাহমানতার আনন্দ পাই।

কবরের সামনে আগার পর থেকে কেবলই মনে হয়
কবরের দিকেই বুঝি পা বাড়ানি। কোম্পানীর
অবস্থা ব্যাভাগ দেবে শরৎ বোস ছাঁচটি দাঁতালো
লোককে কোম্পানীর মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা
করছিলেন। এই সময় রানস্ফোর্ড মিশনের গণেশ মহাশয়
মিশন থেকে বহিষ্কৃত হয়ে সংসার আগ্রহে প্রবেশ
করলেন গণেশ বন্দ্যোপাধ্যায় রূপে। অবিশ্যি সন্ন্যাস-
আগ্রহে থাকাকালীন তিনি সংসারবর্ষই পালন করছিলেন
তালোভাবে তবে সেটা ছিল তাঁর প্রাজ্ঞ। তিনি
যখন একটা হ'লেন তখন হাতে তাঁর মোটা টাকা।
শরৎ বোস এই টাকার সন্ধানহার করবার জন্যে
টাকে আমরণ ক'রে রোটারি মেশিন ইত্যাদি টাকে
দেখালেনও বটে, কিন্তু কল হ'লো না কিছুই।
সাংসারিক পাকা বুজিতে যিনি অতবড় একটা পরীক্ষার
পাশ করে এসেছেন মিশন থেকে তিনি পাকা ব্যাঙিটার
শরৎ বোসকে বুজিয়ে দিলেন যে, আমরণের বাংলাই
আর তাঁর নেই, এই আদর্শে নাভলে তিনি যে নতুন
প্রকাণ্ড মোটার গাড়ীটাতে চেপে এসেছেন তা হঠাৎ
টাকে অচিরে খোঁজতে হবে।

ইংরাজী ও বাংলা বই অনেক আগন্তো আমাদের
কাগজে সমালোচনার জন্যে। সেগুলির মধ্যে এমন
অনেক বইও থাকতে: বেঙলি লিভাই মূল্যবান। বিশেষ
বিশেষ ক্ষেত্রে সেগুলি থেকে অংশ বিশেষে উদ্ধৃতি
বা সংকলন প্রয়োজন হ'তে পারতো কিংবা আরও
কিছু কিছু জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারি মনে করে আমরা
সেগুলো দিয়ে কিছুদিনের মধ্যে একটা পাঠাগার তৈরী
করে ফেলেছিলাম। দেখা গেলো কাগজের অফিসের
পক্ষে এটি একটি সম্পদ এবং মনে করেছিলেন উত্তর-
কালে কাগজের অফিসে একটি বিরাট পাঠাগার তৈরী
হবে এবং সেটা যে শুধু আমাদেরই প্রয়োজন মেটাতে
তা নয়, তা অনেক গবেষককেও দেবে অনেক বোঝাক।
যিনি সমালোচনা করেছেন তাঁর বইখানি প্রাপ্য হ'তো
বলে পাঠাগারে বই অব্যাহার জন্যে সমালোচ্য বই-

মানির উপরস্থ আর এক কপি না দিলে সমালোচনা বার হবে না—এই নিয়ম প্রযুক্তি হ'য়েছিল।

এই সমালোচনার ব্যাপারে বেবেছি শবরের কাগজে যথার্থ সমালোচনা বলতে বা বুঝার তা প্রায়শই সম্ভব হ'তো না এবং এখনো যে তা হয় তাও বলা যায় না। কতিং কোন কোন ক্ষেত্রে হয়তো হু'একখানি বইয়ের প্রতি যথাযোগ্য সুবিচার করা হতো, বাকী অধিকাংশের ভাগ্যে সমালোচনার নামে বা বার হতো তাকে বলা যেতে পারে পাঁচ আইনের বিচারকের গার। এর একটা কারণও ছিল। বৈনিক কাগজ চলে বিদ্যাপতিতে; এই গতির সঙ্গে পাল্লা রেখে আমাদের মনকেও চালিয়ে দিতে হতো। তুরস্ব রূপে। হাতের পল সমরটুকু নিয়ে বুদ্ধিবৃত্তিকে খেলিয়ে চিত্তারানিকে ঘন করে এনে যে লেখকের বক্তব্যকে স্পষ্ট করে বহুতো দে উপায় আমাদের ছিল না কিংবা অভাবানি বৈধ বরাও আমাদের পক্ষে কঠিন হ'তো। আর একটা কথা, অধিকারীর অধিকারও আমরা পেতাম অনেক সময়। এক একদিন বেবেছি সন্দানক মশার আবার হাতে ধান মশেক বই ফেলে দিয়ে বললেন—“অনেক দিন আটকে আছে মশার, এগুলায় আজকেই একটা হিলে কখন।” তার মধ্যে কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস এমনকি হয়তো বিজ্ঞানেরও বই থাকতো। আমরা বিচার পৌড় বস্তুই থাক না কেন, আমাদের দে দিনকার হতো। শাক্ত হতো সর্ববিজ্ঞান-বিদ্যারূপ। অনেক সময়ই তুর্নিকা বা উপক্রমণিকা এবং শেষের করেকথানা পাতা পড়ে নিয়ে চালাকির হারও যে বহু কার্য সাধন করা যায় তা প্রমাণ করে দিতাম। সাংবাদিক হওয়ার একটা সুবিধা এই যে, রাজ্যজ্ঞানটা হয় টুটুনে। একটা বড় বিষয় নিয়েও চলনসই গোয়েড়ের একটা কিছু ঠাঁড় করানোর শক্তি সাংবাদিকের আরতে এসে যায়, একথা অনস্বীকার্য। সাংবাদিক ভীষনে অনেক বড় বড় অধ্যাপক ও পণ্ডিত ব্যক্তির লেখা আমাদের কাগজে প্রকাশ করার সময় বেবেছি তাঁরা বিবরণকে অপ্রয়োজন্যে তার্যক্রান্ত করে তোলেন, বাইলা ব'লে বা

আমাদের মনে হতো তা। ছাঁটাই করে আসল বক্তব্যে অল্পত রাখবার কৌশলটাকে আমরা অস্বস্ত করেছিলাম বৈ কি।

কিন্তু সব উৎসাহ আমাদের জ্বিলিত হ'য়ে আসছিল এই বাণীতে আসবার আগে—বেবেই। উপেনন্দের ভিতরে যে আন্তর পুরুষ বীরে বীরে সম্বিত হ'য়ে সকল বিষয়ে অগ্রদ্বা আরোপ করছিলেন তিনি বেন একটু বেশী রাজ্যর চকল হ'য়ে উঠলেন। রাজনীতি, সমাজ-নীতি, বর্ধনীতি, অর্থনীতি প্রভৃতি কোন কিছুতেই আর তাঁর আত্মর্শের মোহ নেই। এই সময় উপেনন্দের কবি বর্জন বেনগুণের কবিতার পুং তক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন। প্রায়ই তাঁকে এই কবির কবিতা আওড়াতে শোনা যেতো। এই কবির মধ্যে উপেনন্দের বেন তাঁর অন্তরের হৃদের প্রতিধ্বনি পেয়েছিলেন। ইংরাজী ভাষার যাকে বলে “Cynic” উপেনন্দের হ'য়ে উঠেছিলেন পুরাণদ্বর তাই। ঠিক এই সময়ে গণেশ মহারাজকে নিয়ে যে বুদ্ধরোচক কলোভারী বাজার সময়র ক'রে তুলেছিল তাতে উপেনন্দের তাঁর গ্রির কবির ছুটি শাইন প্রায়ই আমাদের সামনে আওড়াতে আর বলে উঠতেন—আঃ! কী লেগাই লিখেছে—

“কে পাবে নৃতন সীতা ?

কে বুঢ়াবে এই হুং-মহায়া গেরুয়ার বিলাসিতা ?

আমাদের সমাজে ‘বরবর’ এখা কোন কালে উঠে গেছে। বিলাতী সমাজে তার কিন্তু রূপান্তর আমরা দেখতে পাই ‘কোটশিপে’। বিলাতী শিক্ষার মোহে আমরা যে কিছুকাল অভিভাব্যর চকল হ'য়ে উঠেছিলাম তার ঐতিহাসিক নজির হ'য়ে গেছে। কোটশিপের ভণাভণ নিয়ে এককালে ভ্রান্তভ্রান্তের চর্চাও হ'য়েছিল প্রচুর এবং বিচার বুদ্ধির দাবা এই প্রধাকে সমাজে গ্রহণ করার অয়োজনও আমরা তখন অনেক বীকার করেছি, এবং ব্রাহ্মযুগে বোধ হয় এর প্রচলনও হ'য়েছিল বেশ। তবু বিলাতী সমাজের কোটশিপকে আমরা পুরাণদ্বর অধিগত করতে সক্ষম বোধ করেছি। প্রাণ

সংঘটনের ব্যাপারটার বিলাতী মসলা বর্জন করে আনরা আহুর্ষণ মতে কিছুটা বেশী রসের ভাবনা দিয়ে তবে হজম করতে সক্ষম হ'বেছিল। তবু উঠতি বয়সের ছেলেদের মনে এখনও ঐরূপ ধারণার একটা প্রণয় ঘোহ যে আগে না তা নয়, এই সময়ে ঐ ধারণার বস্তুটি যাতে সহজলভ্য হয় তার জন্যে বুদ্ধিটাও অস্বাভাবিক করার পক্ষে চেষ্টা হয় অস্বাভাবিক। উপেনদা এর যোরতর বিরোধী ছিলেন। বাহুবী প্রেমের মধ্যে একটা নিঃস্বার্থ ভাবের আয়োগ করাকে তিনি বলতেই মিথ্যাচার। যা হবার নয় তাকে সত্য বলে প্রচার করবার হুশিয়ারী তাঁর ছিল না। প্রকৃতি-চালিত মানব-সমাজে নয়-নাহী প্রেম বলতে আমরা যা বুঝি 'কাম-গন্ধ নাহি তার' একথা ধীরে বসবার চেষ্টা করেন তাঁর। মিথ্যা কথাটাকে একটু পাল্লিগ করে দিতে চান। আর ধাবের মুখ দিয়ে সত্যই কথাটা বার হ'বেছে, তাদের সংখ্যা 'নাথো নামিল এক' এবং এও সত্য যে, তাঁর; বাহুবদেহধারী হ'লেও আসলে দিয়া চেতনার কারবারী। সে রকম হু'একজনের কথা ছেড়ে দিলে বাকী আমরা সব প্রণয় ব্যাপারের যে কারবার করি তা আসলে কিন্তু একটা পারম্পরিক স্বার্থের চুক্তি ছাড়া কিছুই নয়। এই সোজা, সরল কথাটাকে কবির। অবিদ্রিষ্ট একটু রসিয়ে দেবার জন্যে চিন্তের ভাবনায় সংযোগ ক'রে বিরাজেন। যাটির রসে বার বৃদ্ধি তাকে হাওয়ার উড়িয়ে দিলে চলবে কেন তাই? উপেনদা বলতেন—

“নরকে হবে সান্নী?”

প্রেম ও ধর্ম জাগ্রিতে পারে না
বারোটার খেপী মাতি!”

মুক-মুকতীর পারম্পরিক সাহচর্যে যে বিলম্ব সংঘটিত হয় তা কি বাহুবীর নয়?

বাহুবীর হরতো ক্ষেত্র বিশেষে হ'তে পারে। কিন্তু তাই নিয়ে কবিতার চুচুচু তাবে আমরা যদি সেইটাকেই সমাজের সামান্য রীতি হিসাবে প্রচলন করি তবে তা বাহুবীর হবে না'লে আমি মনে করিনা।—

উপেনদার অব্যবহিত এই।

মুক্ত্যাম এ ব্যাপারে উপেনদা সনাতন-পন্থী। কথাটা নিয়ে একটু ভাবির দেখতে গেলে উপেনদাকে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হ'তো না, তবু তাঁকে খানিকটা উড়িয়ে দিতে পারলে আমরা পেভাম আনন্দ। তাঁর এ বিষয়ে চাটা-ছোলা হুনি ছিল এই:

সত্যি কথা বলবে কি তাই, মুক-মুকতীর প্রণয়ান্তিক মিলন বলে যে বস্তুটির ভয়ে তোমরা লালসিত আসলে কিন্তু সে বস্তুটি হ'লো কাকির কাক। কাকুল। তোমাদের মধ্যে কোন মুক যদি কোন মুকতীর প্রেমে পড়ে থাকে তবে আমার বলো। আমি তা হ'লে ছ'জনকে একটি ঘরে পুরে বাইরে থেকে শিকল এঁটে দেবো। ঐ ঘরেই ছ'জনকে করতে হবে নাওড়া-বাওড়া, লাভতে হবে প্রাকৃতিকতাদি, বাইরে কোথাও যেতে পারবে না। তিনদিনের মধ্যে ঐ ঘরেই আটক, বাস। দেখি বাহুবন! তখন প্রণয় বস্তুটি গলে কোথায় গড়ায়!

একদিন উপেনদার ঐ বাণী শুনে আমরা সবাই হেসে উঠলাম। স্বেয়োগ পেয়ে বললাম—আজ্ঞা উপেনদা, আশনারও তো যৌবন এককালে ছিল, আপনি কি কখনও কোন নাহীর প্রেমে পড়েন নি?

—ছিল বৈকি যৌবন এবং প্রেমে কখনো পড়িনি একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে।

উপেনদা অকপটে স্বীকার করলেন যে, তিনি জীবনে ছ'টি নাহীর প্রেমে পড়েছিলেন। তার মধ্যে প্রথম। তিনি, তিনি ছিলেন বাংলা দেশে আগত কোন বিখ্যাত গাউনোহেবের গল্পী—খোতাবিনী, সুমধুর হাসিনী, তবী তলুদেহবাবিনী; সুখীম নবীনত পেলব সেই মেহ, আর সেই বেছে ছিল একবারি গ্রীষ্ম—আঃ কি তার গঠন নৌদর্শ! উপেনদা বললেন—চলুতি ভাবার তাকে 'গলা' বললে তার সাংস্কৃতিক মর্যাদাকে ছোট করা হয় বলে তাকে গ্রীষ্মই বললাম। কব, গ্রীষ্ম-টিথ, কিংবা ঐ ধরণের লক্ষ্যে নিয়ে অবশ্য কবি এই রকম সৌন্দর্যময়ী নাহীর রূপ বর্ণনা করবার চেষ্টা করেছেন বটে কিন্তু আমার মনে হয়

পৃথিবীর কোন কবির কাব্য-শাস্ত্রে এই গ্রীষ্মের তুলনা
আহি পাইনি। উর্বরী-ভিলাস্তম্ভ-যেনক! স্রিগণ্ডে।
হেলেন ইত্যাদি সমস্ত সুন্দরী নারীর সৌন্দর্যকে নিজে
নিজে বিধাতা যদি এই লাট-পত্নীর গ্রীষ্ম সংযোগ করে
দিতেন তথাপি এমনটি পাঁড়াতো কিনা বলতে পারি না ;
কিন্তু আমার মনে হয় এই নারীর গ্রীষ্ম বস্ত্রের সময়
বিধাতা এক সম্পূর্ণ নতুন পরিচ্ছন্ন নিয়ে নেমেছিলেন।
এক বর্ণনা দিয়ে বুঝাবার চেষ্টা করা কঠিন, শুধু দেখা
আর দেখা আর দেখা—দেখে, অস্তরের মধ্যে সেই
সৌন্দর্যকে হয়ে উপলব্ধি করা আর উপভোগ করা।
নোহুলাইন ইঞ্চ লালত একটি চোপা থোপার নীচে
এই গ্রীষ্মের বস্ত্রের তস্নিবা কলনার অতীত। এ নারী
যদি আমার দিকে পিছন দিয়ে থাকতেন আর আমি
তার ঐ থোপার নীচেকার বেহাংপটুইর বস্ত্রের তস্নিবা
অনন্তকাল ধরে দেখে যেতুম তবুও আমার তৃপ্তি রান
হতো না। এটাকে ভোবরা কী প্রেম বলেই বলে।
আমার কিন্তু ঐ ভাবের মধ্যে আর কোন ভাবের নীড়া
ছিল না, সুতরাং আমার অন্তর পীড়িত হয় নি। আমার
অন্তরে যে আর একটি দৃষ্টি আছে তাই নিয়ে যদি এখনো
সেই গ্রীষ্ম দেখি তবে একটা শান্ত সৌন্দর্যের মধ্যে আমি
চুপে বাই।

লাট-পত্নীর গ্রীষ্মপ্রভাবী উপেনদা সত্যিই নিনীট
থানেকের জন্তে বোধ ক'রি অন্তরে ডুব দিলেন। সেখানে
তার আত্মার হরতো নৈঃশব্দে অনিত হয়ে উঠলো
—আঃ !

অতঃপর আমার তিনি বলে গেলেন :

শোন এবার দ্বিতীয় কথা। একবার পশ্চিমের
পথে নাজায়ে হয়ে গেলাম একদিন। সেখানে এক বছর
পছন্দে একটি মহিলার সঙ্গে আমার আলাপ করতে
হয়েছিল। কিছুতেই ছাড়িয়ে না তিনি। বললেন,
এমন অসাধারণ মহিলার সঙ্গে যদি আমি আলাপ করে
না বাই তবে কী যে আমি হারাচ্ছি না কি বলনাও

করতে পারি না। এরকম তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী নারী নাকি
অগতে প্রচুরত।

বছর অল্পের মধ্যে তাই পেরে গেলাম বুদ্ধিশালিনীর
কাছে। তিনি যখন আমাদের সামনে আবিষ্কৃত হয়ে
অভাবনা করলেন তখন করে আর আড়ম্বর হয়ে মনে মনে
চীৎকার করে উঠে ভাকলুম—আহি মাং ভগবৎ !
এ কি দেখালে মা !

অস্বচ্ছন্দ্যের শীর্ষা, কালো, কুৎসিত একটি নারী ;
মাথা একদিক কল কল করে ঝেঁপে বেরছে। একখানি
শোভা কাঠের মাথার বাজার মলের দার করা চুল বসিয়ে
দিলে যেমনটি দেখার ঠিক তাই। আলাপ করবার সমস্ত
উৎসাহ আমার নিম্নেই যেন উবে গেল। ঘরের মধ্যে
প্রবেশ করবার ভয়ে পা ছুটোকে আর টেনে তুলতে
পারছিলাম না। তবু যখন এসে পড়েছি তখন আর
নিজার নেই, কোন রকমে দার থেকে উদ্ধার হতে হবে,
নইলে ভয়ঙ্কর রক্ষা হয় না।

শোভা কাঠ অতঃপর মুখ খুললেন। বললেন, আমা-
দের তিনি বিশেষ করেই চেনেন তবে সে চেনাটা অপরীত,
চামুচ দেখার সৌভাগ্য এই তার প্রথম। আলাপের
ধরণটা অভিনব। প্রথমে কিছুক্ষণ তিনিই তার বক্তব্য
বলে বাড়িলেন আর আমি প্রাণের দ্বারা হাঁ হাঁ করে
হস্ত বাহির করবার চেষ্টা করছিলাম। আমার আড়ম্বর
কিছুক্ষণ বাদেই কেটে গেল। কথা বলার এবং কথা
আমার করবার এ অপকল্প তস্নিবা সত্যিই নারীর কথা
দূরে থাক, পুরুষের মধ্যেও বড় বেশী দেখেছি বলে তো
মনে পড়ে না। অকস্মাৎ আমার দেহের অন্তরালের
বিস্তারী, বিকল্প পুরুষটি কেন সচেতন হয়ে উঠলো। নাঃ,
এ নারী তো সাধারণ নারী নয়। হীতে হীতে সাহস
সংগ্রহ করে আমি আলাপে প্রবৃত্ত হলাম। উঃ সুরধার
বুড়ির সে কী চাকচিক্য ! বিবর্তনকে সহজে আরম্ভের
মধ্যে এসে গেলে তার বিভিন্ন দিক উদ্ঘাটন করে আসলে
মতো বৃত্তি তারলো তাকে বলিয়ে দেওয়া চাট্টাখানি
কথা নয়। অবাক হয়ে গেলাম এই নারীর মানসিক
ঐশ্বর্যে।

* প্রায় দশটা ঘুরে ক ঘরে ঐ নারীর সঙ্গে আলোচনা করেছিলুম বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। তখন হয়ে গিয়েছিলুম তাঁর বাকচাতুরীতে আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধির শরচালনায়। তারপর যখন বাইরে এলুম তখন পা ছুটো বহুচালিতবৎ চলছিল বটে কিন্তু কে যে চালাচ্ছিল, তা জানি না। আমার মনে কিছু এদিকে উড়ে চলেছিল লম্বুক হয়ে কোথায় কোন সৌন্দর্যপূরীতে যেখানে ঐ নারীর ছবির অনন্ত বর্ণচ্ছটা দিগদিগন্তে সৃষ্টি ক'রে চলে অনন্ত বোহাৎবৎ! আমার মনে হয়েছিল এতবড় সুন্দরী নারী পৃথিবীতে বোধ হয় আর কোথাও নেই।

যদিহাটি আশ্রয় কুমারী। তাঁর পরিচয় পেলে তিন প্রখ্যাত নামা সরোজিনী নাইডুর সহোদরা—নাম মৃণালিনী চট্টোপাধ্যায়। শ্রামা পাবলিং হাউস তিনি চাপাতেন, সেখান থেকে অনেক ভালো ভালো বই প্রকাশিত হতো।

এত সুবিস্তৃত রমনী অবত এত বড় সৌন্দর্যের আশ্রয় পৃথিবীতে বিরল।

সৌন্দর্য লম্বাচ্ছে আমার ধারণা সেই দিন থেকে বদলে গেছে তাই।

আত্মকান

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বাহুতি]

সজ্জার দিকে বুদ্ধির জোর অনেকটা কমে এসে। একেবারে খামলো না। টিপ টিপ করে অরুতে লাগলো। মুনশে ঘরের কোণ থেকে ছাতাটা হাতে ক'রে কানের পাখর ছুটো কাগজে বুড়ে এক্সির শকেটে নিয়ে পা টিপে টিপে ঘেরিয়ে পড়লো। ত খিল বুদ্ধির সামনে পড়ে গেলে এখনি চোতামেচি শুরু করে দেবে। এই অলে কানার বাড়ীর বাইরে কিছুতেই পা দিতে হবে না। চূপচাপ ঘেরিয়ে পড়াই ভালো।

কানার আর অলে রাত্তা দিয়ে এগোনোই শুদ্ধর। প্যাচপ্যাচে কানার মুনশের গ্যা বিন বিন করে উঠলো। উচান টিন চোরারমান হ'লেও কেন যে নজর দেন না এরিকে। শহরের সাত্তার নতুন পিচ দিয়ে দিলে আর বর্ষাকালে মাস্তকের এ বিপত্তি হয় না। ছাতার কোণ বেয়ে অলের তৌটা টুপ টুপ ক'রে কাঁধে পিঠে অরুতে লাগলো। পিঠের এক্সির আর পদার্থ থাকবে না। মুনশের মনটা খিঁচড়ে গেলো।

হা শিনের বাড়ীর কাছ বরাবর এসে মুনশে পকেট থেকে কুমার বের করে আনতো। কপাল আর বাড়ি দুইে নিলো। একটা হাত দিয়ে চুলগুলো ঠিক করে নিলো। অগোছাল হ'লে কি না শিনের সামনে ঝড়ানো যার? বিশেষতঃ একদিন পরে লম্বা থেকে এসে!

বাগরার আলো জ্বলছে। হা শিন হেঁট হ'রে একমনে কি একটা করছে। আবছা আলোর ভালো দেখা গেলো না। সামনে পা ফেলে মুনশে ঘরের আগল খুলে উঠানে এসে ঝড়ালো। হাজার সামলে-মুনশে চললেও পায়ের আঙুরা মুনশে লুকেতে পারলো না। অলের ওপর ছপছপ লম্বা হ'তেই হা শিন গুরে বসলো, 'কে, কে আগনি।'

মুনশে কথা না বলে এগিরে আগলো।

হা শিন হি একটা কথা বলতে গিয়েই থেমে গেলো। পলতোটা উঠে দিয়ে শিঁড়ির চাতালে এসে ঝড়ালো, 'বোম লোক বা হোক, এককণে লম্বা হ'লো।'

'বোঁব আমার নয়, তোমাদের দেশের আকাশকে নোঁব দাও। আকাশের কালো বেঁধ আমার দিনটাকেও এমন কালো ক'রে তুলবে তা ভাবিনি।' মুনপে ছাড়াটা ফুড়ে দাঁড়ায় ওপর এসে উঠলো। হাত দিয়ে এক্সির হাতার মল কাড়তে কাড়তে মা দিনকে বললো, 'বুড়ি কই। এই বাল্যার কি জ্বের ভাগাদার খেরিয়ে-ছেন নাকি ?'

মা শিন শুকনো হাসলো, 'না, মা শুয়েছে। কদিন শরীরটা ভালো নৈই। এই সময়ে আমার বাতের বেদনাটা বাড়ে।'।

'ওঃ' মুনপে দাঁড়ায় ওপর বসতে গিয়েই থেমে গেলো। দামী সিনের লুঙ্গিটার দকা শেষ হ'য়ে বাবে অপরিষ্কার দাঁড়ায় চেপে বললো। তার চেয়ে নিচু টুল পেলে হ'তো একটা।

মা শিন ব্যাপারটা আগেই ঝাঁচ করেছিলো। ভিতরে গিরে বেতের একটা মোড়া টেনে এনে পেতে দিলো, 'কাঁহার ওপর বলো না সাত ভাড়াভাড়ি। জানা লুঙ্গি সব বাবে।'।

মোড়ার ওপর মুনপে চেপে বললো। দমকা হাতার হারিকেনের শিখা কৈপে কৈপে উঠছে। সেই তালে দেয়ালের ওপর মা শিনের দীর্ঘায়ত ছায়াটাও ছলছে। আগের চেয়ে মা শিন খেন একটু সুন্দরী হ'য়েছে। আরো পুরুত্ব হ'য়েছে ছুটি দাল, ঠোট ছুটি আরো লালচে, চুলের গোছা খেন আরো দিশ কালো।

'মা শিন' মুনপে আস্তে ডাকলো।

'উঃ' মা শিন হাঁটুর ওপর হুখ রেখে আলতো উত্তর দিলো।

'বেশ মেরে কুঁষি। হ বাশে হ খানা চিঠিও তো লিখতে পারতে ?'

মা শিন হুখ তুললো। ছুটি চোখের তারার হারিকেনের শিখা কাঁপছে। এলোবোলো বাতালে চুলের হু একটা কুড়ি কপালের ওপর এগে 'পড়েছে, তোমার অমন অমন চিঠির কি উত্তর লিখবে ভেবেই কুল পেতাম

না। কি লিখবে ঠিক করতে করতেই সময় কেটে যেতো। লেখা আর হ'তো না। সন্তা যদি লেখাপড়া লিখতাম, মুনপে, তারি ভালো হ'তো তাহলে।'

ভাঙো হ'তোই ভালো। মনের কত কথা লেখা যেতো উকাড় ক'রে, ওর দুঃসহ চিন্তার তার বেগরা যেতো। যে আঙনের ঝাঁচ 'লেগেছে' ওর পাখরে সে আঙনের কিছুটা মূলকিত ছড়িয়ে দেওয়া যেতো না শিনের দিকে।

'তোমার চিঠি বিষ আমার খুঁষ ভালো লাগতো মা শিন।' মুনপে থেবে থেবে বললো, 'আনো তোমার অল্প একরিন হোটেলে আনাকে একটাকা জরিমানা দিতে হ'য়েছে। চিঠি পড়তে পড়তে বুদিয়েই পড়েছিলাম, বাড়ি আর নেতানো হয় নি।' মুনপে নজোরে হেলে উঠলো।

'শুধু একটা দিন কেন, আমি তাবড়ি আমার অল্প তোমাকে না লুগা জীবন জরিমানা দিতে হয়।'

মা শিন হাতের কাছ থেকে বেতের কুড়িওলো লরিরে রাখলো। কুড়ি দুদতে দুদতে গর করার তারি অনুবিধা।

'তার মানে' মুনপে মা শিনের কণার চমকে আশ্চর্য হ'য়ে গেলো।

ভিতর থেকে মা শিনের মার গলার আওরাক খেনো গেলো, 'কে রে মুনপে নাকি ? আর, আর, ভেতরে আর।'

মুনপে মোড়া ফেড়ে উঠে ভিতরের 'দিকে এগিয়ে গেলো। বাবার মুখে কিরে ঠাঁড়িরে মা শিনের লাভো ধবে আপতো টান দিয়ে বললো, 'এই এলো না ভেতরে।'।

মা শিন মুনপের পিছন পিছন আসলো।

একেবারে ঘরের কোশে বাড়িটা কনানো অবস্থার রাখা। স্পষ্ট কিছু দেখা গেলো না। একটা চাটাইয়ের ওপর মা শিনের মা শুয়ে রয়েছেন। চৌকঠি পার হ'রে মুনপে ঠাঁড়িরে পড়লো। বাড়িটা একটু

উকে না দিলে এগোনই অসম্ভব। অন্ধকারে হেঁচট খেয়ে পড়বে জিনিষপত্রের ওপর। বা শিন লুনপের পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেলো। ইচ্ছা ক'রেই, কিবা অন্ধকারে ঠাণ্ডার করতে না পেয়ে একেবারে লুনপের গা ঘেঁষে গেলো। বৌবনপট বেধে, স্পর্শে একটা মাদকতা। লুনপের বনে হ'লো সমস্ত শরীর বেন বিদ্যুতের হোয়ার বর বর ক'রে কঁপে উঠলো। মা শিনের বৌবন অন্ধকারে আরো বেন দুর্বার, আরো ছুসহ।

মা শিন বাস্তিটা বাড়িয়ে দিলো। দেয়ালে ঠেস দিয়ে মা শিনের বা উঠে বসলেন। চাটাইয়ের ওপর লুনপে গিয়ে বসলো।

‘আজ সকালে এসে পৌছেছিল না?’

‘হাঁ, বুড়িমা। শরীর কেমন?’

‘আর শরীর। এই সময়টা বাতে বড় কাঁহু করে ফেলে। একেবারে উঠতেই পারি না। একটু নড়াচড়া করতে পারলে ঠিক তোমের বাড়ী নিয়ে উঠতাম। মেয়েটাকেও সকাল থেকে অনেকবার বললাম, একবার যা না, লুনপে এসেছে, কেমন আছে বর নিয়ে আর। তা মেয়ে বলে কি, আমার লজ্জা করে। শোন কথা।’

লুনপে মুখ ফিরিয়ে বেবলো মা শিন কোপের দিকে পিছন করে বসে কি করছে। এদিকে চাইতেও লজ্জা করছে বুড়ি।

‘বাবুই বা কি ক’রে বুড়ি, সকাল থেকে আকাশের বা কাণ্ড তক হ’য়েছে।’

বুড়ি টোট উন্টে হাসলেন, ‘হ্যাঁ, বিলি বাবলকে বেঁচে কত সেরাহি করে। তবে ভুই নেই, মেয়েটার চোঁ চোঁ ক’রে বোরাটা একটু কবেছে। কেবল আমার পায়ে পায়ে ঘুরছে। কাকর বাড়ী বেড়ো বললেও বাবে না।’ হঠাৎ কথা থাকিয়ে বুড়ি বললেন, ‘মা শিন, কোণে বসে কি করছিল, এদিকে আর না।’

মা শিন ফিরলো না। বললো, ‘তোমার ওষুধটা

তৈরী ক’রে দিই। সকালে ভোঁ বাণ্ড নি, সবটা জানালা দিয়ে ফেলে দিয়েছো।’

বুড়ি টেঁচিয়ে উঠলেন, ‘হ্যাঁ বয়ে গেছে আমার ওই ভেতো ওষুধটা বেতে। সমস্ত নাকী বেন পাক দিয়ে গঠে। সবকার নেই মা শিন, ও ওষুধ তোমার বাটতে হবে না।’

লুনপে হাসলো, ‘মতি, এ কিন্তু কবিরাজের অস্ত্রার। চিনির ডেলা খেতে না দিয়ে তেতো ওষুধ দেওয়া। আমি বাখার সময় কবিরাজ কাকাকে বলে যাবোবন।’

লুনপের কথার ভংগীতে বা আর মেয়ে ছুসনেই হেসে উঠলো। বাড়িতে ওষুধটা নিয়ে মা শিন উঠে আসতেই লুনপে হাত বাড়িয়ে বাড়ীটা নিয়ে নিলো। আগলের ডগাগুলোর আবার হোঁরাছুরি হ’বে গেলো। চিন চিন ক’রে উঠলো লাঝ হাত। কেন যে এমন হয়।

‘নাও বুড়ি, লম্বী মেয়ের মতন হা কহো দিকি।’

মতিই বুড়ি লম্বী মেয়ের মতো হা করে সমস্ত ওষুধটা খেয়ে নিলেন। বিবাদ লাগার অন্ত কোন আপত্তি নয়, সাবাস্ত মুখ বিকৃতিও নয়।

বাইরে দুটি আবার ঝোরে নামলো। খোলা জানালা দিয়ে জলের ছাঁট আসতেই লুনপে গাড়িয়ে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিলো।

একটানা আগের রূপ ঝাপ লম্ব, শিমুল গাছের ডালগুলো জানালার ওপর আছড়ে পড়ছে তারই একেবারে খস খস আওয়াজ। ক্রান্তসেঁতে ঘর।

বিছানা বালিশ থেকে সোঁদা সোঁদা গন্ধ। সব নিলে বিশ্রী পরিবেশ।

‘সংসারের বা অবস্থা হ’য়েছে, কি যে হ’বে’ বুড়ি আক্ষেপ শুরু করলেন, ‘রোজগারপাতি একেবারে বন্ধ। মেতের ছুড়ি লাগি বুনে ঢালাছিলাম কোনরকমে কিন্তু আমি বিছানার পড়ে তাও একরকম বন্ধ। মা শিন কি আর গারে ওসব কাজ। গরীবের মেয়ে হ’লে কি হবে, কুঁকি দিয়ে ওকে আগলে রেখেছিলাম। কোনদিন এসব কাজ করতে দিই নি। এখন ছুড়ি বুদতে গিয়ে আত্মল

কেটে ছতে বেচারী নাভেহাল হ'য়ে গেলো।'

লুপে চোখ ফিরিয়ে দেখলো, কণা আরও হবার সংগে সংগেই বা শিন বাইরে উঠে গিয়েছে। হরত লক্ষ্যর, কিংবা খুড়ি বোনা বাকি রয়েছে, সেগুলো নিয়েই বসেছে।

'বা টিন বলভিলো' খুড়ি নয় নিয়ে আবার শুরু করলেন, 'ওর দোকানের পাশে ছোট কামড়া একটা পড়ে আছে, সেটা ও বিনা ভাড়ায় ছেড়ে দিতে রাজী, বা শিন যদি ছোট একটা দোকানের যতন করে। শিন গেলে চুকনের পেট চালাবার যতন তু' কিছু হবে।'

লুপে চমকে উঠলো। একটুখানির তরুণ সে অল্প-বয়স্ক হয়ে গিয়েছিলো খুড়ির সব কথাগুলো শ্রিক তার কানে বার নি। কিন্তু যেটুকু গিয়েছে, সেই তো যথেষ্ট। বা টিনের পাশে গিয়ে বসবে বা শিন কেন, কিসের জর? ভাড়ির দোকানের হৈ হলার পাশে বৃষ্টি আর তেল-ভাজার দোকান খুলে বসবে?

'কিন্তু আমার ভা নোটাই ইচ্ছা নয়।' খুড়ি বাতের স্বপ্নাভেই বোঝে হর চোখ দু'খুঁচকালেন, 'হাটের মধ্যে ছোয়ান উঠতি বয়সের নেরেকে শুভাবে বসানো শ্রিক হবে না। তার চেয়ে না বেরেতে না হয় অকিরাবে গিয়ে তেলের কলের সমুদ্রলী হবো সেও ভালো।'

ভালো বই কি, হাজার বার ভালো। বা টিনের আগুতার গিরে বা শিন বসবে? শুকোরের সামনে শিন কি হুস? ছু বিনে বাড়িরে চিড়ে খণ্ড খণ্ড করে ফেলবে পাগড়ীগুলো। কুলের অস্তিত্বও থাকবে না।

'ভোবার কোন ভয় নেই খুড়ি। চিরদিন মাছবের এক রকমের ব্যর না: তুনি দেয়ে উঠলে ভাবনা কি। ভোমাদের এদিকে ওদিকে টাকাও তো বড়ো কম হড়ানো নেই, জুবে আগলে অনেক হলো বোঝে হয়, সেগুলো আবার করতে পারলেও বেশ করে কামাস পায়েয় ওপর পা দিয়ে বসে খেতে পারবে।'

'কিন্তু সে সব কি আর কোন জমে আবার হবে।

কবে উঠবে তার ঠিক নেই, আর লোকগুলোও হয়েছে বাক্সেরেরের। কেবল না দেবার কলী। আজ সেবো কাল সেবো করে দু একখর তো পরেই পড়বে, আর থাকি বারা আছে তাদের কি চোখ রাজানী। যেন টাকা ব্যর দিয়ে, আনিই অপরাধ করেছি।'

যেথের ডাক। জনলার ঠাক দিয়ে বিদ্যাতের জিলিক। সুল্লির শেষ নেই। তেননি স্বড়ের বাপট। মনে হলো গাছপালাগুলো খুড়ি শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলে যাবে। বাড়ী বহর ভিত্তগুলো পর্যন্ত কেটে যাবে চিড় খেরে। হুঁপোগ। মনে হলো এ সেখ যেন আর কাটবে না, কোন দিন খুড়ি নীল আকাশের ফালিও দেখা যাবে না।

লুপে উঠে পড়লো, 'আজ উঠি খুড়ি। রাত হয়ে গেছে। একটা পণ আবার যেতে হবে।'

'কিন্তু যদি কি করে এই কড় কাপটায়? তিচ্ছে একলা হয়ে যদি যে? খুড়ি আপত্তি করলেন।'

'আর উপায় কি। বা ব্যাপার, আমাকে রাতে যে কড় ধামবে এমন লক্ষণ তো দেখা যাচ্ছে না। সংগে হাতা আছে। শ্রিক চলে যাবো।'

'তবু করে বাপু, দুদিনের জর গারে কিরে জলে তিচ্ছে অসুখ বিষুখ না কবে বসে।'

'হুয়াস শহরে থেকে এনি কাদার ভেলা খুড়ি হয়ে গেছি যে একটু খুড়িতেই গলে পাক হয়ে যাবো। উই', নিজের গাঁরের বিষ্টি গারে নাথতে ভালোই লাগবে।' লুপে বাইরে চলে গেলো।

নাওরার ওপর খুড়ি আড়াল দিয়ে হারিকেনের শিথাকে স্বড়ের বেগ থেকে বাঁচিয়ে কা শিন দেয়ালে ঠেস দিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো। হাতের কাছে বেতের তুপ। অথেক বোনা একটা সাজিও গড়াগড়ি যাচ্ছে। কিন্তু কোনখিকে ভ্রক্ষেপ নেই এমন কি লুপের পায়েয় আওনাঝেও চমক ভাঙলো না।

লুপে কাছে এসে বা শিনের কাঁধে হাত রাখতেই সে শিউরে উঠলো।

‘এই বুড়ি বেতের ছুড়ি বোমা হচ্ছে তোমার?’ মুনপে ভিশফিস ক’রে বলতে গিয়েই মনে পড়ে গেলো কড়ের শব্দে ওর গলায় আওয়াজ কোথায় চলিয়ে যাবে, তাই কথাটা জোরেরেই বললো, ‘আবার কেবল কীকি দেওয়ার চেষ্টা?’

মা শিন মুন পের হাতটা টেনে নিয়ে নিজের গালে হোঁচালো। জিনে গাল। আসেব হুট এনেছে খোখ হয়। কিন্তু এতটা দূরে বুড়ির জল এলোই বা কি করে।

মা শিন আঙে বললো, ‘গতি নিজেবে কীকি দিতে আর পারছি না-মুন পে। আদি সত্য।’

মুন পের বুকেটি বোজ দিয়ে উঠলো। মা শিনের পাশে জড়ো করা বেতের কাঁটাগুলোর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। কি তীক্ষ্ণ হর কাঁটাগুলো, একবার ভেরচাভাবে বিঁধে গেলে মাংস না ছিঁড়ে টেনে বের করাই দুসর।

‘আদি তোমার কথা দিচ্ছি মা শিন, করার নামে দিখি করে বলছি, আর বছর তিনেক তার বেশী তোমার অপেক্ষা করতে হবে না। আবার তুমি বিখাল করো।’ মুন পের গলা তীব্র কঁপে উঠলো। জড়িয়ে জড়িয়ে উচ্চারণ করলো কথাগুলো। বুকের মধ্যে টিপ টিপ শব্দটা আরো জরুরে শুরু হলো।

মা শিন চোখ দুটো বুকে মুন পের হাতটা নিয়ে গালের সংগে চেপে ধরলো। মুন পে আশঙ্ক হলো। কড়ের আওয়াজ ছাপিয়ে তাহলে শোনা গেছে ওর কথাগুলো। বুড়ির একটানা ব্যাথাপাতের মধ্যে একটি অক্ষরও হারিয়ে যায় নি।

নিচু হয়ে মুন পে মা শিনের দুটো হাত নিয়ে বুকের কাছে টেনে আসতে গিয়েই চমকে উঠলো। হারিকেনের খর আলোর বেগতে কোন অসুবিধা হলো না। আঙুলের ডগাগুলোর রক্ত অবন লাল হয়ে উঠেছে। কলী পর্বত সমাধিস্থল করেকটা ঝাঁচড়। আর একবার অবনো বেতের কাঁটার দিকে চেয়েই মুন পে আচরকা মা শিনের হাত দুটো ছেড়ে দিলো।

কোণে ঝাড় করানো ছাতাটা টেনে নিয়ে জোর পায়ে উঠানে নেমে গেলো। বাইরের দাপাদাপি ছাপিয়েও ওর বুকের দাপাদাপি আরো প্রবল হয়ে উঠলো। পাখর শুলো! কে বেন হুচড়ে দিলো আর বলিই লোমশ দুটি হাতে চেপে ধরলো ওর গলা। খাস নিতে কষ্ট হলো।

হাতার এ কুটি ঠেকানো অসম্ভব। অমা আর লুগি জিকে সপদণ করতে লাগলো। কোলো চাওয়ার শীতের আমেজ। শরীর শির শির করে উঠলো। লুগিটা তাঁজ ক’রে নিয়ে মুনপে একটা হাতে চাতাটা শক্ত করে ধরে আর একটা হাত এজির পকেটে দিয়েই বমকে গাড়িয়ে নড়লো। ভুল হয়ে গেছে। কাণের পাখর ছুটোর কথা একেবারেই খেয়াল ছিল না। সম্বর্ণপে পাখর দুটো বের ক’রে নেড়ে চেড়ে দেখলো। অনেক দূর এগে পড়েছে। এই কলে কানায় আর কিরে যেতে ইচ্ছা করলো না।

নীল বিহুস্তের বলক। সবজ আকাশ মাটি দিনের আলোর উজ্জ্বলিত হ’য়ে উঠলো। করেকটা দুহুর্ড। কিন্তু সেইটুকুর মধ্যেই মুনপের নজর এড়ালো না। বকবক করে জলে উঠলো লাল কাণের পাখর দুটো। ঠিক বলেছিলো রক্তা খোস, রক্তের মন্তন লাল দুটো পাখর। রক্তের মন্তন লাল! কিন্তু মুনপের মনে হ’লো রক্ত অবন থাক। মা শিনের আঙুলের ডগাগুলো আরো লালচে, গাঢ়তর রংয়ের ছোপ। সে গভীর রক্তের কাছে সত্যিই লালবেরের রঙটা কেমন ক্যাকাসে আর দীপ্তিহীন মনে হ’লো। পাখর দুটো এজির পকেটে রেখে মুনপে বোড় ঘুরলো।

পরের দিন সকালে বিজ্ঞান ছেড়ে উঠেই মুনপে গাড়িয়ে নড়লো। উঠানের ওপর গোল হ’য়ে ছেলের দল ব’লে রয়েছে। মুনপের বাঁয়েয় সঙ্গীরা। কাল কড় বাদলে খোখ হয় এলে জুটতে পারেনি। আক সকাল হ’তেই বেথা করতে এলেছে।

ভিতরের ব্যাথাবার ড খিনের সংগে বেথা হ’তেই

দুশপে জিজ্ঞাসা করলো, 'আচ্ছা, ভোর ভোর সব এসে জুটলো যে, খবর পেলো কোথা থেকে?'

'কেন খবর দেবার লোকের অভাব কি?' ডাঃ বিন হাত দুটো উঠে নিঃশব্দ কপালে ঠেকালো, 'তোমার বাবা কাল তবু বিষ্ণির জন্তু ক্রিান্তে পড়েনি। আজ ভোরে ফিরেছে। আসবার সময় থাকে হুঁপাশে গেছেছে, তাকেই খবরটা দিয়ে এসেছে। কোথার ছেলে একটু ক্রিান্তে এসেছে, দু'দণ্ড স্থির হ'য়ে বসবে যবে, তা না! অন্যবোধের বল ভোর থেকে যেউড়ী আগলে বসে রয়েছে।'

লুপে হেসে তোয়ালে দিয়ে মুখটা মুছে বাইরে গিয়ে পাড়ালো। হেঁচ হেঁচ হুটগোল। সবাই শুকে বিরে পাড়ালো।

'এই যে, শহরের কি খবর ব'লো?'

'বাং, এর মধ্যেই পুরোছত্তর পছরে ব'নে গেছো। বেলো আটটার ঘুর ভাঙলো?'

'চলো, চলো, বাইরে বেরোই। কো-শানের বোকানের চা আর কড়াই শুঁটি ভাঙা এই বামলার তারি মুখরোচক। লুপের কাছে আনাধের বাগুরা তো পাণ্ডনাই আছে।'

লুপ থেকে এক রকম বাজা দিয়েই বাইরে গিয়ে গেলো। আকাশের অবস্থা ভালো নয়। বৃষ্টি রয়েছে বটে, কিন্তু বেঘের চাপ একটুও কমে নি। গর গর করছে আকাশ।

সবাই নিলে কো-শানের বোকানের সামনে সান্নি পাতা টুলের ভগ্নর গিরে বসলো। কাবার জলে একাকার। পা নারিয়ে বসবার উপায় নেই। কিন্তু কো-শানের চারের কাশে চুখু বিতেই লুপের পা বুগিরে উঠলো। কুচকুচে কালো রং ছবের নান্দগন্ধও নেই। কিনাইলের নতুন আবাদ।

'বেগ চা ডি করে কো-শান। এই জন্যই তো' আর হাইল হাতা হেঁটে গর বোকানে এসে জুটি।' কে একজন জোকরা বললো।

'সত্যি, এ কিনিবই আদায়া।' আর একজন সায় দিলো।

লুপে চুপ করে রইলো। এদের আর শোষ কি। হোটেলের তৈরী দুধবদন চা কিংবা বোমলট্রীর বোজের বোকানের চাতো আর নি কোনদিন। ভালো আর খারাপ জিনিসের ভকাতই বা মুকবে কি করে। আশ্চর্য এই আলকাভরা রংয়ের চা-ই গিলে এসেছে। নহর বাবার আগে লুপেও তো মনে করতো কো-শানের বোকানের চা-ই সব চেয়ে সুরেশ।

'ভারপর লুপে, নহর কি দেখলে বলো? ক'রাত শো'রে নাচ দেখে কাটালে?'

'পোরে নাচই দেখিনি তাই, তা ক'রাত।' লুপে আর খাওয়া চারের কাপ হাটতে নামিয়ে রাখলো।

'বলো কি?'' ছেলেটি দুটো চোখ আর কপালের বাফামাকি তুলে আললো, 'সময় কাটতে কি ক'রে?'

'পছরে সময় কাটাবার অভাব। বড় বেড়াবার জায়গা। আর লেক, কাল শেইয়ের জেটি, পরন্তু প্যাগোচা, সময় কোথা দিয়ে কেটে যায় টেরই পাওয়া যায় না।' পকেট থেকে পরশা বের ক'রে লুপে কো-শানের হাতে দিলো।

'সত্যি কোবার অজ পাড়ানীর পড়ে আছি আবার' ছেলেটি নিঃশব্দ কেললো, 'হ্যাঁ লুপে, লাট সারেনের বাড়ী বেবেছো? খুব বিরাট বাড়ী না?'

'না তাই, বিলিভী লাটের বাড়ী বেববার মতন মনের অরহা ছিলো না। যদি কখনও এসে যেতে গছের ছটীরে দিয়ে আনাধের নিঃশব্দ লোক লাট হয়ে বসে, তখন লাটের বাড়ী যেতে বাণো হুল আর বোমবাস্তি হাতে ক'রে।'

লুপের গলার আঙুরাছে মলের মধ্যে একটা চাকল্য। সবাই মুগ চাওয়া চাওরি করতে লাগলো। বলে কি লুপে। বিলিভী লাটকে হটাবে আর হটাবেই বা কোথায়?

'কাদের হটাবার কথা বলছো, কোপে বলা ছেলেটি জিজ্ঞাসাই করে কেললো।'

'এই সব বোঝাবার বারা হাতিপাটার আড়ালে

এদেশে যুদ্ধে এসেপেরই করেকটা। কুতুর লেলিরে দিয়ে এসেপের সর্বনাশ করেছে। লুণ্ঠাগরের মুখোশ পরে এসে এসেপের মাঠে মাঠে গ্রামে গল্পে পলপালের মতন উড়ে এসে ছুড়ে বসেছে। কলস লুঠ করছে ইচ্ছা লুঠ করছে, দেশটাকে খেঁচলে ছিঁচছে ক'রে গিচ্ছে।'

‘কিছু ভদের হটাৎবে কে?’

লুণ্ঠাই তো কে হটাৎবে। ভেলেপের মুখে চোখের তাবে ওই এক সম্বন্ধ। বুদ্ধে বসে দাড়িই না হয় ওপড়াচ্ছে বোঝার, কিন্তু বুদ্ধের শিরা উপশিরায় লগে যে বিশে গিরেছে একেবারে, বাস ছিঁড়ে ছিঁড়ে কে আলাপ করবে ওদের? বুদ্ধ থেকে টেনে ছিঁড়ে নাটতে নামিয়ে নেবে?

‘কেন আশ্রয়? তুবি আমি আর লম্বাই’ উত্তেজনার লুণ্ঠের গলার আওয়াজ ভারি হ’য়ে উঠলো, ‘বাদের মাঠের কলস কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা, বাদের মা বোনের ইচ্ছা মাটির মুলোর যেখাচ্ছে?’

ছেলের দল অবভিবোধ করলো। হু’একজন নড়ে চড়ে বসলো।

‘গুপ্ত ব্যাপারে আমাদের মাথা বাবাবার বরকার কি ভাই। তা চাড়া এতো আর তোমার ঘরের চালে বসা কাক নয়, যে হাত তালি দিলেই উড়ে যাবে? লড়বে কে ওদের সংগে? কামান, বন্দুক, পিঙ্কল ঠেকাবে কি সেইন হুঁন কামারের তৈরী মা আর লড়কী দিয়ে?’ ভেলের দল হো হোকরে হেসে উঠলো।

‘লড়কী আর মা দিয়ে কেন? বুদ্ধ দিয়ে ঠেকাবে। চণ্ডা বুদ্ধ নেই তোমাদের? দেশের লোকের সংখ্যা তো কম নয়। একদল বরবে আর একদল এসে তাদের কারগা নেবে? ভদের হাত যুড়ে পিঙ্কল বন্দুক চিড়িয়ে নেবে? ওদের কলকারখানার কাছ করতে গিয়ে তো জান দিয়ে আসলো, ওদের মুখোমুখি ঠাঁড়তে, গারে একটু খাঁড়ক লাগলোই বা!’ শেষ দিকের কথাগুলো বলতে বলতে লুণ্ঠে ঠাঁড়লো উঠে।

হু’একজন ক’রে ছেলের দল গরে পড়লো। কেউ হাটে বাঘার অছিলায়, কেউ অস্ত্র কোন কাজের ছুতো ক’রে। আরগাটা আর খালি হ’য়ে গেলো। শুধু একটি ভেলে বসে রইলো লুণ্ঠের সামনের টুলে।

লুণ্ঠের চোখ দুটো আলা ক’রে উঠলো। এই তো য়েপের বাহু, জাভের পাখর; এরাই মূলো ফেড়ে টান হ’য়ে ঠাঁড়বে, গ্রামে গ্রামে। প্যাগোডার চাতালে চাতালে এরাই ঠাঁড়বে আতনের তুলকি, এদের কপার ঝাঁচ লেগেই মুক্তি বাস্তব তেভে লাল হয়ে উঠবে। এখনও অনেক দেবী। পোয়ের গল্প আর হরত শহরের নেহেরের গালগল্প শোনবার অস্ত্র এরা লুণ্ঠেপে যেতে বসেতিসে, ওরই পরসার চা খেয়ে হরত টিঙ্গনি কাটতো মাঝে মাঝে। কিন্তু যেখাওয়া কথা তুনেই সব নগে পড়লো।

‘কি তুবি যে বসে রয়েছো এখনো? ওরা তো কেটে পড়লো।’

লুণ্ঠে ভীত গলার কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

ছেলেটি অগ্রসর হয়ে পড়লো। কুতকুতে হুটি চোখ মেলে কিছুক্ষণ বোকার মতন লুণ্ঠের দিকে চেয়ে রইলো। হাঁ করে, তারপর চিবিয় চিবিয় বললো, ‘আর এক কাপ চা খাওয়াবে লুণ্ঠে। বাজীর বা অবস্থা দেখে এলাম, তাইই ছুটবে না হরত এবেল। পকেটও চাউটোর মাঠের মতন একেবারে কীকা।’

লুণ্ঠে কোন কথা না বলে বাপের সাকো বেয়ে রাত্তার ওপর গিরে ঠাঁড়লো, তারপর কি ভেবে একটু পাড়ির পকেট থেকে একটা আনি বের করে ছেলেটির দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হন হন করে এগিয়ে গেলো।

এরা বাহুব নয়, নেটি ইচ্ছের দল। লক্ষ পেলেই গর্তে গিরে সে’যোবে আর কিচির মিকির করবে। বাস, এই লম্বাই।

জুহুইতলার কাছ বরাবর গিরে লুণ্ঠে বাবলো। বাপের চোটে খেয়াল করে নি, সোখা মল আর কামার ওপর গিরে ঘেঁটে এসেছে। চটি ছোড়া কামার মাথা-মাখি। বাপের ওপর চটি ঘেঁষে লুণ্ঠে কাদা তুলতে লাগলো। নতুন চটিটার আর পথার থাকবে না—হু’দিনে ছেঁড়া জাককা হ’য়ে যাবে।

‘কে লুণ্ঠে নাকি? ওখানে দাড়িয়ে কি করছো, আরে শোনা, শোনা!’

সাধারণ নির্বাচন

বীরেন্দ্র মহম্মদ

সভাপতি, নিখিল ভারত, চরখা দল

স্বাধীন ভারতের সাধারণ নির্বাচন সমাপ্ত হয়েছে।
এংগের বিভিন্ন প্রদেশে প্রতিনিবন্ধিত বৃদ্ধ যত্নমণ্ডলীও
পতিত হয়েছে। বিশ্বের ইতিহাসে এত অধিক সংখ্যক
লোকের একত্রে একতাকভাবে শাসক নির্বাচনে অংশ
গ্রহণ করার আর কোন নিদর্শন নেই। সমগ্র অগত
উৎসুকভাবে এই বিরাট প্রয়োগের বিবেচনা করেছিল।
কারণ কারণ মনে আশঙ্কা ছিল। তাঁদের ভয় ছিল
যে এই উচ্চতার বোধের ভারত বহন করতে পারবে না।
হঠাৎ ব্যাপকভাবে দাঙ্গা হাঙ্গামা এবং হিংসার ভাণ্ড-
লীলা অপ্রতীত হবে। তবে সৌভাগ্যবশত এ রকম
বিশিষ্ট হয়নি। নির্বাচন সর্বত্রই সুসম্পন্নভাবে অনুষ্ঠিত
হয়। জনসাধারণ নির্বাচনকালে শান্তিপূর্ণ আচরণ
করে। এতে ভারতের অগ্রদূতের মুহূর্তেই প্রকাশ
পেয়েছে। বাপুজী সর্বদা বলতেন যে ভারতের আত্মা
শান্তির সাথে ওতপ্রোতভাবে ঘটিত এবং এইজন্য
ভারতের স্বাধীন সমাজের স্বাধীন শান্তির উপরেই
হওয়া সম্ভব। গণতান্ত্রিক শ্রীতির সাথে অপরিচিত
ভারতে এখন নির্বাচনের ফলাফল বাপু পুরোস্ত উত্তির
ব্যর্থতা প্রমাণ করেছে।

তবে নির্বাচনের এই অভাবনীয় সাক্ষ্যের ক্ষত বৃষ্টি
হবার সাথে সাথে নির্বাচনের ফলে দেশের বিভিন্ন
রাজনৈতিক দলের যে প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ পেল, সে
সহজে আশাযের পতীতভাবে বিবেচনা করতে হবে।
কারণ গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর দেশের শাসন কার্য
চালাতে হলে বেশকি পরিচালনা করার দায়িত্ব কোন না
কোন দলের উপর পড়বে।

কংগ্রেস এই নির্বাচনে সর্বাধিক সাক্ষ্যলাভ করেছে।
কংগ্রেসের এ রকম সর্বাধা পাওয়া অতি স্বাভাবিক।
কংগ্রেসের অসীম ইতিহাসের কথা পর্যালোচনা করলে
মনে হয় যে এরকম সাক্ষ্য কংগ্রেসের না হলে তা

আশ্চর্যজনক মনে হত। তবে কংগ্রেসও নিশ্চয়
নির্বাচনের ফলাফল অতিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করেছে।
বিগত ৩২ বৎসর যাবত কংগ্রেসই ছিল দেশের একমাত্র
স্বাধীনতাবাদী দল এবং কংগ্রেসের নির্দেশে সকল
শ্রেণীর বেশতরু দলে দলে আত্মঘাতি দিয়ে এসেছে।
কংগ্রেসই নাম যুগে নিয়ে গান্ধীজীর নেতৃত্বে সহস্র সহস্র
যুবক একসাথে নিষেধের সর্বত্র ত্যাগ করে দেশের
স্বাধীনতার সূক্ষ্ম ভিন্ন করেছে। কংগ্রেসের অসীম
ইতিহাসের কথা চিন্তা করলে স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর প্রথম
নির্বাচনে কংগ্রেস যে যায়ে ভোট পেয়েছে, তাকে কোন
মতেই স্বাভাবিক বলা যায় না। কংগ্রেসের তেওঁ শতকরা
একশততরু ভোট পাওয়া উচিত ছিল। এরকম হওয়া তো
হূয়ের কথা সর্বদাচলো কংগ্রেসের স্বপ্নকে অধিকাংশ
ভোট পড়েনি। তাই তাঁদের তেবে বেখতে হবে যে
এতদিনের জ্ঞান-সমাজ সেবার 'ব্যাক বালাস' সবেও
কেন তাঁরা এত কম ভোট পেলেন? এই অত্যন্ত কালের
মধ্যেই কি কংগ্রেসের বাট বছরের 'ব্যালাস' সূরিয়ে
গেছে না অন্য কোন ব্যাপার ঘটেছে? আবার পাঁচ
বছরের ভিত্তি এই দলের হাতে শাসন কামত। এসেছে।
একে ভাঙা যেন কঠিন পরীক্ষা বলে মনে করেন।
আত্মনিয়ন্ত্রণ করে তাঁদের নিজ চরুশতা হুর করতে হবে।
সাথে সাথে তাঁদের এ কথাও চিন্তা করতে হবে যে
বর্তমান যুগের সমাজবানীর স্বাধীনতার আদর্শ পথ নির্দেশ
করার ক্ষমতা স্বাধীনতা নামক যে যুগপুত্র অগ্রগমন
করেছিলেন এবং তাঁর প্রাথমিক পন্থা তাঁরা
স্বাধীনতার গৌরবমণ্ডিত স্বর্ণরাজ্যে উপনীত হয়েছেন,
দেশের আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার পুনঃ পঠনের ক্ষমতা
সেই মহাপুরুষ কর্তৃক বর্ণিত উপায়ের পরিবর্তে পান্ডিত্য
পদ্ধতি গ্রহণ করে কি তাঁরা দেশকে বাচাতে পারবেন?
এই সব কথা বিবেচনা করে তাঁদের আগামী পাঁচ

বৎসরের কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে। কংগ্রেস বিরোধীদলগুলিকে ভেবে দেখতে হবে যে নির্বাচনের পূর্বে তাঁদের অবস্থা আশাশুভক মনে হলো ও তাঁরা আশাশুভক নাকি 'অন্ধ' করতে পারেন নি। সাম্প্রদায়িক দুর্যোগ উপর যে সব দল প্রতিষ্ঠিত, তাদের এ কথাটি বুঝবার দিন এসেছে যে জনসাধারণ তাদের সাথে নেই। তাঁরা যেন জেনে রাখেন যে গান্ধীজীর আত্মত্যাগের সাথে সাথে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক অগ্নি নির্বাপিত হয়েছে। আজ সাম্প্রদায়িকতার বেটুকু নিঃশব্দে দূরীভূত হয় তা যে অগ্নিশীলার ক্ষণাবশেষের তত্ত্বাবধান ছাড়া আর কিছু নয়, সে বহিঃ আত্মসম্মতি হবে না।

অস্বস্তি বিরোধীদলকে একটা কথা ভেবে দেখতে হবে যে কোন তপস্বী তপস্যার ফল স্বরূপ ইব্রাহিম খানের পর বত খুদী খিলাস খানদের প্রোক্ত গাঢ়লুক না কেন, তাঁর আসন কিন্তু নড়ে না, তার চেয়ে অধিক বলবত্ব কোন ব্যক্তি না। আশা পূর্বক তাঁর ইচ্ছা অনুসর্য বাক্যে স্তত্রায় তাঁদের নিঃস্বার্থের অবস্থান সম্পর্কে পুনঃ বিবেচনা করে বর্তমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের সামনে যে বিষয় সমস্তা তার সমাধানের জন্য কঠিন ত্যাগ ও কঠোর তপসা করতে হবে। এর জন্য নিজ জীবনের আহুতি দিতে হবে। শুধু অশ্রুরে কিস্তাষেবণ করে তাঁদের ভবিষ্যৎ রচিত হবে না।

সুতরাং বিগত নির্বাচনের ফলাফল নিয়ে প্রত্যেক ব্যক্তির হৃদয়ের যে গভীর বিবেচনা করা প্রয়োজন এতে সন্দেহ নেই। আশা করা যায় যে সংশ্লিষ্ট সকলে যথোচিত গুরুত্ব সহকারে এ কার্য করবেন। নির্বাচনে বিভিন্ন দলের ব্যস্ত অবস্থা অস্বস্তি বোধ্য। এখন যেখানে হবে যে জনসাধারণের অবস্থা কেমন এবং তাদের উপর নির্বাচনের কি প্রভাব পড়ল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে নির্বাচনের যে সব অমূল্য খবর পাওয়া গেছে তাতে জনসাধারণের সর্বাঙ্গিক অজ্ঞতার কথাই প্রমাণিত হয়। এর ফলে গঠনমূলক কর্মীদের সামনে যশেট চিত্তবীর

বিষয় উপস্থিত হয়েছে। যেটা দুটি একথা বলা যায় যে গঠনমূলক কর্মীদের কর্মক্ষেত্রে ও বিশেষ জনগোষ্ঠী দূরীভূত হয় নি। সুতরাং বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে সাথে গঠনমূলক কর্মীদেরও ভেবে দেখতে হবে যে প্রাপ্ত বয়স্কদের ভোটাধিকারের ফলে সঠিক পরিস্থিতিতে তাঁদের কোন কর্মস্বা আছে কিনা। জনসাধারণের মধ্যে নাগরিকতার অধিকার ও কর্মস্বা স্বকীয় শিকার প্রসারের তার তাঁদের নিতে হবে এবং তার জন্য নিশ্চিত কার্যক্রম ভেবে ঠিক করতে হবে। প্রত্যেক গঠনমূলক কর্মীকে এইভাবে কাজ করতে হবে যাতে তার কেন্দ্র সংলগ্ন অঞ্চলের প্রতিটি ব্যক্তি সচেতন নাগরিক-রূপে গড়ে ওঠে।

কেন্দ্রীয় নির্দেশে পরিচালিত সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তে বিচ্ছিন্ন ও ব্যবসায়ী সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তিতে গ্রাম রাজ্য স্থাপন করা যদি কাতাই নগলের স্বতন্ত্রের লক্ষ্য হয় তবে এ কাজের সর্বাধিক বাস্তবিক তাঁদেরই উপর পড়েছে। সুতরাং তাঁদের বরত শিকার এই গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম নিজ হাতে নিতে হবে এবং প্রাচ্যের যুগের শিবির, পাঠশালা এবং সাধারণ সভা আদি সংগঠন করতে হবে। তাদের সাম্প্রদায়িক বৈধিক ক্রমশঃ অধিক সংগঠিত সাধারণ গ্রামবাসীদের আদর্শ করে এ কাজের পরিণি বাড়াতে হবে। যে বৈধিক কার্য সম্পাদনের জন্য কাতাই নগলের অর্থ, তারই পরিপূর্তির জন্য এই ধরনের কার্যক্রমের যশেট সহজ আছে।

নির্বাচনের ফলে জনসাধারণের মনে ভাল ও মন্দ দু ধরনের প্রভাবই পড়েছে। নির্বাচনফলে বিভিন্ন দল ও প্রার্থী অজ্ঞ জনসাধারণকে অশ্রু টানার চেষ্টা করার তাদের পারম্পরিক আদোচনা ও তর্ক বিতর্ক জনসাধারণের চোখ খোলায় বাপারে যশেট কাজ করেছে। এর ফলে তাদের মধ্যে নিঃস্বার্থে নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার হয়েছে ও তারা শিক্ষাগোষ্ঠী করেছে। এত দৃষ্টিত আবহাওয়া সৃষ্টি হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচনের এটি একটি অস্বস্তি সত্ত্ব পরিণাম।

বিভিন্ন প্রাণী ও বলের বিশেষপূর্ণ প্রচারের ফলে যে ভরস্বর প্রকাশ ঘটি হইতে তাতে স্বাভাবিকভাবেই আদর্শ যথেষ্ট ক্ষুদ্র হইয়াছে। ব্রাহ্মণ অত্রাঙ্কন, জাতি, বৈশিষ্ট্য, কারক বৃষিবার কুমী আকির আদি দুখ্য আভিগত পার্থক্য নির্যেই শুধু লগ বোলা করা হয়নি, সৌর কারককৃত আদি দৃষ্টিভঙ্গি শ্রেণী ও উপশ্রেণীগত বিবেচের স্বাভাবিক ও যথেষ্ট সূর্য ছিল। বিভিন্ন রাজ্যে পৃথক নির্মাণে ব্যবহৃত থাকে। সঙ্কেত প্রাচীনিকতার দৃষ্টান্ত ও তীর্থতাবে চিত্রিত। এই সব মনোভূতি যে দেশকে কোথায় নিয়ে যাবে সে সবকিছু অপর্যাপ্ত তত্ত্ব কর্তেও আতঙ্ক হয়। গাছীকীর আত্মদানের পর সাম্প্রদায়িকতার অধি নির্মাণিত হলেও প্রাচীনিকতা ও সর্গীয় জাতি বিবেচের দৃষ্টান্ত যে তাতে গেলিহানশিবা বিস্তার করেছিল, স্বভাবতই তা অতীত তদ্যাবধি। নির্মাণকালে এই অধিতে যেভাবে দৃষ্টান্ত পড়েছে সে সবকিছুও প্রত্যেক বল ও গঠনমূলক কর্মীদের গভীরভাবে চিত্রা করতে হবে।

নেতৃত্বানীর ব্যক্তিকে প্রজ্ঞা ও সন্ধান করাই ভারতের ঐতিহ্য। অগত নির্মাণের সময় বিভিন্ন বলের নেতৃত্ব স্বমালোচনার ক্ষেত্রে বিরোধী বলের কাব্যক্রম ও নীতির

মধ্যে সীমিত চাখার ফলে যে ভাষার বিরোধী পক্ষের কর্মী ও নেতৃত্বের প্রতি ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছেন ও কুৎসা রটনা করেছেন, তাতে সত্য প্রতীকী জন-সাধারণের মনেও তাঁদের প্রতি প্রচার অপর্যাপ্ত ঘটেছে। আজ যাতে যাতে যাতে দেশের বিশিষ্ট নেতৃত্বের সবচেয়ে বরকম দাঁড়িযতীন ও লম্বিত্ততার বাণে আলোচনা চলছে তা কোন দেশের নেতার মর্যাদার পক্ষেই শোভনীয় নয়। এমতাবস্থার জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক উল্লেখ্যতার পরিচয় গেলে তাতে আত্মবিস্মিত হবার কিছুই নেই।

কাজই হওনের সবচেয়ে গঠনমূলক কর্মীদের এ বিবেক ও নজর দিতে হবে। জীবন গণ করে তাঁদের প্রাচীনিকতা এবং সর্গীয় জাতি ও শ্রেণী বিবেচের মূলোৎপাটন করতে হবে ও বলগত অগভীর বাইরে থেকে নিজ ভাগ ও তপতা দ্বারা দেশে জনসাধারণের আত্ম-ভাষন নেতৃত্বের সৃষ্টি করতে হবে।*

*মূল হিন্দী হইতে শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনূদিত।



সাপ অজিত দাস

বাইরের ঘরে বলেছিলেন। একজন লোক সামনে এসে পাড়াল। খালি গা। কাঁবের ওপর গাধা। কালো চেহারা। বয়স বড়র পাঁচিশ হবে। মাথার চুল-জলো উমোখুতো। চোখ দুটো বেশ উজ্জল। আর সব চেয়ে মজার হচ্ছে তাঁর হাত। ওপর পাটিতে ছই কবে দুটো গজদন্ত। ঠিক মহাতারতের বক রাক্ষসের মত। সে করতোড়ে প্রশ্ন করল। দেখেই আমার হাসি পায়ছিল। কোন রকমে সামলে নিয়ে বললাম—কি চাই?

—আজ্ঞে, কাজ।

—কাজ, কি কাজ করবে?

—আজ্ঞে আপনার ভোঁ ঘর উঠছে। ছাদের খোঁরা ত্যাগেবন না?

—তা তাগাতে পারি। ঘর কি?

—সে আটকাবেনা হুজুর। বললই বগল থেকে হাতুড়ি বার করে তেলল।

—তাহলে সেগে পড়ি?

প্রশ্নটা মামুলি ভাবেই করল। যেন না করলেই নয়। উত্তরের অপেক্ষা ভাব লইলো না। লাফাতে লাফাতে ইটের গাধার গিড়ে পাড়াল।

বাধা দিতে পারলাম না। বরং হেসে নিলাম খানিক। আজ্ঞা মজার লোক তো। কিন্তু নামটা কি? ঘর থেকে উঠে ওর কাছে গিয়ে পাড়ালাম। ইতিমধ্যেই ওর কাজ শুরু হ'য়ে গেছে। আমি দেখতেই পামল। গজদন্তদুটো বেরিয়েই থাকে। আরো খানিক অংশ বার ক'রে হেসে বললে আজ্ঞে হুজুর—খুব ভালো ক'রে ভাঙবে। ঠিক বাণ মতো। একেবারে চৌকস। কিন্তু দেখতে হবে না। ঠাকি নেই হুজুর।

আবার হাসি পেল। হাসি চেপে বললাম—স্তোর নাম কি?

—আজ্ঞে নোখারক ভোসেন। বাপের নাম ছাঁবের হোঁগেন। ছুতাই আমরা। ছোট ভাইয়ের নাম, সুহিরাম।

আরো হরতো বলতো অনেক কিছু। সুবোণ দিলাম না। ওর বাঁচালতাকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। বললাম আজ্ঞে হয়েচে। স্তোর কাজ কর এখন।

জেনেই সে দুপাটি পাঁজ বার ক'রে কেলল। হেসেই পুন।

বিকেল বেলা চাকরী ক'রে ফিরেছি। সীমা মানে আমার স্ত্রী হালতে হালতে চুকলো।

—আজ্ঞা লোক জুঁয়েছ বা হোক।

—কেন?

সীমা বললে—প্রথমেই তো চেহারাখানা। যেমন বাছায় রঙ, তেমনি বুপে খোঁচা খোঁচা পাঁজি। আবার দুপাশে দুটো গজদন্ত। ঠিক যেন সুগ্রীবের কপি সেনা। কিন্তু বাই বলো ওল আছে লোকটার।

—কি রকম। ভূমি জানলে কি ক'রে? আশ্চর্য হ'য়ে প্রশ্ন করলাম।

—আমি গো জামি। যে লোক এনেছ। শুণ জানতে থাকি থাকে না। একেবারে সোভাহুজি বাড়ীর মতো এসে বললে—বৌদিহি একটু আগুন দিন। ভানাক খাবো।

—তাই নাকি? একেবারে বৌদিহি?

হ্যাঁ পোনই না। দিলাম এক ছাতা আগুন। সেগুলো এক এক ক'রে কন্ডের মধ্যে বসার আর কি সব বিড় বিড় ক'রে বলে। ভাবলাম পাগল নাকি? মনে হোল সাপ লাশাক কিছু করছে নাকি? থাকতে না পেয়ে ভিজ্জেন করলার। প্রথমে বলতেই চায় না। দুখ গুরিয়ে চেপে থাকিল। জোর করতেই বলণে, মন্তর।

—মন্তর! কিসের?

—সাপের।

—সাপের!

বলতে বলতে সীমার চোখ দুটো অস্বাভাবিক উজ্জল হয়ে উঠেছে। উৎসাহ নিয়ে বলে চলল—কত রকম সাপের নাম করল। ও নিয়ে নেভেছে। খেলা খেপাতে পারে। বশ করতে পারে। কত রকম নাম—গোখরো, কাল কেউটে, চন্দ্র বোড়া, ঝালবোয়। আরো কত রকম, চাই সব নাম মনেও থাকেনা। আমাকে একদিন দেখাবে বলল। গোখরো ধরে আনবে। বিস্ময় বলে খুব। ওরে বাবা!

কল্পনা করেই নিউরে উঠলো সীমা।

আবার হাসি পেল। আচ্ছা বোকা মেয়ে। রাগ হোল বোবারকের ওপর। সীমাকে অনভিজ্ঞ পেয়ে খান্না বেরেছে। কাজ হাসিল করার তলব। বলল—ও সব বিশ্বাস কোর না মোটে। ঝাঁকি দেবার মন্তলব। বাজে, একদম বাজে।

—না, না। অকুণ্ঠ বিশ্বাসে প্রতিবাদ করে উঠলো সীমা।—ও জানে। আমাকে দেখাবে বলেছে। ঠিক দেখাবে। কত রকম কোলল জানে। আর তোমাদের মোব লেগা পড়া শিখে ওসব বিশ্বাস করতে চাও না।

এর পরে আর প্রতিবাদ করলান না। সীমার অভিযোগ মেনে নিয়ে থেবে গেলাম। কিন্তু আকোশ গিরে পড়ল বোবারকের ওপর।

যেখি ঠিক সকাল বেলা সে এসে বলেছে ইউ গাবার ওপর। কিন্তু শোয়াত ভাঙছে না। করছে কি? ভালো করে তাকিয়ে দেখি এক টুকরো কানা দিয়ে এক রাকসের মত ঝাঁত দুটো বসছে। কাছে যেতেই কানোটো কেলে দিল। হুখে সেই গজদম্ব বার করা হাসি।

—কি করছিলি রে? জিজ্ঞেস করলাম।

—আজ্ঞে এই ঝাঁত দুটো।

—ঝাঁত দুটো কি?

—আজ্ঞে থবছিলাম।

—কেন?

মোবারক একটু ইতস্তত করল। নিঃশব্দ হাসিতে মুখখানা তরিরে কুলে বলল—খুব খারাপ লাগে। বিচ্ছিরি। আবার নেকাপড়া হোল না কেন জানেন। ছোট বেলার মাটিরের পাঠশালায় গিয়েছিলাম। বা ভক্তি করে বিরছিল। কিন্তু কি বলবে! হুজুর আযাদের গায়ের শিশু সংগে পড়তো। সে ঠাট্টা করেছিল এই ঝাঁত দুটো নিয়ে। রাগ করে বাড়ী চলে এলাম বার কোলে শুয়ে খুব কেঁদেছিলাম। বা বলল—আর পড়তে হবে না বা। চাবার ছেলে গভর খাটিয়ে খাল। আর তো পড়া হোল না—নাহলে বুদ্ধি আবার খারাপ ছিল না। সে সব কথা ভুলেই গিয়েছিলাম হুজুর। কিন্তু কালকে বাড়ীর মধ্যে আশুন চাইতে গিয়েছিলাম। আজ্ঞে বৌদিদি খুব ভালো বাছুর। খুব ভদ্র নোক। কিন্তু হুজুর তিনি তো আযাদের মতো চাখাকুযো দেখেন নি। বড়ো নোক সব বাবু। আশুনাদের ঘরে রূপের বাসা। তাই বৌদিদি আমাকে দেখেই হেসে কেলেছেন। এই ঝাঁত দুটোর সঙ্গে হুজুর। এছোটো আর রাগবে না। উকে। পেলে ধন্যভান। কানাতে হর না? যথতে যথতে কেটে পড়ে না? ঠিক যেমন উকো গিরে থবে থবে ছুড়া কাটা যায়। বাবে না হুজুর? ভদ্র লোকের মেয়ে ছেলে হেসে কেলেছেন। খুব লজ্জা।

সত্যিই লজ্জা পেয়েছে মোবারক। আচ্ছা সে লজ্জা খুব গেছে মিলার নি। বার বার ঝাঁত দুটোকে জোর করে ঢাকবার চেষ্টা করছে। হুখের হাসি মিলিয়ে গিয়েছে। কালো বাছুর। মুখখানা আরো কালো হয়ে উঠেছে।

আশুন হাসতে পারলান না। অভিযোগ নিয়ে এনেছিলাম। গতকাল সীমাকে খান্না মিরেছে। উত্থাপন করলাম বিষয়টাকে।

—তা তো হোল। কিন্তু কালকে কি বলেছিল?

—আজ্ঞে।

—বাড়ীর মধ্যে বলেছিল শাপের মন্তর জানিস। শাপের খেলা দেখাতে পারিস।

মোবারকের মুখে হাসি ফুটে উঠলো। চোখ দুটো আবার চোখের ওপর তুলল বলল বৌদিবি বলেছেন মুক্তি? আপনাকেও বলেছেন? মাথা নীচু করে আরেকবার হাসলো।

সে হাসিতে রাগ লাগল বমক দিয়ে উঠলো।

—লজ্জা করে না? ওরলোকের বাড়িতে বেরে ছেলের কাছে মিথ্যা কথা বলেছ। ধান্না দিয়েছ। মেয়েছেলের সংগে চালাকী?

—সোছাই হুজুর। মোবারকের অন্তর্ভুক্ত করছো? বলালে, ধান্না দিইনি হুজুর। চালাকি করিনি। মেয়েছেলের কাছে বলেছি। বৌদিবিকে দেখাবো। ঠিক দেখাবো।

—বানে? তুই আনিগ নাকি?

—আজ্ঞে।

—কি আনিগ? সাপ ধরতে? কোথায় পিঁথেকিস?

—আমাদের গাঁয়ের বাসিন্দা বেদের সাধুরের আনি। ওর কাছে আবার শিক্ষা। রোজ রোজ বেড়ান। সাপ থাকে ঠিক ঘরের মেজের মাঝখানে আর দরজার চৌকাঠের কাছে। আমাকে গন্ত খুঁড়তে বলতো। আর গন্তের মধ্যে যেই কোণ করতো আমি লাগে লাগে ধরতাম সাহসে। আলো দেখলেই ওরা খেয়ে যায় কিনা। তার পরেই খোঁজ দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেজ বের কলে টেনে তুলতে হয়।

বলতে বলতে মোবারকের হনের তর কেটে গেছে। আত্মবিক ভাব ফুটে উঠেছে। প্রশ্ন করলো—দরি গর্ত দিয়ে সাপ বেরিয়ে যায় বাইরে। খুঁড়তে খুঁড়তে যদি পালায়?

—সস্তর আছে। সস্তর দিয়ে ওদের বন্ধী করা যায়। আর চপতে পারে না।

—তুই আনিগ সে সস্তর?

—আজ্ঞে ইয়া।

—বল দেখি।

মোবারক চুপ করল। মাথা নীচু করে বসে থাকল। বলতে চান না।

—ওসব সস্তর উত্তর থাকে। বুজি—ওসব বুজি। বাড়ির মধ্যে গিয়ে আর ওসব বলবিনে। বদরবার। বলেই ফিরে আসছিলাম।

—হুজুর। মোবারক ডাকলো। সস্তর আছে হুজুর। বশ করা সস্তর।

—হাই। গুরে পাড়িয়ে বললাম।

মোবারক বেন বেশবোরা হয়ে গেছে। হাতদুটো একবার বেড়ে নিল ভাগি দিয়ে। নড়ে চড়ে বলল শক্ত হয়ে। হুগে শক্ত করল—তিনবার হুং হুং হুং। তার পর আরম্ভ করল—

তুড়ু তুড়ু তাক।

বগ রাবার গল এবার

বক হয়ে থাক।

বা, বা, বা,

হুং হুং হুং

তুড়ু তুড়ু তাক।

দরগাবানী পীর পরগমর

পল্লভ শিবর বানী ভোলা মহেশ্বর

চম্ব হুয়া আতেন বেনো লকল সেবতা

বা—বা—বা।

হুং হুং হুং

তুড়ু তুড়ু তাক

আমার বসে চুপ হয়ে থাক।

মোবারকের মুখ খান। আঙ্গুষ্ঠের হাতিতে উজ্জল হয়ে উঠলো।

বললাম—বশ হয়ে গেল সাপ।

—না, না, এতো শুধু সস্তর। এর সংগে ওধু লাগে। গাছের গায়ে মুল, শিখার।

আনকে আছড়াতে হয়ে মোবারক হাতদুটো তুলে নিল। স্তব্ধ হয়ে গেল ঘোরা ভাঙা। ঠক ঠক ঠক। তার সংগে আননের তালে তালে মাথাটাও ধুলতে শুরু করেছে।

ঘটনাটা সীমাকে এসে বলতেই আনন্দে গদগদ হয়ে উঠলো।

—দেখলে তো। জানে ও সব জানে। তুমি বিশ্বাসই করতে চ্যাপ না। আমি বলেছিলাম—

—বৌদিদি।

বোবারক ডাকছে। আনন্দ চাইতে এসেছে। সীমা বাইরে বার করে গেল। ঘরে বসেই শুনলাম। সীমা বলছে।

—হ্যাঁ বোবারক, মনে আছে ত? ঠিকি দিও না কিছু।

—না বৌদিদি। অবান দিইছি না। মূলমানের চেলে। আল্লাহি কসর। খেলা ঠিক দেখাব। আর একটা বজা—জানেন গোখরো সাপের মাথার ঠিক কণার ওপর এটুলি থাকে। সেই এটুলি ধরে যদি বৌটার করে রাখা যায় তাহলে লক্ষী অচলা হয়ে থাকে বলে। তার ডাক কেউ আরতে পারে না। আপনাকে এনে দেব বৌদিদি।

—শিঙ তো।

—হ্যাঁ নিশ্চয় দেব।

ঘরে বলে থাকতে পারলাম না। বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলাম—কি দিযিরে?

বোবারক অগ্রভিত্তির তংগীতে চুপ করে গেল। সীমা বললে, বোবারক তুমি যদি ওটা দিতে পারো আর খেলা যদি দেখাও তাহলে জোয়ার ওই ঠাক দুটো ডাক্তার দিয়ে কেটে সমান করে দেব। আর কেউ কিছু বলতে পারবে না। কেউঠাটা করতে পারবে না।

বোবারক কথা বলল না। কন্ডের আনন্দে হুঁ দিতে দিতে ঠাক দুটোর নিকে আড়চোখে তাকাল বার কতক। বুকলান আনন্দ হয়েচে।

আনন্দ মূলনারাই। সীমা কলকাতার যেরে। সাপ গোপের সম্বন্ধে কৌতূহল প্রচুর। তাই বোবারকের সংগে তার অন্তরে ঘেঁষা হোল না। বেশি রোজই ওরা গল্প

করে। কি সব বড়বড় করে। সীমার কণার বোবারক ওঠে বলে। বোবারকের ওপর সীমার অতুল্যপার অস্ত্র নেই।

কিছু সাপের খেলা কই? সীমাকে জিজ্ঞেস কর-
সেই বলে হবে।

—কিছু কবে?

সীমা বলে, বোবারক বলেছে ওর ওস্তাদের ঘরে বস্তুত সাপ নেই। বরা পড়লেই এনে দেখাবে। আর যদি এখানে কোন ঘরে সাপ থাকে তাহলে বোবারক ফুলে বেগিরে দিতে পারে।

কিছু কোনটাই সম্ভব হোল না। খোয়া ভাঙার কাজ শেষ হ'য়ে গেল। এবার বোবারককে বিদায় দেখাও ডাড়া করবার কিছুই নেই। মেনা-পাওনা বিশেষ করে ছুবিরে দিলাম সব। বস্তুদী নিতে এসে বোবারক বললে আর কোন কাজ নেই বাবু?

—না।

সে আর কিছু না বলে চুপ ক'রে চলে গেল। দেখলাম বাড়ীর মধ্যে গিয়ে ঢুকলো। পরক্ষণেই সীমা এসে হাজির।

—হাগো, বোবারককে জবাব দিচ্ছে?

—হ্যাঁ, কাজ না থাকলে কি করবে?

—না তা হবে না। ও এখনো খেলা দেখাননি বে।

—তবে কি করতে হবে?

—ও কাজ না থাকে আর কাজ দাও। কেন বাগানের জরিটা পরিষ্কার করুক না। খুবতো অলস হবেছে। পা বাড়ানো বার না। দাঁও ওখানে লাগিয়ে দাও।

সীমা জেদ ধ'রে বলল। উপেক্ষাও করা যায় না। ওই পদে কত সানী সঁপিরাজে মান, কত ধনী সঁপিরাজে বন, আমি তো কোন ছার। বললাম—বেশ তাই বলে দাও, কিছু ওখানে ক'দিনই বা হবে। এর মধ্যে কি এর ওস্তাদের ঘরে হাঁড়ি জমবে?

—আশা তো আছে। দেখা যাক।

সীমা খেরিয়ে গেল যোবারকে কাজে লাগাতে।

যোবারক বাগানে গিয়ে লেগেছে। কাজ করছে।

সীমা ছুপুর বেলা, বিশ্রাম করতে করতেও পারলো না। বাগানে ছুটলো যোবারকের কাজ দেখতে। গিরেই কিছু আন্দর ছোল।

দেখে যোবারক দুটি পাঠগুলোর মধ্যে বলে পাক। দুটিগুলোর সম্ভবহার করছে। চোখাচোখি হতেই বললে, বৌদিদি, সব পেচালে খেবে নিজে। এর ক্ষেত্রেও শেড়াল ছুটে আসে। একটাও থাকতো না। তাই খেয়ে নিলাম কটা। মাহুবে তো খেলো, যেঃ ছেঃ হেঃ।

—কিন্তু কাজ করতে কই ?

—খুদ। কিছু ভাববেন না। একদিনে একবিঘে কুঁই পাক করে দেবো। একটু জিরিয়ে নিই। পার হ্যাঁ বৌদিদি, ওজাদের কাজ থেকে একটা নতুন বছর শিখেছি। তাতে কি হয় জানেন ? বন থেকে সাপ ডেকে আনা যায়। এখনও খুব ভালো শিখতে পারিনি। তবে আর দুটো দিন সবুর করুন। মাস্তর দুটো দিন। আপনাকে বখন বলেছি বৌদিদি শুধন ঠিক দেখাব। বছরে গিরে বলবেন পাঠজনকে। আর আমার ঠাক দুটো কিন্তু দেবেন ঠিক ক'রে। এঁটুনি ঠিক দেবো। সে বয়ের থেকে তোলা সাপের মাথাও পাকে। তাও দেবো। ঠিক দেবো।

সীমার কাছে কথাগুলো শুনে অবশি আমার বিরক্তি বোধ বাড়তে শুরু হয়েছিল। বাইরের কে একজন এসে ঘরের বৌকে এমন পাগল ক'রে তুলবে এ স্থল করা যায় না। ক্রমশই চরমে উঠেছে—ওর বলপাওয়ারে বাজা বাড়ছে। বাড়ী বাবার সময় আনের তেলের পরিমাণ বাড়ছে। কাজের বেলায় কীকিও বাড়ছে সন্দেহ নেই।

শেষকালে চরমেই উঠলো। সন্ধ্যের সীমা ছাড়িয়ে উঠলো যোবারকের ব্যবহার। বিকেল বেলায় খোকন

এসে বললে বাবা, আজ যোবারক কি করেছে জানো ? পাড় থেকে ভাব পাড়ছিল। আমি দেখেই বললাম—ও কি হচ্ছে ? ও আমাকে কি বললে জানো ? বললে—চুপ চুপ, তুমি বোল না কাউকে তোমাকেও দেখো। এই দেখো আমাকেও দুটো ভাব দিরেতে। খোকন দুটো ভাব এনে আমার সামনে বরলো।

আন্দর বাহুরের চরিত্র। যাকে প্রভুর দেওয়া যায়, যাকে চলতি ব্যবহারের গতির বাইরে এনে কাজ করান যায়, সেই এসনি দুঃসহ হ'তে ওঠে।

বৈধি রাখা আমার পক্ষে সম্ভব হোল না। কিন্তু যোবারক শুধন বাড়ী চলে গেছে। সীমাকেই ডেকে বললাম ঘটনাটা।

বললাম—তোমার জন্মেই তো এই সব বেয়াদবী। মাঝার তুলে বলচে। বাই হোক, আমি আর ওকে গিরে কাজ করাবো না। কালকেই যেন ওর শেষকাজ হয়। যেনো-পাণ্ডা মিটিয়ে দিও।

বকুনিও দিলাম সীমাকে।

—তোমার মতো বোকা যেহেতলেও দেখিনি। কে এলে বাগ্ন: দিল সাপের খেলা দেখাবে বললে আর আমি তার আদর বন্ধ আরম্ভ করে গেল। ছুনিয়া চেনা তোমার কাজ নয় ? ও তোমাকে কীকি দিয়ে কাজ হাসিল করেছে। সাপের খেলা না জোখবাড়ীর খেলা দেখাচ্ছে।

সীমা প্রতিবাদ করল না। মগা নীচু ক'রে শুনলো। দেখলাম দুখানা বেগুনীর টস্‌টস্‌ করছে। অপ্রতিভ সে কম ছরনি। বিশেষ করে ডাব চুরিটা সবচেয়ে বেশী ক'রে যা দিরেছে।

পরদিন যোবারক আশতেই সীমা কেনে উঠে ওর সামনে গিরে খেল রুদ্রবীরে বললে

—বাবু, কাজ করতে হবে না।

যোবারক যেন ঠিক বুঝলো না। সীমার দিকে তাকালো।

—বাবু, লোকসান করার জন্য জন্মে আমাকে কাজে

শাপায়নি। চোরকে বাজীতে চুকতে দিতে নেই।

—চোর!

—হ্যাঁ! ডাঘ পেয়েই মনে নেই?

সীমা বেন অভিমানে ভেঙ্গে পড়বে এখুনি। মোবাইল কাঁধের গামছাখানা ঠিক করে কাঁধের ওপর রাখল। তারপর হাতকাটা ছোড় করে অত্যন্ত বিনীত স্বরে বললে, বৌদিদি, খেতে খুব মন হয়েছিল তাই। খুব অস্বস্তি হয়েছে। মাপ চাচ্ছি। কাজ না করি চলে যাব, বাজীতে আর চুকবো না কিন্তু মনে কষ্ট পাবেন না বৌদিদি। আমি চোর নই। কষ্টই হয়েছে। মাপ করবেন। চাষাভূষা লোক। আপনারা নেকা-শড়কা না। কথা কখন।

আমি বাইরে গিয়ে পাড়াত্তেই মোবাইল ছুটে এলো।
পা ভড়িয়ে ধরে কেটে পড়ল কান্নার।

—কথা কখন হুঁহু।

কি তার কান্ডের আবেশন। ওর চোখের জলে আবার পা ভেসে যাচ্ছে। ভাড়াভাদি তুলে বললান—
আজ্ঞা বাও, কাজ করগে এখন।

উঠে চোখ মুছতে মুছতে মোবাইল কাজে গেল।
কিন্তু সীমা কই? ঘরে গিয়ে দেখি সেও চোখের জলে গড়শেষ ভাসিয়ে তুলেছে।

আপদে! সীমার হোল কি?

সীমা ভাঙ্কাসরে বললে—আমায়ই দোষ। ওকে নাথার তুলে দিয়েছি। ছোটলোককে বিবাহ করতে নেই। ওকে ভাড়িয়ে দিয়েছি তো?

সীমার কথা শুনে নিজেদেরই অপরাধী বলে মনে হোল। বললাম—না ও কাজে গিয়েছে। আর ভোখার দোষ কি, ও লোক বেহাৎ খারাপ নহ। হঠাৎ করে কলোছে। একটু পেটুক আর একটু আত্ময়ে। ও আর কিছু করবে না। খুব হুং পেয়েছে।

সীমা বেন সাহায্য লাভ করল। চোখ মুছে পরম ভরসা আর হাত ধরে বলল—ওকে আর রেখো না কিন্তু আজকেই কাজ শেষ করে দাও।

—কিন্তু তোমার শাপের খেলা?

—আর দরকার নেই।

বুজলাম গভীর হুং আর অভিমান ছাড়া এ আর কিছুই নহ। কাঁধেই জবাব না দিয়ে চুপ করে গেলান।
সত্যল বেলাতেই এমনি একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে বুজতে পারিনি। মনটা ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু থাকলো না বেশীক্ষণ।

মোবাইল খানিক পরেই উঠোনে এসে পাড়াল।
সহজ সরল ভাব। সেই হাসি মুখ।

—বৌদিদি, আসুন।

সীমা আসুন দিতে নামতেই মোবাইল বললে,

—বৌদিদি আর শাপের খেলা রেখাবো।

সীমা কথা বললো না। ভাত্তে মোবাইলের বার আসে না। সে আবার বললে, বৌদিদি আর ঠিক দেখাবো। ওস্তাদ গিয়েছে সাপ ধরতে। ঠিক ধরে আনবে। বিকেল বেলায় গিয়ে আমি নিতে আসবো। আর ওস্তাদ যদি না পার তাহলে সেই যে নতুন বস্ত্রটা নিয়েছি—সেটা পড়লেই বনের সাপ ছুটে আসবে। আপনাদের চোখের সামনে খেলা দেখাবো। আর ঠিক দেখাবো। খেলাপ হবে না কথার।...

আরো কি বলতে বাচ্ছিল মোবাইল। সীমা ঘাবিয়ে দিল—থাক, আর তোমাকে কিছু দেখাতে হবে না। দেখাতে হবে না খেলা।

—শেখ! এখনো কুট মনি বৌদি। কথা করেন নি। চাকর বাকর আমরা।

এবার সীমা না হেসে পারবে না। যদিও সে হাসিতে খেঁদনার ছাপ পড়িছুট। ভাত্তেই মোবাইলের আনন্দ। কন্দের হুঁ দিতে দিতে উঠে পড়লো।

—আজ খেলা দেখাবো ঠিক। এটুলি পেলোই দেখো। ঠাত্তে কিন্ত মিলিয়ে দেবেন।

গম্বস্ত বার করা হাসিতে মোবাইলের মুখখানা উজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো আবার।

সেদিন ছিল রবিবার। বাড়ীতেই ছিলাম। সেখানি মোবারক জলখাবার পেতে এলো। ই্যা, কাজ করেছে ঠিক। খেয়ে তেল খান। গা খেয়ে দরদর করে খান ছুটতে। গামছা দিয়ে মুখে হাওয়া খেতে খেতে বললে—

আজ সব আমি সাক হরে গেল। আর কিছু বাকী নেই। একেবারে ধবধবে করে দিয়েছি। এখন মল ঘরে কি কাজ করবে) যৌদিগি।

—কাজ না থাকে ছুটী করে বাড়ী চলে যাও।

সীমার এই নির্দিষ্ট অবাবে মোবারক যেন হত্যাশ হয়ে পড়ল। কেমন বেকুবের মত কাল ক্যাল করে তাকিয়ে বললে, আজ্ঞে।

জবাবটা আমিই দিলাম।

—মাদের ঘরের সামনে যে ইউণ্ডলো আছে শুগুলোকে সরিয়ে বাগানঘরের পিছনে নিয়ে যাও।

—আজ্ঞে আজ্ঞা। বলেই মোবারক মুড়িগুলোকে গোয়ালে গিলতে লাগলো। যেন নতুন আশার উদ্বীণ হয়েচে।

মোবারক কাজে গেল। ঘরে গুণ্ডে বিশ্রাম করছিলাম। সীমাও এলি কাছে বসেছে। লকাল থেকেই গুর মনটো খারাপ। মোবারক চোঁটা করেও তুকে স্বাভাবিক পর্যায়ে তুলতে পারেনি। আমার কাছে বসেও সেই বেদনারই পুনরাবৃত্তি করছিল। মোবারককে বিশ্বাস করতে পারছে না মোটেই। লোকটা ঠাকি দিয়ে গুর কাছে থেকে কেবল কাজের সুবিধাই করে নিয়েছে। এই লম্বাভেই ও ভেঙে পড়েছে। একটা কেমন যেন আক্রোশের ভাব। বার বার বলছে, কাল থেকে ওকে আর নিও না কিছু।

চুপে একটা চীৎকার কানে এলো। পরিজ্ঞাহি চীৎকার—

—গেরে ফেললে গো, মেরে ফেললে গো, শিগুগির এলো গো—

মোবারকের কর্ণধর। ই্যা তাই। কান পেতে শুনে নিঃশব্দে হলো। বিদ্যানা হেঁচে বড়বড় করে উঠেই লৌড়। সীমাও ছুটলো। পড়ি কি মরি গ্রাদপলপে ছুটে পেলাম ছুমনে।

• দেখি নতুন ঘরের ছান থেকে মিস্ত্রী মজুরেরা আগেই এসেছে। সবাই মহা ব্যস্ত।

—সর্বনাশ হয়েছে বাবু। সর্বনাশ।

সবাই একসঙ্গে বললে—মোবারককে সাপে কেটেছে বাবু। গোণেরো সাপে।

—সাপে!

সীমা হাউবাউ করে উঠলো। ছুটে সামনে গিয়ে দেখি সত্যিই। ইউ গাবার মধ্যে একটা গোবেরো ছিল। ইউ তুলতেই সে কণা ধরেছে। মোবারক অবশ্য একটা কাঠি দিয়ে লেজটা ধরেছিল চেপে কিন্তু সে কাঠি পুখই ছোটে। সুযোগ পেয়ে ছোবল বলিয়ে ঘিরেছে একেবারে বৃকে।

মোবারক তখনও লেজ ছাড়েনি। মজুরেরা এসে সাপটাকে মেরেছে। কিন্তু মোবারক আর গাডাতে পারেনি। পড়ে গিরেছে মাটিতে। বিবক্রিমা প্রকৃ হয়ে গেছে।

মোবারক মাটিতে গুরে আছে। চীৎ করে। চেতনা: বিলুপ্তপ্রায়। দেহও অবশ হয়ে আসছে। বৃকে যেখানে গাড ছুটো বসেছিল সেখানে রক্তে বিধে ভরে কাশো: হয়ে গেছে। দেহও নীল হয়ে উঠেছে। সীমা: থাকতে পারলো না, কান্নার ভেঙে পড়লো। মোবারক যে একজন আত্মীয় পুরুষ, আর সীমা: যে গৃহস্থ ঘরের বড় সে জান তার লোপ পেয়েছে। মানুষের সংগে মানুষের সহজ:বন্ধন বড়ো হয়ে উঠেছে তখন।

বোব ছর, সারাজ্ঞ জান তখনও ছিল মোবারকের। হুসহ বেবনা সবুও একবার সীমার দিকে তাকালো। চোখ দুটো উজল হোল—টোট দুটো নড়লো, কি যেন বলতে গেল। বলা হোল না, গেবে গেল। কেবল চোখ দুটো সীমার দিকে নিবছ। সাপ: ধবধবে গজদহ

ছুটো বেঝিয়ে আছে। শুধুটো মিলিয়ে দেবার কথা ছিল নীমার।

সীমা বাড়িয়ে থাকতে পারলো না। কেলে চেঁচিয়ে উঠলো। বসে পড়ে চেপে ধরলো মোবারকের হাত ছুটো। যেন সমস্ত বিরূপতা, সমস্ত আক্রোশের জন্তু কমা জিকা করছে যুগ্মপদ বাড়ীর কাছে।

এ দৃশ্য দেখতে পারা যায় না। রাজ্যের বিরূপতা নিয়ে বাইরের ঘরে এসে বসলাম।

তবে ঠিক করতে শারহিলাম না—কি ঘটে গেল।

চমকে উঠে তাকিয়ে দেখলাম—সামনে এক বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। লম্বা লম্বা দাড়িতে মুখ ভর্তি। মাথায় চুলগুলোও লম্বা বধবধে। হাতে একটা বাড়ীর ইঁড়ি। তার মুখটা লম্বা আর দড়ি দিয়ে ভালো করে বাঁধা। একটা খোতার ঝুলানো।

—বাবু, মোবারক এখানে কাজ করে?

বললাম—মোবারক নাম কি?

—আজ্ঞে, বাবল বেদে। মোবারক বলেছিল আপনার বাড়ীর বেঘরেছেলে নাকি মাপের খেলা দেখতে চান,—তাই ধরে এনেছি ছুটো গোষেয়া। মোবারক বলেছিল তাই।

মহাচীন ও মহাতান্ত্র

জীহরিপদ খোবাল

ভারতবর্ষের সঙ্গে চীনের কয়েকটি বিষয়ে বেশ একটা মিল আছে। ভারতবর্ষের মতো চীন একটি সুবিহীন দেশ, ভারতবর্ষের মতো চীনেও হুজুগাড়ির একটি বিরাট জনসংখ্যা বাস করে। ভারতবর্ষ বহুজাতি ও বহুধর্মের বিলম্বভূমি। চীনও নানা জাতি ও নানা ধর্মের সমন্বয়। ভারতবর্ষেও চীনে সভ্যতা ও সংস্কৃতির ধারা তিন সহস্র বৎসর সমভাবে প্রবাহিত হয়েছে। এই দুই দেশের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরি-স্থিতি এদের জাতীয় চিন্তাধারা ও জীবনদর্শন নিঃশ্রুতি করেছে। বিভিন্ন সমাজতন্ত্রের উপর এদের জীবনদর্শন এমন একটি অপরিবর্তনীয় গভীর ছাপ রেখে গেছে যে, জাতীয় জীবনের নানা পরিবর্তন ও বিপ্লব তা হুঁচকে ফেলতে পারে নি।

সামান্য জীবনের গুলিমলিনতা, বতবাদের তর্কবিতর্ক, ভারতীয় ও চৈনিক জীবন প্রবাহের স্বচ্ছতা ও নির্বপত্যকে লষ্ট করলে সন্দেহ হয় নি। ধর্ম সাম্প্রদায়িকতার জনক।

সুগে সুগে ধর্মকে উপলব্ধি করে এক একটা ধল ও উপদল গঠিত হয়েছে, সর্জনশীলতা ও গোড়ামি সৃষ্টি হয়েছে। দলীয় এবং উপদলীয় সর্জনশীলতার ইয়োয়োপে হুজুগলাইয়ে দিয়েছে কিন্তু চীনে ও ভারতবর্ষে লোক স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশ করেছে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে প্রচারকপন আগ্রহ হিনাচল পদক্ষেপ গ্রহণ করে প্রতিবাদীকে তর্কহুঁচকে আত্মনা করবে, দিনের পর দিন তর্ক-বিতর্ক করেছে, বতবাত বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছে, বিরুদ্ধ-বাদীকে তর্কহুঁচকে পরাস্ত করেছে, এমন কি পরাজিত ব্যক্তি স্বমত পরিহার করে বিজয়ীর মত গ্রহণ করেছে ও তার নিমিত্ত স্বীকার করেছে কিন্তু এতটুকু জার্মেনির মতো এখানে সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাম্রাজ্যের হুজুগলাইয়ে হয় নি, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বিপ্লব ঘটেনি, শ্রমের মতো অবিদ্যমানের আত্মনে পুড়িয়ে মারা হয়-নি—এখানে একহুঁচকে ধর্মগ্রন্থ এবং অস্ত্র হুঁচকে তলোয়ার নিয়ে প্রচাণকরা কোনদিন জোর করে লোককে ধর্ম-ভারিত করেন নি।

যদিও চীনে ও ভারতবর্ষে সুসংস্কারের আভিমন্যু ভাটীর জীবনের প্রাথমিক স্তরে স্তরে ব্যাপ্ত ও পল্লিত করে ক্রমেতে ভগ্নাঙ্গি তাদের বিচারবুদ্ধি ও সম্বন্ধ জ্ঞান তাদের রক্ষা করেছে। ধর্মমত ও অসুষ্ঠান প্রকৃত ধর্মজীবন গঠনে অত্যাবশ্যক নয়। রাষ্ট্রের সভ্যতার আর্থিক উন্নতির এক অধ্যাত্মিকতা অপরিহার্য ও অনবদ্য। ধর্মতাব স্বাভাবিক ও সহজাত। তার প্রকাশ অবশ্যস্বাভাব্য ও অন্তর্নিহিত। বিজ্ঞান বুদ্ধিও সম্বন্ধতার প্রয়োজন থাকলেও বিজ্ঞান ও সম্বন্ধ যদি দ্বন্দ্ববোধ জীবনের চরম সার্বকতার দিকে লক্ষ্য না রাখে তাহলে তারা অগতে বহু অনর্থের কারণ হয়।

চীনাগের ধর্মতাব নিরমের নিগূঢ়ে আছে ছিল না, অসুষ্ঠান বিশেষের সূত্রপে আড়ষ্ট হইল। তাদের ধর্মতাব সত্যের প্রাণবান ও আনন্দরাসিত। বিশ্ববুদ্ধি, তর্কবিতর্কের গহন অরণ্যে এদের প্রাণ হাসরুদ্ধ হয়ে বাধ-নি, নিষ্কর ইঞ্জিতরূপ ও বিবর বস্তুর অজালে এদের শক্তি অবলুপ্ত হয় নি। প্রকৃত ধর্ম তর্কসাহ্য নয়—প্রকৃত ধর্ম বিচার নিরপেক্ষ। যেখান তেজ করে সূর্যালোক প্রকাশিত হয়। প্রকৃত ধর্ম বিষয়বস্তুর আবর্জনা তেজ করে জীবনে প্রতিফলিত হয়। বিচার বুদ্ধির আবরণ তেজ করে ধর্মতাবের নির্মলভোতি বিকীর্ণিত। লাউ-সে, হু, শহর, খ্রীষ্টোত্তর ও হানবুদ্ধি নিজেদের জীবনের ভিতর নিয়ে ভগবৎ জ্ঞানের বহিরা প্রচার করেছিলেন, তাঁদের তপস্বীত্ব অতিক্রম্যে কার্যকরী করে ক্রমেছিলেন।

সংসারের বীভৎস, ক্লান্ত ও উপবাস বহি ধর্ম বা ভগবৎ-ভক্তির মানসে হই, তাহলে চীনাগের ধার্মিক বলা চলে না। তাদের মধ্যে এমন পুং কয় লোকই আছে যারা ধর্মসাধনার এই আবর্জনের অধমায়ী এবং স্বেচ্ছায় জ্ঞান লাভেচ্ছা করে সম্যক পেতে চুরে নির্জন বনে করে। চীন আভির বুদ্ধবৎ অপের পক্ষে ধর্মের উদ্দেশ্য পরমসহনশীল উদার মনোভাব অর্জন এবং অসুষ্ঠান লাভ।

ভারতীয় ও চৈনিক জীবনে ধর্ম অক্ষুণ্ণতা ও

অসুষ্ঠানসাপেক্ষ নয়। এই দুই দেশেই ধর্ম ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পর্যবেক্ষিত। চীনাগ কনফিউশিয়ানের নীতি-শাস্ত্রসত্য ও বৌদ্ধধর্মকে সমান স্তরে দেখত। তাদের পক্ষে এই তিনটি ধর্মের নীতি পরস্পরের পরিপূরক। কনফিউশিয়ানের নীতি তাদের সামাজিক জীবন নিরন্তর করেছে, তাও তাদের অস্তিত্বের লোকের সন্ধান দিয়েছে এবং বৌদ্ধধর্ম তাদের কর্মজীবন গঠনে সত্যতা করেছে। ভারতীয় জীবনের সার্বক জ্ঞান ও ভক্তি বৌদ্ধিকজীবনেও সত্যতা করেছে। বৈষ্ণবীনে রোগী অসুষ্ঠানের সমস্ত প্রলোপাণ, হোমিতপাণ এবং কবিরাজের ব্যবস্থা নিয়ে আধুনিকত্বের চূর্ণে নিরসনের ব্যবস্থা করে। চীনাগ ভেদনি আধ্যাত্মিক চূর্ণে দূর করার জন্য একই দিনে কনফিউশিয়ান, তাও ও বৌদ্ধধর্মের বা মঠে যায়। তারা ধর্মমত সম্বন্ধে উদার। সে দেশের সাধারণ লোক নিজেদের বিশ্বাস অনুসারে এই তিন ধর্মের যে কোন অর্থটানে যোগ দেয়। সুতরাং এই ধর্মমতভেদের এমন একটামিশ্রণ ও মিলন হয়ে গেছে যে চীনের ধর্ম বললে একাধারে এই তিন ধর্মমতের সমস্ত ছাড়া আর কিছু বলা হয় না।

চীনে খ্রীষ্টান ও মুসলমানের সংখ্যা বহুল সম্ভব কিন্তু বৌদ্ধধর্মের সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এর প্রধান কারণ এই যে, প্রথম চাই ধর্মের নীতি ও নীতি অনুসারে, সুবুদ্ধি ও সুগতি যুক্তরূপে স্পষ্ট কিন্তু বৌদ্ধ-ধর্ম তাদের সমস্ত জীবন শির ও সাহিত্যকে এমন ভাবে প্রভাবিত করেছে, তাদের চিন্তার ও বর্ষ এমনভাবে ওতপ্রোত ও প্রকৃত হয়ে আছে যে, তারা বৈশেষ্য আশাভগ্নভেৎ বলা পড়ে না। বুদ্ধি ও পারমার্থিক জীবন সম্বন্ধে সেমিটিক ধর্মবিশ্বের বাহ্যিক মতের অচলার-তন চীনাগের নিম্নতম জীবন সম্বন্ধে কিছুটা তরঙ্গপৃষ্টি করলেও, তার প্রথম আশাত একটু চাকলা ও অস্বস্তি সত্য করলেও চীনাগের মন তাতে অভিবৃত্ত হয়ে পড়ে নি। চীনের সাধারণ লোকের মনোভাব এমন উদার ও সহিষ্ণু যে বিভিন্ন ধর্মস্বতাবলী লোকের একত্র মনোবশে এবং পরস্পরের সঙ্গে চিন্তা ও ভাবের আদান

এদানের ফলে, তাকে উপারতর ও সমুদ্রতর করে তুলেছিল। চীনের পারিবারিক জীবনে এমন ঘটনাদের অত্যন্ত নাই যে এক পরিবারভুক্ত বিভিন্ন বর্ষবৃত্তাবলম্বী নরনারী স্ত্রী ও শান্তিতে বসবাস করেছে।

চীনাধের কাছে ধর্ম প্রতিভাত হই জীবন গঠনের উপায়রূপে। জীবনকে উপেক্ষা করে, অবজ্ঞা করে অথবা অস্বীকার করে তাহের ধর্ম সার্থক নয়। প্রকৃত ধর্ম সার্থক হয় জীবনকে গ্রহণ করে, স্বীকার করে। প্রকৃত মানিক ব্যক্তি সমাজের পটভূমি থেকে দূরে অবস্থান করেন না। পদপক্ষে জলের মত অসংলিখিত হয়ে তিনি সমাজে বাস করেন, সমাজের কল্যাণের জন্য কর্ম করেন। সমাজকল্যাণকারী ব্যক্তি নিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রগঠন ছিল কনফিউশিয়ানের আদর্শ।

কনফিউশিয়ান বলেছেন, মানুষের সঙ্গে বিলম্ব না তো কি পদপক্ষীকে সঙ্গে বিলম্ব? জ্ঞানীরাই দেখিয়ে দেবেন সমাজের বিশ্বম্বল্য কোথায়। সাধারণ লোককে বিশ্বম্বল্য থেকে বঞ্চিত করাই জ্ঞানীর কৃত্য।

শাসন ব্যবস্থার পরিবর্তন সূত্র কিঞ্চি মানুষের প্রকৃতির পরিবর্তন মুকটিন ও সমরসাপেক্ষ। বৃহৎসত্তার ধরে জাতি যে সংস্কারে, যে মনোবৃত্তি সঞ্জন করেছে, আইন তৈরী করে তার সংস্কার বা বর্জন ভুল সহজ নয়। চীনের বিভিন্ন সম্রাটের ধর্মকে রাজনৈতিক মুদ্রের অঙ্গরূপে ব্যবহার করে নি। চীনে মূলমন্ত্রাঙ্গা সংখ্যালঘু কলেও জাতীয়তাবাদ তার সাংখ্যালঘু নয়। তারা গর্বের চীনের অধিবাসী, তারপর মূলমন্ত্র।

টংজেজ সাম্রাজ্যবাহিনীর উচ্চানিতে তারতম্যের মূলমন্ত্রাঙ্গা তারতম্যের বাস করেও নিজেদের আলাদা জাতি বলে দাবী করেছে। তাদের দাবী স্বীকৃত হয়েছে এবং এই দাবীর ধোঁয়াই ঘিরে তারা তারতম্যের ভাগ করে নিয়েছে। তারতম্যের মূলমন্ত্রাঙ্গা আইনে একটা নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি করেছে এবং তারতম্যবিশিষ্ট বানেশ স্বাধীনস্বাধীনতার নিয়ে একটি শক্তিশালী রাজ্য গঠনের স্বপ্নেও রয়েছে।

চীনের মূলমন্ত্রাঙ্গা নিজেদের রাজনৈতিক কল্যাণ বা সুবিধার জন্য অল্প মেসের মূলমন্ত্রাঙ্গার মূখের বিকে তাকিয়ে থাকে না। চীনের এমন একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্য আছে যে মূল আদর্শ ও নতুন চিন্তা গ্রহণ করলেও সে তার স্বকীয়তাব বিলম্বন দেয় না। যে কোন জাতি বা মতের কাছে আত্মবিক্রয় করে না।

প্রাচীনকালে চীনায় পিতৃমুখের আদ্যায় পূজা করত, এখন তারা পূজা করে বেশকি, বেশের সাধারণ লোককে। চীনের কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভিতর তার জাতীয় জীবনের রসধারা কতর জার প্রবহমান। সেই রসধারার প্রত্যয়ে সে পুরাতনকে সমরোচিত সাজে সজ্জিত করে তার জীবন গঠন করেছে। সেখানে আজ মানুষ দারিদ্রের পটভূমি উপর ঠাঁড়িয়ে মানুষের বহুত্ব বোধনা করছে, এশিয়ার সমস্তকে এশিয়ার মত করে সমাধান করেছে।

কালচক্রের আবর্তনে চীনের গৌরবময় নবজন্ম হয়েছে। বাঙ-সে-তুংএর চীন একদে নতুন পথে যাত্রী। তার যাত্রাপথের সহায় শোভিয়েট রাশিয়া মার্ক্স প্রবর্তিত সাম্যবাদের আলোকে সে তার সামাজিক ও জাতীয় জীবনের সমস্ত সমাধান করতে চেষ্টা করছে।

বহু সভ্যতায় চীন ও তারতম্যের সভ্য ও মুহূর্ত জীবনের মূলনীতির অঙ্গবাহী। চীনের দর্শন ও চিন্তার শিরের অবস্থান, ভারতের অধ্যাত্মবিজ্ঞা ধর্ম শাস্ত্রের অবস্থা মূল্য বিধ সভ্যতাকে ঐক্যবাহী করেছে। এই দুইটি দেশ কত রাজনৈতিক বিপর্ষয়, রাষ্ট্রনৈতিক বিপ্লবের সম্মুখীন হয়েছে, কতবার প্রবল পরাজয় অর্ধদাতা বা অন্ত্য জাতির আক্রমণে পুণ্ডিত হয়েছে, তাদের শত্রু স্রাবল কুনি রক্ত প্রাণে তেজে সিরেছে, তাদের নগর ও গ্রাম ধ্বংস হয়েছে, তাদের ঐক্য বৃদ্ধি হয়েছে কিন্তু তাদের স্বত্ত্বের ধর্ম নষ্ট হয় নি। আবারের পর আবারে তারা কতবার সন্ধি-সন্ধি হয়ে কুর্খরুতি অবলম্বন করেছে, অত্যাচারের স্রোত চলে গেলে বেতমূলতার মত আবার মস্তক উত্তোলন করে ঠাঁড়িয়েছে, পণ্ডিত বিজ্ঞানীদের অর

করে আশ্রয় দিতির পথে পূর্ণাঙ্গার বহির্গত হয়েছে।
 চৈনিক ও ভারতীয় মনের বহির্গতায় যে প্রচুর প্রাণশক্তি
 সঞ্চিত আছে ভারতই এসারে চীন ও ভারত যুগ যুগান্তরের
 অবিরাম অভ্যুত্থার ও অভ্যুত্থার পরবর্ত্তিত করে বিবেচনা-
 হাঙ্গের রক্ষকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

ইতিহাসের মূলে যে সভ্য নিহিত, মহত্ব সভ্যতার
 ভিত্তিগতর যে রক্তস্রাবিনী সৃষ্টিকা, যে সৃষ্টিকা সমস্ত
 বীর্ষের, জীবনীশক্তির ও সৃষ্টির উৎস—গাভী মানস-
 নগ্ননে যে বীর কল্যাণময়ী জননী মনোমোহিনী সৃষ্টির
 দর্শন করেছিলেন, “এশিয়ার রক্ত মাছ” চীন আজ তাঁর
 জীবন প্রতিবাক্যে শব্দ যতী বাক্যের জগৎ মন্দিরে
 প্রতিষ্ঠা করেছে। কিন্তু গাভীর মনোমোহিনী স্রষ্টার কণ
 ত্যাগ ও দুঃখ ভোগের সপ্তাহেলে বিবেচনা শাসনের
 সৌভ্য বৈধী তেজে কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বাধীনতা
 লাভে সক্ষম আছে, গাভীর অসম্পূর্ণ বিলম্বের পূর্ণতা
 সম্পাদনে উপাধীন আছে।

নৃতন গাভী এখনও নৃত অতীতের কক্ষালে আবদ্ধ।
 নৃতন চীন বর্ত্তমান ও অতীতের মধ্যে সীমারেখা টেনে
 দিচ্ছে—অতীতের ব্যর্থতা ও বিফলতার তত্ত্ব জীবন
 অতিক্রম করে বর্ত্তমানের অন্তিম কর্মের জীবনের তিতর
 দিয়ে পৌরস্বয় ভবিষ্যত্তে বজ্রিকা; রচনা করেছে। চীন
 আজ জানে, বর্ষে, শিল্পে, বাক্যে পিতার সংজ্ঞাতে
 মাহুয়ের ক্ষমতা বিরাট সম্ভাবনা হার উদ্ভূত করেছে।
 ভারতবর্ষকেও নিম্নোক্ত ফলপ্রসূচীন কর্মের আশ্রয়ে
 উদ্ভূত হয়ে আধুনিকতার সঙ্গে মনোমোহিনীকে অভ্যাস
 শোষণ ও অস্বস্তি শাসনের হাত থেকে মুক্ত করে
 জাতির সামগ্রিক কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে হবে।
 কবির কথা—

রাখের পূজা থাকে ফুলের ডালি
 চিত্তুক বস্ত্র লাগে খুশা বালি
 কর্মযোগে তাঁর সাথে এক হয়ে
 ঘর পছন্দ করি।

সুখা

সমীর ঘোষ

বরষা মেঘের ঝাঁপানো ভালাপালাধীন পেঁপে গাছ।
 কিন্তু এই তিনটে পেঁপেগাছই সভ্যতারের আড়াল রচনা
 করেছিল। তাই কুরোত্তলা লোকনাথের বাগার বাঁধা
 হোতে গুটির আড়ালে পড়ে। ঝাঁড়িয়ে জল ঢাললে
 উর্দ্ধাঙ্গের অনেকখানি বহির্গত হোলে পড়ে, কুরোত্তলায়
 বসে পড়লে পেঁপেগাছ তিনটে কাণ্ড করে কাটলধরা
 প্রাচীরের। পেঁপেগাছের অস্তিত্ব যে এই প্রয়োজন সাধন
 করছে একথা এতোকাল কেউ মনে করেছে বলে বোধ
 হয় না। কেননা বাগা ঘান করে তাবের কোন পর্দার
 প্রয়োজন নেই। বস্তির দখ্যে বাস। বাগা ভাই তাবের
 কাছে বড়-খল থেকে বাগা বাঁধানোর আচ্ছাদন, মান-
 মর্গার রক্ষণ অথবা আবরণ ময়। কুরোত্তলায় ঝাঁড়িয়ে

রক্তা এতোকাল ঘান করেছে আর কুরোত্তলা থেকে
 গড়িয়ে আসা জলে তিনটে পেঁপেগাছ বরষা হোলেছে,
 কলস ধিয়েছে প্রচুর। লোকনাথের আগে কাছানগো
 এখন ভাড়া নিচ্ছে। সে নিচর এই কলস ও প্রচুর
 পরিমাণে ভোগ করেছে আর ধরে নেওয়া হাক, লোকনাথ
 অন্তত তাই মনে করে, রক্তার ঘান করা বিশেষ কোন
 গুটিতে হেবেনি। লোকনাথ কিন্তু না দেখে পারলো
 না। রক্তা করার ব্যবস্থা আছে বাঁধার পূর্বদিকে।
 সেখানে গিয়ে ঝাঁড়ালে চোখে পড়ে লামনে পেঁপে গাছ
 আর পেঁপে গাছের পরে কুরোত্তলা। এখন চাঁততিন
 অবশ্য কিছু চোখে পড়েনি। পুরাণে বাগা থেকে
 আশ্বার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু আসতে হোল উপাধীন

হোয়ে। বাঘের সঙ্গে ছিল তারা পরোয়ানা ভাঙি করলো? হানসংকুলান হোচ্ছে না। সুতরাং লোকনাথকে নতুন স্থান খুঁজতে হোল।

কীর্তি কাহ্ননগোর সঙ্গে পরিচয় হোয়েছিল বস্তুর কাজের বরকারে। সেই এনে তুললো তার বাসার। বরস হোয়েছে কীর্তি কাহ্ননগোর। মাথার চুল বেশ কিছু পেকেছে। চোখের কোলে কঁচড় গড়েছে। তবে গলায় ব্রশটা তারি মিষ্টি। ঘিটকাবাথ সে বললো, পোনেন লোকনাথবাবু! সিংহীষশায় এখন আপনাকে জাতিগা দিতে পারছেন না, তখন আমি বলি আপনি আমার বাসার চলুন। আমার বাড়ির ঘর কিছু আলো-বাতাস আছে। আমি নিজের অস্ত্র ছুবেলা রাখি। সেই হাঁড়িতে না হয় একটুটি চাল বাড়তি বেবে। তাহোলেই হবে। জলের কোনো অভাব নেই। কুরাতে চলি হাত চল এই কান্ডন বাসে। আপনি আহ্নন।

কীর্তিকাহ্ননগোকে খুব দেখী করে চেনে না লোকনাথ। তবুও সাত আটদিন আগে এই বাসার এলে উঠলো সে। এখানে এসে মন ভীষণ ব্যাপন হোয়ে গেল। সিংহী-ষশায়ের অনেকগুলো ছেলেনেয়ে। তাদের পড়াতো আর তারি বিনিময়ের বেতো ও থাকতো। সেই হৈট-এর মধ্য হোতে এসে এই নির্জনতার নিজেকে মানিয়ে নিতে বিন কতক গেল। তারপর মন খুব হোয়ে উঠলো—লোকনাথ নিজেকে সবল মনে করত নাগলো। গত চারদিন কাহ্ননগো বাঁধছিল। লোকনাথ আজ বাধা বিশো, বললো, না কাহ্ননগো বশ্য, আর আর আপনার হাতে আর গ্রহণ করবো না।

সহাস্ত্রম্বর কাহ্ননগো ব্যত হোয়ে উঠলো, অপর্যটক কি করলাম লোকনাথবাবু—

কাহ্ননগো কথা শেষ করবার আগে লোকনাথ বললো, আমার মতেন একটা আওয়ানকে রেখে বাওরাজেন, এই কি কম অপর্যথ?

হেসে উঠলো কাহ্ননগো, ব্যস্ত নিশাফ ফলে বললো, জাই বলুন, তাই বলুন। আমি ভাবলাম বুঝি কোনো ক্রটি হোয়েছে।

এরপর বেশ মানিকটা তর্কবিতর্ক হোল এবং শেখাবনি মীথংনা হোল যে সকালবেলা লোকনাথ রাঁধবে। কেননা তখন তার গভীরতার কোন কাজ পাকে না।

তর্ক করে জিতলো লোকনাথ। তবে তার বিজয় বিপর ভেঁকে আনলো। অর্থাৎ রান্না সে করলো করেনি। পরের দিন সকালে কিছু সেকথা স্বীকার করা চললো না। কাহ্ননগো উমান বরিষে চা তৈরী করে বেয়ে চলে গেল। ভাত চড়িয়ে দিতে মহাসমজার পড়ে গেল লোকনাথ। অর্থাৎ তরকারী কি করবে।

বাহোজ শেখবপক ভাত ভাল ও ভাজার নামে কতোকগুলো বেত্তনের টুকরো খুঁড়িয়ে রেখে সে সেদিন সকালের মতেন রান্না শেষ করে বস্তুরে গেল।

আরে: কহেবদিন এমন অবস্থায় রন্ধনাবির পর লোকনাথ কতোকটা নিশুণ হোয়ে উঠলো। বেধা গেল বেত্তনটুকরো গুচ্ছে না, ডালে হুণ ঠিক গুচ্ছে আর ভাত রীতিমতো সূটেছে। কাহ্ননগোও সেদিন বললো, না শিখে সেলেন যেখনি।

—না বশ্যর শিখলুম কোথায়? ভালো রান্না রাঁধতে পারবো তবে তো।

—ভালো রান্না?—কাহ্ননগো আশ্চর্য হোয়ে জিপোন করলো, গোলাও, কালিয়া! তারপর হোয়ে ছেলে উঠলো, বললো, আপনি বড় রানিক লোকনাথবাবু!

লোকনাথ হাসলো, উত্তর বিশো, আচ্ছা দেখবেন বশ্যর! রেখে থাকোবো তবে ছাড়িবো।

এরপর দিনকতোক রান্নার ব্যাপার নিয়ে যেতে রইলো লোকনাথ। সেদিন নারিকেল ঘিরে ভাল রাঁধতে গিয়ে কতোটা দিল্লি হেবে ভাবতে ভাবতে খুব ফেরাতে গিয়ে হঠাৎ তার চোখ পড়লো ভিনটে' পেপেগাজের কাক দিয়ে কুরোভার গুণর। চোখের সাহনে তার ভেসে উঠলো আবরণযুক্ত কালো পিঠ আর সেই পিঠের ওপর বিবৃত কলসিক্ত অমল চূপের রান। একটু মুহূর্ত। চূপের অধিকারিণী বাঘনে সিরলো। সঙ্গে সঙ্গে লোকনাথের দৃষ্টির সঙ্গে তার ছুটো

বড়ো বড়ো উচ্ছল চোখের চাহনি দিলো। একটি বৃহৎবাঈ। কিন্তু লোকনাথ ভারই মধ্যে আরো বেখলো যেহেতু দান করছে। পরনের সাঁচা উঁচু করে তুলে তারি বকের ওপর বাঁধা। অলে তাকে অবর্ত্ত লেপটে গেছে। আর তারি ফলে পশ্চিমুট হোয়ে উঠছে নিটোল বকের লোভনীর রেখাগুলি।

লোকনাথ বিস্মিত এবং লজ্জিত হোয়ে মুখ কিরিয়ে নিলো। না কিরিয়ে নিলে লজ্জা অপরিসরিত হোয়ে বিস্তর বসিত হোত। লোকনাথকে দেখে যেহেতুও লামাত্র বিস্মিত হোয়েছিল। সে খুঁজেছিল নতুন লোক। নিশ্চয়ই কানুনগোখাতুর সঙ্গে থাকতে এসেছে। লোকনাথ মুখ কিরিয়ে নিতে তার সেই বিষয়টুকু কেটে গেল। হাসলো যে, বাবু হোচ্ছে ভয়লোক। হাসিটা তার সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো। তারপর অতি ধীরে ধীরে হুমিনিটের আরগার পনের মিনিট সময় নিয়ে দান করলো সে। তবে যে উচ্ছেত তার এই বিলম্বীকরণ তা সফল হোল না। অর্থাৎ লোকনাথ ব্যাখ্যার ওপর যতোক্ষণ রইলো তার মধ্যে পেনে গাছের কীক দিরে ফুরোক্তলার দিকে আর চাইলো না। মুখ নীচু করে ডাল তৈরী হোয়ে গেলে অস্ত্র রাখার মন হিপো।

আরো তিনচারমিনিট এই বকস হোল। সাধারণ লোকের থেকে লোকনাথের কৌতুহল বেশী নয়। তবুও সে বুকতে পারলো যেহেতু দান করতে বেশ খানিকটা সময় বেশ আর আশ্চর্য্য এখানে মুখ করে দান করে। আর একটা মিনিট হোল যেহেতুও মধ্যে লজ্জা কিবা ফুটার বালাই নেই। বেহের মৌলস অসংকৃত অংশগুলি অনাবৃত করতে ওর বাধে না এই ফুরোক্তলোও। কেউ যদি তল নিতে অধবা অস্ত্র কোনো বরকারে ফুরোক্তলোতে এসে পড়ে তা ও গ্রাহ্য করে না। এমন কি আগন্তুক পুরুষ হোলে এবং কোনোজন উৎকট রসিকতা করলেও খিল পিল করে হেঁচকি শুটে। একদিন এমন একটা রসিকতা শুনে ও শুধু হাসলো না, বললে, বাম্বাইয়া এলে বলে দেবে। বকরীর শালিক তোর টুটি কেটে ছেড়ে দেবে।

—সাথস, কিন্তু একটা কথা।

—কি ?

—তুই টুটি সাফল্য কি করে ?

যেহেতু পরনের সারার নিরাপদের তল নিছোড়াছিল। তারি খানিকটা লোকটার গারে ছিটিয়ে দিবে বললো, এমনি করে।

অত্যন্তের লোকটা অসত্য বাস্তবিত্ব তুললো ওর বাঁধার চালবে বলে। কিন্তু যেহেতু তার আগে সাংধান হোয়ে গেছে। তুলে নিচ্ছে নিছোড়ো শাড়ী। গামছাখানা বকের ওপর অড়িয়ে ফেলেছে। এইবার যে সাংঘাটা ছুটি হাজেল হাঁটুর ওপর বা হাত দিরে তুলে নিয়ে উচ্চকণ্ঠে হেঁচকি উঠে ছুটে পালিয়ে গেল। সাংঘার সময় অবস্ত্র কেন জানিনা চেয়ে দেখলো পেনে গাছের কীক দিরে লোকনাথের হাওয়ার দিকে। লোকনাথ সেখানে সেমিন দাড়িয়েছিল এবং সবিস্তরে এদের এই অলকেলি দেখছিল। যেহেতু চাহনি বেগে সে সেতেন হোয়ে উঠলো এবং বেশ খানিকটা কুষ্ঠিত হোয়ে সেখান থেকে সরে গেল।

রাত্রিতে কানুনগো বখন ফুটো চিংড়ী দিরে বেত্তনের তরকারী রাখছিল, সেই সময় বেড়িয়ে ফিরে এলো লোকনাথ।

—কি এর মধ্যে বেড়ানো দেখ হোয়ে গেল ?

হ্যাঁ, ঘুরতে ভালো লাগলো না চলে এসু।

—বেশ করেছেন।—কানুনগো বেত্তনের তরকারী নাড়তে লাগলো। ঘরের থেকে ভাঁজকরা চেয়ারখানা এনে উঠানে পাতিলো লোকনাথ। চেয়ারে বসে সে বললো, কি গরম পড়েছে যেথেকে ? ত' আপনার রান্না কতদূর হোল ?

—কেন, আপনার খুশা লাগলো ?

—না, খুশা লাগেনি। খাবি ভাবছি, আপনি আর কতোক্ষণ আশ্রয় সহ্য করবেন।

—সকালে জো আপনিত সহ্য করেন।

—সকালে ঠান্ডা থাকে। দেখুন একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করি—আপনি যেন কিছু মনে করবেন না।

বড়ার অসুখাচী বাস্ত কোরে উঠলো কাছনগো।
একদম লোকনাথের সামনে এসে পাড়িয়ে বললো, না
না আমি কিছু বনে করবো না। আপনি কি জিজ্ঞেস
করবেন কখন।

কীতি কাছনগো কিছু বনে করবে না বললেও
লোকনাথ তুচ্ছ বোধ না করে পারলো না। ঘন বললো
তার কোতুলক চাপা দিয়ে রাখলেই ভালো হোত।
যাহোক সে বললো, আমি ওই কালো মেয়েটির কথা
বলছিলাম।

—কোন মেয়েটি?

—চক্ষিণ পণ্ডি বড় বয়স—বেশ ভালো। বোঝ
হয় ওই কুরোর দক্ষিণ দিকের ঘরে থাকে।

—কুরোতলায় দক্ষিণ দিক? আপনি রত্নার কথা
বলছেন? কেন কি হয়েছে? আপনি কি আজ
কুরোতলায় যান করতে গিয়েছিলেন নাকি? শিটার বা
জল টুল দিয়ে যায় নি?

এক নিমিষে পর পর এতোগুলো প্রশ্ন করে কাছনগো
ধামলো। বেশ বোকা গেল সে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।
এবার লোকনাথ সংকুচিত বোঝ করলো। ভাড়াভাড়ি
বললে সে, না, না, সে সব কিছু হয় নি। আমি কুরো-
তলাতে বাই নি। শিটার বা জল দিয়ে গিয়েছিল যান
করেছি। আমি তো নতুন এসেছি। জা মেয়েটিকে
আজ প্রথম দেখলাম, দেখে কেমন বনে হোল। তাই
তৎক্ষণ আপনাকে জিজ্ঞেস করবো।

—জিজ্ঞেস আর কি করবেন শ্যাম—খ্যাংরা আরতে
হয়। শিঁকুর তো চং। নেহাৎ পকারেতে ছিল বলে
ভুললোক এখানে বাস করতে পারছে, না হোলো এতদূর
দিন ওই মাপীর ভরে খুনখারাপি চলতো।

—ওহ খানী কি করে?

—খান! ও, সে তো বানকাইরা মানে কসাই।

কি আর্থে যে কসাই শব্দটার আরোপ হোল লোকনাথ
তা বুঝতে পারলো না। তাই বিষমভাড়া উকি করলো
সে, কসাই!

—আরে শ্যাম! হ্যাঁ। শ্যামের বাখারের চুকলে
ডানদিকে যে লোকটা ঘলে ওই হোল বানকাইরা।

—আপনার সংগে আলাপ আছে নাকি?

—না, আবার সংগে আবার আলাপ কিসের?
বড়ের একদিন মাংস ভক্ষণ করি কি না লক্ষ্যে। স্তম্ভরায়
কসাইয়ের সংগে আলাপ অবশ্য কি করে? আর বস্তুর
করবার মতো লোক নিম্নের পাঁঠাকাটা কসাইরা নয়।

কাছনগোর হাসিমাখা মুখ কেমন বেন ভালো হয়ে
গেছে। ঘন ঘন নিশ্বাসে বুক ফুলে উঠেছে—নাকের গর্ভে
ছুটো ক্ষৌর হয়ে উঠেছে। গলার গহটা চুষ্টাৎ নাম্বিরে
কাছনগো বললো, মেয়েটা হোল আসলে—বুকেছেন কিনা
শ্যামখান।

আরো তিনদিন পরে বানকাইরাকে লোকনাথ
দেখলো বেশ ভালোভাবে। যে পরিস্থিতির মধ্যে দেখলো
তা অবশ্য অস্বস্তিকর। বৃহস্পতিবার শ্যামের বোকান
আর বন্ধ থাকে। কথাটা লোকনাথের বেখাল করবার
মতো নয়। কেন না আগেও এখানে সে গোটা কয়েক
বৃহস্পতিবার কাটিয়েছে কিন্তু এমন ব্যাপার তো ঘটেনি।

ক্রিতিবিনের মতো কুরোতলায় রত্না যান করছিল।
জল নিতে এসেছিল যেহিনকার সেই লোকটা। তাকে
লকলে তাকে বিলো বলে, আলল নাম হোল বিলোচন।
রত্নার সামনে এসে নীচু হয়ে একটা কুনিশ করলো।

—ভাগ। বানকাইরা হয়ে আছে। রত্না বেশ নরম
গলার বললো।

বিলোচন এই সতর্কীকরণে কোনো কাণ দিলো না।
সে বললো, কুরোর সব পানি বানকাইরার সেহিমানের
অস্ত্রে নয়। আমরাত আছি।

কথাটা শেব করে সে নিম্নের বাগতি নাম্বিরে দিলো।

জল ভর্তি বাগতি গুণরে উঠে এলে রত্না এক কাণ্ড
করে বললো। শ্যামান মাখিল সে একটা হাত বাড়াতো
শ্যামানের ফেনা সেই বাগতির জলে গিয়ে পড়লো।

শ্যামানের এই ফেনা অন্তঃপ্রবেশে পড়লো কি
ইচ্ছাকৃত নিষেধণ হোল তা বোঝবার অস্ত্রে বিলোচন

হস্তার মুখের বিকে ঢাইলো। রক্তার চোখের নৃষ্টির সঙ্গে তার নৃষ্টি মিললো না। কিন্তু রক্তার চোখে ও মুখে একটা পরিকার হাসির ত্রিকি যে মুটে উঠেছে সে বিবরে আর কোনো লক্ষ্য নেই। তবুও বিলোচন আক্ষেপের সুরে বললো, জলটা নষ্ট করে দিলি তো!

—আবার জল তোলা। নিখিটটিতে গলা ও গলার নীচে বৃকের অন্যরক্ত অংশে সাবান ধুগতে ধুগতে রক্তা উত্তর দিলো।

এবার বিলোচনের মুখে হাসি মুটে উঠলো। হঠাৎ দাশতির জল সে রক্তার গারে ঢেলে দিয়ে বেশ গভীরভাবে ধললো, নরো ঝাড়া, তানা ঘোলে আবার জল তুলতে হবে।

বিলোচনের কথাগুলোট বেন ভাড়াভাড়ি সরে গেল রক্তা আর এই ভাড়াভাড়ি করায় কাজে যোগ্য করি বৃকের গপরে তুলে আটকানো সাড়া শ্রুতি হয়ে নেমে পড়লো। সাড়া নেমে আসবার সংগে সংগে রক্তা নড়ি ধরে আটকানো এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে থলথালে স্থাপিত করলো। কিন্তু এই কয়েকটি মুহূর্তের অল্প কালো ছেঁদের গপরে বৃকশ্রীর হুনিপূর্ণ ভাষ্কর্য্যবৃত্তি যেতান ছুটি নিটোল বৃকের একখানি অপকল্প চিত্র উল্লোচিত হয়ে গেল। সেই চিত্র, তবু বিলোচন দেখলো না—বরের লাঙরা হোতে ঝাড়ির লোকনাথও পেঁপেগাছের ফাল দিয়ে দেখলো।

একটি মুহূর্ত। তারপর মিল মিল করে ছেঁসে উঠলো রক্তা। তার সেই কলহাসির সংগে বিলোচনের অট্টহাসি মিললো। আর তারপর একটা প্রচণ্ড গর্জনে ঢাণা পড়লো সেই হাসির দিয়োল।

—এই শালী হারামজাদী কুড়ীকো বাড়ি। যে লোকটা গর্জন করে এসে রক্তার ভিত্তে চুল সেই কুয়ো-ভগার গুপরে চেঁপে ধরলো, তাকে একটা খাটো আকারের বৈভা বগলে তুলে বলা হয় না। লম্বার অধিক লোকটা বেশি নয়। কিন্তু চক্কড়ার রীতিমতো মূল। হাতের থালাগুলো বড়ো বড়ো, গলার ও গর্দানে মিশে এক হয়ে গেছে। চোখগুলো ছোট ছোট আর টকটকে লাল।

বাধা কানানো—গলার আগুয়াক ভাড়া পন্থন। এই ভাড়া বনবনে আগুয়াকের কাজেই যোগ্য হয় কথা বললে ওই গর্জনের যেতান শোনায। পরণে লুণী—তবে নীচে থেকে ভাঁজ করে তুলে কোমরে কল্লী আটকানো। তাই পারের শেনীগুলো দেখা যাচ্ছে। সেই শেনী দেখলে মনে হয় কাশো লোহা ঢালাই করে ছুটো পা তৈরী হয়েছে।

তেনে আর জলে চুল অতিরিক্ত রকম মল্লন হয়ে গিয়েছিল। রক্তা এক কটকির চুল ছাড়িয়ে নিয়ে একরকম ছুটে বরের বিকে ঢলে গেল। তার পেছন পেছন ছুটলো লোকটা। কিন্তু হরিণীর যেতান কিপ্রা রক্তাকে সে ধরতে পারলো না। বরে চুকে এক পলকে রক্তা দরোজা বন্ধ করে দিলো।

হরোজার উপর এক লাগি মারলো লোকটা। দরোজা বসতে লম্বা বহুটা পথর করে কেঁপে উঠলো। আরো একটা লাগি বারবার করে পা তুললো সে। কিন্তু কি মনে করে পা নাড়িয়ে বেশ ক্রান্তগতিতে কুয়োভগার দিগে এলো। বিলোচন দেখানে দীর্ঘে সুরে দ্বিতীয় দালতি জল তুলতে তখন।

—এই তুই গুর গারে পানি দিয়ে বেশরম করনি কেন?

—তোর আঁপ নেই বানকাইরা। রক্তা আমার তল নষ্ট করে দিলো সাবান কৈকে।

—ও সাবান নেই কৈকে। বানকাইরা গরন করে উঠলো।

—হাম তো বোলা তোরা আঁপ নেই হার বানকাইরা।

তু গুঁহ উলকো গুঁহ।

—হামি শুকে গুঁহবো না। হামি বেখেতি তুই মুটেমুটে পানি কৈকে শুকে বেশরম কয়েছিল। বানকাইরা কথা শেষ করেই একটা চক্কড় মারলো বিলোচনকে।

বিলোচনকাইরা সরে গিয়েছিল—চক্কড়া তাই লাগলো অতি সাবান। হাতের দালতি নাড়িয়ে বেগে পরকণে নেকড়ের যেতান ঝাঁত দার করে গর্জে সে লাফিয়ে

পড়লো সৈন্যাকার বানকাইয়ার ওপর। ততোক্ষণে অবতর কুরোতলায় লোক ভরে পড়ে। তারা চীৎকার করে উঠলো তার আর তাৎপর্যই নাগে সম্পূর্ণ নিষেধ অজ্ঞাতে ঘরের বাওয়া যোতে অসুস্থ আর্জন্য করে উঠলো লোকনাথ। মিনিট দুয়েক হয়ে বতাবতি, চীৎকার গর্জন ইত্যাদি চললো। ভাষি মধ্যে, অসুস্থ লোকনাথ গিয়ে ঝড়ালো। আর হঠাৎই হবোকা খুলে বেরিয়ে এলো রক্ত।

কি করবে লোকনাথ বুঝতে পারছিল না। সমবেত লোকজনদের বেশিরভাগ ঘেঁরেছে। আর হর বাসক না হর বুদ্ধ। ঘোষান পুরমরা কেই নেই। বিলোচন কাক করে ওপরে বেলা নটার পর কাজে বার। তাই সে থাকে এ সময়। হুতরাং চীৎকার ও হৈ হৈ হচ্ছিল সীতামতো, কিন্তু এদের ওকাৎ করে বেওয়ার মতোন কোন কার্যকরী ব্যস্থা কেউ অবলম্বন করতে পারছিল না। লোকনাথও চীৎকার করতে লাগলো।

কার্যকরী ব্যবস্থা করলো রক্ত। ঘরে পাশিরে গিয়ে ছুটো কাক সে করেছিল। চুলের জল মুছেছে ঘতোচী গারে আর নতুন সাফা ও ছোট কাবা পরেছে। শাড়ী পরবার সময় হয়নি। এসেই সে চাঁৎকার করে উঠলো, এই বানকাইয়া, ছোট উগকো ছোট।

৬. বানকাইয়া আর বিলোচন তখন বাটারে পড়াগড়ি যাচ্ছে। বলা বাহুল্য ওর চীৎকারে বানকাইয়া কান ধিলো না। রক্ত তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে বানকাইয়াকে তুলতে গেল। সে চোটাও তার নিকট হোল। এঁরবার সীতামতো অন্নাল তাবার সে ওদের উভয়কে পাশি দিয়ে উঠলো এবং বিলোচনের তোলা বাসতির জল ওদের ওপর ঢেলে দিলো, বললো, সে গড়, যেতনা পারিস লড়।

কথা শেষ করে আবার সে কুরোর মধ্যে বাসতি ফেললো ও কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে ষিত্তীর বাসতি জল ঢাললো ওদের ওপর। এই দু' বাসতি জল বোঝে হর উত্তেজনার সবচেয়ে আশ্রয় নিভিয়ে দিলো। হঠাৎ বিলোচনকে ছেড়ে বানকাইয়া লাফিয়ে উঠলো এবং

বিদ্যাহ কলকের মতোন ঝাঁপিয়ে পড়লো। হুতর ওপর। রক্তা এতটাই ছিল না। জল পড়ে যে কর্ণধাতু শিঙিলতার সুরী হয়েছিল তার ওপর পড়ে গেল সে। বানকাইয়া তার ওপর কুঁচকে পড়ে কাবা হয়ে টানলো। ওঠ শালী, বেসরমী কাহাকার—বিলো তোরা বিল-কা-পেরার? কুই আমাকে কখনে এনেছিল?

বানকাইয়ার টানে রক্তার কাবা ছিড়ে গেল। কিন্তু সে উঠে বসলো এবং কুছা বিড়ালীর মতোন তার দেই গোল দুখান হাত নিয়ে লজোরে বানকাইয়ার রক্তে কান ঢেপে ধরলো এবং কানবাগিনীর মতোন গর্জন করে বললো, সময় বেখতা, সময় বানানে পেতা—তোরা সাথ হে বরং ফার, কুই বাপ হোতে পেরেছিল?

রক্তা চুপ করার লগে লগে বানকাইয়া পাগর হয়ে গেল। হাত শুধু তার শিঙিল হয়ে রক্তার বেহ বেহে ছেড়ে এলো না, সেই স্থল গর্জনের ওপরের সরল ও প্রতি সন্তক অনেকখানি নত হয়ে পড়লো।

রক্তার দোবন পরিপূর্ণ নিটোল হুত তখন ক্রত লম্বনে উঠছে নাযছে। দুই চোখ দিয়ে আঙনের কল ঠিকরে বেরোচ্ছে আর ছুটি পাতলা ওষ্ঠাধর কঁপে কঁপে উঠছে।

এরপর কিছু সব থেকে বিষয়কর ব্যাপার ঘটলো। রক্তা হঠাৎ বাণতিটা তুলে নিয়ে লজোরে হুঁড়ে দিলো বিলোচনের দিকে, বললো, যা পকারেতে যা, পরসা গ্যকে রক্তা তোরা ঘরে বাবে।

কথাটা শেষ করে কেনোদিকে না চেরে নিষেধ বাসতি কেলে জল তুলে সে বাবার ঢাললো। জল ঢেলে গারের হেঁচা কাবা অদ্যকোচে খুলে ফেললো ও ডিলে করতে লাগলো সাধারণ বড়ি। আর তারি কঁকে সঙ্কলকেই সে আতি অন্নাল তাবার গালিবর্ধন করে চললো।

লোকনাথ ততোক্ষণ অনেকখানি পেচনে সরে এসেছে। হুত ফোলে বেঘতে পেতা যে বানকাইয়া নিষেধ ঘরের বাওয়ার নিচল পাথরের মূর্তি হয়ে বলে আছে। তার সেই কঠিন মুখের রেখার কোনোরূপ নিহুততার

চিহ্ন নেই; বরং কেমন একটা অসহায় অবস্থা বুটে উঠেছে।

সন্ধ্যার পর লোকনাথ বেড়িয়ে ফিরে আসতেই কাউ কাউ করে উঠলো কাহ্ননগো। বললো সে, আরে শশা, কি ভীতি করেছেন আজ সকালে?

—কই আমি তো কিছু করি নি? লোকনাথ রীতিমতো আতঙ্ক হয়ে উঠলো।

—আর কি করতে শেষ রেখেছেন! দাগী তো পুকারেত্তের সামনে গাড়িরে বললো, আপনি না থাকলে কসাই আজ তার টুটি কেটে একেবারে হালাল করতো।

—কোথায় বললো বললেন?

—পুকারেত্তে শশা পুকারেত্তে। বিলোচন গিয়ে সকালেই দাগি চুকে দিয়েছিল পুকারেত্তে। আমি আবার কলিট মেসার। ডাক পড়েছিল। সেইখানে সব শুনলুম। বাক বা হবার সব হয়ে গেছে। আপনি আর কখনো আবারে চৌহাদি পারায়ে ওষের অকলে যাবেন না। যবন বধি খুনাথরাপি হয়ে যেতো আপনাকে দাগী যানতো। তারপর করেন কোট্টর—রইলেন চাকরী বাথার।

—হঁ। তা কি সীমাংসা হোল?

—সীমাংসা? এলবের আবার সীমাংসা কি? ও দাগীকে জিজ্ঞেস করা হোল কি হয়েছিল। তাতে দাগী বা বললে তা বধি সতি হয় তবে সব ঘোব হোল বানকাইয়ার। বানকাইয়ারকে জিজ্ঞেস করা হোল সে কোনো কথা বললো না শুধু মেরে চুপ করে বলে রইলো। আমরা শুধু ঠিক করলুম ও-কসারের কাছে ও-রত্নাবলী রক্তনের থেকে কাজ নেই উনি ইচ্ছা করলে ঐবিলোচনের ঘর করতে পারেন। এর অস্ত্রে পুকারেত্তের সেমাহী আর যারের পুকারেত্তের বিশ টাকা দিতে হবে।

—তারপর?

—ঐবিলোচনের নিকট হোতে টাকা জমা পড়কে। হুতরাঐ ঐমতী রত্নাবলী বিলোচনের ঘরে।

কথটা শেষ করে কাহ্ননগো অট্টহাসি হেসে উঠলো,

বললো, কেমন বিচার বলুন তো?

নরুণের বহলে নাকি।

কাহ্ননগো লোকনাথের কথার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ লক্ষ্য করলো না। বরং রসিকতার চূড়ান্ত হয়েচে মনে করে অট্টহাসিটাকে টেনে নিয়ে চললো হো হো করে।

গুণগোল বাঁধলো সকালবেলা। বানকাইয়া খুব ভেত্রে ওঠে ভোরবেলা। বিলোচন দপ্তরের চাপরাপি—একটু বেলা করে ওঠা তার অভ্যাস। আজ কিন্তু বাথার বিপরীত। বানকাইয়া ওঠার আগে বিলোচন উঠেছে, উঠে এসে বানকাইয়ারে বানকাইয়ার হস্তোদ্ধার। বেগে বেগে বেকে বেকে কথা বলছে সে। বানকাইয়া কিছু নীরব। চোখের দৃষ্টি তার নিস্ত্রত, গীড়ানোর স্তম্ভীতে স্রাবের অভাব। তাইবের চারদিকে সতকাসের মতোন ভীড় আছে গেল। চীৎকার করে করে বিলোচন এলিয়ে পড়লো। বানকাইয়ার থেকে কোনো উত্তর না পাওয়ার তার চীৎকার হুমাধীন হোয়ে উঠলো।

উঠাৎ বোম্ব হর ঘুরে গীড়ানোর হুধ চোখ তার পেপে'গাড়ের কীক দিয়ে লোকনাথের ওপর এসে পড়লো। সে চীৎকার করতে করতে লোকনাথের হাওয়ার সামনে এসে গাড়িলো। দুহাত তুলে বললো, বাবু আপনি বিচার করুন। শুণে শুণে নগদ বিশটাকা আমি পুকারেত্তকে দিয়েছি কাল। আর রাজিতেই ওই বেটা কসাই সে ছুঁড়িকে গাপ করলো! আমি আজই আবার পুকারেত্তে ডাকবো—

কুতো মেরে ওকে বস্তা থেকে তাকাবে। আপনি বাবু দাগী।

—কে কাকে গাপ করলো? লোকনাথ কাহ্ননগোর উপদেশ তুলে গেল।

—কাকে আবার বস্তাকে। কাথরাজিতে সে আমার ঘরে শুয়েছে—সকালে উঠে বেডি দরোয়া বা বা করছে, ছুঁড়িও কীক।

—বানকাইয়া তুই কিছু জানিস?

—না বাবুজী। ওতো কাল সামনে চলা গিয়া আউব আসেনি। আবার বর খোলা আছে আপনি দেখুন।

—না বাবু ও কুকিরে কেলোছে। বিলোচন তীব্রকণ্ঠে পুনরায় অভিযোগ করিলো।

কঠিন সমস্ত। লোকনাথ কি করবে স্থির করতে পারলো না। তবে সে বানকইয়ার মুখ দেখে বুঝলো রত্নার সঙ্গে তার পূর্বকার সম্বন্ধ পুনঃস্থাপিত হয়নি। তাহোলে ওই রাত্রিভাগরণ ও মানসিক অবস্থা ওর মুখের কঠিনবোধের ঠিক অভ্যর্থানি পতীরূপে ফুটে উঠতো না।

—শোনো তোমাদের ব্যাপারে পক্ষায়েৎ শালিশ করেছে। তোমরা বাবু পক্ষায়েতের কাছেই যাও।

—আপনাকে বাবু পক্ষায়েতে আসতে হবে। বিলোচন আবেদন জানালো।

—কেন?—লোকনাথ আশ্চর্য হোতে তারপ্ন জানতে চাইলো।

—আপনি বাবু বা আমেন—পক্ষজনকে কুকিরে বসতে পারবেন বোঝ কার।

—না, লোকনাথ হঠাৎ কেটে পড়লো, বোঝ কারো নয়। যে ছুঁড়ি ভেগেছে, বোঝ তার, বোঝ তার রক্তের, ধর্মের। আমি ওদল নোংরা ব্যাপারে নেই।—লোকনাথ ছিটকে ঘরের ভেতর ঢুক গেল।

লোকনাথের উদ্বেজন। দেখে বিলোচন পিছিয়ে গেল। বানকইয়া চলে গেল নিজের ঘরের দিকে। ভীড় কাঁকা হোয়ে গেল।

অকুসল হোতে সরে এসে নিজের ঘরের ঘাওয়ার দাঁড়িয়ে লোকনাথ বেনে আপন সত্তার মুখোমুখি হয়ে পড়লো। সেই সত্তার একটা নয় নিলজ্জরূপ সে দেখতে পেলো। এদের কারোকে তার ভালো লাগে নি। সব থেকে নোংরা মনে হয়েছিল গতকাল পক্ষায়েতের বিচার। কেমন করে এক জ্ঞানে ওরা রত্নাকে বিলোচনের শব্দ-ভাগিনী করেছিল। আজ কিন্তু তার থেকেও নোংরা মনে হোলো রত্নাকে। মনে হচ্ছে ও পাগল নি—বিলোচনকে ধারেল করেছে।

অনেক বাসতি ছল চলে রান করেও সে কেমন অসুস্থি বোধ করতে লাগলো।

রাত্রিবেলা পক্ষায়েত সত্যিকারের বিশেষ পড়লো। রত্নাকে খুঁজে পেতে বিলোচনের ঘরে না পাঠিয়ে তারে বিশ টাকা কেয়ত বিতে হয়। অগতঃ মায়ের পুঙ্খ-আঙুর থেকে কি করে টাকা প্রত্যর্পণ করা যায়। পক্ষায়েত তাই শেখাবদি অনেক বিতর্ক বিচার করে বানকইয়ার পাঁচ টাকা অগ্রিমান করলো। কারণ পরিচার্য তাবে বোঝা গেছে রত্নার পালানোর পেছনে তার হাত আছে।

আজ পক্ষায়েতে লোকনাথকে থাকতে হয়েছিল নীরব ঘর্ষনের ভূমিকার। বাগার প্রত্যাবর্তনের পথে কাছনগো জিঞ্জেস করলো, কেমন বিচার হোল লোকনাথবাবু?

—নাকের বধলে নরপ।

—ঠিক বলেছেন মশায়, উচ্চস্বরে হাসলো কাছনগো, বললো, নরপের বধলে নাক কিহা নাকের বধলে নরপ।

একটি পর একটি দিন কেটে প্রায় মাসখানেক সময় বেরিয়ে গেল। তারপর একদিন সকালবেলা এক টৈ টৈ চাঁৎকার শুনলো লোকনাথ। এসব চাঁৎকারের সংগে সে অত্যন্ত হয়ে গেছে—তাই সে কিছুবার কোঁতুংলী হয়ে উঠলো না। কিন্তু গোলমাল বখন তারি ঘাওয়ার শাযনে এসে বায়লো তখন ত্তো আর চোখ বুজিয়ে থাক্য চললো না।

গোলমাল রত্নাকে নিরে। সে কিরে এসেছে আর তার কোলে সজ্জশ্রুতা একটি মেয়ে। রত্নাবলীর কানো শাযন্ত-কোবল ছুপানি বাহবরগীতে মেয়েটিকে একটি তন্ত রত্ননীমক্কা কলির মতোন দেখাচ্ছে। মেয়েটি যেখানে থাক্যবিক তারি স্মরণ।

ভাগ্যক্রমে বারটা পড়েছে বৃষপতিবার। বানকইয়া ঘরে আছে। আর বিলোচন চাঁৎকার করে আকাশ ছাট্টিয়ে দিচ্ছে। তাকে একটা দমক দিয়ে বায়লো লোকনাথ।

সকলে বললো, বাবুজি, আপনি বিচার করুন।

লোকনাথ বললো, সে কি করে হয়, পক্ষাঘাতের পক্ষমান হয়েছে।

—না, বাবুজি, পক্ষাঘাত বালে তো অস্বাভাবিক। আমার আর পক্ষাঘাতে যাওয়া না। আপনি যা রায় যেখান তাই যেনে নেবো।

তবুও ইত্যন্ত করলো লোকনাথ। তারপর বিচার করবার মতোই দৃষ্টান্তিক কাহ্নে সে সেগে গেল। ভরসা ভায়া যদি এ বিচার না নেয়—পক্ষাঘাত তো বোলাই আছে।

—পঞ্চগোলাটা এখন কিসের ?

—রক্তা কিসে এসেছে। আপনি বলুন ও কার ঘরে এখন বাবে ?

—কেন দ্বিঃ হয়েছিল ও বিলোচনের কাছে থাকতে।

এখন ও বিলোচনের ঘরেই বাবে।

—না, বিলোচন ক্রুদ্ধ তাঁৎকার করে উঠলো, ছ্যানাটা নিয়ে ও আমার ঘরে চুকতে পাবে না।

—বাচ্ছাটা কার ?

—আমার। রক্তা বাচ্ছাটাকে আরো কোরে বুক চেপে ধরলো।

—তোর বাচ্ছা কি করে হোল ? লোকনাথ প্রশ্ন করলো।

লক্ষিত ভক্তিভে একটু হাসলো রক্তা। তারপর মেয়েটির অঙ্গ ইতিহাস বললো। যা ওর মীঃতালি মেয়ে। আরো পাঁচ জনের সংগে খাটতে গিয়েছিল মিলিটারী ক্যাম্পে। ফিরে আসে গর্ভবতী হয়ে। ফিরে আসবার সংগে সংগে পাঁচ জনে সম্বন্ধ করে। মীঃ বোধ হয় নিজের অস্ত্রের জ্ঞানভে লভ্য ঘটনা কি। গতকাল গর্ভ বহন। জন্ম হোতে শালজন্মে পালিয়ে গিয়েছিল সে। লভ্য ছিল রক্তা। লভ্যভাত শিতকে নিয়ে সে পালিয়ে এসেছে। যে রক্তাকে আরগা বেবে—এই শিতকেও তাকে আরগা দিতে হবে।

রক্তার প্রত্যয়ে বিলোচন রাজী হোল না। অকৃতকর্মে সে বললো, মিলিটারীর ছ্যানাকে সে ঘরে তুলতে হবে

না। রক্তার চুটি ভালো চোখে আশ্রনের স্থলকি ছিটকে পড়লো। শানিত কঠে যে বললো, আমাকে আরগা দিবি ?

—আলবার। বিলোচন বেন ভাল চুকলো।

রক্তা সেই ভাল ফিরিয়ে দিলো, আমার না রাগিত ছিল আমি রাগিত বাচ্ছা। মিলিটারীর বাচ্ছার চাইতেও বেকমিত।

একটা ধনক বিলো লোকনাথ, এই চুপ।

—বাবুজি—

—চুপ, এখন কথা নয়।—লোকনাথ বাধ্য বিলো রক্তাকে।

বাধ্য পেয়ে কোনো কথা না বলে লোকনাথের হাওয়ার এককোণে সে বসে পড়লো।

লোকনাথ বিলোচনকে খিজেল করলো, বিলোচন, কি করবে এখন ?

—করাকরিত কি আছে বাবু, শানি বেভা কোথাকার !

বিলোচন বড়ো বড়ো পা কেল চলে গেল।

রক্তার বিকে কিঃলো লোকনাথ, খিজেল করলো, হ্যাংরে তুই এখন কোথায় বাবি ?

কোনো উত্তর দিলো না রক্তা। লোকনাথ আমার বললো, বেধ, ও বাচ্ছাটা তোর কাছে থাকলে কেউ ভোকে নেবে না। তুই কি বাচ্ছাটাকে ছাড়তে পারিল না।

—না।

—কেনের কি হোয়েছে—যে তুই ও বাচ্ছাটাকে ছাড়তে পারবি না—তোর নিজের তো একদিন বাচ্ছা হবে।

হুঁগিরে কেঁধে উঠলো রক্তা। সবলেই আশ্রব হোয়ে গেল। তবে কেউ কোনো কথা বলতে সাহস করলো না। রক্তা একটু মাত্র হোলে লোকনাথ বললো, বেধ, আমি তোকে কোনো ব্যাঘ্ন বেবে বলে দিনি।

—নেই বাবুজী, আপনি খুব ভালো আদমি। হোং লব আমার, আমার নসিৎহ !—রক্তা একটা চোক গিললো, আঁচল দ্বিঃ চোখ মুছলো, তারপর কম্পিত

খলার বললো, বাবুজি, আমার কোনোদিন বাচ্চা হবে না, আমি রাস্তা। আমার বা আমাকে বাওয়াই খাইরে দিচ্ছে।

রস্তার কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা কঠিন নিশ্চিন্তা নেমে এলো। একটা মুহূর্ত মাত্র। তারপর সেই কঠিন নীরবতা রস্তার কৌপানিতে ছিঁড়ে গেল। কিন্তু সেই কৌপানি চাপিরেও ভেঙ্গে উঠলো একটা কঠোর : এই বুঝো মাং !

সকলে সবিস্ময়ে দেখলো বৈভবের মতোন চেহারা নিয়ে এগিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে বানকাইরা।

—বাবুজি, আপনি যদি বলেন আর রস্তা খুল হোর, তবু আমি বাচ্চাকো আর রস্তাকো আমার ঘরে নিতে পারি।

—রস্তা ঘাবি ?—লোকনাথ প্রশ্ন করলো।

কোনো কথা না বলে চোখ মুছতে মুছতে উঠে দাঁড়ালো রস্তাবলী। বানকাইরাও বিনা বাধ্যব্বের ছাগল-ভেড়ার টুটি কেটে হত্যার পট্টু ছথানা বড়ো বড়ো বাধার মতো হাত দিয়ে অতি লব্ধবর্পে গম্ভোজাতকে তুলে নিলো।

শাড়ীর জাঁচল দিয়ে মুছলেও, রস্তার চোখ হোতে হল ওখনও নাহনি। কিন্তু সেই জল ছাপিরেও হাসি ফুটে উঠলো। সারা মুখে বলল করতে লাগলো অপরিণীত এসব্বতা। ধোঁপা ভেঙে বাড়িরে আদা ছোট ছোট অসংখ্য চুলে আর বিলু বিলু ঘামে সেই এসর মুখে কেমন একটা মধুর অবসারের আচ্ছন্নতা ছড়িয়ে গেল ও দেখলে বন বলে, জননীর সন্তানের অস্ত্রে লব পরিশ্রম সার্থক হোয়েছে।

সেই আদো-হাসি, অথক অশ্রুশিক্ত মুখে হাত তুলে রস্তাবলী সেলাম করলো লোকনাথকে, বাবুজি সেলাম।

শিশুটিকে কোনোরকমে একহাতে নিজের বুকের ওপর চেপে ধরে বানকাইরাও হাসিমুখে বললো, সেলাম বাবুজি।

—সেলাম !—লোকনাথ হাত তুলে এদের প্রত্যক্তি-নন্দন জানালো।

ওরা চলে গেল। ওদের প্রস্থানপথের দিকে চেয়ে লোকনাথের মনে হোল রস্তার বা কোনোদিন শিশু রস্তাবলীর কচি ছুটি টোট নিজের বুকে চেপে ধরেনি। আর তা না হোলে শিশুকন্ডার জীবনের ঘাবী মায়ের হুক অধার পরিপূর্ণ করে পুরুষের লালসা আর বেহোপ-জিবীনির অর কেড়ে নিরেছিল যশে তাকে এই জীবনের মতোন অধ্যব্যাজী হোতে বঞ্চিত করা হোয়েছে।

কিন্তু না। অধ্যব্যাজী বাবে ব্যাসা হোতে মান করবার ভগ্নে নামতে গিয়ে পেপেগাছের কীক দিয়ে চোখে পড়লো কুরোভলার পাশে রোহ এলে পড়েছে আর সেই রোহে যেতর একটা ঘোড়ার রস্তা বলে নেয়টার কচি হুক নিজের আনাধারিত নিটোল বুকে চেপে ধরেছে। তার সারামুখে এসর হাসি ফুটে উঠেছে।

কয়েক মুহূর্ত ধরে লোকনাথ নিঃশব্দে এই মূর্ত দেখলো। তারপর তার মন আন্দনে ভরে উঠলো : না, রস্তাবলীকে কেউ বঞ্চিত করতে পারেনি। সে জীবনকে বিশ্বস্তর মালাই দিচ্ছে : বা হোয়েছে নিঃশব্দে।



আপেক্ষাকালের ব্যবস্থা

ডাঃ হীরলাল রায়

সর্বকালে সর্ব দেশে আপেক্ষিক উপস্থিতি হ'লে ব্যক্তি স্বাধীনতা আংশিকভাবে লোপ পায়। বর্তমান সময় অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীর আরম্ভ থেকে মেলগাড়ী, ইমার, এম্বোয়েননযোগে ক্রম বাতায়ানের ব্যবস্থা এবং তার ও বেতার যোগে সংবাদ আদান প্রদান সমস্ত সংক্ষেপ হওয়াতে কোন দেশই অল্প বেশ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। এক দেশ থেকে অল্প বেশে সংক্রামক ব্যাধির প্রসার বন্ধ করা যায় কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হইলে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশই তাতে অল্প বিস্তার সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। যুদ্ধ ব্যাধির আক্রমণ থেকে কোন দেশই অব্যাহতি পায় না। যে দেশ যত পরাক্রমশালী ব্যারায় তাকে তত বেশী আক্রমণ করে। আত্মরক্ষা এবং আক্রমণ এই দুই শব্দের ব্যুৎপত্তিগত ভিন্ন অর্থ থাকতে পারে কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগ ব্যবস্থার কোন প্রভেদ নাই।

গত বিশ্বযুদ্ধে সামরিক শিক্ষা এবং সামরিক বিভাগে যোগদান স্বাধীন দেশসমূহের প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে বাধ্যতামূলক ভাবে পালনীয় ছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পাঁচ বৎসরের মধ্যেই আবার রণবাত বেগে উঠেছে। যুদ্ধকালে অন্ততঃ পাঁচ বৎসর থাকতে কোন কাঁচা মালের অভাব না পড়ে সেইজন্য মার্কিন দেশ মাল যত্নসূত করিতে আরম্ভ করেছে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ অব্যক্তাবী, কারণ এত কাঁচা মাল এবং তৈরী মাল বেশী দিন পড়ে থাকলে নষ্ট হয়। কোন জিনিষ নষ্ট হতে বেগুনা মানবস্বত্বের বিস্ময়। অতিরিক্ত ধারার ফলে দিলে নষ্ট হয়। সেইজন্য অল্প হবে অনেকও ধরে তার 'সম্মানহানি' করাই আমাদের রীতি। সামরিক বিভাগ, দেশরক্ষা এবং আত্মরক্ষার গোড়ায় গিয়ে বা জিনিষ চাচ্ছে তথাকথিত গুপ্তচরমেট জাই যোগাড় করেছে। এক্ষত প্রস্তাবে মার্কিন দেশ সামরিক বিভাগ দ্বারাই অপ্রত্যক্ষভাবে শাসিত হচ্ছে। ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতির তাদের অর্থগণের সুবিধার জন্য এই উদ্ভাবন দ্বারা বাধনা বাজাচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিও তাদের কর্তব্য ভাবতে আরম্ভ করেছে। গত যুদ্ধের সময় অসামরিক ছাত্র সংখ্যা খুব কমে গিয়েছিল এবং শিক্ষকেরাও অনেকে যুদ্ধ সংক্রান্ত কাজে ব্যাপৃত হয়ে পড়েছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট বলেন যে আরো ২০ বছর যদি যুদ্ধ চলতো তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মক্ষমতার এবং তার ধারার এমন পরিবর্তন হয়ে যেতো যে তাকে বিশ্ববিদ্যালয় না বলে সামরিক প্রতিষ্ঠান বলাই উচিত হতো। এবার মার্কিন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়, এঞ্জিনিয়ারিং ইন্সটিটিউট এবং কৃষক শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ সামরিক বিভাগের লোক সংগ্রহের বাধ্যতামূলক দাবীর সুব্যবস্থা কি করে করা যার তার আলোচনা শুরু করেছে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের এবং ব্যক্তির কতকগুলি কাজে বিশেষ যোগ্যতা আছে। সেই সব কাজেই তারা দেশের এবং দেশের বিশেষ সাহায্য করতে পারে। যে কোন কাজে যে কোন লোককে নিযুক্ত করলে সর্বোত্তম ফল পাওয়া যায় না। যেহেতু বা সেগুণ কাঠকে জ্বলে জ্বালে তার সর্বোত্তম ব্যবহার হয় না। যে কোন সাধারণ কাঠে সে কাজ চলতে পারে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে গ্যালিপলি বা দার্দানেলেপে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী যুদ্ধ মোকলির কীমানবশেষ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংলণ্ডের ক্রিকেট খেলোয়াড় জেড্রিট্টের মৃত্যু এ বিষয়ে প্রকট উদাহরণ।

পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকে বিশ্বাস করেন যে যুদ্ধ বা যুদ্ধের ভয় সর্বদা প্রকট থাকাই সকল দেশের সাধারণ অবস্থা হয়ে পড়িয়েছে। বিশেষত যে সকল দেশ পৃথিবীর শাসনক্ষেত্রে উচ্চাঙ্গনে প্রতিষ্ঠিত থাকতে চায় তাদের সকলকেই নিজেদের দেশকে সামরিক ছাউনিতে পরিবর্তিত করতে হবে এবং সেই ধরনে চলতে হবে। ভারতবর্ষের মতো নিরীহ, নিরস্ত্র, অহিংসাত্মক শোণক দেশকেও এর জন্য ভুলতে হবে, কান্দাই নিশ্চয় নেই।

মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির প্রেসিডেন্টরা কেই কেই জাবছেন যে, হুজের জন্ত যখন প্রস্তুত থাকতেই হবে তখন উক্ত বিদ্যালয়ের শেখ পরীক্ষা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশের যাবতীয় সমস্র সকল ছাত্রকেই দুই বৎসরের জন্ত বাধ্যতাবুলক সামরিক শিক্ষা নিতে হবে। এই ব্যবহার এইরকম বিশেষ এবং যুবকদের জীবিকা উপার্জনের শিক্ষা দুই বৎসর পিছিয়ে যাবে। এটা খুব বাহুল্যের নয়। এই ক্ষতি পূরণ অবশ্য: আংশিকভাবে করার জন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম উপাধি পরীক্ষার জন্ত পাঠের সময় চার বছরের পরিবর্তে তিন বছর করার জরুরী করণা চলছে। এটা হলো বিশ্বশাসনের যারা তার নিষেছেন তাদের দেশের কথা।

আমাদের দেশের অবস্থা কি? আমরা দুই চাই না কিন্তু রাষ্ট্রের মত বাচতে চাই। অশশন, অর্ধাশন, অসাক্ষান, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, ব্যাধি, বজা প্রকৃতি আমাদের নিত্যসঙ্গী, বাইরের আক্রমণের চেয়ে ভিতরকার আক্রমণই আমাদের বেশী। এই সকল আক্রমণ থেকে আমাদের আত্মরক্ষা করতে হবে, এও একপ্রকার যুদ্ধ। গভর্ণমেন্টকে দোষ দিলেই এর প্রতিকার হবে না। মাইনে দিয়ে কর্ভচারী ও কুলি রেখে এই কাজ গিছ হবে না। আগেকার দিনে রাজারা মাইনে দিয়ে সেপাই রেখে যুদ্ধ করাতো তারা কেবলমাত্র বেতন-তোগী সৈনিক। যে টাকা সেবে তার হয়েই যুদ্ধ করবে। এরকম সৈনিকের কোন আদর্শ নেই, কিন্তু অবহেলা, আলস এবং উদাসীনত বর্ণেই থাকে, কীকি দিতে পারলে সে যুদ্ধোৎসাহ হারায়ে না। আমরা চাই এরকম কর্মীকুল যারা কাজে আনন্দ পাবে এবং নিজের দেশের কাজ মনে করে থাকবে, প্রথম গঠনে বাধ্যতাবুলক ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তারা মল্লের কর্তা হবেন তাঁরা নিজের চরিত্র ব্যবহার, আদর্শ ও কর্তব্য চাই বাহুল্যের প্রত্যেক লোককে উৎসাহিত করে তুলবেন।

পরাক্রমশালী দেশগুলি যেমন বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্ত বাধ্যতাবুলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা করছে আমাদেরও তেমনই পরীক্ষা এবং অপরীক্ষা

অগ্রঃশত্রুর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হবে। কেবল মাত্র বেতনতোগী লোকের দ্বারা এই কাজ হবে না। দেশের এক টাকাত নেই। আমাদের বাধ্যতাবুলক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হবে; তাদের আদর্শবাহ্য। অহুপ্রাপ্তি করে তুলতে হবে। বিশেষ ও যুবকের মল সামরিক নিয়মের অল্পবতী হয়েই প্রত্যেকে এই রকম বেশরক্ষার কাজে জনগণের দ্বিত্যর্থে এক বৎসর বা দুই বৎসর সময় দিবে। সমস্ত ভারতবর্ষে অতি বড় কথা— আমরা এখন বর্তমান বাংলাদেশের কথাই ভাবতে পারি।

বর্তমান বাংলাদেশের সাধারণ কতকগুলি খবর :—
মোট আয়তন—২৮০০০ বর্গ মাইল।

মোট লোকসংখ্যা—২,৪৭-৮৬,৬৫৩।

উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের সংখ্যা—২০০।

প্রতিবৎসর ব্যাট্রি ফুলেশন পরীক্ষার্থীর সংখ্যা—৩৪০০০।

পৃথিবীর সমস্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশে প্রতি বর্গ-মাইলে লোকসংখ্যা সর্বোচ্চ আছেও ছিল। বঙ্গ-বিভাগের কলে এই বসতির ঘনতা আরও বেড়েছে; জল এগাশী বহু হুওয়ার ম্যাসেডিরার একোশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যভাবে প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার দ্বারা অধিক ষট্টে। বসন্ত, কলেরা ও অন্যান্য রোগ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করে বসেছে। “অভাবে স্বভাব নষ্ট” হওয়ার দ্বারা মরি, কাটাকাটি, চুরি, ডাকাতি চোরাকারবার, দক্ষদ্বা ইত্যাদি সমস্তই বেড়ে চলেছে। আদর্শবাদ বেশ থেকে লোপ পাচ্ছে। বেশকি আবার উন্নতির পথে নিরে যাওয়ার উপায় কি? বিশুদ্ধ এবং উচ্ছৃঙ্খল স্বভাব বিশেষ ও যুবকদের মধ্যে ক্রমশঃ প্রকটিত হচ্ছে।

এখনও দেশে চাইই জীবিকানির্বাহের প্রধান অবলম্বন; কিন্তু শুধু চাব দ্বারা এই প্রবৃত্তি জনসংখ্যার স্বাক্ষরো জীবনধারণ অসম্ভব। দান্যরকম শিল্পের প্রতিষ্ঠা এবং উন্নতি অতি আবশ্যিক। এই সকল সমস্তার সমাধান মন্ত্রণে বা অল্পদিনে হবে না। এর জন্ত চাই স্বাভাবিক প্রচেষ্টা এবং সুগঠিত পরিচরনা।

যারা সকল ত্যাগের সকলকেই কিংবা ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। প্রত্যেক দেশেই বিশেষত ভারতবর্ষে এবং বাংলাদেশে মহামন্ত্রের লোকেরা সমস্ত জাতির মেলন। গত করেক বৎসরে এই মেলনগুলির অবস্থা লক্ষ্য হতে এসেছে। 'কিন্তু এদেরই আবার স্বেচ্ছা বাধ্য গম: পার্থ' বলে আগেকার মতো সন্ধ্যা হয়ে উঠতে হবে। হতাশ বা নিরাশ এবং নিজস্ব হয়ে থাকলে সুস্থ্যকে ভেদে আনা হবে। অতিবৃদ্ধ চীন অনেক কষ্ট ত্যাগের পরে নতুন করে নিজের দেশ গড়তে আরম্ভ করেছে। তারা কতকটা পছন্দ মতো আনন্দিতভাবে গ্রহণ করেছে। তারের কর্তৃপ্রণালী আনন্দের বিবেচ্য বিষয়। আনন্দের জীবনের সর্বক্ষেত্রে অবনতি, কোন এক বিশেষ স্থানের সংস্কারের চেষ্টার আনন্দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। বাহ্য, শিক, অসংস্কার, সকল সমস্ত সমাধান আনন্দে আরম্ভ করতে হবে। এবং এক পক্ষে অনেক লোক নানা ক্ষেত্রে কাজ শুরু করুক।

যে সকল ছাত্র স্নাতকোত্তর, আই, এ, এবং বিএ, বি, এল, সি পরীক্ষা দিয়েছে তারা সকলে এক বৎসরের ক্ষমত সমস্ত কার্যে ছোট ছোট বলে এক একজন নেতার অধীনে গ্রামে গ্রামে এবং ছোট সহস্রাব্ধিতে ছড়িয়ে পড়ুক। সেখানে তার নির্দিষ্ট পরিচালনাক্রমে বাড়ি গৃহ, ডোবা, জল পরিষ্কার কক, বহু জল প্রণালীর সংস্কার করে জল প্রবাহের রাস্তা করে দিক, কচুরী খানা নষ্ট করুক, গ্রামে কোন বিচ্ছিন্ন স্থান করে নিরক্ষর বয়স্ক লোকদের প্রাথমিক শিক্ষা দিক। বাধ্য-রকার সাধারণ প্রণালীগুলি লোকদের বুঝাক। মেডিকেল স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরাও অন্তত এক বৎসরের ক্ষমত গ্রামে গ্রামে চিকিৎসা কার্যে ব্যাপ্ত থাকুক। গ্রামবাসীদের পরস্পরের মধ্যে যগড়া বা মত-বিরুদ্ধতার ক্ষমত বোধকরা করতে না দিয়ে আপোষে তাই দীর্ঘাংসা করুক।

এই বাধ্যতামূলক সেবারাধার ব্যবস্থা করলে বিনা যেতনে প্রায় এক লক্ষ কর্মীর কাছ থেকে কাজ পাওয়া যাবে। কেবলমাত্র তাদের খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। এই এক লক্ষ লোকের মধ্যে প্রায় ৩ ছোট ছোট নগরবাসীদের মধ্যে আরো ৩য় লক্ষ লোক কাজের ক্ষমত পাওয়া যাবে। নিরমাহবৃত্তিতা ও শুল্কলা সাময়িক প্রবাহ চালাতে হবে। কোন কর্মীকে নিরম লক্ষন বা দ্ব্যবহারের ক্ষমত নাথি দিতে দিবা বোধ করলে সমস্ত চেষ্টা পণ্ড হবে।

বাংলা দেশের গতবর্ষের যদি এই পন্থা আইন দ্বারা প্রবর্তিত করে তবে আশা করি তা জনগণের মূল অধিকারের বিরুদ্ধে (Fundamental rights of citizens) থাকে না এবং এর ক্ষমত হাইকোর্টে বা সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা শুরু হবে না।

এই কাজ করার আগে একটি অতি বৃহৎ কমিটি করে কার্যপ্রণালী স্থির করতে হবে। প্রত্যেক জেলা, মহকুমা, থানা এবং গ্রামের সমস্ত বয়স্ক নিতে হবে। সমস্ত কাজের তির তির অংশের বড় মানচিত্র তৈরির করতে হবে; জল প্রণালী (নদী, খাল, নালা) দিয়ে জল প্রবাহের দ্বারা রাস্তা ইত্যাদি মানচিত্রে স্থাননির্দিষ্ট করতে হবে।

যারা এতদিনে বিদেশী শাসন কর্তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন তাঁরাই এখন শাসক শ্রেণীভুক্ত। তাঁরা ইচ্ছা করলে বর্তমান গতবর্ষের দিকে দিয়ে এই কাজের ক্ষমত সরকারী আইন করিয়ে নিতে পারেন। যেহেতু সেবকের দল এই কাজ করতে গেলে অনেক গোলাযোগের সৃষ্টি হবে। এই বিষয়ের গতবর্ষের দেশের মনীষীবর্গের, জনসাধারণের এবং যুবকদের সৃষ্টি আকর্ষণ করাই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। আশা করি অনেকে এই বিষয়ে অনেক সুপারামর্শ দিতে পারবেন।

জীবন-শিল্পী

অমলেন্দু দত্ত

'জীবনে জীবন যোগ করা'

এখনো হয়নি বৃষ্টি বার্ষ তাই গানের পনরায় !

তবু এ-পনরায় রচি, ধরে ধরে সংগীত লাজাই

ছন্দেয় অন্তরীণ তপে ফিরি বশির সন্ধান ;

কখনো চমক লাগে চোখে পড়ে আলো-কোশনাই

অতলাস্ত ছন্দেয় বদ্বি-মাপিকের

আর তাই মানে খুঁজে পাই যেন মহাজীবনের !

সেবেছি এ-পৃথিবীর জীবনে জীবনে

ছই নেক ব্যবধান ; কতো অকারণে

বলির পত্তর মতো এ-জীবন কাণে ধরে ধরে।

ভোগ আর বিলাপের বৃণকাঠে তরে অড়োসড়ো

হাল দেহে ঐত্যাশয় মুহূ ঐতীকার !

মৃত্যু সত্য জানি তবু অমায় জীবন

ঐবতর । দেখানে চাকল্য আছে

সেখানে প্রাণের বেগ, আর তাই দিগে

মৃত্যুর ওপার থেকে নিরে আসে জীবন ছিনিয়ে !

এ জীবন মাঠে মাঠে চাবীদের কলিয়ার হাড়ে

কলে আর কাবখানার বন্ধুরের মিছিলের সারে ।

বলির পত্তর মতো ভয়ে ধরে ধরে জীবনও যে

ভূমিহীন কিষাণের বলিষ্ঠ বাহুতে

ধর্মঘটা মজুরের কষুকর্মে সংগ্রামের ভাবাবেগেই খোজে ।

জীবন-সংগীত তাই হুঙ্কারমী অন্তর সংগ্রামী স্বাক্ষর ।

বাণী তার নয় তাই তোরের শিশির ভেঙ্গা ভ্রামলী তুণের

অথবা মারল গুত্র গুচিতার অহিংস প্রেমের ।

হৃদয় নিরুড়ে' যদি ব্যথার পোষিত বেগে থাকে

এ গানের বাণী সেই রক্ত রক্ত লেখা,

আর তারি কীকে কীকে

ভোরের স্বর্গের থেকে অস্তিলাল রক্ত তুলে তুলে

জীবন শিল্পীর আঁকা সংগ্রামের অরচিত লেখা ।

গানের পনরায় বার্ষ ? হরতোষা হবেই তা ঠিক

তবু সত্য জীবনের সংগ্রামের অরণ্যান রচি ।

পীড়িত জীবন কাঁদে,—সে আহারো । তারই কান্নার

হাঝারো বাণিত প্রাণ হাঝারো জীবন

একবার মিছিলের মতো এসে শীত হয়ে যার ।

শাস্ত্রত

বিক্রান্ত দাশ

দেখেছি বিকৃত-সিদ্ধ, দুবিনীত কড়া কলরোল
জনেছি দিবল-রাত্রি, মহাকর্ষ লগ্নে করোল
কাপারেছে দ্বিধিক, স্বরায়েছে কুলের গ্রহন,
ক্লান্ত জনপদ আর বর্ণহার্য বিলম্ব সহর।

দুর্গী-ঋতু জীবনের ছ'চার অব্যাহত গেতে উড়ে,
বৈশাখের রক্ত-রাগ বারবার এসো ঘুরে ঘুরে।
ভবুও দেখেছি আমি নানেনি অনর্থ পরাজয়,
হারায়নি অন্ধকারে শুই এই চূর্ণের ক্ষয়।

ফাঙ্কন রাতের চাঁদ তাই বধা রাতে মিল ডাক,
বিজল এ' ক্ষয়হেরে। নয়-নীল স্বপ্ন এক স্বাক
বলাকার মত এল মনের আকাশে উড়ে উড়ে,
জানীরের বন হ'তে আর্ষিলের উজল রোদুয়ে।
মেঘে মেঘে ইন্দ্রজাল, হেরি রামবহু বর্ণময়,
অবোধ শিশুর মত নৃত্য করে ঢোল ছন্দয়।

যদি

বুদ্ধদেব ঘটক

যদি এ পাণ্ডুর রান বঙ্গান্তিক বাবার অঙ্গনে
হাওরার মৃদল বালে, যদি লব করে স্বপ্ন, মনের অঙ্গনে
কেবলি গহন কাঠা ক্রান্তির বিবহু সুরে তার
অভিজ্ঞান রেখে যায়, নিশুর্ঘ্য স্থতির অভ্যাচার
বিন্দু করে আনাদের, স্বর্ণাত রৌদ্রের স্বপ্ন মুছে যায় তবে
জীবনের রঙহীন দীপ্তিহীন সে চিহ্ন কী হবে!

বলো, আমি কি নিশ্চয় হবো, নতরের নেটুহুও আলো
হাবাবো ক্ষমর থেকে, পড়িয়ান প্রান্তরের মতো
তধু তিক্ত, তধু ব্যর্থ, বিজ্ঞানায় নুতু কালো
অন্ধকারে ডুবে গিয়ে উদ্ভবর হাটাকারে রক্ত
হবো; আর তুমি কোন অবরুদ্ধ অন্ধকারে নদী
শোনায়ে শুধুই সেই চিরকদমী আশার প্রগলভ
অমিত স্বপ্নন গান, প্রাণের নেশায় তুমি যদি
উন্মাদ সাগর হও, আমি কি শুধুও রবো বেফনার নত ?

নবজীবন

প্রভাত বহু

ক'রে যায় মরা পাতা—বাক্ ক'রে।

প্রাণ—সে যে মরে নাক, গুঠে ত'রে।

গান যদি খেমে যায়—স্বর ভাগে।

তাই বেধি প্রাণে আঁক ঘোলা লাগে।

ঘোল থার আকাশেতে লগ্নু মেঘ;

ভাগে নদী করোলে কী আবেগ!

দিকে দিকে লাড়া পড়ে—ছুটে আর,

নব-যুগ ভোরে তোরা কে কোপায়।

স্বপ্নার স্বাক্তে তোরা গাখি গান,

বিলিরে দে নত প্রাণ অহুগাণ।

হের এই মরা ডাঙে—কিপলর,

লব্ধের অভিধান—কোথা তর ?

ইউরোপের চিঠি

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

বার্ণ, ২৫/৮/১২

কাল রাত প্রায় ১২টার আনহা ভেনেভাতে এসে পৌছাই। ইন্ডিয়ান এমবেলীর লোক উপস্থিত ছিল, তাদের গাড়ীতে করেই আমাদের বার্ন-এ নিয়ে আসে। ১০০ মাইল রাস্তা বেশ লাগছিল। সমস্ত দিনের স্থানি বেন ঠাণ্ডা হাওয়াতে উড়ে বাচ্ছিল। আমি ত গাড়ীতে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু বিধি হলো বাহ। প্রায় ৩০ মাইল বাকি থাকতে গাড়ী বিগড়ে গেল। জেনেরা থেকে বার্ন প্রায় পথ দিয়ে আসতে হয়; অর্থাৎ আমাদের প্রায় পথ নয় রাস্তা পাকা এবং তার সমস্ত রাস্তাতেই ইলেকট্রিক লাইট আছে। এমবাসি থেকে এসেছিল সুতি নামে একটি লোক; সে শু ড্রাইভার কতকটা পথ হেঁটে গিয়ে একটা গ্যারেজ পেল; সেখানকার লোকদের ডেকে তুলল। সেখান থেকে ফোন করে দিল বার্ন-এ। গ্যারেজের লোকেরা একটা গাড়ী নিয়ে আমাদের গাড়ীটা টেনে নিল এবং পরে ট্রিক করে দিল। ছোট্টেলে এলাম রাত ৩টার পূর্বে। ঐ সমস্ত সময় অল্প সন্ধ্যা নেমে হৈ চৈ করছে। আমি গাড়ীতে ঘুমিয়েছি, নামা উঠা করিনি। তবে টের পেয়েছি সবটাই, একটা ভ্রমাত্মক ভাব ছিল। তাতে মোটের উপর বিশ্রামের কাজ হয়েছে।

পথে এমনি ত কোন কষ্ট পাইনি; কেবল গ্লেন যখন নামে তখন বেশ ঝঁকুনি লাগছিল এবং এমনি নামা শুটা হয়েছে—করাচী, বগরা, বের্টল্ট, বোম এবং ভেনেভাতে। ঐ সময়টা একটু giddy লাগে। আর খারাপ সেখানে প্রচুর এবং বার বার বাতঝাতে। সমস্ত দিন বসে রইছি, অথচ গ্লেনে খাবার বিরুদ্ধে প্রচুর—বাড়ীতে যা খাই তার অন্তত তিনগুন। অবশ্য তার অর্ধেকই খাইনি। সাই প্রাস, বোড্‌স্, সেলপস্, এড্‌লি জারগা উপর থেকে যেতে একটি নৃতন শ্রেণি। undulating hills mountains—যেন পাহাড়ের তরঙ্গের গতি চলে

গিয়েছে। যাকে যাকে গাছ ও বন দেখেছি। কিন্তু Green Lands প্রায় দেখা যায়নি। আর দেখেছি নেপলস্ এবং তার পাশে ভিক্তোরস। পাহাড়ের উপরটা একটু ইঁা করা মুখের মতো। লহরটা ভিক্তোরস থেকে বেশ মানিকটা দূরে। তারপর রোম—Seven Hills দেখা যায়। এরোজ্জোনে আনহা তিন ঘণ্টার উপর ছিলাম। বহু formalities ছিল, তা বিটাতে সময় গেল—তা ছাড়া রোম লহর প্রায় ২৫ মাইল দূরে, তাই লহরে বাইনি।

১০টার সময় সেলস্ আরম্ভ হয়। তারপর এখানে এসে ১২টার সময় নাম দিই—কে কি বলব। Secretary General's report-এর উপর আমাকে আজ বলতে হয়, লাক এর পর Steno সংগ্রহ করে speech লিখে এইবার তা পড়ে কনফারেন্সে বসেই এটুকু লিখছি। বোধ হয় speech খুব খারাপ হয়নি। কাল আবার বলব—অথবা পরন্তু Parliamentary Control over Budget. কাজেই এই কয়দিন বেশ ব্যটেতে হবে। তারপর ত আছে Party—রোজই একাদিক।

বার্ণ, ৩০/৮/১২ পর্যন্ত

ছপুয়ে যখন Steno'র কাছে আজ বিকালের বক্তৃতা dictate করছিলাম তখন তোমার চিঠি এল। আমাকে ভাড়াভাড়ি বক্তৃতা type করিয়ে নিয়ে বলতে হবে এবং যে কোন সময় জাক পড়তে পারে।

এবার নিষেধ করাই লিখি। হয়ত সব শুনে একটু আনন্দ পাবে। আজ আমার ৩rd speech হল। General Secretary's Report নিয়ে General discussion-এ অংশ; Parliamentary Control over Budget এ বিতীয় এবং limitation of Sovereignty of Nation states এর উপর হল কুড়ীয়। ১ম speech এর পরে বার তিনে এসে congratulate করেছে। Second speech ত হল technical—ভাষাতত্ত্ব ২১০ জন

ভালই বলেছে; আদ্যকার speech দিয়ে বহু লোকের তারিক পেরেছি। Philippine delegation এর leader hand shake করে জিজ্ঞাসা করলেন, "I think you are a writer; are you not?" বললাম, "হ্যাঁ"। বললেন, কর্মদিন তোমার speech শুনেই অশ্রুমান করেছি, তুমি writer.

এপর্বক লেখার পূর্বে যেতে হল আসফ আলীর বাড়ী dinner খেতে এবং সেখান থেকেই যেতে হল Swiss Folklore Exhibition-এ। সঙ্গে ছিল Cocktail সে এক উৎকট কাজ, কিন্তু বলে থাকতেই হলো। না গেলে বা হঠাৎ চলে এলে নাকি তা noted হয় এবং ভ্রমভার বাইরে বলেও গণ্য হয়। তখুঁ সব শেষ না হতেই চলে এলাম ১১টার সময়। শ্রিঅ্যাংক আলী-ও ঐ সঙ্গে এলেন।

আজ ওটা থেকে বৃষ্টি চলেছে; খুব shower নয়— তবে বৃষ্টি মন্দ হচ্ছে না। এখন বোধ হয় পড়ছে না। আসফ আলী-জার গাড়ীতে হোটেলের নাম্বারে গিয়ে গেলেন। বৃষ্টি হওয়ার কলে হয়ত একটু ঠান্ডা পড়বে; তবে এখন ঘরে গরমই লাগছে। কাল ভোরে যাবো Swiss Federal Council কোষার Exhibition-এ নিয়ে যাবো এবং রাত্রে কিরব।

বার্ণ, ৩০/৮/৫২ থেকে ১০/৯/৫২ পর্যন্ত

এখানে শীত মোটেই নেই; কাল সারাদিন বৃষ্টি গিয়েছে; তার মধ্যে Excursion করেছি। কিন্তু তখুঁ শীত লাগে নি। শীত কাপড় পরোক্তনের চেয়ে অনেক বেশী আমার সঙ্গে এসেছে। কাল Excursion-এ গিয়েছিলাম; সে একটি অদ্ভুত ও চমৎকার অভিজ্ঞতা। তা পরে লিখব। সেখানে দুপুরে এক হোটেলের lunch হয়। Executive member এবং leaderদের বলতে গিয়েছিল President এর বড় table-এ, President-এর ডিক ডাইনে ছিলেন একটি Italian মহিলা—বয়স ৭০। তারপরেই আমি এবং তারপর ছিল একটি Swiss মহিলা। আর বয়স Swissটি করানী, ইংরেজী,

Spanish ও Portuguese জানে। এবং Italianটি ইতালিয়, ক্যান্সী ও ইংরেজী জানে। দুজনের সঙ্গে table-এ বসে অনেক কথা হল। গাড়ী, স্বাধীনতা, Communism এবং ভারতবর্ষ। বেশ হয় তাদের কাছে খুব আনাতী ব'লে প্রতীয়মান হইনি।

Conferance ত আজই প্রায় শেষ হল, কাল সামান্য কিছু আছে। এর মধ্যে Committee meeting কিছু হচ্ছে। আজ ছিল একটি। Indiaর পক্ষে আমি ভাতে ছিলাম। আমার প্রতিক্রিয়া তার resolution বলল করা হয় এবং Chairman পরে নতুন Draft করে আমার দেখিয়ে নিয়ে যান। বিষয় ছিল Economic development of the undeveloped Countries, তাতে Colombo plan, Truman's Point 42 Five Years plan signed between U. S. A. Japan and the Philippines এর উল্লেখ ছিল। আমি আপত্তি করে বলি either you should include India's Five years plan, Community development, Integrated plan for Cereals, Jute and Cotton or you should leave out all names তাই বীকৃত হয়। বলা একটা আছে। এর পূর্বের item ছিল autonomous peoples of the non-self Governing countries লম্বকে। তাতে আমি একটু out of point-এ গিয়ে বেশ জোর করে কটা কথা বলি, League of Nations and U. N. O. প্রকৃতি সব fail করেছে,..... League এর mandate লম্বকে Italy দাবী করছিল তার হাতে mandate খুব ভাল চলেছে। অদ্ভব আফ্রিকার ব্যাপারে ইউরোপীয় লোকদের পূর্ণ স্বেচ্ছা বোধ হক; এবং ইটালী তাতে অংশীদার হবে। আমি ভাতে আপত্তি করে অনেক পুরাণো কথার উল্লেখ করি। কি ভাবে যে mandatory system খার্ব হয়েছিল এবং এর অপব্যবহার এখনও চলেছে এর নতুনরূপে অর্থাৎ বর্তমানে U. N. Trusteeship

বাবার তার উল্লেখ করি। তাতে ঐ এম্ভাস চাপা পড়ে। Tunisia, Africa পাশে একটি Conservative Englishman ছিলেন। পরের এম্ভাসে Colombo plan, Truman's point 4, Japan, U. S. A. and Philipines 5 Years Plan প্রভৃতির উল্লেখ ওর ভাল লাগছিল না, কিন্তু U. S. A.র বিরুদ্ধে কথা বলতে-ও বোধ হয় সাহস হচ্ছিল না। বলছিল, "Why don't you move for its broadening by mention of F. A. O.?" আমি জবাব দিই নি। পরে আমার কথা বসি এবং সবাই তখন বলল হী, হয় সব নান হিতে হয়, নতুবা নান বিয়ে দরকার নেই।.....

দুপুরে Iran delegatesদের lunch বিল্য। রাতে বার্বী, কিলিপাইন এবং আমবা (একই হোটেলের আছি) এক tableএ থাব এবং Siam delegatesদের dinner দিচ্ছি। Pak delegatesদের কাল dinner হয় নি; সে অনেক কথা, বেচারি আলি আকবল হয়ত একটু অপগত হয়েছে।

বার্ণ ৩১/১২

এক.....admirer জুটেছে। আনন্দমোহন বস্তুর ছোট ছেলে, ১১ বছর বয়স, কিন্তু দেখতে তা মনে হয় না, Physics এর tritos, রবীন্দ্রনাথ ইংরেজীতে অনুবাদ করেছে। বলাকা ও মহারার অনুবাদ নাকি Wisdom of the East seriesএ ওর অনুবাদ accept করেছে। Publish করবে। দুদিন রাত ১২টা পর্যন্ত বকিরেছে। আজও দুপুরে আমার অধুপস্থিতিতে নীচে থেকে চাষি নিয়ে আমার গর খুলে বসে আমার বাংলা বই পড়েছে। আমাকে নিয়ে সে প্রায় উদ্ভত হয়েছে। আর একটি আজ পেলোব Legationএ কাজ করে বিনয় সরকারের বেয়ে। আজ Legationএ গিয়েছিলাম। ওকে দেখে একটু আলাপ করলাম। আমি ইংরেজীতে, আর সে

বাংলার আলাপ করতে লাগল, পরে বলল, বাগার এসে আমার সংগে দেখা করতে চায়। আমি হাতে ৮টা সময় দিলাম, আজ আমার Legation এর ৪টি কর্মচারীকে dinnerএ নিমন্ত্রণ করেছিলাম, তাহলেও বললাম। এসেছিল। বাবার কথা আলোচনা করতে ভালবাসে, বাঙালী মেয়ের মত শাড়ী পরে। বাংলার সিরে যেতে চায়, ওর দাঙ এখানে, একটু কষ্টেই আছে। চুপ হল, বাংলা বই পড়তে চায়। একখানা "জীবনের বসন্ত" দিলাম। আসক আলী ২১৩ ঘণ্টা আলাপ করতও ছাড়তে চায় না। মাঝে মাঝে.....reference করার এমন একটু ভ্রম করে। একাকী আছে, হয়ত আমারের পেয়ে একটু সহজ ভাবে গল্প করারও কথা বলার সুযোগ পায়।

আজ আমক আলীর ওখানে lunch খেয়ে watch factoryতে বাই। এখানে থেকে প্রায় ৫০ মাইল দূরে একটা স্থানে। গ্রামই বলা যায়। কিন্তু সবই কি পরিভার। সর্বত্র Electricity আছে। Electric toly Bus পথও আছে। Watch factoryতে কার্যত assembly করা হয়। অধিকাংশই Precision machine tools factoryতে। খুব লজা বাড়ি।

কো-অর-মর্জো ৩১/১২

এখন রাত ১১টা। বার বার মনে হচ্ছে—আজ এই সময় ছুটি সংগে থাকলে কত আনন্দ হত। এ একটা দেখার মত দৃশ্য। চারটার সময় বার্বী থেকে motorএ রওনা হই। প্রায় সাড়ে ছয়টার এখানে আসি। এমন এঘটা motor ride খুব কয়েই হতে পারে। বার্বী থেকে অনেকটা প্রেবনে নেমে এলাম। তারপর আবার উঠতে শুরু করলাম—ট্রিক Lake of geneva'র গা বেয়ে। এই হ্রদটার পাড় ঘেঁষে বেটিক রাজ্য। খুব প্রমত্ত নয় মার স্থানে একটু একটু করে বাড়িয়েছে। সমস্ত রাজ্যটা একটা অস্বস্ত দৃশ্য। Alps এর উপর দিয়ে বার্বী থেকে নেমে উপত্যকার (Velleয়তে) এলাম। দুপাশে চাষের ক্ষেত।

পথটা প্রকৃতই প্রায় অকল। কিন্তু সেখানে লোকের
বসতি আছে। সেখানে কাঁচের আনালা লাগানো
Show room সমেত ভাল ভাল দোকান ও টোর।
এমনকি কলের দোকানগুলিও এমনি সাজানো এবং
পরিষ্কার। এই কয়দিনে কম ভাড়াগা ঘুরিনি। কাল
ট্রিক উন্টা পথ দিয়ে Watch factoryতে ৪০৫৫ বাইল
motorএ গিয়েছিলাম। আজ এলাম ৮০ বাইল।
গত রবিবার ৩১শে excursionএ গিয়েছিলাম;
সেদিনও train ও launchএ অনেকটা স্থান বেখেছি।
কোথাও বৈজ, জুঁড়ে ঘর, বোংবা, প্রকৃতি দেখলাম
না। বন (forest) বেখেছি; কিন্তু অকল দেখিনি।
পাখাড়ের গায়ে grazing ground; তাও যেন grass
Cutter দিয়ে কেটে রেখেছে বলে ভুল হবে। এখানে
আসতেই এদের 3rd Man গাড়ীর বরফা খুলে
আমার বাড়িরে ধরল—আর আমরা এক Snap হল।
তখন এক লতা বলছিল; আমাদের সেখানে নিয়ে
গেল; বিশিষ্ট স্থানে প্রথম বসাল। ফরাসীতে
বক্তৃতা ও ইংরেজীতে তরজমা ইচ্ছা; তা আসতে
প্রথম সারিতে করেতখানা আলো চোরাই ছিল।
আমাদের নিয়ে তাকে বসাল। তারপর প্রথমে
আমাদের অভ্যর্থনার জন্য ১০।১২টি ঘেরেও ৪।৭টি
ছেলে—Song of the Orient chorus গান করল।
তারপর প্রথমে আমাকে সভার লাইনে introduce
করল—সেই 3rd. Man of the organisation
আমাকে এবং তারপর আমি আর লম্বাইকে introduce
করলাম এবং দ্বন্দ্ববাদ নিতে গিয়ে ৪।৭ মিনিট একটু
বললাম।

এর পর নিয়ে এল ৫ তলায় একটা বেশ বড় One
Seated কক্ষে। এটা একটা প্রকাণ্ড বাড়ী—পাখাড়ের
উপর। একটুকু থেকে মাটির দীর্ঘ ও তলা, অপরদিক
থেকে এক তলা হ'ল ট্রিক পাখাড়ের গার। এবং এই
৫ তলায় উপরেও আরো আছে। ঘরে বসিয়ে দিয়েই
বলল, Frank Buchman (1st Man Founder)

has invited you for dinner. ৭৪ টার খেতে গেলাম
Buchman অবস্ত খাবার শুধানে আনেন নি। কাল
নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। এর পর হ'ল
এদের film, সেখানেও আমাদের জন্য বিশিষ্ট স্থান।
তিনটি documentary দেখাল। প্রত্যেকটার পর
একজন এসে পিরানো বাকালো। একটা Buch
বাকাল আর ২০টা কি বাকালো ট্রিক ফুলগাম না।
আমার ঘরটা একেবারে Lake of Geneva'র উপরে।
ঘরের সংগে একটা ছোট hanging portico আছে।
তাতে বসে Lake-এর পোতা দেখা যায়। একটিকে
উঁচু পাখাড় আর তিন দিকেই সব Health resort,
Lausanne, Montreux প্রকৃতি সহর। আলোর
মালা সহরটার তিনদিক ঘিরে রেখেছে। এখানে কয়েক
দিন থাকলে শরীর ও স্বাস্থ্য ভাল হ'তে বাধ্য। আমি
তিরোনা বাব না পূর্বেই ট্রিক করেছিলাম। তাই সে
কয়দিন এখানেই থাকব। স্থান যাহাওয়া ছাড়া এখানে
বিভিন্ন দেশের বহু লোক আছে, তাদের সংগে একটু
আলাপ ও contact করতেও চাই। তাছাড়া এই
Organisation টাও একটু বুঝতে চাই। তাবলি ৯ই
তারিখ পর্যন্ত থাকব।

কো-মুনিস্ট ৭/১২/৪২

আজ একজন খুব interesting লোকের সংগে
আলাপ হ'ল through interpreter। কাল এঁদের
meeting ছিল, ইনি বলেন, তারপরে আমিই এর
সংগে আলাপ করার জন্য ব্যবস্থা করতে বলি। ইনি
একজন French Communist এবং বক্তৃতার মধ্যে
নিজেই Communist ও Marxist বসেই পরিচয়
দেন। কাল বক্তৃতার এর কাহিনী বা বলছিলেন তা
একটু বেশ নূতন রকমের। সমস্ত কথার মধ্যে একটা
আন্তরিকতা ছিল। বক্তৃতার বলেছিলেন, আজ একসঙ্গে
lunch খাবার সময়ও বলছিলেন, he is the illegiti-
mate son of his mother। ওর যে জনক, সে থাকে
পরিত্যাগ করে বাধে, না ওকে কেলে চলে যায়। অথবা

যা: বিয়ে করে অক্সফোর্ড যায়। তার এই নতুন গৃহের নতুন
স্বামীর সংগে ওর খাকা সজ্জা হয় না, রাগাধাটে বুকে
অতি ছোট কাজ করে কোন রকমে বেঁচে থাকে এবং
বড় হয়। একটু লেখাপড়ার মধ্যে; ব্যাংকে কাজ নিতে
যায় কিন্তু because of his birth তা হ'ল না। বাকি
পরে সে ঠাড়িয়ে যায়। এক তরুণীর বিয়ে করে,
অর্থাৎ bourgeois যের, কিন্তু ওর labour work জী
পছন্দ করত না। তাই প্রায় separation এর অবস্থায়
এল। Facistদের meeting এ তাদের বিরুদ্ধে বক্তৃতা
দিয়ে মার খায়, যেহেতু তারা বর থেকে ভকে বাইরে
কেলে দেয়। তার পরে এল German Occupation.
underground এবং তার আত্মসংগীত হৃৎকম্প
জীবন। তারপর কমিউনিষ্টদের হাতে মার খায়।
accident হয়, কাগজে report বের হয়, মারা গিয়েছে।
আমার আত্ম বলছিল—“কেমন মজা, হৃৎপাতালে গুলে
কাগজে গড়ছি—আমি মারা গিয়েছি।

তারপরে এল M. R. A.'র আক্রমণ। এদের প্রথম
কথাই হলো “বিষেব বিষ মাপ”। এ প্রথমে তার জীকে
কথা করল—তার কাছে অপরাধ আঁকার করে ভাব
করাল এবং তারা এখন এক happy couple। তার পর
একদিন তাকে চিঠি দিল It was wrong in his past
to sit on judgement over her. তারপরে মার
সংগে বেথা করতে গেল; মার বাবী—যে ভকে অসহায়
অবস্থায় তাকিয়ে দিয়েছিল ভকে বলল, “Won't you
kiss me?” আমার আত্ম বলছিল—খুব বিগা হ'ল—
তবে একটু পরে তাকেও কথা করল। তবে সে এখনও
Marxist—বলল, History is in its march, none
can stop its progress. If anyone complacently
thinks, he can, it would be foolish on his part.”
প্রথমেই আমার জীবন ও রাজনীতি সশঙ্কে তুলতে
চাইল। আমার কথা লব তুলে বলে, “তোমার এই
Revolutionary life এর কাছে আমার কাহিনী বলার
বত নয়...” আমি বললাম, “আমারটা self imposed

আমি এতে আনন্দ পেয়েছি, নইলে চার বাহু ভূষিত হতো
না। কিন্তু তোমার political sufferingটা হয়ত আমার
চেয়ে কম, কিন্তু because of your birth যে সামাজিক
নির্ণাতন ভূগেছে তার তুলনা কোবার্ট? একটা পা
ভেঙ্গে গিয়েছে। এখনো চোপে বুধে অনেকটা জীবন
চাটাজির ভাব আছে। এখনকার লোকেরা বলল—
“গত কয় মাসে অনেকটা শান্ত এবং সুস্থ হয়েছে।”

আমার মেল কাহিনী এবং আমি যে এসব সব্বো
ইংরাজের প্রতি কোন bitterness পোষণ করি না,
এটা আমার বিশ্বাসের বিষয়। তাছাড়া বোধ হয় আমার
সংগে আলাপ করে একটা intellectual বলে আমার
মনে করে। অনেক দেশ এবং General Political &
Historical development সশঙ্কে একটা পল্লবপ্রাণী
বিভার পরিচয় দিতে পারি বা এর অনেকই expect
করে না। আর বিকাশে আলাপ হ'ল oxford এর
Theology'র অধ্যাপক এক বুড়ো ভক্তলোকের সংগে।
তিনি oxford-এ এসেছেন বাবেন না; তাই আমার
reference দিয়ে দিতে চাচ্ছেন। Ronald wilson
নামে একটি লোকের সংগে খুব আলাপ হ'ল। বেশ
intelligent & well read, বিলাতে গে তার বাড়িতে
থাকার নিয়ম দিয়েছে এবং Dr. Buchman বলে
পাঠিয়েছেন Germany, France & England-এ
M. R. A.ই আমার থাকার সব ব্যবস্থা করতে পারলে
সুখী হবেন। অবশ্য এঁদের এখানেও কিছু খবর দিতে
হবে। As you please & as you can. আর
সম্ভার পর আমার খাবার ঘরে দিয়ে গেল Denmark-এর
Foreign Minister-এর ছেলে। বাবা, মা, ছেলে
সবাই M. R. A.'র ভক্ত। মা ২০ দিন হ'ল এখান
থেকে গিয়েছেন। সাধারণতঃ ঘরে খাবার দেবার নিয়ম
নেই; তবে আবার breakfast ও dinnerটা ঘরে
দিয়ে যায়। lunch ও tea নীচে দিয়ে বাই। Chief
Parliamentary correspondent of the Times
সঙ্গীক এখানে আছেন। আর একটি লোকের সংগে

একটু ভাল বকর তাব হচ্ছে, একটি Swiss ex-professor এবং এখন এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা। আমি এঁদের সংগে খুব Theoretical আলোচনা করি। এবং কিছু কিছু বাও দিচ্ছি, তুমি এখানে এলে খুব ভাল হ'ত, গাভীকে এখানে explain করার দরকার আছে। It has become a force, জাপান, স্ত্রী এবং তক্ত।

Germanyতে বেশ প্রভাব আছে। ইংলও ও আমেরিকাতে প্রভাব বাড়ছে।

এখন রাত ১১টা; এবার শেখ করি। কাল একটু পাঠাতে বাখার ইচ্ছা আছে। যেম ছিল বলে আজ যাওয়া হয় নি। কত কথা লিখতে ইচ্ছে হয় কিছু চিঠিতে তা শেষ হয় না।

শারদীর সাহিত্যের গল্প ও ছোটগল্প

ত্রিশস্তোবছর গল্পোপাখ্যান

১০ ছোটগল্প একটি আনন্দকাল কথা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আকারে ও প্রকারে যে সব রচনাকে উপন্যাস বলা চলে না, তারই সাধারণ অভিধান হলো ছোটগল্প। কিন্তু মৌলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে উপন্যাসও বলা চলে না অথচ ছোটগল্পের সীমা অতিক্রম করে গেছে—এমন সব রচনাকে গল্প বা বড়গল্প সংজ্ঞাতেই চিহ্নিত করা বাছনীয়।

শারদীর সাহিত্যের আসরে সাধারণত গল্পেরই প্রাধান্য—তার মধ্যে বড়গল্পের সংখ্যা সত্তাবতই কম থাকে, ছোটগল্পের সংখ্যাতিকাই ঐতিহ্য-সম্মত। ক্রম-বর্ধমান পত্র-পত্রিকার আয়োজন ও প্রয়োজনের ভাগিদে বা অল্পপ্রেরণার আনন্দের দেশের শরৎকালটা বাংলা কথাসাহিত্যের 'স্মৃতি সিন্ধু' বা 'কুহুনের বাস'-রূপেই গণ্য হতে চলেছে। উপন্যাস সম্পর্কে অবজ্ঞা করাটা প্রযোজ্য নয়, কারণ লবঙ্গসরের তুলনায় শারদীর সাহিত্যে প্রকাশিত উপন্যাসের সংখ্যা খুবই নগণ্য এবং যে ছাঁচার-খানার প্রকাশ ঘটে, তাও অনেকক্ষেত্রে ত্যাগহীন করে দায়-সারা গোছ দেখা এবং সেইঅন্তেই সূত্রকাণ্ডের মুদ্রণের পূর্বে অধিকাংশ রচনারই পরিবর্তন ও পরিমার্জন একান্ত আবশ্যিক বলে মনে হয়। কিন্তু গল্প-সাহিত্যের একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য অংশ যে বর্তমানে শারদীর

উৎসব-সমারোহের অর্ধা-উপচার হিসেবেই রচিত হয়, এলম্বৎ রিমত্তের অবতারণা নেই। তাই প্রতিবৎসরের শারদীর সাহিত্য-সম্ভার পর্বালোচনার একটা সার্বজন্য আছে—একথা গল্প ও ছোটগল্পের ক্ষেত্রে বিশেষভাবেই সত্য।

শারদীর পত্র-পত্রিকার সংখ্যাবিক্যের কল্যাণে, এবারের অক্স গল্পের প্রাচীর পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্য ও রসোন্মুলতার অভাবে সামগ্রিকভাবে এবারকার শারদীর গল্পসম্ভার সাহিত্য-রসিক পাঠক-সমাজকে তৃপ্ত ও আনন্দিত করতে পারেনি। শুধু এয়েই মধ্যে বাংলা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট যুগ-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হয়ে উঠেছে, সে কথা অব্যাকার করা চলে না। বর্তমানকালের অসংখ্য-সমস্তা-জর্জরিত বৃহত্তর পাঠক-সাধারণের মনে যে নতুন সাহিত্য-চেতনার উদ্গম ঘটেছে—সেই নবলব্ধ সমাজ-সচেতন বাস্তবধর্মী সাহিত্য-রসবোধের দাবী ও প্রত্যাশা পূরণে অধিকাংশ লক্ষ্যভিত্তি সাহিত্যিকই এবার শোচনীয় অক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। অপরদিকে, বাস্তব জীবনবোধের আদর্শে উদ্ভূত নবীন সাহিত্যিকদের রচনাতে শুধু জীবনানুগ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিবরণিত প্রত্যঙ্গমূল্যের নতুন স্বরস্বাদভূতির প্রকাশই নয়—সঙ্গর-সংবেদ গভীর রসাত্মকতার পরিচয়ও পূর্বাপেক্ষা বেশি পরিমাপেই পাওয়া গেছে।

সাহিত্য সম্পর্কে সুপরিচয় নতুন স্বেচ্ছাধীন কবেই ব্যাপকতার স্বীকৃতি লাভ করছে পাঠকদের মনে এবং বাস্তব-বিশুদ্ধ সাহিত্যিকদের সৃষ্টি-কর্মতা দ্বিগুণিত সৃজনশীলতার সঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তববাহী সাহিত্যিকদের অভ্যুদয়ের লগ্ন সুনিশ্চিত সম্ভাবনার অকণালোকে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে—শারদীর সাহিত্যে এই রূপ-লক্ষণেরই প্রকাশ দেখে আশঙ্ক ও আশাবিহিত হয়েছি।

এবার বড়গল লিখেছেন 'বাহী'র সাহিত্যিক—ভারতবর্ষের বহুগোপাখ্যায় ও স্রীমৎপ্রজ্ঞান দ্বিত্য। 'অপভ্রমণ সূত্র্য' (জনসেবক) গল্পে ভারতবর্ষবাসী বুদ্ধ-কালীন নৈতিক অধঃপতন ও সাম্প্রদায়িক দ্বাষ্ট্যের বীভৎসতার পটভূমিকায় সামাজিক বিকৃতির কবলে লাহিত্য এক রূপহীন নারীর কল্পন জীবনালেখ্য চিত্রিত করেছেন। পটভূমির নবত্বাধারে যে অসহ্য ভরপূর্ণ নারী-বর্ণনা চিত্র-বিচিত্র হয়ে গেল, তার বোগ-জীর্ণ বিকৃত জীবনেও প্রেমোচ্ছ্বাসের উন্মেষ এবং পরিণামে প্রেমোন্মাদের অবহেলায় চরম হত্যার কলে আত্মহত্যা—এই হলো কাহিনী। তবু করুণা, হত্যাতা ও দীর্ঘবাসে ভরা গল্প—বর্ণিত চিত্রটি বেন ভাগ্যের জীড়নক ছাড়া কিছুই নয়, তাই বিকারগ্রস্ত সমাজের পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে লেখকেরও কোন মানসিক প্রতিক্রিয়ার নিবর্ণন কোথাও নেই—নিপুণীতা নারীর রূপহীনতাকেই তার বার্ষ-জীবন ও অপমৃত্যুর জন্য দায়ী করে লেখক কেবল অক্ষুণ্ণ সন্থনকার হাততাপ করেছেন। তাড়াহুড়ো আঙ্গিকের দিক থেকেও গল্পটিতে ত্রুটি আছে—কাহিনীর শেষাংশ সম্পূর্ণরূপেই পাঞ্জাবী বৃত্তীর অবলম্বনে বর্ণিত হওয়ার অনেক কারণের স্বাভাবিকতায় হানি ঘটেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, শারদীর আসরে এবার ভারতবর্ষবাসী এই একটিনায়ে গল্প ছাড়া আর কিছুই লেখেন নি।

স্রীমৎপ্রজ্ঞান দ্বিত্য দু'টি বড় গল্প লিখেছেন—'বাহী' (জনসেবক) এবং 'বিলম্বিত লগ্ন' (বেশ)। বড় গল্প রচনার নবনবায়ু কুশলী শিল্পী—তার সে কৃতিত্ব তিনি

অক্লান্ত রূপেই পেয়েছেন। 'বাহী' গল্পটি এক স্বল্পবর্ণিত সাহিত্যিকের জীবন-চিত্র। সম্ভ্র-সমাজের পশ্চাত্তর দীর্ঘ বংশজাত একটি বহু প্রাণ কীভাবে উত্তরতর জীবনানন্দের পূজারী হয়ে প্রতিস্থল পারিপার্শ্বিকতার মধ্যেও অবনতি নিতার পথটির বিপ্রে কাশাত্মক রোগের কবলে অকালমৃত্যু বরণ করলে—তারই গল্প দু'বার কাহিনীটি মনস্তা-মিষ্ট অস্তরত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। 'বিলম্বিত লগ্ন' গল্পটি দুই শিল্পীর দাম্পত্য-জীবনের প্রতিক্রিয়া। প্রেমের বিবাহের পরে চিত্রশিল্পী স্বামী ও গীতশিল্পী স্ত্রীর আত্মকেন্দ্রিক নিঃসর্গের বিরোধ ও অসহিষ্ণুতার চরম পর্যায়ে বিবাহ-বিচ্ছেদ এবং পরিণামে বহু বিভ্রান্তির বাস্তব প্রতিক্রিয়ায় কত-বিস্তৃত ক্ষণের তাদের পুনর্মিলনের কাহিনী প্রকাশ-কল্পনায় চমৎকারিত্বের সঙ্গেও বর্ণিত হয়েছে। নীতিগত মানদণ্ডের নিষ্ঠার চোখের চিত্রিতা নির্ণয়ের নবনবায়ু ছন্দোবহিক ভাবে উদারপন্থী—আলোচ্য গল্পেও তার সেই সমাজ-বিপর্যায়ক অননুভূতি অক্লান্ত ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। 'বিলম্বিত লগ্ন' নামটির দু'টি স্বাক্ষর ভাবপূর্ণময়। শিল্পী দম্পতির দ্বন্দ্বের শেষের পাশাপাশি তাদের শিল্প-সাধনা ও শিল্প-সৃষ্টির দিকটিও স্পষ্টভাবে অঙ্কিত হলে—এই কাহিনী একটি সার্থক উপন্যাসে রূপান্তরিত হতে পারে।

ছোটগল্পের আলোচনা বিষয়-বস্তুর বৈচিত্র্যে অল্পমাত্রায় হওয়াই স্বীকৃত, কিন্তু বহুসংখ্যক লেখকের বিভিন্ন ধরণের রচনার পর্যালোচনা বিষয়াত্মক ভাবে করতে গেলেই প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। তাই বর্তমান ক্ষেত্রে লেখকাত্মক আলোচনাই সুবিধাজনক।

স্রীমৎপ্রজ্ঞান দ্বিত্য গল্প লিখেছেন, কিন্তু সবগুলি গল্পই বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য ও অস্বাভাবিকতার আড়ল। 'রূপোষ্ঠাকল্পের ভিতা'তে (অনন্যবাজার)—বধ্যবৃত্তীর সংস্কারের সমাজ পরিবেশের রোমন্থন; 'অনিকের' (বেশ) গল্পে—বহানগরীর অভিজাত পাড়ার কৃত্রিম পারিপার্শ্বিকতার রূপগর্ভী কল্পিত দম্পতির সম্ভ্র-বিত্তিক; অনিত অস্তরত্বের অব্যক্ত মনোবিশ্বল

এবং 'আত্মজা' (অনুসন্ধান) গল্প—শ্রীচন্দ্র বসু, বনী গল্পটির মনে নিজেদের ঐক্য-ভাঙা কল্পিত হিতার্থে আশ্রয়ণ আশ্রিত। শান্তি-কল্পিত প্রতি দীর্ঘ ও বিচ্ছেদের নাটকীয় ইতিবৃত্ত—সব কিছুই মধ্যেই লেখকের জীবন-বিশ্বস্তা ও করনা সর্বসত্যের স্মৃতি স্বাক্ষর দেখতে পাওয়া যায়।

ঐশ্বর্যবাহুসার সাপ্তাহিক এবার শারদীয় গল্পের আসরে একেবারেই অগ্রসর। 'বনজল' কয়েকটি অগাঠ্য গল্প নিয়েছেন, যুগান্ত, দেশ ও আনন্দবাজার পত্রিকার।

ঐশ্বর্যবাহুসার 'চৌপ' (সচিত্র ভারত) এবং 'গল্পমুক' শরীর 'আত্মজীবনী'তেও (শনিবারের চিঠি) আত্মকথিত ও ছায়াবাসিনীর নিদর্শন ছাড়া, লভ্যতার বুদ্ধিগত স্নিকভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি। ঐশ্বর্যবাহুসার বনী তাঁর 'নিম্নক' (দেশ) ও 'স্বপ্নাঙ্গ কাহিনী'তে (যুগান্ত) রহস্য বোঝার তৌলিক অগতের স্বপ্নকে ওকালতি করে হাজাংশ হতেছেন। তাঁর 'লতীন' (আনন্দ-বাজার) গল্পেও—একনিষ্ঠ পত্র-প্রেমিক যুগের বিতীষা তাঁর বকলমে প্রথম ব্রীকে তাগবাসার কাহিনীর মধ্যে বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব আছে। স্বপ্নস্বাক্ষর রচনা হিসেবে 'বাকীকরণ' (সচিত্র ভারত) গল্পটিও সার্থক হয় নি। কিন্তু তাঁর 'অগবন্ধর মোহমুক্তি' (অনুসন্ধান) গল্পটিতে—সংবাদপত্র-অফিসের অগবন্ধ বটন-পট্টাবলী পত্রের অগার বহিবার কথা স্বপ্নের প্রোবন্ধ ভগ্নিতে ব্যক্ত হয়েছে। ভট্ট করনার উদ্ভট অগৎ থেকে বর্ডমান কালের ঐশ্বর্যবাহুসার অগতে সেবে এসেছিলেন বলেই, সেবাক পত্রটিতে লেখক প্রাণশরীর কৃত্তিদের পরিচয় দিতে পেরেছেন।

ঐশ্বর্যবাহুসার 'স্বপ্নাঙ্গ কাহিনী' (দেশ) গল্পে, অলৌকিকের রহস্য কীর্ত্তন প্র, না, বি, র উপরেও টেকা দিরেছেন। 'ভোক্ত-বিকোক্ত' (যুগান্ত) গল্পেও তিনি বনী অগিদারের একাধিক বিবাহের খোলালপনাঃ সাক্ষী নেওয়া ছাড়া আর কিছুই করেননি। ঐশ্বর্যবাহুসার স্বপ্নের স্বাক্ষর 'অগবন্ধর মোহমুক্তি' (দেশ) গল্পটিও নীরলভ্য

সেবে সম্পূর্ণরূপেই ব্যর্থ। ঐশ্বর্যবাহুসার একটিমাত্র গল্পই লিখেছেন, যার বিবরণ হলো—কুসুর গোবীর বিড়ম্বনাকে কেন্দ্র করে যুগান্ত কুসুরের প্রতি বনীরের দুর্ভাগ্যের 'দীর্ঘ' (দেশ)। রচনা-তত্ত্ব যুগই বনোক্ত হওয়া সত্ত্বেও, অত্যন্ত দৈর্ঘ্য-ভারাক্রান্ত হওয়ার গল্পটির লিখন বাধুগ অনেকাংশে ভুল হয়েছে। ঐশ্বর্যবাহুসার স্বপ্নের স্বপ্নাঙ্গ কাহিনীর বক্তার বান্দ্যবাহুসার নিয়ে একটি গল্প লিখেছেন, কিন্তু তার মধ্যে লেখকের বনোক্তগতের যথোচিত 'বিশবর্জন' (যুগান্ত) অত্যন্তই শোচনীয় তাবে প্রকট হয়ে উঠেছে।

স্বপ্ন-রচনার বক 'প্রবন্ধবাহুসার' (দেশ) স্বাক্ষর ওকালতি অগার প্রভাব বিকর্ষ হয়েছে, তাঁর 'স্বপ্ন ভাঙারের পেশেন্ট' (আনন্দ-বাজার) ও 'রটকীস্বপ্ন' (দেশ) গল্প দুটিতে। প্রথম গল্পে, অগিত-প্রাঙ্গণের মোহমুক্ততা ও অলৌকিক পত্রিতে বিশ্বাসপ্রবণতা সম্পর্কে সঙ্গ ব্যাক এবং দ্বিতীয় গল্পে, অগিতমাত্র সমাধের অগদ্য ভরনার বিবাহ প্রক্টোর পাত্রীর গুণগনা কাহিরের অগদ্য 'প্রবন্ধ-বাহুসার' প্রতি ব্যাক কণাখাত যুগই উপভোগ্য হয়েছে। কিন্তু তাঁর অগার একটি গল্প 'বদন চৌধুরীর পোকগতা' (সচিত্র ভারত) অত্যন্ত সাধারণ ভরের রচনা।

ঐশ্বর্যবাহুসার 'স্বপ্নাঙ্গ কাহিনী' (দেশ) গল্পটি এবার বড নিম্নস্ত বনে হয়েছে। তাঁর কোন গল্পই তেমন কৃত্তিগারক নয়, তারই মধ্যে 'নন ও মানসিক' (আনন্দ-বাজার) 'দুর্ভাগ্য' (দেশ) এবং 'প্রাণেচার' (সচিত্র ভারত) কোন-রকমে উল্লেখযোগ্য। ঐশ্বর্যবাহুসার গোবীর স্বপ্ন-রচনা গল্পটিও (যুগান্ত ও চকুফোণ) একেবারেই অচল। স্পষ্টই বোঝা যায়, অগিকাংশ প্রবীণ লেখকদের মতো প্রবন্ধের রচনার ভাঙার নিঃসেব হয়ে এসেছে।

ঐশ্বর্যবাহুসার লেখাতত্ত্ব এবার বেন ভ'টার টানই খোরাগো হয়ে দেখা দিয়েছে। বিশস্ত বাংলার মর্দ-বেধনা সম্প্রকিত মানসিক আবহমানপূর্ণ বিবরণ নিয়েও তিনি 'শীবাঙ্গ' (দেশ) গল্পটিকে উদরগ্রাসী করে তুলতে পারেন নি। 'অগবন্ধর মোহমুক্তি' (আনন্দ-বাজার) গল্পটি প্রকাশ-

ভিন্ন দিক থেকে চিত্তাকর্ষক হলেও, বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে কষ্ট-করনার চাপ আছে। ওগুলির চেয়ে বরং—বিপ্লব-যুগের সহকারী গোয়েন্দা বিভাগের গুলচর 'মনস্কান' এর সুশাস্ত্র) তেতি কাহিনীটি মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। সমগ্রগ্রন্থের চরিত্র-চিত্রণ হিসেবে 'শখিনী' (গভিষ্ঠ তারত) গল্পটি আভিনব-হুই হলেও উপভোগ্য মনে হয়েছে।

শ্রীমণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীও যে ক্রমশই তিনিত-বীর্ষ হয়ে আসছে—এবারকার শারদীয় সাহিত্য-আনন্দের অধিকাংশ গল্পেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। আগতিপর্ষী বিষয়বস্তুর অভাব নেই, কিন্তু একাধ-কুললতার দৈর্ঘ্য আর সর্বত্রই পাঠক-চিত্তে হতাশার সঞ্চার করেছে। গণ-আন্দোলনের স্বার্থে অধর্মবাহী সন্নীত-শিল্পী'র (পরিচর) ব্যক্তিগত অবলম্বন-বোধের বিসর্জন; বক্তৃ-বাসিনী উদাত্ত যুবতী 'স্বাভার' (চক্ৰচোণ) সন্তান-সহ তিক্তাত্তি এবং বেকার,স্বামীর জৌবুতিগ্রহণ; অনাহারের জ্বালায় আত্মহত্যা। বা. বেহ-বিক্রয়ের পরিবর্তে 'গেরো' (হুগলজ) চাখা বোএর খেটে-খাওয়ার মপণ ও অনিশ্চয়ের সূঁকি নিয়ে গ্রাম ছেড়ে শহরের পথে যাত্রা—এই সব কাহিনীর কোনটাই বেন গল্পের মাধ্যমে সর্বাসীন সার্বভ্যার রসোজীর্ঘ হয়ে উঠতে পারে নি। 'মীমাংসা' (মপ) গল্পটিও আধর্মবোধের তিক্তিতে বর্ণিত চলনসই পর্ষারের এক প্রয়োপাধ্যান মাত্র। 'এদিক-ওদিক' (সত্যযুগ) গল্পটি বরং অনেকাংশে স্কলতার দ্বাবী করতে পারে—ভারণ, সামাজিক ভারনের দুখে দাঁড়িয়ে নিরমব্যক্তি শ্রেণীকে ভব্যকগিত ভ্রত্বতা ও সৌভ্রত্বকর বোধজাল ছির করে ত্রিক শ্রেণীর সংবন্ধ প্রতিরোধ-ভেতনায় উদ্বুদ্ধ করে তোলায় প্রয়োজনীয়তা, এই গল্পে সাহিত্যধর্মী ইঙ্গিতমহ-তার মধ্যেই অতিব্যাক হয়েছে। 'মরতে পারবো না' (ব্যব্যিক্ত), 'কোন দিকে?' (বহুমতী) প্রাভূতি গল্পগুলি বধ্যবিত্ত পরিবারের ভারনের ভবি হলেও রসাত্মকতার অভাবে ব্যর্থ হয়েছে। 'জিকংগা' (গভিষ্ঠ তারত) গল্পটিও একান্তভাবেই ক্লান্তিমতা-হুই। 'দুরি-চাখারি' (হতীপজ)

গল্পটি অবশ্র দারিত্র-লাহিত নিরমব্যক্তি সংসারের একটি সুন্দর ও স্বাভাবিক বক্তিত্তি।

শ্রীঅমরেন্দ্র বোয়ের 'বৈরাগী' (বহুমতী) গল্পটিতে হৃৎকোর পটভূমিকার চাবী ভরুণ-ভরুণীর ব্যর্থ প্রণয়ের কাহিনী হুইভাবেই বর্ণিত হয়েছে। তাঁর 'মা' (শনিবারের চিঠি) গল্পেও—গ্রাম্য পরিবেশে এক অতিভাবকহীন কুবক-কভার প্রণর ও বাৎসল্যের কাহিনীটি প্রকাশভক্তির দাপুর্ষের ভ্রত প্রণসার যোগ্য। কিন্তু 'বিনতির সংসার' (মধ্যবিত্ত) গল্পে, শিশুর পুতুল খেলার বরত্বের তিত্তা-ভাবনার অতিক্রিয়া অত্যন্ত অব্যক্ত ও বিশদুপ মনে মনে হয়েছে। 'কংকা' (হুগলজ) গল্পেও, কোনোজী ভ্রাতৃপণের মেয়ের সঙ্গে অজুৎ ভীলের ছেলের প্রণয়োপাধ্যান রসোজীর্ঘতার সার্বক হতে পারে নি।

শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পগুলিতেও এবার আশাত্তরুপ ত্রুপি পাওয়া গেল না। তাঁর 'খেত-করল' (হুগলজ) গল্পটিতে—দারিত্র্যের পাশাপ-চাপে নিপেবিত্ত জাত-জীবনের ব্যর্থতার ইতিহাস উদ্বাচিত হয়েছে, কিন্তু বিষয়গত গভীরতা সত্ত্বেও, মূল চরিত্রের স্বগত-চিত্তায় আভিনব-বোধে কাহিনীটি রম্যপন্যী হয়ে উঠতে পারেনি। 'সহস্রতা' (বহুমতী) গল্পে তিনি সর্বব্যস্ত অবস্থার আর্থিক অভাব অনটনের মধ্যেও, আভিজাত্য-গর্বী শ্রেণী-সচেতন স্বামীর বেগহোরা জীবন-যাত্রার রথচক্রে-বাধা অসহ্যতা ত্রীর অনিবার্য দুর্গতির কাহিনী বর্ণনা করেছেন। গল্পের মেধাংশে আগতিপর্ষী সাহিত্যিকের লেখনীও বিকৃত-চিত্ত নারিকাকে ধাম্পত্য-জীবনের বন্ধন জর্জরতার গভী থেকে মুক্তি দিতে না পারায়—প্রকাশভক্তের 'যোগাযোগের' সুদ চরিত্রেরই পুনরাবুত্তি দেখা গেল—বিশ-পঁচিশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও। 'ভিনিরাতিসার' (মপ) গল্পে—নাগরিক পতিভাত্তির অতিভাত সত্ত্বেরপের পটভূমিকার এক অদ-কলভিত্তা ভরুণীর নিভুত প্রণয়ের অচরিতার্থতার কাহিনীর মধ্যেও নাটকীয় ঘটনার প্রাধান্যের ফলে রম-যুই বাধাপ্রভ হয়েছে। হুইটা পরলা (সত্যযুগ) এবং

‘হুযীর’ (মলিভা) গল্প দুইটিও মোটেই সার্থক হয়নি। পঞ্চ-বাটে দেখা ব্যক্তি-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে নারায়ণবাবু কয়েকটি হালুকা-চালের ছোট ছোট গল্প লিখেছেন ‘কনৈক’ নাম দিয়ে। তাদের মধ্যে, সহরতলীর শাস-বাড়ী বিপত্তীক ঘোড় ভজালোক (হুতীপত্র) এবং বজ্রিয়ারগুর ট্রেনের বার্টিন লাইনের ট্রেন-বাড়ী পাঁচোড়ী (তরঙ্গ)—এই দু’টি চরিত্র-চিত্রণ শিষ্টাচার্ধকতার গুণে প্রশংসার যোগ্য।

‘পাছনিবাস’ (নতুন সাহিত্য) নামে ব্যঙ্গ-রসাত্মক প্রবণ-কাহিনীতে নারায়ণবাবু আভিজাত্য-গম্বীর ধনীর হুলালেদের চিত্র-দৈন্দ্য ও বিকার-গ্রস্ত জীবনযাত্রার বীতভঙ্গ্য নির্ধ্বজভাবে উপাটিত করেছেন। কিন্তু বুদ্ধি-দীপ্ত শাসিত ব্যঙ্গ বিজ্ঞপের চমৎকারিষে যে রচনা চূড়ান্ত ভাবে সার্থক—তার মধ্যে হুয়াং হারিভা-লাহিত জীবনের বৈপরীত্য প্রদর্শনের জন্য পাছাডী-পরিবারের শিক্ত-সুভার প্রসঙ্গ অবতারণার কোন প্রয়োজনই ছিল না।

ঐনতী আশাপূর্ণ্য দেবীর ‘বা নর তাই’ (আনন্দ-বাজার) গল্পটি—সমিদ্ধচিত্ত স্বামীর ঘেরাটোপ সংসার এবং বাহির বিশ্বের বহুদল বিচরণ ও চিত্তকুণ্ঠিত স্বাধীনতার দোটার মধ্যে এক গৃহবধূর অন্তর্ভবনের চমৎকার শিরসলোভী কাহিনী। ‘বধ্যপূর্ব’ (বঙ্গবতী) গল্পটিও—রূপক কাহিনীর মাধ্যমে, স্বাধীন তারতের অন্তরীণ হুগতি বোচনে শাসকশ্রেণীর উদ্বাসীনতার প্রতি ব্যঙ্গ-কথাখাত হিসেবে সার্থকোচ্ছল রচনা। সাম্প্রতিক কালের আত্মজীবনী রচনার হিড়িককে উপলব্ধ করে দেখা—‘তার অশাঠা’ (হুগাক্তর) গল্পটিও, প্রেক্ষাত্মক রচনার কলা-কুশলতার সার্থকতার অসুখিত প্রশংসার দাবী করতে পারে। তার অপর তিনটি গল্প—‘বেহারী’ (অনসেবক), ‘আবেদন’ (কথ্যসাহিত্য) এবং ‘কুয়াশার’ মধ্যেও তিনটি বিশেষ করে কটি চরিত্র বিশ্লেষণে দৃষ্টি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন।

ঐনরেরজনাব নিজের বড় গল্প দু’টির কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। ছোটগল্পের ক্ষেত্রেও শারদীর সাহিত্যের

আগের এবার গুীর দান সর্বাঙ্গগম্য। বিষয় বস্তুর গভীর ব্যঞ্জনা এবং প্রকাশ কুশলতার অর্ন্ত সম্বরের গুণে তার ‘একখানি দশটাকার নোট’ (নতুন সাহিত্য) এবং ‘জাত’ (সত্যসুগ) গল্প দু’টির শ্রেষ্ঠ আদিলংখ্যিত। অব্যবহিত সমাজের সর্বগ্রামী হারিভের বাণকতার স্বরূপ এবং সাম্প্রদায়িক বোধবুদ্ধির শেষ পর্বে অর্ধনৈতিক শ্রেণী চেতনার উদ্যোহনের ইতিবৃত্ত—উপরোক্ত গল্প দু’টিকে অর্পূর্ব লোকলোচর সনে বর্ণিত হয়েছে। ‘একপো হুগ’ (হুগপত্র) গল্পটির বিষয়গত গভীরতা মর্শ্বন্য, কিন্তু ঘটনা বিভ্রাসে কয়েক কারবার কল্পিততার আভাস থাকার গল্পটি শেষ পর্বত হুগ উচ্চাঙ্কের হয় নি। ‘গালক’ (আনন্দবাজার) গল্পটিও অতি দীর্ঘ হুগরার ফলে ও হানে হানে প্রতীতিবাগ্যতার অভাবে সম্পূর্ণ অসুখিত হতে পারে নি। ‘কাকিশ’ (বঙ্গবতী) গল্পের কলকল্পিতে যে প্রতিজ্ঞীয়শীলতার আভাস আছে, নরেনবাবুর লেখনীর পক্ষে সেটুকু যেন অপ্রযোজ্য মূলক ব্যতিক্রম বোধই বনে হয়। সনাতন পাণ্ডিত্যভার জের টেনে যৌন-রোগজ্ঞাত সম্পট স্বামীর প্রতি ঘিবাধীন ভালবাসার মধ্যে নারীষের গৌরব বৃদ্ধি হয়—এ বরণের বক্ষণশীল বনোভ্যবের পরিচয় ইতিপূর্বে নরেনবাবুর অল্প কোন লেখার মধ্যে পাই নি। ‘হুলা’ (হুগাক্তর) গল্পটিতে হারিজ-লাহিত অব্যবহিত পরিবারে অর্ধাভ্যবের ভক্ত শিক্তের শিকাদানের অকবতার অননীর যেহ বাহুলতার চিত্রটি সুন্দরভাবে পরিষুট হয়েছে, কিন্তু কাহিনীর শেবাংশে গৃহ-শিকারিজীর অর্ধাভ্যব-অনিত বিভবনার কথা গল্পের তারল্য নষ্ট করেছে। কাহিনীকে অবধা দীর্ঘ না করে সন্ধানের শিক্য বাবহা অব্যাহত রাখার জন্য অননীর বি-বিবি করার প্রভাবের উল্লেখ রয়েছেই গল্প শেষ হতে পারতো। ‘শেকালী’ (পরিচয়) গল্পটিরও প্রথমংশ চমৎকার, কিন্তু শেষে বিপে যেন রঙ্গ দান্য বাধেনি। ‘নতুন প্রেহ’ (অগ্রনী) ও ‘প্রোছদ’ (শনিবারের চিঠি) গল্প দু’টিকে চলনশই পর্যায়ের বলা চলে।

ঐননী তৌমিকত এবার অল্প কয়েকটি লেখার মধ্যেই

কৃষ্ণসেনীর কৃত্তিকের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর 'হালো' (নতুন সাহিত্য) গল্প শারদীয় সাহিত্যের অঙ্গতম রচনা। কৃত্তিক লিখিত অকলে সরকারী তহবলের প্রদান সম্পর্কে রাজকীয় আনুষ্ঠানিক আড়ম্বরের যান্ত্রিক নররূপ এবং তারই প্রতিক্রিয়ার প্রাণকালের হতাশা-স্বচ্ছ জনতার ধ্বংসিত অদস্তোষের কথা, আত্মীয় নিপুণতার সঙ্গে এ গমে অভিব্যক্তি লাভ করেছে। তাঁর 'অরপূর্ণ' (সত্যযুগ) গল্পটিও বিষয়বস্তুর নতুনত্ব ও আঙ্গিকের কলা-কুশলতার অকুণ্ঠিত প্রদর্শন। বাবী করতে পারে। বহু-বিষোদিত নদী-পরিবহননা খাতে সরকারী তহবিলের কোটি কোটি টাকা অপব্যয় সত্ত্বেও, পরিচালকবর্গের মনে জন-কল্যাণ-সাধনার আন্তরিক নিষ্ঠার অভাব কোন্ বৃহত্তর দুর্গতির হুচনা করতে পারে, তারই আভাস পাওয়া গেল এ গল্পের ত্রুণক-চরিত্রেও আশা ও নৈরাশ্যের মর্মস্পর্শী কাহিনীর মধ্যে। ত্রুণক-বধু অরপূর্ণের সঙ্গে প্রায়-বাতমার অরপূর্ণা মূর্তির একান্তকতার ত্রুণক আভাস লেখকের নিরু-কুশলতার পরিচায়ক—কিন্তু লৌকিক চরিত্রটির দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ের উপর যথোচিত আলোকপাত না করার কাহিনীর আবেদন কতকালে স্তব্ধ হয়েছে, একথাও প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। 'নগর-কৃত্তিকা' (মধ্যমিত) গল্পটি কিন্তু কোন দিক থেকেই সার্বক হতে পারে নি।

শ্রীমতীজুলেখা সাংস্কারের লেখাও এবার সাহিত্য-রসিকদের খুবই আশাবিত্ত করেছে। তাঁর 'হার' (বহুভাষী), 'বিবর্তন' (চতুঃকোণ) ও 'রোজ-নাংকা' (মধ্যমিত)—সবগুলি গল্পই মনে দাগ কাটাবার মতো। অল্পভাষী বাঙালীর সংসারে দারিদ্র্য ও আদর্শাহুয়ারের বিভ্রমের হুঁচুটো ভাতের জন্ত তাঁর ব্যাকুলতা, সাংসার একটু আলো-বাতাসগুলা বাস্য কাড়্য পাখরার ব্যাপারও সাধ্যাতিরিক্ত হয়ে ওঠার—শিকিত কুচিসঙ্গর মধ্যমিতের মনে কৌদনবোধের জমিক রূপান্তর এবং দারিদ্র্য-লাহিত অসহ্য মধ্যমিত পরিবারে দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যেও অন্যাক্ষিত ভিজতা-সৃষ্টির কাহিনী বর্ণনার সুলেখাধেবীর

রস-মাহুধরভিত্তি লেখনী প্রাশংসনীর সাক্ষ্য অর্জন করেছেন। কিন্তু তাঁর 'সিঁদুরে মেঘ' (পরিচয়) গল্পটি—প্রথমদানের চমৎকারিত্ব সত্ত্বেও শেখাংশের কৃত্রিমতা-বোঝে, সামগ্রিকভাবে রচনাভীর্ণ হয়নি।

শ্রীসোমনাথ লাহিড়ীর 'পালবংশ' (মুখপত্র) গল্পটিতে ধনভাগ্যিক সমাজ-ব্যবহার বিধাত্ত পরিবেশে ব্যক্তিগত ক্ষমতা-প্রয়োগের হুপকাটে পরার্থপরতার অপসূত্রায় ইতিবৃত্ত বলিষ্ট ভঙ্গিতে বিবৃত হয়েছে। 'আইনের পাঠ' (মধ্যমিত) গল্পটিতেও—ধনভাগ্যিক রাজ্যের কাঠামোর মধ্যে শ্রেণীস্বার্থের জামিনদাররূপে পুঁজিনী আইনের আগল-ত্প উদ্ভাবননের সফল সাক্ষীলতা বিশেষ প্রাশংসার যোগ্য। রাজনীতি-বৈধা বিষয়বস্তুর কৃত্তিকের সঙ্গে সাহিত্য-ভাত করার চেষ্টায় সোমনাথবাহু আত্মর সাক্ষ্যলাভ করেছেন। তাঁর 'পালবংশ' নিঃসন্দেহে এবারকার শারদীয় সাহিত্যের অঙ্গতম শ্রেষ্ঠ গল্প।

শ্রীমহেশ বসু এবার অত্যন্ত হতাশ করেছেন। তাঁর 'হুঁচি মাত্র গল্প—'উজান' (নতুন সাহিত্য) এবং 'রোগ না রোগ' (মধ্যমিত) এর মধ্যে, কোন গল্পই মনে বিশেষ দাগ কাটে না। প্রথম গল্পটি অভিকণ্ঠনের বোঝে ভারাক্রান্ত এবং দ্বিতীয় গল্পটি পুরাতন-পন্থী রোমাঞ্চিক প্রেম-কাহিনীর বাহুলি সংকরণ বলে মনে হয়েছে।

শ্রীহীনল আনার 'আনোয়ার' (পরিচয়) গল্পটিও চলনলই গোড়ের। শ্রীরমেশচন্দ্র সেন ও শ্রীযতেন বসুও কোন গল্পই উল্লেখযোগ্য নয়।

শ্রীজ্যোতসুন্মার ঘোষের 'বিব' (আনন্দবাজার) গল্পে—বন্দেবী জমিদার-বাড়ীর পারিবারিক আবহাওয়ার জবর-রসে বধু-কুপিনী প্রাজ্ঞল বিববী তরুণীর মানসিক ভাবান্তরের কাহিনী স্পষ্টরূপে বর্ণিত হয়েছে। 'বাহুবল' (দেশ) গল্পটির প্রকাশভঙ্গি মনোরম, কিন্তু তার প্রেম ও প্রতিবিশ্বাস-মূলক কাহিনীর রাজ্যতিরিক্ত অমাহুধকতা বিবাস-যোগ্যতার নীমা লংঘন করেছে।

শ্রীহরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের গল্পগুলির মধ্যে

‘অলীকার’ (হুতীপত্র) এবং ‘অবরোধ’ (অপদেশক) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথম গল্পে, শায়রীর তার এসান-ভোগী সাম্প্রতিক নেতার ব্যক্তিগত জীবনের প্রেমের প্রতিভূতি ভক্তের কট্টাধরে গণস্বার্থ রক্ষার অলীকারে বহুত্ব অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর অল্প কথার বক্তৃতার স্বরূপ খাড়াই করা হয়েছে। দ্বিতীয় গল্পে পিতৃ-পতিভক্তের সার্থকতার অর্থোপার্জনের প্রয়োজনে, শিক্ষিতা কল্পনা বেতার জীবনে প্রেমের সার্থকতার সাহেবস্বপ্নে লজ্জিততার কাহিনী চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত হয়েছে।

শ্রীমদ মিত্রের পাকা হাতে লেখা—‘পরী’ (দেশ), ‘মহারি’ (যমিনা) এবং ‘বন্দন’ (আনন্দবাজার)—তিনটি গল্পই মোটামুটিভাবে প্রশংসার যোগ্য। শ্রীমদীলতার ‘মধু গাউলি’ (দেশ) গল্পে—প্রেমের হৃদয়কে উপর প্রতিশোধ গ্রহণের কাহিনী বিষয়-বৈচিত্র্যের ভূমি স্বয়ং-প্রদীপ্ত হয়েছে। ঐচ্ছ্যান্তিরিত্র নন্দীর ‘মেয়ে-শাসন’ (দেশ) গল্পটি—মেয়েকে শাসনের আড়ালে মায়ের স্বয়ং-পুত্রি রোমন্থন ও অবচেতন ও আনন্দ উপভোগের সবস কথা-চিত্র।

শ্রীমদ বেবসরকারের ‘মৃত্যুপন’ (মহাবিভ) এবং ‘অজ্ঞানবিকা’ (আনন্দবাজার) গল্পে স্ক্রামী-জীবনের অস্বস্তির বিভিন্ন দিক অগ্নি সংবেদনশীলতার আত্ম-প্রকাশ করেছে। তাঁর ‘বিদিশা’ (যমিনা) গল্পের বিষয়-বস্তু সুরানো হলেও—প্রকাশিতভাবে নতুনত্ব আছে। অপর দু’টি গল্পের মধ্যে ‘বিনিয়োগ’ (দেশ) গল্পটি বক্তব্যের দুর্বলতার এবং ‘উত্তর হাওয়া’ (অনুদেশক) বিষয়বস্তু কল্পিততার একাত্ততাবেই বার্ষ রচনা।

শ্রীমদ সেনের ‘ব্রহ্মাণ্ড’ (মহাবিভ) গল্পে—সাম্প্র-হারিক বিষয়-দুই সমাজে অসাম্প্রদায়িক ঘেঁষ-দুর্বলতার

একটি মর্মস্পর্শী চিত্র। তাঁর ‘রাক্ষসী-জলা’ (হুতীপত্র) গল্পে—অভি-প্রাকৃতিকের প্রতি অন্ধ-বিশ্বাসের ভিত্তিস্থে নাড়াগেঁড়া হয়েছে।

শ্রীমদ চৌধুরীর ‘পরবারী’ (হুতীপত্র) এবং ‘কণ-কণ’ (দেশ) গল্প দুটিও প্রশংসার যোগ্য। শ্রীমদ বেবসরকারের ‘সাবোটার্জার বাজার গল্প’ (চতুর্ভাগ) গল্পটি—প্রাচ্য সমাজ-পরিবেশের শ্রেণীবিষয়-মূলক বাস্তব অভিজ্ঞতা-সমৃদ্ধ কাহিনী।

সাম্প্রতিক বাস্তবিক রচনার মধ্যে ‘মনী-ভূমির’ ‘মহাবিভের প্রার্থনা’ (মহাবিভ), শ্রীমদ গোবিন্দীর ‘হৃদয়-হেসেল’ (মহাবিভ) এবং ‘কাফের’ এর ‘শ্রীমদী কিনকিন সেনের অস্বস্তি’ (মহাবিভ) উল্লেখযোগ্য। শ্রীমদেও ভক্তের ‘সত্যপর্ব’ (চতুর্ভাগ) অত্যন্ত নিরুপ-শ্রেণীর রচনা।

শায়রীর গল্প-সাহিত্য পরিষ্কার উপসংহারে এই-টুকু শুধু বলা যায় যে, বিষয়গত উৎকর্ষের সঙ্গে একাশ-কুশলতার সমন্বয়ে সর্বাঙ্গীনভাবে সুসমঞ্জস রচনার সাক্ষ্য এবং আর খুব কম ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। অধিকাংশ শিল্প-সার্থক গল্পে যেমন বিষয়বস্তুর বৈজ্ঞানিক নৈরাত্তের স্বল্প করেচে, তেমনই আবার সুগোপনযোগী নতুন বিষয়বস্তু সমন্বিত কাহিনীও শিল্প-নৈপুণ্যের অভাবে সার্থক হতে পারে নি—এমন দুটো মোটেই বিরল নয়। তবে, বাস্তব জীবন-পর্ণনই যে এবারকার প্রারম্ভ সত্য সত্যেই রচনার উৎস স্বল—এ সিদ্ধান্ত শুধু বিশেষজ্ঞ সাহিত্য-সমীক্ষক নয়, সাহিত্য-সেবী পাঠক-সাধারণেরও। তাই আমাদের বিশ্বাস—এবারকার শায়রীর সাহিত্যে শিল্প-সৃষ্টির মৌলিক রূপান্তরের ব্যাপকভাবে মধ্যে যে শুভ ঘটনার অদ্বৈতমূল্য লক্ষ্য করা গেল—আগামী দিনের অল্পকাল পারিপার্শ্বিকতার আলো-বাতাসে সেই অল্পকালই নিশ্চয় প্রাণ-প্রাচুর্যে শাখার শাখার পল্লবিত হয়ে উঠবে।





ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক :—

এই বিষয় নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি। কিন্তু আজ পাশপোর্ট প্রবর্তনের উপলক্ষে ভারতের বিশেষ করে বাংলার রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক জীবনে এটা এতবড় একটা সমস্যার সৃষ্টি করেছে যে এই সম্বন্ধে বার বার আলোচনা করার প্রয়োজন আছে। তাই আমরা আবার এই প্রসঙ্গের পুনরাবলোচনার কোন বিধা বোধ করছি না। উক্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পাশপোর্ট প্রবর্তন নিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল এবং আজও যে অবস্থার স্রোত চলছে তাতে এই সম্বন্ধে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে বলে মনে করি।

কংগ্রেস কনফারেন্সে বিজ্ঞানিত মতবাদের যেনে নিয়ম। তবু যোগেশচন্দ্র দীপের নেতৃত্বে ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত মুসলমান বি-জাতিত্বকে বীকার করে ভারতবিভাগ দাবী করল এবং সেই দাবী পূরণের উপায় হিসাবে প্রত্যেক সংগ্রামের নামে ব্যাপক হাঙ্গামা-হাঙ্গামা ও নরহত্যার সূচনা করল। তখন কংগ্রেস ভারতবিভাগ যেনে নিল। এটো সময় পূর্ববাংলার হিন্দুগণ কংগ্রেস ব্যতীত অন্যত্র প্রায় সমস্ত দলের পরিচালনার বহুবিভাগের ক্ষয়ক্ষতি হয়ে উঠেছিল। বহুবিভাগের বিরোধিতা করতাম বলে আমাদের অনেক মানি ও বিকার লইতে হয়েচে। দলে দলে দিল্লীর বাঙ্গালী যুবক ও নরনারী দিল্লীতে আমাদের প্রবাসের বাসস্থানে এসে হঙ্গা করেছে। এমনি পরিস্থিতিতে আমরা ভারতবিভাগ ও বহুবিভাগ যেনে নিজেছিলাম। তখনও যেনে একটি আশা ছিল, স্বাধীনতা লাভের পরে দ্রুত বিদেশীর উদ্ধারিত অবস্থান হবে এবং অন্ততঃ বাংলার হিন্দু নরনারী অস্ব-স্বাভাবিকভাবে সমস্ত

অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রতিবেশীর সৌহার্দ্যের সম্পর্কে পরস্পরে পাশাপাশি বাস করতে পারবে। আমাদের সে আশা অন্তত এখন পর্যন্ত সফল হয়নি। পরস্পর ঈর্ষা বিদ্বেষ প্রায় সেইভাবেই চলছে। পাকিস্তান হ'তে সাম্প্রদায়িক আবহাওয়া দূর হয়নি বরং প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানকে ইসলামী-রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে -সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে সেখানে প্রচার দেওয়া হচ্ছে।

গত পাঁচ বছর ধাবৎ উক্ত রাষ্ট্র পরস্পরের প্রতি যে অচরণ করেছে তাতে আমরা কাউকে নির্দোষী বলে মনে করি না। ভারতীয় রাষ্ট্র পাকিস্তান সম্বন্ধে প্রথম থেকে বিচক্ষণতা, দৃষ্টিশক্তি ও উদার মনোভাব নিয়ে চলতে পারেনি। পাকিস্তানের ভয় অস্থিরাশ ও বিদ্বেষে। পাকিস্তান ভারতের তুলনার সববিষয়ে ছোট ও অসহজ, পাকিস্তানের রাষ্ট্র-পরিচালকগণ নিজেদের স্বীকৃতি অঙ্গণের সাম্প্রদায়িক ও গভীৰ্ঘ মনোভাবের দোষ। কাজেই পাকিস্তানের কাছ থেকে দৃষ্টিসম্পন্ন, উদার মনোভাব কিংবা বিচক্ষণতাও আমরা আশা করিনি। কংগ্রেসের ঐতিহ্য ও আদর্শ ভারতীয় রাষ্ট্রের সাম্প্রদায়িক গঠন ও প্রকৃতি এবং ভারতীয় রাষ্ট্রের বির্যটিত্ব ও অপেক্ষাকৃত উন্নত অবস্থার জন্য ভারতের দারিদ্র্য এটো কেড়ে নেই। কাজেই ইটপাটকেলের পরিবর্তে ইট-পাটকেল এই নীতি অঙ্গণের করা ভারতের পক্ষে খোঁজনা বা গোয়বের নয়।

পাকিস্তান সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে আচরণ করা হয়েছে তার সঙ্গে ভারতের মুসলমানদের আচরণের কোন তুলনা হয় না। পূর্ববাংলার হিন্দুগণ রাষ্ট্রের কাছ থেকে নাগরিকের মিতম দাবী পূরণেরও আশা রাখে

না। সাধারণ চোর ডাকাত বা নারীর অবমাননাকারী অসৎ চরিত্র লোকদের হাতে হিন্দু লাঞ্ছনা হলে পূর্ব বাংলার হিন্দুই কোন প্রতিকার পায় না এই তাদের প্রধান অভিযোগ। তারা মনে করে রাষ্ট্রের সম্মুখে এইসব অপরাধ ও দুর্কার সাধিত হয়। এই অভিযোগ 'সর্বপ্রাণে সত্য একথা আমরা বলতে চাই না। কিন্তু এই

অভিযোগ যে মূলতঃ সত্য তার প্রমাণ লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর শৈথিল্য বাস্তবিক। পরিত্যাপ করে উষ্মা হিসাবে ভারতে প্রবেশ। কিন্তু যদি কেউ মনে করে যে জারতবার্ষের বা পশ্চিম বাংলার মুসলমান অধিবাসীগণ সম্পূর্ণ নিরাপত্তা ও নিরঙ্কুশ জীবন যাপন করে তাহলে প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে হস্ত খুব সত্য বারখা তাদের নাই। তবু উত্তর রাষ্ট্রের সংখ্যালঘুদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে। ভারতীয় রাষ্ট্র বর্ণনির্ভেদ এবং এখানকার রাষ্ট্র-পরিচালকগণ সংখ্যালঘুদের রক্ষার জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ বৃহত্তারকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করতে প্রস্তুত এবং করে থাকে। পূর্ব বাংলার হিন্দুদের উপর যখন কোন জুলুম হতে থাকে তখন ভারতের কোন কোন অঞ্চলে কিছু প্রতিক্রিয়া হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সরকারী ব্যবস্থা ও জনবস্তের চাপে এই প্রতিক্রিয়া বিস্তার লাভ করতে পারে না। তাই ভারতে প্রায় ৪ কোটি মুসলমান অধিবাসী আছে এবং পশ্চিম বাংলা হস্তেও খুব অল্প সংখ্যক মুসলমান চলে গিয়েছে।

এখন প্রশ্ন উঠে, উত্তর রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হবে? ক্ষত্রবীর মাসের প্রথমার্ধে উত্তর বঙ্গের প্রাক্কক্ষে আমরা উষ্মা সমাবেশ দেখছি। বিভিন্ন রেল স্টেশনে ও প্রান্ত সীমার মাঝেবের চরম হুঁহু ও অবমাননা আমরা দেখছি। বিভিন্ন উষ্মা শিবির এবং উপনিবেশে উষ্মাভক্তের দুঃখদৈন্যের কাহিনীও আমরা জানি। মাঝেবের জন এতে বিভ্রান্ত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বিচলিত মন বা হুঁহু নিয়ে সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালনা করা চলে না। যাতে লক্ষ লক্ষ নরনারীর এবং তাহাদের জনিষ্ট বংশ-ধরনের স্বামী মঙ্গল সাধিত হতে পারে সুস্থভাবে বিচার

করে সেই পথ আবিষ্কার করা দরকার। কার লক্ষ আমরা কাকে পাতি দেব? হস্ত রাষ্ট্রকর্তা হুঁহুভক্তদের হুঁহু এবং পাঁচ লক্ষ জনের হুঁহু এই ভুলি মাঝেবের হুঁহু হুঁহুতির জন্য দায়ী। এর প্রতিকারে যদি শক্ত করা আরও নিরপরাধ নক্ষত্রদের উপর আমরা লুণ্ঠবিধান করি তাতে মহাত্মার অবমাননা হবে এবং মাঝেবের দৈন্য বাড়ানো হবে।

একটা জাতির ইতিহাস এমনি রচিত হয় না। এইখানে আমাদের বিচার করতে হবে আমাদের কীমিত-কালের পরেই বা উত্তর বাংলার অবস্থা কি হবে, যদি পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার যোগাযোগ এবং সাংস্কৃতিক, ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক ঐক্য আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে আজকের অবস্থানভিত্তিক কোথের বশে তার পরিণতি কোন ব্যবস্থা কল্পনা করা উচিত নয়।

আজ পাকিস্তান সম্বন্ধে নানারকম প্রস্তাব করা হচ্ছে, হুঁহু করার কথাও একদল লোক পূর্বে বলতো। আজ লেখণা আর শোনা যায় না, যদিও পাকিস্তানে এখনো একটা প্রবল মত আছে ভারতের বিরুদ্ধে হুঁহু যোগ্যতার পক্ষে। মনে হয় সেটা তাদের মনের কথা নয়, তবু একটা ব্যক্তি কি বলে বলে বাহাদুরি করার প্রচেষ্টা। কারণ এমনি হুঁহুের ফল সম্বন্ধে কারো মনে কোন সংশয় থাকতে পারে বলে মনে হয় না। দ্বিতীয় একটা কথা বলা হয় অধিবাসী বিনিময়। ভারত বর্ণনিরপেক্ষ অগাঙ্গাঙ্গিক (Secular) রাষ্ট্র, কখনই বর্ণের ভিত্তি কঠিকে এখান থেকে নির্ধারিত করা ভারতের পক্ষে সম্ভব বা সংগত নয়। এটা ভারতের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিরোধী। প্রায় তের শত বৎসর পূর্বে ইরানের কয়েক সহস্র অগ্নি উপাসক জারাষ্ট্র পন্থী ভারতে এসে আশ্রয় নিরেছিল। কয়েক সহস্র ইহুদীও ভারতে আশ্রয় নিয়ে বাস করছে। আজ কয়েক লক্ষ মুসলমানকে এখান থেকে বর্ষের ভিত্তি নির্ধারিত করা হবে এটা ভারতীয় সংস্কৃতির বিরোধী এবং উত্তর বাংলার বৌদ্ধিক ঐক্য বোধেরও বিরোধী। তাছাড়া ব্যবহারিক দিক থেকেও

এটা খুব সহজ ব্যবস্থা নয়। কৃত্রিম একটা দাবী করা হচ্ছে যে পরিমাণ হিন্দু পূর্ব বাংলা থেকে আসতে পূর্ব বাংলার সেই পরিমাণ অন্ন পশ্চিম বাংলাকে প্রত্যর্পণ করা। দাবী করলেই পাকিস্তান তা মেনে নেবে এতবড় নির্বোধ বোধ হয় কেউ নয়। এই দাবী পূরণের চেষ্টার অনিবার্য পরিণতি হলো উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ, যা বোধ হয় এখন কেউ প্রস্তাব বা সমর্থন করে না। চতুর্থ আঁকো একটা দাবী করা হচ্ছে এখন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ অর্থাৎ উত্তর রাষ্ট্রের মধ্যে সাম্যাত্মিক লেনদেন বন্ধ করা, এই অস্ত্র অল্প বিস্তর উত্তর রাষ্ট্রকে আঘাত করে। এবং আশা করছি বড় জরায়র এই অস্ত্র প্রয়োগ করা হয়েছে কোথাও এদিকের কাউকে কানু করা যায় নি। তাহাজ্জা এতে জনসাধারণের দুঃখকষ্ট বাড়বে, হয়ত পাকিস্তানের জনসাধারণের দুঃখকষ্ট কিছুটা বেশী হবে। কিন্তু ভারতের জনসাধারণকেও এর ক্ষত কিছু অনুবিধা ভোগ করতে হবে। তাহাজ্জা পাকিস্তানে এখনও ২০ লক্ষ হিন্দু আছে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক অবস্থার কোন বাণ্ডোলে তা সর্বপ্রথম এবং সবচেয়ে বেশী পড়বে ঐ ২০ লক্ষ হিন্দুর উপর। এই সব বিবেচনা করে এই ব্যবস্থাত্ত বিবেচন সমর্থনযোগ্য নয়।

তাহলে করণীর কি? এই প্রশ্নের জবাব দেওয়ার পূর্বে আমরা পালটা প্রশ্ন করবো উত্তর বাংলার মৌলিক ঐক্যে আমরা বিশ্বাসী কিনা? বাংলা ভাষাভাষী পশ্চিম ও পূর্ব বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যে আমরা বিশ্বাস করি কিনা? প্রতিক্রিয়ানীল মনোবৃত্তি সম্পন্ন ব্যক্তির আচরণে আমরা নিজেদের প্রগতিশীল মনোভাব নিরঙ্গন দিয়ে প্রতিক্রিয়ানীল হবো, না? আমাদের প্রগতিশীল মনোভাবকে তাড়ের মধ্যে কার্যকরী করাবো এই প্রশ্নের জবাব নিজেদের মনে বেশ পরিষ্কার থাকে। আতাকার অচকারকে পুলিশীর শেষ অমাবস্তা বলে গ্রহণ করবো না এর পরেও স্তম্ভগণ ও পূর্ণিমা আগবে এই বিশ্বাস আমাদের মনে আছে কিনা? তার উপর নির্ভর করে এখন করণীর কি—এই প্রশ্নের জবাব।

খাদ্য পরিস্থিতি

স্বাধীন ভারতের সবচেয়ে গুরুতর সমস্যা হ'ল দুটি। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ও ভ্রমশ্রমিত উৎসাহ এবং খাদ্য সমস্যা। প্রথমটি অনেকটা আন্তর্জাতিক ব্যাপার। আমাদের রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ আয়ত্তে নয়। কিন্তু দ্বিতীয়টি হ'ল আভ্যন্তরীণ ব্যাপার এবং এটা মোটামুটি রাষ্ট্রের আয়ত্তের অধীন। গত পাঁচ বৎসরে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ উঠেছে তার মধ্যে প্রথমতম হ'ল খাদ্যের অপগাণ্ডতা ও খাদ্য বন্টন (Rationing) প্রথার দোষ ত্রুটিও অন্ততম নিয়ে। আজ স্বাধীন ভারতে সবচেয়ে আশা করে যে স্বাধীনতা লাভের সাথে সাথে তাড়ের সমস্ত দুঃখ কষ্টের অবসান হবে এবং বিভিন্ন সাম্যনৈতিক দল এমনি মনোভাব প্রচারে সাহায্য করে। স্বতাবতঃই কেউ তালিকে যেখানে চায় না যে আশা অভিযোগের মৌলিক উপকরণ কি এবং তা দূর করার উপায়ই বা কি। ভারতবর্ষ বরাবরই খাদ্য ব্যাপারে ঘাটতি ছিল। ব্রহ্মদেশ থেকে চাউল না এলে আমাদের দুখা নিবৃত্তি করা সম্ভব হ'ত না। ভারতের যে সব অঞ্চলে খাদ্য ঘাটতি ছিল বেশ বিভাগের কালে তা সবই পাকিস্তানের অন্তর্গত হয়েছে। তাতেও খাদ্যের ঘাটতি পূর্বের চেয়ে আরও বেশী হওয়া বাতাবিক। শুধু তা নয়, সমস্ত দুনিয়ার হিসাবে লোক-সংখ্যার অধিপাতে পর্যাপ্ত খাদ্য নেই এবং সব দেশেই খাদ্য ক্রয় বিক্রয় নিয়ন্ত্রণ করছে, ইচ্ছারত এদেশ ভ্রমণ থেকে খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব নয়। যে সব দেশে খাদ্যের ঘাটতি আছে, তারা অতিরিক্ত মূল্যে খাদ্য বিক্রয় করে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের সহজ উপায় অবলম্বন করে। আমাদের মত যে সব দেশে খাদ্য ব্যাপারে ঘাটতি তাড়ের সকলেই খাদ্য সংগ্রহ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। যে খাদ্য সরকারের হাতে মজুত থাকে, তার বন্টন নিয়ন্ত্রণ করতেই হয়।

খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ (Rationing) সবচেয়ে ভল আপত্তি হয়ত নেই, অনেকেরই এটা মেনে নিতে রাজী আছে

অভাবের বাতায় কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে। কিন্তু জনসাধারণের আপত্তি প্রধানত নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দোষ ত্রুটি এবং অসন্তোষ। নিয়ন্ত্রণের সংগে অভিত হচ্ছে আঞ্চলিক চলাচলের বেড়াফাণ (District Cordonning)। পাশাপাশি জেলায় বা মহকুমায় ৩ টাকার ৪ টাকার ৫ টাকার করে চাউলের মূল্যের পার্থক্য দেখা যায়। এ অবস্থার চাউলের চোরা কারবার, চোরা আমদানী রপ্তানী ও অন্যান্য নানা প্রকারের অসন্তোষ চলতে থাকে, একথা বললে সত্যের অপলাপ হবে না। যে ক্ষেত্র সমর থেকে খাতের ও অন্যান্য জায়গার নিয়ন্ত্রণ প্রথা জাতির চরিত্রের ভিত্তি ভেঙ্গে দিচ্ছে, আজ দেশে যে ব্যাপক অসন্তোষ দেখা যায় এবং যে অসন্তোষ থেকে সরকারি শালনগর এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানও অব্যাহতি পায় নি, তার মূলে হলো এই নিয়ন্ত্রণ প্রথা। চোরা বাজারে ডবল মূল্য মিলে চাউল বা খাতজব্বা সব সমর পাওয়া যায়। কয়েকই লোকের মনে লক্ষ্যে জাগে খাতের অভাব যে পরিমাণ সরকারীভাবে বোঝানো হয় সত্যিই সে পরিমাণ নয়। সরকারী হিসাব যে কতটা অনির্ভরযোগ্য তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি ঘটনায়। চলতি বছরে কি পরিমাণ খাত শত আমদানী করার সরকার হবে তার হিসাব বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের নিকট চাওয়া হয়েছিল, তারা ৮০ লক্ষ টনের বরাদ্দ পাঠায়। কেন্দ্রীয় সরকার এতে আপত্তি করে, অনেক বকাবকির পরে ৪০ লক্ষ টনে গাড় করা। তারপর যখন কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণা করলেন যে খাত খাতের উপর আর ঠার। কোন Subsidy বা অর্থ সাহায্য করবেন না; তখন এর পরিমাণ ২০ লক্ষ টনে গাড়ায়। তখন খাত বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এই ২০ লক্ষ টনও মূল্য দিয়ে গ্রহণ করেন নি। এমনি সব কারণে অনেকে মনে করত যে সরকারী কর্মচারীগণ এবং ব্যবসায়ীগণ প্রকল্পের ব্যয়যোগ্য খাতের বাটতির পরিমাণ অন্ত্যস্ত বাড়িয়ে দেখায়, অসং উপায়ে ও ব্যবসায়ের অর্থ লাগানো চরিতার্থের জন্য। বিভিন্ন বোয়াযোগে খাত বস্ত্র ও

অন্যান্য জায়গার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নিয়ে দেশে ব্যাপক অসন্তোষ চলছে—জাতির চরিত্রকে অসং দিচ্ছে, এই সব কারণে '৪৭' মাসে গাজীপুর আগ্রহে নিয়ন্ত্রণ প্রথা একবার রহিত করা হয়, কিন্তু অনেকেরই ধারণা যে বাৎসরী ও সরকারী কর্মচারীর চেষ্টার সে প্রয়াস বার্থ হয়। নতুন খাত মন্ত্রী শ্রীযুক্ত আমেন কিদোরাই খাত মন্ত্রকের তার গ্রহণ করার পর থেকেই আস্তে আস্তে বিনিয়ন্ত্রণের দিকে কিরতে হ্রস্ব করেন। রাজ্যের প্রধান মন্ত্রী গাজীউল হক, কিন্তু এঁদের হৃৎকনের আগ্রহে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীমত। আস্তে আস্তে মন্ত পরিবর্তন করতে থাকে। রাজ্যে প্রথম খাতশত্রু বিনিয়ন্ত্রিত করা হয়। যদিও খাত মন্ত্রক সবচেয়ে বেশী ভীত ছিল। পাঁচ মাসের পরীক্ষামূলক চেষ্টার ফল দেখে বলা যায় যে, সেখানকার প্রয়াস সফল হয়েছে। কিছুদিন পূর্বে বোম্বাইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক খাত মন্ত্রীদের সম্মেলনে ঠিক হয়েছে যে কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, আমেরাবাদ, সোলাপুর প্রভৃতি কয়েকটি সমর ব্যতীত সমগ্র ভারতে খাত বিনিয়ন্ত্রিত করা হবে। এই সম্মেলনে কিদোরাই সাহেব যে বিবৃতি দিচ্ছেন তাতে অনেক আশার কথা তিনি বলেছেন। এবং বর্তমানে খাতশত্রু বিষয়ে ভারতের অবস্থা অত্যন্ত সম্ভাবনাময়; তাই খাতের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রথা বন্ধ রাখার কোন মুক্তি সম্ভব কারণ নেই; প্র্যানিং কমিশনের উপদেশক উপদেষ্টা কমিটি খাত ব্যাপারে এই বিনিয়ন্ত্রণ সম্মেলন আপত্তি প্রকাশ করেছে। ভারতের বর্তমান নিয়ন্ত্রণ প্রথা রহিত করলে প্র্যানিং বা পরিকল্পনামূলক আর্থিক ব্যবস্থা সম্ভব নয়।

নিয়ন্ত্রণ প্রথা লোপ করলে সম্পর্কে দু'তিনটি বিভিন্ন দিক বিচার করার আস্তে। প্রথম হলো খাতের বাটতি থাকলে বা কেবলমাত্র পর্যাপ্ত থাকলেও নিয়ন্ত্রণ প্রথা লোপ করা সম্ভব নয়। যদি পর্যাপ্তের চাইতেও বেশী পরিমাণ খাত আমদানি হাতে সম্মত থাকে, একমাত্র

তাহলেই আমরা বি-নিয়ন্ত্রণের দিকে লা বাড়তে পারি। গত বছর যে পরিমাণ খাদ্য বাহির থেকে আমদানী করা হয়েছে তা আনাধারের সব প্রয়োজন হয় নি। এই বছর আমরা ২৪ লক্ষ টন খাদ্যদ্রব্য বিশেষ থেকে আমদানী করার ব্যাধ করছি। তাড়াহুড়া এ বছর চাউন এবং গম খুব ভাল কলস ফলেছে। এসব মিলে প্রয়োজনের চেয়ে বেশ কিছু অতিরিক্ত খাদ্যশস্ত্র দেশে থাকবে এ আশা করা চলে। সরকারী হিসাবের তুলনায় ত্রুটি থাকে, সে তুলনাত্মক আশংকা স্বীকার করতে বাধ্য। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় আগামী বছরে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বেশ কিছু খাদ্য আমদানীর হাতে থাকবে। এদিক থেকে বি-নিয়ন্ত্রণ প্রথা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে খাদ্যের নিয়ন্ত্রণ প্রথার কোন অসংগতি আছে কিনা তাও বিচার করা প্রয়োজন। একথা স্বীকার করতেই হবে যে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণ অনেকটা সঙ্গে সঙ্গে চলে। কিন্তু উৎপাদন সম্বন্ধে এ নিয়ন্ত্রণ সম্ভবানি পরিকল্পনার অগ্রগতি হওয়া সরকার কখন সম্বন্ধে তত্ত্বাবধি অগ্রগামী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন প্রকারে কতখানি প্রয়োজন তা হিসাব করে উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রিত করা সরকার; যাতে ব্যাধারে প্রয়োজনের অগ্রগামী প্রথা সমর্থন করা যায়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যশস্ত্র বিশেষ কেউ খায় না বা খাবে না। আত্ম প্রয়োজনের অগ্রগতি খাদ্যদ্রব্য সাধারণ লোক পায় না। যদি নিয়ন্ত্রণ প্রথা উন্নতি দিলেও সবাইয়ের প্রয়োজন নত খাবার খেলে নষ্ট থাকে, তবে নিয়ন্ত্রণ প্রথা প্রচলিত রাখার কোন কারণ নেই।

তৃতীয়তঃ, ৪৭ সালের ভার অধারতবে ব্যবসায়ী ও সরকারী কর্মচারিগণের যোগ্যভাবে বি-নিয়ন্ত্রণ প্রথা ব্যর্থ হবে না এবং বাস্তবায়ন নষ্ট রোধে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করার ও অতিরিক্ত মুদ্রাফালাভের চেষ্টা হবে না তার নিশ্চয়তা কি আছে? এসম্বন্ধে সরকারকে বিশেষ অবহিত হওয়া সরকার। সরকার হলে কঠোর আইন

করে অসাব্য ব্যবসায়ীদের দণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। আমদানী জানি না কিসে সন্তোষ প্রাপ্তি অসমর্থন করছেন বা করবেন কি না। আমদানীর মনে এসম্বন্ধে সন্তোষ আছে।

তৃতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তির দিক থেকে বিচার করে আমরা বি-নিয়ন্ত্রণ প্রথাকে সমর্থন করি। নিয়ন্ত্রণ প্রথা দ্বারা আমদানী অনেকটা হ্রাস করতে পারি নি। লাভের মধ্যে তাদের সম্ভবতঃ অনেকখানি নষ্ট করেছে। লোকের খুবির আর নিজে লাভের স্বপ্ন করতে আজ কারো মনে কোন দ্বিধা নেই। বাস্তবতার চোরা আমদানী রপ্তানী কাজে তত্ত্বাবধির মেয়ে এবং ছেলেরা আজ লেগেছে। বাস্তবতার লাবে পাণ্ডুরূপে মিশিয়ে মগজটি ২১১ সের গুজন বাড়ানো সরকারই স্টেট থাকে। বাস্তবায়ন সৃষ্টি করে যেখানে কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টি করা হয় এবং এক টাকার খাদ্য দু টাকার বিক্রি করা হয়। সরকারী কর্মচারী থেকে আরম্ভ করে সাধারণ নাগরিক পর্যন্ত এই অসন্তোষ ব্যাপিতে আক্রান্ত হয়েছে। নিয়ন্ত্রণ প্রথা রদ করার পক্ষে এই ব্যাপক অসন্তোষ একটি প্রধান কারণ।

প্রাচীন কমিশনের উপদেষ্টা কমিটি খাদ্যদ্রব্য ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত। বড় বড় ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট, বনী এবং অর্থবিদগণ এই কমিটিতে আছেন। প্রায়ের নিয়ন্ত্রণ প্রথা রদ হলে অনেক বনী ব্যবসায়ীর স্বার্থের হানি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। ইতিমধ্যে আমরা দেখছি ব্যবসায়ীদের মনে আশংকা ভেগেছে তাদের লাভের অংশ হ্রাস কবে যাবে। এই প্রেক্ষিতে লোকের মতামত কতটা বাহীন ও নগ্ন সে সম্বন্ধে আমদানীর সন্তোষ আছে; খাদ্যদ্রব্য অর্থবিদগণ প্রায় সব সমস্তাই দেখেন পুষ্টির দিক থেকে। মানুষের বাস্তব জীবনের সংগে তাদের সম্পর্ক অনেক সময় বিশেষ থাকে না। আমরা গ্রামে গ্রামে পুত্র দেখেছি নিয়ন্ত্রণ প্রথায় বিরুদ্ধে ভীষণ জাতি অসন্তোষের মনে আছে। তাই আমরা মনে করি অসন্তোষ পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রথা লোপ করে দেখা

উচিত। কথা উঠেছে যে এটা একটা রাজনৈতিক চাল, নীতির সঙ্গে যোগ বেগে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংগকে বিচার করিতে হবে। কাজেই এটা একটা রাজনৈতিক নৃষ্টি-প্রণোদিত কাজ এ বলে বি-নিরস্ত্রদের বিরুদ্ধে কোন নৃষ্টি দেখান হয় না। পরিশেষে আমরা বলবো আমাদের বন একেবারে বিধা-বৃথা নয়। সরকারী কর্মচারী ও ব্যবসায়ীদের যোগাযোগে সব কিছু বানচাল করে যেতে পারবে সে আশংকা আমাদের আছে।

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩৩, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

হু'লফেরও অধিক টাকার দাবী মিটানো ইইয়াছে

ভারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এক্সেন্সী ও সংগঠন অফিস আছে

মাত্রাজ অফিস—

৪০বি, সেকেন্ড লাইন বিচ্,

মুম্বাইপ্রদেশ অফিস—

১৭৯, মুম্বাইগল, এলাহাবাদ

আসাম অফিস—

নগণা, আগাম

ছোটনাগপুর অফিস—

বেন হোড, রাতি

চীফ এক্সেন্ট :— ত্রিবাঙ্কুর
মিঃ এম, ডি, জর্জ

চীফ এক্সেন্ট :—মালদ্বার
এন, এ, মহম্মদ

চীফ এক্সেন্ট :—পূর্ব পাঞ্জাব
জুনাৎ এণ্ড কোং, সিংলা

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কয়েকখানি নতুন প্রকাশিত গ্রন্থ

দূরভাষিনী—(উপন্যাস) ২৥০ শ্রেষ্ঠ গল্প— ৪৥০

(সর্বজন প্রাশংসিত গল্পগুলির সংকলন)

দেহমন—(উপন্যাস) ৪ চড়াই উৎরাই— ৩

(অধুনাতম গল্প সংগ্রহ)

সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তক বিক্রেতার নিকট পাওয়া যায়।

শ্রীমতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আগার সাকুলার রোড হইতে শ্রীমতীমহাচরণ কল্লিকট মুদ্রিত
এবং 'মিদিয়া' কাগজের ৩২নং আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্তী—

হেসেনবেরগের প্রেট বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৥০

ডাক্তারের দ্বিধিজয় ২৥০

—অরুণচন্দ্র স্তব্ধ—

১। জীবনের বসন্ত ২৫০

ভাষার, কল্পনার ও সৌন্দর্য-স্বর্গে উচ্চাঙ্গ গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

২। রূপকথা ২১

বাবিলোনিয় উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটা গল্প গল্প। কল্পনার অভিনবত্বে ও মৌলিকত্বে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনে টাইপে ছাপা এই সুসুন্দর বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুবীণমাকে এই পুস্তকের সমাদর অবশ্যজ্ঞাবী।—বঙ্গবর্তী।

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৫০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে।

—বরাক

—ভারতপদ রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩১

কল্প কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তি সম্পন্ন ক্লাসিক পর্যায়ের প্রেট গল্পগুলির বঙ্গভাষায় একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি নতুন অত্যাব পূরণ করিলেন।

—আনন্দবাজার

আমাদের নূতন বই :

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

বিত্যর্থ নবায়ুকের কালে ইউরোপে নেতাজীর কাণ্ডাঙ্গীরা প্রথম প্রায়মাণা ইতিহাস। নতুন ঘটনা উপজ্ঞানের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক বঙ্গদেশে এটি বইটিতে।

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও

সাম্প্রদায়িক সমস্যা ১৥০

অমৃতবাচ্চা, আনন্দবাজার প্রকৃতি পত্রিকা উক্ত প্রকাশিত।

বিশাল বাঙ্কলা ১১

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বহুদিন আগে হুগলি বাঙালি একখানি দুপাখা বই আবার পাওয়া যাচ্ছে।

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—

(তিন খণ্ড একত্রে বাঁধাই)

মূল্য—১০/-

—মগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও

উপনিবেশিক নীতি ২১

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২১

—মরেন রায়—

বাঙালি বুলে বাঙালি যুগের এক অস্বাভাবিক কাহিনী পাবেন এই উপজ্ঞানটিতে। বিভিন্নচন্দ্র বর্ণিত আনন্দমঠের সন্ন্যাসীসকলের সত্যকার ইতিহাস।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২৥০

—অরুণচন্দ্র স্তব্ধ—

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

মানবিক চরিত্রগোষ্ঠীর মহাপ্রবর্তন কৃষিকার। সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উদ্বেগ, বিকাশ ও পরিণতির প্রকল্প ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রকাশিত। বহিঃ জোড়ের মত শিখিত, ভবুও বড়দের জ্ঞাতব্য স্বার্থে অনেক আছে। বিবরণসম্পন্ন, ভাষার সুসভ্য, চবিত্ত ও প্রকল্পগণের পারিপার্শ্বিক পুস্তকখানি অপূর্ণ ও মনোজ্ঞ। বাংলা ভাষার ইহার সমতুল্য কোন পুস্তক নাই।

মূল্য—২৥০

সব্বস্তুতী লাইব্রেরী ৪ ৬নং বঙ্কিম চাট্টাচার্যী স্ট্রিট, কলিকাতা—১২

—স্মৃতিস্মৃতি—

পঞ্চদশ বর্ষ

অগ্রহায়ণ—১৩৫৯

অষ্টম সংখ্যা

বঙ্গগৌরব ভূদেব ঐতিহাসিক চক্রবর্তী

আজ হইতে ৫৮ বৎসর পূর্বে ১৮০১ সালের
জ্যৈষ্ঠ তারিখে চুঁচুড়ায় বঙ্গ গৌরব পুণ্যপ্রসূক ভূদেব
ব্রহ্মোপাধ্যায়ের মহাপ্রসঙ্গ হয়। তারাই কয়েকদিন মাত্র
পূর্বে নৈহাটতে ১৮০০ সালের ২৩শে জ্যৈষ্ঠ সাহিত্যসম্রাট
বঙ্কিমচন্দ্রেরও জন্মস্থান ঘটে। কলুবাহিনী গঙ্গাবাসী
চুঁচুড়ার চুঁচুড়ায় মহাপ্রসঙ্গের তত্ত্ব গায়ে মাখিয়া বিত্ত
লাভ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিবেদ ছিল তাঁর মৃত্যুর
১২ বৎসর মধ্যে বেন তাঁর কোন জীবনী রচিত না হয়,
আর ভূদেবের নিবেদ ছিল তাঁর মৃত্যুর ৪০ বৎসর মধ্যে
বেন তাঁর কোন জীবনী না হয়। শোকাহত মেমবাসী
স্বাম্য হইবার পর ৪০ বৎসর অত্রে ১৮৮১ সালে রা-
ব্রহ্মোপাধ্যায় চন্দ্র বাহাদুরের সভাপতিত্বে ভূদেবের
জন্মদিগ্ধপন অঙ্গীকৃত হয়। তৎপর ১৮৮৪ সালে মহা-
ব্রহ্মোপাধ্যায় ঐশ্বর্য বিজ্ঞপনের শাস্ত্রীয়নৈত্বে দ্বিতীয়
জন্মদিগ্ধপন হয়। আজ ১৮৮২ সালে তাঁর পুণ্য-জন্মদিগ্ধপন
করিয়া জাতীয় বার উদ্‌ঘোষিত হইতেছে। সভা করিয়া
বা অঙ্গপ্রকারে বাহ্যিক বা আভ্যন্তরিক প্রদান-নিবেদনের
নমুনাটি ভূদেবের অগাধ মেমবাসীর পক্ষে গৌরবের
হয় নাই। অবিকল অগ্নিনি আগে বিজ্ঞানগণ লক্ষ্যে
চলিত-অতিনয়ে প্রগতিশীল নৈত্বে লক্ষ্যে অহেতুক
গোড়ারি অঙ্গ বর্শকরের নিকট ভূদেব যে দণ্ড পাইলেন

তাঁহা জাতির পক্ষে আদৌ প্রশংসনীয় নহে। অবশ্য
এতাবৎকাল পর্যন্ত ভূদেবের উত্তরাধিকারিগণ এবং
ভূদেবের উৎসাহিত একলক বাট হাজার টাকার বিশ্বনাথ
ট্রাষ্ট-কাণ্ডের ট্রাষ্টিগণ উক্ত টাকা প্রায় তিন গুণ বর্ধিত
করিয়া তাহার আয়ে 'বিশ্বনাথ চক্রবর্তী' নামে এক
সুপ্ত লক্ষ্য শিকাগার, 'ব্রহ্মদেব ভবভাগল' নামে একটি
দাতব্য আশ্রমের উদ্‌ঘোষন ও একটি দাতব্য হোমিওপ্যাথী
উদ্‌ঘোষন পরিচালনা করিয়া, 'বুধোদয় প্রেস' নামে একটি
বিশ্বজিহ্মিত মুদ্রাণের সাহায্যে ভূদেব-বর্জিত অমূল্য গ্রন্থনিচয়
মুদ্রিত করিয়া এবং ভূদেব পরিচালিত 'এডুকেশন গেজেট'
পত্রিকা চালাইয়া ভূদেবের মৃত্তি কিছু পরিমাণে টিকাইয়া
মাখিয়াছেন। ভূদেবের জীবনচরিত কয়েক খণ্ডে
প্রচারিত হইয়াছে। এদিক ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যপ্রসূ
ব্রহ্মোপাধ্যায়ের এক সংক্ষিপ্ত ভূদেব জীবনী রচনা করিয়া
তাঁহার সাহিত্যসাধক চরিতমালায় সন্নিবেশিত করিয়া-
ছেন; উত্তর ঐশ্বর্যবর্তী কুমার চট্টোপাধ্যায় এক অতি
পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং মূল্যবান পাঠ করিয়া তাঁহার 'জাতি,
সংস্কৃতি ও সাহিত্য' গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন; সত্যি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এ. অনার্স পরীক্ষার
ভূদেবের 'সাংস্কৃতিক প্রবন্ধের' কতক অংশ এবং আই.এ,
আই.এস.সি, পরীক্ষারও ঐ 'সাংস্কৃতিক প্রবন্ধের' এক

অধ্যায়ঃ পাঠ্যরূপে নিবদ্ধ হইয়াছে। কলে কোন কোন অধ্যাপক ব্যাপক বা সীমণী ভাবে ভাষা ভূমণের দৃষ্টি লইয়া আলোচনা করিতেছেন এবং তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছেন। এ ছাড়া দুই চারিজন মনোবী ব্যক্তি ভূমণের এমন গুরুত্বপূর্ণ যে তাঁহারা ভূমণের আলোচনা করিতে পৌরব বোধ করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্বত্রই আলোচনাকারিগণ এই বলিয়া আর্জনাৎ করিয়া থাকেন যে—আত্মির দ্বর্ভাগ্যে এং বিপদগামিত্যির ভূমণ আত্ম বিদ্বতপ্রায়। অতি উচ্চ শিক্ষিত কোন কোন ব্যক্তিকেও এমন বুকাইয়া বলিতে হয় যে ভূমণের কিছু উল্লেখযোগ্য অবদান আত্মির প্রতি বহিষ্কারে। বহীক্ষনাৎ বড় হুঃখে বলিয়াছেন যে অমন যে বর্তমান বহুদেশের নির্দোষকর্তা স্বামোহন রাত আনরা তাঁহাকেও ভুলিয়া গিয়াছি। তেননি ভূমণকেও আনরা ভুলিয়াছি।

বর্তমান যুগের প্রবর্তকগণের মধ্যে শিক্ষানৈতা অবিকর আত্মই আতিষ্ঠক ভূমণের ছিল বৃদ্ধ জ্ঞান-ভাপনের বিদ্ব কোমল কঠ, চনকপ্রদ ক্রিয়াবহুগ নৈতায়ের তুঃলিনান তাঁহার ছিল না। প্রবল ক্রিয়াশালী সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর আত্ম যে পরিমাণে আনয়ের নিকট পরিচিত, শিক্ষানৈতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষক বিদ্যাসাগরের সন্ত-বানি পরিচর কি আনরা ভুলিয়া বাই নাই? আত্মক, গুণবদী ও জাতীর উচ্চ-আদর্শবান ভূমণ পরিবারে ও বাহিরে এক সুরিঞ্জিত কঠোর অশ্বৎস মূর্ত জীবন ধারা বাহিরা জাতিকেও প্রবলভাবে আত্মক ও আদর্শবাহুগ করিয়া গড়িয়া তুলিবার আনরণ সাধনা করিয়া গিয়াছেন, এবং এই সংগঠনের পক্ষে অমূল্য ক্ষেত্রও নিম্ন ব্যয়ে লক্ষ্যসাহিত্য রাখিয়া গিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভূমণের আবির্ভাবের কালটি ভাল করিয়া বুঝিতে হইবে।

প্রাচীন শতকে অশ্বৎস নবাবী শাসনের শেষভাগে বাঙ্গালী তগা ভারতবাসী তাহার শাস্ত্র-নিরঞ্জিত মানসিক শক্তি হারাইয়া ফেলে। কলে ইংরাজ আনলের প্রবল অবস্থার ইংরাজের সর্বতোদুর্নী উচ্ছলতার মোহে পরাজ-

করণে হেমনবাসী এমন কৃষ্টিয়া পড়ে যে ইউরোপীয় সভ্যতা ও মনোভাবের নিকট তেতা খটাই, এমন কি ইউরোপীয় ব্রীতিনীতি ও আনব-কারণার কাঙ্ক্ষে আপনাকে একেবারে বিকাইয়া দিতে উক্ত হয়। তুল কলেজের আনহাওরা দ্বিত হইয়া বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতিকে আত্মক করিয়া ফেলে। প্রতিভাশালীর তরুণ বাঙ্গালী ইউরোপীয় বৃত্তিবাদ প্রবণের নামে স্বর্ধ পর্যন্ত ভ্যাগ করিয়া বিভাতীর ধর্দ প্রেধন করিতে থাকেন। দেবীর পুত্রাতন শাস্ত্র অবজ্ঞার ও বিদ্বতিতে বিলীন হইতে লাগিল। পৌরাণিক পৌত্তলিক আচার অপাঙ্কের হইয়া উঠিল। এই শনর আত্মির ভাঙ্গন রোব করিলেন রাখা বাবমোহন রায়। তিনি বাঙ্গালীর পৌরাণিক ধর্মের পরিবর্তে বেবের ঔপনিষদিক বা বৈদান্তিক ধর্মই প্রধানভাবে প্রেধন করিয়া ব্রহ্ম বা বেগ সন্বতীর ত্রাশ্বর্ধ প্রবর্তন করিলেন। সাধারণের অনবিগনা বিদ্বতপ্রায় বেদ-পুরাণতত্ত্ব হইতে সারোদ্ধার করিয়া তিনি প্রাচীন শাস্ত্রের গৌরব উচ্ছলই করিয়া ফুলিলেন। দেশের ও জাতির বহা উপকার সাধিত হইগ। কিন্তু বিপদ আবার প্রবল আকার ধারণ করিল। ঔনখিগ শতকের মাঝামাঝি আবার তরুণদের মধ্যে উচ্ছলতা আত্মপ্রকাশ করিল। ইংর বেলগের হাতে আত্মির আবার ভাঙ্গন বহিল। এই বিপদকে রোব করিতে বাহারা অগ্রণী হইলেন তাঁহার্য হইতেছেন প্রধানভঃ বিভাসাগর, ভূমণ, বন্ধন ও বহীক্ষনাৎ। ইংহার্য ত্রাশ্বর্ধের প্রয়োজনীয়তা পীকার না করিয়াই জাতিকে আত্মগচেতনাতার উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টার লাগিয়া গেলেন। জাতির দ্বর্ধল পরাজুকগণ প্রিয় মনোভাব কাড়িয়া ফেলিয়া দিলু যে কত শক্তির তাহা বাহাতে সকলে বুঝিতে পারে একত্র তাঁহার্য দেশের শাস্ত্রীয় শক্তি-ভাত্যার সর্বসাধারণের অস্ত উদ্বুদ্ধ করিয়া ধরিলেন। ইংহার্য একদিকে ত্রাশ্বতীর ঐতিহ্যপ্রস্তুত বেদ-পুরাণ-তত্ত্ব প্রতিপাদিত ভিত্তির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরতা অবিক্তর গুচতার লহিত যেমন আগাইয়া ফুলিলেন, তেননই

অঙ্গদিকে ইউরোপের নবগত জ্ঞান-বিজ্ঞানবালা ও কর্মময়, অধুনশক্তি গ্রহণ করিয়া আপনায় করিয়া লইলেন। কিছু প্রবল বৃত্তি ও বার্ষনিকপেক বিচারের লাহায্যে দেশীয় ভিত্তির রহস্যকার গল্প-কুসংসার বাহা এক্ষিপ্তভাবে নাশে ঢুকিয়া গিয়া মহত্ববিবোধী ভাবের উপাদান সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা ইহারা নির্মমভাবে বর্জন করিয়া মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার লাগিয়া গেলেন, আবার বিদেশগত চাকচিক্যময় চারত্রবিবোধী প্রাণ-চাক্ষাৎও ঘুরে পরিভ্রমণ করিলেন। ইহারা দেশীয় আদর্শের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে জুলা করিয়াই বিদেশীয় আদর্শকে গ্রহণ করিতে বলিলেন। পৌরাণিক শৌভলিক ধর্মের এক বৃত্তি-প্রতিষ্ঠিত উচ্চ আদর্শের সন্মোহনক বাধ্যা পাইয়া শিক্ষিত দেশবাসী অন্ধপ্রাণিত হইয়া উঠিল। এই কাণ্ডে জুদেবের দান অপরিণীদ।

জুদেব কত উদার মনোভাব পোষণ করিতেন তাহা তাঁহার সামাজিক প্রবন্ধের কয়েকটি কথায় সূচিত উঠিয়াছে—তিনি লিখিয়াছেন—“তবে কি প্রাচীন আদর্শ অক্লম বাহিরঃ চলিলেই মনুষ্যের উন্নতির পথ ব্লক থাকে? তাহাও নয়। প্রাচীন আদর্শ অবিরোচনাপূর্বক গ্রহণ করিলে অথবা অল্পহৃতি পরবল হইয়া পরিত্যাগ করিলেই যোব। যদি কোন মূল্য ভাব আইনে জাহঃ ঐ প্রাচীনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। যদি ঐ ভাব তাহাতে সম্মিলিত করিলে পূর্ব চিন্তাবর্ধের জ্ঞানচক্রে ঐচ্ছল্য বৃদ্ধি হয় তবেই তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়, নচেৎ উহাকে গ্রহণ করিতে হয় না।”

একদিকে এই প্রাচীনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য অপাঃ-দিকে উদার নবীনতাপ্রদান—এই উভয়ের মধ্যে সামগ্রিক রক্ষার লক্ষ আদর্শের যে অপরিহার্য প্রয়োজন তাহা জুদেবের লেখার বেশ স্বাভাবিকভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

জুদেব নিকে শীর্ষস্থানীয় প্রাচীনপণ্ডিত ৬বিংশনাল ভক্তভূষণের একমাত্র পুত্র। সমস্তগিরিভিত্ত বর্ণবিদিত্ত অতি সুনন্দর সুপুত্রবের আকৃতি তাঁহার ছিল। জুদেব

যখন হিন্দুকলেজে পড়েন তখনই ইংলং বেলের উদার মূল্য—তাঁহার প্রভাব জুদেবকেও বিচলিত করিয়া তুলিয়াছিল—কিন্তু পিতার আদর্শবলক উদারতা, পাতিত্য এবং অভিজ্ঞতা তাঁহাকে প্রেম হইতেই বন্ধা করিয়াছিল। যখন ১৯১২ বৎসরের বালকসময় তখনই অন্তরনাধারণ প্রতিভা ও বাড়িবেশের পরিচয় তাঁহাতে দেখিতে পাই। সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও বাংলা পড়েন; বাঙালিতে এক পত্রিত্তের প্রব্ধের উত্তর দিতে না পারায় উচ্চ পণ্ডিত কটুক্তি করিলে পিতা বিষমময় পুত্রকে বৎসরোনাখি প্রহার করেন। জুদেবের প্রতিভাশীল দৃষ্ণের বিরোধে জাগিয়া উঠিল। যে সংস্কৃত পড়িয়া পণ্ডিতগণ এমনকি পিতা পণ্ডিত এক নির্দয় নির্ভূর হইতে পারিয়াছেন, সে সংস্কৃত তিনি পড়িবেন না—প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন। এ বহুভক্ত পণ্ডিত আর কিছুতেই ডালিল না—তখন পিতাই তাঁহার ইংরাজী পড়িবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। লক্ষ্যত কলেজ ছাড়িয়া তারপরই তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হইলেন। ইহাই পণ্ডিতসম্মান জুদেবের ঐদিনে ইংরাজী শিক্ষা গ্রহণ করিবার মূল ইতিহাস। সেখানে প্রথমদিকেই শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ভূগোল পড়াইতে পড়াইতে ক্লাসের মধ্যে সুদীর্ঘ যে কমলালেবুর মত গোল এসব ধরার জুদেবের পিতা বা দেশের পণ্ডিতেরা জানেন না বলিয়া স্নেহ করেন। জুদেব ছুটিয়া গিয়া পিতাকে বিজ্ঞান। করিলেন—সুদীর্ঘের আকার কি প্রকার? পিতা সুদীর্ঘ যে আনলক ফলের মত গোলাকার তাহা বলিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না—পাত্রগ্রহ হইতে বচন-প্রমাণ দিয়া দিলেন। পরদিন উহা দেখিয়া শিক্ষকে লক্ষিত হইতে হইল। এই প্রসঙ্গে জুদেবের আর এক লাভ হইল তাঁহার লম্বপাটী উপগ্রহিত্ত প্রতিভোচ্ছল কবি মধুসূদন দাসীর মধ্যমোব্যাপরায়ণ জুদেবের প্রতি একান্ত আকর্ষিত হইলেন। হিন্দুশাস্ত্র ও জ্ঞানভাণ্ডারের প্রতি জুদেবের বিশাসবলক উপ হইল। তিনি ইংরাজীতে লেখালে শ্রেষ্ঠ শিক্ষা গ্রহণ করিলেন, শিক্ষাবিত্তাগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া ৫০ টাকা

হইতে ভবনকার দিনে ১৯০০ টাকা পর্যন্ত বেতন পাইয়া গৌরবজনক জীবন অতিবাহিত করিলেন। তাঁহার অনবদ্য ইংরাজী ভাষার লিখিত তুচ্ছিত বিপোর্টগুলি সাহেবদেরও অল্পকণবোগ্য হইয়াছিল। ইহা কম তুচ্ছিতের কথা নহে। সেই বিশেষ সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিক্ষা-সংক্রান্ত জুরি জুরি গ্রন্থপড়িয়া তার গায় গ্রন্থ জুড়েনের এক অসাধারণ কবিতার পরিচয়। সংস্কৃত দর্শন পুরান তন্ত্রশাস্ত্রও বেন উচ্চার করিয়া পড়িয়াছিলেন। বাহা তিনি এছাড়াও জানিয়াছিলেন, তাহা জীবনের সঙ্গে মিলাইয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার অনলস কর্মজীবনের কীকে বহুলাংক গ্রন্থ রচনা করিয়া দেশবাসীকে মহত্বের চানিবা বহিঃতে আশ্রয় উত্তর করিয়াছিলেন। বার্তা-শাস্ত্রের ব্যবহারিক জ্ঞানও তিনি প্রকৃষ্ট পরিমাণেই দেখাইয়াছেন।

তাঁর গ্রন্থনিচয়ের মধ্যে এখানে কয়েকখানি জ্যেষ্ঠ প্রণেয় নান করিব—পুণ্যজালি সামাজিক প্রবন্ধ ও পারিবারিক প্রবন্ধ।

পুণ্যজালি অতুলনীর গ্রন্থ। ইহাতে ধর্ম-বিশ্বাসের মূল ব্যাখ্যা করিয়া আত্মবৃত্তিক অস্ত্রান্ত্র বিশ্বাসের আলোচনা করা হইয়াছে। শিতার মত পণ্ডিত ব্যক্তির চরিত্রপ্রভে বসিরা শাস্ত্রার্থ প্রবণে তাঁর অলপত-সংশয় দ্বন্দ্ব আত্মাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক তথ্য সমন্বিত যে আলোক উপলব্ধি করিয়াছিল তাহাতে জানা যায় যে বিশ্ব সংসারে কিছুই নূতন নষ্ট হয় না। বাহা আছে তাহা অবীক্ষিত পরিবর্তিত-সংস্কৃত করা ব্যতীত কার্যের নাই। উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন যে ভক্তিগত পরার্থ জটরাগ্রিতে জীর্ণ হইয়া নাগে অর্হি বক্ষা রূপ বারণ করিতেছে, অচেন্তন ভক্ত চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া স্পন্দন, মনন, চিন্তনাদি ক্রিয়া নির্বাহ করিতেছে। হস্তধাঃ বহির্ভূতমান ভাগ্যতিক পরার্থ-সমুৎ ও চৈতন্যবিভাজ্য আত্মস্বরূপের মধ্যে কত মিবিড় সম্পর্ক। জীব ও জীবাত্মা কত বসিত। এই জীবাত্মা বা বিশ্বাসের উপাসনা দুই প্রকার—সকাম ও

নিকার। সকাম উপাসনার সাহায্য দেখাইয়াও নিকার উপাসনার বহিরাই একান্ত করিয়া দেখাইয়াছেন। এই নিকার উপাসনাকেই তিনি সাক্ষ্য পণ্ডিতসান আখ্যা দিয়াছেন। তাঁহার কথা—“ইউসান করিব—স্বপ্ন বিনষ্ট হয়—হৃৎক, পরীষ বাহ—খাউব, নাব জুহ—জুহক, এবং এতিজ্ঞানরূপ বীরসুখবোমাই এই মহাসাধনে হত হইতে পারেন।”

এই নিকার উপাসনাই তো বহিঃসাহিত্যে অগ্রদূতন বর্ষের রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে, এই নিকার উপাসনাই তো খ্রীষ্টপূর্বমহংসদেব ও বিবেকানন্দের বৈশ্বাত্মিক বাহু-উপাসনা। জুড়েন অস্থান ১৮২৩-এ, পরমহংস দেব ১৮৩০-এ, বঙ্কিম ১৮৩৭-এ। শাস্ত্র বিদ্যালী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত শিতার কাছে শীকা লাভ করিয়া জুড়েন যে ভাগবত উপাসনার সাহায্য রূপান্তরিত করিলেন তাহাই পরে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অল্পমুহুর্ত দেখিতে পাইতেছি। বঙ্কিম এই পুণ্যজালি হইতেই যে মার্কেটের মহাদুনির মধ্যে তাঁহার আনন্দ মঠের সত্যানন্ডকে পাইয়াছেন তাহা স্মার করিয়াই বলা যায়। বঙ্কিমের মৃগানিনীতে বাহার স্বরূপাত, আনন্দমঠের ‘বন্দেমাভারত’ সঙ্গীতে বাহ পূর্ণ পরিপণ্ডিত এবং কলগাধ্যস্তের দণ্ডের বাহ প্রথম সার্থক প্রকাশ সেই মার্কেটের প্রেরণাও বঙ্কিম জুড়েনের নিকটেই পাইয়াছেন। বাঙ্গালী জাতির পরাধীনতার মানি হইতে যে আত্মবৃত্তা বোধ বহিঃক্ষেত্রে প্রবেশক হইয়া দেখা দিয়াছে তাহার উৎস কোথায়? কর্মব্যপণে বঙ্কিম ১৮৩৬ হইতে ১৮৮১ পর্যন্ত চুঁচুকার ছিলেন এবং জুড়েনের বসন্তবাসির নিকটেই কোড়াবাটে বাসা লইয়া-ছিলেন। জুড়েনের গৃহে বঙ্কিম, হেমচন্দ্র প্রভৃতিগ সাহিত্যিক আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াই বসিত। জুড়েন পৌরী খ্রীষ্টপূর্ণ অগ্রদূতগা দেখী এডুকেশন গেজেটে জুড়েন রচিত সংস্কৃত গান উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন ‘বন্দেমাভারত’ সঙ্গীতের প্রেরণা কোথায়। জুড়েন মার্কেট-আরাধনা মঠে জাহত সাতার মৃতি বহন করিয়া নান দিগাচেন—“অবিভারতী।” মঠ দুইটা নিরূপণ—

(১) যেনো তা হবিন্দব। পদতলে নীলাবলীলাকিতা
সিদ্ধা পিতৃতরঙ্গিনী জুদেবী নীলমুদিতকিনী ।
স্বর্দেশে প্রতিবিম্বিতাধরনগ্ন-প্রাণেশ-বোলি-অলা
সৌন্দর্য্যভাবিকারতী ভরহরা নিত্যায়রা শাস্তরে ॥

(২) বাতর্নামি ভবতীঃ সতীদেহরূপাঃ
মাতন'মামি বহুধাতলপুণ্যভীর্নাম ।
মাতন'মামি পদবুধ্যভা-সমুদ্রাঃ
মাতন'মামি হিরণ্যোর-কিতীটভূম্যাম্ ॥

আসন্নুজহি মালব্যাপিনী সতীদেহরূপা ভারত মাতার
বন্দন:ই তো 'বন্দেমাতরম্' সতীতের উপাধান যোগাইয়াছে
রবীন্দ্রনাথও আশ্রয় ঐ কথা—

নীল সিদ্ধলল দোত চরণতল
অনিল বিকম্পিত প্রাণল অকল
অধরচুম্বিত তালগিহাচল
তলভূম্যাম কিরীটিনী ।

'বন্দে মাতরম্' সতীতের কোন কোন অংশ যে
জুদেবই অদলবদল করিয়া দিয়া বর্তমান আকারে
পৌছাইতে সাহায্য করেন—একথাও প্রীযুক্ত অজুতপ:
দেবী উল্লেখ করিয়াছেন ।

কবি হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ভারত বিলাপ ও বন-
বহাবিদ্যা রচনার প্রেরণা স্পষ্টতই জুদেবের নিকট হইতে
পাইয়াছেন । জুদেব পৌত্র বটুকদেব সুখোপাধ্যায়
বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের এক সময় পিতার মতি
পাশের বাড়ীতে বাসকালে জুদেবের সংস্পর্শে আসিবার
কালে তাঁহাদের স্বপ্নে সংঘর্ষ চিত্রা করার অভ্যাস হুটে ।
সিদ্ধার কর্ণের প্রেরণার শক্তিনিকেতনের অবিস্মৃৎ
সম্বন্ধেও জুদেবই আলোকপাত করেন । রবীন্দ্রনাথ
বহু বটুকবাবুকে এসব কথা বলিয়াছেন বলিয়া এজুতেশন
সেজেটে বসিত আছে ।

দেপাত্যবোধ ও স্বভাটিক্রীতি জুদেবের স্বজাগত ছিল
—তাঁহাদের গৃহের পরিবেশে উহা দানা বাঁধিয়া উঠিতে-
ছিল । সুগভীর মানবতাবাদী জুদেব পারিবারিক

এবং হৃদয় বিচার ও দুষ্টি সহকারে ব্যক্তি লইয়া
যে পরিবার, পরিবার লইয়া যে সমাজ, সমাজ লইয়া
যে রাষ্ট্র—ইহা সুনির্দিষ্টভাবে প্রতিপাদন করিয়া ব্যক্তিগত
ও সমষ্টিগত মানবের জীবনের বিপ্লবতা ও পঙ্কজতা
গড়িয়া জুদিবার নানা উপায় বিশ্লেষণ করিয়াছেন ।
সুখিবীর বত বর্ষ, বত সত্যতা সময়ে তিনি নিরন্তর
বিচারে আনিয়া ভারতীয় বর্ষ, ভারতীয় সত্যতার উৎকর্ষ
সুপ্রদর্শিত করিয়াছেন । এই প্রেরণাই বহির্জ সন্তান
জুদেব তাতিকে বাহারা সন্তত প্রেরণা দিয়া বহির্জ
বাণিবে সেই ব্রাহ্মণ পণ্ডিত অধ্যাপকগণের উদ্বেগে এবং
বিনাশ্যে অনসাধারণের চিন্তাসাগর উদ্বেগে এক লক্ষ
বাট হাজার টাকা দান করিয়া এক অসম্ভব কীর্তি স্থাপন
করিয়া গিয়াছেন ।

জুদেব সমসাময়িক যমুনেশ্বর, রাজনারায়ণ এবং এমন
কি বিভাগস্বরের মতও হরত প্রগতিশীল ছিলেন না ।
কিন্তু তাঁর স্বকণ্ঠস্বরের কাচাশ্রোতারের মধ্যে কখনও
মোড়ামিশ্রলত একদেশদর্শিতা ছিল না । বরং তিনি
হিন্দুশাস্ত্র, আচার ও নিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ সাধক হইয়াও
পান্ডাভ্যের তৌলনগ্নে সমস্ত কিছুই বাটাই করিয়া
দষ্টা করা করিয়াই ভারতীয় পদ্ধতির শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন
করিয়াছেন—সঙ্গে সঙ্গে পান্ডাভা ভগবৎ সর্বত্রই নীকার
করিয়া লইয়াছেন । বেশের পরাবীনতার অভিযোগ
তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়াছে, তবু ইংরাজশাসকদের
প্রদত্ত ভাষা, শিক্ষা, ধর্ম, আচার ও সংস্কৃতি সম্পর্ক নীকার
করিয়া তাহারাই সংযোগে সর্বতোভাবে আত্মরক্ষার চক্র
ভাঙতবালীর মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন । তিনি
বাহ্যকে গন্থক করেন নাই, তাৎকালিক গুণ্য করেন নাই,
কিন্তু তাহা হইতে বিপদ কি তাহাই দেখাইয়াছেন ।
দেশপ্রাণতা, স্বভাটিক্রীতি, ধর্মনিষ্ঠতা ও সর্বোপরি
স্বাধীনতামনোবোধ তাঁহাকে কখনও অমাত্রব করে নাই,
পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ দমনী সমালোচক হিসাবে নিজের গলপ
ও অপরের অল্পকরণযোগ্য গুণ তত্ত্ব ভর করিয়া বিশ্লেষণ
করিয়াছেন—এই যানেই জুদেবের পাণ্ডিত্য ও সহিত্য

অনন্তসংসারণ হইয়া উঠিয়াছে। অতি উচ্চ আদর্শের প্রেরণাই তিনি বিধবাবিবাহ আন্দোলনের মত ঘটনাকেও প্রাণের সঙ্গে মানিয়া লইতে পারেন নাই।

সাংবাদিক প্রবন্ধে প্রবল আশাবাহী ভূমক ভবিষ্যৎ-কাল সম্বন্ধে অনেক আলোচনা ও আলোকপাত করিয়াছেন। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা ও আশামের শিক্ষা-পরিদর্শকভাবে ভারতের সম্বন্ধে বহু জ্ঞান আহরণ করিয়া হিন্দীভাষার মাধ্যমে যে ভারতের শিক্ষা, ধর্ম, আভিয এবং সুদিনের লাভ করিবে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। নির্দম লজ্জাক্রমে তথ্য-সংগ্রহের ভবিষ্যৎ-বাহী আল কাষে পরিণত হইতে চলিয়াছে। এককালে আবার তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলিয়াছেন—“আজ ইংরাজ আমলের আদর্শ। ইংরাজী শিক্ষার বলে যে ইংরাজ আমানিগের আদর্শপূর্ব হইয়া সভ্যতায়, ইহা অবজ্ঞাসহী বলিলেও বলা যায়। ইংরাজীশিক্ষার বিষয় হইতে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা পাইবার উপায় কিছুই নাই, বলিয়াই বোধ হয়। তবে বাল্যকাল হইতে বহি ইংরাজীর সহিত সংস্পর্শে নিম্ন হই তাহা হইলে কলকটায় বিধর্ম লাগিতেও পারে।”

ভারতীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের বাধক ও বাহক এই সংস্কৃত ভাষা। ভূমক নিজে এর মূল্য জীবনে উপলব্ধি করিয়াই এতটা বলিয়াছেন। আজ নানাপ্রকারে সংস্কৃতকে উৎখাত করিবার চেষ্টা হইতেছে। আভির উপর বত চূর্ণিত আসিয়া চাপিয়াছে, দেশীয়দিগের হাতে তাহাই আরও বনীভূত হইতেছে।

কিন্তু ভূমকের স্বকীয়ভাবের ও দেশভক্তি মাতৃভাষা বাংলার প্রতিই তাঁহার দৃষ্টিকে নিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। ভূমকের চাকুরিসম্পর্কিত বিশেষত্বগুলি বাদে অনবদ্য সাহিত্যসৃষ্টি সমস্তই বাংলায়। পিতা বিশ্বনাথ নিজে বাংলাভাষায় রাজকীর্ত্তনকারের কীর্ত্তনশের তাৎপর্য্য রচনা করেন—উহা “বিশ্বনাথ রায়চন্দ্রনাথ খ্যাত।

ভূমকের সময়ে পাত্রীসাহেবদের চেষ্টায় বাংলা

গানের রূপ গড়িয়া উঠে। রামমোহন, অক্ষয়কুমার মল্ল, মহাবিবেকানন্দ, বিভাগাণ্ড, ভূমক, পাণ্ডিত্য, বঙ্কিম প্রভৃতি বাংলা গজক সাহিত্যরচনার অবদান করার দীর্ঘ দীর্ঘ বাংলা গজ উচ্চ সাহিত্য-দম্পবে মণ্ডিত হয়। এর মধ্যে বিভাগাণ্ড ও ভূমকের কৃতিত্ব অসাধারণ। একতরফে ভূমকের সরল, প্রাণ, হৃদয় ও আধুনিকতা-সম্পন্ন গভীরতা আমাদের মুগ্ধ করে। গভীরতায় সেই গোড়ার যুগে যে সংস্কৃতিগত ভাবকে তারাজাত্য করিয়াছিল তেমনটি ভূমকে একই প্রাণে।

ভূমকের ১৮৪০-তে রচিত ‘ঐতিহাসিক কাহিনী’ প্রায় একখানি উপভাগ, ইংরাজী অঙ্কুরণে রচিত। এর পূর্বে অধুনাপ্রকাশিত ভাবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘নবযাত্রা বিলাস’ ও ‘কলিকাতা কল্যাণক’ বাংলা ভাষার প্রথম উপভাগ বলিয়া মানিতে হয়। ইহার পরই ভূমকের উপভাগ। ভাবানীচরণের প্রায় বাধ ও বিস্তারিত ভাষার রচিত। ঐতি উপভাগ বাংলা বঙ্কিমচন্দ্রে আত্মপ্রকাশ করিয়া বাংলা সাহিত্যকে বহিমান-মণ্ডিত করিয়াছে তাহার মূলপ্রেরণা এই ভূমকে। ১৮৪৫-তে রচিত ভূমকের প্রথম উপভাগ ‘জর্জেশনমিনী’-খানি পাশাপাশি গাথিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে ভাবানীচরণ ও বর্ণনাত্মক ভূমকের আদর্শই বঙ্কিম অঙ্কুরণ করিয়াছেন। উল্লেখযোগ্য এই যে ঐতিহাসিক উপভাগ বলিতে বাংলা বুঝা যায় তাহা বাংলা সাহিত্যে ভূমকেই প্রথম প্রকাশ করেন। হৃদয়ের বিষয় ভূমক সংস্কৃত পূর্ণা রচনার চং-এ পূর্ণাঙ্গি প্রায় লিখিলেও আর উপভাগ রচনা করেন নাই। ভূমক এতদেব আভাসে বলিয়াছেন যে ইংরাজী নববলের অঙ্কুরণেই তিনি প্রথম প্রকাশিত রচনা করেন।

বঙ্কিমচন্দ্র ভূমকের প্রকাশিতকীর্ত্তন মূল্য প্রকাশ্য করিয়াছেন—“One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style neither, characterised by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar nor rough and homely like

Tekchand and Hutom—one of the best masters, we say, of Bengali style is Babu Bhudob Mukherjee. He has, unfortunately written little, except works of a technical character, but his little volume of historical tales... is enough to show that he might have done a great deal more than he actually has done." (Calcutta Review)

ভূদেব আরও উৎকৃষ্ট উপক্ৰান্ত লিখিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি তাহা না লিখিয়া শিক্ষক-স্বত্ব কর্ণে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। একজন জ্ঞানবীর, মানবীর ও কর্মবীর, নবদা পরার্থপর অথচ আত্মহ, সংসারলিপ্ত অথচ নিষ্ঠা সংসারী ছিলেন ভূদেব। মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী সহকারে জীবনভর অস্বাভাবিক-বর্ষ নিজে

পালন করিয়াছিলেন, পরিবারে প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বাহ্যে প্রচার করিয়াছিলেন। জাতির দর্শনসংস্কারের যুগে উনবিংশ শতকে স্রেষ্ঠ জ্ঞানমার্গের সাধক ও জাতির পুণ্যপ্রদর্শক গুরু ছিলেন এই ভূদেব। তাঁহার লীকার বীক্ষিত হইয়াই বিভিন্ন প্রকৃতি সাক্ষ্যসাধকগণ ও মনীষিবৃন্দ নিষেধের কর্তব্যপথ দেখিতে পাইয়াছেন; দেশে স্বাভাৱ্য ও দেশপ্রেরণ পাইয়া আজ স্বাধীনতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছে। শক্তির কার্যকারিতা অনেক সময়ই দুর্জয়। আজ ভূদেবের অমর আত্মার কাছে তাই নিমিত্ত জানাই—‘জাতির গুরু ভূদেব তুমি লহ নমস্কার!’*

*১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩৪২, বৃহস্পতিবার (ইং ১৫/৫/৪২) তারিখে চুঁচুড়ার অস্থিত ভূদেব-পুণ্ডিতভার পরিত।

অনতিক্রম্য

চিত্রর বন্ধ

ভেজানো জানলাটা একটু একটু কাঁক করে দিয়ে হ হ করে এক বলক ঠাণ্ডা হাওয়া এসে চড়িয়ে পড়লে ঘরে। গাটা শির শির করে উঠতেই চোখ খুলে গেল নীলার। পোষা দুধশীগুলো তখন উঠানে আল বেগ ঘরে বলে অবিরাম গতিতে হেঁকে চলেছে—কোঁকোঃ কোঁক—কংল আগো—ও।

কটা বাজলো? হুটা বেজে গেছে? এলোবেলো: শাজীটাকে কোন রকমে গারে জড়িয়ে নিয়ে ভাড়াভাড়া খাট থেকে নেমে পড়লো নীলা। স্নাইটো জেলে দিয়ে ক্ষতপায়ে এগিয়ে এলো ছোটো টেবিলটার ধারে। তারপর তরে তরে ছুঁতে তুলে ধরলো টাইবিশটাকে।

সবে পাঁচটা! ও, এখনও দুই দুই করছে বুকেং দেহভরটা। তেবেঙিলো না জানি কতো বেলা হয়েছে

—আটটা—নটা বেজে গেছে হয়তো। ছটার কলেজ। প্রথম বকোতেই আবার ‘নি-বি’র ক্রাশ। কি যে খুঁতখুঁতে লোক। এক মিনিট দেহী হোলে আর পাসে’স্টেজ দেখেন না। একি অহেতুক কড়াভি। দশ মিনিট পরে নাম ডাকলে কি কলেজ উঠে যাবে, না চাকরি বতম হোয়ে যাবে একেবারে ব্যানাজির। কতো দুঃস্থ বকে মেয়েদের আগতে হয়। অনীতা আসে ক্রামবাজার থেকে। শেকানী আসে আতো দুই থেকে—পাঁচ বাবার মোড় পেরিয়ে দেই টালা থেকে।

এর একটা প্রতিবিধান হওয়া প্রয়োজন। শেকানী, মালতী, স্মিতা, মধু ওদের সকলের সংগে সকলের মূষণাজী হোয়ে নীলাই না হয় বাবে একদিন প্রেসিপিালের ঘরে। মেয়েগুলো আবার যা জীতু। হয়তো ওকে

ট্রেস দিয়ে একে একে সকলেই পিছিয়ে যাবে। যা রানভারী উল্লোলক। তা হোক। সে তো কোনো ক্ষমতা করছে না। একটুও ভয় করবে না ও। সোজা ঝড়িয়ে জোর গলার বলবে—এর একটা প্রতিবিধান করুন সার।

যাক সে সব কথা। তবে তো পাঁচটা। হাত-পা গুলো আর একটু ছড়িয়ে নেবে নাকি। উঃ, যা নীত। বুঝে যাবার কথা মনে করতেই গায়ে জর আসে। চোখ দুটো কি ভীষণ জ্বালা করছে। কাল রাত্রে তো শুতে শুতেই তিনটে বেজে গেল।

গত রাত্রির কথা মনে পড়তেই একটা মিষ্ণু হাসিতে তিক্তমুখ করে উঠলো নীলার চোখ দুটো। কি অপূর্ব রঙেই এসেছিলো তার জীবনে। এইটুকু জীবনের গোলা-গুন্ডি হাজিগুলির প্রত্যেকটি এ সুখের সম্বেশ বহন করে আনে না কেন!

হাথার বাসিন্দা তুলে ধীরে ধীরে খামটা বার করে আনলো নীলা। চারপাশে একবার অতি সতর্কসূচী হুলিয়ে নিয়ে খামটা ফোরে চেপে বরলো বুকে। তারপর অতি সতর্কপণে একটা গাঢ় চুম্বন রাখলো তার মাথার। প্রতিটি হুমকি, বলিষ্ঠ, জামল অক্ষর কি গভীর নির্ভরতার সংবাদই না বহন করে এনেছে। নিরাপত্তা এই বোকাই পৌছেছে কনক। যে কারণে ঘর ছেড়ে এই ভেপান্তরের পারে আসা সেই চাকরি ঠিক হয়ে গেল বিনা বিয়ে। আর একটা বিষয় নিশ্চিত হওয়া গেল। কোয়ার্টার নিশেছে। নতুন কোয়ার্টার উঠলো ডবের ভঞ্জে। দুখনি শোবার ঘর। তা ছাড়া বসবার ঘর, ভাঁড়ার আর গরাদঘর। ইলেকট্রিক নীয়েই আসছে।

নতুন বক্তাকে কোয়ার্টার। সারির পর সারি নতুন কলি ফেরানো সাধা সাধা একই ধরণের বাড়ী। জর রাজহংসের মতোই বেন বংকিম প্রীতবোধ উদীত করে সারি বেঁধে আড়চোখে হাসছে ওরা নীলার দিকে চেয়ে। কি সুন্দর। বুকাটা হাসে উঠলো নীলার।

নীয়েই কিবে আসছে কনক। তারপর বার ইচ্ছে,

কিরেটা ভালোয় ভালোয় চুকে গেলে সকলে নিলে চলে যাবে বোকাই।

কি ছেলেমানুষ এই কনক। কথাটা কি এতই সোজাভাবে বলতে হয়। এ যে ইংগিতে বলার, সোজা কথার কটমট করে বললে যে এ কথার জ্বর বেড়ে যায় রসারনে প্রথম হোরে উজীর্ণ হবার পরেও কি তাকে এরমিতাবে কলম হয়ে শেখাতে হবে নাকি! ছি!

বিয়ে! —বেহের গুটি কহিয়ে আবার একটু হাসলো নীলা।

ক্রামে পৌছলো নীলা ছটা বেজে ছ' মিনিটের মাথার। এদিক ওদিক চেয়ে বসবার মতো একটা আরগা খুঁজছে এমন সময় স্মৃতি তাক দিলো—নীলু, এদিকে।

প্রথম বেকিতে বসেছে স্মৃতি। একটু ইন্তন্ত করে শেঘের দিকে আঙুল-বেহিরে নীলা বললে—চলুন ওদিকে। বেশ নিরিবিলিতে বসা যাবে। সামনের বেকিতে বসে ভালো। বেহের মতো মন দিয়ে পড়া শুনতে আজ আর ভালো লাগছে না তার।

স্মৃতি: ঝিল ঝিল করে হেসে উঠলো নীলার কথার। তারপর জ্বর করে বসে উঠলো—একি কথা শুনি আজ বছরটির সুখে। ফাস্ট গাল' বসেছে কিনা লাস্ট বেকে। সোনার পাখর বাটী নাম দিয়ে জুই একটা রিসার্চ আরম্ভ করে যে। ডক্টরেট পেয়ে যাবি লক্ষ্যেই।

এ বেহের সংগে কথা বলাই তার। এরই মধ্যে বেহেরা দুখ টিপতে আরম্ভ করেছে।

চুপচাপ স্মৃতির পাশেই বসে পড়লো নীলা। 'এই এক বছর এদের। দেখা হোলোই জাঁকা-বাঁকা কথা ছুঁড়বে হৃদয়ে দুখনের দিকে। আবার একদিন একজন কলমে না এলে অবনি অজ্ঞান ছুটেবে তার বাড়ী।

এবনি একদিন স্মৃতির সংবাদ আনতে গিয়েই তো ওদের সংগে আলাপ।

নীলারের মতোই ছোটখাটো সংসার ওদের। বাপ-মা, ভাই-বোন মিলিয়ে বোটা চারটি প্রাণী। অতি

‘প্রথমে অতি শান্তির নীড় শুদের। মনেই হয় না আত্মকের এই অর্ধৈতিক সংগ্রামের বিমূর্ত্তি কোলাহলত ওরা কতদূর পার।

প্রথম দিন নীলকে দেখেই অস্বস্তির বা বলদ্বিলেন—
—‘হুমি দেখেছিলি কি অস্বস্তির বেয়ে। টিক বেন অস্বস্তি।’

—‘কুমিই দ্যাখো। দেখে দেখে চোখ লটে গেছে আবার।

তারপর দিন কিছু কয়েকে এগেই নীলকে ছায়াতে
:‘কড়িয়ে গের চুখ খেরে বললে অস্বস্তি—

—এই কাকুলী কাল থেকে ঘোমটা বিরে আসবি কলোকে। স্নেহগুলোকে আসিয়ে সেভটা দরকার, এই আসিয়ে আর চাকুলি খানি নাই। বাবা আজ তোদের বাড়ী গেছেন তোরা লগে দাবার বিরে টিক করতে।

নীলা স্বতাব-লাজুক। লকলের চেয়ে কথা কম বলে ও। তবুও ইচ্ছে করছিলো অস্বস্তিকে লড়িয়ে ধরে বুকে বুপ ভাঁজে বলে—‘গুলে বল ভাই। ছুটি পায়ে পড়ি তোরা। কিন্তু না, কিছুই বলতে পাহেনি সে। অতি বীরে বীরে তার শান্ত গভীর চোখ দুটি কেবল নামিয়ে এনেছিলো বাটতে।

—ওয়ে শুনছ? You please নীলা!

লজিত হোয়ে উঠল নীলা। একেসার বানার্জি তারই দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন। আরক্ত মুখে বাণী নীচু করলো সে।

—‘কি হোলো তোমার আবার? বন ভালো নেই? সয়েছে জিজ্ঞাসা করলেন একেসার বানার্জি।

কি বলবে নীলা। কি করে বোঝাবে গীকে কত ভালো আজ তার মন। মাথা নীচু করে বেকির-শুপ-নব দিয়ে বাগ কাটতে কাটতে উত্তর দিলো—না তাব, এখন একটু।

—এই তো লক্ষী বেয়ে। তোমাদের মতো ভালো মেয়েরা অস্বস্তিক হোলো কি করে ক্রাশ চলবে? You

must set an idial before them.

পেছনের দিকে ইংগিত করেন তিনি।

একটা চাপা শুভন শুটে বৃহৎ প্রতিবাদে।

—শালুক চিনেয়েন গোপাল ঠাকুর। পেছন থেকে একজন বললে কথাটা।

একেসার বানার্জি গভীর হোয়ে চোখ ফেরালেন ক্রাশের দিকে। তারপর বীরে বীরে প্রাটকর্ষ থেকে নেমে দাঁড়িয়ে বললেন—

কি নীচ মন! ছি-ছি কি হীন প্রবৃত্তি হোচ্ছে আজকাল তোমাদের। তোমাদের ক্রাশ আর নেখো না আমি। In protest to such narrow mindedness I beg to retire. তোমরা বেতে পারো।

দরোজার দিকে শা বাতালেন তিনি। এই স্বতাব একেসার বানার্জির। মাঝে মাঝে সামান্ত কারণে এমনি হঠাৎই ক্রোধে আত্মহারা হোয়ে ক্রাশ চেড়ে চল বাল তিনি।

একটা গভীর আশ্রিত্তে মনটা তরে উঠলো নীলার। যদি আজ ক্রাশ না হয় সবত ক্রাশের বাগ পড়বে তার ওপর। অনেক ক্রোধ আছে আজ তার মরাত্তে। সে উঠে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধভাবে বললে—এবারের মতো দরকার করে কথা করুন ক্রাশ।

বেতে বেতে গুরে দাঁড়ালেন একেসার বানার্জি।

—সে কি, তোমার কি দোষ?

—না তার দোষ আমারই। আপনি আজ ক্রাশ না নিলে বুঝবে আমার কথা করেন নি আপনি।

—Then for your sake। কিন্তু আর যেন না হয়।

কিরে এসে চেয়ারে বসে বললেন,—দাঁও, বই দাঁও।

বাংলার ক্রাশ। রমণী পড়া হয় এ খণ্ডায়। নীলাই ভাড়াভাড়ি নিষেধ বইটা একেসার বানার্জির হাতে ফুলে দিলো। বই গুলেই প্রশান্ত হোয়ে গেলেন একেসার বানার্জি।

—কোথার পড়া হচ্ছিলো? কতো পাতা? শিত বুখে এর করলেন একেসার বানার্জি।

—পাঁচতর পাতা ভ্রায়। বট পরিচ্ছেদ।

কলকর্তে সারা ভ্রাণ আবার উষল হোয়ে উঠলো। এটা সহজেই উপলব্ধি করা গেল, একেবারে ব্যানাজির প্রত্যাবর্তনে সকলেই বিশেষ সুখী হোয়েছে। সত্যি, কি অপুর পড়ান তত্ত্বলোক। কি দরদ প্রীতিটি নব্বৈ। মনেই হয় না তিনি পড়াচ্ছেন। মনে হয়, ভ্রাণ শুদ্ধ হেরেকে তিনি এক নতুন রাস্তা উপস্থাপিত করেছেন,—যেখানে প্রতিটি চরিত্র আপন স্বাভাবিক হোয়ে যোগ্য-কেনা করছে সকলের সামনে। এতদোক চরিত্র যেন তাঁরই মধ্য দিয়ে নৃত্য হোয়ে উঠেছে।

একেবারে ব্যানাজি এক হাতে বই ধরে, অন্য হাতে বিবৃত করে প্রতিটি পদ বিশেষ বিশেষ ভঙ্গী সহকারে উচ্চ কর্তে আবৃত্তি করতে লাগলেন,—

‘ওতে বীরে, রজনী! বীরে, বীরে; আমার এই কদর মলিরে প্রবেশ কর! এত ভ্রত-সামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, বীরে, রজনী বীরে। সূত্র: এই পুরী, আধার, আধার, আধার চিহ্নাকর। দীপ-মল্যাকার ভ্রায় হইতে প্রবেশ করিয়া আলো কর :—দীপমল্যাকার ভ্রায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আধার পুরী আলো করিবে।’

ভ্রায় হোয়ে স্তন্যে সমস্ত ভ্রাণ। নীলার মনে হলো শচীশ্রের মতো একেবারে ব্যানাজির জীবনেও কি এমন এক রজনীর আবির্ভাব হোয়েছিলো। উনি কি এমনি ভাবেই সে আবির্ভাবকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। এমনভাবেই কি প্রশ্ন করেছিলেন সেই আকস্মিককে,—
“ওতে বীরে, রজনী বীরে। এ পুরী আলো কর, কিন্তু বাহ্য কর কেন?” এ প্রশ্নের উত্তর পেতে বড় সাধ বার নীলার। কিন্তু সাধ হল না। কি উত্তর আসবে ওই ভুল কেশ বক্সির বুকের আলিতময় বৃণপল্লবের ভেতর থেকে। সেদিন শচীশ্রের বিরাট ভ্রুণশিঙটা কতো ভ্রুণগতিতে আন্দোলিত হোয়েছিল তার কি আভাস যেনে ওই বিনীর্ণ নিরাসংকুল, নিবিদ্য হাত ছুটি।

বড় ভয় হয় নীলার। তারও জীবনে কি এমন

একদিন আসছে! তাদের চোখের আলো কি এমনি ভাবেই একটু একটু করে নিতে বাবে! জনকের ভট বীণামান হুখশ্রী কি এই বুকের মতোই আলিতময় গল্পের পরিণত হবে।

উঃ, বাগো! আশংকার, উত্তেজনার চোখ বন্ধ করে নিল। একেবারে ব্যানাজি শুধন গভীর আবেগেও লংঘে পড়ে চলেছেন—

“কখনও দেবতার এই অসংখ্যোত্তীর্ণর, কান্তরপথর যেকোনো নৃত্যে পরিপূর্ণ। তাহারা পবিত্র অমরপথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে, তাহা মিলেব অংগের সৌরভে আমার নাগরহু, পরিপূর্ণ হইতেছে। কিন্তু বাহ্য দেখি না কেন,—সকলের মধ্যস্থলে—রজনীর সেই প্রসন্নময়ী নৃত্য দেখিতে পাইতাম। হায় রজনী! পাথরে এত আসন।”

আর বন্ধ করতে পারছে না নীলা, বক্সির বুকের এই আবেগ রোমন্থন। মনটা বিধিরে উঠেছে তার। হয়তো নীলা তখন উঠে চলে যেত ঘরের বাইরে যদি না একটা ঘটনা ঘটত উদ্ভাপাতের আকস্মিকতা নিয়ে।

একেবারে ব্যানাজি পাতা গল্টাভেই কইয়ের ভেতর থেকে এক টুকরো কাগজ খট করে পড়লো টেবিলের ওপর। একটা উগ্র কুলেলে ভেলের গছে সাধা ঘরটা ভাবে উঠলো। যেহেতু সচকিত হোয়ে চাইল একেবারে ব্যানাজির দিকে।

একেবারে ব্যানাজি হয়তো ব্যাপারটা একটুও লক্ষ্য করতেন না। কিন্তু সেই উগ্র বদির গন্ধ তাঁকে পর্বত সচকিত করে তুললো। নাটকীয় ভাবে বাবা পাণ্ডুর বেশ বেগে গিয়েছিলেন তিনি। ভ্রুণ-কৃতক করে নীলার দিকে চোখ বেগে প্রশ্ন করলেন—

—কি হে ব্যাপার কি? নোট নাকি?

—কি জানি ভ্রায়, মনে নেই। বোধ হয় নোটই হবে।

—And written with a pen dipped in such

scented ink ? এঃ ! কলম তুল করে আভরে ভূবিরেহ নাকি ? ভূমি আজকাল কবি হুজো নাকি হে ?—কথা বলতে বলতেই কাগজটা খুলে ফেললেন একেবারে যানাকি । সংগে সংগেই কিছ পঙ্খীর ছোরে গেল তাঁর হৃৎ ।

কাগজের টুকরোটা আবার ধীরে ধীরে তাঁর করে রেখে দিলেন বইয়ের ভেতর । তার পরেই উঠে দাঁড়িয়ে বইটা নীলার হাতে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন তিনি দ্রুত পদক্ষেপে । একটি কথাও আর শোনা গেল না তাঁর হৃৎ থেকে ।

নীলার হাত থেকে বইটা কেড়ে নিয়েই কাগজটা খুলে ফেললো হুমিতা । আর একবার সেই উগ্র গদ্য তড়িয়ে পড়লো সমস্ত রূপে । হুমিতা তখন কিছ কাগজটা বন্ধ করে উঠে দাঁড়ালো । তারপর কঠিন হাতে নীলার হস্তবদ্ধ হয়ে বললে,—বাইরে আর নীলা । কথা আছে ।

একেবারে হোতলায় নীলার শরন কক্ষ এসে দরোজার খিল তুলে দিলে হুমিতা । ছোট্টো বরটি নীলার । হাত নীল রং চারদিকের দেওয়ালে । ঘরে ঢুকে প্রথমট চোখে পড়ে ছোট্টো টেবিলটা । না, ঠিক টেবিল নয় । টেবিলের ওপরের ছবি ছোট্টো । একটি রবীন্দ্রনাথের । বোধ হয় কোনও সংবাদপত্র থেকে কেটে নিয়ে রাখা—হোয়েছিল । এখন বরষের তারে একটা হৃৎকৃত্তর কর্ণভা নেমে এসেছে ছবিটাকে দিয়ে । দ্বিতীয় ছবিট নীলার মালয়ভীর । প্রথম বোধনের ছবি ।

সেই দিকেই তাকিয়ে ছিলো হুমিতা । হঠাৎ যেন চমকে উঠে নিম্নে একটু ঠিক করে নিলো । তারপর জানার ভেতর থেকে চিঠিটা বের করতে করতে নীলার চোখে চোখ তুলে বললে—এর মানে কি ?

পাড় নীল রঙের চিঠির কাগজ । প্যাডটা কাপ নীলাই কিনে এনেছিলো কনককে চিঠি লেখবার জন্যে । কাগজের তাঁর খুলতেই চোখে পড়লো একটি চিঠি ।

নীলাকেই দেখা হোয়েছে চিঠিটা—গোটা গোটা ঝাঁক ঝাঁক অক্ষরে ।

ও আশ্রয় আলোর আলো,

তোমাকে আমি কতো ভালোবাসি তাহা কি ভূমি জান না । আর আমি অপেক্ষা করিতে পারিতেছি না । ভূমি কবে আবার হইবে ? ভূমি আমাকে চিঠি লিখিয়া এই বই চাপা দিয়ে রেখে তাহা হইলেই আমি পাবো । ভূমি আমার হৃৎকৃত্তর হৃৎকৃত্তর চুখ নাও । দরাসী, চিঠি দিবে তো ? চিঠি চাই-ই । ইতি—

তোমার ভৃত্য ।

কোনো স্বাক্ষর নেই । সন্মহের অবকাশও নেই কোনো । অত্যন্ত পরিত্রিত হৃৎকৃত্তর । সব পরিত্রার ছোরে গেল । ক্রোধে ভূগার সারা হৃৎ কালো হোয়ে উঠলো নীলার ।

—কে দিয়েছে এ চিঠি ? হুমিতার ঘর শূন্যভীর ।

—সংগে আর । সব বৃদ্ধতে পারিবি । হুমিতাকে টেনে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে ছুটে চললো নীলা ।

—মা । মা ।

—কিরে অত চীৎকার করছিল কেন ? কি হোয়েছে ?

এদিকে আর । ঘর থেকে উত্তর এলো দরাসভীর ।

—মা । রান্নাঘরে এসে দাঁড়ালো ভূমেন ।

—কিরে ? কি হোয়েছে ?

—এই দেখ না তোমার চাকরের কীতি । নীলা উত্তর দিলো ।

—কে গোপাল ? কি করেছে সে ?

—চোখ দুটোর মাথা তো একেবারে খাতনি । পড়েই দেখ না । চিঠিটা এখিরে দিলো সে হুমিতাকে । চিঠিটা এক নিম্নে পড়ে ফেললেন দরাসভী । স্রুগীর বৃৎখানি তাঁর লক্ষ্যে, অপরাধে লাল হোয়ে উঠলো ।

বললেন,—আচ্ছা । তোরা যা । হৃবীর আশ্রয় থেকে । এর বাবু হ'বে ।

—ব্যবস্থা হাই হবে। আদর্শে আদর্শে চাকরটাকে একেবারে মাথার মণি করে তুলেছে। এর প্রতিফল একদিন স্তোম্যের ভূগতে ফল মনে রেখো।

—বেশ হোরেছে। তোমরা এখন বাও এখান থেকে।

—বাচ্চি, বাচ্চি। ছুদিন বামে তো একেবারেই দূর হোরে বাথো।

অলভরা চোখে নীলা বেরিয়ে গেল সুমিতার সংগে।

উন্নয়ন আর নিতে এসেছে। হাই বের করে আবার করলা দিয়ে ভাত চাপালেন সন্ন্যস্তী। তারপর চারের ওপর একটু মল দিতে দিয়ে, মাথা নীচু করে হাতেরা করতে লাগলেন উন্নয়নের সুখে।

কি অল্প দিনই এসেছে। একটু কি ভয় ডর নেই এদের আগে। ভয় হরতো থাকে না ছোটো লোকের। ভা'বলে কি একটু কৃতজ্ঞতা থাকতে দেই। না যেতে পেরে বসছিল। বিপদের সময় আল্লাহ পেতে, ধর্মের সময় ছুটি অর পেতে, এমনি করেই শোব দিতে হয়। এমনি ভাবেই কি কারডাতে হয় সাপের মতন।

সন্ন্যস্তী মাহুটি বড় ঠাণ্ডা। বড় ঘরের মেয়ে। বাবীর ঘরে পা দিয়েও চিরজীবন বাচ্চলোর মধ্যে কাটিয়েছেন। একটু হৈ-হরোড, একটু হাসি-ঠাট্টা এরই মধ্যে তৃপ্তির সংগে জীবনের স্বাধ গ্রহণ করেছেন তিনি। মাহুতের বিচ্ছেদ কোনোদিন কোনো অভিযোগ জানাবার প্রয়োজন হয় নি বিবাহের পরবর্ত্তে।

বখন সুদিন ছিলো কোবরে আল্লার অভিভাবক অল্পভেদী অলভরকারের মধ্যে বহু লোকের অর পরিবেশন করেছেন তিনি। তাঁর বন্ধন প্রসিদ্ধি এ অঞ্চলে সর্ব-জন বিদিত।

হরতো সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নি। কিন্তু এমনি করে আশ্বাস ও তো হানে নি কেউ।

বহুদ্বন্দ্বের আগে সুখেরই একদিন সংগে করে এনেছিলো গোপালকে।

বলেছিলো,—না, আপিস থেকে বেরিয়ে ট্রাবের অন্তে হাড়িয়ে আছি। এমন সময় হেলোটা এসে বললে, সন্ন্যাসিন কিছু খাই নি বাবু।

বলুন, গল্প আরে খাটিন না কেন? ভা, ও বললে, কান্না দিন না। যেখন খাটতে পারি কি না।

তারপর একটু খেবে বলেছিলো,—সংগে করে দিয়ে এলুম না। বা সন্ন্যাসীর অবস্থা তোমার। যদি কোনো সাহায্য করতে পারে।

বহু আঠোরা-উনিশ বরষ। মোটা-মোটা গোল-গাল ভালো চেহারা। কান্নাতে খোকের রেখা কুটে উঠেছে মূল ওঠের ওপরে। ছোটো-ছোটো চোখদুটিতে এক অস্বাভাবিক ভীকু দৃষ্টি।

—আর, তেত্তের আর—বললেন সন্ন্যস্তী।

কথা বলতে বলতে ভয় কেটে গেল গোপালের। সন্ন্যস্তীর নাড়ুতের সাগরে অবগাহন করে অর সময়ই গোপাল তুলে গেল, এখাড়াতে সে একজন আগন্তুক।

কথার করণ্য নামলো গোপালের মুখ থেকে। কতো কথা বললে সে। তার কথা। বাবার কথা। ঘরের কথা। ক্যানিং লাইনের ওরিকে কোথায় বেন ঘর। বাবাকে সে বেধে নি। অভি শৈশবেই পিতৃহীন হোয়েছে সে। বা আর হলে ঘর করতো। এমন সময় তার ডাক এলো ওপর থেকে। না চলে গেল। গোপাল বেরিয়ে এলো ঘর বন্ধ করে।

—নে, বেতে বোস। বেতে বেতে গম মল। আনি-তনি। রাত্রে চাপিয়ে সন্ধ্যার আগে গোপালকে ছুটি তোল-ভাত রে'বে দিয়েছিলেন সন্ন্যস্তী।

নীলা গিয়েছিলো তার কোন বাচ্চবীর বাড়ী। কীরে এসে আহার্যত - গোপালকে বেধে প্রের করেছিলো—এ কে না?

—ও আবার আর এক ছেলে। সয়েছে উত্তর দিয়েছিলেন সন্ন্যস্তী।

—তাই নাকি? সব ভুলছি এসে।

সকৌতুকে হেসে কাপড় হাড়তে ঘরে ঢুকলো নীলা।

গোপাল বলেছিলো, সে নাকি ইকুলে পড়তো। ইকুলে পড়লেও গোপাল কিন্তু কথা বলতে শেখেনি।

—হুই নাথাপানা স্কুলরপাতা মেয়েছেলেটা কে না? অথাক এগ্র করেছিলো সরল চোখে চেয়ে।

—তোর দিদি।

—ওঃ তাই বুঝি?—আর কোনো এগ্র করেনি গোপাল।

সেই গোপাল। তারই হাত থেকে বছর দুপুরে না পুরতে এই চিঠি এলো। ইদানীং অবশ্য মানবানেক হোলো নীলাকে দেখলে ও নিচুনিচু হাসতো, ঈদ দিতো। কতোবার এই নিয়ে নীলা অধ্বোণ-অভিযোগ জানিয়েছে মার দববারে। সরস্বতী ভেবেছিলেন নাকোচ কাটছে বলেই স্বাভাবিক হোয়ে আসছে গোপাল। আর, বাজীর ছেলের সংকেত না থাকাই ভালো। থাক না তাই-বোনের মতো। তবু অবশ্য একটু শাসন করেছিলেন গোপালকে—হিঃ! তবু লোকের বাজী কি ঈদ দিতে আছে রে। ঈদ ঘের ছোটো লোকেরা।

কিন্তু এ কি। হি-হি। মাহুয়ে খোয়া বার গেল। নাঃ, স্রীরকে বলে আজই একটা বিহিত করতে হবে। পাখা রেখে উঠে পাড়ালেন সরস্বতী ভাত-ধরা গন্ধ রুড়িরে পড়েছে নারা বাজীটার।

স্রীর আপিস থেকে ফিরে ভলখাবার খাবার পর চাতের কাপ হাতে দিয়ে কথাটা পারলেন সরস্বতী। বীয়ে বীয়ে অনেক কোশলে, অনেক গুরিরে পাড়তে হোসে কথাটা। বা অবশ্য হেসে। এখনি একটা কাজ করে বলবে হয়তো।

—কোখার সে হতভাগা!—আর গলার হাঁক দিলে স্রীর—গোপাল।

—হুই যদি একটা কেলেকারী করিস আমি মাঝ খুঁড়ে মরবো কিন্তু।

তবে বুক দুঃখের করছে সরস্বতীর। হি-হি তবু লোকের বাড়ীতে একি কাজ। পাড়ার লোকে জানতে পারলে মরলেন কি? লজ্জার বাতির নংসে নিশে যেতে ইচ্ছে করছে সরস্বতীর।

গোপাল কোখার ছিলো, এলে পাড়ালো তাক শুনে। একটু ভয় পেয়েছে বলে বনে বোনো না।

—দাদাবাবু, তাকছেন আমার?

—আর এথিকে।

স্রীর ওকে সংগে করে নিয়ে গেল বাজীর বাইরে। সরস্বতী উৎকণ্ঠিত হোয়ে বলে বইলেন। স্রীরের কি এতটু জান হোলো না। রাত্তার নিয়ে গেল শেষটা।

পরদিন তোর থেকে গোপালকে আর পাওরা গেল না। সরস্বতী ভেবেছিলেন বাইরে গেছে খিড়ি খেতে। এখনি আসবে। এই ভর হুতাব। দিনের মধ্যে পকাশবার খিড়ি খাওয়া চাই।

দুপুর গড়িরে গেল মেখে মনতরা অশান্তি আর অশান্তি নিয়ে নিজের ক্ষত্রে ভাত বাড়লেন সরস্বতী। নীলা কাল থেকে আর একটা কথাও উচ্চারণ করেনি গোপালের লব্ধে।

কি যেরে। না হুই ছেলেটা একটু মোবই করেছে। কিন্তু এ কি তাইই মোব। এগোবে তো বরসেয। মেহেদাভবের কি অন্ত কঠিন হোলো চলে। মেহের কোখার দয়া হ'বে, মারা হবে। লোকে ভালো বলবে। তা নয় কেবলই মেহে আঘাতের পর আঘাত করবে লোককে। তাই বলে বুক টেনে নিলেই তো হতো। নাঃ, ছেলেটা হয়তো মদাহারে শুকনো মুখে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

ভাত আর উঠলো না সরস্বতীর মুখে। খুখ বুয়ে গোবার ঘরে এলে বললেন আনন্দবাটারখানা নিয়ে। সরস্বতীর এই কাগজপড়া—এর মূলে আছে স্রীরের খেদাল।

আপিস থেকে ফিরেই ঘরের কাগজ হাতে আসলেন

রাষ্ট্রাচার্যঃ। পৃথিবীর মানচিত্রও আমনবে একটা সজে করে। বলবে—এই দেখো মা, ব্রহ্মান, এই মিশর, এই সুরেন্দ্র বাল। এইবার পড়ো কানজনা। ক্রোধো, সব বুকতে পারবে তুমি।

এখন এখন মনে মনে হাসতেন সরস্বতী হেলের খেরাল বেধে। তেবেছিলেন, আর সব খেরালের মতো এগুও কোনো চিক্‌ থাকবে না কালকের সকালে। কিছু একটু একটু করে তাঁর চোখও জড়িয়ে আসছে অজকাল রাজনীতির নেশার।

—মা—মা—সরস্বতীকে চমকে দিয়ে বড়ের মতো হবে চুকলো নীলা। মুখ চোখ তার ঘর ঘর করছে আঘাত বেধের মতো।

—সেই হতভাগা ড্রোটোলোকটা মা আমার এলেনিগো।

—শেচন পেকে সরস্বতীর ছুই কাঁধে ভর দিয়ে কিস্‌ কিস্‌ করে বললে নীলা।

—কে গোপাল? জিজ্ঞাসা করলেন সরস্বতী।

—হ্যাঁ, হ্যাঁ তোমার সেই গোপাল ঠাকুর।— উত্তেজনার নীলার বুক ক্রম তঠা-না মা করছে।

সরস্বতী গভীর চোখ তুলে তাকালেন মেরের দিকে। আপনাকে অপমানিত বোধ করলে এমনি হঠাৎই গভীর হোরে বান সরস্বতী। এ সময় নীলা, সুবীর এমনকি নীলার বাবা পর্বত নির্বাক হোরে বান সেই গভীর চোখের সামনে। একটু চুপ করে থেকে বললেন সরস্বতী—

কোথার গোপাল? চলতো।

সে কি তোমার জন্তে বলে আছে নাকি—এক যুহুর্ডে কথার কোমর আবার কেনিল হোরে উঠলো নীলা।

—এই দেখো। আমার এক চিঠি লিখেছে। আমি বাইরের ঘরে পড়ছিলাম। এমন সময় জানলা দিয়ে চিঠিটা ছুঁড়ে দিয়ে আমার দিকে নুচকি হেসে চলে গেল।

—কি বললে?

—কি আবার বলবে। সাহস করে কথা বলতে?

মেরের কথার সরস্বতী হেসে উঠলেন।

—তুমি হাসলো মা? কি যে তোমাদের সব কথাতেই হাসি আমার ভালো লাগে না। ভুক কুটকে বিরক্ত মুখে বললো নীলা।

—না তাবড়ি, সরস্বতী বললেন—বে লোকটা মুখের ওপর হাসতে পারে, চিঠি দিতে তার পায় না, হুটো কথা বলতেই তার সব সাহস উবে যাবে।

—কি জানি। তোমরাই জানো বাবা। নীলা পরপর করতে করতে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। সরস্বতী চিঠিটা খুললেন।

সেই উগ্র মদির গড়। সেই একই জাব। একই তাবা।

ও আমার আলোর আলো,

আমি জানি তুমি আমারাই। যদি তুমি আমার কাছে এলো, তাহা হইলে আমি লাগা জীবন তোমার কেনা খোলাম হোরে থাকবো। তোমার সব কথা শুনিব। ভালো হইব। দেখাপড়া শিখিরা বড় বড় চাকুরি করিব। তুমি চলে এসো। আমার আর তর সহিতেছে না। যদি রাণী থাকো এক ঘটিকা পর লেকের বীশে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিও। কেহ জানিতে পারিয়ে না। আমবা ঘুরে চলিয়া বাইব। ইতি—

তোমার ভৃত্য গোপাল।

হি-হি। নাগো। আরক্ত মুখে চিঠিটা সজোরে তিনি ছুঁড়ে ফেল দিলেন ঘরের কোণে। নানটাও এবার লুক্কোর সি হৌড়া। বড় বাড় বেড়েছে।

হঠাৎ মনে মনে হেসে উঠলেন সরস্বতী। একি হেলেনাসুবি করছেন তিনি। এ মরেনে কি আর এ উত্তেজনা শোভা পায়। মনের হাসি লাগা মুখে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর।

সরস্বতী তেবেছিলেন সুবীরকে আর কিছু জানাবেন না এ বিষয়ে। কিন্তু সবই খুলে বলতে হোলো শেষ পর্যন্ত।

স্বপ্নীয় আশির কোরার আগেই সামনের বাড়ীর দরজা সাহেবের চাকর তাহু এসে হাজির হোলো। উঠানে দাঁড়িয়েই ডাক দিলো,—বোমা।

সামনের রকে বসে সরস্বতী নীলার চুল বেঁধে দিছিলেন। বললেন,—কেনন আছ বাবা?

তাহু লোকটা সত্যিই বড় ভালোবাসে স্বপ্নীয় আর নীলাকে। অস্ত্রের বাড়ী কাক করলেও ছোটবেলা থেকেই এ বাড়ীতে ওর অবাধ গতি। সরস্বতীর শান্ততীকে বা বলে ডাকতো। তিনিও ওকে সন্তানের মতোই দেখে করতেন। শান্ততী বাবা বাবার পথেও এ বাড়ী আনা-বাওয়া তাহুর করে নি। কেমন একটা মাত্রা পড়ে গেছে তার এ বাড়ীর ওপর—নীলু বিদিনিদি আর স্বপ্নীয় দাবাবাহুর ওপর।

—বোমা—আবার ডাকলো তাহু।

—কি বাবা, বলো।

—এখানে নয় বোমা। একটু ইদিকে আসতে হবে।

কি এমন কথা থাকতে পারে তাহুর। কোনো দিন সে তো এমনভাবে কথা বলে না তাঁর সংগে।

একটু অবাধ হোয়ে তিনি ডাকলেন তাহুর দিকে।

—বোমা একটু ভাড়াভাড়ি আসবেন। আমার আবার এগুলি বেতে হবে।

—তুই বা নীলু। গা বুয়ে নে।

বাঁ'র নুখের দিকে চেয়ে নীলা বীরে বীরে উঠে গেলো। সরস্বতীর পাথরের কাছে এসে বাবা নীলু কে বললো তাহু। তারপর অতি সংকুচিত হোয়ে খেঁ খেঁবে বলল,—

—কাল থেকে নীলু দিমিকে আর ইস্কুলে যেতে দেবেন না বা।

—কেন? গভীর বিষয়ে চোখ ভুললেন সরস্বতী।

—আপনার সেই গোপাল হস্ততাগা এখান থেকে জুটেছে আমাদের বাড়ী। সব শুনেছি আমি। হস্ততাগা আমাদের দাবাবাহুর সংগে খোঁড় বেঁধেছে। ওরা সবাই ঠিক করেছে কাল ইস্কুলে বাবার দরজা খোঁড় গাঙিতে

চুলে মেখে নীলুদিমিকে। আমি কেনেছি একথা ওরা জানতে পারে নি। আমাকে ওরা বিশ্বাস করে না বোমা।

বাবা আরও নীলু হোয়ে গেল তাহুর। সব দোব সব লক্ষ্য যেন তারই।

একি সংবাদ এনেছে তাহু! সারা দেহে কাঁটা দিয়ে উঠলো সরস্বতী।

একি সত্য!

একটা গভীর লম্বেয়ের দোলার চোখ কেঁদালেন সরস্বতী।

—তাহু,—দুর্ভাগ্যে বললেন সরস্বতী—একি সত্য?

মাজিতে চোখ রেখেই বীরে বীরে বলল তাহু—আমার অবিশ্বাস করবেন না বোমা।

সব পরিষ্কার হোয়ে আসছে।

অজ সাহেবের ছেলেকে কেনেন সরস্বতী। বীবনে অবশ্য কোনো দিন কথা হরনি তাঁর সংগে। তবু অনেক কিছুই শুনেছেন ছেলেটির সবচে।

বার পাঁচেক ম্যাট্রিক ফেল করে বরং বলে আছে। পাওয়া পরার চিন্তা নেই। অগাধ টাকার মালিক জজ সাহেবের ওই নিব্বাখির সদন্তে। গোপালের কাছে তিনি শুনেছিলেন ওদের নাকি এক বিয়াট হল আছে। অনেক ছেলে নাকি জজ সাহেবের ছেলের কথার ওঠে বসে। ছোটো ছোটো জীপ গাড়িতে চড়ে সারাদিন নক্স গতিতে সারা কোলকাতা চরে বেড়ায় ওরা।

বাবা, দেখলে শুধু লাগে। বা সব চেছারা। লখা চওড়া কালো কালো দেহ। চোখাড়ে মুখ।

মাকে মাকে আবার হু একজন আসে। তার অস্ত্র রকম। দিব্বাকান্তি। টুকটুক করছে বড়। টিকেলে নাক। টানা টানা বড় বড় চোখ। বৈধে এঁরে পুখালী দেহ। সরা পাট জাভা দামী দামী স্মিট পরে কাঁধ কাঁকিরে কোরে কোরে কথা বলে। দেখে মনেই হয় না এরাই আবার রকে বসে হুংসিত পরচর্চা করে।

পথ দিয়ে জজ খয়ের কোনো মেয়ে-বৌ গেলে

সন্ধ্যারে মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা লম্বা কল্প চুলভলো। কপাল থেকে পেছনে সরিয়ে দিয়ে মুখ টিপে হাসে আর ওদিয়ে ভুলিয়ে নীল ঘিরে গান বহরে;—ও মাই ছাট, একটু কিরে চার।

পাড়ার লোক বার কয়েক খানা-পুলিশ করেছিলো। কিন্তু কোনো কলই হয় নি। পুলিশ মহলে আজ সাহেবের নাকি অসীম প্রতিপত্তি।

জুহীরা বাড়ী ছুঁতেই সব খুলে বগলেন সরস্বতী। তখন সে ছুটলো পানায়। তার এক অন্তরঙ্গ বন্ধু স্থানীয় খানার 'ও-নি'। যদি তাঁকে বলে কিছু করা যায়।

অনেক রাতে কিরে এলো জুহীরা। বললে—সব ঠিক হয়ে গেছে মা।

জুহীরের বন্ধু রাখী হোরেছেন কাল নির্দিষ্ট সময় রক্তবেশী অন কয়েক পুলিশ পাঠাতে। ঘটনাস্থলেই থাকবে তারা। অবস্থাজুহীরা যত্নবান করবে।

—মাই নীলাকে বলে আসি সব। মাইলে সব জড়ুল করে দেবে। বা ভীত বেরে তোমার। মুখে মুখে যতো সাহস।

বার দিকে চেরে হাসলো জুহীরা। তারপর উঠে গেল নীলার সন্ধানে।

পরদিন শীতটা বেশ একটু জাঁকিয়ে পড়েছিলো। সারা বছরের মধ্যে এমন হাড় কাঁপানো শীত আর একদিনও পড়েনি।

গত রাতে নানা কথা ভাবতে ভাবতে ঘুম আসতে অনেক ঘেরী হোয়েছিলো নীলার। আজ আর সত্যল সকাল ঘুম তাতে নি। উঠতে বেশ বেলা হোয়ে গিয়েছে।

ঘুম ভাঙা চোখে শাড়ীটা কোনো রকমে ভড়িয়ে নিয়ে রান্না ঘরে ছুকে পড়লো নীলা।

—চা দাও না। নিশ্চয়। জীঘ সেট হোয়ে গেছে। বুকলে মাজন লাগাতে লাগাতে বললে নীলা, —তোমার অন্তেই তো সেট হোলো আমার। কেন কুঁচি ভেঁকে দিলে না তোর তোর।

বেরের কথা শুনে হাসলেন সরস্বতী।

—বা ঠাণ্ডা। অত ভোরে ভোকে ভাকতে আমার মাস্তা লাগে যে। তোদের ঘেরী ঘেবে আমি আমার জাত চাপালাম। বা মুখ ধুয়ে আর। চারের তল হোরে এলো বলে।

মাথা নীচু করে ভাতের ফেন কয়তে কয়তে বললেন সরস্বতী।

একটু পরেই কে খেন ডাকলো—মা।

—কে? ঘুরে বগলেন সরস্বতী।

মাথা নীচু করে ব্যস্ততার কোল ধৈরে ঝড়িরে আছে তাহ। চোখ দুটো লাল। চুল উকো খুঁকো। খালি পা।

—তাহ! আর কোনো কথা বের হোলো না সরস্বতীর মুখ দিয়ে।

—হি-ছি শেবকালে কি কাকটাই করলে হোঁড়াটা ঘেবলেন মা।

—কি হোয়েছে তাহ! গভীর উৎকর্ষার কথা সরছে না সরস্বতীর মুখ দিয়ে।

—গোপাল গলায় হাড়ি দিয়েছে মা।

গোপাল গলায় হাড়ি দিয়েছে!

এতটু এক চমকে ভাতের ঝাড়টা গড়িয়ে গেল ঘুরে। চমকে চমকে লাফিয়ে পড়লো কুঁচি ফেন সরস্বতীর হাতে-পায়ে।

বিহুস্প পাথরের মতো ঝাড়িরে রইলো তাহ।

ভায়রর বীরে বীরে, খেবে খেবে, একটু একটু করে জানালো সে ভায়ের উঠোনের সেই বড় বহুল গাছটার কেমন করে কাল রাতে গলায় হাড়ি দিয়েছে গোপাল। এক মিনিটও নাকি সে ঝাড়তে পারে নি মৃত গোপালের পাশে। এমনই জীঘ যে দুঃ।

খেবে খেবে, বীরে বীরে সে বর্ণনা করতে লাগলো কেমন করে ঝাড়টা একেবারে ভেঙে গিয়ে পাবনে খুলে পড়েছে। বড় বড় গোপ গোপ চোখ দুটো কেমন করে অঁকি কোটর থেকে বেরিয়ে এসেছে।

মরতে মরতে নাকি গোপাল গীত দিয়ে আশপাশে
চেপে ধরেছিলো নীচের ঠোঁটটা। গোটা কতক বড় বড়
গীত কেটে বসে গেছে বাসের ভেতরে। রক্তে ভেলে
সিঁয়েছে চিকু আর কুক। হঠাৎ দেখলে মনে হয় রক্ত
ভুলেই শেব সময়টা।

—নাগো!

মুখ ঘুরে আসলে মুখ মুহুর্তে মুহুর্তে কখন বায়ের
পেছনে এসে থমকে দাঁড়িয়েছিলো নীলা। ভাগুর
কথাগুলো কানে বেতেই নিউরে উঠে চোখে হাত চাপা
দিয়ে আছে আছে হাটিতে বসে পড়লো সে। রক্তীন
শাটী ঢাকা দেহটা তার একটা ভীষণপন্থীর মতোই
কৈপে কৈপে উঠতে লাগলো।

সরস্বতী ধাপুর মতো বসে তাপসা, অলসার চোপ
ছুটো ফেরালেন মেরেকে লক্ষ্য করে।

পূরদিন কথা নয়ইই কলোয়ে গিরেছিলো নীলা।
এক মিনিটও দেবী হয় নি তার।

রাতে শুয়ে শুয়ে সরস্বতী বসেছিলেন,

—নীলু দেখেছিল, বাড়িটা বেন হুম হুম করছে।
কিন্তু, রাতে তো একটুও ভয় করল না নীলার। কি
গভীর প্রশান্তিই নেমেছিলো তার মুচোকে। আশ্চর্য!

একটা অনাবিল স্মৃতির লগ্ন হাওয়ার ভয় করে
কলোথ থেকে বাড়ী ফিরলো নীলা। চোকবার দুঃখ
দরোজার গায় আটকানো সেটার বস্তু থেকে চাপা
নমেই চিঠিগুলো বের করে নিলো সে। অনেক চিঠি
অন্যে। কাল থেকে খোলা হয়নি চিঠির বাক্সেটা।
প্রতিদিনের চিঠি বের করা—এটা ওর বহুদিনের খেয়াল।
সেই সাত বছর বয়স থেকে প্রতিদিনের চিঠি আগে ঘর
ওর হাতে। ভাগুর ওরই হাত থেকে পানি বাড়ার
সকলে। সকলে হাসে ওর এই খেয়াল দেখে। সরস্বতী
হালেন আর বলেন,—পাগলীর খেয়াল।

ইন্টিগ্রেসনের প্রিন্সিপালের ভাগিন। / ইলেক্ট্রিকের
বিলু। বাবার চিঠি। দাদার চিঠি। একে একে সব
জরিয়ে রাখতে লাগলো নীলা।

একটি পত্র নীলার নামাধিকৃত।

হত্যাকর দেখেই বোকা বার বোঝে থেকে এসেছে।

কি লিখেছে কনক? বুকটা ভুলে উঠলো নীলার। না,
এখন না। সেই ছপরের নির্ভাক, নিম্নস্বর অবসরে
দরোজার বিল খুলে—তারপর।

এক টুকরো সোনার হাসি রিক্সিবিরে উঠলো
নীলার চোখে-মুখে।

শেব পত্রটি ভুলে নিয়েই চমকে উঠলো নীলা।

‘ও আমার আলোয়ার আলো।’

একটা ভীষণ ভগ্নার সারা বেহের চানড়া হুঁচকে
কালো হোয়ে গেলো। নিঃশ্বাস থমকে দাঁড়ালো।
একটু চুপ করে থেকে মস্ত গতিতে নির্ভি বেরে ওপরে
উঠতে লাগলো নীলা।

ঘরে চুকে জানলার পর্দাটা ছাবার পরের দিকে
চোয়ারটা সামনে টেনে নিলো নীলা। দেহটা চেঁচিয়ে
হুটিয়ে দিয়ে অনেকখণ্ড সে ভাকিয়ে রইলো আকাশের
দিকে। তারপর টেবিলের ওপর থেকে ‘রজনীটা’ আছে
আছে ভুলে নিলো কোলের ভগ্নার।

“বীরে রজনী বীরে। বীরে, বীরে, রজনী ঐ অন্ধ
নকন উদ্বীপিত কর। দেখ, আমার দেখ, আমি তোমার
দেখি। ঐ দেখতেছি—তোমার নয়নপথ ক্রমে
প্রস্তুত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, বীরে, বীরে
বীরে, নয়নরাজীব হুটিতেছে। এ সংসারের কাহার না
নয়ন আছে? মো, বেব, কুকুর, মার্জার, ইত্যাদিরও
নয়ন আছে—তোমার নাই, নাই, নাই, তবে আমারও
নাই। আমিও আর চক্ষু চাহিব না।”

অতি বীরে বীরে গোপালের বৃত্ত বীভৎস, আকৃষ্ট
মুখানি ভেলে উঠে—ভুলে গেল যেন হেলে উঠে সে
নীলার চোখে জোথ বেধে।

তালপাকানো চিঠিটা হাত থেকে পড়ে হাওয়ার
গড়িয়ে গিরেছিলো কিছুদূর। নীলা উঠে দাঁড়িয়ে হাত
বাড়ির ভুলে নিলো সেটা। গীতে গীত চেপে খজ
হাতে চিঠিটা টুকরো টুকরো করে হাওয়ার ওড়াকে
দিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো নীলা। একটা ভীষণ,
ভীষণ দৃষ্টিতে চিঠিটার দিকে সে চেয়ে রইলো একটু
সময়।

তারপর হঠাৎ দু’হাতে মুখ ঢেকে হ-হ কোরে
কৈপে উঠলো সে।

ব্রিটলে রাজা রামমোহনের স্মৃতি পালন

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ

করেকদিন হয় তোর একখানা চিঠি পেরেছি। কিন্তু এমন খোঁজ ব্যপের মধ্যে দিন যায় যে সময় মতো চিঠি লেখা হয় না। সুকালে আটটা পনের মিঃ লওন থেকে বের হয়েছি—ট্রেনে এসে গাড়ী ধরেছি ব্রিটল এসেছি সাড়ে বাতায়। তারপর একটার পর একটা function চলেতে সাড়ে ৮টা পর্যন্ত। লওনের হল লওনে চলে গেল; আমি আবার নতুন সজা নিয়ে বের হলাম, বকর বকর করে এই রাত এগার টার সময় শোবার ঘরে এলাম। এখানে-ও আমার জন্ত সব ব্যবস্থা করা করে রেখেছে। কাল প্রাতে এখান থেকে সাড়ে আটটার বের হব। আমি জানতে কি খাই, কখন খাই সব খোঁজ নিয়ে গেল, যেখানে খাই একখানা করে বাড়ি সাঝানো পাই, এটা কার পুণ্যে! নিজের এতটা পুণ্য নেই-যে এই বিশেষে এসব সাঝানো পায!

এখন আজকার কথা বলি, কিন্তু চিঠি শু আজ শেষ করতে পারব না এখন রাত প্রায় এগারটা। খুব ক্লান্তও বোধ করছি। সময়দিন কেবল ঘুরেছি এবং এ জিনিষ চলেতে রিক এক বাস ব্যবস্থা। তবুও কিছুটা লিখে রাখব,— কাল রাত্রে হরত walesএর (cardiff) সহরে যা আরও তিনত্রে কোপাও থাকব, সেখানে চিঠিখানা শেষ করে পরশ পোষ্ট করব। হরত থাকিখানে বা ওয়েলসের কোন ডাক ঘরে।.....

আজ থেকে ১১২ বছর পূর্বে রাজা রামমোহন রায় এই ব্রিটল সহরে সারা বাস, রাজা রামমোহনকে বলা হয় maker of modern India—আধুনিক ভারতের স্রষ্টা। ১৯৪০ সালে কলিকাতায় এক জনসভায় মৌলানা জালাল রামমোহন সন্থে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করেন। মৌলানা সাহেবের মতে রামমোহন রায়ের ঐ পরিচয় শুনে বেশ ভাল লেগেছিল। আজ এখানে স্মৃতি অমুঠানে আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রী শেখর রামমোহন সন্থে ঐ বিশেষণ প্রয়োগ করেন। হরত তোর ভাবি—এটা অতি-

পরোক্ষ, কিন্তু ভা নয়, আত্মীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঐ সময় যে প্রভাব তিনি বিস্তার করেছিলেন—তা স্মরণ করলে ঐ উক্তিই সত্যতা পাষ্ট হবে। পশানী বছর রিক ১৭৭৪র পর অর্থাৎ ১৭৭৪ অব্দে তাঁর জন্ম হয়। এখন নাকি প্রমাণিত হয়েছে যে ১৭৭২ সালে তাঁহার জন্ম হয়। অর্থাৎ জাতি বনন স্বাধীনতা হাফাল রিক তার ১৫ বছর পরই এত বড় একটা প্রতিভাশালী ও চরিত্রবান লোকের জন্ম ঘূবই বিশ্বজনক। আর বরলে পাটনা গিয়ে কান্দৌ ও আরবী লিখে কোরান পড়েন এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী হন। গৃহে কিংবে এসে তাঁর জীৱ একেশ্বরবাদ বিয়ে পিতামাতার বিরক্তি উৎপাদন করেন। কতকটা গৃহ হতে বিতাড়িত হয়ে তিনি চলে বান তিস্ত, সেখানে খোঁজ ধর্ম পড়েন। তিস্ত কেবল পাহাড়পর্বতের জন্তই অনধিগব্য ছিল না; কোন বিশেষীকে তাঁরা ভাল চোখে দেখত না। তাঁর জীবন বিপর্যয়; তিস্তী-নৈরোধের হার্য সে বিপর্য থেকে রক্ষা পান। তিনি গ্রীক ও হিব্রু ভাষা লিখে বাইবেলের মূলসংস্করণ পাঠ করেন, ল্যাটিন ভাষাও জানতেন। তা ছাড়া সংস্কৃত, বাংলা, উর্দু ও ইংরাজী ত জানতেনই, একটিকে তিনি পাহাড়ীষের বিচ্ছিন্ন লেখনী চালনা করে, হিন্দুধর্মের খ্রীষ্টান করার বিচ্ছিন্ন অভিযান চালান; অপর-দিকে তিনি হিন্দুধর্ম ও ধর্মভেদের মূলসংস্কারের বিচ্ছিন্নও অভিযান শুরু করেন। তিনি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বিশেষ করে উপনিষদ পাঠের ও প্রচলনের অধ্যয়নী ছিলেন; ঐশ ও অজ্ঞাত দু'ই ত বান উপনিষদ ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। অপরদিকে তিনিই প্রথম ইংরাজী ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করেন। তিনি বাংলা পত্র সাহিত্যের জনক। তিনি সংবাদপত্র ও ভাষাখানার স্বাধীনতার জন্য প্রথম রব জোড়েন। সংবাদপত্রের বিচ্ছিন্ন হঠাৎ এক আইন ইংরাজী পাশ করে—বাত্তে তাবের অহমতি ভিন্ন সংবাদপত্র প্রকাশ করা বাবে না; এর প্রতিবাদে তিনি তাঁর সংবাদপত্র “গণ্য কোমুদী” বড় করে বেন

এবং কলিকাতার বহু নাগরিকদের আকর্ষণই এক বসবাস পাঠান। যেসব বসনকার্যে যাতে বেনীয়ারদের অধিকার আসে—সে সম্বন্ধে তিনি আন্দোলন ভারতেও বিস্তার করেন। তাঁর বিস্তৃত জ্ঞান, তিনটি কারণের অন্তর্গত—এখন হল—ঐ কারণ; দ্বিতীয় হল সত্যবাদী এবং বদ কবী এবং তৃতীয় হল—দ্বিতীয় মোগল সম্রাটের স্বার্থ রক্ষা। ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে সত্যবাদী প্রথা তাঁর চোঁটাই বন্ধ হয়—তা ত জানিল।

এখনি লিখে ২৮শে ভোর ন'টার সময় ব্রিটল থেকে বেরিয়ে পড়ি, আর এখন রাত দশটা—সমস্ত দিন বোটারে ঘুরেছি—Wales-এর নগরে ও গ্রামে। এটা হল একটা গ্রাম। করণার খনি অঞ্চল এবং আঁক রাতটা এখানকার এক স্রমিকের বাড়িতে কাটাতে হবে। আমি আসব তখন বাড়ীর দুই ছেলে—ভোর চোদ ও আট দশ বছর বয়স হবে—সমস্ত দিন অস্থির হয়ে বেড়িয়েছে একজন ভারতীয়কে দেখে। আগতে ঘেরী হওয়ার জন্য প্রায় হত্যা হয়ে পড়েছিল। আলার পরই এরা দুজনই এসে hand shake করে গেল এবং একটু পর এসে বড়টা আমার চোঁটার হাতে বসল এবং ছোটটি প্রায় কোলেই বসল। বড়টি বিশেষ কথা বসল না, ছোটটি জিজ্ঞাসা করল magic জানি কি না এবং coconut কি? খুব হাসাহাসি হল। মা ভাবের শোবার সময় হয়েছে বলে রাস বাস ভাগি বিয়ে করতে পাঠান। এমনিতে যেখনি—জোট ছেলেদের শোবার নিষিদ্ধ সময় ৪৩ বাড়ে আটটা। এর মধ্যে পাড়াগড়নী বহু লোকজন এসে। ভাবের সঙ্গে অনেক গল্প হল। ইংরেজের বিরুদ্ধে Welsh বা ওয়েলসবাসীদের রাগ বেশ আছে; ওয়েলসের প্রায় সবাই বারত-শাসনের কড় তির আগ্রহ দেখেছি। ভারতবাসীর নিকট বন ঘুলে কথা বলতে এদের আঁকাত না। ভারত থেকেই Welsh-রা এখানে এসেছে—এমন একটা কথাও এখানে রাষ্ট্র আছে, ...এবার আবার রামমোহন রায়ের কথাই ফিরে যাওয়া বাক্য।

ব্রিটলে এসে পৌঁছাই বাইটার পরে। Trait-এ একটা পাড়ী reserve করে আশ্রয় প্রায় চল্লিশ জন এসেছিল। তার মধ্যে অল্প বেনীয়ার ভাগই বাঙালী। গাড়ীতে উঠতেই একজন নাম করে ডেকে নমস্কার করলেন। আনিতিক ভিনতে না পারার পরিচয় দিলেন। তিনি শ্রী পি. সি. দুবাকী—চিত্তরঞ্জন মেলকারখানার কর্মকর্তা। তাঁর ওখানে বসলাম। এর পর গাড়ীতে আমাদের বেবে এসে বসলেন P. T. L.-র লণ্ডন অফিসের, কর্মচারী—শ্রীমতী—পাঞ্জাববাসী, এর সঙ্গে দুই তিন দিন পূর্বে পরিচয় হয়েছিল। ব্রিটলে বেনীয়ার ভাগ সময় অবধি সন্দেশই হয়েছিল ও ঘুরেছি। আর একটা বাঙালী দুবকী শ্রীমুখের শ্রেণীর অনেক সময় সঙ্গে ছিলেন এবং আমার খোঁজ নিতেন।

ষ্টোন থেকেই প্রথমে আমরা ঘাই Stopeleton Grove নামক বাড়িতে। এখানে রাজা রামমোহন থাকতেন এবং এই গৃহে তিনি বেহত্যাগ করেন এবং এই বাড়িরই একখানে তাঁর বেঁধে সমাধি করা হয়। ১৮৩০ সাল হতে ৪৩ সাল পর্যন্ত এইখানেই তাঁর সমাধি ছিল। এই বাড়িটা খোঁজ হর কার্পেণ্টার পরিবারের ছিল। তাঁর প্রথম সমাধিস্থলটা এখনো খোঁজ আছে এবং ওখানে লেখাও আছে যে দশ বছর তাঁর বেহ ওখানেই ছিল। ঐ বাড়িটা এখন একটা হাসপাতাল। অপরিণত মস্তিষ্ক লোকদের এটা আশ্রয়স্থল। অর্থাৎ কতকটা পাগল গারব। যে কক্ষে রামমোহন বাস করতেন সে কক্ষটার গেলাই। সেখানে তাঁর কোনই চিহ্ন নেই। আমার মনে হয় রামমোহনের শেষ আবাস-স্থল বলে ওখানে একটা প্রস্তরকল লাগানো উচিত। ওখান থেকে গেলাই Red Lodge নামক গৃহে। এটাতে হুমারী ঘেরী কার্পেণ্টার বাস করতেন এবং এখন একে বয়-বাঁী বিভাগের আছে। কার্পেণ্টার পরিবারের সঙ্গে রামমোহনের অন্তরঙ্গতা ছিল।

ঘেরী কার্পেণ্টার রামমোহনের অস্থায়ী ও ভারত হিতৈষী ছিলেন। রামমোহন ও ঘেরী উভয়েই মেরেফোর্ড

শিক্ষা ও অধিকারের মন্ত্র চোঁটা করেছেন। দেবী সমগ্র ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন। ভারতের বিভিন্ন নগরের মেয়েবা তাঁকে যে সব স্নানপত্র দিয়েছিল—তা সব সেধলাম। তাতে বহু ভারতীয় মেয়েদের হস্তধত আছে, বাংলা, ইংরেজী, হিন্দী, গুজরাটী, উর্দু প্রভৃতি হরকে সবি আছে। রামমোহনের ও মেজীর পুত্র সব ওখানে আছে। তাও সেধলাম, ওখান থেকে সেলাম বাহুধরে বা মিউজিয়াবে। রামমোহনের জীবিতকালে ঐশ্বর্য তাঁর একখানা তৈল চিত্র আছে। ব্রিগস (Briggs R.A.) নামে বিখ্যাত চিত্রকর এঁকেছিলেন, চমৎকার আছে ছবিখানা। ভারতে ওখান। নেবার চোঁটা চলছে, ভারতকে বিতে ব্রিটেন কর্তৃপক্ষ রাজী হয় নি, কিন্তু মনে বর এখন ওরা রাজী হবে।

সমস্ত গুপুচটা মাঝে মাঝে একটু কুটি পড়ছিল। ব্রিটেনে গভনের চেয়ে বেশী নীত, কাজেই নামা ওঠা বা চলার সময় বা বাইরে গাড়িতে থাকায় বেশী ঠাণ্ডা লাগছিল। তাড়াতাড়ি লঙন থেকে বেরুবার সময় বর্ষাতি বা rain coat। আনতে ভুলে গিয়েছিল। তাই একটু সতর্ক হয়ে চলতে হয়েছিল। তবে দেখেছি প্রকৃতি দেবী আমার উপর খুব দয়ালু নন্দ। জার্মানী, ফ্রান্স ও বিলেতেও ব্রিটিশ উপদ্রব আমার বেশী ভোগ করতে হয় নি। ব্রিটেনেও ব্রিটিশে আমার বেশী ভিক্ষতে হয় নি। তবে ঠাণ্ডা বেশ লাগছিল, সেটা সব্বায়েই পক্ষে সমান। মিউজিয়াবে থেকে এক হোটেলের খেতে সেলাম। ব্রিটেন নদী ও নদুজের ধারে। কাজেই ভাল বাছ পাওয়া যায়। বাছ আলুতাড়া ও পুজি খেলায়; কুটি বা ঐ জাতীয় বাছ যাতে আলু বা হান। বা cereals আছে বিশেষভাবে না চাইলে বিলাতে কেউ খেয় না। অল্পের কর্ণে চাউল বা গম বা বার্লী প্রভৃতি খাওয়ার পরিবারে আলু বাও, শাকসব্জী খাও, টমেটো। খাও—কল, ভিন, মাংস খাও খুব ভাল। ভারতে হরি তাত বা কুটি বন্ধ করে ভোজের আলু সিদ্ধ বা তরকারি সিদ্ধ খেতে বলে তবে ত একবারে মহাভারত খাও বন্ধ করবে। সব

বারপদী ও গৃহপদী মিলে চিত্তিক প্রতিরোধ নব্ব হাপেন করবে। কিন্তু বিলাতে ওটা বেশ চলছে।

বাঁওয়া সেহে আমরা সেলাম Lewin Mead Chapel এ বা নিউন বীড় গীর্জায়। এখানেই রামমোহন প্রতি প্রতিবার সূর্য্যার পূর্বে আসতেন, এবং গীর্জার তিনি Sermon দিয়েছেন কয়েক রবিবার। পুরোহিতের বলদার মকের (pulpit) তান দিকে সেগুলালের গার প্রখান; কুকফলক আছে। একখানিতে লেখা আছে রাজা রামমোহন তার এই গীর্জার প্রার্থনা করতেন এবং এখান থেকে ধর্ম উপদেশ বা Sermon দিয়েছেন ১৮৩০ সালে। একটু দূরে আর একখানা ফলকে লেখা আছে বর্ষাপক ব্যানার্জী এখানে Sermon দিয়েছেন ১৮৭১ সালে। আর মকের বাঁদিকে আর একখানা ফলকে লেখা আছে অচ্যর্ক কেশবচন্দ্র সেন এই গীর্জার ১৮৭০ সালে Sermon দিয়েছেন প্রথমে Rev. বার্টল্ড (Rev. Bortles) রামমোহন তার সম্বন্ধে একটু বললেন। এর পর ঐশ উপনিষদ ও অমন্ত্র উপনিষদ থেকে রাজার ইংরাজী অনুবাদ কিছু পড়লেন। ঐশের প্রথম দিকে কয়েকটা প্রোকেস অগ্রবাহ এবং সত্যার সুতিকে বর্ষার সূর্য আয়রণ করে রেখেছে—উপনিষদের সেই প্রোকেস অগ্রবাহ পড়লেন—হিরণ্যের পায়ে সত্যাপ্রতিভা সুখ। তৎ তৎ পূরণ অপারূপ সত্যাব্দার সূত্র ॥ (ঐশ উপনিষদ) এর পর Hymns of worship নামক গ্রন্থ থেকে George Matheson প্রণীত "Gather us in" 'ডেকে নাও আমাদের' নামক গুণটি পড়লেন।

এর পরে প্রার্থনা করেন রেভার ডেভিস। (Rev. Davis)। তিনি প্রবীণ লোক। বেশ বৃদ্ধ।

রামমোহন সম্বন্ধে অনেক সময় তিনি বললেন; রামমোহনের সর্বভোগ্যুদী প্রতিভা এবং সর্বমানবে ও জাতিতে সমতার তিনি যে দেশ ও কালের অজীত মহাপুরুষ সে সব কথা তার তার করে বললেন। সূর্য্যার পূর্বে দুই তিন প্রতিবার এই গীর্জাতে তিনি Sermon দেন। তাছাড়া অনেক সময়ই এই গীর্জাতে প্রার্থনার যোগ

দিতেন। প্রকৃতি বহু কথা রোভার ডেভিস বলছেন। উপনিষদ এবং Immitation of Christ থেকে কিছু আধার পড়লেন। অবশ্য উভয়ই ইংরাজী অনুবাদ। Immitation of Christ একথানা খুব নামকরা তত্ত্ববিশারদ বর্ষ পুস্তক। এখানী বেশ পুরানো বই। কবে যে লেখা সঠিক বলতে পারব না। এর লেখকের নাম দত্তটা মনে পড়ে Thomas A. Kempis; তোর ভূপেনচাঁদা বলতে পারবেন। ১৮৬০ হ'তে ১৮৭১ খ্রিঃ অব্দ। রাম মোহন এই পুস্তককে খুব আদর করতেন। পরে ব্রাহ্ম সমাজে ও ভক্তিবাদী লোকের মধ্যে আশীর্ষের বেনেও এই পুস্তকের বেশ আদর ছিল।

ডেভিস লাহোরের কবার মধ্যে বেশ একটা আন্তরিকতা ছিল। ব্রিটল মিউজিয়ামে রামমোহনের যে ছবিখানা আছে তার উল্লেখ করে তিনি বলেন—ঐ ছবি তোলাবেরই তোমরা নিয়ে যেতে পার। তবে আশা করি এর একটা প্রতিমূর্তি আবারের সাহায্যে হবে। তিনি আরও বলেন, “রামমোহনের দেহাবশেষ ইচ্ছা করলে তোমরা নিয়ে যেতে পার, লেটা তোমাদের পক্ষে হবে লাভ কিংবা ক্ষতি।” “That will be a loss to us.” ইনি স্যোজিনী নাইডুর লেখা থেকেও কিছু পড়লেন। এর প্রার্থনা বা বক্তৃতা প্রসঙ্গে রাম মোহনের দেহাবশেষও তারতে নিয়ে যাবার সম্ভাবনাও কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু তেমন কোন প্রস্তাব বোধ হয় এখনও তারত থেকে হয় নি।

এরপর বহরটা একটু ঘেঁষে নিলাম। বাসে ক'রে লহরটা দেখানো হল। বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল Clifton Suspending Bridge—ক্লাফটো পুল। ৩০০ ফুট উঁচু পাহাড় এক দ্বারে—অপর দ্বারেও বেশ উঁচু পাহাড়। সারথান দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে এতদ নদী। বহিরাগে নদীরের থালের বিস্তারের চেয়ে সামান্য বেশী চওড়া হবে। তবে পাহাড়ে নদী তাই তীব্র স্রোত আছে। এই নদীর উপর এই ব্রিড্জ পুল। ওখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যবশেষের সঙ্গে এই সেতুটা বেশ মানিয়েছে। গুনগাম

আরই ঐ উঁচু পাহাড় থেকে লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। এবং তার মধ্যে বহুবারই বেশী। ব্রিটনের সামাজিক অনিশ্চিত অবস্থারই পরিচয় এতে পাওয়া যায়। বৃহৎ এলাকাতেই কিছু কার্ণেল এরা শেষ হয়ে গিয়েছে। ব্রিটনের বর্তমান আর্থিক অবস্থা, পুস্তকের চেয়ে বহুবার লম্বাখার বেশ আধিক্য, রাজনৈতিক ভীতি সব মিলে একেই নার্ভ (nerve) উপর খুব খা মেরেছে। বাক ও কথা। ঐ সেতু ঘেঁষে আমরা রোয়াল Royal Hotel-এ।

ভারতীয় বাস্তুদ (High Commissioner) Royal Hotel-এ এক অত্যধার বাহবা করেছিলেন। লণ্ডন থেকে গিয়েছে আর ৫০ জন। ব্রিটলে ভারতীয় আছে আর ৫০০ জন, তাছাড়া স্থানীয় সম্রাট অধিবাসী কিছু ঐ হোটেলে সমবেত হল। ব্রিটনের Lord Mayor, Sheriff এবং Parliament-এর সভ্য প্রমুখ (Minister for Labour) মিঃ মন্টন (Moncton) অত্যধার এসে-ছিলেন। দেখানো চা, বিদ্যুৎ, কেক প্রকৃতি সম্বন্ধে। বিদ্যুতে এমন সব অত্যধার (Reception-এ) লন্ডনচিৎর বেডা হয় মন ও স্যান্ডউইচ (Sandwich) অর্থাৎ পবিত্র মাংস (গর বা গরুর) ২ টুকরা কটর মধ্যে ডরে বেওয়া হয়। কাঁচের ২০টা এমন অত্যধার গিয়ে থাকার কিছুই পাই নি। কখনো পানীয় হিমায়ে নেহুর বা অল্প কলের রস কখনো দেহেছি। এই অত্যধার হল ভারতীয় রাষ্ট্র হস্তের এবং আবারের রাষ্ট্র হল মন নিবাহক (Prohibitionst), কাঁচের এখানে চা ও ককির ব্যবস্থা ছিল এবং বাংলার পরিবর্তে বিদ্যুৎ ইত্যাদির ব্যবস্থা ছিল।

ঐ দিনকার প্রধান অর্ন্তান এল এর পর—গোবিন্দান রামমোহনের সমাধির কাছে সমবেত হয়ে শ্রদ্ধা দেখানো, সর্বপ্রথম করেকটি বাঙালী মহিলা একটি প্রার্থনা পাঠ বা গান করেন। বহুবার বোধ হয় ওক বহুবার একটি মোক... “সংস্কৃত সংস্কৃত লম্বাখানাপি গান করা হয়। এটা... বিখ্যাত মোক। সবটা এখন মনে পড়ছে না; বই থেকে...

বলতে পারব। যা তোর ভূপেন কাকাকে বলিগ বেগ করে দেবেন। প্রোকটার বাংলা অর্ধ সমেত তোমার মুগ্ধ করা উচিত। ৪৪ হাজার বছর পূর্বে ভারতীয় নদীবিদ্যা কি রকম উচ্চতাবে প্রকাশিত হয়েছিল, তার পরিচয় এই স্লোকে পাওয়া যায়। সংস্কৃত জীবনব্যাপন করার মূল মন্ত্র এই স্লোকে বৈধতে পাই।

তারপর ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রীমন্ত খের রামমোহনের জীবনী আলোচনা করেন। তিনি ঐ প্রসঙ্গে রামমোহন রায়কে “Maker of Modern India” বলে বিশেষিত করেন। ব্রিটনের লর্ড মেরর, নেরিক, ও পূর্বোক্ত গির্জার পাহারী রেভঃ বাটিলস এইখানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীখের এই আলোচনা প্রসঙ্গে সলজ্জভাবে রামমোহনের তৈল চিত্রের কথা উল্লেখ করেন এবং সুব বিনীতভাবে ও প্রকারান্তরে প্রস্তাব করেন যে লর্ড মেরর ইচ্ছা করলেই ঐ চিত্রখানা ভাষান্তরে দিতে পারেন। এম পর শ্রী রত্ন ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনার নাম করে ইংরাজীতে কিছু একটা পড়লেন। সমস্ত অমৃত্যুদের সংগে এর অসংগতি মনকে লীড়া দিচ্ছিল। এর পড়ার ঢং এবং বক্তব্য কথা কোনটাতেই গাভীও ছিল না। তাড়াতাড়ি রামমোহনকে ব্রাহ্ম সমাজের বা হিন্দু সমাজের সংগে ফুড়ে এই অমৃত্যুদের একটা গভীর্ষক আবেশ আনাও তাঁল লাগে নি। কিন্তু বহিঃশ্রী রত্ন এই কাছটা হুতুভাবে করতে পারতেন, তাহলে এর অসংগতি এমন প্রকট হতো না। এই অমৃত্যুদের আর একটি অঙ্গ—এক মহিলার রামমোহন সম্বন্ধে পবিত্র কবিতা পাঠ—তাও বাব বেওয়া উচিত ছিল। রচনা ও পাঠভঙ্গী কোনটাই ঐ অমৃত্যুদের যোগ্য হয় নি। শ্রী খের তারপর সমাধিতে মাগা অর্পণ করলেন এবং সর্বশেষ “জনগণমন” গাওয়া হল। কিন্তু একটু ভুল করচি, শ্রী খেরের বক্তৃতার পরই লর্ড মেরর কিছু বলেন। সম্ভ্রান্তার অমৃত্যুদের শেষ হল। লগুন থেকে আগত বাজীর আবার বাসে করে ঠেপনে পেল—লগুন ফিরে বাওয়ার জঙ্গ। আমি ভিড়ের মধ্যে খুঁজে পেলাম আবার ব্রিটনের চালক, তাকে নিয়ে আমি বেরিয়ে পড়লাম ব্রিটন নগর বৈধতে।

ব্রিটন নগরটা পুরানো; এজন্য নদীর উপর। বাক আমেরা ব্রিটন চেনেল বা খাল বলি—তাহা এজন্য নদীর বোহনা। মোটের উপর এবেশের নদী হিসাবে বেশ চড়া। আনাবের পদ্ম বা বেঘনার তুলনায় কিছুই নয়, হুস্ত আধ নদীলের চেয়েও কম। এমন কি বতিশালের কর্তনখোলা নদীর চেয়েও অনেক কম চড়া। এহিৎ ওহিৎ ঘুরে এবং ২১ জনের সঙ্গে ঘেরা পাখাং করে—আমি গেলাম এক ত্ত্রলোকের বাড়ীতে। তিনি ৩৭ বছর ভারতে ছিলেন; পাঞ্জাবের রেশ লাইনের একজন উচ্চ কর্মচারী; বোধ হয় প্রধান কর্মকর্তা—General Manager—এর পরই এর পদ ছিল। পাঞ্জাব বিভাগের অল্প পূর্বে তিনি চলে আসেন। পাঞ্জাব ও ভারত নিয়ে অনেক কথা হল। রাতে খেয়েছি অল্প এক ত্ত্রলোকের বাড়ীতে; রাতে শোণ এবং শ্রোতে শ্রোতরশ ও চা খাব এঁর বাড়িতে। রাত শ্রার ১০টা পর্যন্ত অনেক গল্প হল। উপরে শোবার ঘরে এসে তোকে চিঠি লিখতে বসলাম। পরদিন চা খাবার সময় আবার ঐ বর্ণিতির সঙ্গে অনেক কথা হল, কর্তা হাসতে হাসতে বললেন, এখনো ত ভারতীয় বেহারার (bearer) প্রথা খাবার সময় আছে; গিন্নী পুং ছুং করলেন। ভারতীয় curry powder বা তরকারীর সমস্তের জন্য।

চা খেয়ে ১টা আলাদা বৈর হলাম। ঐ খাল পার হতে হবে ওয়েলস (Wales) খাবার জন্য। খেবার জীমারের বাতারাও মোয়ার-ভাটার উপর নির্ভর করে। ২৩ বার telephone করেও সঠিক সময় জানতে পারলাম না। পথে Collegiate School নামে এক খেরেরের তুল দেখে গেলাম। Rex Thpes নামে এক বৃদ্ধা মহিলা এটা চালান এবং এঁরা স্বামী-স্ত্রী লগনে আবার আয়তন করেছিলেন। বৃদ্ধি তো আবার বেধে তরানক খুলি। তুপুরে খেয়ে খাবার জন্য বললেন এবং আরও বললেন, “একটা পাকিস্তানী ঘেরে এগেছে; সে তোখার সঙ্গে দেখা করতে চার—ভাকব?” আমি বললাম, “খুইই খুলি হব।” খেয়েই এসেছে কোটো গেছে; খেব হয়

১৯১৫ বছর বয়স। আমার বেবে খুব সুন্দর। ২১ জন সঙ্গী ভারত ও পাকিস্তানের পার্শ্বকোর কথা জুলল। যেহেতু বলল, "I see no difference except in name; we were the same six years ago; I feel we are same ever now except in name." তারপর বলল, "এখানে অনেক ভারতীয় আছে; রাখার মতো মাকে দেখি। খুব ভাল লোক।...এর সঙ্গে বন্দীর ভাগ কথা আমি হিন্দিতেই বলছিলাম।" ওখান থেকে phone করে পেরার সময় খেনে মুখের চারের পেরাশা তাড়াতাড়ি শেষ করে ছুটলাম। ১০ মাইল অমানা পথ মোটরে করে গিয়ে ঠিক সময় মত খেরাবাটে পেলাম। ১৮খানা মোটর, মোটরসাইকেল ২৩টা; এমনি সাইকেল ৪৭ খানা প্রকৃতি নিয়ে থাল পেরবার জন্য ট্রাকারে উঠলাম। ১৫মিনিটে

Wales গিয়ে নামলাম। এবার শেষ করি। লম্বা চিঠি হল। আমি এই বেলা ২টার রক্তনা হব এবং ৩ই রাত ১০টার সময় পৌঁছব। লম্বা ও পাকি কেমন আছে? মাঝ কি এসেছেন। পুন্না ও বিজয়া ত এই স্ট্রেচ্ মুমুকেই গেল। ভবু ও বিজয়ার দেহ ও আশীল সবাই আনিস।

৪ গত সেপ্টেম্বরের শেষভাগে লন্ডনে Parliamen-
trains' conference on world government-এর
ষিড়ীর অধিবেশন হয়। ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে
ঐযুক্তবল্লভ শ্বহ তাহাতে অংশ গ্রহণ করেন। ঐ সময়
ব্রিটলে রালা রামনাথন রায়ের সূচাবাবিকীতে যোগ
দিতে গিয়া তাঁহার প্রাকৃপ্ত্রী ঐমতী আন্তি রায়কে
এক চিঠি দেন। সেই চিঠির এক অংশ এখানে প্রকাশিত
হইল। বঃ সঃ

আরাকান

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূঃসংগতি]

লুন পে খুব জুললো। তাঁড়ির বোকারের মাচার
ওপর বা টিন বসে রয়েছে।

লুন পে এগিয়ে গেলো।

'কি ব্যাপার, মাটির ওপর পা চুকছিলে কেন?'

'বা চমৎকার পথঘাট তোমানের, বর্ষাকালে পথে

পা বেঁধেই যায়। হাঁটু পর্যন্ত কাদা ঢিটকে ওঠে?'

'তাই ভালো! একটা চোখ বন্ধ করে বা টিন হেঁসে

উঠলো, 'আমি তাকলাম বুঝি শহর থেকে পোরেনাচের

নতুন কোন ভাল শিখে এসেছে, পা চুকে চুকে ভারত

মহড়া দিলে?'

হাসি পানিয়ে বা টিন গলার সুর বমলে

কেনলো, 'ভালো কথা, বা শিবরের বাতী থিয়েছিলে

তো?'

লুন পে ভুক ভুটো কুঁচকে বললো, 'হ্যাঁ থিয়েছিলাম,
কেন?'

'কেন আমার। এমনি জিজ্ঞাসা করছি। এসেছে

যখন, একটা বন্দোবস্ত করে বাত, মইলে আমাদের প্রাণ

অভিষ্ট হবার যোগাড়।'

তার নানে? লুন পে শক্ত হ'য়ে ঠাড়ায়ে। কিসের

বন্দোবস্ত করবে আর ওই বা করতে বাবে কেন।

'তোমার হৈরাণী বুঝতে পারছি না বা টিন? আমি

কেন বন্দোবস্ত করতে বাবে: ওদের? ওরা কি আমার

সঙ্গে এক আটচালার থাকে না, ওরা আমার আত্মীয়

হুইব?'

'সে কুনিই ভালো জানে তাই' বা টিন পানের ছোপ

ধরা কালো রীতের পাটি বের করে ফেললো। 'তবে কদিন ধরে মা'নিদের মা আবার উদ্ভাষ করে তুলেছে। টাকা হার চায়। কিন্তু আমিই বা খালি হাতে টাকা নিতে বাই কেন ব'লো? বেরেছেলের ব্যাপার, লেখা নেই, পড়া নেই, অমনি হাতে টাকা ঠেঁকিয়ে দিলেই হ'লো! সাত পুত্রে উল্লস হ'বে সে টাকা! আমি লম্বা বসেছিলাম তাই, শুধু হাতে টাকা দেবার মালিক আমি নই, তবে ই্যা একটা কাজ করা বেতে পারে; আমার পাশে একটু ভারগা খালি পড়ে আছে, সেখানে মা'নি বসি দোকান টোকান করে, আমি বিনি ভাড়ার ছেড়ে দিতে রাখী আছি। ওরকম সোমন্ত বহুর ভবগা ছুঁতি পাশে বসে থাকলে, আমার দোকানের ভীড় এমনিট বেড়ে যাবে। লোকদের বিক্রীটাও করার ইচ্ছা, ভবগ হ'রে যাবে। কিন্তু তাতে রাখী নর। ব'লে লুন পে এসে কি বনে করবে।' বা টিন কথার নাকখানে বেধে পড়ে লুন পের দিকে আলগোড়ে নম্বর বুদিয়ে নিলো, তারপর বুধের অদ্বুত ভগি ক'রে বললো, 'শোনো কনা, টাকা ভালবার বেলায় বা টিন আর বনে করবার বেলা লুন পে। তোমার সংপে বনে কথা করির একটা সম্পর্ক গড়ে উঠছে, তাতো জানতাম না ভারা।'।

লুন পের সমস্ত শরীত ঠক ঠক ক'রে কেঁপে উঠলো। হাত দিয়ে বাঁশের মাচাটা চেপে ব'রে কিছুকণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে পড়লো। একবার বনে হ'লো, বাই কিছু হোক, প্রাপণ পলজিতে টেনে একটা ছুঁবি দাববে বা টিনের বুধে। ছোঁপলাগা রীতগুলো আলগা করে দেবে। তার পরেই লুন পে নিম্নেকে সামলে নিলো। তাত্তে কুৎসাটা বাড়বে বই আর কববে না। গারে হি, হি, পড়ে যাবে। রাতের অন্ধকারে সুখ ঢেকে গা গেছে পালাতে হবে শুকে।

লুন পে বা টিনের দোকান থেকে আস্তে আস্তে সরে এলো। রাত্তার কাছ বরাবর এসে ফিরে দাঁড়িয়ে বললো, 'লুনি একটা আত্ম শরতান। লম্বা ব'লেও কি কিছু নেই তোমার।'।

বা টিন হো হো ক'রে হেসে উঠলো, 'লম্বা? লম্বা ছিলো তাই, তোমাদের সংপে যখন লুনে পড়তাম, ব্যবসারে নেমে ও ভিনিঘটার কপর আর তেমন কোর মিই নি। নরত বহুরের পর বহর কি আর দোকান দাড়িয়ে বেতে পারতাম।'।

লুন পের বনে হ'লো হাসির লম্বটা তীরের কদার বসন্ত ওর সর্বাঙ্গে বিঁধে গেলো। কেন এমন করণো মা'নিদের মা। সারা গীয়ে হাতে পেতে দাঁড়াবার আর লোক গেলো না। ওদের গারিজেয় ছিই পথে বা টিন নিজের শোণুপ গুটি দিচ্ছে। বা শিনকে নিজের আওতার আনার অজ কোন কিছুতেই সে পিছ পা হবে না। এমন কোন লম্বত কাজ ছুনিয়ার নেই বা বা টিন করতে পারে না। কিন্তু কোথায়ই বা মা'নিকে সরাবে লুন পে?

নরম রোদে দ্বালের ভগার জনে থাকা অলের কিছুগুলো ককম ক'রে উঠলো। নানা রঙের আলো। আকাশে কালো মেঘের গুর ছিঁড়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। হরত মেঘ কেটে যাবে। লুন পে কপালের ওপর হাতটা আড়াআড়ি তাবে রেখে আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখলো তারপর বেড়ে ঘুরে বা হাতি রাত্তা থ'রে বা শিনদের বাড়ীর দিকে রওনা হ'লো।

বেশি ঘুর এগোতে হ'লো না। বাঁশের আগলটা সাধবনে বন্ধ ক'রে বা শিন রাত্তার ওপর এসে দাঁড়ালো। বা শিনকে আসতে দেখে লুন পে রাত্তার পাশের ব্যবলা কোণের পিছনে লুকিয়ে পড়লো; কাছাকাছি আঁহুক না বা শিন, ভবন বেধা দিলেই চলবে।

বা শিন কিছু ব্যবলা কোঁপ' গরুত এগোলো না। একটু দূরে ধরকে-দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, 'বোপে কাঁকে রাছয় থাকা আমি পছন্দ করি না। আরাকানের ছেলে বেরিয়ে এসে পথের নাকখানে দাঁড়াক।'।

অদ্বুত লুন পে রাত্তার ওপর এসে দাঁড়ালো।

'তোমার চোখ এড়ানো ছুর।'।

'সোমন্ত বহুরের মেয়ে কিনা, তার ওপর আমার ১

গরীবের মেয়ে, চারদিকে চোখ রেখে চলা অত্যন্ত করতে হয়।’

সুন পে একেবারে বা শিনের কাছ বৈলে ঝাড়িয়েছিলো, কি ভেবে গলে ঝাড়ালো একটু। এমন কিছু নির্জন পথ নয়। একটু পরেই এগুণ দিয়ে হাট ফিরতি লোক চলতে শুরু করবে।

‘কোন দিকে যাবে?’ সুন পের গলায় আঙুরাক বেশ ভারি।

‘জংগলের দিকে যাবে। শুকনো কাঠের ব্যবসার। যাবে নাকি সংগে?’

বা শিনের কথার উত্তর না দিয়ে সুন পে পিচনে পিচনে চলতে শুরু করলো।

শাল আর মহুয়ার জংগল। এখানে শুধারে আকন আর বনকুলসীর কোণ।

‘হুড়ী কেমন আছেন?’ সুন পে জল আর কী ঝাড়িয়ে চলতে চলতে জিজ্ঞাসা করলো।

‘সেই রকমই। ভালো ভাবে রোদ না উঠলে বার বাস্তবের বয়না কমবে না।’ বা শিন নিচু হয়ে জিদিগাহের তলা দিয়ে আবার ভিতরের দিকে চলে গেলো।

‘আর কতদূর যাবে?’

বা শিন ফিরে ঝাড়ালো। মহুয়াগাছের পাতার ঝাঁক দিয়ে রোদ এসে পড়লো ওর বুকে চোখে। নয়ন রোদে চোখ দুটো ঠিক ঠিক ক’রে উঠলো, হুচকি চেয়ে বললো, ‘কেন ভর করছে নাকি?’

হালগে বা শিনের গালে টোল বার না। বা শিনের গালের টোল দুটি কিং অসুখ।

‘ভরসাও বিশেষ করছি না। জুলিয়ে কোঁপার দিয়ে বাক্সো অংগলের মধ্যে?’

‘হুল ফুড়োতে নয়, শুকনো কাঠ ফুড়োতে। নইলে রান্না পড়।’

বা শিন হালগে চেঁচা করলেও হাসি ফুটলো না। দুটি চোখের পাতার বিষয় তাই। দুখটো কাকালো।

একটু ভিতরে গিয়ে বা শিন ঝাড়িয়ে পড়লো।

এখান থেকেই কাঠ ফুড়ানো শুরু করবে। ছোট ছোট কান্ডা ডাল আর শুকনো পাতা জড়ো ক’রে তুলেছে। কীকালের সুড়িটা নাথিয়ে রেখে বা শিন হাঁটু বুকে বসে পড়লো।

‘কি সাহায্য করতে হবে নাকি?’

‘সোহাই তোমার, আমার কাজ আর ঝাড়িয়ে না।’

‘আমি তো তোমাকে?’

‘ভার বালো, আমি বুঝি এমনি অশব্দার্থ? বাছুরের কাছ পত্ত করি কেবল?’

‘করোই তো’ না শিন আবার হুচকি হালগো, ‘বাছুরের গড়া ভিম্বি চুরবার ক’রে যাও?’

সুন পে বা শিনের দিকে এগিয়ে বেতেই বা শিন চোখের ইস্তারা তাকে বাধন করলো। সুন পের খোলা হ’লো খোপে বাড়ির পিচনে আরো অনেক কাঠ ফুড়োতে এসেছে। দল বেঁধে এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে পড়ে শুকনো পাতার শুণ তুলছে সুড়িতে। গাছের গুপ্তও চড়েছে কয়েকজন।

সুন পে নিম্নলি গাছের গুড়ির গুপ্তে বসে পড়লো। অনেক দূর থেকে বিলের শব্দ ভেসে আসছে। একটানা ক্রান্তিকর আওয়াজ। অশব্দের পাতার ঝাঁক দিয়ে আত্মকান ইরমার কালো পাখরের খামিকটা দেখা যাচ্ছে। নিকব কালো পাখর, কত বৃণ-বৃণান্তের গ্রহণী।

বাটিনের সংগে দেখা হলো। সুনপে বা শিনের দিকে চেয়ে বসে ফেললো।

‘ভাই নাকি।’ নিম্নলি গলায় শব্দ বা শিনের।

‘ইচ্ছা হলো এক দুদিকে তার বাস্তব পাটি ভেঙে দিই।’ সুনপে দুংগির গুপ্তে নিম্নলি বুটো করা হাতটা বংতে লাগলো।

‘না ভেঙে ভালোই করেছে। একে ভরলোকেব ওই রকম চেহারা তাতে লামনের ঝাঁকটো না থাকলে... বড়ো বিশ্রী দেখাবে।’ বড় একটু শুকনো ডাল হাত দিয়ে তারতে ভাঙতে বা শিন উত্তর দিলো।

‘খুঁচী নাকি বাটিনের কাছে খুব বাওয়া আসা করছেন?’

‘নাও থাকেন, বাটিনও আসছে। তুমি আসবার আগে তো প্রায় বোঝাই সকালের দিকে দাওয়ার এসে বলে পাকতো?’ মাশিন খুঁড়ির প্রায় অনেকটা ভরে ফেলছে।

‘কি চার শু?’ লুনপের গলার আঙুরাখ খুব জোরালো। গলার তীক্ষ্ণ আঙুরাখে কিছু ভালে বলে থাকি। একটা চড়াই ভানা বেলে আর এক পাড়ে উড়ে গিরে বললো।

মাশিন উঠে দাঁড়ালো। কোমরটা ধরে গিবেছে। ছুটো হাত কোমরের রেখে চপালে কাত হয়ে শরীরটা ঠিক ক’রে নিলো, তারপর লুনপের দিকে ফিরে বললো, ‘তোমার সংগে তো দেখাই হ’য়েছিলো, কি চার জিজ্ঞাসা করলেই পারতে?’

লুনপে এগিরে এলো। কোমের পান থেকে দু’এক-জন বোধ হয় লক্ষ্য করছে। তা করক। মাশিনের কাছে বসাবার গিরে বললো, ‘তোমার নাকে আমি প্লাই ক’রে বলতে চাই সব কিছু?’

মাশিন একটু পিঁড়িরে গেলো। লুনপে দুদিন পরে পছরে চলে যাবে, কিন্তু তাকে তো থাকতে হবে গায়ের। পোকের হাসি টিটকিরীত বাকখানে চলকেরা করতে হবে। কোন মাত্রেরে নেন কি আছে বলা যায়!

‘মার জানতে কিছু বাকি নেই। কিন্তু মা কি ব’লে জানো?’

‘কি?’

‘বলে বললোকেই খেয়াল। চোখের দেখা কেটে যেতে কতকণ?’

‘মাশিন’ লুনপে চীৎকার ক’রে উঠলো।

এতলো আমার কথা নয় লুনপে, মার কথা!’

‘তুমি আমার অবস্থান কবে মাশিন?’

‘বিদ্যালয় অবস্থানের কথা আমি তুলে কেন লাভ আছে লুনপে? আমরা কি অন্য দিনের চেনা?’

‘কিন্তু খুঁচী বাটিনকে কেন আমল দিচ্ছেন এত?’ বাটিন কি চক্ষিরে শোক ভাতো? তোমাদের অজানা নয়?’

‘তা জানি লুনপে, কিন্তু বাহুব বখন ডোবে হাতের কাছের ছুটোটা তার তরসইবে কিনা। এত কথা ভাববার অবসর সে পায় না। আমাদের অবস্থা তো তোমার কাছে লুকোবার নয়।’

‘আমি তো রহ’ছি মাশিন। সাহায্যের দরকার হ’লে তোমার মতো আমাকেও জানাতে পারেন।’ লুনপে আবেগে মাশিনের একটা হাত ধরতে গিবেছে কি তেবে নিজেই সামলে নিলো। প্রকৃত দিনের আলোর বাড়াবাড়ি হ’য়ে যাবে। কে কোনদিক দিবে যেবে কেলবে ঠিক আছে।

‘চলো এগোই মাশিন খুঁড়িটা কাঁধে তুলে নিয়ে এগিরে চললো। লুনপে চললো পাশাপাশি।

‘আমার বডো ভর করে মাশিন?’

‘কিদের ভর?’ মাশিন তুল ছুটো কৌচকালো।

‘বাটিন টাক-পরমা দিবে দরত তোমার মার মন কিনে কেগবে। আমি তো এখানে বাকি না। সর্বনাশ বহি হ’রে মার?’

মাশিন হাসলো। হাসি হাসি। খুঁড়িটা কাঁধে বসল করে নিলো, তারপর চলতে চলতেই উত্তর দিলো, ‘তুমি নাই থাকলে, কিন্তু আকিয়ারেবের মদ্র জো রহ’য়েছে। মাশিনের ডোববার মত পতীর জলন্ত তোরবেতে লুনপে।’

লুনপে চপ করে রইলো। কিছু বলা যায় না। বা ঘেঁষী মেরে মাশিন, বাটিনের অভ্যাচারে কিছু একটা ক’রে কেলো ওর পকে খুবই স্বাভাবিক।

অংশের বাইরে এসে মাশিন সোআ রাত্তা বরলো। লুনপে দাঁড়িরে পড়ে বললো, ‘চলি, আক বিকেলে থাকো তোমাদের বাড়ী। খুঁড়ী সঙ্গে কথা আছে করকটা।’

বাওয়া দাওয়া সেতে লুনপে বেতের চেয়ারে গা এলিরে দিলো। হাতে ইংরেজী নতেন। কিন্তু পাতা

মূলতাই রাজ্যের চিত্রা এসে মনের মধ্যে অঁকা হ'লো।

বা টিনের আওতা থেকে কি ক'রে বা শিনকে সরিয়ে আনা যায়। বা শিনদের এই অবস্থার অর্থ সাহায্য হয়কার। কিন্তু গ্রিক নিজের চলার মতন টাকাই উঠান টিন লুন পেকে পাঠান। হাতে বেশী পরমা থাকলে, বিগড়ে যেতে পারে ছেলে। কাজেই উদ্ধৃত বা থাকে তা এমন কিছু নয় বা বা শিনকে পাঠানো যেতে পারে। বাড়তি কিছু উঠান টিনের কাছে চেয়ে নিতেও সম্ভার আছে। হুহুত কৈকিরং চাইবেন। বা টিনের নিজের বোজগারের পরমা, কাউকে গুর অব্যবহিতি করার প্রয়োজন নেই, আর এসব কাজে কিতাবে পরমা ছড়াতো হয়, তা বা টিনের ভালোই জানা আছে। তবে লুন পে কুল কিনারা পেলো না। কিন্তু দোহেবিন গা ছেড়ে বাবার আগে বোকাশুড়া কটা বরকার একটা। অতঃত পোটা তিনেক... বড়র কোন বকনে কাটরে দিতে পারলে, লুন পের আর তহব কিছু নেই। বি-এটা পাশ করতে পারলেই কিছু এন্টা জুটিয়ে নিতে পে পারবে। কিন্তু তিন তিনটে খর বাহুরে জীবনে বড় কম নয়, একটা বয়স সংসারের বোকাবার পক্ষে অনেকখানি সময়।

বারান্ধার চটির আওরাজ হ'তেই লুন পে উঠে বসলো। উঠান টিনের চটির আওরাজ। এমন সময় এমিকে তো বড় একটা ডনি আসেন না। কি ব্যাপার! দরবার কাছে এসে উঠান টিন গলা কাড়লেন, 'লুন পে যুয়েজ্জো নাকি?'

লুন পে বইটা পাশের টেবিলে রেখে হাড়িয়ে উঠে: 'আজ্ঞে না, জেগেই আছি।'

উঠান টিন ভিতরে এসে ঢুকলেন।

'পড়াশোনা কেনন হচ্ছে?' উঠান টিন ইজি চেয়ারে বসে পড়লেন।

লুন পে একটু আশ্রয়ই হ'লো। পড়াশোনা সবচেয়ে উঠান টিন কখনও কোন খোঁজ খবর করেন না।

'দম্ব হচ্ছে না এক বকম।' লুন পে বুস্তুতে পারছে এটা অল্প কোন এসংখের ভূমিকা।

'মন দিয়ে পড়াশোনা করবে। এ বরসে অল্প কিছু চিন্তাও করবে না। কাটা বরস। নানা লোক নানা উঠানী দেবে, কিন্তু মনে রেখো লেখাপড়ার কথা ছাড়া অল্প কিছু চিন্তা করাও তোমার পাশ।'

লুন পে শঙ্কিত হ'রে উঠলো। দিকের কেউ কিছু বলেছে উঠান টিনের কাছে। বা শিনদের কথা কিছু বলেছে নাকি বা টিন! বা টিনের অসাধ্য কোন কাজ নেই ছুনিয়ায়।

লুন পে একটু আমতা আমতা ক'রে লাইই কিস্তাঙ্গা করে ফেললো, 'আমি পড়াশোনার সম্পূর্ণ মনোযোগ মিছি না, এ অভিযোগ কি কেউ করেছে আপনায় কাছে?'

এবার উঠান টিন একটু খতমত খেয়ে গেলেন, 'না না, তা গ্রিক নয়। তবে এই পাড়ার ছ' একজন বলছিলো রাজ্যার।'

পাড়ার ছ' একজন! তবে অংগলে বা শিনের সংশে বুঝে বেড়াবার সময় বেখে ফেলেছে নাকি কেউ। কিন্তু এতো আর নতুন নয়। লুন পে যে বা শিনের সংশে বেড়ায়, এতো দোহেবিনের অধেক লোকই জানে, কিন্তু এর আগে উঠান টিনের কাছে কেউ তো নালিশ করতে আসে নি। তবে, নতুন কি হ'লো আজকে।

'কি বলছিলো পাড়ার ছেলেরা?'

'বলছিলো' কথার কঁকে উঠান টিন চুপট বসলেন। এক মুখ বোঁরা ছেড়ে বললেন, 'ওরা বলছিলো তুমি নাকি চায়ের নোকানে ব'লে কি সব গরম গরম রাজনীতির কথা বলেছো। ইংরেজ ভাড়াবার কথা, বেশ স্বাধীন করার কথা।'

ওঃ এই ব্যাপার। সত্যিই লুন পের বোঝ হ'লো। বাব দিয়ে যেন এর ছাড়লো। বা শিনের কথা নয়, রাজনীতির আলোচনা সবচেয়ে ছেলের অতিযোগ।

হঠাৎ উঠান টিনের কথার লুন পের খেয়াল হ'লো, 'এই সব কাজে ব্যাপার নিয়ে কেন অব্যব। মাথা বামাণ্ড। তা ছাড়া কবে কোন দিচ্ ক পলিশের কানে কথাগুলো

উঠবে, তোমাকে আনাকে ছুঁলকেই নাভেহাল হ'তে হবে।'

সুন শে নড়ে চড়ে সোজা হ'য়ে বসলো, 'নিষেধ দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবাটা বাজে চিন্তা এ আমি কিছুতেই মনে করতে পারছি না বাবা।'

'ও' উচান টিন ভুক ভুটো। কুঁচকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে সুন শেও দিকে চেয়ে রইলেন, 'ওদর চিন্তা কথবার ঢের লোক আছে, তুমি এমন কি মাতঙ্গর হ'য়ে উঠেছো যে সমস্ত চিন্তার ভার তোমার ওপর পড়েছে?'

উচান টিন এমনি খুব ঠাণ্ডা মেজাজের লোক কিছু বাবা পেলেই ভেঙে আশ্রয় হ'য়ে ওঠেন। যদি মাগা মিচু ক'রে সুন শে চুপচাপ বসে থাকতো, তবে ব্যাপারটা এখানেই শেষ হ'য়ে যেতো। কথা আর বাড়তো না। কিন্তু বুকের ওপর সোজা উত্তর মিলো সুন শে। কেন ত' মাস কলেজে পড়ে এমন কি লাহের হ'য়ে উঠেছে যে বাপের মুখে বুকে সমানে উত্তর দেবে!

'বেশ স্বাধীন না হওয়ার তোমার অনুশিষ্টা কি হ'চ্ছে শুনি? খেতে পাচ্ছে না, না পরতে পাচ্ছে না।'

'শুধু একলা আমার পাওরা পরা দিয়ে তো আর একটা আন্তের খাওয়া পহার হিগাব চলে না। তা ছাড়া বোকাটা কেন থাকবে এবেশের মুখে চেপে? আমাদের পরসার ওদের যুক্তুরে তাপ কেন থাকবে? আমাদের বেশ আমরা শালন করবো। ওদের চেয়ে আমরা কিলে কম?'

উচান টিন একদৃষ্টে ভেলের দিকে চেয়ে রইলেন। মুণ্ডা বমবন করছে। কপালের ছপালের নিচাগুলো ফুলে উঠেছে। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কাবড়ে হ'য়ে রাসে বেশ কিছুক্ষণ কথাই বলতে পারলেন না। হঠাৎ একেবারে কেটে পড়লেন, 'তুমি উচ্চর গেছো একেবারে, আহার্যে গেছো। বেশ বুঝতে পারছি কেন একটা বমবাইল দলের পরায় পড়েছো, বরা তোমার বাবার এই সব বদ চিন্তা চুকিয়ে দিয়েছে। তুমি যদি এই দলের হাত এড়াতে পারো তবেই বাঁচবে, নরত করনা।

তোমার ওপর আমি খুবই আশা করেছিলাম। মাতঙ্গের বদন মাছুব হ'বে তুমি। পরকায় হ'লে তোমার বিলেত পর্যন্ত পাঠাবো। কিন্তু বস, শালকাটে গুন ধ'রেছে, কোপরা ক'রে কেলেবে একেবারে। ছুঁনিয়ার কোন কাজে লাগবে না।' চটি কঠ কঠ ক'রে উচান টিন ব্যাঝা পার হ'য়ে চলে গেলেন।

চটির দশ বিলিয়ে বাবার অনেকক্ষণ পর পর্যন্ত সুন শে চুপচাপ বসে রইলো। আচমকা ব্যাপারটা ঘটে গেলো। একটা বস্ত্রপাত। সবুজ গোলমাল হ'য়ে গেলো।

বিকেলের দিকে মশিনের বাড়ী বাবার অস্ত্র কিছুটা এগিয়েই সুন শে বাড়িরে পড়লো। মনের এই অবস্থায় দেখা করতে ইচ্ছা করলো না মশিনের সংগে। কি বলতে কি বলবে। আদ্য থাক বরং অস্ত্র আর একদিন দেখা করবে গিছে। সুন শে ঘুরে প্যাগোডার দিকে পা চালালো।

মুখু খটায় শঙ্ক। বড়ো একটা পাখরের চাকুরের ওপর সুন শে পা ফুলিয়ে বসলো। এখান থেকে সোয়েবিন গাঁটা অনেকখানি দেখা যায়। প্যাগোডা খালি। কড়-বাঘলের দিনে বিশেষ লোকজন নেই। অনেক ঘুরে আকিতাবের সন্মুখের কালি চিক্ চিক্ ক'রে উঠলো। কেমন নিশ্চল আর মন্থর সারা গ্রাম— নিস্তেজ আর প্রাণহীন। এর চেয়ে মন্থর অনেক জীবন্ত। উচান টিনের কথাগুলো কানে ভেঙ্গে আসলো। খুব ঘরেছে শালকাটে, সত্যিই খুব ঘরেছে। সমস্ত আন্তের পাঁজর খুব ঘরে একেবারে কৌপরা করে কেলেছে। একটু আখাতেই ভাঁড়িয়ে ফুলার সংগে মিশে যাবে।

লজ্জার অঙ্কুর নেমেছে। সুন শে চোখ তুললো। আরাকান ইরবার বীর্ষ কতিন বহে। কালো নিরেট পাখরের তপ্ত। গ্রাম নৈ কোথাও। সব কিছুতে প্রাণের স্ফূর্তি ক'রতে হ'বে। দেশের নি-নীড়িত আত্মকে ইজিত বিতে হ'বে। ওদেরপর গাঙলাল, আকাশ বাতাস সব কিছুতে দিতে হ'বে প্রাণের স্পর্শ।

জুনপে উঠে দাঁড়ালো। ওর মনে হ'লো ওর আপে
পাপের সব কিছু বেন একটা আয়ের-সংবাদের অপেক্ষা
করছে। সারা বেলে একটা কি মাপের মতন মাপ
নেই, যে চীৎকার করে বলতে পারে, 'এলো তোমরা,
দাঁড়াও আমার পতাকার তলায়। তোমাদের শক্তির
বিনিময়ে আমি স্বাধীনতা এনে দেবো। মাইকো!'

সিঁড়ি ঘেরে জুনপে তত্ব তর করে নেমে পড়লো।
কত বাবা আসবে ও পাবে, তাইলে সিঁড়িরে দাঁড়ালে
চলে যে কেন? উচানটিন একটা বাবা। কিন্তু দুর্বার
স্রোতে কত উচানটিন ভেলে বাবে ঠিক আছে! রক্ত
বোলের ক্ষতচিহ্নটা দপ দপ করে উঠলো চোখের
সামনে। রক্তা বোলের সংগ্রাম, এদেশেরও সংগ্রাম।
পাশাপাশি দুটো দেশে আঙন জলে উঠবে, বলা যায় না
সেই আঙনে দেড়শো বছরের শক্ত শিকল হরত গলে
গলে পড়বে।

জুনপে অল্পমনস্কভাবে পথ চলতে হুফ করলো।
মামিনের সংগে দেখা করার কথা ছিলো। যেথাই

করে যাবে একবার। যেচাঁরি হরত সারা বিকেল ধরে
অপেক্ষা করেছে।

মামিনের বাড়ীর কাছ বরাবর গিয়েই জুনপে
দাঁড়িয়ে পড়লো। বাবিকের বাড়ী ধরে আর একজন
কে হন্ হন্ করে এগিয়ে আসছে। কাছে আসতে
চিনতে অসুবিধা হ'লো না। বাটিন আসছে, ছাতে
ওঘের নিশি আর কাগজের বোড়ক। রাত্তার পাশে
ঝোপের আড়ালে গিয়ে জুনপে দাঁড়ালো।

বাটিন এগিয়ে গিয়ে মামিনের বাপের আগল ধুলে
উঠানে ঢুক গেলো, 'কেন আসছেন আজ মামীমা!'

ভিতর থেকে মামিনের মার গলায় আগরাক শোনা
গেলো, 'কে বাবা বাটিন, আর তোর অতাই অপেক্ষা
করছি!'

মামিনের মার গম্বীর ঘোর শুনে মনে হ'লো তিনি
তালোই আছেন। জুনপে আছে আঙে ফিরে গেলো।
(ক্রমশঃ)



কাল-পরিচয়

(শরৎ চাট্টোবর রসিকতা)

শ্রীশশীভবোদয় চৌধুরী

তখনকার দিনেও তরুণ সাহিত্যিকদের মধ্যে বিশেষ করে 'কল্যাণ' চক্রের লেখকদের অনেকেই আসতেন আশাদের এখানে। তাঁদের আশ্রয়চার উদ্দেশ্যে কিংবা কোন বিশেষ একটা বস্তুতঃ সাধনের মানসে যে তাঁরা আসতেন, তা নয়। তাঁদের সঙ্গে আশাদের সম্পর্কটা হয়ে উঠেছিল দ্বন্দ্বের। বোধ করি এটা অত্যধিক নির্বিড় হয়েছিল তাঁর একটা প্রধান কারণ হলো: বয়সের সমতা; আর দ্বিতীয়তঃ তাঁদের দলের একটা উচ্চল বনি ছিল আশাদের বাবুজান—প্রেমেন্দ্র মিত্র। কিছুকালের মধ্যে আশাদের বৈকালিক বৈয়াকট্য সঞ্চারিত হয়ে উঠতো তাঁদের কল-কল্যাণ সম্বন্ধে। নির্বল, অক্ষুণ্ণ রসের বস্ত্রা বয়ে যেতো; এর উৎস ছিল উত্তর তরকের দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে।

ব্যাক্তান্য, বয়স সাহিত্যিক ধারা আসতেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে দেখেছি ডাঃ দীনেশ সেন ও শরৎ চাট্টোবকে। ডাঃ দীনেশ সেনের সাধারণ ছিল আশা-দ্বন্দ্বের শুষ্ক, রুদ্ধ এক রাগ চুল, তাতে কোনদিন-তেল পড়তো কিনা জানি না। গায়ে থাকতো লুপ্ত ক্লাইভের আশলকার বরণের আভ্যুত্থানিত মোটা একটা কোট; গায়ে বোঝা এবং পলায়নরত কলকটার অভ্যাস—সে কিবা গ্রীষ্ম আর কিবা শীত। সে এক অদ্বুত বৈশ, ছর শব্দকে ভাঁড়িয়ে কেন যে তিনি একটা শব্দে এনে পাক করিয়েছিলেন তাঁর কারণ জানতে পারি নি কোন দিন। কোন কোন দিন আসতেন একটা নাতিকে সংগে নিয়ে—যেন বরের পাশে কোল-বর। বাংলা সাহিত্যের গবেষণা বিভাগে প্রবেশ মিত্র ছিল তাঁর সহকারী—সহকারী হিসাবে নয় বৈ-সহকারী। প্রেমেন্দ্রের এ কাগজটা ছিল নিছক বৃত্তিগত, চিত্তের যোগ তাতে ছিল না বড় বেশী। তবু প্রেমেন্দ্রের প্রতিভা তার মধ্যেও প্রকাশ পেতো; ডাঃ সেন তাই প্রেমেন্দ্রের প্রতি

ছিলেন আকৃষ্ট। আশাদের এখানে তাঁর শুভাগমনের হেতুর মধ্যে বোধ হয় এটাও একটি।

শরৎ চাট্টোব আসতেন এই প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাঁর দৃষ্টি বোধের বরণ। সাহিত্যের আলর থেকে টেনে এনে তাঁকে রাজনীতি ক্ষেত্রে বীড় করিয়েছিলেন বেশবন্ধু চিত্তবন্ধন তাঁর স্বরাজ্য দল গঠনের সময়। বেশবন্ধুর অসাধারণ কাল ছিল না। তিনি সে সময় অনেককেই এক ঘাটে মল বাইরেছিলেন। শরৎচন্দ্র তখন কিছুকালের মধ্যে কলম ছেড়ে পত্রব্যবসায়ী হয়ে বেশবন্ধুর সংগে বাংলা দেশের বিভিন্ন স্থানের সভা-সমিতিতে ঘুরেছিলেন। বেশবন্ধুকে যেমন তিনি প্রভা করতেন তেমনি দেহ করতেন সূতাশচন্দ্রকে। তাঁদের উভয়ের কাছে তিনি আশা করেছিলেন বাংলার স্বকীর্তার উদ্বোধন ও রক্ষণ। বাংলা দেশের কোন বিখ্যাত নেতা কিন্তু সে সময় বেশবন্ধুর বিরোধী হয়েছিলেন; যদিও তাঁর কঠিন ও লেখনী অবিচল হয়ে পায়নি তখন, শুধুনি বেশবন্ধুর কাছে তা বাধাবরণ বলে মনে হয়েছিল। উক্ত বিখ্যাত নেতা তাঁর বৃত্তিমের করকলম সংগীতে নিয়ে পরিচিত হয়েছিলেন 'নো-চেন্সার' অর্থাৎ অচলারভন বলে। গান্ধী প্রদর্শিত পথ ছাড়া নান্দ পছন্দ বিভ্রান্ত—এই ছিল তাঁদের ধারণা।

বেশবন্ধুর কর্মপন্থার সমালোচনা করতে গিয়ে উক্ত নেতা বোধ হয় শরৎচন্দ্রের প্রতিও কী একটা কট্ট্রি করেছিলেন একবার। তাতে শরৎচন্দ্র হয়েছিলেন অধীর ক্রুদ্ধ, রাগ আর তাঁর শব্দে না কিছুতেই। পূর্ববঙ্গে একটা সভার অধিবেশনের পর শরৎচন্দ্র তাঁর নির্দিষ্ট আবেগে ঘন ঘন পার্যচারি করছিলেন; তাঁর মন অধির, চিত্ত চঞ্চল, তাঁর প্রতি উক্ত নেতার সেই উক্তিটা তাঁকে বিদ্বেষ করেছিল।

অতীতই ছিলেন হেমন্ত সহকারী। শরৎচন্দ্র তাঁকে

কাতে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—হেমন্ত, খুন করবে।
অথচ আইনের কবলে পড়বো না! এমন পন্থা বাস্তবোন্মতে
পাওয়া?

—কী রকম?

—এই ধরো অনুকূলে আমি খুন করতে চাই অথচ
আমাকে কেউ কীসিঙে লটকাতে পারবে না।

হেমন্ত সবক'র হেসে উঠলেন। বললেন—দাদা,
উপজ্ঞাসে হয়তো সম্ভব হ'তে পারে কিন্তু বাস্তব
জগতে তা কী ক'রে সম্ভব তা তো বলতে পারি না।

“ও কিরণ! কিরণ!” কিরণশব্দর রহস্য কানেই
ছিলো। পরব্রহ্ম তাঁকে অন্তঃপুর বললেন—“তুমি তো
ভাই, ব্যাভিষ্টারি পাশ করেছিলে তুমিই। বলতে
পারো খুন ক'রে রেহাই পাওয়া যায় কী করে?”

কিরণশব্দর অস্বাভাবিক হয়ে গেলেন এই প্রশ্নে। রসিক
ব'লে তাঁর ব্যাভিষ্টারি থাকলেও পরব্রহ্মের এই বদ
রসিকতার তিনি তাঁর প্রতিভা দেখাতে পারলেন না
আমো।

পরব্রহ্ম বিরক্ত প্রকাশ ক'রে বললেন—“দূরে!
তুমি ব্যাভিষ্টারি পাশই করেছো, অ্যাকটিন্ করো
কোনদিন—একবার! আমি জুলাই গিরেজিগুহ!”

অন্তঃপুর পরব্রহ্ম হেমন্তদ্বার পরণ নিলেন। ভীষণ
আক্রোশের একটা কৃত্রিম ঢাকলা প্রকাশ ক'রে দে-
বদ্বকে বললেন,—‘দাদা সাহেব, আপনি তো পাকা
ব্যাভিষ্টার। আজ্ঞা, আপনাদের শাস্ত্রে এমন কিছু
আছে যাতে খুন করলেও খুনী আইনের কবলে পড়-
না?’

দাদা সাহেবও হতভম্ব হ'রে গেলেন। খুনী যে, সে
খুনের দ্বারে পড়বেই, তবে খুনী বলে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যে
খুন করেনি এটা অবিত্তি তিনি যদি তাঁর ব্যাভিষ্টারি
বুদ্ধির দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন তা হলেই খুনী-
বাচ্যতার একটা পন্থা হ'তে পারে নতুবা অভ্যাক খুনের
দ্বার থেকে তিনি কী করে খুনীকে রক্ষা করতে পারেন!

তা তাঁর শব্দশাস্ত্র মন করলেও তো মিলবে না।

পরব্রহ্ম অন্তঃপুর তাঁর নিজ প্রতিভা ব্যক্ত করলেন—
“দাদা সাহেব! বুধাট ব্যাভিষ্টারি করলেন এতদিন!
ধরুন, অনুকের (যানে ঐ অলদারভনের) বাড়টা। যদি
আমি হট্টকে একটা ড্রেনের মধ্যে ফেলে দিই তবে লোকে
ওটা গাড়কাক ছাড়া আর কিছু মনে করবে কি? আর,
গাড়কাক খারলে কেউ খুনের দ্বারে পড়ে?—বলুন তো
দাদা!”

পরব্রহ্ম গম্ভীর। দাদা সাহেব হোঃ হোঃ করে হেসে
উঠলেন—তাঁর সঙ্গে আর সবাই। পরব্রহ্মের রসিকতা
দাদা শোনেমনি বা তার বদপট্টা দেখেমনি, তাঁরা সে
রস পেকে বন্ধিত। বিক্ষোভের উজ্জ্বল অঙ্গি ক'রে
রসে গলিয়ে দেওয়া ছিল তাঁর স্বর্ন।

মনে আছে পরব্রহ্মের অস্বাভাবিক উপলক্ষে তাঁকে
প্রথম জনসভার সম্বন্ধিত করার বিরাট আয়োজন
হয়েছিল ঘটনাক্রমে আবারের তরফ থেকেই। পরি-
কল্পনাটা প্রথম এসেছিল ‘কল্লোল’-চক্রের সাহিত্যিকদের
মাধ্যম। কিন্তু তাঁরা দেখলেন তাঁদের দলের একক
চেষ্টার এই বিরাট আয়োজন সম্ভব নয়। বিশেষ করে
আয়োজন এর সঙ্গে সংবাদপত্রের সহযোগিতা।
করওয়ার্ড প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে পরব্রহ্মের আর্থিক বোগের
কথা কল্লোল-চক্রের অজান। ছিল না, তাই স্বতাবতঃই
এই প্রতিষ্ঠানের কথা তাঁদের মনে পড়েছিল।

সেদিন ছিল রবিবার। ইংরাজী মৈনিকের সেদিন
কোন কাজ নেই। আবারের বাংলা বিভাগ খোলা
ছিল। কল্লোল-সম্পাদক বীর্বেশ্বরদাস দাস তাঁর প্রস্তাব
নিরে এলেন। আবারের সম্পূর্ণ সহযোগিতা যে এ
উজ্জ্বলে থাকবে, এটা বলাই বাহুল্য। অন্তঃপুর এলবার্ট
হলে নির্দলচক্র চক্রের সভাপতিত্বে যে সভা হলো। তাতে
সম্বন্ধী সমিতি গঠিত হয়ে গেলো। প্রথম চৌধুরী
সভাপতি, আবারের ‘বঙ্গদর্শন’ কথাসম্পাদক গোপাল
সাহা সম্পাদক, বীর্বেশ্বর দাস এবং অবিনাশ ঘোষাল
সহ-সম্পাদক আর ইঞ্জিনিয়ার কোমোডোর। সম্বন্ধী
সমিতির উল্লেখযোগ্য সভ্যদের মধ্যে ছিলেন উপেন্দ্রনাথ
বন্দ্যোপাধ্যায় আর কিরণশব্দর দাস।

চারিদিকে সেবার সারা পড়ে গেলো। একটি প্রভাবশালী সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের প্রচারমূল্য তখন অনেক। 'প্রেসিডেন্সী কলেজের বহিঃ-শরৎ সমিতিও সেবার শরৎচন্দ্রে সঞ্চর্না করবার আয়োজন করেছিলেন; ভাড়াড়া ছোট ছোট আরো কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের শরৎ-প্রীতি সেবার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু ঐক্যে সঞ্চর্না করার আয়োজন হয়েছিল ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে বধ্যাকালে সেই বরণ্য ব্যক্তিকে আর পাওয়া যায়নি না। সকলের মনে উষ্ম আত্মপাত। কথা ছিল সকলের দিকে তিনি কলকাতার হাজির হবেন। এমনে প্রেসিডেন্সী কলেজের চাকরের সত্য বোপ দিয়ে তারপর আসবেন আমাবের এখানে অর্থাৎ ইউনিভার্সিটি হলে। এইখানকার সভ্যটাই বিরাট। ছোট ছোট আর সব প্রতিষ্ঠান আনাবের এখানেই মিলে গিয়েছিল। কিন্তু বেলা দশটার সময়ও যে তাঁর কোন বোঝ নেই!

'কাসি-কলন সম্প্রদায় হুগলীর বহু ছুটলেন হাওড়া ষ্টেশনের দিকে। একোজন হলে হরতো তাঁকে ছুটতে হবে 'সান্ডা-বেঙ্ক লক্ষ্য' হয়ে ত্রুণাতারদের তীরে। শরৎচন্দ্রের বাড়ী তখন সেইখানেই, কলকাতার তখনো তাঁর বাড়ী হয়নি।

বেলা এগারোটার সময় নির্বলচন্দ্র কোন করে জানালেন, শরৎচন্দ্র হাফিজ হবেরেন এবং তাঁরই কাছে আছেন। ঝাটা গেলো, একটা দুর্ভাবনা গেলো!

ইন্সটিটিউট হলটি লোকে শোকারণ্য। ভিতরে স্থান সঙ্কুলান না হওয়ার বাইরের রাস্তার উৎস্রক জনতা চেয়েছিল এই দিকে। লাউন্ড স্নীকারের প্রচলন হয়নি তখন এখনকার মতো। স্তম্ভরং প্রতিজ্ঞকর কোন কিছুর আশা ছিল না এই জনতার। তবু যদি এই বিশেষ দিনের বিশেষ আয়োজনের ক্ষেত্রে এই বিশিষ্ট অতিথিকে একবার চোখে দেখা যায়!

শরৎচন্দ্র এখন হাজির হলেন তখন বেলা দুইটা পড়িয়ে গেছে। হলে প্রবেশের মুখে শরৎচন্দ্রের পিছনে

প্রবেশই নজরে পড়লো একভোড়া লোক—কবি নরেন্দ্র দেব, ব্রজেন্দ্র কারো বাবা হলো না। ভবিষ্যৎ ব্যাক-প্রাউন্ট ছিল তাঁলো। আশে পাশে ছিলেন, সুবোধ দাস, হুগলীর আর বেহালার বণি দাস। শরৎ-চন্দ্র যদি রাতের মোটরখানা সেবার কাছে লেগেছিল খুব।

শরৎচন্দ্র আসন গ্রহণ করলেন। তোকিল-কর্তৃ বিলীপ রাতের কঠে জনিত হলো—

কোন্ শরতে পূর্ণিমা চাঁদ আসিলে এ বরাহল।

কে মলিন তব তরে কোন্ গুণে ব্যাঘর লিম্বলয়।

ছায়ার ভাঙা ভাগল ভোম্বর এই বেদনার দরিদ্রার।

আল ভারতী অলম্বতী মধ্যে হুশে টলমল।

কখন ভোম্বর বাজল বেণু প্রাণের বংশী বট-ভার

মহা গাভের তাক। যাতে খট করে গোপিনী মল।

বিদ্রোহের বাক্য হাসি হাসির। কালো মেখে।

আসিলে কে অভিমাত্রী বহরে মরুতে চল।

গরে হাতে জিন্ন-কাঠি আসিলে কে তপসুয়ার।

উঠল বেগে তপসুয়ারী ঐধারে ঐ বলমল।

আকাশে চকোরা কীমে তড়াগে চাহে কুন্দ।

বরুণ আধির শেকালিকা ছুঁয়ে তব পদমল।

গানটির রচয়িতা কবি^১নজরুল ইসলাম শরৎ এই

সত্য উপস্থিত ছিলেন। তখনকার দিনের খুবসমাজে নজরুল ও বিলীপসুয়ারের জনপ্রিয়তা ছিল অসাধারণ।

কথাকে শ্রবের তরঙ্গে খেলিয়ে একটি অনবদ্য চিত্র প্রোভার মনের পর্দায় একে দিবার অসুল্লমীর ক্ষমতা ছিল বিলীপসুয়ারের। বেশ মনে পড়ে শ্রবকার বিলীপসুয়ারের সেবিনকার সত্য যে শিল্পীর স্বগণন করলেন তিনি যেন কোন্ দূর অলকাপুরী থেকে নেমে এসেছেন ধরার অভিব্যক্তি হয়ে; তাঁরই সত্যে কড়ে পড়েছে সেই অলকাপুরীরই শ্রবের নিভর।

ইন্সটিটিউটের বিরাট হলটির উপরে, বীচে, আশে-পাশে সর্বত্র সমবেত জনতা জড়, নিপল। সকলের একাগ্র দৃষ্টি এবার পড়েছে সম্মানীয় অতিথির দিকে—যে

অভিগি বাঙ্গালী সমাজের ভ্রমর ভর করে নিয়েছেন
ব্রহ্মকাল মধ্যে অতি সহজে।

একটি শান্ত, মৃদু পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছে। এইবার
কবিত্তর রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী পাঠ করা হবে।
রবীন্দ্রনাথ এই সভার প্রথম উপস্থিত থেকে সভাকে
সৌন্দর্যবান করতে পারবেন না; এটা আশঙ্কা হয়েছিল
আগেই। বাই হোক, আমাদের উৎসবের দু'দিন
আগে তাঁর আশীর্বাণী পৌঁছেছিল এমন চৌধুরী
কায়দে।

অতি নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির পোক এমন চৌধুরী।
তাঁর কীর্ণ কর্ণের আওরাজ গুলেয়ে যেন হতো না জীবনে
কখনো কোন চাকলা তাঁর একশ পেয়েছে। পকেট
থেকে কবিত্তর লেখাটুকু বার করতে তাঁর বিলম্ব
হচ্ছিল, হয়তো তাঁর লক্ষ্যে ছিল এই বিরাট জনতাকে
কী করে জনাবেশ করি, বাণী তাঁর কীর্ণ কর্ণে। এই
বিধা-লক্ষ্যে লক্ষ্য করে ছুটে এলেন কবি বতীন বাগচী,
আমাদের বহুলাকার গিরিজা (কবি গিরিজাকুমার
বহু) আর ডাঃ নরেশ সেনগুপ্ত ডি.এল। কবি
আশীর্বাণী নিয়ে প্রায় 'ডুয়েল' বললেও চলে। কারণ
তখন—

যদি নট-ঠাট কে করিবে পাঠ
তাঁর লালি কাড়াকাড়ি।

'বীরবল' নামের ব্যক্তিটির বসী চালনা থেকে ধারা
তাঁর অসি চালনা হচ্ছে একটা বহু ধারণা পোষণ
করতেন তাঁদের সে ধারণা দুই হয়ে গেলো। বীরবলে
বীর্য দুই বাক, বলই ছিল না গারে। কবিত্তর
আশীর্বাণী নিয়ে যখন কাড়াকাড়ি চলছিল 'বীরবল'
বীরবল তখন হতবাক হয়েছিলেন। বীরবাহু ডাঃ
নরেশ সেন গুপ্তের দর হলে। 'হুউউ গভীর কর্ণে তিনি
পাঠ শুরু করলেন রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী—

ঐহিক শরৎকাল চট্টোপাধ্যায়ের সম্মাননা সভায়
বাংলা দেশের সকল পাঠকের অভিনন্দনের সংগে আমার
অভিনন্দন বাক্যকে আমি সন্নিবিষ্ট করি। আজও

সমরীরে পুণিবীতে আছি, সেটোতে সময় লক্ষনের
অপরাধ প্রত্যাহাই এল হতে, সে কথা অরণ্য করবার
নানা উপলক্ষ্য সর্বদাই ঘটে, আজ সভার সমরীরে
উপস্থিত থেকে সকলের আনন্দে যোগদান করতে
পারলুম না এও স্মারি মধ্যে একটা। বস্তুতঃ আমি
আজ অতীতের প্রান্তে এসে উত্তীর্ণ—এখনকার
প্রদোষাভ্যাস থেকে কীর্ণ কর প্রসারিত করে তাঁকে
আমার আশীর্বাণী মিতে বাই, যিনি বর্তমান বাংলা
সাহিত্যের উদয়-নিখরে আপন প্রতিভা-স্বোভিত্তি বিকীর্ণ
করলেন। ইতি—২২শে ভাদ্র, ১৩৩৪।

বলা বাহুল্য, অতীর্ণা সমিতির সভাপতির বরচিত্ত
সম্বর্ধনা সভাপের তাঁর পকেট পাঠ করা কল্যাণীত।
সেটাও পাঠিত হলো বকলয়ে।

তারপর পাঠ করা হলো সর্বসাধারণের তরফ থেকে
রচিত্ত অভিনন্দন পত্র। রচনা করেছিলেন রবীন্দ্র
উপেন্দ্রনাথ বসু।

রূপার পাতে খোদাই করা হয়েছিল বীন্দে-করা নীল
অক্ষরগুলি—

ঐহিক শরৎকাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়

ব্রহ্মপদেহু।

হে বহু, তোমার জি-পঞ্চাশৎ অগ্রদিনে আমরা—
তোমার গুণবৃত্ত দেশবাসী—তোমাকে অভিনন্দিত
করিতেছি। বাঙালীর দুঃখ-দৈনন্দিতা জীবন ভূমি মধুময়
করিয়া তুলিয়াছে; আমাদের হাসি-কান্না, আশা-আকাজ্ঞা,
ভয়-ভাবনা আজ তোমার গুণে অমর। শিল্পী তুমি,
তোমাকে নমস্কার করি।

কেন্দ্রের নর-নারীর তুচ্ছ জীবনকে মহিমাযুক্ত করে,
যতই বর্ষ অমর করে, কলহকে চন্দনদর জ্ঞান করে,
কেন্দ্রের বহুকেও অভিজ্ঞ করে,—হে কবি, তুমি সেই
সর্বহার প্রেমের অরগন করিয়াছ। প্রেমিক তুমি,
তোমাকে নমস্কার।

অশ্রু-তোলা অহির সন্ধান খেলার পেখে যেমন
ছুটিয়া আসিয়া কোর করিয়া নরের কোল দখল করে,

বলবানীর আশ্রয়ে ঘন তুমি, তেমনি করিয়া প্রবাসের
বেলা শেষে আক স্মৃতি ভরনীর কোল অলঙ্কৃত করিবাচ।
তুমি আত্মীয় হও, তোমার লেখনী ভরনীর হৃৎক—
আক তোমার অবশ্যবানীর ইহাই কামনা। ইতি—
স্ববিবাহ, ৩১শে ভাদ্র, ১৩০৪।

এই অভিনন্দন পত্রের সংগে শরৎচন্দ্রকে উপহার
দেওয়া হইবে। একটি সেনার ফাউন্টেন পেন, গরদের
ছোড আর একটি লুকার রূপার গডগড়া।

অস্ত্রাঙ্গ প্রভিটানের অভিনন্দন পত্রগুলিও তাঁকে
দেওয়া হলে। শক্তিতে গেলে সমস্ত লাগতো। আর
বৈশিষ্ট্য সহ্য করার ঠিক নয়। শরৎচন্দ্রের দিকে তখন
সবাই চেয়ে আছে তাঁর ভাবন ও নবায় ভাষে। তা হাউ।
অন্তর্যমী হৃদয়ানে বিরত পাকা যে শরৎচন্দ্রের পক্ষে কী
বাস্তবিক ব্যাপার তা কেবল তিনিই অনুভব করতে
পারছিলেন। ভাবন পাঠের দারিদ্র্য কখন কখন
সেের দিতে পারবে যেন তিনি বাচেন। বিরাট সত্য
সত্যানন্দের অন্তর্যমী, ভীত, লাজুক শরৎচন্দ্রের সে কী যে
অস্বস্তি! উৎসবটা শেষ হলে যেন তিনি হাঁক চেড়ে
বাচেন। বিজয়লাল প্রকৃতি আমরা করেকজন ছোট
ছোট কবিতার শরৎচন্দ্রকে করেছিলেন। লিখে কেলে-
ছিলেন অলঙ্কৃত। কিন্তু তা এই বিরাট জনতার সমক্ষে
পাঠ করতে হবে, এ আমি কল্পনাও করি নি। অপরের
কথা জানি না, আমি গাড়িরে উঠলে যে একটা
কেলেক্টরী করে কেলেক্টরী তা নিশ্চয়। পাঠক ঠক
করে কাগজে আর হাতের কাগজ ব্যক্তিগত পুঁজিতে।
গড়তে হবে না তেনে আমার ক্রম ক্রম ক্রম ভাবাবিক
অবস্থার এসে গেলো। মনে মনে বললাম—আঃ!
বাচলে মনুষ্যত্ব।

উৎসব জনতার মনে বিদ্যুৎ কলকের ভাব আনন্দ
সত্যক করে শরৎচন্দ্র এইবার গাড়িতে উঠলেন। বেশ-
জুয়ার পারিপাট্য হীন শরৎচন্দ্রের গাড়ি ছিল একটা
সাদা বর্মের 'চাইনা' কোচ। তাঁর স্ত্রী অতিভাবপটু হু
প্রাণপ্রতা অননুক্রমণীয়। বীরে সেটুকু পাঠ করার সময়

জনতার দিকে চাহিনি তাঁর খুব কমই নিকট হইবে।
শরৎচন্দ্র বজা নন্দ, শিল্পী; শিল্পীর অনন্ত ভাবা তাঁর
ভাবকে হৃদয়ে ফুলাইল। সত্যক। সাহিত্যের বিচারে
তাঁর বক্তব্য যে সত্যকে প্রকাশ করেছে তা কালবিশেষের
সীমাবদ্ধ আধুনিক সত্য নয়, তা চিরকালের। কলে-
ছিলেন তিনি—

“এই যে অস্ত্রাঙ্গ, এই যে আমার অস্বস্তিক্ষেপে
উপলব্ধ করে আনন্দ প্রকাশের আয়োজন আমি জানি
এ আমার ব্যক্তিগত নয়। দরিদ্র গৃহে আমার ভয়, এই
তো সে দিনও দুই প্রবাসে তুচ্ছ কাজে জীবিকা অর্জনেই
ব্যাপৃত ছিলাম, সেদিন পরিচয়ের আমার কোন সত্যই
ছিল না। তাই তো বৃষ্টিতে আক ব্যক্তি নেই—এ প্রকা
নিবেদন কোন বিস্তারিত নয়, বিস্তারিত নয়, উদ্ভাবিকের
হয়ে পাওয়া কোন অস্বস্তি যিনের গৌরবক নয়, এ শুধু
আমাকে অবলম্বন করে সাহিত্য লব্ধীর পদতলে ভক্ত
সাহিত্যের প্রকা নিবেদন।

সাহিত্যের দিক দিয়ে এ বর্ষাকার বোগ্যতা কি আমি
সত্যই অর্জন করেছি? কিছুই করি নি একথা আমি
বলব না। কারণ, এত বড় অতি দিনের অত্যাতি দিয়ে
উপলব্ধ করতে আমি নিজেদের চাই নে, আপনাদেরও
না। কিছু আমি করেছি। বজা বলবেন, শুধু কিছু
নয়, অনেক কিছু, তুমি অনেক করেছে; কিন্তু তাঁদের
বলকল্পে ধারা নন, তাঁরা হয়ত একটু হলে বলবেন অনেক
নয়, তবে সানাত্ত কিছু করেছে। এইটাই সত্য এবং
আমরাও তাই জানি। কিন্তু তাও বলি যে সে সানাত্তের
উর্ধ্ব বুদ্ধি আর অধের আবর্জনা বাদ দিলে অবশিষ্ট
বা বাক্যে কালের বিচারালয়ে তাঁর মূল্য লোভের বস্ত
নয়।

এ বিরাট বলেন আমি তাঁদের প্রতিবাদ করি নে।
কারণ তাঁদের কথা যে সত্য নয় তা কোন মতেই ভোর
করে বলা চলে না। কিন্তু এত ভক্ত আমার দৃষ্টিভাঙ
নেই। যে কাল আকও আসে নি, সেই অনাগত
তবিশ্বস্তে আমার লেখার মূল্য থাকবে, কি থাকবে না

সে আমার বর্ডহানের সত্যাপলঙ্কির সংগে এক হয়ে
মিলতে না পারে, লখ তাকে তো ভাঙতেই হবে। তার
আয়ুতাল যদি শেষ হয়েই যায়, সে শুধু এই ভেঙেই বাবে
যে আরও রহস্য, আরও স্মৃতি, আরও পরিপূর্ণ সাহিত্যের
সৃষ্টি কার্ণে তার ককালের প্রেরণাওন হয়েছে। ক্ষোভ
না করে বরঞ্চ এই প্রার্থনাই জানাও, আমার ঘেলে
আমার ভাবার এত বড় সাহিত্যই ভুল্লাসত করুক, যার
কুলন্যায় আমার লেখা যেন একদিন অকিঞ্চিৎকর হয়েই
থেকে পারে।

এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা আমার সর্ববাই মনে
হয়। হঠাৎ মনে মনে যা লাগে ভাবাপি একথা সত্য
খলেই বিশ্বাস করি যে, কোন যেনের কোন সাহিত্য
কখনো নিত্যকালের হয়ে থাকে না। বিশ্বের সমস্ত
কষ্ট বস্তুর মত এও অমর আছে, পরিপতি আছে,
বিনাশের অঙ্গ আছে। মানুষের মন ভাড়া ত্যা সাহিত্যের
গাভারার কারসা নেই, মানব-চিত্তেই তো তার আশ্রয়,
তার সকল ঐশ্বর্য বিকশিত হয়ে উঠে। সেই মানব-চিত্তেই
যে এক স্থানে নিশ্চল হয়ে থাকতে পারে না। তার
পরিবর্তন আছে, বিঘর্ভন আছে,—তার রসবোধ ও
গৌল্লর্ঘ্য বিচারের ধারার সংগে সংগে সাহিত্যের পরিবর্তন
অব্যক্তাধী। তাই এক মুগে যে মূল্য মানুষ খুঁদী হয়ে
দেয়, আর এক মুগে তার আর্থিক দান দিতেও তার
কুষ্ঠার অবধি থাকে না।

ছেলে বেলায় আমার ভবানী পাঠক ও হরিরাসের
গুপ্ত কথাই ছিল একমাত্র লবণ। তখন কত বস, কত
অনন্দই যে এই দুইখানি বই থেকে উপভোগ করেছি
তার সীমা নেই। অথচ একে সে আমার কাছে মীরস।
কিন্তু এ প্রবন্ধের অপরাধ, কি আমার বুদ্ধির অপরাধ তা
বলা কষ্টের। অথচ এমনি পরিহাস, এমনই অগভীর
বদ্ধুল সংস্কার যে, কাব্য-উপভোগের ভাল মন্দ বিচারের
শেষ তার নিয়ে পড়ে বুদ্ধির পড়েই।

সৃষ্টির কালটাই হলো। যৌবন কাল—কি প্রজ্ঞা সৃষ্টির
বিক দিয়ে, কি সাহিত্য সৃষ্টির বিক দিয়ে, এই বয়স

অস্তিত্ব ক'রে মানুষের দৃষ্টির দৃষ্টি করতো। ভীষণতর
হয়, কিন্তু আচ্ছন্ন দৃষ্টি তেননি স্বাপ্না হয়ে আসে।
প্রাণীকতার পাতা বৃদ্ধি দিয়ে তখন নীতিপূর্ণ কলাপকর
বই লেখা চলে দিচ্ছ আশু-তোলা যৌবনের প্রলবণ বেয়ে
যে রসের বস্তুর হয়ে পড়ে তার উৎসবুধ রক্ত হয়ে যায়।
আজ এত বছরে পা দিয়ে আমার এই কথাটাই
আপনাদের কাছে জানাতে চাই।

বক্তব্য শেষ করে পরৎক্রে মুরলীধর, মীনেশ দাস
প্রভৃতির বিকে করুণভাবে চাইছিলেন। তাঁর বহুত্ব
ধর্মপানে বিবস্ত পাশাও অবস্থাতা তাঁর ভক্তমুগ্ধের বুকে
বাকী রইলো না। যে স্থানে ভিনি বলেছিলেন সেটা
রক্তরক্তই বলা চলে। একটু আড়ালে গেলেই যেন
“প্রীনকম” পাওয়া যায়। কয়েক মিনিটের ভক্তে ভাড়া
পেয়ে পরৎক্রে তাঁর নেতার পর্ব শেষ ক'রে এলেন।

বিলীপ কুমারের কঠোর আবার ক্ষণিত হলো:—

“তুমি যে মৃত্যুর কমল মনে
আহরি আন মধু আশ্রম মনে,
গোপন বেদনার অমির তালি
কর তা লবাকার পরম আপনার
অমর কর সেই চরম মনে।”

ইত্যাদি—

কীর্তনের সুরে মধুর জতি গান। অপর মধুরতর
লেগেছিল এই গানের আশ্রয়—

“এগো মধুকর
কমল মধুকর
গগো কমল দুলাল লব ত্যজি তুমি
বেদন-কমল মধুকর।”

ইত্যাদি—

রচনা করেছিলেন নিরুপমা দেবী। প্রখ্যাতা উপভাস
লেখিকা নিরুপমা দেবী নন, ইনি কবি নিরুপমা। রাষ্ট্র
নিরুপমা দেবী নারী যে মহিলা কবিতা লিখতেন ইনি
সেই নিরুপমা। কোচবিহার রাজপরিবারের বধু
হিলাবে ইনি রাষ্ট্র বলে পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু আমরা

বন্দন তাঁকে পরৎ-সম্বন্ধী। সত্যের উপস্থিত দেবতার তখন আর তিনি রাণী নন, শুধু বাণীর উপাসিকা, রাজ-পরিবার ভাগ্য করে সাধারণ পরিবারে বেবে এসেছেন। শুধু বাণীর জ্বরে রূপের ঐশ্বর্য তাঁর ছিল। কাঞ্চল-কালো চোখ দুটো। ভিল বেন 'পরশরে ক্রিতি' আর সে চোখে ছিল নদীরতার চোরে অমিশিখার আভা।

সেদিন পরৎস্র বিদায় নিলেও আসর ভাঙেনি অনেকক্ষণ। দিলীপকুমারের কণ্ঠে নজরুল রচিত বাংলা সত্যল সান গুনেছিলাম সেই দিনই গ্রন্থম।

এরপর রাজনীতির সঙ্গে অড়িত পরৎস্রকে দেখেছি কয়েকবার আমাদের অফিসে। বন্দন-বেদী কণ্ঠশিল্পীর রাজনীতিতে আনোচনা। চলতো স্তম্ভাবস্ত্র বা সত্য বস্ত্রীর সঙ্গে পরিহাসের পথ ধরে। তখন বোধ হয় তিনি হাডডা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি। বলতেন, স্তম্ভাবস্ত্র: তাঁকে সাক্ষীগোপাল ক'রে কেন যে মসিরে রেখেছেন তিনিই জানেন; বা কিছু করেন করেন খোব, তিনি চলেন বকলবে। পরৎস্রের সহকর্মী হবেন খোব ছিলেন অক্লান্ত কর্মী, এমন কলাকাজীহীন শান্ত কর্মী খুব কমই দেখেছি।

শেষবার পরৎস্রকে করগর্য অফিসে সেমিছিলাম বন্দন তাঁর "শেষগ্রন্থ" উপজালখানি প্রকাশিত হয়েছে সেই সময়। একদিন সত্য বস্ত্রীকে সঙ্গে করে তাঁর ঘর থেকে বার হ'য়ে আমাদের ঘরে ঢুকে বসে বসলেন— "ওহে শেষগ্রন্থটা। এত খেটেখুটে লিখলাম, লোকে ভেদন নিতে পারলে না।"

তাঁর সেদিন আশুযাশু বেন। সুখে সুস্থতার ছাপ।

পাঠক সমাজে রসগ্রহী মনের সারা না গেয়ে তাঁর চিত্র স্মৃতি হয়েছিল। কোথাও কোথাও শেষগ্রন্থ সম্বন্ধে বিভগ সমালোচনা ও করা হয়েছিল তখন।

কারো কারো সুখে এমনও শুনেছিলাম যে রবীন্দ্র নাথের শেষের কবিতা'র সাবপ্যকে টোকা দিবার ক্ষেত্রে পরৎস্র শেষগ্রন্থে কবলকে সৃষ্টি করেছিলেন আর তাঁর এ সৃষ্টির উদ্দেশ্য তিনিও যে রবীন্দ্রনাথের মতো 'ইন্টেলেকুয়াল' হ'তে পারেন তা দেখানো। কবিতার মধ্যে অত্যন্ত বাভাবাভি ব্যাকলেণ্ড একব্যাক্তিক যে পরৎস্র ছিলেন আনলে জনবের কারবারী, তাই আমরা তাঁকে কখনও গ্রন্থ করেছিলাম; কখনও ছেড়ে বন্দন তিনি সাধারণ উঠেছিলেন তখন বেন আমরা তাঁকে হারিয়ে ফেলেছিলাম, আর তাঁকে খুঁজে পাইনি। কবরের মাথুর-বলে বৃদ্ধির কাঠিন্য বিশিষ্টে নিজে আমাদের মন সরেনি, পরৎস্রের সিন্ধু জ্যোৎস্নার সূর্যের ধরতাপ বেন খাপ খায় না। কমলের ষোড়শ চলেছে উদান বিভ্রাৎ-গতি। কোথায়? গ্রন্থটা সেইখানে। কিন্তু এগ্রন্থের কি শেষ আছে? বাস্তবের বিচিত্র মনের বিচিত্র গ্রন্থের অস্ত্র কোথায়? মনের গতি যেখানে স্তম্ভ, মন যেখানে হয়ে এসেছে স্থির, শান্ত সেখানে তো গ্রন্থের কোন অবকাশই নেই। সেই প্রশংস নিম্নলিখিত মধ্য কি কবল ডুব ঘিরে এক পলিভট্টনীমতায় ইঙ্গিত মিলে পেরেছে না সে কেবলই দুটে চলেছে উদান উদাল? এ গ্রন্থ আবার যুগে যুগে আসে?

পাঠকদের সংগে পরৎস্রকে স্মৃতিস্ত, সংস্কৃত করেছিল।



চোরাবালি

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

ঠেশন থেকে খুব বেশী দূরে নয় রেশন অফিস। খুব সুবিধেই হ'য়েছে ননীমাধবের। তবু নতুন কাজ, সব সময়েই যেন যেন একটা ভয়, কখন কি অজ্ঞার ঘটে তার ঠিক নেই। তাণ্ডা তার বেলোনশাই রজনীকান্তবাবু ছিলেন শিলালদার, তা নইলে রেলের এ-চাকরীটা পাওয়া ননীমাধবের পক্ষে দুর্লভ হতো।

ভালোই হ'য়েছে বলতে হবে। অনেক কষ্টে কয়েকজন আত্মীয়ের চেষ্টার বৈঠকখানা ঘোড়ে দু'খানা বরত পেয়েছে ননীমাধব। বুড়ো মা আর ছোট দুটা ভাইকে নিয়ে আপাততঃ ও এখানেই উঠেছে। বাবা এখনো প'ড়ে রইলেন পাকিস্তানে। ব'লেছেন, শেন পর্বত বেখে বাই—এই আমি খর বাড়ী সব ছেড়ে দিয়ে এতো সহজে আমি উদ্ধার হ'য়ে যেতে পারবোনা বাবা, তোরা বা সমর হ'লে আমিও বাবা।

ভারী একরোখা ধরনের মানুষ হচ্ছেন তার বাবা। প্রবোধবাবু। প্রথমদিকে অনেক ইকিরেছিলো ননীমাধব। পূর্বপাকিস্তানের এই মুহূর্তে দাংগা হাংগামার মধ্যে থাকা যে আর কিছুতেই সীচীন নয়, তা সে অনেক ভয়াবহভাবে বোঝাতে চেষ্টা ক'রেছিলো, প্রবোধবাবু কিছুই শোনেননি। সাতপুরুষের ভিটে, এককথার ছেড়ে আসা তাঁর সাধের বাইরে।

কাজটা সহজই বলতে হবে। চাল, ডাল, তেল, ঝিন—যেসব জিনিস রেশন শপ থেকে গুজন ক'রে দেওয়া হবে, আরোমন হ'লে, সম্ভব হ'লে সেগুলিকে পুনরায় গুজন ক'রে দেয়া, কেউ কম পাচ্ছে কিনা, কাক তাণ্ডা বেশী চ'লে যাচ্ছে কিনা, এই সব খবরসারী কটা আর কি!

উদ্ভটটা হচ্ছে, কোপাও যেন চুরি না হয়, কোন অসাম্য যেন না ঘটে। স্বাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীন রাষ্ট্রে সত্যের বীজ হজির দেওয়ার চেষ্টা আর কি! ভারী ভালো লাগ'লো ননীমাধবের। যেন যেন এই

রকম একটা আদর্শ কাজের সম্ভাবনাই সে করছিলো। বিধাতা তাকে ঠিক তারগাভেই এনে বসিয়ে দিয়েছেন। সেও মহাত্মাজীর শিষ্য, ভারতবর্ষের কর্ণধারবের মতো ভারও তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা কম নয়। যতটুকু কনভাই হাতে থাকে, সত্যের পথে সে অবচলিত থাকবেই সারাজীবন, এমন একটা প্রতিজ্ঞা শুধু আর নয়, আট বছর আগে, যেবার ম্যাট্রিক দিয়ে ক'লকাতার মহাত্মাজীর প্রথম বক্তৃতা শুনেছিলো, সেই দিন থেকেই তাঁর যেন দৃঢ়বদ্ধ হ'রে আছে—বীচবার লগ যে সত্যেরই লগ একপা প্রবতারার মতোই তাঁর জীবনে সেদিন থেকে মল মল ক'রে জলছে।

ওয়ার্ড-কীপারের নাম মনজয় গোস্বামী। বেশ করিৎকরী লোক। বড়ও ৩৮ বছর। রেশন-শপের সংগেই আর সংলগ্ন তাঁর কোয়ার্টার। সতলের সংগেই হেলগ কথা বলেন, বিনম্রী মানুষ।

প্রথমে এল্লি অবজ ননীমাধবকে কিছুদিন ক্যাশ-মেমো লিখতে হ'রেছিলো। সেই সময়েই ঘট্টলো ঘটনাটা।

শশীকুমার হাঙ্কা ব'লে আরেকটা ছেলে ওই একই কাউন্টারে ক্যাশমেমো লিখতো। জুলিকান্দ্রের নিরেই বেশী ভাগ তারের কাজ। অগুদেও মাহাতো ব'লে একটা ওয়াচম্যান ছিলো। ভারী কলমেজী লোকটা। রেশন নিজে এনেছিলো সেদিন। একটা দশ টাকার নোট দিয়েছিলো সে কাউন্টারে, তাই নিরেই সোলমালটা আরজ হ'লো। হঠাৎ সে চীৎকার ক'রে উঠলো, আপলোকতো এক রপেয়া কমতি দিয়া হাঙ্কো!

শশীকুমার আরও ভালো ক'রে তাকে হিসেবটা ইকিরে দিলে। কিন্তু সে কিছুতেই সেকথা শুনলো না। তার সেই এক কথা, 'এক রপেয়া হাঙ্কো কমতি দে দিগা'—কথার কথার এবারে শশীকুমারও চটে উঠলো,

বললে, যাও ভাগ্যে! আউর নেহি মিলেগা।'

'আচ্ছা হাম বেখ-লেগা আগেকো।' ব'লে জগদেও গেলো। এসে ঢুকলো কাউন্টারের ভিতরে, একেবারে ওয়ার্ড-কীপার অর্থাৎ বড়বাবুর কাছে। বললে, দেখিয়ে বাবুজি, হামকে ঐ বাবু এক রূপের কন্সতি যে দিরা।' সংগে সংগে শশীকুমারও এসে গাড়ালো, সব ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে সে ওয়ার্ড-কীপারকে। কিন্তু জগদেও তবু বুঝবে না; তার ব্যর্থতা, একটা টাকা নির্ধারিত হুদী করেছে শশীকুমার।

তখন শশীকুমারও ভীতিবস্তো যোগে গেছে, বললে, 'বাও ভাগ্যে ইখানে' আউর হুদী করোগা তো ভোবারা গোপ হাম্বু হিন্দু লেগা—!'

যেই বলা, আর সেই মুহূর্তে যেন একটা বোমা পড়লো বস্তুর মধ্যে। খুব একটা অস্বাভাবিক গালাগালি দিয়ে উঠলো সে এবার শশীকুমারকে। বললে, তোম্ব এক ব্যাপক্য বেটা হো তো হিন্দু লেও হামারা গোপ—জরুর লেনে হোগা।

বড়বাবু ততক্ষণে সোজা হ'রে হাটু গুটিয়ে উঠে গাড়িয়েছেন। কপাটা শেষ হওয়ার সংগে সংগে টেনে করেকটা ঘূঁষি বসিয়ে মিলেন তার বাডে মাথায় হুকে। সংগে সংগে শশীকুমার এবং আরো কয়েকজন এসে ভাঙে যোগ দিলো। সম্ভবতঃ জগদেও এতোখানির ভেঙে প্রবৃত্ত ছিলো না। অতক্ৰিষ্ট আকর্ষণে মেঝের উপরে গড়িয়ে পড়ে গেলো—শশীকুমারের তখন দিক-বিদিক্ জ্ঞান নেই—বেশ করে তার হুকের উপরে উঠে একপাল থেকে কতোগুলি গোপ সে সত্যিই ছিঁড়ে নিলে।

হেঁ হেঁ ব্যাপার! ঠাকেরা সবলেই আর সেখানে ছুটে এসেছে। জগদেও ততক্ষণে আর অর্ধদ্রুত। কাকুতি মিনতি আরম্ভ করেছে, বললে, ছোড় দিদিরে বাবুজি, এইলা নেহি বোলেগা আউর।

কেউ কেউ বললে, পুলিশে হ্যাও-ওতার করে যিন বড়বাবু। ও সব লোককে আর বিশ্বাস নেই।

কিন্তু জগদেওর সেকি কাতর প্রার্থনা, বললে, নেহি বাবু, হামারা কল্লুর হো। গিরা, এইলা নেহি বোলেগা ফিন্দ।

এতোটা মারধোর করবার পর বড়বাবুর মনটা ঝুঁক-মরম হয়েছিলো সম্ভবতঃ, বললেন, আচ্ছা, হাম্বু ছোড় দেতা, লেকিন্ এইলা বাৎ করেতা।

জগদেও রেশম আকিস্ হেডে টলুতে টলুতে চলে গেলো। বাকী তিনেক পরে অল্প জগদেও ফিরে এলো। কিন্তু এবারে সে একা নয়, অল্পতঃ চারশো ফুলি হাভল, থোরা, শাবল লোহার শিক্ এই সব নিয়ে—অতঃ তারা সেবে নিবে বাবুদেহ।

বড়বাবু প্রহর গনুলেন, তাকাতাডি হেড-অফিসে কোন্ কবে মিলেন, বললেন, এগুনি পুলিশ পাঠান, নিয়াট একটা ফুলির দল রেশম-দপ্প-শট ক'রে নিজে আসছে। সংগে সংগে ব্যবসায় হ'রে গেলো—জগদেও'র দল ছত্রভঙ্গ হ'রে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো—সেবারের মতো বাঁচলো রেশম-দপ্প।

কিন্তু জগদেও একেবারে ইল গাড়লো না। সে বড়বাবুর নামে বেশ করলো আদালতে। প্রথম প্রথম ফুলিরাই চাঁদা ভুলে তার বোকমবার টাকা জোগাতে লাগলো। ঠাক মান হ'রে বিচার চললো, তারপরে এক সময়ে টাকার অভাবেই আস্তে আস্তে সরে আসতে হোল জগদেওকে। আপোষ করে নিতে হোল বড়বাবুর সংগে। বড়বাবু মেনিন গুণ একটু ছেঁগেছিলেন, বসেছিলেন, এবারে শিখা হোল তো?

জগদেও যাবা বেগিরে সেকথা স্বীকার করে নিলে।

সম্মেহ নেই, ননীমাহবুব এই মবীন কর্জীবনে এখটনা বিশেষ কৌতুককর এবং বৈচিত্রপূর্ণ, তবু কোথায় যেন এর একটা ঠাঁক থেকে গেছে—ঠাঁক থেকে গেলো, সেটা হ'রেত ঠিক যেন ঘরতে পারছে না সে।

আরো কিছুদিন পায় হোয়ে গেলো। আতকাল ক্যান্থেবোমা কাটিতে হয় না ননীমাহবুবকে। এখন সে 'দি-ওয়েদেট' করে। এ্যাসিস্ট্যান্ট ওয়ার্ড-কীপারের

পর পেতেছে। আগে থেকে অনেক বেশী দাঁড়ি
বেড়েছে তার।

কিছু কিছুদিন থেকে একটা সন্কে তাঁর মনে
বন্দীকৃত হচ্ছে। কিছুদিন থেকেই সে লক্ষ্য করছে,
অফিসের ছুটির পর বাব্বা কেউ একসের ডার্ন, কেউ
মুনের চাল, কেউ একসের তেল সংগে নিয়ে যাচ্ছে।
অবশেষে বড়বাবুকে খোলাগুনি ভাবে একদিন সে এসবকে
জিজ্ঞাস করলে। বড়বাবু হাসলেন একটু, বললেন, আপনার
অধি বরকার থাকে তো, আপনিও নিতে পারেন।

—মানে ?

—মানে আর কি ? যেটা এক্সেস্ হয, সেটা
এইভাবেই আমরা ভাগ ক'রে নিই।

—অর্থাৎ ?

—অর্থাৎ আপনি একটি ছেলে বাছব। ব'লে বড়বাবু
চুষ ক'রে গেলেন।

কয়েকদিনের মধ্যেই ব্যাপারটা বুঝলো ননীমাধব।
বখনই দাঁড়ি-পাল্লার জিনিষ গুলন ক'রে দেওয়া হয়,
তখনই এক ছটাক আধ ছটাক ক'রে প্রত্যেককেই কম
দেওয়া হয়, কলে সমস্ত দিনের শেষে সব জিনিষই কিছু
কিছু বেশী থেকে যায়—সেটাই ভাগ হয় এইভাবে।

গভীর মূখে অফিসের শেষে ননীমাধব এসে বললো
বড়বাবুর লামেন, বললে, এটা অস্তায় বড়বাবু!

বড়বাবু আবার আশ্চর্যের মতো সেই বকম হাসলেন,
বললেন, কোনটা ?

—এই এক্সেস্। এটাকে ধামাতেই হবে, তা না
হ'লে আমার এখানে কাম করা তো সম্ভব হবে না।

বড়বাবু সেই হাসির রেশটাকে টেনে নিয়ে আরো
একটু পাচ অথচ গভীর গলার অস্তরঙ্গ হ'বার চেষ্টা ক'রে
বললেন, তুমিকাটা ছাড়ুন না ভাই, কতো কি লাগবে
বলুন, দিয়ে দিচ্ছি!

—আপনি বুঝতে পারছেন না।

—সব বুঝতে পারছিই ভাই, সব বুঝতে পারি।
হাঁড়ির ভাত একটা টিপলেই জানা যায়, বাকীভাল কী

রকম। তা বাক্, আজ তিন সের ভাল আছে, নিরে
যান শুট।

—আপনি ভুল করছেন!

—বোটেই নয়—প্রথম প্রথম শুরকম সমিচ্ছা
অনেকেরই থাকেই ভাই—।

—আমি রিপোর্ট করবো ইন্সপেক্টরকে। সমস্ত মুখ
চোখ ততক্ষণে লাল হ'রে এসেছে ননীমাধবের—এ আমি
কিছুতেই হ'তে দেবো না।

সংগে সংগে বড়বাবুর চোখ মুখের তাবড় বললে
গেলো। জারী একটা নির্মম আর ক্রুর হাসি মুটে
উঠলো তাঁর মুখে, বললেন, আঃ! বেশ ভাই করবেন!
ব'লে একটা কাইল টেগে নিলেন টেবিলের উপরে।

ননীমাধব প্রমাণ সংগ্রহ করবার কাজে লেগে
গেলো। এতো বড়ো অস্তায় সে কিছুতে গম্ব করবে না।
এর একটা বিহিত সে করবেই। ভাত্তে বড়ো ক্ষতিই
হোক তার।

ছোটখাটো প্রমাণ অনেক জোগাড় হ'তে লাগলো।
হরদেও সিং জিনিষ গুলন করতো। ননীমাধব লক্ষ্য
করলো, তেল গুলন ক'রে দেওয়ার সময়ে যে মগে তেল
ত'রে দেওয়া হয়, তার ছাণ্ডলের মধ্যে কারনা ক'রে
একটি আবপোতা বলালো থাকে। প্রতিবারের গুলনে
ওই আবপোতা কথ মের সে লক্ষ্যকে। তিনি গুলন করা
হয় যে টিনের মগে, লকালঝো এসে তাতে বেশ পুচ্
ক'রে কিছু চিনি জল নিয়ে মগের মধ্যে লেপে দেওয়া
পাকে। পরে সেটা তুলিয়ে গেলে তাইতেই গুলন চলে,
কিছু চিনি কম যায় তাতে।

দাঁড়ি-পাল্লার ওপরেও কিছু কিছু কারনামি চলে।
কিন্তু এলব ছোট ছোট প্রমাণ। বড় একটা কিছু না
পেলে কাঁপিয়ে পড়া চলে না। তারই অপেক্ষা করতে
লাগলো সে।

সুযোগও এলো একদিন। অফিস ছুটি হ'রে গেছে
কিছুক্ষণ। ননীমাধব অফিস থেকে বের হবে এমন সময়ে
দেখে একজন সুলী প্রাণ আর মগ চিনি আর সেচ মশেক

গম নিরে পেট পার হতে যাচ্ছে। 'সোফা' এসে সে গাভাশো কুলীটার সামনে, বললে, কার্ড আত মেথো কোথায় দেখাও। কুলীটা খতোবতো খেতে গেলো, বললে, উ—তো নেহি হায় বায়জি!

—নেহি হায় তো কেইনে সে জাতা কুন?

—বড়বাবু তো বোলু দিয়া—উনি ওয়াঙে—!

—নেহি, উ নেহি বানে শেকে গা! রান দেও ব'লে সব ভিন্দিব সে টোরে নিরে আটকে বেধে দিলে।

প্রায় সারারাত্ত জেগে লুকা চওড়া খুব বড়ো একটা রিপোর্ট লিখলো সে। পর দিনই বড়বাবুর টেবিলে সেটা পেশ করলে, বললে, এটা দেখে পাড়িরে দেবেন আনাকে।

বড়বাবু সেটা একপাশে রেখে মিলেন। কিছুক্ষণ পরে সেটা কিরে এলো ননীমাধবের টেবিলে। ননীমাধব সেই দিনই সেটা পাড়িরে দিলো ইন্সপেক্টরের অফিসে।

পরের দিনই ইন্সপেক্টর এসে হাজির। বললে, কি হ'য়েছে কি আপনাদের? এসব কি ব্যাপার? বড়ো-বাবুর কাছে কৈফিয়ত চাইলেন তিনি। তারপরে দুজনে বলে কি যেন কথাবার্তা হোল। অবশেষে এক সময়ে ইন্সপেক্টর উঠে এলেন ননীমাধবের কাছে। বললেন, আপনাদের কেনটা সব ইতলাশ, সত্যিই ভারী অস্তায়, কিন্তু বেখুন এ নিরে আরো উপরে টানাটানি না করাই ভালো। এই ওয়ার্ডের নামে একটা কেলেঙ্কারী হবে, তাছাড়া মিছেদের মধ্যে একটা মনোবাগিগত তো বাটে। একসাঙ্গে সব কাজ করছেন বখন, তার থেকে আদি বলি, যা হ'বার তা হ'রে গেছে—এবার থেকে বাতে আর কিছু না হয়, তার দিকে সকলেই লক্ষ্য রাখবেন।

চূপ ক'রে রইলো ননীমাধব, হাওড়া যে কোথা দিগে কি জাবে বইছে, সেটা বেশ বুজতে পারছে এবার।

বিকেলের দিকে স্পষ্টই বড়বাবু তাকে ডনিরে ডনিরে হরমেও সিংকে বললেন, "চাং সের চঃউল আর ডিন সের স্তেল আং ইন্সপেক্টর বাবুকে বাড়ী লে যান। হো গা!"

—'জী হুজু।' হরমেও সিং উত্তর দিলে। দীতে দীতে চেপে বসে রইলো সে।

শেষ পর্যন্ত হুঁর হুঁতে পারলো না ননীমাধব। পরের দিন এ্যাসিষ্ট্যান্ট কম্ট্রোলারের কাছে সে রিপোর্ট করলো। আরো ভালো ক'রে এন্কোয়ারারী হোক—এ অস্তায়কে কিছুতেই সহ করা হবে না। শেষ পর্যন্ত সে বেধে নেবে।

এক সপ্তাহের মধ্যে কম্ট্রোলার নিজে এসে উপস্থিত হ'লেন। সবত কারগজপত্র ভালোভাবে পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, বললেন, 'কই, কোথাও তো কিছু গোপনাল নেই?'

এবারে ডাক পড়লো ননীমাধবের।

কম্ট্রোলার বললেন, 'এসব মিথিবিহি কি হারাসমেন্ট করলেন আবারে? সবই তো ঠিক আছে।'

—'ঠিক আছে?' ননীমাধব বিষরে কঙেট পড়লো, —'কি রকম?'

—'কি রকম আবার কি? এইতো বেখুন না, দুটো ক্যাস মেথো, তাছাড়া এ বিনিমটা আনাদের টোয়েরই নয় বাটে, কুলীটা বড়োব্যাকার থেকে কিনে এই পথ দিরে বাজিলো, তাছাড়া আপনি বলছেন, ডিনি আর গম একজন লোকের কাছে পাওকা গিরেছে, কিন্তু ব্যাপারটা সম্পূর্ণ মিথো—এই বেখুন ডিনির ভল্ডে এই লোক এবং পরের ভল্ডে এই লোক—এরা দুজনে দুটো নিরে বাজিলো, এরা সব লাকী মিছে—ভায়া দেখেছে।'

ভু সাহনের দিকে একবার চোখ তুলে তাকালো ননীমাধব। দুজন কুলীই বড়োবাবুর হাতের লোক। যারা লাকী ঘোরার ভল্ডে উল্লীষ, ডারাগু ওয়ারই কুশা-পাত্র। সবত পুঁথিটা এক দুহুর্ডের ভল্ডে বেন তার পারের মীচে টলে উঠলো, যাঁবাটা কি—ম'ক'রে উঠলো সেই সংগে; বড়োবাবুর বুখের দিকে ভু জোর ক'রে সে তাকালো একবার, একটা কুর চাপা হাসিতে মুখটা ভারী অসুস্থ দেখাচ্ছে তাঁর, তাও মধ্যে মুখিবা কিছুটা জরের আনন্দও প্রদীপ্ত রসেতে।

খুব কথা কড়া করেবটা কথা ব'লে কম্ট্রোলার চলে

গেলেন। বাওয়ার আগে রীতিমতো ওয়ানিং দিয়ে গেলেন ননীমাথবকে—এরকম ভাবে আর যেন সে ছায়াস না করে উজ্জ্বলতর কর্তৃপক্ষকে। খুব সাবধান!

বড়বাবু চায়ের কাপটা নিচ্ছেই এগিরে দিলেন ননীমাথবের দিকে। বললেন, আপনাদের হাতের কাঁচা বহুলে আমাবেরো ওই রকম আদর্শবাক ছিলো ননীবাবু, কিন্তু ও পোড়া বেশে শুটি কথার কথা ভাড়া আর কিছু নয়। অনেক বেগেছিরে তাই, অনেক নিখেছি। তারপরে এইভাবে পাকা চোর তৈরী হয়েছি। তবু নেই, আপনাকেও তাই হ'তে হবে। যখন একবার থাকের মধ্যে এসে প'ড়েছেন তখন যাবেন কোথায়? তবে হ্যাঁ, আমাদের দিক থেকেও কিছু বক্তব্য আছে, পেটাত আপনায় শুনে রাখা উচিত। আপনি কি জানেন, যখন ওই ব্যায়েল ব্যায়েল তেল গোড়াউন থেকে আসে তখন প্রত্যেক ব্যায়েলের বাঁকে বাঁকে কানামাটী পুক ক'রে রাখাযো থাকে, আর তাতে ছ'লের আড়াই সের তেল কম আসে, আমাকে কিন্তু পুরো ব্যায়েলের হিসেবই বিতে হয়, কম পড়লে আমি হারী, আমার মাইনে থেকে কাটা বার টাকটা। তা আমি সে কতিটা সহ্য করি কেন বলুন? আমার আগেই যে উপরের মহাপ্রভুরা এইভাবে হাত সাফাই ক'রে থাকেন, এটা জেনে নিজে কষ্ট পাই কেন? আসল কথা কি জানেন ননীবাবু, মর্ষণে মধ্যে ছুত চুকেছে, আপনি ভুতটাকে

তাড়াবেন কি ক'রে? ব'লে টেনে টেনে হাসতে লাগলেন বনজর গোস্থানী, বললেন, আমার প্রপিতামহ নদরীশের স্ট্রেট পণ্ডিত ছিলেন সে যুগের, ক্রাফট পিকারের মার হয় তো শুনে থাকবেন, ওঁরাই প্রদৌর আবি, কিন্তু আমি চোর ননীবাবু। আমার নাম শুধরমণি চৌররত্ন।

বাধা নীচু ক'রে ঘরে কিরে এসেছে ননীমাথব। বনজর গোস্থানী কাঁচা লোক নন, কুলী দিয়ে ছ'লের তেল, তিন সের ভালো যুগের ভাল আর চার সের ভাল পাট্রিয়ে দিয়েছেন সংগে। বারান্দার একপাশে সেস্তলি রেখে দিয়ে কুলীটা অনেককণ চলে গেছে। বা এসে যুগের ভাল আর মর্ষণে তেল বেখে তারী খুদী হ'য়েছেন, অফিস থেকে এখন জিনিব থাকে মাঝে পাণ্ডরা বাবে জেনে আরো বেশী খুদী হ'য়েছেন। কি দিনকাল পড়েছে আমকাল, ভালো জিনিব পত্তর কি আর নাম দিয়েও কিনবার উপায় আছে।

সামনের দিকে একবার বাধা তুলে তাকাণো ননীমাথব। তার পড়বার টেবিলের সামনে মহাপ্রভুর ডাক্তারী অভিযানের চিহ্নটা। নললাল বহুর আঁকা। লাক্সি নিয়ে তিনি এগিরে চলেছেন সামনের দিকে। সহস্ত্র মুখের উপরে একটা দৃঢ় সংকল্পের ছায়া গভীর হ'য়ে ছুটে উঠেছে।

চোখ নামিয়ে নিলো ননীমাথব।

মোনালিসা

শ্রীজয়ন্তী বোষ

আমি 'মোনালিসা',

শিল্পী তার আপনারে ব্যাকুল নিপাশা

মিটারেছে অধরে আমার ;

ধিরে গেছে কৃষা দুনিবার ।

আমার অধর,

প্রসূচ্ছ করেছে নিভা কত বস্ত উন্মাদ অস্তর ;

হোঁরা বিরে গেছে,—

আমার হাসির মাকে আজো তার রেশ ওঠে বেজে ।

সে প্রচণ্ড কৃষা

প্রমত্ত বোঁবন হতে তীর, তপ্ত সূতা

দুই হাতে করে পান ;

একদিন সেই এসে করে গেল দান

দুর্লভ্য অকরে

আমারে অধর পরে

অধরা হাসির এক রেখা ।

জীবনের গুটপথে নিভা চলি একা,

অগ্নীর দ্রুতগতির অন্তরেতে করিয়া বহন ;

হৃৎস্পন্দে বহন

প্রত্যক্ষ করেছি নিভি ; মিথ্যা নহে হয়,

অংশা, প্রেম, বশ, ব্যাতি, অশ্রের সঞ্চার ।

হেরি প্রবন্ধনা,

পুরুষের কল্প কামনা

সহস্র নারীর চক্ষে অগ্নিরেছে অল

অবিরল ।

নিখিল নারীর কাছা জুর হাসি হয়ে

ওষ্ঠাবর ফেলিয়াছে ছেয়ে,—

আমি তাই হাসি,

বাক্যবের সুখোমুখি বয়েছি উদাসী ।

অধরা আমার হাসি গোপনীর বস্তুর মস্তন,

বেধা দেহ,—আপার রে প্রেমের মন

চিত্তমাঝে ; দেহ নাকো ধরা ;

কৌতুকেতে ভরা

অজস্র করুণা লবে অমুখ্য হাসি

নির্বোধ অনের পানে ।

নিখিলের কানে

জুলিয়া হাসির স্বভ, আমি উদাসীনা,

বিবশ-দ্রুতন !

এ হাসি আমার

আগিয়া রহিবে নিভা পার হয়ে সুপাতের দ্বার ;

বিবশের বন্ধ ভেদি, তির করি' নিশা

আমি 'মোনালিসা' ।

দিবাক্ষত্রির কাব্য

নগেন্দ্র দত্ত

ইতিহাস মোড় কেহ
শব্দকের পিঠে,
দিনাক্ত কালান্ত হল ঘুরে।
কালের আশ্রয় পাশে
স্থিতি চিহ্ন বিজড়িত,
পরিভ্রান্ত ঈর্ষ্যে।

সহস্র বর্ষের অতঃপর
উত্তরাংশ ছাড়ি
দক্ষিণে তাকায়,
খোলা হৃদয় ঢলে পড়ে
বন্দিত্বের পাশে।
গাঙ্গিবাদী বিষম ভারত
বিপন্ন মানব জাতি
ব্যতির নিখোলে।

আকাশের সুনীল নীমানা অবলম্ব্য,
নগরীর সৌর বেড়াঝালে।
বিজলীর হৃদয় কলক বিবে
অমর ব্যক্তি ভালে।

বক্তিকেন্দ্রে কে কান হোবার
ভিক্ষাপাত্র হাতে লয়ে।
তার চেয়ে শোন কিছু
গণতন্ত্র গান।
বহুদিন পরে ভোমঃ,
কিছু কিছু অধিকার ঘান।

গণতন্ত্র, স্বাধীনতা, আত্মতন্ত্র মিলে,
সমুদায় রক্ষা
ও আর চাই না আর—
নমঃ গণেশায়োঃ।

সিদ্ধিলাভা তুষ্ণ হোল
চাঁদিত্ত্ব যুগে—
'কেবল তঁ'র'
বল বল তাইও।

পেয়ার ব্যাকার
ওপারে পাটের কল,
র চেরে আঁঠে ঘুরে
কাজে পাট কেত।
সবই যেন এক যুগে গাঁথা,
সকল গনেন্ত।

কৃষকের বউ সারা বেলা
ধান ভানেন—
সোনালী সন্ধ্যায় ভলে নামে।
আরে! পালো পালো
ধান-মাথা বাঁহু এলো এয়ে।

ধানের দালি কিছু,
আর কিছু শগেরদি পেশ।
এট নিষে মোহনেনব কমে শুঠে দেশ।

ইতিহাস শুদ্ধ হয় জননীর
মেঘনীর নীড়ে,
বহাগ্রস্ত অসন্তান, তৈলহীন বীণ।
হস্তাশ্রয় সন্ন্যাস আকাজকের বীণ ;
প্রাণগত স্বাধীনতা ব্যতির কবলে।
পকেটে পয়সা নাই পথ নাহি চলে।
বুড়ার বেগলা-পর অনাদি পুরুষ
ভালে মহাবোমঃ।
নীলাকাশ কালো হয়
শব্দাই হোয়ে।

গহিড়ীর খেতপত্র পূর্ণ হল,
হস্তের বমনে ।

বশিকের শোলমিছা উগ্র হল,
রক্ত আস্থাননে ।

ইন্ডাট্রী ভিস্পুট এ্যাট্ট
কাল কারী হল,
মনে আশা পুঙ্খোঃ
কোনাস পাৰোঃ ।

সেনা-টেউ কোনক্রনে এবাঃ
সানাল দেবোঃ ।

মহীরনী মহিলা গুহুতবাসিনী ।
চিঠিপত্র দিখি কিছু,
কিছু খেই মালহারা গিনি ।

“সব্বর চলে এসো
আমার কেমন ভয় করে ।
পুরু হুঁকি এইবার মরে ।”

ইতিহাস ক্রম চলে
তড়িতের গুকে ।

বিধাতা বসানো ছোরা
ভ্রামলীর স্রুখে ।

গ্যালী বুক, তাংবোর মহেশের
নিম্রা নাহি স্রুখে ।

ভূগের ডেউ ভাঙ্গে মন-মরা পাগে ।

ভ্রামলীর তাঁর বরে
আকাশ চৌচির ।

চাঁদ-স্বর্ষ ভুবে গেছে,
মহা ধোমে নিপলক
তারকার জীড় ।

অশান গীমাত্রে বসে আতি,
চোখে ভাল নিভাত্ত স্মৃৎ ।
হুঁ একটা শিখার ডাক,
ক্রান্ত কাংরাণি,
আকৃত মড়ার বৃদি,
পাশে ডাকে ভণ্ডার ভেদুয়া কুহুর ।

শোন বন্ধ, কিছু নত্যা, কিছু মিথ্যা,
কিছু কাঁকা কথা ।
এই নিরে আবারের জীবন সংহিতা ।

সোনার মাছুর বটে,
স্তোমরা ত সাধক স্তম্ভন ।

ব্যাঘের কালো গর্ভে
দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়
সাধনার ধন ।

লভতার-শাল মুড়ি দিজে
মুখে এনে লভ্যতার হাসি ।
সামাজিক সূত্রাক্ষে—টান বীরে
স্বর্ণ রজ্জু কাগী ।

হে বিধাতা, এরা কিন্তু তোমারই মানব ।
তোমারই রচিত স্বর্ণ
এরাই মানব ।
তুমি কিন্তু মগ্ন জুগে গেছ ।
লভ্যা, শিব, স্মরণেরে বিসর্জন দেছ ।

অন্ধ্রজাতি ও তেলগু ভাষা

শ্রীকীরোদ কুমার ঘস

তামিল, তেলেগু, মালয়ালম এবং কান্নড়ী— দাক্ষিণাত্যের এই চারিটা ভাষাকে দ্রাবিড়ীয়ান ভাষা বলা হয়। থাকে। ইহার মধ্যে তেলেগু ভাষাতারী লোক- সংখ্যা প্রায় তিন কোটি। হাফনহেট্রী হইতে মাত্রাজ পর্যন্ত একটি লাইন টামিয়া উঁহাকে ব্যাস লইয়া যদি একটি অধঃস্থ অক্ষন করা যায় তবে এই অঞ্চলকে প্রধানতঃ তেলেগু ভাষাতারী অঞ্চল বলা যায়। ছুই কোটিরও অধিক তেলেগু ভাষাতারী এই অঞ্চলে বাস করে। ইহার আয়তন প্রায় ১২৭০০০ বর্গ মাইল। এই অঞ্চলে কিছু মুসলমান এবং সামান্ত কিছু তামিল ভাষাতারীও বাস করে। শেখোক্ত শ্রৌণীকে পোছুর দ্রাবিড়ীয়ান বলা হয়। ইহা ভিন্ন দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমস্ত খেলায়ই কিছু কিছু তেলেগু ভাষা লোক আছে। তেলেগু ভাষাভাষার বিশেষতঃ বিস্তর নগরের প্রভাব এক সময় সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সম্রাট কুলদেব রায় দাক্ষিণাত্যের প্রায় সমগ্র ভিতরই প্রতিনিধি নিয়োগ করিয়াছিলেন। এইভাবে তেলেগু ভাষার প্রভাব সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী এবং মহীশূর ও হায়দরাবাদ রাজ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ তেলেগু ভাষা লোক আছে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে এক শ্রৌণীর লোক নিজেদের তেলাং নামে পরিচয় দিয়া থাকে। ইহাদের পূর্ব পুরুষগণও তেলেগু ভাষা ভিণেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। তেলেগুভাষিগণ উত্তম ও প্রচেষ্টাশীল সম্প্রদায়। ভারতের বাহিরে বহুদীপ প্রকৃতি স্থানে ইহারাই প্রথম বসতি স্থাপন করে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও ইহারাই দ্রবণেশ এবং আসাম প্রভৃতি স্থানে বসবাসের চেষ্টা করিতেছে।

এই জাতির আদি উৎস কি, তেলেগু ভাষার উৎপত্তি- স্থল কোথায় এ সম্পর্কে কিছু সুনিশ্চিত ভাবে বলিবার উপায় নাই। প্রত্নতত্ত্ববিদগণ বলেন, আর্যদের দাক্ষিণাত্য প্রবেশের পূর্বে দাক্ষিণাত্যের দ্রাবিড়গণই এই অঞ্চলের

অধিবাসী ছিলেন। আর্যজাতি ও আর্যসংস্কৃতির সঙ্গে ইহাদের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু আপনাদের এই অনাধি পরিচয়ের ইহারাই নিজেরা আজ আর বিশেষ আগ্রহ বোধ করেন না। তেলেগুভাষিগণের 'আদি উৎস দ্রাবিড়ী—ইহা সন্দেহ হইতে পারে, কিন্তু সুদূর ইতিহাসের শেষ সাক্ষ্য আজ যাহা বর্তমান তাহাকে সুনিশ্চিত ভাবে অনাধি সংস্কৃতি বলা চলে না। ঐতিহাসিক যুগে প্রবেশ করিবার পূর্বেই তাহারাই ধর্ম, ভাষার, লাহিত্যে এবং সম্রাজ্ঞ সর্ববিধ ব্যবহার সম্পূর্ণ আর্য ভাষাপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল।

তেলেগু ভাষাতারী অঞ্চলের সার্বভৌম নাম অন্ধ্রদেশ। হানারথের যতকারণ্য বলিয়া অভিহিত ভদ্রশূত্র অঞ্চলই কালক্রমে অন্ধ্রদেশে পরিণত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করা হয়। একেই ব্রাহ্মণ, হানারথ, মহাত্মাভক্ত এবং ব্রহ্ম পুরাণে অন্ধ্রজাতি বলিয়া এক জাতির নাম পাওয়া যায়।

অন্ধ্রদেশের অন্ত আর এক নাম বেঙ্গীদেশ। তেলেগু ভাষাতারী অঞ্চলের কোন এক অঞ্চল বিশেষের নাম হইতে বেঙ্গী ছিল। গোদাবরী এবং কৃষ্ণারীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের এক সময় বেঙ্গী ছিল মনে করা হয়। থাকে। কেহ কেহ বলেন, 'ত্রিলিঙ্গ' শব্দ হইতে তেলেগু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ত্রিলিঙ্গ বলিতে তাহার। এই অঞ্চলে অবস্থিত তিনটি প্রসিদ্ধ মন্দির—কালেশ্বরম, শ্রীশৈলম্ এবং ব্রহ্মরামম্ বলিবে বুঝাইতে চাহেন। আবার, কাহারও কাহারও অভিমত এই যে 'ত্রিকলিঙ্গ' নাম হইতে তেলেগু নামের উৎপত্তি হইয়াছে। উড়িষ্যা অঞ্চলের কলিঙ্গ নাম তাহার। ইহার সম্বন্ধে উল্লেখ করেন। শাসন কার্যের সুবিধার জন্য এই অঞ্চল প্রাগৈতিহাসিক যুগে বিভিন্ন 'বিবর্ষে' বিভক্ত ছিল। ঐতিহাসিক যুগে এই বিভাগ সমূহ 'নাহ' নামে পরিচিত হয় এবং বর্তমানে ইহার। বিভিন্ন জিলায় পরিণত

হইয়াছে। তেলেগু সাহিত্যে নিম্নলিখিত নাট্য সূত্রের নাম পাওয়া যায়।

(১) বেঙ্গী নাট্য (গোদাবরী ও কৃষ্ণানন্দীর মহাবতী অঙ্কল) (২) হুসীকী নাট্য (কুডারা জিলা, রাজমহলী এই অঞ্চলের রাজধানী মহীশূর পর্যন্ত) (৩) পট্টী নাট্য (কুডারা হইতে পেল্লার পর্যন্ত) (৪) হেনাত্ত ও মানাত্ত (কুর্নুল জিলা) (৫) পান নাট্য (গুন্টুর জিলার পশ্চিমে) (৬) শাক নাট্য (নেল্লোর হইতে ক্যাকা পর্যন্ত সহস্রাবীরাঞ্চল) (৭) কথ নাট্য (তনিসেনা হইতে কথ পেরু পর্যন্ত গুন্টুর জিলা) (৮) বেগি নাট্য (গুন্টুর জিলার অংশ বিশেষ। চমবলু ইহার রাজধানী ছিল)

গীর্জাতির দ্বার অক্ষুণ্ণতাতিও (১) ব্রাহ্মণ, (২) কত্রি, (৩) বৈজ্ঞানিক ও (৪) শূত্র এই চারি বর্ণে বিভক্ত ছিল। ব্রাহ্মণগণ আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত—(১) বৈদিকী ও (২) নিয়োগী। বৈদিকী শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ পুরোহিতের কার্য করিতেন। অক্ষুণ্ণতার মধ্যে রাজবাক্য শ্রেণীর লোক কত্রি বলিয়া পরিচিত এবং বেলনা, হেড্ডী, বলিমা এবং কাপু—ইহারা শূত্র। কিন্তু সাহিত্যসাধনা কোন সম্প্রদায় বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। তবে নিয়োগী ব্রাহ্মণদের মধ্যেই লেখকের সংখ্যা বেশী। কত্রি শ্রেণী এবং হেড্ডীরা বিভিন্ন কলার পুষ্টপোষক।

বর্ষ বিধের অক্ষুণ্ণতাতি গোড়া হিন্দু। ইহার সাধারণতঃ তিন সম্প্রদায়ভুক্ত—(১) অশ্বৈতবাহী (২) শবর পত্নী পৈব এবং শিখারত শ্রেণী (৩) বৈকব। বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্মও এখানে প্রচলিত হইয়াছিল কিন্তু ইহারা কোন বড়ী নির্মাণ সাধিতে পারে নাই। সাহিত্যো বা জনসাধারণের দ নকম জীবন দ্বারা আশ্রয় উহার কোন চিহ্ন নাই। শূন্যমান কিংবা শূন্য প্রভাব সম্পর্কেও ইহাই বলা চলে। বোড়ল শতাব্দীতে বিজয় নগরের পতনের পরে ইসলাম প্রবেশ প্রবেশ লাভ করে। কিন্তু জনসাধারণ কখনও ইহার প্রতি বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে নাই। আবার বৃহৎ অষ্টম শতাব্দী হইতেই

এখানে প্রভাব বিস্তার করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়া আনিতে। এ বিধের সামান্য আপাত সাফল্য দেখা গেলেও এই প্রচেষ্টা দ্বারা চাইবে বলিয়া মনে হয় না।

আর্যের দ্বার অক্ষুণ্ণতাতিও সঠি, স্থিতি ও গর এ ত্রিধিকার উপাসক। ব্রাহ্ম, হিন্দু এবং শিব ইত্যাদি দেবতা। ইহাদের মধ্যে ব্রাহ্ম কোন মন্দির নাই এবং কোন পূজাও হয় না। শিব ও বৈষ্ণব ধর্মমত অক্ষুণ্ণতার মধ্যে পাশাপাশি প্রচার লাভ করিয়াছে কিন্তু কোন সংঘর্ষ করি করে নাই। প্রকৃতপক্ষে এই শিব এবং বৈষ্ণব ধর্মমত অবলম্বন করিয়াই শবর, বাসব এবং বামাদ্রু এই তিনটি ধর্মাবলম্বন এ অঞ্চলে চলিয়াছিল। ব্রাহ্মগণ সাধারণভাবে শবরের অবৈতন্য গ্রহণ করিয়াছে। এমিলি তেলেগু কবিদের মধ্যে অনেক হরিহরের উপাসক বলিয়া আপনাদিগকে প্রচার করিয়াছেন।

এই অক্ষুণ্ণতাতি যে ভাষার কথা বলিয়া থাকেন উহার নাম তেলেগু ভাষা। তেলে=মু, আত=বু। ডাঃ কম্বওয়েল তাঁহার Comparative Grammar-এ এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে এই ভাষা কোনরূপে সম্পর্কিত নয়। কিন্তু তেলেগু বৈয়াকরণিকগণ ও সংস্কৃত ভাষাতত্ত্ববিদগণ কেহই এই মত সমর্থন করেন না। তাঁহারা বলেন, তেলেগু ভাষা সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষার বিকৃতি বাক্য।

তেলেগু ভাষা তামিল ভাষার দ্বার প্রাচীন নয়। কিন্তু ইহা মালয়ালম ভাষা অপেক্ষা প্রাচীন এবং সমগোত্রীরা কানাড়ী ভাষার সহ প্রাচীন। তেলেগু ভাষার প্রচলন কবে আরম্ভ হইয়াছে তাহা নির্ণয় করিবার উপায় নাই। একাদশ শতাব্দীর পূর্বে এই ভাষার সাহিত্যের কোন নির্মাণ পাওয়া যায় না। ইহার পূর্ববর্তী সমস্ত অধ্যয়নও সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষার রচিত। শূন্য শূন্যের প্রাচীনে প্রায় সমগ্র নব্য ভারত অক্ষুণ্ণতাতিই ছিল। কিন্তু তাঁহারা

তেলেগু ভাষা ব্যবহার করিতেন কিনা কিংবা কোন না কোন আকারে তেলেগু ভাষা প্রচলিত ছিল কিনা তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

তেলেগু ভাষার এই প্রাচীন নিদর্শনের অভাবকে অনেক অগৌরবের কারণ বলিয়া মনে করেন। বোধ হয় এই দলই কিংবদন্তীমুখে তেলেগু ভাষার উৎপত্তিকাল কৃতজ্ঞপেত্র (মতাব্দ) চতুর্দশাব্দ নির্দেশ করিতে চান। এই সংক্রান্ত কিংবদন্তী এইরূপ :—প্রাচ্যের নিদারুণ উত্থাপে অবিভিন্ন বৃষ্টিশক্তিহীন হইয়া পুনরায় চতুর্দশাব্দের জন্ত সূর্যদেবের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তপস্যার সঙ্কট হইয়া সূর্যদেব তাঁহাকে এক নৃতন ভাষা শিখাইয়া দিলেন এবং এই ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তি প্রসঙ্গ প্রবল যে ইহার আবৃত্তি দ্বারা তিনি তাঁহার বৃষ্টিশক্তি কিরিয়া পাইলেন। এই ভাষাই অন্ধ্র ভাষা। অন্ধ্র অংশায়ণ করিতে লক্ষ্য হইয়াছিল বলিয়াই ইহার এই নাম। ইহাদের মতে প্রত্যেক যুগের জন্ত অন্ধ্র ভাষার বিভিন্ন রূপ আছে। বর্তমান কলিযুগের কলিঙ্গ-অন্ধ্র এবং রৌদ্র অন্ধ্র সাতকর্ণি রাজার রাজত্বকালে নাক্ষত্রবর্ধন ও তাঁহার শিষ্য দেবল দ্বারা বর্ত্তক সৃষ্ট হইয়াছে।

অস্বাভাবিক প্রাচৈনিক ভাষার দ্বারা তেলেগু ভাষার শব্দসমূহের জারি প্রদীপ্তে বিস্তৃত :—(১) তৎসমসমূহ বা তৎসম (বাটি সংস্কৃত), (২) তত্ত্বসমূহ বা তত্ত্ব (সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন), (৩) দেশীয়সমূহ (দেশজ শব্দ) (৪)

অন্ধ্রসমূহ (বিদেশী শব্দ)।

বর্ত্তমান আকারে তেলেগুভাষা খ্রীষ্টাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দী হইতেই পাওয়া যায়; কিন্তু প্রাচীন লিপিসিদ্ধপদ প্রচুর প্রাচীন যুগে ইহার উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া বলেন। পুঃ পুঃ চতুর্দশ শতকে উত্তর ভারতে ব্রাহ্মী-লিপির উদ্ভব হয় এবং ক্রমে ইহা ব্রাহ্মি ব্রাহ্মী নামে দক্ষিণভারতে প্রচলিত হয়। অশোক অম্বলাসনের মৌর্যালিপি হইতে এই লিপি সত্ত্ব। কালক্রমে এই ব্রাহ্মি ব্রাহ্মী লিপি হইতেই তেলেগু, তামিল, মালয়ালম এবং কানাড়ী লিপির উদ্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন সময় এবং স্থান তেদে এই লিপি বিভিন্নরূপে রূপান্তরিত হইয়াছে। অন্ধ্র রাজাবংশের শুভাংশয়নে তেলেগু লিপির যে-রূপ পাওয়া যায়; বেঙ্গী দেশের অম্বলাসনের লিপি উহা হইতে ভিন্ন। অম্বলাসনের ব্রাহ্মীভুক্ত; তৎকর্ত্তকর্ত্তাল বন্ধু দেবদাসাই যে এত অক্ষর সৃষ্ট তাহা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া যায়। চাপুকা রাজাবংশের সময়ে এই লিপি আরও কিছু পরিবর্ত্তন হয়। বর্ত্তমান তেলেগু লিপির সঙ্গে সামুদ্রিক লিপি একাদশ শতাব্দীতেই প্রথম পাওয়া যায়। প্রথম তেলেগু কবি নাগিরা একাদশ শতাব্দীতে এই লিপিতেই তাঁহার পুস্তক লিখিয়াছিলেন। খ্রীষ্টাব্দ ১০০০ হইতে ১৩০০ শতাব্দীর মধ্যে তেলেগু ও কানাড়ী লিপি অতিরিক্ত ছিল। তিনজন কবির সময় এই দুই লিপি সমস্তরূপে ধারণ করে। ১২২০—১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ তিনজন কবির জীবিত কাল।

মোমাল বুড়ী

ব্রজেন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য

পুত্রনী দিবা বেগুনগাছের গোড়া খুঁড়িতেছিল মোমাল বুড়ী! অম্মা, ও আবার কে হৈলিক পানে আসছে? এই মরেছে, ছুঁড়ি বাধ হয় দিলো নাউ গাছটা মাড়িয়ে। হাঁ হাঁ করিয়া উল্লসিত গাছের বুড়ী—চোখের মাতা খেঁচিল, বলি হ্যাঁলা ছুঁড়ি? ইহিকে নাউগাছলো আসলে মরবে যে।

হ্যাঁ তা লাউগাছলি ফনকনাইয়া উঠিতেছে বটে, অম্মা তাকাইয়া বেখে। বলে, ও পিসি, কোথা তোমার লাউগা মাড়ালান আমি?

মাড়ালি না, বলি হ্যাঁলা মাড়ালি না তুই নাউগাছলো? আমি যিখো বলছি? আমাকে মিথ্যুক বলি তুই! হ্যাঁ! এত বড় আশ্পদা হয়েছে তোমার? সেদিনকার ছুঁড়ি, চ, বাড়ি আমি তোমার বাগের কাছে। বলে, তোমার বাগকে হতে দেখলাম আমি—

ও পিসি বাট হয়েছে আবার, এই কাল নলিচ বাবা, আর যদি কোনদিন তোমার বাড়ী আসি আমি। অম্মা! কীদো কীদো হইয়া যায়। অস্ত্রাঘটা তাহার হইয়াছে বৈকি চুপি চুপি ছুল জুলিতে আসিয়া।

বুড়ী কিন্তু জল হইয়া যায় তাহার বাড়ী বেড়াইতে অসিরাছে ক্রিয়া। অম্মা তাই বল, আমার কাছে এসেছি তুই? আর না আর খোল খোল। তাইতো বলি অম্মা আমার সম্মেলনা ইহিকে কোত্তা। আর বলি না না, এই দেখনা, বুড়ো মানুষ কই করে নাউ নাগাই, কুমড়ো নাগাই, আর হারানজাগা হারানজাগিয়া এসে পটু পটু করে ছিঁড়ে নিয়ে যায়গা। বলি, হাতে যে পোকা হবে। হ্যাঁ না বেড়া দিয়ে নয় গরু-বাছুর ঠেকানো, এই ছুবছুনগুলোকে কী করি বলতো। আর ভাগ বলি গাভার ইচ্ছে হয়, নিয়ে যা, চেয়ে নিয়ে যা। আমার আর কে খাবে বল, শজুর, শজুর সব পেটে হাতিলালান আমি। নিগত দুই-সত্তানের শোকে তেইশ বছর পরেও বুড়ীর চোখে জল আসিয়া যায়।

এখনি বসত কাহিনী মোনাইতে বসিবে মোমালবুড়ী। এই জন্তই কেহ আসে না বুড়ীর বাড়ী। পর একবার গুরু হইলে পাকা-ছটি বসে। অম্মা বলে, ও পিসীনা, বেগুনগাছো তো তোমার বেশ হয়েছে। কোত্তাকার বীজ আনিরেছিলে বলে তো? না বলছিলো—

অ-মা বাগুণপাড়ার ঘৌ-এর বুধি আবার বেগুন নাগাবার লক্ষ হয়েছে। নিবি, বাবা ছোটো নিরে, মাঝে নিবি গিরে। তেখে দেবে এখন, খেদ্দু খেতে মাকনের মতন নাগবে। গাছপালায় গ্রন্থংগা করিলে ভারী পুসী হয় বুড়ী। পটু পটু করিয়া চারটা বেগুন ফুলিয়া গেল।

বেগুন হাতে করিয়া অম্মা বলে, আচ্চ চলি পিসি, লম্বে হয়ে এলো।

অম্মা, বাসনি যা, এই বেক জুলে গিইছি, কি এক ছুটিল ছুটিল দিগে গিয়েছে বাপু। দেকদিকি কি নিচেছে। ঠাড়া না একটু, নিরে আসি, বনের কি আর বশ আছে, লম্ব জুলে বাই না।

বুড়ী একথানা পোটকার্ড আনিয়া গেল। অম্মা দেখিয়া বলে, ও পিসি, এবে চিঠি গো।

চিঠি? চিঠি কোণার। বাজার হুড়ো নেই, চিঠি আবার কেনন করে হলো? বুড়ী রাজার হুতু বোঝে। হ্যাংগো হ্যাঁ, চিঠি। এ বে পাকিভানের পোটকার্ড, পাকিভানে আবার কে আছে তোমার, কইতিনি তো কোনদিন। হব-সুন্দর চক্ৰবর্তী। কে হয় তোমার পিসি?

চিঠি পোনার আগ্রহে রাজার হুতুর গ্রন্থটা চাপা পড়িয়া যায়। বুড়ী ঐ হাতটা টিপিতে টিপিতে বলে, কই না, কেবো বাপু, বনে পড়চে না তো! তুই পড় না চিঠিটা; বৈকি কে কি নিচেছে। কে আবার আমাকে চিঠি নিকতে গেল।—সত্যিই তো তিনহুন্নে বাহার কেহ নেই, তাহাকে কে চিঠি লিখিবে, আচ্চের কথা বৈকি।

অমলা চিঠি পড়ে—শ্রীচরণের, আপনি হঠাৎ তুলিয়া গিয়াছেন। আমি বাণাজীবন চিত্তাহরণের মাঝ। বহরিন দেখা-সাক্ষাৎ নাই তুলিয়া যাইবাই কথ্য। বড়ই বিপদে পড়িয়া আপনাত আশ্রয় চাহিতেছি। চিত্তাহরণের বাড়ীতে চিঠি দিয়াছিলো। উত্তরে আনিলান, তাঁহারা বহরিন দেশভাড়া। সেখান হইতেই আপনাত টিকানা ঞ্জোগাড় করিয়া এই চিঠি মিত্তেছি। আমি অল্প বৃথবার সপরিবারে আপনাতের গুণানে বওনা হইতেছি। আশা করি ৩০ দিনের মধ্যে পৌছিব।’

এবার, শানিকটা কাটা যে গো ছাপার কালি দিয়ে। 'সাক্ষাতে সকল বলিব। প্রণাম লাইবেন। ইতি—
হরমুখর চক্রবর্তী। সাং পীরপুর, জেলা ঢাকা।'
এইবার বুড়ী চিনিতে পারে। অ-মা তাই বল চিত্তার যাবা। তা কি করে মনে থাকবে বল, সে কতো বিনাকার কথা। আহা চিত্তা আমার মরে গেল বাছারে, বায়ের শোক কি সত, কতি চেলে। আমি সেই আত্মা, হস্তভাগী, হুই চেলে বেয়ে থেরে বক হয়ে থলে আছি। বয়েগও অকচিরে আমি। আহা চিত্তা আমাকে কি ভালোই বাসতো। বেশ করেছিলো নিতে গিহেতিগো মাঝরা। সৎ-মার থেরে কি বস্ত্রভাতি হয়। ইয়া লং-না বটে আঁছলের সেই বৌ, ছেলে-অন্ত প্রাণ।

অমলা এবার লতাই বিরক্ত হয়। পাশ কাটাবার ক্ষম বলে, আমি চলি এবার পিসি, সঙ্গে হয়ে গেলো যে। বুড়ীর চমক ভাতে, ইয়া না, কি নিকেচে বলি চিত্তার মাঝা?

ওরা সব আসবেন গো, বওনা হয়েছেন বৃথবারে। কাল সাগাৎ পৌছে বাবে।

বৌ-টৌ সব নিয়ে আসছে, নর?

ইয়া, ইয়া, লম্ব নিয়ে আসছে। পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসছে। ওখানে বে'হুনাখুনি দালা, শোনা নেই কুঁমি কিছু?

তা আত্মক আত্মক, আহা তাহলে তো বড় আটকরে

পড়েচে ওরা। বাড়ীটার আমার ছিহি কিকক। ইয়ালা যাহুব জন নষ্টে বাড়ী মানার? পুলিশ লম্বী বেঁচে থাকলে কী আনকই করতে।

বুড়ী আবার হুঁচি প্যানপ্যানি স্ক্রু করবে এগুনি। অমলা অল্পবস্তির অপেক্ষা না লইয়াই চলিতে স্ক্রু করে। ইন্স কতো সেরী হইয়া গেল বাড়ী কিরিতে, মা-এর কাছে নির্ধাৎ বকুনি খাইতে হইবে।

অধেবরা গ্রামে আবার কচিট গ্রামীর লম্বাগন হইবে। হটক না পাকিস্তানের পলাতক বাজহারা, হটক না ক্রিগতির বিপদন্ত, তবু তো গ্রামের লোকসংখ্যা তিন-চার-পাঁচ-ছয়টি বাড়িবে। অমলাই স্ববরের থমকে মারের বকুনি বক হইয়া যায়। সাতারানি গ্রামের বাহুবগলি জানিতে পারে সংবাহনী। এমন কিছু উপকারে আসিবে না নবাগত বাজালগলি, তবু উৎসাহে সকলে অটলা পাকায়, কি জানি হঠাৎ উত্তলোক ভাকারওতো হইতে পারেন, কিংবা, বরক গিরা অস্তত একটা ভাল খেলা, আজ্ঞা নেওয়ার লোকও তো জুটিবে। সন্তোষে বাড়ি পাঁচটি দিন যেন মরিয়া থাকে গ্রামী। বেল, ছোট্টেলে থাকে চাকুরে বাবু আর পদ্মহারা—লগ্নাহাতে শনিবার লক্ষ্য হইতে কমিয়া ওঠে গ্রাম, চেলেয়া, কর্তার। কিরিয়া আসেন।

সাতারানি বুড়ী বস্ত্র বেবে। বাড়ীটা তেইশ বছর পরে আবার লোকভনে করিয়া উঠিবে। বেইশ বছর আগে চলিয়া গিয়াছে লম্বী, তাহারও হুই বচর আগে কাকি দিষ্টাছে পুলিশ, সাত বছরেরই হইয়া। তাহার পর হইতে বাড়ী অপান হইয়া আছে। লোকে তুলিয়া গিয়াছে পুলিশ লম্বীকে। তাঁহার কি মনে পড়ে সব কথা। ওই যেখানে এখন হুই স্থলের গাছটা, ওখানে পুলিশ ঘোপাটির চারা লাগাইয়াছিল। আহা কী স্থলই হইত। দেওরাল চাপ: পড়িয়া মরিয়া গেল গাছগুলি আর হইল না। আর লম্বী? লম্বী সবে পুঙ্খ বেলিতে শিখিয়াছিল, বাজটা এখনো তোলা আছে নিম্নক। আহা কী আনকই ক্রিগত লাক পুলিশ লম্বী থাকিলে।

বাহুব জনের কী ভাঙটাই ছিল।

শুভ ভিটার প্রাণ যেন ঝাঁঝ করে। কর্তা কী স্বার্থপর, কেমন পুলিন লক্ষ্যকে লইয়া স্বর্গে সংসার পাতিয়াছেন। তাঁহাকে বুদ্ধি প্রয়োজন হয় না। বেশ ভিনিও আবার সংসার পাতিবেন, চিহ্নার নামাঙ্ক তাই বোনেদের লইয়া। যে যা কালী, চিহ্নার নামাঙ্ক যেন চলিয়া না যায়। পাওয়ারনোর ভাবনা আছে আত্মকাল-কার দিনে। তা চিহ্নার নামা কি আর কিছু আনিবে না টাকা পরস। হাজার হোক পুরুষ মাহুণ কিছু একটা জোগাড় করিয়া লইতে পারিবে।

কখন আসিবে কে জানে, কলকাতা হইতেই আসিবে নিশ্চয়। ট্রেন তো ছুটায়। এখানে আসিতে সেই কিকিনিমিকি বেলা, লঙ্কার কোলে কোলে। তাহাতে বসে এক সময় ঘুাইয়া পড়ে বুড়ী।

ওনা এত বেলা হয়ে গেল, বাড়ীতে আত্ম মাহুণ আসবে, বড়নড করিয়া আসিয়া শুটে খোয়াল বুড়ী। কঁদ কাঙ্ক বাকী। ওপরবাসা বাড়পোড়ে করিতে হইবে। চাল চাট্রি আনিতে হইবে বিনোর মার কাঙ্ক হইতে। চাষা বাড়ী হইতে শুভ আশু জোগাড় করিতে হইবে। বী হান্তের, ব্যাঘাটির কথা ভুলিয়া যায় বুড়ী।

কাজ আর কি? হইয়া গেল বারোটার মধ্যে। রাত্রা করিয়া রাখিতে ভয় হয় না। কী জানি এবলার জাত ধার কিনা ঠিক লাই। কোনমতে চোখে মুখে চাট্রি ভুলিয়া ঘর বার করে খোয়াল বুড়ী। বেলা আর পড়ে না। ঘরে রুগিয়া বসিয়া বিরক্ত হইয়া খোয়াল বুড়ী বাতুল্যে বাড়ী যায়।

চালা। মেজগিরী, কটা বাজলো একবার সেপতো বাহা? বড়ির লঙ্কান খোয়াল বুড়ীর এই প্রথম। মেজগিরী গানের পিক ফেলিয়া বলে, বড়ি কী হবে গা দিগি? তোমার আবার বড়ির দরকার হ'লো কিসে?

অ-ম্য জানিস্ নে তোরা? আমার চিহ্নার নামা মাহুণা সব আসছে যে লা আত্ম, সেই পাকিস্তান থেকে। এখানে থাকবে যে আমার কাছে।

চিহ্না আবার কে গা বিধি তোমার, ভনিভি তো কখনো। পাকিস্তানে আবার তোমার হুইন কে ছিল গা?

অম্মা, আবার ন' দেওরের পেতন পকের ছেলে ছিল যে গা চিহ্না। কতদিন তো বশিচি তোকে। মেজগিরীর মনে নাই কবে খোয়াল বুড়ী তাহার দেওরপোর গল্প করিয়াছে। ভনিভে চাহিলে আবার ইতিহাস কাঁথিবে বুড়ী। বড়ি দেখিয়া বলে, এই তো লুখে ভিনটে, তোমার সেই আলতে গিবে লাড়ে পাচটা হ'টা।

খোয়াল বুড়ী বলে, ও মেজগিরী, বাগ বাহু তোরা, আমরা সব সেকেলে নোক, কি জানি? কই ছোট বৌকে দেখছি না যে লা, কোতা গেল।

মেথো গিরে বাও রায়খরে। লাহেবের বৌ, চা চাই না, ভিনটে বাজলো। মেজগিরী বইটা আবার টানিয়া লইয়া ভাবে, আবিখোতা মেথো বুড়ী; কোথাকার কে দেওরের মাগা, তাও প্রথম পকের, তাঁরা আসছেন পাকিস্তান থেকে বৌ ছেলে নিয়ে, তাঁর আত্মা মেথো। বৃকবে বুড়ী চালা কিচির নিচির বাতালের পালায় পত্নক একবার।

চারের নামে খোয়াল বুড়ীর মনে পড়িয়া যায়, একটু জোগাড় রাখিলে হইত। বলে, দেখি, এলাম একবার দেখা করে বাই।

মেজগিরী বৌটা দিয়া বলে, তোমার আরার চারের নেশা হলো কবে থেকে?

আমরণ, আমি আবার চা খাবো কি লা? বুড়ী হাসে। অজ দিন হইলে বোম হয় সুক্কের বাখিয়া খাইত। মেজগিরী অম্বাক হয়।

চোট বৌকে এই সময়টা একা রোজ একাই চা খাইতে হয়। একটা কঁকা বসিবার লোক পাইয়া খুশী হয় সে, হোক না সে খোয়াল বুড়ীই। আপায়ন করে, ও বিধি, কী ভাগি আমায়, বোসো বোরো। আত্ম কিছ তোমাকে চা না খাইয়ে ছাড়ছি না আমি। খাওনা

একটু এ তো আর আশ নয়। দেখবে, শরীর মন সব ভাল হবে বলে।

ঘোষাল বুড়ীর ভালো লাগে এই কলেজে পড়া; যেহেতুকে। দুই দুইপুড়ী, সাতকাল গেলো এখন চিত্তের চড়ে চা খাবো কি না? তা শোন আমারে—হঠাৎ চা চাওরাটা কি ঠিক হইবে তাবিয়া কথাটা পুরাইয়া দেয় বুড়ী। নানে আমারে সেই চিত্তার কথা বলতাম না, সেজ বেত্তের পেত্তম পক্ষেই হলে না, ইয়া সেই, গর বাবা মারিয়া সব পাকিস্তান থেকে আসছে আমার কাছে থাকবে বলে। বাস বাবু তোরা, আশাপ সালাপ করিস। আমি তো আমার সেকেন্দ্রে গেঁয়ো ভুত। কী বলতে কী বলি, হরতো কবাই বুঝবো না ওদের।

ছোট বো চোখ বড় বড় করিয়া স্তাকার—ওমা তাই নাকি? তোমার আমার অস্ত্রীয় স্ট্রিম ছিল নাকি পাকিস্তানে। বেশ কয়েকটা দিবি আসতে লিখে দিয়ে। ওখানে আমার হিন্দু কেউ থাকে নাকি দিবি, আমার জানাশোনা সবাই কবে চলে এসেছে। নিচ্চরই খাবো দিদি আমি, আমার বাঙাল কথা বলা অভ্যাস আছে। কিছু তেবো নাখুদি।

বাসু ভিন্ন ঠিক। ইয়া, ও বো শোন, তাবজিলাহ কি, খী জানি বাপু ওরা আমার চা কা খায় কি না। আমার তো গুগল পাট নেই।

ওমা ভাততে কি হয়েছে, নিরে বাঙনা খানিকটা চা চিনি। হু, তোমার হাসপটাকে একটু হয়ে নিও এখন। কেটলি না থাকে তো কি হয়েছে, ডেক্টি টেক্টিতে করে জল গরম করে নিও। ও সে ত্যরাই বেবে এখন, আর বেশা সে বুঝবে। এই আমার দেখো না, দুপুরবেলা রান্নাবনের পরবে বলে ভাপছি।

ছোট বো-র কাছে চা চিনি লইয়া বুড়ী ওঠে, বাসু কিন্তু না, ওমা তুই বে বুন লা, মরণ দেক আমার। বাসু কিন্তু ঠিক বুঝলি?

বাড়ী ফিরিয়া বুড়ী আর একবার লাওরাটা কাঁট দেয়, জাপর রঙনা হর ইহুল ঘরেই দিকে। গাড়ী আদিলে

এই দিক দিরাই আসিবে।

একখানা করিয়া গাড়ী আর বুড়ী আগাইয়া যায়, কোভা বাবে পা? গাড়ী চলিয়া আর অস্ত্র গ্রাম। আর গাড়ীই বা কখনো। খান পাঁচ ঘর সেল সত্যা পর্বত। বুড়ী হতাপ হইয়া পা বাড়ার বাড়ীর পথে। সত্যা উংরাইয়া গেল, ভিটার প্রাণপটু ভো আসিতে হইবে। অছকারে ঠাণ্ডার ঘর না ঠিক। তবু গ্রামের চেনা রাস্তা, লাঠি ঝুঁকিয়া ঝুঁকিয়া বুড়ী চলিতে থাকে।

বাড়ুঘো বাড়ীর কাছে আসিতে বিলি বিড়িটা আড়াল দিয়া বলে, ও পিপি কোথা ভিলে গো এতক্ষণ, তোমার বাড়ীতে যে শোক এসে বসে রয়েছে তখন থেকে।

বুড়ী যেন টাব হাতে পার, এসেছে? এসেছে ওরা সব। ওমা কোভা নিরে এলো গো ওরা, আমি যে সেই ইহুল ঘরে ঠায় বসে আছি বিকল থেকে দেক দিকি। বে বাবা এটুকু পর করে দে। আহা বেভায়া কষ্ট পাচ্ছে তখন থেকে।

বেড়ার পারে বসিয়া আছে তিনটি মানুষ। অ-তাই আমার, ও বোনটি, কখন এলে পা তোমরা, আমি সেই ইহুল ঘরে বসে আছি। মরণ আমার।

হরমুন্দর, সরমা, বেবে গারজী প্রশ্ন কর ঘোষাল বুড়ীকে। বাক থাক বেঁচে থাকো, চিরএতোস্ত্রী হও। আহা কত কষ্টই হয়েছে তোমাদের, চলো উটে এলো ঘরে। আহা ইটি বুজি দেয়, বিরে লাওনি এখনো? আহা চিত্তারে, কোথ্য গেলি বাপ আমার, পুলিশ লম্বীরে—বুড়ীকে বমক দেয় বিলি, ও পিপি কেঁদো পরে বাপু, বাও এঁদের ভেত্তরে নিরে বাও, হাত হু খুক ভিটুক একটু। বুড়ী চোখ বুজিয়া ভালো খোলে।

দুএকদিনেই শুধাইয়া বলে সরমায়া। পাকিস্তান হইতে কিছুই আনা যায় নাই। কিছু গিয়াছে লুট হইয়া, কিছু রাস্তায় কাঠমসে আটকাইরাছে। থাকার মধ্যে শ'বেড়েক টাকা, পুরাতন কাপড়-জামা, আর বিদ্যনা বাসন কিছু! ঘোষাল পরিবারের জুলিয়া রাবা

সংসারটি শিখ-সিকা-ভাঙার ঘর হইতে নামাইয়া আনেন সরমা। তবু যেন মন বলে না, এ কাহার সংসার, কাহার দয়ার বাঁচিয়া থাকি, কয়েকটা দিন কে জ্বলিবে? বুড়ী আদর আঙ্কান করে বৈকি, তবু যাকে নাকে বধন বিনাইয়া বিনাইয়া কানে, রাগিয়া উঠিয়া বদক দেয়, মনে লাগে সরমার। পরের বকুলি বাইরা ভাগ্যকে বিভার দেয়। কিন্তু তবু তো একটা আশ্রয়। আরো হাজার ভ্রমের বস্ত্র টেনে ক্যাপে কাটাইতে তো হয় নাই। সরমা মানাইয়া লইতে চায়, বুড়ীকে খুশী করিতে চায়।

গ্রামের বেহে-বোরা আসি পাকিস্তানের দাক-পুনো-খুনির গল্প শুনিতে। সরমা তাহার শব্দরবাড়ী, বাবার ভিতার কলহের কথা বলিতে পারে না শুভাইয়া। কেন পালিয়ে এলেন আপনারা? কী ককুম থাকতে লাগলাম না। কতগুলো বুন হরছে আপনাদের গায়ে? চার-পাঁচটা আইবো। সব জুট হয়ে গেছে, নাগো ঢাকার বৌ? তা আইছে অনেক। মোছলমানগুলো ভারী পাখী?—হ, খুইয়া বমনাস। ভালো মাহুদ আছে জুতারভা। এমনি দারা জবাব দেয় সরমা গায়ত্রী। তা ইয়াগা, মেরেদগুণের ওপর জোরজবরদস্তি কেন হরছে? বাঁড়ুজ্জের বেজবৌ জবার।

সরমা বলে, আইছে দিদি, ভাঙ আইছে। এই হগ-গল কথা জিগাইবেন না আবাগো।

ঘোবালবুড়ী ভারী খুশী, তাহার বাড়ীতে এখন দুপুরটার আঙ্কা বলে, কত লোক, জমজমাট। আপ্যায়ন করে পান দিয়া। গায়ত্রীকে বলে, তোরা এখানে কী করচিস? বানা পান নিয়ে আর না। গায়ত্রী অমলা উঠিয়া গেলে বেজবৌকে বলে, ভুই বেল কী, বেজবৌ, পোনত আইবুডো বেরেদের সামনে ওই সব কথা বলতে আছে নাকি?

বেজবৌ বলে, তাকে আবার কী হরছে? বেরের ইয়ে হলই বারের সমান। আবার ওই বয়েলে ছেলে হয় নেই ছুটো। বকুল নাগো পাকিস্তানের বৌ, কী কী

হরছে আপনাদের গায়ে।

সরমা বুধ খোলে না, ভুই কথা জিগাইবেন না আবাগো। হুতাপ ইয়া কিরিয়া বার মেয়ে বোয়া। বুধখোচক গল্প জেনে না। বেজবৌ বলে, বড় সেবাকী ওই বাড়ালনী, বেখলে তো দিদি। বুড়ীর হাতে ছল দিয়ে ছাড়বে ও বলে দিলাস আমি। তট্‌জোখিয়া বলে, চং মেখে বাঁচিলে, আ মরখ, নজা বেখে বাঁচিলে। নিশ্চর জবর কিছু হরছে, নইলে এমন ঢাক ঢাক কেনে। আবার তো আর পান খাইনে। বাঁড়ুজ্জের ছোটবৌ বলে, আপনাদের যেন কেনন কথা। মাহুদটা এত বকল বেখে এগেছে, বর-বাড়ী খুইয়ে—। অমলা সার বের ছোটবৌকে। বেশী কথা বলার লাহন বেই, না আইছে পিনী আছে।

হরজ্জের সারাজীবন বাঁচারী করিয়া কাটাইয়াছেন। দশবিধা অমিও ছিল। এক বেহে লইয়া দিন ভাল ভাবেই চলিয়া বাইত। কিন্তু এবার? অমিও নাই, বাঁচারিও নাই। অকুল পাখার, চিতা করেন দারা মিনরাত। পাতানো মিথিরা উপর ভর করিয়া কতদিন থাকি বার? বড় দিন বার শংকিত হইয়া ওঠেন, বুড়ীর রকমকম নাকে নাকে কেনন হইয়া উঠিতেছে। এগ্রাম ওগ্রাম ঘুরিয়া ঢাকার সজান করেন, কাগজ মেথিরা বেশিরা দরখাস্ত করেন। দিন একটি একটি করিয়া গড়াইয়া বার আশার ছুরাশার। বাবা-বার বুধের দিকে চাহিয়া গায়ত্রীর কথা যেন শুকাইয়া যায়। কেলিয়া আসা গ্রামের নতুন পুরাতন বৃত্তি বিলিয়া শিথিয়া, কেসে তাহাকে। হাগিখুশী উজল বেয়েটা বীর পাঁচ হইয়া মিঠাছে আশ্বত্থ রকম। বহলের তুলনার কত বুড়াইয়া মিঠাছে গায়ত্রী। অমলা বলে, তুদি কি হাগতে জানো না নাকি? চোটা করিয়া হাসে গায়ত্রী, এই তো হাগি। ইয়া, এমনি দারা হাসে নাকি মাহুদ—অমলা রাগ করিয়া 'মাহুদ' করিতে চায় নতুন ছোট সখীকে। গ্রামে তাহার পুরাতন সখীদের সবারই বিবাহ হইয়া গিয়াছে।

একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হইয়াছে গায়ত্রীর।

গাঙ্গুলীঘের দেহ। গ্রামের চোট সাইক্লোরিটার সেজেটাকী সে, বই আনিয়া ঘের নাকে নাকে। গারজী মানে, বই আনা ছাড়াও আর একটি কাজ আছে তাহার এ বাড়ীতে। অমলায় সঙ্গে দেখা করিতেই সে আসে।

করেকদিন গ্রন্থা অমলা বিকালের আগেই চলিয়া যায়, কী আমি কেন। দেহু আনিয়া আনিয়া কিরিয়া বাইতেছে। এটা ওটা গর করিতে করিতে হঠাৎ একসমর গারজীর হাতে একটুকরা কাগজ ভাঁজিয়া দিয়া বলে, এইটা অমলাকে দিয়ে দেবেন, পাঁচ পড়ি কাউকে বলবেন না যেন। তারপর লক্ষ্য করিয়া পালায়।

বুড়ী মাগুরা হইতে দেখিতে পাইয়া ঠক ঠক করিয়া আগাইয়া আসে, বলি এসব কি হচ্ছে না তোমার গারি। সোমন্ত ছেলের সঙ্গে এত কটনটি কিসের না আইবুড়ে বেরের ? পিনীম দেখা নেই, ঠাকুর দেবতার নাম দেয়া নেই। মকরা হচ্ছে সন্দেহে—

গারজী বলে, ভিহাংবিহি বেকা ক্যান্ পিনীমা, কিছু করি নাই আমি।

বুড়ী আরো বাগিয়া গিয়া বলে, শুভকে দেকলাম জুজুর জুজুর করচিসু তুই, আবার মিথ্যা কত। বলি হুঁস নেই তোর; সমরকালে বিয়ে হলে চারছেলের না হতিসু যে। ফের যদি কোনদিন বেকিচি ও ছোড়াকে এ বাড়ী চুকতে তো ছাং ভেঙে দোবো আমি। এসব ইল্পতেপনা আমার বাড়ীতে চলবেনা বলে দিছি।

গারজী হঠাৎ দৈর্ঘ হারাইয়া ফেলে, বাতা কথা কইরো না পিসি, কি করছি কি আমি ? তদন্তলোকের পোলার সাণে কথা কতনে অপরাবটা কি অইচে ? রোজই তো কই আমি।

ও হারামজাদী, রোজ আসে ও, রোজ আসে ? রোজ নাগর নিরে রক হয় তোমার, আমার বাড়ীতে বসে, পীড়িত ? বেরো বহুি আমার বাড়ী থেকে, হারামজাদী, নভেক খোয়ারী বিদী কোথাকার, ছোনাদী—রাগে মুখ দিয়া কথা গরিতে চাহে না।

সরমা চোঁতাতে গুনিয়া রান্নায় হইতে বাহির

হইয়া আসে। বুড়ী কেশিয়া গিয়াছে, এ আশ্রয়কৃত ব্যার বুঝি। ঠাসু করিয়া একটা চড় বসাইয়া ঘের মেঘের গালে। গারজীর গরুর মত ডাবভেবে চোখে কল নাহিয়া আসে।

মরগ হয় না তর, হতভাগী। মরসু না ক্যান্ তুই ? মরিসু না ক্যান্ ? তরে লইয়া বত জালা আনাগো। ঘাপ বাড়ী ছাইড়া আইশাহ, এছেনে আবার গুত করছসু ! চুলের বুটি বহিয়া পাগলের মত মারিতে থাকে সরমা। গারজী পড়িয়া যায়।

অম্বো করছ কিগা, লভিই মেবে কেলবে নাকি মেরেটাকে সন্দেহেলা। বুড়ী ছাড়াইবার চেষ্টা করে। গারজীর হাত হইতে একসমর দেহুর কাগজের টুকরাটা পড়িয়া যায়। হো মারিয়া তুলিয়া পর সরমা চিঠিটা, দেখি দেখি কী লিখেছে ?

চিঠিটা পড়া যায় না লক্ষ্যার আবছা অক্ষকারে, তবু বোকা ব্যার নাম হুটো। সরমা হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলে, কাম কি তর পরের চিঠি বতনের নিজের জালায় মরছসু না তুই।

কার চিঠি বো, কার চিঠি ? বুড়ী গুহার।

ওই বে আপনাগো অম্বলি, তাবে চিঠি দিছে দেহু ছায়াছাড়া।

টলিতে টলিতে ঘরে যায় গারজী। ভীষণ লাগিয়াছে পড়িয়া গিয়া। বুড়ী সাধাসাদি করিয়া বাগরাইতে পারে না রাত্রে। শরীর ব্যাপটা, রোগ মনে করিয়া বাগ আর বেশী ভাব করেন না। নিভেহই লক্ষ্য করিতেছে এখন অতবড় বেরেক না আনিয়া তনিরা এইভাবে মারিয়া।

আকাশপাতাল ভাবে গারজী। তাহার লজ্জাই বত জালা বা-বাবার। তাহার লজ্জাই চলিয়া আসা পিতৃ-পুরুষের ভিটা ফেলিয়া। আজ যে কাণ্ড হইয়া গেল, তাহার পর এখানেও আর থাকা বাবে কিনা লক্ষ্যে। কোন আত্মীয়তার স্ত্র বহিয়া বাবা আবার আশ্রয় খুঁজিতে বাহির হইবে এই বৃদ্ধ বরলে... পেটটা ভীষণ

যেতদ্বি দিহা উল্লিঙেছে, আর সহ করিতে পারে না
 বুঝি...এই অপরান লাহন; বহিয়া, না-বাংর বোঝা
 হইয়া কতদিন বাঁচিয়া থাকে যায়। পাকিস্তানের সেই
 দিনটির কথা মনে পড়ে, শিহরিয়া ওঠে গায়ত্রী। যুদ্ধের
 বহো দম বজ হইয়া আসে। পেটটা বেন ঠেলিয়া
 উল্লিঙেছে বুক পর্বত। আর বুঝি লুকাইয়া রাখাও
 বাইবে না। অসহ বহণায় কাঁদায় গায়ত্রী।

হাতড়াইয়া হাতড়াইয়া দরখা খুলিয়া বাহিরে
 আসে—পিলীর বহি আকিম খাত্তার নেশা থাকিত।
 হাতপা অপর হইয়া গিয়াছে। হুম লইবার ওল একটু
 বলে এবার। হে ভগবান, এখনি বেন শেষ হইয়া যায়
 সব কিছুই। পুস্তক ঘাট পর্বত বাইতে পারিবে কিনা
 সন্দেহ, একটু যদি বিষ পাইত কোথা হইতে।

ঘরে ঘরে যন্ত্রের মত বাঘাটা মিলাইয়া যায়।
 আঃ এই বুঝি মুক্তা।

খানিক পরে আবার অসুস্থ করে মন্দিরা বার নাই
 সে। বস্ত্রপাটা আরো বাড়িয়া গিয়াছে। হঠাৎ এখনি
 করিয়া ভুগাইবে সারাসাত সারাদিন। প্রাণপণ চেষ্টার
 পা বাতায় নীচের দিকে। অন্ধকারে ঠাঁহর হ্র না,
 পড়িয়া বার হুড়মুড় করিয়া।

সরবার ঘুম ভাঙিয়া যায়, কে? কে? দরখা
 খুলিয়া বাহিরে আসিয়া দেখে গায়ত্রী মুখ বুঝড়াইয়া
 পড়িয়া আছে। হাঁটরাউ করিয়া কাদিয়া ওঠে সরবা।
 ঘোবালবুড়ী, হরম্মন্দরকে ডাকিয়া ডুদিয়া ঘরে আনিয়া
 শোয়াইয়া দেয় গায়ত্রীকে। গায়ের কাপড় আলসা
 করিয়া দেয়। পেটের বহো কী একটা ঠেলিয়া ঠেলিয়া
 উল্লিঙেছে।

ঘোবালবুড়ী তাহার দিকে তাকাইয়া নংকিত হইয়া
 ওঠে। এ কি বৌ, সন্মোনান, কেমন করে হলো গো?
 এতো বেশ বড়লড় মেক্ছি। হ্যাঁগা কোতা থেকে এ
 সন্মোনান এসো গো? কোন্‌ দূরে বড়ী কাদিয়া

কলে। হরম্মন্দর বাহিরে গিয়া উদান পুষ্টিতে তাকাইয়া
 থাকে আকাশের দিকে।

কাদিতে কাদিতে সরবা গায়ত্রীর লাহনার কাছিনী
 বলে। চারদাল আগে খট্টাছিল এই ঘটনা। কিন্তু
 তাহা হইতে এই সন্মোনান হইয়া গিয়াছে, হুঁকিতে পাবেন
 নাই তিনি। গায়ত্রী কেমন করিয়া লুকাইয়াছে মায়ের
 চোখেতে।

হঠাৎ পা দুইটা জড়াইয়া ধরে সরবা—অ দিদি,
 তোমার দুইটা পার পড়ি, কইওনা করে। বিধ
 আইতা ডাঙ, খাত্তারাইয়া দিহু বাইয়ারে।

ঘোবাল বুড়ী বলে, বাগাই বাট, মেরেক দারবে
 কেনে পা। মেরের আমার অপরবটা কি? বাচা,
 আমার একুনি সেরে উটবে।

ও দিদি, তাকের পোলা বে বাইচার প্যাটে।
 বাইয়া কালাও দিদি, কাকপকী ট্যার পাইবো না।

আমাকে আর শিকিও না বৌ, তিনহুজি পেরিয়ে
 গেল আবার। এই অবস্থার নষ্ট করতে গেলে বাঁচে-
 কনো পোয়তী। হোক না হেলে, কেউর কীয, দান
 করে পোখে খোঁজোমানকে।

গাভাড়া দিহা উল্লিঙা বলে বড়ী।—নাও ঘরো দিকি
 শিমিট। মেরেটাকে তো মেরে বুন করে কেললে।
 ঘরের কোন বুড়িয়া বড়ী বাহির করে একহুড়া
 সিঁদুরমাখা হার।—ভিলে কোবরেক এসব ব্যাপাকে
 বনস্তরী হলে কি হবে চানার হারামজাদা টাকা ছাঁকা
 কতা কইবে না। বাগে পেরেছে একোন আবার চেপে
 বরবে।

লাটিগাছ। হাতে লইয়া হরম্মন্দরকে ডাকে বড়ী—
 হ হরো, এসো দিকি, আমার লুনে। রাতবিরতি একা
 একা ঠাঁহর পাই না ঝাঁকায়। থাকতে পারবে তো
 বৌ? ওর কি আমার এই এলাম বলে।

সাহিত্য পরিচয়

মেহমুন : নবোদয় নামে বিখ্যাত। বেঙ্গল পাবলিশার্স,
৩৪ বক্সিং চার্টার্ড স্ট্রিট, কলিকাতা। মূল্য ৩/-।

'মেহমুন' উপজাতিগোষ্ঠী একটি সাহিত্যিক, রূপগোষ্ঠী।
সমাজ সম্পর্কীর্ণ, নারীর জীবনকাহিনী। একে
নিঃসন্দেহে একটি 'She Novel' বলা যায়। আমাদের
সমাজ জীবনের ভিত্তির উপর যে নারীপ্রকারের বিস্তৃতি
দেখা দিয়েছে পিতৃপিতৃনির আবির্ভাব হচ্ছে কবি
তারই মূল্য প্রকাশ। মানসিক স্বাধীনতার অভাবজনিত
বিবাহিত জীবনের ভিত্তি অতিশয় কবির পরবর্তী জীবন
নিয়ন্ত্রণের পথ হ্রাস করে দিয়েছে। স্বাধীন কালে।

গুণাটী কবির বিবাহ বিচ্ছেদের প্রধান কারণ নয়,
আমলে বিবাহটাই কবির জীবনের প্রতিফল। স্বাধীন-
পুত্র নিয়ে ঘর সংসার করতে হ'লে নারী স্বভাবে যে
মনোনিষ্ঠতা, সামাজিক বিষয় বুদ্ধি এবং মনোনিষ্ঠতা ও
মনোনিষ্ঠতার প্রকার, কবির চরিত্রে তার একান্ত অভাব।
এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্রের অন্তরালে যে উচ্চত
ও উচ্চত ভেলনিপনা থাকে, বর্ষার যে উচ্চত ক্ষমতার
রূপ রূপ থাকে—যার মুহূর্তে নিম্নাভাঙ্গণ ও বিবেচনামূলক
বুদ্ধিসিত দোষাচ্ছে যে কোন জীবনই বিপন্ন অস্থির হ'য়ে
যেতে পারে, অতিশয় স্থিতি পরিবর্তনও যার পৈশাচিক
অভয়গর নিখাস সমস্ত বুদ্ধি ধ্বংসরূপ রচনা করে
ক্রমবিধ বীজের অসুস্থ প্রাণকোষ অর্থাৎ করে তুলতে
পারে—কবির জীবনে তার কোনটাই একেবারে অভাব
নেই। নিজের জীবনের অসৌন্দর্য দিয়েই সে উমার
জীবনে অশান্তির বৃন্দাবন অবলম্বন করে তুলেছে,
বিভাগের মরল, অমায়িক সাহু জীবনে কলংকের
রোষণাও করেছে। ভাঙার পের প্রেরণে তাচ্ছিল্য-
ভরে উপেক্ষা করেছে এবং বিবোদ্যুর লালসাকে প্রতিরোধ
করেছে। এই ক্ষান্তত যেরূপের একমাত্র লক্ষণ হলো
মেহ। কবিতা সে সম্বন্ধে অসচেতন নয়। দেহের কোন্
ভাগীতে কার কল মেহের কিতাবে প্রকাশ করা যেতে
পারে, চোখের কোন্ দিশার কার মনোপূত। আলোপের

কোন্ ধনি কার অন্তর কিতাবে প্রসূত করে, তলনার
কোন্ দূর কে কতখানি পঙ্কজ করে—এ সবই কবির
মহাবর্ণণ। তাই সমস্ত ঘটনাই তার উচ্চাঙ্গল আচরণের
অঙ্গুল হরে দেখা দিয়েছে। কবির চরিত্রে অঙ্গুল
এবং প্রতিফল ঘটনার কোন তীক্ষ্ণ বস্তু নেই, কারণ,
অঙ্গুল ঘটনাও যেমন তার পক্ষে নিত্য পরিবর্তনশীল,
প্রতিফল ঘটনাও তেমনই কবিকেই নিঃশেষ। কোন
স্বাধীন-বেদনা বা লক্ষ্য অপমানই তার নারীকে
স্বাধীন করে না। এই চরিত্র-সৃষ্টিতে নরেন্দ্রবাহু
তীক্ষ্ণ মনোনিষ্ঠতা ও বাস্তব শিল্প বুদ্ধির পরিচয়
দিয়েছেন। একথাও একরকম স্মরণ করেই বলা যায়,
নরেন্দ্রবাহুর কল্পনা যদি খুব দুর্বল হতো তাহলে এই চরিত্রের
সাধারণ্যে তিনি লেডি ম্যাকবেথ বা ইরাগোর মত কোন
জীবনের বর্ধিতিক ধ্বংসরূপ রচনা করতে পারতেন।
কবি-চরিত্র চিত্রাংকনের পটভূমিকাটিও যথাযথ হয়েছে।

স্বাধীন-পরিভ্রমণ। স্বরূপের শ্রেণীজীবনের আচরণ
তার চরিত্রটিকে যথার্থমণ্ডিত করেছে। উমার জীবনের
প্রারম্ভে জীবন-বেগের কিছুটা অভাব লক্ষিত হ'লেও
বিভাগ ও কবির মেলামেলায় সন্দেহপূর্ণতা ও তারই
প্রতিজ্ঞাস্বরূপ বিভাগের প্রতি উমার বিচ্ছিন্নতাও
যুগ চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গুর রেখেছে, যদিও এই
চরিত্রটি সুস্থিত হবার বশেষে সুযোগ পাননি।
উপজাতির শেবাংশে বিভাগ ও কবির মতো প্রবর্তী
যৌনতত্ত্ব ব্যাখ্যার অভাব অতিশয় সমর ব্যর্থ না করলেই
বোধ করি ভাল হতো। যদিও উচ্চতর চরিত্রবিচারে
এতে অবলম্বন বা অসংগতির কিছু নেই তবু এই
স্বাধীন নীরস তরু উপজাতির বহুল গতি ও যথু
স্বিত্যকে বাহিত করে, একটা ভুলে না যাওয়াই
ভালো। কবিকে শেবকালে বিভাগের প্রী বলে
স্বীকার করে মেলাটা ও উমার প্রতি তার পূর্তীভূত
মমতার বিলম্বন দিয়ে ততল মোহে একেবারে রুট হয়ে
যাওয়াটা কিছুটা আর্থিকতার স্বপ্ন করেছে। এর

পঞ্চাশে তেমন কোন কাণ্ডকারণ সূক্ষ্মা নেই।
কথোপকথনে নরেনবাবুর (বিত্ত হুজির কনভা লক) করা
গেল।

বোটিকা, 'বেহন' উপজায়ে নরেনবাবু ক্রটি-
বিচ্যুতির হাত থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হ'তে না পারলেও
উপজায়ে আংগিক এবং ক্রটিরহস্ত যে তাঁর আরও নরেনবাবু
বহির্ভূত নয়, নিঃশেষেই এ সমস্ত প্রকাশ করা যায়।
ভাবার সিন্দূর, বটনাগরপ্রভা নটিকীর আকর্ষণিকতা
ও চমৎকারিত্ব নষ্ট, চরিত্র চিত্রণে অন্ত্যাত্মিক বিশ্লেষণ-
নৈপুণ্য প্রভৃতি এবং প্রেমীর সাহিত্যিকের কথকটি
বিশিষ্ট ভণ 'বেহন' উপজায়ে গতির সকার করেছে।
হাণা স্নান, প্রজ্জ্বলিত বোটিকাটি।

ভক্তসঙ্গমে

মেঘদাল পাঠক

আজব জীবিকা : এ, ভি, কে, চৌধুরী :
অনুবাদ—নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী : বেঙ্গল 'পাবলিশার'
১৪, বক্স চার্টার্ড স্ট্রিট, তিন টাক।

সমসাময়িকের মধ্যে চৌধুরী নিজে বৈশিষ্ট্য
সম্পন্ন। তাঁর বুদ্ধিগুণ খোলাসেবা বৈশিষ্ট্য (বৈশিষ্ট্য)
তিনি সাহিত্যেও সফলিত করেছেন। নতুন একটি
ব্যাকরণ অর্জনমুক্ত করেছেন সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। এই
বৈশিষ্ট্য লেখার একটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন 'এ প্রাচীন অর্থ হুজির
ট্রেন' বার অনুবাদ করেছেন শ্রীমুক্ত নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
আজব জীবিকা নাম দিয়ে।

প্রত্যেক ভাবার সাহিত্যেই অনুবাদের একটি
বিশেষ স্থান আছে। অনুবাদ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে।
ইংরেজী সাহিত্যের একটি বড় অংশই অত্যাধ। কিন্তু
হুজিরের বিবরণ ক্রটিগত রচনার সমৃদ্ধ হয়েও বাংলা
সাহিত্যে এখনও সার্বিক অনুবাদ আর দুজাপা।
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিভাত অর্থ লোক অনুবাদে হাত
দেয়, এবং অনুবাদের কাজকে মেহান্তই ব্যক্তি ভাবার
হাত। অল্প কিছু বলে তারা ব্যাখ্যা করতে পারেন। ফল
বিপর্যয়। অনুবাদের প্রধান উদ্দেশ্য সেক্ষেত্রে বার হতে
ব্যর্থ। সেমিক থেকে শ্রীমুক্ত নীলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

অনুবাদ বিশেষ উদ্দেশ্যে দাবী রাখে। তাঁর অনুবাদের
আন্তরিক গতিগত সমৃদ্ধতা চৌধুরীর বৈশিষ্ট্যকে
সুন্দরভাবে বিবৃত করেছে। কবিতার অনাবরণ দক্ষতা
তাঁর গন্তেও এমন একটি সন্নিবিষ্ট এনে দিয়েছে যা
কোন কবিতার বাকসংঘর্ষেই আরও করা সম্ভব। মূল
এই না পড়েও মূলর আশ্রমে পাঠক পুরোপুরিই পাবেন।
অনুবাদ এখানে ক্রটিগত সাহিত্যের পর্বেই উঠেছে।
এখানেই অনুবাদের পূর্ণ সার্বিকতা। বাঙালী পাঠকের
সঙ্গে আজব জীবিকা নামক চৌধুরীর রচনার
পরিচয় ঘটিত হবে এবিষয়ে সন্দেহ নেই। আর সে-
পরিচয়ের সেতুবন্ধনের সবটুকু কবিতাই নীলেন্দ্রনাথ
চক্রবর্তীর অনবদ্য অনুবাদের।

উত্তরাপথ—স্বর্গীয় খোব। ঠার লাইট পাবলিকেশন,
১৯৫, চক্রেবেড় লেন, কলিকাতা—২০। দাম দু' টাক।

সাহিত্যিক বিশেষণ হিসেবে ব্যবহৃত উদীয়মান
শব্দের সঙ্গে নবাগত শব্দের ঠিক যেন অর্থগত নেই।
উদীয়মান বলতে বোঝায়—ব্যাখ্যা লিখছেন, প্রতিষ্ঠা
অথবা হয়েই ব্যাখ্যা আসরের এককোণে আসন বুঝে
নিরেছেন ব্যক্তি, সম্ভাবনার অধুর বেগা গেলেও পরিপূর্ণ
রূপ পাননি। কিন্তু নবাগত ভাষা—প্রথম অর্থ নিয়ে
সাহিত্যের আসনে এই বাদ্যের প্রথম আবির্ভাব অর্থাৎ
বাদ্যের ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন ব্যাখ্যা ক'রে নেওয়াও
সম্ভব নয়। এই নবাগত শিল্পীর প্রয়োজন আছে
সাহিত্যে। বিশেষ ক'রে আজকের বাংলা দেশ।
আমাদের অগ্রহায়ণ সাহিত্য আজ যে সীমার এসে
শৌছেছে সেখান থেকে আরও ভবিষ্যতপথে টেনে নিয়ে
ব্যবহার সম্ভব দক্ষশিল্পী যেন গোঁথে পড়ে না শুভেন।
কবিতা-প্রবন্ধের দিকটা বাদ দিলেও শুভমাত্র দল
উপজায়ে ভবিষ্যত সম্বন্ধে বিশেষ আশাবিত্ত হ'তে
পারছে না। ইদানীং কালে হ'লন একজন উদীয়মান
কথাসিল্পী আশ্চর্য্য কর্মতার পরিচয় দিচ্ছেন সত্য কিন্তু
পূর্বসূরীদের জুলনার তারা সংখ্যার পর্বাণ নয়। স্বভাব

আজকের এ' দুদিনে বস বেনী ভরল কথামিলা এগিরে আসবেন ঐশ্বর্যবতী সাহিত্যের পক্ষে তা ততই কল্যাণকর। এ'দৈব মধ্যে ছ' একজনও যদি প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারেন সাহিত্যের পক্ষে সেটাও অসম্ভব নহ। সখীর যোগে তাই অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উত্তরাংশ লেখকের একটি গল্প নতুন। সবগুলো গল্প সমানভাবে রসোত্তীর্ণ না হলেও কয়েকটি গল্প সত্যি ভালো লাগলো। উত্তরাংশ, সীমান্তর, লহরীকৃতি, বঙ্গ লেখকের সত্যিকারের শিল্পীমনের পরিচয়। সীমান্তর গল্পটির বে পটভূমি পাঠকের কাছে তা সম্পূর্ণ অপরিচিত আর মোহন সাহেবও এক বিচিত্র চরিত্র। বাস্তবতার সঙ্গে এ' বিচিত্র পরিবেশের কতটুকু মিল দেটা অবশ্য তবিতব্য নয়, এ' ব্যাপারে লেখক যদি আমাদের ঠিক দিবেও থাকেন তবে দিন। কিন্তু এর মূল বস্তু—পারিত্রা যে বাহুরে জীবনে কতোবড়ো অতিশাণ, নিপেবিত একটা। গুটান পরিবারের মধ্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু এ' গল্প প্রসঙ্গে একটি কথা বলবার আছে—আজকের বাংলা সাহিত্যে সাধুভাষা একেবারেই অচল। অথচ এ' গ্রন্থের কতগুলি গল্পে এ' ভাষারই সাহায্য নিয়েছেন গদ্যকার। কথা বা চলতি ভাষার নির্দিষ্ট জটিলত্ব গল্প পাশাপাশি থাকার দরুন এ' কথাই মনে হয় যে সখীরবার ঠিক বেন যুঁকে উঠতে পারছেন না কোন পথে তাঁর চলা উচিত, কোন ভাষা গ্রহণযোগ্য। সঙ্গর গল্পের সঙ্গে সীমান্তর গল্পের তুলনা করলেই বোঝা

যা—ভাষার দিক থেকে বর্ণনামূলক গ্রন্থ গদ্যটির সাধু কতো বেনী। এ' ব্যাপারে সখীর বাক্যকে একটু তেবে দেখতে অগ্রহণ করছি। সঙ্গর ও উত্তরাংশ আদিক-জ্ঞে রসোত্তীর্ণ। নইলে এ' গল্প ছোটর বস্তুব্য ও কাহিনী খুঁই বাহুলী ও লাহারণ। এ' সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন বলেই হয়তো লেখক আদিক বৈচিত্রের আশ্রয় নিয়েছেন। পড়তে ভালো লাগাটা কাব্যক্ষেত্রে অসম্ভব স্তর হলেও, গল্প উপভাসের স্বগতে তা যোটেই সত্য নয়। তাই যে গল্পে আখ্যান বস্তুকে অস্বীকার ক'রে আদিকটাই বড়ো হয়ে ওঠে সে গল্পের ভালো লাগাটুকুও সামগ্রিক। সখিমী আদিকের জন্ত ভাববেন কেন? কল্পিত চরিত্র ও কাহিনীর সঙ্গে সমতা রেখে সে আপনি এলে ধরা দেবে। 'সান্তক' ও 'উজ্জ্বল' গল্প ছোটোও ভালো লাগলো। তবে পরিণতির বিবে লেখক যদি আরও একটু বস্তু নিতেন তবে এরা আরও স্পষ্ট হওয়ার সুযোগ পেত।

অথু, সব মিলিয়ে উত্তরাংশ একটি ভালো গদ্যগ্রন্থ। জটিলত্ব নয়, প্রতিশ্রুতি বাহী। নতুন লেখকের লেখা নিয়ে আলোচনা করতে গেলে সর্বপ্রথম ত্রুটি না পুঁজে, দেখতে হবে—সে রচনার ভবিষ্যত সম্ভাবনা কতখানি? পরিপূর্ণ perfection নিয়ে কোন লেখক প্রথম এগিরে আসতে পারেন না। বলতে কুঠা নেই—সখীরবার উত্তরাংশ আমাদের অনেকখানি আশা দিচ্ছে।

অরেন্দু চক্রবর্তী।



তুই বাংলা

বিশ্বের পথে গাছীতি ভারতবর্ষের বুদ্ধি-সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। ইতিহাসে বিশ্বের প্রথম ও শেষ কথা জনগণের অগ্রগতির পথে জনগণেরই অন্তর্নিহিত শক্তি ও কর্মোদ্ভব বড়নমূলক হওয়া। বহু যুগ ধরে মানাতরে নানাভাবে আনাহের মেনে বিপ্লব প্রতিহত হয়েছে প্রতি-বিলম্বী শক্তির কাছে। ভারত ইতিহাসের লক্ষ্যে রচিত হয়েছিল তাঁর গঠনমূলক কর্মতালিকার প্রতিটি অক্ষ। তাঁর আশা ছিল, জাতীয় সরকার হাতে পেল এ অজোক দিকে তিনি বিপ্লবকে রূপ দিতে পারবেন। কিন্তু বাংলার নিয়ে তিনি জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম করেছিলেন, ইংরেজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেও ইংরেজের ইতিহাসের শিক্ষা তাঁদের অভিজ্ঞত ক'বে রেখেছিল, আজও বেবেছে, অতিশক্তির পথই তাঁরা চিনেছেন, বিপ্লবের পথ চেনেন নাই—গঠনমূলক কর্মপন্থার বিনিময়ী শিক্ষা, অজুত নিষারণ, হিন্দু মুসলমানের মিলন প্রভৃতি কথাগুলিকে তাঁরা প্রাণহীন বস্তুর মতো আঁড়ে গেছেন, এসবের বিপ্লবী স্বরূপ তাঁদের চোখে ধরা পড়ে নাই। জাতীয় সরকার হাতে পেরেও তারা ব্যুরোক্রাসির কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছেন, গঠনমূলক কর্মতালিকারও যে অর্থে বড়োটা পছন্দ হয়েছে, তাকে রূপ দেবার কাজও তাঁরা ব্যুরোক্রাসির হাতে প্রভু করেছেন। ব্যুরোক্রাসি সর্বত্র অসৎ নয়, কিন্তু যেখানে তাঁরা সাত্ত্বিক সং, সেখানেও তাঁরা নিজেদের স্বার্থে বিপ্লব বিরোধী না হয়েই পারে না, স্বভাবতই তাঁরা স্থিতিশাপকতার (status quo) পক্ষপাতী। জনসাধারণের কাছে তাদের কথা হ'ল—তোমাদের সেবার কাজ তোমরা করবে

কেন? তোমাদের সে অধিকার নেই, তাঁর অস্ত্রে তো আঘাতই রয়েছে। আমাদের জাতীয় পরিচয়নাও সেই ভাবেই উপর থেকে চাপানো হচ্ছে। বাইরের আর্থিক সাহায্যকে জনগণের নিজস্ব শক্তির চেয়ে বড়ো করে দেখা হচ্ছে—অর্থ আকর্ষণ জাতীয় নেতৃত্ব সেই মূলে গড়ে উঠেছেন—বার শিক্ষার প্রধান উপাদান ছিল চরখা—স্বাধীনতার প্রতীক।

অপ্রাসঙ্গিক হ'লেও কথান্তরিত আজও বার বার পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন আছে। বর্তমান প্রসঙ্গের ভিত্তর আসে গঠনমূলক কর্মতালিকার অন্ততম অঙ্গ—হিন্দু মুসলমানের মিলন। জাতীয় আগরণে হিন্দু নেতৃত্ব করছিল গত শতাব্দীর বহুভাগ থেকে। মুসলমান পিছিয়েই ছিল। তারপর গাছীতি স্বখন বার বার বলতে লাগলেন, হিন্দু মুসলমানের মিলন না হ'লে দেশ স্বাধীন হবে না, জাতীয় জীবনে মুসলমান তাঁর নিজের পার্বকতা দেখতে পেল, সে যেন সারাজের বাহ্যিক বোধ থেকে মুক্তি পেল, গর্বোদ্ধত হয়ে উঠলো তাঁর শির, বহু যুগের নিষিদ্ধ জীবনে আগরণের বিরূপ চাক্ষু্য খেলতে লাগলো। এর ছ'বকম ফল কলসো। নেতৃত্বানীর মুসলমান বাঁচা কখনও ইংরেজ রাজত্বের অবসান কল্পনা বা কামনা করেন নাট, বরং নিজেদের স্বার্থে পৃথক নির্বাচন গ্রহণ দাবী করেছেন বা সান্নিধ্যবাদের প্রয়োজনার গ্রহণ করেছেন, দর্পের দ্বাবে তাঁরা নিজেদের জাতীয়তা-বিরোধী নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুযোগ পেলেন। অপর দিকে বিপ্লব-বিরোধী জাতীয় স্বাধীনতা কাহীর হল মুসল-মানের প্রথম আগরণ-চাক্ষু্যের আভিনব মেখে বলতে শুরু করলেন, আট কোটি মুসলমান ছাড়াই ভারতবর্ষের

স্বাধীনতার সংগ্রাম চলতে পারবে। এই দুই প্রতি-
 বিপ্লবী শক্তির মধ্যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সাম্রাজ্যবাদের
 অভিসন্ধিই সাক্ষ্যের দিকে গেল। পৃথক নির্বাচনেরই
 চরম ফল হিসাবে পাকিস্তানের দাবী উঠলো। এবং
 বিপ্লবোত্তেজনা বড়ো গভীরতা ও বিস্তৃতিলাভ করলো,
 বিপ্লব-বিরোধী দাবী ও সংঘাতও ততো অচ্যুত হতে দেখা
 দিল। এ সমতায়ও বিপ্লবী সমাধানই পাকীকি করলেন—
 ১৯৪২ সালে ক্রিপস্ প্রস্তাব যখন বার্ষিকার পর্ববসিত হ'ল,
 তখন কংগ্রেস ওরা কিং কনিট গভীকি প্রেরণার প্রস্তাব
 করলো, দেশের কোনো অংশের অধিবাসীরা যদি স্বাধীন
 পৃথক রাষ্ট্র গঠন করতে চায়, তা হ'লে তেমন রাষ্ট্র গঠন
 করার অধিকার তাদের মেনে নেওয়া হবে। এ প্রস্তাব
 যদি এমনভাবে দেশ গ্রহণ করতো, তা হ'লে দেশের
 মুক্তির হুন্ডা হিসাবে হযতো দেশ বিভাগও হ'ত না।
 আর হ'লেও, এক আশ্রয় বিষয় ও নির্ধর হত্যাকাণ্ড
 হানাহানির ভিতর দিয়ে হ'ত না, যার ফলে লক্ষ লক্ষ
 সরসারী আত্ম গৃহহৃত, সর্বস্বহারা, সহায়সম্মলআশ্রয়
 পরিবেশহীন, অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে অপলক চেরে
 চেরে শিথিলরাষ্ট্র, উদ্বাস বা প্রায়োদ্যাদ। কিন্তু বিপ্লব-
 বিরোধী শক্তি সেদিন এক বিকে বেইন জগৎ নারায়ণ
 জাল প্রস্তাব দিয়ে অথও ভারতের দাবীকে অসচিহ্ন
 উত্তেজনার ভরে তুললো, প্রতিজ্ঞার অপর দিকের
 বিপ্লব-বিরোধী শক্তিও তেমন পাকিস্তানের দাবীকে
 প্রচণ্ড ক'রে তুললো, গাকীকির বিপ্লবাত্মক সমাধান দুই
 প্রতি-বিপ্লবী শক্তির মধ্যে ভিতর অন্তর্লে জুবে গেল।
 স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে বেশ দুই ভাগে বিভক্ত হ'ল—
 ভারত ও পাকিস্তান।

ব্রিটিশ পালিরায়েন্টারি ডিমেজাক্সির অঙ্গকরণে
 দুই বিকেই দেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব এবং তাঁদের
 ভিতর থেকে মন্ত্রীরা দেশ শাসনের ভার পেলে। কিন্তু
 বিশেষজ্ঞ ও উপদেষ্টা হিসাবে দুই দেশেই শাসনকার্যে সর্বময়
 হয়ে উঠলো বিপ্লবের সেই চিরশক্ত ব্যুরোক্রেট বা
 চাকুরার দল। ভারতবর্ষে শুধু কংগ্রেস ছিল, কংগ্রেসের

ও নেতৃকির একটা আদর্শনিষ্ঠা ছিল—সে আদর্শনিষ্ঠা
 খুব খুগের প্রতিবিপ্লববিপ্লব বিপ্লবী জাতির জীবনে
 গাকীকির বিপ্লবাত্মক নীতির অঙ্গসম্পন্ন করে নাই, জন-
 গণের জীবনে আত্মপ্রত্যয় ও আত্মশক্তির বজা বইরে
 দেবার প্রেরণা পায় নাই, বরং পালিরায়েন্টারি ডিমে-
 জাক্সির আদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে সেই বিপ্লবাত্মক নীতিকে
 প্রাণহীন ক'রে ছেড়েছে— শুধু কংগ্রেসের সেই আদর্শ-
 নিষ্ঠার ফলে একদিকে নানাবিধ পরিকল্পনার জনগণের
 প্রাসাচ্ছাদনের সমস্ত সমাধানের চেষ্টা উপর থেকে বস্তুত্ব
 হ'তে পারে তাই হচ্ছে, অপর দিকে সেই আদর্শনিষ্ঠা
 —এটা হিন্দুর দেশ, মুসলমানের এখানে স্থান নেই—এই
 বয়ণের প্রাথমিক দিক বা প্রাথমিক বয়সের দিকের
 হচ্ছে দমন ক'রে চলেছে। কিন্তু পাকিস্তানের কথা
 আলাদা। সেখানে কোনো আদর্শবাদের কোনোভাবেই
 কোনো স্থান ছিল না, আজও নেই। পাকিস্তানের শুধু
 জিন্না সাহেবের একটা ব্যক্তিগতপ্রবণ, অনমনীয়, শক্তি-
 শালী, বিরাট ব্যক্তি ছিল—যার কাছে হরতো বর্তমানের
 অনেক ক্ষুদ্রতা বাণী তুলবার সাহস রাখতো না। কিন্তু
 কোনো রকম মহৎ পরিপত্তির সম্ভাবনা আজ সেখানে
 হইলে-হইতে-পারিত-র বাতো চির-অস্থিহিত। ওখানকার
 বর্তমানের নীতিবিধাতা বাজা নাকিমুদ্দিন সাহেবও
 ইংরেজ আমলের ব্যুরোক্রেটের হাতে তৈরী। কাজেই
 শুধানে ব্যুরোক্রেট বা চাকুরার দলের ক্ষমতা
 অপ্রতিহত। তারা বিপ্লবের তো ধার ধারেই না,
 জনগণেরও না। তাদের কাছে নিজেদের স্বার্থই মুখ্য,
 এমন কি, রাষ্ট্রের স্বার্থও গোপ। এই ব্যুরোক্রেটদের
 আবার শিক্ষালীকা সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষ ভরে :
 কাজেই, হিন্দু স্বার্থ আলাদা, মুসলমানের স্বার্থ
 আলাদা এটা দুটি আলাদা প্রবীর জীবন—এই ভাবেই
 এরা সব জিনিষ বেগতে অত্যন্ত। তির সম্ভারদের
 প্রতিএরা সম্পূর্ণ নির্বন। এদের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই
 পরিপূর্ণ মনের মিল হয়েছে মুসলিম লীগের নিরন্তরের
 অগণিত বিচারবুদ্ধিহীন স্বার্থক অনিশ্চিত নেতৃকির।

বুরোক্রাটদের এরা সকল স্বৈকন স্বাধীনভাবে সাংঘ্য করছে, বুরোক্রাটরাও এদের সর্বস্বত্ব অস্ব উপায়ে নিরস্ত্রেণ্ডি থেকে নব্যশ্রেণীতে উঠতে সাহায্য করছে। এরোজনে বুরোক্রাটরা এদের দিয়ে বা খুসী ভাই করিয়ে নিতে পারে, এরাও সেই কারণে সব অস্ব কাঙ্কে নিরস্ত্র। এই ভাবেই রাষ্ট্রকাণ্ড চলছে। অনেক ক্ষেত্রে শিক্ষিত নেতারা, এমন কি, মন্ত্রীরাও এই সম্মিলিত শক্তির দাপটে ক্ষমতাহীন। পশ্চিম পাকিস্তানে হিন্দু মূলশ্রমিকের সমস্তা আর দেশবিভাগের সবে সজেই নিটে বার। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে এখনও যে প্রায় ২০ লক্ষ হিন্দু রয়েছে তাদের জীবন এক শ্রমিকের শাসিত হেয়ে রয়েছে, সভার গারে সহস্র কীট সংশ্রমেও টু'নলটি নেই। কিতাবে ওধানকার হিন্দুর জীবন দুর্বিহ হেয়ে রয়েছে, এই বিরোধণ থেকেই তার হেতু কতকটা অস্বয়ণ করা যাবে। এমন পূর্ববাংলার আতীর জীবনে কোনো রকম সংকট দেখা দিলেই, শাসনকর্তাদের স্বার্থাধেবী নীতির কোনো রকম প্রতিবাদ হলেই, স্বর্ধনীতি বিরাস্তপথে চলে জনসাধারণের জীবনযাত্রা হুহু হুহুয়ন করে তুললেই হিন্দুবিধেবী বুরোক্রাটরা ঈশ্ব অঙ্লীর ইস্যভার দেখিয়ে দেয়, হয় হিন্দু দারী, নরতো তারতবর্ষ দারী, আর তারতবর্ষ দারী হ'লেই হিন্দু দারী, কারণ, পূর্ব-বাংলার হিন্দু তো ভারতবর্ষেরই একটা প্রসারিত অংশ। এই ভাবে আজ পূর্ববঙ্গের হিন্দু তারতবর্ষের সদাচারণের অজ্ঞ প্রতিভূসিাবে পাকিস্তানের কর্মচারীসকলের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে জীবন কাটাচ্ছে।

কিন্তু এটা একান্তভাবে আজ আর হিন্দু-মূলশ্রমিকের প্রশ্ন নয়। দেশবিভাগের কালে বাংলাদেশকে বখন দুই পক্ষ ভাগ ক'রে দিল, তখন বিবদমান পক্ষ ছুটি বোহ হয় একথা ভুলে গিয়েছিল যে, বাংলাদেশটা ঠিক একটা লাউ বা কুমড়ো নয়। পিকার, সংকতিতে, সাবাসিক যোগে, স্বর্ধনীতিতে—সর্বপ্রকারে বাংলা একটা অখণ্ড সম্ভা—একধাটা এইভাবে বললে বেন মনের উপর দিয়ে কথাটা তেলে চলে যায়, দুই বাংলার ভিতরে যে বাড়ীর যোগ

ভাঙে টান পড়ে না। বাবা! পূর্ববঙ্গের শ্রী-বেকে হুংকট্টে সত্তে টাকা পাঠানে, আদরের ছেলটি কলকাতার ডাক্তারী পড়ে; পশ্চিম বাংলার ছেলে উপাধীন করে, তার টাকা গেলে বাশম্বারের পেটে, আর পড়ে—এসব শুধু হিন্দুর বেলার সজি নয়। হেয়েটি কলকাতার কলেজে পড়ে, ছুটিতে পূর্ববাংলার বাড়ীতে-বার, প্রোবের মেয়েদের নিয়ে ব'লে গল্প করে, আলোচনা করে, খায়া জীবনে একখানা রেলগাড়ীও দেখে নাই, তারা কতো কি দেখে জানে। পূর্ববঙ্গের পরিবার, জামাইটি কুটেছে হুশিমাবাদ জেলার। ভাড়াড়া, এগ্রাম-বেকে ওগ্রামে, বাগায়ে, শহরে বার কিছু তরকারী নিয়ে, গোচাকতো ধান নিয়ে, কিছু জালানি কাঠ নিয়ে, শুধিক থেকে হুগ কিনে নিয়ে আসে, কাপড় কিনে নিয়ে আসে—এমনি ক'রে লক্ষ লক্ষ লোকের জীবিকা চলে। হুগ হুগ ক'রে এমনি আদানপ্রদানের ভিত্তর দিয়ে যে অখণ্ডতা গড়ে উঠেছিল, দেশ বিভাগে তা ভেঙে গেল। তেলে গিয়েও বতোখানি যোগাযোগ স্বচশিট ছিল, সম্মতি পাগপোট আর ভিসা হয়ে ভাঙে গেল।

অখণ্ড বারা এটা করলো, অগণিত নমনারীর এই হুংখকটে তাদের কিছুই বার আসে না। নীমান্তের দরিস জনসাধারণ বাচুক আর মরুক, যে-বুরোক্রাটদের পরামর্শে এই পাগপোট ও ভিসা হয়েছে, তাতে তাদের একটি পরগাও হাইনে কমবে না বরং অযোগ্য আঞ্জীর বন্ধ অনেক পাগপোট আকিসে, ভিসা আকিসে বা ঢেক পোটে হুগদলা ক'রে যাবে। অ্যু, মন্দিরা! বুদ্ধিতর্ক সুববার যোগ্যতাও তাঁদের নেই, বুদ্ধতে গেলে মজিককে ও মরীরকে বতখানি খাটাতে হয়, তা খাটাতেও তাঁরা নায়াজ—না বুঝলেও মরীর তো থাকবেই! কেবল গব্বরের কাপড়ে বখন বিভূপ সমালোচনা হবে বা বাবস্থাপক সভার বখন প্রশ্ন হবে, তখন জবাব লিখে দেবার মতো একজন সেক্রেটারী বা বুরোক্রাট থাকলেই চলে যাবে।

এখন প্রশ্ন—কর্তার স্বার্থে, কেন এই পাগপোট ও

ভিনা? ব্যারোক্রাট হিসাবে আজ যারা পূর্ববঙ্গের জাগোবিধাতা, তাঁদের প্রধানের সবাই পশ্চিমের আমদানী। 'বাংলাভাষার মাধ্যমে যদি রাষ্ট্রের কাজ চলে তাঁরা বেকারদার পড়ে যান, উর্দু মাধ্যমে কাজ চলে অমৃত: বাঙালীর প্রতিবোধিতা থেকে অনেকখানি বেঁচে যাওয়া যায়। কিন্তু বাঙালী মূলসমান্যতা তো লেগাপড়া নিখে উঠছে; পাকিস্তান হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের উজ্জ্বলতাও জেগেছে। তা'রা দিয়ে তাদের একদারকার ফেলতে চাইলে চলবে কেন? তাই এখন উর্দুকে পূর্ববঙ্গেরও রাষ্ট্রভাষা করা হবে বলে মন্ত্রীদেব সুখ দিয়ে এজার চালালো হ'ল, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ কিন্তু হ'রে উঠলো। আর, এটা শুধুই একটা মূল স্বার্থের ব্যাপার নয়। বাংলাভাষা বাংলার হিন্দু মূলমান চুরেরই শুধু বারের ভাষা নয়, একটা গৌরবের ভাষা। হিন্দু মূলমান সবাই মিলে এতাবাকি অনেক শুন ব'রে এমন ক'রে গ'ড়ে তুলেছে যাতে এতাবা আজ বিশ্বের সববারে স্থান পেয়েছে। এতাবা আজ এতখানি সবুজ বে, সাধারণত: এর সঙ্গে অস্ত্র বেশব ভাঙ্গা প্রতিযোগিতা করতে আসে, তাদের দৈন্তে বাংলার হিন্দু-মূলমান সবাইই সমান করণ্য উল্লেখ করে। বাংলায় এই গৌরব শু পর্বকে রক্ষা করতে এখানকার হিন্দু-মূলমান সমানেই পুচলংকর। সেই সংকল্পকে যখন বন্ধুদের ভগিতে ধাবিরে রাখার চেষ্টা হ'ল, পূর্ব বঙ্গের মূলমান সমান উত্তেজিত কিন্তু হ'রে উঠলো। ব্যারোক্রাটদের করণ্যর অতীত বিরোধের অনল জ্বলে উঠলো—এমন কি সরকারী আকিসের আভিনার পর্গর। ব্যারোক্রাটরা এটাকে একটা হুঁষণ হিসাবে গ্রহণ করলো। তাদের গুজবী ইচ্ছিত করলো হিন্দুদের প্রতি, আর তাদেরই শিতা হুঁকে মন্ত্রীরা বললেন, ভারতীয় চর এসে পূর্ববাংলার শান্তির সংসার ভাঙছে। শিক্ষিত বাঙালী মূলমান একজনও একথা বিবাস করলো না। কিন্তু মন্ত্রীদের বিশ্বাস না ক'রে উপায় নেই, তাঁদের তো চাকরী বজায় রাখতে হবে!

ভারতীয় চর এসে যখন উপদ্রব সৃষ্টি করছে, তখন ভারত থেকে আসা বাঙালী বন্ধ ক'রে দাও, পাসপোর্ট ও ভিনা প্রথা প্রবর্তন কর। মন্ত্রীরা বললেন, তথ্য। তাঁদের তো কোনো ক্ষতি হবে না। তেমনি ক্ষতি হবে না এম, এল, এ, ও এম, সি, এ-বেহ, তাঁরাও বললেন, তথ্য। অস্ত্রের প্রাণ খলে পড়লো হাজার হাজার ধর্মিত মূলমানের আর তাদের শিতা পুত্র-কন্তাদের হাত থেকে।

পূর্ববাংলার ধর্মিত জনসাধারণের এই দুঃখে মিনীড়ন শুধু কি এই পাসপোর্ট আর ভিনা প্রথা প্রবর্তনই? এতো চলছে আজ কর বছর ধ'রেই। কমনওয়েলথ রাষ্ট্রগোষ্ঠীর অস্ত্রার রাষ্ট্র যখন মুদ্রাবুল্য হ্রাস করলো, পাকিস্তান করলো না। বিতর্ক অর্থনীতির বিক থেকে পাকিস্তান টিক করলো কি, করলো না, সে বিচার অন্যর; কারণ বিতর্ক অর্থনীতি দিয়ে দুনিয়ার বাজার চলে না। পাকিস্তানের অর্থনীতি ভারতবর্ষের অর্থনীতির সঙ্গে অকালী জড়িত এবং পার্শ্বব সম্পদের দিক থেকে পাকিস্তান ভারতের ভূগমার ধর্মিত। সে ক্ষেত্রে ভারতের অর্থনীতিকে উপেক্ষা ক'রে পাকিস্তানের অর্থনীতি চলতে পারে না। কিন্তু মুদ্রাবুল্য হ্রাস করা আর না করার কলে দুই রাষ্ট্রের অর্থনীতিতে যে বৈষম্য দেখা দিল তাতে পাকিস্তান গ্রহণ কিছুদিন (কোরিয়া যুদ্ধের কল্যাণে) লাভবান হলো আজ সে এক চরম দুর্গতির সামনে। তার অবশিষ্টপ্রার ট্যাগিং ভাঙার, তার ব্যবসারে প্রচণ্ড ক্ষতি, রপ্তানীর মূল্যের চেয়ে আমদানীর মূল্যের ক্রমবর্ধিত আধিক্য—এসবের কথা এখানে বাহ দিই। শু পূর্ববঙ্গেরই যে ক্ষতি হয়েছে, তাই এখানে বিচার। পূর্ব বাংলা বাংলার অর্থস্রু পাট উৎপাদন করতো, পশ্চিম বাংলার কলে সেই পাট পাওয়া বলে পরিণত হয়ে রপ্তানী হ'ত, বিশেষ লেকে কোটি কোটি টাকা আসতো, পশ্চিম বাংলার শ্রমিক ও পূর্ব বাংলার কৃষকের পেটে ধানাপানি পড়তো। দুই বাংলার অর্থনীতির ভিতর সেমন চিড় দেখা দিল, অমনি হঠাৎ

এ ব্যবস্থা ভেঙে গেল, পূর্ববঙ্গ নিদারুণ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন হ'ল। পাকিস্তানের সংবাদপত্রগুলির এবং কবজার জাতীয় ব্যক্তিদের প্যারাম্পরিক বশের ভিতর দিয়ে ক্রমে প্রকাশ পেল, পূর্ববঙ্গের পাটের চাষ ও ব্যবসায়কে রক্ষা ক'রে সমগ্র পূর্ববঙ্গকে চরম দুর্ভিক্ষের হাত থেকে বাঁচাতে তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী মিঃ গোলাম মহসন প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বুকেছিলেন, পূর্ববঙ্গের পাটের প্রধান খরিদদারকে হাতছাড়া করা চলে না। কিন্তু ব্যারোক্রাটের দলে পরিবেষ্টিত একজন পূর্ববঙ্গবাসী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর বিরোধিতাভেই মিঃ গোলাম মহসনের সে চেষ্টা ফলশ্রুতি হয় নাই। আরও প্রকাশ পেল, অতি অল্প সংখ্যক, প্রধানতঃ একজন অবাঙালী শিল্পপতির বার্ষিক এই পূর্ববঙ্গীয় মন্ত্রী সমস্ত পূর্ববঙ্গবাসী পাটচাষীকে চিরকালের মতো দারিদ্র্যের অতল গল্লবে ঠেলে দিয়েছেন। শুধু পাটচাষী কেন, পাট গেল তো সমস্ত পূর্ববঙ্গই বন্যভূমে গেল। বলতে গেলে, পূর্ববঙ্গ পাটই পূর্ববঙ্গের সকলের দরে অর্থসময়ের একমাত্র উপায় ছিল, তারপর, আর সাবাস্ত্য পরিমাণে ছিল ম্লপারি ও মাছ। পূর্ববঙ্গের বাইরে থেকে আসের মতো সমস্ত ব্যবসায়ই আজ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। সে প্রধানতঃ ঐ একজন অবাঙালী শিল্পপতিরই বার্ষিক। ঠাঁইর বার্ষিক তারতের সঙ্গে পাকিস্তানের এই অর্থনৈতিক দম। এই সব শিল্পপতি, এই সব মন্ত্রী, এই সব ব্যারোক্রাট—এঁরা কিছু বা মূলমান তবু নিজেদের বার্ষিক বতোহুই প্রয়োজন ভতোহুই। নিজেদের বার্ষিকিছির জন্তে প্রয়োজন হ'লে কোটি কোটি অর্থসময়ের বার্ষিক বলি দিতে এঁরা কোনো দিকে দৃষ্টিপাত করবেন না। আজ পূর্ববঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ব্যারোক্রাটের দ্বারা উপস্থিতি হয়ে সমস্ত চাষী সম্প্রদায়কে বলছেন, পাট বোন: কবিরে দাও, বন্ধ করলেই ভাল, তার পরিবর্তে খাদ্য চাষ কর। তাত হাঁথ আর খাও। অর্থসময়ের অর্থনীতিতে কিবে খাও। সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানের শিক্ষামন্ত্রী বলছেন, আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজন কি? প্রাচীনগণী শিক্ষাই বশেষ। আর

ব্যারোক্রাটরা বলছেন, পাকিস্তানের দরকার জানালো সব বন্ধ কর, লোক চলচল যেন না হয়। তারতবর্ষের তথা আধুনিক জগতের শিক্ষা দীক্ষা, জগৎপের আলো হাঁওরা যেন পূর্ববঙ্গে না ঢোকে—করজন শিল্পপতিই দেশের মালিক হয়ে বাবু, আর মন্ত্রী আর ব্যবসায়ী বতদিন পারি হবে রাজস্ব চালাই।

কিন্তু বাংলার এই কি নিরতি? অতিমানী, আগ্রহ-বাঙালী জাত কি এই ব্যবস্থাই যেনে নেবে? বাংলার যে বিপুল আগরণ-চাকল্যে সমগ্র দেশকে স্বাধীনতার সংগ্রামে ব্রতী করেছিল, সেই বাঙালী জাত কি আবার প্রতি বিপ্লবের চাপে শিবে, ভাঁড়িয়ে অকলুষ হয়ে বাবে? মাহব নিয়ে বেশ, মাহ্বেবের পক্ষিই দেশের প্রধান সম্পদ, আজ পশ্চিমবঙ্গ নাকি এই মাহ্বেবেরই জারে ভেঙে পড়েছে! আজ নবগন্ত মাহ্বেবের প্রতি সেখানে অব্যাহিত আগবের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে—বলা হচ্ছে, এত মাহ্বেবের তার বইবার শক্তি পশ্চিম বাংলার দেই। এমন প্রাচীন যুগের অর্থনীতির কথা, প্রতি-বিপ্লবীর কথা। দুনিয়ার মাহ্বেবের সংখ্যা খেড়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সে তার জীবিকা অর্থনের পথকেও প্রশস্ত, ক্রত করে ফুলেছে, কেবল সমাজের প্রাচীন কাঠামো বৃষ্টিমেয়ের বার্ষিক সেই পদ্ধতিতে সর্কীর্ণ ক'রে রেখেছে। একদিকে পশ্চিমবঙ্গের প্রতিবিপ্লবী শক্তির এই যুগবিশেষী বৃদ্ধি প্রায়শ, অপর দিকে পূর্ববঙ্গে করেকটি লোকের বার্ষিক বন্ধকটোর রাখকীর শক্তির বৃদ্ধি বারিহো অগণিত লোক যিনের পর দিন জর্পীর্ষ কংকালদার হয়ে যাচ্ছে, শিক্ষা দীক্ষা জগৎপের অপরবে নিশ্চিষ্ট হচ্ছে। এই বাংলাকে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের দিনে আরও একবার বিখণ্ডিত ক'রে এমন নিশ্চিষ্ট করার চেষ্টা বতোছিল। সেদিনের দুনিয়া আজকের মতো এমন ক'রে বিপ্লব-চাকল্যে বহিত হয়ে ওঠে নাই, দেশের আগরণও এমন ক'রে নিরতম করে পৌছায় নাই। সেদিনকার বাঙালী জাত সেই প্রতিবিপ্লবী শক্তিকে লাকলোর সাথে বাধা দিয়ে-

ছিল, বিখ্যাত বাংলা আবার যুদ্ধ হয়েছিল। আর আজ সেই বাঙালী জাতই আজকের প্রতিনিধিত্বী শক্তির হাতে হুইয়েরেয়ার স্বার্থে ধরাবন্ধ থেকে ভিলে ভিলে অবলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সরকারের যুদ্ধের দিকে চেয়ে থেকে বাঙালী জাত তার বর্তমানের নিরাক্রম সমস্তার কোনো সমাধানই খুঁজে পাবে না, আজ জাতের ভাগ্যে জনগণকেই নিজ হাতে তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে হবে। বিপ্লব নদী সমুদ্র পর্যন্তের সীমারেখাকেই খনন ক্ষত অতিক্রম করে চলেছে, তখন শিক্ষা দীক্ষা, সমাজ, ইতিহাস, রাজনীতির সহস্র বন্ধনে যুদ্ধ বাংলাই কেবল বিচ্ছিন্ন থেকে ভিলে ভিলে মরবে? এ খুঁজ করে এক হবার কথা নয়, আক্রমণ করে এক হবার কথা নয়,

রাজ্য কেড়ে নিয়ে এক হবার কথা নয়, এর ভিত্তির প্রতিহিংসা প্রতিশোধের কথা নেই, অর্থনৈতিক অববোধ্যের কথা নেই, আছে বিপ্লবী মিলনের কথা। এ মিলন সৃষ্টি করে, ধ্বংস করে না, এ মিলন মানব জাতের নতুন ইতিহাস রচনা করে, বিবেচ্য ভুলে গিয়ে একে অপরকে বড়ো করে নিয়ে বড়ো হয়, পরস্পরের সাহায্যে সাহচর্যে নতুন সমাজ গড়ে তোলে—যেখানে সকলেরই স্থান আছে, সকলেই সকলের সঙ্গে সমৃদ্ধি সৃষ্টি করে, এক শিক্ষা দীক্ষার ধ্বংসস্থলের উপর যেখানে কোনো শিক্ষা দীক্ষা গড়ে ওঠে না, সমগ্র মানব সমাজ থেকে শিক্ষা দীক্ষার উপাদান কুড়িয়ে ভবিষ্যৎ মানবের মহত্তর শিক্ষা সজ্যা গড়ে তোলে।

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩৩ নং নেতাজী স্ট্রাভ রোড, কলিকাতা-১

হু'লফেরও অধিক টাকার দাবী মিটানো হইরাছে
তারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এজেন্সী ও সংগঠন অফিস আছে

মাস্তাজ অফিস—

৪০বি, সেকেন্ড লাইন বিচ্

যুক্তপ্রদেশ অফিস—

১৭৪, মুনিগড়, এলাহাবাদ

আসাম অফিস—

মঙ্গা আগাম

ছোটনাগপুর অফিস—

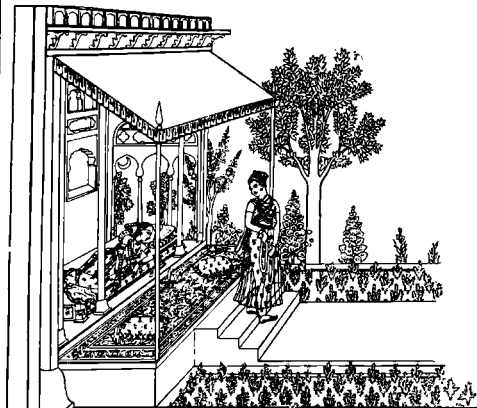
বেন রোড, রাঁচি

চীফ এজেন্ট :—ত্রিবাঙ্কুর
মিঃ এম, ডি, বর্জ

চীফ এজেন্ট :—মালাবার
এন, এ, বহাদুর

চীফ এজেন্ট :—পূর্বপাঞ্জাব
কুমার এণ্ড কোং, দিল্লী

গ্রীসবর্তী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আপার সাকুলার রোড হইতে প্রথমবার চক্রবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এবং 'মহিলা' কার্যালয় ৩২নং আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।



কতৃচ্চক্রেব বিভিন্ন বর্ণ-সম্মারোহই তৎ নম, দিন-
হাদিনীৰ প্রীতিটি প্রহরের সঙ্গে সন্ততি য়েথ নর
সংযোজন। ভারতীয় সঙ্গীতের একটি চিত্রাচবিত
বৈশিষ্ট্য। বিশেষ বিশেষ সময়ে বা পরিবেশে
মাত্রই তার স্ব-স্ব, দুঃখ-বেদনা বাধ-বাদিনীর
মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

ভারতীয় সঙ্গীতের এই ভাবধারাটি হৃৎহৃৎ ধরে
শিল্পী রাগ বাদিনীর নানা সৃতিতে রূপায়িত
করেছে। দিনরজনীর বিভিন্ন পরিবেশে স্ব-স্বষ্টির
আবেগনটি এই রূপায়নে মূর্ত হয়ে আছে।

চা

সঙ্গীতের সঙ্গেই চায়েও রূপধারাট অনেক দেরিতে জেরপায়
উৎস। কিন্তু চায়ের তল-প্রস্থে দিনকালের সাধ নিষেধ নেই।
যে-কোন সময়ে, যে-কোন সময়ে চা যন্ত্রণাকে আনন্দ দিয়েছে,
সম দিয়েছে, দিয়েছে নম নম জেরপায়।

গোপন

প্রভাতের একটি স্নানিত
বাদিনী। উপরের আলোখাটি
তারই রূপায়ন। দিবা শু বাতির
চিত্র-বিরহমধুর সঙ্কীর্ণগতি ললিতের
মুহূর্তায় মূর্ত হয়ে আছে।

সেইদিনেই বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত

—সুন্দর—

পঞ্চদশ বর্ষ

পৌষ—১৩৫৯

নবম সংখ্যা

সুন্দর জার্মেনী

ঐক্যগল্প ও

ভোমার চিঠিখান। ভূপেনের চিঠির সঙ্গে আজ পেশাব। বার্ষ থেকে তা redirected হয়ে এখানে এসেছে। ভূপেনের ৩ ও ৪ তারিখের চিঠি আজ পেশাব। হঠাৎ ওর operation এর বর পেরে মন্টা ভাল লাগছে না। কথবিনের চিঠিতে এই লম্বা কিছুই ছিল না; তাতে মনে করেছিলাম হরত আরও কয়েক দিন দেবী হবে। ১৬/১৭ তারিখে ববি operation হ'ত তবে আমি লওনে নিয়মিতভাবে থবর পেতাম। এখন ত আমার গতি একেবারেই অনিশ্চিত; কোণার এবং কভবিনে যে থবর পাব তাও জানি না। হরত ভয়ের কোন কারণ নেই; ভোমরা সবাই আছে—তার উপর আমি খেবেক যে খুব বেশী কিছু করতে পারতাম, তা নয়। তবুও ঠিক এই পরিস্থিতিতেই আমি রোজ রোজ হুদ পড়িবর্তন করব এটা ভাল লাগছে না। এই চিঠির জবাব দেবে এই ঠিকানায়—A. C. Guha, M. P. (India) Delegate to the Conference for World Government, Bedford College, Regent Park, London N. W. 1 England, কাণ আমি এখান থেকে বেরছি;—জুরিখে (Zurich), ২ দিন থেকে জার্মানী বাব। ৪৫ দিন সেখানে থাকব; তার মধ্যে যে কটা স্থান

পারি খুব। জুরিখে এক ভ্রমণের বাড়িতে অতিথি হয়ে থাকব; জার্মানীতেও অতিথি হিসাবেই কয়েক স্থানে থাকব। আমার সঙ্গে একটি বুক আছে—সে জার্মান জানে এবং ইংরেজী জানে—জাতিতে সে Norwegian এবং জার্মানীতে অনেক দিন বাব আছে। জার্মানীর industrial area সে আমাকে খুঁজিয়ে দেখাবে এবং প্যারীশে লম্বা করে নিয়ে যাবে। সেখানে M. R. A.র এক আড্ডা আছে; সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে।

এদের এই কো'র আড্ডা একটা দেখবার মতো জায়গা। প্রথমত প্রাতিষ্ঠিক বৃত্ত হিসাবে খুব চমৎকার। Lake of Genevaর উপর ৩০০০ ফিট উঁচু এই স্থানটা; যে বাড়িটাতে আছি—সেটা আবার একটা জোট পাহাড়ের উপর। এই Lake বা ভ্রমের তিন পাশ দিয়ে নানকরা কয়েকটা জায়গা। Geneva ত বিখ্যাত শহর, তা ছাড়া Lausanne, Vevey, Montreux, Caux প্রভৃতিও বেশ নামকরা। বিদেশী ধনী ভ্রমণকারীরা এসব স্থানে বেড়াতে আসে। রাজে এই ভ্রমণের চারিদিকে খিচুড়ির আলো জ্বলতে থাকে। চারিদিকে বগা ঠিক হ'ত না;—এই ভ্রমণের তিন দিক হ'ল Switzerland, এক দিক হ'ল

France। সে দিকটায় বেশী জন্মবসতি নাই; কাজেই বিদ্যাস্তের আলোও তেমন নাই। এই তিন দিক দ্বায়ে দেখলে মনে হবে ত্রুটি দীপ-মাণ্ড: গলার পরে আছে। এই ত্রুটির মধ্যে একটা ছোট দীপ আছে। আবার ঘর থেকে বা আবার নবর রাত্র: থেকে দেখে মনে হবে বেশ ভালের মধ্যে একটা পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। গর বিদ্যুতি হ'ল যাত্রা নাকি ৩৫ কোয়ার ফুট বা কোয়ার গজ। গুনটি এটা নাকি হুইজারল্যান্ড ইংল্যাণ্ডকে দান করেছিল—বোধ হয় মহারাষ্ট্রি তিক্তোত্রিহাকে। কাজেই এটা এখনও নামে ইংরাজের সম্পত্তি, কিন্তু কিছুই করতে পারে না—এবং ওতে কোনই কাজ হয় না। কোন প্রকলও সে নেয় নি।

এই বাড়িটাতে ১০০০ লোক থাকে ও থাকে। স্থায়ী বাসিন্দা হ'ল—প্রায় ৪০০, আর বাকিরা আনাদের যতো আসে ও যায়। প্রায় সব দেশের লোক এখানে আছে। খুব শিক্ষিত ও অবগুণার লোক এবং একেবারে প্রমিক বা labour শ্রেণীর লোক একই সঙ্গে থাকে, বসে ও থাকে। এমনকি নিগ্রো (Negro) অনেক আছে—ভারতও কোন পার্বত্য অসুখ করে না। এখানকার পাকের ঘরে, খাবার ঘরে এদের গানের দলে (chorus) এবং আরও বহু ক্ষেত্রে বহু নবের কাজ করে। এরা প্রায় সবাই ২০টা ভাষা জানে, অনেক ভাল ঘরের এবং ভাল অবস্থার। খুব সাধারণ সাক্ষ্য-পোষাক ও কট্টন জীবন এসেছে। খুশে ও নখে রঙ লাগানো এখানে নাই। খাবার tableও বদ এমনি দেওয়া হয় না—তবে কেউ চাইলে পারে। কিন্তু কাউকে নব চাইতে বা খেতে দেখিনি। হোজাই সেবতাম—আবার ঘর, commode, bath tub, বিছানা, জুতা—সব কিছু দ্যাক ও পরিষ্কার করে রেখে যায়। কে করে জানতাব না। একদিন আমি একটু অগনয়ে ঘরে ছিলাম; একটি ঘরে ২০টা brush, বালতি প্রভৃতি নিয়ে আমার ঘরে এল। আমি ঘরে আছি রেখে বলল—একটু পরে আসবে, আমিও একটু পরে বেরিয়ে

যাচ্ছি; ঐ ঘেহেটি আবার এল। দরজার বইয়ের পাড়িরে গর সঙ্গে আশাপ করলাম। ফরাসী ঘেরে—বেশ পরিষ্কার ইংরাজী বলে। দেশে শিক্ষকের কাজ করে, বেশ হুশী ঘেহেটি; এসেছে শায়খান, ঘানের tub প্রভৃতি পরিষ্কার করতে। খুব সফোচ ও লক্ষ্য বোধ করলাম, সে বলল, “এ ভ হ'ল সেনা, এলব শু আবার করা কতবা।” আমি বললাম—“সে ভ বা তোমার দিককার কথা; কিন্তু আমি কোন অবিকারে এসব তোমার কাছে গ্রহণ করছি?” সে তাতে জবাব দিল না। আমিও চলে সেলাম—নিজকে একটু ছোট মনে করে।

এখন বহি তোমাদের বলি, নিজেদের বাড়ির পার-খানটা পরিষ্কার করে—বিশেষ করে তোমাদের ওখানে যেখার নাই—অন্য দি তোমরা কৌল করে উঠবে। অ্যাং, বেগরের কাজ করতে বলছে। কিন্তু না, এদের সব মধ্যে সত্যিই তোমাদের কথা ভাবি—এমনভাবে শুদ্ধিয়ে এত কাজ এবং তার উপর লেখাপড়া, গান প্রভৃতির চর্চা আনাদের যেহেঁরা বেশ পারে না। রাস্তা ও লোককে খাওয়ারো ছাড়া কোন কাজেই যেন কচি নাই। থাক ওসব কথা।

কাল রাত্রে প্রায় ১১টার সময় রুচ (Ruch)-এ এসেছি। ডুসেলডর্ফ এরোড্রাবে এসে নেনেছি ৮১২ মিনিটে এবং বার্লিন থেকে রওনা হয়েছি ৩২৬ মিঃ এ। ডুসেলডর্ফ এরোড্রাবে নামবার পরই একজন ভারতীয় এর ডিকালো করলেন—আগনি মিঃ ভর ? বললাম ইয়া। পরে বললেন, পশ্চিম জার্মানীর রাজধানী য়ু-বেকে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত তাঁকে পাঠিয়েছেন আমার অন্তর্ধান করার অজ্ঞা এবং যাতে আমি বন্দি যাই এবং তাঁর গৃহে একবেলা ভোজন করি, সেই আশ্রয় পাঠিয়েছেন। বার্লিনেও ভারতীয় প্রতিনিধি আছেন। কাল দুপুরে তাঁর ওখানে খাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু কোন কারণে খাওয়া হয় নি। সেজন্য তিনি কাল আসার সময় বার্লিন এরোড্রাবে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে যান। ভারপর-পূর্ব: নির্দিষ্ট একটি লোক গাড়ী করে আমার এখানে নিয়ে আসেন

—এরোডোব থেকে প্রায় ৪০ মাইল হবে। তখন প্রায় ১২১৪৪টি লোক দেখলাম। যে ক্রমবর্ধনের সঙ্গে দেখা যাত ১১টা। আমার অস্ত্র খাবার বেখে দিয়েছিল; তাড়ই ছিল, কিছু খেলায়। এখান থেকেই কাল গাড়ী নিয়ে গিয়েছিল।

এখনই মান করতে যাব। তারপরই যের হ'ব—এখানকার কয়লায় খাদ ও লোহার কারখানা দেখব এবং লোকদের সঙ্গে আলাপ করব। আর কিরক যাত ২-১০টার সময়। কাবেই চিঠি আজ আর শেষ হবে না; কাল তোরে যদি শেষ করে post করতে পারি, তার চেষ্টা করব। মান করতে বাচ্ছি এখন।

এইমাত্র মান করে এলাম। এদিকে এটা বহা আরামের, এবং রাত্রি ও অবশ্যই ঘুমাতে পকে বস্ত্র ভাল। বস্ত্র বড় sub, গরম জলের tap খুলে তা তরে নিয়ে তাতে ২০৩০ মিনিট শুয়ে থাকি। বনে ছব্বলীয়ে সব মানি তাতে বেরিয়ে যান্বে। এই সব আরামের অভ্যাস হচ্ছে—তাই ত প্রথম চিঠিতেই লিখেছিলাম—তোদের বেশের কথা হয়ত ভুলেই বাবো এবং সঙ্গে সঙ্গে তোদের কথাও—তুই ও আরতি তাতে প্রতিবাদ ও আশংকা জানিয়েছিল—এমনি বোকা তোরা! এবং স্বাৰ্ণ-পরত। যদিই কাকা ভুলে যায় তোদের! না—সে ভয় তোদের নেই—কবে দেশে কিরক—আবার তোদের সঙ্গে বিশব তার ভয়ই বনটা ঠুটুটু করছে।

কাল বাগিনে বহু বুরজি। বাগিনের বিখ্যাত Tiergarten অর্থাৎ চিড়িয়াখানা বা Zooতে গিয়ে-ছিলাম। সে কাহিনি তোকে লিখব না। শব্বর ও লক্ষীর নামে এক চিঠি বিব; তাতে সে সব লিখব—অবশ্য যদি সময় করে উঠতে পারি।

এখানে বাবের সঙ্গে আছি তাদেরই সঙ্গে ও আজার কো'তে (Caux) ছিলাম। কো'তে অবশ্য পরমা দিয়ে গ্যকতে হয়; কিন্তু এখানে একটা লক্ষ্য আছেটন পাওয়া যায়। বহু দেশের লোক এদের মধ্যে আছে এবং কাজ করছে। এখানকার আজাটা ছোট, এখানে জার্মান, হুইজিগ, হুইক, ডাচ্ প্রভৃতি বহুদেশের

১২১৪৪টি লোক দেখলাম। যে ক্রমবর্ধনের সঙ্গে দেখা হ'ল সবাই ইংরাজী জানে। হয়ত এদের উপর থেকে কিছু নিদেপ আছে;—এরা অসহ্য অস্ত্র খাতির করছে। এরা কোন টাকা চার না এবং চাইবে না। এমনিও এদের সব প্রতিষ্ঠানে নিয়ম হ'ল, যে যা দেয় তাই নেয়—কোন টিকা চাচ্ছি নেই।

জার্মানী সহজে তোমাকে ২৪টা কথা লিখছি। বুকে ঘেরে বাগনার ফলে এই দেশটা কার্যত ৬ বা ৭টা ভাগে বিভক্ত হয়েচে, East Prussia এখন রাশিয়ার বা U. S. S. R. এর অধর্গত। Pomarenia, Silesia প্রভৃতি অঞ্চল এখন পোল্যান্ডের অধর্গত। Sarr অঞ্চল কার্যত এখন ফ্রান্সের অংশ—বহিও নামে তা স্বতন্ত্র একটা রাষ্ট্র। বাগিন ছিল এদের রাজধানী এবং সর্বপ্রধান সহর এটা চার ভাগে বিভক্ত হয়েচে—পূর্বভাগ রাশিয়ার অধীন; পশ্চিমভাগ ব্রিটেন, ফ্রান্স ও আমেরিকার অধীন অর্থাৎ ঐ চার দেশের গৈত্র ঐ চার অংশে আছে। সহরটার আর ৬ ভাগ রাশিয়ার অধীন; ৩ ভাগ অপর তিন দেশের এবং ঐ তিন দেশ একযোগেই কাজ করে। ফলে বগিন সহরটা পূর্ব ও পশ্চিম দুইভাগে দুইটা অলাদা শাসনের অধীন। আর বা বাকি রইল—তার পূর্ব অংশ রাশিয়ার সৈন্তের ও পশ্চিম অংশ ঐ তিন জাতির সৈন্যের অধীন। দুই অংশেই এখন একটা করে নতুন রাষ্ট্র গড়া করানো হয়েচে স্থানীয় লোকদের বিয়ে। পশ্চিম অংশের রাজধানী হ'ল বন্। পূর্ব জার্মানীর সহজে কেউ বিশেষ কিছু বলতে পারেন না, তবে পূর্ব জার্মানীর যে তিনটি অংশের কথা উপরে বলেছি—তা থেকে ২-৩ লক্ষ বা এক কোটি refugee পশ্চিম জার্মানীতে এসেছে। East Prussia, Pomarenia ও Silesia থেকে এসেছে—প্রায় ৬০ লক্ষ এবং সেখান থেকে বারি আসে—তাদের কোন বাবা এরা (পশ্চিম জার্মানী সরকার) দেয় না; ঐ সব অঞ্চল এখন আর জার্মানীর মধ্যে নয়,—রাশিয়া এবং পোল্যান্ডের মধ্যে। পূর্ব রাশিয়ার প্রধান সহর Königsberg; সেখানে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক Kant বাস করতেন। তার এখন নাম হয়েচে—

Kaliningrad) সেখানে এখন জার্মান ভাষা অচল; Silesia ও Pomereniaতে এখন পোলিশ ভাষা বিধানো হই, কাজেই সেখানে জার্মানরা থাকতে পারে না। এটা ঘরে নিরে ওখান থেকে কাউতে আসতে বাধ্য দেখে না।

পশ্চিম জার্মানীতে আগত ৮০ লক্ষ উদ্ধার ছাড়া, ঐ সব অঞ্চল থেকে পূর্ব জার্মানীর বাস অঞ্চলেও ১০ লক্ষ refugee এসেছে। অর্থাৎ ঐ তিনটি অঞ্চল থেকে আর সোয়া কোটি লোক উদ্ধার হয়েছে। কিন্তু পূর্ব জার্মানী থেকে কোন refugeeকে পশ্চিম জার্মানীতে সহজে গ্রহণ করতে চায় না; refugeeকে দেখাতে হবে যে কোন রাজনৈতিক কারণে—তার উপর নির্ভরতন হচ্ছে বলে সে চলে এসেছে; নতুবা তাকে এখানে আসার দের না। ছুটো কাহণে এটা করতে। এরা আশা করে ২১০ বছরের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এক হবে; কাজেই ওখানে বাসা আছে কত করে থাক এই ২১০ বছর। তা ছাড়া ওখানে শু ভাষা বা জার্মান রাজ্যের ক্ষত্র কোন নির্ভরতন হবে না। দ্বিতীয় কারণ হ'ল—যদি ওখানকার লোকদেরও আসতে খোলা দরজা দেয়া তাহলে এত লোক চলে আসবে যে পশ্চিম জার্মানী তা সামাল দিতে পারবে না। আমাদের দেশের অবস্থার সঙ্গে তুলনা করে দেখিল। গ্রিক এই ছুটো কাহণই হয়ত আমাদের দেশের রাষ্ট্র-কর্তাদের মনে আছে। যদি পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এক হয় ২১০ বছর কত করে থাকে কি উচিত নয়? অন্তত সেটা দেখা দরকার; এখন রাস্তা পৌনে বায়েটা। ১০টার পর থেকে বসেছি ১০-৪০ মি: উঠেছি। তার পর নীচের ঘরে পাবার টেবিলে বসেই এত সময় গল্প করছিলাম। আজ আবার মনটা খুব ভাল আছে এবং ভাল লাগছে। কেন—তা আজ আর এখন লেখা হবে না—তা হলে আর রাত্রে ঘুম হবে না। কালও ভোরে উঠে তৈরি হতে হবে—বন্য বাগারের ক্ষত্র; তার পূর্বে এঘর অভিবির খাতার কিছু লিখতে হবে। কাজেই কাল রাত্রে যদি সম্ভব হয়—কেন বসে চিঠি লেখ করব,

‘কত ঘরে দিলে টাই’—রবীন্দ্রনাথের কবিতা; আবার এখন সেই অবস্থা।

এখনই বের হচ্ছি—ঘরের দিকে। এখন ৯টা;—রাত্রে চিঠিগান শেষ করতে চেষ্টা করব। Bohn Knarrhavn Hotel এ বেলা ২টার এখানে এসে—৭টা পর্যন্ত কেবল ঘুরেছি। এখন হোটেলের এগেছি একটা বিশ্রাম নিতে। এখনই আবার বেরিয়ে যাব আমাদের Ambassadorএর বাড়িতে। রাত্রে যেতে যাব এখান থেকে ১০ মাইল দূরে Cologne নগরে। যেখানে এসেই চিঠি লেখ করব। আজ একটু রাগি লাগছে। এটা একটা গিমনের হোটেল করেছে। Rhine নদীর উপর এই steamerটা ধাঁধা, ‘ভারই একটা কেবিনে আছি। এক রাত্রি মাত্র থাকবে; কাজেই অসুবিধা হবে না। কাল ত ভোরে বেরিয়ে পড়ব ২-২০ মিনিটে আবার কোলনে গিরে train বসব। আর শু এই হোটেলের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে না।

কাল ২-২০তে ট্রেনে চেপেছি, রাত ১০টা ১২ মি: প্যারিসে পৌছেছি। এই বাড়িতে এগেছি ১১টার। এখানে আসার পর—এরা গরম দুধ, loaf, অমলেট প্রভৃতি খাবার দিল। সে সব খেয়ে ঘরে এসে শুতে ১২ বজা গিয়েছিল। আজ ভোরে নেবু গরম মল খেয়ে এই চিঠি লিখতে বসেছি। কাল দুপুরের দিকে লন্ডন রওনা হবো। এবার আবার জার্মানীর কথাই এলাম।

জার্মানীকে এইভাবে ভাগ করা হয়েছিল, কারণ জার্মানীর ঐ সময়কার মনোভাব থেকে, তখন এরা মনে করেছিল জার্মানীই এদের সব চেয়ে বড় শত্রু এবং যে কতর হ'ক তাকে শায়েস্তা করা দরকার। ইয়াল্টা (Yalta) চুক্তি হয় বোধ হয় ১৯৪৪ সালে; তখন শু আশেরিকা, ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে রাশিয়ার খুব বাড়তি। এই চার দেশ এক সঙ্গে যুদ্ধ করতেন এবং জার্মানীকে হারাবার পক্ষে রাশিয়ার সামরিক বল বিশেষ দরকার হয়েছিল। তাই এরা রাশিয়াকে সন্মিহিত বাড়তি করত। রাশিয়া তখন

দাবী করল—পোল্যান্ডের পূর্ব দিকে কতক অংশ তার চাই এবং জার্মানীর পূর্ব প্রাশিয়াও তার চাই।

এখানেও একটা পুরানো ইতিহাস আছে। পোল্যান্ড বহু পূর্বে একটা স্বাধীন দেশ ছিল। তারপর রাশিয়া, অট্টোমান এবং প্রাশিয়া—এই তিন রাষ্ট্র মিলে একে গ্রবণ, দ্বিতীয়, তৃতীয়বার পর পর ভাগ করে গ্রাস করে। ইউরোপের মানচিত্র থেকে পোল্যান্ড এই ভাবে লোপ পায়। গ্রবণ বিষয়বৃত্তের পর এই তিন দেশই মিলে মিলে অংশ ভেঙে বিস্তে বাধ্য হল এবং পোল্যান্ড আবার স্বাধীন দেশ হিসাবে ইতিহাসে আসে। এই যুদ্ধের পূর্বে হিটলার ও হ্যাডলিন সমগ্র দুনিয়াকে বিধ্বস্ত করে এক চুক্তিনামা তাকে জার্মানী ও রাশিয়া আবার পোল্যান্ডকে ভাগ করে গ্রাস করার সত্ৰ করে। যুদ্ধের আরম্ভে—

জার্মান বাহিনী পোল্যান্ডের পশ্চিম অংশ গ্রাস করল;—
টিক তখনই রাশিয়া পূর্ব অংশকে কারেখীভাবে নিজের রাষ্ট্রের অঙ্গ হিসাবে স্বাধী করল। ইয়াল্টা (Yalta) চুক্তিতে এই দাবী যেনে দেওয়া হয়। আজ জার্মানীতে ও কোরিয়াতে গত যুদ্ধের চার বিদ্রোহিত্রির মধ্যে যে বিচরণ দেখা যাচ্ছে তার গোড়া হল ইয়াল্টা চুক্তি। যুদ্ধের টিক অব্যবহিত পরেই জার্মানীর পশ্চিমের পরই বালিসের দিকট পটীগড়ামে এই চারশক্তির আর এক সন্মেলন হয়। তাতে টিক হয়—রাশিয়া পোল্যান্ডের কতক অংশ বে গ্রাস করেছে, তার কতিপূরণ দেওয়া হবে জার্মানীর কতক অংশ পোল্যান্ডকে দিয়ে; এবং পূর্ব প্রাশিয়াকে রাশিয়া নিজের রাষ্ট্রের মধ্যে নেবে। আরও টিক হয় যে জার্মানীর পশ্চিম দিকে সার (Saar) নামক অঞ্চল যুদ্ধের কতিপূরণ বাবদ ১০ বছর আশ্রয় অঞ্চল ও রাষ্ট্র হিসাবে স্বাধীনতার অধিকারে থাকবে। তা ছাড়া হিটলার যে সব অঞ্চল জার্মানীর অধীভূত করেছিলেন, তা সবই ফেরৎ দিতে হবে। গ্রবণ বিষয় যুদ্ধের পর লেনিন ঘোষণা করেছিলেন—annexation বা পররাষ্ট্রের কোন অংশ গ্রাস করা নীতি-বিগবহিত এবং চশ লম্বাটো যে সব অঞ্চল করেক বছর পূর্বে গ্রাস করেছিলেন, তা সব তিন

ভেঙে যেন। হ্যাডলিন অবশ্য লেনিন নন, এবং তাঁর সব বক্তৃতা কথ্য বানেনও না। ফিনল্যান্ড, রুম্যানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া; প্রভৃতির কতক অংশও এই যুদ্ধের অবশেষে রাশিয়া নিজের অধীভূত করেছে।

এখন আবার একটু লঙেনের কথা লিখে জার্মানীর কথার কিবে বাব। কাল এখানে এসেছি এবং প্যারিসে—
তিন দিন পূর্বে জুগেনের চিঠিতে জানলান তাঁর ডিপ-
থেরিয়া হয় নি, গলার কোঁড়া হয়েছিল। মোটে ব উপর
একটা পচা দেহে; একটা না একটা লেগেই আছে।

আজ রাত ১১টার পর House of Commonsএ
dinner খেয়ে এলাম। সেখানে একটা কাণ্ড হয়েছে।
একটা সিগারেট খেতে হয়েছে। আমরা tables ৬৭
জন ছিলাম, তার মধ্যে একটি Scotch ও তাঁর ইংরেজ
পত্নী ছিলেন। তঁ ও ইংরেজ সনাতন বগড়া। তঁর
বলে, ইংরেজেরা আমাদের Home Rule—স্বায়ত্ত শাসন
দেয় না; ইংরেজরা বলছে তঁরই সব গ্রাস করতে
এবং ইংল্যান্ড লুট করছে। আবার এরা একসঙ্গে বাসও
করে—রাজ্যও চালার এবং সবই করে। এদের সঙ্গে
খুব আলাপ চলছিল এবং তঁ ও ইংরেজের বিবাদও
স্বাধী ও স্ত্রী একটু আপসে করে মিল। আমার সঙ্গে
রাজনীতির আলোচনার আহার বার বার বলতে লাগল
—তুমি এর পূর্বে আর কখনো মিলাতে আস নি?
তখন আমি বললাম—২৩ বছর খেলে মিলাব; সময়ও
হয়নি—এবং তোমাদের সরকার আমাকে দেশ থেকে বের
হতেও দিত না। ওরা ত অবাক—২৩ বছর খেলে
বাস! বলে, আমাদের দেশে বোধ হয় কেউ আসে না
যে, তারতে কাউকে বিনা বিচারে খেলে অটিক রাগ
হ'ত। ওরা ত বুঝেই বাস খেল, বদ খেল, আমি
এর কিছুই খেলাম না। সিগারেট ২৩ বছর খেল,
তাও খেলার না। খাওয়ার পর খেব বার ওরা বখন
সিগারেট হরাবে, তখন আমার বিশেষ করে ধরল—“For
our sake and only for to-day, can't you smoke
once?” কি আর—করব—একটা মিলাব; হরলাম

শেষামত এবং বলগাম প্রথম দিন থেকে না চাইতেই দেশে সিগারেট নিরেকে; কিন্তু কাগজ কলম, বই, পেন্সিল, প্রভৃতির ক্ষয় বরাবর অগড়া করতে হয়েছে। তট-তল্লোক নিজেই বাণীর চৌকা দিয়ে বঙ্গদেশ—মতলব কি জানি? খেলে খাবে দাবে—আরামে থাকবে, কিন্তু মাংসের চর্কা করতে পারবে না।

রাত বারটা বেজে গেছে, এখন শুতে পড়ছি।

আবার এখন জার্মানীর কথা আসছি। ঐশ্বর অকণ থেকে এক কোটি জার্মান পশ্চিম জার্মানীতে এসেছে। এটাই হ'ল এরের প্রধান সমস্যা। অবশ্য এর মূল কারণ হ'ল দেশ বিতাগ। কাজেই সেইটেই বৈশিষ্ট্য সমস্যা। আর একটা সমস্যা হ'ল—লক্ষ লক্ষ বাড়ি, ঘর, কারখানা বুকের সময় ধ্বংস হয়েছে; উড্ডোভাহাজ থেকে বোমা কেলো নক্ষত্রপত্ন ঐশ্বর কেসেছে। বালিনে ১ বছর পড়েও বহু বাড়ির ভাঙ্গা পড়ে আছে। আর লসেনজগ দেখেছি রুচ (Rurh) অঞ্চলে। দেখানে জুপের বিরাট কারখানা ২৩ মাইল স্থান জুড়ে এসে (Essen) শবের স্থানবের মতো পড়ে আছে। এই জুপ হ'ল অগন্তের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা। হিটলারের আনলে এরা হিটলারকে বহু সাহায্য করেছে। প্রধানত এরের কারখানার মুক্ত সরঞ্জাম তৈরী করে। তাই জার্মানীর নক্ষত্রপত্ন জুপ কারখানাকে বিশেষভাবে ধ্বংস করেছে এবং এখনো একে মৃতদ করে গড়তে দিচ্ছে না। জুপের হাতে ১০১২টা কারখানা বনি আছে। তাও এরের হাতে ধ্বংসে নক্ষত্রপত্ন এখনো রাক্ষসী নয়। তনলায় এরের উপর লক্ষ্য হারছে—ঐশ্বর বনি হত্যাভ্রিত অর্থাৎ বিক্রি করতে হবে। জুপের কারখানার কয়েক সহস্র প্রতিক কাল কর্তৃত; তারা অনেকই আজ বেকার। তা ছাড়া জুপে কাল করার সময় তাদের বা পাওনা—খেরন Provident Fund, Social Insurance ইত্যাদি অব্যেছিল, তাও তারা পাচ্ছে না। এতদিন এরা অনেক কারখানার তাকাতুরা টুকরা মাল বিক্রি করে

বাড়িল। এখন তাও আর চলে না। এখানে ৪টি নক্ষত্রপত্নী ভাঙির—আমেরিকা, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়ার মনোভাবের কিছু আলোচনা দরকার। কি রকম পতনপর বিরোধী মনোভাব এরের মধ্যে চলছে তা দেখতে পাবে।

পত্ন নহাযুক্ত দেশ হ'বার অল্প পূর্বে এরের এক সম্মেলন ঠিক করে যে,—জার্মানীকে আর ইণ্ডাস্ট্রিয়াল আভি (industrial nation) হিসাবে গকে উঠতে দেওয়া হবে না। একে প্রধানতঃ কৃষিমূলক দেশ হিসাবে রাখা হবে। এই নীতি কিছুদিন পর্যন্ত এরা অচলপর করে। কিন্তু কিছু দিনের মধ্যেই অসম্মত জিনজি বুঝতে পারল যে, এই নীতি অচল—জার্মানীর পক্ষেও অচল এবং সবত ইটেরোগের দিক থেকেও অচল। আমেরিকা তখন সমগ্র ইউরোপে মারশ্যাল সাহায্য (Marshal Aid) বাবদ টাকা দিচ্ছে—ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পত্নবার অজ্ঞ। জার্মানীকেও ঐ তহবিল থেকে টাকা দিতে শুরু করল। কোন কোন আভি বিশেষ করে কমানীরা ঐ টাকা দিয়ে প্রোভেনীর ব্যবহার-প্রব্য আমেরিকা থেকে কিনে আনল এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পুনর্গঠনের অজ্ঞ টাকা ধরচ না করে তা ধরচ করল—ভাত কাপড় ও বিলাস প্রব্য। জার্মানী তা করল না, তারা সব টাকাই ইণ্ডাস্ট্রিয়াল পুনর্গঠনে নিয়োজিত করল। একদিকে মার্শ্যাল সাহায্যে ওরা মৃতদ ইণ্ডাস্ট্রিয়াল স্থাপন করছিল। অপর দিকে পূর্ব চুক্তি অহুলায়ে বুকের কতিপূরণ বাবদ চালু কারখানা তেলের নিয়ে বাড়িল—'dismantling of factories as reparations.' এক কাল বিশেষভাবে করছিল ইয়োরাক।

জার্মান সরকার তখনও হয়নি; ১০১২টি প্রাদেশিক সরকার চকুপজি গাড় করিয়েছিল; এরের ইজ্ঞা এছিল এমনকি পশ্চিম জার্মানীকেও একত্র ও এক রাষ্ট্রবৃত্ত হ'তে দেখে না। ঐশ্বর প্রাদেশিক সরকার কারখানা তাকার প্রতিবার আনিরে কোনই ফল পায় না। তখন ২৩টা কারখানার প্রতিকরা তাকার কালে বাধা দেয়; কারণ কারখানা তাকলে তাদের বোজগারের পথ বন্ধ

হবে। সৈন্ত দিয়ে শ্রমিকদের শংকোয়া করা হ'ল, কিন্তু ইংরাজও বুঝল এ জিনিষ চলবে না। কেবল স্ত্রীদিগের জার্মানীকে ভূঁই রাখা সম্ভবও নয় এবং সম্ভবও নয়। তাই ক্ষতিপূরণ বাবদ কারখানা তাল্লা বদ্ধ হ'ল এবং পশ্চিম জার্মানীতে ইত্যাট্টী স্থাপিত হতে লাগল। কিন্তু এখনো কুপের কারখানা ও কুপ পরিবারের প্রতি এদের বিরাগ ও অবিশ্বাস দূর হয়নি। তবে কুপের শ্রমিকদের দাবী এরা বেনী বিন অগ্রাহ্য করতে পারবে না; কুপ কারখানাও চালু করতে হবে।

ভোয়ারা তখনই আদর্শ হবে এত দূর বাধা বিয় নজ্জুও পশ্চিম জার্মানীর ইত্যাট্টীর উৎপাদন এখনই যুদ্ধের পূর্বের চেয়ে বেশী; বোধ হয় আমেরিকা, ব্রুটন ও রাশিয়া ব্যতীত আর কোন দেশই এটা করতে পারবে নি। এই সব দেশের সঙ্গে জার্মানীর তুলনা চলে না। যুদ্ধের সময় এবং পরে এমনভাবে জার্মানীকে স্বয়ং করা হয়েছিল বাতে জার্মানী যেন আর কোন দিনই মাথা তুলতে না পারে। মাত্র গত ৩ বছর হ'ল ত্রিশজি এই নীতি পরিবর্তন করেছে। পূর্ব জার্মানীতে রাশিয়া কি করেছে—বলা মুড়িল। পশ্চিম জার্মানীর ও পশ্চিম বালিনের লোকের কথা বিচার করলে—সেখানকার অবস্থা ঘোটেই ভাল নয়। পূর্ব বালিনে বাস করে কিন্তু পশ্চিম বালিনে এসে জীবিকা অর্জন করে, এমন মহ লোক বালিন সহরে আছে; কিন্তু পশ্চিম বালিন থেকে পূর্ব বালিনে কেউ জীবিকার জন্ত যায় না। পূর্ব বালিন ও পূর্ব জার্মানী থেকে বহু লোক পশ্চিম বালিনে ও পশ্চিম জার্মানীতে উভাগ হয়ে আসছে; কিন্তু এখিক থেকে ওখিকৈ যাওয়ার ঘটনা প্রায় নেই—মানে ২৪টা মাত্র।

পশ্চিম জার্মানীর বার সঙ্গেই আলাপ করেছি সেই আশা করে ২১৩ বছরের মধ্যে দুই জার্মানী আবার একত্র হবে। কি করে হবে—তা বলতে পারে না। তারা বলে ত্রিশজি বাধা দিচ্ছে না; রাশিয়াও আর বেনী বিন বাধা দিতে পারবে না। পশ্চিম জার্মানীতে একটা নতুন ব্রকস্‌ট্যাঙ্ক বা কল তুলছে। ১ কোটি উভাগ; এবং ৫ ভাগ লোকের বাড়িঘর বিশ্ব সম্পত্তি নষ্ট করেছে। যাঁদের বিশ্ব সম্পত্তি নষ্ট হয়নি এই কর

কেবল তাদেরই মিতে হবে। বিশ্ব সম্পত্তির একটা মূল্য রাখ করে তার মোট ১/৩ ভাগ বিশ বছরের মধ্যে মিতে হবে। এই টাকা দিয়ে উভাগ ও নষ্ট সম্পত্তির লোকদের পুনর্বাসনের জন্ত সাহায্য করা হবে। পশ্চিম জার্মানী অনেক ভাল ভাল আইন করেছে—সামাজিক আইন—Social Laws; শ্রমিক ক্লাব নির্বাহক কমিটিতে শ্রমিক বালিনের প্রতিনিধির সঙ্গে শ্রমিকদের প্রতিনিধিও থাকবে। এমন আইন হয়েছে। কৃষি শ্রমিকদের জন্ত নতুন বর তৈরী করেছে—তার চুইটাতে সেলাম। একটা হ'ল বুক শ্রমিকের এবং অপরটা শিক্ষানবিশ অর্থাৎ ১৪ থেকে ১৬ বছর বয়সের শ্রমিকদের জন্ত। আহারের বেশের খুব ভাল student hostelও এমন নয়। ছোকরাদের খেতে দিচ্ছে, দুই থেকে এগিরে সেলাম, একটা plateও করে কিছুটা মিতে বললাম—পারেন দিচ্ছে সেই রাত্রে। শুধায় হ'ল দাক্তিতির শুদ্ধা ও তিনি মিশিরে রেখেছে, ওরা বলল এটা ভারতীয় ধারাব। একটা ১৭ বছরের ছোকরা একখানা বই পড়ছিল—বোধ হয় তার ইংরাজী স্তোর ভূপেনকাকার কাছে দেখেছিল। একজন জার্মান ললীতজ্ঞের জীবনী নিয়ে এই উপভোগ্যনা লেখা। যদের কাছে বিবেচকের গৃহ দেখলাম; ভাগনার (Wagner) যে পিরানো বাঁজাউন—তাও একখানে স্ট্রাইচারল্যাণ্ডে দেখছি।

অনেক কথা লিখেছি, আর না, এবার শেষ করি। কট থেকে একটা চিত্রিতে তোকে একদিন লিখলাম, আজ মনটা খুব সুন্দর আছে। কারণ পরে লিখব। সে কারণ স্তোর ভূপেনকাকার চিত্রিতে লিখেছি। সংক্ষেপে এখানে লিখছি। এক জার্মান শ্রমিকের পত্নী হুডি আবার খুব আশীর্বাদ করে কুপে বিদ্ধ বীজের একটি মুক্তি উপহার দিয়ে বলল—এটা তোমার রক্ষা করবে। সব বিপদ থেকে তোমার রক্ষা করবে। সেখান থেকে ঘরে ফিরে এসে দেখি ঘরখানা নানা স্থানে কুপের শুদ্ধ দিয়ে লাগানো; এবং টেবিলের উপর ১০১২টা বোতাম, ২টা হুচ এবং একটা হুতার গুলি—আমার বোতাম ছিঁড়লে বরকার হবে। দেখছিল ত মা! সবই আমার স্বপ্নস্বপ্ন আছে।

আত্মকান হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় [পূর্বাছত্তি]

পরের দিন ভোজের দিকে চা খাবার সময় উটান টিন আবার মুন পের ঘরে ঢুকলেন। "হাতের খামটা এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'নাও তোমার একটা চিঠি এসেছে। ছাপ দেখে মনে হচ্ছে বেঙ্গল থেকেই এসেছে, কি ব্যাপার দেখো তো।' উটান টিনের গলার খাওয়ায় খুব বোলায়েম। বোধ হয় কাল হঠাৎ চটে বাঙারার পরে একটু অহুতগুই হ'য়েছেন।

হাত বাড়িয়ে চিঠিটা মুন পে টেনে নিলো। চিঠি আবার কে লিখলো। ছোট্ট চিঠি—কয়েকটা লাইন। নিচে কমল বোসের লগ্নবন্দ। এক নিঃশ্বাসে মুন পে পড়ে নিলো। কলেজের একমল ছেলে মিলে একটা 'লেখা লগ্ন' গঠন করেছে। মৌলমিনে কলেজার প্রচুর লোক দাড়া বাচ্ছে। হাসপাতালের কতারা সামলে উঠতে পারছে না, তাই মূল, কলেজ, ক্লাবে অনেকগুলো মল গড়ে উঠেছে বোগীদের সেবা করার জন্য। মুন পে যদি ইচ্ছা করে শুদের সেবা লক্ষ্য বোগ দিতে পারে। যদি বোগ দেয়, তবে অবিলম্বে যেন রঙনা হয়, কারণ হাতে বিশেষ লম্ব নেই। খুব শীঘ্রই মলটি কৌলীনিন যাত্রা করবে।

মুন পে খুব ভুলভেই উটান টিন জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার? কিসের চিঠি। পরীক্ষার খবর নাকি?' চিঠিটা মুড়ে পকেটে রাখতে রাখতে মুন পে বললো, 'না, পরীক্ষার খবরের এখনও বেরী আছে। এ মল ব্যাপার! আমাকে কালই রঙনা হ'তে হবে?'

'কালই? কেন? এমনকি তেঁা ছুটি শেখ হ'তে অনেক দেরী।' শেখ বিকে উটান টিনের গলটা খুব করণ পোনাগো।

হু এক মিনিটের শুভতা। তার পরেই মুন পে নিষেজে লামলে নিলো। সোজা উটান টিনের বিকে

চেয়ে বললো, 'আমার ক্লাসের একজন ছাত্র লিখেছে, ছুটির মধ্যে একজন একেবারে ক্লাস নিচ্ছেন ইংরাজী। আমি ক্লাসে বোগ দেবো কিনা তাই জানতে চেয়েছে।' 'তুমি কি ঠিক করলে?'

'ভাবছি, বিধি বিধি ছুটিটা নষ্ট করে লাভ কি?'

উটান টিন কিছুকণ চুপ করে রইলেন তারপর আঙে আঙে বললেন, 'তার মানে, তুমি চলে যাবে এখান থেকে? এই তো সেদিন এসে?'

'উপায় কি! এখানে বলে থাকলে ক্লাস কীকি যাবে। ছুটির মধ্যে অনেকটা এগিয়ে বাওয়া যেতো।'

উটান টিন উঠে ঝড়ালেন 'লেখাপড়ার ব্যাপারে আমি বাধা দিতে চাই না। কিন্তু যদি লম্ব হয়, আর অন্ততঃ কয়েকটা দিনও থেকে গেলে পারো।'

উটান টিন বাইরে বেরিয়ে গেলেন।

মুন পে মন ঠিক ক'রে কেলেলো। ভালো লাগছে না সোয়েবিন গ্রা। ব্যাটন, আর চরখাড়া ছেলের মল দুর্ব্বল হয়ে উঠেছে। শুধু মা শিন। মা শিনকে লরিরে কেলতে হবে সোয়েবিন থেকে। যেমন করাই হোক আর বত শীঘ্র লম্ব। এ বিষয়ে কিরে গিরে খোলাখুলি আলাপ করবে কমল বোসের লগ্নে। রেজুপের কাছাকাছি কোন একটা আত্মনার নিরে গিরে ভুলবে তাকে। আটোপাশের মত বা টিনের প্রসারিত বাহর আওতা থেকে অনেক দূরে লরিরে নিরে বেতে হবে।

চটি খোঁড়া পাঁরে লরিরে মুন পে বেরিরে পড়লো।

বাঙারার শুপরেই মা শিনের দেখা মিললো। মুন পেকে দেখেই মা শিন খুব লরিরে বললো। অতিমান, কাল বিকেলে কথা রাখতে পারে মি তাই মা শিন খুব কিরিরে বলছে।

‘মা শিন’ লুন পে মাওরার ওপর গিড়ে বসলো,
‘খুড়ী কই।’

একবার, দুবার। কোন উত্তর নেই। মা শিন
একমনে বেতের খুড়ি বুনে চলছে। পাশে যে কোন
একটা লোক বলে আছে, ওর হাবতাবে বোঝার উপার
নেই।

‘বেশ কথা বখন বলবেই না, তখন চলি। কাল চলে
যাচ্ছি তাই বলতে এসেছিলাম।’

‘কালই’ সব কিছু ভুলে মা শিন ফিরে বসলো।
সাব্য খুঁ লাগ টকটকে হ’রে উঠেছে। চোখের
পাতা দুটি কাপছে।

‘হ্যাঁ, বলল খেকে চিটি পেয়েছি, কালই যেতে
হবে।’

‘তুমি যে বলেছিলে, দুমাস অন্ততঃ থাকবে?’

‘তাই তো ভেবেছিলাম। কিন্তু বা টিনের পাশাপাশি
দাঁড়াতে আমার লজ্জা করছে। এ উঠানে ওর চারা
পড়বে, এ আমি কিছুতেই সহ করতে পারবো না।’

মামিন বেতের-খুড়ি সরিয়ে রেখে লুন পের দুটে।
হাত আপটে বসলো, ‘লুনপে, কি তুমি বলতে চাও, স্ট্র
ক’রে বসো?’

লুন পে দুটিলে পড়ে গেলো। পরিচার্য্যার দিনের
আলো। পথ চলতি লোকের অত্যাচরণ নেই। এসিকে
নজর দিলেই সর্বনাশ হবে। যাতে মা শিনের হাত দুটো
সরিয়ে দিল একপাশে। বসলো, ‘কাল আমি আস-
ছিলাম এ বিকে, পথের বাঁকখানে বেগলায় বাটিন জিনিষ
পড়র হাতে আমাকে পার হয়ে এ বাড়ীতে ঢুকলো।
এ বাড়ীতে অন্ততঃ কেউ আমার পার হয়ে ঢুকবে এ
আমি সহ করতে পারি না ভাতো তুমি জানো মা শিন?’

মা শিন চোখ নাড়িয়ে যাতে যাতে বসলো, ‘বা টিন
কাল মার কড় ওখুঁ আর সাতের সব বাগিন এনেছিলো।
আজ মাকে নিয়ে কবিরাজের বাড়ী গেছে।’

‘খুড়ীকে এত ভাবির ভদারকের মানে?’

মা শিন জ্ঞান হারালো, ‘মানে, বা টিন পাখা ব্যবসার

‘মানে কল লাড়তে হ’লে ভাল হ’রে নোয়াতে হবে।’

‘সেই কথাই আমি স্ট্র করে আজ বলতে এসেছি
মা শিন,’ লুন পে চৌতালের ওপর চেপে বসলো, ‘তোমার
হাতা আমার জীবনের কোন মানে হয় না, ভাতো
জানো। আর বড়ো আর বড়র তিনেক, আর বেশী
নয়। এ কটা বছর তুমি অপেক্ষা করো। আমি তোমাকে
আপন ক’রে নেবোই। আর যদি এর মধ্যে গোলমাল
কিছু টের পাও, আমার কলেজের টিকানার চিঠি লিখে
বিদ্য, আমি কথা দিচ্ছি, যেমন ক’রে পারি তোমার
এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাবো।’

মা শিন এগিয়ে এসে লুন পের কোণে মাথা ঝুঁকে
কুশিরে কেঁপে উঠলো। এবার লুন পে আর বাবা মিল
না। পথ চলতি লোকেরা চেয়েই যদি থাকে, থাক।
ওদের নজরকে জয় করার শক্তি লুন পে অর্জন করেছে।
বিদ্যা অপব্যবহার ভর আর তার নেই।

‘আবার তুমি কবে আসবে?’ মা শিনের গণ্ডার
আঙুরাক কান্না জড়ানো।

‘যদি গোলমাল কিছু না হয়, তবে মাস সাত আট
পরে আমার ফিরে আসবো।’

‘গোলমাল কিছু না হয়?’ মা শিন মুখ তুলে চাইলো,
‘তার মানে কিসের গোলমাল? তুমি যেন কিছু একটা
লুকোচ্ছ আমার কাছে?’

লুন পে কোন উত্তর না দিয়ে মা শিনের খোলা এক-
রাশ তুলের ওপর হাত খোলাতে লাগলো। পশনের
অস্ত্র নরম চুলের গোছ।

‘কি, কথা বলছো না বে?’ মা শিন লুন পের দুটো
কাঁধ ধরে মুহূর্তকালী বিলো।

‘সবই বলছি মা শিন, তোমার কাছে কোন কথা
লুকোবো না। লেখাপড়ার চেয়েও আর একটা বড়ো
চিন্তা আমার মাথার ঢুকেছে। প্রথম প্রথম আমি
এটাকে আনলই রই নি কিন্তু ক্রমে মনে হচ্ছে এ চিন্তা
আমার হস্তের সংগে বিশে গিরেছে, জড়িয়ে গিরেছে
আমার শিরাজপশিরার সংগে।’

‘কি চিত্রা লুন পে?’

‘এই দেশের চিত্রা, যে দেশে আমরা বাস করি। এ দেশ ইংরেজরা মানে বোঝীরা চিনিতে নিজেছে আমাদের হাত থেকে, আমাদের গাছপালা, মাঠ-খাট, নহর গ্রাম সব নিজেদের কৃষিকাজ করেছে। ওদের হাত থেকে এ দেশ আমাদের আবার চিনিতে নিতে হবে ‘ভুলে, বলে, কোশলে’ যে উপায়ে হোক ওদের এদেশের মাটি ছাড়তে হবে।’ লুন পে হঠাৎ গেসে গিয়ে দেখলো যা শিন একটুটে ভার বুকের দিকে চেয়ে রয়েছে।

‘কি দেখছো যা শিন?’

লুন পের আচমকা প্রস্নে যা শিন বসন্ত মনে গেল। সারা মুখ আবিহের মতন লাল, দুটি চোখে অশ্রু ছাতি। মিলি হেসে বললো, ‘তোমার দেখছিলাম লুন পে, এই সব কথাগুলো বলার সময় কি ভ্রমর দেখাছিলো তোমার?’

‘এ আমার নিজের কথা নয় যা শিন। এ ভাবে চিত্রা করতে আমার শিখিয়েছে রজা বোল।’

‘রজা বোল কে?’ যা শিন লুন পের হাত ছাড়িয়ে সরে গিয়ে বললো।

‘আমাদের সংগে একজন কালা পড়ে কমল বোল, তার বোন।’

বিষাদের ছায়া নেমে এলো যা শিনের মুখে। চোখের কোলে গাঢ় রানিমা। খাড়া বৈকিৎ লুন পের দিকে এক টুটে চেয়ে রইলো। অনেকক্ষণ পরে বললো, ‘কেলোমা? তোমার সংগে আলাপ হ’লো কি ক’রে?’

‘ওদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম একদিন।’

‘যুব ভ্রমর দেখতে বুঝি কেলোমাকে? অনেক পড়াশুনা?’

যা শিনের কথার বরণে লুন পের চেতলা হলো। যা শিন বুঝি সম্বোধন করছে ওকে! সাপিনীর জ্ঞাত। আশে পাশে আর একটা সাপিনী দেখলেই ল্যাঞ্চে ভর দিয়ে কথা তুলে দাঁড়ায়। নিজের হারায় ওপরেই লগ্নরনে ছোবল মারে।

লুন পে হাসলো ‘তুমি মিথ্যা তর পাছো যা শিন।

রজা বোলের মত যেরেক ভালোবাসা যায় না, ও বরণের যেরে নিজের দেশ ছাড়া কাউকে ভালোবাসতেও পারে না। দেশকে সুখসুস্থ করার জন্য নিজে তপিয়ে পড়েছে সংগ্রামে পুণিশেষ লাঠি, বুগেট সব কিছু অগ্রাহ করে। উপসাগরের ওপারে কি ভীষণ খাপার চলছে আমরা এ পারে বলে তা কল্পনাও করতে পারবো না। সেই বিরাট দাবানলের রজা বোল শুধু একটা স্ক্রিগে। ছিটকে কিছুদিনের জন্য এপারে এসে পড়েছিলো।’

‘কিন্তু লড়াই কাদের সংগে?’ ব্যাপারটা যা শিনের কাছে খুব বেন ভালো ঠেকেলো না। কেলোমাদের বরণ বারণ সবচেয়ে বিশেষ কিছু ও জানেও না। ওর মাসীর বাড়ীর পানের বিলে করেকটা কেলোমা মজুরী দেখেছিলো। কিন্তু তাদের তো খুব শক্ত আর নিরীহ মনে হ’রেছিলো। এমন কি একদিন কুলি ব্যারাকে কারা শুনে ওর মাসীকে বিজ্ঞাসা ক’রে জানতে পেয়েছিলো যে কালাবাসী বাড়াল হ’রে এসে বুঝি বউকে পিঠেছে, তাই হাপসু নরনে ডাক ছেড়ে বউ কাঁদছে। শুনে যা শিন আশ্রয়ই হ’রে গিয়েছিলো। কেসনবারা মেয়েমানুষ। খুব বুজিরে মার খেয়ে থাকে, তেড়ে উঠছে না। পারে কি চটিও নেই যেরেটার? বাড়ীতে লোহার শক্ত মতন কোন জিনিষ নেই? কিন্তু কেলোমা রজা বোল কোথা থেকে ক’পিয়ে পড়ার সাহস আচরণ করলো!

‘লড়াই, ব্যাং! আমাদের দেশ আঁকড়ে বসে আছে, আমাদের সংগে? এদেশেও গোলমাল শুরু হবে?’ ব্যাপারটা কেসন বোলাটে ঠেকেলো যা শিনের কাছে।

‘হবে বৈ কি, নিশ্চয় হবে। আমরা স্ট্রী গলার বোঝীদের ভেঁকে বলবো ছেড়ে লাগ আমাদের দেশ। শোনে তো ভালোই, নহত আমরা এদিকে যাবো। হাঠে হাঠে শুনের উৎসাহ ক’রে তুলবো, পুড়িয়ে দেবো ওদের বরবাড়ী যেরেমানুষ বাছা কাউকে রেহাই দেবো না।’

এতক্ষণে কিছুটা বুঝলো যা শিন। এখানের হাটে কিংবা পোরে নাচ দেখতে গিয়ে যে বরণের হাতাখাতি

বা ছুরি মারামারি হয় সে রকম কিছু নয়, এ তাঁর চেয়েও অনেক ভীষণ। গোলাগুলি কামান বন্দুক সব কিছু নিয়ে বোম্বারি তোড়ে আসবে। কত মানুষের প্রাণ বাবে ঠিক আছে। কথাটা মনে হ'লেই মা শিন নিউরে উঠলো। বলা যায়, ভলি এসে লুপের গায়েরও ভো লাগতে পারে।

লুপের একটা হাত আঁকড়ে ধরে মা শিন সত্যের মাথা নেড়ে উঠলো, 'না, না, লুপে তোমাকে এসবের মধ্য দিয়ে কাজ নেই। কোথা দিয়ে কি হ'য়ে বাবে ঠিক আছে?'

লুপে রান হাসলো, 'কোথা দিয়ে কিছু একটা হ'লেই যদি যায়, তুবি আমাকে মনে রাখবে মা শিন?'

মা শিন লুপের কোলে মাথা রেখে হুঁপিয়ে কৌদে উঠলো, 'কি নিষ্ঠুর গো তুবি। এমন সর্বনেশে কথা কি ক'রে উচ্চারণ করতে পারলো।'

লুপে কোন কথা বললো না। তারি ভালো লাগলো। মা শিনের এই উজ্জ্বলিত কান্না। নিজেও উন্মাদ ক'রে দেওয়া।

'তুবি মিথ্যে ভয় পাচ্ছে। মা শিন। একি ভ্রূ এক দিনের ব্যাপার! শুধু ভোড়লোড় করতেই কত বছর লেগে যেতে পারে। তাছাড়া সারা দেশে একসঙ্গে আতন আশাবার মতন বন্দেই বাজদও তো দরকার হবে।'

'কিন্তু তোমার বাবা জানেন এ কথা। তিনি মত দিয়েছেন?' এতকণে মা শিন অন্ধকারে একটা কুল দেখতে পেলো। রানতারা লোক উচান টিন, তাঁর নিষেধ ডিগিরে কিছু করতে কি সাহস পাবে লুপে।

'বাবা কিছু কিছু জানেন। তাঁর সংগে আমার কথাও হয়ে গেছে।'

'তিনি শুনে কি বলেন?' মা শিন উঠে বসে এল্লিগ হাতার চোখের ভল মুছে নিলো।

'আমার আস্থারানে যেতে বললেন' লুপে হাসলো।

'তার মানে রেগে গেছেন খুব?'

'তাই তো মনে হ'লো।' লুপে একই খেমে বলো।

'তা হ'লে কি করবে?'

'কাল পালানো এখন থেকে। বাবার কাছে বিশেষ মিথ্যে কথা কোনদিন বলি নি, আমাকে বললাম। এখানে এ ক'দিনেই আনি হাঁপিরে উঠেছি। তুমি ছাড়া এখানে কিছু আমার ভালো লাগছে না।'

'কিন্তু কালই চলে বাবে?'

'যেতেই বনম হ'বে তখন কি দরকার বেদী ক'রে। তাছাড়া কমল বোল চিঠি লিখেছে সেবাদেশের অস্ত্র আমাকে দরকার। ছুটির মধ্যে সোয়িট সেবা করতে হবে।'

মা শিন চুপ করে বসে বসে। লুপে ঘন অস্ত্র অগন্তের, এর সংগে কোনদিন পরিচয় ছিলো। বলেই মনে হচ্ছে না। কেলেরা রক্তা বোল লুপে পেকে গ্রান ভূলে যেতে শিখিয়েছে, গ্রানের মেয়েকেও ভূলে যেতে শিখিয়েছে কিনা কে জানে।

অনেকক্ষণ দুজনের কেউ কোন কথা বললো না। রোগ বাড়ছে। খুঁটোয় সুরোর সাহনে কারা জড়ো হ'য়ে মান করছে। যোব হয় গায়ের মেয়েরা।

'তোমার মা আসবেন কখন?'

'কি জানি, এতকণে তো এসে বাবার কথা মা শিন রাস্তার দিকে চেয়ে দেখলো, 'কাল সকালেই যদি চলে যাক, তবে আর বোধহয় দেখা হ'বে না। বিকেলে তো খুব ব্যস্ত থাকবে?'

'বতই ব্যস্ত থাকি, বিকেলে তোমার সংগে দেখা করবো। কোথায় পাবো তোমাকে প্যাগোডার ভাতালে না লুজের বার? এখানের এসে তো লুজের বারে যাওয়াই হ'লো না।'

'যাকে কেলে তো বেরোতে পারবো না। তুমি এখানেই এসো। মা শুনিয়ে পড়লে আমায় পাওয়ার বসে পর করতে পারবোখান। অবস্ত্র যদি তোমার ভালো লাগে।'

লুপে হাত বাড়িয়ে মা শিনের গাল টিপে দিলো

'বস্ত্র কথা শিখিয়ে বো।'

‘কেলোনা রক্তা বোসের মতন কি আর বিবেছি’ বুঢ়ি
হেসে মা শিন সত্রে ঝাঁড়ালো।

হাঙরা থেকে নামতে নামতে লুন পে বুয়ে ঝাঁড়ালো।
মা শিনের দিকে একটুখানি চেয়ে হাঙরার ওপর গিয়ে
উঠলো, ‘সত্তি। কত্রে ভোমার মনের কথা হলো তে
মা শিন। তুমি সন্দেহ করো আমার না?’

মা শিন এগিয়ে এলে লুন পের বুকে নিজেই মাথাটা
রাখলো। ‘ভোমার আর আমার মাঝখানে আব কোন
মেরের ছায়াও আমি করনা করতে পারি না। আর
কাকর নামও সহ্য করতে পারি না।’

‘রক্তা বোস সাধারণ জ্বরের বেয়ে নয়, যে সব মেরে
আমতা হাঙরার হাঙরে চাটে বাজারে দেখতে পাই সে
জ্বরের নয়। সত্তি। বলছি মা শিন, ওরকম মেরে যদি
আমাদের হেনে একটাও জ্বরায়, তবে আর এ দেশের
জ্বর নেই।’

‘ভোমার রক্তা বোসকে আমার দেখতে খুব সাধ

‘সে নিজের হেনে ফিরে পেতে। আর কোনদিন
আলবে কিনা। তারই ঠিক নেই,’ লুন পে আবার সিঁড়ি
বেয়ে নেমে পড়লো, ‘চলি এখনকার মতন বিকেলে
আসবো।’

হুপুরের বিকেই আকাশ কালো ক’রে যে ঘবে
উঠলো। কড়ের দোঁ দোঁ আওয়াজ। বড়ো বড়ো
কোটার কুটি গুরু হগো। জানলা বন্ধ ক’রে লুন পে চুপ
ক’রে বলে রইলো।

বিকেলের দিকে কড়ের বাতান্নাতি আরো ছিগুপ
হ’য়ে উঠলো। বিছারতের কিলিক আর কান কাটানো
বাজের শব্দ। লুন পের মনে হ’লো কাঠের বাড়ী পাঁজা
কোলা ক’রে ছুঁড়ে কেলে বেবে কোপাঙ।

ড দিন পায়ে কবল ছড়িয়ে এখর ওখর করতে করতে
বিড়কি ক’রে কুটির বাপাঙ আরম্ভ করলো। লুন পের
ঘরে এলে একবার বললো, ‘আহা! বাড়া কতদিন পরে

গায়ে ফিরে এলো, কোণার একটু বুয়ে বুয়ে বেড়াবে,
তা নয় পোড়া বিষ্টির অস্ত্র চৌকাঠের বাইরে পা দেবার
যো নেই।

‘আমি সেজত জাবছি না’ লুন পে যিহানার চিত্ত
হ’রে তরে বলতে লাগলো। ‘আমি জাবছি এই রকম কত
বিষ্টি হ’তে থাকলে কাল বাবে। কি ক’রে?’

ড বিন এমনকি ঝাঁড়ালো। একটা হাত কাণের পাশে
দিয়ে লুন পের দিকে খুঁকে পড়ে বললো, ‘কোথার বাঘি
খলি?’

‘কেন বাবা ভোমার বলে নি কিছু?’

‘আমার কৈ না?’ ড বিন চেয়ারের পাশে এসে
বসে পড়লো।

‘আমি কাল রেতুপ চলে বাবে।’

‘কাল? কেন? এই যে বলি, অনেক দিন ছুটি।’

‘হ্যাঁ, ছুটিই তো চিলো। হঠাৎ একটা দরকার
পড়ে গেলো। কালই যখন হ’তে হবে। কিন্তু ঝড়ঝল
এই রকম চললে বাবে। কি ক’রে তাই ভাবছি।’

হঠাৎ ড বিন হেসে উঠলো। ঝড়ঝড়ি কাক ক’রে
কুটির জোরটা বেধে নিয়ে ছেলে বাছুরের মতন চৌৎকার
ক’রে উঠলো, ‘টিক আছে, টিক আছে। সাত দিনের
মধ্যে এ বিষ্টি ঘেন না বাবে। আমি কাকর বাপার আর
একটা হাতা গড়িয়ে দেবো চান তিনকে ব’লে। খুব
জোরে বিষ্টি হোক, দেখি লুন পে কি ক’রে পালার।’

ড বিনের কপাই বোধ হয় করা জনসেন। তিন
দিন তিন রাত ব’রে অবিশ্রান্ত কুটি। বুড়োরা পর্বত
কীকার করলো এমনি কড় আর কুটি ভাদের জীবনে কেউ
দেখে নি। সোয়েবিনের পথখাট সবুজ ছুবে গেলো।
এতদিনের বাঘান গাছটা ভালপালা ছড়িয়ে বাস্তার ওপর
মুখ খুঁড়ে পড়লো। কিবাণ দজুরেরা টোকা নাথার
দিয়ে লুন পের বারান্দার নিচে লার দিয়ে বসে রইলো।
এই ছুবেগে কে নাওবে পথে ঘাটে!

তিন দিন পর উঠানে পা দিয়ে লুন পে অবাক হ’য়ে

গেলো। পনের চিলমাত্রও নেই। অসে একাকার।
তখনও টিপ টিপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, তবে আকাশ
অনেকটা পরিষ্কার হ'য়ে এসেছে।

নাথান টোকা আর সর্বাংগ বর্ষাভিত্তে ঢেকে
উঠান টিন ফিরলেন। 'তোরে উঠেই কোথায় বুঝি রওনা
হ'য়ে' ছিলেন। লুন পেকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন,
'ভীষণ সাইকোন গেলো ক'দিন হ'রে। রাত্তাখাট লম্বা
হলে ডুবে গেছে। রাঠে এক বুক অল। কলদের দফা
রকা। তা ছাড়া আশে পাশের পা থেকে দলে দলে
লোক এসে ছুটছে এ গাঁয়ে। তাদের ঘরবাড়ী লব পড়ে
গিয়েছে, কেত খামার ভুবে গিয়েছে অলে, কি যে হবে।
প্যাংগোভার চাতালে সবাইকে থাকতে দেওয়া হ'য়েছে
আপাততঃ, কিন্তু যেভাবে পরশালের মত চারদিক থেকে
আসতে আরম্ভ করেছে, কোথায় যে থাকবার বন্দোবস্ত
করবে; তাই ভাবছি।' উঠান টিন দুটো হাত পিছনে
বেধে উঠানে পারচারি করতে আরম্ভ করলেন।

'এবার তো দুর্বোগ বেঘমেছে, আমায় একটা যাওয়ার
বন্দোবস্ত করে দিন' লুন পে আমতা আমতা ক'রে
কথাটা বলেই ফেললো।

'কি ক'রে বাবে?' উঠান টিন কিরে দাডালেন
'পুল তেজে বাজা বন্ধ হ'য়ে আছে। শহরে থবর পেওয়াও
এখন বৃষ্টি।'।

তা হলে উপায়? কমল বোসের হল কি আর
একদিন অপেক্ষা করবে ওর গর। একটা চিঠি লিখে
যে অবস্থা জানাবে, সে পর্যন্ত বন্ধ। কতদিনে চিঠি গিয়ে
পৌছাবে ঠিক আছে!

লুন পে ঘরের ভিতর থেকে খাম আর চিঠি লেবার
কাগজের বাড়িলটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। অল
ঠেলে ঠেলে, নাশার পড়ে, আছাড় সামলাতে সামলাতে
আর বকী বানেক পরে সে বা শিনদের দরজায় গিয়ে
পৌছোলো।

উঠানে তিন চার জন লোক গাড়িয়ে। অব মজুরী
বলেই মনে হ'লো। দুজন লোক ঘরের চালে উঠে

গোলপাতা দিহে চাল ভাইছে। নিহের লোকগুলো
ব্যখারির ফ্রেন আর দড়ি এগিয়ে দিছে।

এবারে ওবারে না শিন কিংবা বুড়ি কেউ নেই।

লুন পেকে আসতে দেখে মজুরের হল শব্দাত হ'রে
উঠলো। 'বাড় কাভ ক'রে বগলো, 'মায়েলা পেয়া।'

'বাড়ীর লোক সব কোথায়?' লুন পে দাঁওয়ার
গিরে উঠলো।

'আজ্ঞে তাঁরা কেউ নেই এখানে?' মজুরদের মধ্যে
একজন বললো।

'নেই এখানে? বানে, কোথায় গেলো?'

'আজ্ঞে পরন্ত রাতে দেখাল গুলে পড়লো, আর
চালের খানিকটা বড়ে উড়ে গিয়েছিলো, তাই বা টিন
সারের বড় বিষ্টি মথোই ওদের নিছের বাড়ীতে নিয়ে
গিয়েছেন।'

বাশের বৃষ্টিটা এক হাতে আপটে না ধরলে বোঝ হয়
লুন পে ছিটকে নিচে পড়ে যেতো। পা দুটো ভীষণ
কাপছে। চোখের সামনে পুত্রীভূত অন্ধকার।

'কিন্তু বা টিন সারের দেখাল গুলে বাবার আর চাল
উড়ে বাবার থবর পেলেন কোথা থেকে? আপশে পাশেই
খোরাবুরি করছিলেন নাকি ওস্তলোক?' লুন পে হাতে
গাত চেপে কথাগুলো উচ্চারণ করলো।

'আমি থবর দিয়েছি হুজুর' আর একজন মজুর এক
গাল ছেসে এগিয়ে এলো। 'থবর সেই রাত্তিরে ছুটতে
ছুটতে গিয়ে আমি দিয়েছি হুজুর। আমি বা টিন
সারেরের কথামত এ ক'দিন এই বাড়ীর দাঁওয়ারেই
রোজ স্তোম্য কিনা। মার পায়ে ওড়ু মালিশ করতাম,
জল তুলে মিষ্টাম, অর কাই ফরমাল বাটতাম, আর
রাত্তিরে বাড়ী পাহারা লিভাম। চাল উড়ে যেতেই
থবর বোর অলে তেলে গেলো একেবারে, মা আর হেরে
ভিত্তে আব হ'য়ে কোণে গাড়িয়ে ঠকঠক ক'রে কাপতে
লাগলো, তাই বেখেই আমি টোকা মাথায় দিয়ে পড়ি
কি মরি ক'রে হুজুর দৌড়ানাম। তারপর বা টিন
সারেরের হুকুমে তেরপণ ঢাকা দিহে তেনাঘের

সাথানে নিরে গেলাম লগেগে করে।’

দূন পে চৌকাঠ পার হ’তে খেয়ে নখো গিরে
চুকলো। সারা থর জলে ভেসে গেছে। বিদ্রানীটা
দেওয়ালের দিকে ওঠানো। বেতের খুঁড়িগুলো জলে
ভিজে লপ লপ করছে। হোদে শুকিয়ে না নিলে
ব্যবহারই করা যাবে না।’ চিঠির কাগজের প্যাকেটটা
দূন পে একটা খুঁড়ির মধ্যে ফেলে দিয়ে বাইরে চলে
আসলো। তাহার বহি গুটি নামে তা হ’লে চিঠির
কাগজগুলো ভিজে অকেজো হয়ে যাবে। ওই কাগজে

আর যা শিনের চিঠি লেখা চলবে না। কিন্তু যদি
আকাশ পক্ষির হ’য়ে যায় কিংবা বা টিনের লোকেরা
খুব ভাড়াভাড়ি না শিনের ঘরের চাল হাইতে পারে
জাইলে হয়ত ভিজবে না কাগজগুলো। বা টিন বোকা
নয়। ভাড়াভাড়ি হাইবারই চেষ্টা করবে, নয়ত বলা
যায় কোথা দিয়ে কখন গুটির ফোটা এসে যা শিনের গারে
পড়বে।

দূন পে দীর্ঘ পথে উঠান পার হ’য়ে এলো।

(ক্রমশঃ)

সদ্যকাল্য ও রবীন্দ্রনাথ

ঐতর্য্যক মোষ

পর্য্য কবিতার পক্ষ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,
“কাব্যের লক্ষ্য জন্মের জর করা—পদের ঘোড়ার চড়েই
হোক আর গড়ে পা চালিয়েই হোক। সেই উদ্দেশ্য
নিষ্ঠির লক্ষনতার দ্বারা তাকে বিচার করতে হবে।
হার হলেই হার, তা সে ঘোড়ার চড়েই হোক আর পারে
হেঁটেই হোক। ছন্দে লেখা রচনা কাব্য হয় নি, তার
হাস্যের প্রমাণ আছে; গভীরচিন্তা কাব্য নাম ধরলেও
কাব্য হলে না, তার ছুরি ছুরি প্রমাণ জুটে থাকবে।

ছন্দের একটা সুবিধা এই যে, ছন্দের স্বতাই একটা
বাধু আছে, আর কিছু না হয় তো সেটাই লাভ।
সত্তা সন্বেশে জ্ঞানীর অংশ নগদ্য হতে পারে কিন্তু অন্তত
চিনিটা পাওয়া যায়।

কিন্তু লক্ষ্যে লক্ষ্যট নয় এমন একভাবে যাদু আছে,
যায়া চিনি দিয়ে আপনাকে ভোলাতে লক্ষ্য পাঠ।
মন ভোগান মালমসলা বাদ দিয়েও কেবল খাঁটি মাল
দিয়েই তারা বিভব, এমনভাবে তাদের মিত্র, তারা
এই কথা বলতে চায়, আসল কাব্য জিনিষটা একান্তভাবে
হৃদয় অঙ্গ নিয়ে নয়, তার গৌরব তার আন্তরিক
সার্বিকতায়।”

কাব্যের প্রকৃত সার্বিকতা তার বাহ্যরূপে নয়,
আন্তরিক রসগত সিঁড়ি রচনাকে কাব্য হিসেবে
সার্বিক করে তোলে। স্তব্ধ বাইরের প্রকরণটাকেই যদি
কাব্যের মাণ বলে ভুল করে বসি, তাহলে মূল বস্তুটা
হাস্যের আশঙ্ক: থেকে যাবে। বাইরের রূপটাকে
অতিক্রম করে কাব্যের আন্তর পদার্থের বাদ গ্রহণ
করাই কাব্যশাস্ত্রের পক্ষে প্রেরণকর। রসের বিচারই
কাব্যের স্রেষ্ঠ বিচার।

কিন্তু কাব্য তো কেবল রসপদার্থ নয়, তার মধ্যে
রূপেরও প্রাচুর্য্য আছে; কবি কেবল ক্রান্তদর্শী নল, তিনি
বে ব্রহ্ম: হয়েও শিল্পী। রসকে হেঁকে রূপকে লক্ষ্যগ
করলেও যেমন ঠকতে হয়, রূপকে বার দিয়ে রস নিয়ে
যাচাযাচি করলেও তেমনি একটা বন্ধনার আশঙ্কা আছে।
কাব্যের রূপ আর রস দেহ আর আত্মার মতোই স্বতন্ত্র
হবেও অবিচ্ছেদ্য,—তাদের যে কোন একটাকে বাদ
যেওয়া চলে না।

পদ্য কবিতা আর পদ্য কবিতার রূপের মধ্যে একটা
পার্থক্য থাকে। রবীন্দ্রনাথের উপমায পদ্য কবিতা হল

জড়ির ঝাঁচলা বেগুনা বেনারসী বাড়ী পরা নটীর নাচের বন্ধনে বহু নিয়মে নবত ভঙ্করোহের বসতি ; আর গল্প কবিতা হল সেই নটীর দেহের নিয়মহারা সহজ ভঙ্গি—তার স্বচ্ছন্দ চলন। গল্প কবিতাও যে কবিতা এ কথাটা কোটাতে গিয়ে কবিত্ত্ব বলের্হেন, "সে নাচে না বলেই যে তার চলনে বাণীর অতাব ঘটে কিংবা সে গান করে না বলেই যে তার কানে কানে কথার বসো কোন ব্যঙ্গনা থাকে না, এ কথা অসম্ভবের। বরঞ্চ এই অনিয়মিত কলার একটি বিশেষ গুণের বিকাশ হয়, তাকে বলব ভাবের স্বচ্ছন্দতা—আগন আত্মরিক সত্যেই তার আপনার পর্যাপ্তি। তার বাহ্যল্যবৃত্তি আত্মনিবেশনে তার সঙ্গে আত্মদের অত্যন্ত কাছের লগ্ন ঘটে,"

গল্পের ভাষা হল আটপৌরে—বাণুবের জীবনব্যাক্য তার একান্ত প্রয়োজন। গল্পের ভাবাঙ্কন দিয়ে বাধা জায়া হল পোষাকী-মাছবের জীবনের নৈমিত্তিক ভাব-দ্রবণকে বহন করার তার কৃতিত্ব। গল্পেরা নিত্য বাহ্যারে জীর্ণ গল্পকাব্যকে যদি কাব্যের বাহন করে তুলতে হয়, তা হলে সেই ভাবার মধ্যে এমন উপাদান সন্ধান করতে হবে যা তাকে তার তুচ্ছ প্রয়োজনকে অতিক্রম করে প্রয়োজনাতীতকে রূপান্তরিত করবার শক্তি দিতে পারে। অর্থাৎ হৃদয়ের পরিমিত বাঁধন থাকবে না, যে ভাবার বলা হবে সেই ভাষাটা হবে হৃদোহারা গল্প-ভাষা—কিন্তু সেই গল্পের প্রকাশভঙ্গিতে থাকবে এমনই একটা শক্তি, যা কবির ভাবাবেগকে পরিশুট করে তুলতে পারে। হৃদয়ের কৃত্রিম আবেশ এই রচনার মধ্যে থাকবে না—গল্প ভাবার বনের ভাবকে ছুটিয়ে তোলবার আবকাশ থাকলে কবিকে আর চোঁটা করে কাব্য বানতে হবে না—বনের ভাবকে মুখের ভাবার প্রকাশ করলেই তা কাব্য হয়ে উঠবে—অবশ্য যদি তাতে কাব্যোচিত রসবস্ত বা ভাববস্তু থাকে।

গল্প কবিতার ভাষা গল্প হবে—কিন্তু আনাদের বৈদম্বিন ভাবার সঙ্গে তার একটা পার্থক্য থাকবে—একপ্রকার ভাষা থেকে তা বহুতর হবে। গল্প কবিতা হলে

গাণা বাধি হবে না বটে—কিন্তু হৃদোহৃতির বাধুর্গ তাতে থাকবে। কাব্য থেকে গল্প হৃদোহৃৎ করে যাবেন—ভাষার মৌরভ বিসৃষ্ট হবে না। গল্প কবিতার ভাষা গল্প হয়েও সাধারণ গল্প হবে না—তার মধ্যে হৃদ না থাকলেও হৃদোহৃৎ থাকবে।

গল্প কবিতার বলনে গল্প কবিতাকে বরণ করলে আনাদের লাভ লোকগান দুইই আছে। গল্প কবিতার সবচেয়ে বড়ো লাভ হচ্ছে ভাবের স্বচ্ছন্দতা—যে কথা বলতে হবে তাকে হৃদয়ের নিয়মে লগ্নেত করে বলতে হবে না হৃদোহৃতি ভাবের অব্যাহিত সহজ প্রকাশকে সম্ভব করে তুলবে। গল্প কবিতার আনরা যে জিনিষ হারাই তা হচ্ছে হৃদ—যা কেবলমাত্র একটা বন্ধন নয়, যা একটা শিল্প। এই লাভ লোকগানের প্রতিদান করেই গল্প কবিতাকে তার ভাষা পাঠনা বেগুনা যাবে।

কাব্যসাহিত্যের যে ধারাটা প্রাচীন যুগ থেকে অপ্রতিরূত গতিতে বয়ে আসছে তার দিকে ভালো করে চোরে দেখলেই আনরা বুঝতে পারি যে ভাবপ্রকাশের ভঙ্গি যেমন যুগে যুগে ঝঙ্কতর হয়ে উঠেছে—হৃদয়ের মধ্যেও তেমনিই একটা লয়লতা ক্রমেই বেড়ে চলে এসেছে। কোথায় বলাক্রান্তার গড়া 'দেহদুত' আর কোথায় 'ভালগাছ!' সংস্কৃতের লঘুগুরু মাণা হৃদ গেছে। প্রাকৃতিকের পাণ্ডিত্যের আদর্শও বহুকাল আগেই বিলুপ্ত; ত্রিগুণী-পয়ারও নতুন রূপ নিয়েছে। অবিজ্ঞানকর হৃদ নায়ে পরিচিত মিলহীন প্রবহমান পয়ার, গৈরিক হৃদ, বলাকার তানপ্রধান মুক্তক হৃদ, পলাতকার বলপ্রধান মুক্তক হৃদ—হৃদকে সহজ করে তোলবার সাধনার কবির চিরকাল উৎসাহ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই নানা হৃদয়ের রঙো পার হয়ে, দেখকালে হৃদকে যেন উপেক্ষা করে গল্প কবিতার এসে পৌঁছেছেন। হৃদয়ের বোহ তাঁর ছিল না—হৃদ তাঁর কাছে কেবল ভাবকে দূর করার একটা অবলম্বন। সেই জন্যই তিনি হৃদকেও যেমন, হৃদোহৃতিকেও তেমনই সাধারণে বরণ করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথের অন্তরে

বৈচিত্র্যের গুণ যে একটা প্রবল আকর্ষণ ত্রিগুণ—গল্প কবিতা রচনা করা তাঁর সেই বৈচিত্র্য-পিপাসার একটা রসে: দৃষ্টান্ত।

কিন্তু চন্দ্র কেবলমাত্র একটা বহিঃক ব্যাপার নয় যে সেটা হইল কি গেল সে কথা নিয়ে কবিকে কিংবা কাব্য-রসিককে মাথা ঘামাতে হবে না। তাহাকে একটা মধুর নিয়মে সম্বদ্ধ করাই হৃদয়ের একমাত্র কাজ নয়—হৃদয় অনেক সময়ই কাব্যের প্রাণ; তাবৎস্তর সজে সম্বায় সযত্নে আবদ্ধ হয়ে তা একটা অগুণ্ড কাব্য সৃষ্টি করে তোলে। রবীন্দ্রনাথের কাব্য থেকেই আমরা তাঁর দৃষ্টান্ত পেতে পারি। ‘বর্ষশেষ’, ‘হরণ নিলন’, ‘তপোভঙ্গ’ বা ‘বলাক’ কবিতার ভাববস্তুকে হৃদয় থেকে একেবারে নিঃসৃত করে উপভোগ করা যায় না। হৃদয়ের শক্তি এই সব কবিতার ভাষার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে তাবকে পরিপূর্ণ করে তুলতে সহায়তা করেছে। হৃদয়ের শক্তিই এই সব কবিতার আঘাদের কাব্যরস আঘাদ করতে উৎসাহ করে তোলে।

স্বচ্ছন্দ্যাবে ভাব প্রকাশ করা—না বানিয়ে কথা বলা ও কাব্যের চরম সার্থকতা নয়। কাব্য তো কেবল তত্ত্বের ভাঙার নয় যে ভাববস্তুকে সহজ স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে ব্যক্ত করলেই সব দায়িত্ব নিটে যাবে; কাব্য রসের ধনি—তাবকে বিভিন্ন উপাদানের মধ্য দিয়ে রসমণ্ডিত করে পরিবেশন করাই কবির কাজ। দার্শনিকের কাছে ভাবপ্রকাশের স্বত্বা একান্ত প্রয়োজন তিনি সত্যের দাস; কবি তাবকে সৃষ্টিরে তুলবেন, কিন্তু তাকে রসে মধুর করে পরিবেশন করবেন—তিনি হৃদয়ের সেবক। দার্শনিক যদি শিল্পীও হন তবেই তিনি কবি হতে পারেন। বাস্তবিক পক্ষে ভাবাহুবাধন কাব্যের উদ্দেশ্য নয়, কাব্যের লক্ষ্য হল ভাবাহুতব।

হৃদয় এই ভাবাহুতবের অন্ততম সহায়ক। হৃদয়ের দোলা ভাষার মধ্যে যে একটা আবহাওয়া সঞ্চারিত করে দেয় তা আমাদের মনকে স্রবীভূত করে দিয়ে ভাবাহুভূত বা হসাহুভূতিকে সহজ করে তোলে। ‘ভাষা ও হৃদয়’

কবিতার রবীন্দ্রনাথ যে সত্যটিকে ব্যক্ত করছেন তা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। মাধুর্যের ভাষা নিত্যবাবহারে জীর্ণ হয়ে যায়—হৃদয়ের পাখা দিয়ে তা তাবলোকে বাত্মা করতে পারে। গল্প ভাষার মধ্যে আছে সংকীর্ণতা—গানের মধ্যে আছে অসীমের, অনির্বচনীয়ের আভাস; হৃদয় তাবাকে তাঁর সংকীর্ণ অর্থ থেকে সীমাতীত ভাবলোকের দিকে টেনে নিয়ে যায়!

যেটুকু এই যে, তাবসৃষ্টি যদি কবিতার লক্ষ্য হয় তা হলে গল্প কবিতার আমরা তা বেশী পরিমাণে পাব; আর আনন্দসৃষ্টি যদি কবিতার লক্ষ্য হয়, তা হলে গল্প কবিতার আমরা তাঁর অনেকখানি হারাব। গল্প কবিতার আমরা আনন্দজন্যই হসকেও পরিপূর্ণভাবে পাব না। তাবের সফল প্রকাশই সেখানে বড়ো হয়ে উঠবে—সারা রাতের আকাশকে বাদ দিয়ে পূর্ণিমার চাঁদের কথা বলাই তাঁর ধর্ম হবে। হৃদ্যাবদ্ধ কবিতা রসপ্রাণ, গল্প কবিতা ভাবজীবী। যেখানে কবি দার্শনিক হন, সেখানে তিনি হৃদয়কে বরণ করেন; যেখানে দার্শনিক কবি হন, সেখানে গল্প কবিতাই সহজ সৃষ্টি।

সুতরাং কবি যখন তাঁর হৃদয়ের ভাবটিকে গল্পভাবে তাঁর পাঠকদের কাছে পরিবেশন করতে চাইবেন—তখন গল্পকবিতাই তাঁর ভাবপ্রকাশের উপযুক্ত বাহন হবে। গল্প কবিতাতেও গিরিক সত্ত্ব, রোমান্টিকতাও গল্প কবিতার মধ্যে অভিব্যক্ত হতে পারে—কিন্তু গিরিকের মাধুরী রোমান্টিকতার আবেগ হৃদয়ের মধ্য দিয়ে বহত সবলে আত্মপ্রকাশ করতে পারে, গল্পকবিতার ততখানি সবলে বৃত্ত হতে পারে কিনা সে বিষয়ের সংশয়ের অবকাশ আছে। আবার গল্পকবিতার ভাবের যে সফল প্রকাশ সত্ত্ব, পদ্যকবিতার তা অনেক সময়ই সত্ত্ব হয় না। কবিচিত্ত বন্দন তাবের ঐশ্বর্যকেই স্রেষ্ঠ মর্যাদা দিয়ে তাকেই কবিতার মধ্য দিয়ে সৃষ্টিরে তুলতে চাইবে, তখন কবি গল্প কাব্য রচনা করবেন।

হৃদয়ের মাধুরী বা আবেশ গল্প কবিতার থাকে না; সুতরাং গল্প কবিতা পড়লেই একটা যে ‘আবেশ মনে

আগে গল্প কবিতার সেটা পাওয়া যায় না। এই কতিটা কবি গল্প কবিতার মধ্যে নানাতাবে পূরণ করেন। প্রকালভির জীভুতা এই কতিপূরণের একটা বড়ো উপাদান। হৃষের যে আকর্ষণ সেটাকে হাতিয়ে পাঠক বাগ্‌ভবির বৈচিত্র্যের দ্বারা পান। বিদগ্ধ উজ্জির চমক হৃষাশিরের অভাবের পরিপূরক হয়ে ওঠে। এই চমকের মূলে থাকে ব্রহ্মজির শাপিত ছাতি বা বিরল ব্যবহৃত শব্দের পরিণামী ফল। হৃষের চমকবাক্যের অভাব যেটোতে এই চমক পায় না—কিন্তু কবির সচেতন প্রয়োগের নিদর্শন হিসেবে পাঠকের কাছে আশ্চর্যকণ্য করতে পারে। বিদগ্ধ উজ্জির দ্বারা দিয়ে বননকে পাঠক সমাজের কাছে পৌছে দেওয়ার এই রীতি রবীন্দ্রনাথের যেমন, আধুনিক কবি সমাজেও তেমনই প্রচলিত—এটা গল্প কবিতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ।

অবশ্য এই সচেতন বৈদগ্ধ্য কৃত্রিম অর্থাৎ বোহিত লালের অভিযোগ অমূল্যের একটা ‘পালোয়ানী পাঁচ’ হয়ে উঠতে পারে। রবীন্দ্রনাথের অল্পতম স্রেষ্ঠ কবিতা ‘শুধিবীর’ বিজ্ঞে লেখনী দ্বারা করে বোহিতলাল যা বলেছেন তা উপেক্ষা কর। তিনি বলেছেন, “স্বীকার করি, ইহাতে একটা ধনি স্রোত বহিরাচ্ছে” এবং তাহা কাব্যহৃদয়ে বর্জন করি। কিন্তু প্রশ্ন এই, ইহা কি কবিতা হইরাছে? এই রচনার আগাগোড়া একটা আতিশয্য বা অবরহিত—‘একেই’ বৃষ্টি প্রাণপণ প্রচলিত থাকতে কাব্য প্রেরণা কোথায় স্থূল পায় নাই। ইহাতে আছে কতকগুলি কথা, কথা, আর কথা। এমনটির কথা আরও সহজ ভিত্তিতে, বিতর্কিত ভাষায় সিদ্ধি করিলে আরও সরল ও কৃত্রিমতাপূর্ণ হইত। রবীন্দ্রনাথের মত ভাবকের চিত্তা-গভীর ভাবদ্বারা অর্থপূর্ণ হইবেই। অর্থদৌরব্যকে কাব্যদৌরব্য বান করিবার জন্য কতকগুলি কষ্টকল্পিত ত্যাকলাপানো উপহার কোনো প্রয়োজনই ছিল না। ভাব-অর্থ-নিরপেক্ষ চিত্রকলায় রেখা-লেখা-বিলাসের মত, অতিশয় কৃষ্ণ ও সামান্য বস্তুর—জীর্ণতা ও জরাগ্রস্ত বস্তুকে কেবল

কল্পনার সাহায্যে চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলা কবিকর্ম নহে। এ সকল রচনার যে ‘হ্রিদ্য’ আছে, তাহার কোনও বিশিষ্ট দৌরব্য নাই; টানা সহজ গদ্য যেটুকু অনায়াসে চলিতে পারে, তার মস্ত নূতন পংক্তি প্রচার প্রয়োজন নাই।”

বিতর্ক কাব্যাদর্শের দিক থেকে বিচার করে দেখলে বোহিতলালের এই উজ্জির সারবত্তা অস্বাভাব্য করা কঠিন হবে না। গল্পও কাব্য হতে পারে—তার জন্য তাৎকালিক পংক্তিভেদে বিতর্ক করে সাঙ্গানোর কোনো প্রয়োজন নেই। রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত মহাশক্তি বা বাইবেলের ইংরেজী অম্বাবাদের কথা বলেছেন—সেই সঙ্গে নিজের ইংরেজী গীতাঞ্জলির উল্লেখ করে গল্প কাব্যের সার্বকতার উদাহরণ দিয়েছেন। কিন্তু ওগুলো কাব্যার্থে সম্পূর্ণ হলেও গল্প। তাইবর্ষ পরিবেশন করাই এগুলোর প্রধানতম লক্ষ্য—এগুলোর কাব্যরস একটা উপরি পাওয়া।

অবশ্য গল্প কবিতার লেখক বা পাঠকও এ অভিযোগে লুপ্ত হয়ে থাকবেন না। বোহিতলালের মতব্যের সারবত্তা স্বীকার করেও বলা যেতে পারে যে গল্প কবিতা গল্প হয়েও কবিতা—গল্প আর কবিতার মধ্যে বিরোধের কোনো কারণ থাকতে পারে না। গল্প রচনার মধ্যে কাব্যের যে গুণাবলি আছে গল্প কবিতা তারই নিদর্শন। পংক্তি বিভাগটা এখানে বড়ো কথা নয়। ‘সিঁপিকার’ মতো একটানা গদ্যে লিখে গেলেও কোনো কতি হয় না। বস্তু নাচের ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি অবশ্যস্বাভাবিক—কিন্তু চন্দ্র অস্বাভাবিক। ওরুও চোখের নিম্নে যেটুকু দেখা যায় সেটুকু অর্থও হয়েও একটা-একটা; তেমনই বাগ্‌ভবের বিদ্যায় দেখানে, লেখানে পংক্তি শেষ করে অর্থও গল্প প্রবাহকে কাব্যের পরিচিত পদ্ধতিতে বিভক্ত করা হয় এই মাত্র।

যোট কথা হল এই যে গল্প কবিতা কবিতার বাহ্য-রূপের নির্বর্তনের ফলে সৃষ্ট হয়নি—গল্প কবিতার পরিবর্তিত এ নয়—গল্প কবিতা কেবল গল্প আর গল্প

কবিতার যথাগা একটা ধারা। গভ বৈখানে লিখিক হয়ে ওঠে সৈখানেই তো কবিতা। সেই গদ্যভঙ্গী কবিতার পংক্তি বিভাগই গদ্য কবিতার গোড়াকার কথা। ক্রমে গদ্য কবিতা ভাবের হ্রস্বোমুখ্ত আকারে কাব্যোচিত প্রকাশ হয়ে উঠেছে। গদ্য কবিতা কবির জীবন জিজ্ঞাসাকে যতখানি প্রকাশ করতে পারে তাঁর বসন্তকৃত্তিকে ততখানি ছুটিয়ে তুলতে পারে না। গদ্য কবিতা কবির মনের কথাকে যতখানি ব্যক্ত করে, তাঁর

মনের গভীরে যে কথা শোনা যায় না তার অভ্যন্তর ততখানি নিতে পারে না। হৃদয়ের শির সব শিরের বতোই কবির অগোচরেই তাঁর সত্যের গোপন অংশকে প্রকাশ করে দেয়, কিন্তু গদ্য কবিতার পহিগামী তল এতটা গভীর বা সুদূরপ্রসারী নয়। -কবিতা হয়েছে গদ্য কবিতা তার সীমাকে ছাড়িয়ে অসীমের অভিসারে আত্মহারা হতে পারে না—সচেতন মনের বাস্তবরূপে তা আবদ্ধ হয়ে থাকে।

বাংলায় সংস্কৃতিকেन्द्र—মশোহর

ঐশ্বর্যেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

একালে বাংলা বাদিক্য বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষারও বেলা বসেছে কলকাতার। আগেকার দিনে বাংলাদেশ জুড়ে যেসব সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে উঠেছিল আজ তাদের প্রতিপত্তি ও গৌরব জুগুপ্সার। সেদিনের নবদ্বীপ, বর্ধমান, ক্রিমপুর, বশোহর—আজ অর্ধ-বিশৃঙ্খিতের সজ্জাহারাধেয়া।

চারিদিকের বন হরণ করে বশোহর একদিন প্রকৃত কীর্তি অর্জন করেছিল। প্রথমেই হরতো আমালের মনে পড়বে তারতচন্দ্রের বিখ্যাত রচনা :

বশোহর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম

মহারাজ বঙ্গ কর্তব্য।

নাহি মানে পাতলায় কেহ নাহি আঁটে তার

ভয়ে বত ভূপতি যাত্রা।

এই পশ্চিমালী ভূপতি একদিন তাঁর "যোড়শ হলক" হাতী অমৃত ভূষণ সাদী আর বাহার হাওয়ার ঢালী" নিয়ে দিল্লীরকণ্ড সন্নত করে তুলেছিলেন। তারতচন্দ্রের 'অন্নবান্ধলে', রাধাকান্ত বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত্রে' প্রতাপচন্দ্র যোবের 'বন্দাধিপ পরাজয়ে', রাধাপচন্দ্র রক্তির 'বনের শেখ বীরে', রবীন্দ্রনাথের 'খোঁজাছুরাগির

হাটে', কীর্ত্তনেন্দ্রনাথের 'প্রতাপাদিত্য' এবং আরও নানা গ্রন্থে এ নাম স্মরণীয় হয়ে আছে। ঈশ্বরীপুরে এবং বুঝবাটে এখনও রয়েছে তাঁর কীর্ত্তিক। দুটি স্থানই বর্তমানে খুলনার মধ্যে। খুলনার রাজ্য সীতারাবের রাজধানীও ছিল বশোহর জেলার রাজ্য। বহুকুমার অস্বর্গত বহুসরপুরে।

পূর্বেকার বশোহর এবং এখনকার বশোহর এক নয়। অঞ্চল আধুনিক বাংলার বশোহর ছিল পাঁচটি বহুকুমা, ৬৬২২টি গ্রাম নিয়ে। বহুকুমা পাঁচটি হচ্ছে—সদর, বিনাইবহ, বাগরা, নড়াইল ও বনগ্রাম। বণ্ডিত বাংলার বনগ্রাম-বহুকুমা এসে পড়েছে পশ্চিম বঙ্গে—বর্তমান বশোহরের বাইরে। তনসল্লা ও বনসল্লায়ে বশোহর সমৃদ্ধ। তৈরব, কুমার, মধুনতী, নবগঙ্গা, চিত্রা প্রভৃতি এর নদী। খাল বিলও কম নয়। নদী বহু বাগরার কোন কোন অঞ্চল আজ পূর্বপ্রী হারিয়েছে।

প্রতাপাদিত্যের সময় দক্ষিণ বঙ্গের বহুলাংশ এমনকি কলকাতার নিকটবর্তী অনেক স্থান তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। সে রাজ্যের দক্ষিণভাগে ছিল আগমুত্র প্রসারিত বিশাল মৃদবন, পশ্চিমভাগে প্রায় সমগ্র

চক্ষিপ পরগণা ছিল তার অংশ, উত্তরভাগ ছিল নদীয়ার
প্রান্ত পর্বত বিহীন।

ইংরেজ রাজত্বকালেও মহদিন পর্বত বর্তমানের মূলনা
কোলা ছিল বশোহরের মহকুমা দ্বারা।

প্রতাপাদিত্য সীতারামের মূল দেশ বরেন্দ্রে বহুবাল
হ'ল। কিন্তু পরবর্তীকালেও বশোহর কীর্তীহীন হয় নি।
ইংরেজ শাসনের প্রথম আরম্ভে নীলবিদ্রোহে বশোহর
বীরব্রতের পরিচয় দিতেছে। শিক্ত অশিক্ত বশোহর-
বাসী একত্রে দাঁড়িয়েছে অত্যাচারের বিরুদ্ধে।

এ প্রদেশে মনে পড়ে মহীপ্রাণ শিশিরকুমার এবং
তার অমৃতবাজারের কথা। শিশিরকুমারের জন্মপট্টা
পল্লী—বাগরাই পরে ব্যাভিলাত করেছে 'অমৃতবাজার'
নামে।

শিমে, সাহিত্যে এবং ধর্মসাধনাত্তেও বশোহর গৌরব
অর্জন করেছে। স্বাধীনতা ও ভারতের বহু নির্দশন রয়েছে
এর মন্দিরে ও মন্দিরে। কালীবাটও এককালে
প্রাচীন বশোহর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাই বশোহর
মূলনার ইতিহাস লেখক ৮শতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়
বলেছেন, "মহাপ্রাচীন আদি যুগেই বশোহর রাজ্যের
দক্ষিণ সীমায় দুই মিকে দুইটি পীঠস্থান হইয়াছিল।...
কালীবাটে মায়ের ৪টি অঙ্গুলি পড়িয়াছিল।... পূর্বাংশে
মহানাকুলে মায়ের পাণিপত্র পতিত হয়। 'বশোহরে
পাণিপত্রক দেখতা বশোহরেরবরী।' বশোহরের চাঁচড়া
দশমহাবিদ্যার কাঠের মূর্তি এবং বিভিন্ন স্থানে চাচড়া
শব্দী, গম্বা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেব দেবীর খেলব মন্দির প্রভৃতির
মূর্তির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, উক্ত ইতিহাসিক তার
সচিহ্ন বিবরণ দিয়েছেন। কোথাও কোথাও বৌদ্ধ
বিহার ছিল বলেও তিনি অনুমান করেছেন। মূলদিক
যুগের বাজারস্থান আগির বহু কীর্তি বশোহর মূলনা
জুড়ে এখনও বিদ্যমান। পঞ্চাট বীর্বিও মসজিদ
স্থাপনে তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন।

বৈষ্ণব যুগের চার জন প্রসিদ্ধ সাধক ছিলেন বশোহর
বাসী—রূপ, সনাতন, লোকনাথ ও হরিদাস।

কলিকাতা মূলনা রেলপথে চেষ্ট্রিয়া বলে একটি
রেল স্টেশন আছে। স্থানটি বশোহরের অন্তর্গত। আর
তার নিকটেই 'প্রেমভাগ' গ্রাম চৈতন্তদেবের প্রিয় শিষ্য
রূপ ও সনাতনের গৃহস্থস্থিত বহন করছে। গ্রামের
নামেও তাঁদের দিবা প্রেমের স্মরণ লেগেছে। হলেন
শাহের অবাত্য এই দুই তাই অধিক বিবর আশর
জনহিতে উৎসর্গ ক'রে সংসার ত্যাগ করেন। এঁদের
অরুণচিহ্ন এখনও ঐ গ্রামে কিছু কিছু দেখা যায়।
প্রথমতঃ, এঁদের কাটানো সাতটি জলাশয়। দ্বিতীয়তঃ
মঠবাড়ী—রূপসনাতনের প্রসিদ্ধ দেব মন্দির। তৃতীয়তঃ
পাটবাড়ী—এখানে পাটপুজা, ধোলপুজা প্রভৃতি উৎসব
হ'ত। চতুর্থতঃ মূলবাড়ী—এখানে ছিল মন্দির মূলের
বাগান আর পুকুর।

বশোহর—বাগরা মহকুমার 'ভালখড়ি' নামে একটি
গ্রাম আছে। সেইখানে লোকনাথ গোস্বামীর জন্ম।
যুগে তিনি চৈতন্তদেবের অশ্রুতঃ 'দু' তিন বছরের বড়
ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল পদ্মনাথ, মাতার
নাম সীতা। পদ্মনাথ ছিলেন অষ্টভাচারের শিষ্য।
পুত্র লোকনাথকে তিনি পাঠিয়ে দেন গুরু কামে
পাতিপুরে। সেখানে তাঁর সত্যার্থ হ'ল বহু শ্রীচৈতন্ত।
অষ্টভক্ত স্বাক্ষরে লোকনাথকে মহাপ্রভুর হাতে সঁপে
দিলেনঃ

"এত কহি" প্রিয় শিষ্য গৌরে সন্মগ্ন।

শ্রীগোরাঙ্ক লোকনাথে আশ্রয় কৈলাঃ"

পূর্ববঙ্গ জব্বের পথে গৌরান্দেব ভালখড়িতে
লোকনাথের গৃহে ন্যায়পণ করেছিলেন। চিরকুমার
লোকনাথ গৌরান্দেবের আদেশে ভক্তিবর্ষ প্রচারের
অন্ত বৃন্দাবনে গিয়ে বাস করেছিলেন। বিখ্যাত ছত্র
গোস্বামীর তিনি অঙ্গভন।

বেনাপোল রেল স্টেশন থেকে কিছুদূরে কর্ণাজ
পুকুরিয়া গ্রাম। সেখানে আছে রামচন্দ্র খাঁর পরিখা
খোঁদিত বাজবাজীর ক্ষয়সাধন। জনহিতার্থে তিনি

একশ' পুস্তক কাটিয়েছিলেন। এই সময়ের কনিষ্ঠ পুত্র দুঃস্বপ্ন নামক ছিলেন অসামান্য শক্তিত। 'বিষপ্রদীপ' নামে ১৮ পৃষ্ঠে বিস্তৃত এক বিরাট সংকলিত বিখ্যাত্য তিনি চেনা করেছিলেন। তার ছুই খণ্ড মাত্র পাওয়া গিয়েছে। একশও ভ্যোটিবশান্ত্র সম্বন্ধীয়—হরহর্ষে লভনে, ইতিহাস অদিস লাইব্রেরীতে। আর একখণ্ড সঙ্গীতশাস্ত্র সংক্রান্ত—নেপাল থেকে উদ্ধার করেছিলেন মহানিহোপাধ্যায় চরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

একালের সাহিত্যিকদের মধ্যে সর্বপ্রথম যেন পড়বে নবদুগের মহাকবি মাইকেল মধুসূদনকে। তাঁর আবির্ভাবে মজ্জা হরহর্ষে সাগরগাঢ়ি গ্রান, অমর হরহর্ষে কলোস্তাক নদ। তাঁর ভ্রাতৃশূলী স্মৃতি মানসুনারী যন্ত্রণা যশোহরের গৌরব বৃদ্ধি করে গেছেন। আর কাব্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য 'মহিলা' কাব্যের কবি সুরেন্দ্র নাথ মজুমদার।

বাংলা নাটক ধার হাতে নবজীবন লাভ করেছিল, 'নীল বর্ণন' চর্চাচিত্র। সেই বীনবন্ধু মিত্রও যশোহরের অধিবাসী।

কথাসাহিত্যে অদ্বৈত 'বর্ণলতা'র প্রতীক ভাবকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, সমালোচনা সাহিত্যে ঠাকুরমাণ্ডল সুখো-

পাধ্যায়। ঐতিহাসিক রায়চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ও ৮০সতীশচন্দ্র মিত্র মহাপুত্র যশোহরের ব'লেদারী করেছেন। সত্যোদয়িত যুগের তৃতী পুরুষ বহুনাথ মজুমদার মহাপুত্র সাহিত্য ভাণ্ডারের কিছু চিত্তার সত্ত্ব রেখে গিয়েছেন। খ্যাতনামা নবীন লেখকদের অনেকে যশোহরের অধিবাসী।

বঙ্গের অগ্রজ কেলার মন্ত এখানেও জনসমাজের মধ্যে প্রবাহিত হবে চলছে লোক-সংস্কৃতির বাতাস—পাঁচালী, বাতাস, ত্রীভূমি, বাউল, সারিগান, জাহী, জাহীর গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। বণিত বাংলায় হুহুতো সে বাতাস অপেক্ষাকৃত ক্ষীণ হতে এসেছে, তবু লুপ্ত হুহুনি। আর বহুদিনের গৌরবচ্ছায়া নিরে ঠাড়িয়ে আছে অতীতের সমৃদ্ধ গ্রামগুলি—কালিয়া, 'লোহাগড়া, লক্ষীপাশা, ইতন, মল্লিকপুর প্রভৃতি। বড় শাস্ত্রচর্চা, বরাহতা, সামাজিকতা এবং আমোদ উৎসবের দৃষ্টি তারাজাত্য ক'রে তোলে আতঙ্ক অধিবাসীদের নদ। এখানে কালের বজ্রার বৃষ্টিবা অতীত নিতে চলছে বিব্রত, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত।*

*কলিকাতা বেতার কেন্দ্র হইতে প্রচারিত। অল-ইতিহাস-বেতারের সৌজ্যে।



সঙ্গিনী

মানবেন্দ্র পাল

সুত্রত অক্লিষ খেবে কিরল সেদিন একটু দেরিতে।
ছুটি পেয়েছিল ট্রিক পাঁচটাতেই—স্বপ্নবাঝারের প্রথম
ট্রায়টা ধরতেও অসুবিধে হয়নি, কিন্তু তত্ত্বসুত্রদিনের
মতো হুটার মধ্যে বাড়ি কিরতে পারল না।

ট্রামে উঠে একটা সিগারেট ধরতেই হঠাৎ মনে
পড়ে গেল আজ আজুয়ারি মাসের ন' তারিখ।

চমকে উঠল সুত্রত যুগ্ম আনন্দে আর কীণ রোমাকে।
মনে মনে ভাবল, উঃ খুব লম্বা মনে পড়েছে তো, নইলে
বাড়ি গিরে স্ততার কাছে আজ অশ্রুজ্বলের সীমা পাকত
না।

কলেজট্রাটে আসতেই সুত্রত নেমে পড়ল। একটা
কিছু নিরে আজ বাড়ি কিরতে হবে। নইলে বড়ো
বেয়সিক মনে বাবে স্ততার কাছে।

বেশি কিছু সেনা হল না। নার্শারি থেকে কিনল
এক গাছা বেলফুলের মালা—আর একটা রজনীগন্ধার
তোড়া। আর পকেটে পুরে নিল চাষআনার ডালমুঠো—
বড়ো ভালোবাসে স্ততা।

মনে মনে হাসল সুত্রত,—কেন্দ্রান্ত্রী স্বানীর প্রাঞ্জলিত
বৌকে উপহার দেবার আত্মনিক কঠিনস্বত্ত্ব জিনিষ এর
চেয়ে বেশি গুণনে উৎসাহে যেতে বেঙেরা টিক নয়। তাতে
মূল্যের প্রাচুর্য বাড়ি কিছু কঠির ঐশ্বর্য থাকে না।

সুত্রত খুশি হয়ে আর একটা সিগারেট ধরালো।
শীতকালের ছোট বেল।। সাতটার মধ্যেই রাত হয়ে
গেছে। অজবিন এতকণ চা বেয়ে সুত্রত ইলিচেরের
গা এলিয়ে দেয়। কিন্তু আজ—

আজ এতকণ নিকরই স্ততা অক্লিষ থেকে নিরে
বলে আছে তার পথ চেয়ে। হরতো অজবিনের মতো
একসঙ্গে চা খাওয়ার আশার জায়গা চা খাওয়া হয়নি
এখনো। নিকরই মনে মনে একটু তাবয়ে এত দেরি
দেখে। হঠাৎই আজ সুত্রতর এই ধরণের চিন্তা করতে
যেমন ভালো লাগে।

আজ দু'বছর তাদের বিয়ে হয়েছে। দু'বছর আগের
স্ততা আর আজকের স্ততা—বিশেষ প্রভেদ চোখে ঠেকে
না। দু'বছর আগেরও যেমন বাহা ছিল—যেমন বড়
ছিল—যেমন ছিল পথে ঘাটে অবাধ গতি, আজও সব
ট্রিক তেনেই আছে। প্রভেদের মধ্যে—নির্দিষ্ট
একটু সিঁদুর চিহ্নিত হয়েছে, মাথার ওপর উঠেছে
কাপড়ের অবস্তরী—খোঁটা নয় আবরণ,—যেটুকু না
থাকলে লোকলজ্জার অসম্মান ঘটে।

এর লগে আর একটু পরিবর্তন—ঘনিষ্টতা।

আগে কত দিন ডালহৌসীরা একই ট্রামে দুজনে
গিরেছে; কেউ বেন কাউকে চিনত না—চেনা দিতেও
চাইত না। হঠাৎ চোখোচোখি হলে বেন দুজনেই উঠত
পিউরে—অপমানেরও নয়, অসুস্থগণেরও নয়—এবনি একটা
চেনা অবাধ অপরিচয়ের লজ্জা।

আজ এই দু'বছরের মধ্যে সেই লজ্জার ব্যবধান ঘুচে
গেছে। তার বদলে কী আশ্চর্য ঘনিষ্টতা এসেছে!

পরের ঘেরে স্ততা—পনেরো বছরের বালিকা সে
নয়। ডালহৌসী স্ততারের পাঁচভলা প্রাণাঙ্গের চণ্ডা
সিঁড়ি বেয়ে মোক্তার তাকে ওঠা নামা করতে হয়। পরলা
তারিখে পে-সীটে লই করে টাকা বাখিরে—ত্যানিটি
মাগ হাতে নিরে সে বাড়ি করে।

সেও আজ এক বিশেষ পুরুষের গন্তে ভাবে—স্ততা-
অস্তত ঘটনার কথা চিন্তা করি ব্যাকুল চোখে পথ চেয়ে
থাকে!—আশ্চর্য!

বাড়ি এলে সুত্রত কিছু একটু আশ্চর্য হল। স্ততা
এই মাত্র কিরছে অক্লিষ থেকে। ছাড়া কাপড়
আলনার অপোহাল ভাবে রেখেই বাগরুনে গিরেছে
হাতখুণ বুতে।

সুত্রত একটু মবে গেল। টিক এ রকম বেন আশা
করে নি। ও বেন মনে মনে দেখছিল—আজ স্ততা
কিরে এলছে একটু আশ্চর্যই। ঘরবানাকে গাধিরেছে

একটু বিশেষ ভাবেই। হরতো তার টেবিলে আলিয়ে
যেথেকে ছোটো পুণ কাটি। আর চারের সঙ্গে নিশ্চয়ই
ও তৈরি করেছে তার মনের মতো করে কলাই খুঁটির
কুচুরি।

কিন্তু এ ঘেন চঠাইই উপোপতন। শুধু হরত
নিখেকে লানলে নিল। ভাবল—কী করা যাবে এখন?
এখনিতো ও বেরিয়ে আসবে কাপড় বদলে। তার
আগে কী ভাবে বেশ একটা স্টাফ—

কিছু দ্বির করবার আগেই মরজা খুলে শুভা বেরিয়ে
এল খবরবে শাড়িতে কদা মুখের ওপর কৌটা। কৌটা
অলবিন্দু মুহুর্তে মুহুর্তে।

—কী আক এত দেরি?

শুভা একটু হেসে জিগেস করল।

হরত বললে একটা মিথ্যা প্রহসন করে,—তোমার
খুঁজতে গিয়ে।

—আমার খুঁজতে! সত্যিই শুভা চমকে গিয়েছিল।

হরত একটু হেসে পরিস্থিতিটা বালকা করে দিল,—
তোবেছিলাম, আজ বিশেষ দিনে নিশ্চয়ই জুপি লফিস
সেবে কিরবে একটু তাড়াতাড়ি। পাছে কলাইখুঁটির
কুচুরি ছুড়িয়ে যায়, তাই আগে ভাগে আমিও দুটে
এসেছিলাম। কিন্তু এসে দেখি—হা হতোমি!

শুভা খিল খিল করে হেসে উঠল।

বললে—নিশ্চয়ই ভেবে বসলে, অর্ধাঙ্গিনীকে তোমার
কেউ অপহরণ করেছে। আর ওমনি ছুটলে কি
ধর্মাহিকরণে?

হরত মালা আর রজনীগন্ধার তোড়াটা টেবিলে
বেধে বসলে,—অপহরণের কাণটা ছিল রেড্ডা মুগের
দিকে। তাতে বরক বীরত্ব দেখাবার একটা সুযোগ
ছিল। কিন্তু এ ঘোর কদমিতে অপহরণের চেয়ে
অপসরণের আশঙ্কাতাই বে বেশি—সিংগল চুপি চুপি
অপসরণ। এতে আবার বীরত্বের অপচেষ্টার চেয়ে
সুযোগ বা কিছু তা অকৃত্রিম অপঘণের।

সময়ে হেসে উঠল শুভা।

বললে—বা: চমকায় বসেছ। যদি কোনদিন
সৌভাগ্য হয় 'হুমমশদর' আদেশ পাবার, সেদিন দুকে
গিয়েও তোমার বাবা বিভ্রান্ত জ্বলবে না।

শুভা এবার আর কথা না বলে শুধু শুধু করে গান
গাইতে গাইতে রজনীগন্ধার তোড়াটা এনে রাখল
বিছানার কাছে ছোট্ট টিপাইটার ওপর। আর মালা
গাছটা টাঙ্কিয়ে দিল বেওয়ারে আটকানো একটা বড়ো
আয়েল পেটিংএর গায়ে।

কণকাল বন্ধ হয়ে রইল শুভা। হু হু করে উঠল
ওর হুই চোখ। বললে নিচু গলায়—এসে, বাবাকে
প্রণাম করি।

হরত কোনো কথা বলতে পারল না। শুধু এগিয়ে
গেল। শুভা বললে—গত বছরেও বাবা এমনি দিনে
কত আনন্দ করেছিলেন। আর আজ—

আজকেও যে আনন্দ থু বন তা নয়। গত বছরে
হরতর বাবা দীর্ঘকাল ছিলেন। জীবনের শেষ দিনটা
পর্বত প্রাণপাত পরিশ্রম করে পেয়েছেন। শুভা বলেছে
কতবার—বাবা, এ বছরে আর কত বাটবেন? আপনাত
আশীর্বাদে—

নববয়সকে আঁধার করে বলেছিলেন—জুপি গৃহলক্ষী
হয়ে গারামিন পরিশ্রম করে পরমা উপায় করেছে আর
আমি বলে বলে তাই দেখব! তা হতে পারে না।
আমার শরীরেও বড়টুকু কুলোয়—তার ক্রটি করব না
না। আজ যদি আমার হরতর উন্নতি হয়—!

বৃদ্ধের সে ক্ষোভ অবশ্র আশ্রয় যেতেনি। কিন্তু
উন্নতি করতে চলেছে শুভা। সেই কথাই হচ্ছিল
আজ।

—সামনে তার বিয়াট প্রসূপেই। বড়ো সাহেব
যেবে ছোটো। সাহেব পর্বত বেকোনেও করেছে শুভা
মুখাঙ্কিকে। সহকর্মীরা নাকি ঈর্ষা প্রকাশ করেছে
সিঙ্গেল মুখাঙ্কির এই ভাগ্য পরিবর্তনে।

গম করতে করতে শুভা হেসে ওঠে। হরতর

হাতখানা একসময়ে নিজের নুকের ওপর টেনে নেয়।

সামনেই পুর্বদিকের পর্দা-ফেলা খোলা জানলা দিয়ে শীতের আকাশের ত্যাক্যানে চাঁদের আলো উঁকি মারছে। নীরব নিস্তব্ধ শীতের কলকাতা।

শুভা বললে নিচু গলায়—আমার প্রবেশান হল কী বেবে?

আজ হঠাৎই যেন স্তব্ধ কেমন নির্লিপ্ত হয়ে পড়েছে। শুধু বললে—কী চাপ?

—কুমিই বলো না, কী চাইতে পারি?

—চাইবার জিনিষের কি অভাব আছে? শাড়ি, ব্লাউজ, রিটগারচ থেকে রাজহুস্ট পর্যন্ত চাইতে বাবা নেই। অভাব আছে, সহজে পাবার যতো সামান্য জিনিষের চাহিদার।

শুভা বললে—তবে থাক।
হল না।

—কী চাই বলোই না?

শুভা একটু হাসল।

—বলব? রাগ করবে না?

সুভদ্রা বললে—না।

শুভা বললে—চাচ্ছিলাম একটা ছোট্ট হেলো বাহন করতে। বেশ প্রকার লৈখতে—আর খুব ছুঁ। খরচের কথা? তা আমারের দুজনের উপায়ে একটা ছেলেকে বাহন করা খুব শক্ত হবে না।

সুভদ্রা এবার হেসে উঠলো হো হো করে। বললে—পরের ছেলে বাহন করতে বাত কোল হুণে? তোমার বার্ষিকতা তো এখনো প্রমাণই হয় নি।

শুভা চমকে ওঠে। বলে—না না, রুখে করো। আমার আর শু সাধে দরকার নেই। 'কোলে' ঝাঁকালে ছেলে বেয়ে নিয়ে কি চাকরি করা চলে?

শুভা একটু ধামল। তারপর আবার বলল—বেয়ে জর নিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু মেয়েলি পথ বিসর্জন দিয়েছি ইংরেজি আর্টক্লিপ লাল থেকে। চাকুরে বিকি মেয়ে—কপালে বরতো ববই ছুটত না তো আবার—

শুভা স্নান হাসল।

সুভদ্রা বললে—এ অভাব কতদিন বইবে?

শুভা হঠাৎ দৃঢ় আলিঙ্গনের যথো স্তব্ধকে ঘনিষ্ঠ করে নিল। বললে—বতদিন না জুনি ঝাঁকালে পারছ তিন জনের সম্পূর্ণ হারিষ নিয়ে।

—বরি সারা জীবনে না পারি?

শুভা মুহূর্ত হাসল;—তাৎপর্ষ্যে কি মনে কর তোমার সে লক্ষ্যের চেয়ে আমার ক্ষোভই হবে ওজনে বেশি তারি?

কিন্তু এর পর একদিন এই শুভাকেই চাকরির জন্তে সুভদ্রার সামনে গাড়ির কঠোর ভাবে কথা বলতে হল। সে ঘটনা হঠাৎ নয়।

ইফামিং অফিস থেকে ফিরতে বেশ দেরি হয়ে যাচ্ছিল। সুভদ্রা ফিরে এসে নিজেই চারের আল চড়িয়েছে।

শুভা ফিরছে লজ্জা উতরে গেলে। তাড়াতাড়ি করে এসে লক্ষ্যের হাসি হেসে বলেছে—খুব চটেছ আমার ওপর না? কি করব? কাজের চাপ এত পড়েছে—তার ওপর ইন্সক্রিমেন্টের লোভও সাবলাতে পারি না।

সুভদ্রা একটু হেসে বললে—ইন্সক্রিমেন্ট তো আমার কপালে কখনো ছুটল না, কাজেই তার প্রত্ন-সুবিধে আমি আর কি বুঝব?

কিন্তু এর পরে একদিন শুভা রাত আটটা বেজে গেলেও ফিরল না। সত্যি সত্যিই সুভদ্রা সেদিন বিচলিত হয়ে উঠল,—এত রাত স্তো শুভা কখনো করে না।

আজ সুভদ্রার প্রতীক্ষা করার পাল্য। চাঁ খাওয়ার পাট লাক করে দরজার কাছে ইমিগ্রেশনটা টেনে নিয়ে বসে বইল।

গলির সাববে দিয়ে কত বেয়ে ট্রামে বাসে উঠল না—আহুল উৎকর্ষের বায়ে বায়ে সেদিকে নজর করে দেখেছে সুভদ্রা—না শুভা নয়।

টাইমপীসটার টিক টিক করে লাড়ে আটটার ঘরে
কাঁটা ফুলে পড়ল।

—কী ব্যাপার! কোনো বিপদ ঘটল না তো?

একবার তাকল হ্রত নিজেই গিয়ে খোঁজ করে
আগে ওতার অফিসে। কিন্তু পরক্ষণেই তাবল—সে
কি আর এতক্ষণ অফিস করছে?

পূর্ব মুহূর্তেই হ্রতের সমস্ত ফুটো হঠাৎ কিরকস
ফুঁকড়ে উঠল—বুদ্বি অফিসটাই না করে তবে বাণে
কোথায়?

অন্ধকার গলির এক পাশে অসল সিগারেট-টুকরোটা
ছুঁড়ে কেলে দিয়ে হ্রত উঠে পাড়ল।

—অশুভ! না, এভাবে প্রেরণ দেওয়া আর চলে না।

এমনি সময়ে আকাশ ছেঁরে কোথা থেকে উড়ল
অকাল-বাবলের হাওয়া। স্বপ্নের আপটায় দরজা
জানালা আড়নাড় করে উঠল—আর সেই সঙ্গে নামল
বুদ্বি। হ্রত বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল।

—নাঃ আর তাবা বার না।

কতক্ষণ পর বুদ্বি খাদল। রাত্তির অল খে খে করছে।
আরও কিছুক্ষণ পর একটা ছুটো ট্রান চলতে শুরু
করেছে। এমনি সময়ে হুঁ না বাজিয়ে গলির সামনে
এসে পাড়ল একটা গ্রাইন্ডেট কার।

আলো নিবিয়ে ভয়েছিল হ্রত 'বিছানায়। সেই
অবস্থাতেই জানালায় কাছে এসে পাড়ল।

ঐ তো শুভা আগছে। উঃ বাচা গেল। বা ভাবনা
হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে শুভা নমস্কার করল,—
কি বলে ধন্যবাদ যেন আপনাকে।

গাড়ির ভেতরের ড্রল্লোলকের মুখ অস্পষ্ট দেখা
যাচ্ছে। বোকা যাচ্ছে—পরিকার পরিচ্ছন্ন কিছুকটি
ড্রল্লোলক। হুখের ওপর কেমন একটা কৃত কৃতার্ণতার
বিনয় বাধা হাসি।

গাড়ি ঘুরে চলে গেল। গলির হুখের এক হাঁটু অল
ভেগে শুভা এসে দরজায় মুদ্র আঘাত করল।

এ দিনের এই ব্যাপার নিয়েই মনোবালিঙ্গ। কথার

কথার হ্রত বললে—সাহসের একটা বৈধের সীমা
আরে।

শুভা বললে—আমি স্ত্রীকে একসঙ্গে যে সংসারে
চাকরী করে খেতে হয়, সেখানে বৈধের শুপর অভিমানে
স্বাধসে চলে না। তোমার গলার টোনটা আচ্ছ এত
বিস্তী যে, তাতে বৈধের অত্যাধের চেয়ে বিশ্বাসের
অত্যাধটাই বেশি ফুটে উঠেছে। যেন তুমি আমার
সন্দেহ করছ।

হ্রত বললে—সন্দেহ কিংবা অস্বাস্থ্য বাই মনে
করনা কেন, আমি জানি, এ বাসীনতা তোমার অশোভন
তাবে প্রেরণ গাচ্ছে আমার কাছ থেকে তো বটেই—
এমনকি তোমার বিবেক সুদ্রির দিক থেকেও।

শুভা একবার দুগ্ন তর্কিতে তাকালো হ্রতের পানে।
—অশোভন প্রেরণ! না যেন এ ধরনের অপমান
করাটা তোমার কতখানি অজ্ঞার সে বোধশক্তিটুকু পূর্বক
তুমি আচ্ছ হারিয়েছ।

কথা শেষ করে শুভা হঠাৎ নিজের হাত-ব্যাগটা
ফুলে পচিশটা টাকার নোট ছুঁড়ে দিল হ্রতের দিকে।
—ইন্ডিজিবেট পেলাম আচ্ছ। অফিস ঠাক তাই আচ্ছ
বয়েছিল বাঙালাবার অস্ত্রে। সেই অস্ত্রেই খেরি। আর
বুদ্বিতে ট্রান বাস বন্ধ—বরা করে তাই মিঃ রাস ওগু
জীর গাড়িতে করে বাসার পৌছে দিতে গেলেন।
এতেও যদি বুঁটে-বুঁটে অপরাধ বের করবার চেষ্টা
করো তা হলে—

অকস্মাৎ ওতার দুই চোখ টলনল করে উঠল। কঠ
কঠ হল আবেগে।

হ্রত কিয় বিচলিত হল না। যেনন বলেছিল
ভেদনই রইল। নোটগুলো টেবিল থেকে উড়ে পড়ল
মাটিতে, সেদিকে অকস্মেপ নেই কারও।

কয়েক সিনিট খেটে গেল শুভতার মধ্যে দিয়ে।
তারপর কথা বললে হ্রত—তোমাকে আর চাকরি
করতে হবে না। কালই রেজিগনেশন দিয়ে দাও।
হ্রত উঠে পাড়ল।

শুভা অস্থিত হয়ে গেল। স্মৃত্ত এম আগে অনেক দিন অনেক রকমে অনেক নির্দেশ দিয়েছে—কিন্তু এতক্ষণ আদেশ এই প্রথম। অকৃত শোনালো কণাভালো স্মৃত্তর গলায়।

—কী বলছ তুমি।

—হ্যাঁ, ঠিকই বলছি। আমার চেষ্টা অনেক হীন অবস্থার বানী আছে, তারাত সংসার করে। কিন্তু বেশি স্মৃতির আমার তাদের গ্রীকে টাকা উপারের জন্তে রাখার বেরাতে হয় না।

—ছি ছি! তুমি এত দুর্বল!

—সব উপায়তাকে লম্বন করবার মতো শক্তি নব আহার নয়, এতো তুমিও জান।

শুভা হঠাৎ খাঙ্গ হয়ে পড়ল।

বললে—তুমি একটু স্থির হও। তবে থেকে, তোমার এই একর উপরে কোলকাতার মতো আরপার থেকে বাড়ি ভাড়া শুধে সংসার চালাতে পারবে?

—যেমন করে হোক চালাতে হবে। না হয় কষ্টই হবে। পারবে না সেটুকু সহ করতে?

একটু স্থান হাসি হাসলো শুভা।

—কষ্ট আমি সহিতে পারব কি না জিজ্ঞেস করছ? আচ্ছা।—

চাকরী নতুন নতুনই ছেড়ে দিল শুভা। কোনো ঘটনা নেই—কোনো পৌরসংস্কার নেই—হঠাৎ গিয়ে শুভা কান্নে ইন্তকা দিয়ে এল।

বাড়ি কিরে এসে বেঙালো কুলিরে রাখল হাত-বাগগা। —যেমন রাখত অল্প অল্প দিন অকিল থেকে কিরে। তারপর কাপড় না ছেড়েই গা এলিরে দিল বিভ্রান্ত—যেমন কত নিচ্ছিন্ন আত্মা—নিরবচ্ছিন্ন স্মৃতি।

কিন্তু স্মৃত্তর চোখে আর স্মৃতি রইল না। নতুন জীবন শুরু হয়েছে—নব বিশ্বাসিতের যোমাক-মধুর জীবনযাত্রা এ নয়, কষ্টের অধি-পরীক্ষা। পৌরসংস্কার অধিমান প্রয়োজন আর ওদিকের বিচ্ছেদ বেহাশ ঘোষণা করেছে। এ বুড়ে স্মৃত্তকে কিততেই হবে—পরাজয়

নানেই মৃত্যু। সে মৃত্যু তার একর নয়, শুভারও। —যে শুভা মরতে চায় না—যে পুদিবীর মাটি আঁকড়ে বানী-পুত্র নিয়ে সংসার গড়তে চায়—ভালোবাসতে চায়। আর এইটুকুর বিনিময়ে সে এতটাই ছিল স্বীকার করে নিতে কষ্ট—মুখে-রক্ত-তোলা-পরিশ্রম, এমনকি বিসর্জন দিয়েছিল গৃহস্থ—শান্তি—গৃহমহাবাঘ।

সেই শুভাকে বাঁচাতে হবে।

অনেক কষ্টে স্মৃত্ত একটা টাইশান জোপাড় কবল। সকাল বেলা সময় নেই। স্মৃতি থেকে উঠে চা খেয়েই বেরিয়ে পড়তে হয় বাজারে—স্বাস্থ্যনের বোকানে। তারপর বেলা নটীর স্থান তারপর খাওয়া।

বিক্রমে করে স্মৃত্ত খুঁকতে খুঁকতে। এখন আর এনে-সরকারী চুক্তিতে বাধা পার না। শুভা আছে। বিক্রমে কিন্তু খেয়েই বেরিয়ে পড়ে চলে পড়তে। করে রাখি নটীর। স্মৃতি অবসর নেই—চোয়াল হয়ে গেছে—মাথার চুল থেকে পায়ের পাঞ্জাবি পর্যন্ত বিশ্বৃদ্ধ।

শুভা কোনো কথা বলে না। শুধু পাখা নিয়ে বাতাস করে।

প্রথম মাসটা কেটে গেল। শুভার মাইনের টাকটী ছিল বলে বিশেষ আঁচ লাগল না। কিন্তু দ্বিতীয় মাস থেকে শুরু হল বিপদ।

—বাড়ি ভাড়াটা আগে তুলে রাখো। খুব সাবধানে শুভা পরামর্শ দিল স্মৃত্তকে।—আর স্বাস্থ্যনের টাকটী। শুভাই কবল স্মৃত্ত। কিন্তু বাকি যা রইল শুভা করে—

ছাটাই শুরু হল সংসারের বিলাস আভিলাষের। —কোনটা রেখে কোনটা কমাতে? শুভা জিজ্ঞেস করল বীর ভাবে।

—সকালের জল খাবার বন্ধ কষ্টের মতো। নটী বাজতেই তো ভাত খেতে হয়।

তবাহ। সকালে কটি সাধনের পাট উঠে গেল। একটু চা? চা একটু নইলে যে চলে না কারোরই।

তত্না বললে—ওটাও বড় কবে লাগে। তখন পেটে চা খাওয়ার চেষ্টা না খাওয়াই ভালো।

সুন্নত বললে—অসম্ভব। চা আর সিগারেট বড় করলে বাঁচবে কি নিজে? বরক একবেলা তাত না জুটলেও কই নেই।

তাই হল। চারের বরাক রইল আগের মতোই। কেবল লিপটনের বদলে এদো প্যাকেট যোড়া সত্তা ওড়ো চা। তাই—সই। তত্না গরম জল ডো। সকাল সন্ধ্যা দুবেলা পেটে একটু লীকার গোলা গরম জল পড়লেই সুন্নত শুষ্ট।

নিকলে অফিস থেকে এসে সুন্নত বললে একদিন,—বেশো, একবেলা পরেটা আর ভালো লাগে না। কুটি কবো না? তরকারির ছালামার সরকার নেই। শুভ হলেই বেশ চলে যাবে।

তত্না কোনো কথা বললে না। নিঃশব্দে চারের কাপটা এগিয়ে দিল।

কোনো রকমে চা খেয়ে নিজেই সুন্নত উঠে পড়ল। আদা কাপড় ছাড়া হয় নি। তত্না সুখটা ঘুরেছিল।

তত্না জিজ্ঞেস করল—একি এখনি বেরোচ্ছ কোথায়? সুন্নত বললে—আজ একটু সকাল সকাল পড়তে যেতে হবে।

—বিজ্ঞান করবে না একটু?

সুন্নত তার কোনো জবাব দিল না। উঠন থেকে কাগজে করে আঙন নিয়ে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়িয়ে গেল।

ছুটো টাইশান করে সুন্নত। হাশে হুড়ি হুড়ি চলিগ টাকা পায়। এ টাকাটা যার এ ক'বাসের বেনা শোব করতাই। তাত্তেও গোটা বাস লগোর চলে না। আবার বেনা।

ছেলে পড়িয়ে পেনিন সুন্নত করে অনেক রাজে। আজ বেন শরীরটা বড়ো দুর্বল। হাড়ের ভেতরে ভেতরে কীপের বেন একটা ব্যাথা টমটনিরে ওঠে—কন্ডক করে।

মাথাটা মাকে মাকে ঘুরে যায়। লেজ একটা ট্রান উঠতে গিয়ে কিরকম ভাবে বেন হাতটা কন্ডক গিরেছিল আর একটু হলে।

নিজেকে অনেক বোকার সুন্নত—ও কিছু নয়। চোখের কোলগুলো বসল পেছে এইই মধ্যে—গালের হাড় ছুটো কী বিস্তী তাৎ মাথা ঠেসে উঠেছে।

তত্না এক একবার বেধে আর আঁবেকে ওঠে। কিন্তু কিছুই বলবার উপায় নেই। কিছু বললেই সুন্নত বলবে—বোহাই তোমার, আমার একটু নিরিবিলিতে বিশ্রাম করতে লাগে। তোমার উপদেশের ঠেলায় আমার বাড়ি-ছাড়া কোথায় না। শরীর কি তত্না আনাই তাকে?

তত্না আর কোনো কথা বলতে পারে না, চলে যায়।

অফিস থেকে কিয়ে এসে একদিন সুন্নত চমকে উঠল।—এ কী ব্যাপার! মাখন!

তত্না একটু হাসল, বললে—এ আর আশ্চর্য কী! একদিন তো মাখন না হলে চলত না।

—সেই অজুই তো মাখন-বর্জনের পর তার অকস্মৎ পুনরাবির্ভাবে চমকে উঠছি।

সুন্নত গরম পেয়ালার আরাব করে একটা চুমুক দিল। তারপর নিচু গলায় বললে—এ টাকাটা আমার খরচ করলে কোথা থেকে?

তত্না হেসে বললে—না গো না, ভয় নেই।

তোমার টাকা থেকে খরচ করি নি।

—তবে? সুন্নত ছুই চোখ বিস্ময়িত করে তাকায়।

—বাস তিনেক আগে আমার অফিসের এক বোয়াল পাচটা টাকা বার নিয়েছিল। হঠাৎ দেখি শ্রীমান কাল দুপুরে এসে ছাডির। বললে—নাইজি, বহৎ পেরি হো সির, বাপ কীসিয়ে।

সুন্নত হেসে উঠল—বা বা বেশ। এরকম পাউ আর দু-একটা নেই হাতে?

সুন্নতের শরীরের সেই দুর্বলতা কিন্তু গুল না। থেকে

বেশে মাথা ধরে ওঠে—বা কনকন করে। শেষে হঠাৎই একদিন স্ত্রুতকে বিছানা নিতে হল।

এমনে অন্ন অন্ন আর আর মাথার ঘরনা। তারপর সেই আর বাড়িতে লাগল ক্রমশঃ। একদিন, দুদিন, তিন দিন করে সপ্তাহ গেল, বাসন্ত কাটতে চলল।

বিছানার সঙ্গে বিশেষ পেছে স্ত্রুতর বেহ। আর আর, জ্ঞানও আছে পুরোবাজার। শুধু দুর্বলতা—যাখ। তুলতে পারে না, পাশ দিতে পারে না, কথা বলতেও কষ্ট।

মাথার কাছে বলে আঁতে আঁতে বাতাস কবছিল শুভা। স্ত্রুত মাথাটা একটু তুলে বললে—আজ যেন একটু ভালো বোধ করছি।

শুভা স্নান হাসল। হাত দিয়ে স্ত্রুতর কপালের চুলগুলো সরিয়ে দিল।

—কিন্তু যত ভালো হচ্ছে, তত আমার ভয় করছে শুভা। তাবুছি আমার চাকরির কথা—ছু ছুটা টুইংশন। তার ওপর আমার অল্পে বড় ওরমাই না কয়ে উঠল। একটা দীর্ঘ নিখাল—বেরিয়ে এল স্ত্রুতর ঘুক ঠেলে। শুভা বললে—কিন্তু সে ভালো আমি করি না।

—কর না।

—না। আমি বিশ্বাস করি, তুমি ভালো হয়ে উঠলে আমি আমার সব কিরে পাখ।

—কিন্তু শুভা, আমি যে স্বাধীন কর্তব্য পালন করতে পারলাম না; কী দিতে পারলাম তোমার? অর্থ নয়, সুখ নয়, সম্মান নয়। বরঞ্চ বড় অবিচার করেছে তোমার ওপর—

—আমার ওপর অবিচার! কৈ আমি তো—

স্ত্রুত একটু হাসল—বাটি বদন সোনার ফল মাছবের হাতে তুলে দেয়, তখন সে নিজের বুকের গভীর কথা বদন করিয়ে দেয় না।

শুভা হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে উঠল। বড়ির দিকে তাকিয়ে বলল—উঃ সাতো পাঁচটা বেছে গেল। আমার তো এখুনি একবার বেগোতে হবে ডাক্তারের কাছে। তুমি

একটু একলা থাকো, আমি এখুনি আসব।

স্ত্রুত বীরে বীরে শুভার হাতটা ছেড়ে দিয়ে বললে—ডাক্তারি এলো কিং।

শুভা চলে যাচ্ছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে বুদ্ধ হেসে বললে—না, আর আসব না।

শুভা চলে গেল।

আর বিছানার ওরে ওরে স্ত্রুত ভা কত কী।

—কে জানে তার চাকরী আর থাকবে কি না? দরখাস্ত তো করেছিল—ছুটি স্বত্ত্বও হয়েছে। কিন্তু আর কতদিনইবা ছুটি নেওয়া যায়। অগত এই তো শরীর। এখনো ভালো করে উঠে বলতে পারে না। কতদিন এখনি তাইবে লড়ে থাকতে হবে কে জানে?

আর শুভা?

আশ্চর্য কী করে যে ভালো হচ্ছে সংসারটা তা ঐ জানে। হাকখানে একবার ওর পিলভুতো দাখা এসেছিল অল্পবেশ ধবর পেয়ে। হয় তো তাঁরই দম্মাহ এ বাজার শুভা বাঁচাতে পেরেছে।

কিন্তু সে ধবর তো শোণ করতে হবে। কত টাকার সে ঝপ? কত বছর লাগবে সে ঝপ মুক্ত হতে?

স্ত্রুতর মাথাটা আবার কি রকম ঘুরে ওঠে। ডাক্তারি পাশ কিরে পোয়।

বড় তেঁটা পাচ্ছে। একটু ভাবের জল খেতে ইচ্ছে করছে। ভালো শুভা এলে এখার বলবে—আর শুধু নয়—বড় বড় ছুটো ভাব কিনে দাও। গলাটা একটু ভিছোব কৃষ্ণ করে।

ঐ তো শুভা আসছে। এত ডাক্তারি কিরল যে? নিশ্চরই ডাক্তারের দেখা পায় নি। কিন্তু স্ত্রুতোর দখ দরজার কাছে এসে থেবে গেল। অসম্মিতিক নয়—পর্বা মুগছে, দেখা যাচ্ছে না কে এস।

স্ত্রুত কোঁতুল ভরে একবার বাড় ফেরাল।

—May I come in?

পর্বার আড়ালে একটা মুখ দেখা দিল। দৈবর্

একটি পাতলা মুখ। অশ্লষ্ট গোটা কতক ত্রণ। চোখে কালো করে টান। জুতমা—ট্রোট লিপস্টিকের উৎকট প্রকাশ। মুখটা বাড়াবাড়াবের বিকে। মাথার চুল তলো কৌকড়ানো—বাড় পৃথক তো ফিরিদি পাটার্ণের বাঙালি মেয়ে।

জন্মিত হ'বে তখনো জ্বরত বেধছে। বীরে বীরে মেয়েটি ঘরে ঢুকল। স্বচ্ছ হাসক শাড়ি পরণে। গায়ে বুক পর্যন্ত কাটা ব্লাউজ স্লীলভাবে বিজ্ঞপ করছে। গায়ে হিল-উঁচু জুতো। বীরে বীরে এগিয়ে এলো মেয়েটি।

—জি সুখাসি, আমার চিনতে পারছেন না?

জ্বরত জন্মিত হ'বে গেল—এত কি সম্ভব! এ'বে রিতা বিশ্বাস। এক সঙ্গে কাজ করে সামান্য মানি বলে। জ্বরত ভেঁরি করে নাছিল স্টেটমেন্ট আর তাই বর করে টাইপ করে রিতা বিশ্বাস।

পাতলা শ্রামবর্ণ—উচ্চত আধুনিকতার চরমপন্থী এই রিতা বিশ্বাস। গুইমাসের দিন এ'ই কোয়ার্টারে সেনসর রক্য করতে গিরে একদিন জ্বরতার বাড়িরে আয়তন জানিরে এসেছিল জ্বরত।

—আগেই কিছু একদিন আমার বাড়ি। খুব দুশি হ'ব। ব্রু হেসে রিতা বিশ্বাস সেদিন সে আয়তন গ্রহণ করেছিল।

তার দীর্ঘ বিন পর আজ অবসান এই আবির্ভাব।

নিজেকে সামলে নিরে জ্বরত বললে—কী আশ্চর্য বিন বিশ্বাস, আমি এবধে আপনাকে চিনতেই পারি নি। দৃষ্টি লজ্জিত এত দুর্বল হ'বে গেছে। বহন, বহন।

রিতা বিশ্বাস দুশি হ'বে বললে—খ্যাক্স।

তারপর চেয়ারটা সরিয়ে রেখে বলল বিছানায়—জ্বরতর বাপার কাছে।

—কেমন আছেন এখন?

—একটু ভালো।

—আমি তোমাই তাবি দেখা করে আসব, কিছু কিছুতেই ন্যানেব করে উঠতে পারি না। অফিসে

কাজের বা প্রেসার পড়েছে। এ'ব জরত সত্যিই আমি লজ্জিত।

—ভাতে কি হ'বেছে। আর আবার বাসাও তো খুঁজ কা'রে নয়।

কথা শেষ করে জ্বরত চুপ করে রইল। হঠাৎ যেন কেমন বনটা কুঁকড়ে গেল। কেমন যেন অসোহাগি ধোব হচ্ছে—রিতা বিশ্বাসের এই সান্ধ্য।

রিতা বিশ্বাস তখন কামলে মুখ মুহুতে-মুহুতে বলছে, —উঃ কতদিন দেখা হ'ব নি আপনায় সকে। সত্যি এত বিলী লাগে আপনায় খালি চেয়ারটা সামনে থাকলে। I can't express.

এইজন্ম আমি কাজ করে কোথাও মুখ পাই না। কত অনেক সকে পরিচয় হল—তারপর কে কোথায় চলে গেল। আর খোঁজ পাই না কারোর আজ এখানে আমি খাল কোণায় থাকব জানি না। কত কারাগার চাবরি বতলামি আবার ছাড়লাম। এক কারাগার কোণায় থাক্য রেখেও গুটে না। Strange! নিজের বিকে তাকিরে নিজেই অবাক হ'বে বই।

উদ্বীৰ্ব হ'বে জ্বরত মিসেস করতে বাচ্ছিল তার অফিসের কথা—কেউ কিছু বলে কি না; কিন্তু হঠাৎই মিল বিশ্বাসের বিকে তাকাতে গিরে লজ্জার আপনা থেকে মাথা হেঁট হ'বে গেল।

ইচ্ছে করল, আলনা থেকে চাবরিটা টেনে আগে ছুঁড়ে দে'ব ওর গায়ে—যুকে। তবে বসি তাকানো বার।

অবশ্য এই পোষাকে—আর এই ভলীতেই এতদিন এক সঙ্গে ওরা কাজ করে এসেছে সামান্য মানি বলে মশটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। সে সময়ে এ'ভাবে চোখে বেঁধেনি। হাতটা দিরে তো ও'বসি কত নির্লজ্জ মেয়েই তার পুরুষের বেধে আঁকড়ে। এ'তো চোখ-লগরী।

কিন্তু হঠাৎই আজ দীর্ঘ বেতমানে পর রিতা বিশ্বাসের এই সান্ধ্য আর নয় সৌন্দর্য জ্বরত লজ্জ করতে পারল না। দুর্বল সজ্জিকের মধ্যে হঠাৎ দুহন্ত বায়ুগুলো উন্টন করে উঠছে।

বিকেল দুপুরে গিরেছে অনেকক্ষণ। গছের অঙ্ককার খোলা জানালা দিয়ে কখন ঢুকে পড়ছে চুপি চুপি। এখনো আলো জ্বলেনি ঘরে। কে আসাবে ?

ঘড়ির দিকে তাকাতোই স্তব্ধ চমকে উঠল—এখুনি শুভা এসে পড়বে। হি হি এ অবস্থায় হঠাৎ দেখলে—, রিতা বিশ্বাস জিগেস করলে—কিস্ত বিশেষ সুখাচ্ছি কৈ ? তাকে তো দেখছি না। এখনো কেয়েননি নাকি অফিস থেকে ?

—ভিনি একটু বাইরে গেছেন। এখুনি এসে পড়বেন।

—ও। কথা শেষ করে কখনাল নিয়ে বস্তাস করতে লাগল বীরে বীরে।

স্তব্ধতর সর্বাঙ্গ বেমে উঠল। স্থির করল—আর সহ করা ঠিক নয়।

বললে—বিস বিশ্বাস, আজ আমি বড়ো ক্লান্ত, একটু ঘুমতে চাই।

রিতা বিশ্বাস ভাড়াভাড়ি উঠে পড়ল—সজ্জিত হয়ে বললে Sorry, extremely sorry আমি হয়তো অসময়ে এসে আপনাকে বিরক্ত করলাম—excuse me.

স্তব্ধতর বুঝে কথা সরল না। দেখল, বিসু বিশ্বাস ক্ষতপারে দরজা পৰ্ব্বত এসিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎই আবার কী মনে করে ফিরে এল।

—মিঃ সুখাচ্ছি।

—এ্যা।

—কিছু যদি মনে না করেন, সামাজ্য কিছু লেখুন—এন-হিলাস আপনার অন্তে।

বলে হাত ব্যাগটা থেকে একটা টোভা বের করে সাফল চেয়ারের ওপর।

ঘরের ভেতরে থাকাটি অস্বস্তিকার। সেই অস্বস্তিকারের ভেতর মিস বিশ্বাসের কালো চেহারা আবার মিলিয়ে গেল। শুধু শোনা গেল, হিলতোলা জুতোর শব্দ নীচে নেমে যাচ্ছে।

হাঁক চেড়ে বাঁচল স্তব্ধত। উঃ স্তব্ধতর বুঝ রকে করেছেন। কিন্তু এই লেখগুলো? এখুনি তো হাতে-নাতে ঘট্টের বেবে শুভার কাছে। এখুনি হয়তো প্রেরণের পর প্রেরণ শুরু হবে—কে এসেছিল? কি নাম? কোবার থাকে? বেথতে কেমন? বয়স কত?

বুড়ো হাতা দিয়ে একটা ট্রায় চলে গেল একটু আগে। সেই শব্দটা হঠাৎ এখনো বেন মাথার লাগছে। বোম্ব হর আঙ্গ একটু বেশি উত্তেজিত হয়েছিল বলেই। হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল ঘরে। চমকে বাড় ফেরাল স্তব্ধত।—শুভা ফিরে এসেছে। একা শুভা নয়, সঙ্গে আর একজন—মিস বিশ্বাস।

শুভা হেসে বললে—তুমি তো আচ্ছা অফেলোক। একে একটু বসিয়ে রাখতে পার নি? তোমার কি ভয়, আমি আলাপ করতেও পারি না কার সঙ্গে?

মিঃ হাসি হেসে শুভা রিতা বিশ্বাসের হাত ধরে টানল—বসুন তাই একটু, কাপড়টা বদলে নিয়ে চারের আল চড়াই। দেখুন দেখি ভাগি সি'ড়ির বুকেই দেখা হল, নইলে আপনায় সহকর্মীর তত্ত্বাবধি টৈলার আমার পৰ্ব্বত দুখ দেখানো ভার হত উত্তমসাথে।

মিস বিশ্বাস শুভার হাত ধরে একটা অঁকানি দিয়ে হেসে উঠল—থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি বাচ দিসটার। কিন্তু মিটার সুখাচ্ছিকেন্ত আমি দোষ দিই না, বড়ো week, I feel for him,



অন্নপোন্ন গান

ভরতী বোম

পাখীরা কিব্বিছে নোড়ে,
ডানার স্পন্দনাথাতে বিহারি' ভিম্বিরে
নিভক সজ্জায় ;
দূরে চলে যায় ।
অন্নপোন্ন গভীর গহনে
নিব'রিণী সনে
বস কথা হয়,
সব তা'র রহে পরিচর
স্পন্দিত ডানায় ;
উচ্ছ্বিত বিহগের আবেগ সংকুল
দরদী অন্তর নায়ে পূঁজে ফেরে কুল
শে কথা পাশাপাশি কানায় নিব'রে
মেঘেরা যে বার্ডা দেয় স্নেহে শিখরে,
যে কথা মর্মরসনে বনস্পতি কহে,
তাহারি তরঙ্গহ্নন বিহগেরা বহে
আপন ডানায় ।
যেথা গিরে উড়ে উড়ে যায়
যেবে, যেবে যায় কেলে
সবুজ কদলে
অন্নপোন্ন গান ।
গ্রাম হতে গ্রামে আর দেশ হতে দেশে
অন্নপোন্ন গান চলে তেলে ।

ধূলিকীরণ পত্র

সন্তোষকুমার অধিকারী

উপর দুর্গের পথে কলরোলে উন্নতস্থর
ওরা আসে অসংখ্য বাহুব ।
সমগ্র দিনের সীমা বেছে চলে কঠিন আঘাতে ।
একত্র কঠিন এক নিশেপ জ্বর
মথিত করিয়া ফেরে সমস্ত চরণ ;
ওরা আসে, কিরে বার, পশ্চিম দিগন্তে
নিঃশেষে নিভিয়া যায় সারাক্ষর দুর্গের বীণ ;
বাতালের একপননে ঝড়া পড়ে ক্রান্ত পৃথিবীর
অপার হতাশা,
আর এক প্রান্ত জুড়ে পদতলে বিকৃত বৈতন
পদ পড়ে থাকে ।
থরে যায় স্থান অশ্রুতল,
চেতনার ধূলিপ্রান্তে পৃথিবীর নিঃশ্বাসের স্লেষ
মিশে থাকে কলংকে বাথার ।
অন্ধকারে একাকার
অমে বস কেলে রাখা অগণ্য বিদূর্ণ আশা,
বিদূর্ণ বেদনা মানি হতাশার অজ্রবিদু বিদু
—জীবনের অদন্ত-আশাস কই ?
তবু এক দীর্ঘ রেখা বেদনা বিহীন পথ
একত্র কঠিন
পড়ে থাকে পদপ্রান্তে অপ্রীতিকৃত আগত হারিণি ।

অভঙ্গ

বিকাশ দ্বাপ

আকাশ, দিগন্ত আর পনের ছ'বার,—
 হঠাৎ গিরেছে ঢেকে শীতের বিকেলে কুয়াশাঃ।
 তোমার ছ'চোখে ভাই,
 রশ্মি রশ্মি আঁখিরে ছাই,
 তারি সাপে উড়ে আগে বিববাপ গলিত ল্যভার।
 নিবে যায় অকস্মৎ তারার দেয়ালি,
 মুঠো মুঠো বালি তড়ে বালি
 তরুণাথে পাখিরা নিশ্চুপ,—
 ছ'হাতে হুড়ায় তব দিগন্তিকে কোঁচি অন্ধকূপ।

হিংস্র অরণ্যের ছায়া অন্ধকারে বন হয়ে আসে,
 খাপবের পদচিহ্ন পথের ছ'পাশে।
 তোমার ও' তীরে বুকে ভাই,
 নিরাশার আতনানি লক্ষ্যে একে বার।
 তবু তারো পর,
 আনন্দে উল্লাসে নাচে রাজির প্রান্তর!

ওঠে চাঁদ,—তীর চাঁদ আড়ালে বনের,
 গলে যেব ওমোট নদের।
 ছিঁড়ে কুয়াশার কালে আলোর স্রবীক্ষ তরবার,
 হুঁতে দেব কালো ছায়া বিকট বীভৎস ক্রুর খাপদ লজ্জার

লম্বা আকাশ ঢাকে প্রাণের মেঘে,—
 বড় অন্ধা বিছাতের উৎকট আবেগে।
 তারপর পরন্তের রেখের ছোঁয়ার,
 বীভৎস অন্ধর লক্ষি নিবেশে গোয়ার
 মগবর্ষ তুহিনের মত টুপ্ টাপ্,
 করে যায়। বুজে আসে কালো কালো পা-গুলোর ছাপ
 তোমারো আঙিনা হ'তে সেরে যাবে একদিন
 আঁখিরের দৃঢ়,
 আন্তরে হৃদয় ছাড়ি' বিকট অহুত।
 গুপিত মিনের লগ সাব গান,—হৃৎসের গান,
 ছুঁধোগের বুনো-রাস্তা করে জেতে হবে স্রিরসগ।

প্রসঙ্গ

বুদ্ধদেব ঘটক

এ স্বপ্ন জলেই যদি অন্ধকণ মিনের শিররে
 আবার ব্যবিত কাদা জীবনের কুঁড় কামনার,
 কবিত্ত ছদরে তার সেই ক্রুর অন্ধকার করে
 কতো না নিঃশব্দ স্নানি করে তধু বন সীমানার।
 কেন যে পতঙ্গ হলো বন, রাজিবিদ মুঁড়ে আল বুনে
 স্বপ্নের লবুখ মাঠে উড়ে কিরে আবেগ বেহু
 ছায়ায় শিরির মেঘ গেঁথে গেঁথে অর্ধলোভাভু
 গড়েছে আরেক বন, সেই বন স্রাস্ত আজ ব্যর্থদিন শুণে

সে স্বপ্ন করেছে আজ, বহু বর বাগনার কীর্ণরোশনাই
 আজ মুগ্ধ, প্রাণ মুগ্ধ, বুনাতার গুঁকতার বুক
 বেঁচে থাকি, বন্ধনার কোত কতি শোকে
 কবিত্ত বিবর্ণ ভাই জীবনের গথ হাঁতুভাই।

অনেক হয়েছিল ভুল, এইবার প্রতীক্ষা প্রসঙ্গি
 এবারে হিমিরে নেব কীবনের পূর্ণ অহুত।

চারজন সমসাময়িক লেখক

নারায়ণ চৌধুরী

বর্তমান নিবন্ধে চারজন সমসাময়িক লেখক এবং তাঁদের সম্প্রতি প্রকাশিত চারটি উপন্যাস নিয়ে আলোচনা করব। লেখক চকুটের হলেন—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, জ্যোতিবিন্দু নন্দী, সত্যেন্দ্রকুমার ঘোষ। উপন্যাস চারটির নাম যথাক্রমে—লালমাটি, বেহমদ, স্বর্ণমুখী, নানাঃ রঙের দিন।

আলোচ্য লেখক চকুটের শুভমাত্র কালগত অর্থেই সমসাময়িক নন, বরংসের দিক থেকেও সমসাময়িক। এঁদের পরম্পরের মধ্যে উল্লেখ্যক 'ছ' চার বৎসরের ব্যবধান হ'তে পারে—উত্তর তিরিশের কোঠার এই ব্যবধান দরখাই নয়। স্বয়ংসের উল্লেখ্য করছি এই অল্প বে, সব বয়স্কেনীর (age group) মাহুংর মধ্যে যেম্বা, মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর বিশেষ মিল থাকা সম্ভব। থাকেও। বিশেষতঃ শিল্পী সাহিত্যিকদের ভিতর এ মিল প্রবলভাবেই চোখে পড়ে। কারণ তাঁরা মূলতঃ নবোন্মিত জীব, তাঁদের মনের বিকাশের ইতিহাসটাই তাঁদের স্বার্থ হতে ভর্য ইতিহাস। আর এই ইতিহাসের অনেকখানিই তৈরী বহু সমসাময়িক ধ্যানধারণা, কৃতি, বিশ্বাস ও আদর্শের দ্বারা। এক একটা যুগ বা পুরুষ বা অধ্যায় আসে, তাকে আশ্রয় করে এক একটা বিশেষ ভাবাদর্শ ধান্যু বৈবে ওঠে, এই আদর্শ সমকালীন সমাজের প্রেক্ষিত্তি জিজ্ঞাসির কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রায় একই ছাঁচে গড়ে তোলে। চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গীর এই সমতা সমবয়সীদের উপরই সব চাইতে বেশী বর্তার—তাঁরা প্রায়শঃ একই ভাবের উৎস থেকে প্রায়শঃ আহরণ করে বড়ে হ'ন। আরু) আনি, ব্যক্তিত্বে পরিবেশের ভিন্নতা, এবং এই ভিন্নতার কারণে দৃষ্টিভঙ্গীরও বখেটে তারতম্য হয়ে থাকে। কিন্তু কথা হচ্ছে, শিল্পী সাহিত্যিকদের জীবনে বাহু প্রভাব বড়ে কথা নয়। তাঁরা তার জগতের অধিবাসী, তাইই তাঁদের জীবনের মূখ্য নিয়ন্ত্রক। চতুর্পার্শ্বের আবেশনীর দ্বারা

তাঁরা বত না প্রভাবিত হন তার চাইতে চেহ বেশী গুণ প্রভাবিত হন সমসাময়িক কালের প্রবহমান ভাবাদর্শের দ্বারা। তাঁরা মাহুং হতে থাকেন ভিতরে ভিতরে—শিল্পীর আত্মবিকাশের প্রক্রিয়ার সামান্যই বাইরে চোখে পড়ে।

বর্তমান লেখক চকুটের ক্ষেত্রে মনেই এই অগোচর প্রক্রিয়াজনিত দৃষ্টিভঙ্গীর সাহুজ্য বিশেষ লক্ষণীয়। এঁদের চার জনাই অভূতপূর্ব কল্লোল-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ অধ্যায়ে। এই অধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য—গভ্যাহুগতিক শিল্পদৃষ্টির বচন থেকে মুক্তির প্রয়াস এবং আঙ্গিক সচেতনতা। এই দুইটি দ্বারা ই মূলতঃ কল্লোলের দ্বাত বেয়ে এসেছে, বাংলা সাহিত্যে কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকেরাই প্রথম জীবনদর্শন ও ভাবমানা ক্ষেত্রে সজ্ঞানতঃ বিদেশী মানসিকতার আধাবাসী করেন। ইউরোপীয় সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ফলে তাঁরা মাহুং ও তার আবেশনীরকে বিচার বিশ্লেষণ করেছেন বিদেশী ভাবমর চোখে, তাঁদের চিন্তা প্রকাশও করেছেন বিদেশী চঙে। কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যিকদের এই বৈশিষ্ট্য অনিবার্য ভাবেই উপরের চারজন লেখকের মনোভাবনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। জ্ঞাতসারে হোক অজ্ঞাতসারে হোক তাঁরা প্রকাশভঙ্গী ও আঙ্গিকের প্রয়োগে বিদেশী পদ্ধতি প্রকরণ আহরণ করেছেন। এঁদের বেলায় ভিন্নরকম হবার উপায় ছিল না, কারণ এঁদের চারজনকেই সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রকাশ কল্লোলের অব্যবহিত পরবর্তী কালে। কল্লোলীয় ধ্যানধারণা শুধম আকাশ-বাতাসে ছড়িয়ে ছিল, চোটা করলেও সেই প্রভাব অতিক্রম করা যেত কিনা সন্দেহ।

বাংলা সাহুদিক কথাসাহিত্যের প্রকাশভঙ্গীতির এই বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়া উচিত। বস্তুতঃ, এই সৈনিকটোর অভুই সাহুদিক বাংলা কথাসাহিত্য বিশেষ স্বাদগন্ধ বহিত এবং প্রাক-কল্লোল সাহিত্যের

দ্বারা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে। নুতন লেখকের বেলায় বৈদেশিক প্রভাব হীনমস্ততার কারণ হয় নি, এই ক্ষেত্রে যে নৃসিংশী তরুণ লেখকেরা বিদেশী প্রকাশনালীকে অহুকাণের তর থেকে কেবল বীজবর্ণের পর্বায়ে নিয়ে কুলেছেন, তাঁরা তাকে আশ্রয় করেছেন। ব্যাপারটা নিম্নলিখিত হ'ত যদি তাঁরা বিশ্ববস্ত্র নিবাসনে বিদেশী ভাবধারার দ্বারা চালিত হতেন; চরিত্ররূপে কল্পিত বৈদেশিক অব্যক্তবস্ত্র আমদানী করতেন। তা তাঁরা করেন নি। গল্পোপকল্পের চরিত্র ও ঘটনা সৃষ্টি করতে গিয়ে তাঁরা হৃদয়ঃ এবশেই বালনসম্রাট গ্রহণ করেছেন, শুধু প্রকাশের কার্যদাটা ধার করেছেন বিদেশী কথা সাহিত্যের সমুদ্র স্রুত থেকে। অর্থাৎ বিশ্ববস্ত্র কেবল তাঁরা বিদেশী, প্রকাশনীতির ক্ষেত্রে বিদেশী। আধুনিক কথা সাহিত্যিকদের এই বিধাবিভক্ত শিল্পী হোন্সক তাঁদের রচনাকে নানা দিক দিয়েই বিশিষ্ট করে কুলেছে বলে বলা বলা কঠিন।

আলোচ্য চরিত্র লেখকের উপর বৈদেশিক প্রভাবের সত্যত্ব বিচার করলে নামগুলিকে নিম্নলিখিত ক্রমে সাজানো যেতে পারে—জ্যোতির্বিজ্ঞ নন্দী, সত্যোবহুদার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। জ্যোতির্বিজ্ঞ নন্দীর লেখার বৈদেশিক চরিত্র-এর ছাপ সব চাইতে বেশি, ঐতিহ্য চেতনা সব চাইতে কম। পঞ্চাশের বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভিত্তর ঐতিহ্যনিষ্ঠা সব চাইতে বেশি, বৈদেশিক প্রভাব সব চাইতে কম। সত্যোবহুদার ঘোষ ও নরেন্দ্রনাথ মিত্র দুই ব্যক্তির ভিত্তর সময়ের প্রাণী, তবে এঁদের রচনারও যে বিদেশী আধুনিক ছোট গল্পের চরিত্র প্রভাব তাৎসবিক গোঁথে পড়ে সে কথা অস্বীকার করা যায় না।

সমালোচ্য চরিত্র উপকল্পের প্রসঙ্গে আসবার আগে এতিম বইয়ের লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্য আলোচ্য ভাবে আলোচনা করা যথ্য নয়। এটি বক্তাবান নিবন্ধের উদ্দেশ্য পূরণের পক্ষে প্রয়োজনীয় বলে বলা হয়।

প্রাচীনতমের এ কারণে যে, পনের এই আলোচনাতুল্য লেখক সমগ্র উপকল্পের আলোচনার সঙ্গে প্রযুক্ত করে নিলে লেখক এবং তাঁর রচনা সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। লেখকের নারায়ণ রচনাবৈশিষ্ট্যের কী পরিমাণ ও কতটা বর্তমান রচনার প্রান্তে প্রতিফলিত হয়েছে সেটিও তা বলে এই সুযোগে পরীক্ষা করার সুবিধা হবে। এঁদের ভিত্তর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার পরিমাণ বেশি, সুতরাং তাঁকে দিয়েই আলোচনা শুরু করা যাক।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় কুলনী ভাষাশিল্পী। পঞ্চাশবছরে তিনি ঐতিহ্যপ্রিয়, সংস্কৃতপ্রিয়, বিভিন্ন শব্দ-লভার ও ধনি সংকেতবাহী গভীর পঞ্চ প্রেরণার পঞ্চপাতী, স্বপ্ন তাঁর ভাষা আশ্রয় সজীব, বেগবান, প্রাঞ্জল। ভাষার বাধুনির ভিত্তর অক্ষততা কোথাও নেই। এমন একটা প্রকাশ গভীর সৌন্দর্যের মধ্যে তিনি তাঁর ভাষা কথাকে এনে ফেলেন যাতে সেগুলি আশ্রয়পূর্ণ পঞ্চবস্ত্র ও গুরুগভীর অর্থবাহী হওয়া সত্ত্বেও পাঠকের বনে একটা বুদ্ধক সাবলীলতার আভাস বেরে আসে। কি ঘটনা বর্ণনা, কি চরিত্র বর্ণনা, কি প্রকৃতি বর্ণনা—সকল প্রকার বর্ণনাত্মক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বর্ণনাত্মক প্রতিমোহ প্রবল। এই যোগে তাঁর সুনামের যত্ন হতে পারত, কিন্তু তিনি তাঁর গুরুগভীরতীর বিনিময়ে আধুনিকতার দ্বারা আশ্রয়লা করেছেন। তাঁর পঞ্চ লভার পুরাতনের ভাষার থেকে আশ্রয়, কিন্তু তাঁর বাক্যগঠন পদ্ধতি সম্পূর্ণ একালের—এই মিশ্রণের ফলে তাঁর ভাষা পুরাতন নুতন উভয় পন্থীর গ্রহণীয় হয়ে উঠেছে। ব্যক্তিগত ভাবে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষার আদি বিশেষ অহুকাণী। পঞ্চাশবছরে পুরাতন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান এবং ঐতিহ্য চেতনার পরিচর পাওয়া বাবে অশ্রুত ভাষাতত্ত্বী হবে আধুনিক, পঞ্চাশবছর প্রক্রিয়ার ভিত্তর কমনীয়তাগুণ যেমন থাকবে সেবনি থাকবে বলিষ্ঠতা ও প্রাণপ্রাচুর্যের ল্পষ্ট আশ্রয়—এ না হলে আর কথা সাহিত্যের ভাষা কী।

হৃদয়ের বিষয়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষায় চিত্তর এই সব কটি গুণেরই সম্বন্ধ ঘটবে। তাঁর ভাষা একাধারে ঐতিহাসিক, আধুনিক, স্মৃতি, প্রাণবীর্ণ।

ভাবাত্মক চিত্তর লেখকের অনেক গভীর অনৈক-
বাদি পট্টির পাণ্ডুর বার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাবাত্মক বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই, তাঁর মন মূলতঃ বহির্মুখী। বহিঃপৃথিবীর ঘটনাপুঞ্জ এবং পারিপার্শ্বিক প্রকৃতির দৃষ্টান্তের তাঁর মনকে যেমন সবসঙ্গে আকর্ষণ করে এমন আর কিছু করে না। নিজের কিংবা অপরকে মনোজীবনের গহনে দৃষ্টি সকালনে লেখকের ক্ষুধা সাত্মকই; এই ক্ষুধাভীরব প্রকৃতি তিনি পূর্ণ করেছেন পূর্ণ নারায়ণ ঘটনার বেঁচে থেকে। ঘটনা বৈচিত্র্যের প্রতি লেখকের আকর্ষণ সহজাত, দুর্নিবার। এই আকর্ষণই যে লেখককে মনোমগ্নতায় হতে বাধ্য করেছে সেটি খোঁজা যায়।

আর একটি দিক থেকেও লেখকের বহির্মুখিতার স্পষ্ট প্রমাণ মেলে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর উপন্যাসে যেভাবে ঘটনা সাজান তা কতকটা উদ্ভিন্ন শতাব্দীর উপন্যাসের রীতির আরও। তিনি ঘটনাকে তার নিজস্ব নিয়ম ও বেগে অগ্রসর হতে দেন না, পক্ষান্তরে তাকে কবুল্যার বেঁধে পাঠকের মনোমগ্নতায় উপস্থিত করেন। তাঁর বর্ণিত কাহিনী কোন্ দিকে মোড় নেড়ে, ঘটনামোড় কোন্ খাত বেয়ে অগ্রসর হচ্ছে সেটা আগে থেকেই ঊর্ধ্ব করা যায়, আর এই অগ্রিম অমুখ্যানের ব্যাপারই প্রমাণ করে লেখক ঘটনার হঠাৎবাধা অগ্রগতির নিয়মে বিশ্বাসী, ঘটনাবলীকে তাবের নিজস্ব বেগে এগোতে বিতে তিনি কুণ্ঠিত কিংবা অপারগ। বলাই বাহুল্য, বাস্তব জীবনে ঘটনা ঠিক এভাবে ঘটে না। বাস্তব জীবনের সংঘটনগুলি যেমন আকস্মিক, তেমনি তাদের পরিণামও অচিহ্নীয়। অগ্রিম অমুখ্যানের অবকাশ সেখানে লামাই। এই এই অবস্থার ঘটনার গতি ঠিক এই মত হবে—একসম প্রত্যয় ও প্রত্যাপা নিয়ে বাস্তব জীবনে ঘটনার গতি অমুগ্ন

কর। চলে না, কহলে বার্ষ হতে হয়। পর্বৎকককে বাবিত করবার অস্ত ঘটনা নয়, পরন্ত ঘটনার গতির ঘটনাই পর্বৎককের দৃষ্টি মূখ্যতঃ নিবৃত্তি হয়। এই বহিঃবাস্তব সংসারের সংঘটনগুলির প্রকৃত চেহারা হয় তা হলে বলতেই হয় ঘটনার রূপাংগে করন্থা যেমন চলার অবকাশ নয়। অবচ নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ঘটনার চিত্রাংগে করন্থাকেই প্রাণত্ব দেন বেশি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে এই রীতি লেখকের বিশেষ সহায়ক হতে পারে (অমুখ্যান করি হয়েচেও), কিন্তু বিশ শতাব্দীর উপন্যাসের রীতি এটা নয় সেটা স্বীকার করা ভালো।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রকৃতিবর্ণনার হাত চমৎকার। তিনি হঠাৎ করে প্রকৃতিকে দেখেচেন, হঠাৎ করে তার প্রমাণ মেলে। প্রকৃতি পর্বৎককে লেখকের দৃষ্টি সজানী, তীক্ষ্ণ, খুঁটিনাটিতৎপর। কোন কিছুই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় না। তাঁর এই দৃষ্টিতীর তীক্ষ্ণতা ও পূর্ণাঙ্গপূর্ণ মনোবোধ্যমতা মনের সজীবতার একটা বড়ো প্রমাণ। মন ক্ষুধিত, আত্মকেন্দ্রিকতার বোধমুক্ত না হলে বহিঃপ্রতির দিকে এমন সুকৃষ্ট দৃষ্টিতে তাকানো সম্ভব নয়। আর এই থেকে আরও প্রমাণ হয় যে, লেখক কবিপ্রাণ। প্রকৃতির রূপরসগন্ধ স্বস্পর্শের বিভিন্ন সৌন্দর্য লেখকের মনে গহুত এক রোমান্টিক অমুখ্যতির সৃষ্টি করে, যে অমুখ্যতির গারে বিশে আছে স্পর্শ সৌন্দর্যপ্রতির পানে পানে ধানিকটা অজীত চেতনা, ধানিকটা বাস্তব—পরামুখতা, ধানিকটা বা অস্বাভিতি শূন্য। মনে হয় ইতিহাসবোধও এই সঙ্গে কিছু পরিমাণে অমুখ্যত রয়েছে। সাম্প্রতিক ল্যাঙফেপের বর্ণনের এসমত বহন লেখক বরেন্দ্রভূমির গৌরবময় অজীত ইতিহাসেরও কীর্তন করেন তখন প্রকৃতি-চেতনা ও ইতিহাস-চেতনা এক ঝড়ে মিশে গিরে পাঠকের মনে এক মূখ্য বোধের সৃষ্টি করে। এই বোধ কাব্যবাদ-মুগ্নতায় বহু।

‘বাস্তব পরামুখতা’ কথাটি সত্যবীন। লেখকের নির্গ-বর্ণনাতেই বা বাস্তব বিদ্যুতের আবেশ পাওয়া

যায়, কিন্তু যুগ কাহিনীর রূপায়ণে তিনি বাস্তব-বিশ্বতাকে আর্য্যে প্রবেশ করেন না। বরং এই ক্ষেত্রে তিনি আন্তর সমাজ-সচেতন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় জীবন বর্ণনের দিক থেকে দুশটি বাদগম্যই বিশ্বাসী। তিনি অজ্ঞান-অসহিত, নির্বাসিতের প্রতি প্রাণ সহানুভূতিসম্পন্ন, অত্যাচারী পক্ষ ও জনগণের চূড়ান্ত হয়ে আত্মবিশ্বাস। জমিদার শনিক বণিক কুলাসক ও পোষক—সকল প্রকার সুবিধাতান্ত্রিক মানুষের অজ্ঞানপরতা সম্পর্কে তিনি নির্বাক, আশোষহীন। যেখানেই অত্যাচারীর ও অত্যাচারের বর্ণনা দেখানেনই ক্রোধের গুটার গুঁড়ি মচেন। এই ক্রোধ ক্ষেত্র বিশেষে অসংগত, কিন্তু ভাষাগার ভাষাগার নাক্সা হাড়িয়ে দিয়ে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এটি ভালো নয়। রূপো ভুলটোয়ার মূলত সমাজ-সমালোচনাসাহিত্যে ভিত্ততার স্থান আছে, কিন্তু কথ্য সাহিত্যে ভিত্ততারভিত্তি হলো তা অযোগ্যবানী হয়। কাজেই লেখকের এ সবকিছু অবহিত হওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি। তবে খাপসার কথা লেখকের এই ভিত্ততা ও চিত্তবাহু জ্বায়েই পরিপোষণে, অজ্ঞানের তিনি প্রচণ্ড বিরোধী। নির্বাসিত ও পশ্চিমতের প্রতি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের অমের ক্ষণা একদিন গুঁড়ি চোখের সুস্থিবে সর্বপ্রকার মানি বিবর্তিত প্রকৃত মানব প্রেমের পথ গুলে যেবে বলে আশা করি। জ্ঞাননিষ্ঠ তিনি গুঁড়ি মনে অজ্ঞান অসহিততা অবজ্ঞাই থাকবে, তবে ক্রোধের পথে হিংসার পথে অজ্ঞানকে জয় করা যায় না সেটি বোকা বরকার।

অন্তর্গত, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়েরই সহস্রী নরেন্দ্র নাথ বিজয়ের লেখার ধাঁচ কিছু স্বতন্ত্র। তাই প্রায়োগে নরেন্দ্রনাথ নিজ ব্যাকুলতা, স্নেহ, সুহৃৎবানী। বোলারের গুঁড়ি লেখার সুত্র, চড়া গলায় তিনি কখনও কথা বলেন না। নৈশবর্ষ, আড়ম্বর, বর্ণাচ্যুত এসব তিনি স্বভাবতঃই এড়িয়ে চলে। লেখকের সুহৃৎবানী হচ্ছে নরম গলায় সুত্র, সুহৃৎবানী স্বভাবতঃই গুঁড়ি গুঁড়ি না থাকাই স্বাভাবিক। হয়তো এক্ষেত্রে পারঙ্গমভাষ্যও কিছু

অভাব আছে। বর্ণাচ্যুত বর্ণাচ্যুতি ও শব্দবিত্তের প্রতি উদাসীন এবং বৃহৎ কণনের দিকে অভ্যস্ত আত্মীয় হওয়ার ফলে নরেন্দ্রনাথ বিজয়ের রচনার বর্ণিততার কিছু কমতি চোখে পড়ে। প্রকৃতি সচেতনতা ও প্রাণ-প্রাণুর্ভবনিত উদাসীনতার প্রমাণ তাঁর রচনার ক্ষম। কিন্তু এই অপূর্ণতা যেমন আছে তেমনি লেখকের কৃতিত্বের দিকটাও দিরাট। নরেন্দ্রনাথ বিজয়ের রচনা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুখপাঠ্য। কথার চাতুরীতে, শব্দ সাধার্য্যের কাব্যিক, সংলাপের কৌতুকময়তার তিনি গুঁড়ি রচনার এমন একটা অঙ্গসত্তার আবহাওয়া ঘনিয়ে তোলেন যে পাঠকের মনে অজ্ঞান-গারেই পড়ার আনন্দ ঝিলকিরে ওঠে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনার প্রাণের দীপ্তি অধিক, হস্তরস কম; নরেন্দ্রনাথ বিজয়ের রচনার ঝিলকির উঠে। তাঁর সাহিত্য সুহৃৎ, কিন্তু কৌতুক অসুহৃৎ। নির্বাক হস্তরস তাঁর রচনার সর্বত্র প্রবাহমান।

নরেন্দ্রনাথ নিজ গুঁড়ি চোখের অভাব পূরণ করেছেন মানুষের উপর দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করে। সেই মানুষও আবার ঘটনানিষ্ঠ মানুষ নয়, মনোনিষ্ঠ মানুষ। যে মানুষ ননকে আশ্রয় করে বেঁচে থাকে, শত অভাব বৈজ্ঞানিক মনোবিশ্লেষণের অংশ নয়, সেই মানুষের মনোবিশ্লেষণ উদ্ভাটনে লেখকের অপরিহার্য ক্ষমতা। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে লেখকের কৃতিত্ব প্রথম প্রেরণ। প্রথম প্রেরণ আরও এইভাবে যে, তাঁর মনোবিশ্লেষণ কখনও পাঠকের মনের ভিতর ভুলেও বহুতর ভাবে সৃষ্টি করে না যেমন অতি আধুনিক অনেকের লেখা করে। মনোবিশ্লেষণ স্মিথিটা খুবই বুদ্ধিগ্রাহ্য চাতুর্যপূর্ণ বিষয় সন্দেহ নাই, তবে প্রায়ঃ ক্লাস্তিকর, boring। নরেন্দ্রনাথের মনোবিশ্লেষণের বেলার এ অপসারণ আরোপ করা চলে না। বরং তাঁর বিশ্লেষণের ধারা অল্পসংখ্যে পাঠকের মনে কৌতুকময়ই উদ্ভেদ হয়। রচনা স্বাভাবিক সহসংগত বর্ণিত না হলে এরকম হতে পারত না সেটি সহজেই বোকা যায়।

নরেন্দ্রনাথ বিজয়ের সাহিত্যের নিঃসংখ্যে পাঠ-

ব্যোম্যাত্ম্যর আর একটি লক্ষণ বর্ণনা করব। লেখকের অবিকার্য গল্পোপন্যাসের প্রধান উপজীব্য নিরমধ্যবিত্ত জীবনের দৃষ্ট বৈশিষ্ট্য। নিছক বেঁচে থাকার প্রাণাত্মক সংগ্রামে মল্লনারের কী প্রোচন অলচর শোচনীয় নির্যাতন বইয়ে দেশের নিরমধ্যবিত্ত জীবনকে রচনার ক্ষেত্ররূপে নির্বাচন করে তিনি সেই নিছক মধ্যবিত্তিক তথ্য আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরেছেন। কিন্তু এই বিবাদের চিত্র আবারের স্থান হোব করে না, ইঁপ ধরিয়ে দেয় না, উঠে, মনের ভিতর এক মধুর কারুণ্যের সৃষ্টি করে। তাঁর গল্প শেষ করে ওঠার পর পাঠকের মনে যে প্রতিচ্ছবি হয় তা অবিস্মরণীয় সমাজ-ব্যবস্থার অজায়-পরতার বিরুদ্ধে তিক্ততা বা বিদ্রোহ নয়, গল্পে বর্ণিত ভাগ্যহতের প্রতি শান্ত কারুণ্য—বসিও অল্পান্ত্রিত সমাজ ব্যবস্থাই যে সাধারণ মানুষের জীবনের ট্রাজিডির মূল কারণ এটি তিনি অস্বাভাবিকভাবেই তাঁর লেখার নির্দেশ করেন। শিরোভাষকের দিক থেকে বিচার করতে গেলে পাঠকের মনে হোব বা তিক্ততা আণাণোর চাইতে শান্ত সহানুভূতির উল্লেখ করা বহু গুণে প্রেরণ: আদর্শ তা আশা করি সকলেই স্বীকার করবেন।

নিরমধ্যবিত্ত সত্ত্বের বাঙালী সংসারের দৃষ্টান্ত আশা আকাঙ্ক্ষা বৈশিষ্ট্য বর্ণনা নরেন্দ্রনাথ মিত্রের কলমে যেমন সার্থক রূপ পেয়েছে এমন আর কারও লেখার পার নি। লেখকের এই বৈশিষ্ট্য তাঁকে নিঃসংশয় ব্যাপ্তির অবিকারী করেছে। তবে এই ব্যাপ্তি বিশদ সম্ভাবনা রহিত নয়, বলা বরফায়। নিরমধ্যবিত্ত সংসারের আটপোরে মূখ ভূখের কাহিনীকে রূপ বিতে গিয়ে লেখক অন্ত্যস্তসারে নিজেও কিছু পরিমাণে নিরমধ্যবিত্ত সংসারের আটপোরে সংসার হার্য প্রোভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়। নিরমধ্যবিত্ত পরিবারের জীবন ব্যাক্তির অল্পস্থিতি নাটিক প্রতি লেখকের যে সম্ভাবনা চোখে পড়ে সেটি তাঁর জীক পর্ববক্ষণ শক্তির প্রমাণ সম্ভব নাই, কিন্তু এই শক্তিরও সীমাবদ্ধতা আছে। অংশের প্রতি অতিরিক্ত মনোযোগ প্রজ্ঞ করে কী হেব যদি সমগ্রকে কাগণ করতে যথেষ্ট

বহুসম হতে না পারা বেলগু প্রোভাবিক জীবন সংগ্রামের আশাতে সংঘাতে কয় পাওয়াও পাওয়া আবার আদিক অন্তর্ভুক্ত নীড়নে কয় পাওয়াও পাওয়া—শিল্প বিচারের দিক থেকে এই দুই চিত্রণের মধ্যে একটিকে যদি বেছে নিতে হয় তা হলে অল্পান্ত্রিত চিত্রে শোভোক্তিটিকেই আমি বেছে নেব। শ্রুতিবীর সাহিত্যের ইনিসালে পুরাতন কিংবা নতুন কালে শ্রেষ্ঠ শিল্পীর বর্ণনা তাঁরাই মূখ্যতঃ পেয়েছেন বাঁদের রচনার সব ভাঙিয়ে আদিক সংগ্রামের কাহিনী রূপান্তরিত হয়েছে। সম্ভাবিত্যনৈরাত্ত সংসার জিজ্ঞাসা কটকিত গভীর অন্তর্ভুক্তির আদিক সংগ্রামের পাশে নিছক বেঁচে থাকার সংগ্রাম অকিঞ্চিৎকর। অন্ততঃ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অকিঞ্চিৎকর। সাম্প্রতিক সাহিত্যের উৎসাহী পঠিকদের মধ্যে অনেকেই আবার এ কথাই সার যেমন না আনি, বিশেষতঃ আমার কয়টি শিল্পী বহুসমের তো একেবা মনে নিতে খুঁই থাকবে (তাঁদের চোখে সকল প্রকারের আদিক সংগ্রাম মনোবিশ্বাস ভাঙা কিছু নয়), তবু বলব, সকল কালের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে আদিক সংগ্রামের কাহিনীকেই মূখ্য বর্ণনার ভূমিত করা হয়েছে আটপোরে জীবন সংগ্রাম নয়। সাহিত্যের এই যে ভাব-বৈশিষ্ট্য ট্রাডিশন, এটা জটীক হতে পারে, কিন্তু ভুললে চলবে না এইটেই সাহিত্যের মূখ্য ট্রাডিশন—এই ট্রাডিশন থেকে স্থিত হয়ে নতুন পথে পাঠক চিত্তকে প্রোভাবিত করা বড়ো কষ্ট। নরেন্দ্রনাথ মিত্র শক্তিশালী লেখক তাঁর শিল্প সৃষ্টি প্রথম শ্রেষ্ঠ, তবু তিনি পুরোপুরি শিল্পি নন। বার্ষিক প্রজ্ঞা মিশ্রিত যে কবিত্বটি থাকলে উপভাস sublime এর স্তরে উন্নীত হয় সে কবিত্বটি লেখক সামান্যই অক্ষীণন করেছেন। লেখকের উচ্চাঙ্কেব লিখন সৈপুণ্য অকিঞ্চিৎকর খুঁটিনাটির উপর প্রায়শঃ গুণ হওয়ার কতকাংশে বণিত হয়েছে। অকিঞ্চিৎকর ট্রাজিডির ভূমিকা রচনা না করে নরেন্দ্রনাথ বির তাঁর সাহিত্যে বহু ট্রাজিডির ভূমিকা রচনা করন, তিনি অচিরেই অপ্রতিভোধ্য হয়ে উঠবেন।

ট্রাজিডিই নরেন্দ্রনাথের একমাত্র রচনাবৈশিষ্ট্য নয়,

মিষ্ট প্রেমের গল্পও তাঁর হাতে পোলে ভালো। প্রেমের যাদুঘরের সঙ্গে নির্ঘণ পরিহাস রসবসিকতা মিশিয়ে তিনি প্রেমের কাহিনীকে অত্যন্ত উপভোগ্য করে তুলতে সক্ষমেন। হালে তাঁর প্রতিটি রচনার পরিসর যত্নে বৈষি বিবৃত হয়ে পড়েছে, কাহিনীকে স্থানিয়ে উপাধি বড়ো করার কৌশল তাকে পেয়ে বসেছে। তাঁর পুরাতন রচনার সংক্ষিপ্ত সংহত নিউটন রূপ বর্তমান রচনাধিতে অঙ্গুপস্থিত। এর কারণ দুই হতে পারে,—লেখকের খুঁটিনাটি বনজতার আরও বেড়েছে, অথবা তাঁর গল্প জনসং উপভোগ্যের ব্যাপ্তির অভিক্ষেপে কুঁকছে। শেখোজ্ঞ কারণটি যে অঙ্গুমান মাত্র নয় লেখকের লগ্ন রচিত কল্পিত উপজ্ঞান তাঁর প্রমাণ। ‘দেহমন’ এইরূপ একটি সাম্প্রতিক উপজ্ঞান। এর গঠনের ভিত্তর উপজ্ঞানের উপকরণ বস্তু না আছে তার চাইতে বেশী আছে বস্তু গল্পের উপাধান। কিন্তু সে প্রঙ্গল বখাওয়ানো।

এর পর জ্যোতিবিরজ্ঞ নন্দী। জ্যোতিবিরজ্ঞ নন্দীর রচনার পরিমাণ অল্প, তবে তিনি নিঃসংশয় শক্তির অবিকারী। তাঁর পর্ববেশন আর আদিক সচেতনতা। তাঁর শক্তির ভিত্তি গড়ে তুলেছে। মাছের আচার-আচরণ চলনবলন বৈশিষ্ট্য। ইত্যাদি সম্পর্কিত সহস্র রকমের খুঁটিনাটির প্রতি লেখকের স্নাতক বনোযোগ—এই বনোযোগের ফল সাহিত্যে রূপায়িত করতেও তিনি ওস্তাদ। (খুঁটিনাটি বনজতার প্রঙ্গল নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে জ্যোতিবিরজ্ঞ নন্দীর রচনা সম্পর্কেও সে বক্তব্য সমান প্রযোজ্য) জীবনকে তিনি দেখেন বানিকটা ডেরা চোখে, মাছবন্ধে সেইমুগ্ন। তাঁর অঙ্কিত মাছ পুরোপুরি স্বাভাবিক মাছ নয়, অঙ্কিত ভাবের বাইরেটা স্বাভাবিক মাছের বস্তু দেখতে হলেও ভিতরটা নানারকম মানসকূট (complexes) দ্বারা পূর্ণ। এই মানসকূটগুলির মধ্যে যৌন-বনজতা প্রধান। তাঁর পাশাপাশি রয়েছে পাশাপাশি, অপরাধ-চেতনা, বিবাদ, অকাঙ্গল চিন্তাপ্রারম্ভতা, স্নহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রার প্রতি বিবেচ ইত্যাদি। এক কথা

জ্যোতিবিরজ্ঞ নন্দী ‘অবিত’। এই দিক নিয়ে তাঁর লেখা আধুনিক ইউরোপীয়, বিশেষ করে করানী কথাসাহিত্যের বর্ণোক্ত, তাঁর লেখার বর্ণোক্ত বক্তব্য বিবেচ্য। কিন্তু মাছের বক্তব্যের বিবৃত দিকের চিত্রণ বস্তুই দ্বিগুণিতিক হোক, কেবল ঐদিক সাহিত্যে রূপায়িত করে কেউ কখনও প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর বর্ণনা লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ। অন্ততঃ, আমাদের সাহিত্যে এ নন্দীরের অভাব। ঐতিহ্যগত ভাবে আমরা সাহিত্যে স্নহতার চিত্রণের পক্ষপাতী এবং প্রাত্যাহী। যৌনতা সম্পর্কে অতিরিক্ত সচেতনতাকে আমরা রঙ্গমতীর নানার বস্তুই বনে করে থাকি। একমাত্র মণিক বনোপাধ্যায় বাধে বাংলা সাহিত্যের আর কোন বিশিষ্ট কথাসাহিত্যিক যৌনতাকে প্রঙ্গল বেন নি। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রথম দিকের রচনার যৌনতার কিঞ্চিৎ আভিপ্রাণ ছিল, হালে তিনি এই প্রাত্যাহ সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠেছেন। এর ফল তাঁর সাহিত্যের পক্ষে হিতকারণ হয়েছে। নরেন্দ্রনাথ মিত্রের চিত্রিত বিবরণসূত্রে পরিমিত বিস্তার ঘটতে, তাঁর সাহিত্য গভীরতর প্রাঙ্গল হয়েছে, তদুপাধিতে পাঠক চিত্তে তাঁর রচনার আবেদন ক্ষমতা বহুতর বেড়েছে। জ্যোতিবিরজ্ঞ নন্দী নরেন্দ্রনাথের স্নহ পুটায় অঙ্গুপস্থ করলে এই রকমের স্নহ লাভ করতে পারবেন বলে আমাদের ধারণা।

আমাদের ক্ষেত্রে জ্যোতিবিরজ্ঞ নন্দী ইউরোপীয় কথাসাহিত্যের বীতির দ্বারা বিশেষভাবে প্রাত্যাহিত, একথা পূর্বে বলেছি। তাঁর বাক্যসূহ ছোট ছোট, কাটা কাটা অনেক সময় একটি কি দুটি বাক্য শব্দসম্বলিত। বাক্য-গঠনবীতি নির্বাক। সংলাপের বেলায় এই নির্বাকতাই আরও বেশী চোখে পড়ে। ছোট ছোট কথা, ছোট ছোট বাক্য, ছোট ছোট অঙ্গুপস্থ—সব মিলিয়ে রচনার একটা ছিন্নছিন্ন মাঝা-বাক্য চোখে পড়ে। এই রচনাবীতি কিছুকাল ভালো লাগে, সকল সময়ের ভক্ত নয়। বাংলা ভাষার বাক্যসূহের একটা গড়পরতা দৈর্ঘ্য, গুণন এবং বেগ আছে। বাক্যের মাপ বড়োও নয়, পূর্ব বেনী

চোটেই নয়। কতটা ক্রিয়া করি বিশেষণ সর্বস্বনাম ইত্যাদি মিলিয়ে গড়পড়তা ব্যাক্যকে একটা নিদিষ্ট ভজন ও বেগ রক্ষা করে চলতে হয়। তা না করলে ভাবার ভিতর ধ্বনিবাহুরি আসে না, আসে না প্রাণবস্তৃত্ব। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাবার এই ধ্বনিসম্পদ ও প্রাণবস্তৃত্বের অভাব। তাঁর অধিত মলসবুকের ভজন নেই, স্নতহাঃ বলিষ্ঠতাও নেই। বড়ো জোর তাঁর ভাবারীতিতে আনয়: 'আট' আখ্যা দিতে পারি, তার বেশি কিছু নয়। উচ্চাঙ্গের সাহিত্যে স্মৃতিতে smartness এর স্থান সোণ, এই কথাটি স্বরণ রাখলে আমাদের মলমলকুহেলির সাহিত্যিকেরা উপকৃত হৈ অপরূক হবেন না একথা বলতে পারি।

উপরের অল্পক্ষেপে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ভাবারীতি সম্পর্কে যা বলা হ'ল তা প্রতিভুলনার ক্ষুণ্ণতর হবে বলে মনে হয়। আনয়: এই ক্ষেত্রে নাট্যরূপ মঙ্গোপাধায়ের ভাবারীতির উল্লেখ করতে পারি। দুই ভাবারীতির ভিতর স্রুতন্তর ব্যবধান। দুই ভাবারীতির আংশিক উৎকর্ষাপকর্ষের স্রুতিও এই ব্যবধানের ভিতরেই নিহিত আছে।

পক্ষান্তরে, সন্তোষকুমার ঘোষ 'আট' লেখক, কিন্তু ঐতিহ্যবিরহিত নয়। বাংলা ভাবার নিজস্ব প্রকাশভঙ্গির সঙ্গে তিনি ইংরেজি ভাবারীতির স্বাধীন বড়ো চমৎকার মিলিয়েছেন। বিরলভাষণ সন্তোষ কুমার ঘোষের রচনার একটি প্রধান গুণ। কিন্তু এই বিরলতা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী মূলত রিক্ততা নয়, তার সঙ্গে ভাবার চারভাষ্যগুণও অনেকখানি জড়িয়ে মিলিয়ে আছে।

জীবনকে কে কোন দৃষ্টি দিয়ে বিচার করে তার উপর তাঁর রচনার গুণাগুণ বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই দিক দিয়ে বিবেচনা করলে আলোচ্য লেখকের ভিতর আনয়: অনেকটা পরিমাণ মিশ্র বানসিকতার সাক্ষ্য পাই। সত্যক জীবনে সর্বপ্রকারে বারী হুঃ নিশ্চিন্তিত ভাবেই প্রতি লেখকের সহায়ত্বিত আত্মরিক, তবে এই সহায়ত্বিতিকেই ছাড়িয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে সত্যক ব্যবহার ব্যবহারী অসংগতি ও ক্ষুণ্ণতার বিরুদ্ধে

বিজ্ঞপণ্যরূপতা। জীবনকে ও সাহসকে কতকটা বক্র দৃষ্টিতে দেখতেই যেন লেখক মানসিক ক্ষুণ্ণ অস্বস্তক করেন বেশী। আনয়ের বেশের সত্যক জীবনে এমন অনেক আচার অহুশাসন আছে যেগুলি সত্যজননের নজীরে ব্যক্ত দৃষ্টিতে এখনও কুসীলনের সর্গাদায় অধিষ্ঠিত, কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে-সব কবেই কৌপিত হয়ে গেছে। এই সকল অসার রীতিনীতির বিরুদ্ধে সন্তোষকুমার ঘোষের ব্যক্ত নির্মম, জালাহুয়া। বনেবিরানার কপট জৌলু, মাজাজনে বক্তিত মজীপনার নাটকীয় উৎকর্ষ, মালবিদ্যার অস্বাভাবিক চর্চিতানিষ্ঠা, ধরিত্রের চুনকো আত্মগম্বয়ের অহংকার—এ সব লেখকের হারালো 'বিজ্ঞপণ্য আচারে বারংবার জর্জরিত হয়েছে। বোট কথা, সর্বপ্রকার কাণটোর বিরুদ্ধে লেখকের মন অভিপন্নই মালোচনপ্রবল ও আপোষবাহীন। ভালো সাহস ও আত্মস্বাধার আবরণে যেখানেই তিনি ভগ্নাতি লেখতে পেয়েছেন তাঁর হুঁতীক কলম নির্মমতার ছুরি হয়ে উঠেছে। তিনি যেন প্রতিটি আত্মজ্ঞান বিবক্ষিত (কিংবা আত্মদ্রব্দপূর্ণ) সাহসকে ডেকে বলতে চান—“কে ক্ষুণ্ণ, নিকেকে তুমি যা কেবে প্রসার অস্বস্তক করছ আসলে তুমি তা নয়। তোমার আসল স্বরূপ হচ্ছে এই। যেখা, নিমের চেহারা দেখে আতকে উঠো না যেন।”

অনুমান করি, সত্যক জীবনে লেখকের বহু স্বপ্নতল হয়েছে, সেই স্বপ্নতলের বেদনা থেকেই নৈরাশ্রের উদ্ভব। লেখকের বানসিকতার ভিতর আনয়: অস্বস্তিতর মূলক মালোচন-প্রবণতার যে আবিষ্কৃত্যে লড়ে তাঁর মূল এই নৈরাশ্রবাদের ভিতরেই নিহিত বলে মনে হয়। এক কথার লেখকের নিমিসিতর লেখককে ধানিকটা বক্রদৃষ্টি করে তুলেছে, তাঁকে পুরোপুরি মানবধরী হতে দেয় নি।

ব্যক্তিগত ভাবে আমি সন্তোষকুমার ঘোষের রচনা-রীতির অভ্যাস অহুয়ালী। কিন্তু সেই সঙ্গে এও বুঝি, সাহিত্যের মূল্যায়নে ব্যক্তিগত ভালোনাগা মলমাগাটাই নয় কথা নয়, এমন কি সেই ভালোনাগা মলমাগার

শিখনে যদি দীর্ঘ দিনের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতা থাকে তা হলেও নয়। সকল কালের সকল মানুষের ভালোলাগা মন্দলাগার নির্ধারিতরূপ সাহিত্যের একটা দৈর্ঘ্যজিক মান পাড়িরে গেছে, সেই মান কখনও ব্যক্তিগত চরিত্র পোষকতা করে, কখনও বিরোধিতা। বোধ করি বিরোধিতাই করে বেশী। এই দৈর্ঘ্যজিক মানের দ্বারা বিচার করতে গেলে দেখতে পাই, সত্যোবস্থার ঘোষের রচনার গভীরতার কিঞ্চিৎ অসম্ভাব। তাঁর দৃষ্টি যে পরিমাণ বন্ধিম সেই পরিমাণে তিনি চটুলজাবাগর। ক্যোতিরিজ নখীর স্রাব তাঁর লেখারও যৌনসচেতনতা প্রবল। জৈব জীবনে যৌনতার স্থান বুঝা, সেই নখীরে সাহিত্যেও তাকে আশঙ্ক্য দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। তা ছাড়া লেখক মানুষের বহিরঙ্গ বিচারেই সমধিক ভৎসন, মানুষের আবেগ জীবনের গভীরে তাঁর দৃষ্টি সচরাচর পৌছায় না। 'সচরাচর' কথাটি লক্ষণীয়, কারণ 'হু' একটি রচনার এ কথার বিপরীত প্রমাণ পেয়েছি, যেমন বর্তমান আলোচ্য 'নানা রঙের দিন' বইতে। তবে যোটাছুটি এই বলা যেতে পারে, সত্যোবস্থার ঘোষের অত্যন্ত রচনাভঙ্গি এমন কোন পরিচয় বহন করে না যার থেকে মনে হতে পারে তিনি আধ্যাত্মিক সংকটের লক্ষ্যীন মানুষের অন্তর্ভূতের চিত্রাঙ্কণ পারংগম, এ আত্মীয় চিত্রণ প্রয়াসের দিকে তাঁর বৌদ্ধ অঙ্গ। পুণ্যের উজ্জলতা, বিবাহের গভীরতা কাকুণ্ডের প্রাবল্য, ক্রীতির উজ্জ্বল—এ সবের একাংশ লেখকের কলমে ক্ষুণ্ণিত হয়। তার থেকে এই শুধু বোঝার, লেখক প্রদানন্তঃ বুদ্ধিবীণী, লেখকের মনো-জীবনে আবেগের স্থান সংকুচিত। হরতো আবেগের উজ্জলতা লেখকের নিকট কিঞ্চিৎ পরিমানে অব্যক্তিকর, তাই অল্পভূতির সর্বপ্রকার আবেগমগ্ন প্রকাশ লেখকের কলমে আত্ম-আরোপিত সংঘম বন্ধনের দ্বারা নিরামিত।

কিন্তু এটা হল সুলভঃ নগরক বিচার। নগরক বিচারের দ্বারা কোন লেখকের সর্বকণ্ঠ গুণাবলী খারিজ হয়ে যায় না। সদর্পক দিক থেকে সত্যোবস্থার ঘোষের

রচনা বহুগুণ সম্পন্ন। অত্যন্ত ঠাইল ভাবার প্রাগদগুণ, সহক গরকখননৈপুণ্য, আনিকনিষ্ঠা—এ সব বৈশিষ্ট্যের সমন্বয়ে লেখকের বই সাহিত্য পাঠক সাধারণের নিকট বর্ধা আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। লেখকের অন্তঃপ্রতিরতার পরিচি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে এই লক্ষণ স্পষ্ট।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনারীতির সাধারণ লক্ষণ বর্ণনা করা হয়েছে। এই লক্ষণ লক্ষণ তাঁর 'লাল মাটি' উপন্যাসেও পূর্ণ মাত্রায় প্রকট। লাল মাটি নুতন করে প্রমাণ করল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় উজ্জ্বলতার আশাশ্রী, প্রকৃতি সচেতন, কবিশ্রাণ, কিন্তু বজ্র বেশী ভাষণবুধর, উদাম। তাঁর সৃষ্ট ঘটনাসমূহ উনিশ শতাব্দীর রীতির স্মারক। যে যে ক্ষেত্রে সেগুলি বিশ শতাব্দীর রীতি অঙ্গ লয়ন করেছে সেখানে কিঞ্চিৎ সিনেমাগামী হয়ে পড়েছে (বৃষ্টান্তস্বরূপ, কালোশব্দীর কাহিনী, বড়লনের রাজ্যে রক্তের অন্তর্ধান, কালোশব্দীর ডাকার বধ বাবা নিয়ে লড়াই, শালনগরের টিলায় সন্ধ্যাসিত সাস্ত্রসাময়িক দালা প্রভৃতির উল্লেখ করা যেতে পারে)। লেখকের চরিত্র-চিত্রণ বহিঃস্বী। সেই কারণে কিঞ্চিৎ সুলভা বোধ। মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে হুম্ব কাকনৈপুণ্যের ছাপ সাব্যস্তই চোখে পড়ে। চরিত্রগুলি বিশেষ মাহুৎ নয়, কতগুলি নিবিশেষ মানুষের প্রতীক। এর মধ্যে একমাত্র আলিমুদ্দিন মাস্টারই বা বীর বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র লক্ষণে সুলভ। বস্তুতঃ আলিমুদ্দিন মাস্টারই এ বইয়ের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য চরিত্র। নির্ধাতিতের প্রতি গভীর বেনদারোহদৃষ্ট মর্ধালা ও গুচুতা চরিত্রটিকে মরিচাঘটিত করেছে। সেই সুলভার কাহিনীর official নায়ক রক্তন নিভাওই নিম্মত। পূর্বগামী উপন্যাস শিলাশিপি—যার লক্ষ লাল মাটির কাহিনীপন্থ বারাবাহী খোণ আছে—তাতে রক্তনের বালা কৈশোর ও প্রথম যৌবন অঙ্কিত হয়েছে। সেখানে রক্তনকে আবরা বেন অনেক বেশি প্রাণবন্ত ভাবে পাই। কিন্তু এখানে রক্তন আপাতদৃষ্টিতে নিষ্ক্রিয়, স্থবির, পুত্রান্তন সৃতির বোম্বদনকারী মায়। বস্তুতঃ রক্তন সক্রিয় বামপন্থার বিশ্বাসী এবং গণ-সংগ্ৰামিক, তা হলেও এ বইতে ত্বক

সমিতির সংগ্রামের সঙ্গে তার যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে তা নিতান্ত সূত্র হস্তের স্থলে আছে। রক্তের সক্রিয় ভূমিকা বইটিতে প্রতিষ্ঠিত হয় নি, ফলে চরিত্রটি আংশিক বার্থ হয়েছে।

শাল বাটিতে আর পুরনিকের একটি উপকাহিনীর অঙ্গপ্রস্থল ঘটানো হয়েছে—এককালীন সমৃদ্ধ বর্তমানে হীনাবস্থা রেশমছুরির দানিক সাইন্স কাক ও মার্চার কাহিনী। এই কাহিনীটিতে লেখকের রচনা কৃপণতার লবিশেষ প্রমাণ দেওয়ায়। কাহিনীর আবরণ তেজ করে একটা সরল কৌতুকের ছটা থেকে থেকে চিলকিছে উঠেছে, সেটি গল্পটিকে বুঝে উপভোগ্য করেছে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় আপাতদৃষ্টির বর্ণনাগ্রহণ লেখক হলেও প্রয়োজনতঃ তিনি হাজারস ব্যক্তি করতে পারেন এ উপকাহিনী তার প্রমাণ। তবে নিছক হাজারস এ গল্পের লক্ষ্য নয়, গল্পটিতে বেরনার স্তরই প্রধান। কৌতুক ও কাকগো নিলে সাইন্স কাকের কাহিনী অনেক উপর ছাপ রাখে।

বইটিতে বরেন্দ্র ভূমির প্রাকৃতিক আবহাওয়ার একটি অত্যন্ত বর্ণনা পাই। বাংলা সাহিত্যে দুইজন কথা সাহিত্যিক আঞ্চলিক পরিবেশ বর্ণনার বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন—ভারতবর্ষ ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতবর্ষের রচনার বীরভূমির কক গুলির প্রকৃতি বৃত্ত হয়ে উঠেছে; অল্পশব্দে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর লেখার উত্তর বঙ্গের উত্তরাংশের শক্তি পরিবেশকে সজীব করে তুলেছেন বিভিন্ন বর্ণনা দেখা শু রঙের সমাবেশে। লেখকের একাধিক উপজ্ঞানে ও গল্পে শালবাটির যেন বরেন্দ্র ভূমির সার্বক নিসর্গ-চিহ্ন চোখে পড়ে। এই দিক দিয়ে, লেখক ভারতবর্ষের সঙ্গে মূল্যে তাৎপর্ ইরাজী সাহিত্যের উনাস হাতির সঙ্গে একাকান দাবী করতে পারেন।

শাল বাটি উপজ্ঞানে একটি তত্ত্ব প্রকাশ রয়েছে। তত্ত্বটি এই যে, শাল ও শোষণের ক্ষেত্রে হিন্দু জমিদার আর মুসলমান জমিদারের তেজ নাই, যেমন তেজ নাই

অভ্যাচারিত হিন্দু ও মুসলমান প্রকার। সমাজের সৌম্যরূপ নির্মিত হয় সাম্প্রদায়িক বন্ধনের দ্বারা নয়, শকারের অর্থনৈতিক নিরক্ষরতার দ্বারা। আলিমুদ্দিন বাটীরের চোখে যখন সামাজিক সৌম্যবিশ্বাসের এই মূল চেহারাটি বরা পড়ল তিনি মূলতঃ শীগ শবী হয়েও সাম্প্রদায়িকতার জিহির ছেড়ে সকল সাম্প্রদায়িক শোষণের পক্ষ সমর্থনে অগ্রসর হলেন। কনভাষারের জুহুটিতে তিনি বিচলিত হলেন না। শীগ সমর্থিত আত্মাধীর সম্পূর্ণ মূল্য এক অর্থ তাঁর দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হল।

মাস্তাবার একটি সুশরীতিত তত্ত্ব এইভাবে লেখক কোশলে কাহিনীর ভিতর প্রবেশ করেছেন। এতে করে লেখকের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীই শুধু প্রমাণিত হয়। তবে শিলাসিপি এবং শালবাটি উভয় গ্রন্থে লেখক গভীর-বাদের প্রতি কিঞ্চিৎ অবিচার করেছেন সে কথা বলব। কথাটা হুঁসির দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারত, তবে বর্তমান আলোচনা তার উপযুক্ত ক্ষেত্র নয় বলে ইচ্ছা করছি সে প্রশ্নে বিরত রইলাম। আপাততঃ লেখকের রচনাবৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে এই শুধু বলব, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের রচনাতত্ত্বের ভিতর দ্রুত বিশদ্রুপ ভণের সমাবেশ ঘটেছে। সাহিত্যিক কৃতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে তিনি ঐতিহ্যবাহী, রাসনৈতিক ভাবধারণের ক্ষেত্রে তিনি উগ্র-পনাবলম্বী। এই দুই দ্বারার ভিতর সম্বন্ধ ঘটানো কঠিন। তবে লেখক এ বিষয়ের বহুলাংশে সফলকাম হয়েছেন বলে মনে করি।

নরেন্দ্রনাথ বিজের 'বেহন' গ্রন্থটিকে উপজ্ঞানের আকারে বড় পর বললে বোধ করি তার বশবর্তন বর্ণনা করা হয়। একদিকে বরেন্দ্র ভূমির আদর্শে আত্মশীলা ব্যক্তিত্বপ্রাণীনা সাহসিকা তবুও কবি তার, অঙ্গদিকে বর্ণনিত নিরীহ বৃক পৃথক বিকাশ ও তার স্ত্রী উদা— এই তিনি নিলে বেহননের বেহ ভৈরী হয়েছে। স্মৃতিতাই বর সখ্যক চরিত্রকেত্রিক গল্পে উপজ্ঞানের ব্যাধি থাকবার কথা নয়, আলোচ্য গ্রন্থে তা নেইও। তবে

এই অপূর্ণতার জন্য কোমল করবার কারণ নেই। বইটি পড়তে অতি উপায়ের। কি বর্ণনাংশে, কি সংলাপাংশে। গ্রন্থের বিষয়কর পাঠযোগ্যতার দ্বারা উপভাসের স্বার্থের ব্যত্যয়জনিত ক্ষুদ্রতার পূরণ হয়েছে। লেখকের পূর্ববর্তী উপভাস 'বীপপুত্র' পত্রীকেন্দ্রিক রচনা এবং তাতে বহু চরিত্রের ভিত্তি। উপভাসের লক্ষণ বিচারে বীপপুত্র সার্বিকতর রচনা যে কথা স্বীকার করতেই হয়, কিন্তু বেহুদয় অনেকখানি স্থানবিশিষ্ট রচনা। গত কয়েক বছরে নরেন্দ্রনাথ নিজের রচনারীতির যে দুটিপ্রকার হুঁচকিটি সাধিত হয়েছে রচনায় এছাড়া আরো অন্য।

নিরমব্যবস্থিত জীবনের অর্থ নৈতিক কল্পতাপীড়িত আশা আকাঙ্ক্ষা স্বর্গবৈশ্বনাথ রূপায়ণ নরেন্দ্রনাথ নিজের জুলা কুঠী লেখক বাংলার সেই একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কিন্তু এ বইয়ের আশা কিংবা আশালা। এ বইয়ের স্বল্পবিত্ত জীবনের অর্থ নৈতিক সমস্তা গৌণ। পরম্ব গোটা ভিত্তিক মাছুরের ক্ষয়ক্ষতি সংঘাতকে এখানে আশাভিত্তিক দেখা হয়েছে। গ্রন্থ—বৈদিক ও মানসিক—এই গ্রন্থের মূল উপজীব্য। এ ক্ষেত্রেও যে লেখক একজন পাকা শিল্পী এছাড়া নানা অংশে তার প্রমাণ হুঁচকি দিয়ে রয়েছে।

চরিত্র সৃষ্টিতে লেখকের কুশলতা অবিসংহারী। বিশেষ করে কবি রায়ের চরিত্র চিত্রণে এই বৈশিষ্ট্য সন্নিবিষ্ট লক্ষণীয়। ব্যক্তিত্বের হুঁচকি এই চরিত্রটি উপভাসের আর হুঁচকি এখানে চরিত্রকে রূপ দেয় দিয়েছে। এতগুলি জীবিত্তির বানবস্তুর কবি রায় কিছু আদর্শ চরিত্রের মধ্যে নয়—তার জীবনে অসল পতনের কলঙ্ক আছে। ব্যক্তিগত স্বাধীনতার তাগিদে সে তার বৈদিক সৌন্দর্যকে পুরুষভিত্তি আকর্ষণের ঐক্য স্বরূপ ব্যবহার করতে বিধা করে না। অতীতকাল হতে সে অভিত্যবক-হীন, স্বাধীন, একক জীবন বাস্তব অভ্যস্ত। অতীতকে সে অনুভূত জীবনী কল্পা নয়, এক সময়ে তার বিবাহ হুঁচকি, কিন্তু মূল অভ্যাস উপভাসের সঙ্গে যৌন জীবনের সংগতি না হওয়ায় বিবাহের কিছুদিন বায়েই সে স্বাধীন

সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করে। তারপর থেকে সম্পূর্ণ নিজের ছোট্ট নিজের পায়ে ভর দিয়ে স্বাভাবিক একাধারে সাধনার স্বরূপাত। সাধনা একাধারে, তবে একনিষ্ঠ নয়। একাধিক পুরুষ নিয়ে কবির নির্বিশেষে জলাকলার লীলা। কবির নিকট মেহের গুণিতা একটা সংস্কার বই নয়, একমাত্র ভালোবাসার পায়েই খেলাই শুধু এই সংস্কার মাত্র। আর এই ভালোবাসার পায়ে এলো বিভাসের রূপ ধরে—কবির মনোভাবের পায়ে পদ হুঁচকি। তারপর থেকে উনার দীর্ঘায় আর কবির উনাকে পীড়নভার আর বিভাসের স্বতন্ত্র কবিত্বী জন্মঃ জটিলতার হয়ে উঠেছে। কাহিনীর মধ্যে এনে লেখক জটিলতার সে এছাড়া নিশিষ্ট করেছেন।

কিন্তু উপহাসের রূপ হল কবির উজ্জল দিক, ওয় রূপের একটা দ্বারা দিকও আছে। সেখানে বেহুদে পাই। সে তার উপভাসের একটা অংশের দ্বারা পিতৃপরিবার প্রতিপালন করে, বিভাসের সংস্কারে কালের বিশেষ দেখা দিলে কোমরে শাড়ীর আঁচল জড়িয়ে হুঁচকি হাতে তাদের স্বাভাবিকতার কাল সেবে দিয়ে আসে, উপভাসের পাই পরমাণি পর্যন্ত সে হুঁচকি দিয়ে হিসাব করে, তাড়া নিয়ে বাড়িওয়ালার সঙ্গে কগড়া করতে তার মেটেই বাবে না। এক কথার কবি বহির্জগতে সাক্ষরী, গৃহে সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন প্রাকটিক্যাল বেয়ে। বিভাসের বৈচিত্র্যবিশিষ্ট নিয়ন্ত্রণ জীবনে আলোড়ন সৃষ্টির জন্য কবির মতো বেহুদেই বুকি প্রয়োজন ছিল।

জীবিত্তির মানবগুণে কবি অস্বকরণযোগ্য বেহুদে নয় সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সাহিত্য তো নীতি-প্রচারণার স্থান নয়, নীতিপ্রচারণার ক্ষেত্র অসাধারণ। ভালো-মন্দে বেশাংশে মানুষের যে মিশ্র ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্বকে তার স্বরূপে হুঁচকি তোলা নিয়ে সাহিত্যের কথা, স্বাধীন সোনার গহনি হবার বারনা কেউ সাহিত্যিককে দেয় নি, সেটা তাঁর জুড়িকাও নয়। এইটে যদি সাহিত্যবিচারের মূল কথা হয় তবে নরেন্দ্রনাথ নিজ কবি রায়ের কথা দিয়ে-যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্রসৃষ্টি

করেছেন সে কথা স্বীকার করতেই হয়। এই চরিত্রটির অন্তঃস্থার অন্তর্ভুক্তই দেহমন পাঠকে নিকট সম্মানের বস্তু হয়ে থাকবে।

ছোত্তিরিঙ্গ নন্দীর স্বর্ণমুখী সত্যিকার উপজ্ঞানের লক্ষণাক্রান্ত গ্রন্থ। স্মৃত্তরায় বিশেষ চিহ্নিত হওয়ার যোগ্য। অনেক চরিত্র খইটিতে ভিক করে এসেছে এবং তাদের সকলকেই একটা সমগ্রতার পরিকল্পনার ভিত্তির প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। বাংলা দেশের প্রত্যন্তদেশস্থিত একটা ক্ষুদ্র নক্ষত্রল শহর এই গ্রন্থে একটি বিশেষ রূপ নিয়ে উঠে উঠেছে। বস্তুতঃ, শহরটাই যেন গ্রন্থের একটি চরিত্রবিশেষ। আধুনিকতার বোদ্ধকবিশিষ্ট আর্থ-গ্রাম-আর্থ-সহর উঠতি যে কোন নক্ষত্রল শহরের প্রতিরূপ বুঝে পাওয়া যাবে স্বর্ণমুখীর নিশ্চয়গুণের মধ্যে। বাংলার নানিত্বের মক্ষত্রল শহরের এমন নিপুণ চিত্রণ আর কোন বাংলা উপজ্ঞানে পড়েছি বলে মনে হয় না। ত্রি কি বাঁমের 'The results of an accident' গ্রন্থে ভার্মান নক্ষত্রল শহরের অত্যাক্ষর বর্ণনা পড়েছি, এই গ্রন্থের পটভূমির সঙ্গে আলোচ্য গ্রন্থের পটভূমির কিঞ্চিৎ অভ্যাসিত সাদৃশ্য আছে, যদিও দুই বইয়ের চিত্রচরিত্র বর্ণনা সম্পূর্ণ আলাদা। আনন্দের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত আধুনিক লেখকের মধ্যে নক্ষত্রলচিত্রণে কুশলতার পরিচয় দিতেছেন অভিভাক্ষার সেমন্তর, সুবোধ ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং হালে সত্যোবজ্ঞার ঘোষ। সত্যোবজ্ঞার ঘোষের আন্ত-সমালোচ্য পুস্তক 'নানা রঙের দিন' এই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য যোগ্য। তবে এখনও ছোত্তিরিঙ্গ নন্দীই যে এ বিষয়ে দক্ষতর লেখক সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। আর কোন কারণে যদি নাও হয় এই একটি কারণে অন্ততঃ, স্বর্ণমুখী আধুনিক উপজ্ঞান-সাহিত্যে বিশেষ মর্যাদা দাবী করতে পারে।

চরিত্রচিত্রণে ছোত্তিরিঙ্গ নন্দী বিশিষ্টভাবে আধুনিক। তাঁর গল্প বলার চতুর্ঘটনা সাজাবার রীতি, চিত্রাঙ্গকানের কায়দা সবই একাধীন সংস্কার দ্বারা দখলকর। মনো-

বিশ্লেষণ তাঁর লেখার একটি মস্ত স্থান জুড়ে আছে। কিন্তু এ সকল কথা সর্গহীন নয়। মনস্তত্ত্বের উপর অভিনবতার কোঁক বিতে গিয়ে লেখক তাঁর রচনাকে অত্যুগ্র পরিমাণে বাস্তবমুখী করে তুলেছেন। সেটা তাঁর রচনার উৎকর্ষের অপরূপ ঘটনোক্ত। অবস্থান্তরে আনন্দের মনের ভিতর ভ্যালোমক্ষ কত রকম চিত্রাই তো উদয় হয় তার সব কিছুই সাহিত্যে চিত্রিতব্য নয়। স্মৃতি শালীনতার খাতিরে কোথাও না কোথাও সীমারেখা টানতেই হয়। বাস্তবতার দাবী মানতে গিয়ে মনের বাস্তবীয় জ্ঞান খোলাখুলি আলোচনার রেড্ডাক্স বহিঃসিদ্ধি হত তা হলে সাহিত্যে ঐচ্ছিকভাবে পরিণত হত। এটা স্বীকারই গ্রন্থ নয়, শোভনতার গ্রন্থ, আভল-আবোধিত সংবদননের দ্বারা শোভনতার অস্থূলকর করতে হয়, নতুবা জীবনে সৌন্দর্য থাকে না, সুবাস থাকে না, রস থাকে না, সব-কিছু কুপ্রিত্যার গগন স্পর্শে ক্ষেদ্রাক্ষ হয়ে উঠবার উপক্রম হয়। স্বর্ণমুখী গ্রন্থের চেহি, চেহির বা সীংহর, বোধিনীবাসুর যেরে গিলি, নিরন্তরনের প্রী গপি সকলোই যেন যৌনতার উৎকপশীড়িত বক্তকস্তলি অস্বাভাবিক জীব। যৌন-মনস্বতা ভাড়া চেহির জীবনে যেন আর কোন দ্বিরাঙ্গিতি নেই। তার মনে না আছে কিশোরী বালিকা সুলভ চাপল্য, না মেহ, না মমতা—দিনরাত সে শুধু অস্ব-গীড়নকারী বিষম চিত্রাকুলতার বিস্তৃত স্রব্ধে রক্ত হয়ে আছে। অন্তরকে চেহির বা আধুনিকতার বাস্তবিকতা। এই বাস্তবিককে কীপিরে-কুগিরে বজ্র বোধ অস্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে। সত্যাববজী হুমারী গিলির বিহি-জাম থেকে ভারবুজ হয়ে আসাটা যেন কিছুই নয়, আনন্দের মধ্যবিক্ত সম্মানে এ জিনিষ যেন অগণ্যার হক্ষে এবং হওয়ার উচিত! উপজ্ঞানের মাধ্যমে এ আতীর সাসেলীয় মতবাদ প্রচার সকলে হজ্ব করতে পারবে বলে মনে হয় না।

যৌন সন্তেমনতাকে অতিরিক্ত স্না দিতে গিয়ে লেখক নিজের প্রতি আর একটা দিক থেকে পরিচায় করেছেন। সহস্রহুতি, দরদ প্রভৃতি উচ্চ মানবিক

বৃত্তিগুলি তাঁর রচনায় অসুচ্ছাদিত থেকে গেছে। তাঁর সাহিত্যে বাস্তবজীবনের প্রাধান্য সামগ্রিক চোখে পড়ে। সেই কারণে রাউন্স-এর লক্ষ্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর রচনা স্বয়ং শিল্পকীর্তির পথে উন্নীত হতে পারে নি, কোথায় বেন একটা মত কীক থেকে গেছে। প্রকৃত প্রভাবে, লেখকের ষাট রচনাকর্মই লেখকের সর্বপ্রধান বাহ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাক্যভাষাই হোক আর আচরণের চাতুর্যই হোক, চাতুর্যভাষাই অগতীর, পল্লবগ্রাহী। জ্যোতিষ্মত নবীর রচনার বেলায় এই অগতীর স্বের অতিবেগন সংগত তাইই আয়োগ করা চলে।

স্বর্ধবীর আসল বৈশিষ্ট্য তাঁর কাহিনীতে নয়, মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণেও নয়, সেটি পাওয়া যাবে বাংলার মকমল সহরের পরিবেশ বর্ণনার এবং কতকগুলি 'টাইপ' চরিত্র-সৃষ্টির মধ্যে। সেখানে কেহে প্রধান হলেন উনিশ শতাব্দীর ধ্যানধারণার পোষক, এ যুগের সঙ্গে বে-মানান অটলবায়, অসাময়িক সামাজিকতার প্রতিমূর্তি বোদান ডাক্তার, মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান সুখোমস্বামী বোহিনী নন্দী, সাবরেজিষ্টার মুন্সি হাজরা, সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কল্যাণী নন্দী, এবং বরফা কলার অত্যাধুনিকী বঙ্গলাকান্তিকী যাক্স নীহার (এই চরিত্রটির সঙ্গে লেখকের সঙ্গপ্রকাশিত গল্প ঘের-শাসনের মাস্তার চরিত্র তুলনীয়)। উপজাতির প্রধান চরিত্র নিশানাথও একটি টাইপ, কারণ আজকাল সহরে বসবাস এই বয়সের ভিতর-কাঁপা নীতি বিবর্তিত অর্থ আর্থিক জীবনে প্রপ্রতিষ্ঠিত হুবক প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়, নিশানাথকে অনায়াসে এদের প্রতিমূর্তি মনে করা চলে। নিশানাথের আপাত-বোগ্যতার পিছনে লুকিয়ে আছে পর্বতপ্রমাণ অনায়াস ও নিরুদ্ভূততা, মত বড় একটা কীর্তির উপর তাঁর নাকলোর দুনিয়ায় ঝাড়া, তবু এই বয়সের হুবকই আজকাল সাপ্তাহের চোখ বাঁধার বেশী। সমাজের এই নূতন গলগতির উপর সজ্ঞানী বৃত্তি ব্যক্ত করে মনের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা সবরোচিত হয়েছে। লেখক এ জন্য

মনাবনের পাত্র।

সন্তোষকৃত্যর যোবের 'নানা রঙের দিন' একটি অর্থ সচেতন বালক মনের দিকট পানিপানিক পৃথিবীর ক্রমিক উন্মোচনের কাহিনী। এই উন্মোচনের কেন্দ্রে আছে এক নিম্নমধ্যমিত ভদ্র পরিবার, যার আত্ম হুব-চুপকে অবলম্বন করে ঘটনার ধারা আবর্তিত হয়েছে। যে সময়ের কাহিনী এ বইতে দেখা হয়েছে সেটা ১৯০০-০১ এর কাছাকাছি একটা সময়। এই সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বাধীনতাবাদী সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্য্য-আইন প্রবাহা আন্দোলন—সারা দেশ জুড়ে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করে। এই গ্রন্থের মূল মুহূর্ত বরোয়া হলেন্ড পরিবেশ অসমিস্তর রামনৈতিক। সেই কারণে স্বাধীন বৃত্তি আন্দোলনের কথা অবশ্যই তাইই এই গ্রন্থের কাহিনীর মধ্যে এসে মিশেছে। 'অপের পটভূমি পূর্ববঙ্গের একটি নাতিকৃত মকমল সহর—গাজীকী প্রবর্তিত লক্ষ্য সন্তোষকৃত্যর বাংলার মকমল জীবনের উপর লবিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল, সকলেই জানেন। গ্রন্থে রাজনৈতিক প্রসঙ্গের অবতারণার এটিও একটি ক্ষেত্র। তবে এটি রাজনৈতিক উপভাষ নয়, অসলে পারিবারিক উপভাষ, পারিবারিক কাহিনীটি তদানীন্তন কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনার উপলক্ষে বিবৃত হয়েছে যাক্স। বইয়ের রাজনৈতিক অংশের ভিন্ন ভাড়াভাড়া, অবস্থিত ছুঁল। তখনকার রাজনৈতিক পরিবেশের সম্পূর্ণ কোন ভিন্ন লেখার ভিতর দিয়ে পাওয়া যায় না। তবে এই অসমিস্তর অস্ত্র মনের মধ্যে অসুস্থি ভাগে না এতন্ত যে, বইটির পারিবারিক সামাজিক অংশের ভিন্ন অতি চরমকার। উপভাষের কাহিনীর স্বকীয় উল্লেখ্যতার রাজনৈতিক ইতিবৃত্তগত ক্রটি বিদ্যুতি তুলিয়ে বাধে।

শিল্প মনের রূপায়ণের ক্ষেত্রে বাংলার সব সেরা বই হল 'পথের পাঁচালী'। নানা রঙের দিন-ও মূলতঃ শিল্প মনস্তত্ত্বের রূপায়ণমূলক বই। কাজেই দৃষ্টি গ্রন্থের ভিতর যেভাবেই একা বাক্য স্বাভাবিক, আছেও। তবে পার্থক্যটাই প্রবল। 'পথের পাঁচালী'র অনু অনাবিল

পল্লীপ্রাপ্ততার ব্যাধি আচ্ছন্ন স্বপ্নবসন্তল নিবন্ধ এক বিশেষ, আর সহরের আবহ প্রচার বহিত শুভানুভব সরল হলেও কিছু পরিমাণে অস্পষ্ট। ঐ বিশেষ বয়সেই নানা রকম বিসম্মত অভিজ্ঞতা ইচ্ছার হোক অসিদ্ধায় হোক তাঁকে যেন নিতে হয়েছিল। তার দুনিবার স্বাভাবিক কোমলগুণ কতক পরিমাণে তাকে অজানিতের পথে ঠেলেছে, মনে করা যায় ৯ কলে শিশুর আদিম সারল্যের স্বর্ণ থেকে শুভানুভব স্রষ্ট, তার পরিবেশের ভিন্নতাই তার সারল্যকে আংশিক খতিত করে দিয়েছে।

এটা হ'ল শুভানুভবের মানসিক গঠনের কথা, তাতে না-অস্বগ্রাণ কিংবা শিশুর আদর্শের প্রতি প্রভাবিত হতে তার আটকায় নি। শুভানুভবের বাবা দেবানুভব দেশের অল্প লাক্ষ্যবানকায়ী একজন ত্যাগী কর্মী, যেনপ্রেম তাঁকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রতি উদারীন হ'তে নিবিধিয়েছে। দেশের ভাকে কিছুদিন বাধে বাধেই তিনি গৃহ থেকে নিজস্ব হন, স্বদেশি করেন, জেল বাটেন আবার আন্দোলন জড়িয়ে আসতেই সংসারের প্রতি সামরিক আকর্ষণে গৃহান্তিরূপে পা বাড়ান। তবে কসূহে এর স্বত্ত্বাংলয়ে, দেবানুভবের উপার্জন অক্ষমতার অল্প শুভানুভবরা আবালা মানার ব্যতীতে নাহুৎ। দেবানুভবের এই সংসারবিশ্বস্তা ও দাতিজ্ঞানপূরতার অল্প শুভানুভবের বা বিতার মনে স্মৃতির কোষ। তিনি কঠিন, অনমনীয় চরিত্রের দেশের, স্বাধীকে তাঁর আচরণের অল্প তিনি, কখনও কথা করতে পারেন নি; 'যখনই বাবী গৃহে এসেছেন, এই নিরে স্বাধীর সঙ্গে তাঁর বিচিহ্নিৎ বেগেছে। পুত্রকে তিনি সবচেয়ে স্বাধীর সারিবা থেকে ঘুরে বাগতে চেয়েছেন পায়ে ছেলেও বড়ো হয়ে বাগের পথ ধরে। শুভানুভব বাগবায়ার মায়ের এই খেদনা লক্ষ্য করেছে আর শ্রীভিত হয়েছিল। সে মনে মনে সংকল্প করেছে, যাকে সে বেনন করে হোক হুদী করবে, শিশুর আদর্শের প্রতি প্রতিষ্ঠিত হওয়া সত্ত্বেও এই বোধ শুভানুভব তার বালকবন থেকে

কখনও দূর করতে পারেন নি যে তাদের দারিত্র্য আর লক্ষ্য প্রচার দুর্বতির অল্প তার বাবাই প্রোনাত; দারী। কিন্তু এমন যে শুভানুভব তাকেও শেষ পর্যন্ত ষটনাংকতে পক্ষে দেশের অল্প হুৎবরণের পথে পা বাড়াতো হ'ল। সে কাহিনী গ্রন্থটিতে অতি মনোজ্ঞভাবে বর্ণিত হয়েছে।

লেখকদের আলোচনার অংশে সন্তোষকুহার ঘোষের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে লক্ষ্য কথা বলা হয়েছে তার থেকে বুঝেই যাওয়া হবে, লেখকের ভিতর ছদ্মবেশ বণ্টে প্রবল নয়। কিন্তু এ মন্তব্য তাঁর গোটা সাহিত্যের সাক্ষ্য ব্যাঘাত অবলম্বন করে করা হয়েছে, বিশেষ কোন রচনার কথা মনে করে করা হয় নি। 'নানা রঙের দিন' উপরি উক্ত মন্তব্যের একটি বিপরীত ব্যতিক্রম। এই গ্রন্থে ছদ্মবেশের স্মৃতিই প্রধান, আর সে স্মর স্বল্পাশী। গ্রন্থের উপক্রমবিকাশ লেখক নিজেও এই ছদ্মবেশের কথা মনেছেন, অভিন্নতট স্বীকার। গ্রন্থটিতে ছদ্মবেশের প্রাবল্যের একটা কারণ বোধ করি এই যে, গ্রন্থটির বাঁচ কতকটা আত্মজীবনীমূলক। মনে হয় লেখকের স্বকীয় বস্তুজীবনের অভিজ্ঞতা কতকালে উপজ্ঞানটির কাহিনীর ভিতর বিশেষ আছে। অস্বল্প অল্পমানের অপ্রত্যয় সম্পর্কে স্মার করে কিছু বলা করিন, তবে রচনার ছদ্মবেশভূতির প্রাবল্যসূচী এরকম মনে হওয়া স্বাভাবিক। কাহিনীর ভিতর আত্মজীবনীর উপাদান যদি নাই বিশেষ থাকবে তবে স্বতাবতঃ বাট লেখক সন্তোষকুহার বোধ এমন আত্মবিকতার প্রতার প্রত্যয় হয়ে উঠলেন কী করে? তাঁর অত্যন্ত ব্যঙ্গপ্রবণতাকে ছাড়িয়ে বেননার কাক্স্য বড়ো হয়ে উঠল কোন্ ভূপে? সন্তোষকুহার ঘোষের স্রষ্টাচারিত্ত্বগুণগাম কিছু গোমালার গলি রচনাচ্যুত্বের দিক থেকে অনেক বেশী হৃদয় দীপ্তিময়, কিন্তু এম্বইয়ের আবেদন গভীরতর। তাবার সারল্যে, বর্ণনার আন্তরিকতায়, পরিবেশের গ্যাক্ষীর্বে নানা রঙের দিন মনে স্মৃতির রেখাপাত করে। রচনার এই সারল্য আন্তরিক গুণ যদি লেখক তাঁর লক্ষ্য লেখার অব্যাহত রাখতে পারেন, তাঁর আর মার নেই।

নানা রঙের দিন-এ সত্যিকার উপভাসের লক্ষণ স্পষ্ট। অনেক চরিত্র আর অনেকগুলি ঘটনাকে একটি কাহিনীর ভিতর অগুণ্ড দানের প্রয়াস প্রতীতিযোগ্য সাক্ষ্যের দ্বারা ঘেঁষে গেছে। সব চরিত্র অবশ্য সমান উৎসাহের নি। (কবিদি আর ছোট মানির চরিত্র আরও বিস্তারিত হলে ভালো হ'ত।) সত্যোবজ্জ্বার খোবের বাকসংঘর্ষ প্রশংসনীয় তবে এটাও লক্ষ্য করবার, সময় সময় তিনি এই ভণ্ডাকে নিত্যের অসন্তোষের কিনারায় নিয়ে তোলেন। ভাষণ বিরলতার ফলে ঘটনা পুরোপুরি কবিত হ'য় না, চরিত্র অপরিস্ফুট থাকে, এমন দৃষ্টান্ত তাঁর লেখায় মাঝে মাঝে চোখে পড়েছে বলে এবিষয়ে সতর্কবাণী উচ্চারণ প্রয়োজন মনে করি। নারায়ণ পমোপাধ্যায় অতিরিক্ত মজার ভাবগন্ধুধর, সত্যোবজ্জ্বার খোব অতিরিক্ত মজার ভাবগন্ধু। (দুটোই রচনামৌলিক জটী এবং দুটোই সমান পরিহার্য।) তবে বিভা, সরমাদি, দেবাশিষ এবং শুভান্বিতের বিধি চাক এই কয়টি চরিত্র

রচনাগুণে অত্যন্ত বিরসমত রূপ পেয়েছে। বিভার আশ্চর্যবাদীপূর্ণ বৃণ্ড চরিত্র মনের ভিতর স্বার্থ প্রত্যাখ্যান কাগিরে তোলে, সেই সঙ্গে দেবাশিষের প্রেতি জাগে অপরিস্রব সছাচ্ছৃতি: চাক ও ছোট মানির বিবাহিত জীবনের স্বার্থতার মধ্য দিয়ে আমাদের দেশের নিঃস্বার্থবির শরিবারগুলির কজ্জাবার লবজার ভগ্নাবহ প্রকৃত রূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। এ উদ্ঘাটনের প্রয়োজন ছিল। বস্তুত: উপভাসের এই দিকটি বইটির এক প্রধান সম্পদ। এই সম্পদগুণে পরিবেশিত সাহিত্য স্বার্থ সন্মাজ-কল্যাণকর হয়ে উঠেছে। অন্তর্গত, সরমাদি'র চরিত্র বালবিধবার নিষ্করণ বিবিলিপি'র আরক। তবে সরমাদি বিধবার উপর জোর করে চাপানো কৃত্রিম কল্পিতার অল্পাংশ বীকার করে নেই নি, স্বীয় ব্যক্তিত্বের জোরে সে তাঁর ভাগ্যহত বকিত জীবনকে সার্থকতার মণ্ডিত করে তুলেছিল। এইখানেই চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য আর আকর্ষণ।

কাল-পরিক্রমা

(উদয়শতর ও স্যানা পাভলোভা)

প্রশান্তমোহন চৌধুরী

অধ্যাপক দ্বারা আগন্তেন আমাদের এখানে তাঁদের মধ্যে দু'জনকে মনে পড়ে বিশেষ করে—রাজকুমার চক্রবর্তী আর ডাঃ জুয়েন সেন, এক-এ,পি-এইচ-ডি। প্রথমোক্ত ব্যক্তির আনাগোনা ছিল আরো নিভা; কারণ রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগ থাকার তাঁর কাছও ছিল যেন সাংবাদিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা করে চলা। আমাদের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠলে তাতে দ্রুত প্রচার কার্যের সুবিধা ছিল। এমিক দিয়ে তাঁর শ্রুতাবহ কৃত্রিমতা প্রকাশ পায় নি, আগন্তেন তিনি তাঁর সহজ সম্পর্কের জোরে। আমাদের যুগপত যেন পনের তিনিত ছিলেন সেই বলকুক্ষ। আমাদের সংসর্গে

তাঁর এত বনভাবে আসার আরও একটা বড় কারণ ছিল। তিনি ছিলেন আজন্ম কৌমারপ্রভাবারী। গৃহে তাঁর কোন আকর্ষণ ছিল না। অধ্যাপনা শেষ করে ঘরে ফিরে যখন তিনি চারের পেরাশার চুমুক দিতেন তখন তাঁর মস্তিষ্ক কোনদিন পেয়ালার দরবার আগে কোন কোমল হজের চুড়ির হুঁ হুঁ আওয়াজ শুনবার সুযোগ পড়ে নি কিংবা শিশুর কল-কাকণিতে তাঁর চিত্ত মেহুরগে আগ্রস্ত হ'ত হয় নি কোন দিন। ঘরে তাঁর মন বসতো না, তাই আগন্তেন ঘুটে আমাদের কাছে। এক একদিন সন্ধ্যা থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত কাটিয়েও শেষে ফিরতেন আমাদের সংগে। আরম্ভে ট্রীটের ঘোড়ে এসে বিজয়-

ভূষণ ও আনার সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যেতো।

সপের সাংবাদিকতাও ছিল তাঁর একটি নেশা। মাঝে মাঝে আমরা তাঁর সাহায্যে নিজের শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপারে। অসাময়িক, সরল ও বহুবৎসল ব্যক্তি ছিলেন এই হাক্কুমার চক্রবর্তী।

ডাঃ সুরেন সেন তত্ত্ব যে বরিশাল জিলার লোক ছিলেন তা নয়, তিনি 'বিশ্বযত্ন'পত্রের অগ্রাধ্বাণীও। অশ্বিনী দত্তের 'ভক্তিবোধ' এইর উদ্ভবের পড়া ছিল কিনা জানি না তবে এইর আত্মিক বোধ দেখে মুগ্ধ হ'তাম। তত্ত্ব এইর ক্ষেত্রেই নয়, বরিশালবাণী অনেকেই মর্মেই এই বোধ দেখে আনার মনে হতো অশ্বিনী দত্ত তাঁর মিলাবাদী লকলকে একটি মাত্র বোম্বাই দীক্ষা দেন নি, তিনি ছিলেন অনেক বোম্বাইর দীক্ষাগুরু।

ডাঃ সুরেন সেন থাকতেন তাঁর বাগিচার বাড়িতে। ট্রেণে যাত্রাসময় করতেন। লাহুর রোডে আমাদের অফিস পড়তো তাঁর ট্রেনে যাওয়ার পথে। এই সময়টা তাঁকে দেখা যেতো ঘন ঘন।

শিক্ষা বিষয়ে, বিশেষ ক'রে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত কোন জটিল ব্যাপারে প্রবন্ধ লিখতে হলে অনেক সময় তাঁকেও অনুরোধ করতো বিজয়।

বাংলায় প্রবন্ধ লেখার অভ্যাস তাঁর ভেতন ছিল না। তত্ত্ব বিজয়ের অনুরোধে তিনি উৎসাহ করেন কি করে? বক্তব্য তাঁর কিছু অসাময়িক হলে না, সেইটুকুই আমাদের চাই প্রধানতঃ।

বঙ্গালম্বর ক্রম প্রবন্ধ শেষ ক'রে হাতের ব্যাগটি তুলে নিয়ে তিনি কেটে পড়বার সতলবে উঠে ঝাড়ালেন একদিন। অধ্যাপক বঙ্গালম্বর তাঁর একটানা লেখার মধ্যে কোথাও খানেন নি। কথা, সেনিকোলন, গাড়ির কোন বালাই নেই কোথাও।

বিজয় প্রবন্ধটি হাতে নিয়েই বললে অধ্যাপক মশারকে—এই! করেছেন কি! পাঠ্যচূষণ করেন নি যেখানে! পাঠ্যচূষণ ক'রে নিয়ে যান।

বিজয়ের তো আকার মন্দ নয়। প্রবন্ধ গেরেছে

সেই তো বটেই, আবার পাঠ্যচূষণ চায়।

ডাঃ সেনের অভ্যর্থনা বৈধ ছিল না আর সময়ও ছিল না হাতে।

বললেন—'আর-এর আ-বা-র' এদিকে ট্রেন কেল হইয়া যায়, তুমি বলো পাঠ্যচূষণ করিয়া দিতে! পাঠ্যচূষণ করুক কী!

ডেবী গ্যাঙ্গোয়ার না হ'লে ডেবী গ্যাঙ্গোয়ারের ট্রেন থম্বার তাড়া জরুরক করা বরিন। বিজয়কে ট্রিকটাক ক'রে নিবার অথবা অধিকার দিয়ে ডাঃ সেন ক্রম নিজস্ব হলেন।

ভারী বজার লোক ছিলেন এই ডাঃ সেন। তাঁর হাসি মুখের পরিহাসপট্টতা আকর্ষণীয় ছিল। বিজয়ের মতো তিনি বর্ণচোরা হবার চেষ্টা করেন নি কোন দিনই। নলিনীরজনের মতো তিনিও তাঁর আকর্ষণিক ভাষাকে ব্যবহার করতেন অথবা এবং স্ত্রী সমাজেও। কেবল বুঝতে পারতাম না একটা বিশেষ ভাষার উচ্চারণেও তাঁর আকর্ষণিক ছাপ বেগুয়াটা। ইংরাজী 'হ্যাডিনাল' শব্দকে 'এডিনাল' রূপে রূপান্তরিত করতে তিনি অধিকতর ঘোরতর বোধ করতেন। আর 'হ্যাডিনাল' এর চেয়ে 'এডিনাল' এর সাহায্যে পেলেন তিনি খুশী হতেন বেশী। একটা পরদেশী ভাষার উপর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার এমন নির্বাহ হওয়াটা যেন কেমন লাগতো।

আর একজন লেখকের আবির্ভাব হয়েছিল কিছু দিনের মধ্যে আমাদের শুভানে। তাঁর আবির্ভাবটা যেমন আকর্ষণিক, তিরোভাবটা তেমনই সক্রম।

সম্পাদকীয় পুঁটার অন্ততঃ কলম তিনেক গুতোতে হতো একটা বিশেষ প্রবন্ধ নিয়ে। এই বিশেষ প্রবন্ধ আমাদের সংগ্রহ করে রাখতে হতো। এখনকার মতো লেখককে মন্দিরা বেগুয়ার বেগুয়ার তখনো চানু হরনি স্তম্ভাঃ লেখকের ভরক থেকে থাকিগের অভাব ছিল। এই অভাবটা আমরা পরিপূর্ণ ক'রে নিতাম কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা যেমালুন উদ্ধৃতি দিগাবে দিয়ে কিংবা কোন ইংরাজী প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্তি দিগাবে। বিজয়লাল

মাকে মাকে আবারের সাহায্য করতেন সে কথা আগেই বলেছি; কিন্তু সেটা ছিল তার খেয়াল, সেই খেয়ালের বশেই সে হতে পারতো। মৌলিক এবং সে রকম মৌলিক হওয়াটাই ছিল তার তৌলিক বর্ষ। আবারের সে রকম কোন উজ্জ্বলতা বা অস্বাভাব্য না থাকার বিরক্তি বোধ করেছি। আবারের এ বিপদ থেকে উদ্ধার করার ক্ষেত্রে সম্পাদক গোপাল সাত্তাল আবিষ্কার করেছিলেন এই লেখককে। কীভাবে তিনি এই লেখকের সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন তা আমি না তবে আমাদের সঙ্গে যখন তাঁর সাক্ষাৎ হলো তখন তাঁর ছু' একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়ে গেছে আমাদের কাগজে। সম্পাদক মশার নিজেরই সম্পাদনার ক্ষমতা দ্বারা বহন করেছিলেন। প্রবন্ধের ভাষা এক রকম চলন-সই আর বিশ্বর ঐতিহাসিক—তাও আবার ছাড়া, বেড়ে ছাড়ার বহুর আগেকার ব্যাপার। কাজেই বিশ্ববন্ধ নিয়ে পাণ্ডিত্য দেখাবার অবসর আমাদের ছিল না। লেখকের পক্ষে তাই আমাদের চোখে খুলো দেওয়া সহজ ছিল।

সুদীর্ঘ, রোগা, শাওঁ চোখেরা ছিল এই লেখকের। তাঁর টেরা চোখের সৃষ্টি সম্পাদকের দিকে কিংবা আমাদের মতো যে-কোন এক ব্যক্তির দিকেই পড়েছে বলে মনে হতে পারতো। এমন হয়েছিলো ছু' চার দিন। পরে চুকে বসতো কোন গরু তিনি করলেন একজনকে আর আমরা জবাব দিয়ে বললাম দু'গণ্ড জন পাঁচেক।

লেখকের নামের পিছনে জুড়ে দেওয়া থাকতো একটা মন্ত ডিগ্রী—পি-এইচ-ডি। কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এই মহাব্যূহা উপাধি লাভ করেছিলেন আমি না তবে তাঁর পাণ্ডিত্যের ক্ষেত্রে ভক্তি বশতঃ আমরাও তাঁর নাম ছাপাবার সময় নামের গোড়ায় লাগিয়ে দিতাম ডাঃ। ডাঃ লেখক একত্রে দুই থাকতেন। নামের মোহে বোঝাবিষ্ট লেখককে পেলে আমাদের কাগজের পৃষ্ঠা ভরে যেতো। একেজো লাভটা ছিল উত্তর পক্ষের—উভে উভাত্যায়।

কিন্তু একদিন ডাঃ লেখক হঠাৎ বস পড়ে গেলেন।

তিনি এক প্রবন্ধ পাঠিয়েছিলেন, উদ্ধৃতির বাহুল্য বেখে মূল্যবান প্রবন্ধটি একটু বন দিয়ে পড়া মুক্ত করলাম। লেখকের উদারতা ছিল, তিনি তাঁর প্রবন্ধের মাল মশার ক্ষেত্রে অপর লেখকের কাছে স্বপ্ন বীকার করতে সৃষ্টিত হন নি দেখলাম। কিন্তু বিপদ হলো প্রথম উদ্ধৃতির পরে দ্বিতীয় উদ্ধৃতির এক কোণে বন্ধনীর মধ্যে দেখলাম লেখা আছে Ibid গ্রন্থ, ১১৩ পৃ। Ibid গ্রন্থ! ও হরি!! নীচে চেয়ে দেখি আরো গোটা কয়েক বন্ধনী শোভিত সীমিত।

বুলগাম লেখক একই ইংরাজী গ্রন্থ থেকে তাঁর প্রবন্ধের মাল মশা সংগ্রহ করেছেন তাই Ibid গ্রন্থের এত উল্লেখ।

সম্পাদক গোপাল সাত্তালকে বললাম—ও মশার, আপনি এই Ibid গ্রন্থ আর কতকাল চালাতে বলেন বলুন তো?

—কী রকম?

—এই দেখুন মশার।

বন্ধনী আবদ্ধ Ibid গ্রন্থের নিকে তাঁর সৃষ্টি আকর্ষণ করতেই তিনি হেসে ফেললেন। ডাঃ লেখকের এতখানি অজ্ঞতা তিনি তাবতে পারেন নি। পরঃ এই লেখকের আবিষ্কারক বলে তিনি সন্মিতও বোধ করলেন। ক্লান্ত হয়ে প্রবন্ধটি ছেঁড়া কাগজের ঝাঁপিতে ফেল দিয়ে বললেন—আর নয়, এইবার ইতি দিন।

অন্তঃপুর ইতি যে কি ভাবে দিলাম সেইটাই বলছি এবার। সম্পাদক মশার ক্লান্ত হওয়ার সুবিধা হলো এই যে, আমরা এবার যে ব্যবস্থাই করি না কেন তাতে তাঁর অন্তরের সম্মতি পাওয়া বাবে।

প্রবন্ধটি ছাপা হলো না বেখে কয়েক দিন বাদে লেখক বরং উপস্থিত হলেন তাগিদ দিয়ার মানসে। সম্পাদকের পাশের চেয়ারখানা দখল করে তিনি অশ্রুত কঠে প্রবন্ধটি লম্বা ফলাফল কানতে চাইলেন। সম্পাদক ক্রোধে করলেন না, কোন কঠও বেন তাঁর প্রতিগোচর হয় নি এমনি তাব দেখিয়ে তিনি তাঁর বলম চালাতে

লাগলেন অতি দ্রুতভাবে। অপর সকলের মধ্যেও কারো মুখে কোন কথা নেই—সবাই যেন শশব্যস্ত। এবড় সেখানক স্কলেরই কাজের ভাড়া বেধে তাবলেন এখন কথা বলা ঠিক নয়, তিনি বরং ইংরাজী কাগজের ওখিকটা একটু ঘুরে এলে পরেই তাঁর জিজ্ঞাস্য হইবে বাবে।

কিছু ঘুরে এসে বা তিনি দেখলেন তাতে তাঁর চম্ভ্বির হয়ে পেলো। তিনি যে চেয়ারটিতে আগুন হয়েছিলেন সেটি উঠে রাখা হয়েছে। এদিকে ওখিকে বারকতক হতভয়ের হতো: চাইলেন কিছু কারো কোন দাড়া নেই, মুখে কোন কথা নেই। সম্পাদক বসারও এমন নির্মম।

দু'দিন আগে বীর আশের ছিল, দু'দিন আগে তাঁর এমন লাঞ্ছনা—এটা তিনি কখনও কল্পতে পারেন নি। ক্যান্ ক্যান্ করে আরো বাসিকল্পণে চেয়ে থেকে তিনি নিশ্চয় হলেন। বাবার বেলায় সেদিন তাঁকে কেউ কিছু ডাকে নি।

এমন কক্ষ রাস্তা কখনো চ' একটি ঘটে যেতো। কিন্তু একেজো যেন বড়ই বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছিল। ছোঁকাব বসের কাওই আলোদি। তাদের বড় উল্লাসে প্রকাশ পেরেছিল নিত্যজই হেলেমাহুবি—যাকে বলে প্রসঙ্গতা।

তখনকার দিনে আমাদের এখানে শুভ্র সাহিত্যিক-দের অবাধ আনাগোনা ছিল নিত্যজই একবন্ধুবাধের মতন, একথা আপসেই বলেছি। সেই আনাগোনার মধ্যে মাঝে মাঝে আবিভূত হতেন তখনকার সঙ্গব্যক্ত ন্যট্যকার বঙ্গমহাশয়। তিনি আবিভূত হলেই তাঁর পাশে বেরা যেতো তাঁর বিষয় অচর বন্ধু শিল্পী ও শিল্প সাহিত্যিক শ্রীঅখিল নিয়োগী ওরফে শ্রীঅ। অসম অপরবধারী দুই ব্যক্তির এমন বন্ধুত্ব আমাদের চোখে বিভ্রিত বোধ হতো। বিশাল শাখলী তরুর ছায়ায় যেন স্নেহ আকম্ব বৃকটি। আর সাত ফুট দীর্ঘ বেষ্ট এই বঙ্গমহাশয়ের। বাঙালীর মধ্যে এমন দুই, দুগঠিত বেষ্ট দুই

বিশল, শীবাস্তের গাভীর রাত্তো বানাতো ভালে; কিন্তু সে বেষ্টে ঐ দীর্ঘ আরত চোখের কমনীহতা ফুটতো কিনা লম্বেক। নিউতাবী, বিনরী সদাশাসী এই বঙ্গমহাশয় তাঁর বাসনাভার বন্ধুকে নিয়ে আসতেন হস্তো তাঁর নতুন কোন নাটকের অভিনয়ে আয়ত্তন করতে কিংবা অভিনয়কে আমাদের অস্থূল অথবা প্রতিফুল বনো-তাবের আভাস নিতে। "Made to order" নাটক লিখবার নাকি অসাধারণ শক্তি ছিল তাঁর, একথা শচীনগা বলতেন। -নাট্য নিকেতনের কর্তা প্রবোধ শুই নাকি একবার তাঁকে বহের ভিতর বন্দী করে লগ্নাহবানেকের মধ্যে এক নাটক রচনা করিয়ে নিয়েছিলেন। পূব সঙ্গব সে নাটকখানির নাম 'বনা'।

১৯২২-৩০ সাগে যে দুইজন অগবিখ্যাত নৃত্যাদিল্লীর নৃত্যকলা সেখবার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছিল তাহের নাম বখাত্রের উদয়নতর আর গ্যানা পাভলোভা। একজন প্রাচ্যের আর অপর পাভলোভের প্রতীক।

বখাত্রের কাগজগুলারের সুবিধা ছিল এই যে, তাঁরা এসব ব্যাপারে আমন্ত্রিত হতেন সন্মানীয় অভিযন্ত্রণে। কার্যত তাঁদের কলমের দাখিগ্য বা বিস্তরতার শক্তি ছিল অনেকখানি। কে না চাইতো তাঁদেরকে হাতে রাখতে? বিশেষ করে অর্ধ অনর্ধ নিয়ে বাদের মাথা বানাতো হতো তাঁদের কাছ থেকেই খাতিরের ভাগটা পাওয়া যেতো বেশী মাঝার। উদয়নতরের নৃত্যকলা সেখবার আয়োজন ধারা করেছিলেন তাঁদের বান্ড থেকে আয়ত্তন এসেছিল বখাত্রিতি।

নবে আছে কোন সিনেমা কোম্পানী থেকে আমরা পেরেছিলাম 'সিমন-পাস' অর্থাৎ সর্ব কল্পতে ছিল আশ্বের সমান অধিকার। বারো মাসে তেরো পার্শ্ব হলো ঐ সিনেমা কোম্পানীর প্রদর্শনীতে সর্বের হাজির হবার অবাধ অধিকার আমাদের ছিল।

সাধাসাধি করলেও কোন দিন বাবার প্রযুক্তি হয়নি ঐরবনে একথা নিঃস্বোচে বলেতে পারি। কিন্তু উদয়নতরের বেলায় আয়ত্তন প্রত্যাখ্যান করতে পারিনি।

দেশে বিদেশে তাঁর নৃত্যকলার উচ্চসিত প্রশংসা কাগজে পড়তাম; বনটা তাই প্রথমেই তৈরী হয়েছিল, চাকুস বেখার এলোভন হয়ে উঠেছিল উন্নত।

নিউ এশ্যারার রহমকে বেদিন প্রথম তাঁর নৃত্যাভিনয় দেখি সেদিন যেমী বিবেচনী বর্ণকের সংখ্যা হতেছিল অগণিত। ভিল বারশের স্থান ছিল না কোথাও। অভিনয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সববেত বর্ণকবৃন্দের এমন নিম্নরকর আচরণ আমার জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করিনি। সকলে ছুত, প্রশান্ত; একটি নৃত্যাভিনয়ের পর অবসর কালের মধ্যেও কারো মুখে কোন কথা কোটেনি—চারিদিকে যেন নিম্নরঙ্গ, শুভতা, ব্যাটতে একটা হত পড়লেও তার আওতাধীন কানে আসতো।

অভিনয়ান্তে দেখেছি সেই অগণিত লোকের বহির্গমনে কোন সোরগোল নেই। সবাই যেন ভেলে চলে গেলো এক নিম্নহতার অব্যাহিত ব্যতালোভে।

সার্বক হয়েছিল সেদিনকার ঐ নৃত্যাভিনয় বর্ণন। সেই নৃত্যকলার সৌন্দর্য্য ভুটেছিল অতয়ের উপলব্ধিতে, তাযা তাকে প্রকাশ করতে পারে না; হৃতরাং সমা-লোচনার প্রয়োজন ছিল না সেদিন।

শান্ত জনতার নৈশশয্যা প্রমাণ করে গেলো উত্তর শব্দের পারবশিতা।

কী যেন একটা মোহে আবিষ্ট হয়ে ছিলাম কিছুকাল। এমন উজ্জ্বলের নৃত্যকলা দেখিনি আর কখনো। রঙ্গালয়ে বা এখানে ওখানে যে নৃত্যাভিনয় দেখেছি এর পূর্বে তাতে চট্টল নাতে একটা তরলিত স্বরূপবেগ বা ঐ রকম একটা কিছু হযতো মনকে হোঁদা দিয়েছে স্বপ্নিকের মত্রে; তাকে পৌরুণ্য লাগান করতে পারিনি অতরে। উত্তরশব্দের যে ভাবের তরল ভুলেছিলেন উপভোগ করেছিলেন তার হিম্বোল। তাই বেদিন তাঁর বিতীর্ণবার নৃত্যাভিনয় হলো কিছুদিন পরেই সেদিন ভুটে গেলাম আনন্দে।

কর্ণেরেণন অকিলের উত্তর-পূর্ব কোণে পিক্চার প্যাঙ্গেলে (এবারকার আরোজন এখন বেখানে 'এলিট'

সিনেমা)। এবার আমার সঙ্গী ছিলেন বিজয়ভূষণ। পাশাপাশি বসেছিলেন আমরা দুই বন্ধু। একটু বামেই যিনি আমার বাহিকের আসনটি দখল করলেন তিনি একটি খাটি মেন সাহেব। একটু আড়তটা বোণ করে-ছিলাম, কিন্তু দেখলাম তিনি তাঁর পাশেই আসীন একটি বাঙালী ভ্রমলোকেব সঙ্গে কথা বলতে লাগলেন। এইবার ভালো করে চাইতেই দেখি মেন সাহেব আমারে খ্যাননায়া অধ্যাপক বিনয় সরকারের পত্নী, কথা তিনি বলছিলেন তাঁর দেবরের সঙ্গে। শাড়ীর বহলে গাউন তাঁর পরণে থাকার প্রথমটা তাই খেয়াল হয় নি।

সেদিনকার নৃত্য হুটীতে নতুন আরো কয়েকটা বিবহু সন্নিবেশিত হয়েছিল। মুম্বাই তত্বনী সিন্ধী ছিলেন উত্তরশব্দের নৃত্য-সঙ্গিনী। পুরাতন বিবহের পুনরাভিনয় আমার দেখলাম, সেই একই আনন্দ হিল্লোলে হিল্লোপিত মন তবু ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল নতুনের আবার গ্রহণে।

বলন্ত সমাগমে পুরাতন পৃথিবীর জীর্ণতা কেটে গেছে। চারিদিকে সবুজের সমাহার্য্য মন্ডানিলে হিল্লোলিত; পল্লবিত তরুশাখার শাখীদের কাকলীতে শোনা যায় নব জীবনের বহননা গান; প্রান্তরে কাহারে গুপ্তভায়ে আনন্দ রুকরাজির মুহু সৌরভ ভেলে আসে;—নবোদ্বিগ্ন বোবনের সে সৌরভ। সিন্ধী এবং তাঁর সঙ্গিনী অজ্ঞাত বালাবের নৃত্য-লাভে রূপায়িত হলো এই বলন্ত-সমাগম। নব স্বপ্তির আনন্দ সৌরভে আকুল মন উড়ে চলেছিল কোথায়!

স্বর্গ থেকে মর্তে নেমে এলেন গভা—অনন্ত প্রাণ লক্ষ্যবিস্তীর্ণ গভা। তাঁর দেহধারার নিকিত শ্রাম্য পৃথিবীর মুখে হালি ভুটে উঠলো। ভারপূর কত বুণ বুণাত বরে গেছে; দিক দিকতে আবাহিনী গভার কুলে কুলে ভুটে উঠেছে গাভের সৌন্দর্যের অকুর্ত হল। মুহু নিম্নরে মাহুব তাই গভার তবগান করেছে বুণ বুণ হয়ে মুখনা যোক্ষমা গভা গভৈব পরমা গতিঃ।

মাহুষের অন্তরের উৎসাহিত এই স্মৃতি তরঙ্গাহিত হলো নর্তকী সিম্বীর দেখে। পূজারিনের পূজার্য ভেসে গেলো যেন এক অপরিচিত আনন্দলোকের দিকে। অচল দর্শকরূপ বিষয়ে অবাক হ'য়ে ছিল। হঠাৎ নিতম্বভা ভঙ্গ হলে এক নারীর কণ্ঠস্বর—Oh-h! She is a goddess!

ঠিক এই মুহূর্তে সমস্ত হল ঘরটি কানোকে উড়াসিত হয়ে উঠলো। যে দৃষ্টি ছিল একত্ব শুধু পাত গ্রাসীপের সামনে নৃত্যশীলা নারীর দিকে তা এখন ফিরাতেই দেখি আমার ঠিক পাশের মহিলাটি অর্ধাৎ অধ্যাপক বিনয় সহকারের শরীহ তাঁর আসন পরিভ্রমণ করে দণ্ডায়মান হয়েছেন। তাঁরই কণ্ঠের ধ্বনি এসেছিল আমার কানে—তিনি অম্বাচোলা হয়েছিলেন। সিম্বীর নৃত্যাতিনয় সার্থক হয়েছিল।

যান্য পাতলোভাব নৃত্যাতিনয়ের আবেগজন হয়েছিল ফার্স্ট এম্পারারে। এখানেও দেখেছি বসন্ত স্বপ্নের

বর্ণজটা, দেখেছি হংস-নৃত্য। মুহূর্ত হঠাৎ কিছ্র তুলি পাই নি। গ্রীক ভাষারের সঙ্গে ভারতীয় ভাষারের যে তফাৎ পাতলোভাব নৃত্যকলার সঙ্গে ঐক্যবদ্ধতার নৃত্যকলার ঠিক তেমনি তফাৎ। একটি দেখে সর্বস্ব; অপরটি দেখে বেকোও দেহাতীত। একটি কণিকের মোহে আচ্ছন্ন, অগ্নি, বিহ্বল, চকল; অপরটি পুঙ্খপুঙ্খের ইচ্ছিতে নিবিড় ঘেরে বিহ্বল। একটি আপন পরিবেশের মধ্যে ঘুরে ঘুরে মরে; অপরটি আনে তার পরিবেশের মধ্যে উল্কাশোকেস সংবাদ।

পারের আশ্রয়ের ভগ্নায় দেখের তারার্পণ দেখেছি পাতলোভাব; সার্কাসের কোন ব্যাংকায় বীরের কাছে তার চেয়েও নিপুণতার ভবিষ্যৎ হয়তো দুর্বল নয়। পূর্ণাধারে পূর্ণাধারে পাতলোভা যে মন্তব্য ছুটিয়েছিলেন তাতে বসন্ত এসেছে মনে করতে পেরেছি কিছ্র অনন্তের আভাষ পাই নি। তাঁর ভগ্নিমায় যেন ছিল :—

"অকস্মাৎ পূর্বের বকোনারে চিত্র আ
রক্তধারা!"

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

ছ'লক্ষেরও অধিক টাকার দাবী মিটানো ইইয়াছে

ভারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এজেন্সী ও সংগঠন অফিস আছে

মাস্ত্রাজ অফিস—

৪৩বি, লেকেন্ড লাইন বিট্

সুস্কপ্রেদেশ অফিস—

১৭৪, দুপিগজ এলাহাবাদ

আসাম অফিস—

নগুগা আগাম

ছোটনাগপুর অফিস—

যেন হোড, রাঁচি

চীফ এজেন্ট :—ত্রিবাঙ্গুর.

বিঃএন, ডি, অর্জ

চীফ এজেন্ট :—মালাবার

এন, এ, মহম্মদ

চীফ এজেন্ট :—পূর্বপাঞ্জাব

কুমার এণ্ড কোং, সিমলা

লক্ষ্য করবার মত নয় হরত। কালো, কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েটি; বেশভূষা সাধারণ—হরত তার প্রতি কিছুটা ভাঙ্কিলোর ভাবও আছে। তবু আমি কোত্থলী হয়ে উঠেছিলাম। প্রতিদিন লম্বু পরক্ষেপে এক ক্রোশ পথ হেঁটে বেড়িয়ে আবার ফিরত। একাই আসত। অলঙ্কার অথচ সযত্ন অঙ্গির মধ্যে তার আত্মগম্যের অস্বস্তি দৃঢ়তা বেন জোগে থাকত।

সহরের উপকণ্ঠে লম্বুজোপকূলের দীর্ঘ পথ। বাহ্য-কাহী অগণিত নর-নারীর জড় জবে ওঠে সুবোধের এক ঘন্টা পূর্বের। সেই জীবের মধ্যেই মেয়েটির এই আলো। বৈশিষ্ট্যটুকু আমার চোখে ধরা পড়েছিল। সকলের অলঙ্কারে আমি নিজেই হুঁত কোত্থলী হয়ে উঠেছিলাম।

বৈশাখ আলোের একটা উপলক্ষ্যও ঘটে গেল। সেদিন ঘন কুন্ডলীকার লম্বুজোপকূল ঢেকে গিয়েছিল। ছ'ফাট ব্রের বন্ধও দুটিগোচর হয় না; কুন্ডলীকার এমনই দিগন্ত আচ্ছাদন!

বাহ্যিকাবীরের কারো দেখা নাই। এমন দিনে কে আর বের হবে একমাত্র ব্যতিক্রম লোক ছাড়া? লম্বুজোপকূল আমি একাই বের হয়েছিলাম এবং কুন্ডলীকার দিক্‌ক্ৰোধান ভেদ করে হেঁটে চলছিলাম—।

কর্তব্যে যেরটির হুঁতহুঁত হয়ে গেলাম, আর তবুনি কেন আনিনে হেসে বললাম,—এ দেখা আপনায়ও আছে দেখছি।

যেরটি পথকে ঠাড়া। আমার আপাদমস্তক নিরীকণ করে বোধ হয় নিশ্চিত হ'ল। তারপর বলল,—সকাল বেলাটা কেন আমি ঘরে অবস্থ থাকতে পারিনি। তা'ছাড়া বেড়াবার উদ্দেশ্য নিয়েই তো এখানে আসা।

—ভাতো পটেই। তবে ওই বাহ্যিকাবীরের জড় চলা ছুটল। যেন বাহ্যিকাবীর নিহিল বের হয়। আলো কিছু কারো টিকিটা দেখা দেই। হরত গলায় 'বাকলার' অক্ষিরে বের বলে বলে ধুকছে।

মেয়েটি হাসল। বলল,—আনন্দ্যও খুব কিতিনি। Sun riseটা মাঠে মাঝা গেল।

আমি বললাম,—কিছু লম্বুজোপকূলের আর একটা রূপ আলো অস্বস্তি করলাম। এমন তনয়াকৃত না হলে বোধ হয় সে রূপটা অজ্ঞাত থেকে যেত। এত নিকটেই যে মহাগণের তার তলদেশে আলোড়িত ক্ষুদ্র গর্ভনে তার অতল জীবনের গভীরতা বেন আলো প্রথম অস্বস্তি করলাম। মহাগণের দিগন্তবিস্তৃত বিশাল রূপ—তার সুবোধের আশ্রয়ের প্রতিদিনের লক্ষ্যবস্ত; কিন্তু এর গভীর রূপ উপলব্ধির জড় একটা বিশেষ উপলক্ষ্য চাই—।

যেরটি এখার আমার প্রতি তাকাল, হুঁ চোখে তার পশ্চৎ বিশ্বদৃষ্টি—। বোধ হয় প্রথম পরিচয়ের আন্তরিকতার স্টাটিকিটেকট।

পরের দিন আমার উত্তরের লক্ষ্যে। বললতাই অগ্রসর হয়ে এল। হেসে বলল,—এসে গেছেন।

বেলাতুহিতে বাহ্যিকাবীরের অলঙ্কার জড়। আমার হুঁলন পাশাপাশি হেঁটে একটু নিরালা অগ্রগার একটা উঁচু টিপির উপর গিয়ে বসলাম। বললতাই একটু লম্বুজোপকূলের হাশির দেখার আচল টেনে লম্বুজোপকূলের দিগন্তের প্রতি তাকিয়ে বইল।

অপাধ অলঙ্কারের তদ্ব্যবহৃত হুঁত হুঁতীয়! মৌন, হুঁত। প্রথম সুবোধের হুঁত—হুঁত একটি স্বর্ণ গোলক লম্বুজোপকূলের অলঙ্কারে আলোড়ন করে বেন উল্লসিত লাগিয়ে উঠল। অর্কোশ ও মহাগণের বিদ্যন কেন্দ্রে

পূর্ব সিপাহে বুদ্ধি বর্ণকটার বিলিক খেলছে।

কতকণ তম্বর হয়ে ছিলাম জানি না হঠাৎ আমি সচকিত হয়ে উঠলাম। বেলা অনেকটা হয়েছে তো। বেলাভূমির স্বাত্মকায়ীকের জীড় বিহল হয়ে আসছে। আমি বললাম,—চন্দ্র, এবার উঠি। রাস্তার বাসি আবার ভেত্রে উঠবে।

বনলতা বেন একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস চেপে নিয়ে উঠে ইড়াল। বলল,—এ সৌন্দর্যের বৃত্তি ক্রান্তি নেই।

আমি ভাকালাম বনলতার দিকে। ছুঁটা টান। চোখে বিশ্বস্তর আবেশ বেন তখনো লেগে আছে,— নিস্ত্রাতকের পর যেমন তন্ত্রার জড়িমা লেগে থাকে। চোখ ছুঁটা তার জ্বলন্ত,—চটুলতার নর, গভীরতার। অগাধ চলতির নতই রহস্যবন, ইজিতমর—।

পরদিন আমার সাক্ষাৎ সেই সাগর সৈকতে। বনলতা বুদ্ধি হেসে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। বলল,—বোবা হয়ে বুকে বেড়ান সত্যি বিরক্তিকর।

উত্তরে আবার সেই চিলির উপর গিয়ে বললাম। সমুখে সীমাহীন সমুদ্র,—অসীমের মধ্যে রাহুদের এমনি বুদ্ধি একটা আশ্চর্যমর্পণ আছে, তার সমস্ত ভাবনা, চিন্তা সেই অস্বহীন বিশ্বস্ততার ভূবে যায়। রাহুব আশ্চর্যচিটার বলদপী, বিষয়ী—কিছু অস্বহীন গভীরতার সে বিমুদ্র শিত্র—।

তেননি একটা অস্বহুতির মধ্যে আমরা উত্তরে বেন বুক হয়ে ভুবে রইলাম। মৌনতারও কি ভাষা আছে? তাব বিনিবর? পাশাপাশি জ্বলন্ত জী-পুরুষ পাড় একটি বাত্র অস্বহুতি দিয়ে পরস্পরকে ছুঁয়ে থাকার আর কোন ইঙ্গিত নেই? হোক তারা মৌন,—এই মৌনতাই বুদ্ধি অস্বহের প্রকাশ—।

বিদায়ের পূর্ব চকিতে একবার উত্তরের চোখাচোখি হ'ল। বনলতার কালো মুখখানি হঠাৎ আরক্তিম হয়ে ওঠে; সে সলজ্জ দৃষ্টি অবনত করল। অনিকেয় এই লজ্জা জড়িমা দিয়ে নিজেই চাকতে গিয়ে বনলতা বুদ্ধি নিজেই আরো উন্মুক্ত করে তুলল।

অপেক্ষাকৃত ক্রম পরস্পরে সেদিন সে ছুটে পালাল। একটা তত্ত্বৎস্পর্শে বেন আমি সচকিত হয়ে উঠলাম।

চোখে বুখে আমার বিষয়ীর তাব।

পরদিন। আমি ভেবেছিলাম, বনলতা হয়ত সন্ধ্যাে আমার পাশ কাটিয়ে যাবে। আমার দুইটা, আমার বাক্যবাক্তিকে বনলতা হয়তো কখনও করতে পারবে না। বনলতা কুমারী নয়, বন্যতা ব্যক্তির গৃহিণী। বেশ ভ্রমণে স্বামীও সঙ্গে এসেছেন। প্রাতঃভ্রমণে তিনি কোন দিন বের হন না। বহুজের Sun rise দেখা অপেক্ষা ছুঁ বস্তু। বিদ্যানায় গড়িয়ে নেওয়া নাকি অধিক আশ্রয়জন। বনলতা বেসে আমাকে বলছিল। তবে বিকেলে তিনি বের হন। কাঁধে এক রাইকেল তুলে শিকারের সন্ধানে লজ্জ সৈকতে গুরে বেড়ান। অস্বাভাবিক জীরা রাইকেলের লজ্জা, বাবদান সাহুজিক পাখীকেও অস্বাভাবিক সন্ধানে স্তলী ছুঁড়ে ভূশাভিত করেন। বনলতা বলেছিল,—বিজী লাগে।

—কি?

—এই হত্যার ভিতর দিয়ে আনন্দভোগ। বেন আদিম ক্রোড়ানিতি।

বুহু হেসে বনলতাকে সেদিন আমি সন্দর্ভন করেছিলাম। আজ মনে হ'ল, যদি আদিম বুগটাই আমার ফিরে আসে? সলীন উঠিয়ে না হোক, duel fight যদি বনলতার বারী স্তীর জীর মন অপহরণকারীকে challenge করে বলে? বনলতা হয়ত পূর্ব থেকে ভারী সন্ধ্যা গেয়ে সে পূত্র উপতোষ করবে। রাহুব আশেও তেননি বস্ত্র উল্লাসিপালী।

আমি নিজেই রাস্তার ভীড়ের মধ্যে আত্মগোপন করে রইলাম। যদি বনলতার সঙ্গে বৈবাহিক দেখা হয়ে যায়? হয়ত সে তেননি আরক্তিম হয়ে উঠে বুক লুকোবে। আর সে যদি আমার চোখের সমুখেই পাশ কাটিয়ে চলে যায়? আমি বুদ্ধি সত্যি অপরাধী, পূর্বের সেই বিষয়ীর দর্প আজ আর নেই। বনলতাকে আমি ভয় করি,—তার শক্তিত উপেক্ষাকে সর্বোচ্চ করি, তার আরক্তিম সলজ্জ

ভঙ্গিমাতেও আমার লজা হয়। তাই ভীষণ বড় আত্ম-গোপন করে লোকের ভীড়ের সঙ্গে মিশে গেলাম।

—এই যে, প্রাণাধার্য্য!

চমকে উঠে কিয়ে তাকালাম। বললতা পদ্মোত্তে পাড়িয়ে। সেই প্রথম দিনে দেখা অসম্ভব অথচ সংঘত সূত্রতা নিয়ে সে পাড়িয়ে আছে।

আমি বলতম যেহেঁ কি একটা কিছু বলবার পূর্বেই বললতা লজ্জিতভাবে হেসে বলল,—এদিকে আমি আপনাকে খুঁজে বসি। চলুন, Sunriseএর আর দেবী নেই।

লোকের ভীড় ঠেলে পাশাপাশি ছুঁজনে এগিয়ে চললাম সেই টিপির দিকে।

আবার সেই স্তম্ভতা। কতকণ তত্ত্ব হরে ছিলাম জানিনে। বিশাল জনবির বিমোহিত ঐশ্বর্য্যও বোধ হয় এই নীরবতার নয়তাকে ঢেকে রাখতে পারে না। কেমন যেন অবস্থি বোধ হ'ল, একটা সামাজিক অসমঙ্গল পরিবেশ যেন আমার চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠল। আমি আরো সঙ্কুচিত হয়ে উঠলাম।

—একটা অসুতোষ করব?

আমি চমকে উঠলাম। —কি?

—আপনার একটা কবিতা শোনাতে হবে।

—তবু ভাল, গান শোনাতে বললেন নি।

আমি হাসলাম।

বললতাও হাসল।

আমি আবার বললাম,—চোখের সামনেই তো দিগন্তব্যাপী মহাকাব্য—অনন্ত জনবির—।

বললতা বাধা নেড়ে বলল,—না-না, পাশ কেটে গেলে হবে না।

আমি হেসে বললাম,—কবিরের গাথা কথাতলোও ততো এক রকম ঠাঁকি।

—সে আমি বুঝব। কবিতা ঠাঁকি নয়, ঠাঁকি এই বোঝা অসুস্থতির বিরাট সূত্রতা। মনটাকে শুধু অগাহ্য করে তোলে।

যেহেঁটা বলে কি? প্রকৃতির বিরাট ঐশ্বর্য্য কেড়ে আমার অন্তরালকে আশ্রয় পেতে চায়! আমি কবি, বললতা তা জানে। আমি যে কবি ছাড়া আরো কিছু—স্রী পরিবার নিয়ে সাধারণ কাননা ভাবনার একজন মহিমণ্ড, বললতা তা কেনেও জানিতে চায় না। আমার কবি মানস উন্মাদন করতে চায় সে? কিন্তু তার উদ্ভাণ? বললতা অসী পিকারীর গৃহিণী বললতার অসুস্থ খেয়াল নয়ত?

সেদিন তাকে কবিতা আত্মিক করে তুলিয়েছিলাম। স্মরণিত কবিতা। যেদিন প্রথম এই সাগরতীরে এসে ঐশ্বর্য্য দেখে গিয়ে যে কবিতাটা আমার মানস-পটে অঙ্কিত হয়েছিল সেইটী। সেদিন মহাশাগরে তরঙ্গাঘাত ছিল না, ছিল না স্ক্রু উজ্জ্বল,—প্রশান্ত অলসারির নিবিড় মৌলতার স্ক্রু হয়ে গিয়েছিলাম আমি। তারপর আরো দিন গেছে, গুনেছি সাগরের স্ক্রু উজ্জ্বল। কড়ও বুঝি যবে গেছে নিখের মনে; সেই বিমুগ্ধ মনের চাকল্য নিয়ে গেছেছি কবিতা। বললতাকে কুনায়েরছি একটির পর একটি—দিনের পর দিন।

কবিতা—কবিতা! দেশা লেগে গেছে বুঝি মনে। দিনের পর দিন উন্মাদন করে চলছি নিঃশব্দে। বললতাকেও যেন আবিষ্কার করেছি,—অসী পিকারীর গৃহিণী নয় সে, কলকাতার ঐশ্বর্য্যাদিনীও নয়—বললতা স্মৃতাভা। সে স্মৃতা জোড়গতির বিপুল ঐশ্বর্য্যে বুটবে না মিটেবে না অসী পিকারীর অমার্ধ্য লক্ষ্য লঙ্ঘনে—।

দীর্ঘাণী প্রানলী মেরেটী। প্রথম দিনের পরিচয়ের সেই সংঘত স্বস্তি আর নেই, বললতা কাণের সোহাগে বুঝি জব হয়ে গেছে। লতাঝুঁঁর গুচ্ছ গুচ্ছ মূল ফুটে উঠেছে আমার কবি মানসে। সন্মুখের সেই মহাশাগরের ঐশ্বর্য্য বুছে গেছে, বাতাসত স্ক্রু উজ্জ্বলে দোলা কাগে না—। বললতা আরো কাছে—আরো—।

তারপর একদিন কুনায়েরছিলাম সেই চিরন্তন কাব্য। ভাবোজল কণ্ঠে বলেছিলাম,—লতা ঘেণী! পৃথক ও প্রকৃতির এটাই চিরন্তন রূপ,—নর-নারীর অনন্তকালের বিশদকাব্য—।

বনলতা নিরুত্তর। অধর তার আবেগে একবার কেঁপে উঠল, হুঁ চোখ কাপলা হয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুও গড়িরে পড়ল। আমি বাধা দিলাম না। কাঁদুক বনলতা। পুঞ্জীভূত রুদ্ধ বেদনা চোখের জলে দ্রব হয়ে গিরে নিজেকে সে উপলব্ধি করুক...

পরদিন। নব অলঙ্কারে কবিতার ডালি সাজিয়ে আমি এলাম। বনলতাকে উপহার দেব—প্রকৃতির নিকট পুন্সবের প্রথম নিবেদন।

কিন্তু বনলতা কৈ? ভর ভর করে বুকেও বনলতাকে পেলাম না। বনলতা আসে নি। কবিতার খাতাখানি হাতে নিয়ে সগর সৈকতে খুঁজে খেঁড়াই কেপার নত। বনলতার সন্ধান নেই—একদিন, দু' দিন,—অনেক দিন।

হঠত বনলতা অসুস্থ হয়ে থাকবে। আপন মনের সন্কেই সজি স্থাপন করে থরে কিরি।

গৃহিণী বললেন,—একজন লোক এসে একটা চিঠি দিয়ে গেছে।

—কৈ চিঠি, দেখি?

ঝামের চিঠি। খুলে দেখি, বনলতা লিখেছে। সে লিখেছে, তারা কালই চলে যাচ্ছে। সত্ত্বভঃ কলকাতার। তার একান্ত অসুস্থরোধ আজ যেন সন্ধ্যার গিরে একবার দেখা করি। রাজির আহারটাও সেখানেই হবে। ‘পুনক’ দিয়ে আবার লিখেছে, ‘আমার স্বামীর সনির্বন্ধ অসুস্থরোধও এর সাথেই রইল।’

ভঙ্জিত হয়ে গেলাম। বনলতা চলে যাচ্ছে? কলকাতার? সেই ইট গাঁথুণীর হৈম কারাবাসে? বনলতা নয়, তার নিঃসাড় দেহটাকে খোঁজ হয় আর কেউ টেনে নিরে যাচ্ছে কলকাতার ভাঙের ঐশ্বেরে গজবের। ...বেচারী বনলতা!

সন্ধ্যার গিরে উপস্থিত হ'লাম। বনলতার স্বামী সকলরবে অগ্রগর হয়ে এসে অত্যাধীনা আনালেন। অক্লান্ত রায়। স্যাণ্ড লর্ড এণ্ড ব্যাটার। কিন্তু তার

চোরেও বড় পরিচয়, তিনি জঙ্গী শিকারী। বেহের গঠনেষ সে পরিচয় অস্পষ্ট। দীর্ঘাকৃতি মূগুৎ দেহ, দৌর বর্ণ, প্রশস্ত লগাট, দুট মুষ্টি,—ভবে হাসি খুলিতে উজ্জল।

মিঃ রায় বললেন,—আপনার কথা লভার মুখে শুনেছি। আপনি কবি বাস্তব,—কত বড় শুষ্ক ব্যক্তি! সাক্ষাৎ পরিচয় পেরে সুখী হ'লাম।

একবার অলঙ্কে ঘরখানির চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলাম। অসম্মিত পরিচ্ছন্ন ড্রিং রুম। কিন্তু বনলতা কৈ? সে কি কার্ঘ্যসরে এতই ব্যস্ত? অথবা যেচ্ছাক্ত আঙ্গোপান?

আমি একটা আসন টেনে নিরে বসে বললাম,—কালই চলে যাচ্ছেন নাকি?

মিঃ রায় হেসে বললেন,—আমি তো ঘিঘি ছিলুম এখানে। রাইফেলের খোতাকণ্ডে প্রচুর মিলছিল। কিন্তু লতা কেন্ ধরেছে, এখানে আর এক মুহূর্ত নয়। সত্যি, বেচারী ক'দিন বাবৎ যেন আধমরা হয়ে রয়েছে। বার জন্ত এখানে আসা, তার বাস্তাই যদি না টিকলো—কি বলেন?

—তা বটেই। আমি হেসে বললাম কথাটা। সেই সঙ্গে একটা দম্কা কটিকা বেগণ্ড যেন সামলে নিলাম। বনলতা জেদ্ ধরেছে? এখানে এক মুহূর্তও নয়? কলকাতার হৈম কারাবাসে সত্যি আকর্ষণ আছে তার? সম্রাট সমাধের ঐশ্বেরে অভিযান?

...মিঃ রায় এক মনে বলে চলেছেন তাঁর দুর্ধর্ষ শিকারী জীবনের লোমহর্ষক কাহিনী। কবে কোন্ গহন অরণ্যে নরবারকের কবলে পড়েছিলেন, সুপবছ অরণ্যচারীর সঙ্গে একক সত্তাবগত জানারায়ের প্রকৃতিগত তফাৎ কি, পণ্ড ও পক্ষী শিকারে পার্বেক্য কি—ইত্যাদি শিকার কৌশলের মৌলিক তত্ত্ব। মিঃ রায় সত্যি সরল, সরস্তের একখণ্ড ভাসা মেঘের নতোই স্বচ্ছ। একজন অহতুতীল কবির সুখোমুখি বসে অবলীলাক্রমে বলে চলেছেন তাঁর শিকারী জীবনের জঙ্গী কাহিনী! শিকারের নেপা তাঁর মনের হিংস্রতা

নয়, খেলা। হুহুর্ডে যেন তাঁকে আমি চিনে ফেললাম, তাঁর অন্তরের শেষ পর্দা পর্দিত। এমন স্বস্তি মনে বিরোধের দাগ বুকি কোথাও পড়ে না।

আমি বললাম,—আপনার ত্রী এই hunting সম্বন্ধে করেন?

—লতা? মিঃ রায় হো হো করে হেসে উঠলেন।
বাপস! দে গোড়া বৈক্যক্কেও হার মানায়। ওসব ফিলজকি বুঝিনে মশাই। আমি বুকি Hunting is a romantic game। কি বলেন?

আমি লজ্জিতকণ্ঠে বাক্য নাড়লাম। এবং সঙ্গে সঙ্গেই অজুতব কলমায় যে বনলতা একটি শিশুমন নিয়ে এতকাল খেলা করেছে। এ তরুণ রোমাঞ্চে ঢাকল্য আছে, উত্তাপ নেই।

হাতির আহ্বারে বলে প্রথম বনলতার সাক্ষ্য পেলাম। সর্বাঙ্গ স্বামী শাক্তি, গমনা ও শ্রমাবনে ঢেকে লহাজে সে আমাকে অন্তর্ধান জানাল। আমি বিম্বিত হয়ে গেলাম। বাহি আড়খরে ঢেকে বনলতাকি নিজেই কুকোড়ে চার? লতাকুঞ্জের পুশিত তরুণ তো আমার অপরিচিত নয়, তার সৌরভটুকুর আশ্রয় পর্বত আমি পেরেছি, তবু—

কেন জানিনে আহ্বারে আমার কটি ছিল না। বনলতা তবু খুটিয়ে খুটিয়ে পাওয়ারে লাগল।

—ওকি! কিছুই খাচ্ছেন না যে। না-না, সে হবে না, ওই মাংসটুকু খেতে হবে। নিজের হাতে ওজুসো বেঁধেছি, আমকের huntingএ ছুটো বুনো হাঁস মেরে আনা হবেছিল।

মিঃ রায় হেসে উঠে বললেন,—লতা আজ নিজে জ্যতি দিয়েছে, আবার সবার জ্যতি স্বাভাবিক বড়বয়সে

করছে। বৈক্যব জ্যতি বলে মাংস স্বাভাবিক বয়স হয়।

বৈক্যবের কথা জানিনে, কিন্তু বনলতাকে তো চিনি। হিংস্র হত্যার জ্যতি তার চির বিবেক, তবু আজ সে শিকার করা পাখী ছুঁতী স্বস্তিতে কেটে রহন করেছে। তবু তাই নয়, সমাধারে নিমন্ত্রণ করে আহারই সমুদ্রে হাড়িরে সে মাংস স্বাভাবিক জন্তু পীড়্যপীড়িত করেছে। মাংসাহারে আমার অন্তর্ধান নেই, তবু আহ্বারে বলে বনলতার আগ্রহাতিশয্যে আহ্বারবস্ত্রগুলি যেন গোয়ালে গিলে খেলাম। বনলতা তৃষ্ণি পান। বলে হ'ল এ বনলতা সেই স্বর্ণশর্পা বিদ্রা নয়, সে আজ স্বর্ণশর্পা নারী এতটা নির্মম হতে পারে? ছ' চোখ তুলে একবার তার দিকে তাকাত্তেও কেন আমি লক্ষ্যেও বোধ হ'ল।

আহারের পর বিদায় নিলাম। মিঃ রায় করবর্ধন করে পরম আন্তরিকতার বিদায় লব্ধনা জানালেন। বাইরে এলে কিরে না তাকিয়েও অজুতব করলাম যে কোন কোতুহলী চোখ সে বাড়ীর বাতায়ন পার্শ্বে হুহুর্ডের অন্তঃপীড়িরে লক্ষ্য হয়ে ওঠে নি। যে চাঁদ আকাশে উঠেছিল, নদী বকে তার জ্যতিবিধ দেখবার পূর্বেই যেবে আচ্ছাদিত হয়ে গেছে। অথবা এটা বুকি আমারই অন্তরের ছায়াবাজীর মিলে কাহিনী।

আমি আগুন মনেই একবার বলে উঠলাম,—বাক্, বনলতা সুখে থাক। অলী স্বামীর ঐশ্বর্যে আর বনলতাকে সে গরবিনী হয়ে উঠক। বহুস্তের অন্তর্যে সে উজল হয়ে থাক।

তারপর একান্ত অনাবস্তক ভাবেই অতিষ্ঠত পদক্ষেপে অগ্রসর হলো সাবনের পথে। তবু মনে হোলো আমকের এ পর্বতার যেন শেষ নেই, পরিমাণ নেই। না—সত্যি নেই।





পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনা

পরিকল্পনা পরিষদ ছ' বছর পরিশ্রমের পর তাদের পরিকল্পনার রিপোর্ট শেখ করেছে। যে পাঁচ বছরের অল্প এই পরিকল্পনা করা হয়েছে তার প্রায় ছই বছর অতীত হয়ে গেছে এবং এই ছ' বছরে যে সব উন্নয়ন কার্য সরকারের তরফ থেকে করা হয়েছে, তাও এই পরিকল্পনার ভিতর বসে হয়েছে। সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে এত বড় বিরাট বিষয়ের আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবু আমরা মোটামুটি একটা আভাস দেওয়ার চেষ্টা এখানে করবো। প্রথমে বলে নেওয়া উচিত যে পরিকল্পনামূলক অর্থনীতি বা আর্থিক ব্যবস্থা সোভিয়েট রাষ্ট্রের আনুমানিক ১৯২৭-২৮ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্র পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং তার পর থেকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর একটা করে পরিকল্পনা সে রাষ্ট্রে গৃহীত ও কার্যে পরিণত করা হচ্ছে। সোভিয়েট পরিকল্পনার সাথে আমাদের পরিকল্পনার তুলনা করতে গেলে প্রথমেই উক্ত রাষ্ট্রের প্রকৃতিগত পার্থক্যের কথা বলতে হয়। সোভিয়েট রাষ্ট্রে কমিউনিস্ট দল ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দল নেই এবং কোন বিরোধী দল বা মত সেখানে বরণ্যে করা হয় না। তার ফলে রাষ্ট্র যে কর্মসূচি গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে কোন মত সেখানে প্রকাশ পায় না এবং জনগণের সামনে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন কথা উপস্থিত হয় না। তাই রাষ্ট্র যে কার্যক্রমই গ্রহণ করুক না কেন, দেশের সমস্ত জনসাধারণ তা মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু ভারতীয় রাষ্ট্রে বিভিন্ন মতবাদ প্রচারিত হতে কোন বাধা নেই এবং রাষ্ট্রের অস্থূলত

কার্যক্রমের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্থেজিত ও উৎসাহিত করা সুদীর্ঘ সময় হায়েমশাই দেখে থাকি। কাজেই এখানে পরিকল্পনা অস্থায়ী কাজ করার পক্ষে অস্বাভাবিক বাধা অনেক বেশী হবে এবং গতিও বদলাতে পারে।

সোভিয়েট পরিকল্পনা ও আমাদের পরিকল্পনার মধ্যে দ্বিতীয় পার্থক্য হলো তার বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ। রাশিয়ার পার্শ্বের (সম্রাট) আশলের অবিকৃত বিরাট ভূখণ্ড সবই সোভিয়েট রাষ্ট্রের অন্তর্গত আছে এবং তার অনেক অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদ এত দিন পর্যন্ত অস্বাভাবিক হয়ে গেছে। সোভিয়েট পরিকল্পনার সময় তাইহারা ঐ সব প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাতে পেরেছে। লোক সংখ্যার অল্পশাতে যে ভূখণ্ড ও প্রাকৃতিক সম্পদ ভারত পেয়েছিল, তার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের কোন তুলনাই হয় না। আমাদের বেশ বিস্তৃত ও অত্যন্ত বন-বসতিপূর্ণ। অস্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক সম্পদ (unexploited natural resources) তেমন বিশেষ কিছু নেই। এই দুইটি কথা মনে রেখে আমাদের পঞ্চাব্দিকী পরিকল্পনার বিবরণ আলোচনা করতে হয়।

সমস্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাকে ছ' ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম ভাগ হ'ল সরকারী বা সাধারণ ক্ষেত্র, দ্বিতীয় ভাগ হ'ল ব্যক্তিগত মূল্যবানস্বত্ব ক্ষেত্র। দেশের বিভিন্ন ইলাষ্ট্রী সাধারণতঃ দ্বিতীয় ক্ষেত্রের অন্তর্গত। অর্থাৎ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ও উত্তমের উপর ঐ ক্ষেত্রে মোটামুটি যেতে দেওয়া হয়েছে—বলিও সরকারী কর্তৃক ও নিয়ন্ত্রণ তার উপরও থাকবে। এই ক্ষেত্রের অল্প মনত্ব একটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে। তার মধ্যে ইলাষ্ট্রী

থেকে ৪০০ কোটি পাণ্ডার আশা করা যায়। সরকার থেকে এই ক্ষেত্রে ৭৪ কোটি টাকা নিয়োগ করা হবে এবং বিদেশ থেকে ১০০ কোটি পাণ্ডার হিসাব করা হয়েছে। এই একশত কোটির মধ্যে কতক পাণ্ডা যাবে আন্তর্জাতিক ব্যাংক হতে; কতক বৈদেশিক ঋণপত্রিদের তহবিল থেকে আসবে। এখানে বিভিন্ন ইণ্ডাস্ট্রিতে বৈদেশিক ঋণপত্রিগণ কিছু কিছু অর্থ নিয়োগ করছে এবং তথ্যসমূহও করবে। এই ইণ্ডাস্ট্রির ক্ষেত্রটিকে বোটাটুট ব্যক্তিগত এজেন্টার মধ্যে ছেড়ে দেওয়া আমরা সম্পূর্ণ সমর্থন করি না। এই সব ইণ্ডাস্ট্রিকে জাতীয়করণের (nationalisation) এজেন্টা করা উচিত। বর্তমানে আমাদের আর্থিক সংস্থান বা আছে তাতে এই সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিকে সরকারী আয়ত্রে আনা বা জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করা হয়ত খুব সহজ নয়। তাই এই সমস্ত ইণ্ডাস্ট্রিকে ব্যক্তিগত অধিকার থেকে জাতীয় অধিকারে আনা আশাই সম্পূর্ণ সম্ভব হবে না। কিন্তু যে সিল্কন ও পরিচালন ক্ষমতা সরকারের হাতে আছে, তাকে আরো কার্যকরী করা উচিত, যাতে কেউ অতিরিক্ত হানাকা অর্জনের সুযোগ না পায়।

সাধারণ বা জাতীয় ক্ষেত্রে বোট ব্যয়ের হিসাব করা হয়েছে ২০৬২ কোটি টাকা। এর মধ্যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক বিভিন্ন সরকারের তহবিল থেকে ১২৪৮ কোটি টাকা পাওয়া যাবে। বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়েছে ১৪৬ কোটি টাকা; আর বিলাতে আমাদের ২২০ কোটি টাকা ঋণ আছে, যাকে বলা হয় টোলিং তহবিল। ২২০ কোটি টাকা অতিরিক্ত বোট ছেপে খরচ করার বরাদ্দ করা হয়েছে; একে বলা যায় বাটটিং হিসাব (deficit financing)। এর পরও ৩৬৫ কোটি টাকা বাকি থাকে। আরও কিছু বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অতিরিক্ত কিছু ঋণও হয়ত সরকার মতো তোলা যেতে পারে। এই সব পছন্দ ঐ ৩৬৫ কোটি টাকা পূরণ করার কথা হয়েছে।

অর্থের যে সব হিসাব করা হয়েছে, তা যে পুরোপুরি

পালিত হতে পারবে, সে বিষয়ে আমাদের কিছু সন্দেহ আছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার ৪০২ কোটি টাকা এই পরিকল্পনার অঙ্গ খরচ করবে বলে ঘর। হয়েছে। রেল থেকে ১৭০ কোটি টাকা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হয়েছে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকার এত টাকা দিতে পারবে বলে আমরা আশা করি না। রেলের হিসাবে যা করা হয়েছে তাও পাওয়া যাবে বলে, আমাদের মনে হয় না। এমনি আরও দু' একটা হিসাবে আমাদের সন্দেহের কারণ আছে। বোটের উপর আমাদের মনে হয় টাকার যে হিসাব করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ সার্থক হবে না। কিন্তু আমরা একথা বলতে চাই না যে টাকার অভাবে এই পরিকল্পনা বাধা হবে। আমাদের দেশে সমস্ত জাতির বাৎসরিক আয় হলো ২০০০ কোটি টাকা। তার থেকে রাজ্য শতকরা ৫ টাকা ছাড়া আর সবই আমরা খরচ করে ফেলি। অর্থাৎ ১০০০ কোটি টাকার মধ্যে রাজ্য ৪৫০ কোটি টাকা নতুন করে উৎপাদনের কাজে লাগানো হয়। এই পরিকল্পনার হিসাব করা হয়েছে যে ৫ বছর পরে জাতীয় আয়ের পরিমাণ বেড়ে দশ হাজার কোটি টাকা হবে এবং বর্তমান হিসাব অনুযায়ী ৫ শত কোটি ভিন্ন আর সমস্ত টাকা আমরা খরচ করবো। এটা হলো স্বাভাবিক অবস্থা। বা আমাদের সমাজে এখনো চলছে। কিন্তু জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাকে সার্থক করার অঙ্গ জাতিতে কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হবেই। আমাদের দেশে ব্যক্তিগত বা প্রত্যেক যে ট্যাক্স (direct taxation) আদায় করা হয় তার পরিমাণ খুব সামান্য। পুরো ট্যাক্স যা করের পরিমাণও খুব বেশী নয়। জাতির আয়ের শতকরা সাত টাকারও কিছু কম বোটের উপর ট্যাক্স যা কর হিসাবে তোলা হয়। অর্থাৎ ৩২৫ কোটি টাকা। অত্যাধিক বেশে জাতির আয়ের শতকরা ২৫০০ তাগ কর রূপে সংগ্রহ করা হয়। কখনোই জাতির পরিকল্পনাকে সার্থক করার অঙ্গ সরকার যদি নতুন কর তুলতে চায়, তার পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ আছে।

বৈদেশিক সাহায্য। সমাজে অনেক আপত্তি তুলছে। কিন্তু আকাকার দুনিয়াতে বৈদেশিক সাহায্য বন্ধ করে কোন দেশই তার উন্নয়ন পরিকল্পনা কার্যকরী করতে পারে না। আপত্তি যারা তুলছে তাদের মনের প্রাধান্য কথা হলো আনৈতিক ও অস্বাভাবিক দেশ থেকে সাহায্য নেওয়া তারা সমর্থন করে না। হরত ক'শিয়া লেকে সাহায্য গ্রহণ করলে তারা আপত্তি করতে না। এর সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ক খুবই সাধারণ। আমরা মোটের উপর মনে করি এমনি সাহায্য কোন না কোন দেশ থেকে গ্রহণ করতেই হবে এবং সেই অবস্থার সর্বাত্মক (totalitarian) রাষ্ট্র কনীয়া থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়ার চেয়ে গণতান্ত্রিক দেশসমূহ থেকে সাহায্য নেওয়াই বরং নিরাপদ। ভারতবর্ষের ক্ষতি হচ্ছে আমাদের কোন সংশয় নেই। মিউজিলাও, মহড়েরে প্রভৃতির মতো ক্ষুদ্র দেশের কথা বাদ দিলেও, আমেরিকার লুক্সমবুর্গ থেকে আর্থিক সাহায্য নেওয়ারতেও আমরা কোন ভয়ের কারণ দেখি না। প্রথম পরিকল্পনার সময় সোভিয়েট রাশিয়াও এমনি কর্তৃক ও বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই পরিকল্পনা পূরণ করতে হ'লে ২২০ কোটি টাকা ব্যাটতি অর্ধ বোগান (deficit financing) ধরা হয়েছে; হরত আরও কিছু পরিমাণ ব্যাটতি ভবিষ্যতে হতে পারে। তার অর্থ অতিরিক্ত নোট ছেপে অর্থাৎ ব্যাটতি অর্ধ বোগান দ্বারা কাল চালাতে হবে। এতে সাধারণতঃ বুল্যাক্টি (inflation) জনিত বিপদের আশংকা আছে। কিন্তু বুদ্ধ-কালীন ব্যাটতি অর্ধ বোগান যেভাবে হস্তাকৃতির সৃষ্টি করেছিল, একেই ভেদন অবস্থার কোন আশংকা নেই। বুদ্ধের সময় নোট ছাপা হ'য়েছে কিন্তু লোকের ব্যবহারযোগ্য কোন পণ্য বাজারে আসে নি; কেবল বুদ্ধের সন্ধান তৈরী হয়ে বুদ্ধকেই চালান দিয়েছে। লোকের হাতে টাকা অমেরে প্রচুর অর্থ বাজারে কেনবার মতো পণ্যের ছিল অতাব। তাই

কিনিবের দাম হ হ করে বেড়ে যেত। একেই নোট ছেপে যে ব্যাটতি পূরণ করা হবে, তার পরিবর্তে বাজারে পণ্যক্রয় আসবে। কাজেই অর্থের অল্পপাতে পণ্যক্রয়ের অতাব ভেদন হবে না। তা; ছাড়া বর্তমানে বাজার অত্যন্ত মন্দা, অর্থাৎ পণ্যক্রয় কেনবার মতো অর্থ লোকের হাতে পর্যাপ্ত নেই। সেই ক্ষেত্রে নোট ছেপে লোকের হাতে কিছু অর্থ দিয়ে বাজার কিছুটা চালা হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে মন্দা অবস্থা দুই করার অর্থ-ও কিছুটা পরিমাণ নোট বাজারে ছাড়্য হরত বাছনীর।

এই পরিকল্পনার বিশেষ ষোয় দেওয়া হ'য়েছে কুটির উপর—যাতে ভারতবর্ষ বাজ ও কুটিজাত দ্রব্যে লপধ্যাপ্ত হতে পারে। ইত্যাগ্নি সমাজে ততটা ষোয় দেওয়া হয় নি। কুটির উপর বিশেষ দ্রব্য অর্পণ করা আশ্রয় সমর্থন করি। কারণ ব্যক্তি ও সমষ্টির পক্ষে ষাচ্চ সর্বপ্রধান প্রয়োজনীয় দ্রব্য। বাহুরের ও জাতির জীবন ধারণের এই অতি প্রয়োজনীয় দ্রব্য সবচেয়ে আশ্রয় সাধীন ও লপধ্যাপ্ত হতে না পারলে সাম্প্রতিক সাধীনতা অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়ে। বর্তমান দুনিয়াতে প্রত্যেক দেশই বাস্তব্য নিয়ন্ত্রণ করে। পূর্বের মতো লক্ষভাবে খোলা সাজারে বাস্তব্য ক্রয় করা চলে না। ভারতবর্ষ যাতে ব্যাটতি, বিশেষ হতে ষাচ্চ কিনবার সময় অনেক অতিরিক্ত দ্রব্য দিতে হয়। যে দ্রব্যই দাবী কৃতক না কেন লোকের ক্ষমিক্তির লক্ষ এবং দেশের দ্রুতিক প্রতিরোধ করার লক্ষ সে দ্রব্যই ভারত সরকার দিতে বাধ্য হয়; তা ছাড়া বছর বছর কয়েক শত কোটি টাকার বাস্তব্য বিশেষ হতে কিনতে হয়। এই আর্থিক অপর বন্ধকরাও বিশেষ প্রয়োজনীয়।

কুটিজাত ও অস্বাভাবিক দ্রব্য সমাজে আমাদের লপধ্যাপ্ত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে। অধিকাংশ ইত্যাগ্নি নির্জর করে কুটিজাত দ্রব্যের বোগানের উপর। ভারতের একটা শ্রেষ্ঠ ইত্যাগ্নি হলো পাট। বস্ত্র ভারতের অস্বতন প্রধান ইত্যাগ্নি। এই দুইটি ব্যাপারেই ভারত বিতাগের কলে ভারতবর্ষ অন্তের দ্রব্যপেক্ষী হ'য়েছে। কাঁচা

পাটের যোগান নিয়ে ভারতবর্ষকে কিতাবে বিক্রয় হতে হয়েছে, তা সর্বজনবিদিত। তুলার ক্ষয়ও ভারতবর্ষ কম বিক্রয় হয় নি। এই সব কারণে আরও মনে করি যে, কৃষির উপর যে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, তা পূর্নই সঙ্গত। ইউরোপের বহু দেশ কৃষিকে উৎসাহ করে ইত্যাতির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। আজ তারা সে পন্থার ভুল দৃষ্টে পেরে গুরুত্ব আর চেষ্টা করছে।

আমাদের দেশ বিরাট, এতদিনের সক্রিয় অভাব ও দৈন্ত তাও বিরাট। এর উন্নয়ন কার্য বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে কোন পরিকল্পনাই এই লক্ষ্যে হোক তাতেই মন্তভেদ হতে বাধ্য। নির্দোষ ও সর্বাঙ্গ সুলভ কোন পরিকল্পনা বেট করতে পারবে না। যে পদ্ধতিগত পরিকল্পনা দেশের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে, তাকেও আমরা ভুল প্রমাণপূর্ণ বলে দাবী করি নে। যৌবন অঙ্গসম্পাদনের দৃষ্টি নিয়ে দেখলে, এই পরিকল্পনার তিত্তরও বহু দোষ বের করা যাবে। কিন্তু তা করে-ও কোন নির্দোষ ও নিতুল পরিকল্পনা তৈরী করা যাবে না। আজকার প্রয়োজন হলো এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা। পূর্বেই বলেছি, আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধান থাকার ফলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে হস্ত প্রচার কার্য চালাবে। সেটা তাদের রাজনৈতিক দলগত লড়াই করার সাধারণ অঙ্গ প্রয়োজন। কিন্তু অনেকেই এমনি কোন রাজনৈতিক দলের নয়; তেমন জনসাধারণের পক্ষে আজ বিশেষ দায়িত্ব হলো এই পরিকল্পনাকে কার্যে পরিণত করা। সরকার পক্ষেও উচিত জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়ার বিশেষ চেষ্টা করা। আজ পর্যন্ত তেমন কোন চেষ্টা সরকার পক্ষ থেকে আমরা দেখি নি। সরকারী কর্মচারীর উপর সব বিষয় নির্ভর করলে পরিকল্পনা যে পূর্ণ হইতাবে স্থাপিত হবে, এমন আশা করার কোন কারণ নেই। মোটের উপর সরকার এবং জনসাধারণের পারস্পরিক সহযোগিতার উপর এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করছে। আমরা আশা করি উন্নত পক্ষ থেকেই সেই সহযোগিতার চেষ্টা হবে।

পাটের দর:

ভারতবর্ষের রপ্তানী করার দ্রব্যের মধ্যে পাট বরাবরই প্রধান স্থান অধিকার করে ছিল এবং এই দাবীতে ভারতবর্ষের একচেটিয়া অধিকার ছিল। কিন্তু ভারত বিভাগের ফলে তার আর সেই একচেটিয়া অধিকার রইল না। ভারত বিভাগের অব্যবহিত পর মাত্র ১৫ লক্ষ গাট পাট ভারতে উৎপন্ন হত; অথচ ভারতের সরকার হ'ল আর ৫৫ লক্ষ গাট, অর্থাৎ প্রায়-জনের লক্ষ্যে ৩০ লাখেরও কম পাট খণ্ডিত ভারতে উৎপন্ন হ'ত। পাটের অল্প পাকিস্তানের উপর ভারতবর্ষকে নির্ভর করতে হ'ল। পাকিস্তান এই অবস্থার সুযোগ নিতে জটী করে নি। পাট তাদের নিকট কেবলমাত্র পণ্য দ্রব্য রইল না; ভারতবর্ষকে খারিজ করার রাজনৈতিক অস্ত্র হ'য়ে উঠলো। ভারতীয় সরকার ভাড়াভাড়া পাটের উৎপাদন বাড়ানোর চেষ্টা করতে বাধ্য হয়। এবং ভারতীয় কৃষকগণ এই আত্মীয় প্রচেষ্টার সাড়া দিয়েছে। ১৯৪৮-৪৯ সালে ২০ লক্ষ ৬০ হাজার গাট পাট উৎপন্ন হয়। ১৯৪৯-৫০ সালে প্রায় ৩১ লক্ষ গাট উৎপন্ন হয়। ৫০-৫১ সালে প্রায় ৩০ লক্ষ গাট পাট উৎপন্ন। এবং গত বছর প্রায় ৫৭ লক্ষ গাট পাট ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয়েছে। কাঁচা পাটের বিষয়ে আজ আর ভারতবর্ষকে স্বেচ্ছাভাবে পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু কাঁচা পাটের ব্যাপারে ভারতের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তান বিশ্বের বাজারে আছে।

পাটিকল এবং পাট হতে উৎপন্ন দ্রব্যের ব্যাপারেও অনেক প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দেখা দিয়েছে। পূর্বে ভারতবর্ষের বাইরে বিলাতের ডাকিতে কিছু পাটের কম ছিল। সেই ডাকির কলসমূহ বিলাতেই চাহিদা মেটাতে পারত না। পাটিকল দ্রব্যের প্রধান ক্ষেত্র হলো আমেরিকা। হুস্তরাষ্ট্র তার সব চাহিদাই ভারতবর্ষ হ'তে মিটাতে। কিন্তু ইহা নিং ইউরোপের ফ্রান্স, ইটালী প্রভৃতি দেশে কয়েকটি পাটের কম হয়েছে। সেই সব কারখানার অত্যন্ত উন্নত

দরপের বস্ত্রপাতি বসানো হয়েছে। তাদের উৎপাদন দরচ কম এবং সেই সব কারখানার শ্রমিকগণ ভারতীয় শ্রমিকদের চাইতে অধিক কার্পক্ষম। ঐসব পাট কলে একটি তীত চালাতে ১৫ জন শ্রমিক দরকার। আর আনাদের এখানে একটি তীতের জন্য ৪৫ জন শ্রমিক দরকার হয়। এই সবকিছু ইউরোপীয় কারখানা পাকিস্তান হতে প্রচুর পাট পেতে পারে। পাকিস্তানের পাট ভারতীয় পাট থেকে কিছু ভাল এবং দরও পাকিস্তান তাদের কিছু সুবিধা দেয়। তাই সম্প্রতিকার বরং যে আনেরিকা ইউরোপের ঐ সব কারখানা হতে প্রচুর পাট কিনতে; ভারতবর্ষ থেকে তখন কিনতে না।

কিন্তু পাটজাত দ্রব্যের দলানী ব্যবসা ভারতবর্ষকে বড়ার দাপ্তরেই হবে, সেইজন্য দরকার প্রধানতঃ কাঁচা পাটে সম্প্রদায় হস্তাঃ অর্থাৎ পাটজাত দ্রব্য বিদেশে দলানী করার জন্য ভারতীয় পাটকল সমূহের প্রয়োজন বড়ো দরদায় পাট ভারতবর্ষে উৎপাদন করা। দ্বিতীয় দরকার হলো পাটকল সমূহের জন্য নতুন বস্ত্রপাতি আমদানী করে উৎপাদন দরচ কমানো। গত কয় বছর পাটকলের মালিকগণ প্রচুর লাভ করেছে। খোলা কারবারে ও চোরা কারবারে করকণ্ড কোটি টাকা পক্ষ ছুঁবছরে এয়া লাভ করেছে বলে হিসাব করা হয়। এর কিছু টাকা দরচ করে কারখানার নতুন বস্ত্রপাতি আমদানী করা খুব কঠিন ব্যাপার নয়। হিসাব করা হয়েছে এই জন্য প্রায় ১০০ কোটি টাকার প্রয়োজন হবে। দরকার ও কল-মালিকগণ নিলে এই টাকার ব্যবস্থা দরচ অনারদেসই করতে পারে। কিন্তু উভয়েই এ বিধের উদ্যোগীন। পূর্ব বাংলার নতুন পাট কল বসানো হচ্ছে; ফিনিশাইন ও আপনেন্ট পাটকল বসছে। এয়া সবাই নতুন বস্ত্রপাতি দিতে সক্ষম করবে; তখন ভারতীয় কলসমূহের অবস্থা আরও ব্যাপ্য হবে।

কিন্তু আমরা এখানে মূলত আলোচনা করতে চাই কাঁচা পাট নিয়ে। কাঁচা পাটে বহি আমদা বাটতে অবস্থার থাকি, তাহলে আনাদের পাটের ইত্তালী বিপর

হবে এবং ভারতবর্ষকে পাকিস্তানের উপর নির্ভর করতে হবে। এর যে কেবল একটা সাম্প্রতিক দিক আছে তা নয়;—কোটি কোটি টাকা বেশ থেকে বেত্রিয়ে থাকে,—এই অর্থনৈতিক বিকটতা অবস্থার প্রয়োজন আছে। ভারতীয় কল পাট উৎপাদনে যেতৎপরতার পরিচয় দিয়েছে, তাতে অনারদানে আশা করা যায় যে আমাদী বৎসরেই ৫০ লক্ষ পাটের উপরে ভারতবর্ষে উৎপন্ন হতে পারত। কিন্তু ভারতীয় কলবকে তার জন্য উপযুক্ত মৃদ্য দিতে হবে। পাট উৎপাদন করে যদি তার লোকগণ হয় তাহলে সে পাট উৎপাদন করবে কেন? বর্তমানে বাংলা এক আনাদের বিভিন্ন স্থানে এন অকলে পাটের দর ১৩।১৪ টাকা হ'তে ১৯।২০ টাকার মধ্যে; এবং এই দর কলকের উৎপাদন দরচও পোষায় না। ভারতীয় চটকল মালিকগণ পাকিস্তানে নতুন পাট পাচ্ছে এবং পাকিস্তানী পাট প্রচুর আমদানী করছে; তাই ভারতে উৎপন্ন পাটের চাহিদা এবং দাম কমে গেছে।

১৯৪০-৪১ সালে পাটজাত দ্রব্যের মূল্য আনাবিক দরদর চেয়ে প্রায় তিনগুন বেশী ছিল। তখন পাটকল মালিকগণ অতিরিক্ত মূল্য আর্জন করেছে; কিন্তু কাঁচা পাটের দর দরকার থেকে তখন বেঁচে দিয়েছিল ৩৪. টাকা মন। কয়েকই কলকগণ সেই বাজারে বিশেষ মূল্য আর্জ করতে পারে নি। তারপর কলকদের হাত থেকে এখন পাট দালানদের হাতে চলে গেল, তখন '৪১ সালের মার্চ মাসে কাঁচা পাটের নির্দিষ্ট দর মূল্যে বেত্রা হ'ল।' সেখতে সেখতে কাঁচা পাটের দর ৩৫. টাকা থেকে ১০. টাকার উপরে চলে গেল। এই বাজারে পাটের দালানগণ একদম বা দেউলভ কোটি টাকা মূল্য আর্জ করে নিল। এবছরও পাটের দর মনঃ উপরে এখন কম দাপ্য হচ্ছে। বাংলার কলকদের এমন আর্থিক সক্তি নেই যে, পাট ভাদা দর দাপ্যবে। যে বা মূল্য পাচ্ছে তাতেই তার পাট বিক্রী করতে দাপ্য হচ্ছে। দরচ ছ'মাসের তিতর

পাটের দর কিছুটা বাড়বে এবং তার মূল্যকা পাবে পাটের দালালরা, কৃষকরা নয়। কেন্দ্রীয় জুটকমিটির ৪০-৪১ সালের রিপোর্টে এইসব কথা বীকার করা হয়েছে।

এখানে পাট ব্যবসায়ের সংগঠন লক্ষ্যে কিছু কথা বরকার। ভারতীয় চটকলের ব্যাংক বালিক তারাই আজ প্রধানত এই ব্যবসায়ের এতোকটি বিভাগের অধিনায়ক বা নিয়ন্ত্রা। পাটজাত প্রবোজ রপ্তানী প্রায়-ই এরা বা এদের বৈষয়দ্বারা করে পাকে। পাকিস্থানে সরকারের তত্ব থেকে কাঁচা পাট ক্রয় করার দালালও অনেক সময় এরা-ই বা এদেরই নানোনীত লোক। ভারতবর্ষে বাজা কাঁচা পাটের দালাল (balers) তাদের লক্ষ্যে চটকল দালিকদের অঙ্গানী বোগ আছে। বোটের উপর এতবড় একটা বিরাট ব্যবসায় জল কয়েক নোঙের বুটপত। আমেরিকার বাজারে পাটজাত প্রবোজ দাম এখন খুব অস্বাভাবিকভাবে কম নয়। সেই মরে পাটজাত প্রবোজ বিক্রয় করলে কাঁচা পাটের বোটামুটি ভাল মর বেওয়া সম্ভব; কিন্তু চটকল দালিকগণ ও কাঁচা পাটের দালিকগণ নানা রকম কারসালি করে কাঁচা পাটের দর কয়েক মাস পর্বন্ত হাবিয়ে রাখে। পাট চাষের পূর্বে এইসব দালালরা কৃষকদের দায়ন বা বিভিন্ন সন্তে জপ বের। ৪৮ নং একশত টাকার একশত টাকার উপরে জপ আদায় করে এবং বিভিন্ন কারদার উৎপন্ন পাট অত্যন্ত কম মরে নিয়ে নেয়। কেন্দ্রীয় জুট কমিটির রিপোর্টে এ সবকে বিবাহিত বিবরণ আছে। কেন্দ্রীয় জুট কমিটি একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। সেই কমিটির স্থাপনিত অধুবারী সরকার এখন পর্বন্ত কোন এতিকারের ব্যবস্থা করে নাই—ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। ঐ রিপোর্টে পরিকল্পনা বোকার করা হয়েছে যে এমন বণ দান প্রথা কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত কঠোর অবস্থার সৃষ্টি করে এবং সরকারের অবিলম্বেই কোন সতিকারমূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত। (The above system of loan is causing hardship among the jute growers and the State

Government should take necessary action in the matter.)

বর্তমানে কৃষকগণ পাটের বা দর পাচ্ছে তা তাদের উৎপাদন বরত হতে বন প্রতি ৭৮ টাকা করা। এর প্রতিকারের ক্ষত বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে। কয়েকটি প্রস্তাব আমরা নীচে উল্লেখ করছি।

- ১। পাকিস্থান হতে পাট আমদানী বন্ধ করা।
- ২। কাঁচা পাটের ন্যূনতম মূল্য বাধ্য করে দেওয়া।
- ৩। কিছু কাঁচা পাট রপ্তানী করতে দেওয়া।
- ৪। সরকারের বাৎসরিক প্রয়োজনীয় পাটজাত বস্তা ইত্যাদি এখনই ক্রয় করা—যাতে পাটের বাজারের চাহিদা এখনি বেড়ে যায়।
- ৫। বিভিন্ন পাটকল লব্ধকে নির্দেশ দেওয়া একটি নির্দিষ্ট মূল্যে অবিলম্বে পাট ক্রয় করা এবং ক্রয়ের কলে কোন লোকসান হলে সরকারের তত্ব থেকে ক্ষতি-পূরণের সন্ত দেওয়া।

এর কোন কোন ব্যবস্থা লক্ষ্যে সরকারী মহলে অসম্মত মত আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভবিষ্যতী কার্য করা হচ্ছে না। যদি '৪২ সালের ডিসেম্বর মাসে সরকারের বাৎসরিক প্রয়োজনের পাটজাত প্রবোজ ক্রয় করা হত, তাহলে কাঁচা পাটের দর কিছু বাড়তো। এ সবকে সরকারী নির্দেশও নাকি হয়েছিল। কিন্তু তাও ক্রয় করা হয় নি। বর্তমানে কাঁচা পাটের চাহিদা এখনে নেই। সেই অবস্থায় কাঁচা পাট কিছু বাইরে রপ্তানী করতে কেন দেওয়া হবে না,—তার কোন বুজিসংগত কারণ-আমরা পাই না। একমাত্র কারণ এই হতে পারে যে পাট ব্যবসায়ের ব্যাংক সরকারকে উপদ্রোহ দিয়ে থাকেন, এটা তাদের স্বার্থের হানিকর।

এ বাস্তবিত্ত আরও দুটি ব্যবস্থার কথা উঠেছে,— কাঁচা পাট ক্রয় করা এবং চটকলে সরবরাহ করার ব্যাংক সরকারের হাতে নেওয়া উচিত। এই ক্ষত একটি জুট বোর্ড স্থাপন করা সরকার। পাকিস্থানে এমন জুট

বোর্ডে আছে। আজ পাটের দালালগণ যেভাবে ভরত-
দের লুণ্ঠন করছে সরকারী ফুট বোর্ডে স্থাপিত হলে তা
আর সম্ভব হবে না এবং কৃষকগণ তাদের উৎপাদন
থরচের উপরে উপযুক্ত বুনামা পাবে। দ্বিতীয় প্রস্তাব
হল, পাটজাত ড্রবের উপরে রপ্তানী শুদ্ধ হ্রাস করা।
সাধারণত এই ড্রবের হার ৪০।৫০।৬০ টাকার মধ্যে
থাকে। ৪০ সালে কোরিয়া যুদ্ধের সময় পাটজাত ড্রবের
অত্যধিক চাহিদা হয়, এবং দর-ও বেড়ে যায়। তখন কয়েক
মাসের মধ্যে বাপে বাপে রপ্তানী শুদ্ধ বাড়িয়ে প্রতি টনে
১৫০ টাকা করা হয়েছিল। তা থেকে আবার রপ্তানী
শুদ্ধ কমানো হওয়াতে কিছু বর্ধমানও তা টন প্রতি ২৭৫
টাকা আছে। অর্থাৎ সাধারণত বা থাকে তার অন্তত
৪ গুণ আছে। রপ্তানী শুদ্ধ আরও কমানোর প্রস্তাবও
হয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্তাব লম্বাচ্ছে আনয়্য কোর করে
এখনো কিছু বলতে চাইনা, কিন্তু সরকারী ফুটবোর্ড স্থাপন
করে কাঁচা পাটের ক্রয় ও বিক্রয় সম্পূর্ণ সরকারের হাতে
নেওয়া উচিত। স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পাট লম্বাচ্ছে
সরকারী নীতি খুব বেশী সুরক্ষিত পরিচালক হয় নি।
পাটে যাটতি হওয়ার কলে সরকারের মন একটু ঢোল

ও ভীত ছিল। চটকল মালিকগণ তার পূর্ণ স্বযোগ
নিরেছে। সরকার বরাবরই চটকল মালিকদের পরামর্শ
ও উপবেশনের উপরে নির্ভর করেছে এবং তারা
অত্যন্ত ক্ষুদ্র বার্ষিক হারা প্রদোষিত হয়ে আরম্ভই
লং উপদেশ দেয় নি। '৫১ সালের মার্চ মাস
পার্থ ওয়াকার (Walker) নামক একজন ইংরেজ চটকল
মালিক ছিলেন তারত সরকারের প্রধান উপদেষ্টা।
শরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই তত্ত্বালোকের খ্যাতির
বহু হানি হয়। এখনো পাট ও পাট ব্যবসা লম্বাচ্ছে
সরকার বাবের হারা চালিত হয়, তারা কতখানি লং
পরামর্শ দিচ্ছে তাতে-ও যথেষ্ট সংস্কারের প্রকাশ আছে।
তাদের মধ্যে অনেক পাকিস্তানে কাঁচা পাটের ব্যবসাতে
লিপ্ত, এবং পাকিস্তানের পাট যাতে অবাধে ভারতকে
আসতে পারে, সেটা তাদের বার্ষিক অগ্রহণ। এই সব
বিভিন্ন কারণের যোগাযোগে পাট চাহিদা তাদের প্রবের
ও থরচের উপযোগী পাটের মূল্য পাচ্ছে না। এর ফল
অত্যন্ত কতিজনক হবে। অর্থাৎ, আগামী বৎসরে
পাটের উৎপাদন খুব কম হবে। এবং ভারতবর্ষকে
পাকিস্তানের উপরে পাটের অল্প নির্ভর করতে হবে।

‘শারদীয় সাহিত্যে গল্প ও ছোট গল্প’

মন্দিরার কান্টিক সংখ্যার ‘শারদীয় সাহিত্যের গল্প ও ছোট গল্প’ নামে যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল
সে লম্বাচ্ছে আমাদের কোন কোন পাঠক ও লেখক আপত্তি জানিয়েছেন। প্রবন্ধটিতে এবারকার বিভিন্ন কাগজের
শারদীয় সংখ্যার প্রকাশিত অধিকাংশ গল্পের প্রতিভুল সমালোচনা বেরিয়েছে। বঙ্গ বাহাদুর প্রবন্ধটিতে যে
আলোচনা সমালোচনা করা হয়েছে তা ঐ প্রবন্ধের লেখক শ্রীসঙ্কোষকুমার গঙ্গোপাধ্যায়েরই ব্যক্তিগত কতিমত,
তার সঙ্গে মন্দিরার সম্পাদকীয় বিভাগের কোন সম্পর্ক নাই। শুধু মৌখিকভাবে কিংবা ব্যক্তিগত চিঠিগে
আপত্তি না পাঠিয়ে কেউ যদি ঐ প্রবন্ধের প্রতিবাদে লম্বা প্রবন্ধ পাঠাতেন তা অবশ্যই আনয়্য প্রকাশ কর্তব্য।
ঐক্লপ কোন প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ এখনও গেলে আনয়্য তা প্রকাশ করতে লম্বাচ্ছি। নঃ নঃ

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২নং আগার সাকুলার রোড হইতে শ্রীঅরবিন্দ ক্রমবর্তী কর্তৃক মুদ্রিত
এক ‘মন্দিরা’ কাৰ্যালয় ৩২নং আগার সাকুলার রোড, কলিকাতা হইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—অনুমোদিত চক্রবর্তী—

ছেলেদেরের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৥০

ডাক্তারের দ্বিধিজয় ২৥০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

১। জীবনের বসন্ত ২৫০

ভাষার, কল্পনা ও সৌন্দর্য-সৃষ্টিতে উচ্চাঙ্গ গল্প
সাহিত্যের আগের স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

২। রূপকথা ২১

বাবিলোনিয় উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত
কয়েকটি সরল গল্প। কল্পনার অভিনবচে ও
মৌলিকভাবে প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো
টাইপে চাপা এই হৃদয় বইখানি আনন্দোৎসবে
প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি অদ্বন্দ্ব
উপহার। স্ত্রীসমাজে এই পুস্তকের সমাদর
অবশ্যজারী—বহুমতী।

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৫০

গল্প হিসাবে সব কথটাই উৎকর্ষতা দাবী করতে
পারে।

—ববাজ

—ভার্যাপদ রাহা—

রাশিয়ার মেরা গল্প ৩১

জন্ম কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক ব্যাপ্তিসম্পন্ন
রাস্ট্রিক পণ্যেরের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে
প্রকাশ করিয়া লেখক একটি দ্বারী অভাব পূরণ
করিলেন।

—আনন্দবাজার

আমাদের নূতন বই :

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কালে ইউরোপে নেতাজীর
কাণ্ডাবলীর প্রথম লোহাণা ইতিহাস। সভ্য
যুগের উপভোগের চেয়েও উপভোগ্য করে লেখক
বলেছেন এই বইটিতে।

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও

মানসদায়িক সমস্যা ১৥০

অমৃতত্বাভার, আনন্দবাজার প্রতীতি পত্রিকার উচ্চ
প্রশংসিত।

বিশাল বাঙ্গলা ১১

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বহুদিন বাদে হুগিরে যাওয়া একখানি দৃষ্টান্ত বই
আবার পাওয়া যাচ্ছে।

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—

(তিন খণ্ড একত্রে বাঁধাই)

মূল্য—১০/-

—অগেন রত্ন—

মাত্রাজ্যবাদ ও

উপনিবেশিক নীতি ২১

সম্মানসী বিদ্রোহ ২১

—নরেন রায়—

বাঙালার কুলে যাওয়া হুগির এক অসিদ্ধ কাহিনী
পাঠের এই উপভোগ্যটিতে। বহুদিনের বহু
আনন্দময়ের সম্মান সৈন্তদের সত্যকার ইতিহাস।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২৥০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

[পোস্তন দ্বিতীয় সংস্করণ]

হাযানন্দ চট্টোপাধ্যায় বংশধরের স্মৃতিস্মরণ।
সৃষ্টির আদি হইতে সভ্যতার উদ্বেগ, বিকাশ ও
পরিণতির প্রাক্কল ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত।
বহু ও ছোটদের জন্য লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য
কথাও অনেক আছে। বিশ্ববন্ধুতে, ভাবার সর-
লভাষা, চমিত ও প্রজ্ঞাপটের পারিগাটো পুস্তকখানি
অসুখ ও বনোজ। বাংলা ভাষার ইহার সমতুল্য
কোন পুস্তক নাই।

মূল্য—২৥০

‘মন্দিরা’র নিয়মাবলী

মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ’তে আরম্ভ ।

২। প্রত্যেক সংখ্যার দাম আট আনা ।
সাপ্তাহিক পত্রাক লাগে ছয় টাকা ; বাৎসরিক তিন
টাকা চার আনা । বৎসরের দুইবার গ্রাহক হওয়া
যায়, বৈশাখে বা কা্তিকে । অত্র কোন সময়ে
গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কা্তিক থেকে বৎসর শুরু
হবে । ত্রিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে আনাবেন ।
পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নম্বর দেবেন । মন্দিরা
প্রত্যেক মাসের শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয় । সময়
মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের ত্রিশোটি সহ
গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করে আমাদের আনাবেন ।

লেখকদের প্রতি—

যথাসম্ভব নতুন বানান ব্যবহার করবেন ।
নকল যেরূপে রচনা পাঠাবেন । ডাকটিকিট না
দেওয়া থাকলে অনমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয় ।
কবিতা ক্ষেত্রে পাঠান হয় না ।

প্রকাশিত গ্রন্থাদির মতামতের ভিত্তি সম্পাদক
দায়ী নহেন । নাম ও ত্রিকানা না দেওয়া থাকলে
কোন গ্রন্থাদি প্রকাশ করা হয় না ।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—
বিজ্ঞাপনের নতুন হার : মাসিক :

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—৫০

অর্ধ পৃষ্ঠা—২৫

সিকি পৃষ্ঠা—১৬

১ পৃষ্ঠা—১০

কত্থার ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার
পত্রিচার্য্য জ্ঞাতব্য ।

আমাদের ঘর নেওয়া সবেও কোন বিজ্ঞাপনের
রুক নষ্ট হ’লে আত্মতা ভজ্ঞত দায়ী নষ্ট । কাজ শেষ
হবার পর যত শব্দর সম্ভব রুক ফেরৎ নেবেন ।

গ্রন্থাদি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
নিম্ন ত্রিকানায় পাঠাবেন ।

ম্যানেজার—‘মন্দিরা’

৩২ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা ।

ফোন :—বি. বি. ২৬৬০

মন্মথ রায়, এম, এ, প্রণীত নবম্মুগেন্ন নাট্যসাহিত্য

কৃষাগ	২১	মজী	১১০
রাত্রির তপস্তা (নৃতন নাটক)	২১	ধনা	১১০
মীরকাশিম	২১	অশোক	২১
চাঁদসদাগর	১১	মহুয়া	১১
কারাগার	২১০	ক্রিবৎস	১১
একাত্তিকা	১১০	সেবাসুর	১১
সাবিত্রী	১১০	মুক্তির ডাক	১০/০
বিদ্যাপর্ণা	১০	কাজল রেখা	১০

শুভ্রকদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্ম,

২০৩১১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রট,

কলিকাতা—৩



—স্মৃতি—

পঞ্চদশ বর্ষ

মাঘ—১৩৫৯

দশম সংখ্যা

কাল-পরিচয়

(সেনগুপ্ত সাহেবের বহুরূপ)

শ্রীশ্যামসোহন চৌধুরী

একতাল পত্রিকার বঁরা যোগ দিলেন তাঁদেরও আগে যোগ হয় আমরা চপলাকৃতিকে হারিয়েছিলাম। চপলাকার যোগে যোগে আইনের পরীক্ষা পাশ করে মোটা টাকা আরের আশায় আইনজীবী হবেন বলে ম'রে পড়েছিলেন এখন থেকে। আইনের ব্যবসা কিছু তাঁর হাতে নয়, তাই হাতে তিনি বেশা করেছিলেন তাই উত্তরকালে তাঁর পেশা হ'রে রইলো। আমাদের আচার্য কবীন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পাশে আর পা বাডান নি; তিনি গিরে জুটলেন অতীত যুগের কাব্যবিশারদের সাপ্তাহিক পত্রিকা হিতবাহীতে। নতোজ্ঞ এসার এ বাজীতে আলার কিছুকাল পরে 'ইউনাইটেড প্রেস' নামক এক সংবাদ সহবাহকারী প্রতিষ্ঠানে যোগ দিরে দিল্লী-সিমলা করতে লাগলেন। 'এই 'ইউনাইটেড প্রেস' প্রতিষ্ঠানটির শিখনকার ইতিহাস একটু জ্ঞান দরকার। তখনকার দিনে বিদেশী খবর আমরা যা পেতাম তা 'রয়টার' মারফৎ আর বেশী খবর পাওয়া যেতো 'এসোসিয়েটেড প্রেস' মারফৎ। একটি বাঁচি বিলাতী ওরফে সরকারী দ্বারা-প্রতিষ্ঠান আর অপরটি ছিল আধা সরকারী প্রতিষ্ঠান। বিলাতী খবর আমরা যেটুকু পেতাম তাতে আমাদের ইংরেজ প্রভুদের প্রতি ভয় ও

ভক্তি বৃদ্ধি করার চেষ্টা ছাড়া আর বেশী কিছু পেতাম বলে বনে ছর না; উপরন্তু এশিয়া মহাদেশে ভারতবর্ষ নামে যে দেশটি আছে তার একটুখানি কীপ পরিচয় ইংরেজ যে ভাবে পরিবেশন করতেন তাই পেতো। 'এসোসিয়েটেড প্রেস' বা আমাদের হাতে তুলে দিতেন তা বাঁচি ভারতবর্ষীয় সরলার ছুৎ। এই চরম ছরবতার প্রতিকার করে জুতাযন্ত্র লগুনে 'ওরিয়েন্ট প্রেস প্রিন্স' আর বদশে 'প্রী প্রেস' নামে দুইটি সংবাদ সহবাহকারী প্রতিষ্ঠানের পত্তন করেছিলেন। প্রথম-টিতে আমাদের লগুনর সংবাদদাতা পুলিন শীলের উত্তম ছিল প্রশংসনীয়। দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠানটির হুতনার বঁরা জুতাযন্ত্রকে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ক্ষিতীন্দ্র এসার চট্টোপাধ্যায় ও মাত্রাজী লদানবের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অতঃপর বিধু সেনগুপ্ত এই প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন। দেশের জাতীয়তাবাহী সংবাদ পত্রগুলির আদর্শকূলে 'প্রী প্রেস' পক্ষিপালী হ'রে জাতীয় আকোশনে প্রভূত সাহায্য করেছিল। ফলে সরকারী কোপামলে পড়ে 'প্রী প্রেস'কে অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় এবং চরম আর্থিক ছরবতার মধ্যে এর

কর্ণধারদের নতুন পদ্ম আবিষ্কার করতে হলো। দেশের দিকে লক্ষ্য রাখা ও বিধি সেনগুপ্ত ছিলেন প্রকৃতপক্ষে এর কর্ণধার। কিন্তু কি জানি কী হয়ে গেলো, মাস্তানী ও বাস্তানীতে হ'য়ে গেলো ছাড়াছাড়ি। বিধু বাবু বিধান দায়কে ধরে ডিয়েটের করে 'স্ট্রী থেপের' রূপান্তর করলেন 'ইউনাইটেড গ্রেন' নাম দিয়ে, আর লক্ষ্য রাখা গেলেন হুটুকে নিয়ন্ত্রণে।

সত্যেন বিধু বাবুর পক্ষে হ'য়ে উঠেছিল সম্পদ স্বত্ব। বিধু বাবুকে এই সময় দেখেছি আমাদের অভিনে অনেক-বার। বিধু বাবুকে বহু বাবা-বিয়ের সঙ্গে লড়াই করতে হ'লেও তিনি দেখেছিলেন দেশের লোকের সহায়ত্ব ও আর্থিক আশ্রয়।

আমাদের রসমত কোম্পানীর রস প্রকৃতির আসছে দেখে অল্প রস সংগ্রহের জন্যে যোগ দিল গিয়ে 'ট্রেসম্যান' পত্রিকার। চোখের সামনে দেখছি 'একে একে নিবিছে দেউটি'!

কবরের সামনে আসার পর বিশেষর যেন ঘন ঘন ঘটেছে লাগলো। আমার ব্যক্তিগত আর্থিক ক্ষতিও হলো এইখানে আসার পর। 'নব-জি'—সম্পাদক সরোজ রায়চৌধুরী তার কাগজে 'দূরবীণে ছানিরা' শীর্ষক একটি কলাম আমাকে দিয়ে দেখাতো এবং তার অন্তর্গত যে উপরন্তু মকিয়ার ব্যবস্থা সে আমার অন্তর্গত করেছিল তাও বড় হ'য়ে গেলো। আরও দু'ঘণ্টা হ'লো সরোজের জেল হওয়ার এবং তা অতি তুচ্ছ কারণে। 'মাননীয় গান্ধীজী' এর রচয়িতা রবি মৈত্রেয় এক কবিতা ছেপেছিল সরোজ। ক্ষুণ্ণ করেচেন। মাইনের মধ্যে নাকি এমন নারায়ণক রকমের বীরবলের অন্তর্ভুক্ত। ক'রে ফেলেছিলেন কবি যে তাতে ইংরেজ রাজত্বের তবিত্ত্ব সবচেয়ে শক্তির হবার কারণ ছিল। সম্পাদক এই কবিতাকে প্রস্তর দিয়ে অপর্যায় করে ফেলেছেন নিশ্চয় এবং তা রাজস্বোদয়ের আওতার পড়ে। স্তম্ভগো সংযোগের প্রবন্ধ বালের ব্যবস্থা হলো। তাকে হাণ্ডিয়ে লড়াই দু'ঘণ্টা বোধ করেছিলাম। সপরিবার সরোজের সঙ্গে বাস

করেছিলাম কিছুকাল। তার বিজ্ঞানের বাণ ভীত হ'লেও উপভোগ করেছি অনেক সময়। বন্ধু হিসাবে তার সহায়ত্ব পেয়েছি, সেটি ছিল আমার পক্ষে সুলাভ।

ফকরজাদা কোম্পানীর নিঃসীদা ভেঙ্গে গিয়েছিল। আর একটি লাঠির খারে তাকে বরাশারী করতে পারলেই ইংরেজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ত। এ জন্যে ইংরেজ মহাপ্রভুর চক্রান্তের অস্ত ছিল না। সত্য বন্দী জেল থেকে ফিরে এলে আবার কাগজের কর্ণধার হয়েছেন, উপেন বাজু'রো তখনো আরেন; আর স্তম্ভগুপ্ত শরণ বোস ইত্যাদি তখনো নারক। কখনোই 'মকিরা না মরে রাম' এই অবস্থা যখন, তখন ইংরেজ এক নতুন মতলব আঁটলেন। জেল অভিনায়কের বলে ইংরেজ বলাশেন এক জেল অফিসার—তার কাজ হলো কাগজগুলোকে সারোজ করে তাঁবে রাখা। প্রথম জেল অফিসার যিনি নিযুক্ত হয়েছিলেন তাঁর নাম ডাক্তার লু ব্যারেরট। ডোক্তা বরেনের টাটকা আই-সি-এস। তিনি এসেই তাঁর পেয়ে গেলেন আমাদের মধ্যে উপেন বাজু'রো নামক যে ব্যক্তিটি আছেন তিনি যোমার দুগের বিপ্লবী, হাদেশ বর্ষ কালাপানি ভোগ করেও তাঁর কিছু-নাছড় চেষ্টালাভ হয়নি, দেখার তাঁর বিজ্ঞানের বিযুক্ত পর, অতি সাংঘাতিক লোক, বুদ্ধি তাঁর দূরব্য। সাহেব এ-যেন ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে উৎসুক হ'য়ে বার দুই তাকে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। কিন্তু উপেন বাজু'রো বললেন বরো গেছে তাঁর, সাহেব দুয়ারের প্রবেশ কাছাল তিনি ন'ল। মহম্মদ যখন পর্বতের কাছে যেতে রাজী হলেন না তখন পর্বতই একদিন এলেন মহম্মদের কাছে আলাপন করতে আমাদের অভিনে।

সাহেব চেয়েছিলেন তিনি তাঁর চাক্ষুশ পরিচয়ের মধ্য দিয়ে গুরুরে ফিরিয়ে তাঁর পদ-নারিষের বিবরণটি তুলে প্রকাশ্যেরে তাঁর শাসন-সঙ্কটের কথাটা উপেন বাজু'রোকে অর্পণ করিয়ে দিয়ে যাবেন। কিন্তু বাজু'রো

সে পাঞ্জাই নন। সাহেবকে কথা বলবার সুযোগ বেশী না দিয়ে তিনি করলেন সমান্তরাল দীর্ঘতাকে আলাপন শুরু। সাহেবের ঘর-বাড়ী কোথায়, কেমন সেখানেকার লোকজন, সাহেবের দেশের বাড়ীতে কে কে আছেন, কেমন ক'রে ঘরকরা চলে ইত্যাদি বাবত্যের প্রশ্নে সাহেবকে একেবারে অর্জরিত ক'রে শেষটায় ব'লে উঠলেন—“ও সাহেব! তুমি এখনো বিয়ে করেনি, বাই ডব্‌লু গ্যাড্‌!” তাঁর বিশ্বাসের তলীট। এমন হ'লো যে আপ-পাশের অপর ছুঁতন সম্প্রদায়কও হাসি চাপতে গিয়ে তাঁরই চাপা হাসিকে কাটিয়ে কেমনলেন! সাহেব লজ্জিত হ'য়ে মাথা নিচু করতেনই বাড়াবাড়ি তাঁকে এই সবর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন—“আচ্ছা, সাহেব, তুমি তো সম্ভা-সম্ভা দেশের মানুষ, তোমাদের দেশে পুলিশ এসে যাবার কাগজের সম্প্রদায়কে কী লিখতে হবে তা বলে?”

সাহেব এবার চোয়ার ছেড়ে উঠে বিরক্তি প্রকাশ ক'রে বললেন—“You are a dangerous fellow, you refuse to be trapped I see.” (“আপনি দেখছি সাম্প্রদায়িক লোক, কীদে পা দিতে চান না।)।

টাক্সেল ব্যারমেন্টকে যে এ রকম ‘টাক্স ফাইট’ (অর্থাৎ আলার সঙ্গে কোয়ার লড়াই) দিতে হবে তা তিনি তেবে আসেন নি আপশে থেকে।

সাহেব সেই যে চম্পট ছিলেন, আর এই দুমুখের সঙ্গে কখনো সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করেন নি।

সুখ অজ্ঞাতলে বাবার আর বেশী দেরী নেই। তবু এই পড়ন্ত বেলায় আবার নতুন ক'রে ছ'একটি বন্ধু জোট। এঁদের যেন তো কোন আশঙ্কা ছিল না। নিশ্চয়ই হওয়ার কাল থেকে তার বহিষ্কৃত অবস্থা এবং শেষটায় তার ক্ষতিমুক্ত অবস্থাও জানা যে চোখে দেখেছি, প্রত্যয় আমাদের বেরনা ছিল নাড়ীর টানের মতো জীৱ। নতুন বঁরা এলেন আসরে কালর কুলানো লাল-লজ্জার বৈজ্ঞানিক তাঁরা দেখতে পান নি বটে, তবু তাঁদের তো এটা আসরই, হোক না এর আয়োজনের অপ্রাচুর্য, প্রাপের প্রাচুর্যে এঁরাই যে এখানে একদিন কুল

ফুটতে পারবেন না, সে কথা কে বলতে পারে?

এলেন হেমচন্দ্র নাগ, শচীন্দ্রনাথ বোম্ব, বিজন সেন গুপ্ত, সুবোধ রায়, নীহার রজন রায় (অথবা ডাঃ)।

হেমচন্দ্র ইংরেজী কাগজে সম্প্রদায়িক গ্রন্থ লিখতেন। হেমচন্দ্র মানুষ হিসাবে ছিলেন উপেক্ষা নিরোগী মহাশয়ের সংগোত্র—মিথিগ্রন্থ, শান্তনুভাব, নীর, বির। আপন বক্তব্যটুকু অর্থাৎ গ্রন্থ লেখা হাড়: আর কোন চাকলো মাদ্রা মেডুয়া তাঁর ছিল স্বভাব-বিশেষ। তাঁর মুখে সামনেকার উপরদিককার গোটা-কতক দাঁত বিস্তারিত ক'রে বাইরে এমনি ভাবে বেরিয়ে এসেছিল যে, দেখলে কালী করালবদনীর ভঙ্গাবস্থা আসতো মনে; কিন্তু আশ্চর্য এই, এই বহিঃ প্রকাশে ছিলনা তাঁর অন্তরের নিশ্চলতার সংযোগ। অজিত্যত কুলের রূপসী সিগারেটের চেয়ে গীতা, হানা, বলিনা বিড়ির প্রতিই তাঁর আশক্তি ছিল বেশী; তাই তাঁর সম্ভাষাতে (ভাষণে নয়) নিশ্চীড়িত হ'তো বিড়িই। সেই সম্ভাষার বাক্যখানে আশ্চর্য রকম কোশলে বিস্তৃত বিড়িটি কুঁকতে কুঁকতে যখন তিনি গ্রন্থ লিখতেন—সে হতো এক অসুখ মৃত! তাঁর ভঙ্গাবতার অনেক সময় অস্বাভাবিক বিড়িটা স্থলিত হ'য়ে পড়তো: কাগজের উপর।

শচীন্দ্রনাথকে আমাদের বাংলা কাগজে দিনকতক পজুবাদের কাজ ও ছ'একটা সম্প্রদায়িক গ্রন্থ লিখতে দেখেছিলুম। তদন্থিকে ইংরেজী কাগজে টেলিগ্রাম সম্প্রদায়িক কাগজেও তাঁকে হাত পাঁকাতে দেখেছি সে সময়। কিছুদিনের মধ্যে দেখা গেলো বাংলার চেয়ে ইংরেজীতেই তাঁর দখল বেশী। তিনি ছিলেন ইংরেজীতে এক-এ। শেষে পাকাপাকি ভাবে বহাল হলেন ইংরেজী কাগজে। প্রাণের প্রাচুর্যে ছিলেন তিনি বদা উজ্জল। সব সময় থাকতো তাঁর হাতে একখানা ইংরেজী নভেল, নরতো কোন জ্যোতিষ শাস্ত্রের বই। টেলিগ্রাম সম্প্রদায়ের কীকে কীকে তিনি নিশ্চয়ই হতেন তাঁর বইয়ের পাতার। দেখলে মনে হতো লোকটি

কাজে কীকি দেওয়ার ভয়ানক; কিন্তু আলো তো নয়, কাল তাঁর হাতে খুব কমই থাকতো পড়ে—ক্রতগামী ছিল তাঁর কলম আর নির্মূল ছিল তাঁর কাজ।

আবার সঙ্গে শচীন্দ্রপালের বন্ধিত্ব হারছিল খুব। ডাকতো সে আমাকে ‘চাঁদমা’ বলে। কথা বলতো আমাদের ত্রিষ্ঠার অন্নদার ভাষায়।

বললাম হরতো—ও শচীন, তুমি নাকি আজ মডেল কেডে কলম ধরোনি ?

“কেডা বলচে” বলে শচীন হুৎতলে আমার বুকের দিকে চেয়ে হাসতে থাকে। তারপর সব তখন মেইটার “জ্যাডে বাঙ মনে” বলেই আঙুল-চুকানো মডেলের পাতাটা ধুলে আবার ভাতে নিবিষ্ট হ’লো।

বিজন সেন ছিলেন আশুতোষালা, অগোচালা লোক। বে-ভুবার পাঁচিশটা তাঁর ছিলনা আগে। খুঁজতরা মাঝার চুলেও হরতো চিকুই লড়তো না অনেক দিন। গায়ের বহলা জামাটার দিকেও ছিলনা তাঁর ক্রতপ। ইংরাজী সাহিত্যের এস-এ হ’লেও তিনি টেলিকোন করতে পারতেননা, বরংও তাঁর হ’তো আতঙ্ক। টেলিকোন করার প্রয়োজন হ’লে অনেক সময় ডাকতেন আমাঘের কাউকে। আর, বেউ টেলিকোনে ডাকলে বাধ্য হ’রে যদি তাঁকেই ধরতে হ’তো তবেই হতো বিশদ। আরো বিশদ হতো যদি টেলিকোন বন্ধ হতো হিন্দুস্থানী, কারণ তিনি হিন্দী ভাষার এক বর্ণও বুঝতেন না। অকস্মৎ ‘রিগিভার’টা টেবিলের উপর নামিয়ে রেখে তিনি পূর্ববর্তীর ভাষার ব’লে উঠতেন—“কর কীরে মশ্বর, কিছুই-ই হুঁশি না।”

সহল, জ্বরবান পুত্র ছিলেন এই বিজন সেন। পরিচ্ছদের মালিন্য তাঁর অচর্যকে মলিন করেনি কোন দিন। সাহিত্যে বিধরক করেকটি ইংরাজী প্রবন্ধে তাঁর শক্তি পড়িচর পাওয়া গিয়েছিল।

কবি সুবোধ রায় ছিল আমার পুণাশো বন্ধু। বাবীন বোধ এবং অকুন্ডার বরন দাপ সম্পাদিত “নারায়ণ”

মাসিক পত্রে আমরা উভয়ে লিখতাম, তাই আমাঘের বন্ধু হয়েছিল আগেই।

বেঁটে লোকটি। বেহের তুলনার তার মাথাটা ছিল অত্যধিক ভারী আর মূষণা ছিল তেমনি চ্যাটালা। হটো কর্ণা হলেও কী বেন কী একটা কঠিন রোগে অকালে থেকে-তারাটে হ’রে গাড়িয়েছিল। চেয়ারে ব’লে থাকলে তার নির দেহাংশের আলাদা পাওয়া যেতো না আরো। উঠে গাড়ালেই দেখা যেতো তার কাঠির বতো নক নক হাত আর পা। হাতের আঙুল-তলি কিছু ছিল শিরীর বতো আর পায়ে কোন চীন। অক্ষীর জ্বতো পরিরে দিলেই চলাতো।

সুবোধ রায়ও শচীন্দ্রপালের মতো কিছুদিন আমা-ঘের সঙ্গে বাধা লিখে ভর্তি হরছিল গিরে ইংরাজী কাগজে। যাকে কিছুদিনের ভরে সরোজ রায়চৌধুরী জেলে গেলে তার ভায়গরে নবমজির সম্পাদকও সে হ’রেছিল। সকল বলে ভিড়ে পড়ে আজা কবিরে তোলায় তার কৃতিত্ব ছিল বেশ। রাজহীনের টানা প্যাক-প্যা-ক ডাকের সঙ্গে হাড়-হু-হু খেলোয়াড়ের চন্দ্রাব-কিং-কিং ছানি বেগালে বে অমৃত আওরাক হর সুবোধ রায়ের হাসিতে ছিল সেই আওরাক। সে হাসতে পারতো এবং হাসাতেও জানতো। কাজেই সকলের সঙ্গেই সে ভবে উঠেছিল, অতি অন্ন দিনে এবং সহজে।

‘কম্বোল’ দলীর সাহিত্যিকদের ভাষা অংশের মুখপত্র ‘কালি-কলর’ এর পুটার সুবোধ রায়ের ‘আটের আটচালা’ উপভোগ্য ছিল তখন অনেকের কাছে।

চাকরী সুবোধের না করলেও চলতো, কারণ তার দোবা সুবীর রায় ছিলেন চুঁচুড়ার একজন বিখ্যাত উকিল—বেশ অবস্থাপন্ন। সুবোধ চুঁচুড়া থেকে ডেলি-প্যালেজারি করতো। সে ছিল আক্ষর্য ব্রহ্মচারী—অর্থাৎ বিরে সে করেনি কোনদিন। বিরে তার হরনি, এমন নয়; সে-ই বিরে করেনি, তার কারণও নাকি সেই কঠিন রোগটা। একার পেটের ভরে দাদা তাকে

ভাষাতে নিবেদ্য করেছিলেন শুধু বাবার কবর গেরে তাঁর অশ্রুগ্রন্থই হ'য়ে থাকাতো কেমন বেন লাগতো তার, তাই এই চাকরীতে ঢোকা। এত হেসে এত বহুসন করেও কিছু সুখের রস বোধ করতো একটা দুঃসহ নিঃশব্দতা। এই বেখনা-বেধে কখন যে সে আত্মহত হ'তো জানিনা, আরই বেখতা-হাতের কান্ন চেড়ে হঠাৎ সুখের এক সমর কলের জলে মাশাটা বেশ করে বুঝে ভোরালে দিয়ে বহু হে। তোরাগেটা সে সকে করে বাড়ী থেকে বয়ে আনতো। আর আনতো একটা বড় কোঠাতে করে গভা চরক লুচি ও তার সঙ্গে অল্পপান। আশাদের মধ্যে কাউকে না কাউকে বিশি না করে সে ভূঁপ্ত পেতো না।

সুখোদের মাথা ঘোরা দেখলে উপেনদা আড়ালে আশাদের কাছে বগতেন—“ওরে, সুখোকে তোরা কিছু বলি না। হু হু'বার টাইফয়েড হ'য়েছিল বেচারীর।”

নীহার রজন তার এনেছিলেন রবিবারের ইংরাজী কাগজের সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হ'য়ে। তিনি খুব বেশী দিন ছিলেন না আশাদের মধ্যে। তাঃ বিমলা চরণ লাহার সেক্রেটারীগিরি শেষে তবে আশাদের কাছে বিদেন হাত। আগন্তেদ আর বিকাশের দিকটার, তাও সব দিন নয়। শুনতায় তিনি কর্পোরেশনের “মিউনিসিপ্যাল গেজেট” সম্পাদক অমল দায়ের সম্পর্কীয় জাই। পোষাক-পরিচ্ছদের পারিশাটো ও পরিচ্ছন্নতার তিনি যে সে সম্পর্ক কোনদিন মলিন করেন নি তা চোখে-দেখছি। তাঁর চেহারা ছিল নারী-জ্বলত কম্বীরতা ও সৌন্দর্য্য। কটটিও ছিল মিহি। হাসলে তাঁর হাসিতে বেজে উঠতো একটা ভরসারিত কুলকুল জ্বনি এবং বই সকে তাঁর চোখের দুটি পাখা হয়ে আসতো অর্থনিরীক্ষিত। অনেক বলতো তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা নেই, আছে কটলাখ অভ্যাগল একটা প্রকাশ বাক্য নাকি বলা বার শান্তিনিকেতনী চণ্ড। নির্দেয় অথবা চোত আদ্বির শিলে-করা পাভাবীর উপর

গলা জ'ড়ের একটা দিকি ইকি কানো কুচকুচে কিতে নেমে এসে তাঁর বুক-পকেটের একটা প্রান্ত-রেশের গুঁতে লুকিয়ে থাকতো। তাবতায় বুঝিবা সেটা চশবার বাহক। আশাদের ভুল তেলে সেটা একদিন প্রকাশ করলে একটা চোটে হাতখড়িকে। রানীশ্রক প্রত্যাখ এড়িয়ে তিনি এনেছিলেন এতে স্বকীরতা। স্বরকাল তিনি আশাদের মধ্যে থাকলেও এটা অকণ্টে স্বীকার করতো যে, তিনি তাঁর স্বভাবের কোমলতার ও মাধুর্যে আশাদের সকলেরই হ'য়ে উঠেছিলেন অতীব জ্বর। দুদিনের আশঙ্কার রিষ্ট আশাদের মধ্যে তিনি সকার করেছিলেন কিছুদিনের অন্ত্রে প্রাপের রস।

নীহার রজনের সঙ্গে মনে পড়ে গেলো আশাদের রাজ্যী বহু কেবলমগ্নের কথা। গোড়ার দিকে তাঁর কথা বলতে তুলে গেলি, তার কাবণও আছে। কারন, তেজটরমণ আশাদের মধ্যে থেকেও ছিলেন না; কখনো বেখতার তিনি অস্বাস্থ্য উভাগ, আবার কখনো বা তাঁর অস্বাস্থ্য আবির্ভাব। কীভাবে যে তিনি আশাদের সম্পাদক-গোষ্ঠীর মধ্যে অস্বাস্থ্য ছিলেন তাও ভালো করে কোনদিন আনতে পারিনি তবু অতি মধুর সম্পর্ক তাঁর ছিল আশাদের সঙ্গে। রাজ্যীদেব মধ্যে অমন জুগুৎস্ব খুব কমই চোখে পড়ে। তাঁর বলিষ্ট সেহের স্বাস্থ্যও ছিল শোভনীয়। পরিচ্ছন্নতার তাঁর রুচিও ছিল ঠাকুর-বাড়ীর অভিজাত জেনীর। দেখলে তাঁকে বাঙালী ছাড়া আর কিছু বনে করা সম্ভব ছিল না। ইংরাজী ভাষার তাঁর সকে কথা হতো আশাদের। সাধারণ রাজ্যীকীর কথা বলার ভণী ও উভাগের তিনি ক'রে নিরেছিলেন কিছুটা মাজিত। তবাপি সেই সময়টার কেবল তাঁকে বাঙালী ব'লে মনে করা আর সম্ভব ছিল না। তাঁর দেশী পাভাবীটার উপর ক'রৎ কখনো তিনি আর ইকি চণ্ড। চকোলেট পাণ্ডের উড়ানি উড়িয়ে ও পারে রাজ্যী ভ্রাতাণ চ'ড়ের দক্ষিণ ভারতের দক্ষিণ প্রকাশ করতেন।

তেজটরমণকে উপেনদা ভাষতেন চাঁৎ

ডেকটরমণ হাসভেন তাকে। ঠাণ্ডাকাটার অর্থ একদিন তাঁকে ভর্তুকা ক'রে বুড়িরে দেওয়া হ'য়েছিল। অন্তঃপর আমরাতও তাঁকে সন্মানিত করতামি এই নামে। অল্প বয়সে একটা দীর্ঘ নামকে ছোট ক'রে আমার প্রবন্ধ ছিল বৈকি। ডেকটরমণ এতে ব্যর্থিত হ'ননি কোনদিন বরং এই ভাবে সত্য্য মেতরাই হ'য়ে গিয়েছিল তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক। শরীরের অভিজ্ঞতা জেগীর হেন বাড়ী ছিল না যেখানে ডেকটরমণের অস্বাভাবিকতা হ'য়েছে। রোগ নামক রিপুটি বিধাতা বোধকরি তাঁকে দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। সুখানা ছিল তাঁর সখ্য হাজির। কোন রসিকতা শুনে হাসলে তিনি সে হাসি তাপা দিতে চাইতেন মাত্র একটি আঙ্গুলের ছোঁয়ায়; তাতে আঙ্গুলটা তাঁর সুদীর্ঘ নালিকার ডগা স্পর্শ ক'রে হাসিটাকে ভাগ ক'রে দিত দুজনে। যোগতত্ত্ব নিরামিষানী ভ্রূপে তিনি বাস্তবিক জ্ঞানের সচিহ্ন। বলা করে চলতেন, একত্রে তাঁর কিছু ছিলনা কোন গোড়ামি। আমাদের ব্রহ্ম আচার্য্য গ্রহণে ছিলনা তাঁর কিছুমাত্র দ্বন্দ্ব; বা সন্দেহ। একদিন তাঁর বাসার নিমন্ত্রিত হ'য়ে আমরা কয়েকজন পেরাজ-লতা দেওয়া লবণাক্ত হাঙ্গুরের সঙ্গে চা পান ক'রে মনে মনে ভোবা ভোবা করলেও হবে ব'লে এসেছিলাম 'ওরাজারহুল'।

বোল পরিবারের অসার মেহ লাভ করেছিলেন ডেকটরমণ। আমাদের মধ্যে থাকারি। যেমন ছিল তাঁর রহস্যজনক তেমন একদিন তাঁর অকস্মাৎ অন্তর্ধানও হ'লো রহস্যজনক।

আর একজনের কথাও ভুলে গিয়েছিলাম ঠিক এই কারণে। তাঁরও আমাদের মধ্যে থাকারি কিংবা বর্ধাৎ বলতে গেলে প্রাত্যহিক না হোক, সপ্তাহে অন্ততঃ দু'চারদিন এসে কলকালের গল্পে থাকারি কিংবা মাঝে মাঝে একেবারেই না-থাকারি ছিল আরো রহস্যজনক। এই ব্যক্তির নাম ছিল অমিনাশ পেন—ব্রিটিশদের বিখ্যাত নেতা সতীন্দ্র সেনের বৈয়াক্তের ভাই। একে লজ্জীন্দ্র সেনের ভাই, তাঁর উপর আর্য্যের সম্প্রদায় লজ্জী-

বস্ত্রীর সেনের লোক; সুতরাং এখানে থাকারি না-থাকারি অধিকার যেন ছিল তাঁর সহজলভ্য।

ভাষা কর্ণপ, এবং তাঁর কথা বলার ভঙ্গীটা ছিল এত ক্ষুদ্র যে, তাঁর অধিকাংশই হ'তো দুর্বোধ্য, সুতরাং তাঁর মুখের সামনে ঠাড়োনা দাধ হ'তো। তাঁর বচন-ভঙ্গীর সঙ্গে কিছু হাতের লেখার বেশ সঙ্গতি ছিল। মাঝে মাঝে হাতে লিখে কী লব রিপোর্ট করতেন। সে লেখা ছিল আমাদের ইলিফট সাহেবের হাতের লেখার যুগোপায়ী—কাকের ঠ্যাং বকের ঠ্যাং, বোঁড়া লোক নোঁড়ে গলে যে বৃত্ত হয় তাই।

কিসে তিনি আশ্রিত পেরেছিলেন এবং কোথায় তাঁর বাসা ছিল জানি না, কিন্তু সম্প্রদায়-গোষ্ঠীর কোন কোন ব্যক্তির প্রতি ছিল তাঁর প্রচণ্ড আকর্ষণ; তা ছাড়া দুনিয়ার আর লব ব্যক্তির প্রতিই তিনি শ্রদ্ধা হারিজে ফেলেছিলেন। লব কিছুকিছু মজাও করাটা বেধে হয় এসেছিল তাঁর সেই বেগনা থেকে। একারাজের তিনি জানিয়ে দিতেন যে, বাস্তবিক নিয়ে তিনি অশ্রদ্ধা নি এবং তাঁকে যদি কেউ না চায় তবে তিনি যোড়াই কেয়ার করেন। তাঁর গুণ দুইটি এই যে, বোগ্যের মূল্য কেউ দেয় না; তাহার যেখানে চলু বেশী সোনার আদর সেখানে করবে কে।

পুরাতন কর্মীদের মধ্যে উৎসাহ জ্বলিত হয়ে এসেছে লজ্জী করছিল। গুণাবলী থেকে হুঁসুটিজিত হবার আগেই অনেকের মন থেকে গিয়েছিল। নতুন বার। এসেছিলেন তাঁদের নবীন উৎসাহে তবু মাঝে মাঝে কীণ আশা বলাকি দিয়ে যেতো। তত্ত্বপনের আশাবাদী মন সেই বলকে আবার নতুন ক'রে অগ্নির জাল বুদবুদে। কিছু সেরানো উপেন বাজুয়ে হুঁসুটিজিত গদ্যব্যাজ। লজ্জী জানতে পেরেছিলেন তাঁর অসুখ বিচক্ষণতার দ্বারা। তাই তিনি ভিতরে ভিতরে চেষ্টা করেছিলেন এখান থেকে সরে পড়বার। ১৯০০ সালে লখন সত্য্যগ্রহ জুজ হবার বদন ভোড়ভোড় চলছে তখন বাংলা কংগ্রেসের কর্মচারীদের মনে বৈষম্যতা। সেনগুপ্ত

হুজাযের কথাতা আহরণের লড়াইয়ে হুজায তখন বেঞ্জা দখল করে ফেলেছেন অর্থাৎ প্যারেসিক কংগ্রেসের মননে তিনি এখন আনীন। বেঞ্জা সুরক্ষিত কংবায় অস্ত্রে যুগান্তর ও অসুশীলন মল্লের সৈন্যবাহুর নিয়ে তখন টানটানি চলতো দু'দলে। সেই সময় কর্মী-সম্মান নামে একটি দল গঠিত হ'য়েছিল, তাঁরা সকল দলকে মিলিত ক'রে একযোগে কাজ করার পক্ষপাতী। এই দল বাংলার পক্ষপাতবকে আরহতে আনতে না পারায় সেন-ভগ্নকে সাহায্য করছিলেন। চরখা-পত্নীরাও সকলে চলে পড়েছিলেন সেনভগ্নের বিকে, কেননা গাড়ীভর স্ত্রীপাকটাক ছিল সেনভগ্নের উপর। লবণ আইন ভঙ্গ করার মানসে সেনভগ্ন সত্য্যগ্রহী বল গঠন করে ফেলেছিলেন। তিনি স্বয়ং এই আন্দোলনে বাঁপিরে পড়বার জন্যে ভোড়ভোড় করেছিলেন। কলী-সভ্যের সভ্যরাও তৈরী হচ্ছিলেন সেনভগ্নের অসুশীলন হবেন ব'লে। পুরানবে সত্য্যগ্রহ-চালারার সে কী উৎসাহ! কিন্তু বাংলার মাটির এমনি ভণ্ড বে, সবে সবে বিদ্যা-গ্রহণ শুরু হয়ে গেলো চট্টগ্রামে। অন্যত্র সিং-এর নেতৃত্বে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার সৃষ্টি হলো।

হেংরজ শাসকবর্গকে উড়িয়ে দিবার জন্যে বাংলার বিপ্লবীদের এটা হয়তো একটা ছেলেমানুষী পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনার মধ্যে কোন বহুতী শক্তি নিহিত আছে কিনা তা নিয়ে তাঁরা কোন হুজু বিচারে প্রবৃত্ত হন নি কোনদিন। শুধু দেশাস্থ্যবোধের জ্বালা ছিল তাঁদের মুখে আর সেই বোধে উত্তর ক'রে তুলতে চেষ্টা-ছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বদেশবাসীকে। হয়তো তাঁদের এ প্রচেষ্টা ছিল ভুল কিন্তু এই ভুলভার বাবেও যে কত পারমাণবিক শক্তি সঞ্চিত হ'য়ে বিক্ষুব্ধিত হলো দিকে দিকে তাঁরা বোঝ কে রেখেছে? বিপ্লবীদের স্বদেশ-বাসীর মনোজগতে গিয়ে লাগলো সেই ভুলভার বিপুল ভাব-স্তরঙ্গের আঘাত। কে বলতে পারে উত্তর কালের স্বাধীন ভারতের পৃষ্ঠের একটি কণা যোগাযনি এই চট্টগ্রামের বিপদের?

তখনকার দিনে ভূপেন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'স্বাধীনতা' সাপ্তাহিক পত্রে সম্পাদকীয় গ্রন্থ বার হলো—'বহু চট্টগ্রাম!' সে গ্রন্থে ছিল আশুন জালাবার মন্ত্র। কলে 'স্বাধীনতার' অপমৃত্যু ঘটলো।

চট্টগ্রামে বিপ্লবীরা যে আশুন জালালেন কী ভাবে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বাঙালীর মনে তার চিত্র পাওয়া দুঃসাধ্য ছিল না। ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে এক জনসভার অধ্যাপক নূপেন বাবুবা তাঁর বক্তৃতার ভাবাবেগে অসীর হয়ে 'স্বাধীনতা' পত্রেরই প্রতিক্রিয়া করলেন—চট্টগ্রাম! চট্টগ্রাম! বহু চট্টগ্রাম!! বিপ্লবীদের কর্ণে প্রশংসার পক্ষপাত হয়েছিলেন বহুভাষ্য তখন সবাই।

এই ক্ষেত্রে মনে পড়ে গেলো দেশমন্ত্র নেতা সেন-ভগ্নের কথা। রাজনীতি ক্ষেত্রে নেতা হিসাবে তিনি যে হুজাযের চেয়ে অবিকল্পিত ভাবে ছিলেন তার প্রশংসা পাওয়া যায় এই অস্ত্রাগার সৃষ্টির ব্যাপারে। কূটনীতির কোঠারে আস্তর নিয়ে যেত বিপ্লবে আত্ম-গোপন করার কৌশল তিনি আরহত করেছিলেন তাহা ভাবেই। অর্থাৎ নেতা হ'তে হ'লে সুবিধা মতো যে কৃত্রিমতার খোলস পরবার কারণের যোজ্ঞা থাকে সরকার তা সেনভগ্নের ছিল। হুজাযভ্রম এ বিভার পারদর্শী হতে পারেন নি কোনদিন। তাই তিনি 'স্বাধীনতা' পত্রের মনোভ্রম করতে না পেরে খেবে ভ্রান্তভ্রান্ত হয়ে দেশ ছাড়ো হ'তে বাধ্য হয়েছিলেন। মনে রাগ থাকলেও হবে কী ক'রে হাসি মাখাতে হয়, বাক্যে দেখলে গা জলে যায় তার সাক্ষাতে কী ভাবে ঢলে পড়তে হয়, বাতে বিশ্বাস নেই তাতেও আশ্বাসের হেতু বুঝে যায় করতে হয় কেনন ক'রে—সে সব কলার পারদর্শ্য যিনি না হ'তে পারলেন তাঁকে বোঝা নেতা বলি কী করে? সত্য্য ব'লে বা বিশ্বাস করি তা সেজা ভাবে প্রকাশ করে তাতে অটল থাকার নাম গোঁয়ার-কুসি। এই ভণ্ড বা দুর্ভাগ্য ব্যক্তবার বহু হুজাযভ্রম আখ্যা পেয়েছিলেন গোঁয়ার-গোঁষা।

যাক্ সে কথা। অস্ত্রাগার পূর্তনের কথার ফিরে আসা যাক। ঘটনার পরদিন সারা কলকাতা খবরের কাগজের কিংওহালাদের কোলাহলে সরগরম। চারের টেবিলে বসে চারের এমন মুখরোচক অনুশান ভাষণে জোড়েনা সব দিন।

সেনগুপ্ত সাহেবের কণ্ঠে "নেলি! নেলি!" জমিত হ'য়ে উঠ'ছিল। তাঁর আনন্দ-উৎসাহ চিত্তের কোন প্রান্ত ছিল না, তবু তা চাইছিল কোন স্মরণকে সে আনন্দের ভাগ দিতে। নেলী বাপ যেন-সাহেব হলেনও ছিলেন কিছু কুমারী-মতো অসাধারণ বৈশিষ্ট্য, পতিব্রতা নারী। স্বামীর সঙ্গে অনেক লাহুনা তাঁকে লইতে হতো নীরবে। স্বামীর ডাকে ছুটে এলেন কাছে, কিন্তু স্বামীর কোন প্রস্তাবেই, স্বামীর মুখে কোন কথা নেই— শুধু সে এক অপরূপ হাসি! কাগজখানা নেলীর সামনে ছুঁতে ফলে দিয়ে সেনগুপ্ত সাহেব স্বামীর চোকলো ক্রত ইতস্ততঃ পাথচাচি করতে লাগলেন। এমন সময় কারা আসে ওরা?

প্রমোদ ঘোষাল না? হ্যাঁ, তিনিই তো এবং তাঁর সঙ্গে আরো জন পাঁচেক—সব অবিলম্ব ছাত্র-সম্মেলনের ছেলেরা, সেনগুপ্ত সাহেবের পরম ভক্তের দল। মহো-জ্ঞানে সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর ভক্ত-সম্মেলকে আদরান করলেন কাছে। সকলের মুখেই হাসির ত্যাব ছিল এক প্রমোদভরের মিন আকর, আক শুধু প্রসঙ্গতার উৎসব।

সেনগুপ্ত সাহেব তাঁর চেয়ারে বসেই লাফানকার টেবিলটার উপর প্রচণ্ড এক হুঁচকাত করে বললেন— "Bravo Chittagong! I'm proud that I belong to it"

টেবিলের কোণে বসিত পেরালা ও কেটলি গয়েত 'ট্রেডি ইউনিয়নের মতো উপরের দিকে নেচে উঠে তুল্লিত হলো; ফলে পেরালা ও কেটলি ভেঙে হলো চুইং; মেসের উপর বিকস্প চীনা মাটির টুকরাগুলিতে আভ আর জ্বালোর বেদনা নাই—আছে নুতনতর সৃষ্টির

নবাত্মের সঙ্কেত!

"বেয়ায়া! চা লাভা!"

সাহেবের এমন পুণ্যজ্ঞান দেবেনি অনেকদিন।

নবাগত ছাত্রবৃন্দের সঙ্গে সেদিন চারের মজলিসের আলোচনার সেনগুপ্ত সাহেবের মুখে অসাধারণ বিশ্রবের বিভিন্ন খ্যাখ্যা স্তনাগিরিছিল।

কিছুকণ বাদে ছাত্রগণ প্রদর মনে বিধার নিলেন।

অথ পট-পরিবর্তনঃ

এবার বাঁরা এলেন তাঁরা সব গাড়ী মার্ক। বাঁটি বদর পোতিত বেছে আড়ম্বরের বেশমাত্র ছিলনা কারো। কয়েকজনসামান্য অহিংস হবার-দুশ্কেটীর তাঁরা সিঁড়ি-লাত করেছিলেন ব'লে খাত হয়েছিলেন। তবু তাঁদের মধ্যে ছিলেন-একজন যিনি অতীতকালে অমূল্যন দলের একজন মন্ত চাই হিলাবে প্রচা আকর্ষণ করতেন অনেকদূর। সেই দুদিনের অপকীতি এখনো তাঁর মনের কোণে কোণাত বাসা বেঁধে আছে কিনা তাঁর বোজ নেবার সাধন করতে পারেনি, নি সেনগুপ্ত সাহেব।

এই দল সামনে এসে দাঁড়াতোই সেনগুপ্তের মুখের চোয়ার আশ্চর্য বকম পরিবর্তন হয়ে গেলো। সে মুখে কোথা থেকে এলো যেন এক বিপরতার কালো দ্বারা—আতির তবিত্ব হুঃখের অনন্ত হৃদিতার ভাবে আনত, বিবর্ষ সে মুখ!

সেনগুপ্তের মুখ থেকে নিঃসৃত হলো গভীর দুঃখের আত্মনা—"ওঃ!"

উল্লাসের চাকল্য কোথাও নেই। আপদকর্মের সঙ্গে সেনগুপ্ত সবভাবে মিশ্রমান!

এই পঙ্কিত আতির-উদ্ধারের আর আশা নেই। অহিংসার মহামরে বাঁরা দীক্ষিত হ'তে পারলে না, অভ্যাচারিত হ'য়েও বাঁরা কমানীল হবার চেষ্টা না করে প্রতিহিংসা রূপ বৃদ্ধ মানববর্ষ পালনে কিঞ্চি হয়ে ওঠে তাবের তবিত্বও জেবে সেনগুপ্ত আকুল হলেন।

বিন্নবীধের সাত্র পূর্ণ থেকে ফিরিয়ে আনার ভার এখন নিতে হবে তাঁদের। দেশবন্ধুর বাংলাদেশ সর্ব-ভারতের কাছে হেরে হবে—এ তিনি সইতে পারবেন না। বিন্নবীরা দেশান্তরবোধে তাঁদের চেয়ে ছোট একথা তিনি ঝুলছেন না, তবু তাঁদের লমটা যে বিশেষ একথা তাঁদেরকে বুঝতে হবে স্পষ্ট করে। বুঝতে হবে যে, হিংসা খাঙ্গা হিংসাই হবে আগ্রহ। আর সেই হিংসার অন্তরে ভারতবর্ষ পুড়ে হবে থাক। যে খাঙ্গা আবার সম্ভাবনাকে উজ্জল করে রয়েছে তা অন্তঃপুর হবে অসুখ!

সংস্কৃতির দ্বারা সেনাকণ্ঠ স্থান করে নিলেন আগন্তুকদের দ্বারা।

যেহাঙ্গা অন্তঃপুর বৈকালিক সত্তার তত্তে 'মিটিংকা কাপুডা' টিক করে রাখার আদেশ পেয়ে গেলো।

‘উবারচেতা, ভাঙ্গী, দেশ প্রেমিক সেনাকণ্ঠ ছিলেন রাজনীতিবিদ চিন্তাবে কলা-কুশলী। রাজনীতি ক্ষেত্রে ক্রান্তিরেখার প্রসঙ্গের আছে, এ বোধ সূত্রেব্রহ্মের ছিল না, কাজেই এ-ক্ষেত্রে সেনাকণ্ঠের জ্ঞানার তিনি ছিলেন ‘দি’ টিমের খেলোয়াড়।

বিবাহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিমত

সারা স্তম্ভ

নববিবাহিত দম্পতিকে একবার গান্ধীজী নিম্নলিখিত কথাগুলি বলেছিলেন। এর দ্বারা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা ছিল তা সবই জানা যায়। তিনি বলেছিলেন—

“যে অশুভান দ্বারা আমার কতক বুদ্ধি প্রাপ্ত হয়—কেবলমাত্র সেই অশুভানেই আমি বিশ্বাস করি। এই অশুভানে পতি যন্ত্রোচ্চারণ করে এই ইচ্ছা প্রকাশ করেন যে বধূ স্বামীর এবং স্বামীর পুত্রের অনন্য হোক। এই ইচ্ছা দ্বারা আমার মনে কোন চিন্তা বা অশান্তির উৎপত্তি হয় না। এর অর্থ এ নয় যে প্রজনন বাহ্যাত্মক। পরকায় মত কঠোরতার সঙ্গে ধার্মিক মনোভাব বিরেই বিবাহ করা উচিত। বরী সন্তান চান না তাঁদের বিবাহ করা উচিত নয়। মৈথুনিক বৃত্তিকে তৃপ্ত করবার জন্য যে বিবাহ করা হয়—তা বিবাহই নয়। তা বাতিল।” (হিন্দী থেকে অনুদিত)

এর দ্বারা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে গান্ধীজীর মতে বিবাহের আসল উদ্দেশ্য, অন্তঃ বৈহিক সম্বন্ধের

একত্র উদ্দেশ্য পূত্রোৎপাদন। “পূর্যার্থে ক্রিয়তে ভাণ্ডা”—অন্ত পক্ষে এই তাঁর বলার উদ্দেশ্য ছিল। উল্লিখিত প্রবচন প্রসঙ্গে তিনি স্পষ্টরূপেই বলেছিলেন “আত্মের অশুভানের ভাবপার্থ এই যে উত্তরের দিক থেকে যখন স্পষ্টরূপে সন্তান কামনা আছে তখনই শারীরিক মিলন হতে সেওয়া উচিত। সমস্ত দারপাটাই পবিত্র। এইজন্য যখনই বৈহিক মিলন হয় ভজনাত্মকরূপে (prayerfully) হওয়া উচিত। এইরূপ মিলনে পূর্বজীভা বা কোটিপ পুত্রের স্থান নেই কারণ ঐগুলির উদ্দেশ্য বৃত্তি (মৌনবৃত্তি) শুনিকে উত্তেজিত তথা তৃপ্ত করা।

“যদি দম্পতির কেবল একটি সন্তানের কামনা থাকে তবে সারা জীবনে কেবল একবারই শারীরিক মিলন হওয়া উচিত। দ্বারা নৈতিক বা শারীরিক ভাবে অসুখ নয়—ভাণ্ডের পক্ষে শারীরিক মিলন উচিত নয়, এবং যদি তারা সম্বোধন করে তবে তা বাতিলের সমতুল্য। যদি ভাণ্ডের এই শিক্ষা করে থাকে যে বিবাহ কাম-প্রবৃত্তিকে চরিতার্থ করবার জন্যই তবে তা ভুলে যাও।

একপ ভাবাই কুলঙ্কার। দেখ সমস্ত অসুখাই অস্তির
লগ্নে করা হয়। তোমাদের অস্তির যদি এমন কিছুহা
থাকে বা কামনারুলক তবে এই অস্তিতে তা ভস
হতে থাক।

“আমি তোমাদের মস্তিষ্ক থেকে আর একটি কুলঙ্কার
দূর করে দিতে চাই—এই কুলঙ্কার আজকাল খুবই
প্রচলিত হচ্ছে। এটা এই যে সংঘর্ষ ঠিক নয় এবং
কামবৃত্তিকে প্রকৃতভাবেই চরিতার্থ করা উচিত এবং
সুস্থ প্রেমই ঠিক। এই সব পাঠ করে এর মধ্যে কোন
কুলঙ্ক থাকবে হতেই পারে না। হরত তোমরা আদর্শ
পন্থা পৌঁছাতে পারবে না, হরত তোমাদের বিপ্লুই
অবশ্য চলে পাবে। কিন্তু তার জন্য মহৎ আদর্শকে
চোঁট করা না এবং যা অর্ধ তাকে ধর্ম বলে প্রচার
কর না। বিবাহের উদ্দেশ্য সংঘম তথা কামবৃত্তির
উদাত্তকরণ।”

বলাবাহুল্য গাজীজীর বিবাহ সম্বন্ধী বিচার সম্পূর্ণ
রূপেই ব্যতিক্রম। যদিও গাজীজী স্পষ্টভাবে বলেন
নি যে চিরকোনার বা ব্রহ্মচর্য আদর্শ বস্তু কিন্তু স্পষ্টই
বোঝা যায় সে তাঁর আদর্শ তাই। সেপ্ট পলের বিচারের
সঙ্গে তাঁর বিচার আর অস্তির।

অস্ট্রিয়ানদের লিখিত প্রথম পত্রে সেপ্ট পল
লিখেছেন “আদর্শ অসম্ভাব্য—ভবে ব্যক্তির থেকে
হল। পাবার জন্য বিবাহ করা যেতে পারে।” বাস্তবিক
রূপে সেপ্ট পলের বক্তব্য বদল করে নিম্ন এই
করেছেন যে বিবাহ বিবরে তাঁর (সেপ্ট পলের) এই
বারণ্য ছিল যে বিবাহ কামবৃত্তির একটি বিকাশ স্থল
নাম্বা বস্তু। কামবৃত্তির বৈধ সাধন হয়। ঐহিক এই যে
এইভাবে প্রত্যক্ষরূপে না হোক পরোক্ষরূপে কামবৃত্তি
চরিতার্থ করা বিবাহের একটি উদ্দেশ্য নানা হয়েছে।
কিন্তু মহাত্মা গাজীজীর বিচার অঙ্গুণ্যে বহুত অধিক এই
বৃত্তির কোন স্থানই নেই। সব মনস্তাত্ত্বিক আশির্বাদ
যেবার সময় তিনি বলেছেন “পবিত্র আদর্শ তোমাদের কাম
প্রবৃত্তিকে ভস করুক।” এইরূপ বিচার যারা বোঝা যায়

যে গাজীজীর আদর্শ সেপ্ট পলের আদর্শ অপেক্ষা আরো
অশাশ্বিত এবং এই অর্থে উচ্চতর।

পরবর্তী কালে ফ্রান্স চার্চ আরো কঠোরতর আদর্শ
ও অঙ্গুণ্যসন তৈরী করেছিল। এর সঙ্গে গাজীজীর
আদর্শ আর সমতুল্য বলে অনুভূতি হয় না।

পরবর্তী ফ্রান্স আদর্শ সেপ্ট পলের আদর্শ অপেক্ষা
আরো কঠোরতর। পিউরিটান মতে বিবাহের আদর্শ
দুটী। একটা তো সেপ্ট পলের আদর্শ এবং দ্বিতীয়টি
সম্মানোৎপাদন। কলে এই হল যে পরবর্তীকালে সাম্প্রদায়িক
সম্প্রদায় সেপ্টপল কর্তৃক কথিত সম্মানোৎপাদন অপেক্ষা অনেক
কঠিন হয়ে গেল। যদি কেবলমাত্র এই থাকতো যে
পতি পত্নীর মধ্যেই সামাজিক মিলনের অধিকার সীমাবদ্ধ
থাকার বিষয় তবে হক ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালের
সাম্প্রদায়িক সম্মানোৎপাদন এই হল যে সম্মান উৎপাদন না করে
পতি পত্নীর সম্মানোৎপাদন।

গাজীজীর বিচার ও ছিল এইরূপ। পতি পত্নীর
মধ্যেও সৈনিক সম্মান তিনি প্রকৃতরূপে সমর্থন করেন
নি। সুবোধের মত It is better to marry than to
burn অর্থাৎ নিত্য জলার চেয়ে বিবাহই শ্রেষ্ঠ—তিনি
এই ভাবেই সমর্থন করতেন। সম্মান যে একটি বৈধ
আনন্দ এ কথা গাজীজী কখনও স্বীকার করেন নি, কেবল
মাত্র সম্মান উৎপাদনকরেই সম্মান বিবাহ এই মাত্র
তিনি স্বীকার করতেন। এবং এ অবস্থাতেও সম্মান
কখনোই রূপে করবার বিধান দিচ্ছিলেন।

গাজীজী পরোক্ষভাবে ব্রহ্মচর্যকেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ বলে
বোঝেছেন, কিন্তু তবুও স্পষ্টরূপে লোককে চিরকোনার
প্রাণী করতে বলেন নি। বিবাহের মধ্যেই ব্রহ্মচর্য বলা
করতে বলেছেন, এটি খুবই দুর্দশিতার পরিচায়ক বলা
উচিত। না হলে তাঁকে আরো বহু কঠোর সমস্তার
সমাধান চিন্তা করতে হতো।

বিবাহ প্রথা দূর হলো যে সমস্তার উদ্বার হয় তার
নৈতিক দিক যদি চোড়েই দেওয়া যায় তবুও তার
সামাজিক ও আর্থিক বিশ্রবকে আবাহন করা বর্তমানে

কোন নেতারই পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। এবং নৈতিক দিক থেকে লোকত্বের চিরন্তনত্বই পালন করতে বলা বা কোন বিশেষ প্রেক্ষিকে তা করতে বাধ্য থাকবার অঙ্গুশাসন দেওয়ার কল কিছুপ হতে পারে তা বাট্রাও রাশেনের ব্যাতি বর্ণিত রোমান ক্যাথলিক চার্চের পাদরীদের চিরন্তনত্বই পালনের অঙ্গুশাসনের কলযাচাই করতে। বোধগম্য হতে পারে। তিনি লিখেছেন “মহাযুগে দুর্নীতির অত্যন্ত আধিক্য হয়েছিল। দুর্নীতি এত অধিক হয়েছিল যে তা বুঝার উদ্দেশ্য করে। বিশপেরা কত্থাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবেই পাপময় কলঙ্কিত জীবন যাপন করতো এবং আর্কবিশপেরা নিজেদের শ্রীর পাজদের কাছেই। লক্ষণ গোপ জনকে অগম্য গমনের অন্ত সাম্য দেওয়া হয়েছিল। তার ওপর আরো অনেক অস্ত্র অভিযোগও ছিল।”

সেন্ট অস্টল দ্বারা স্থাপিত মঠের মঠাধীশ লরডে অঙ্গুসন্ধান করে ১১৭১ খ্রঃ দেখা গেল যে একটি গ্রামেই তার ১০টা অবৈধ সন্তান আছে। ১১৩০ খ্রঃ সেনের সেন্ট পেলায়ারের এক মঠাধীশ লরডে প্রমাণিত হয়েছিল যে তিনি ৭০ জন স্ত্রীলোককে উপলব্ধিভাবে বেবেছিলেন। লিয়েন্ডের বিশপকে ১২৭৪ খ্রঃ ৬৫টা অবৈধ সন্তানের জনক হওয়ার অপরাধে বার করে দেওয়া হয়। হস্তা-বৈশ্যের পূর্বে এই অভিযোগে ব্যবহার হয়েছিল যে, যে কাকে ভজেরা। আশ্চর্যের বীকার করতেন সেই কক্ষ বাড়িচারের অস্ত্র ব্যবহার করা হত। মহাযুগের লেখকদের লেখা পাঠ করে জানা যায় মানবের কনবেটকুলি প্রায় পতিতালয়েরই তুল্য হয়ে উঠেছিল, এবং তার প্রাচীরের অন্তরালে শত শত শিশু হত্যা করা হত। এতদ্ব্যতীত সাধারণত পাদরীদের অগম্য গমনের কুখ্যাতি ছিল।

গাঙ্গোত্রীর নিষ্ঠুর একবার কেহ জিজ্ঞাসা করেছিলেন সন্তান লাভের ইচ্ছা না থাকলে বিবাহ বিধেয় কি না। উত্তরে গাঙ্গোত্রী বলেছিলেন “কথাটা নয়। নিফলা বিবাহে আমি বিশ্বাস করি না। কোনো বার কেবল স্ত্রীকে রক্ষা করেই কোন কোন বিবাহ করা হয়ে থাকে, সন্তানগের

অন্ত নয়। কিন্তু এইরূপ কন্যার ঘটে থাকে। আমি পবিত্র বিবাহিত জীবন লক্ষ্যে বা কিছু লিখেছি তা তো তোমারা পাঠ করেই থাকবে।”

“আমি মহাভারতে বা পাঠ করেছি, প্রত্যহ তার প্রত্যহ আমার উপর পড়তে। তার অঙ্গুশাসনের ব্যাস পরিচালিত হয়েছিলেন। ব্যাসের লক্ষ্যে বলা হয়েছে যে তিনি স্ত্রীকে তো মরই অঙ্গুশাসনই ছিলেন। স্ত্রীর রূপ ভয়ানক বলে বর্ণিত হয়েছে। তিনি কামোদ্দীপক কোন ইশারাও করেন নি এবং শরীরিক নিলনের পূর্বে তিনি সর্বদা স্ত্রীকে স্তম্ভ লেগন করেছিলেন। কামগ্রন্থিত চরিত্রার্থ করবার অস্ত্র নয়, প্রজননের অস্ত্রই ব্যাস যৈষ্মন করেছিলেন। সন্তান লাভের ইচ্ছা অত্যন্ত স্বাভাবিক এবং বহিঃ একবারেই সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে যায় তবে পুনরায় সন্তানগের না লিপ্ত হওয়াই উচিত।

“মহু প্রথম সন্তানকে বধিক এবং বাকীদের কামল বলে উল্লেখ করেছেন। লক্ষ্যে দেখে সন্তান লক্ষ্যে এই নিয়মই আছে। এবং ঈশ্বর নিয়ম ছাড়া আর ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনই নিয়ম পালন।”

এ বিষয়ে নিজের আদর্শ দিয়ে গাঙ্গোত্রী বলেছেন “বনে রেখে, আমি বন বা’র প্রতি (কস্তুরবার) কাম দৃষ্টিতে দেখা স্ত্রীকে করলাম তখনই আমি বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দের সন্ধান পেলাম। যে সময় স্বামী পূর্ণ সুখ ছিল সে সময়ই আমি পূর্ণ সংযম পালনের প্রতিজ্ঞা করেছিলাম। আমি জান লাভ করেছিলাম যে আমার সন্ত সন্তানেই এক পবিত্র বিশন নিয়ে কস্তুরগ্রহণ করে। আমার বিবাহকালে আমি সে বিষয় কিছু জানতাম না। বধন আমার জ্ঞান হল তখন আমি সুখে-পারলাম যে আমি যে বিশন নিয়ে করেছি বিবাহ তা সাধনে বাধ্য দিতে না পারে। তখনই আমি সত্যার্থকে চিন্তিতে শিখি। আমারের জীবনে সত্যতার স্তম্ভ তখনই এসেছিল বধন আমার প্রতিজ্ঞা করলাম। বধিও বা’কে দুর্বল মনে হত, কিন্তু তার শরীরের গঠন বদ্ব্যন্ত ছিল। তিনি ভোর হতে বাড়ি পূর্ণ গৃহকার্য করতেন। তিনি

যদি আমার কামনাটাই হয়ে যেতেন তবে তাঁর দ্বারা নিঃসৃত এই কাণ্ড সম্ভবপর হত না।”

চক্ৰবর্তীর সিঁহাতের পাখিটার পর বাগানের বিধি আছে। কিন্তু গাজীজী পাখিটার সংবাদ দামী তাঁর মিলন যতদূর সম্ভব জুগু করে দিতে চেয়েছেন। এই তাঁর আশ্রয়। তিনি আরো লিখেছেন “কিছু আমি বিলম্ব জান লাভ করেছি। এর অর্থ এই যে আমি কিছু বৎসর-কাল বিবাহিত জীবন বাহিত করেছি। তোমরা এই দিক দিয়ে নোভাগ্যবানী যে দিক সময়েই তোমাদের জাগ্রিত করা হচ্ছে। যে সময় আমার বিবাহ হয়েছিল সে সময় পরিস্থিতি সম্পূর্ণ এর প্রতিকূল ছিল। এখন তোমাদের অল্প পরিস্থিতি বতস্বর ভাল হওয়া সম্ভব ততদূর ভাল আছে।”

সকল নেই যে তাঁর আশ্রয় অত্যন্ত সাধুজীবির আশ্রয় কিন্তু সাধারণ লোকদের উপর এ আশ্রয় পালনের উপলক্ষ নিতান্তই অসম্ভব কারণের পরিচায়ক। হরত গাজীজী

তাঁর কান্ডের সেই গল্পই বলেছেন—“প্রবন্ধক হওয়া দিক নয়। যে কাল তোমার দ্বারা হওয়া অসম্ভব তা সম্পন্ন করার ব্যর্থ চেষ্টার নিজের দ্বারা নষ্ট কখনো না। দ্বারা দ্বারা দ্বারা নষ্ট হয় তা সংঘের পর্যায়ে পড়ে না। বাস্তবিকভাবে সংঘর্ষ ব্যক্তি নিজের অধিকতর বলশালী হতে থাকেন এবং তাতে তাঁর শক্তি লাভ হয়। আত্মসংযমের প্রথম সোপান বিচার সংঘ। নিজের সীমা সংঘে চেনা লাভ হয়। আমি তোমাদের নিকট সমুদ্রে আশ্রয় তথা উপযুক্ত দৃষ্টিকোণের সন্ধান দিতেছি। এই দৃষ্টিকোণের সাহায্যে বতস্বর পৌছাতে পার ততদূর অগ্রসর হও, কিন্তু যদি অসম্ভব হও তাঁর গল্প চূড়ান্ত বা সঙ্কীর্ণ হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি কেবল এই কথাই বলেছি যে বিবাহ একটি পবিত্র কার্য।”

গাজীজীর বিচার বৃদ্ধ প্রকৃতির বিচারের মত হলেও তিনি তাঁদের অপেক্ষা কিছু অধিক ব্যবহারিক বিচারশীল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আল্লাকান

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বাহ্নতি]

লুণের ব্যস্ততা নতাই ভালো। ছুঁদিনের মধ্যেই আকিরাণ দ্বারা স্রবণে ছুঁটে সেগো। রিলিফ অফিসার নিজের পাড়ি করে গায়ের টেল দিয়ে কতের পরিমাণ দেখে বেড়াচ্ছেন। তাঁর অল্প কোন রকম ক’রে পাথরের কুঠি আর বাটি দিয়ে রাজা দেয়ানত করা হয়েছে। পুনের-বদলে কাঠের তক্তা। শক্ত সেস্তান গাছের ভাঁড়ি। তার দইতে পারবে।

রিপিক অফিসার উঠান টিনের বাংলোর এসে উঠলেন। আসে পাশের মধ্যে পোরবিন গাঁটাই একটু

উঁচু। অলে বিশেষ কতি করতে পারে নি। কিন্তু তাহলে কি হয়, হুঁ করে চার দিক থেকে লোক এসে চুকেছে এখানে। মাঠে মাঠে ছাউনি টাঙিয়ে থাকতে শুরু করেছে। এরও বিহিত করা দরকার। হেড-কোয়ার্টারে কিরে দিয়ে মোবাক্ক করতে হবে।

লুণ পেই কবাটা পাড়লো। সাহেব তো যাচ্ছেনই শহরে, লুণ পে যদি লগে যেতে চায়, অসুবিধে হবে কিছু!

‘কিছু যায় না’ রিলিফ অফিসার নজা থেকে হুঁ

তুলে চাইলেন) 'কুঁবি চলো আমার সংগে। একটু
বুঝে বুঝে বেঁচে হবে কিন্তু আর কোন অশ্রুবিধা হবে না
তোমার।'।

উঠান টিন বাকী হলেন। সাহেবের হোকারেতে
ছেলেকে কেড়ে নিতে তিনি ঘোটেই গররাখী নন।
যে ব্যাপার হ'রে আছে, বাস বাসেকের মধ্যে গরর
গাড়ী চলাচল করবে কিনা বলা যায় না।

লুন পে রওনা হয়ে গেলো।

অকিরাণে পৌঁছেই কমল বোসকে চিঠি লিখলো
একখানা। দেরীর কারণ জানিয়ে আর কবে সে
পৌঁছেবে সে বকরও নিলো। দু দিন পরে আহাৎ।
দুটো দিন উকিলের বাড়ীতে কাটাতে হ'লো।

কেন্দ্রনে নেবে লুন পে হত্যা হ'লো। আশা
করেছিলো যেটিতে হত্যা কমল বোস থাকবে। কিন্তু
জেটি ফাঁকা, অতঃপর চিত্তিত কেউই হাফির নেই।

হোটেলেও খালি। গেটের কাছে সোলোমন
সাহেবের সংগে দেখা হ'লো। বিশিষ্টি ভদ্রসূত্রী গাছের
নীচে বই হাতে করে বসে রয়েছে। লুন পেকে বেঁচে
চোখ তুললো, 'কি বকর? চলে এসেন? হোটেলে
কত জন কেমন করছিলো হুজি?'।

লুন পে হাড়াগো, 'না ভা নয়, শুধিকে ভীষণ কুটি
জর হ'রেছে। আশে পাশের গাঁ জুড়ে গেছে। বলে
মলে লোক আমাদের গাঁয়ে এসে উঠছে। এবার অশ্রু
বিহীন আরক্ত হবে হত্যা। তাই সরে পড়লাম।'।

কথা শেষ করেই লুন পে অপ্রস্তুত হ'লো। সোলোমন
সাহেবের ওর দিকে খোয়াগত নেই। এর করেই সে
নইরের দিকে কুঁকে পড়েছে।

লুন পে এগিয়ে গেলো।

বিকেলের দিকে কমল বোসের বাড়ীর দিকে রওনা
হলো। ওয়া-মৌগিনি চলেই গেছে বোব হর। নরত
চিঠি পেয়েও দেখা না করবার লোক তো সে নয়।

লনেই কমল বোসের সংগে দেখা হ'বে গেলো।

কাউ গাছের তলার ঘাসের ওপর পা ছড়িয়ে উণ্ড হ'রে

ভরে কি একটা বই পড়ছিলো, লুন পেকে ঘেঁষেই ধড়মড়
ক'রে উঠে পড়লো, 'আরে আমুন, আমুন, বেশ লোক
বা হোক।'।

'কড়মলের জর রাঙাখাট সব জেলে' গিরেছে, তাই
আসতে দেবী হ'রে গেলো।'।

'সে সব আপনার চিঠিতে পড়লাম।' কিন্তু একটু
আগে দিতে হয় চিঠিটা। আপনি আর আপনার
চিঠিতো একই আদ্যে এসে পৌঁছলেন। আপনি বোব
হর আগেই পৌঁছেছেন কারণ এই একটু আগে শিরন
আমার চিঠি দিয়ে গেলো।'।

লুন পে হেগে কমল বোসের পাশে বসে পড়লো।

'আপনারা বাম নি মৌগিনি'।

'এক ব্যাচ আগেই চলে গেছে। কিছু গুরুত্বপূর্ণ
আগাধ ক'রে এই কয়েক দিনের মধ্যেই রওনা হ'বো।
আম্বর্ষ ব্যাপার সেখান, জুঁবি হ'লে বেবার কো দিনের
পোরে নাচের বল এলো, তা সে কি ভীষণ ভীত। হ'লে
ভিল ব্যরণের স্থান নেই। কত টাকার যে টিকেট বিক্রী
হ'রেছিলো তার হিগেব কত ব্যার না, কিন্তু আমাদের
এই ব্যাপারে চেনাখানা ব্যার কাছেই থাকি, তিনিই
কোন না কোন গুরু দেখাচ্ছেন।'।

'এতো পুরানো কথা। ভালো কাজে উণ্ড হুজ
করাই লোকের চিরদিনই অভাব।'।

'হুক শিরকে মনে আছে তো আপনার' কমল বোস
আচবকা এর করলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে আছে বৈ কি। আমাদের ক্লাসের
হুক শির। বিখ্যাত ব্যায়ামবীর?'। লুন পে হাসলো।

'হ্যাঁ দেও গেয়ে এখন ব্যাচে। কাতের জেলে,
ওখুখের মোকানে বুঝে বুঝে অনেক ওখুখ আগাধ
করেছে। চীনেপটিতে কোন মোকান বাগ-মেহ মি।'।

'হঠাৎ সেখানজের মেহাল হলো যে?'।

'আউডিয়াটা মৌলিক নয়, মিথির কাছে ব্যার করা।
ওদের শুই দক্ব একটা সেবা লম্বিত আছে। গাঁয়ে
গাঁয়ে গিরে লম্বিতের লোকেরা সেবা-জুজ্বা কত
লোকের, নিরক্ষরবেদ সেখাপড়া সেখা, আর বা সেখা

ভাতো হুঙেই পারছেন।'

'আপনার দিদি কেমন আছেন?'

'কি জানি, হেঁচন ছাড়বার পরে, তার তো আর কোন খবরই পাইনি। দিদি ওই বরপের। পিছনে বাগের ফেলে এসো, তারের কথা ভাববেও না একবার। পিছন ফিরেও চাইবে না।'

'আপনার দিদিকে আমার খুব ভালো লাগে। ওই বকম বেয়ে বসি আমাদের ঘেঁষে থাকতো।' শুন শে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়লো।

'কিন্তু তৈরী হ'লে, ভালো বীজ পড়লে তবে তো হ'বে ভালো ফল, কি বলুন?' কমল বোস হাসতে হাসতে বললো, 'দেখছেন তো কে কত বেনী নামের সুগি পরবে আর কার দেন্ট কতো উগ্র এই নিয়েই ব্যস্তি। সুখে তানখা শেষে পোরে নাচের প্রথম সারিতে গিয়ে বসবে বাস এই তো এদের নারী-জীবনের চরম সার্থকতা। অথচ আপনার ঘেঁষে বেয়েরা আমাদের ঘেঁষে বেয়েদের চেয়েও খালসী, অনেক বেনী করোয়ার্ড। আবরর বালাই নেই, লবঙ্গের বাধন নেই, এগিরে আসার এদের কতো সুবিধে!'

'সত্যি এরা যেন বেশ সবচেয়ে ঘোটেই সচেতন নয়।' শুন শে গলা কণ্ঠ শোনালো।

'আপনারেই তো এদের হাত ধরে এগিয়ে আনতে হবে। গাড়ি ক্রান্তে হবে পাশাপাশি। আমার দিদি কী বলে আনেন?'

'কি?'

'দিদি বলে, বাড়ীতে আগুন লাগলে মেরে পুড়ন সবাইকেই রাজ্যের এসে গাঁড়িতে হয়। বাইরের লোকেরা কি বললে তাই তেবে অলস বরের মধ্যে খোঁচা টেনে তো আর বসে থাকা যায় না।'

শুন শে কোন উত্তর করলো না। এতদিনে হৃদয় বা শিনদের খর ছাওয়া হয়ে গিয়েছে। কড়ালোর অভ্যাচার থেকে নিরাপন করে ফেলছে তারের আশ্রয়।

আর তার নেই। কিন্তু বরের চালে আগুন লাগলে যা দিনও কি দুহাতে পারবে নিশ্চিত। ছুটে বাইরে আসতে হবে না তাকে? আগুনের খাঁচে সমস্ত শরীর তেতে লাল হয়ে উঠবে!

'আনেন, বাবার সংগে আমার একটু মন কথাকথি হ'য়ে গিয়েছে।'

'তাই নাকি?' কমল আন্দর হ'য়ে গেলো, 'কেন বলুন তো? কি নিয়ে?'

'এই বয়সে লেখাপড়া করা ছাড়া অস্ত্র সব এমিক ডমিক চিত্রা করাও পাশ। ঘেঁষে কথা ভাববার লোকের অভাব নেই, এলব ভাবনা করার আনন্দের কোন প্রয়োজন নেই।'

কমল বোস হুচকি হাসলো। 'কোন কথ বললো না।

'সেই অস্ত্রই আরো সোয়েবিন ভালো লাগলো না। যে কটা দিন ফিলার বাবাকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে হ'তো। কি জানি কি কথা কি কথা এসে পড়বে, হরত কট করে কিছু বলেই ফেলখো।'

'সত্যি, বড়রা এলব নিয়ে মাথা ঘামাতেই চান না। আর কোন কারণে নয়, তাঁদের রক্তেও একটা স্থবিরতা এসে যায়। নিশ্চিৎ আরো ছেড়ে আর কিছু কথ চিত্রা করার কষ্ট স্বীকার করতে চান না। কিন্তু বড়রাও ভাবছেন না, হোটেরাও ভাববে না, ঘেঁষে কথা ভাবলে কে ভাববে বলুন তো? ইংরেজদের তৈরী শিক্ষার কাঠামো, সেই অস্ত্রই দেখানো হয় ভাতাদের রাজনীতি আলোচনা করা পাশ। আর বড়রা ইংরেজদের সেওরা কাকরির আফিংএর গুলি খেয়ে বুন হ'য়ে আছে। কামেই ঘেঁষে কথা বেশি চিত্রা করবে, কি বলেন?'

শুন শে হাঁটুর ওপর সুখ রেখে কিছুক্ষণ ব'লে হইলো। সমস্ত যেন অট পাকিয়ে গেলো। রানি রানি চিত্রা। যে শিক্ষা বাস্তবকে ওদেরই গোলান ক'রে তোলে কি বরকার সে শিক্ষায়? ওদের বাধা হুঁক

আউতে পরীক্ষার পাশ ক'রে ওদেরই চেয়ারে বসে চাকরি করতে হবে—এট ভো জীবনের পরিধি। তার চেয়ে আত্মপ জলে উঠুক—দেশের এ গ্রাম থেকে ও গ্রাম পর্যন্ত বিরাট সাহায্য। সেই আশ্রমে ওদের তৈরী খোলস পুড়ে ছাই হয়ে থাক। সত্যিকারের আলস বাহুবা জেগে উঠুক।

‘আপনার বাবা এ বিষয়ে কিছু অ্যালোপ করেন না?’
 লুন পে জিজ্ঞাসা ক'রে বললো।

‘হ্যাঁ, করেন বৈকি। তিনি বলেন, শুধু হাঁকাহাঁকি ডাকাডাকিতে কিছু হবে না। দেশের শিকড় ধরে সলোয়ে নাড়া দিতে হবে, তবে বসি বুঝ তাকে। গোলামীর নেপা রক্তে গিয়ে মিশলে, সচেতন করা পুই কঠিনায়া।’

‘এ দেশের ভবিষ্যতের কথা কিছু বলেন নি? কোন দিন আগবে এ দেশ?’

‘আগবে বৈকি নিশ্চর আগবে?’ কমল বোস সোজা হ'রে বললো। ছুটো হাত দুটো ক'রে হাঁচুর ওপর চুকতে লাগলো, ‘বাবা বলেন, ফুংগীরা নয়, আমরা—দেশের সংসারী লোকেরা বাতা দেশের হুং-কটের মধ্যে অড়িয়ে রয়েছে, তারাই একদিন ঠাড়িয়ে উঠবে মাথা উঠু করে।’

সবই বুঝলো লুন পে। কিন্তু ক'বে, ক'বে আসবে সেই মহাআগরণের দিন। যেদিন সারা দেশে ঢাবী, মজ্ব, মিজি বা কি, ছেলে ফুটো সবাই মেলসও সোজা করে আঙুলগুলো চোখে একসঙ্গে জেগে উঠবে। বলবে দুটো করা হাত আকাশের দিকে ফুটে ‘তোবামা, তোবামা।’

অঙ্কুর হ'রে আসলো। কাউ গাছের পাতার ঝাক দিয়ে রাত্তার আলো লনে এসে পড়লো। লুন পের চমক ভাঙলো। রাত হ'রে গেছে।

‘এবার উঠি।’

‘চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।’ কমল বোস উঠে ঠাডালো।

‘আপনার বাবার সাথে দেখা ক'রে গেলে হ'তো।’
 লুন পে ঠাড়িয়ে পড়লো।

‘বাবা, নেই এখানে।’

‘নেই, কোথায় গেছেন?’

‘আমাদের দেশে, মানে বাংলার গেছেন ছুটির মধ্যে।’

‘হুঁহু?’

‘অবশ্য আমাদের বলে গেছেন ওঁর এক্সপেরিয়েন্টের কি একটা ব্যাপারে বাংলার ছ একজন কেমিস্টের সংসে আলোচনা করবেন কিন্তু আমার মনে হয় সেটা আগল কার্য নয়।’

‘তবে?’ আলস কারণের কন্তকটা আন্দাজ করতে পারলেও, লুন পে জিজ্ঞাসা না ক'রে পারলো না।

‘দিকিকে দেখতে গেছেন। দিকির একখানাও চিঠি না আসতে উনি খুবই চিন্তিত হ'রে পড়েছেন। অবশ্য মুখে কিছুই বলেন নি। কেবল একদিন বারাবার পারচারি করতে করতে খেলে আমাকে বলেছিলেন, ‘কমল, এটা কিন্তু অস্তায়। তারি অস্তায়। নিজের আত্মীয়-স্বজন সবাইকে ছেঁটে ফেলে কেবল দেশকে ভালোবাসা।’ তারপরে একটু খেবে বলেছিলেন, ‘দেশ বড় হিংস্রটে দেবতা। অস্ত কাককে ভালোবাসার দ্বারাও যদি তার গারে পড়ে ছো কেপে যায়। বলে, আমি ছাড়া তোমার আর কেউ নেই। তোমার রক্ত বাংলা আমি, তোমার মজ্বা কেবল আমি। তোমার চিত্রা আমি, তোমার কামনা আমি। এ পৃথিবীতে আর কেউ নেই।’

কমলের ভারী গলার আঙুরায়ে চমকে লুন পে হুং তুললো। কমল কান্দেছে। গাল বেরে আলের দ্বারা গড়িয়ে পড়ছে। বাতির আলোর ছুটো চোখ চক চক করে উঠলো। আন্দাজ, হাত দিয়ে কমল বোস চলটা মুহুৎ নিলো না। শুধুমনি ভাবেই লুন পের পাশে পাশে হাঁটতে লাগলো।

‘অনেকখানি চলে আসার পর লুন পে জিজ্ঞাসা

করগে, 'আমরা মৌলভিন করে রওনা হবো'।

'ওদের বাড়ি থেকে এতটা চিঠিও অপেক্ষার হয়েছি। বাড়ীর বন্ধোত্তর করে আনাকে চিঠি লেখবার কথা। বোধ হয় আজকালের মধ্যেই চিঠি পেরে যাবে।' মাসে বহুত দিন, দিন পাঁচ ডয়ের ভেতরেই আবারের রওনা হ'তে হবে।'

চৌরাস্তার মোড় অবধি এসে কল দাঁড়িয়ে পড়লো। 'কাল সময় হবে আপনাব'।

গুন পে কিরে দাঁড়ালো, 'হ্যাঁ, অটল সময়। কেন যখন তো'।

'আমি তো একলাই আছি। দুপুরের বিকে আশ্রয় না। আবার এখানেই থাকব। কালার বাসাব নানা একটু চেপে যাবেন।'

'বেশ তো। নিষ্ঠুর আসবো'। গুন পে চলতে শুরু করলো।

দিন চার পাঁচের মধ্যেই হুক শিবের কাছ থেকে কল বোল দীর্ঘ এক চিঠি পেলো। কলেরার একোপ ক্রমশই বাড়তে। লোকের কুলিয়ে ওঠা যাচ্ছে না। গুরু পত্রও কম পড়ে গেছে। এত দুঃখের মধ্যেও আনন্দের কথা শুধু এইটুকু যে এক বাড়োমায়ীর বিরাট এক বাগানে বাড়ী পাওয়া গেছে। কর্মীদের থাকবার যে অগ্রবিধা হচ্ছিলো, সেটা দূর হ'য়েছে। কল বোল কিছু গুরু কোলাজ করে বিতার মলকে নিয়ে রওনা হ'তে পারে।

জন যখনক। আরো বেশী ব্যবার কথা ছিলো। কিছু শেখ মুহম্মদ' অনেকেই নানা অভিযার পিছিয়ে পড়লো। কাজের বাড়িতে অগ্রুণ, কাজের বা-রেজাই নবীর ব্যাপার হ'য়ে উঠলো। মলের মধ্যে কয়েকজন গুন পের ভালেসই ছেলে। অ্যাপো না থাকলেও, হুক চেনা ছিলো। বাকী অনেকেই কাইয়ের লোক।

সালুইনের কোলে মৌলভিন শহর। এপাও রাটাবান ওপারে মৌলভিন। উঁচু সাহাড়ে কোল ঘেঁষে পাড়ার কককে ককতকে ছোট শহর। কলেবা

ওক হয়েছে শহরে নয়, শহরের দশ মাইল দক্ষিণে গ্রামের ভেতরে। জেটিতে তিনজন ছেলে এসেছিলো ওদের নিচে। সকলেরই বুকের ওপর কাপড়ের ব্যাচ। কল রংয়ের জমির ওপর নীল রংয়ের মন।

বাকবার জায়গাটা গুন পের খুবই পছন্দ হ'লো। অনেক একর জমি নিয়ে বিরাট বাংলা। এখানকার লোকে বলে 'বগুন বাঘের বাগিচা।' বাংলার নামনে ছোট আকারের লোক। লোকের পাড়ে মরুভূমী স্থলের বাড়।

কথাটা গুন পের আগেই মনে হ'য়েছিলো, ভতে ব্যবার সময় সে কলকে জিজ্ঞাসা করলো, 'হঠাৎ মগুনরা এতো বড়ো বাড়ীটা যে কেড়ে গিলেন আবারের জন্ত'।

'সাবে কি আর দিয়েছেন' কল বাড়ির ওপর বসে বললো, 'যে গ্রামে কলেবা শুরু হয়েছিল সেটা যে ভঁরই অধিনায়ী। যা লোক বরছে, তার চেয়েও বেশী লোক পালাচ্ছে যা কেড়ে। কানেই বাজনা পত্রের অবস্থা কমেই ব্যাপার হয়ে আসছে। আবারের সংগে সন্ত' আমবা গাঁয়ের লোককে হুঁরিয়ে গুনিরে রাখবে ওখানে। রোহীসের সেবা করে বাড়ী করে কুলবে। মনে এককথার বাতে মগুনরাবের বাজনা আবার একটা পরগাও না ক'বে সেমিকে সঙ্গা গুটি রাখতে হবে।'

হুক শিবও বলেছিলো, 'অতের ভেতর। গাঁতে গাঁত চেপে সে বলে উঠলো, 'পরতান লোক। কি করণো সবাই যে ব্যাপ করলো নইলে ওইই বাংলার লেকে ওকে চুনিরে রাখতাব।'

গুন পে আর কল দুজনেই হেসে উঠলো। কল বললো, 'কিন্তু হুক শিব, আপনি এই ভাবে জনসেবা শুরু করলে তো মৌলভিনের বাসিন্দাদের পক্ষে ওদের কথা।'

'জন সেবা টেনা বুজিনা বশাই, কি হতভাগা লোক। গ্রাম বখন দু একঘনের রোগ আচ্ছন্ন হ'লো, গিরে বললান, কিছু সাহায্য করুন, আবারের মল বিশেষ

নেই, এইবেলা চিকিৎসা করতে পারলে রোগটা আর
হত্যাশে না। মগনরায় ছেঁটে একটা তাকিয়া কোলে
নিরে দুসতে দুসতে বললে, 'ওখ শত্রে কি হ'বে?'
মাত্রকে পরমাত্র কি আর দিতে পারবেন? যে
দুঃখের রোগ হয়েছে, ওরা সরলসেই ভালো বশাই, হ
সতে মাস একটা পরমা ভাড়া দিচ্ছে না। চাইতে
পেলেই ইমিটে বিনিরে দুঃখের কথা বলে। তার পরে
রোগ বখন আরো হত্যাশে, গিরে বললাম, 'আপনার
কাংলোটা দিন না, হানপাতাল করবো। এবানকার
হানপাতালে তো আর সিউ নেই, বস্তির মধ্যে
চিকিৎসারও খুব অজবিবা।' ততলোক চমকে উঠলো।
পাশে রাখা পেলি কাটা কোঁতা একটা ছুঁকি কুণে নিয়ে
আমার হাতে দিবে বললো, 'তার চেয়ে দিন গলার
কসিরে দিন। এমনিতেই ভগবান মেরেছেন। এক
পরমা আবার নেই, তার ওপর সাহেব সুবো বাবে বাবে
ওই বাংলাটা ভাড়া দেন, সেটিও আপনারা বন্ধ করতে
চান।' সেদিন দাঁতি ইচ্ছা হয়েছিলো, বা থাকে কপালে,
ওই কোঁতা ছুরি দিয়েই লবাই করি লোকটাকে। এগ
লোক বতো কমে যায়, ততই ভালো।'

কুক লিম রাগে দুসতে লাগলো।

কমল বললো, 'আমেন এই সব ধরনের লোকদের
জন্মে এদেশে ভারতীয়দের নাম রাখান হ'য়ে যায়।
বিনেশী ইংরেজদের যে চোখে দেখে আমাদেরও সেই
চোখে দেখে। এদেশের লোকদের গুঁড় বারমা হয়ে বার
আবরা ইংরেজদের সংগে হাতে হাত বিলিয়ে এদেশে
পা বিবেছি। আমরা শুধুনা পাতার তুল জড়ো
করছি আর ইংরেজরা বেশলাইয়ের কাঠি জালাকে
ভাতো। সবজ দেশটা জগৎ করার হুলে রয়েছে
আমাদের যৌগ বড়বয়.'

'কিন্তু আসল কপাটা এদেশের লোককে কেউ কি
বোঝাতে পারে না। বোঝাতে পারে না সব ভারতীয়ই
এই রকমের নয়। এমন অনেকে আছে যারা এদেশের
লোকের মতনই ভালোবাসে এদেশকে। সত্যিই

এদেশের মঙ্গল চিন্তা করে' মুন পের গলা।

'যাতে সে রকম কিছু বোঝাবার অবদর না পায়, তার
চোঁটও চলেছে' কুক লিম উঠে দাঁড়ালো।

'কি রকম?'

'প্যাগোভার বাতাসে, গ্রায়ে গড়ে ফুগিয়া
বোঝাতে শুরু করেছে ভারতীয়রা এদেশের শত্রু।
ভাদের সংগে মেলাও পাপ। আলাদা বেশক-ওরা
আলাদা মজ্জা। ওদের ভাগ্যেই সংগে নিজেদের ভাগ্য
জড়ালে বহীরা নিজেদের অঙ্গলই, জেকে আনবে।
আচারে, বিচারে, চাপচাপে, সভ্যতার মাগকাঠিতে
ওরা অভ গ্রহের বাসিন্দা। সেইজন্মে বর্মার মত
হাফনৈতিক সভা দাবী করা উচিত। তারতবর্ষ আর
এদেশের মাঝখানে বিচ্ছেদের প্রাচীর তুলে দেওয়া হবে,
যাতে ওদেরই খোলমাল এদেশের লোকের কানে এসে
না পৌঁছাতে পারে।'

কুকলিম ঘেঁষিয়ে গেলো।

সাত হ'য়েছে। লোকের পাশে যাচ্ছে মধ্য থেকে
একটানা কিঁকির আওয়াজ।

মুন পে তরে পড়লো।

কিছুক্ষণ খুঁট বাট আড়খাচ্ছে মুন পের মনে হ'লো
কমল বোল ব'লে রয়েছে খাতিয়ার ওপরে।

'কি খুব আসছে না আপনার?'

'বা মশার অভ্যাচার। খুব আসাই মৃগিল।'

'এত বড় একটা কাঁকে নেবে শেষকালে মশার
কাষকের নালিশ জানাচ্ছেন?'

'মশার কাষকের নালিশ জানাচ্ছি না তো, মকে মকে
যে গান শোনাচ্ছে, তাতেই আমার আগতি।'

অনেকক্ষণ দুজনে চুপচাপ।

সত্যিই মশার বেশ উপদ্রব। মুন পে কখনো কান
অবধি টেনে দিলো।

'কুক দিমের কথাগুলো শুনলেন? কবলের গলা।

'হ্যাঁ, শুনলাম বৈ কি?'

'আমার মনে হয় বহীরা আর কালাদের মধ্যে তেল-

নীতি আগিরে দেবার অল্প ওয়া আশ্রয় চেষ্টা করবে। ওরা বুঝতে পারছে, ভারতবর্ষের আকাশে যে আশ্রয় মলে উঠেছে, তার ফুলকি এদেশেও ছড়িয়ে পড়বে।

‘কিন্তু কাগজের মাগে দুটো দেশের দামধানে যেটা লাইন টেনে দিয়ে সে ফুলকি ওরা আটকাতে পারবে? মাটির সংগে মাটির যে খোপ কা ওরা ভাঙবে কি করে? ভূমিকম্পে ভারতবর্ষের মাটি কেঁপে উঠলে এ দেশের মাটি নিশ্চয় ঝাকতে পারবে কখনো?’

‘সাহা দেশ জুড়ে কিন্তু একটা প্রচণ্ড সোলমালের সৃষ্টি হবে। এ খেলার ওরা কত পাকা, তাতো ভালোই জানেন।’

‘কিন্তু’—কি একটা বলতে গিরেই লুন পে খেবে গেলো।

‘কিন্তু—কি?’

‘ভাবছি সাপুড়ের বানীতে বার বার কি সাপ নাচে? মাতে নাকে স্রব কেটে গেলে ছোবলও তো বের। তখন সাপুড়ের পুরোশো নরও কিন্তু বিশেষ কাজে আসে না।’

কমল বোল কোন উত্তর দিলো না। বুঝিরে পড়েছে বোধ হয়। লুন পে চোখ মুছলো।

দূর থেকে লুন পে বতটা ভয় পেয়েছিল, কাজের মধ্যে ঢুকে ওরা অনেক কমে গেলো। তা ছাড়া অনেক-গুলো ডাক্তারেরও সাহায্য পাওয়া গেলো। লুন পের শুধু অসুবিধা হতো রোগীর আত্মীয় স্বজনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে। রোগীর শিরের বটোর পর বটো সে বেশ বসে থাকতে পারতো, কিন্তু সরকার কাচে ভীড় ক’রে দাঁড়ানো রোগীর আত্মীয় স্বজনের অনেকগুলো ভয়ানক চোখের দিকে নজর পড়তেই ওর গা শির শির ক’রে উঠতো।

‘শেয়া, আমার বাবা ঝাঁকবে তো। আমারের আর কেউ নেই পৃথিবীতে’ ক্যালফোর্ন ক’রে চেয়ে বাবা মেয়েটির স্তূতির সামনে থেকে লুন পে পাপ কাটির লহে যেতো।

‘হ্যাঁ, হ্যাঁ। সাহায্য বৈকি তবে কিছু নেই।’ লুন পে শোশন দিরে হাত বুতে বুতে আলগায়ে বসতো। লুন-পের আরো অসুবিধা হতো, চাটাই জড়ানো মুভমেবের ওপর কচি কচি শিশুগুলো চীৎকার ক’রে বখন কাঁপিরে পড়তো।

‘কোণার বিবে বাছো। নাকি। না, না, কিহিরে দিরে বাও, কিহিরে বিবে খাও।’

লুন পে একপাশে সরে গিয়ে আঁধানে চোখ মুছতো। ফুৎ লিম এগিয়ে আসতো এই সময়টা। সাফনা দিতো কচিকলোকে, বরতনের উপদেশ দিতো। বিদ্যাবাহু কিছু একটা ক’রে ভাঙা সংসারের জোড়াতালি দেওয়ার চেষ্টা করতো।

দু এক লম্বা রুটি হস্তার সংগে সংগে কলোরার একোপটা অনেক কমে এলো। লুন পে’দের কাজ ও কিছু কম। এই ভাবে আর দু একদিন রুটিটা চললে, বস্তিগুলো এবারের মতন বোধ হয় বেঁচে যাবে।

কমল বোনেরও তাই মত, ‘এ বছরের মতন কলোরটা কমলো বোধ হয়, আমার সেই আগসে বছর বদি হয়।’

‘কি বছরেই হয় নাকি?’ লুন পে আশঙ্কি হয়ে গেলো। ‘ভবে?’ ফুৎ লিম হাসলো, ‘গাওয়ার সমারোহটা দেখতে হবে তো। যা যাটা মাইনে পার মিল থেকে, তাতে এক হেলাই ভাত জোটে না। বত অখাত গিলেই তো এই যোগ ভেকে আনে।’

‘এদের কথা কেউই ভাবে না।’ লুন পে ফুৎ লিমের দিকে চেয়ে বললো।

‘হ্যাঁ, ভাবে বৈকি’ কমল বোসের গলা বৈতরনী পারে এক তরলোক বজ্র ভাধেন। বিরাট খাঁড়া উটে কেবল এদের নামের ওপর নম্র বোলান।

‘সত্যি করনা কহা বার কোন স্থানীন সেপে ফুৎ লিমের মতন এমনি ভাবে গাধা গাধা লোক সহজে। তবু তো আপনাদের হৈ চৈ চীৎকারে ডাক্তার বস্তির সাহায্য মিললো, নরও অসুখ। যে কি জ্ঞানক হতো জোবাই বার না।’ লুন পে উঠে আনবার বাবে গিরে দাঁড়ালো।

‘মিলের দালিকদের ব’লে অন্ততঃ যদি এদের থাকার ব্যাবস্থাটাও ভালো হয়, তা হ’লেও অনেকটা ঝাটোয়া। তম্বোরের বোঁরাড়ের মতন ফুঁকিতে আলো নেই বাতাস নেই, ঘুর্ণন্ত অন্ধে দিনের পর দিন কি ভাবে এরা কাটার জীবন্তও ভয় হয়।’ কমল বোস খুব আস্তে কথাগুলো বললো।

‘বব্বের কাগজের পাতায় এরাই কিছু ভাবির মেক-মন্ত’ হুস লিম হুচকি হাসলো, ‘কিন্তু এই বেকমন্ত যে কতো ঝাটো তা যদি আমাদের রাজনৈতিক নেতারা চোখ খুলে একবার দেখতেন।’ কথার সংগে সংগে হুস লিম সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে গেলো। বিকেলের দিকটা গর ভিউটি।

লুন পের এ বেলা ছুটি। সকালের বিকে গর ভিউটি ছিলো। কমল বোসের সংগে বেড়াতে বেড়াতে লুন পে জেটির দিকে রওনা হলো।

নিচরস সাহুইন। ঝোলাটে জল—শান্ত আর নিস্তেজ। দু একটা জেলে ভিগি। ওপায়ে বাঁটখান দহর অস্পষ্ট দেখা গেলো। লুন পে আর কমল বোস জেটির দার ঘেঁষে বসলো।

‘বাংার চিঠি পাই নি অনেক দিন’ কমল বোস বললো। কমল বোসের কথার লুন পের খেয়াল হলো। তাইন্ত, তারি অজ্ঞার হ’য়ে গেয়ে। পোরবিন ছাড়ার পরে আর চিঠিই লেখা হয় নি উচান টিনকে। নিচর তিনি খুবই উখির হ’য়ে পড়েছেন। আজ রাজেই চিঠি একটা লিখে ফেলতে হবে।

কমল বোসের কাছে কথাটা বলতেই সে হেসে উঠলো, ‘চিঠি তো লিখবেন, কিন্তু আপনার চিঠিতে মৌলবিনের চাপ বেখলেই তো আপনার বাবা অবাক হয়ে থাকেন। ব্যাপকে তো আর সত্যি কথাটা ব’লে আসেন নি।’

লুন পের খেয়াল হ’লো। সত্যিই তো ছেলে পড়বার অস্ত রেহুইন কিরে এসেছে কাছেই মৌলবিন থেকে চিঠি লিখলে হাজার সম্বোধের উবর হতে পারে।

এমনিতেই তো উচান টিন ছেলের ওপর বিশেষ খুশী নন। ছেলে বিগড়ে যাচ্ছে এরকম খবর তাঁর কানে পাড়ার ছেলেরা তো আগেই কুলেছে।

‘কিন্তু আপনার মৌলবিনের ঠিকানা আপনার বাবা জানেন?’ লুনপে বিজ্ঞাসা করলো।

‘না, তাঁকে লেখার সময় হয় নি। কিন্তু বাড়িতে বলা আছে, চিঠি এলেই এখনকার ঠিকানার পাঠিয়ে দেবে। দিদির একটা খবরের অস্ত বনটা বড় ব্যাকুল হ’য়ে রয়েছে।’

কিছুকণ চুপচাপ।

জল কেটে কেটে কেঁরি ঈষার এপারে এলে ভিউলো। বাজীর নামা গুঠা। হৈ চৈ। একটি হুগীকে ঘিরে অনেকগুলো লোক কলহব করতে করতে এগিয়ে এলো।

টুকরো টুকরো কথাগুলো গদের কানে গেলো।

‘করার পিছনের বাঁটখাই তো ভালো হবে। অনেক ধানি জারগা আছে আর শহরের বাসবানও হয়।’

‘কিন্তু আবার মনে হয় মিউনিসিপাল অফিসের লাকনে মিটিংয়ের বন্দোবস্ত করলেই ভালো হয়। ও দিকটার কালাবের বসতি বেশী। কথাগুলো ওদের শোনানোই তো সরকার।’

‘বেশি উজেরাওযাতি কি বলেন? এখনও তো দিন চুয়েক বাকি আছে।’

লোকগুলো ছেটির বাইরে চলে গেলো।

‘কিসের আবার মিটিং?’ লুন পে কমল বোসের দিকে কিরে বললো।

‘খুসী এখন সংগে রয়েছে তখন ধর্মের বিবর নিচর দহর’ কমল বোস হাসলো।

‘কিন্তু কালাবের শোনাবার মন্তন কি কথা আছে?’ লুন পে ঠাঁড়িরে উঠলো।

‘এবারের সব কথা তো কালাবেরই শোনাবার। আমরা নাকি ভাঙটাকে নই করে ফেলছি। বোজীরা লাভ সবুজ ভের নদীর পার থেকে এ দেশের উন্নতির অস্ত

যে নিকরান ত্রুত নিয়ে এসেছেন, আমাদের ভুল সব নাকি পড় হয়ে যাচ্ছে।’

‘তুতনে ছোট পায় হ’রে তা’

‘মত লুন পে।’

আচমকা ডাকে লুন পে কিরে দাঁড়ালো। পবিত্রিত গলায় বর। ছোটখি দিক খেতেই কে যেন ডাকলো। এদিক ভদিক চেয়েই লুন পের নজরে পড়ে গেলো। অবগোল পাটারের ছেলেটি ছোটর লোহার শিকল পায় হরে হাত্তার ওপর এসে দাঁড়ালো।

লুন পে এগিয়ে পেলো, ‘আরে আপনি বে এখানে?’ ছেলেটি হাসলো, ‘না, একথা তো আমিই আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে আসলাম? আমি তো এখানকারই ছেলে।’

‘আমরা এখানে বেড়াতে এসেছি। এঁর সঙ্গে আলোপ আছে আপনার?’ লুন পে কমল বোসের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখালো।

‘ছেলেটি কমল বোসের ওপর আসলো নজর বোললো। লুন পের দিকে চের বসলো, ‘পনি একটু আসবেন এদিকে।’

লুন পে এগিয়ে আসলো। এ ছেলেটাকে কোনদিন ওর ডালো লাগে নি। তাছাড়া কমল বোসকে তাচ্ছিল্য করার ধরনটাও ভালো লাগলো না।

‘কি বলুন তো?’

‘না টিন আপনাকে একটু ডাকছেন।’

‘না টিন? কোন না টিন?’

‘আমাদের সঙ্গে পড়ুন। উনিই তো এবারে আপনাকে দেখতে পেরেছেন।’ ছেলেটি হাসবার চেষ্টা করলো।

লুন পে দাঁড়িয়ে পড়লো। একবার তাংলো, কি ঘরকার দেখা করার। স্পষ্ট বলে দেওয়াই ভালো। পূব ব্যস্ত রত্রে, এখন দেখা করার সুবিধা হবে না। কিন্তু তাঁর পরেই যেন হ’লো সেটা ভরজা-বিকল হবে। লামনা সামনি গিরে দাঁড়াতে আর কি ক্ষতি।

লুন পে কমল বোসের দিকে কিরে দাঁড়াতেই কমল বোললো, ‘আপনি বান দেখা করে আসুন। আমি এখানে অপেক্ষা করছি।’

একবারে অলোর বার ঘেঁষে টিমার বাঁধবার লোহার ছোটো টিনি। একটার ওপরে না টিন বলে রয়েছে। বোব হয় অতটর ওপরে সেই ছেলেটি বসে ছিলো।

লুন পে কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই না টিন বুকে বসলো, ‘কি ব্যাপার সোরেবিনের ছেলে মৌলবিনে যে?’

লুন পে হাসলো, ‘সোরেবিনের ছেলে নয়, বর্ষার ছেলে। এ মেসের এতোবটি শহর আর গ্রামে আমাদের সত্যি হড়ানো রয়েছে। আমাদের বড় বড় করে কোন একটা গ্রামে বা শহরে কোনটাটা করে রাখা যায় না।’

‘সত্যি বলুন না’ না টিন মিটি হাসলো, ‘বেড়াতে এসেছেন না?’

‘কিছুটা বেড়াতে, কিছুটা কাজে?’

‘কাজে? এখানে আপনার কি কাজ? এমন কিছু নিরিবিদি শহর নয় যে পড়বার সুবিধা হবেন আপনার?’ না টিনের সাড়াতে হলুৎ ধরের কুলের গোছো। উগ্র সুরতি। লামলক্ষ্যার ধরকে না টিনকে ডালোই দেখালো।

‘বে কাজে এসেছি, তুলে আপনি লাকিরে উঠবেন। এত কাছাকাছি বসতে সাহস করবেন না।’

‘কাছাকাছি বসার সাহস বে কার কস পে কথা আর আল তুলে লাভ কি?’ না টিনের কথার কোথার একটি বোত ছিলো। প্যাগোডার চাতালের ব্যাপারটা আরও বুকি সে তুলতে পারে নি।

‘শহরের দক্ষিণে কলোয়া জল হ’রেছিলো বোঝ রাখেন?’

‘হ্যাঁ, বাসীয়ার চাকরটা বলছিলো। এবার দিকে অনেক লোক যা়া গেছে। সরকারী হাংপাতালের ডাক্তাররা ঝাঁপিয়ে না পড়লে নাকি ভীষণ কাজ হ’তো।’

'সরকারী হাসপাতালের ডাক্তারদের বিচেনোব গবর রাখি না, তবে কলেজ থেকে আত্মা তাদের দেখা করবার জন্যই এখানে এসেছি। 'সর্বনাশ' ধরগোস প্যাটার্ণের ছেলেটি লুন পের পাশ থেকে সরে গিয়ে পাড়ালো। মা টিনের বিকে ছুটো চোখে বড়ো বড়ো করে বললো, 'ভীষণ ছোঁরাচে রোগ আসেন। আর একবার এখানে হ'য়েছিলো, বক্তিকে বক্তি একেবারে লাগাত হ'য়ে গিয়েছিলো। সে বা দুড়িল। বাবার মিলে মজুর পাওয়া যায় না, বাড়ীতে চাকর খোঁটে না, সে এক বিশ্রী ব্যাপার।'

লুন পে ছেলেটির বিকে ঘুরে পাড়ালো। হাসির তান করলো একবার, তারপর ভীষণ গলায় বললো, 'ভয় পাবেন না, এবারে ব্যাপারটা অতো মারাত্মক হতে দিই নি। আপনাবা বাবার মিলে আর আপনাদের বাড়ীতে বোধ হয় এবার আর লোকের অত্যাচরণ হবে না।'

ছেলেটির মুখ দেখে লুন পের কথাগুলো সে যে খুব বুঝতে পেরেছে এমন মনে হ'লো না। এক গাল বেগে বললো, 'বাবার মিল বন্ধ হলেই আবারও সব কিছু বন্ধ হ'য়ে যাবে। কলেজে আর পড়তে হবে না।'

মা টিন চোখ ফুটে চাইলো। লুন পের মনে হলো ওর চোখের পাতাগুলো যেন তারি তারি। গলায় আগরাকণ্ড একটু তিক্তে তিক্তে টেকলো, 'এ সব রোগ নিয়ে ছোঁরাছুরি করেন, বাড়ীর লোকে আপত্তি করেন না?'

লুন পে আবার হাসলো, 'বিপদের সময় নিজের ভাই বোনদের ছোঁবো এতে তো কারুর আপত্তি হ'তে পারে এটা ভাবতে পারি নি।'

'কিন্তু এসব রোগের চিকিৎসার অল্প তো সরকারের অলাদা বন্দোবস্ত আছে?'

'সরকারের ওপর নির্ভর করতে পারি না, তাই তো দেখ। ওরা যেখানে যেতে একটু ইতস্ততঃ করে, সেখানেই আমাদের এগিয়ে যেতে ইচ্ছা করে, আর ওরা

যে কাজে আগ্রহ দেখায়, সেটা আমরা পণ্ড করায়ই চেষ্টা করি।'

ধরগোস প্যাটার্ণের ছেলেটি মা টিনের বিকে ফিরে এক গাল হাসলো, 'এই হচ্ছে আসল কথা। আপনাকে আমি এতকণ কি বলছিলাম। বাবার ঠিক এই কথাই বলেছিলেন। সেবা টেবা একটা ভুড়ং। রেজুন থেকে একবল ছোঁরা এনেচে মজুর কেপাতে। এর মধ্যেই নাকি মজুররা দাবী পেশ করেছে—ওদের থাকবার সুব্যবস্থা চাই, অল্পবে ওদের বন্দোবস্ত চাই। শুধুন কথা। ছোট আন্তকে একটু আত্মা মিলেই একেবারে বাবার চড়ে বসবে।'

লুন পে ছোট ছোট কানড়ে কিছুকণ চুপ করে পাড়িয়ে রইলো। লারা মুখ লাল হ'য়ে উঠলো। একটু পরে নিজেকে সাহসে নিয়ে মা টিনের বিকে চেয়ে আস্তে আস্তে বললো, 'এবার তা হলে আমি চশি। আর তো কিছু আপনাবা বলার নেই?'

মা টিন পাড়িয়ে উঠলো। কি একটা বলতে গিয়েই থেমে গেলো। ছোট ছোট অল্প কেঁপে উঠলো। এগুলো যে ওর কথা নয় তাকি বুঝতে পারতে না লুন পে? ওর কোন কথাই তো বশ্য হয় নি।

'আপনি এখানে কোথায় আছেন?'

'আপাততঃ মগন রায়ের বাগানে।'

'আবার মাসীমার বাড়ীও শু দিকে চলুন না এক সংগে বাই, নাকি আপত্তি আছে আপনাবা?'

'আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু আমার সংগে আনাদের ক্লাবের কমল বেগ রয়েছে। ছোঁরাছুরি ওর থাকলে এগোনো কি ঠিক হবে?'

লুন পে লোকা ছেলেটির দিকে চাইলো। কালার সংগে বেশানিশিতে ছেলেটির অবেকশনের আপত্তি একথা লুন পের অজানা নয়।

মা টিন ছেলেটির দিকে ফিরে বললো, 'আপনাবা মার্কোটে বাবার কথা ছিলো বললেন না। ভালোই হ'ল আমি তা হলে এর সংগেই বাড়ী ফিরছি।' কথার সংগে সংগে মা টিন এগোতে শুরু করলো।

‘কিন্তু আপনি যে বসছিলেন, মার্কেটে আপনার কি কেনার ব্যবসার ছিল?’ ছেলেটি শেষ চেষ্টা করলো।

‘খুব একটী কিছু নয়। আজ না হ’লেও চলবে। আজনি।’

যা টিন লোহার শিকল পার হ’রে হাত্তার গিঁড়ে ধাঁড়ালো।

কমল বোস হাত্তার ওপারে একটা হোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলো। লুন পেং ডাকে ফিরে গেছে এগিরে আসলো।

‘আমার বন্ধু কমল বোস ইনি আমাদের সংগেই পড়েন যা টিন।’

ছুত্বে হেঁলে ছুতনকে অভিবাদন করলো।

‘আপনারা এ কাজে আমাদের ডাকেন নিতো’ যা টিন সোজা কমল বোসকে জিজ্ঞাসা করলো, ‘আমরা এ সব কাজের অযোগ্য এই বৃত্তি আপনারদের ধারণা?’

কমল বোস হাসলো, ‘না, তা মোটেই নয়। বরং এ সব কাজে আপনারদের যোগ্যতাই বেশী। সেবার কাজ তো চিরদিনই আপনারদের একচেটে।’

‘তবে ডাকেন নি কেন? এতগুলো ছেলে এসেছেন, ক্লাসের একটি বেরেকেন্ড তো সংগে আনেন নি, জনান নিও কিছু?’

‘তার কারণ আপনারদের ডাকবার প্রয়োজন হয় নি। আরও বিরাটভর কাজে ছরত আপনারদের সাহায্য চাইব। বিপদের কালো বেধ যখন আরও ঘনির্বে আসবে তখন আপনারদের এগিরে আসতেই হবে, আপনারদের ডাকার অপেক্ষার থাকলে চলবে না।’

বাক্যে বাক্যে পথ চলতি ছু একটা হুলি বন্ধুর দাঁড়িয়ে পড়ে ওদের অভিবাদন করলো। সংগের ছোট ছোট মাছগুলো পর্বত বাত কাত ক’রে বললো, ‘সারেলি সেয়া।’

‘আপনারা আরো কিছু দিন থাকবেন নাকি এখানে?’ যা টিন লুন পেং মিকে চেষ্টা করলো।

‘না, আর বেশী দিন থাকবার প্রয়োজন হবে না। সত্যিই আমাদের মধ্যেই বেড়ানো কিংবা।’

‘এখানকার লোকেরা কিন্তু আপনারদের কাজকে নিছক নিষাধ সেবার কাজ বলে মনে করে না?’

‘লোকের কথা ছেড়ে দিন। লোকে তো কত কিছুই মনে করে। লোকে মনে করে ইংরেজরা এ দেশের উন্নতির জন্য বস্তু বিক্রি, এ দেশের লোকেরদের স্বার্থ সুবিধার কথা ভেবে ভেবে শাসকদের অনিচ্ছা রোগ হবার উপক্রম হ’য়েছে’ কমল বোস আবেগে আবেগে বললো।

‘আমাদের সবকিছু কান-খুঁচো জনলেন নাকি কিছু?’ লুন পেং ভুত ছুটো কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলো।

‘আমার মেসো পুলিশের লোক, কাজেই বৈঠক-খানার নানা কথাই হয় কিনা। নজরবন্দির মধ্যে কয়েক-জন এসে আপনারদের নামে লাগিয়ে যায়।’

‘নজরদার?’

‘হ্যাঁ, সেবা বস্তু ক’রে থাকের আপনারা’

‘তুলছেন, তারাই?’

‘কি বলে তারা?’

‘আপনারা ওরূপে সেবার ঠাঁকে ঠাঁকে আরো যে সব কথা ওদের গেলার চেষ্টা করেন, সেই সব কথা-গুলো বং চাং ক’রেই বলে ফেলেন। কথার সংগে যা টিন দাঁড়িয়ে পড়লো আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললো, ‘ওই—কে ওই বাগলোটা হেসোর। আজনি না একটু বলে বাবেন?’

লুন পেং হাসলো, ‘একবারে খুঁচোখুঁচি ধাড় করাতে চান পুলিশ হেসোর সামনে?’

‘আপনি কি মানুষকে আঘাত না দিয়ে কথা বলতে পারেন না?’ যা টিনের ভিত্তে গলার আঙুলকে কমল বোস আর লুন পেং ছুতনেই চমকে উঠলো। অন্ধকারে যেয়েটার খুঁচালা ক’রে দেখা গেলো না। এলো-যেলো হাওতার ওর পাতলা এলিটা কাপছে। যেয়েটা একটু খেনেই জোর পায়ে হাত্তা পার হ’রে গেলো। সেটের শিকলটা হাত দিয়ে খুলতে খুলতে একবার গিঁদন কিয়ে চাইলো। গ্যাসের আলোটা তির্যক রেখা ওর খুঁচা গিয়ে পড়লো। তানাবা বাবা খুঁচা কেনন স্নান আর করণ মনে হলো। সত্যার আবছা আলোর এমনিই অবস্থা মনে হয়।

কমল বোস আর লুন পেং আর দাঁড়ালো না।

(ক্রমশঃ)

নিবেদন

এরশাদ্ কন্ডারেল

বাংলার টুকরোগুলোকে লাভি ঘেয়ে সরিয়ে দিয়ে
উম্ ডেমী কসাইখানার উঁচু পাটাতার ওপর টান হয়ে
থবে পড়লো। খানিকক্ষণ শুয়ে ক্রান্তির অভ্যস্তা দূর
করতেই চার সে। কসাইখানার মধ্যে শোবার মতো
আবস্থা শুধু ঐ উঁচু পাটাতাই, সেখানে একটা মাত্র
অনারাসে খানিকক্ষণ গড়িয়ে নিতে পাবে। উম্ তাই
করলো; তার অবসর বড়ো কম। পৈঠের ওপর একটা
পা ছড়িয়ে দিয়ে অস্ত্র পা-টাকে সে আত্ম হতে রাখলো।
হাঁটু ওপর, আর মাংসগুলোকে বাগিল করে নিয়ে
মাথাটা দিলো তার ওপর চাপিয়ে। বরফ ঘর থেকে
মাংস আনার পর তা' বেশ আত্ম-প্রদ থাকে, তাই উম্
মাংসের দলাকে বাগিল বানিয়ে নেয়। এই আত্মমুঁহু
উপভোগ করবার ভেত্রেই সে মাংসকাটা উঁচু পাটাতার
ওপর গা এলিয়ে দিয়েছে। জুতো ছোড়াটা টান মেরে
পা থেকে হুলে কেলে দিয়ে সে পাথের আগুনগুলো বেশ
ভালো করে মুঠকে নিলো একবার।

টমের কসাইখানার গছটা কিছু মোটেই তৃপ্তিকর
না। ব্যতীত তার দোকানে আছে মাংস কিনতে
তাদের নাকেই সেই কটু গন্ধটা গিয়ে ঘাভা মারে। প্র
কর তার 'তোষার ঘোরালের গুদিকে কি পচেছে
কপতো? কিসের বেশ একটা পড়া গন্ধ থেকেছে?' বহুরের
পর বহুর গছটা বেশ ক্রমেই উগ্র হচ্ছে।'

উম্ খানিকটা তামাক মুখে ফেলে দিয়ে আত্ম হ করে
পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়লো। চারদিকে তন্মুদ্র করে বাহি
উড়ছে, এই সব নির্দ্বা বদ বাহিগুলো অনেকদিন থেকেই
এই দোকানের বাসিন্দা। সাহনের দরকার যে পর্বাটা
আছে এরা থাকে তার পেছনে, কিন্তু নতুন রক্তের
আব্দান পেয়ে একবার বাহি উড়তে থাকে তাহলে বাহির
ভীড়ে মনেই হয় না যে সেখানে কোন পর্বা আছে।

সবাই টমের দোকানের মাংস ভালোবাসে। তা
ছাড়া শহর আর বিত্তর কোন বাংলার দোকানও নেই।

তার দোকানের কাছে এসে পড়লে কিছু মাংস অন্তত
কিনতেই হবে খরিদারকে। বেড়াতে বেড়াতে তার
সাহনে পড়ে কেউ যদি কুশল প্রদ করে 'কি উম্, ভালো
তো?' এ প্রশ্নের উত্তর সব সময়ই তার এক, 'ভালো
তো আছি, কিন্তু বোটার মাথার বস্ত্রার ঠেলায় বদ ব্যতি-
বাস্তব।' এর পর উম্ খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবে আর সেই
অবসরে প্রস্তুততা বলবে, 'আমার এক পাউণ্ড বাংলার
দরকার ছিল উম্।' একথা শুনে উম্ হতভম্ব হয়ে উঠে
বলবে, 'ও হরি, তাই বলুন। এছাড়া সব ঠিক করে
দিচ্ছি।' তারপর অত্যন্ত অতিজ্ঞতার ভান করে অনেক-
খানি বাংলার মধ্যে থেকে বেছে বেছে এক পাউণ্ড
মাংস কেটে নেবে। সবাইকেই সে এম্বিতাবে খুদি
রাখে। মাংস কেটে ভালোভাবে পছের বিদার করতে
দে সব সময় তৈরী, এ ব্যাপারে সে তাত্তী চটপটে।

মুখের ওপর থেকে বাহিগুলোকে এক কাপটার
উড়িয়ে দিয়ে উম্ খান তন্মুদ্র হয়ে পড়লো তখন ট্রিক
হুগুং বেলা। পাড়াগাঁয়ের কোন লোকই এগনো শহরে
আসে নি, কেন না এটা চাহবাংলার সমর, বেশি বেলা
পর্বন্ত তারা মাঠেই বাস্ত থাকবে। আজ শনিবার হলও
জু-চারকন কবাতিং শহরে আগছে।

শনিবারের ভোজের জন্তে বাংলার বাংলার দরকার
তার নিয়র গেছে আগেই, আর রবিবারের জন্তে এতো
আগে থেকে কেউ কেনে না। রবিবারের করে কেনার
প্রকৃষ্ট সময় হলো শনিবার রাত্রি দশটার পর, সে মাংস
পরের দিন পর্বন্ত রেখে দিলেও নষ্ট হবার ভয় নেই।

বাহিগুলো টমের নাকে-মুখে বসছে আর উম্ এক
একবার ভেট হাঁকিয়ে তারের উড়িয়ে দিয়ে বাংলার দলটা
আহো নিবিড়ভাবে মাথার নীচে টেনে নিয়ে খুদুবার
চোঁ করছে। তাহাকের রস গাল বেয়ে আসছে
গড়িয়ে, উম্ ভয়ে শুয়েই পিচ ফেলে ছায়গাটা ক্র
ফুলেছে নোংরা। শো-কেশের শেজনে কমা করা আছে

অন্ধের মাথা আর নাড়িভূঁড়িগুলো, সেখানে কাঠের ভাঙা ভাঙা ভাঙা খুঁ ফেণার বাকলও আছে কিন্তু অত্যাশ্চর্য উঠে খুঁ ফেণার নতো অথবা তখন উঠে নেই। কিছু-কণের মধ্যেই পৈশেট। ভানাকের নোংরা পুণ্ডে বোকাই হয়ে গেলে। মাংসের গুপ্তরও যে খুঁ পড়লো না তা নয়, কিন্তু তাতে এমন আর আর কি কতি হবে, রান্নার আগে তো সবাই মাংস খুঁই নেয়।

কিন্তু কি বিদ্যুটে মাকিগুলো! শরতানগুলো যেন চিরতন গুড়ার সংকর নিজেই আজ এসেছে। টম্ বেনী নড়াচড়া না করেই মাটি জ্যাড়াবার অস্ত্রে চড় চপেড় ঢালোছে আর খুঁ ফেলছে যেখের ওপর অত্যাশ্চর্য বিকিরণ সংগে। বানিকটা পরে মনে হলো যেন বাহির উপগ্রহটা কিছু করেছে।

পেছনের দরজা টেলে নানিতের দোকান থেকে জিন বখন কলাইখানার চুকলো তখন টমের ঘুমটা বেশ লাগ হয়েই এসেছে। জিন হচ্ছে টমের অসীমার; কাকের ককট বৈদ্যি বেশি থাকে সেদিন জিন আগে টমকে সাহায্য করতে। সে পেছার জোড়ান পুরুষ, বিরাটবে টমের আর বিভণ! সর্বদাই তার মাথার থাকে কালো চওড়া একটা টুপি, আর গারে থাকে নীল রঙের কলুই পর্বত হাত ভটোনো একটা সাট। পেটটা তার লোকান্ত আলায় নতো, ফলে প্যাণ্ট এখন তখন স্থানান্তর হয়ে যায়। চলতে গেলেই প্যাণ্টটাকে বার বার টেনে বুকের কাছ পর্বত তুলতে হয়, কিন্তু প্যাণ্ট কিছুতেই কোবরে থাকবে না, একেবারে মাটিতে হুট্টরে পড়বার আগেই জিনকে নিজের গরজেই তা টেনে তুলে নিতে হয়। মোট কথা সব সময়েই তাকে প্যাণ্টটা একরকম ধরেই লাগতে হয় হাতে করে। কিন্তু যেট, কিছুতেই ব্যবহার করবে না জিন, কেন জানিনা ওটা তার কাছে নাকি খুব হাঙ্গরর টেকে!

পেছনের দরজা দিয়ে ছুটে এসে জিন বখন টমের কাঁধ ধরে তাঁকানি বিজে তখন সে সত্যিই খুঁ অচেতন। এক গ্যামা নাহি কাঁধ পেরে চুকে পড়েছে

তার খুঁয়ের ভেতর! জিন তাড়াতাড়ি হাতের করে সেগুলোকে তাড়াতাড়ি লাগলো।

—‘টম্—এই টম্!’ জিন নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভীষণভাবে চোঁচাতে শুরু করে। ‘ওঠো, ওঠো, নীগ্রি উঠে পড়ো!’

টম্ বড়নড় করে লাফিয়ে উঠে জুতো খুঁজতে থাকে। এরকম থাকা খাওয়ার যে অভ্যাস, খেদেরও তাকে সহ্য নয়র ডেকে তুলে মাংস কিনে নিয়ে যায়, তাই আচমকা জিনকে সে খেদের বলে তুল করলো। খুঁয়ের গুপ্তর হাত খুলিয়ে বাহির কামড় উপলব্ধি করতে করতে জিনের খুঁয়ের দিকে চোখ ফেরালো।

—‘বলি হয়েচে কি?’ ‘বানিকটা খুঁ ফেলে জিনের খুঁখটা তালো করে বেঁধে নিয়ে এসে করলো,—‘হয়েছে কি তোমার?’

—‘তোমার বখুখটা নিয়ে চটপট এসো, অংগলের রান্নার এক ব্যাটা নিজেসক বাতুরা করতে হবে। ওঠো, ওঠো, না হলে ব্যাটা পালাবে এখুনি!’

‘ও তাই বলো!’ টম্ তড়াক করে লাফিয়ে ওঠে। চোখ থেকে ঘুম পালিয়েছে। উৎসাহভরে জিনের হাতটা চেপে ধরে বলে উঠলো,—‘আরে, তাই নাকি?’ তোমরা নিজেও করতে থাকো!’

—‘টিক করতে পেরেছো এতোকণে। অনেকদিন আগে সেই যে একটা নিজে বেল লাইনে কাজ করতো, তুমিও তো তাকে চেনো, চেনো না? সেই ব্যাটাকে করতে বাছি। সেই হলুদবুখো সুরোরের বাজাকে পাখ জয়ের নতো শিক্ষা দিয়ে দেবো!’

টম্ জুতোর কিস্তিটা করে বেঁধে নিয়ে দৌড়ে জিনের পেছন পেছন বেড়িয়ে এসে রান্নার। হাতে তার বখুখ, আর জিনের হাতে মাংসকাটা কাটারী-খানা। তারা দলবেঁধে বাজে সেই হলুদবুখো সুরোরটাকে খুঁজতে—সবাই নিলে পাখ তাকে উচিত শিক্ষা দিয়ে দেবে।

আরো জন করেকের সংগে টম্ উঠলো মোটরে।

জিব লাকিরে ভাড়াভাড়ি অত্ৰ একটা গাড়ীর পা-
ধানিতে জেপে পড়লো। জিপ-চল্লিগটা মোটর বাজে
অংশলো।

সংসদের মধ্যে একটা অরণ্য খুঁজে নিয়ে অপেক্ষা
করতে লাগলো ওরা। অংশল কেটে রাস্তা করা হয়েছে,
তব্বনো ছোট ছোট গাভপালা চারদিকে ছড়ানো।
মোটরগুলো এসে অংশলের রাস্তার ধারভেই নবাই কপ-
কপ করে নেবে পড়তে রাস্তার। কেউ কেউ নেবেই ছুটলো
উইল ম্যাকসীকে খুঁজতে তার বাড়ীতে। এই উইলই
হচ্ছে সেই হুমুসুখো মিঞা, যার খোঁজে আক এতো-
দূরে এরা ছুটে এসেছে! তাকে নিশ্চয়ই এখন বাড়ীতেই
পাওয়া যাবে, কেননা সে বাড়ী থেকে কোথাও যায় না।
তুলোর চাপ নিয়েই সর্বদা যাত। এই আগপাত
পরিগ্রহের ভজ্ঞে তার তুলো এতলাটের দেয়া। বীত
থেকে ঝাঁপ ভাড়িরে তব্বই তা সে মরে তোলে। অথচ
অগ্ররা ঝাঁপ না ভাড়িরেই সবতছ মরে বোকাই করে।
উইল ঢালান, তুলো হাড়ী সে অগ্র মস্ত একই অনিতে
ফগার আগ্রাণ চোঁরা। সব পড়েরই ঝাঁপ আর ঠুব
কেড়ে নিয়ে পরিষ্কার করে। তাই সে সকলের চক্ষুশূল,
খালি ঠুব বিক্রী করেই সে বহু টাকা পায় বহুরে।
পাসা বহুরে সে বা রোজপার করে তা মাংস বিক্রী করে
টম্ব বা চুলকেটে জিন কেউই করতে পারে না, সেই
• অজ্ঞই অত্যন্তক উপাধিত, সদাই শুও পশতে থাকে তার
সর্বশ্বশের আশার।

ইতিমধ্যেই ডক ক্রমার তার চাকরকে পাঠিরে
ঘিরেছে বোকাণ থেকে হ' বোতল বেনোমার 'কোকা-
কোলা' আনার ভজ্ঞে, আর তার সংগে বরক। একটা
গামলার বোঁরা বলে বোকা-কোলা আর বরক মিনিরে
এখানেই একটা মদের বোকান কেঁবে ফেলবে ক্রমার।
অত্যন্তকই তার ঠাঙা বেনোমদের ভজ্ঞ!

মদের তেতর টম্ব, জিব আর হুবার্ট, ওরেলদের
সংগে এলো বাসেবরী গিলতে। হুবার্ট বোখানোই বাক
সংগে তার মদ থাকবেই। সে নিজে হইকী ভৈরী করে

পাড়াতে আর বোকানে বোকানে বিক্রী করে। হবার্টের
ভৈরী মদ দেশের এক মাশা জিনিষ!

বেধা গেলো পেছন থেকে যেত মারতে মারতে
বারো-চোদ্দজন লোক উইলকে হিঁচড়ে নিয়ে আসছে
এই বিকেই। উইল ম্যাকসী আতকাল বুড়ো হব
পড়ছে, সংসারের স্ত্রী আর ভিনটি মেরে। ভিনজনেরই
বিষে হয়ে গেতে, তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত। উইলও
সাদাঘাটা ধরনের মাহু, মিছের চাষবাগ নিয়েই গাংক
সারাবিন, শাবা মাহুদের সংগে দেখা হলে টুপি বুদে
কথাও বলে তব্বও তাকে কেউ মেরতে পারে না।
যেহেতু সে ভুঁগো থেকে মিছের চোঁরা সিদ্ধ ভৈরী করে
অনেক লাভ করছে আর সবার চেয়ে।

উইল রাস্তা দিরে ছুটছে আর পেছনের লোকগুলো
তাকে খুঁজার ভাড়ানো করে নিয়ে আসছে! আগে
থেকেই সব ব্যাপার ঠিক ছিলো—তার ভজ্ঞে কাঠের
চিটা, গলার কীলের ভজ্ঞে নকসাকাটা শেকল সব
প্রস্তুত।

ডক ক্রমার ছোকরা এরি বোখা মদের বোকানটা
লাকিরে তুলেলে, অনেক কালি বোতল খালি হয়ে
গেছে। আগের আনা আর মাজ চাব পাটো বোতল
পড়ে, এখুনি ছুটতে হবে আবার মহুরে, তার মদের
বা জাছিবা।

ক্রমারের চাকরটা আবার মদের আমদানী করলো।
এমন লোক সমাগম বহুদিন হয় নি। দিনটাও বেশ
গরম, তাছাড়া এমন একটা উত্তেজক ব্যাপার হচ্ছে
বৃখন, ঠাঙা মদ ভো তখন যেতেই হবে! অংশলে
বেঁকশ থেকে হু'ল লোকের কিড উৎকর্ষ হয়ে অতীক্য
করছে শেব গুস্তের ভজ্ঞে। জিম না ডাকলে তো টম্ব
এমন একটা মকার জিনিষ থেকে বাধই পড়ে যেত
আজ। এমন চিত্তাকর্ষক জিনিষ থেকে বঞ্চিত হয়ে সে
তব্বু বাহির কাবড়ই যেতো গুরে গুরে।

উইল ম্যাকসী ক্রমারের বেনো মদ কোন দিন কেনে
নি। এমন ভাবে দেখা করে বাজে পরলা ওড়ানোর

পক্ষপাতী সে নয়,—বাইরে মদ কিনে খাওয়ার ক্ষেত্রে সে অপরাধ মনে করে। বেনোমদ খাওয়া না, নূরির তৈরীও করে না। নিয়োনের মধ্যে সে বসে ভালো মনুষ্য। এমন কি কোনদিন সংগে কোন অস্ত্রও নেয় না, কণ্ঠাভাষী তো তার পেশা নয়। শাশা মনুষ্যের সম্মান করে, টুপি খুলে অভিবাদনও করে। ভাড়াডা সে সব সময় তার ঘরেই পড়ে থাকে, বাইরে কোথাও যায় না। কিন্তু আজ সবাই তাকে পেয়েছে হাতের মুঠোর, ঈশ্বরের এই বোঝা নূরিকে সবাই মিলে আজ মরকে পাঠিয়েছে! ভবিষ্যতে কোনদিন আর সে তুলো থেকে নিষ্কৃত্যে নেই। তার স্বভাবের পায়ে তার ব্যবস্থা করতেই হবে! সবাই মিলে কাভার্ডিং করে তাকে একটা গাছের ভিত্তিতে শেকল দিয়ে বেঁধে ফেললো। আরে পুটে। গলা আর হাঁটুর ওপর বসে বসে গেলো লোহার শঙ্ক শেকল। হ্যা, এতোদিনে তারা পেয়েছে চলনে

কোয়ার্টারে হাতের মুঠোর মধ্যে! আর কোনদিন সে কোন শাশা মনুষ্যের চেয়ে বেশি রোজগার করতে পারবে না পৃথিবীতে!

এসব পুস্ত টমের বেশ ভালোই লাগছিলো। হবার্ট তাকে আরও খানিকটা মদ দিলো খেতে। হবার্টও খুব তৃপ্তি করে দেখেছে এই নিখাঁড়ন। তার মত মদ আর কেউ এতজায়ে তৈরী করতে পারে না তাই না টম তাকে এতো ভালোবাসে! হবার্টও তাই টমের দোকানের নিয়মিত খেদে।

হঠাৎ বন্ধুত্ব বাগিরে হয়ে টম তুলি করলো উইলকে লক্ষ্য করে। সংগে সংগে আর চলি পক্ষাশা। বন্ধুত্ব গর্ভে উঠলো জীবন থেকে—উইলের স্মৃতিস্মরণ পরীক্ষা। ভলিতে ভলিতে হয়ে গেলো কাঁদা।

ক্রমাগত চাকরটা সব মদ বিক্রী করে কেলেঙ্কারী করছে। ডক ক্রমাগত মদ বিক্রী চাকাটা পকেটে তরে বেশ উৎসাহিত হয়েই। হ' পেট মদ উড়েছে এইটুকু সময়ের মধ্যে, আরো আনলে আরো উড়তে

হয়তো। ঐক্যকালে এমন ঠাণ্ডা মনুষ্য লোকে পাবে কোথায়?

মৃতদেহটার বিকে অপসরুভাবে খানিকটা তাকিয়ে থেকে অন্তরা হৈহৈ করে তাকে গাছের ডালে বেঁধে ফুলিয়ে দিলে। যেন সে পৃথিবীর গুপ্ত বীজস্রব হয়েই সলায় ঘড়ি দিয়েছে। টম আর জিম আর দেহী না করে পছন্দে ফিরে এলো, এমনিতেই তারের অনেক বেরী হয়ে গেছে, দুপূর্ববেলা গিরে ফিরতে বিকেল চারটে হয়ে গেছে। দোকানে এখনো কতো কাজ পড়ে। ভাড়াডা খনিখাতের বাজার রবিবারের অস্ত্রে মাংস কিনতে দোকানে এতোক্ষণে হয়তো ভিড় জমে গেছে।

জিম আর টম ভাড়াডা ফিরে এসে দোকান খুলে গভীর মনোযোগসহকারে বড় বড় মাংসের টুকরোগুলো কেটে কেটে ছোট করতে লাগলো। কাছের জুনিয়র জমে। টম হচ্ছে আজ কলাই, মাংস কাটার যাবতীয় কাছের সে নিপুণ। একটা আঙুল গর কেটে তার কাঁক করে মোটা শিক্রে ফুলিয়ে দোকান সাঞ্জিরে ফেললো।

মাংস কিনে পরস্পর বেতোতে হয় জিমের কাছে। জিম হচ্ছে ক্যান্সার। ক্যান্সারীও তার সংগেই বলতে হয়, টম শুধু নিজের খেয়ালে মাংস কেটে প্যাক করে দেবে খেদেবকে। প্রকৃত ভুড়ি নিয়ে জিম কাটুকুটির কাজ করতে পারে না, তাই বলে থাকে পরস্পর বাজা আগলে।

ঈশ্বরের কৃপার গ্রিক সময়েরী তারা ফিরে এসেছে, মাংস-ক্রেতার ভীড় জমে গেছে দোকানের চারদিকে। নানারকম টোনেতে উঠছে ভিড়ের মধ্যে থেকে—'কই টম, আমার মাংসটা হলো?'... 'কি হোলো, আমার দু'-পাউন্ড মাংসেরেবে কি দেবে না?'... 'হালো টম, স্তন্যে পাছ?'... টমের কোনদিকে নজর দেবার সময় নেই, শৈশাচিক আনকে তার হাতের কাটাঠাখানা তখন চকল।

অনুবাদক—মৃণালকান্তি মুখোপাধ্যায়

স্বপ্ন

ঐগনীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী

“ওগো ওঠ ওঠ বেলা হয়ে গেল।”

দুখনটা জেতে গেল বিজয়ের। ওঃ বিমল এত জোরে
গায়েব ওপর পা ছুঁয়েছে দুখনটা জেতে গেল—মিসির
গেল নয়।

অগ্ন, বড় বড় স্বপ্ন—অশ্রুপূর্ণ কণ, তার চারিধিকের
দেখলে তবে কিংক লক্ষ্য রঙের পেটিং। ঘরের এক
দিকে একটা বেহাগি কাঠের বিরাট আলমারী। তার
পাশেই রয়েছে একটা বড় হেভিওগ্রাফ। ঘরের আর এক
দিকে বড় একটা ফ্রেসিং টেবিল, বাত্মব্রহ্মনাথ একটা
আমনা লাগান। তার সামনে দুটো ফ্রেসিং চেয়ার।
ঘরের এক কোণে একটা কাচের আলমারী—বাক্যকে
চানডায় রাখেই বইতে তা তত্তি। একটা জানলার
পাশে একটা বড় তাইটিং টেবিল—তার ওপর একটা
স্বপ্নর কাচের ঘোরাট, দুটো হাতীর দাঁতের কলম,
বিভিন্নবর্ণ বহু পেপারওয়েট হুড়ানো—কোনটার সাধা
কাগজ চাপো দেওয়া আছে, কোনটার লেখা। টেবিলের
সামনে একটা রিভলভিং চেয়ার। সুখোমুখী চারটে
আনলা, এক দিকে বরফা। মেহগনির তৈরী বিরাট
একটা বাটে সে-তরে—দুহুকেননিত শব্দা—বড় নয়
তার গতিজলো। সাধারণ ওপরে একটা পাখা ঘুরে—
তার প্রকার ছিল না, আনলা দিয়ে এত হাতরা
আলসে। তার পাশে বসে কিংক আকাশরঙের শাড়ী
পরে কে সেই সুন্দরী তাকে ডাকল? লগা দুখনটা
চোখ থেকে তার বিগত রজনীর স্মৃতিস্তার হোচাক
তখনও মিলিয়ে বার নি—চুলচুল বীর্ণায়ত হরিণ নয়ন
ছুটি। দুখচোখে তার রক্তিম ওষ্ঠ আর গও ছুটির দিকে
তাকিয়ে যেন হয় এই বৃষ্টি জোর হল—গজ আগ্রহ
প্রভাত-রবির প্রথম কিরণ তাই বৃষ্টি ছড়িয়ে
পড়েছে সেই ওঠে আর গও ছুটিতে। পিঠ তরে তার
আকুল কেশ হানি—আকাশ তরে কালো মেঘ। বিব্রত

বনের অতবাল থেকে উঁকি মারছে যৌবন কুসুম চুটি।
সুখের ওপর স্মৃতি পড়ে দুহাত নিয়ে তড়িয়ে সে ডাকছে
“ওগো ওঠ ওঠ বেলা হয়ে গেল।”

বেলা হয়ে গেল, বড় জড়াজড়ি বেলা হয়ে গেল।
তাজি কেন আরো বড় হলো—বীর্ণায়ত হস্ত মধুর স্বপ্ন।
কে সেই সুন্দরী? শৈকী নীলা? নীলা সুন্দরী, কিন্তু
অমন সুন্দরীতো নয় সে—সৌন্দর্যের বিরাট তাকার
উজাড় করে গড়া হয়েছে তাকে—তাকে তো চোখে
দেখা বার না, বৃষ্টি তম্ব স্বপ্নেই পাওয়া যায়। চোখ
দুটো বুকে আবার ঘুরোবার চেষ্টা করে বিজয়।

“নাথ! জীবন বাণা বয়েছে।” পাশ থেকে বিমল
করিয়ে ওঠে।

“কি হয়েছে জোর?” বিমলের কপালে হাত দেয়
বিজয়। কপাল যেন গরম। পার হাত দেয়, গা পুড়ে
যাচ্ছে।

“বিজয় কি হয়েছে তের বিজয়?” মা উঠে পড়েন পাশের
বিছানা থেকে।

“কর হয়েছে?” লক্ষিপ্ত উত্তর দেয় বিজয়। মা এগিয়ে
এলে পার হাত দেন বিমলের—“হঃ গা পুড়ে যাচ্ছে”।

“ও কিছু নয়, বেগ হয় ইনসুরেক্সা হয়েছে।” বিজয়
তরসা বের্নে নাকে।

“হুই বাবা তাহলে চারটে ইনসুরেক্সা ট্যাবলেট
কিনে নিয়ে আসিস।” মা ওষুধের ব্যবস্থা করেন।
একটা কাবা টেনে বিমলের গা তাল করে বুড়ে দেন।
“ওরে কমলা ওঠ, বেলা হয়ে গেছে।” কমলাকে মা
ডাক দেন। বাঘের বিছানার কমলা তরে ছিল, উঠে
পড়ে চোখ দুটো খোঁজ হাত নিয়ে। বিজয় বাইরে কল-
তলায় বার হাত মুখ বুজে।

কলতলার এখনও হরিষাবুদ বট আসেনি, আশ্চর্য
তো! বাড়ীর সব ভাড়াটে ওঠান আপে হরিষাবুদ বট

কলভলার কাজ সেয়ে নেন। চোখ মুখ দুয়ে বিজয় গলি পায় গলির মোড়ে এসে দাঁড়ায়—প্রাণ তরে নিঃশ্বাস নেয় করেকবার। এখানে থাকিছুটা খোলা চাকরা পাওয়া যায়, ঘর তো পরমে ভর্তি! এখনই আবার ধোঁয়ায় তরে উঠবে—সব ভাড়াটের উত্তনে বহন আশ্রয় দেওয়া হবে। চোখ দুটো বুজে আবার স্বপ্নের কণা ভাবে বিরহ—কেন এমন স্বপ্ন দেখল?

কিছুক্ষণ বায়ে খেয়াল হয় তার, এখনই বাত্মারে যেতে হবে। আর কাছে এসে বাজারের হলিটা চাব। বাজারের গলির সংগে সরষের ভেলের টিনটা নিয়ে যা বলেন।

“সেরে খানেক সরষের ভেল আনিমু বিজু। ই্যা আর একটা কণা কমলার আর আমার কাপড় যে আর পরা চলেনা বিজু। এক জোড়া শাড়ী আর পান বা মুক্তি যে চাই।”

মুখি শাড়ী চাই, কিন্তু বলেনা সব সময়। মিললেও বা পান—জামা কাপড় কিনলে সে মাস আধপেটা চালাতে হয় এমনি অবস্থা। “ই্যা, আঁত বেখবো না।” মাকে আশস্ত করে বিজয়। আচ্ছা সেই বড় আলমারীটা ভর্তি কি ছিল? কাপড় নিশ্চয়। আঃ যন্ত্র যদি সত্য হত কাপড়ের অভাব থাকত না। যন্ত্র যদি সত্য হত অনেক কিছুইই অভাব থাকত না—সে কথাটা ভুলে যার বিজয়। আনিবনে বাজারের লব ধরে সে।

ওঃ কিনিবপত্রের বা দান—আশ্রয়। হাত দেওয়া যায় না। কিছুদিন বায়ে হরত তধু হাত ঠেকালেই তার মূল্য বাবব কিছু হয়ে বিতে হবে। আচ্ছা এমন জ্বলন্ত টাটকা বড় বড় বাহ, একি সব সাজিয়ে রাখবার ক্ষমতা? না হলে এত দাম দিয়ে করা যায়? তাদের ব্যক্তিগত সব ভাড়াটেদের মধ্যে কাজিকে তো মাসে চার পাঁচ দিনের বেশী ভাল বাহ খেতে যেখেনা সে; শুধু বালের গোড়ার দিকে। এরাতো রোজই এমন বাহ সাজিয়ে রাখে। নিজের মনেই হেসে ওঠে বিজয়, যার

নিশ্চর তারা যারা হাত কাটার খেয়গিরি খাটে শুয়ে। ফুতো টিংড়ি, নর ছোট ছোট ট্যারো বা পার্পে—এক পেটা বা দিন বিশেষে আধপোয়ার বেশী বেশার ক্ষমতা নেই বিজয়ের। শুধু মাসের গোড়ার দিকে এমন বড় বাকের দেই বা আধ দেই দাণা কেনে সে ছু একদিন। এক টাকার বেশী বাজার করার ক্ষমতা নেই তার রোজে। আলু, আনাছ সবই অজিরা—কোনরকমে শুছিরে বাজার করে বাড়ীর লব ধরে সে।

বাজারের হলিটা রাসার দাওয়ায় সামনে যেনে বিজয় বলে ওঠে, “না একটু ভেল দাও।”

মা এগিয়ে এসে ভেলের টিনটা ছাতে নিয়ে বলেন, “ভেল আনিগিনি কেনের?”

“ওঃ ভুলে গেছি একেবারে।” ভেলের টিনটা নিয়ে মুখির বোকানের লব ধরে বিজয়। আছ যেখি সব কাছের ভুল হবে। সেই যন্ত্রটা এখন তাই মাকে মাঝে মন জুড়ে বসছে। মুখির দোকান থেকে ভাড়াভাড়ি ভেল কিনে টিনটা মায়ের হাতে ভুলে দেয়। ঘরের মধ্যে কাপড় জামা রেড়ে গামছা পরে এক খাবলা ভেল গারে মাথার মধ্যে কলখরের সামনে এসে দাঁড়ায় বিজয়। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ, কে আবার এমন সময় ঢুকল? হরিবাবু বেরিয়ে আসেন কিছু বায়ে। “হরি বাবু, আপনি আছ এত ভাড়াভাড়ি?” বিজয় আশ্চর্য হয়ে যায়।

“আর বলোনা ভাড়া, বউয়ের অস্থল, চান সেয়ে ছোট্টেলে চানু বা?” হরিবাবু মন মতা তাইে জবাব দেন।

কলখের টুকে কয়েক বগ জল মাথার ঢালে বিজয়—আঃ বেশ ঠাণ্ডা, গরম কালে মান করাটাই বা ভাল লাগে। আচ্ছা সেই ঘরের পাশে নিশ্চর একটা বাথরুম ছিল, কেনন সেটা? মার্বেল পাথরের? বড় সাওয়ারের নিচে বাথটব সাবানের কেনা আর সেটে ভর্তি?—ওঃ তাতে মান করে বা আরাহ! গায় জল শুকাতে থাকে, বিজয়ের হাঁস পাকে না। হঠাৎ খেয়াল হয় তার—ওঃ জরানক দেই হয়ে বাবে আছ অফিসে যেতে। ভাড়া-

তাড়ি গা হুছে ঘরের মধ্যে এসে আত্মকাপড় পরে সে, চুলটা কোমরকবে আঁচড়ে বের তাতা চিত্রশী আর আরগীর সাহাবো।

যা ভাত বেড়ে রেখেছেন—ভাত, আলু তরকারী, ডাল আর কুচো চিংড়ীর কোল। ভাত খেতে বসে বিষয়: ইস! বা মোটা চাল, দুর্গন্ধ আর কীকরে ভর্তি—সরকারী, বাড়ি সববরাহ বিভাগের কৰ্ম-ইনপুণ্ডের সার্ক পরিচর। ভাত চিৎবাতে চিৎবাতে অস্তমনক হয়ে পড়ে বিষয়। আচ্ছা সেই ঘরের অবিবাসীরা কি যায়—পক-খ্যন্ন পরিবেষ্টিত কাপার খালার ওপরে উৎকৃষ্ট

বি বা সজ্ঞাপন? ভাতের সামনে বি ঢালা?—খালার পাশে ঝাঁট ছুঁ আর বর্তমান কদা পাতে নিশ্চয়!

“বিষয়, কাপড় আর ইনকুয়েন্স ট্যাবলেটের কথা কলিন্দা বধা, রমলারও পাটা ছাৎ ছাৎ করছে।” বা বিষয়কে কব্যাটা স্বরণ করিয়ে দেন।

“হু” আনমনে উত্তর দেয় বিষয়।

“কিরে খাচ্ছি না কেন? বিদে সেই?” যাবের হুবে আশঙ্কার মেঘ ঘনিয়ে আসে।

“না এইতো খাচ্ছি।” বিষয় সহজভাবে খেতে চেষ্টা করে কিন্তু পারে না আচ্ছ সে একঘেরেরি বাইরে যেতে চায়। বিষয় উঠে পড়ে। বা বলে ওঠেন,

“কিরে উঠে পড়লি বে? কিছু তো খেলি না।”

বা ব্যাকুল হয়ে পড়েন।

“আকিলে আচ্ছ বাঙাল-বাঙালি আছে বা” নাকে বিদ্যা লাগুন দেবার চেষ্টা করে সে।

“কখনরে?”

“দুপুরে টিকিনের সময়।”

“তাহলেও এতটা বেলা প্রায় খালি পেটে থাকবি? না না খেয়ে নে।” মার মন মানতে চায় না।

“না না এখন ঘেরী হর গেছে আর খেতেও ভাল লাগছে না।” বিষয় হাতমুখ বুজে দেয়।

“ভোর কিছু হয়নি তো?” না এসিয়ে এসে বিষয়ের কপালে হাত দেন।

“না না আমার কিছু হয়নি, আমি বেশ আছি।” বিষয় চটিকোড়ার পা ছুঁসিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

ট্রাবে শাসে বা ভীড়! একটা বাসের রড ঘরে হুলতে থাকে বিষয়। আচ্ছা সেই ঘরের লোকের কি থাকে? মোতাব, কাইলুপার, ইন্ডিবেকার, একটা অষ্টন নিশ্চয়—ওঃ লাদা পাটা একেবারে মাড়িয়ে দিলেন বিষয় পাটা সঠিকে দেয়—মাক্ করবেন মাঝ বড় ডিড অগচ লেট হয়ে গেছে—তত্তলোক সঙ্গতিক কমা প্রার্থনা করেন। বুজি অকাটা—বিষয় মনে মনে ভাবে, তা ছাড়া বস আছে থাকে চিতা চুকেছে মাথা।

আকিলে গিরে এটেন্ড্যান্স খাটটার সেই করে বড়ির নিকে তাকায়—না। খেতে আট মিনিট হয়েছে। আর দুমিনিট পরে এলেই লেট হয়ে যেত। মটার এটেন্ড্যান্স, মশ মিনিট গ্রেস। বিষয় চোরের এলে বলে বিষয়। এর মধ্যেই বেরায়া অনেকগুলো চিঠি দিয়ে গেছে, চিঠিগুলি পড়তে থাকে সে। পাশ থেকে নরেন বলে ওঠে

“কিরে শেখের বোজাতে আচ্ছ যাচ্ছ তো?”

“নিশ্চয়”।

চিঠি পড়তে পড়তেই বিষয় উত্তর দেয়। শেখর তাহের সহকারী। মনে হয় তার, সে বলে আছে সেই বড় রাইটিং টেবিলটার সামনে—সাধা কাগজ তরে উঠছে কালো কালিত আঁচে—কবিতা আর ছোট গল্পে। এর মধ্যেই কয়েকটা আর্সেন্ট চিঠির উত্তর লিখে বড়বাবুর কাছে পাঠার অহুনাগনের জঙ্গে, বোঝার হাতে। কিছুকণ চুপ করে বলে ভাবে বিষয় তৈরী কবিতার কথা। বেরায়া এলে গাড়ার, “সেলান দিয়েছেন বড়বাবু।” কি হল আবার, বড়বাবু তাকে কেন? ডাকবার কারণ ভাবতে ভাবতে বড়বাবুর সামনে এসে মমতার করে গাড়ার।

“এই যে বিষয় শরীরটা ভাল তো? কাল রাতিরে ভাল খুব হয়েছিল?” বড়বাবু দেখলি অতিভাবকের মত কুশল জিজ্ঞাসা করেন। এত মেহের কারণ বুকে উঠতে

পাণে না বিজয়, আমতা আমতা করে উত্তর দেয়,
“আজ্ঞে তালই আছি।”

আমার মনে হয় কাল রাত্তিরে তাল ঘুম হয়নি তোমার। যে কটা চিঠির উত্তর লিখেছ সবটাকেই তুল—কোনটার ঠিকানা। তুল লিখেছ, কোনটার উত্তর। উত্তর দিয়েছ—আর এইটে দেখ।” বড়বাবু একটা কাগজ বাড়িয়ে দেন। বাবুড়ে বার বিজয়—একি এটাতে যে একটা কবিতা লেখা।

“এটা শান্তিনিকেতন নয়, সঙ্গদাগরী অফিস। কবিতা লিখতে হলে এ জায়গা ছেড়ে সেখানে আজ্ঞা পাড় না বাবা—আনন্দ্যও বাঁচি, তোমারও মনের সাথ বেটো।” বড়বাবু কর্ণে মধু ঢেলে দেন।

“আজ্ঞে, আত শরীরটা তাল নেই, তাই বাবে”—কেনরকমে ব্যাপারটা মিটিয়ে কেলেতে চায় বিজয়।

“শরীর তাল নেই বলে কবিতা লিখবে, কি হয়েছে তোমার?” বড়বাবু কড়াভাবে প্রশ্ন করেন। “আজ্ঞে কাল রাত্তিরে তাল ঘুম হয়নি, বড় গরম গেছে কাল।” বিজয় সাফাই গার।

“ওশব বাজে কথা। ঘুম হয়নি তো কি হয়েছে, আমাতো তো রাত্তিরে তাল ঘুম হয় না—কই তা বলে তো এক লাইনো কবিতা বেরোর না সলম থেকে।”

—করোবে কোথা থেকে কিছু থাকলে তো—বিজয় মনে মনে ভাবে। “আমার মনে হয় তুমি কাজে কাঁচি দিয়ে এই ছাইতম্ব লিখে সময় নষ্ট কর।” বড়বাবু কড়া চোখে বিজয়ের দিকে তাকান। গলা শুকিয়ে ব্যার বিজয়ের, কোনরকমে চোক গিলে বলে, “আজ্ঞে, না, এ একটা কেমন তুল হয়ে গেছে।”

“আজ্ঞা, এনারের মত ছেড়ে দিগুন, তবিত্যতে যদি আর কোনদিন এই রকম চিঠির উত্তর পাই—তোমার চাকরী থাকবে কিনা সন্দেহ। বাও চিঠিগুলো নিয়ে মন দিবে উত্তর লেখ।” বড়বাবু ত্যাগ দিয়ে ওঠেন।

চিঠিগুলো বড়বাবুর হাত থেকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে বিজয়। নতুর্ক হয়ে কাজ করে—না আর কোন সময়

সেই ছুঃখপ্রটাকে মাথার চুকতে দেব না। ছুঃখর নাটো কি—চাকরী নিয়ে টানাটানি!

বাড়ী কিরাতেই বা বিজ্ঞান্সা করেন, “কিরে কাপড় আনিনি না?”

“না বা আম এক অফিসের বন্ধুর বউভাত, কাপড় খুঁজতে দেবী হয় বাবে তাই আর কোকানে ঘুরঘুর না।” মা কিছুকল তুল করে থেকে আবার বিজ্ঞান্সা করেন, “ইনুজ্জেরা টাবলেটও আনিনিমি বোধ হয়?”

“ওঃ বড় তুল হয়ে গেছে। তা আমকে তো আরের প্রথম দিন, দু একদিন বেগো তারপর ওম্বু না হয় আনা হবে।” বিজয় নিজেই কথার ভাবে প্রকাশ করে যেন ওম্বু না আনাই ঠিক হয়েছে। না তুল করে থাকেন। বিজয় হাতবুখ ধূরে জামাকাপড় পরতে থাকে। বা এর মধ্যে এককাপ চা আর ছুঃখনা গরম কটি করে এনেছেন। একখানা কটি তরকারী দিয়ে খেয়ে চাটা শেষ করে ফেলে বিজয়। খোপছুরত কসী লজ্জের পাছারী আর মিলের ভালো কাপড়টা পরে নিজেই বেশ সৌখীন মনে হয় বিজয়ের—এই একপ্রস্ত জামাকাপড় তার তোলা থাকে কোন তর জায়গায় বাওয়া আসার ক্ষত।

“কম্বি পাউডার আছে নাকিরে?” কবলার কাছে পাউডার চায় বিজয়।

“পাউডার থাকবে কোথায়, সেইতো হুমান আপে—একটিন কিনে দিয়েছিলে সে কুরিয়ে গেছে কবে। কত-দিন তোমার বলছি নিয়ে এস একটিন—সে কথা তো কানেই তুলছ না।”

সে কথা কানে তুলবে কি করে? একটি পহলাও জতি এগেরোজনীর মিনিব হাড়া কিছুতে ব্যর করতে গেলে নশবার ভাবতে হয়। ছাড়া কাপড়ে তাল করে খুখটা বলে খেরিয়ে পড়ে বিজয়।

কত দিনেরই কথা বা! সন্ধ্যা বেলা অফিস থেকে কিরে বাইরে যেতে তাল লাগছিল না বিজয়ের ঘরের

বসে থাকতে ইচ্ছা করছিল না। বাড়ীর ছায়ে উঠত বিজয় কদাচিৎ—সেদিন ছায়েই বেড়াতে গেল।

হোভসা পার হয়ে ভেতলার ছায়ের দিগ্ভিত্তে বসন সে উঠেছে, নীলা হুঁকি ছাপ থেকে বেড়িয়ে নেনে আসছিল। হোভলার ভাড়াটেদের মেয়ে নীলা।

“এই যে বিজয় দা। ভারী অলস হয়েছে আপনার কবিতা।” নীলার চোখ দুটি চেয়েছিল তার দিকে সঙ্গশংস দৃষ্টিতে।

“আমার কবিতা! কোথায় দেখলে তুমি?” বিজয় বিস্মিত হয়ে পড়েছিল—ভাকতে পারে নি তার কবিতা নীলার চোখে পড়বে।

“কেন, আশ্ব বখন গিয়ন ‘ছন্দা’ ঘিরে গেল, আমি তখন তো কমলাদির সংগে গল্প করছিলাম। কমলাদি পাভা উটোভেই আপনার কবিতা চোখে পড়ল—প্রথম পাভার সতিভা ভারী লুপ্ত হয়েছে আপনার কবিতা।”

নীলার মিষ্টবরের আত্মবিক অভিনয়ন তার মনে কি বোলাই দিয়েছিল। আকাশ ভরে সেখিল ঘোঁংঘার নাক্তাখাল। ছায়ের ভাড়া কানিসে কল্লই দুটো রেখে ছুরাতের ভাঙ্গুর মধ্যে বুখ ভরে সে চেয়েছিল সবুখ পানে উদাস দৃষ্টি বেশে—বতবুর দৃষ্টি পড়ে শুধু বাড়ীর গা বেঁধে বাড়ী ঘোঁংঘার আলো কিকে সুরাগার বত ভাঙ্গের জাঙ্কর করে রেখেছিল।

বতবুর মধুর পরিবেশ। কিছুকনের জন্ত সেদিন সে ভুলে গিয়েছিল তার অতীত, বতবান—ভুলে গিয়েছিল সে ১২৫৭ টাকা বাহিনীর কুস্ত কেরানী, যাড়ে দুটো জ্বলুদা বোন, নাবালক তাই আর বিধবা মা।

নিজের জীবনে তার কামনা ছিল একটি ছোট ঘর—একাত্ত আপনার। সেই ঘরে থাকবে একটি লিখবার টেবিল আর চেয়ার—একটা আরাম কেদারা জানলার বায়ে দেয়ালের গারে টাঙান বই ভক্তি কাঠের ব্যাক্স। নিজের জীবন পরিপূর্ণ সাহিত্য সাধনায় সে কাটিয়ে যাবে। সেই দিন সেই সময় তার কল্পনা তার কামনার

কিছু রূপ পরিবর্তন করেছিল। সেই ছোট ঘরের পরিধি হরতো বিস্তৃত হয় নি, কিন্তু তার একক বাসীখ সে করনা করে নি। নীলা এসেছিল সেদিন সে ঘরের ভগ্নী হয়ে। হুটুটে বেরে নীলাকে ঘিরে সেদিনের বত করনা শুধু করনাই হয়ে গেল। নীলা আশ পরতী।

পরে যেতে যেতে সেই সন্ধ্যার কথাই তাবতে বিজয়। তার মনের স্পষ্ট কামনা গন্তরাজে তাকে সে কোন রাঙ্জে নিয়ে গিয়েছিল? নিজের তুচ্ছ দাবীর পরিবর্তে সে সাম্রাজ্যের অধিকার পেয়েছিল। তবিশ্বং শুধু তবিশ্বং! তবিশ্বত্তের জন্ত সে নিরাশ নয় আবার বড় কিছুও আশা করে না। তবে বতবানের এই জীবন? এর মধ্যে কোন আদম নেই আছে শুধু বতব। সন্ধ্যাদানের শূন্য।

দূরে শেখরদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। মনে হচ্ছে শূন্য সাজিয়েছে। সাতাবেই বা না কেন? কলকাতার ওদের নিজেদের বিরাট বাড়ী। ওর ঠাকুরা এক লাখ টাকা জমা রেখে ওদের অফিসের ক্যাশিয়ার হয়েছিলেন। ওর বাবা এখন ক্যাশিয়ার—নিজেদের বাড়ীর ঘোঁটের অফিসে আনেন। নিজের মনোই বিজয় হেসে ওঠে—অতুত! এঁদের ঠাকুরা টাকা থাকে সবুখ এরা গোলাঘাী করেন শাস্ত্র, নিরাপদ জীবন বাপনের জন্ত। বাঙলের কটিন কুট জীবনের সঙ্গে বদি ওদের কোনদিন পরিচয় হয়, কেবন হবে সেই পরিচয়ের প্রতিক্রিয়া ওদের পলুকা আলতো জীবনে?

বাড়ীর চারপাশের গাছগুলো ওরে নানা রঙের বিকলী বাস্তি। বাড়ীর সাধনের প্রাংগণ শুড়ে বিরাট সাদিয়ানা টাঙানো—নীলাভ আলোর ভরে উঠেছে তার শূন্যতা। দূরে বেবীর ওপর বসে একজন বেহালা বাজাচ্ছেন—ইমনকলাপ। বিভিন্ন স্রুশেপ সঙ্কার ইতস্তত বাজায়ত করছেন নরনারীর দল—বতবুর পরিবেশ।

দূর থেকে তাই দেখতে দেখতে কখন বিজয় তাবে, এই কি তার সেই তোয়ের দেখা বহু!

দূর বন্দর

শ্রীশান্তিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়

দীঘল থেকে নেমে তেঁটি পেরিয়ে বাইরের খোলা আলোয় এসে ঝড়ালো নারায়ণদাস। একটা কৃত্তির নিঃশ্বাস কেলে এবার শুবার চাইলে বার কয়েক, তারপর ছুটকেন্দটা হাত বল করে নেমে পড়ে পথে।

নাথার গুপত খা পা করছে চৈত্রেব আন্তন হুড়ানো হোদ। এখানে শুখানে কাটল বরছে মাটির বুকে। পথে বাহুবের দেখাটি নেই, আপে পাশে নেই কোন জন-পদের চিহ্ন। এখানে যেন বাহুবের অস্তিত্ব থেকে নেই।

খাল পারের তেঁতের আল খয়ে চলতে চলতে ভালো করে দৃষ্টিপাত করে নারায়ণদাস।

দূরে শুটি কয় অব'উলঙ্গ ছেলে গামছা দিয়ে খালের ঘর জল হিঁকে মাছ বরাহ ব্যাপ্ত: একটানা কলরব ভেসে আসছে সেখান থেকে।

বড় ভালো লাগলো। মনে পড়লো ছোট বেলার দিনগুলির কথা। তারাত্ত তো এমনটি ছিল একদিন। পথ চলতে আপনি ঝাড়িয়ে পড়ে একদমর।

—মাছ উঠলো রে খোকা ?

—হ: উঠছে বটে, কিন্তু মাছ না—বাছেব পো, ব্যাভ্যটি।

খিন্ খিন্ করে হেসে উঠলো ছেলের দল।

—বাইয়েন কৈ বাহু। ল'বাসে কাগা মাথা একটা ছেলে ভলে ঝাড়িয়েই গ্রন করে তারিক্তি চালো।

—অনেক দূর। হেসে উত্তর বিল নারায়ণদাস।

—কইন্তে ডর কি ! এই ল্যাগেই তো ?

—হুঁ ! বলতলী। চেনো ?

—তিনিমা আবার ! ভা—বাড়ীত্ চলছেন বুকি ? বাড়টা অস্বাভাবিক ভাঁচু করে বললে ছেলেটি।

—হুঁ !

হেঁ হেঁ করে আবার ছেলের দল ব্যস্ত হয়ে উঠলো মাছ বরাহ। আর ঝাড়ার না নারায়ণদাস। হন্বন্

করে পা চালানো সামনে।

বোনের শুভ যেন আরও বেড়েছে। কিন্তু বাহুব কৈ, গ্রাম কৈ ? এ বে আনন্দমঠের সেই দ্বন্দান ! পর আছে, কিন্তু গৃহী নেই। বাহুবের স্মরণ আছে, কিন্তু অস্তিত্ব নেই। কেত আছে তবু কল্লপ স্থষ্টির আভাস নেই। একোন দেশ ? এতো তার জননী জগজ্জুনি নয় ! এবেন কোন বনীতাক্তি নিঃশ্বাস গ্রাম। এখানে নেই সজীবতা, নেই কোন গ্রোণের বন্দন।

বাখার অস্তিত্বনে আপনা হতেই জল জবে গুঠে চোখের কোণে। হহুর্ভে বনে দার মনটা। কোন্ দেশের বুকের গুপত দিয়ে হেঁটে চলতে সে ?

তারাক্তি বনে চলতে থাকে নারায়ণদাস।

গ্রান হুঁটো গ্রাম পেরিয়ে তবে বাহুবের সাক্ষাৎ মিললো। দূরে একটা বাখার দেখা বাছে মনে হলো। মনটা একটু সজীব হয় নারায়ণদাসের। তবু কটা বাহুবের মুখ দেখা বাবে, কথা শোনা বাবে। হাত বাড়িটা দেখলো একবার। তিনটে চাম্প।...বেলা পড়ে এলো বল।

বাখারের পাপ দিয়ে চলতে গিয়ে থনকে ঝাড়তে হোলো অকস্মাৎ। কে যেন ডাকছে পেছন থেকে।

—আরে, নারায়ণ গোলাই না ?

অবাক বিশ্বরে কিরে ঝাড়ালো নারায়ণদাস। পাশের একটা বোকান থেকে একগাল হেসে এগিয়ে আসছে এক বৃদ্ধ।

একেবারেই বৃদ্ধ লোকটি। বাখার বিরল বেশ থেকে বুকের ঝাড়ির সবই সাধা। তার গুপত এক হোপ লাগতে আসা। কালোর অস্তিত্বইহু পর্বত নেই। উজ্জল হাসিতে কুঁচকে উঠেছে সমস্ত মুখ, চোখ দুটি পর্বত। তবু যেন মনে হলো, সে রূপের তুলনা নেই।

—আমার বাবুদী বাড়ীর গোসাই ঠাকুর না? হ—
টিক ধরছি। আরে বুড়া হইছি বইলা কি চোখের
মাথোটাগু ধাইছি? পাশে এসে দাঁড়িয়ে হেসে
বললো বৃদ্ধ।

—অবাক হয়ে চার নারায়ণ বাস।

—আপনাকে তো টিক তিন্তে পারলেন না?

মিটিমিটি হালে বৃদ্ধ, ইয়ার করেন দেখি?

চেনা—খুব চেনা মনে হয় বৃদ্ধকে। ভয় স্বরূপ করতে
পারেনা নারায়ণদাস, কোথায় বেঁচেছিল। কতকালের
চেনা।

—তিনবার পারলেন না তো? হা হা করে প্রাণ
খোলা হাসিতে তবে তুললো আপশাসটা বৃদ্ধ। আমি
হলিমুন্না। আপনার বাপের জ্ঞাতব্য। বাপ ডাকছি-
লাব তেনারে। আর আপনার মাথেরে ডাকতাম, মা
অন্নপূর্ণা। একটু চুপ করে, কর্ণ হেসে বললে, ছোট
বেলায় দ্যায় ভাড়ছেন, তিনবার তো কথাই না। কিছু
আমরা পারল্যাম কৈ ভালোতে?

—ওঃ। এতকণে স্মৃতি নছন করে মনে পড়ে নারায়ণ
দাসের। একাক্ষর মনে পড়েছে। কীর মাগুরাবার লোভ
দেখিয়ে আপনাই তো আবার কীধে চড়িয়ে বাড়ী নিয়ে
যেতেন?

—মনে পড়েছে? ছেলে মাছবের মতো জড়িয়ে
থরলো বৃদ্ধ নারায়ণদাসকে। তাই তো কই, এই
বুড়ারে তিনেনা এই তলাটে এমন লোকটা কে আছে?
তা—থর চলছেন বুঝি?

—হ্যাঁ। মনটা বড় টানছিল ক'দিন থেকেই।
লগ্নে ছাড়া লগ্নে একটু নারায়ণদাস।

আর টেনে! হঠাৎ গভীর হয়ে গেল বৃদ্ধ। একটা
পূর্ণ বীর্ণাশাস ঘেরিয়ে এলো তার কীর্ণ পাঞ্জর
ভেদ করে। কত চেষ্টা! করলাম, কিছু পারলাম
না কারুরে আটকাইয়া রাখবার। চইলা গেল সমাই,
গোটা জালটারে কানা কইরা। একটু চুপ করে
বৃদ্ধ। নোঁব করি দম বোবার জেতে। পরে বললে “হাত

জোড় কইরা মিনতি করলেন, পিছন বন্দু কাপড় টাইনা
থরলাম, দুই হাত দিরা লব আড়াল করলাম—খোবার
দিখি, বাইত না মা-তাইরা। কিছু—না, পারলাম না
তাপো আটকাইতে। চইলা গেল সমাই আবার
চোখের পানি করাইয়া।”

মাস টেনে চুপ করলো বৃদ্ধ হলিমুন্না। নেবে এলো
চোখের কোণে জল। কেমন যেন একটু বিস্তৃত বোধ
করে নারায়ণদাস। বলতে পারেন না কিছু খুব মৃটে।

খুব তুললো বৃদ্ধ। বললো “নিখাস করবার পারলো
না আসাম। মনটাই হইল বড়। বনুটা যেন কিছু না।
নদিব—বুঝলেন গোসাই ঠাকুর, লব মগিদের কাম।
তা’না হইলে এই ভাপের মাগুরাগুলি এমন অনাহব
হয়? যেইমন, এই পোড়া অপাইলার জাউটাই
যেইমন।”

ঠাসু ঠাসু করে কপালে করেকটা চাপড় ঘেরে বৃদ্ধ
কীলতে কীলতে বসে পড়লো, টিক নারায়ণদাসের
পারের কাছে।

আজ্ঞে করেক পা পেড়িয়ে গেল নারায়ণ দাস
সর্ভোচ্চের সঙ্গে। তি: করেন কি? উঠে দাঁড়ান। বুড়ো
মাগুরার কি এমন ছেলেমাগুরী শোভা পায়?

এখনটা উঠলো না বৃদ্ধ। মানিকটা সদর গুন্ হয়ে
বসে হইলো। তারপর এক সদর উঠে চলতে চলতে
বললে “হ—শোভা তো পারই না এমন কইরা বুকের
বাখা পেরুকাশ করন। কেবল ‘শোভা’ পরে থম লইয়া
ভাইয়ের লগে কগড়া করন, তাগো মাইরা খাওয়ান।...
শোভা ভাপে একটা বজাও হোটে না খোদা?
বেঁচতাম একবার মাইনদের কোরামতিয়া।”

কোন উত্তর দিলে না নারায়ণ দাস। শুধু একবার
বৃদ্ধের কর্ণ বুখটা দেখে চোখে কিত্তিরে চলতে লাগলো।
পুরোনো দিনের স্মৃতি যেন তারত বৃকে আশ্রয়
আলিয়েছে, টেনে এনেছে চোখের কোণে বৃক নিভানো
ব্যাখার অক্ষ।

হাটতে হাটতে অনেকটা পদ এগিয়ে দিল বৃদ্ধ

নাভারণ দাসকে। কলসীর ডোঁট খালটার কাছে এসে বিদায় নেবার সময় ঠাণ্ডা পণ করে চেলে ধরলো তার বাঁ হাতটা। বললো “পৌসাই ঠাকুর, আর বাইবেন না তো জ্ঞান—গী ডাইরা? আপনারা না থাকলে আমরা বাঁচুন কাগোশইরা কন্! গোড়া জ্ঞানে কি আর মানুষ আছে? বরছে—সব বরছে। কৈখান সব ডাকডিত আইচে, আয়গ খালন কবচে। না বুকি তাগো ভাবা, না পারি তাগো পেরাণে বরবার। উজ্জরে ঘাটতে বস্ছে গোঠি: জাপটা। যেখেন্ন না জ্ঞান—গেভামের ছিটিটা? লকীত্রি কি আছে?”

প্রথমটা কোন উত্তর দিতে পারেনি নাভারণ দাস। অস্তর আবেগে তারঙ্গ বে কঠিনালী তুচ্ছ। এক সময় নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, “থাকবার তো যো নেই বিয়া সাহেব। যেতে হবেই। তবে—আবার আসবো। নিজের দেশকে কি তুলে থাকতে পারি?”

বুড় কিছুক্ষণ চেয়ে রইলো। তার মুখের দিকে। উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে, “গোদার কলস, নিজের জ্ঞান বইলা স্বীকার করেন?”

—তুলতে পারি, নাথাকি? এ দেশের মাটিতে যে আবার বক্তের সম্পর্ক!

—তবে কথা ভান, বাইবার পথে একবারটি অস্তর: এই ককিরের ভিটার পথগুলি বিয়া বাইবেন। বাড়ী না ভিনেন, এই কলসীর বাজারে কাঁচের কইবেন—দেখাইরা দিব। কথা ভান্বেবা করবেন?

কথা দিতে হলো তাকে। বুড়ের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললে, “এমন একটা জ্ঞানের বোজ যদি পেলেমই, হারাযো কোন্ সাহসে? জীবনে বেঁচে থাকলে, কাল হোক, দু’শ বছর পরে হোক—খেখা হবেই হবে।”

—কিন্তু পৌসাই ঠাকুর—খেল করে হাসলো বুড়।—বুড়ো তো আর জুই দশটা বছর বাঁচবে না। কবরের ডাক তো পড়লো বইলা।

—আবার নবের মধ্যে তো পে চিরদিন বেঁচে

থাকবে। তুলতে গেলে বুক চেপে ধরবে। উজ্জল চোখ দুটি তুলে বললো নাভারণ দাস।

চমকে উঠলো একবার বুড় ছলিহুয়ার শীর্ষ দেহটা। আবেগে জড়িয়ে ধরলো নাভারণ দাসকে। একবারে বুকের মধ্যে। সেখানে সেখানে ছুঁতোখের ভাড়া জেপ করে নেমে এলো অস্তর বজা। মাথাটা নড়ছে অস্বাভাবিক। ঠোঁট দুটিও যেন বার বার ঝেঁপে উঠছে। অশ্রুটি ধ্যানিত হোলো “খোদা দেহেরখান্...খোদা—খোদা!”

নিজেকে একটু সন্তুষ্ট করে ছাড়িয়ে নিয়ে আর দাঁড়ালো না নাভারণ দাস। দাঁড়াতে পারলো না। বুকের মধ্যে কোথার যেন ঘূর্ণি কড় উঠেছে। বুকি উজ্জরে নেবে এই বুদ্ধের, বনের সবকিছু বাঁধন।

শ্রুটেকেসটা হাত বদল করে, পোলটা পেরিয়ে চলতে শুরু করলো লজক বেয়ে। অনেকটা জোরে ছুটব গতিতে।

বুড়ের ঝাঁকে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়ালো। এক নজর পেছন ফিরে তাকালো। বুড় ছলিহুয়া তেমনি দাঁড়িয়ে আছে ঠাণ্ডা তার দিকে চেয়ে। ওহুনি বুকি তেড়ে পড়বে তার হুয়ে আসা দেহটা।

চোখাচোখি হতেই হাত তুলে চিৎকার করে কি বললো বুড়। বোণ হর আদাব। বোণ হর অস্ত কিছু।

সেও এক মুহূর্ত। তারপরই আবার ফিরে পা চালালো নাভারণ দাস।

সন্ধ্যার মুখে গ্রামের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো সে। বড় জাফ, বড় অবসর লাগছে দেহটা। চারিদিকে গভীর বৃষ্টিপাত করলো একবার। সবই আছে। সেই বাজার সেই বুড়ো বকুল গাছে ঘেরা হাই বুল, সেই খেলার মাঠ, এমন কি বিহাবী পাখীওরালোয়ের পুরোনো আত্মনাটা পর্যন্ত—নেই শুধু সজীব প্রাণস্পন্দন। একটা দীর্ঘবাস ঘেরিয়ে এলো তার বুক ভেদ করে।

বাড়ারটা আলোর সম্পর্কহীন। কুলবাড়ীটা পোহো বাড়ীর রূপ নিয়ে গম্বুস করছে। কটন কনকত দুই

দূরে দু'চায়তে বাত্ন মাহুকের ভীতভরিত আলোগোনা যেন শ্রেতপুত্রীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে।

অকস্মাৎ পিউরে উঠলো নারায়ণদাস। তবে তরে দুখ তুলে চাইলো মাঝার ওপহ। একরাশ অটুপই করে উড়ে এসে গাছের ভালে বস। পাখীর ব্যস্ত হবেও যেন কেমন হবে আসে মনটা। গাটা চম্‌চম্‌ করে। ভাবতে গিয়ে অবাধ হয় এই প্রেমই নাকি এককালে মহাশয়ের দুখর গ্রাণ চকলভার ভেগে থাকতো অবিদ্যায়।

আর ঝড়ালো না। ছোট ছোট পথটায় নেমে এসিয়ে চললো রাস্তা পথকেপে। আশে পাশে একটানা ক্রিষ্টি পোকাকার ঐক্যভান চলছে। শেরাল আর পাঁচার বিস্তৃত স্বর থেকে থেকে ক্রমশ উচ্চমার্গে উঠছে। হিম্মল আর গাবগাহের ছায়ায় যেন কিসের অগত ইঙ্গিত। হুম্‌হুম্‌ করে পাটা, নিষেধ পাঠের নশে নিজেই চমকে ওঠে বাহবার নারায়ণদাস।

আবার খেবে পড়লো সে পথের মাঝেই। দূরে যেন কাঁদের কথা শোনা যাচ্ছে। কথা তো নয়, যেন ঝাঁকছে যিনিরে যিনিরে।

অনেক সময় কেটে গেল, কিন্তু এলো না কেউ। আবার পা চালালো নারায়ণদাস। পোঠি অফিসের ভাঙা বাড়ীটা বাঁয়ে রেখে বাক দুহাতেই চোখ বুলসে উঠলো।

কুতুবাতীর চতৌরুপের একবারে রাউবাট করে আঙন অলসে। আর তার চারপাশে দূরে দূরে খের জানাজে গতিকর ছায়াসৃষ্টি।

চমকে উঠলো নারায়ণদাস। তার ও হোলো। ইতস্তত করলে ধানিক। মনে পড়লো অপূর্বর কথা কটি।

“মাজিল তো দেখে। গিরে দেখবি হয় না যা করা স্বপ্নানোনার বাড়ী, মরতো মড়ে যরা উলস গৃহস্থের চিত্তাভব। দেখে কি আর মাহুদ আছেরে? তবে হ্যাঁ, একটা সাঙ্কনা, গ্রামের দুখে পড়লেই শুন্‌বি মরণ সাধুর মলের খোল-খড়াল সহযোগে হরি সংকীর্ভন। ওটা এখনও সকাল-সন্ধ্যার ভেগে আছে গ্রামে। যেদিন এ-ও

থাকবে না, জানবি সেপে আর গ্রাম বলতে থাকবে না কিছু।”

অকারণে ভিজে উঠলো কপাল, কুজিত হয়ে আসে দুখের মালস চামড়া। তবে কি সত্তা হেলেব আরু থনালো? ভাবে—ওধু ভাবে সে। বুকের ভেতরটা যেন বড় যেমী ধক ধক করছে।

এসিরে গেল নারায়ণদাস ছায়াসৃষ্টিভলো লক্ষ্য করে। অনেকটা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে।

—কে? বন্ধু ঝড়ালো ছায়াসৃষ্টিভলি। কয়েক দুহুর্জের ব্যবধানে কাছে এসে ঝড়ালো ভাঙা। হঠাৎ যেন ধক খেয়ে ঝড়িরে পড়লো সবাই।

নারায়ণদাস একটা দীর্ঘশ্বাস কেলে ঝড়িরে গেল এককণে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো। কিন্তু উত্তর দিতে পারলে না, হাসলে একটু।

কাকর দুখেই প্রথমটা কথা ছোঁগালো না। এমন ভাবে দুখোমুখি ঝড়ানোর কথাটুকুও যেন সত্তা বলে বিশ্বাস হচ্ছে না কাকর।

অসম্ভব হয়ে হাঁপলো আবার নারায়ণদাস। বললে,—এলাম। মনটা বড় টানছিল ভাই। পথে একটুও দেহী করিনি, লাভে দেখা না পাই কারু?

আরো কাছে এসিরে এলো সামনের মাহুদভলি। একজন বললে—তুল করেছিলে এসে। কিরে বাও গোঁসাই। এবেগে আর মাহুদ নেই।

ধক করে উঠলো বুকের ভেতরটা নারায়ণদাসের। বললে,—কেন? তোমরা তো রয়েছ।

—আজ রাতেই হুই। তারপরই গথে বেকথো।

—কেন?

—থেকে কি হবে? গীরে কি আর মাহুদ আছে?

—কেন মরণ সাধু? ত্রান বৈরাগীর আখড়া?

দুহুর্জে যেন চমকে উঠলো লোকভলি। মনে হোলো একটা চাপা ক্যারার বোল ভেসে উঠলো ভাঙের অক-জড়িত কর্তে।

—মরণ সাধু নেই।

—নেই ?

—না, কাল রাজে সে একা কোথায় চলে গেছে।
ভারি বৈরাগীর আখড়া যেন কারা পুড়ির দিবে গেছে
চোখরাজে। ভারপর থেকে লম্বাই পালিয়েছে আমার।
ও যাবে, কার ভক্ত আর বকেবা ?

কেন যেন গেল বেঁবে গেল নারায়ণদাসের ঘনে।
অনেকটা সময় সামনের আঙনের দিকে চেয়ে রইলো।
বিশ্রুতির মত। ভারপর অসুটে প্রস্থ করলে,—ও
আঙন—?

—বিশ্রহের শেষ কৃত্য। আমাদের সর্ব্ব দিগেই মান,
বর্ষ রক্ষা করে গেলাম তাঁর। ঝাড়তে তো আর পারলাম
না। এতটু চূপ করলো লোকটি। ভারপর বললে,
—গোসাই! বিশ্রহ তো চিত্তার দিলাম না, লম্বজ গ্রাম-
টাকেই বিশর্জন দিলাম তাঁর নাম করে।

মুখ তুলে চাইলো নারায়ণদাস। সবার সহে সিজ,
মুখে চোখে দ্রুত করার ছাপ। মনে হোলো, লোক-
গুলি যেন পাগল হয়ে গেছে।

—যেহুতো কি চেয়ে চেয়ে গোসাই! এ মুখে রাঙ্গুনের
চাপ নেই, নেই কোন হ্রত প্রাণের স্পন্দন।

বর্তমান খেয়ে চোখ নামিয়ে নিলে নারায়ণদাস।
মিকের অন্তিমটুকু লম্বজের যেন লম্বজ লাগতে মনে।
চোখের ওপর এল বকেও যেন লম্বা বিশ্রাস করতে
চাইছে না মন।

চব্ব মিলে যাচ্ছে অপূর্ব্ব কথ:গুলি। তাবলো
নারায়ণদাস। কিছু একটা কথা বলনি অপূর্ব্ব। পদ্ম-
বেবনার বেশে সরবাণ্ড অত্যা হর না।

—এখনো জাবড়ো গোসাই! বেঁচে থাকতে চাইলে
কিরে বাত। বেশ গাঁ কান্না চিরদিন থাকে না। পদ্ম-
বেবনার ভেঙে নেই না ?

গতকিত হয়ে উঠলো নারায়ণদাস। বললে “না,”

—না? কি-না? বিবিত হরে চাইলো সামনের
লোকগুলি।

—কিহবে না। এসেছি যখন ‘ভিটে’ না বাড়িরে

কিছুতেই কিরে যাবে না।

—এত মাথা ভিটের ওপর? কিহ আরে কি কিছু ?

—কিছু না থাক, বাপ-বাণীর পরশটুকুতো আরে
এখনও? হুঁটো প্রথম বেঁবে যাবে দেখানে? নিতে
তো আদি নি, নিতেই এসেছি।

মুখে ঠাডালো নারায়ণদাস। একবার তুলে উঠলো
ভার দেহটা। অনেকখণ্ড চেয়ে রইলো ভার দিকে
সামনের লোকগুলি। একজন বললে,—যেহ! ভিত্ত
নর, ভাড়া দরগুলি বেঁবে যদি অর্থ পাও—তাই হোক।

মুখে মুখে মাথাটা বাড়ী দেখলো নারায়ণদাস।
চোখের সামনে যেন আঁজ নজুন করে মূলে গেল শ্রুতির
ছায়া। ভেঙ্গে উঠলো কত শ্রুতি, কত পরিচিত মুখ,
অর্থ-ভ্রমের কত বিভিন্ন ঘটনা। আজ যেন সেসবও
ভালো লাগছে ভার। ইচ্ছে হচ্ছে না কিরে যেতে।

কাপাল পাছটার নীচে ঠাডালো একবার। আপনা
হতেই হৃৎ করে বুক ঠেলে কারা বেরিয়ে এলো।
ক’টা দিন আগেই বা কথা। এক শ্রুতির হাতে,
এখানেই পিতৃবেদের শেখরত্না হর। আর কাঁঠালের
কাঠের আঙন অগ্নে উঠলো। অসুখে, মাকে বিরে
ছ’টা তাই বেঁবে সে দৃষ্ট...কেনন আশ্রব তাবে
শেষ হয়ে গেল একটা রাঙ্গুনের অস্তিত্ব। কিছু কৈ
ভুলতে তো পারলে না সেদিনের শ্রুতি! চোখের
সামনে ভেঙ্গে গঠে সে দৃষ্ট ছবির মত। মনে হোলো,
সে যেন গত কাল রাজেরই ঘটনা। বাণীর মোড়
বিরে গঠে নারায়ণদাসের বুকের তেতরটা।

ধাড়িরে থাক আর হোলো না, কান্নার ভেঙে বলে
পড়লো দেখানই।

হঠাৎ একটা রব উঠলো মুখে। চব্ব কিরে চাইলো
নারায়ণদাস। মনে হোলো যেন অনেক-অনেকগুলি
লোক দুটে আসছে জতে গা কেকে উঠে ঠাডালো সে।
একটা অজানা আশ্রয় তরে উঠলো মন। পা হুটো
টলে উঠলো একবার। সেও এক হুটুর্ভা ‘ভাংগেরই
পথে নেমে দুটতে শুরু করে দিল। হুটকেনটা? কেলেই।

পেচনের আঙুরাকটা যেন ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে।

কারা যেন ছুটে আসছে সোরগোল তুলে। সাহস বলে বনে ছর না ভরেব। যেন আগল ভাঙা শ্রুতপুরীর চরাগম্ব।

সেতের আলু ধরে, খালের পাড় ঘেঁসে, মাঠের বুক বেধে, ডিগ্গিরি বোর্ডের লড়কটার ওপর যখন এগে দাঁড়ালো নারায়ণদাস, হাত তখন বেধে করি এক গ্রন্থের অতিক্রান্ত। একবার চারদিকে চেয়ে দেখলো। আসে পাশে কোথাও মানুষের অস্তিত্ব শব্দ নেই। দূরে জলটার পাশে হাড়িরে বাকারটাও যেন রক্তস্রব হয়ে উঠেছে বাতের নিশ্চলতার। গ্রানটা লুপ্তে নিঃসড়ে। বৃষ্টি ছুর আর ভাঙের না।

ওপারে, অনেক দীর্ঘে খালের বুক সার দেওয়া নৌকোভঙ্গিও নিশ্চল। মনে হোলো, এখানে কোন দিন গাণ ছিল না, থাকতে পারে না।

একটু দাঁড়িয়ে বুক ভরে দম নিয়ে, সেমিকেই নেমে গেল নারায়ণদাস। যেহটা যেন বজ্র বেধী রক্তর কীপছে। বুকটা চেপে ধরলে একবার।

একবারে বাটের কাছে নেমে গিয়ে অশ্রুতে ডাকলো "মাবি, মাবি।"

কোন সাড়া পেলো না। আবার ডাকলো। এবার একটু জোরে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ঘেঁষে গেল। নিজের অহটাও যেন কেমন ঠাণ্ডা, কেমন গম্বনে বনে হজ্জে।

...তুলে উঠলো লামনের নৌকোটা। আড়মোড়া ভেঙে কে যেন উঠে বসলো মনে হোলো। চমকে উঠলো নারায়ণদাস। ভরসাও হোলো একটু। কাছে এগবার আগেই হৈঁ'এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো একটা লোক, লঠনের ললুভটা বাড়াতে বাড়াতে। লুপ্ত তুলে চাইতে গিয়ে অবাক বিশ্বের সম্মুখে গেল সে। গলার বরটা বতটা লজ্জা বাড়িয়ে বললে, "কে—কি চাই?"

ভয় ভয় করে কাছে নেমে গিয়ে মুখোমুখি দাঁড়াতেই আবার চমকে উঠলো নারায়ণদাস। নিজের চোখ

ছ'টোকেন্ড যেন দুহুর্ডের ভাজে বিখাল করতে চাইলো না। পরমুহুর্তে লোকটাকে জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো "হাবি?"

—কে? অবাক হয়ে লুপ্ত তুললো লোকটা?"

—আমি নারায়ণদাস।

—নারায়ণদাস? যেন বিখাল হোলো না কথাটা তার। আলোটা বুকের কাছে তুলে ভালো করে দেখলো বানিক, তারপর বললে, "এখানে?"

—সে অনেক কথা, পথে বলবো। আগে নৌকো ছাড়। তোরেই দীনারটা ধরতে হবে। বলতে বলতে ছুকে পড়লো হৈঁ'এর ভেতর নারায়ণদাস।

নৌকো খাল ছেড়ে পদ্মার দুপে পড়বার আগেই লম্বা ঘটনাটা গুললে হাবি। বললে না কিছু। ভালো করে একবার ফিরে চাইলে না পথের নারায়ণ দাতার দিকে।

—কি ভাবলো! কথা বল? বানিকটা উসখুস করে প্রশ্ন করলে নারায়ণদাস এক লম্বা।

হাসলে একটু হাবি। বললে,—তাবি চোটবেলার সেই তুলে পড়ার কথা। ছুনিয়া বসলো, তোমরা পাশ করে বেরিয়ে গেলে, আমার আর পড়া হোলো না—মাবির ছেলে মাবিই রয়ে গেলো।

—আর কিছু নহ?

—হাঁ, আরো একটা কথা। বা বাপ-চাচার দুগুণ কেউ তাবেনি। সেই বর্ষ নিয়ে বড়াই করার কথা। কিন্তু ভেবে তুল পাচ্ছি কৈ। পদ্মা-মেঘনারও তুল আছে, কিন্তু ভিয়ার তো তুল নেই।

এবার আর কথা বললো না নারায়ণদাস। বলতে পারলো না। অনেক—অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে এক লম্বা অশ্রুতে বললে,—হরতো বা আছে। নইলে এমন করে তুমিই বা আমার বাঁতে দেবে কেন? তারপর চোখ ফেরালো দূরে—বহু দূরের ভাগ্যতুল দীনার বাটের দিকে। গিটপিট করে আলো জলছে কতকগুলি। আর তার প্রতিবিম্ব ছুঁছে পদ্মার বুক।

প্রায় শেখরাতের দিকে নৌকো লাগলো। শীমার-
ঘাটায়। হাঁটা পথে এনে রহতো আর একটু আগেই
শৌধুনা যেতো। তা' হোক তবু তো নিশ্চিতে
এগেয়ে। পরিপূর্ণ সজ্জা, তত্ত্বজ্ঞান কানার কানার
তরে উঠলো নারায়ণদাসের মন হবিবের প্রতি।

ভোর হবার আগেই একটা শীমার এলো।
গোয়ালন্দ-প্যালেসের। এতক্ষণ কোন কথা বলেনি
হবিব। এবার আর থাকতে পারলো না। নারায়ণ
দাসের হাত ছুঁতে ধরে বললে, জানি আমাদের কথা
তোমাদের মনে থাকবে না। তবু যদি কখনও ইচ্ছে
হয় এলো। পোড়া দেশে বাস করছি। তবু তোমাদের
কাছে গেলে ছুঁতে দিন প্রাপ্ত হুলে ভীষনটাকে উপভোগ
করতে পারবো।

বুকের মধ্যে হবিবের সঙ্কটিত দেহটা চেপে ধরলো
নারায়ণদাস। কোন উত্তর দিতে পারলো না। কত
বেদনাটা যেন সমস্ত বুক ছুঁড়ে চেপে বসেছে তার। তবু
যেন এতটাই বলা হয়ে গেল অনেক কথা।

চমক ভাঙলো ব্যস্ত বাহুবের আনাগোনা আর
শীমারের সিঁটির শব্দে। ততো নুত্রে, চোখের জল চেপে
ক্রম এগিয়ে গেল সে জেতি পেরিয়ে আহাজের দিকে।

নারায়ণদাস যখন আহাজের ডেকে, শীমার তখন
চলতে শুরু করেছে। তুতুল গর্জন করে জল কেটে
এগিয়ে চলেছে গোয়ালন্দর পথে।

চোখ ফেরালো নারায়ণদাস। হবিব তখন ওঠার
দাঁড়িয়ে জন্মির ওপর। মনে হলো তার চোখেই কোল
ছুঁতে যেন টুলু করছে।

সব্বৎসর না শে মৃত্যু। মৃত্যু ডেকে বলে পড়লো।
যখন চোখ তুলে চাইলো, ভাগ্যকুল শীমার ঘাটে তখন
বহু শেখনে। এত শেখনে যে জলমলে আলোকলি
ছাড়ি আর কিছুই চোখে বরা পড়ে না গোটাভরণে।

জল কাটার নজটা বড় বেনী করে কানে বাজছে।
চোখ নাহালো নারায়ণদাস। পদ্মার কল্যাণে লেগে নাচেছে
আহাজ থেকে ছিটকে বেরুনো একরাশ আলো। আর
চেউ—ওহু চেউ চারিদিকে।

নারায়ণদাসের বুকও চেউ ওঠে। চিৎকার চিৎকার
তোলপাড় করে বুকুর ভেতরটা। যেন একটা চাপা
কান্না পাক খেয়ে বুকের বুকের বেরতে চাইছে বুক ঠেলে।

এক সময় চোখের দৃষ্টি কাপলো হয়ে টপটপ করে
করে পড়লো কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু। মনে পড়ে গেল
রক্ত হলিমুজ্জার ব্যথার করণ দুখটা।—নাঃ এ ভীষনে
যুক্তি আর কথাটা রাখা হোলো না হলিমুজ্জার কাছে।

বিগ্রহের চিতাটাও ভেসে উঠলো চোখের ওপর।
ভারপরই ফেলে আসা বাহুবলির মূখ। কিন্তু তারতে
গিরে খেই পেলো না। পদ্মার মতই যেন উবেলিত হয়ে
উঠেছে নারায়ণদাসের বুকুর ভেতরটা। দৃষ্টি ফিরিয়ে
নিলে আকাশের দিকে।

হঠাৎ কেমন ভালো লাগলো, কৃষ্ণি নেনে এলো
দৃষ্টিতে। পুনের আকাশে তখন সূর্যের অস্ত্রবান সমাধি।
আকাশ ঝুঁড়ে বেরছে তার দীপ্তি। বুকে—বহু বুকে
অশ্রুই দেখা যাচ্ছে আসন্ন গোরালন্দ ঘাটে।

বুকের সেনে এবার বুক বুন ভাঙার পালা।



পলাশের নেশা

অখিলেশ্বর ভট্টাচার্য

সরকারী অফিসের কেরানী প্রতিমা রায় অফিস থেকে ফিরেছে। বিধবা বিধির মেয়ে ছয় বছরের বন্ধু শেখা ফেলে বোঁড়ে এল মাদী তার ভক্ত কিছু এনেচে কি না দেখতে। মুখটা কালি করে বন্ধু ফিরে গেল। প্রতিমা রায় ঘরে ঢুকে ভানো কাগজ বুলে ঘরের বাইরে পা দিচ্ছেই বুঝা না একটা খবরের চিঠি গর হাতে দিল। 'কে লিখেছেরে?' মায়ের এই কৌতূহলী প্রশ্নে প্রতিমা রায় ক্রুদ্ধিত করে মনে করলো না আজও গোয়েন্দা-গিরি করতে চায়। কিন্তু বুঝা। পরকথের তার বুঝে একটা নির্লিপ্তের হাসি ফুটে উঠলো। হরতো কিছুটা আক্ষেপও ফুটে উঠলো সেই হাসিতে। খোঁবন ছুরিতে গিরে উত্তর-ভিরিলে বরষ পড়েছে। দেহটা বুড়িয়েছে একটু বেশী। কপালের চামড়া ফুঁচকে গিরে বিরক্তির একটা চিরহাসী বসেবসে এঁকে দিয়েছে। মুখখানায় লালিত্যের আভাষটুকু শেষ হয়ে গিরেছে শেষবার বিশ্বের পাকাপাকি বন্দোবস্ত ভেবে বাবার সঙ্গে সঙ্গে। প্রতিমার বাপ অজিগত বংশ ছাড়া মেয়ের গিরে ঘেঁষন না। প্রাচীন অমিন্দ্রী ঐশ্বের বাস্তব ল্পন যতই দূরে সরতে থাকলো, ততই বুড়িতে সে ঐশ্বের ল্পন-মায়ুর্ষ বেড়ে উঠলো। সেই মায়ার অজিগত বংশের উপরই নজরটা আটকে থাকলো প্রতিমার জন্ম বর বঁচতে গিরেও। একটানে চিঠিটা হিঁকে পড়ে ফেললো প্রতিমা। তুফা লিখেছে। গর বর বদলী হবে শীগগিরই বিলী থেকে বোকে। এর মধ্যে ওরা একবার আসবে কলকাতার। তখন দেখা হবে ইত্যাদি আনিরে চিঠি শেষ করেছে তুফা। চিঠির এক কোণে খোঁচা-প্রকাশের টিকানাটা লিখে গিরেছে। প্রতিমাই জানতে চেয়েছিলো।

ওর সম্বন্ধে প্রতিমার এই বে কৌতূহল এর কি আজও কোন সার্বকতা থাকতে পারে? কলমে তুফা ঠাট্টা করতো। স্বীকার না করলেও প্রতিমার বুঝ রক্তির হয়ে

উঠতো তুফার অকৃত ঠাট্টার। তুফার কথায় প্রতিমা রাগ করতো। কিন্তু থাকে ভাল লাগে তার সঙ্গে মিলে থাকে ভালবেসে কাছে টানবার সাহস ছিল না তুফার মতো। তা ছাড়া বাড়ীতে সমাজ গ্রন্থী ছিল অনেক-ছোড়া চোখ। বাড়ীর শিক্ষানীক্ষা, সার্থাগিরি বিগত পুরুষদের কীতি-গরিমা তরুণ-তরুণীর প্রেমের ব্যাপারটা রেবেছিল তুচ্ছ করে। অতি তুচ্ছ আর অতি কবর। প্রতিমা ছিল ভালো মেয়ে। সমাজ যে পথে তার বদলীকে সানাইয়ের সুরে বরণ করে আনবে, সেই পথেই অস্টার দায়িত্ব ছিল তার। গলি পুণ্ডির চোরা পথে খারাপ মেয়েদের আনিরোপা। ও পথে যেননাই নেই। ওপথে পুণ, তরুণের ঐশ্বার। কিন্তু তুফা? ও তো অজকারে ভুবে যারিন! মনের মায়ুর্ষকে বিয়ে করে বেশ সুখেইতো দিন কাটতে গর। দিদি এল চা খাব খাবার নিরে। বললো, 'বিরে পুকা, চুল করে বসে কি তাবছিল?'

প্রতিমা হাই তুলে বললো, 'শরীরটা আজ ভাল নেই। সেই কখন থেকে মাথাটা চিন্ চিন্ করছে।'

বিধি কোমল কণ্ঠে বললো, 'গুপ্তে বুঝি চা খাসনি? তুচ্ছ হলে প্রতিমা বললো, 'ঘেয়েছিলুম টিকই। তবু কেন যে মাথাটা বেরেছে বুঝতে পারছি না।'

'শোন,' প্রতিমার বিধি বলতে লাগলো; 'ও বাড়ী থেকে বুড়োটা এসেছিল। নিরে যেতে চায় শীগগিরই।'

'বিধি!' প্রতিমা রাগে ফেটে পড়লো; 'ভের ওই বুড়োকে চুকতে গিরেছে? কি ইতলব তোমার? ছোট-বোনের রোজগারের ভাত গলাব, ঠেংবে? তাই যেতে চাও তই চামারের বাড়ী?'

প্রতিমার বিধি একটু চুল করে থেকে শান্ত গলায় বললো, 'রাগ করিনি; ঠাণ্ডা হয়ে কথাটা বুঝতে চেষ্টা কর। হাজার বোঁক খরচবাড়ীতো! তাছাড়া মজুতো ও বাড়ীরই মেয়ে। ওর বোকা কুই বইতে খানি কেন?'

প্রতিমা চূর্ণ করণো।

আজকাল বা ও যেন কেমন হয়ে গেছে। ঘরের রোজগারে দিন চলছে একথা ভাবতে কি তার কষ্ট হচ্ছে? অথচ প্রতিমা যদি এখানে থেকে চাকরিনা করতো, তবে এরা ঈড়োতো কোথায়? বাবার মৃত্যুর পর যৌর দুদিনে প্রতিমাই একা সাংসারিক হুংক কটের বিকটে লড়াই করেছে ঐকান্তিক চেষ্টায়। মনে মনে লাবনা ছিল, বিশ্বের জল নাইবা ফুটলো। সংসার প্রতিপালনের এই যে লাবনা, এই যে কটা প্রাণকে অন্যাহারের মুখ থেকে বাঁচানো রোজগার করে, এই তো তার চরম সার্থকতা। চারিদিকে অথই জলের মাতবানে প্রতিমা হয়েছে যৌনের আশ্রয়। আজ চারিদিক থেকে স্রোতের আবর্ত যেন বড়বড় করে এই বালির চড়াকে গ্রাস করতে।

লজ্যাক বিকে প্রতিমা বাসা থেকে বেরবার সময় ওর দিদি বলল, 'শরীরটা এখন ভাল নেই, আজ না হয় নাই বা গেলি টিউনানিতে।' স্নান হানি হেসে প্রতিমা পাশ কাট্টিয়ে বেরিয়ে গেল। দিদি লজ্যাকুত্তি জানাতে চায়। ও স্বামী পেয়েছিল। বিশ্বের দুবছর পরই স্বামীর মৃত্যু হয়। একমাত্র বেরকে নিয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। স্বত্তরবাড়ীতে ওর ওপর দুর্ব্যবহার চলে। তবু ওই বাড়ীতেই কিংবে যেতে চায় সে। সেটা ওর স্বামীর বাড়ী। হঠাৎ চমকে উঠলো প্রতিমা যাত্রার নারটা পড়ে। জুল করে অস্ত্র পথে চলে এসেছে। আজ আর টিউনানিতে বাওয়ার ইচ্ছা নেই। অন্য কোত্থলে সে জ্যোতিগ্রকামের ঠিকানাটা মনে করতে চেষ্টা করলো। একটা বাড়ীর সামনে এসে কড়াটা বার ছুরক নেড়েই চলে যেতে পা বাড়িয়ে প্রতিমা একটু থমকে গাড়াল। 'কাকে চাই?'

চল্লিপের কাছাকাছি থরগ হবে এমন একজন জ্ঞানলোক তাকে জিজ্ঞাসা করছে।

একটু পেনে প্রতিমা বললো, 'জ্যোতিগ্রকাম বাবু থাকেন এই বাড়ীতে?' গলটা বার তিনেক কেঁপে

উঠেছিল এই অন্ন করটা কথা বলতে যিরেত্ত।

'জ্যোতি বাবু? আচ্ছা গাড়ান।' বলেই জ্ঞানলোক থড়ানু করে দরজাটা বন্ধ করে দিচ্ছে চলে গেলেন। প্রতিমা বস্তকণ গাড়িয়েছিল, খেয়াল নেই। হঠাৎ কানে এল, 'কে? প্রতিমা?' জ্যোতিগ্রকাম ওর অত্যন্ত কাছে এসে পড়েছে।

'এমন তাৎবে তুমি আসবে, একথা ভাবতেও পারিনি।' তারপর দরজাটা ঠেলে প্রতিমাকে নিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকলো।

অনেক ভাড়াটের সকেজুক চোখ ওকে লক্ষ্য করছে, চোখে না দেখলেও প্রতিমা তা অনুভব করতে পারছে। নোংরা আর পিচ্ছিল উঠান লজ্জপে পার হয়ে দীর্ঘ বারান্দার শেষ প্রান্তে এসে প্রতিমা থমকে গাড়ালো। জ্যোতিগ্রকাম ভক্তকণে বারান্দা-লংগর একটা ঘরে মাছুর বিঠিরে ভিতর থেকে ওকে ডাকছে। একটু ইতস্ততঃ করে ঘরের সামনেই জুতো ছোড়ারেখে প্রতিমা ভিতরে ঢুকলো। হ্যাঁটাটা রাখলো বেয়ালে ঠেকিয়ে। ঘরেই এক কোণে পুরানো ভাঙা হোলনার কাঁধ কাপড়ে অড়ানো একটা শিশু উঠলো; তার পরেই ওর হল কারা। বছর সাতকের একটা মেয়ে ভাঙা স্টেট আর ছেঁড়া বাংলা ও অংকের বই নিয়ে বসেছিলো আর এক কোণে। জ্যোতিগ্রকাম ওকে বললো, 'বাতো। দীপগির বাকে ডেকে আনগে।' ঘরের পাশে গাড়ালেন এক বিধবা মহিলা। ওর হাত ধরে গাড়িয়ে একটু বছর চারেকের ছেলে। ছেলেকে বক্ত রোপা।

'কেরে থোকা! ওকে তো তিনতে পারলুম না?' মহিলাটি বললেন।

জ্যোতিগ্রকাম বললো, 'না শিশী! ওকে তুমি তিনবে কি করে?'

'দে, দে, ওকে আমার কাছে যে, বলে জ্যোতি গ্রকামের পিনীবা শিশুটিকে কোলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।

কণ্ঠ ছেগেটকে দেখিবে জ্যোতিপ্রকাশ বললো
'এটি আমার বিজয় হলে। বড় মেয়েটি ওর মাকে
ডাকতে গেছে। তৃতীয় সম্মান বেঁচে নেই। চতুর্থ
কম্মার টেটানি তো এখনও জন্মতে পাচ্ছে।'

এই অল্পত পত্রিবেশ প্রতিমার আল লাগছিল না।
বাইরে শোনা গেল কে কেন বলছে, 'বৌমা, খোকার
সঙ্গে ওখের কে এসেছে?'

একটা মুহূর্তের আন্তরিক হল, 'কি জানি! কেউ
তো আমাকে বলে নি।' প্রতিমার মনে হল বড় কণ্ঠ,
বড়ো বেদনাত্মক সেই স্বর। অকস্মাৎ অব্যবহৃত জীবনের
এই কন্ঠ নয় একাধারে প্রতিমার মন বিচলিত হরে
উঠলো। বিবাহিত জীবনের শাস্তির নীতি কি এই?
আলাপনত জ্যোতিপ্রকাশের দিকে চেয়ে প্রতিমার মনে
হলো চেহারার সেই ভীষণতা, বুড়ির সেই নীতি কোণার

উড়ে গেছে! এই শাস্তির নীড়ে নিজেকে কল্পনা করে
প্রতিমা পিউরে উঠলো। না, না, এমন জীবন নয়!
এ জীবন লে চারনা।

আচমকা উঠে বাড়িরে প্রতিমা বিহার নিল,

'আজ উঠি তা' হলে'

'না না- এরই মধ্যে উঠবে কি,' বাবা দিল জ্যোতি-
প্রকাশ।

'আর কিছু না হোক একটু চা ভো খেতে যাবে।'

হাসে একটু হাসল প্রতিমা 'সে হবে আরেকদিন।'

কিন্তু আর কোন দিনই কি প্রতিমা এ বাড়ীতে চুকতে
পারবে? চুকবার প্রবৃত্তি হবে ওর?

বাইরে শ্রাবণের হাত। টিপ টিপ করে রুটি পড়তে।

হাত বাড়িয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে প্রতিমা রাস্তায় নামল।

আগামী

অনিমিত্তে চৌধুরী

কাণো বখনলো আড়লভঁনে ঝিকিমিকি আলো ফলকে,

হীরা-চুরীর অলমূল বেহাগজা,—

আভগ কাঁচের তুলসী নাচের কোমল-মোলন ছল,

গোনার বাঁচার তুক-সাহী গান গাওয়া—

সে বুগ গিরেছে! বা গিরেছে বাক,

সোনা থেকে রূপো, সোনার-সোনার, সেবে

বন্ধীহুগের বাঁধন-শালায় দুয়ার পড়েছে গুলে,

সহসা আগের উজ্জল ডেউ-নাগা—

এলেতে এ বুগ। বা এলেছে থাক,

উড়ে-বজ্রের বুণোর-কাঁকরে মেখা,

হিল্লি আগের হাঙ্কাকারে তোলা, শুই

বুগ চোখেও বসে পরশ-নাগা—

আগামী বুগের। আগসে সে বুগ,

আকাশ-বাড়ীর মিতালীর হয়ে হবে,

জীবন-মরণে মিলন-প্রতি-বাধা—

আগের স্বর্ণাধারার বজ্রাজোতে!

বোহেমীয়

গোবিন্দচরণ বুধোপাখ্যায়

চোখের জলের পরাব গিয়েছি ত্রেব—
তুলেছি জলসা, মাঠের মহলা, বাড়ি।
রতীন স্বপন বেবেছি সোফুন কের—
উর্ক আকাশে নতের আভাস বাড়ি।
তত্ত্ব বাসুর কার্পেটে দিই নিদ্।
কাঁকা আশ্রয়, কোথা কেত আধুরের ?
স্বর্গা চোখেতে লাকী কোথা ? গুয়েসিন ?
মাখি কুৎকুৎ হুটো হুটো আভাসের।
বোহেমিয়ান-মন বেহুইন কাঁদনার
দহাজ সত্তরাজ, লাহলে বেবেছি নিদ্।
গোমের সলাবে ছিলো কাঁটা হাম তাম
কষতো দিই নি, আনন্দে করেছি ঢিল।
আখরোট যনে ওকনো বেহুয়ে তবু
কতো বহু আভে, তুলতে পারি কি কত ?

স্মৃতির পাখী

প্রণবদুয়ার বুধোপাখ্যায়

স্মৃতির পাখিরা পাখা কাপটার,
কাকে যনে পকে আজ সজ্জায়।
জানার জানার, আঁহা, কান হুহ
কান যন বোঁকো হরে উৎসুক।
মিটে গেছে বার সব সেন-বেলা
সে নেহে তো আর কিহে আসবে না।
উজল রেখে এককটি হেনা
চকিরে বেবে না। ভরিরে বেবে না
তোমার ভবন এই সজ্জায়
হুহর রেখে। পাখীরা বার
কিহে আসবে না কোনদিন হার,
তোমার ওস্ত-নয়ন কোনার।
তবু কেন বুধা আজ সজ্জায়
স্মৃতির পাখিরা জানা কাপটার।

স্বপ্ন

প্রভাকর দাশি

আমরা স্বপন বেবি প্রাত্যহিক খেবনার ভুলি
আগিছে নতুন দিন পুথিবীতে স্বর্করোজল।
মিররের ঘরে ঘরে মিলেবিত গ্রাসদুন্দুলি
নতুন পাখীর গানে নতুন আনন্দে কলোবল।
আখিরের মৌল মতে, হেবতের জান গোবুলীতে,
লগ্নত-ভাবল যানে, দুফানন শিশির কণার।

লবী কয়েগ-গানে, বিহকের ব্যাখুল নলীতে,
আবাবের স্বপ্ন-কণা আখিরে উড়ে উড়ে যায়।
গ্রাইনডিহাসির লোক অবদুত হয়ে তিরতরে
সতর্পনে হিমলায়েব অভকারে বাবে নির্বাণল।
হুজিবে বিমল হাত বকিতের দিকত অবরে,
হাল্লেবে করিবে নলী অস্তরের নিখিত বদন।

লীখনের ধাক্কাজোত উজ্জিরা উট্রাবে কর্ণালোকে
পূর্ণাণার চেহ আকো দিন সখি স্বপ্নাতুর চোখে।

সুহৃৎজনা

সুহৃৎজি যোব

কি নামে তোমার ডাকবো যে বলো সুহৃৎজনা ।

যদিও তুমি উদাত্ত নহবে, কণ্ঠে পাতে

ট্রাকটিক ও ট্রায়ে কংক্রিটে রচি কি যন্ত্রনা—

জনন্য মনে আশ্রয় পেতেছি ঐক্যতানে ।

ভাইতো মানবকতা তোমার স্বরে হায়

কীৰ পেতে হবে আটিকে রেবেছি—বিষম ঊহ ।

যদিও পালানো সুহৃৎ মনের বন্ধ বীণায়—

এবারে মিটাক বক্তা তোমার স্বর মাঝ ।

হে বিশ্বকর্মা, কি যারা তোমাকে অধর কোণে—

যেইতে বেঁধে বরণের কোম মনের মূল ।

তোমাকে তোলা যে কঠিন করেত নহবে মনে

কঠোর গড়ে কথা গড়ে—নাথের মূল ।

তোমাকে নিয়ে যে শিঙা আবার স্বর বোনা

কি নামে তোমার ডাকবো বলো তো সুহৃৎজনা ।

সূর্যস্বপ্ন

বিষমায় সৌম্যুদী

এবারে আত্ম জালেমি অন্ধকারে

লীকনের ডান হাটের তলার শেষ,

শীতল অন্ধ পথানের গারিবারে—

জুগান জোলেদি, হুতে হুতে নিঃশেষ ।

তবু জেনো আরো যন্ত্রনের ইতিহাস,

কালের পাতার দহর বিচেষ্টে নিখে—

দাঁড় কখন এসেছে সর্বনাশ,

জুগানের আরো জোলেদি অন্ধাঙ্কিত ।

উষিহালার স্বপ্ন কেবেছি যেও—

হাজার হাজার আরো মোতে ভালে,

জ্ঞান যে মনে, ব্যর্থতার ভেদ ? কেন হু

আর্জ্যবোধের পথর দে কি আসে ।

জন্মেত হোয়, পথের বহু তবু—

এসেত নতুন পৃথিবী বক্তার বাকী—

কীবারের শেষে চিডা জলে বার হু হু—

হাজির শেষে আদোকেত হাডকাহি ।

গান্ধেশ্বর বহু

কণপ্রভা ভাঙ্কড়ী

হে আত্মী,
তোমা হতে বহুব্রহ্মের লোকান্তরে হিঙ্গু
সহসা তনিত্ব;
বীণাঙ্গনি সম মম হৃদয় তন্ত্রীতে।
তুমি ডাক দিলে যোরে উজ্জল সজীতে,
সুষ্ঠি ছাড়া, সর্বভোলা, অস্পষ্ট ইন্ডিতে।
হাত বসে নিষে এসে, তোমার কোলের কাছে
বিজন প্রবেশে;
মেথালে মোহিনী রূপ।

নানা ছন্দে, নানা তালে কলোচ্ছল গান্ধেশ্বরী
যারা অপরূপ।

অতি পৈশম্ব থেকে গঙ্গাকে বহুতলে বহবার বেগে
আগতি; তবু মনে হয়, যেন এ বেগের শেষ নেই।
আবার কল কল্যায়ের সাধনার বহু বিচিত্র ধারা যোগ
হয় এর স্রোতে প্রবহমান। তাই যেখানেই বাকি, সে
অবস্থাতেই থাকিমা কেন, নাহে নাহে মনের নিতৃততম
স্থানে অস্থগত করি তার গতিময় রাগিনীর বিচিত্র চন্দ।
ছুটে আসি তার তীরে। ছুঁ চোখ করে দেখি উনার
রূপ। আবার ফিরে যাই; মনে হয় সে যেন পিছন
থেকে হস্তভাষি দিয়ে ডাকে, অকৃত সে আস্তান;
অকৃত তার আকর্ষণ, অকৃত তার সন্মোহনী মারা।

কলকান্তারি গঙ্গাকে রেখে মনে হয়, ঠনি যেন
অত্যন্ত কর্ণবাত; আনাদের কথা শোনবার তাঁর মোটে
অবসর নেই। মহানগরীর ব্যবসায়ানিকোর প্রাপ-
নরূপ্য এক গৈরিক বর্ণি ভলদর বৃত্তৎ রাহপথ। তার
তীরে তীরে নানা প্রকারের সৌখমালা, চিমণীর সাদি,
আর কুণ্ডলীকৃত ঘোঁরাই সমাবেশ। জনতার কোলা-
চলের মাঝে জীবনের কল্লোল ধ্বনি সেখানে চিরন্তরে
বুধ।

তারপরে দেখছি ডারকট হারবারে গঙ্গার আর
এক রূপ। যেখান থেকে নাত্র আটচলিগ নাইল পূরে

গঙ্গার ধারা গিরে বিশেষে বঙ্গোপসাগরের ধারায় লগে।
তার ভারত পরিক্রমণ হয়েছ শেষ। এইখানে গঙ্গার
বিশ্রুতি বিশাল। তার পরাণাত সিংহের সাথে বিশে
এক হয়ে গেছে। পশ্চিম প্রান্তে শুষ্ক কীর্ণ, মণীহেখার
জার দেখা যায় শুষ্ক অকলের বিখ্যাত বনরাজির
অস্পষ্ট সীমা রেখা। চারিদিকে শুষ্ক নিঃশীল নিতৃততা;
তারমধ্যে গঙ্গার শব্দনর কলনাট। মনে হয় বহানুজের
অমরীকে বগে কে যেন গভীর স্তরে অলভ্যরে আলাপ
করছে।

সেই স্তরের আড়ালে গঙ্গার অজুত বর শোনা যায়।
সে যেন বলছে গভীর আবেগের সঙ্গে গভীর করে,
“এইখানেই আমার চলার শেষ। এই সূতায় আমার
স্বর্গীকৃত্যের এইখানেই ঘটবে চন্দ পতন। এইখানেই
আমি মিলিত হবো আমার দীর্ঘ বাহিনী জয়ন্তমের
সাথে” কোথায় সেই হিমালয়ের পর্বপ্রান্তে নির্জন
তথ্য অত্যন্তরিত দীর্ঘ প্রপাত গনোত্মী, আর কোথায়
এই জনকোলাহলপূর্ণ কলকাতার উপকণ্ঠে, সাগর
যাত্রীণীর বিশাল বিদ্রুত ভল ধারা? এই দুইয়ের
মাঝে আকাশ পাতাল প্রান্তর। তবুও তারা এক,
অথও তাদের জীবনের যোগ; বতিহীন তাদের
চলার চন্দ।

এদিকে দেখছি বেদুত ও বকিণেশ্বরের পূণ্য পাণ
পীঠে গঙ্গার তপস্বিনী রূপ। এখানে গঙ্গা বাহুরের
নাগরিক লভ্যতা হকাকরে, শুধু বাণিজ্যিক স্ভার
ও সম্পন্ন নয়। বক তার বাণিজ্যিক স্ভারী স্ভায়ে পূর্ণ
নয়। কাজেই এখানে তার পূর্ণতা অনির্গের। গগনে
গগনে কলকলনে সে বাহুরের কাণে কাণে বলছে, “এ
সংসার শুধু বাজ ভোগের স্থান নয় জ্যাগেরও বটে।
সে কথা একটু চিন্তা করে দেখ”—তার চতুর্পার্শ্বের
শায় গ্রাম, নির্জন বনবীধি, মনে প্রাণটির এলেপ
বুলিয়ে দিয়ে অগে গগে উদিত করে এই গঙ্গাতীরবাসী

দৃষ্টি মহা সম্মানীর মহান চিত্র। একজন বানরকে পরমহংস দেব, অপর জন স্বামী বিবেকানন্দ।—এই স্থানের গঙ্গাঙ্গল মহামানবের আপশর্শে সত্যিই আগ্নেয়।

ভারতের চন্দননগরে বেথেন্টি গঙ্গাকে স্তম্ভাক্তি রূপে। এর ভীরুত্ব (Stand) স্রবণ বিলাসীধের একটি অত্যন্ত প্রিয় স্থান। এর একটি তীর বাগানো, এবং ঘনসন্নিবিষ্ট তরুভাজিতে ঘিট চাটাময়। এবং তীরবর্তী পথের উপর সরকারী কার্যালয়, স্থল কলেজ বোর্ডিং এবং হোটেলের বড় বড় বাড়ীগুলি রাস্তাসিক আড়ম্বরে সুশোভিত। গঙ্গাতীরের এই বিলাসবাহুল্য মনকে বড় দীড়ঃসেয়। এখানে গঙ্গা হারিয়ে ফেলেছে তার স্বাস্থ্যবিক সংজ্ঞা রূপের ত্বন্দর বিকাশকে। তার গতিতে প্রতিহত করেছে একটি বিনোদী সাম্রাজ্যবাদের রাষ্ট্রত্বপূর্ণের বিজ্ঞাপনিকা।

এরপর বেথেন্টি গঙ্গাকে রাজমহলের—“সানী মালান্দে” বাড়িরে নবাবী আমলের একটি অংশের মূসকে সাক্ষী করে। এ সহরটি অত্যন্ত পুরাতন। গঙ্গা-তীরে অত্যন্ত কোণ ফাড়া জঙ্গল, এবং সমুদ্র বসতি অত্যন্ত বহুল। নৌকাবন্দে জলবানের বাহুলা দেখে মনে হয় এটি একটী প্রশস্ত বায়বার কেন্দ্র। এই রাজমহলের পর্বতসমূহ পথ অতিক্রম করে গঙ্গা বাংলা বেলে প্রবেশ করেছে।

এরপর বেথেন্টি তাগলপুরের বুড়ী গঙ্গার বিগত-বিত্তারি বন্ধপটে অবগীর হৃৎকণ্ড শোভা। এ পুত্র আশি কখনও ভুলবোনা। একদিকে হৃৎকণ্ড কোটা সমুদ্র প্রান্তর আলো করা সীমাহারা নরবে কেন্দ্র, মাঝখানে গঙ্গার গৈরিক জলরাশির ঢোল তরলোচ্ছ্বাস; আর ওপারে আকাশের নীল সমুদ্রে রক্তবর্ণ সূর্যের বিদায় অবগাহন। হৃৎকণ্ডে শোভেই হবে, এখানে গঙ্গার ব্যাকুল বাহুর উত্তাল আত্মান বুধা, নীল আকাশের রক্তসাগরভিত্তি সরমসুচিত ভাবাময় মৃষ্টির সলজ ইন্দিত বার্ষ, সজ্জার সজল ছারার অবতরিতা পৃথিবীর শুভ

বিষয় নীরব অভিমানের সাক্ষ্যে আবেদন এখানে পরাজিত। এখানে গঙ্গার মাতী জলা ভাঙ্গা পারে গতিরে বিবলোন্মের এক অশ্রুতমান অশ্রুতুষ্টি এবং মৃত্যুমান চিত্রশালায় সজ্জান পেদুয়। এর স্তুতি আমার মনে জাগরক থাকবে।

এরপরে বুকেরে গঙ্গাকে বেথেন্টি ইতিহাসের এক বেদনাময় অরবীর বুকেরে পটভূমিকার। বেথেন্টি গঙ্গা-তীরে প্রাচীন দুর্গের অভ্যন্তরে গঙ্গার গোপন স্তম্ভক পথ। যে পথে একবা গভীর মিশিধকালে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব পলায়ন করেছিলেন। সেই দুর্গপ্রকার সেই স্তম্ভক জলপথ গঙ্গা-তীরে আজও বিস্তারমান। জুই নেই এই সলল পাথির বহুর নির্বাস্তা স্বাধীন বাংলার সেই শেষ তেজীমান লুকব নবাব নীরকার্শম।

মোকামার বেথেন্টি কূলে কূলে তারা গঙ্গার শৈকি ডক্কের বিপুল বিক্ষেপ! আমার মনে হয় গঙ্গার বিদ্যুতিও উচ্চমতা এখানেই সর্বাধিক।

ভারতের বায়ানলোভে বেথেন্টি বুর্জীবাধিনী গঙ্গাকে গৈরিকবন্দা শান্ত তপস্বিনী রূপে। মগরীর অলংগ্য মন্দিরও শৌখিনালা তার বন্ধে অর্ধচক্রাকারে বিচিত্র রূপে শোভা পাচ্ছে। তার পারাপারে কানীর রাজ্যের রাজধানী রামনগর, এবং মূরে বিগত সীমার দেখা যায় বিদ্যা পর্বতের অটলোত্তর নিম্নর মালা। এখানে গঙ্গার মাকাম্য অলংকার। এই-গঙ্গাতীরে কনডার কোলাহল বড়ই থাক তার মধ্যেও স্পষ্ট অদ্ভুত কভা বার তার অগাধ প্রোশতির ব্যাপকতা। যেন বাহিন্তা হরিত্রী অলংক্য থেকে সজ্জানের বেদনা ঘোচনের গুহু তাঁর কলাপহস্ত প্রোদারিত করে দিয়েছেন গঙ্গার শান্ত তীর-ভূমিতে বার মুদ্র উচ্ছলতরকের গতি ভলে।

এই রকম ভাবে কতবার কতরূপে দেখলুম গঙ্গার অনবদ্য রূপরাশি, তবুও মনে হয় দেখার যেন শেষ নেই, আরও থাকি আছে।

সত্যিই বাকী আছে।

হরিদ্বারে এসে মনে প্রাণে উপলব্ধি করলুম

বাস্তবিক একথা সত্য যে গঙ্গাকে ইতিপূর্বে আমি বা বেংগি সে তার ভ্রমের সমগ্রতা নিষ্কণের পক্ষে এক তৃতীয়ংশও নয়। গঙ্গার রূপ এখানে কি বিশাল, কি দ্বন্দ্বপ্রায়ী, তার রূপ ভাবার কেটোবার ক্ষমতা কোনও মাত্রেরই নেই। এখানে গঙ্গাভীরে ঝড়ের উত্তর-পূর্ব দিকে বহুদূর দৃষ্টি যাবে বেলে ধিলে দেখা যাবে, দিগন্ত স্পর্শকাতর, তবু পর্বতের পর পর্বত। হুঁতের অবশ্য হামির অক্ষপ্রভার তার কর্তন রক্ত শিলাংক নীলান্বিত স্ত্রীম আভরণে আভূত। এই পর্বতের শিখরে বহন পাগে বাতাসের বস্ততা তখন মনে হয় ষ্ট্রিক যেন পুনো সোলারমান এক বিশাল সবুজ সবুজের উত্তাল উমিমালা আকাশকে স্পর্শ করার জন্য দিগন্তের পটভূমিকায় এক নীল সবুজে মিলিত হুন্সর চিত্রশালায় ব্যত্যাব্যতীন করেছে। সেই বৈশাল্যের পদশ্রেণে আবার অরণ্যের সমারোহ। তার নির্জন প্রান্ত প্রাণিত করে বয়ে চলেছে বৃক্ষী বাহিনী গঙ্গার মুক্ত বাহা। নীল নির্মল জলরাশি তরল সেনপুত্রের ত্যাগে অস্বস্ত হুন্সর। তার বল কল ছল ছল পানির হুন্সর মিথিল বিধেব সকল অব্যক্ত সঙ্গীত হুন্সর নিত্য উৎসারিত। কিশোরী বালিকার মত গঙ্গা এখানে আনন্দসঙ্গীতে বেতে করতালি দিয়ে ছুটে চলেছে। আকাশ পাহাড় বনবাগি নিঃশেষে সমেত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে দেখছে তার এই দুতানীনা পতিবরী নীলোৎপলা রূপ। তাহের অস্তুরের আশিস দ্বারা অক্ষপ্রভার, গঙ্গার রূপ লহরীতে ছুটে উঠছে নিত্য নব নব বৈচিত্র্যের অদ্ভুত বিকাশ। দ্বন্দ্বপ্রায়ী সারসের অপূর্ব বাজনা, অরণ্যভীত কাদের সাধনার অগাম্য লাফলোর পরম বোণহুত ধারা। গঙ্গা এখানে বাগে, গুণে, ভ্যাগে, ভোগে, এক বিচিত্র প্রাণী জলধারা।

এই গঙ্গার ভীরে অবস্থিত হরিদ্বার নগর।

ভারতবর্ষের এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র অথবা ঐতিহাসিক এই হরিদ্বার। এই হরিদ্বারের নূরু নৃত্যিক বক্ষে বাতল করে রেরে প্রাচীন ভারতবর্ষের বহু পৌরবসন।

এই পথ প্রান্তে আছে ত্রৌণদী সহ লক্ষ-পাণ্ডবের মহা প্রস্থানের চিরঅবশীর্ণ পথ; ভগবান লক্ষ্যচাচের সাধনার পূণ্য পানীঠ। ভারত পথে আছে বেদব্যাসের বেদকে চারিভাগে বিভক্ত করার বৃতি বিভক্তিত ব্যাসাঙ্গন। এবং প্রেত তীর্থ কোনার বহরিকাশ্রম বাজার কুর্নি বস্তুর পথ। আরও আছে এই পথেই বহু প্রান্তের গঙ্গার অস্থান গজোত্রী এবং গোমুখী।

এই কারণে সকল সন্ধ্যাই হরিদ্বার নগর তীর্থ-বাসীদের সন্ধ্যাবেশে পূর্ণ থাকে। এখানে স্থানীয় বাসিন্দাদের অবিকার্য ভাগই কুবিভীবি এবং বাকী অল্প বহিরাগত অবলর প্রাপ্ত বনী ব্যক্তিরা গঙ্গাভীরে বাস ভবন নির্মাণ পূর্বক অস্বাস্থ্য করে থাকেন। বিড়লা পরিবারের দান এখানে যথেষ্ট দেখা যায়। বহু ধর্মশালা, মন্দির, স্থানের ঘাট, জনপদ, প্রভৃতি তাঁদের দ্বারা নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে "পীতা ভবন" একটি গর্ভনীর স্থান। এই মন্দিরটি অনেকটা আশ্রমের বেগুত বস্তুর অঙ্গকরণে তৈরী। সাধারণতঃ দেখা যায় মন্দির প্রভৃতি স্থানে দর্শকের উপবেশনের কোনও স্থান থাকে না। কিন্তু এখানে বেগুতের পরমহংস বেবের মন্দিরের মত বেগলরের সমুদ্র ভাগে বাজীদের অল্প বহু বিভূত প্রসঙ্গ কক্ষে পরিচর্য করা পাতা আছে।

এই মন্দিরের প্রধান দেবতা হল যেতপ্রস্তর নির্মিত অতি হুন্সর রক্তমুতি। তার চতুর্পার্শ্বে বহু খেব মেবীর বৃতি আছে। ককের প্রাচীর গায়ে ভারতবর্ষের সমস্ত মূনি ঐবদের চিত্র অঙ্কিত, এবং তার নির ভাগে খোদিত আছে উক্ত সাবকবের কঠিনিস্ত বেদ-বাক্য সকল। এখানে রাজনিক আভর্য সর্বত্র বিস্তারন।

যত্মানে এই নগরটিকে দ্বিতীয় অমৃতপুর বলা চলে। সমস্ত বড় বড় বাকী এবং ধর্মশালা প্রভৃতি পশ্চিম পাঞ্জাবের শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়েছে। প্রায় প্রায়ী বললেই আশ্রমের চোখের সাধনে ভেসে ওঠে কোলকাতার পথে যাত্রের নিত্য দেখা, সেই সব পূর্ণ-

পাকিস্তানের বাস্তবায়ন সন্তব্ধায় নববহায়া উদ্বোধন হস্তগত) আবার ভাই-বোনদের কথা। এখানকার বাস্তবায়নের অবস্থা কিন্তু তথাকথিত দারিদ্র্য ও দুর্ভাগ্য লাহিত নয়। যদিও লক্ষ্যের সমস্তাই এক ভাষাণি একথা বলা চলে যে পশ্চিম পাকিস্তানের বাস্তবায়নের চেয়ে পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তবায়নের অবস্থা অধিক শোচনীয়। কেননা, এদের মধ্যে বেকার নেই বললেই চলে। চোট বড় সমস্ত ব্যক্তিই নয়নাঙ্গী নিবিশেষে নানা প্রকার ব্যবসায় কার্বে লিপ্ত। হেলে মেয়েরা নিরক্ষিত ভাবে বিজ্ঞানের অবদান করছে। বয়স্ক মেয়েদেরও কুটীরশিল্প-শিল্পের প্রতিষ্ঠান আলম ইত্যাদি আছে। কাজেই এদের অতিযোগ থাকলেও অভাব নেই বলে মনে হয়।

হরিহার থেকে তিন মাইল দূরে কপল নামক স্থানে উত্তর প্রদেশ গভর্ণমেন্ট এই বাস্তবায়নের অত্র এক বিবাহট কলোনী নির্মাণ করছেন। সেখানে সারি সারি বহু কুটীর নির্মাণ হচ্ছে। এইগুলি তৈরী হয়ে গেলে হরিহার সহরের অনেক বাড়ী খালি হয়ে যাবে এবং গৃহহারাও গৃহ ফিরে পাবে। কাজেই একটা বৃহৎ খাল আছে। তাদের কৃষিকাজ করার পক্ষেও ভালো হবে। এই সব দেখে মনে হোল যুক্ত প্রদেশের সরকার পশ্চিম বঙ্গের সরকার অপেক্ষা বাস্তবায়নের সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন ও সহায়ত্বমুখী।

স্বাভ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বর্তমানে চালু নেই। কাজেই কুটপাথে অসিতে গলিতে এখানে কালোবাজারের ব্যাপকতা দৃষ্টগোচর হয় না। পরিধানের বস্ত্রাদিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং অত্যন্ত স্থান অপেক্ষা সুলভ। এখানে বস্ত্রে সুলভ। রেশম বস্ত্র এখানে বেশ সস্তা। হাণ্ডা স্রুতি এবং রেশমের শাড়ী ও ছিটের আবদানীও যেমন প্রচুর সেই পরিমাণে সুলভ ও তার খুব কম।

এই কারণেই উক্ত খেণবাসীর পোষাক পরিচ্ছদে অত্যন্ত আড়ম্বরবাহন্য লক্ষ্য করা যায়। কোনও

মহাশয়ের বহিরাগতের দেখে সে বনী কি নির্মী ভা নিরূপণ করা সহজসাধ্য ব্যাপার নয়।

বাঙালী সম্বন্ধে এদেশের লোক বেশ সচেতন। নানা স্থানে বাস্তবায়নের কালে কখনোই পলচায়ী ব্যক্তিরা আনাগোনা দেখে বস্তাব্যয় বলাবলি করতো, "এরা বাঙালী, বাংলা থেকে এসেছে।"—

আরও একটা আনন্দের কথা এখানে চোট বড় নয় মাঠী নিবিশেষে নেতাজী স্মৃতিচিহ্নকে দেবতার মত ভক্তি করে। তারা আশা করে তিনি আবার ফিরে আসবেন এবং তখনই এই বিখ্যাত তারমহর্ষি আবার অধঃস্থ হবে। মানুষ ফিরে পাবে তার পুনরায় সকল সুখ শান্তি সম্পদ ও পরম্পরের প্রতি সহযোগিতা ও সহায়ত্বমুখিত সম্পন্ন মানসিক বিকাশ। নেতাজী প্রতী জনসাধারণের এই ভক্তি ভালোবাসা ও অকুণ্ঠ বিশ্বাস হরিহার সহরের কেন্দ্রস্থলে অকুণ্ঠে অবস্থিত "নেতাজী ঘাট" ও নেতাজীর শ্বেত গুপ্ত মর্মর মূর্তি প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়েই পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

হরিহারের প্রধান মর্মানী স্থান হোল, "ব্রহ্মকুণ্ড" অথবা "হরকী পেরী।" কথিত আছে, এই ঘাটে স্নান করলে অধঃস্থ গুণ্য লক্ষ্য হয়। ঘাটের নিকটে প্রাচীর পাঠে ভগবান বিষ্ণুর পবিত্র আছে। এই মলাতীয়ে বহু প্রাচীন ও আধুনিক দেবালয় এবং দেববিগ্রহ দেখা যায়। গলেশ্বর ও শঙ্কর শিব, রাধা গোবিন্দ, রামলীতা, বীর হুমান, প্রভৃতির মন্দির, সচোৎসে একসঙ্গে এখন আরতি হয় এবং গজাবরণ ও আরতি হয় তখন সে মুগ্ধ বর্ণনাভীত। সেই সময় হিন্দুর চব্বই কোমণ্ড জনবিশাল স্থানে এসে একটুখানি ঠাঁড়ালে মনে হবে, গজাবকে যেখানে হাজার হাজার শক্ত-প্রাণীপের শিখা জলস্রোতে বন্দনান, সেখানে গজাবেরী কেন নিজে দেবদাবী রূপে স্তব্ধ খচিত লীলাধরীতে অল আত্মত্ব করে আরতিসুতো বিতোর, আত্মহারা। চতুর্দিক হতে তাকে বেঁধে করে ত্রহরীর মত নিঃশব্দ গাড়িরে আছে মহাপ্রকীর পর্বতশীর্ষের এবং পাদবিশের গভীর স্তম্ভ অরণ্য রাঙি। অটলোন্নত শৈলশিখরের অংশ

দীর্ঘতায় যেন প্রকৃতির পত্র-পুষ্পের লব্ধ দৃষ্টিরূপে ইন্দিতে সকলকে স্তম্ভিত করছে, “তোমরা স্তম্ভিত হও—সন্ধ্যার এই মহাধূমকে” বিশ্বের আত্মার দেবাদিদেব মহাদেব যানো বলেছেন; তাঁর ভগ্নোক্তি যেন না থাকে।”

এখানে গঙ্গার মাঝখানে একটি সুদীর্ঘ বাধা—চর আছে। তার দুইপাশ দিয়ে গঙ্গার দুটি দাড়া প্রবাহিত। চর আর তীরের মধ্যস্থিত জলদ্বারাটিকেই বলে ব্রহ্মকূট। প্রাতঃ সন্ধ্যাবেলায় এখানে বহু সাধু-সন্ন্যাসীর আগমন হয়। এবং তাঁরা কেহ নীরবে কেহ লগ্নবে অত্যন্ত আবেগ করে যেন পুরাণাদির ব্যাখ্যা করে থাকেন। তাঁদের বেটন করে জন সমাবেশ হয় অত্যন্ত বিরাট। এর মধ্যে নারীর সংখ্যাও অধিক।

সন্ধ্যাবেলা এই স্থানটির দৃষ্টি হয় অতীব বিচিত্র। বহুদূর বিস্তৃত গঙ্গাতীরের সীমিত করে এক সর্বজাতীর সর্ববয়স্ক মহা সমন্বয় কেন্দ্র সৃষ্টি হয়। রেডিওর সঙ্গীত, বর্ষাকালের উপদেশ, নৃত্যকারী নৃত্যের মজারকভার, হকারের চীৎকার, জনতার কোণাহুলি ভিখারীর কলপ আবেগের তার মধ্যে সহরের ভ্রমণবিলাসী সমস্ত নর-নারী ও সবংসা গোষ্ঠের অবাধ জনমণের গতি অপ্রতিচ্ছন্ন হয়ে একত্রে যে দৃষ্টান্তটোর অবতারণা করে, তার অস্বাভাবিক যেন একদিকে বিচিত্র ভেদমনি অপর দিকে বৈকল্য দায়ক।

গঙ্গাতীরের যে একটি স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য আছে সন্ধ্যাবেলায় এখানে সেটা ধীরে পাওয়া যায় না।

গঙ্গাতীরে এক রকম স্থলে তরা পাতার নৌকা কিনতে পাওয়া যায়; তার মধ্যে একটি করে ক্ষুদ্র বৃন্দ-গ্রামীণ থাকে; সন্ধ্যাবেলা বহিরাগত ভ্রমণকারীরা প্রায় সকলেই সেই নৌকা কিনে তার মধ্যে গ্রামীণ জালিয়ে গঙ্গার তালিয়ে যায়। নদীর ধরপ্রান্তে পাতার নৌকা তার ভর করে ভেসে চলে যায়, তার বুকে মিট মিট করে জলে আর কাঁপে সোনালী গ্রামীণ শিখা। কত বাড়ুয়ের বনের গোপন আশা ব্যাকুল আবেগের অমনি করে মিট মিট করে কাঁপতে কাঁপতে মহাকাশের অনন্ত

স্রোতে লীন হয়ে থাকে। তবুও প্রত্যহ অগণিত পুণ্যার্থী মনের ব্যাকুল বাসনার অতিবিজ্ঞ হবে পাতার নৌকা কিনে ভাসে দাঁটার গ্রামীণ জেলে জলে ভাসিয়ে দিচ্ছে ভক্তিভরে স্পর্শ করছে গলোবন্ধ।

এইখানেই টাণ্ডার ক্রকের অনুরে “নেতাজী বাট”। এই বাটেই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে ভারতবর্ষের সির নেতা নেতাজীর সৈনিকবন্দী, আনক যেত গুপ্ত সর্বত্র প্রতিমূর্তি। তার পাদদেশে, প্রান্তর বৈকুণ্ঠে, কক কলকে বৈকুণ্ঠগরী হরকে নিশিত আছে নেতাজীর সৈনিক জীবনের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে স্থানীয় বৃদ্ধ বতগীর অকৃত্রিম উৎসাহ ও প্রচেষ্টায়।

তিনিই সার্বক জননেতা যিনি দেশের আপামর জনসাধারণের ভক্তি ও ভালোবাসা সমভাবে অর্জন করতে সক্ষম হন নিম্ন জীবনে। সমস্ত পৃথিবী যার বীরত্বের পরমতলে অবনত হয়ে বসে হয়। সমস্ত জাতীর ভবিষ্যতের আশার সর্বত্র কক্কর হয় যার স্রবধুর আশ্বাস বাণী।

“নেতাজী বাটের” অনুরে “কুশাবর্ত” বাট। এখানে মহাবীরত্বের কঠোর গুণপ্রাণ করেছিলেন। এই বাটে পিতৃপুরুষাদির তর্পণ ও পিতৃদান করলে অমর পুণ্য সঞ্চয় হয়। এই বাটটা বেশ সুন্দর বাধা—না। কিন্তু এখানে লোক সমাগন হয় বৃহৎ আয়। তবু সবংসা গাভী অবাধে বিচরণ করে বেড়াচ্ছে। বৈভবত্ব পাঠের সাহায্যিকা বলে বোঝা হয় এই প্রাচ্য বাসনে তাদের এই অনাবশ্যক আগমন। পুণ্য মহাপ্রাণ পার্শ্বের দিন আমার স্থায়ী শুই বাটে সেলেন পিতৃপুরুষদের পিতৃদান করার উদ্দেশ্যে। আমাদের শান্তা মহাবীরত্ব ছিলেন অতি সাধু প্রকৃতির লোক। সেইজন্য তাঁকে কোনও অসুবিধার গড়তে হয় নি। কাশী, পুরী, প্রভৃতি বড় বড় তীর্থস্থানের বত এখানের পাণ্ডাঘরের দ্বারী দাঁড়ায় লম্বা কেঁদে জোরজুহুদের প্রায় গঠে না। কাজেই বন বেধানে প্রায় থাকে, দানও সেখানে সর্বাঙ্গসম্পন্ন হয়।

আশা

শ্রীশঙ্করেন্দ্র গুহ

সে যেন একটি হাঁপ,
অবল নীলের বেড়া
যেহা চাহিদিক।

একটা তারার আলো
পৃথিবীর সমস্ত কুড়ালো;
মাহুবেদা বিজ্ঞান নাবিক
যুগে ফিরে এদিক ওদিক।

অজস্র ভালের বন
ঝড় হ'রে ছলিতে কখন।
নৌক'-ভূবি, পোত-ভূবি হ'রে গেছে,
আরোহী আসিতে চেষ্টে
পথেই বিশেষে।

মাহুবেদে বাস্তব
টেনে আনে সিংহীনের বোঝে।
পাওয়া নাহি যায়—
খোঁজার খাতার
তবু বার দাগ কেটে
যুগে যুগে অলংকা মাহুদ
তারে লক্ষ্য কর'রে।
বীপের সে জ্ঞান-বাতি—
তারই টানে
জড়ির লহন ঢাকা ঘোরে।

সুনাও

শান্তলীল ঘাশ।

সুনাও বহু, স্নেহে সুনাও, যেটুকু পার,
এপারেরে আছে এইটুকু শুধু পরম লাভ;
বিষয়বের ভারে জীবনের সার্বকতা,
সুনাও তেজে গেলে শুধু হতাপার অট্টাল!

একটানা ঢলা : অজানা পথের স্নেহে নিশান :
বন্ধুর লগ্ন—পথের দু'ধারে ঘন অ'ধার ;
তবু অকারণ পগচারীদের ছটগোল,
ঘন নদীমাঝে বিকৃত জীবনে কী উল্লাস!

চাওনা আর পাওনা হিসাবে যেলেনা আজ কিছু,
জীবনের পারে মিন গোনা শুধু শেষ মিনের ;
ধূসর পৃথিবী : তুরে লয়ে গেছে সব আলো ;
পংক জুড়ে বেমনা আভ' লহরপ।

সুনাও বহু, যেটুকু পার সেই ভালো,
জড়ির কোলে হুঁজে বেধে কিছু লাভ কিনা ;
জাগরণ মাঝে শুধু ক্রোধাক্ত লগ্ন ভ্রমণ ;
চরণ পোদিত পথে নাকো কোন শব্দনা।

হেনরিক ইবসেন

জীবন সুধোপাখ্যান

"এডল্ফ হাউস" এর নোয়া স্থায়ীর ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, আর "গেট্টেল" নাটকের মিসেস অ্যান্ডিয়ার তার শান্তী প্রার্থীকে কুশল (৭) চলবার পরামর্শ দিয়েছিল; যে কোন ভক্ত কচি সম্পন্ন মানুষই এ বরণের নাট্যকারের কাছ থেকে দুইরো বাক্যে চাইবেন। নোরাকে সুলভ্যাসিনী আর মিসেস অ্যান্ডিয়ারে ব্যাতি-চাতিবী বলে গান দেবেন। যে নাটক এমন সব চরিত্র সৃষ্টি করে তার সজ্জাপাষণ আইন বলে বড় করবার ক্ষমতা সহকারে পুরোশ্রম দেবেন। কিন্তু যে সব নাটকে নাট্যকারা শুধু অনাচারটুকু সম্পন্ন করেই নিষ্কৃত হন না, সে অনাচারের, সে ব্যাতিচারের, সন্দর্ভে নীতিমত বুদ্ধিমান বিস্তার করেন, সমাজ ধোঁসের বরণ আলো-চনা করে তার ব্যর্থতা প্রতিপাদন করেন—সে বকম নাটকের নিদ্রার ভাষা বুদ্ধি পাওয়া যায়। এ বকম অবতার সাধারণতঃ মানসিক স্বরূপা আমরা হারিয়ে ফেলি, নীতি গেল, বর্ম গেল, সমাজ গেল—এই 'গেল গেল' হবে আমরা। (আধুনিক যুগে আমাদের সংবাদ পত্রগুলো), সুখ হতে উঠে। কিছু বলবার আর থাকে না আমাদের, বিচার করবার শক্তিও আমরা হারিয়ে ফেলি।

ইবসেনের নাটকের অভিনয় দেখে ইংলণ্ডের বুদ্ধি-ভীরা মহলেও ঠিক এই অবস্থাই ঘটেছিল। ইংলণ্ডের কপাই বদলি—কারণ, জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, শির-সাহিত্যে, টেরোরোপীর বেশগুলির মধ্যে সে সবই ইংলণ্ডই ছিল সব চেয়ে উন্নত। সে সময়ে মানে, উনিশ শতকের শেষের দিকে। আর সব দেশে কি ঘটেছিল বা কি ঘটতে পারতো, ইংলণ্ডের অবস্থা দেখেই তা অনুমান করা কেতে পারে, সারা ইউরোপের এগুটা আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল নরওয়েজিয়ান ইবসেনকে নিয়ে।

এমনি হয়ে থাকে, কোন নুতন কিছু করতে গেলেই,

নুতন কোন কথা বলতে গেলেই, তখনশীল মহল, ক্ষমতার পাবন ভাঙে বাতের চিন্তা চলবার শক্তি হারিয়ে ফেলতে, তারা এমনি করেই চীৎকার করে উঠবে। এদের চীৎকার লেখক জগৎ কিছু এগিয়ে চলতে, এগিয়ে যাবেও। এই এগিয়ে চলার নামই প্রগতি। এগিয়ে চলতে গেলে, পথের সকল বাধাকেই ত অস্বী-কার করতে হবে!

বাধাকে অস্বীকার করতে গেলেই, সংস্কারের সীমাকে লঙ্ঘন করতে গেলেই চীৎকারও উঠবে। প্রগতির পথিক থাকেও উপেক্ষা করবে।

ইবসেন সামাজিক জ্ঞানোন্নিতির আদর্শের সীমাকে লঙ্ঘন করেছিলেন। তাই এই 'গেল গেল' হবে। ইবসেনের পথে যারা পথিক তারা এই চীৎকারের পরকে গাঁড়ান নি, এগিয়ে গেছেন, তাকে উপেক্ষা করেই। ইবসেন সমাজ নির্দেশিত পথে চলেন নি, নিজেকে নুতন পথের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই ছিল তাঁর অলপাণ; সেদিনের সে অলপাণই কিছু আজকে হয়ে বাড়িয়েছে তাঁর অভিনব (সাহিত্য জীবনে এই অভিনব নিয়ে বাবা বামাগেও, বাতব জীবনে কিছু আজ ও আমরা ইবসেনের কণার কান দিই নি)।

ইবসেনের নোয়া স্থায়ীর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসে-ছিল, সামাজিক জ্ঞানের বিকৃততা করেছিল। অথচ নোরাই ছিল একদিন পতিপত-প্রাণ, নতীয় আর গেবের আদর্শ একনিষ্ঠ। তবে কেন সে এমন কাজ করেছিল, বা তার আদর্শেরই বিরোধী? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে নোরার সেই আদর্শকেই বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন।

যাহুব জন্মের কতগুলো সহজাত প্ররুতি নিয়ে। সেই আদি যুগে সমাজ সৃষ্টির আগে, এই প্ররুতি চাঙানারই সে তার জীবনকে চালিত করতো। কিছু

সমাজবন্ধন গড়ে উঠবার সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রের এই প্রকৃতিগোচক সংঘত করবার প্রয়োজন হয়ে পড়লো। সেখা দিল নীতি ধর্মের আদর্শ। সেই সময় মানব সমাজের বৈশব অনন্য। প্রকৃতির নির্ধনতার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার কোন উপায়ই আর খুঁজে না পেরে শিশু মানব করনা করে দিল একটা বৈব শক্তির।—বার ভূপাত্তেই শুধু বেঁচে থাকতে পারে সে। সামাজিক জ্ঞান নীতির আদর্শ ভুলোও কমিত হয়েছিল এই বৈব শক্তির নির্দেশমতে। ঐ আদর্শকে যে লক্ষ্যন করবে, বৈব কোপ ববিত হবে তার উপর। প্রথমাবস্থার বন্দিও বৈবতার হস্তচক্র করনা করেই সমাজ ধর্মকে মানুষ যেনে নিত। পরবর্তীকালে তাই হল বৈব সংস্কার। এই সংস্কারের নির্দেশই তার জীবনচরার চরম নির্দেশ। এই ভাবেই মানব সমাজ এগিয়ে এল রেনেসাঁর যুগ পর্যন্ত।

রেনেসাঁর যুগে এই বৈব সংস্কারের বিরুদ্ধে জাগল একটা বিদ্রোহ। শিশুমানব যেদিন কৈশোরে পর্যাণ করেছে। অপভ্রমণেও হুঁচি তার যুগেতে বানিকট। শৈশবের সংস্কারকে সে কেড়ে ফেলতে চাইল। প্রথম হুঁচির উদ্দেশ্যে জগৎ ও জীবনের বিচারে প্রবৃত্ত হল সে। হুঁচিবাদের (Rationalism) উদ্ভব এই যুগেই। প্রকৃতির ভাঙো মানুষ কার্যকারণের নিরন আবিষ্কার করলো। জীবনবিচারে দিল হুঁচির আশ্রয়। বৈব সংস্কারের যুগ কেটে গেল। এল বাবীন চিন্তার যুগ।

বৈব সংস্কার কেটে গেল? বর্ষশাস্ত্রে বিশ্বাস আর রাষ্ট্রের ঐল না? রাষ্ট্র কি তবে অবাবে নরহত্যা, লুণ্ঠন আর বাজিচারে মেতে পেল? বৈব বিশ্বাস হাবিরে ফেললে যে তাই হবার কথা। কিন্তু তা হল না। নতুন বিশ্বাস সেখানে জায়গা করে দিল। সে হল “মানব—কল্যাণ-ধর্ম” বিশ্বাস, greatest good to greatest number. জীবনচরার প্রতিটি কর্মকে, মানবের প্রতিটি কর্মকে এই নীতির পরিশ্রোক্ষিতে বিচার করে

বেখা যেতে লাগলো, অবশ্র হুঁচি দিবে। এই মানব সল্যাপের আদর্শও কিন্তু ক্রমে সংস্কারেই পরিণত হল, বৈব সংস্কারের মত। তার নির্দেশও অনন্য বলে গণ্য হল।

হুঁচির তবে কি হল? করানী বিলম্বোত্তর ইয়ো-রোপীয় মনীষীদের মনে এই প্রশ্নটাই জেগে উঠলো— জীবন বিচারে হুঁচি-প্রয়োগের সার্বকতা কতটুকু? মানবের কর্মব্যাপবে হুঁচির নির্দেশই কি চরম?

করানী বার্মনিক জলটেয়ারেই সবপ্রশ্ন এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেন। মানুষের জ্ঞান ও প্রণয় কর্মব্যাপবে বেঁচে থাক। অথচ ছুঃ-দৈন্ত প্রাপীড়িত পৃথিবীতে অধিকাংশ মানুষের পক্ষেই বেঁচে পাকা একটা দার বিশেষ। জীবনে তার ছুঃখের ভাগই বেশী, সুখের ভাগ কম। এ অবস্থার হুঁচির নির্দেশ হল, জীবনের এ দার থেকে হুঁচি পাওয়া, যে করেই চোক। তার সহজতম পথ হচ্ছে আশ্রুহত্যা। কিন্তু মানুষত আশ্রুহত্যার প্রবৃত্ত হয় না? (অবশ্র কেউ কেউ সে পথ অবলম্বন করে, কিন্তু সেটা হুঁচির নির্দেশ নয়, সাময়িক আবেগ; তাই সে পথ ব্যতিক্রম বলেই ধরে নিতে হবে) জীবনে শত লাঞ্ছনা সহ্যে সে বেঁচে থাকতে চায়; জীবনকে সহনীর করবার জন্ত নানা ভাবে চেষ্টা করে। কারণ, এই বাচনার ইচ্ছা তার সহজাত প্রবৃত্তি। তার চরিতার্থতা কোন হুঁচির নির্দেশ সাপেক্ষ নয়।

পরবর্তী কালে সোপেন হাশ্বরকের মর্শনে এই আদিব ইচ্ছা (Primary will) স্বীকৃতি পেল মানব জীবনের যুগ নিরঙ্ক্য বলে। তাতেই হুঁচির প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত হল না। তারও সার্বকতা রইল, তবে চরম নির্দেশক হিসেবে নয়, ইচ্ছা পূরণের পথ বেছে নেওয়ার উপায় হিসেবে। বার্গার্ডের এর ভাব্য—“for by accurate reasoning only can we calculate our actions so as to do what we intent to do. that is to fulfil our will; but faith in reason as a prime motor is no longer

the criterion of the sound mind ; আবার ফিরে যেতে হল সেই প্রথম কথায়—

মাহুয জমার কতগুলো সহজাত প্রকৃতি নিজে, বা কতগুলো আদির ইচ্ছা নিজে। এ হল প্রাণের সহজ ধর্ম। অথচ সমাজসুখময় নামে যুগে যুগে চলিয়াছে এই সহজ প্রাণ-ধর্মের অস্বীকৃতি। দৈব নির্দেশে, মানব কল্যাণের প্রয়োজনে মাহুয তার সহজাত প্রকৃতি-গুলোকে সংযত করে রেখেছে। তাতে জীবন ও মেরে উঠেছে সুবিশাল। জীবনকে সহনীয় করে তুলবার জন্য আবার এই নির্দেশ-গুলোকে কল্পনা করে নিজেতে মাহুয যোজনীয় আদর্শরূপে।

যে ধর্ম আর সমাজের নির্দেশ মাহুযের কাছে গীড়াদারক তাকেই পরিত্যক্ত রেখেতে আদর্শ কল্পনা যুগোল। একনিষ্ঠ প্রেম বা সত্যীভব ও পাতিব্রতাদর্শ এমনি এক একটা আদর্শ যুগোল। যৌন-মিলনের আকাঙ্ক্ষা মাহুযের সহজাত প্রাণ-ধর্ম। অথচ মাহুয এ আকাঙ্ক্ষাকে কল্পনা করে নিয়েছে ‘কুৎসিৎ’ বলে, আর এ প্রকৃতিকে পমন করার যথোই নাকি আছে নহুতত্ত্বের (?) পরিচয়। কোন কোন দেশে ব্রজচর্চ-শিক্ষা দিতে এই কুৎসিৎ ইচ্ছাকে অবদমিত করার চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু তা সফল হয় নি। অরে সৃষ্টিরকার জন্ত নয়-নারীর মিলনের যে প্রয়োজন ও রয়েছে। তাই যৌন-মিলনকে কল্পনা করা হল ‘কুৎসিৎ’ প্রয়োজন রূপে।

অথচ মিলনের তাগিদ মানবপ্রকৃতি গুলোর নব্যোত্তর ববচরে প্রবল,—কারণ তা সৃষ্টির তাগিদ—তাকে এমনি কুৎসিৎ রূপে কল্পনা করার মাহুযের বিবেকে ব্যঙ্গল। তাই চেষ্টা চল প্রথম আদর্শের যুগোলে তাকে চেক রাখা। বৈবু-ক্রিয়া কুৎসিৎ, কিন্তু প্রেম প্রবল। মর-নারীর সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই প্রেমের বহনকেই কল্পনা করা হল সুখ্য বলে (প্রেম কিন্তু আগলে মিলনেইই আকর্ষণ, অর্থাৎ তার মূলেও বৈবুনের তাগিদ)। যৌন-জীবনে আদর্শ সম্পর্ক প্রেমের সম্পর্ক।

বিবাহ এই আদর্শ সম্পর্কেই, চিরস্থায়ী স্বরবার

উপায় বিবাহের পবিত্র বন্ধনে নমনীয় অগন্ত হতে চিরদিনের জন্ত। নারীর পক্ষে আবার এ বহনকে অস্বীকার করা অমানবীয় অপরাধ—অন্তঃ পুরুষের বোলাহ তা অপরাধ নয়। বিবাহিত জীবনে একই স্বামীর প্রতি অগন্ত থাকি নারীর পবিত্র কর্তব্য। পুরুষ প্রভু (স্বামী) কথাটার যথোই রহেতে তার প্রমাণ) আর স্ত্রী সেবক। আত্মীয় পুরুষের ইচ্ছাহ-সারে নিজেকে চালিত করাই স্ত্রীর ধর্ম। নিজের ইচ্ছা বলে তার কিছুই থাকবে না। এমন কি কোন কোন দেশে স্বামীর মৃত্যুর পরে স্ত্রীর আর বেঁচে থাকাই চলত না। তাকে জোর করে পুড়িয়ে মারা হত স্বামীর সম্বন্ধে।

নারীর পক্ষে কিন্তু অস্বস্তি অসহনীয়। কারণ তা মানব প্রকৃতির বিবাহী,—সহজ প্রাণ-ধর্মের পরিপন্থী, অপরের ইচ্ছা পূরণের উপায় মাত্র করে থাকা—নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দিতে—মানব জীবনে তা চরম অভিশাপ। নারীর এই গুলেই অস্বস্তিকেই সহনীয় করে তুলবার জন্য এল পাতিব্রতাদর্শের আদর্শ, আর একনিষ্ঠ প্রেমের আদর্শ, বিবাহের চিরস্থায়ী বন্ধনকে অস্বীকার করার যখন আর কোন উপায় নেই, তখন এ আদর্শের যুগোলে নিজের আগল অবস্থাকে চেক রাখাই নারীর পক্ষে একমাত্র পথ রইল।

কিন্তু আদর্শের প্রাণে নারী-জীবনের অসহ জ্বালার কোন উপলব্ধি হল না। সৃষ্টির সাধাযোজ্য অস্বস্তি কেউ কেউ বিবাহ বন্ধনের অপ্রাকৃতিকতার, গার্হস্থ্য ও পাতিব্রতাদর্শের সামাজিক আন্তঃকৃত্যের প্রমাণ উপ-তাপিত করেছিলেন। কিন্তু মাহুযের সহজ প্রকৃতি, তার প্রাণ-ধর্ম কোন সৃষ্টিইই বনোদ্ধত নয়।

নারী-জীবনে তাই বিবাহই পোষা দিল। আদর্শের যুগোল সে ছিড়ে কেলে দিল, বিবাহের পবিত্রতার সে সম্বন্ধে প্রকাশ করল। সৃষ্টির নির্দেশও সে মানল না। সকল লংকারকে তুচ্ছ করে জীবনের রাজ্যলগ্নে সে বেরিয়ে এল। জীবন-প্রবাহ তার এতদিন বরে চলছিলো

ছোট ছোট নিখুঁতী রূপে সংসারের হুড়ি পাগের তা
আহত হইলি প্রতিনিহত। এবার সে বেরিয়ে এস
প্রাণ-লোকের মহাসমুদ্রে—হুড়ি, বাবীন।

সেই নারীই “ডলস্ হাউস্” এর নোরা। ইবসেনের
সমন্বিতকৃত বৃণের হুড়ি অতিলাবিনী নারী সমাজের
প্রতীক। নোরা বাবীর খর ছেড়ে এসেছিল, কারণ সে
ছিল গৃহস্থের খেলাঘর। কাঠের পুতুলের পক্ষেই চণ্ড
সম্বল সে সংসারে বাস করা। গৃহস্থের ইচ্ছা অনিচ্ছা
বলে কিছু নেই, কারণ তার প্রাণ নেই। কিন্তু রক্ত-
মাংসের দেহবিশিষ্ট মানুষের তা আছে—যেহেতু তার
প্রাণ আছে। প্রাণের লব্ধকে সে স্বীকার করবে কি
করে? পুতুলের সংসার ছেড়ে এসে নোরা প্রাণ
বর্ধকেই স্বীকৃতি দিয়েছিল।

এই রকমই আর একজন নারী “গোটস্” নাটকের
মিসেস অ্যালভিং। নোরা সমাজদর্শনের বন্ধন ছিঁড়ে এসে-
ছিলো, আর মিসেস্ অ্যালভিং সে আদর্শের যুগকাঠে
নিজের প্রাণ-বর্ধকে বলি দিয়েছিল। নোরা যেমন
বাড়িচারিনী বলে নিখুঁত হয়েছিল, মিসেস্ অ্যালভিং ও
হস্তক্ষেপমি আদর্শ নারীরূপে সকলের স্রষ্টা আকর্ষণ
করত। কিন্তু অ্যালভিং এর চরিত্রেও একটু ক্রটি
রেখেছেন ইবসেন; আর এই ক্রটিটুকুতেই এ চরিত্রের
সার্বকতা, সমগ্র নাটকেরও সার্বকতা।

স্বামীর ঘরে এসে মিসেস্ অ্যালভিং যখন দেখল
যে স্বামী মগ্নালক্ত এবং সারাদিন নতল পড়ে আর
বাড়ীর পরিচালিকার সাথে গোপন অভিসারেই কাটিয়ে
যেয়, সংসারের সকল দায়িত্বের বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়
তার নিজেকেই। তখনই সে একবার কিছুদিনের জন্য
অস্ত্র নিয়েছিল Manders নামে এক পাত্রীর বাড়ীতে।
বিয়ের আগে এই পাত্রীর প্রতিই সে আসক্ত ছিল, তার
অনন্তই বাপ-মা তাকে দিটার অ্যালভিং এর হাতে পণে
দেন। মিসেস্ অ্যালভিং ঘরে ফিরে যেতে চাইল না।

Manders এর জীবনেই করে নিতে চাইল তার ঠাই।
কিন্তু Manders বাধ্য দিল, বর্ধের নামে, আদর্শের নামে
সে মিসেস্ অ্যালভিংকে উষ্ম করে তুলল। বৃকাল তাকে,
স্বামীর ইচ্ছামুগারে নিজেকে চালিত করাই জীব কতবা;
হোকনা স্বামী পর-স্ত্রী আসক্ত, হোকনা কোন সে যন্ত
মাতাল, তবু তাকে ছেড়ে আসা পাশ। Manders এর
কথা মিসেস্ অ্যালভিং বাধ্য পেতে দিল। ফিরে এল
স্বামীর ঘরে; জীবনকে উৎসর্গ করল আদর্শের সেবার।

মিসেস্ অ্যালভিং এর যন্ত অপরাধ, সে Mandersকে
প্ররোচিত করার চেষ্টা করতে তাকে গ্রহণ করার
অন্ত। তাই সে সমাজে বিকৃত হল, আদর্শ নারীর সম্মান
পেল না। আশাবাদের আদর্শ পুঙ্খ হল Manders যে
অ্যালভিংকে পাত্তিপ্রত্যাহারে উষ্ম করেছিল। সমগ্র
জীবনকে যে গ্রহণ করতে চাইল, সে হল তিরস্কৃত; আর
সে জীবনের পথে যে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল, সে পুরস্কৃত
হল আদর্শের পূজারী মিসেসে।

প্রায় সব নাটকেই এই ধরনের চরিত্র সৃষ্টি করলেন
ইবসেন; জীবনে সামাজিক আদর্শের বার্তা প্রতিলব
করলেন। ইউরোপের রক্ষণশীল মহল কিন্তু এতে
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। কিন্তু হওয়ারই কথা; সমাজ-
দৌণের (সমাজ কারাগারের নয় ত?) ভিত্তি যে ভেঙ্গে
দিলেন ইবসেন!

সাধারণ মানুষ, বাস্তব “আদর্শ-কারাগারে” বন্দী, তারাই
কিন্তু অভিনন্দন আনালো ইবসেনকে। ইউরোপের
বিভিন্ন ভাষার ইবসেনের নাটকের অল্পখালে আর
বিভিন্ন দেশের রক্ষণকে তাদের শাকলাযুক্ত অভিনয়েই
রয়েছে তার প্রশংসা। ইবসেনের নাটকে মানুষ পেয়েছে
হুজির পথ—তাই এই অভিনন্দন; সেখানে রয়েছে
সমাজদর্শনের রক্ত উৎসাহটন—প্রাণবর্ধের হুড়ি।
ইবসেনের কৃতিত্ব এইখানেই,—স্তায় অভিনবধর্ম।

সাহিত্য পরিচয়

কব্যপ্রবাহ ১—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বুথোপাধ্যায়।

শব্দ এ বুথানী এও কোং সিং।

‘প্রত্যেকের বুকেই ছুটি ক’রে হাহুয় আছে, একটি কেমোহাহুয়, সে প্রয়োজনের কাজ শুধায়; আর একটি ব্রহ্মচারী পবিত্র, সুতের বেশার মন মাতিয়ে দেওয়াই তার কাজ।’ লেখকের মনের কোণে হাহুয়-টির কাজ শুধারির সাথে সাথে তার রূপ রূপান্তর ব্রহ্মচারী হাহুয়টি বাণী বাজিয়ে চলেছে, সেই বাণীর বেশার বিস্তার লেখক সাহিত্যরস পান করে চলেছেন। দেশী-বিদেশী, প্রাচীন-নবীন, সাহিত্যে কাব্যে, গল্প-উপক্ৰমে, নাটকে, লেখকের জ্ঞান যে কত গভীর জ্ঞানের পরিধি যে কত ব্যাপক তা তাঁর এই ‘সাহিত্য প্রবাহের’ হুস্তে ছেঁয়ে বরা পড়ে।

‘সাহিত্য-প্রবাহ’ সাহিত্য সমালোচনার বই। দেশী ও বিদেশী সাহিত্য, সাহিত্যিক পরিচিতি আর রবীন্দ্র সাহিত্য। এইভাবে বিবর বন্ধকে ভাগ করা চলে। তবে কোন অংশেই ব্যাপক বা বিস্তৃত পরিবেশ নিয়ে লেখার চেষ্টা নেই। সাহিত্য কেড়ে বিচরণ করতে করতে লেখকের রসপিপাসা মন, যে কারাগার থেকে আপনি বলে উঠেছে ‘বা—চন্দ্রকর’ সেখানটার কবি সাহিত্যরস-মন মনের সাথে নিজের মনকে মিলিয়ে উপভোগ করেছেন, সেই উপভোগের আনন্দেরই একটু আধটু ভাগ রেখে গেছেন সাময়িক পত্র পড়ে।

বিদেশী সাহিত্যের আলোচনায়, লেখক বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন, ‘আপানী কবিতা,’ ‘জীবনের জয় মুহুর্তে,’ ‘লাংহাইয়ের জড়,’ আপানী প্রকৃতিতে, ‘প্রতি মুহুর্তে’ যে রূপ-বাহুরী কুটে উঠেছে মূলের মনে, বলকে উঠেছে শাবীর পাখার ভাঙেই এরা একে রেখেছে রঙে ও রেখায়, জীবোধ্য দার্শনিক রহস্য নয়, কঠিন পরমার্থ তত্ত্ব নয়, এ বেশ পৃথিবীর লব ঢলার গান; দু’ধারে মূল কুড়িয়ে নিয়ে চলেছেন কবি মুগ্ধ, আপনি হারা, ‘এই লহক স্বাক্ষর আপানী কাব্যলবীর মনোরম শাবণে’

আমাদের লেখকও মুগ্ধ, আপনি হারা। আপানী কাব্য সাহিত্যের আধিভূগ লেখক নব্য রোমান্টিক হুগ পর্বত তিনি বিচরণ করেছেন। আপানী কবিতার অজবান-ভুলি পড়ে মনে কোন মগ্নের থাকে না যে এরা আমাদের লেখকেরই স্বর্গ। মূল ভাবও হৃদয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে এক মূগুর কাব্যাহুয়াদ চোখে পড়ে না—

‘লাহাড় চূড়ার চেহী মূল কোটে
বেয়ের মত,
বরে বাহ, যেন মিথিপুর মূল,
ভুবার পত।

(কোরেমিতি)

‘মহত্তের পূর্ব চাঁদ,
পাইন পাছের চাঁদা পড়েছে
মাহুরের উপর।

(কিকাকু।)

পান্ডিত্য রোমান্টিক ব্রহ্মসুতির প্রভাব ও এসে পড়েছে আপানী কবিতাতে—

একাকী হাড়িয়ে জনি

বিবাদের মুহুর্তে মন;
মুহুর্তে মুহুর্তে বুকে
অমরীন নীলাকাশ
তুল হুথালোকে
বিত্য যে কথা বলে।

একক সে বাহী

পাশ, তবু সে দীর্ঘ।
কি করে জানবো আমি,
মুহুর্তে কি কথা বলে
মুহুর্তে মুহুর্তে
আলোকিত আকাশ।

(কান্দুবারা।)

‘এই ব্রহ্মসুত কবির বেশেই নাট্যকারেরা আত
নাটকে রূপ দিচ্ছেন বাস্তব জীবনের বিভিন্ন দৃশ্য

সংঘাতকে।' পারিবারিক ক্রীতি বন্ধনের চমৎকার একটি চিত্র, 'জীবনের অর দুইটি,' এর নাট্যকার ইরামানোজা ইবুজের। আরম্ভ আর শান্ততা অগৎ সম্বন্ধে ততটা রাশি না। 'সাহাইয়ের স্বপ্ন' প্রাচ্যের জীবন সংগ্রামে অর্জিত দারিদ্র্য-ক্রিষ্ট, সাধারণ চীনা বাহুবলকে কেন্দ্র করে একটি উপজাত। সংগ্রাম রক্ত করেচকী 'জীবনের ভাগ্যলীল' চিত্র পরম অহুস্পার সংগে একেছেন স্তরাসী কথা শিল্পী 'আজ্ঞে মালমো।'

সাহিত্যিক পরিচিতির প্রথমেই পাই, 'এটন চেখভ' কে। তাঁর শিল্প স্রবনা ও সহজ কথা সহজ ভাবে বলার নিম্নম স্রবন তলটি আশাধের লেখককে আকৃষ্ট করেছে, তাই তিনি বলেন 'শিল্প নৈপুণ্য, বিশ্ব বৈচিত্র্য, ভাব-চিত্রণে সম্ভবত বোঁপাসার চাইতে চেখভ নিষ্ঠুর।' মানবের প্রতি অহুস্পার জীবনের প্রতি সহজ প্রেমের বোঁব হর তার রচনা গভীরতর, গম্ভীরতর। উর্ সাহিত্যে কবি হালির নাম অক্ষর। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের দুগে কবি হালির অথও তারন্তের উপাসনা জাতীয়ভাবোথের পৃষ্ঠা লেখককে মুগ্ধ করেছে, কবি ইকবালের আদর্শপ্রতি, তাঁর বলিষ্ঠ দৃষ্টি-ভংগী ভবিষ্যৎ জাতিকে অহুপ্রেরণা দেবে এই আশাই আশাধের লেখক করেন।

স্বভাবকবি গোবিন্দচন্দ্র দাস আর হুম দর্রাই সত্যোদয় রক্তের সাহিত্যিক পরিচিতি অভ্যন্তর মনোজ ও প্রাণশল্লী হবেরে, জাতীবন দারিদ্র্যের সাথে মুগ্ধ করেও গোবিন্দচন্দ্র কি করে কবি বলটিকে ধাঁড়িয়ে রেখেছিলেন তাই আরম্ভা বিশ্বের সংগে তাবি। 'তার কবিতা কোথায়ও পরের অহুস্পার বা কামনিক স্রব দুঃখের কথা নয়, জীবন সত্যোবরে পদ্বের মত হুটে উঠেছে, যে আদম্য বেদনা একতাই কবির অস্বরকে আলোড়িত করেছে, কবিতাজলি তাইই প্রকাশ, তাই তাঁর বর্ণনা ওজী এমন সম্ভী ও মৃদু।' 'আর সত্যোজ্ঞানোথের বৈশিষ্ট্য, 'তিনি বড় কবির বোঁহে পড়ে স্বাতন্ত্র্য হারাননি।

তাঁর কাব্য অঙ্গলোকের ভাণ্ডার, মনোরম চিত্রশালা, ইজ্ঞাশালের রক্ত। সেখানে প্রবেশ করলেই মুগ্ধ হতে হয়, ধ্যান ভ্রমরতার অস্বকাশ সেখানে নেই। আরে শুধু রক্তের উপর রং, বোঁহের উপর মোহ, নানাবর্ণের লক্ষ্যামেথের খেলা। সেখানে পতীর গান, ময়ূর বার, সে শুধু করনার পাখা মেলে উড়ে বাবার দেশ।

'জীবন সাগরে কত ডেউ, কত বোঁজ-জোঁহা-নীপু কেন-বুড়ু।' ঘরে ঘরে ত্রিতকণে চলে হাসি-অক্ষর লীলা, মনে মনে জাগে অহুস্পার বিরাগের গোপন কন্দন, শিল্পীর তুলি হুটিয়ে জুলবে তাবের রূপ ভাবার রেখার আর জগরের রক্তে। অঙ্গগৌরবী আশাধের মন তার হাতে পাবে আশন। স্বর্ধাধ। 'আধুনিক বাংলা কবিতা, 'বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রকৃতি আর 'ভোটগর' এই তিতটি লেখার, বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন লেখক। আধুনিক বাংলা কবিতা ও ভোটগরে বীরেন বাবুর জ্ঞানের পরিবি যে কত স্রুতবিশুদ্ধ তা তাবলেও অস্বক লাগে। ছোট বড় কোন কবি বা গরকারই তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেন নি, আরও আশ্চর্য তাঁর অহুস্পার ও বিশ্লেষণ ক্ষমতা, প্রতিটি গল্প ও কবিতা তিনি প্রাণ মন ও বুদ্ধি সম্মান রেখে পড়েছেন।

রবীন্দ্র সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা বা মনালোচনার অভাব নেই আশাধের সাহিত্যে। অভাব হ'ল একপ্রত্যার সাথে রবীন্দ্রসাহিত্য পড়ে নিতের মত করে তাবা বা মনালোচনা করা। 'বাগ্জাতার কবি', 'মামলী', 'সোনার তরী', 'খেরা' আর রক্তকরবীতে আশাধের লেখককে দেখি পড়তে পড়তে যে তাবটী অজ্ঞাতসারে মনে জেগে উঠে সেই তাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ভাবতে বা মনালোচনা করতে। সোনার তরীর তাব ব্যাখ্যার লেখক বলেছেন—'আমি যখনই পড়ি, এ কবিতার অস্ত্র একটি অর্থ আমার মনে আসে। তাবের স্তরানী। কবি কুলে বসে আছেন, দু' বেকে শাদা পাল তোলা একখানি বৌকা কাঁছে এসে আবার দিগন্তে মিলিয়ে

সেণ। সুহৃদের বন্ধ। এমনি করেই অসীম সৌন্দর্যের দেবতা চকিতে দেখা দিয়ে কোথায় অসমর্থান করেন। কণ-রূপের মধ্যে অরূপের স্পর্শ, আনন্দের বৃদ্ধি ছয় ভোলে তার সৌন্দর্য, নিবেদন করে তার আবেগ কল্পনার সোনার কল চার তার রূপতরীতে, তির্যক একটি স্থান। কিছ ভা ভো হবার জো নেই, অনন্ত স্রব্ধকে পাই শুধু জীবনের ছ' একটি পরমকণে অনন্ত আনন্দের সংগে গাপন করতে পারি না। অনন্তের অবিচ্ছিন্ন বোণ। 'সোনার তরী' ব্যাখ্যা কবি করেছিলেন, 'সোনার তরী' লেখার অনেক পরে 'বাল্লভ সমস্ত জীবন ধরে মঙ্গল চায়ে করেছে। তার জীবনের ক্ষেতটুকু বীণের নত, চারি দিকেই অস্বস্তির দ্বারা বেষ্টিত..... তারপর কাল ঘনিয়ে এলে সংসার তরণীতে বাল্লভের নিত্য কলটুকুর ঠাই হয় কিছু সেই সাথে নিমেষের ঠাই বেগে না। এই ব্যাখ্যা রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী কালে তার বিরোধ নানা জনের নানা ব্যাখ্যায়, সোনার তরী সম্বন্ধে কবি একবার বলেছিলেন, 'মনে করোনা, বিশেষ কোনই অর্থ নাই, কেবল বর্ষা, নদীর চর কেবল মেঘলা মিনের তাব, একটা ছবি একটা সংস্কৃত মাত্রই যদি হয় তাতে কতি কী?' তাই মনে হয় বীর্ভেন বাবুর ব্যাখ্যায় সাথে রবীন্দ্রনাথের মূল ভাবের হরত বিরোধ নেই।

'মনীষী রবীন্দ্রনাথের মনের আড়ালে রয়েছে এক চিরন্তন ঘেরালা শিশু, সে মনোনা কোন ধাবন, তার ধারে না স্ক্রিয়ার। বুড়ের গাড়ীঘটকে উপেক্ষা করে সে ছুটায় হাসির হিরোলে উচ্ছ্বিত করে তোলে আকাশ—কে। 'খাপছাড়া' খেদ রাজসিংহের আকাশ, এই যে, এই রোদ, বৃষ্টি কোন স্পষ্ট ছাড়া অনিচ্ছের রাগত কিছ বিচিত্র এই মেলা কণিক খালে আর অশ্লীল কৃত্যপার লুকাচুতি, হং আর চারার বিবোহন আলিঙ্গন।

যে একাক্ত ভাবে মনের সেই ভো। মানসী, তাকেই তো। আমরা বুঁজে বসি লজলজ, লকল প্রোবে, প্রকৃতি-প্রের আর বেশ এই ভিন ভ্রমে মানসীর অর্থা রচনা। একতাক কেড়েই কবির দৃষ্টি অশ্রুত্বী। স্মৃতি উজ্জ্বল উজ্জল, যোগাটিক ব্রহ্মবস্ত্রিত সুস্বপ্ন এর কবিতাগুলি। একমুখিতা আবেগ, স্বর বাহন—গীতিকবিতার

প্রধান লক্ষণগুলি সবই এ কাব্যে পরিদৃষ্ট;—আত্ম-বোমটিকতার বা কিছু শুণ—হৃদ বগ্ন, বাসনা বিকোভ—ভাগ উজ্জল বর্ণনাগে রঞ্জিত করেছে এই 'মানসী প্রতিধ্বং'।

'খেদা রচনার কিছুদিন আগে কবি হারিয়েছেন তাঁর স্ত্রী আর একটি কল্পাকে। তাই মনে আগছে 'শেষ বেলা'র কথা হেহ-মন মিশ্রাণের অস্ত ব্যাখ্য। তাই আমরা যেখি পূর্ববর্তী সোনার তরীর ও অজ্ঞাত কবিতার চাইতে সৌন্দর্য দৃষ্টি আরও গুরু আরও পতীর। বৈক্য তাব, বহুর রূপে ভগবানের কল্পনা, শান্তি আকাংখা খেদা বাবো প্রাণান্ত লাভ করলেও কবি জোশেননি যে শুধু কোমলতা জীবন পঠনের উপাধান নয়, কেবল সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে জীবনের পূর্ণতা নেই। দেবতার দান চুহর বক্তব্য তার। তার আসান নক্তির আসান।

'সত্যতার সংকট কণে আত্ম জীবনের' আদর্শ সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন আগছে আনন্দের মনে। জীবন ব্যাককে লক্ষ্য করতে থেরে আমরা তাকে অতিশয় জটিল করে ফুলছি। হাতের চেয়ে হাতিরায় হয়ে উঠেছে বন্ধ। রবীন্দ্রনাথ তাই বার বার বলেছেন অস্তরের দিকে চোপ কেবোও, কেবল বাইরের দিকে চেয়ে খেচো না, সোনার ভাল-বস্তই ফুড়িয়ে আনো, তাকে ভরবেনা মন ভাল-বাসো। প্রকৃতিকে ভালবাসো। বাল্লভকে বিশ্বের সংগে জীবনের সুর মেলাও পাবে শান্তি, পাবে আনন্দ; 'রক্ত কবী'তে এই কথাই গুনি উপদেশ রূপে নয়, সরল বাণী রূপে।

'সাহিত্য-প্রবাহ' পড়ে লেখকের পাণ্ডিত্যের প্রতি বশত্বৃত' প্রভা আগে। কাব্যালোচনার উপায়ে প্রয়োণের সময় সব চাইতে উপযোগী সব চাইতে সুন্দরটিই তিনি ফুড়িয়ে এনে সাজিয়েছেন। এ শুধু তার বিভাবতার পরিচয় নয়, এ থেকে আমরা বুঝি তার রসাহুতি কত ভীত। শুধু রসাহুতি থাকলেই উচ্চ শ্রেণীর লখনাটক হওয়া যায় না। চাই বীর্ভেনবাবুর হত চিন্মীলতা চাই ভবধর্মন।

অনলেন্দু চক্রবর্তী



হারিভাবাদ কংগ্রেস অধিবেশন

দৈনিক কংগ্রেসের প্রায় দুই বছর পর হারিভাবাদে কংগ্রেসের ৪৮তম অধিবেশন হয়ে গেল। কংগ্রেস অধিবেশন উপলক্ষে হারিভাবাদ নগরের উপকণ্ঠে তিন দিনের জন্য একটি নগর তৈরী করতে হয়েছিল। প্রতি বছরই কংগ্রেস উপলক্ষে এমন একটি সাময়িক নগর গড়ে উঠে। প্রায় ২০ লক্ষ টাকা এই অধিবেশন উপলক্ষে খরচ হয়েছে। নর্থ ও এন্টিনিবিশের নিকট হতে হকিঙ্গা বাসন করে লক্ষ মুন্সী পাওয়া গিয়েছে; অত্যধিক পরিমাণে সন্দের হকিঙ্গা বাসনও বিক্রয় টাকা উঠেছে, সব নিয়ে হরত খরচ কুলিয়ে কিছু টাকা উদ্ধৃত্তও থাকবে। এটা কংগ্রেসের অনশ্রিতার অকৃত্রিম পরিচয়। কিন্তু এত বিশুল অর্থ ব্যয় করে অধিবেশন করার যুক্তি-বুদ্ধিটা সবেছে প্রশ্ন স্বভাবতই ওঠে। এবারকার অধিবেশনে তিন সপ্তাহের চেয়েও বেশী প্রতিদিনই এবং লক্ষাধিক বর্ষক উপস্থিত ছিল। পণ্ডিত জগদ্বলাল এই অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন। বর্তমানে কংগ্রেসের যে অবস্থা গাড়িয়েছে তাতে জগদ্বলাল ব্যতীত অন্য কারো পক্ষে কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া সম্ভব নয়, হরত সম্ভবও হবে না।

সভাপতির অভিভাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নজর। হ'ল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হু'একট উক্তি, পাকিস্তান সাম্প্রদায়িকতাই সত্য। এবং অসুসলদামণ যে সেখানে প্রধান অধিকার পেতে পারে না এবং তাড়া যে বর্তমানে ভারত অসুস্থই এবং তবিশ্বাস সবেছে আশংকাজিত হবেই একথা পণ্ডিতজী তাঁর অভিভাবে শীর্ষই বলেছেন।

তিনি আরও বলেছেন যে পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ নীতি সবেছে আমাদের বলার বা সম্বোধনা করার কোন অধিকার নেই। কিন্তু পাকিস্তানের যে সতীর্ঘ নীতির ফলে সেখানকার সংখ্যালঘুদের সমস্ত কটিল করে তোলে, সে সবেছে আমরা একেবারে উদাসীন থাকতে পারি না। এই প্রসঙ্গে তিনি রান আব্দুল গফুর খানের বন্ধি অবস্থার কথা উল্লেখ করে দুঃখে একাশ করেন। পাকিস্তানের ব্যাপার নিয়ে এমন শীঘ্র ভাবায় কথা বলা পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে এই প্রথম। এখানে উল্লেখযোগ্য যে এই অধিবেশনে প্রবন্ধের ঋণ সচিব সবেছে এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে, কংগ্রেসের পক্ষেও এ একটি অভিনব প্রস্তাব। সংখ্যালঘুদের পক্ষে পাকিস্তানকে বিশেষ নিরাপদ ও আশার স্থল নয়—তা এর পূর্বে পণ্ডিতজী কখনো শীর্ষকাবে বলেন নি।

এ ব্যতীত অভিভাবে আর যে সব কথা বলা হয়েছে তা যেটাই হু'ই বাহুদী ধরনের। পরমাত্র নীতির লক্ষ্য, বিশ্ব-রাজনীতি ক্ষেত্রে হবছয়ে ভাব, হামিরা ও আমেরিকার মন কথাকবি, ভাষান্তিক প্রদেশ গঠন, পক্ষ বাহিকী পরিকল্পনা, কোরিয়া যুদ্ধের অবসানের জন্য ভারতের প্রস্তাব প্রতীতি বিশ্ব সভাপতির অভিভাবে যে সব কথা বলা সম্ভব তা সবেছেই অস্বাভাবিকতা যেতে পারে। নতুন সংবিধান অস্বাভাবিকতা সাধারণ নির্বাচনের পর কংগ্রেসের এই প্রথম অধিবেশন। সভাপতি প্রবন্ধেই নির্বাচনে লাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু নির্বাচনে যে সব স্থানে কংগ্রেসের পরাজয় হয়েছে, তার কারণ বিশ্লেষণে কোন প্রয়াস

এই অভিভাষণে নেই। স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেস ছিল আত্মীয় অবিসংবাদিত নেতা : তবু তার পাঁচ বছর পরে নির্বাচনে কংগ্রেস এতগুলি আসন হারিয়েছে কেন ? যা প্রাপ্ত ভোটের শতকরা ৪০-এরও কম ভোট পেয়েছে এবং বাকি শতকরা ৬০টি ভোট কংগ্রেসের বিপক্ষে কেন গিয়েছে, এর জন্য কোন আত্ম-বিশ্লেষণের চেষ্টা এই অভিভাষণে নেই। একটি প্রদেশটির আর সব প্রদেশেই কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে বলে সভাপতি সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এর মধ্যে কয়েকটি প্রদেশে কংগ্রেস যে সংখ্যাগুরু বল না হয়েছে কোন দৃষ্টান্তে কোভাভাভা : বিহে মন্ত্রিসভা গঠন করেছে সে কথারও উল্লেখ অভিভাষণে নেই।

সভাপতির অভিভাষণে আত্মিক আত্মনা জানানো হয়েছে নতুন সমাজ গড়বার জন্য যাতে সকলে সমবেত চেষ্টা করে। আজও আত্মীয় অন্তরে লাভা তুলতে পড়েন একমাত্র পণ্ডিত জগদ্বদলাল, তাই আমরা তাঁর এই আত্মনাকে সমর্থন করি।

এবার কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলির একটু আলোচনা করা হরকার। এবারকার কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবের মধ্যে, যান আত্মলু গৃহীত যান সঙ্ঘে ও আচার্য বিনোভা ভাবের ভূমি বজ্জ সঙ্ঘে প্রস্তাব দুটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য,—পাশ্চাত্য স্বাধীন রাষ্ট্র থাকে রাষ্ট্রের ক্ষমতায় পাঁচ বছর বাঁধত বন্ধ করে রেখেছে, তাঁর সঙ্ঘে অপর রাষ্ট্রের প্রধান রাজনৈতিক দলের পক্ষে প্রস্তাব ও উল্লেখ প্রকাশ করে প্রস্তাব গ্রহণ করা একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার প্রয়োজন ছিল। আচার্য বিনোভা ভাবের ভূমি বজ্জের প্রস্তাব সঙ্ঘেও আমরা মনে করি, এটা নিতান্ত সমর্থিত হয়েছে। এমনি প্রস্তাব গ্রহণ না করলে কংগ্রেসের পক্ষে প্রস্তাব হ'ত। এই প্রস্তাবের শেষ ভাগে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সঙ্ঘকে সমর্থন করা হয়েছে যাতে তারা আচার্য বিনোভার প্রচেষ্টাকে সফল করতে সাহায্য করে। আমরা আশা

করি ভূমিগত সরকার সঙ্ঘে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার সঙ্ঘে এই প্রস্তাবের পরে অবিকল্পিত সক্রিয় ও সচেতন হবে।

ভারতের বৈদেশিক নীতি সঙ্ঘে এক দীর্ঘ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে। কংগ্রেস বিরোধীরা সঙ্ঘে মোটামুটি স্বীকার করে যে ভারতের বৈদেশিক নীতি মোটের উপর সমর্থন যোগ্য। আমরা জানি, ইউরোপ ও আমেরিকার জনমত ভারতের প্রতি প্রত্যাশী। বহু স্বানে ভারতীয় বৈদেশিক নীতির জ্ঞানটি হয়। আমরা দেব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকেও বলতে পারি, বিশ্ব রাজনীতিতে ভারতের প্রভাব ও ভারতীয় বৈদেশিক নীতির ব্যক্তি ক্রমেই বাড়তে। কাজেই কংগ্রেসের পক্ষে এমনি প্রস্তাব গ্রহণ করা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু এই প্রস্তাবের যেখানে সংযুক্ত আভি-সংঘের যোগ্যটি দেখান হয়েছে, সেখানে এই প্রস্তাব আমাদের নিকট ক্রটিপূর্ণ মনে হয়। আভি-সংঘের সংবিধানের মৌলিক পরিবর্তন না হলে বিশ্বের সংস্থা হিসাবে এর কার্যকারিতা থাকতে পারে না। পাঁচটি স্বাধীন সঙ্ঘের (ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, চীন ও রাশিয়া) যে কোন একজন কোন প্রস্তাবে আপত্তি করলে সে প্রস্তাব কার্যকরী হয় না। এই নাকচকারী ক্ষমতা (Power of Veto) যোগ্য না হওয়া পর্যন্ত সংযুক্ত আভি-সংঘ সক্রিয় ভাবে কার্য করতে পারবে না। এই প্রস্তাবে এই কথা উল্লেখ নেই। অর্থাৎ কমিটি (Trusteeship Committee) যেভাবে আভি-সংঘের নামের যোগ্য দিয়ে কোন বিশেষ বিশেষ আভির সাহায্য রক্ষার সাহায্য করছে তারও উল্লেখ এই প্রস্তাবে নেই। আর সঙ্ঘে চার বছর পরে সংযুক্ত আভি-সংঘের সংবিধান নিয়ে পুনর্বিবেচনা হওয়ার কথা আছে। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবে তারও কিছু উল্লেখ থাকা উচিত ছিল। তবু এই প্রস্তাব মোটের উপর সন্তোষজনক।

দক্ষিণ আফ্রিকা সঙ্ঘে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা মোটের উপর আভির বিনোভাকে ব্যস্ত করেছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বর্বরোচিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আল সোখানে যে শান্তিপূর্ণ সংগ্রাম চলেছে, মোটের উপর বলা যায়, ভারতবাসী তার নেতৃত্ব নিষেধে। ভারতের বাইরেও এ কথার স্বীকৃতি আছে। আফ্রিকার অধিবাসীরা যে নিরপত্তা ও শান্তিপূর্ণ ভাবে এই সংগ্রাম চালাচ্ছে তা তথাকার ভারতীয়দের নেতৃত্বে সম্ভব হয়েছে।

পঞ্চাধিকারী পরিকল্পনা সম্বন্ধে প্রস্তাবে বলা হয়েছে যে, আভির পক্ষে সবচেয়ে কঠিন সমস্যা হ'ল জন-সাধারণের জীবন-যাত্রার মানের উন্নতি লানন করা, দারিদ্র ও বেকার সমস্যার সমাধান করা এবং সংবিধানে নিবদ্ধ সামাজিক ক্রম বিধান ও সাম্য সাধন করা। এই উদ্দেশ্যেই পঞ্চাধিকারী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করে জনসাধারণের ব্যাপক সহযোগিতার উপর। ঐ প্রস্তাবের শেখাংশে জনসাধারণের সহযোগিতার জন্ত আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু সহযোগিতা লাভের পন্থা কি করা উচিত তা প্রস্তাবে বলা হয় নি। তাই আমরা এই প্রস্তাবকে ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করি। একথা স্বীকার করতেই হবে যে পঞ্চাধিকারী পরিকল্পনা আভির মনে বিশেষ কোন উৎসাহ বা উদ্দীপনার সঞ্চার করতে পারেনি। সহযোগিতা আহ্বান করলেই সহযোগিতা পাওয়া যায় না। তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা সরকার।

কংগ্রেসের অপর একটি প্রস্তাবে ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের কথা বলা হয়েছে। তাতে মোটের উপর বলা হয়েছে, বর্তমানে অল্প ব্যতীত ভাষা ভিত্তিতে অল্প কোন প্রদেশ গঠন করা হবে না। এই ব্যাপারে কংগ্রেসের নীতি খুব অস্পষ্ট নয়। অল্প, সবচেয়ে সরকারের দত্ত কর্মসূচি পূর্বেও মোটেই অল্পকূল ছিল না। এক অল্প, নেতার জনমনে আত্মাহুতির পর সরকার অল্প প্রদেশ গঠনে রাজী হয়েছে; সহজেই অল্প প্রদেশের লোকেরা মন করতে পারে সরকারের পক্ষে অস্বীকৃত অসংস্থার

সৃষ্টির উপর অকাত্ত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠন নির্ভর করবে। এই প্রদেশ বাংলা দেশের একটা অভিযোগ আছে। তা কংগ্রেস নেতৃবর্গের অরণ্যে থাকা উচিত। ১৯১২ সালে কংগ্রেস পেটাই প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বিভাগের অন্তর্গত মানভূম, সিংভূম, ধলভূম, পুর্নিয়া প্রভৃতি বাংলাভাষী অঞ্চল বাংলার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। কংগ্রেসের সেই প্রস্তাব আদৌ অসূচ্য হয়েছে। অগত ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের জন্য কংগ্রেসের তরফ থেকে সেই সর্বপ্রথম দাবী।

কংগ্রেস আর একটি প্রস্তাব পাশ করেছে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের শিক্ষা করে এবং তেমনি মনোভাব প্রসাধন পন্থা প্রকাশ করেছে। সাম্প্রদায়িকতা সর্বথা নিষেধ। কিন্তু ভারতবর্ষে যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের তেমন কিছু প্রসাধন হচ্ছে তা আমাদের মনে হয় না। আমাদের মনে হয় এই প্রস্তাবে বাস্তব অবস্থাকে কিছু বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে।

কংগ্রেস অবিরোধনে জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা বশেষ দেখা গিয়েছে, কিন্তু শাসন কার্যের দায়িত্ব গ্রহণকারী একটি দলের ব্যবহারিক সম্মেলনে এটাই পর্বপ্রথম নয়। গত পাঁচ বছরের শাসন কার্য ও তার ফলাফল সম্বন্ধে একটি আত্মতত্ত্বসন্ধানমূলক বিচার থাকা উচিত ছিল। কংগ্রেসের একান্ত সম্মত সনর্ভক ও এম্বী কর্তে পারবে না যে গত পাঁচ বছরের শাসন কার্য সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন হয়েছে। কংগ্রেস যদি আত্মতত্ত্বসন্ধান করে নিজের অসুস্থতা নীতি ও পন্থার ভুল ব্যবহার ও স্বীকার করার প্রয়াস না করে তাহলে তার পক্ষে ভুল শোধরানো কঠিন হবে। অসুস্থতা নীতি ও পন্থার ভুল স্বীকার করে তা শোধরানোর চেষ্টা করলে জন-সাধারণের কাছে কংগ্রেসের জন-প্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে।

চীন সম্বন্ধে নতুন নীতি

আর্মেনিকার নতুন রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করেছেন যে আর্মেনিকার লক্ষ্য নৌ-বাহিনীকে ফরাসীরা থেকে সরিয়ে নেওয়া হউক। কারণ এই নৌ-বাহিনী বহুদিন

চীনকে করমোঙ্গার কুমিংটাং সরকারের আক্রমণ থেকে রক্ষা করছিল। আইসেনহাওয়ারের হাতে এই নিরাপত্তার আড়ালে থেকে কম্যুনিষ্ট চীন সরকার কোরিয়াতে সাংস্কৃতিক-সাংস্কে সৈন্য-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাবার প্রয়াস পাচ্ছে। তাই আইসেনহাওয়ার হুকুম দিচ্ছেন সমস্ত নৌ-বাহিনীকে করমোঙ্গা হাটে সত্বে নেওয়া হউক। বাণাশাট্টা ভেদন সরল নয়। ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধ শুরু হওয়ার পরে কম্যুনিষ্ট চীনের ভরফ থেকে করমোঙ্গা আক্রমণের আশংকা প্রবল হয়েছিল। তা ছাড়া চীনের উপকূল দিয়ে সাংস্কৃতিক বাণিজ্যের ও জাহাজের চলাচলেরও ব্যাঘাত হচ্ছিল। তখন আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ট্রুম্যান সমস্ত বাহিনীকে করমোঙ্গার নিকট স্থাপন করেন। এবং করমোঙ্গাকে নিরপেক্ষ অঞ্চল বলে ঘোষণা করা হয়। এর প্রবল উদ্বেগ ও তাৎপর্য হল এই যে করমোঙ্গাতে অবস্থিত কুমিংটাং সরকারকে কেউ সেখান থেকে সরাস্তে পারবে না। এর অর্থশ্রুতী প্রতিজ্ঞা হিসাবে করমোঙ্গাতে অবস্থিত কুমিংটাং সরকারের পক্ষেও কম্যুনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধে কোন অভিযান করা নিষিদ্ধ হ'ল। কুমিংটাং সরকারের পক্ষে তখন চীন আক্রমণ করে কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রকে পরাজিত করার কোন সম্ভাবনাই ছিল না; বরং তার উল্টা দিকে বধেই সম্ভাবনা ছিল। অর্থাৎ কম্যুনিষ্টরা হয়ত তখন করমোঙ্গা আক্রমণ করে দখল করতে পারত।

তার পরে গত আড়াই বছর ধরে করমোঙ্গার অবস্থিত কুমিংটাং সরকার চীন আক্রমণ করার ধন্য তৈরী করেছে, অপর দিকে চীনের কুমিংটাং রাষ্ট্র কোরিয়ার যুদ্ধে অড়িত হয়ে হরত কিছু শক্তি নষ্ট করেছে। আজ প্রায় তিন বছর হল কোরিয়াতে যুদ্ধ চলছে, তার মধ্যে প্রায় দুই বছর বাতত চীন প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে অড়িত আছে। শোক কর, অর্থ কর, ও শক্তি কর চীনের ঘণ্টে এতে হয়েছে। চিকাগোবৈদেশিক করমোঙ্গাতে নিরাপত্তা বলে শক্তি লোক করার চেষ্টা করেছে, এবং

করমোঙ্গা পূর্ব থেকে তখন ব্যক্তিগত তিনি চীন আক্রমণের অস্ত্র ভোড়ভোড় করছেন, আইসেনহাওয়ারের বক্তৃতি নিম্নোক্তের ফলে হয়ত চীনে আবার নতুন করে গৃহ যুদ্ধের প্রচনা হবে। কম্যুনিষ্ট চীনের পিছনে আছে সোভিয়েট রুশিয়া, সর্বশ্রকারে সে কম্যুনিষ্ট চীনকে সাহায্য করবে। আর কুমিংটাং চীনের পিছনে আছে আমেরিকা এবং সর্বশ্রকারে তাকে সাহায্য করবে। ত্রিশ চল্লিশ বছর বাতত চীনে কোন না কোন রকমের গৃহযুদ্ধ চলছিল। ১৯১১ সালে মাক্স শাসনের বিরুদ্ধে স্পিলভের পর থেকে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত চীনে কদাচিৎ একটা কেন্দ্রীয় শাসন চালু ছিল; বিভিন্ন অংশে একটা সামরিক বা সেনাপতির অধীনে খেচ্ছটার শাসন ভোগ করেছে। এবং আর বরাবরই একটা গৃহযুদ্ধ চীনে চলছে। গত আড়াই বছর বাতত সেই গৃহযুদ্ধের অবসান হয়েছিল। কম্যুনিষ্ট শাসনের প্রথম হয়ত চীনের বর্তমান আছে। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার হয়ত সেখানে নেই। কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে বা বর পাওয়া যায় তাতে এটা অসম্ভব স্বীকার করতে হবে যে (১) সমগ্র চীনে আজ এক শাসন ও রাষ্ট্র অধিকার চালু আছে। (২) অন-সাধারণের জীবনব্যক্তি পূর্বের চাইতে সহজ হয়েছে, এবং (৩) বৈদেশিক শোষণ বন্ধ হয়েছে। আবার গৃহযুদ্ধ শুরু হলে এ সমস্ত ব্যবহার হয়ত ব্যাঘাত জন্মাবে।

তা ছাড়া সমগ্র এশিয়ার শক্তি ব্যাহত হওয়ার আশংকাও এর মধ্যে আছে। চীনের এই দুই দলের পিছনে গাড়ির পুঁথিরী ছুটি স্ট্রেট রাষ্ট্র এই গৃহযুদ্ধে যোগদান হবে। সহজেই পনের বৎসর পূর্বের স্পেনের গৃহযুদ্ধের কথা, আমেরিকার মনে আসে। সেখানেও আমেরিকা দেখেছিল বিভিন্ন রাষ্ট্র স্পেনের মুখ্যমন্ত্রীর দুই দলকে নানাভাবে সাহায্য করেছে। এই প্রসঙ্গে আমেরিকার আরও মনে পড়ে চীন ও স্পেনের প্রথম যুদ্ধের কথা। বর্তমান কোরিয়ার যুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে নয়—এ যুদ্ধ হল রুশ ও আমেরিকার

মধ্যে। চীনের গৃহযুদ্ধ প্রকৃতপক্ষে রুশ ও আমেরিকার
যুদ্ধে পরিণত হবে। কোরিয়াতে মহাযুদ্ধ কোরিয়া-
বাসীরা, আর ধ্বংস হচ্ছে সমগ্র কোরিয়া। চীনে গৃহ-
যুদ্ধ শুরু হলে সেখানে মহাযুদ্ধ চীনায় এবং ধ্বংস হবে
সমগ্র চীন। তাই এই নতুন প্রত্যাবে সমগ্র এশিয়া
শঙ্কিত হচ্ছে।

এর উঠতে পারে—হঠাৎ এই নতুন ব্যবস্থাকেন?
অবস্থা মনে কচি, এ কতকটা অনিবার্য। কোরিয়ার
যুদ্ধে চীন প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হয়েছে এবং তার ফলে
তার বর্ণেই শক্তি ও সংগতি ক্ষয় হচ্ছে। যুদ্ধ থেকে
দেখে আমাদের মনে হয় নিজের ঘর তাল করে না
গুহিমে চীনের কোরিয়া যুদ্ধে এমনভাবে জড়িত হওয়া
সংগত হয় নি। হতত চীন সেখানে সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়,
কমিয়ার ঠাপ অনেকখানি এ ব্যাপারে তার উপর ছিল।
তা ছাড়া চীন একথা ভুলতে পারে না যে জাপান চীনের
উপর তার হায়েলা শুরু করেছিল এখনে করমোলা
দিয়ে এবং বিতীর ধাপে কোরিয়া গেছে। এবং আজ
আমেরিকাও অঙ্গুর হচ্ছে চিরংকাইশেকের হাংকং
করমোলা দিয়ে বিতীর ধাপে কোরিয়ার ভিতর দিয়ে।
অপর দিকে আমেরিকা ও সংযুক্ত জাতি-সংঘ কমিউনিটি
চীনকে এখনও স্বীকার করে নি। এমন একটা অবস্থার
অবস্থা বেশীদিন চলতে পারে না। এর কমিউনিটি
চীনকে স্বীকার করতে হয় নতুন চীন হতে কমিউনিটি
শাসন হঠাতে হয়। এরপরটা যখন হয় নি বিতীরটা
হওয়া স্বাভাবিক। অপর দিকে আমেরিকা দেখতে
কমিউনিটি কথিমা ধাপে ধাপে জারীয় (Czarist)
কমিয়ার অনুকরণে ধাপে ধাপে প্রশান্ত মহাসাগরের
উপর প্রভাব বিস্তার করতে, বর্তমানে কমিয়ার সেনাদের
নীতি অস্বীকার করে হাংকং বিস্তারে ও প্রভাব বিস্তারে
উৎসাহী। প্রশান্ত মহাসাগর দক্ষিণ দিক দিয়ে বহুই
প্রশান্ত হটক উত্তর দিকে একটি লক উপসাগরে পরিণত
হয়েছে, সেই উপসাগরের দুই তুলে প্রতিধ্বনি ও প্রতি-
বন্ধী আমেরিকা ও কমিয়ার নিবিবাদে বাস করতে

পারে না। কাজেই আইসেনহাওয়ারের এই নতুন
প্রত্যাবে যে সংঘের হুচনা করতে তা কতকটা অনিবার্য।
যদিও তার ফল সমস্ত দুনিয়ার পক্ষে বিধমর হতে
পারে।

গান্ধীবাদের আন্তর্জাতিক আলোচনা:—

দিল্লী সহরে কিছুদিন পূর্বে গান্ধীবাদের এক আন্ত-
র্জাতিক আলোচনা হবে গিরেছে। বিভিন্ন দেশের ১৫।
১৬ জন ব্যক্তিনায্য ব্যক্তি বিল্লীতে এই আলোচনা
উপলক্ষে সমবেত হয়েছিলেন। বঁরা এসেছিলেন
ঔদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বৃটেনের লর্ড বয়েড
অর (Boyd-Orr) আমেরিকার ডাঃ বুল (Dr.
Ralph Bunche) ইটালীর অধ্যাপক ডি টুচ্চি (Prof
Tucci) জাপানের Tsuoremi, পারস্তের Mar-
taine Dastari আরবানীর Rev. Martin
Nimoller ইত্যাদি। এর মধ্যে লর্ড বয়েড অর
ও ডাঃ বুল শান্তি প্রচারণার জন্য নোবেল পুরস্কার
পেয়েছেন। বয়েড অর ব্যক্তিনায্য ব্যক্তি, এবং পুণি-
বীর স্বাভ-সম্রাট স্বাভেই ইনি একজন বিশেষজ্ঞ। ডাঃ বুল
বহুতর শ্রমকার কিন্তু আমেরিকার নিয়োগে বংশে এঁর
জন্য। প্যাডোষ্টাইন বিবাদে ইনি সংযুক্ত জাতি-সংঘের
প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করেছেন, এবং এখনো সংযুক্ত
জাতি-সংঘের অধি-কমিটার (Trusteeship) সভাপতি।
অধ্যাপক টুচ্চি বিশ্ববিখ্যাত ব্যক্তি। সংস্কৃত সাহিত্যে
ও ভারতীয় সাংস্কৃতিক বিষয়ে ইনি বিশেষজ্ঞ। নিমোল্লের
একজন জার্মান পাণ্ডী। হিটলারী শাসনের বিরুদ্ধে ইনি
যুদ্ধ বুলে থাকতে পারেন নি। তাই হিটলারের হাতে
এঁর বর্ণেই শাসনা হয়েছিল।

এইসব ব্যক্তিনায্য ব্যক্তিরা বিভিন্ন দেশ থেকে
এখানে এসে গান্ধীবাদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। এটা
অত্যন্ত আনন্দের বিষয়। গান্ধী ও তার মত আজ কেবল
ভারতের সম্প্রতি নয়—আজ সমস্ত বিশ্ব এর উত্তরাধি-
কারী। এই আন্তর্জাতিক আলোচনার গান্ধীবাদের
আন্তর্জাতিক প্রয়োগ সম্বন্ধকে স্বীকার করা হয়েছে।

গাড়ী যে কেবল একজন ধর্মনিষ্ঠ চরিত্রবান ব্যক্তি নহে তাঁর অহিংসা, তাঁর চরম ও ধর্ম, তাঁর জীবনযাত্রা এট সবই যে একটা সামাজিক ও আর্থিক প্রদর্শনের নির্দেশ করে তা এঁরা সবাই স্বীকার করেছেন। আশঙ্ক্য এই হিংসা দ্বিত্ব দুনিয়াতে গাড়ীর অহিংসা যে শাস্তির একমাত্র পন্থা—তা বিশেষ করে এই আলোচনার বস্য হয়েছে। তাঁর বনিয়াদী শিক্ষা, তাঁর বিকেন্দ্রিক অর্থনীতি (Decentralised Economy) এবং তাঁর অহিংসা ও নৈমিত্তিক অর্থ বিবোধ পক্ষে বিশেষ প্রেরণা-জনক; সমবেত বিদগ্ধজন সবাই একথা স্বীকার করেছেন।

আজকের দুনিয়াতে এক দিকে চলছে পুঁজিপতিদের

আধিপত্য, অপর দিকে হ্রাস হয়েছে কমিউনিষ্টদের একাধিপত্য। জন-সাধারণের মুখ-স্বাচ্ছন্দ্য—বা তাদের আচরণে, বাহ্যে ও মনে স্বাধীনতা কেউ মানতে না। এই দুই চরম পন্থার মাঝখানে জন-সাধারণের স্বার্থরক্ষা করতে পারে একমাত্র গাড়ীবাদ। পুঁজিপতির আধিপত্য ও কমিউনিষ্টদের একাধিপত্য আজ পরস্পরকে হুজুৎ আহ্বান করছে এবং তার ফলে সমস্ত বিশেষ শাস্তি আজ বিলম্ব। বিপন্ন বিশ্ব শান্তিকে রক্ষা করতে পারে গাড়ীবাদ। তাই তার এই আন্তর্জাতিক আলোচনার আশ্রয় আনন্স প্রকাশ করি। আশা করি, এই আলোচনার বক্তব্য কথাগুলি ভারত সরকার পুস্তকাকারে প্রকাশ করবে।



‘মন্দিরা’র নিয়মাবলী

মন্দিরার বৎসর বৈশাখ হ’তে আরম্ভ।

২। প্রত্যেক সংখ্যায় দ্বি-বাচনী আনা।
দ্বি-বাচনী সভাক সাড়ে তিন টাকা; দ্বি-বাচনী তিন
টাকা চার আনা। বৎসরে দুইবার গ্রাহক হওয়া
যায়, বৈশাখে বা কাটিকে। অল্প কোন সময়ে
গ্রাহক হলে বৈশাখ বা কাটিক থেকে বৎসর বৃদ্ধ
হবে। গ্রিকানা পরিবর্তন হলে সময়ে আনাবেন।
পত্র লেখবার সময় গ্রাহক নবর দেবেন। মন্দিরা
প্রত্যেক বৎসর শেষ সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। সময়
মত কাগজ না পেলে ডাকঘরের রিপোর্ট সহ
গ্রাহক নবর উঠেব করে আনাবেন আনাবেন।

লেখকদের প্রতি—

যথাসম্ভব নতুন খানান ব্যবহার করবেন।
নকল রেখে রচনা পাঠাবেন। ডাকটিকিট না
দেওয়া থাকলে অমনোনীত রচনা নষ্ট করা হয়।
কবিতা কেরৎ পাঠান হয় না।

প্রকাশিত প্রবন্ধাবির মতামতের অন্তঃসম্পাদক
দায়ী নহেন। নাম ও গ্রিকানা না দেওয়া থাকলে
কোন প্রবন্ধাবি প্রকাশ করা হয় না।

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি—
বিজ্ঞাপনের নতুন হার: মাসিক:

সাধারণ এক পৃষ্ঠা—৫০৮

অর্ধ পৃষ্ঠা—২৮৮

মাসিক পৃষ্ঠা—১৬৮

পৃষ্ঠা—১০৮

কতর ও বিশেষ পৃষ্ঠার হার
পত্রচারী জাতীয়।

আনাবেন বৎসর দেওয়া সত্ত্বেও কোন বিজ্ঞাপনের
রকম নষ্ট হ’লে আনবার তদন্ত দায়ী নই। কাজ শেষ
হবার পর বৎসর সময় রকম দেবেন।

প্রবন্ধাবি, চিঠিপত্র, টাকা ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদি
নিম্ন গ্রিকানার পাঠাবেন।

মানদেয়ার—‘মন্দিরা’

পত্র সাহসুলার রোড, কলিকাতা

ফোন :—বি. বি. ২৬৬০

মন্দিরা, এম, এ, প্রণীত নবম্মগের নাট্যসাহিত্য

কৃষ্ণা	২৮	মতী
রাত্রির তপস্যা (নূতন নাটক)	২৮	খনা
মীরকাশিম	২৮	আশোক
চাঁদসদাগর	১৮	মহায়া
কান্নাগার	২৮	শ্রীবৎস
একাত্তিক	১৮	সেবাসুর
সাবিত্রী	১৮	মুক্তির ডাক
বিদ্যাংগণ	১৮	কাজল রেখা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩/১১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট

কলিকাতা—৬

শ্রী টাইপ ফাউণ্ডরী

আধুনিকতম ডিজাইনের হেডিং ও বডি টাইপ

এবং

বড়ার প্রভৃতি স্টক হইতে সর্বদা পাওয়া যায়।

সহাধিকারী

জে, সি, হুই অ্যাণ্ড কোং

৮ বি, লালবাজার ষ্টাট

বিকানীর বিল্ডিংস্

ফোন : ব্যাংক—৩৬১৩

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

হুলফেরও অধিক টাকার দাবী মিটানো হইয়াছে

ভারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এজেন্সী ও সংগঠন অফিস আছে

মাস্ত্রাজ অফিস—

৪০বি, লেকেন্ড লাইন বিচ্,

সুজ্ঞাপ্রদেশ অফিস—

১৭৪, সুপিগজ এলাহাবাদ

আসাম অফিস—

নওগাঁ

ছোটনাগপুর অফিস—

যেন রোড, রাঁচি ১২

চীফ এজেন্ট :—ত্রিবাঙ্গুর
মিঃ এন, ডি, বর্জ

চীফ এজেন্ট :—মাল্যবার
এন, এ, মহম্মদ

চীফ এজেন্ট :—পূর্বপাঞ্জাব
কুমার এণ্ড কোং, দিল্লী

—স্যান্ডি ফোর্ড—

পঞ্চদশ অর্ধ

ফাল্গুন—১৩৫২

একাদশ সংখ্যা

মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া

অধ্যাপক বিজয়কুমার গুহ

বিশ্বের নর্যমূলে একটি স্তর বাস্তবে 'মনে রেখো'— তাই কত আরোহণ অতীতকে মনের মধ্যে বেধে রাখবার—সফর করবার। কিন্তু তবু হারিয়ে যায় অতীত অভিজ্ঞতার চিহ্ন—মাথায় ভুলে যায়। মনে রাখা এও যেমন সত্য, ভুলে যাওয়া এও তেমন সত্য। তাই এই মনে রাখা ও ভুলে যাওয়া আমাদের আলাদা মনের বিষয়।

সাধা কথায় আমাদের সমস্তাগুলি বলা যাক। কোন একটা বিষয় বার বার পড়ে বা করে আমরা সেটা নিখি। অভ্যাস বিষয় আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি। মনের মধ্যে লক্ষ্য বা সংরক্ষণ (Retention) ঘটে বলেই আমরা পুনরাবৃত্তি করতে পারি, আবার অভ্যাস ছেড়ে দিলেই ক্রমে ক্রমে আমরা অনেক সময়ই ভুলে যাই বা পূর্ব দক্ষতা হারিয়ে ফেলি। এখন প্রশ্ন হচ্ছে (১)—অভ্যাসের ফলে আমাদের যে দক্ষতা আমরা (কৃতি-শক্তিতে বা কার্যে) সেটি মনের মধ্যে সংরক্ষিত হয় কি কি কারণে? (২) অভ্যাস ছেড়ে দিলে কত ক্রম এবং কিভাবে ক্রমে ক্রমে সে কৃতি বা দক্ষতা লোপ পায়? (৩) অভ্যাস ছেড়ে দেওয়ার ফলে কৃতির যে মালিক বা বিলুপ্তি ঘটে বা দক্ষতার যে হ্রাস বা বিলুপ্তি

ঘটে—পুনরাবৃত্তির দ্বারা পূর্বের সে শক্তি ফিরে গেতে কতটা সময় লাগে? (৪) বহুদিন অভ্যাসের ফলে অর্জিত কৃতি বা কার্যদক্ষতা কি একেবারেই মুছে মুছে যায় না কিছু চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে?

আমরা এখানে বের নিচ্ছি স্বরূপ-শক্তি বা কৃতি-শক্তি একটা অভ্যাস—ঘেটা অর্জিত হয় পুনঃ পুনঃ একটা বিষয়ের অধ্যয়নের দ্বারা বা জিয়ার দ্বারা। Sandi-ford এর ভাষায় 'it simply means that we have acquired certain language habits or muscular habits.'

(ক) এক একটা জিনিস আমাদের অনেকদিন মনে থাকে। তার কারণ এক একটা জিনিস আমাদের মনে গভীর রেখাপাত করে যে যে কারণে মন কোন বিষয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, সে সে কারণেই সেটা মনের মধ্যে দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়। কোন ঘটনা বার বার ঘটলে (Repetition) সেটা মনে গভীর দাগ কাটে এবং মনেও থাকে অনেকদিন। যে ঘটনা পুনঃ পুনঃ দিন দিন বা অল্পকাল আগে ঘটেছে (recency) তার কৃতিও উজ্জ্বল। যে ঘটনার আনন্দ বা কৃষ্টি পাওয়া যায় সেটা মনেও থাকে অনেকদিন।

আজ্ঞা এই মনে থাকে বা Retention বাপাঃ।
কি? যে পড়াটা শেখা হোল বা যে কাজটা শেখা
হোল “সেটা আমার মনে আছে” এ কথাটা বহন বলি
তখন কি এই বুঝি যে মনে মনে সে পড়াটা বা কাজটা
ক্রমাগতই পুনরাবৃত্তি হচ্ছে? তা নিশ্চয়ই নয়।

Woodworth বলেন “Retaining is not
certainly a continued repetition of the
learned performance.” যে পড়াটা বা কাজটা “মনে
আছে” সেটা বুঝের মধ্যে “মনে আছে”। কাজেই
এটা হচ্ছে বোঝের বিশেষ করে স্নায়ুতন্ত্রের (Nervous
system) মধ্যে একটা পরিবর্তন—যেটা ঘটেছে পড়াটা
বা কাজটা শেখবার ফলে। Activity has left
behind it some modified structure of the orga-
nism, mostly modified brain structure, এটাকে
ইংরাজীতে বলা হয় memory trace, এটা সত্যক
করা যায় না কিন্তু সত্যক অভিজ্ঞতাই এরকম একটা
মাগ বেধে যায় এটা আমরা ধরে নিতে পারি—তা না
হলে অভিজ্ঞতাটা অতীত হয়ে গেলে আবার আমরা
সেটাকে অর্জন করতে পারতুম না।

সে হাপটা কি চিরকাল থাকে? কবি বলেন—
“হারার না কিছু”। বস্তু কথা, যত গান সবই আছে,
সবই থাকে। “ভুলে থাকে সে তো নয় ভোলি বিশ্বস্তির
মর্মে বসি তজ্জে মোর দিয়েছ যে ঘোলা”। এ কথাটা
একবারে কবিতাই নয়। বালাকালের বিশ্বস্ত ঘটনা
তথাৎ যেন মনের মধ্যে ঝিলিক মেরে ওঠে—

“মাকে আমার পড়ে না মনে

তুধু কখন খেলতে গিরে হঠাৎ অকারণে
একট: কী জ্বর গুলজগিরে কানে আমার বাজে,
ব্যয়ের কথা মিলায় যেন আমার খেলার বাজে।
না ব্রহ্ম গান গাইতে আমার কোলনাঃ টেলে টেলে
না গিরেছে, যেতে যেতে গানটি গেছে ফেলে”
এমন অভিজ্ঞতা সকলের জীবনেই ঘটে। অরের
বিচারের মধ্যে কখনো কখনো মানুষ তাদের অতীত

জীবনের এমন ঘটনার কথা বলে যেটা সত্যি ঘটছিল
কিন্তু মুহূর্ত অবস্থার তাকে সে কথা ভিজেন করলে সে
কিছুতেই তা অর্জন করতে পারে না। কিন্তু এসব
ঘটনার থেকে কিছুই মন থেকে চারার না এরকম একটা
সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌছানো বিপজ্জনক। আমাদের
প্রাথমিক জীবনের পক্ষে এ সিদ্ধান্তই বহু সম্ভব যে
অনেক অভিজ্ঞতা কেন অবিচল অভিজ্ঞতাই আমরা
সম্পূর্ণ ভুলে বাই। মনের মধ্যে অতীতের সব অভিজ্ঞতা
সব কপাই যদি ডিক তরে থাকত তা হলে সে দুঃসহ
চাপে আমরা যে পাপল হয়ে যেতুম।

(খ) ভুলি কেন?

সময় বস্তু গন্ত হয়, গন্ত আমরা ভুলে বাই।
সময়ের গতি এর ভিত্তে দাঁড়ী নয়—সময়ের মধ্যে বা ঘটে
তাই একত্রে দাঁড়ী—“It is not time, but what
occur in time that produces the effect.”

(১) একটা মত হচ্ছে অব্যবহারের দ্বারা Memory
trace বা স্মৃতির ধাপ মলিন হয়ে যায়। শরীরের যে
কোন যন্ত্র বা তন্ত্র বা muscle সবচেয়ে এটা সত্য যে
ব্যবহার না করলে সে রক্তস্রোত থেকে পুষ্টি আহরণ
করতে পারে না এবং দুর্বল হয়ে পড়ে। হাত ভেঙ্গে
গেলে হাত জোড়া লাগবার ক্ষেত্রে হাতটা plaster করে
দিলে যে muscle তুলি নড়াচড়া করতে পারলো না
সেগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। কাজেই কোন পড়া বা কাজ
যেটা শেখা গেছে সেটার আর ব্যবহার না হলে স্নায়ুতন্ত্রের
তন্ত্র বা শিকার দ্বারা দিয়ে যে পথ (Nerve Path) তৈরী
হয়েছিল সেটার ধাপ অস্পষ্ট হয়ে যায়।

(২) আর একটা মত হচ্ছে interference বা
বাধা দ্বারা memory traces অস্পষ্ট হয়। একটা
কাজ বা পাঠ শেখার সময় যে nerve path তৈরী হোল
সেটা স্নায়ুতন্ত্রের অন্তঃসমস্ত তন্ত্র ও শিকার সঙ্গে স্তম্ভপ্রায়
ভাবে অভিত। কাজেই অন্য কোন কাজ বা পাঠ
শেখার সময় সে nerve path অন্য nerve track
দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে। স্রেষ্ঠ এক শেখার ক্ষেত্রে

অল্প লেখা লিখে গেলে আগের লেখাটা অস্পষ্ট হবেই।
কাজেই একটা স্মৃতি পরবর্তী অল্প অভিজ্ঞতা দ্বারা বাধা-
প্রাপ্ত হয়ে থাকে—এটা বোকা লজ্জা না।

এ ক্ষেত্রে অল্পকালে কতগুলো তথ্য দেওয়া যায়।
দিনের বেলা জামরা বাবে বাবেই কাজের খবর করি।
কিছু রাত্রে যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখন হয় বিশ্রাম।
দিনের বেলা এক অভিজ্ঞতা আর এক অভিজ্ঞতার
স্মৃতিকে কেবলই বাধা দেয়। রাতের বেলায় ঘুমের
সহোতা ঘটে না। তাই বেগতে পাই দিনের বেলায়
বিশ্মতির দ্বারা (rute) রাত্রে ঘুমের সময়ের তুলনার
অনেক দ্রুততর। একটা পরীক্ষার কল নিচে দেওয়া
গেল। কতগুলি অর্থহীন ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি (Nonsense
Syllables) একজন দিনের বেলায় মুখস্থ করে অল্প
নানা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। দিনের শেষে দেখা গেল
অনেকটাই ভুলে গেছেন। আবার অল্পকাল অর্থহীন
ব্যঞ্জনবর্ণের সমষ্টি সেই ব্যক্তি মুখস্থ করার অল্পকাল পরেই
ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম থেকে উঠে পরীক্ষা করে দেখা
গেল ভুলে যাওয়ার পরিমাণ অনেকটা কম। একটা
কাল শেষ করেই আর একটা কাল শুরু করলে
memory trace নষ্ট হয় বেশী। কিছুকাল বিশ্রাম করে
নিলে সংরক্ষণ (retention) দীর্ঘতর হয়। পাঠ্য-
দ্রব্যের স্মৃতির অবস্থান ১৫ সেকেন্ডের ভেতর লক্ষ্য করে
একজন বসে রাখতে চেষ্টা করলেন। টিক তার পরের
মিনিটেই তাকে দেওয়া গেল কতগুলো প্রশ্নি যোগ
করতে। যোগ শেষ হয়ে যাওয়া মাই তাকে দ্রব্যের
স্মৃতিগুলি আগের ব্যাপার টিক টিক বলতে বলা হোল।
লক্ষ্যকণা পক্ষান্তাই তার ভুল হোল। কিছু তাকে ১৫
সেকেন্ড আবার স্মৃতিগুলি লক্ষ্য করতে দেওয়া হোল।
তারপর এক মিনিট তাকে বিশ্রাম করতে দেওয়া হোল।
তারপর স্মৃতিগুলি আরগাতে বসাতে বসাতে তার ভুল
আগের ব্যাপার তুলনার অবধি হোল। এ ধরনের
বাক্যকে Woodworth বলেছেন retrospective in-
hibition. এদর ক্ষেত্রে পরীক্ষার কলে দেখা গেছে

সংরক্ষণের ক্ষতি শতকরা ৫০ ভাগ করে যায়—“Retrospective inhibition lowered the retention by over 50 per cent.”

কখনও কখনও দেখা যায় দার্শনিক (বিশেষতঃ
মস্তিষ্কের) বা মানসিক আকস্মিক গুরুতর আঘাত পেলে
আঘাতের সময়ের এবং তার পূর্বেরও কিছুকাল সময়ের
সব ঘটনা ঘটছে তার স্মৃতি লোপ পায়—একে Wood-
worth বলেছেন Retrospective shock effect।
এটাকে inference theoryর সমর্থন পাওয়া যায়।

(৩) Freud পন্থীরা এ তোলা ব্যাপারটাকে
ব্যাখ্যা করেন অস্ত্রভাবে। তাঁরা বলেন আত্মার অহং
বোধ বড় প্রবল—যখন আত্মা সচেতন নই তখনও এই
অহং অবচেতন মনে অস্ত্রভাবে ভেঙ্গে থাকে। বা
আত্মার এই অহংকে পীড়া দেয়, লজ্জা দেয় তার
উপর শোথ তোলে সে তাকে বিশ্বস্তির রাখে। নির্বাসন
দিয়ে। এটাকে তাঁরা বলেন repression—অবহরন।
কাজেই দেখা যায় আত্মা এমন ঘটনাগুলো ভুলে যাই
যেগুলি আত্মার নৈক অস্ববিধজনক, অস্বস্তিকর,
বা আত্মার অহংকারকে আঘাত করে। তাই দেখা-
গুলো ভুলে যাই কিছু পরামর্শা অহং হাপি। Sandi-
ford বলেছেন, “Repression is a biological func-
tion, a defence mechanism guarding the mind
against the intrusion of experiences which
would cause it pain or discomfort. Consequently
the mind purchases peace by refusing to
remember disquieting experiences. We
remember our cheques but forget our
bills.”

(৪) তোলায় কার্য সম্পর্কে Behaviourist মন-
তাত্ত্বিক Watson এর আর একটা মন্ত রয়েছে। তিনি
বলতে চান যে সেই ঘটনাই শুধু আত্মা মনে রাখতে
পারি যেগুলোর সূত্রে আত্মা কথার সম্পর্ক (verbal
association) স্থাপন করতে পেরেছি। একটা বাগানে

বেড়াতে গেলার—হেলবার লক্ষণে আটটা ওপুঁরি গাছ রয়েছে—পক্ষিযে তিনটে আমগাছ ও কাঁটাল গাছ, পূর্বে রয়েছে সন্ধ্যামালতীর বাড। বাতশানে বেগি রক্তনীগড়া, গোলাপ, হেনা, অথবা আর বহুব্রী ফুলের সোদান ফুলের bed রয়েছে ১০টা। মনে মনে এটা লক্ষ্য করলুম—Watson বলছেন নিজের কানে কানেই নীরবে কথা বলা হোল—“thinking is subvocal speech”—অথবা এতলো নিয়ে আর কাক সঙ্গে আলোচনা করলুম—তা হলে এবার চোখের ক্ষুতির সংসদ বাচনিক ক্ষুতির জোর বাধা হোল। এটা মনে রইল। এটা ভুলতে দেহী হবে। তিনি বলেন শিশুকালের প্রথম চার বছরের কথা আশায়েব মনে থাকে না তার কারণ তখনও বাচনিক সংযোগ ঘটবার সুযোগ হয় না—Our inability to remember the experiences of the first three or four years of life is due to our lack of language at the time,

এ ঘটনার কোনটাকেই “একমেবাবিভীত” মনে করলে ভুল হবে। এতোকট্টা বতই কতগুলো ঘটনার ব্যাখ্যা করতে পারে। এ ঘটগুলো আশাততঃ বিস্ময় মনে হলেও পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত।

The Rate of forgetting conclusions :-

বে পড়া বা কাজ শেখা হয়েছে অন্যভাবে তা আবার ভুলে যাই। কিন্তু শব্দের ভোলায় হার লমান নয়। কেউ ভাড়াভাঙি ভোলে, কেউ ভোলে দেহীতে। অনেকগুলো Muscle একত্র বে লব কাজে লাগে যেমন, সঁতারকাটা, বাইলাইকেল চালানো, টাইপ করতে শেখা—এগুলো একবার শিখলে আরই একবারে ভুলে যাওয়া যায়না। কিন্তু পড়ানোয়ার ব্যাপার যাতে ভাষার ব্যবহার বরকার লেখনি কিন্তু গ্রীক অভ্যাস মনে পাকে না। বে কাজ বা পড়া আবার পূর্ব ব্যাবহার করে পড়ে শিখেছি (our learned) লেখনি আবার পূর্ব শীগগির ভুলি না। যেখানে মিল আছে, হুব আছে বা বুদ্ধিসম্বন্ধ লম্বন্ধ (logical relation) আছে বা

অর্থপূর্ণতা আবার। ভুলি অনেক বীরে বীরে আবার অন্যভাবে ব্যাখ্যা কোন জিনিষ ভুলে গেলে তা পুনরাবৃত্ত করতে আগের মত মত মনে লাগেনা। ভোলায় হারটা গোড়াতে পূর্ব জ্ঞত—পরে দেটা বহর হয়ে আসে, যাটা জ্ঞত আরম্ভ করতে পারে জায়া মনেও রাখতে পারে অনেকদিন। Lyon কতগুলো পরীক্ষার ফলে সিদ্ধান্ত কছেন We are entitled to say that with material that is logical in character those who learn quickly remember the longest.” ব্যাখ্যা বা বুদ্ধিবাদ তাদের অরমলজি ও বেনী। James এর মতে অরমলজি অসঙ্গত এবং একে পূর্ব বেনী পরিবর্তন করা চলে না—“no amount of culture would seem capable of modifying a man's general retentiveness.” অথবা সকলে তাঁর মত সমর্থন করেন না।

এ সম্বন্ধে কিছু পরীক্ষার উল্লেখ করা যাচ্ছে। Rejall লাঞ্চে তিন বৎসর অন্যভাবে করে Type writing কতটা ভুলেছেন (বা কতটা মনে আছে) তা নিয়ে পরীক্ষা করলেন। Type writing শেখার শেষ দুই সপ্তাহে তিনি মিনিটে ২৫টি শব্দ type করতে পারতেন এবং তাঁর ভুলের পরিমাণ ছিল শতকরা ৪। লাঞ্চে তিন বছর পর আবার পরীক্ষা করে দেখা পাঁচদিনে কটি শব্দ তিনি type করতে পেরেছিলেন এবং কতটা ভুল করেছিল। তা বেগল হোল। প্রথমদিন প্রতি মিনিটে শব্দ type করতেন ১৮/৭৫, ভুলের পরিমাণ শতকরা ৮। দ্বিতীয় দিন ১৮/২৩ ভুল ৭১। তৃতীয় দিন ২১, ভুলের পরিমাণ ৬১। চতুর্থ দিন ২২/১, ভুল ৪, পঞ্চম দিন ২২/৫, ভুল ৮/১ পাঁচ বকী অভ্যাস করে তিনি পূর্বে ৩০ বকী অভ্যাসের ফলে বে দৃকতা অভ্যাস করেছিলেন তা আর ফিরে পেলেন। Sandiford ১৮৯৯ সালে Skating শিখেছিলেন। মাঝে ১৮ বছর এ অভ্যাস ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরে আবার Skating শ্রম করে দেখা গেল পূর্বের দক্ষতা পূর্ব কই হাল পেয়েছে। কিন্তু ১৯০৩

দশ থেকে ডেনমার্কের ছাত্রের দ্বারা তৈরি Danish ভাষা শিখিয়ে দেওয়া। কিন্তু ১৯১০ সালে যখন সেখানে দশটাই ঘাই ভুলে গেলেন। দু'দিন বিশ্রিষ্ট বই ছেঁটা করেও তিনি Danish ভাষার ১ থেকে ১০ পর্যন্ত কবিতা পড়লেন না। Ebbinghans, Rados প্রভৃতি জালায় হারিয়ে অনেক পরীক্ষা করেছেন—Non-sense Syllables দিয়ে এবং কবিতা দিয়ে।

পূর্বেই বলা হয়েছে Over learned বিষয় আদর কম হুঁসি। বই বেনী Over learned হর ভুলে যাওয়া হয় তত দ্রুত। Grates নীচের ছবি দিয়ে কলটা প্রকাশ করেছেন।

Curves, showing the probable influence of disuse in the case of functions over learned in various degrees. 'A' shows the loss or forge-

ting when the function is barely learned. The initial loss is rapid and great, followed by a much slower rate of deterioration. B, C, D, show probable losses in functions which are overlearned slightly, considerably and greatly respectively.

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যখন আয়ত্তি করে কোন পড়া তৈরী করলে তা মনে থাকে মনে মনে সে পড়া তৈরী করার চেয়ে। তা হাওয়া একটা পড়া তৈরী করে গেলে সেটাকে দু'দিন কেলে না রেখে, কয়েক সপ্তাহ পরে আবার কালিরে নিলে সেটা মনে থাকে বেনী। Witasek ও Grates nonsense-Syllable এর ১৬টি তালিকা এবং ছোট ছোট কবিতা ৫টি নিয়ে এবং নীচের দু'খণ্ড করে যে ফল পেয়েছেন তা নীচে যেদান হোল

MATERIAL STUDIED Distribution of learning time	16 nonsense syllables		5 Short biographies totalling about 170 words	
	Per cent remembered Immediately	After 4 hours	Per cent remembered Immediately	After 4 hours
All time devoted to reading	35	15	35	18
$\frac{1}{2}$ of time devoted to recitation	50	26	37	19
$\frac{2}{3}$ of time devoted to recitation	54	28		25
$\frac{3}{4}$ of time devoted to recitation	57	37	42	28
$\frac{4}{5}$ of time devoted to recitation	74	48	42	26

পূর্বেই বলা হয়েছে যে অন্যান্য আদর লেখা পড়া বা কাল ভুলে যায়। কিন্তু সেটা যে একবারে লোপ পেয়ে যায় না তা আদর দ্রুত পড়ি এ ঘিরে যে আবার অধ্যয়ন করলে পূর্বের দ্রুততা কির পড়ে অনেক কম সময় লাগে। একটা কবিতার Stanza দু'খণ্ড করতে ১০ মিনিট সময় লাগলো। সে কবিতাটা অনেক বছর পর আবার স্মরণ করে দু'খণ্ড করতে সময় লাগলো ৮ মিনিট। কাজেই দেখা যাচ্ছে আবার

শেখবার পরিপ্রস্থ বাচলো ২০% অর্থাৎ ২০% পূর্বের অর্জিত বিষয়কর মনেও মনে সংরক্ষিত হোল। এখন শেখবার দ্রুত কম পরে Relearningটা হবে—দ্রুত লাগবে তত কম। Ebbinghans প্রভৃতির curves of forgetting থেকেই কথটা দ্রুত পড়া যাবে।

Application of the results to the field of education—How to avoid forgetting.

পৰ্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা যে কথগুলো জানা গেল

—শিক্ষার ক্ষেত্রে তাদের মূল্য রয়েছে। যাদের পড়া-
তলা করে পরীক্ষা হিতে হয় তাদের পক্ষে কি করে মনে
রাখা যেতে পারে এটা একটা জীবনমরণের প্রশ্ন। এ
ব্যাপারে মনস্তাত্ত্বিক কি সাহায্য করতে পারেন ?
এখানে মনস্তাত্ত্বিক যে উত্তর দেবেন তাতে অনেক
কথাই পুনরাবৃত্তি ঘটবে। তবুও মোট কথাগুলো এক
জারগার বলে দেওয়া যাক নতুন।

কোন পড়া তৈরী করার সময় সবচেয়ে আবৃত্তি করলে
সেটা মনে থাকে ভাল।

যা মনে সংযোগে বাধা সৃষ্টি করে তা শিক্ষার পথে
বিঘ্ন—বরং বাধার পথে। তাই যত্ন সহ ও শক্তি
অধিষ্টিত মন অংশগুলির পক্ষে অগ্রসর।

পড়াটা তৈরী করার সময় বা কাজটা শেষ করার সময়—
টিক ঘড়টুকু শিখলে তখন তখন মনে থাকে (just learnt)
সেটুকুই শিখে সময় বায়ানো যুগ্মতা। এ রকম (just
learnt material) বেশীকণ মনে থাকে না। বরং
এখন দেখার সময় কিছু বেশী সময় নিয়ে দেখাটা পোক্ত
(consolidate) করে নেওয়া ভাল যে বিষয়গুলি ওরফ-
পূর্ণ লে সম্পর্কে এ উপদেশটি অংশ রাখা বিশেষ দরকার।
over learning এর দ্বারা একটা বিষয় মনের মধ্যে গেঁথে
যায় তাই শিক্ষকদের উচিত নিত্যকাল নিশ্চয়তাজন
তথ্য Overlearn করতে ছাত্রদের বাধ্য না করা।
তাতে মন অবধা ভারাক্রান্ত হয়।

পড়াটা তৈরী করে যা কাজটা শিখে—সামান্য কিছু-
কণচূর্ণ করে বিস্তার করলে ভাল হয়। তাতে শিখিত
বিষয়টা মনের মধ্যে চেপে বসে (consolidate.)

পড়াটা বা কাজটা শিখে অনেককণ ফেলে রাখলে
চূর্ণ দাবার সন্ধাননা বেশী। এখন দিকেই তোলাটা
বড় কষ্ট—তাই কয়েক ঘণ্টা পরেই আবার পড়াটার
চোখ বুদিয়ে নেওয়া দরকার। তারপর আবার দীর্ঘতর
সময় পরে পরে পড়াটা দেখে নিলে খুব ভাল শেখা
হবে যায়।

পড়াটা তৈরী করতে যা কাজটা শিখতে মনের মধ্যে

যতটা যুক্তিসঙ্গত লব্ধ (logical relations) স্থাপন
করা যায় ততই ভাল। কাজেই না বুকে মুখস্থ করা
সময়ের অপব্যবহার—তাতে পরিভ্রমও বেশী, কলও
কম। যেখানে শিক্ষার বিষয় যুক্তিসঙ্গত লব্ধহীন জটিল
বা নানবের লব্ধি বাজ দেখানোর স্তম্ভ হয়ে মনগড়া লব্ধ
গড়ে নিতে পরলে তাদের শিখতে সময় কম লাগে—
মনেও থাকে বেশী দিন।

বিষয়টাতে রুচি অথবাতে পারলে—সেটাতে মন
পেলে মন ভাতে বসে—তা ভাল মনে থাকে। বিয়ক্ত
মন বিষয়গেত অগ্রসর।

জীবনে অনেক দুঃখের অভিজ্ঞতা আশ্রয় ভুলে
যেতেই চাই। আশ্রয় প্রিয়জনকে হারাই, তাকে অংশ
করে বুক ভেঁকে যায়। থাকে বিশ্বাস করেছি, সে ভুল
যুগে দুঃখ দেয়। অজ্ঞাত করেছি, লজা পেয়েছি,
অপরাধ হয়েছে—এমন অস্বীকৃতির স্মৃতি আশ্রয় মন
থেকে কেতে কেলেতে চাই। Freud পত্নীর বলধেন
তা পারিও। কিন্তু সেটা অচেতন মনের দ্রুত ব্যাণার
—সেটাকে সচেতন ভাবে কাজে লাগানো যায় না।
তাই সমস্ত হোল—চেটা করে সচেতন ভাবে আশ্রয়
ভুলতে পারি কি না ? উপরের আলোচনা থেকে
কিছুটা উত্তর আশ্রয় পেতে পারি। যেটা ভুলভেদে
সেটা পুনরাবৃত্তি (review) না করলে তার স্মৃতি দুর্বল
হবে। সেই ঘটনার সঙ্গে যে সব লব্ধ যা ঘটনার সংযোগ
খনিষ্ট তাদের থেকে দূরে থাকতে হবে। অতঃনানা
কাজে মনে সংযোগ করতে হবে। তবুও হয়ত বেদনাপূর্ণ
স্মৃতি বারে বারে মনের ছুরিয়ে এসে ছানো দেবে।
অনেক সময় আশ্রয় ঘোর করে ভুলতে চেষ্টা করি—
কখনও কখনও কতকটা সফলও হই তাতে। কিন্তু এর
বিপর্য অজ্ঞে। এটা গেতে লুপ্তাভাষ্য, ক্ষয়কামন, মাথা-
ব্যোরা, ইত্যাদি ব্যাধিই তু্য নয়—কখনও কখনও
দৃষ্টিহানি বা পক্ষাঘাতও ঘটতে দেখা গেছে। তা হাঁড়া,
এতে নানারকম মানসিক বৈকল্য বা বিকৃতি ঘটে
(neurosis complexes) অর্থাৎ ঘোর করে ভোলা

চেষ্টা বিপজ্জনক। ঘটনাটার সব দিক তাৎবে চিন্তা করে তার সবটা ভূৎ ও বেদনার সুযোগ্য হতে পারলে বহু তার চেয়ে সুকল লাভের আশা বেশী—বহিঃ প্রলম অবস্থার মানসিক বেদনার পরিমাণ তাতে খেটে হতে পারে। Woodworth বলছেন, "If involved in

something we should note to remember, the best rule is to face the facts, think them through, do what needs to be done, and reach a satisfactory adjustment before laying the matter aside."

আত্মকান

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পুর্বাঙ্গ]

দিন দুয়েক পরে ছুক লিমই থবরটা নিয়ে এগো। এর আগে উত্তেজিত থবরের টুকরো ওদের কানে এসেছিলো কিন্তু বিশেষ আদল দেয় নি কেউ। কিন্তু এবার ছুক লিম মিটিংয়ের আরগ্য আর সময় পর্যন্ত নিয়ে এগো।

‘প্যাগোডার পিছনের চাতালে আচ্ছ বেলা চারটেই সময়।’

‘আগনি বাবেন না ছুক লিম?’ লুন পে জিজ্ঞাসা করলো।

‘আমার সময় নেই। হাতে এখনও দুটো যোগী, অবশ্য তারা সেবে আসছে, কিন্তু ঠাঁয় ছ’বক্টা পা হুড়ে খ’লে ওই শুকনো বজ্রতা পোনা আমায় খাতে পোষায় না।’

লুন পে, কল বোল আরো কয়েকজন মিলে দ্রিক করলো বিকেলের দিকে বেড়াতে বেড়াতে ব্যাপারটা শুনেই আসবে। রেজুন থেকে উত্তেজিত যোগী এসেছেন বাগী পোনাতে। সারা মৌলমিন শহর খেঁচিয়ে আসবে একেবারে। হুংগিদের বজ্রতা শুনে লোকদের ভিরকালের উৎসাহ।

এবারের আরোজন বেশ জোরালো। সকলি থেকে খোড়ার গাড়ী করে ব্যাঙ্কা বাড়িয়ে কাগজ বিলি ক’রে

গেছে। শহরের গুলিকে বান্ধে কুলি মজুরদের আত্মানার কাছে কাজে খট্টা বাড়িয়ে মিটিংয়ের থবর বলে গেছে। বেলা চারটেই মিটিং, সকাল থেকেই হাটে ব্যাঙ্কার রাস্তার দুপাশের দোকানপাট বন্ধ। যে কোন একটা হুংগু পেলেই হ’লো এ দেশের লোকদের।

প্যাগোডার পিছনের বাঁঠি জুড়ে গিল গিল করছে লোক। এখনও মিটিংয়ের খট্টা খানেক দেরী, কিন্তু এর মধ্যেই অর্ধেকের বেশী আরগ্য করে গেছে। কিছুটা আরগ্য বেশ দিয়ে ঘেরা, বোধ হয় শহরের গণ্য-মান্য লোকদের গুলি আলাপা করা। লুন পে আর কল বোল ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলো। জন মশ বাহো ছোকরা হুংগী সামনের দিকে বসেছে। গুলিদের চেয়েও কুলি মজুরদের সংখ্যাই বেশী। ভারতীয় মজুর আর বর্মী মজুররা পাশাপাশি বসেছে। সকলের মুখে চোখে একটা উত্তেজিত ভাব। রেজুনের বড় হুংগি উত্তেজিত হয়ে বসেছে ‘দেশের ভবিষ্যৎ’ সম্বন্ধে। তার ওপরে শহরের কদিনকার উ বা মর সত্যাপত্তির আসন অলঙ্কৃত করবেন। মৌলমিন শহরে এখন যোগাযোগ লচরার ঘটে না। সালুইনের ওপার মর্ত্ত্যবান শহর থেকেও অনেক লোক এসে জুটেছে।

প্রায় চারটা বাজে। বাইরে একটা টেঁচেয়ের

শব্দ। বোধ হয় উজ্জ্বলভাষী এসে পৌঁছেছেন।
কুঙ্গিরা ধড়িয়ে উঠলো। লুন পে, কমল বোস আর
সংগের তিন জন বাঁশের বেড়ার এশাপে এসে
বসলো।

প্রথমে উজ্জ্বলভাষী, পিছনে পিছনে কুঙ্গির আর
তার পিছনে শব্দের হোমরা 'চোমরা মাতঙ্গর লোক,
তার পিছনে শিল শিল ক'রে লোক ঢুকলো। এরা
সব কুঙ্গিকে দেখবার উৎসাহে বাইরে ভীড় ক'রে
ধড়িয়েছিলো।

দ্বিত্যমে নিম্নভাষী। কুঙ্গি উজ্জ্বলভাষী উঠে
দাঁড়ালেন। নাতিদীর্ঘ বলিষ্ঠ চেহারা। বাতালে গৈরিক
বাস উড়ছে। হাত ছুটো একসংগে ক'রে পালি জোড়
করলেন। উদ্ভট গলার স্বর। খোলা মাঠে ভগাট
গলার আওয়াজ গম গম ক'রে উঠলো।

'আমাদের দেশের ভাই-বোনরা' উজ্জ্বলভাষী
বেড়ার ধারে এগিরে এলেন, 'আমাদের বোনার
দেশের লোকটাকাল উপস্থিত। নিম্নী কুলের পাগড়ীর
মধ্যে জমজট কীট বাসা বেঁধে যেমন তিলে তিলে কুলের
সদৃশ সৌন্দর্য নষ্ট করে, ছুঁলে নিম্নীকে ছিন্নভিন্ন ক'রে
কলে, তেমনি আমাদের দেশের শিরা উপশিবার মধ্যে
বাস। বেঁধে কীটের দল দারা দেশটাকে নষ্ট করে
কলছে। নির্বন হাতে এই সব কীটদের ধ্বংস
কর: আমাদের একান্ত প্রয়োজন এবং সর্ব প্রথম
কর্তব্য।'

লুন পে করল বোসের দিকে তুঁকে পড়লো, 'এক-
বারে সোজামুখি আরম্ভ করেছেন কিন্তু। খাটি কথা।
কমিশনার সাহেবের ঘুঘটা একটু ক্যাকাসে ক'রে গেছে।
বাঁজীরা ভর হাসভুতো ভাই কিনা, ওদের নামে সামন্ত
অপমান জনলেও শিউরে ওঠেন।'

কমল বোস সুখ ফেরালো না। মুচকি হাসলো
ওঁহু।

'এ দেশের কুঁকে বসে কমল পুটবে, জমিজমা ভোগ
করবে, দরকার হ'লে আমাদের মা বোনকে নিয়ে

ছুদিনের জন্য আমোদ আক্লাব করবে, চড়া ছুঁবে আশ-
বের গরীব মজুরদের টাকা ধার দিয়ে তার রক্ত মাংস
ছদ বাবদ নিজেকে ওজন ক'রে নেবে অথচ কোন দিন
এ দেশের ছুঁপ বেননার সংগে নিজেদের জড়াবে না, এ
দেশের মানুষের যে পৃথক সত্তা আছে, দেশাত্মবোধ
আছে তা স্বীকার করবার মত মনোবৃত্তি এদের নেই—
এরা চার তিরদিন আমাদের পদানত ক'রে রাখতে
যাতে পূর্ণব্রাহ্মণ শোষণ করার কোন অসুবিধা কদের
কোনদিন না হয়।'

কমল বোস সামনে বাঁধা বাঁশটা পক্ষ হাতে
ব'রে গভীর মনোযোগ দিয়ে ওনতে লাগলো
প্রত্যেকটি কথা।

'এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যে যেদিকে
চাইবেন, দেখবেন আপনাদের প্রত্যেক ইচ্ছা আরম্ভ
ওরা অধিকার ক'রে বসে আছে। অফিস নিল-
কারখানার উঁচু ভক্তভাউন থেকে কুলি মজুর পর্যন্ত
ও দেশের লোক। আমাদের দেশের ধান কাটবার অস্ত্র
বহুবে বরষে মস্ত্রাঙ্ক অকস থেকে ওদের দেশের চাই
আমদানী করা হয়, আমাদের ইঞ্জিন, স্ট্রিমার এমন কি
শাল্পান পর্যন্ত চালার ও দেশের লোকেরা—এর চেয়ে
লজ্জার কথা যে কি হ'তে পারে তা আমি বারংবার
করতে পারছি না।'

লুন পে আবার কমল বোসের দিকে তুঁকে পড়লো,
'সর্বনাশ, ইংরেজদের সম্বন্ধে নয়, এতো ভারতীয়দের
সম্বন্ধেই বলছে। বক্তৃতা নয়, এতো রীতিমত উদ্ভাসী।
গোলমাল বাঁধাবার চেষ্টা।'

কমল বোস লুন পের দিকে চোখ ফেরালো না,
আজ্ঞে আজ্ঞে বললো, 'লোকটা কিন্তু সেমকহারাম নয়।
বে টাকা হাত পেতে নিচ্ছে তার সর্বাধা ঠিক
রাখছে।'

'অর্পনারা শুধু কমনা কমন', উজ্জ্বলভাষীর স্বর
সপ্তমে, 'আজ যদি এগেঁথে কালারা পল্লণালের মতন
এসে না জুটতো, আমাদের সনাতনের ওপর এই ছুট-

এহের হায়াও না পড়তো, তবে এ বেশ সস্তা সোনার বেশ হ'তো। অমিমা চাকরি-বাকরি সব কিছু আপনাদের হাতেই থাকতো। এ দেশের বৈষম্য সাগর পায় হ'রে কালাদের দেশে গিরে পৌছাতো না। এ দেশের কলকারখানার হাজার হাজার কালো মিস্ত্রি বছর কাছ করা বানাই আমাদের দেশের হাজার হাজার হেলেকে নিরস্ত রাখা। আপনারা লম্বাই একযোগে ঠাড়িয়ে উঠে কালাদের জিজ্ঞাসা করুন স্পষ্ট ভাষায়, আপনাদের সুখের গ্রাস কেড়ে নেবার কি অধিকার ভদের আছে? নিজের বেশ ছেড়ে পরের বেশের দিকে তুলো বাড়াবার শোভা জমালো কোথা থেকে?'

পিছনের দিকে গোলমাল। অনেকগুলো লোকের পায়ের বল বল পড়। পুন পে পিছন দিগে দেখলো ভারতীয়রা বলে বলে উঠে বাচ্ছে লজা ছেড়ে। মেয়েরা কড়িকাচার হাত ধরে সাবধানে বাঁশের বেড়া পরি হ'রে বাইরে বাচ্ছে। বলা যায় না। গোলমাল হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়। এরকম গরম গরম কথাই লোককে উত্তেজিত করলে, হুলি মজুদের দল তো কেশে উঠতেই পারে।

দু একজন বর্মী ভল্যুটিয়ার ঠাড়িয়ে উঠে হাত তুলে গোলমাল থামাবার চেষ্টা করলো। কতক লোক কিরে এসে নিজের আরণ্যক বসলো, কিন্তু বেশী ভাগ ভারতীয়রাই বাহিরে চলে গেলো।

ফুগি উ জেরাওয়াড়ী একটুখানির অস্ত্র ব্যবসেন ভারপর গোলমালটা ক্বতে আবার প্রক্ক করলেন, 'আজবে, ব্যবহারে, সামাজিক বিধি ব্যবহার, শিক্ষা নীকার সব কিছুতেই কালাদের সঙ্গে আমাদের কিছুমাত্র মিল নেই। ওরা আর আমরা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। ওদের বেশ আর আমাদের বেশকে একই রাকসৈনিক গোষ্ঠিকুল করার একটা। হীন বড়বড় চলছে, কালাদের নেতারা বড় বড় হুলি আঙড়ে বোকাতে চাইছে যে তারা আর আমরা এক। একই গভীর মন্ডে থাকলে দুজনেরই

সুবিধা কিনা আনি না, তবে কালাদের যে প্রচুর সুবিধা এটুকু বোঝবার মতন বুদ্ধি আপাকরি আপনাদের আছে। ত্রিকাপাত হাতে নিয়ে কালাদের দরজার আপনারা গিরে দাঁড়াবেন মুষ্টি ত্রিকা অশায়, আপনাদেরই গোলা থেকে মুঠুনকরা সম্পদ আপনাদের হানি করে তাঁরা দাঁতার লম্বান লাভ করবেন। এই হাতকর পরি-স্থিতির উদ্ভব বাতে না হয়, সেই চেষ্টা আপনাদের লম্বাইকে মিস্তিভাবে করতে হবে। এই চেষ্টার বারো বাধা বেবে, তারা আপনাদের দেশের শত্রু, আমাদের জন্তের শত্রু। তাদের যে তাইবই হোক উচ্ছেদ সাধন করতেই হবে.'

বা দিকে বলা একদল বর্মী মজুর কণা শেষ হবার সংগে গংগে চৌংকার ক'রে উঠলো 'কালারা নিপাত ঘাচ্, দেশের শত্রু ধ্বংস হোক

অনেকজন একটানা চৌংকার। উ জেরাওয়াড়ী হাত তুলে গোলমাল থামাবার চেষ্টা করলেন। একটু এসিয়ে এসে বসতে লাগলেন 'আপনারা উত্তেজিত হবেন না। নীকার করছি উত্তেজিত হবার বথেষ্ট কারণ বটেছে। কিন্তু হৈ হৈ গোলমাল করলে তো আর এ সংগ্রাম সমা-ধান হবে না। আপনারা সকলে মতন লগ গ্রহণ করুন বতকণ আপনাদের দেহে এক বিলু রক্ত থাকবে ততকণ আপনারা এদেশের ভাগ্য কালাদের দেশের ভাগ্যের সংগে জড়াবে না। যারা এলোভন দেখাতে আসবে জানবেন তারা প্রত্যাক। নির্মমভাবে তাদের উচ্ছেদ সাধন করতে হবে। এরোজন হ'লে প্রত্যেকটি কালাকে এ দেশ ছাড়া করতে হবে। স্পষ্ট ভাষায় বলতে হবে, এ দেশ তোমাদের নয়। এ দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার তার তোমাদের ওপর নয়। তোমরা অবাস্তর। এ দেশের মেলেমেয়েদের খেয়ে পরে উজ্জীষ্ট যদি কিছু থাকে তো তোমাদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে কিন্তু এ দেশের লোকদের সুখের গ্রাস ছুঁতে এসে এ দেশের মাটিতেই তোমাদের কবর খুঁড়তে হবে।'

সামনে বাঁধা বাঁশটা হঠাৎ আচমকা কমল বোম
গাড়িয়ে উঠলো। ওকে গাড়িয়ে উঠতে দেখেই
উজ্জ্বলগায়ী ভুরু কঁচকে খেনে গেলেন। দুটো হাত
আড়ালিভাবে বুকের ওপর রেখে একদুটো ওর দিকে
চোরে রইলেন কিছুক্ষণ।

‘এ ব্যবস্থা কি শুধু কালারের জন্যই করতে চান ?
আর বাকি আরো দু’দশ থেকে এসে চলে যাবে
কোনো একদশের বুকে অলঙ্কার পাথরের স্তম্ভে চেপে
বসে আছে, এদেশের ছেলোদের ক্রীতদাসের অধম ক’রে
রেখেছে’ এদেশের বুকে নিজেই শেখ রক্তবিন্দু পর্বত
নিজেদের দেশে ভালান বিজে, নিজেদের স্বাধীনতায়
জন্ত আসন করেন করার জন্ত ভেদনীতি জাগিয়ে তুলছে
তাদের সম্বন্ধে সচেতন হবার কি সময় আসে নি ?
কালারা কি তাদের চেয়েও এ দেশের বোমী স্বাধীন
করবে ?’

লোকদের মধ্যে বেশ হৈ চৈ শুরু হলো। সামনে
বসে ভক্তলোকেরা শিষ্টান কিংবা দেখতে লাগলেন।
বর্মী নরুণের মধ্যে একটা উত্তেজনার ভাব। বড়ো
কুংগির বুকের ওপর দুখ তুলে কথা কর, কালারা তো
সাইল কম নয় ?

উজ্জ্বলগায়ী খুঁকে পড়ে পাশে বসে অল্প
কুংগিরের ফিল ফিল ক’রে কি বোকায়েন তারপর সোজা
হঠাৎ গাড়ির গাড়ীর পল্লীর বললেন, ‘এই রকম যে হবে
এ আমি আগেই আশঙ্ক্য করেছিলাম। এ দেশকে
জব্বারের পথে নিয়ে বাবার জন্ত কালারা বন্ধপরিকর।
কিছু তাদের কোন হীন প্রচেষ্টাই এ দেশের লোকদের
আত্মশ্রুতি করতে পারবে না। কালারের স্বল্প তার
চিনতে পেরেছে। তাদের লাগত পায় না ক’রে দিলে
যে এ দেশের শান্তি আর সুখ কিংবা আসবে না—এ
কথা তারা বেশ বুঝতে পেরেছে। কালারের আশ্রয়
নালি না। এ দেশে কালারের স্থান নেই।’

উজ্জ্বলগায়ীর নির্দেশে দু’জন বর্মী ভলান্টিয়ার
কমল বোসের দিকে ছুটে এলো। সুন পে আর অল্প

সংগীরা প্রমদ গণলো। তারা উঠে কমল বোসের
পাশে গিয়ে গাড়ালো।

কমল বোসের কিছু জ্বলপ নেই। সে সোজা
গাড়িয়ে বলতে শুরু করলো, ‘উত্তেজনার বুকে
উজ্জ্বলগায়ী বোম হঠাৎ হ’য়েছেন যে এদেশের
আত্মা এ দেশের প্রাণ, এদেশের অগণিত নরনারীর
উপাত্ত দেবতা ভগবান ভগবত তারতবার্ষিক সন্তান !
পুত্রোদয় কাল ! কালিগায়ত্রী নগর বর্মীর নগর নয় !
তাই’লো এদেশের লোকদের সর্বপ্রাথমিক কত বা—করাকে
তুলে নিয়ে লাগত পার ক’রে নিয়ে আসা’—

বর্মী ভলান্টিয়ার দু’জন কাছাকাছি এসেই থেমে
গেলো। ভগবান বুকের কথার বিব্রত হ’য়ে পড়লো।
ভগবতের আত্ম নির্ণয় করার প্রশ্ন তাদের মীনে আর
আসে নি। দুজনই শতমত খেয়ে গাড়িয়ে পড়লো।
সেই মুহুর্তে সুন পে আর অল্প সংগীরা কমল বোসের
হাত ধরে তাকে বাইরে নিয়ে আসলো।

বলে বলে তারতীয়রা বাঁঠ পার হ’য়ে চলতে আরম্ভ
করেছে। দু একজন প্রৌঢ় বর্মীও রয়েছে সে বলে।
তার মধ্যে হঠাৎ গোলমাল তালোবাসে না কিংবা হঠাৎ
উজ্জ্বলগায়ীর বক্তৃতার স্মরণ তাদের তালো লাগে নি।

বাঁঠ পার হ’তে, প্যাগোডা পার হ’তে ওরা হাতার
ওপর এসে গাড়ালো।

এখনই সুন পে কথা বললো ‘উজ্জ্বলগায়ী যে তাজা
করা বক্তা এ বিষয়ে ভিন্নমত সন্দেহ নেই। দেশের
মধ্যে গোলমাল বাধাবার অল্প নানানভাবে এরা চেষ্টা
করবে।’

কমল বোস কোন কথা বললো না। দু হাতে বাধাটা
টিপে চুপ ক’রে কিছুক্ষণ গাড়িয়ে রইলো তারপর আন্তে
আন্তে বললো, ‘চলুন একটু নদীর ধারে গিয়ে বসি।
নাথোটা বন্ধ টিপটিপ করছে।’

‘আমরা ভা’লো এগোই। সন্ধ্যার দিকে আমাদের
আবার ডিউটি রয়েছে।’ দু’গের একজন বললো।

‘হ্যাঁ, আপনারা বাদ। আমি আর সুন পে নদীর

ধারটা একটু ফুঁই বাজি।’

‘বেশী রাত করবেন না। শহরে গোলমাল হওয়া বিচিত্র নয়। ভারতীয় মজুরদের বস্তুত্বের ওপর একটু লক্ষ্য নকর রাখা প্রয়োজন। চোঁটটা ওদের ওপর দিতে বাওয়াও আশ্চর্য নয়।’ ছেগেটি বাজা পায় হ’তে হ’তে বললো।

সুন পে আর কল বোল ট্র্যাণ্ড মোড ররে নদীর দিকে এগিয়ে চললো। জ্যেট গরম। বিকেলের দিকে এতটা গরম সাধারণতঃ হয় না। আকাশের কোণে মেঘও আছে। বলা যায় না, ওই কালো মেঘের টুকরো হবত আকাশ ছেয়ে ফেলবে। এলো-পাখা ডি কোড়ো। হাওয়া শুক হ’বে। গাছ পাল্লা ভেঙে ভচনক করে বেবে। মাহুকে মাটি ঝাঁকড়ে ঝাড়াতেই দেবে না।

জেট খালি। দু’একজন মোলো আর সারেং ওলে পা ডুবিয়ে বসে আছে। গোটা তিনচার ইংরেজ বাজা নিয়ে জেটির ওপাশে ছুটো করেপ নাগ।

‘একটু উত্তেজিত হ’য়ে পড়েছিলাম’ কল বোল জেটির কোণে বসতে বসতে বললো, ‘কিন্তু একি কথা; একটা লোকও প্রতিবাদ জানাবে না, এমনি ভাবে একটার পর একটা সাজিয়ে সাজিয়ে মিথ্যা কথা বলে বাবে, অথবা লোকদের কেপিয়ে তুলবে, সাপুড়ের বাশীর তালে তালে কথা তুলে বাহুবকে ছোবল মারতে দেখাবে—আর একটা কপাও কেউ বলবে না?’

সুন পে পারের চটিটা জেটির ওপর বসতে বসতে বললো, ‘ঠিক করেছেন আপনি। একটুও অস্ত্র্য করেন নি। যে কথা আমাদের মানে, এসেদের ফেলেশ্বর বলা উচিত ছিলো, সেই কথাগুলোই আপনি বলেছেন। মাসকরা ফুঁতে পাঠছে, পানাপানি ছুটো দেশ যদি ওদের বিজ্ঞে লজবহু হয়, তবে সামলানো হুস্তিল হ’বে, তাই একটা গণ্ডগোলের সৃষ্টি ক’রে দু-বেশের ধ’বা বিবেকের বিষ ছড়াতে চায়।’

‘আমি জানি সুন পে’ কল বোল পুনঃ পুনঃ বললো, ‘ভারতীয়দের হাওয়ার দোষ আছে। এ দেশের আর খেয়ে তারা বাঁচে, অথচ এ দেশের লোকের সংগে গভীর ভাবে তারা মিশবে না, এসেদের হুঁহে বেরনাকে তারা নিজের ক’রে নেবে না, কিন্তু তাদের সংশোধন করার পথ তো বন্ধ করে দায় নি।’ বাতে আমরা পরস্পরের আরো কাছে আসতে পারি সেই চোঁটাই তো মতত্ব থেকে করা উচিত। এপার আর ওপারের মধ্যেকার সেতুটা ভেঙে দিলে শুধু ব্যবধানই তো বড়ো হ’য়ে উঠবে।’

‘কিন্তু শুক থেকে এটা ঠেকাতে না পারলে, সত্যিই করের কথা। যদি বর্মী জনমজুর কেপে ওঠে তবে সারা দেশ জুড়ে একটা বিস্ত্রী অবস্থার সৃষ্টি হবে।’

‘তাই তো ওরা চায়। ভারতীয়দের যতো পর ব’লে প্রমাণ করতে পারবে, ইংরাজকেও ততো কাছে আসতে পারবে। ভারতবর্ষের দিকে যেন কেউ চাইতে ও না পারে, সেইভক্ত এদের শেদিকের চোঁখটা একবারে কানো ক’রে দিতে চায়।’

দুজনেই চুপচাপ। সিটি রিরে একটা সীমার জল কেটে কেটে এগিয়ে আসলো। চোঁটের মাঝার সাদা ফেনার ঝালর। ফেনেল থেকে কালো ধোঁরা কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠছে। জ্যেট কালো ধোঁরা। বিকেলের স্নান আলোয় সীমারের রূপোলি পাতগুলো চকচক ক’রে উঠে।

‘আমাদের এখানের কাছ তো প্রায় শেষ হ’য়ে এসেছে’ কল বোল বললো, ‘এবারে তাবছি বেহুনের দিকে ফিরে যাবো। এই সময়টা শহরে না থাকলে দেশের হাওয়া বোন দিকে বইছে হাশিশ পাবো না।’

‘হ্যাঁ, এবার তো ফিরতেই হ’বে। তাছাড়া কলেজ খোলারও আর বেশী দেরী নেই।’

দুজনে উঠে পড়লো।

রাজ্য দিয়ে গেলে একটু ঘুরপথ হ'বে, তাই সোজা-সুজি মাঠে নেবে পড়লো।

'বাঝা বোঝি হর চিহ্নিত হ'রে পড়েছেন,' মুন পে বললো, 'চিহ্নি তিচ্ছেন, উত্তর পাচ্ছেন না। আমার খোঁজে আমার দেখি মস্তকে রেগুনে না পান।'

'এখান থেকে সোয়েবিনে একটা চিহ্নি মিলেই পারছেন? অথচ মৌলনিনে এসেছেন পে খবরটা বাজিতে জানাতে চান নি?'

'বুঝতেই তো পারছেন, এখনি ছাত্তার কৈফিয়ৎ দিতে হবে: বাচ্চ, গিয়ে কিছু-একটা লিখে মিলেই চলবে। পড়ার চাপ কিংবা শরীর খারাপ—এই ধরনের কিছু একটা অসুস্থতা।'

অনেকগুলো কেল্লা ত্রি বি আর কুচ্চুড়ার গাছ। এদিকটা বেশ অন্ধকার। গাছের তলার প্রচুর শুকনো পাতা ভেঙে হ'য়েছে। ভূমনে পাতা বাড়িয়ে বাড়িয়ে এগিয়ে চললো।

'নাশাটা বড়ো হ'রে রয়েছে। ভীড় আমি একে-বারেই সহ করতে পারি না, অথচ ভীড়ের কাছই বেছে নিতেনি।' কমল বোস নিচু হ'রে পায়ের ছুঁতাটা ঝিক ক'রে নিলো। জুতোয় মধ্যে কি ক'রে শুকনো পাতা চুকে পড়েছে। চমকে তারি অসুবিধা হচ্ছে।'

'আজ পরদও পড়েছে বিজ্ঞি। গাছের একটি পাতাও নড়ছে না।' মুন পে ওপরের দিকে চেয়ে দেখলো। বেশন ওষধনে নিশ্চিন্ত। 'বিকলে গিয়ে আর একবার বান ক'রে কেলতে হবে। বেশি আবার কি নবাব অপেক্ষা করছে আমাদের জন্ত। গিরে হরত দেখাবো—উঃ ফরা—মুন পের আচমকা চাঁৎকারে কমল বোস বমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

'কি হ'লো মুন পে, কি হ'লো?' বিজ্ঞি অন্ধকার। একটু আলো নেই গারের কাছে কোথাও। কোন উত্তর নেই, কেবল একটা অশ্লষ্ট গোঙানি শব্দ।

শুকনো পাতার ওপর কতকগুলো পাঁচের খস খস শব্দ। কতকগুলো লোক বেন নৌড়ে পাগিয়ে গেলো। গোঙানির আওয়াজ লক্ষ্য ক'রে ছু একপা পিছনে এসেই কমল বোস মুন পের দৌজ পেলো। একটা হাত দিয়ে মাঝা চোপে হ'রে মুন পে শুকনো পাতার ওপর উণ্ড হ'রে পড়ে রয়েছে।

হাঁটু বুড়ে ব'লে অন্ধকারে আশ্রয় ক'রে কমল বোস মুন পের শরীর হ'রে নড়ো মিলো, 'মুন পে, মুন পে, কি হ'লো হঠাৎ?'

কোন উত্তর নেই। কাতরানির শব্দ। কমল বোস ছুটো হাতে মুন পেকে পাঁজাকোলা ক'রে তুলে নিলো। আঙে আঙে গাছের অন্ধকার পার হ'রে রাজ্যের আলোর নীচে দাঁড়িয়েই চমকে উঠলো। কপালের ধী দিকে, তুচ্ছ ঝিক ওপরে, গভীর কত চিহ্ন। রক্তে কপালের ওপর এসে পড়া তুলের গোছা লেপটে রয়েছে। চোখের পাশ মিরে গাল বেয়ে রক্তের ধারা গড়িয়ে গলার কাছে এসে জমা হ'য়েছে। হুটি চোখ নিম্নীলিত।

কমল বোস বুকের কাছে বুৎ মিরে আঙে আঙে করেকবার ডাকলো, 'মুন পে, মুন পে।' উত্তর নেই, কিন্তু তুচ্ছ হুটো নড়ে উঠলো, ঠোট ছুটো বার করেক বার বার করে কৈশে উঠলো। মনে হ'লো মুন পে বেন উত্তর দেবার চেষ্টা করলো।

কমল বোস এদিক ওদিক চেয়ে চোঁচালো, 'লাকা, লাকা,। কিন্তু বানবাহনের কোন চিহ্নই নেই। জন বিয়ল শব্দ। এদিকটা বোধ হর শহরের সব চেয়ে নির্জন অঞ্চল। মুন পেকে সাবধানে শুইয়ে মিরে কমল বোস এগিয়ে দেখলো। একটা লাকার আওয়াজ বেন আসছে। কাছে আসতেই বোকা গেলো ভূমন সওয়াদী মিরে একটা লাকা শহরের দিক থেকে আসছে। কমল বোস হাত তুলে লাকাটা ধামালো। ভূমন বমী বুড়া ব'লে রয়েছে। এগিয়ে গিরে ব্যাপারটা বলতেই ভার্য তাকাডাড়ি নেনে পড়লেন। উৎকর্ষা কড়ানো

গলায় একজন বললেন, 'সেকি, বেঁচে আছে তো এখনও? এরকম ব্যাপার তো কখনও শুনি নি! আজ দু'বছরের ওপর রোজ আমরা প্যাগোডা থেকে এই পথেই ফিরছি।'

লাকাগুজার সাহায্যে কবল বোস লুন পেকে সাবধানে লাকার তুলে নিলো। বুড়াদের গলা বাড়িয়ে বললো, 'একটু কষ্ট হবে আপনাদের। আমি গিরেই লাকা ফেরৎ পাঠাচ্ছি।'

বুড়ারা হাত নাড়লেন, 'কিছু না, ফেরৎ পাঠাবার রকর নেই, ওই তো আমাদের বাড়ির গেট দেখা যাচ্ছে। আমরা ট্রিক যেতে পারবো।'

লাকার উঠে কবল বোস দু'এক মিনিট ভাবলো। কোন ডাক্তারের বাড়ী নিয়ে যাবে প্রশ্নে, না, মগন-রামের বাংলোর তুলে ভাঙ্গার ডাক্তার ডাকার বন্দোবস্ত করবে! শেষের সূক্ষ্মই সবীচীন ব'লে মনে হ'লো। এই অবস্থায় এদিক ওদিক ঘোরার চেয়ে লোকা আত্মনার নিয়ে তোলাই ভালো।

একটু পরে লুন পে গভীর একটা নিশ্বাস ছাড়লো। বাবাটা দু'একবার নেড়ে যেন উঠবার চেষ্টা করলো। কবল বোস ওর বাবাটা কোলের ওপর চেপে ধরলো।

গরমের অজ্ঞ ভিন চার জন ছেলে লনের ওপর ব'সে ছিলো। গেটের মধ্যে লাকা ঢুকতেই কে একজন টেটির উঠলো, 'কে?'

'আমি বোস।' কবল বোস কথা বললো, 'তোমরা টর্চ নিয়ে এগিয়ে এলো তো। বিদ্রী ব্যাপার হচ্ছেই।'

কথা শেষ হবার সংগে সংগেই ছেলেরা দৌড়ে এসে লাকার সাবনে ভাঁড় ক'রে দাঁড়ালো। একজন টর্চের আলো লাকার মধ্যে কেলেই চীৎকার করে উঠলো, 'কি সর্বনাশ, লুন পে না? তোমাদের এ অবস্থা কে করলো? দু'জনে রক্তে বে'নের উঠেছো।'

সাধারণ লুন পেকে ছেলের দিকে এগিয়ে দিতে

দিতে কবল বোস বললো, 'আমার কিছু হয় নি। আমার যে রক্ত দেখছেন, তা লুন পেরই রক্ত। শার্ক রোডের পাশের রয়হান গিরে আমরা ফিরছি, হঠাৎ করা পিছন থেকে ওর মাথার আঘাত করেই পালিয়ে গেলো। অন্ধকারে কিছুই দেখতে পেলাম না, কেবল লুন পের হোতানি শুনে ব্যাপারটা আশঙ্ক করলাম। আপনারা কেউ একবার শেরা উন ভীকে খবর দিন, তাঁর ডিনপেনসারীই যোগ হ'র সব চেয়ে কাছে।'

'আমি এখন যাচ্ছি,' একজন হোককা বেড়ার ধারে দাঁড় করানো সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

বিজ্ঞানায় শেরানোর পরেই লুন পে চোখ মুললো। আঙে বললো, 'একটু অল।'

তুলো গিরে কবল বোস কতস্থানটা হুচে মিছিলো। একজনের দিকে চেয়ে ইগারা ক'রতেই সে বাইরে গিরে এক মাস অল এনে লুন পের সুখের কাছে ধরলো।

শেরা উন ছি 'কলে' বেরিয়েছেন, মত পো ডাক্তারকে নিয়ে এসেছে। তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে আঘাত-চিকি পরীক্ষা করলেন। শুধু গিরে কপাল ব্যাণ্ডেজ ক'রে গিরে, ইন্জেকশনের বাস্ক খের করতে করতে বললেন, 'বিশেষ ভরের কিছু নেই। মনে হ'চ্ছে লোহা বঁধানো লাঠির বা গিরে কেউ মেরেছে। অন্ধ-কারে ট্রিক হ'রত তাঁর করতে পারে নি, নরত ঞাণাতটা মারাত্মক হ'তেও পারতো। ট্রিক চোর ছাচড়ের আক্রমণ বলে তো মনে হচ্ছে না।'

লুন পে জান হাসলো। বিড বিড ক'রে বললো, 'না, চোর-ছাচড় হ'লে না ব্যবহার ক'রতো, লাঠিতে ঘাবেল করার চেষ্টা করতো না। এ ভাড়া করা গুপ্তার কাম। কোনরকমে মনিবের নেরকের মান রাখার চেষ্টা করেছে।'

ডাক্তার লুন পের দিকে হুঁকে পড়ে বললেন, 'আশনি বেশী কথা বলবার চেষ্টা করবেন না। চোখ বড় ক'রে চুলচাপ শুধে বাতুন। আজ রাতে শুধু এক কাপ গরম

হুৎ চাড়া আর বাবেন না কিছু ।’

ইনজেকশন শেষ করে বক্তৃতা শেষে গেলেন।
খাতিয়ার ওপরে শুধু কমল বোস আর কুক লিখ। বাকি
সবাই খেতে বীচে নেমে গেলো।

লুন পে কাত হ’য়ে ওদের দিকে ফিরে বসলো,
‘কমল, আপনি জামাটা ছাড়ুন। রক্ত মাথা জামা পরে
কতকণ বসে থাকবেন?’

কমল বোস হাসলো, ‘রক্তটা গায়ে সহ্যই নিচ্ছি।
ভাখহি, আজ শুধু স্নান, কতো বছর পরে এ রক্তের
শেষ কে জানে।’

কুক লিখ খাতিয়ার ওপর নড়ে চড়ে বসলো, ‘বেশ
পাকা হাতের কাছ কিছু। সময় বেশী ওরা নষ্ট
কবে নি।’

কমল বোস কুক লিখের দিকে চেয়ে বসলো, ‘সময়
হরত ওরা বেশী নষ্ট করেনি, কিন্তু পাকা হাতের
কাছ তা বলবো না। লাটি টিকই চালিয়ে ছিলো,
কিন্তু মাথা ভুল করেছিলো। ও আঘাতটা আমার
পাওনা ছিলো।’

লুন পে আবার হাসলো, ‘সেনা পাওয়ার কথা তুলে
লাও নেই। একজনকে সেনা আর একজনকেই চিরকাল
শোধ দিতে হয়। পাওনার বোঝাতেও তাই। আন-
দের বাপঠাকুরার সেনা আনাদেরই শোধ করতে হবে।
তাই না?’

‘বেশী কথা বলছেন না। হীডান আপনার দুখটা
নিশে আসি।’ কমল বোস উঠে গেলো।

লুন পে হাসবার চেষ্টা করলো, ‘দুখ দিয়ে
দুখ বন্ধ করবেন, এমনি দুখপোয়া বৃদ্ধি পেরেছেন
আমাকে?’

পরের দিন একটু জর হ’তে সকলেই ভয় পেয়ে
গেলো। দুপুরের দিকে লুন পে আবেল ভাষোল
বক্তৃতা শুরু করলো। ভাষার এসে অনেককণ ধরে
পরীক্ষা করলেন, একটা ইনজেকশন মিলেন তারপর
জ্বর দিয়ে চলে গেলেন। কুক লিখ আর কমল বোস

সারাক্ষণ মাঝার কাছে বসে রইলো। বিকেলের দিকে
জ্বরটা একটু হ্রাসে লুন পে চোখ বেলে চাইলো,
‘এতো অক্লান্ত কেন? আশো কই!’

কুক লিখ উঠে আলোটা জালিয়ে দিলো। পাছে
আলোটা লুন পের চোখে লাগে তাই কাগজের একটা
টুকি পরানো হ’য়েছিলো।

লুন পে মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলো তারপর কমল
বোসের দিকে চেয়ে বসলো, ‘কমল, একটা তারি
মজার কথা মনে হচ্ছিলো। লাটিটা আপনার মাথার
না প’ড়ে আমার মাথার পড়ার পিছনে বিরাট একটা
ঝানে আছে?’

‘কি বলুন ভো?’

‘স্মৃতির কথা মনে এ দেশের লোকদেরই সর্বনাশ
হবে, এটাই যোগ্য হয় ইংগিত।’ তাঁর কর্ণপত্রা এবেলের
ডাইয়ের বিকটে তাহিকে ঠাঁই করাবে, যেমকে লতকা
বিচ্ছিন্ন করবে, দেশের অমঙ্গল ডেকে আনবে।’

এতগুলো কথা এক সংগে ব’লে লুন পে হাঁপাতে
লাগলো। কমল বোস খুঁকে পড়ে লুন পের মাথার
হাত বোলাতে বোলাতে বসলো, ‘উদ্বেজিত হবেন না।
আপনি গেরে উঠুন। এ সবের অনেক সময় পাবো।
যেপের সর্বনাশ এমন ভাবে আমরা কাউকেই করতে
দেবো না, এর লজ আমাদের যদি আরো অনেক
লাটির আঘাত সহ করতে হয়, তাতেও আমরা
পিছপা নই।’

লুন পে হাসি হাসলো, ‘লাটির আঘাত মাথার
পেলান বটে, কিন্তু একটা বড়ো অক্লান্ত হয়ে গেলো
কমল?’

‘কি?’

‘আঘাতটা কপালের আরো? কোণ বেঁধে হ’লে
ভালো হ’তো, আরো একটু গভীর হ’লেই যেন
টিক হ’তো।’

‘কেন বলুন ভো?’

‘তা’হ’লে রক্তা বোসের মুখোমুখি হাঁড়িতে পারতাম।

বলতে পারতাম, সেখান এদেশের শাসকের স্বাক্ষর
কপালে কুটিলে তুলেছি। আপনার পাশে ঝাড়বার
অধিকার এখার তো পেতে পারি ?

‘দেশের সেবার এগিয়ে ঝাড়বার অধিকার আপনার
অনেকদিনই হ’য়েছে। আপনার মধ্যে খাব নেই,
যেটুকু আছে সেটুকু বাঁচি।’

কমল বোস আয়ো কি বলতে বাজিলো কিন্তু আর
একটি ছেলেকে ধরে চুকতে দেখে আচমকা থেমে
গেলো।

‘কি ধরত ?’

‘একটি বেরে নিচে অপেক্ষা আপনারদের
কাউকে ডাকছেন।’

‘একটি মেরে ?’ হুক লিম উঠে ঝাড়লো ‘কি
আবার দরকার এখানে ?’

হুক লিম নিচে নেমে গেলো। কিছুক্ষণ পরেই
ওপরে উঠে এসে বললো, ‘মা টিন এগেছেন। আমা-
দের ক্লাসেব মা টিন। ওপরে আসতে চাইছেন লুন
পেকে বেখবার অজ্ঞ। ওপরে নিরে আসবো ?’ কমল
বোস লুন পের দিকে ফিরে চাইলো। চোখ চুটো বুজে
লুন পে চূপচাপ করে রয়েছে। একটু চেয়ে থেকে
কমল বোস হুক লিমের দিকে ফিরে বললো, ‘লুন পে
খুনোচ্ছেন। বেশী কথাবাতা বলতে ডাক্তারের বারণ।
সেটা শুকে বুঝিয়ে বলুন না ?’

কথা শেষ হওয়ার সাথে লুন পে চোখ বুললো।
হেসে বললো, ‘না লুন পে খুনোখি নি। ওপরে
নিরে আসুন না। হরত অনেক নতুন ধরত শুনতে
পাবো।’

সিঁড়িতে পারের আওয়াজ হ’তে লুন পে আবার
চোখ বন্ধ করে ফেললো।

মা টিন আস্তে আস্তে ঘরের মধ্যে এসে চুকলো।
কমল বোস এখিকের খাটেরাটা একটু টেনে দিয়ে বললো,
‘আমাদের আস্তানার চেয়ার টোকারের তারি অডাব।
কোনরকমে গাদাগাদি ক’রে বাক। এইটাতেই কঠে

ক’রে বসুন।’

মা টিন চূপ করে খাটবার এক কোণে বসলো।
একটি কথাও বললো না। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চেয়ে থেকে
কমল বোসের দিকে ফিরে বললো, ‘ঘাতটা কি খুন
শুরুতর ?’

কমল বোস কথা বলার আগে লুন পে উত্তর দিলো,
‘বাইরের আঘাতটা খুব গুরুতর নয়, কিন্তু মনের দিক
থেকে খুবই চোট পেরেছি। মিটিংয়ে লোক কমা
করার অজ্ঞ সফলের ডাকের কাগি, বিকলে বাণের
লাগি হয়ে ঝাড়বে এটা ভাবতে পারিনি।’ হাসতে
গিরেই লুন পে খুঁটো বিকৃত ক’রে কেললো। ব্যাটা
তিনটিন করছে। শিরান্তলো পর্বত দগদগ ক’রে
উঠলো।

‘কিন্তু মিটিংয়ের ব্যাপারেই আপনারকে আক্রমণ
করেছে, এটা কি ক’রে ভেবে নিলেন ?’

‘এটা ভেবে নেওয়ার অজ্ঞ যেটুকু বুঝির দরকার,
লে বুঝি আমার আছে, এ গৌরব অন্ততঃ আমাকে
দিন।’

কিছুক্ষণ কোন কথা হ’লো না। জানলার বাইরে
হাওয়ালাগা কাউপাছের পাতাগুলো শির শির ক’রে
কাঁপছে। দেওয়ালের ক্যালেন্ডারটাও বাতাসে গুলে
উঠলো।

‘ধরটা আপনি শুনলেন কোথা থেকে ? কাগজে
নিচর বের হয় নি ?’ লুন পে চোঁট মুচকে হাসলো।

‘শহরে ধরটা ছড়িয়ে পড়েছে। ছোট শহর তো,
কাছেই কোন ঘটনাই কারুর কান এড়ায় না। আপনি
রেগুনে কিগেবন কবে ?’

‘শীঘ্রই ফিরবো।’

‘হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ফিরে যাওয়ার দরকার।’

‘জল করছেন আপনি। হরত তাড়াতাড়িই ফিরবো,
কিন্তু লাগির ভরত নয়, কলেজ বোলায় আর বেশী দেরী
নেই। কতগুলো কাজ রয়েছে, তাই একটু আগেই
ফিরবো।’

‘আমি পবিত্র হওনা হ’বে।’ ঠেঁ চৈ ভালো লাগছে না।’

‘কিছু যেখানেই যান, ঠেঁ চৈ এড়াতে কি আর পারবেন? সাহা! বেগে আশুন ছড়িয়ে পড়বে, কোথায় লুকোবেন?’

‘কি আমি কিছু করতে পারছি না। তবে বেগের ঘন ঘন পুলিশ লাহেবের বাংলায় দৌড়ানোড়ি আর পুলিশের লোকের অবিহত আনাগোনার মনে হচ্ছে, বিরাট রকমের কিছু একটা তোড়বোড় চলছে। প্যাগোভার পিছনের খোলা মাঠে হোক সকালে পুলিশ অফিসারদের রিভলভার চৌড়ার মড়া চলছে।’

‘ওসবের বিশেষ বরকার নেই,’ লুন পে হাসলো ‘কীড়ের মধ্যে রিভলভার ছুঁড়তে হ’লে লক্ষ্যের বিশেষ প্রয়োজন হবে না। হাজার হাজার লোক কাতার দিগে আসবে, রিভলভারের নলটা ভাবের দিকে ফেঁড়াতে পারলেই, অনেকে যায়েল হবে। এতো একজন ছুঁড়নের ব্যাপার নয়, যে বিশেষ ক’রে লক্ষ্য ক’রে তবে টিগার টিপতে হবে।’

‘আলমিও সন্তিই মনে করেন বিশেষ রকমের একটা গোলযোগের শুরু হবে?’ মা টিনের গলায় স্বর উঠাত।

‘নিশ্চয়, ব্রিটিশ সিংহ অবধা লাফালাফি করে না। কেউ তার ল্যাঞ্চে পা দিলে তবে সে বেশির ভুলিয়ে হাঁড়ার’ কথাগুলো কবল বোল বললো।

‘তবে কথা হচ্ছে, থাকে আমরা বেশির ভাবটি, দেখলো হয়ত নিছক পাটের পহুলা আর সিংহের

হাঁড়িরে ওঠার ভাবটি। হয়ত তার পালানোর চিক আগের অবস্থা।’ লুন পে হেসে উঠলো।

অনেক দূরে কোথায় গির্জার বড়িতে ঢং ঢং ক’রে বকটা বেজে উঠেছে মা টিন হাঁড়িরে উঠলো, ‘আজ উঠি আপনি সেহে উঠলেই রেঙুনে চলে যাবেন। এখানে আর থাকবেন না। আপনাদের দলটাকে পুলিশ বিশেষ সুনামেরে দেখছে না, কোন একটা গোলমাল থাকিতে তুললেই হলো।’

এসব কথাই কেউ কিছু উত্তর দিলো না। শুধু কবল বোল হাঁড়িরে উঠে বললো, ‘এতটা রাজা আপনি একলা যাবেন? সংগে লোক দেবো একজন।’

মা টিন হাত নাড়লো, ‘না বরকার হবে না। আমি বাড়ির লাকার এসেছি। লাকা গেটের কাছে হাঁড়িরে আছে।’ কথার সংগে সে লুন পের খাটিরার কাছে এগিয়ে এলে ব্যাঙেজটা নিরীক্ষণ ক’রে বেগে বললো, ইন্স চোবটা পুঁব বেঁচে গেছে।’

লুন পে মুখ মুড়কে একটা কথা বলতে গিয়েই বেগে গেলো। অল মা টিনের চোখ ছুঁটো চিক চিক ক’রছে। গালে ভানানার স্বর তেদ ক’রেও একটা বিবয়ভার আনেক ছুটে উঠেছে। চোটা ছুটো পর পর ক’রে কাঁপছে। লুনপের মনে হ’লো, আর কিছুক্ষণ এমনি ভাবে থাকলেই মা টিনের চোখের অল টপ টপ ক’রে ওর ব্যাঙেজের ওপর এসে পড়বে। সমস্ত ব্যাঙেজটা ভিত্তে যাবে। অসময়ে আঁখার হয়ত ব্যাঙেজ বললাতে হবে। (ক্রমশঃ)



পারস্যের বস্ত্র

(পূর্বাহ্ন্যতি)

কলশ্রতা ভাঙ্কুড়ী

সূর্যবর্ত খাটের পরে, আরও করেকটি ছোট ছোট খাট আছে; এবং সেইরকমই একটি খাটের তীরে অবস্থিত ছিল আমাদের বাসভবন। তখন বলতে, বড় একখানি ঘর; আর তার সামনে ঠিক গঙ্গার উপরে খানিকটা রেখিঃ ঘেরা খোলা ছায়া। এই ছানটুকুই ছিল আমাদের অত্যন্ত প্রিয় স্থান। এক কথাই বলা চলে সমগ্র হরিষ্যার শহর মর্শনের কেন্দ্রস্থল। এই ছানে দাঁড়িয়ে একবার চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত করলেই চোখের সামনে জলবল করে উঠে, উজ্জ্বল প্রকৃতির এক আনন্দ-ময় অধিবাসী-রূপ। এখান থেকে পূর্বদিকে দিগন্ত বিস্তৃত পর্বত মালায় নিখর দেশে প্রতিদিন প্রত্যুৎপন্নোদয়ে এক অভিনব নবীন পূর্বোদয়। আমাদের অত ভোরে ঘুম ভাঙতো না কোনদিন। জীমূক্ত ভাঙ্কুড়ী, প্রত্যেকদিন আমাদের ডেকে তুলতেন প্রত্যন্তের জন্মোৎসব দেখবার জন্য। ঘুম ভাঙা চোখ মেলে দেখেছি, প্রকৃতির সর্বোৎসাহ সজ্জা রক্তিম। দীর্ঘ রাত্রি বিচ্ছেদের পর আবার তার স্রিষ্টতম ফিরে আসতে। তার অতুল রূপের সুবর্ণ তটায় পাহাড় নিখর হংসের উৎসব লেগেছে। বেল অলঙ্কো থেকে গর্ভর স্তন্যদায়ীরা গুলে দিয়েছে রমনহস্যের এক রসীক ছায়ার। তাইতে সূর্যবর্তের সন্তানের দ্রুত গতিবেগের প্রতি পলকে পলকে পরিবর্তন হচ্ছে, বর্ণ হ্রস্বতার বিচিত্র ব্যাধ। ক্রমে সেই রংয়ের স্রোত অবগাহন করে উদীয়মান হন নৃতন সূর্য। বীরে বীরে বিন্দু বিন্দু করে তার রাত্রি সাহস অবদান হয় আকাশের তটভূমি পাবে। ক্রমশঃ পূরে চলে যায়, পর্বত নীর্বেরে যেন আলিঙ্গন প্রকৃতির ভ্রাম। অকলের নীহারিত হচ্ছের আঙ্গান। তখন সূর্যবেশ এক। অনন্ত কালের, বিশ্বলোকের একচ্ছত্র সস্ত্রাট। তার তামর জ্যোতিতে বিশ্বের কোণ ও বস্তু পুত্র, অনন্ত প্রাণময়, অখণ্ড আনন্দময়। সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের

মন পরিপ্লাবিত করে, চোখে লাগতো সেই আলোকের মহারশ্মি। আপনা থেকে অবনমিত হয়ে আসে নৃতন পল্লব। হৃদয় পাণ্ডী গান গেয়ে ওঠে,—

আবার ভাঙা আলোর গানে, কে ভাগে।

সূর্য তটায় বদ নিরে কে ভাগে;

আমরা আশি সূর্যন যুগের ভোর হোল;

তখন জোড়া বন্ধী শালায় ঘোর খোল

হুঁড়ির বৃকে মূল আগে, আর পাখীদের গান ভাগে,
মনে মনে তাইতো। পৃথিবী রং লাগে.....

বাখার উপর দিয়ে তাঁকে তাঁকে উড়ে বার কিটির মিচির কবচে করতে সজ্জা টিয়ার তাঁক। তারও পিছনে দুই থেকে আসে লাল। যকের তাঁক। সর্বত্র জেসে ওঠে আগরণের মহা আলোড়ন। এট ছায়ে বাঁড়িয়ে ছুপুর বেলা, দেখেছি প্রকৃতির অন্ধ দীপ্ত সূর্যবর্ণ স্রোত পরিপ্লাবিত হতে। খাটের কিনারে মাছের তাঁক, অলঙ্কৃত সূর্যালোকে, জলের নীচে, তাদের রূপালী দেহের কি জৌগুণ?

মরহাৎ গুলি খেতে দিলে, মাছেরা হল বেঁবে খেতে আসে। বিরাট বিরাট সব মাছ। ছানা শোনা নিরে বদন সব একত্ব হর তখন ভারী মজার লাগে দেখতে। এখানকার লোকেরা বাছ খায়না। নিরামিষ ভোজী। কিন্তু বাইরের শু বহু লোক এখানে বাস করে; তাহাও এখানে মাছ খেতে পারবে না। যদিও বোকান বাছের কোথাও মাছ কিনতে পাওয়া; বাহানা—অবুগ স্থানীয় খাদ্যাদির তর আছে, যদি কেউ গঙ্গা থেকে মাছ বহে খায় এই স্থানেই। তবে এই মহাপ্রাণের ভাগী হবে কে? তাই সত্তর্পণেই থেকে আইন করে দেওয়া হয়েছে যদি কোনও লোক এখানে মাছ খেয়েছে বলে বরা বার, তবে তাকে চরমাস কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে। মাছ এখানে গঙ্গার শোভা। রসনার তৃষ্ণা, যা উদরের

পুষ্টি নয়। ঐ ভাবুড়ী অভ্যস্ত বহত প্রিয়। তিনি ঘাটে মৎস্তের লম্বাবেশ দেখলেই অভ্যস্ত আনন্দের সঙ্গে জালের গারে হাত বুলিয়েছেন। মরগর শুনি খাইয়েছেন। আর মনে মনে তুলনা করেছেন নিজের দেশের কোন্ নদীতে এই রকম মাছ পাওয়া যায়? তাঁর বিচারে একমাত্র বাংলা দেশের সুগন্ধ সূর্য্যপুরের কংস নদীতে এত রকম বিরাট বিরাট মহাপোল মাছ পাওয়া যায়। এ মাছের স্বাদ নাকি অতুলনীয়। আমার মনে হয় আইন না করলেও এখানে কেউ মাছ ধাবে না। কেননা এখানে প্রত্যেকেই হিম্মত। তারপরে প্রত্যেকের মনেই ধর্মতীক্ৰ তাণ কিছু কম বেশী আছে। তারও পর স্থানীয় বাসিন্দাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে অদূর কোয়ালপুর থেকে মাছ সংগ্রহ করে এনে ভক্ষণ করা কিছু সহজ সাধা ব্যাপার নয়। কাজেই পূর্ণ্যস্থানে এসে কে লাগ করে আর, পাণপথে নিমজ্জিত হয়?

তারপর পড়ন্ত অশ্রুত বেলার, এই চাদে গাড়িয়ে দেবেন্দি, গঙ্গাবক্ষে সূর্য্যাস্তের অপভ্রংশ বর্ণ মাহুতী। বুঝাবনে বোলদালা বহিও কখনও দেখিনি, তবুও মনে হয়, একটা বুঝাবনে বসন্তোৎসবে বোর হয় এইরকমই অবর্ণনীয় রংএর প্রাচীন বইতো, মাছবের মনেও, প্রকৃতির সর্ব্বাঙ্গে। গঙ্গার পরপারে বীরে বীরে মেঘে আসে সন্ধ্যার বিষমতা। অদূরে সমস্ত দেবালয়ে স্নানিত হয় দেবারতির বাজঘনি। তিমিত হয়ে আসে ঘাটে জনতার কলরব। আমরা ছায়ে রেলিংএর বায়ে বসে থাকতুম। ছুটি অতৃপ্ত বক বেবেহি—তাদের গায়ের রং বহুধাে সাদা, কিন্তু ডানা ছুটি বাহাণী; আর লম্বা সরু ঠোঁট ছুটি চমৎকার লাল। পাখী ছুটি আকারে বুঝই বড়। এরা প্রতিদিন তোরে গঙ্গার উত্তর দিক হুত উড়ে উড়ে দক্ষিণ দিকে কণবল পার হয়ে নীল বাহার দিকে যেতো—আবার সন্ধ্যার দক্ষিণ দিক থেকে কিরে উত্তরে যেতো। গঙ্গার অনতিউচ্চ পাশে শুভ্রাচার সমস্ত তাদের ডানাছুটি, এমন সুন্দর শান্ত ভাবে, সূক্ত স্ফালিত হোত, তাহা দেখে মনে হোত, এরা যেন

কোনও অশ্রুত বাজনার তালে তালে শূণ্যপথে সূতা করছে, কারও অলক্ষ্য ইচ্ছিতে। এমনিই আশ্চর্য্য সুন্দর ছিল তাদের গতিবাহ। আমার মনে বড় কৌতুহল ছিল, এই বিভিন্ন পক্ষীমণ্ডল, কোণা থেকে আসে এবং কোথায় যায়, সেটা জানার অস্ত। কেননা, এদের কোনও দল নেই, কোনও কলরব নেই, কোনও চঞ্চলতা নেই, নেই কোনও শিকারীর মত সতর্কতা। তাদের গতিপথে হাড়িরে থাকতো, একটা বৈরাগ্যের গুচ্ছ নিলিগুতা। কঠিন অথচ কোমল। যেন সন্ন্যাসীর অস্ত্রোচ্চাতি। মহামেঘের বিজুতি।

এদের নীড়ের সন্ধান পরে আমি পেয়েছিলুম। ব্রহ্ম-কুণ্ড থেকে অনেকটা দূরে গিয়ে গঙ্গার মাঝখানে একটি বীপের মত, অলম্বাত, বনভূমি আছে। তার দুই পাশ দিয়ে গঙ্গা বয়ে গেছে। তার মাঝখানে এই বন-ময় কলতগতী দু'থেকে জারী সুন্দর দেখায়। শুই বীপে মন্থা বসতি নেই। শুধু বিরাট বিরাট সব বহীক্ৰ আছে। সেইখানেই বাস করে আমাদের পরিচিত এই ছুটি বক পক্ষী। আর ওরা বীকারে যেতো, গঙ্গার ওপাড়ে নীলহারার নির্জন সুবৃহৎ চরভূমিতে।

ক্রমে সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত্রির রহস্যময় অন্ধকারে গভীর হয়ে উঠতো পৃথিবী। চতুর্দিকে ঘনিয়ে আসে একটা গভীর অশ্রুত নীহবতা। গারে শাল জড়িয়ে আমরা বসে থাকতুম। অন্ধকার গম্বাংকে পাতার নৌকা তেলে দার। তাতে মিট মিট করে জলে সূর্য-প্রাণী। নীচে গঙ্গার ঘাটে প্রত্যাহ সন্ধ্যার পরে একটি-তুচ্ছ বহুক্ষণ ধরে বসে সাধন তখন কোরতো এবং দুই হাতে ছুটি প্রাণী নিয়ে গম্বাংকে বরণ কোরতো। পূর্ণ্যস্থানে গঙ্গা প্রদক্ষিণ করতে করতে গভীর অর অগ্রুতি করতো, হয় হয় ব্যোম ব্যোম, মহাদেব, গঙ্গা নিব বরভূ। "কাশী বিশ্বনাথ স্ত্রীগঙ্গা" ইত্যাদি।

তার উদাত্ত কঠিননিত্যে কেঁপে উঠতো আমাদের মন, দুলে উঠতো গম্বাংল। কি বিভিন্নরূপী নগোর;

এখানে এক একজনের মনের তার এক এক সুরের বাঁধ।
সব্বত বরে বাজে একটা অশুভ সুরের ধারা। সেই সুরের
সুর মিলিতে কেউ করছে ক্রন্দন, কেউ করছে হাত্ত;
কেউ করছে বিষময় অশ্লুসঙ্গান, কেউ মত্ত, সীমাবদ্ধ
পরিবেশে লক্ষ্যের মোহে। গলার একতীরে একমল
পশিক দুইহাত ভরে সংগ্রহ করছে অসংখ্য দুষ্টি ও
পাথর; অপর তীরে আর একমল পশিক দুই হাত শূণ্য
করে ভাসিয়ে দিচ্ছে, আপন অন্তরের পরম প্রিয় বস্তু
গুলি। মাহুঘের মনের এই বহুবিচিত্র সুরের ধারার,
গলার কলধনি হয়ে ওঠে আরও ভাব্যময়, আরও
প্রাণময়, আবহু গীতময়; আরও চকোময়।

সেই সময় কুটীরের অপর প্রান্তের বাগান্ধার গেলে
বেথা বেঙো, আলোময়, বাণীময়, মাহুঘের আর একটা
সুরের জীবন ধারা। তখন ছিল রামলীলার সময়;
একমল লোক, বিরাট বিরাট রাম লক্ষণ ও রাবণের
মুষ্টি নির্মাণ করে, বহু আলোক সজ্জা, বাত্মজনি সহ-
কারে ময়দানের দিকে চলেছে। তার সঙ্গে সঙ্গে
চলেছে, বিচিত্র বেশভূষার সজ্জিত, সুদূর পায়ে রাম-
সীতার জীবন্ত নাটকীয় প্রতিমূর্তি। সমস্ত নগর আলি
করে তার শিঙনে ছুটে চলেছে মাহুঘের এক মুক্ত
জীবনের ধারা। তাদের উল্লাসের সেই বিকট বিকাশ
সহ করা সকল মাহুঘের পক্ষে সম্ভবপর নয়। তার
শিঙনে বইছে আর একটা উল্লাসের স্রোত। সেটা হোল
পথের গায়ে, হোটেল, দুধ, মিঠাই এবং বিভিন্ন
দোকানের সম্মিলিত জনতা, অল্পত অল্পপ্রকাশের
ধারা। তারও শিঙনে ঢাক ঢোল বাড়িয়ে, সুদূর পায়ে
মেড়ে বিভিন্ন বিজ্ঞাপনের আর এক বিরক্তিকর উৎকট
বিকাশ জ্বলি। তারপর আছে, গরু আর মাহুঘে রাজ-
পথে অব্যাহত বণ, অকুট উত্তেজনাপূর্ণ আক্ষালন। এই
স্রোতের ধারায় সীমবস্তার কোনও স্থান নেই; অত-
কাহের কোনও প্রয়োজন নেই, অল্পত সুর সযত্নে কোনও
চেতনা বোধ নেই। পৃথিবীর সর্বত্র পাশাপাশি করে
চলেছে জীবনের এই দ্বিষ্ট ধারা। এরা মূলতঃ এক;
বাহ্যেতঃ ভিন্ন।

ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হোত; অন্ধকার আরও
নিবিড় হোত। বাতাসের স্পর্শে কেগে উঠতো, স্বতী-
ভেদ শীতলতা, অরণ্যের প্রশান্তিতে নেনে আসতো,
একটা অশ্লষ্ট ব্যাকুলতা। আমরা উঠে পীড়াতুন;
এবার আমাদের ঘরে প্রবেশ করতে হবে। অন্ধকারের
অন্তরীক্ষে আগে উঠেছে এক বিরাট অন্তরময় আত্মা।
তারই আত্মানে বীষে বীষে কেগে উঠেছে মুখ্য প্রকৃতি।
পল্লব মর্ষের অল্পত সুরের তারা করছে বাণী বিনিময়;
বাতাসের মল বেগে তারা করছে প্রাণ বিনিময়।
আকাশ তার সম্ভবমান বেগলোকের গহীরতার স্পর্শ
করতে চাইছে গলার লীলায়িত চন্দ্র-মাধুর্যের ধারা।
তার আত্মল আত্মনিবেদনে গলা আত্মহারা। ওদিকে
পূর্বভরাঙ্গি ব্যাকুল হয়ে উঠেছে অরণ্যমীর ব্যাঘ্র আলি-
ঙ্গনে বরা বেবার জন্ত। না আর নয়; প্রকৃতির এই
নিশীথ লীলায়নে আমাদের আর স্থান নেই। আমরা
ঘরে গিয়ে সুরের পতঙ্গন।

বেদিন কোনও সুরের জায়গার বেঙাতে বাবন
আমাদের ঠিক হতো; তার আগের দিনটা বাড়ীতে
থেকে আমরা দেখেই সম্পূর্ণ বিশ্রাম নিতাম। সন্ধ্যার পর
বাড়ির পাট সেরে গিয়ে চাদে বসে থাকতাম। তখনই
বেগছি, প্রকৃতির সেই অসংখ্য লীলা বৈচিত্র। সমস্ত
আত্মার উপলব্ধি করেছি, আমাধের মত, তাৎকালিক
যৌন প্রাণলোকে, এমাতারে বৈরাগ্য ও ব্যাকুলতার
বস্তুস্বত্ব ব্যঙ্গনা।

আমাধের কুটীরের অনতিদূরে, বিড়লা ঘাটের তীরে
তোলানন্দ গিরি আশ্রম। এই প্রতিষ্ঠানের ধর্মশালাগুলি
প্রাণী বাসালীর পরম নির্ভয়বাগ্য আবাসস্থল।
যদিও বর্তমানে প্রাণঃ ধর্মশালাই, লম্বাবী শিখিরে
পরিণত হয়েছে। তোলানন্দ গিরির অধিকাংশ নিবৃত্তি
বাহালী। সন্ন্যাসীদের মধ্যেও দেখলাম অনেক বাজালী।
এখনকার বাঁধলতা, স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি, তিনিও
বল সম্ভব। এর থেকে প্রমাণিত হয় এই যে, গীতার
ঐক্যলত উপদেশ, কিতু লম্বা বাজালীর জীবনে

কাপকরী ধোচ্ছে। কেননা গীতার প্রকৃত উপদেশ নিহিত রয়েছে কর্মযোগের মধ্যে। সে সাধনার পদম সিদ্ধ পুরুষ রূপে আশ্রয় পেতে পাই, স্থানী বিবেকানন্দকে, বেশবন্ধু চিত্তঞ্জনকে, (অবাসানী মহাত্মা গান্ধীকে) নেতাকী জ্ঞাতবজ্রকে। তাঁরা কর্মবীর হয়েও শ্রেষ্ঠ সন্ন্যাসী। ভোলানাথ গিরি আশ্রমের নিষ্ঠাবাদ প্রকৃত কর্মযোগী। জনকল্যায়ের নিমিত্ত বেশ মেপাতের, তাঁরা বহু কাজ করেছেন।

আশ্রমে ঘটে দুর্ঘ্যা পূজা হয়। শাহনীর মহাষ্টমীর দিন এঁরা সন্ধ্যায় স্থানীর সমস্ত বাঙ্গালী অধিবাসীকে নিমন্ত্রণ করে ভূমিতোড়ে আয়োজিত করেন। তারপর চোরাচালিকা বাঙ্গালী মেয়েকে কুমারী পূজা করে, তাদের শাঙী মিষ্টান্ন প্রদান করেন।

আশ্রমের চতুর্দিকে বাগান। এট সফল বাগানে নানাবিধ ফল ভরিতরকারি প্রকৃতি উৎপন্ন হয়। সন্ন্যাসীদের নিজ হাতে উক্ত বাগান সবুজে পরিচালনা করেন। আশ্রম বাড়ীটির ছুঁচু মূল আছে। প্রথমটী মন্দির আর ভিতরের অংশ আছে, সন্ন্যাসীদের বিশ্রামাগার, অতিথি শালা, সাধনা মন্দির, বস্ত্রশালা, ইত্যাদি—শিরানে বহু বিকৃত জমিতে তৈরী হচ্ছে, এখন বিরাট বিরাট সব অতিথি শালা। এতদিন তাঁদের বিশিষ্ট অভিনীত এসে ধর্মশালার থাকতেন। কিন্তু এখন ধর্মশালাতে আশ্রমপ্রাঙ্গণীরা বাস করার দক্ষতা তাঁরা নতুন করে শিখাচ্ছেন এই বড় বড় অতিথিশালা গুলি।

আশ্রমের মন্দিরটিতে তিনটি প্রকারের আছে। প্রথমটিতে স্থানী ভোলানাথ গিরি মহাত্মাজের যেতঃপ্রসন্ন রম্য মূর্তি স্থাপিত আছে। দ্বিতীয়টিতে একটা স্তম্ভের উপর ভোপানির্মিত পদ্মপুষ্পের মধ্যে, নিখিলম স্থাপিত শেষেরটিতে তরুণ সন্ন্যাসী, ত্যাক্ততীরের বৃদ্ধ আত্মা, ভগবান শঙ্করাচার্যের দুর্ভাবল রম্য মূর্তি প্রতিষ্ঠিত। তৎসংলগ্ন অপর একটি ছোট মন্দিরে মহাবীর হনুমানের মূর্তি স্থাপিত আছে। তারতম্য একটা আকর্ষণ শিকার।

এখানে মানুষ একযোগে পূজা করে নিরাকার ঈশ্বরের কৃষ্ণরূপকে, মানুষের মনকে, ও পুণ্ডরীককে। ভোলানাথ গিরি আশ্রমের মন্দির এই ত্রিশক্তি পূজার্থের মধ্য সমন্বয় স্থল।

প্রত্যাহ সন্ধ্যাকালে এই সকল মন্দিরে একসঙ্গে পূজা, আরতি, অঙ্গলি, বেদমন্ত্র পাঠ; এবং মন্দির প্রাঙ্গণেতে ছোত্র পাঠ নিরব্রত ভাবে হয়ে থাকে। পূজা পাঠ সমাপনান্তে, সন্ন্যাসীরা মন্দিরের অর্ঘ্য রোহণের পর দালানে উপবেশন করে বহুক্ষণ ধরে ধ্যান গুণ ইত্যাদি করে থাকেন। তাঁদের সেই উল্লাস ভর্যর বহুধর থেকে ধোনা যায়। যে সকল মানুষ অত্যন্ত বিশ্বাসী, ভোগ জ্বরের আকাঙ্ক্ষার, বাসের আকর্ষণ নিরাকৃত, সেই সকল মানুষ যদি সুস্থের ভক্ত এইখানে এসে উপস্থিত হয়, তাহলে তাদেরও মনের পরিমার্জন অতি অল্পমুহূর্তে ঘটে। মনে প্রশ্রয় আগবে, এই মহা নির্জন বনস্থানে, এই সকল সন্ন্যাসীরা, একিলের ভগ্নতা করছে। কার ভক্ত করছে? আনিই বা জীবনে কি করেছে? কেন বৈরে আর্হি? ইত্যাদি।

আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থেকেছি সেই মন্দির ঘরে। বাড়ী ফিরে আসতে মন চাইতোনা—আশ্রম প্রাঙ্গণের বড় শেকালিকা, সুগন্ধ ছড়িয়ে বসন্তো, রাত, হয়েচে বাড়ী বাত; নেহু মুলের গৌরভও থাকতো সেই বার্তা, কিন্তু আমরা বাই কেমন করে? মন বলতে, আর একটু পাকো; একটু পরে চাঁদ উঠবে দুই গুই মহা মনের মাঝার। তার ছোত্রা ছড়িয়ে পড়বে আশ্রমের এই সুস্বাদু আর কলসের বাগানে। বৃদ্ধ ভূষণের মত বকমকির উঠবে মন্দিরের সুউজ্জ্বল ছাদ। দলার জলে আগবে ভগ্নশালা চেষ্ট। দেখবেনা প্রকৃতির সেই বনভূসানো রূপ?

এমন সবর তালুদী বললেন, মেরনের দিকে চেষ্টে, "ভাষা পাণ্ডীকে কলকাতার রেবে এলে বেশ হোত; তাহলে আমাদের ঘরে ফেরার কোনও ভাড়া থাকতোনা।"

আবার মনের কথাটা ঠিক কর্তে অল্পশ্রুতি হয়ে উঠতে শুনে মনে মনে খুশী হয়ে উঠে লাড়াই। যেহেতু কিত এতে যেটেই খুশী হয় না। আশাধের নানারকমে যোক্তান্তে চোঁকা করে যে, তাৎপের না দেখে, আশা না কি একদিনও থাকতে পারি না ইত্যাদি—দূর থেকে বয়ের প্রতি হাতছানি দিয়ে ডাকে—আমরাত পথে নেমে পড়ি।

সকাল বেলা মাঝে মাঝে হৃদয় পাগড়ী আশ্রমে বেড়াতে আসতো। তারা আসলে যেতো বিভলা ঘাটের থেকে পাগর সংগ্রহ করতে। সন্ধ্যায় তখন ওদের ডেকে আবার করে দিগন্তে প্রসাধ, মূল ইত্যাদি বাগানে মিঠে গিয়ে গানের থেকে পেতে দিগন্তে ফল, গল্প করতেন নানারকম। তাদের হাত ভর্তি পাগর বেধে, খুশী হয়ে নানা রকম মন্তব্য করতেন। সূর্য অস্তিত্বের আনন্দ বিধানের জন্ত নিজে মনের আনন্দ ব্যত করতেন অকরণ হস্তে। আমি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করে দেখি, প্রত্যেকটি বড় মাছের মতো একটি করে আদর্শ কালের দিক মন লুকিয়ে থাকে; শিশু দেখলেই তার গোপনতার সকল আবরণ খসে গিয়ে আনন্দের সঙ্গে তাদের সঙ্গে এক হয়ে মিশে যায়।

নীলধারা

ভোলাদেব গিরি আশ্রমে দুই হাত দিয়ে দুইটা পথ আছে। একটা সোপা চলে গেছে টেশনের উপর দিয়ে মাঠপুরী রোডের দিকে; অপরটা পেড়ে গঙ্গার ধার দিয়ে বহু বন জঙ্গল, অপরিসর্য বস্ত্র পেরিয়ে সোজা নীলধারার প্রান্তে। প্রকৃতুও বাটার অনতিদূর হতে গঙ্গার যে শাখাটা দক্ষিণে নীলপর্বতের পথ খোঁজ করে, নির্ভর বনপ্রাঙ্গণ আবেশী ভেস করে সোজা করে গেছে, তার নাম নীলধারা। নীলধারা আর গঙ্গার সমন্বয় থেকে একটি গাল কাটা হয়েছে। উক্ত গালটিকে প্রবেশ একটি ছোট নদী বলা চলে। নীলধারার অনতিদূরে Anal Division এর Executive Engineer এর বাসগোলা। এই বাসগোলাকে একটি হৃদয় বসবাস বলা

চলে। কেননা, এর তিনদিকে জল আর মাঝখানে তখনটা একটা সাগরবীণের মত শোভমান। এর একদিকে গঙ্গা, অপর দিকে গাল। আর অদূরে প্রাচীনতা নীলধারার নীল অলরাশি। যেদিকে তাকাও শুধু জল, আর জল। খালের উপর সেতু নির্মাণ করে যেখানে যেখানে জলকে বাধা হয়েছে, সেখানে তার সে কী রক্ত রক্ত? কী ভয়ঙ্কর গর্জন? কী ভয়াল আন্দোলন? বাধা প্রাপ্ত জল রাশি বিপুল বিক্রমে, জল কেন্দ্রে আবর্তিত হয়ে কীপিরে পড়ছে বাধার অপর দিকে। এখানে পলকে প্রায় ঘটে বেজে পারে, বহি অতি বড় সীতার ও এই মুখে পলকের জন্ত অবতরণ করে। আবার এখানে বিশ্বকবির কথার বলা যায় “স্বভাৱেই প্রাণ হয়ে পলকে পলকে—” কেননা, প্রতি পলকে এখানে জল নিজে গতিবেগের বিচিত্র ধ্বনি। তার গতিপথে বাধা প্রধান করে কে? সেই বাধাজনিত গতিবেগ হোলের অর্ধই হোল স্তূপ—বাধার দাধাপ্রান্ত জলরাশি, দূরার শক্তিতে সেই স্তূপকে প্রাণময় করে তুলেছে, প্রতি পলকের প্রচণ্ড আবর্তনে। প্রকৃতির সেই অতীতপূর্ব নীল ধরে মনে হোল, অস্বাভাবিক কোনও শক্তিকে বাহ্যিক শক্তিদ্বারা কেউ কখনও পরাজিত করতে পারে না। তার প্রকাশ স্বভাবতঃ। তাইই সাক্ষ্যের বিকাশ আমরা দেখতে পাই ভ্যাকুয়ামের স্থলীর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে। একথাও অবিসম্বাদী সত্য, যে একলা এমন দিন আসবে, যেদিন এই সত্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ, আধ্যাত্মিক তারতম্য সমগ্র পৃথিবীর নেতৃত্ব কোরেবে। কেননা সত্য প্রত্যেক মানুষের অন্তরে কাজ করে; আর কর্মসূচী কাজ করে প্রকাশে। সত্য করে সর্বদায় মতো প্রাণের সঙ্গে সত্য ও ক্ষেত্রের সম্মিলন; আর কর্মসূচী, মাছের জ্বরকে বোহাগ করে রাখে অহংকারের অজান আধারে, ও সোভের বুদ্ধিবার অস্বপ্নে। কাজেই মাছের মন থেকে আকাঙ্ক্ষার অগ্নিশিখা দিগ্বিদিক না হলে, তার বৈশিষ্ট্য সঙ্গ্রহ বস্তুর জগৎ অবতরণী।—বর্তমানে পৃথিবীর সকল

সজ্জাগী রাষ্ট্রতলি, এই জ্বালের মধ্যে দিয়েই স্বর্গের
মুন্ডন সজ্জাগীর বস্ম দেখেছে,—যে বস্ম একদিন দেখেছিল
ইটালীর “সিনোর সুসোলিনী, আনানীর” “হের
হিটলাং,” জাপানের হাই কম্যান্ডার “ভোজো”। যদিও
জানি এ সকল স্মৃতি অত্যন্ত বেদনাকারক; তথাপি
একথা জোরবার নয় যে এই সকল রাষ্ট্র কখনও গর্বে
অন্ধ হয়ে ভুল পথে পরিচালিত হয়েছিল।

তাই আজ মনে হয়, একমাত্র ভারতবর্ষই সেই দেশ,
দেশে তার বিশুল আধ্যাত্মিক সজ্জিতে তুচ্ছ করেছে
বিশ্বদৌ সাত্ত্বিকাবাদীদের চিত্ত শু চরিত্র। অশেষ প্রকার
দুঃখ ও লাঞ্ছনা বরণের মধ্যে দিয়ে ভারতবর্ষ তার
অধ্যাত্মবাদের মরনের পক্ষে করেছে অতিক্রমণ। আজ
সে অস্তিত্ব। আজ সমস্ত পৃথিবী তার নীতির পানে
উৎসুক ভাবে দৃষ্টিপাত করে আছে। ভারতবর্ষের
সজ্জিতে, রবীন্দ্রনাথের সাধনার পুস্তকীশে, বিশ্বাস্তিবাদী
সম্মেলন অঙ্গীকৃত হওয়ার এই সত্য বিশ্বের বহুবারে সর্ব
সম্মতিক্রমে শ্রেষ্ঠ বলে গ্রহণিত হয়ে গেছে।

একমাত্র ভারতবর্ষই কবিত্বের ভাষায়, গভীর প্রেমে
উন্নত কণ্ঠে সকলকে ডাক দিয়ে বলতে পারে
‘তবুও সব্যারে, হবে মিলিবারে, আনত সিরে’;

এই ভারতের, মহানবাবের, সাগর ভীরে।”

ইন্ডিয়াটার সাহেবের বাংলার অধূরে ধীরে নির্জন সেতুর
উপর দাঁড়িয়ে ভারতবর্ষের এক গৌরবময় যুগের চিত্র
আমার মানসকে তেলে উঠল। সেদিন হরত এ
পৃথিবীতে আমি নাও থাকতে পারি; তথাপি আমার
প্রিয়জনদের মধ্যে প্রেমরূপে আমি সেদিনও অলক্ষ্যে
থাকবো এই পৃথিবীতে।

খালের সেতু পার হবে-আমরা নীলবারার সেতুয়।
বাংলার বাইরে এসে বোকা গেল যে আনরা গজার
জপারে চলে গেছি। অর্থাৎ একদিকে গজা, অপর
দিকে নীলবারা, তার বহুস্থলের অরণ্যায় তুণ্ডে আমরা
দাঁড়িয়ে আছি। চতুর্দিকে গভীর জঙ্গল ছাড়া
কোনও বস্তু দৃষ্টি গোচর হয় না। কোথাও একটা

জনমানবের আর চিহ্ন মাত্র নেই। এদিকের
পথ বাট আমরা কিছুই চিনি না। ক্রমে
অন্ধকার গাঢ় হতে লাগল; আমরা এখন কোনদিকে
যাবো? এ অবস্থায় যে পথে এগেজিস্ট্রুম সেই পথেই
কিধে বাওয়া সমীচিন বলে মনে হোল। দরকার নেই
আর নীলবারা বেধে। কিন্তু দেরার পথেও বিপদ
কুসুমুদীর নত খাখা পেতে আছে। কেন না গজা পার
হওয়ার সেতুটি, যেমন অল্প সব সেতু হয়ে থাকে, সেই
রকম সজ্জা বস্তুত ও চারিদিকে ঘেরা। কিন্তু খালের
সেতুটির নির্ধারণকার এখনও শেষ হয় নি; তাই সেখানে
জনসাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ। এই দুইরকম অলস্রোতের
উপর কীক কীক করে বাজ করেকটী ফংক্রীটের টালি
বসানো আছে। পা দিলেই টালিগুলি নড়ে ওঠে; আর
নীচের অলস্রাপির দিকে তোখ লড়ে গেলেই মাথা বন বন
করে ঘুরে ওঠে। ভারতের সেতুর পানে যেখানে রেলিং
গাঁথা থাকে, সেখানে বহুপুস্তকা হায্যকার করছে। মাত্র
একটী করে দুইদিকে দুইটী মোহার সজ্জা দিক এদিক
ওদিক করে গাঁথা। যদি হঠাৎ কারো মাথা ঘুরে কিংবা
পা পিছলে যায়, তাহলে বহুতের মধ্যে সেই ভয়ঙ্কর অল-
স্রোত কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তার কোনও স্থিরতা
নেই। এ হেন বিপদলঙ্ঘন পথে, অন্ধকারের মধ্যে অতি
হরত বেয়েছুটীকে নিয়ে পাখাপার হতে তালুতী কিছুতে
রাজী হলেন না। তিনি চললেন “নীলবারার বাতায়নের
পথ আছেই। সাধারণ লোক ত আর বাংলার মধ্যে
দিয়ে বাতায়নত করে না? তারা যে পথে বাতায়নত
করে, বুজলে হরত সে পথ পাওয়া যাবে”—

আমরাও মনে হোল, এই সুক্তিই ভালো। এই
জুবাগে বনায়নের বহু পথের সঙ্গে মিতালী হটে
যাবে। সাধ করে কে আর বনজঙ্গল দেখতে বেহোর?
কিন্তু জুবাগে যদি পাওয়া গেছে তবে সেটি গ্রহণ না করা
মোটাই উচিত হবেনা—অসম্ভব। আমরা গভীর বনের
মধ্যে পথ বুজলে বুজলে অসম্ভব হতে লাগল।

বনের একটা নিম্নস্বরপ আছে; একটি নিম্নস্বর তাই।

আছে; একটা নিজ মণ্ডিবেল আছে। হিংস্র জীবজন্তুর
বালবান বলে, এর সমস্ত কিছুই হিংস্র ভাঙ্গা ও
ফুটান নয়। বরং এর অন্তরে ও বাহিরে এমন
একটা প্রচণ্ড শক্তি স্তম্ভহস্ত রয়েছে যার প্রভাবে
তার গাছীর্ণ হয়ে উঠেছে, অতীব মনোহর। বনের
বেদিকে বহুদূর খুশী দৃষ্টি প্রেরণ কর, দেখবে, শুধু
নিবিড় গহন বন আর কত কি যে বিরাট বিরাট সব
মজার তার কাউকেই আমরা চিনি না। শুধু শাল
বহুটা আর পলাশ বৃক্ষকে আমরা চিনতে পারি। শাল
মজারী জীর্ণ গড়ে বনপথ আবাদিত হয়ে উঠেছে।
গানের তলার করকে করকে করে পড়ে রয়েছে বহুগুণে
তরু, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাল মজারী। আমাদের সাড়া পেয়ে
কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বন্য পাহী, চকিত হয়ে দাঁড়িয়ে শাখা-
তরালে ইতঃতত জ্ঞপন করতে লাগল। কাঠবিড়ানী
আর বেকী, দুই ছেলের মত জঙ্গলের মধ্যে থেকে দূর
বাড়িয়ে আবার ছুটে পালায়। বাতাসের বেগে,
তুকনো করা পাতা সরসর করে ওঠে, আমরা চকিত
হয়ে উঠি; ওই যুঝি কে আসে? কিন্তু কেউ নয়;
বাতাস হা হা করে হেলে চলে যায়। দূরে অরণ্য
নিখরে চার উঠেছে বেশ বোঝা যাচ্ছে; কেননা,
অন্ধকারাচ্ছন্ন বনপথ জ্ঞপন হয়ে উঠতে লাগল, রূপালী
আলোময়। বনের অন্ধারলে যে এত বায়ু আছে তা
কে জানতো? কোথায় গেল আমাদের মনের তার ও
আতঙ্ক? মনে এত আনন্দ, কঠে এত গান, গতিবেগ
এত ক্রান্ততা এল কোথা হতে? এতকণে বুঝতে
পারি, পণ তার মোহিনী বাগ্মীর আবাদের করেচে
রোহিত্য। তাইই মোহন ইন্দ্রিতে অজানা পথের
লক্ষ্যে আমরা নির্ভয়ে অগ্রসর হয়ে চলেছি। কিন্তু এ
পথের শেষ কোথায়? বন মহাউল্লাসে গান গেয়ে
ওঠে—

“পথের শেষ কোথায়, শেষ কোথায়, কি আছে শেষে

—এত তাহনা, কোথায় বেশে?

পথের, কি আছে শেষে?”

এমন সময় ঈশ্বরের আশীর্বাণের মত, পথের দেবতা,
এক কাঠবিড়ানো বেশে, আমাদের সম্মুখে দেখা দিলেন।
আমরা দেখেই সেই গহন বনের মধ্যে থেকে একটা
কাঠবিড়ানো মাথার কাঠের খোকা নিয়ে এদিকে আসছে।
সে আমাদের নিকটবর্তী হলে শ্রীকৃষ্ণ তারুতী তাকে
জিগোস করলেন পথের শেষ কোথায়? সে বললে,
“এই বনের বিস্তার বহুদূর পর্যন্ত। কিন্তু এর বাইরে
গেলেই দেখা যাবে, জলভাগের দ্বিগিরে গঙ্গার নীল-
ধারা প্রবাহিত। উঁচু পাহাড়, এবং বনের গভীরতার
অন্ধ এখানে থেকে কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছেনা। নীল-
ধারার পার ধরে দক্ষিণে কিছুদূর অগ্রসর হলেই,
খালের সেতু পার হয়ে কনকল রোড পাওয়া যাবে।”

আমরা কাঠবিড়ানকে প্রোত্তের বক্তব্য জানি।
সে হেসে বললে, “এখানে কোনও জয় নেই। তবে
নীলধারার ওপারে, নীল পর্বতের পঙ্ক্তিতে, চতু-
পাহাড়ে অনেক হিংস্র জন্তু আছে। সেইজন্য এই পথে
লোক বাতায়াত এত কম। চতু পাহাড় কিংবা নীল
পর্বতে, বন্য কোনও যোগ বা বেলা অভূতি বলে,
তখন এ পারের লোক একসঙ্গে দলবেঁধে হৈ হৈ করতে
করতে এই সকল পথ অতিক্রম করে ওপারে যায়।
নচেৎ এ পথ এই রকম জনশূন্য থাকে। চতু পাহা-
ড়ের চতু রক্ষির বিখ্যাত। এবং সেখানে হিংস্র পশুকে
উপেক্ষা করে দু একজন সিদ্ধ লম্বাঙ্গীর অবস্থান আছে
বলে শোনা যায়।”

কাঠবিড়ানো আমাদের বনের বাইরে যাবার পথ
দেখিয়ে দিলে প্রস্থান করলো। মনে লালস নিয়ে
আমরা নীলধারার দিকে অগ্রসর হলাম। তীরভূমি হতে
জলধারা অতি নিয়ে প্রবাহমান। তবে জলের রং এমন
কিছু বন নীলবর্ণ নয়। তবে নীলের অস্বচ্ছ আছে।
স্বচ্ছ জলের তরঙ্গভঙ্গে, নীলধারা আচলের হুম্মারিত
ধোলন আছে। সুদৃঢ় হবার মত রূপ বটে। নদী এখানে
গঙ্গার থেকে অনেক বেশী চওড়া।

দূরে বহুদূরে নীলধারা দেখানে দিয়ে গঙ্গার সঙ্গে

মিগেতে, আকাশ সেখানে পিটার মত উদার বাতসল্যে
নত হয়ে তাবের স্পর্শ করে আনন্দে সেই সজীবন।
এদিকে পূর্বদিকে মীল পর্বতের নিখর বেলে উঠেছে
চাঁদ। মীলের তল, তার জ্যোৎস্নার কাপড়ে রূপার
পাতের মত। জ্যোৎস্নার এমন তীক্ষ্ণ ঐশ্বর্য আমি
ইতিপূর্বে আর কোথাও দেখিনি। ঠিক দিনের আলোর
মত স্পষ্ট তাবে সমস্ত বস্তু দেখা যাচ্ছে। মীলের ভট-
কুমিতে এত স্থলর স্থলর পাথর আছে, যে কোনটা
ঠেপে কোনটা নেথো, সেটা ঠিক করতে মাথা
ব্যুরে যায়।

ছায়া পাগড়ী মহাউজ্জ্বলে কোঁচড় করে পাথর সংগ্রহ
করছিল; আর আবার মীলের মাঝর অন্তর আঘিট
হতে গিরেছিলুম। কে বলে মাগের বিব মীল ?
তাইলে লম্বা নহিত বিব কর্তে বাঁধন করে বিব অত
স্বন্দর বর্ণ পেলেন কোথায় থেকে ? পৃথিবীর বত কিছু
কুৎসিত অমলজনক বস্তু তাবের কোনও রূপ নেই, বর্ণ
নেই—ভায়া জলহীন। কাজেই শিবের কোনও রং
নেই। রূপ নেই—বিব সূত্রার মত অসুস্থমান জীবন বস্তু।
এমন সময় পিটারের শালের বন থেকে, কি একটা অস্থ
কর্তন হয়ে ডেকে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে দিকট ঘুরে ডেকে
উঠল, কয়েকটি পাঁচ। খুব সম্ভব বাজুড় হবে; তাবের
চিবকারে চকিত হয়ে জানা ভটপট করে, বুঝায়রে
ডেকে গেল। মীলবারার ওপারের জনপদে হুজুরা করে
চিবকার করে উঠল, বলবৎ শিবারা।

আমরা চকিত হয়ে উঠলুম। নাঃ, আর এখানে
খাকা ঠিক নয়। এরা আমাদের সতর্ক করে
ছিল। এ সতর্কতা উপেক্ষা করলে, বনচারীদের নিকট
হতে শান্তিজনক অনিত শান্তি আমাদের অবশ্য গ্রহণ
করতে হবে। আমরা উঠে পড়লুম। বহু চক্সালোকে
আমাদের পথ চলতে কোনও কষ্ট হচ্ছিল না। কাঁঠু-
রিয়ার নির্দেশিত পথে, মীলের ভটকুমি ঘুরে বাসিকটা
অগ্রসর হয়ে, একটা সরু পথে চলা পথ আমরা দেখতে
পেলুম। মীলবারাকে পিছনে রেখে, আমরা সেই পথ
ঘুরে চলতে লাগলুম। এই পথটা যেমন অন্ধকার, তেমন

অসমতল পার্বত্য বহুতর, তেমন আবার সজীব, কাঁটা
বোপ জনপদে পূর্ণ। আমরা অনেক দূর থেকে দেখতে
পাচ্ছিলাম, আমাদের সম্মুখের পথের উপর একটা কালো
মত কি গাড়িরে আছে—ভেবেছিলাম হয়ত সেটা, বড়
কোনও আগাছার বাড় হবে। কিন্তু আমরা নিকটবর্তী
হতেই মূর্তিমান কৃষ্ণবীট এক প্রকাণ্ড লাক যেতে
জলসের যথো চুকে গেল। খুব সম্ভব জলটা বড় জাতীর
তরুণের বাড়। হয়ত বাচ্ছিল মীলবারার অলপন
করতে।

এর পর পথ চলতে সত্যিই আমাদের গা ছমছম
করতে লাগল। অতি ক্রমত যে পথ অতিক্রম করতো
ভারও উপায় নেই। কেননা, দুটি বনের হাত আমরা
জুজনে ঘুরে আছি। এই সজীব পথে দুইজন পাশাপাশি
চলা অসম্ভব—ভারপর একটু ক্রম হাঁটলেই, পায়ে
পায়ে লাগে পাথরের সংঘর্ষ। শুধুও আমরা একজোকার
চুটে সেই বনপথ পার হতে লাগলুম। একদমত অধুনে
সেখা গেল, বৃদ্ধ সুলেহে করেবটী আলো। তাহুটী
বললেন, এখানে নিশ্চয় থাকে সেতু আছে। ও
আলোভুলি সেতুর প্রাণীপ শিখা। সত্যিই তাই; কিছু-
কালের মধ্যেই আমরা সেই ভরতর বনপথ অতিক্রম করে
থাকের সেতুর সামনে এসে উপস্থিত হলুম। এখানে
সেতুটা বেশ মজবুত। বহিষ্ঠ পাশে ঝিলের রেলিং,
তথ্যপি পারের নীচে নক্ত কাঠের পাঠাভন। সেতুর
এপারে এসে বেশ বোকা গেল, এখানে মজুত সন্ধানক
আছে। এবং মনেও কিরে এল সহজ ভাব। এর
খানিকটা পথ অগ্রসর হয়ে যুক্ততে পারলুম, নিকটেই
গম্বার সেতু এবং কনবল রোড। এদব পথ আমাদের
পরিচিত। কাজেই আবার আমাদের নক্ত পথ চলতে
লাগলুম। কিন্তু একটু বিশ্রামের প্রয়োজন—পা বেন
আর চলতে না।

এইখানে গম্বার সেতুর ঝিলটি তাহী স্থলর।
বিশ্রামের জন্য অনেক স্থলর স্থলর খোঁজী জেই আছে।
অথচ গম্বার পতনেরও কোন সন্ধান নেই।

(কমপঃ)

ভাষ্ক

ঐবেদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

ভিত্তি বোর্ডের বাধানো পাকা সড়ক একে বেকে কোঁড়ে গেছে জুড়খাটা থেকে মাদারীপুর পর্যন্ত। মূল-গ্রামের হাটখোলার বুক চিরে একটা এগুতো খেবকো নেটে রাখা এসে বিশেষে তার সংগে। এই সংগমস্থলে এসে হঠাৎ কি মনে ক'রে গমকে হাঁড়ালো ললিত। পেছনে আসছিল সুগুণো বাড়ীর রাঙা-বৌ আর তার স্ত্রীর পরীক্ষা দেওয়া ছেলে বিশল, তারাও খামলো।

হাছ কি কিছু ফলে এসেছে নাকি?—আকস্মিক ঘেনে বাওরার কারণ অসুস্থকান করে বিশল।

বিশলের সংগে ললিতের সম্পর্কটা দাছ—নাতির নয়, গ্রাম সুবাদে আঠা-ভাইপোর। ললিতের স্তম্ভগ টাকের চারিমিকে এলোমেলো পাকা চুল, সুগমর খোঁচা খোঁচা আক-পাকা বাড়ি আর অত্যধিক নিষ্ঠ-শ্রিতার ক্ষেত্রে সব ছেলেবেলাই ডাকে দাছ বলে। গ্রাম সম্পর্কের জাঠা ভাই বিশলের দাছ। দাছর মতোই উত্তর গের ললিত, না ভাই চ'।

হাটতে স্কর করে ওরা। হাটতে হাটতে বগ-ভোজির মতো বলে ললিত, কি বে করবে একা হরেন। গাছের সবাইকে ভো এখনও চেনেই না ভালো করে। চিত্রপত্তর কিছু বিলি হবে না এমিকের রাগে।

কিন্তু কিই বা করবে ললিত। সকাল বেলা দু হুঠো বুদ্ধি চিনিয়ে পোষ্ট অফিসে বেকবার ক্ষেত্রে ভৈরী হজিল সে। ঠিক সেই আগের মতো—আজ থেকে গ্রাম বিশ বহর আগে—যেমন ছাটাটা বগল দাছ করে উঠানে পা বাড়িয়েছে, অমনি বাড়ীর বশ আনা গরিক উত্তরের বর থেকে কারার রোল উঠলো। ললিত গিরে জিপোল করলো রাঙা-বৌর শাওজীকে, কি হয়েছে চন্দরের মা, এত গোম্‌গোল কিসের? ললিতকে বেখে বুদ্ধা হাউ-হাউ ক'রে কঁদে উঠলেন। বললেন, চন্দরের বড় ছেলে পাগে-এ তার মামাদের কাছে থেকে লোখাড।

করে ভাঙে: জােনাই। আজ সকালে খবর এসেছে তার বড় অস্থখ। ঐ বেশ রাঙা-বৌ কি কারাটাই কাবছে। ওকে বদি ছুনি গিরে মাদারীপুর ইটিনারে ফুলে দাঙ ভো—। ললিত রাঙী হ'রে গেল। একবার মনে হয়েছিল পোষ্ট অফিসের কথা, কিন্তু এ কাকটা অক্ষরী। ছেলের অস্থখ:

কেমন যেন হ'রে বার ললিত। বিজুতির সুখানা মনে পড়ে বার তার। বাপ-মাকে ছেড়ে কলকাতা সহরে আছে সে। কেমন আছে, কে জানে। অনেক আশা নিয়ে বিজুতিকে রাখা করছে ললিত। এই ছেলে তার হুং খোচাবে, বংশের' বাবাকে সযত্নে রাখা করবে।

ভাবতে ভাবতে রাঙা-বৌয়ের গুং বড় বেশী ক'রে বাখলো ললিতের বুক। রাঙা-বৌয়ের ছেলের আরগার বিজুতিকে করনা করে বুকুর ভেতরটা মেচড খেরে ওঠে তার। রাঙা-বৌর সাথে একটা একাখুতা বোধ করে সে। ভাই না এসে থাকতে পারেনি ললিত।

রাঙা-বৌয়ের টিনের স্তুটবেনটা ডান হাতে সুলিরে নিয়ে চলছে ললিত। জামা কাপড আর টুকিটাকিতে বেশ ভারী হ'য়েছে সেটা। যেন একটা ছোটখাটো লোকান। মাকে মাঝে হাত বদল করছে ললিত। অনেকটা পথ হেটে গিরে মাদারীপুর ইটিনার বাট। পথ বড় কবে, ললিতের হাত বদল করার সময়ের ব্যবধান তত কবে।

যন যন হাত বদল করতে দেখে একটু লক্ষিত হয় রাঙাবৌ। বোমটার আড়াল থেকে ছেলেকে লক্ষ্য ক'রে একটা প্রস্তাব করে, বিশল, ওর খুব কষ্ট হ'চ্ছে। ওঁকে বল, লামনের গা থেকে বাস্‌টা নিয়ে দাবার ক্ষেত্রে একটা লোক ঠিক করতে।

না—না, এ আর এমন কি ভারী!

শক্তিতে মুখে একটা স্বাক্ষরের ভাব টেনে আনবার ব্যর্থ
জের ক'রে বলে লগিত। কিন্তু কথার ও মুখের স্পন্দ
টিকে থেকে যায় বস্তু কারাক্ষ। তবু বলে, আর এসেই
তো সেছি। একটা মোক লাগালে কমসে কম একটা
টাকা না নিয়ে ছাড়বে না। তার চেয়ে, একটু খেয়ে
বলে লগিত, যে টাকটা কুলিকে দেবে সেটা; না হর
আমাকেই দিও রাত্তা-বৌ।

কথটা শুনে লক্ষ্যের রাত্তা হ'য়ে গেল রাত্তা বৌ।
এমন একটা কথা শুনে হেবে জানলে সে হর তো লোক
লাগাবার প্রস্তাবই করতো না। কত দুঃখে আশ্রয়
লগিত এমন ভিক্ষার অপমান পাঠে মেখে নিল সে কথা।
তোবে রাত্তা বৌয়ের চোখ জলে ভরে এলো।

বস্তু দুঃখের সংসার লগিতের। পরমা সে যে তাঁর
কীভাবে রোজগার করেনি এমন নয়। কিন্তু সব নিঃশেষ
হ'য়ে গেছে হেসেছে কি, এ, পাশ করাতে। চাকরীর
সন্ধানে কোলকাতা বাবার সময় সর্বশেষ কপটকটি
পর্ষক তুলে দিয়েছে বিতুতির হাতে। স্ত্রী বলেছিল,
সব ভে: ছেলেকে দিয়ে দিলে, এখন চলবে কি করে ?
লগিত বলেছিল, আমরা সেকলে, থাকবো অত পাড়া
গায়ে, আমাদের বাছোক ক'রে চলে বাবে। আর
বিতুতি থাকবে কোলকাতায়, ওর খরচ কতো! কত
বস্তু বড় লোক, সাহেব সুবোধ দেশ ক'লকাতা, সে কি
একটা যা-তা ব্যাপার! বি, এ, পাশ ছেলে বিতুতি
তো আর আমাদের মতো চলে সেখানে থাকতে পারবে
না। পুত্র-সৌরবে লগিত আরো কত কি বলেছিল
সেদিন

আসিখোতা বেবে পা জলে যায়, বলেছিল লগিতের
স্ত্রী, বহর চাল বাড়ন্ত, ব'লে বাজে বগর বগর
করতে।

এদম কপাতেও রাগ করে নি লগিত। আশার
বুক বেঁধে বলেছিল, দুঃখের দিন চিরকাল থাকবে না
বৌ, বিতুতি পরমা রোজগার করলে আমাদের আর
ভাবনা কি।

কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে যেদীদিন চলে না—
দুঃখের দিনের গতি বড় অস্থির। মাকে মাঝে এর ওর
কাছে গিয়ে টাকটা সিকেটা চেয়ে এনেছে লগিত।
যে পেরেছে সে দিয়েছে কেহন পাবার আশা ছেড়ে
দিয়েই। লগিত কিন্তু নিয়েছে বার হিসেবে, প্রতিশ্রুতি
দিয়েছে, বিতুতির চাকরী থাকরী একটা সুভাষা হলেই
বেনা শোধ ক'রে দেবে সে। তখন কেউ মুখ টিপে
হেসেছে, কেউ বলেছে পাগল।

এই পাগলামির অর্থ বেশ ভালো করেই জানে
রাত্তা-বৌ। চোখের জল সঞ্চয় করে বললো, বিমল,
ওকে বল যে, টাকার দরকার থাকলে উনি
যেন তা' নেন। তাই ব'লে বাজটা ওকে বইতে
হবে না।

কথা শোনে না লগিত। সারা পথ বাজটা বহর
নিয়ে গেল সে। মাকে একবার বলেছিল রাত্তার বারের
বাঁধানো বড়লগার।

বাগারীপুর সহরে ঢুকে একটা টিপ-কল থেকে
অগস্ত্যের মতো খানিকটা জল শুঁবে বলে লগিত। তার-
পর টীয়ার খাটে গিয়ে রাত্তা-বৌর কাছ থেকে টাকা
নিয়ে ছু'খানা টিকিট কেটে দিল তাকে। টিকিটের
সঙ্গে কেহন রেজকীগুলো দিয়ে বললো, দাও রাত্তা-বৌ,
যা দেবে দাও। এখুনি আবার ফিরতে হবে।

সংকোচের সংগে দু'টো টাকা লগিতের হাতে
তুলে দিল রাত্তা-বৌ। বিমলকে বললো, ওকে বল
হোটেলের খেঁর নিতে। বাড়ী যেতে দুপুর গড়িরে
যাবে।

সত্যি কিদে পেরেছে লগিতের। টীয়ার-খাটের
গা-বেঁধা একটা পাইল হোটেলের গিরে উঠলো সে।
ভাল, ভরফারী ও মাড়ের বাতী থালার ওপর লগিতের
টেবিলের ওপর এনে রাখলো উড়ে ঠাকুর। হাত দুয়ে
এসে বললো লগিত। সামনে কাতের থালা বেখে
কিষ্টে। বেড়ে গেল যেন। দুখিতের আগ্রহে থালার
হাত দিতে গিয়ে হঠাৎ বেখে গেল লগিত। না, খাওয়া

হবে না। টাকা ছুটো থেকে একটা পরসাত্ত বরচ করা চলবে না। কি আনি কবে এসে পড়ে বিজুতির চাকরীর সুববর। সেদিন সবাইকে অন্ততঃ একটু মিষ্টি-রুখ করতে হবে তো। সামান্য পালা সামনে রেখে উঠে পড়লো ললিত। হোটেলের ঠাকুর কাছে এলো তার।

না ঠাকুর, খাওয়া আর আর হ'ল না, জিজ্ঞাস্য দুটি মেলে খালাসরা ঠাকুরের কাছে অবাবদিহি করে ললিত, পেটে কখন যেন একটা ব্যথা মনে হ'চ্ছে।

বেরিয়ে এলো ললিত। দূর থেকে শুনলো ঠাকুর বলছে, বড় এসেছেন বাসেওয়ারা, হাঁঃ।

পরের দিন। বধ্য সময়ে পোট অফিসে গিয়েই কালকের অতৃপস্থিতির কারণ বিবৃত করতে লাগলো ললিত। পোট-মাস্টার মশাই সব শুনে হেসে বললেন, আহা—ভাতে আর হ'য়েছে কি। আপনি তো আর সরকারের মাইনে খান না।

কথাটা সত্যি। পোট অফিসের সে অবৈতনিক কর্মী। এক কালে পোট-মাস্টার ছিল সে এই পোট-অফিসে। রিটারায় করেছে বহুরাশনেক। এখন ঘরে বলে মাসে মাসে পারসাত্ত টাকা। রিটারায় করলেও পোট অফিসের বাধ্য ছাড়তে পারেনি ললিত। এখন গ্রন্থের পোট-মাস্টার মশাইয়ের সংগে গল্প করতে আসতো। কেনবার পথে পিওন হরেনকে বলতো, আনাদের গভিককার কারো কিছু থাকলে দে না, বাবার সময় দিয়ে বাবো খন। এনি ক'রে আস্তে আস্তে ছ'খানা গ্রাষের চিঠিপত্র বিলির তার খোজার নিজের হাতে নিয়েছে ললিত। এখন পিওনের মত টাইম মাসিক এসে চিঠিপত্র, মনিঅর্ডার ইত্যাদি নিয়ে বেত্রিরে পড়ে, যেন এই তার কাজ।

ললিতের স্ত্রী কতদিন বলেছে, বুড়ো বয়সে কি তোমার ভীষতি হ'য়েছে? ছিলে পোট-মাস্টার, হ'য়েছ ডাক পিওন। লোক বলে কি?

ললিত হেসে বলেছে, আহা লবে কি আর করি

বৌ। বিজুতির চাকরীর খবরটা হাতে হাতে পোট-অফিসে ব'লে পাওয়া, ও টাকা পাঠাবে, আমি পোট-অফিসে ব'লে বুক চুলিয়ে লই ক'রে নেব—পোট-মাস্টার মশাই দেখবে। ঠাা, তারপর আমার ছুটি। বিজুতির টাকার মোতাই তো এখনো বাই। আপন রসিকতার এক গাল হেসে কেলোছে ললিত।

তবু এই একটা কারণই নয়। সরকারী কর্মচারীর মতো ভীষনটাকে কাটিয়ে দিতে চায় ললিত। তাই কালকের অতৃপস্থিতি যেন একটা মন্ত অপরাধ, এমন ভাবে অবাবদিহি করে সে।

কিছু আমার মন্তে কালকের ডাকবিলিটা তো বন্ধ হ'য়েছে ছ' ছুটে গারে। কত লোক আমার পথ চেয়ে ব'সেছিল আনুন তো।—বলে ললিত।

ঠাা: আপনার যেমন কথা, তাক্সিলের ভাব প্রকাশ ক'রে বলেন পোট-মাস্টার মশাই, লগা দিনে আসে তো ভারী এগারো খানা চিঠি আর কালে-মন্তে একটা মানি-অর্ডার, তার আবার—ঐ তো পড়ে আছে আপনার এলাকার খান তিনেক চিঠি, আর একটা মানিঅর্ডার। ব'লে টেবিলের এক কোণে অতুল নির্দেশ করেন তিনি।

সেগুলো নিয়ে বেরিয়ে পড়ে ললিত।

খান ক্ষেতের আলপথ দিয়ে লগতে লগতে দূরে কে একজন কাছে দেখে একটু দ্রুত পা চালায় সে। কে, কিছু হাজরা না?

বিজু, ও মিছু।

ললিতের ডাক শুনে ঠাডার মৃত্যুজয়। একখানা খান হাতে দিয়ে বলে ললিত, তোমার চিঠি।

চিঠিখানা দিয়েই চলে বাচ্ছিল ললিত, মৃত্যুজয়ের ডাকে পিছু ফিরলো একবার। বললো, কি হ'ল?

খাবের সুখ ছিড়ে চিঠিখানা বার ক'রে ললিতের দিকে এগিয়ে গিল মৃত্যুজয়। বললো, পড়ে দিবে বাও, ঠা-ঠাকুর। আমি কি পড়তে আনি?

চিঠিখানা হাতেও নিল না ললিত। একটু রুগের

ভাব প্রকাশ কর'য়ে বললো, কতদিন বলেছি না যে, বুড়ো হ'য়েছি, চোখে ঠাণ্ডার হয় না? বলেই হ'ল হ'ল ক'রে এগিয়ে যাব ললিত। হুখ না কিরিয়েরই বলে, ভোমাসের অহুলা ভাক্তারকে বিয়ে পড়িয়ে নিও।

ললিতের এ আচরণে আশ্চর্য হয় না দুকুয়র। সবাই জানে সম্ভ্রান্ত চিঠিপত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছে ললিত। দুষ্কিন্তির অতাবটা এর কারণ নয়। ললিতের ধারণা—চিঠিপত্রে কত দুঃসংবাদ থাকে, কখন তার চিঠি পড়তে গিয়ে কাকে কোন দুঃসংবাদ দিতে হয় কে জানে। বিড়ে শাপের ভাণী হ'তে চায় না ললিত। তারও দীর্ঘনিঃশ্বাসে বসি বিকৃত্তির কোন অকলাপ হয়! তাই দুষ্কিন্তির নিষেধ। হুখ ক'রে বিকৃত্তিকে সে রেখেছে নিরাপন্ন গভীর বনে, যেখানে কারো দীর্ঘনিঃশ্বাস শাপ হ'য়ে পৌঁছোয় না।

সব চিঠি বিলি হ'য়ে গেছে, শুধু মানিঅর্ডারটা বাকী। বাজীর সামনে এসে মানি অর্ডারের প্রাপকের নাম হ'য়ে ডাকে ললিত। পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে বেরিয়ে আসে কুঁড়োরাম।

নে, টিপ, দে, টাকা আছে তো'র নামে।

ডান হাতখানা এগিয়ে ধরে কুঁড়োরাম।

আরে এ হাত নয়, বাঁ হাত।

বাঁ হাতে টিপ দিতে পারবে না-ঠাটুর।

কেন, কি হোল দেখি?

কতকগুলো আধরল কাপড়ের নেকড়া জড়ানো হাতখানা অতি সতর্কণে সেলে ধরে কুঁড়োরাম। সকালে কেতে নিড়েন দেবার সময় কেনন যেন বেটপুকা জখন হ'য়েছে আতুল পাঁচটা। কোন রতে টিপ সই দেবার সাধ্য নেই তার।

তবে আর কি হবে, বলতে বলতে ঊঁলো ললিত, হাত ভালো হ'লে ডাকঘরে গিয়ে টাকা নিয়ে আসি।

বিমর্ষ হুখে মাথা নেড়ে সম্ভ্রান্ত জানার কুঁড়োরাম। এগোর ললিত।

টাকা এসেছে কখন গেয়ে হাতের কাছ ফেলে বাইরে এসেছে কুঁড়োরামের বো। কাপড়ের খুঁটে ডান হাতটা হুহুতে হুহুতে বলে, বলি কত টাকা পাঠালো নিবারণ? ও ভালো আছে তো?

নিশ্পলক চোখে বাঁ হাতখানাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছিল কুঁড়োরাম। বেশ মোরের সংগে স্ত্রীর বিকে তাকিয়ে বললো, না-ঠাটুর টাকা বিলে না।

কথাটা কানে সেল ললিতের। কখনো দাঁড়ালো নে। নিবারণ কুঁড়োরামের ছেলে। সে টাকা পাঠিয়েছে বাপের নামে। সারাটা মাস বাপ-মা প্রতীক্ষা করেছে এই টাকা ক'টার। আজ কুঁড়োরামের আরণ্যক বসি আমি হ'তাম নিশ্চয়ই বড় কটক'ত, জাফলো ললিত। তাবতে তাবতে ফিরে এলো কুঁড়োরামের ঊঁলোনে।

ললিতকে কিয়ে আসতে দেখে কুঁড়োরাম দাঁড়ায় থেকে নেমে এলো, ধরে দুখলো তার স্ত্রী।

জাব কুঁড়ো, এমিক ওমিক তাকিয়ে কেউ কোথাও নেই দেখে চুপি চুপি বলে ললিত, তো'র হয়ে আমিই টিপ সই দিয়ে দিছি। তবে দেখি, কেউ যেন বুগাকের জানতে না পার। সরকারী ব্যাপার, বুঝলি তো? বলার ভীততে সরকারী ব্যাপারের গুরু আরো বেড়ে যায় যেন।

কালির চোপ লাগা বুড়ো আতুলটা মাথার হুহু ললিত টাকা শুনে ধরে কুঁড়োরামের হাতে। উৎসুক হ'য়ে ওঠে কুঁড়োরামের হুখানা। একটা হুখ হাসিও হুটে ওঠে। এমনি একই হাসির সাধন। ক'রেছে ললিত। কবে তা হুটবে ললিতের হুখে কে জানে।

এমনি গভ্যাহুগতিক আত্মাহিকতার আঁবেত'পড়ে জীবন চলে ললিতের কোন ইচ্ছা নেই, নেই কোন সজুনের সাধ। সেই আগেকার বড়ো ছাড়াটা বদল দাবা ক'রে পোষ্ট-অফিস বাণ্ডার, চিঠি বিলি-কল-আর ঘরের কেরা।

আজও তুমি পোষ্ট অফিসে এসেছে লিখিত। কিন্তু ছোট ডাকঘরের স্তোত্রাধিক ছোট বরজাটা ডিঙাতে না ডিঙাতে পোষ্টমাষ্টার মশাই অত্যাধীনা করলেন, আমুন, লম্বিতবাহু, আমুন। এ সম্পূর্ণ অভিনব। এমন তো হয় নি কোনদিন। অজানা একটা অসুস্থতা বশতই কেলেঙ্গো লম্বিতকে। মস্তবৃদ্ধের মতো বললো এসে চেয়ারে। কোন কথা বলতে পারলো না, বলে রইলো জিজ্ঞাসু দৃষ্টি যেনে।

একটা স্নানঘর আছে, হাসতে হাসতে বললেন পোষ্ট-মাষ্টার মশাই।

চাকলা এলো বলিভের মনে।

কবে মিষ্টি খাওয়াজেন বলুন। আপনায় হেলে চাকরী পেয়েছে—সালো চাকরী, এই যেখান চিঠি।

কাঠের পুতুলের মতো একতরফে বসেছিল লম্বিত। হঠাৎ চিলের মতো হৌ বেগে নিল চিঠিখানা। দুক থেকে শেষ পর্বত পড়লো বার করে। তাবণর আরো আকস্মিকভাবে একটা উত্তর প্রত্যাহ করে বললো সে, আচ্ছা। মাষ্টার মশাই, ক'লকাতার যে পোষ্টঅফিসে চিঠিখানা ফেলছে আর আমাদের পোষ্টঅফিস, এই দু'য়ের মধ্যে আরো অনেক পোষ্টঅফিস ঘুরে তবে তো চিঠিটা এসেছে?

এককালের পোষ্টমাষ্টারের হুঁশ এমন কথা তুমি অবাক হ'য়ে চেয়ে রইলেন মাষ্টারমশাই। বললেন, হ্যাঁ, তা তো নিশ্চয়ই।

সে সব পোষ্ট অফিসে অনেক লোক, আবার আরম্ভ করে লম্বিত, তাদের মধ্যে কেউ না কেউ কিছুস্তির চিঠিটা ছুঁয়েছে। কেউ বা 'সীল' বেরেছে, কেউ বা বলিতে পুঁয়েছে।

সে তো জানা কথাই, বলেন মাষ্টার মশাই।

আচ্ছা, বৌদে ঘর নিয়ে তাদের নাম ধাম খেলে তাদের নামে মিষ্টি খাবার আছে ছুঁতো একটা ঢাকা পাঠানো যায় না? তাহা ত তা হ'লে প্রাপ্তরে আমার কিছুকি আশীর্বাদ করবে।

লম্বিতের কথা শেষ হ'লেই লম্বকে হেলে উঠলেন মাষ্টার মশাই। বললেন, হাজার হাজার লোকের মধ্যে কে আপনায় হেলের চিঠি 'সীল' বেরেছে তাই এখন বুজতে বাধেন।

এবার লম্বিত হ'ল লম্বিত। লম্বি এ অসম্ভব। আনন্দের আতিশয্যে যে প্রজাবটী সে করেছে সেটার বিষয় একটু তাবা উচিত ছিল তার। ভিঃ ভিঃ মাষ্টার মশাই কি তাবলেন!

আজকের ডাকটা হবেনই যেন বলি করে মাষ্টার মশাই, বিনীত ভাবে বলে লম্বিত, আমি এবার বাড়ীতে থবরটা ছিঁ গে। উঠলো লম্বিত। যাবার সময় বলে গেল, কাল আপনায় গল্পে ভালো লক্ষণ নিয়ে আসবে মাষ্টার মশাই।

পরের দিন লক্ষণ নিয়ে আর আসা হয় না লম্বিতের। কাল বিজুতির চাকরীর স্নানঘর দিতে লাব। প্রেমের ছুটে বেড়িয়েছে। প্রত্যেক বাড়ী বাড়ী গিয়ে বলছে, আমার কিছু ভালো চাকরী পেয়েছে। রাতা বৌয়ের কাছে থেকে মানারীপুরে পাওয়া ছুটো টাকার ব্যতালো কিনে হরির লুট দিয়েছে বোঁসাই বাড়ী!

কালকের বাতামতিতে গারে আর এসেছে লম্বিতের। তাই বাওয়া হয় না মাষ্টার মশাইয়ের লম্ব লক্ষণ নিয়ে। সামান্য লম্বি-ম্র, কিন্তু ভাবণ দুর্বল ক'রে ফেললো ডাকে। লবাই বললে, বুড়ো বরলে এ ভালো নয়, অন্যত কবরেলকে না হয় একবার ডাকো। কারো কথার কাম বেশ না লম্বিত।

ম্রী এলে বলে, দিন দিন কি হ'য়ে যাচ্ছে। একবার কবরেল মশাইকে ডাকতে পাঠাই।

লম্বিত সোহাগতর। থবকের প্ররে বলে, তুমিও কি পাগল হ'লে বৌ? মশাই না লাহক, তুমি তো জানো একটা পরমা অনিয়ার হাতে নেই।

তাই ব'লে যোগের চিকিৎসা করাবে না?

করাবো বৌ করাবো, এ মাসের আর কটা দিন বা বাকী, ও মাসের চার পাঁচ দিনের মধ্যে কিছু টাক।

পাঠ্যের তখন প্রাণতরে চিহ্নিত করা যাবে।

ক্রমশঃই দুইদল হ'য়ে পড়ে ললিত, অবস্থা আপত্তা-জনক হ'য়ে পড়ে। সমবয়সীরা শেখ বেথা দেখতে আসেন, সবাই জানে এ বাত্মা আত্ম ললিত উঠবে না।

দিন যায়। একদিন অবস্থা খুব বেশী খারাপ দেখে ওপাড়ার টুই চৌধুরী সহর থেকে ডাক্তার নিয়ে আসেন সঙ্গে করে। ডাক্তার এসে তখনেন, রোগীর মুখে শুধু এক বুলি, আশ্বকের ডাক কি এখনো আসে নি ?

নাথের মাঝে বিকারের ঝোঁকে ব'লে যায়, এত টাকা ? এত টাকা দিয়ে করবো কি ? হরেন, দেখ তো তুপনে কি লিখেছে ? ভালো আছে তো ? ব'লতে ব'লতে ললিত ভক্তাভর হ'য়ে পড়ে।

আবার ভক্তা টুটলে টাকা গেনার ভক্তিতে হাত নেড়ে বলে, এক... দুই... এই নাও দশ চুতপে কড়ি টাকা। সব ফেলা শোধ।

ডাক্তার বললেন, আশা নেই।

অজ সারা গ্রামের লোক এসে জমায়েৎ হ'য়েছে ললিতের চোট ঘরখানায়। কেউ কেউ গানছা কানরে বেধে এসেছে শব্দাঙ্গনন করবে ব'লে। ললিতের শিরের বসে কাঁদছে তার স্ত্রী। একবার ডোখ

যেলে ডাকলো ললিত। সকলের দিকে একবার শেখ দৃষ্টি নিষ্কেপ ক'রে অভিত করে বললো, ডাক বুলি এলো।

ডাক এসেছে। মনি অর্ডার আছে ললিতের নামে। বিলি করতে বেরিয়েছে হরেন। বাফীর উঠোনে চুতপে গিয়ে তারার হোল তখনই চলে বাড়িল সে। কে যেন ডাকলো তাকে। কেউ বললো, কে পারিচ্ছে ? কত টাকা ?

বিভূতি পারিচ্ছে—গুণান টাকা। এই টাকার জন্ত কত দিন কত দুঃখ সহ ক'রেছে ললিত। শেখ যুদ্ধত পর্বত আশা করেছে টাকা আসবে, বিভূতির টাকা আসবে।

পিওনকে দেখে ও প্রমোত্তর শুনে মৃতদেহের ওপর কেঁদে লুটিয়ে পড়লো ললিতের স্ত্রী, ওগো, একবার চেয়ে দেখো, বিভূতি তোমার টাকা পারিচ্ছে।

টাকাটা আর কি দিয়ে নিয়ে যেত না, কে একজন হরেনকে অগ্রহণ করে যেন, যরা হাতটা তুলে একটা টিপ সই নিয়ে ছেড়ে দাও।

স্তোমাদের অনেক উপকারই করেছে, বললে আর একজন।

সমস্ত হ'ল না হরেন। সরকারী ডাক-পিওন লে, যেআইনী করবে না কিছুতেই।



কাল-পল্লিকল্প

(রবি মৈত্রের চা-চক্র)

জীশাঙ্কমোহন চৌধুরী

আবেদনিক কংগ্রেসের সভাপতিত্বপে জ্ঞাতগণের লবণ সভাপ্রব্ধ আবেদনে বর্ণনাগিরে পদ্ধতির আবেদনই কিন্তু সরকারী কৰ্তৃপক্ষ তাঁকে সরিয়ে দিলেন বর্ষা অকালে। অমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তখন কর্মী সঙ্ঘের সভাপতি। তাঁকে দলপতি ক'রে গ্রন্থ সভাপ্রব্ধী হলের বহন পালা পড়ছে সেই সময় উপেন বাবুঘোষ তাঁর বন্ধুকে উপদেশ দিয়ে বললেন—স্বাভাবিকভাবে যদি বন্ধুদের আবেদনে সন্তোষিত হ'তে চান তবে এই আবেদনে তাঁর কল্প প্রদান করাই শ্রেয়; আর তাঁর নিজের কথা হ'চ্ছে এই যে, তিনি উদ্বারনীতি নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছেন, কাজেই আপাততঃ তিনি একটা চাকরীর চেষ্টা করবেন।

গাড়ীজী আবার জনগণের মনে আসন পেয়েছেন। যে দেশের আশে পাশে লবণাক্ত সমুদ্রের ঢল পৈ থৈ করছে সেই দেশের লোকেরা এক ঘোঁড়া জল কুটির ত্যাগ করে নিজে ভাতের সংগে মিলিয়ে খেতে পারবে না, এ কেমন কথা! কবাইটা চটু ক'রে মনে আঘাত ক'রে যায়। কিন্তু এই লবণ ভৈরী করার ফল কোপার গিরে ঝড়াবে তার সংঘে স্পষ্ট ধারণা কারো মনে না থাকলেও গাড়ীজী যে একটা ভেড়ী বেগাবেন এমন বিশ্বাস অনেকেরই ছিল। কিন্তু উপেন বাবুঘোষ মনে কোন আশা বা সংশয় ছিল না। তিনি পরিষ্কার বললেন—দুরো। স্বাভাবিকতার এখানেই হোক ইতি। জ্ঞাতবের মনও বিধা ছিল, কিন্তু আবেদনিক কংগ্রেসের সভাপতি হ'য়ে বিপদে পড়েছিলেন, তাই সুখরসায় কল্পে বন্ধুত্ব প্রয়োজন সেইটুকু শুধু করলেন বহিঃ জ্ঞাতে তাঁর অস্তরের কোন সাদা ছিল না। ভারতের নেতৃত্বের পুরোভাগে এসে আবার গাড়ীজী। উপেনদায় আশা নির্বাণিত হলো।

জ্ঞাতবের মধ্যে উপেনদা বেধে ছিলেন এক

বিপ্লবীকে; সেই বিপ্লবীর পূর্ব বিকাশের লবণ ব্রিথা কল্প হ'য়ে যায়। তাঁর হাতি ক্রমে মনে হ'য়ে এলো। হাতে নাথো তাঁর আনমনা ভাবে গাড়ীজীর আভাস লক্ষ্য ক'রে পড়িত হ'য়ে উঠতাম। অবিখ্যাতীয় সংসদবাদ তাঁর মনকে আচ্ছন্ন ক'রে কেলেজে, কোন কিছুকেই আর তিনি জ্ঞাতর চোখে দেখতে পারতেন না। যৌবনে যে আদর্শে মত্ত হ'য়ে তিনি বর ছেড়েছিলেন জীবনের বধ্যার্থে এসে আবার। পরে বেধে তিনি যে দিকে চান সেই দিকেই যখন শুধু মরীচিকা। নিজের কল্যাণ কী তা-বে জানে না, সে পথের কল্যাণ সাধন করবে কেমন ক'রে? সে কি আদর্শের ধোঁয়া নর? এখনই সংসদ তাঁর মনকে পীড়া দেব নিরন্তর।

বাংলার সংসদ শক্তি বিধা বিস্তৃত হ'য়ে গেছে। দুইটি দল তাদের সর্গীয় আদর্শে মালিন্য নিয়ে আশ্রয় করলে তাদের দুইজন নেতাকে—সেনগুপ্ত আর স্তাভাষ। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়, মীচের খেতে পাক উঠে তা ছিটকে শড়ে চারদিকে; উপরে গিয়েও তার দাগ লাগে। উভয় দেশমান্য নেতারা এই মালিন্যের দাগ থেকে আশ্রয়লা করতে পারেন নি।

উপেনদা মনে মনে একটা নতুন প্যাচ খাঁটছিলেন, এটা স্পষ্ট বুদ্ধিতে পারল না। কিন্তু সে তাঁর দেশোদ্ধারের চিন্তা নয়; সেটা নিছক আত্মকেন্দ্রিক। বীণাসুতার উপেনদা সংসদক্ষেত্রে অবেশ কয়ে আবার ছুঁটি সন্তানের জন্মক হ'য়েছেন। তাঁর সংসার আবার বড় হ'য়েছে। এই চানটা এখন এমল হ'য়ে তাঁকে বিমল ক'রে ফুলেছিল।

দেশোদ্ধার? কে তাঁকে দেশোদ্ধারের অস্ত্র যথার দিগি দিয়েছে? যিনি দিব্যরাত্রি তাঁকে মাথার দিগি দিয়েছেন সে তো বাহাদুরী—অর্থাৎ একটা দুগ যিনি কাটা-

লেন পাবতীত ক্রীড়া তাঁরই প্রত্যাশার তুলনামূলক, তাঁর প্রতি কর্তব্যই যে এখন তাঁর সব চেয়ে বড়। হুলোর ঘাট সব! তিনি ভালো করবার কে? ভালো যিনি করেন বলে তিনি জনহীন, বাকি কখনো তিনি চোখে দেখেন নি, দেখবার ইচ্ছাও আর নেই, তিনি যদি বনে করেন তো কখন, তাতে তাঁর কোন আপত্তি নেই। আপাততঃ বাবেব তিনি চোখে দেখেছেন, বাবা সত্য হ'লেই বলে 'কি বাবেব' তাঁদের দিকে একবার ভালো করে চাইতে চান।

সুভাষের বন কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র সেই সময় উপেনদা একদিন তাঁকে কানে কানে বললেন — "তুমি বাবু, এই সময় কিছু করতে পারো; তোমার কর্পোরেশনে একটা চাকরী-বাকরী লাগে দেখি। এখানে আর কিছুদিন থাকলে একেবারে অসুস্থ পড়ে যাবে।" সুভাষ একটু হেসেছিলেন সেদিন।

ওদিকে সমরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও জেলে বসে বসে কথার কথার তুলতে পারেন নি। লগ্ন আইন তল করে তিনি কারাকান্ড হয়েছিলেন। তিনি বন দফতর জেলে সেই সময় একদিন তাঁর অস্ত্রের কথা কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা জে, সি, সুভাষি ওরফে বাবাকে অস্ত্র করলেন। বাবা জেলে গিয়ে তাঁর সঙ্গে লাক্ষ্য করলে বাবাকে গুলি উপেন বাবুয়ের চাকরী করতে পরামর্শ হ'লো। বাবা বললেন তাঁর বখাওয়া তিনি চেষ্টা করবেন। বাবা প্রধান কর্মকর্তা হ'লেও তাঁর কথটা ছিল সীমাবদ্ধ। সুভাষ মেয়র হ'লেও সে সময় কর্পোরেশনকে চালনা করতে পারতেন একতরফে শরৎ বাগ। এক দিকে সুভাষ-শরৎ অপর দিকে বাবা—আট বাট বাবা হ'লে গেলো।

তারপর একদিন উপেন বাবুয়ে অকস্মাৎ আবারে বয় থেকে অবসর হ'লে কর্পোরেশনের গুলি গাড়ীর গাড়োয়ানদের কর্তব্য থেকে বসলেন। আবারে প্রতিষ্ঠানের সমস্ত আনন্দের উৎস বৈক: একদিনে

তকিরে গেলো। মনে হলো যেম হঠাৎ বীণা নিয়ে গেছে।

উপেন বাবুয়ে চালাক লোক; পথ কখন বিপদ হ'লে বাঁচার তার সবচেয়ে সচেতনতা ছিল প্রথম, তাই তিনি ধরলেন নতুন পথ। কিন্তু আবারের কাছে তাঁর নির্মম এনে ছিল একটানা তরলচিত্ত আনন্দের বদলে নিস্তরল নৈরাশ্র। ছুঁচোরজন ছাড়া সংসারে অনতিদূর অধিকাংশ তরল সাংবাদিকের মনে যেম হঠাৎ এলো একটা অসহায়তার ভাব। শুধু অকারণ পুঙ্ককে আবারের পিছনে ছুঁতে গিয়ে তাবতে পারিনি কখনো যে, বাস্তব এমন ক্রম বৃত্তিতে একদিন দেখা যাবে।

উপেন বাবুয়ের বস্তু অমন প্রতিষ্ঠা, প্রতিষ্ঠা বা ব্যক্তি আবারের নেই যে, সহজে নতুন কোন পথে পা বাড়াতে পারি। সুভাষ অসহায় বাস হ'লেই রইলো প'ড়ে।

এর পরে বহু দিনের ইতিহাস নামা বিশ্বখ্যাত ইতিহাস, দুর্ভাগ্য দুর্ভাগ্যের ইতিহাস, ক্রম অধঃপতনের ইতিহাস। সার্কুলার রোডের নতুন বাড়ীতে এসে নতুন করে সংসার বন পাঠ। হুজি তখন কর্মোপা-বনায় মধ্যে আশাবাসীর হ্র ছিল। রোটারি মেদিনটা ওবাড়ী থেকে পুলে এনে এ বাড়ীতে বসাতে কেটে গেলো প্রায় বাল খানেক। এই সময়ই বেথেনহিলার এখানে পদার্পণ করতে গেলেন মহারাজকে শরৎ বাগের সঙ্গে।

পুরানো বাড়ীটার মনের পৌরব না থাকলেও তার সৌরভ ছিল। নতুন বাড়ীতে সৌরভের আশা করবার আগে তার জোশু দেখে বুঝী হয়েছিল। জনহীন সাহিত্যে কোণ সৌখীন মূলমান তরলচিত্তের বাড়ী। ভাড়া-বেওয়ার জেতে যে এ বাড়ী তৈরী হয়নি তার প্রমাণ ছিল। কটক পুণতেই সাহসে বেরারি-করা ছোট একটা হলের বাগান চোখে পড়তো। দোস্তলা বাড়ীতেই হানের অত্যন্ত হয়নি। ধর্মতালিকে কাগজের

অফিস করে তুলতে গিয়ে হোস্তলার বড় হল ঘরটার রূপান্তর কিছু কিছুতেই সম্ভব হয়নি। নর্তকীর মতো ঝাঁক-ঝাঁক ভঙ্গিমা তার, আর বিচিত্র রঙে রঞ্জিত। শুনেছি এটা নাকি নাচঘরই ছিল—কত পুর-হুমহূরীর নৃত্য নিকপ এখানে নাকি বেয়েছে। বাড়ীর মালিক নবাবের বংশধর কিনা জানিনা শুনে তাঁর মনে যে নবাবীমানার রং ছিল তা ঘরের রংগার যেতরালে সেওয়ারলে প্রস্ফুট।

হল ঘরটায় ঢুকে সামনের দিকে এগিয়ে গেলে ডান দিকে দুখানা ঘর চোখে পড়তো—একখানা ডিহেউরদের জন্তে নির্দিষ্ট ছিল, অপরখানা দখল করেছিলেন আমা-দের ম্যানেজার দত্ত সাহেব শরৎ বোসের নামা বীভেন দত্ত ওরফে বি. এন. ডাট বি-এন-জি-এস। দত্ত সাহে-বের এই অভিনব উপাধিটি দিতেছিলেন তাঁর ভাগিনের শরৎ বোস; অর্থ বিলাতে না গিয়ে সাহেব। উপেন-দার সক্রামক রসিকতা শরৎ বোসকেও আক্রমণ করেছিল, তাই তিনিও বাক্যে বাক্যে খুশ পাকাতেন। এ ক্ষেত্রে বাজবের সঙ্গে উপাধিটার অর্থের এমন সঙ্গতি হ'তেনি যে, আমরা এতে আনন্দ পেতাম প্রচুর।

দত্ত সাহেবের ঘরের সঙ্গেই সংযুক্ত 'বাথরুম'টি সাহেবীমানার সঙ্গে বেশ খাপ খেয়েছিল।

এই বাড়ীতেই হুতাবজ্ঞের আগমন হতে লাগলো ঘন ঘন। নামা বরণের লোক আসতো তাঁর সঙ্গে বিকালের দিকটায়। সবেদা বোধ ওরফে মধু বোধকে দেখেছিলাম কিছুদিন। বোধ হর হুতাবজ্ঞের দলের সঙ্গে হুতাবের তখন একটা চূড়ান্ত বোকাপড়া হচ্ছিল। সিড্রিয়া টীম নেভিগেশন কোম্পানীর গগনবিহারী লাল মেহটা জ্যারই আসতেন হুতাবের সঙ্গে। বরদা বোধ করি ছ'জনেই ছিলেন সমান, গায়ের রংও ছ'জনের প্রায় একরকম; পাশাপাশি ছ'জনে ঠিকালে অনেকে হুত হ'রে চেয়ে থাকতো। বিবেচী জাহাজ কোম্পানীর সঙ্গে প্রতিযোগিতার আদ্যের এই দেনী জাহাজ

কোম্পানীকে বেশ পেতে হতো খুবই। আমরা এই কুহ জাহাজ কোম্পানীর পক্ষে এটার কার্য কতদান তখন। কিন্তু এই টীম নেভিগেশন কোম্পানীকে বতাই সমর্থন করিনা কেন, আমাদের যে এদিকে টীম হুরিয়ে গেছে তা টের পাচ্ছিলাম। বোধ হর সেই জন্তেই হুতাবজ্ঞের ডোড়ঝোড় চলছিল বেশী করে। একদিন দেখলাম এই বাড়ীতেই পদার্পণ করতে আমাদের কুহ-পূর্ব কংগ্রেস সভাপতি সন্তক ডাঃ আগারীকে। তিনি এই ব্যক্তির অনেকবার ছেপেছি আমরা, এইবার চান্দুব লোকটাকে মিলিয়ে নিলাম সেই ভাবির সঙ্গে।

সিটি কলেজে লরস্কটী পুতা নিয়ে ছাত্রদের যে ধর্মঘট হয়েছিল তাতে জাজদের পাণ্ডা হয়েছিলেন হেরথ বুখার্ডি। ইনি হুতাবজ্ঞের দেহ আকর্ষণ করেছিলেন এই ধর্মঘটের পরিচালন দক্ষতার। কাজেই অমিল বল ছাত্র লম্বলনের পাণ্ডা এসোদা বোংবালের দল ঘন সেন স্তম্ভকে সমর্থন করতে লাগলেন তখন এই হেরথ বুখার্ডিকেই খাড়া করা হলো বহীর প্রাথমিক জাজ লম্বলনের পাণ্ডা রূপে। এই ঘিড়ীর দল হলো হুতাব-জ্ঞের সমর্থক। দলাদলির বিষ সব্ব জড়িয়ে যেতে লাগলো। এই সময় হেবেছি এক কুহে পলিটিশিয়ানকে—সব সময় হুতাবজ্ঞের বিপক্ষ ব'লে পরিজ্ঞাত করক ব্যক্তির সঙ্গে স্তম্ভ, স্তম্ভ, হুদ, হুদ করতে। বিশেষ করে গোপাল সাঙালের সঙ্গে ছিল তাঁর নিবিড় অন্তরঙ্গতা। নাম তাঁর অক্ষর লরকার। ভাঙ্গা কানীর মতো ছিল তাঁর গলায় আঙঠাক, নারী কঠোর সঙ্গে তুলনা করতে গেলে নারীর অপমান করা হয়। এক-টানা ভাঙ্গা কানীর আঙঠাকের তালতল ক'রে নাকে নাকে তাঁর গলা থেকে বেরিয়ে আসতো আরো হু'তিন রকম বেহুতো আঙঠাক। একটা চাপা বড়ঘরের নাকে দিগু ধাক্কাতে ভালো বাসতেন এবং হাবতাবে সেটা প্রকাশ করতে পারলে যেন করতেন একটা বহুদ বর্তব্য তিনি সম্পাদন করেছেন। হুতাব বাবুকে



তিনি ডাক্তেন মাঝা বলে। তাঁর হাবভাব বেখে কারো কোন দিন মনে হয়নি যে, খুঁতাব বাবু তাঁর সাক্ষ্য মাঝা ন'ন। মাঝা ভাগনের সম্পর্ক যে একটা ছিল তা টের পেয়েছিলেন পরে। তবে সেটা আসল নয়। নকলেই এই, আসল হলো না জানি আরো কি ঠাড়াতো। রাজনীতির বড় বড় চাল তিনি ধরতে পারতেন, একথা তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুরা প্রকাশ করতেন। চাল তিনি ধরতে পারেন আর নাই পারেন, তিনি যে মানার কানে অনেক কিছু লাগিয়ে অনেক সময় সব বানচাল করে দিতেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যেতো। পরে এই ব্যক্তি “খেরালী” নামে এক সাম্প্রতিক পত্র বার করে তাতে চমক লাগানো অনেক সংবাদের সঙ্গে মানার ভরত গাইতেন।

ঢাকা জিলার আউটসাইড গ্রাম থেকে এক বস্তামাড়া চৌকরাক দেখলান কিছুদিন থেকে বিকালের দিকে লাব-এডিটরদের টেবিলে বসতে। সত্য-সমিতি সংঘে রিপোর্টও মাঝে মাঝে সে পেশ করতো। সেই সব রিপোর্টের ভাষা সংশোধন করে মোড়া কথাটা ঠিক করতে বেগ পেতে হ'তো বীতিমত। কিন্তু উপায় ছিল না, বিরক্তি প্রকাশ না করেই তা ভাপতে হ'তো পত্রের রাজনীতির খাতিরে। বাপরে কি ঘোঁড়ো এতখান তার বেখেছি কিছুদিন। কতৃপক্ষের নাকি সে বিশেষ সৈন্যের পাত্র, কারণ বিপক দলের সভাপতি ক'রে দেবার সে ছিল মত ওস্তাদ, কাজেই তার মূল্য ছিল এবং সে মূল্যটা তাকে দিতে হতো কাগজের সহ-সম্পাদকের সঙ্গে তার নাম বেখে। অক্ষয় সরকারের সঙ্গে তার যাবতাবি ছিল বেশ। বিকাশের দিকে যাচ্ছে মাঝে চোখ পাকিয়ে পেশীবহল হাত ছ'খানি বুড়িয়ে কভের বসে। ঘরে ঢুকে সে বলে উঠতো— “একিবারে দিছি প্রাণ কইরা”। অর্থাৎ দেশ ভাঙের দলের সভাপতি করে দিয়ে সে একটা মহৎ কার্য সমাপন করে এসেছে।

ভাষাতাত্ত্বিক ব্যাপারটা চলেছিল আরো অনেক

দিকে। সরোজ জেল থেকে ফিরে এসে আর বনবার জায়গা পান্ছিল না। সুবোধ রায় ইতিমধ্যে “নবশক্তি”—সম্পাদকের বান দখল ক'রে বসেছিল। সরোজ পুনর্বহল না পেয়ে হতভব হ'য়ে গিয়েছিল, সেবটা গোঁসা করে বইলো ঘুরে। কতৃপক্ষ বললেন আর কল্যাণে হরকার নেই। ম্যানেজার মত সাহেবের সহকারী তারানাথ রায়ই ঐ কাগজ অনারালে চালিয়ে নিতে পারবেন, হুস্তগাং অথবা বার বহন না ক'রে বার সন্ধ্যাট করাই ভালো। হলোও তাই। তারানাথ রায় ছিলেন রোহীত যুগের বাঁড়ের লড়াইয়ের লক্ষ্যপাতী। তিনি যে স্বরকাল সম্পাদক রূপে দেখা দিলেন সেই সময়ের মধ্যে কল্লোল চক্রের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী সাহিত্যিকের মধ্যে লাগিয়ে দিলেন লড়াই। একজন প্রেরণ থেকে অপরকে একটু করলেন সাহিত্যিক চোর রূপে। বিশাখী কাহিলীর ইংরাজী অংশের উদ্ধৃতির পাশে বাংলা অন্তর্ভাব মিলিয়ে নিতে বলা হলো পাঠককে। তুহুণ বাগবিত্ততা চললো এই নিয়ে কিছুদিন। এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে এক পক্ষের লেখা বহন করে আনতো তখন ‘মুউনো’র সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায়। সে ছিল আমাদের বাংলা কাগজের দ্বিগ্নবিত্ত সংবাদদাতা। বলকাতার আশঙ্কায় না এলে নাকি সাহিত্যিকপণ্য বৃদ্ধি পায় ন', তাই সে বলকাতার ছুটে আসতে প্রারম্ভ। আমা-দের কাগজের অতিথে এলে তাকে অভ্যস্ত লাঞ্ছন বলে মনে হ'তো। মিষ্ট প্রকৃতির ছোকরা হলোও কিন্তু ইতি-মধ্যে দুই মিতে সে লীলা নিয়েছিল।

আমাদের তখন ধরেছিল অনেক দিকে। এক একটা ব্যাবস্থা হয় কিন্তু তার স্থায়িত্ব লম্বে আমরা সন্দী-হান হয়ে উঠি। নবশক্তির ম্যানেজার-সম্পাদক তারানাথ রায় একদিন দেখন আমাদের বিশ্ব সৃষ্টি করলেন তেমনি ঠাঁকে বিখ্যাত করেই আবার একদিন সরোজ রায় চৌধুরী তাঁর মননকে পুনরায় দখলী স্বয় পেলে। সরোজ ছিল আমাদের প্রত্যাবর্তনের ও কিরণশরর যাদের অতীত ঘেঁহের পাত্র। হুস্তাবস্র ছিলেন জেলে।

এক রাশ থাকলেই যথেষ্ট হতো। সরোজকে বদকাল রাজ্যারীন হয়ে চূড়োংগ ভুগতেও হতো না। সরোজ অত্যন্ত পোশাক সজ্জার অর্থাৎ ক্রিয়ারসমূহের পরমপার হয়ে রাজ্যের পুনরুদ্ধার সাধন করেছিল। কিন্তু সেও বেশী দিনের জন্তে নয়।

ভাগ্যচক্র অলক্ষ্যে বে-সংবাদ প্রতিষ্ঠানের কৃত্য রচনা করে চলেছিল তার আকস্মিকতা সত্ত্বে সচেতন না হলেও অবজ্ঞাবিশিষ্টা সত্ত্বে একজন নিঃশঙ্কে ছিল আরো সবার।

আমাদের পক্ষ-পাণ্ডবদের মধ্যে নির্মলচন্দ্র চন্দ্র ছিলেন একেবারে অসংযত্নের চন্দ্র অর্থাৎ তাঁকে কোন-দিনই চোখে দেখিনি আমাদের অফিসে। তুলনী চন্দ্র গোঁস্বামী আমাদের ছাপাখানার দাবী হ'লেও বাসিন্দার দাবী তাঁকে পেশ করতে দেখিনি কোনদিন। বাকী দুইজন বিবান রায় ও নলিনী রত্নন সরকারকে নিয়েই ছিল সমস্ত। তাঁদের ক্ষুদ্র হ'বার কারণ ছিল। তাঁদের উভয়ের প্রচণ্ড বে হতো না আমাদের কাগজে তা নয়; তথাপি স্তম্ভ্য বোল ও শব্দ বোলের লরচাক হ'য়ে উঠেছে আমাদের কাগজ এমন অভিযোগ তাঁরা দিতে পারতেন বৈ কি। কাজেই এর প্রতিবাদে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন শেষের দিকে, কিন্তু রস তখন আর তকিয়ে এসেছে।

এই সময় বেথুখি বাইরে থেকে এক পিণ্ডন এসে কিছুদিন দেখা দিয়ে যেতো সম্পাদক গোপাল সাহাভালের হাতে। সম্পাদকীয় প্রবন্ধ হিসাবে তা ছাপাও হতো; নাকে নাকে। পরে জানতে পারলাম ঐ প্রবন্ধের লেখক অরুণ আনন্দবাজার সম্পাদক সত্যেন নকুসার। এটা আমাদের পক্ষে পুনঃগৌরবজনক না হলেও নলিনী-রত্ননের থাকিয়ে তা প্রকাশ করতে হতো—বদিও সব দিন নয়। আনন্দবাজারের "দবিকর" শব্দের লেখক রবি বৈদ্যকেও চাপানো হ'য়েছিল এই সময় আমাদের খাড়ে। ইনি স্বয়ং আসতেন আমাদের অফিসে দেখা নিয়ে। ব্যাপারটা অপ্রীতিকর হ'লেও রবি বৈদ্য তাঁর

চরিত্র বাধুর্বে আমাদের অনেককে একান্ত আপন করে নিয়েছিলেন। রবি বৈদ্য আনন্দবাজারের সঙ্গে প্রকৃত-ভাবে জড়িত না হওয়ার তাঁকে আরো সহজে আমরা গ্রহণ করতে পেরেছিলাম। সরোজ ও আমার সঙ্গে তাঁর ভাবটা অবৈধ ছিল বেশী। রবি বৈদ্য প্রতিষ্ঠান লেখক ছিলেন। "শনিবারের চিঠিতে" তাঁর "মানসরী গাল শৃঙ্গল" রচনাটা পড়ে আমরা পুনী হয়েছিলাম। আমাদের সঙ্গে তাঁর অন্তর্ভুক্ততা হওয়ার কিছুদিন বাধেই ঐ হস্তরসের নাটকটি রচনাকে অন্তর্নিহিত হলো যেহেতু আরও পুনী হ'য়েছিলাম।

রবিব্রজের বন্ধু রবি বৈদ্যের জীবন ছিল অনাড়ম্বর। আত্মভোলা এই মানুষটি হাসিতে মুখিত ছিলেন সদা আনন্দময়। একদিন মহা উৎসাহে তিনি চারের নিমন্ত্রণ করলেন সরোজকে ও আমাকে তাঁর বাসায়। ইটানী অক্ষলে তাঁর বাসার সকল আশ্রয় আটটার সময় আমরা দুই বন্ধুতে গিয়ে হাজির। রবির কিছু তখনো ঘুম ভাঙেনি। তাঁকে জাগিয়ে তুলতেই বললেন—"ওঃ কাল রাত্তিরে তাই ঘুম হরনি ভালো।" অতিথি অত্যাগন্তের প্রতি তাঁর এরূপ নিরাপত্তা বেবে ভয় হলো। চারের নেবস্তরটা কি তা হ'লে মাঠে মারা বাবে নাকি! রবি ছাড়া আর বিশেষ কাউকে তো চোখে পড়ে না। নিজেরাই তোড়তোড় করে নেবা নাকি নেবস্তরের পালাটা শেষ ক'রে? ছ'মনে মুক্তি করছিলাম।

"ভুলুয়া! ভুলুয়া!"—বাত হ'য়ে রবি হাঁক দিলেন।

একটা পরিচায়ক তা হ'লে আছে যোধ হ'চ্ছে। ঘরের শুবারটার এক কোণে রবি ছুটে যেতে আমরা তাঁর অনুসরণ করলাম। দেখলাম এক ব্যক্তি উজ্জল বরিষেচে, সেই ভুলুয়া। উজ্জল। অলপে উঠেছিল।

"এই অল বসিয়ে দে।"—বলেই রবি একটা হিন্দু-স্থানী লোটা ভুলুয়ার দিকে এগিয়ে দিলেন। রবি নিজেই কিংবা তাঁর পরিবারের কোন ব্যক্তি হরিষার

প্রীত্বাত্মক গিরে সোটাটি সেখান থেকে সংগ্রহ করে-
ছিলেন কিনা জানিনা, এ বিষয়ে তাঁকে কোন প্রশ্ন
অবিস্ত্রি করিনি।

অতঃপর রবি আমাদের দু'জনকে নিয়ে এসে
বসলেন তাঁর বৈঠকখানায়। বৈঠকখানা মানে তাঁর
শোবার ঘরের পাশে এককালি ঘর; সেখানে ছোটো
বেঁটে আলমারি আর খান দুই ভাড়া চেঁচাবে।
আলমারিতে বেশলাস ঠাণ্ডা বই, দাবী বইও কিছু
হিল।

হুইট ক্লাবান চেয়ার আমকা দখল করে বসলাম।
রবি এসে বসলেন আমাদের পাশেই একটা ছোট টুল
নিচে। বলা বাহুল্য, এই দুই ভাড়া চেঁচাবের সাহায্যে
একটি টিপার বসানো ছিল। টিপারটি রবি কোথা থেকে
সংগ্রহ করেছিলেন তাও জানিনা। এটি ছিল খোঁষ
মোতাখাবার মার্কা। আর তার উপরকার খাণ্ডার পহিবি
এতখানি যে মন জন লোক বুঝাকারে বসে ভাঙতে চাহের
পেরালা। বসিয়ে আত্মমে চা পান করতে পারে।

রবি সোৎসাহে গল্প শ্রবণ করে দিলেন। আমাদের
অস্বস্তি ও আপত্ত্যের প্রতি বিশূব্রাহ্য ক্রক্ষেপ তাঁর ছিল
না। মানবদী গাল'সু ফুলের অস্তিত্ব, চটকলের মজুর-
নের হুতৎকার কথা এবং এমনি আরো কত কি। পাশের
ঘটটার মেকের উপর একটা ছিঁড়া মাদুর ও আব-বরলা
বাগিন চোখে পড়ছিল। শব্দটো মিলিয়ে আমরা রবির
ঐশ্বর্যের ভাবিক করজিলাম।

বানিক বাবেই ভুল্লুরা তিনটি কলাই-করা বগ নিয়ে
এসে আমাদের সামনে সেই মূলিকীর্ণ মোরাদাবান মার্কা
টিপরের উপর বসিয়ে দিল। হরিয়ার মার্কা সোটার
ভিত্তরই চাহের পাতা ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। তা
থেকে আমাদের চাহের পেরালায় চা বসিত হ'লো।
মসত্তলী পেরালায় কোন কোন অংশের কলাই ছুটে
বিয়ে ভিত্তর থেকে আত্মগ্রকাশ করছিল কালো
বরণ সোহা।

একখানা হেফাবিতে গজা ছুই গঁড়ে বিস্টুট সাজিয়ে

এনেছিল ভুল্লুরা। রবি টুপ করে তা থেকে একখানা
লিফ্ট ফুলে নিয়ে তাঁর বগের ভিত্তর ছেড়ে দিবে
আমাদের মিকে চেঁচে বসলেন—"খাও, চবৎকার
লাগে।"

এমন অবলীলায় তিনি বসলেন এই কথাগুলি যে
কোনরূপ প্রতিবাদ করবার সাহস হরনি তখন যদিও
আমাদের চিত্ত চবৎকার হ'য়েছিল। এই পালা কস্ত-
কপে নাক হবে তাই ভাবছিলাম মনে মনে। এমন
মজারী চা-পান গ্রীষ্মে আর কখনো হরনি। এই
বেমস্তরের বিষয়ে যদি দুর্গাকরেও টের পেতাম আগে
তবে কি আর পা বাড়াই।

সাত্তার বেরিয়ে পড়ে সেদিন রবির স্রাঙ্ঘ করেছিলাম
ছুই মস্ততে। প্রথমেই আমাদের দু'থ থেকে দু'পলং
বেরিয়ে এসেছিল এই মন্তব্য—"বার্ড্রাপ!"

রবির প্রশ্ন গল্পের বই "বার্ড্রাপ" তখন বাজারে
বেশ চালু হয়ে শেখকের খ্যাতি ছড়িয়েছিল। নামটা
তাই সহজে বুঝে এসেছিল মন্তব্য রূপে।

কিন্তু রবি ছিলেন এই সব নিম্না-প্রশংসার উর্ধ্বে।
তিনি আপনায় চারমিকে এমন একটি পরিবেশ সৃষ্টি
ক'রে তার মধ্যে আত্মসমাহিত হ'রে থাকতেন যে, সেটা
চোখে পড়তো না সহজে।

সেদিন আমাদের চা-পানের ইন্দিত বিলাস এমন
মৈত্রে পর্বানিত হলো বলে বুঝে ভ্রাণ করলাম বটে কিন্তু
যদিও এক লাগ্ন হুহুতে মনের পর্দার বেগতে পেলাম
রবির এক ছবি—উসুকে। বসুকে। কঁকড়া কঁকড়া ফুল;
লোকটির বিবাবিত্তজ বনের এক অংশ যেন এক রাশ
অসংলগ্নতার মধ্যে ছড়ানো, আর অপর অংশ যেন
প্রশান্ত, নিদ্রা। হঠাৎ বেগলে লোকটিকে পাশ'পাটে
বলে যোঁব ছুড়রাটা দিত্তাৎ অস্বাভাবিক ছিল না।
বাইরের কর্ণবাত্ততার মধ্যে থেকেও তাঁর উদাস, নিরা-
শঙ্ক মন এমন একটি কেন্দ্র আশ্রয় করে থাকতো যেখান-
কার বজ্জতা কখনো মলিন হবার মর।

রবির এই চরিত্রের সাধু বীরে বীয়ে একটি হ'য়ে-

ছিল আমাদের কাছে। পরে জানতে পেরেছিলাম বহু যন্ত্রের তিনি ছিলেন বহু। তাঁর উপাধিত অর্থের অনেকাংশই যেতো দুঃস্থদের তৃপ্তি ঘটান।

আমাদের চারের আসরের পরে খেদী বিন কাটে নি। অকস্মাৎ বজ্রাঘাতের জ্বর একদিন বর্ধিত হ'লো রবির কৃত্য-সংসার। জ্বহু হ'তে ছিলাম কিছুকাল। সত্ত্ব বহু যন্ত্রিতে যেহা এই বহুর সহস্র বেগাল-ধ্বনির মধ্যে নিজেকে চেঁচে দিয়ে একটা গভীর বেদনা বোধের সঙ্গেও পেরেছিলাম বহু কোন্ এক ব্যাথার একটা অন্যায়াদিত স্রবের হেশ।

তাগোর এমনি বিড়ম্বনা, শেখটার আনাকেই করতে হ'রেছিল "বলবানীর" সম্প্রদায়ের জ্বহু রবির কৃত্য-তর্পণ।

লেখাটা এখন হ'রেছে যেন দার সারা। স্ত্রীশ্রুত টেলিগ্রামের রাসির মধ্যে কত হেশের কত বিচিত্র জীবন-বাস্তব আঁকা-বঁকা পথ ধরে গেছে; সেই সব পথ আবিষ্কার করবার আনন্দ একদিন ছিল প্রচুর। এখন আনন্দের বদলে এসেছে বিরক্তি। গতানুগতিক ভাবে শুভ কভ'বের বোকাটা বহন করি কোন ক্রমে।

কাজ একদিন ছিল, তার সঙ্গে অকাজও ছিল তেমনি। অকাজের ভিতর দিয়েও আসতো কাজে নতুনতর প্রেরণা; তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি এখন। উপেন বাঁজুয়ার কথা ছেড়েই দিলাম। দুর্কার রসের দলিক পেলাকাত নেই যে ছুটো সংকট শ্লোক জনি; বিজয়লাল নেই জুতরাং কে আর আমাদের পায়ে পায়ে জড়িয়ে দিয়ে যুগশাক খাইয়ে বাধ্যচর্চা করাবে? যরের সাহসে কবরখানা হাড়া খোলা মাঠে খেলা দেখবার সুযোগ কোথায়? ও বাজীর অধরেই ছিল গড়ের মাঠ। হাকে হাকে শটান সেনগুপ্ত সরোনকে মাঠে টেনে নিয়ে যেতেন তাকে বৌনতবে তালিম দিতে। আমরাও যেতাম তাঁদের সঙ্গে কোন কোন দিস ফুটবল ম্যাচ দেখবার লোকে। এই রকম গেছি একদিন।

সেদিন প্রেমেনও ছিল আমাদের সঙ্গে। বেলায় মাঠে ছুই দুইমান দলের কোন একটির পক্ষ কখনও এককো দিয়ে ফেলত তা বলা শক্ত। সেখানে গিয়ে নিরপেক্ষ কেউ থাকে কিনা বলতে পারি না। সেদিন প্রেমেন বে দলের পক্ষ নিরেছিল সেই দলের খেলা সেদিন চমৎকার হওয়া সত্ত্বেও এমনি দুর্ভাগ্য যে, বার বার গোলা বেগুনার সুযোগ পেয়েও তাঁরা কেমন যেন ব্যনচাল করে ফেল-ছিলেন ঠিক গোলের হুঁচটাতে গিয়ে। প্রেমেনের আত'কঠোর বিকৃত আক'শোষ ধ্বনি সেদিন শোনা গিয়ে-ছিল বারবার। খেলা শেষ হ'তে বোধ হয় তখন আর মিনিট দুই বাকি; এমন সময় ঐ দলের বল এসে গুলোটো গুলি থাকিল বিপক্ষ দলের গোলের মুখে; প্রেমেন আর আত্মসম্বরণ করতে পারে নি। সুখে তার একটা আত'নাং শোনা গেলো—অ—বু—বু—বু—ই—জ—জ—জাঃ! আমাদের সব ছেড়ে প্রেমেন একবারে মাঠের মাঝখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। তার মুখের শেখর আত'রাজের সঙ্গে বেলাও লাক হইছিল, তখন অগণিত লোকের ভিড়ে আর কোথাও প্রেমেনকে দেখা যায় না। আমরা হেলে পুন হইছিলাম। বির করলাম কোথাও নড়কো না আমরা। প্রেমেন নিশ্চয়ই আগুবে কিরে আমাদের কাছে। লোকের ভিড় কবে গেলে তখন বাওয়া বাবে এক সঙ্গে। প্রেমেন শ্রিহমান হ'রে ফিরছিল তার দলের বিপক্ষের স্রবণ ক'রে। আমাদের কাছে সে কিরে এলো যখন সব একসঙ্গে আবার অকিস অভিমুখে যাত্রা করছি এমন সময় হঠাৎ তার মুখে করণ আওতাখ শোনা গেলো—“ওই-জাঃ! আমার গুয়াটা-প্রক!” এইবার সে আত্ম-সংগি কিরে পেয়েছে।

এতক্ষণ তাঁর কাঁধের গুয়াটারপ্রকটার কথা একবারও স্রবণ হয়নি। যোহুলামান গুয়াটারপ্রকটা কাঁধে বহন করেই সে ছুটে গিয়েছিল মাঠের মধ্যে। কখন তা খলিত হ'রে মাটিতে পড়ে গেছে তা সে টের পাওনি—পায়ের কথাও নয়, এমন অবস্থার কারণই বা বেলায় থাকে?

নাঠ একেবারে লুপ্ত হওয়া পর্যন্ত আমরা সেখানে অপেক্ষা করলাম। কোপাও সে ওয়াটারপ্লেকের চিহ্ন নেই। প্রেমনে লবে কিমেছিল এই বস্ত্রটি মগদ শনেরো টাকা দিয়ে। তাই তার বেদনা হয়েছিল একটু তীব্র। খেলার নাঠের অভিনয় সব রকম দিয়ে এমন করণ রসাত্মক হবে তা সে কি কখনো ভাবতে পেরেছে?

প্রেমেনের এই লুপ্তাবান বর্ণাভি হারাবার করণ সংবাদটি 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয়েছিল প্রেমনের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে নয়, রঙ্গের খোরাক হিসাবে।

এখানে আসবার পর বছর খানেক কেটে গেছে, তখন একদিন শুন্লাম ম্যানেজিং ডিরেক্টর শরৎ বোস আর পেয়ে উঠছেন না এই খেত হস্তির খোরাক কোণাতে। তাঁর নিজস্ব আর থেকে প্রায় সত্তর হাজার টাকা। টেলিও আর তিনি একে চাকা ক'রে তুলতে পারছিলেন না। দুদিন হ'লেও কাগজের চাহিদা দেখে ধরতে পারতাম না কোপার আদ্যদের গল্প। দত্ত সাহেব ও ভারতনাথ রায় আদ্যদের কাগজের প্রচার-সংখ্যা কেবলই কমাতে পরামর্শ দিতে থাকেন, কেননা তাঁদের মতে কাগজ বেশী বিক্রী হলেই কতিরি পরিমাণ বেশী। রাজ হ'পরলা ছিল আদ্যদের বাংলা কাগজের ধান। কাগজ বিক্রীর দাবি আর কতটুকু? আগল দাম খাঁরা দেখেন অর্থাৎ সেই বিজ্ঞাপন দাতারা তাঁরা ক্রমে ক্রমে হাত ভটিয়ে আনছিলেন। আদ্যদের অপরায় কোথায় তা ধরবার ক্ষমতা আদ্যদের ছিল না। শরৎ বোস হাল ছেড়েছিলেন নলিনী রঙ্গনের হাতে।

নলিনী রঙ্গন প্রচ্যুত লোক। পাকা ব্যবসায়ীরা হুঁদিত তিনি অন্ত বড় হ'রে উঠেছেন। আগর্পের খেয়ালে সর্বস্বাত হবার ছুঁড়ি তাঁর ছিল না সুতরাং ব্যবসায়িক জলাঞ্জলি দিতে তিনি রাজী হ'ন নি। কিছু-কাল হাল ধ'রে তিনি বুঝতে পারলেন নৌকা হুটা

হ'রেছে, সলিল লম্বাি হবার পূর্বেই তিনি ছেড়ে গিলেন হাল।

অন্তঃপর এলেন বিধান চন্দ্র রায়। নিগানে বদি কিছু বিধান দিতে পারেন তিনি—এই ছিল আদ্যদের আশা। বিধান রায় বদি লম্বা ব্যাপারের কতৃৎ স্বয়ং নিতেন তবে কি হ'তো বলা যায় না। কিন্তু তাঁর লে লম্বর কই? আর প্রকৃতিও ছিল না। কাজেই তাঁর হ'রে দেখা দিতে লাগলেন তাঁর ছুই অগ্রজ সাধন রায় আর সুবোধ রায়—একজন এগ্রিনিয়ার, অপর জন ব্যারিষ্টার। আরও একজনের আগমন হ'তে লাগলো এ লম্বর ধন ধন—তিনি ক্যান্টেন নরেন দত্ত। প্রথম লম্বাখুঁড়ে ডাক্তার হ'রে লেখাকার্য করার ইংরেজের দেওয়া পদমর্যাদা লাভ করেছিলেন—ক্যান্টেন। বুড়ের পর আর ডাক্তারি করেন নি, কিন্তু ক্যান্টেনগিরিও ছাড়েন নি। একটা ওষুধের কারখানা গড়ে তোলায় তাঁর নাম হয়েছিল “বেঙ্গল ইন্ডিউস্ট্রি” তাঁর কৃতিত্বের পরিচয় সম্বন্ধ নেই। কিন্তু এখানেও ক্যান্টেনি ক'রে তিনি মুকল কলায়েন এমন নিঃসন্দেহ হবার কারণ ছিল না। ক্যান্টেন ছিলেন বিধান রায়ের খুব প্রিয় পাজ। তিনি তাঁর বেঙ্গল ইন্ডিউস্ট্রি টীম নিরে এসে নানারকম লড়াইসেস দিতে লাগলেন। ছুই অগ্রজের সঙ্গে ক্যান্টেন এবং তাঁর টীম। অনেক লম্বাসীতে গাজন নষ্ট—এই প্রবাদ বাক্যের নির্মম সত্যতা উপলব্ধি করতে লাগলাম দিনের পর দিন।

বিধান রায় কর্ণধার হবার পর স্বয়ং কিছুদিন এলেন বিকালের দিকটার। নগিনীরজনকেও তিনি লম্বা করে আনতেন। কিছুকালের জ্ঞে ভরগজীর স্বরে চারিখিক প্রেক্ষিপিত ক'রে তিনি চলে যেতেন। তারপর তাঁর আগমনও বিরল হ'রে এলো।

সুবোধ রায় ব্যারিষ্টার সুতরাং ১৭ লেখবার অধিকার আছে নিশ্চয়, সেই অধিকার বলে তিনিও লম্বাদকীর লেখা শুরু করলেন। ইংরাজী কাগজে লুপার-এডিটরের সাফাং পাওয়া গেলো। আদ্যদের



বালা কাগজেও এক সুপার-এডিটরের লেখা আসতো
শিওন আরকং লেখা আগেই বলেছি।

যাক সে কথা। ওদিকে বিজ্ঞাপন বৃদ্ধির জন্যে
অগ্রভেরা “ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট” না কী বেনেট
রকন একটা কোম্পানী করে তার আরকং আদ্যদের
বিজ্ঞাপন সংগ্রহ করবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে।
ডেভেলপমেন্ট কোন্ খিকে হলো তা বুঝতে পারলাম

না। তবে আমরা যে একদম কুশ হ’য়ে নাতিখাস ছাড়তে
লাগলাম তা বিবেচন ভাঙ্গার বিধান তার দৃষ্টিতে
পারলেন। তিনিও অনেক টাকা ঢেলেছিলেন। দেবটার
হোমীর আর বীটার আশা না দেখে তিনি গলাবাক্সার
ব্যবস্থা দিলেন।

আমাদের সংবাদ-প্রতিষ্ঠানের আরু শেষ হ’য়ে
গেলো ১৯৩০ সালে।

মহানগরী

ঐকরতী বোম

উদয়বির দোনাগী আলোর রঙীন প্রভাতবেলা,

আকাশে রঙের বেলা;

পূব গগনের গুপার হইতে সপ্তর্ষি রবে,

স্বর্গদেবের বাক্য আকাশপথে।

মহানগরীতে ঘেঁষে ঘেঁষে ভাঙে ঘুম,

নিজ্জাঙ্গল নগরীতে আগে ঘুম;

অজগর খেন দীর্ঘশ্বাসে শেবে

বিরট দেহটী নড়োবে গরখি’ কৌলে।

গরুগের মস্তবুৎ মনে,

রঙীন প্রভাত আশাস নাহি আনে,

আনে শুধু সাপে বস্ত্রের গান বত,

ঘর্ষ রবে অবিরাম, অবিরত;

কাকলীমুখর, শাঙ-শীতল তোবে

স্বপ্নের মত আবহা যে মনে পড়ে।

হেথা আনে শুধু ধূঁবার গতি সাপে,

অনন্দের হিরা তীক্ষ্ণ নেশার মাতে।

দ্বিগহবের গ্রন্থের সুখী চক্রাবর্তনে,

আনিছে লাক্তি,—ক্রান্ত, ক্লম মনে,

এখন নগর নিম্নব হয়ে আসে,

প্রান্ত প্রতিক দুদার বৃক পাশে।

মাকে মাকে আসে ফেরিওয়ালার হাঁক,

জানালার পাশে, ‘আইশক্রিবেহ ডাক’।

অনপদবুৎ হেরি কতু বাতাসানে,

পথ হেরে শুধু উদাস সে ছ’নয়নে,

ট্রাম, বাস চলে,—নাই তাতে কোন ডিঙ,

সুনারে পড়েছে খেন শিত্ত অধির।

অন্ত-তপন শেব আলোকনা দিহে বরণীর গায়,

বিদায় লইয়া যায়।

এবার আবার কোলাহল হব ত্বক,

হাজার আগে, গরজন আগে শুক।

ক্রান্তি নেয়েছে এখার নগরী ঘেরি

ক্লম সাঁঝের ভায়ার ঘোমটা পরি’।

বিবধ রান নগরিক মলে বলে,

কর্মকলানে আগনার পথে চলে।

বাত, নিম্নব মৃক বেনার রূপ,

অবলর আশা হেথা রহে নিম্নব।

দুর্ভে বোকা নিরত জীবন তারি’,

বাহাতা বেতছে ভেঙে বহন করি,—

তাঁহাদের দৃষ্টি লেখা আছে ইতিহাস,

গভীর ব্যপার রাখে লেখা হাজতান।

হাওয়ার স্বপ্ন হলো স্বাভাৱ নিশ্চল,
 তিল, তিল ব্যথা মনে ওঠে পলে পল ;
 সে ব্যথার রূপ আঁত, বক্ষণ রূপে
 ক্লান্ত, ডগ্ন শরীরে তেপেছে চুপে ।
 শত আদর্শ হলো ব্যর্থ অবমান,
 তবু তার নত সহিষ্ণু অসমান ।
 তারপরে আসে মহানগরীতে অভিসার ভরা রাত্তি,
 জলে ওঠে শত ব্যক্তি ;
 অভিজাত পথে রূপলক্ষ্যার লীলা,
 আঁখিরে সাজায যেন ধনুকের ছিলা,
 সে কালো নয়ন বিছাৎজ্যোতি হানে
 লহন বাণ নরনের কুণে আনে ।
 নীরব, নিভৃত কোন পল্লীর বুক,
 গনিকা গাভারে বুমে ভরা দুই চোখে ;
 হুতা ও সাকীর মূর নেপায় নহে,—
 ভীত পাশব বিবেক জ্বালায় ঘেহে
 ধলে ধলে আসে গোপনে এ পথপাশে ;
 বহনানব অষ্টহস্ত হাসে ।
 মংগারাজি ; নির্জন পথে ভুলি,
 মহানগরীর করুণ আভাসনি ।

সামান্যবস্ত্রের তপ্ত হীর্থবাস,
 কত ভুল-বোঝা, বেদনার ইতিহাস ;
 কত বকনা,—কত বে অত্যাচার
 আকাশে, বাতালে ফুলিতেছে হাহাকার ।
 শত অচিহ্নিত, কষ্টের নিশেধণ,
 মনের বুকু কত শত অগণন,
 তবু নিশিধে মধুর মমিমা বাড়ে,
 উক নিশাস লাগিছে আবার গারে ।
 অগছ বাধার ফুলিরা ফুলিরা উঠে,
 বাধন শব্দেও বৃষ্টিবা কেনিবে টুটে ;
 ব্যাকুল তাহার অন্তর বেদনার,
 উজ্জল ব্যক্তি নিঃশব্দ হয়ে যায় ।
 যৌন বাসিনী ; নিঃশ্বাস চাপি ভনি,
 পাথরের নীচে অপ্রভ এক ধনি ।
 আঘেরগিতি রচনা হতেছে হেথি,
 বুক জনতার চারিপাশ ঘেরি ঘেরি ।
 গ্যালের আলোক নপূর্ণ করে জলে,
 রাত শেষ হয় ; পুর্বাকাশে আলো কলে ;
 আবার-আলোর বিলন লীমার মাঝে,
 লুকানো বিবাহ কাঁটার মতন বাজে ।

—না, তা নয়।

—তবে?

—যে রক্ত তোমাকে বিয়ে করতে পারিনি সেই জন্তই। আমাদের কলনার স্ত্রীর পুত্রবীর্য বাইরে আছে এক রক্ত বাস্তব জগৎ। বেকার আমি। তোমাকে বিয়ে করার অধিকার আমার নেই।

—বেকার তুমি তা জানি, কিন্তু তুমি শিক্ষিত। কাজ একটা না একটা তুমি পাবে।

—চাকরী হবে পাব আর পেলো তাতে বিয়ে করা চলবে কিনা তা জানি না। অমিত্রিত্বের মাঝে বলে ভবিষ্যতের স্বামী হল দেবা চলে, কিন্তু অপরের জীবনের তার নিয়ে তার ভবিষ্যৎ নষ্ট করা চলেনা।

—এত কাপুরুষ তুমি! সুঁকি নিতে তর পাড়। ভবিষ্যতের ছাংখের ভয়ে আমি ভর পাই না। আমার স্ত্রীর বিশ্বাস জীবনে তুমি উন্নতি করবে।

—বিশ্বাস আমারও ছিল। তাই তোমার সংগে বসিষ্ঠতা বাড়াতে সংকোচ করিনি। কিন্তু শুধু এক নব্বয়ের জন্ত এবার এখন বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে ফেল করলাম, তখন মনে হল শুধু ঐ এক নব্বয়ের জন্তই আমার জীবনের বড় বড় সুযোগ এমনি করে হারিয়ে হবে।

—তোমার ঐ এক নব্বয় আমি না হয় দিয়ে দেব।—
পরিচিন্তা মিশ্রি হেসে বলল।

অরুণ হাসল।—সে দেওয়া নেওয়ার খেলার তুমি হরতঃ আনন্দ পাবে, আমার তর বুঢ়বে না।

—কম্পাউন্টেন্টালে তুমি পাশ করতে পার, তার পরই তো চাকরী পাবে।

—না পরী, কম্পাউন্টেন্টালে পাশ করলে ভাল চাকরী পাব না। তা ছাড়া বেসোমশার এলেক্সাই রিটার করবেন মিনিটারী একাউন্টন্ট থেকে। এ বছর পাশ করতে পারলে একটা ভাল চাকরী পেতাম তার অকিলে। সামনের বার পাশ করলে ভাল চাকরী তো

দূরের কথা, চাকরী যোগাড় করাই মুশকল। বা বাজার! বুদ্ধি ভবিষ্যতের পেই তাবনাই মন জুড়ে বলে অরুণের, গালে হাত দিয়ে মাথা নিচু করে বলে থাকে সে।

—অরুণ! আমার দিকে তাকাও, বলতো কেনন করে আমি বরণ করে নেব আর একজনকে!

অরুণের নেনে এসেছে ঘরে। বাহিরের আলোর একটা মলিন আভা শুধু উপলব্ধি করছে পরস্পরের অবদ্বিত্তি। পরিচিতার দিকে তাকিয়ে দেখে বাহিরের বাদল আশ্রয় নিচ্ছে তার চুটি চোখে, ঘুরে ঘুরে দিচ্ছে তার গালের চন্দনরেখা।

—এবার তুমি বাও পরী, তোমার বোঁজ পড়েছে নিশ্চয়। এমন তাবে কেউ আমাদের মেথলে তোমার আমার লোকনিমাই শুধু লাভ হবে। তাছাড়া আর এক বাড়ীর বন্ধু হতে তুমি চলেছ, তাবের কানে এ কথা পেলো লাবা জীবন তোমার ছাংখের অন্ত থাকবে না।

—অরুণ, আমার ছাংখের কথা বললে না? তুমি কি তাব এ বিয়েতে আমি সুখী ছব? যে মন একবার একজনকে দেওয়া বার, তার উচ্ছ্বিত দিয়ে কি আর কাউকে সুখী করা বার, না সুখী হওয়া বার?

—মনের এটা বিকার কিনা জানি না, তবে আমার মনে হয় অবস্থার বিপাকে মানুষের মন সব স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়, আর সে অবস্থায় খুব কঠোর না হলে মানুষ সুখীই হয় সব সময়। তোমার সামনে এক আনন্দময় জীবনের সম্ভাবনা। তোমার স্বামী যিনি হবেন তিনি হয়তো স্নেহের মন, শিক্ষিত মন, কিন্তু তিনি ধনী ব্যবসায়ী। জনৈকি মিনিটারী কন্ট্রোলারের টাকা করেছেন। জীবনকে ভোগ করবার জন্য বিলাসের বস্ত্র উপকরণ বয়স্কাস, সবই তার আছে এতদূর পরিমাণে। তোমার বসন্ত স্ত্রীরী স্ত্রীকে তিনি মিত্র সুখী করবেন।

—থায়লে কেন বলে বাও।—হাসতে চেষ্টা করল

পরিচিতা, সাহস না। নির্ধাক হয়ে ব্যর্থ অল্পের
 মুক্তিলাপ পরিচিতার বিপদ করবার ব্যর্থ প্রয়াস দেখে।
 একই কাছে এগিয়ে আসে পরিচিতা। পরিপূর্ণ দৃষ্টি
 মেনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে অল্পের ছুইচোখের
 দিকে।—তবে কেন বলেছিলে সেদিন তোমার মুকে
 আমার মুখ টেনে নিয়ে—পরী, হৃৎকরের উপলব্ধি আমার
 লাভ করেছি অল্পের, পরস্পরকে ভালবেসে। বাইরের
 ঐশ্বর্যে হরতো আমাদের ঘর তবে উঠবে না, কিন্তু
 মনে আমাদের হৃৎকরের যে অনন্ত ঐশ্বর্য ঠাই পেরেছে,
 বাইরের কোন কঠিন দাবীতে তা ছুঁয়ে বাবে না।
 হাসল পরী, বড় করণ সে হাসি।—আজ বুকেছি তুমি
 বলেছিলে তা শুধু বলার জন্ত। কিন্তু আমার সবত
 ছন্ন সেদিন ঐ কথা শোনবার জন্ত, ঐ কথা বলবার
 জন্ত উদ্ভূত হয়ে ছিল। কেন? কেন বলেছিলে সেই
 মিথ্যা কথা? উদ্ভেজনায় তার চোঁট দুটো কাঁপতে
 থাকে। তারপর দুহাতের পাতার মুখ ঢেকে কেলে সে।

উঠে বাড়ির অল্প। হাতটা আলতোভাবে রাখে
 পরিচিতার মাথার ওপর।—বিশ্বাস কর পরী সেদিন
 আমি মিথ্যা বলিনি। আজ কিন্তু সে কথা আর কোর
 দিয়ে বলতে পারবো না। আজ আমি হরতো ছুঁল,
 হরতো ভীক। তাই তোমাকে এমন নিশ্চিত সুখের
 জীবন থেকে বঞ্চিত করতে সাহস পাচ্চিন।

বুকেত পারে অল্প সাধনা পরিচিতার দ্বন্দ্ব সাধন
 করছে না, বাড়াচ্ছে তার অস্ত্র বেগ। এমনভাবে
 পরিচিতাকে আর এখানে রাখা যায় না, হরতো এখন
 কেউ বোঝে এসে পড়বে। যেমন করে হোক বিয়ের
 কনেকে পাঠাতে হবে তার নিজের আশপাশ, বিবাহ
 বাসরে।

—শোন-পরী, তোমাকে বিয়ে আমি করতে পারি
 সুরমার বাবার কাছে আমি কথা দিয়েছি।

চবকে ওঠে পরিচিতা অল্পের দৃঢ় কর্তব্যের। কারা
 দেখে যায় তার, নিশ্চিত ছুঁই বেসে ধরে অল্পের দৃঢ়
 সংকল্পবদ্ধ মুখের দিকে।

—তোমাকে তা জানাতে পারি নি কারণ তুমি
 দ্বন্দ্ব পাখে। সুরমার বাবা আমাকে ভাল চাকরী দেবেন
 বলেছেন। কীবনের স্নান, উন্নতির বহু আশা দিয়েছেন।
 আর—একটু থামে অল্প, একটি হাসি তার মুক্তি
 চোটে খেল যায়।—সরমাক্ত বেশ মেয়ে।

আকস্মিক আঘাতের বিফল ভাব কাটিয়ে ওঠে
 পরিচিতা। মুক্ত, পূর চোখ দুটি তার ভয়ে ওঠে তুমার।
 ওঃ বেশ!—বাড়িয়ে ওঠে সে সন্তের অঙ্গী নিয়ে, দৃঢ়
 কর্তে প্রসন্ন করে।—জানতে পারি কি আমার মন নিয়ে
 এ খেলার কি প্রয়োজন ছিল?

অল্প বাড়িয়ে থাকে নিরুত্তরে।

—ভুল আমারই। এ প্রস্তাব উত্তরতো তুমি দেবে
 না। যেহেতু মন নিয়ে খেলা যে তোমাদের দেশ।
 ‘আনন্দ পাও তাদের সংগে ভালবাসার অভিন্ন কবে,
 গৌরব অমূল্য কর বন্ধুদের কাছে সে গর বলে। তার
 সন্তের কষ্টের একটু যেন স্মিত হয়ে পড়ে। যদি
 মুক্ত সে খেলা আমাদের কাছে কত মর্যাদিক। না
 তোমাকে ও কথা বলে লাভ কি!

—তোমার বেরী হয়ে যাচ্ছে পরী। শুভ লক্ষ্য রাখা
 বরষেতে দিও না।

—চুপ কর! ও নামে আর আমাকে ডেকো না।

—কোন নামেই তোমাকে আর ডাকব না পরিচিতা,
 আমার অধিকার ছুঁয়ে গেছে।

—ওঃ কি ভীষণ ঠক তুমি!

—তবুতো সর্ব বাকতে তা জানতে পেরেছ, ভাগ্য
 তোমার প্রতি বিপদ নয়।

—হী ভাগ্য আমার প্রতি বিপদ নয়। সাধারণ
 কেরানীর ঘরে হলেও আজ আমি বড় বরের ঘোঁ হতে
 চলেছি। তবুও দুর্ভাগ্য আমার, তোমার সঙ্গে পরিচয়
 হয়েছিল।

—দুর্ভাগ্য তোমার জীবনের সামান্য ক্ষতি করতে
 পেরেছে, ভাগ্য তার অমূল্য সুখের ভাঙার নিয়ে
 তোমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। যাও, পিছু কিয়ে

তাকিও না। একটি হাতের ছুঁথের কাছিনী আগামী বহু বছরের দিনের মাকে কোনদিন মনে পড়বে না।

—আবার কাণ্ড হচ্ছে, লক্ষ্য করো না।

পরিচিতার বাগ দেখে অসহ্য ভাবে হাসে অরুণ। কিছুতেই সে যায় না! নিজেই ঘরের বাহিরে বাবার জন্ত এগিরে যায় অরুণ, তারপর পিচনে কিংবদন্তি বলে।—
অন্য হও পরিচিতা। ক্রতপদে বাড়ীর বাইরে যায় সে।
মধ্য রাত্রি পর্যন্ত কাটাতে সে তরঙ্গার বাহিরে, লক্ষ্যহীন

সময়ে অসহ্য চিন্তার আর ভাগ্যকে মনে মনে বিজ্ঞপ্তি করে।

পরিচিতার বিবাহ সেই রাত্রে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়েছিল।
ধবর পেরেছে সে, হুঁসে পরিচিতা স্বামীর ঘর করেছে।
তাদের ঘরে এক নতুন অভিধিও এসেছে।

আজও কি পরিচিতার মন উদ্ভূত হয়ে আছে সরসার
সঙ্গে তার বিবাহের সংবাদের শোনার জন্য? নিজের
মনেই হলে ওঠে অরুণ।
বাহিরে গানাই কেঁদে চলেছে।

পারডি সর্বোদয় সেবাসংঘ

শ্রীমণিলাল চক্রবর্তী



বিকারের দেহাত। দেওঘর থেকে সাত-আট মাইল
হুঁসে পাঁচাডের কোল বেঁচে পারডি। বাস করে এখানে
ডোম, চাঁদের প্রকৃতি শুধাক্ষিত অশ্লীল প্রেমীর মাহু।
পেটে তাদের অর কোটে না, পরিধান বস্ত্র নেই, গিটে
নেই জ্ঞানের আলোক। চির-নির্ধাতিত, চিরশোষিত
এই মাহুগুণো যেভাবে দিন শুভগ্রন করে তাকে ঠিক
মাহুগুণের মতো বাঁচা বলে না। ছুঁথবন্দার নিরস্তর
আঘাতে ছুঁকুট করত করতে তাদের নিয়ানল বিনশলি
কোনোরকমে ঠেলে পার করে দেয় মাহু।

বস্ত্র দেড়ক পূর্বে এখানকারই ডোম বস্ত্রিতে এক-
খানি পরিত্যক্ত ভাঙা কুটীরে সৌরেননা (সৌরেন্দ্রহুমার
বহু) এসে উঠলেন, সর্বোদয় সমাধের আদর্শ হুঁসে নিখে,
সেই আদর্শকে বাস্তবে রূপান্তরিত করে তুলবার মানসে।
এখানকার কারও সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই, তাছাড়া তাদের
ব্যাপস্য নয়। চেহারা তাদের অত্যন্ত নোংরা, পাহাড়ের
কঠোর নিষেধের নিকরূপ রূপ তাদের চোখে, হুঁসে,
সর্বোদয়ে। এদেরই উন্নয়নের ভিত্তিতে, সর্বোদয়ের পন্থন

হবে—এই তাঁর আশা, এই তাঁর লক্ষ্য।

আমি যেদিন প্রথম এখানে এলাম, বিস্মিত হয়ে
বেখলাম, যে পরিত্যক্ত কুটীরখানিতে এই সর্বজ্ঞানী
কর্মী, একমিষ্ট সেবকের আসন পাতা হুঁসে ত্যাগ
দিনের সজিত ধূলায় স্থলে আচ্ছন্ন। তারই মলিন
মেতেতে এক বাড়ী থেকে তিকে করে চেরে-অনা
একটি বেঞ্চর পাতার চাটাইয়ের উপর তিনি বিছিয়েছেন
শায় কলখানি। কিন্তু সখল তো তাঁর কিছুই নেই।
হাতে একটি পরলা নেই, বাঁহে কাঁচ কোন সখ্য নেই,
সরী ছুঁতেছে এদেরই একটি পাহাড়িকা শোকে।

পাহাড়ের পাদদেশে উঁচু নীচু চাষু জমি। সাগা
সাধা পাথরগুলো বুঁজার মতো বেরিয়ে পড়েছে।
মাকে মাকে গোপা গোপা টোপরের মতো আম মাহুর
গাছ—আবার রথের চুড়ার মতো খাল-বনানী ঘিরে
আছে দীর্ঘ ঢালু জমির গায়ে গায়ে। হুঁসে পূর্বদিশতে
পর্বতের শিখরদেশ নীল আকাশের সঙ্গে মিশে গেছে।
পশ্চিমে আর এক নিভৃত পর্বতমালা খানসহ হয়ে আছে।

উত্তরে বুদ্ধ ব্যাঘ্রের মতো শিকারে বিরত হয়ে বিশ্রামে যত আর একটা সাহাড়। জংগলের মধ্যে একখানা ভাঙা ঘরের অবশিষ্ট পড়ে আছে। বাঘের পরিত্যক্ত মারিত্রের জীর্ণতা নিয়ে সে এখনও দাঁড়িয়ে আছে ভূত প্রেতের আত্মনা হয়ে। একটি বিশাল জলাশয়ের চতুর্দিকে বাটীর বাঁধ বেওয়ার অল্প প্রায় দুইশত নারী-পুংসবের সম্মিলিত অভিবান চলছে। তাদের সার বেঁধে পিল পিল করে এগিয়ে যাওয়া এক মনোরম দৃশ্য। কুলী খাটানাই এখন প্রধান কাছ হ'ল। কিন্তু হজুর না হলে সে তাদের বন্ধু হয়ে এসেছে এই কথাটা তারা বিশ্বাস করত বা নাই করত আমাদের বলার জটী ছিল না।

অগরের বব, কিন্তু এখন তো আমাদেরই ভেড়া—তার সংসার না করে নিলে কেমন করে বাস করবে? একটি কুঠুরীতে সৌরেননা উঠেছিলেন—অগর কুঠুরীটা বাঘের অঙ্গবা ছিল। লোক লাগিয়ে সাক করা হ'ল। মরঝাও খাটিয়ে নেওয়া হ'ল। উন্নতের ব্যবস্থা ছিল না—ইটের পরেই গালা হাফিল পলাপ ও মহারার শুকনা পাতা দিয়ে। উহন তৈরী করা হ'ল—মাজির হাঁড়ি এবং তিন খানা খাশা, দু'টি বাটি ও দু'টি গাল এখন আমাদের অঙ্গবাব। দুখানি কোদাল দুখানি রাইতি আমাদের জগাম হাতিয়ার, একটা বাসতি জলাধাররূপে আছে। দেওঘরের আর একটি ভাই আমাদের সাথী হয়েছেন। ভাল পরিবারের ছেলে, পুরাণো কর্মী নর। করেক মাস কেটে গেল। আমাদের এই জংগলে আসা বা এখানে থাকে যে মোটেই নিরাপদ নয় এবং নিত্যই পাগলামি, একথা বারবার আমাদের বন্ধুত্বেরা শোনাতে থাকলেন। হেসে তাদের জবাব দিই দু-একটা কথা। প্রতিবাদও করিনা, সম্বর্জনও করিনা। তিন মাস পরে সৌরেননা কোলাকাতা গেলেন—যখন ফিরলেন তখন কিন্তু একা নয়, আরও তিনটি সখী নিয়ে এলেন। একজন প্রোট, আর দু'টি বোন। প্রোট বাজিঙ্গী সর্ব-জাগী গৃহী সন্ন্যাসী, শ্রী অববিনের তক্ত। নিজের সব

কিছুই ভাগ করেছেন দেশের অক্ত। এক সময় বাংলার বিপ্লবী বলে খিচিট খান অধিকার করে ছিলেন। বাংলার চন্দননগরের সুবিখ্যাত শেঠ পরিবারের মূলস্থান। বোন দু'টি নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের বেগুন-রো সংস্থা থেকে এলেন। গৃহস্থ জীবনের রূপ-দানকারী শিল্পী এলেন—কলে অতিষ্ঠ এই খাপছাড়া বোংরা গৃহী উল্লস হয়ে উঠলো তাদের নিপুণ হাতের স্পর্শে। করেকজন হরহাডের আশা একটা স্মরণ গৃহস্থালীর আকার ধারণ করল। দুখের হাঁড়ি মলসার কোটা, জলের আধার, বাসনপত্র, কাপড় চোপড়, কাপড় মেলবার তার, এইরকম আরও কত কিছু বেড়ে গেল। তার সংগে প্রাণা পায়খানা, বাসকন ইত্যাদি ও ব্যবস্থা হলো। বন্ধুরা অধিকন্তর আশ্রয় হলেন যখন এই পরহীন, মহারহীন, জংগলের মধ্যে বেতেরের নিয়ে আসা হলো। দিন বার, বোন দু'টি বর সংসারের কাজ দেখে আবার বস্ত্রীতে বেরিয়ে ভোমেরের ঘরে ঘরে বার, তাদের সংগে পরিচর করে তাদের কথা বুঝতে চেষ্টা করে। সবচেয়ে আনন্দ হ'ল যখন বস্ত্রীতে একটি সেরে লাভেরা গেল যে বাংলা জায়ে। সে নাকি তার স্বামীর সংগে বর্ধমানে করলার খাদে কাজ করেছে। আরও দিন কেটে বার। ভোমেরের ফেলে-দের টেনে এনে আমাদের একটা বোন আমগাছের নীচে জুল বসার। তিন তৈরী করার তক্ত কুলীরা কাজ করে—বঁধের কাজ প্রায় শেষ হয়ে গেল। যে অমিত্তে আমাদের তবিত্ত আশা স্থাপন করা হয়ে—মিত্রী লাগিয়ে সেই জীর্ণ ঘরের রূপ বদলাবার উদ্দেশ্যে দেওঘাল গাঁবা সুরু হয়। কিন্তু কবে তার উপর চাল উঠবে তার টিকানা নেই অবস্ত্র—কাগজ টাকা কোণার—আমরা ত খুনাহাতে। হাতে হাতে করেক সের করে চাউল কেনা হয়। ভাগ্যক্রমে একটা ডুবুরের গাছ আমাদের ছিল—গাটীটা বৃক্ষ হতে আমাদের কলদান করতে থাকল। বর্ষা এসে গেল। চাদের কোন বন্দোবস্তই নেই। অনেক কটে একজোড়া বদল ও একজোড়া গরু আনা,

হ'ল। ইতিমধ্যে আরও দুজন মজুর তাইকে (সাঁওতাল) আমাদের সাথী নেওয়া হয়েছে। আমাদের বড়ীসীর নাম বীরনিয়া—আর কমি পারভিতে। গ্রাম আধ মাইল দূরে। মত্স্য পরিত্যক্ত বাড়ী ঢুকুদিকে বৃহৎ অংগল এবং কটকে ঘেরা। বাড়ীর দক্ষিণে একটা বৃহৎ মহা গাছ তার বিস্তৃত শাখা প্রাণাধার গৃহটিকে রক্ষা করেছে। তৈয়ারের প্রাণর তাপে শরীর বেশ আত্ম-নেত্র তাপে বলসিয়ে দেয়। উত্তপ্ত হাওয়া বেশ অগ্নি বর্ষণ করে। বর্ষার প্রান্তরে আরও করে কটী বোন এল—আমাদের পুত্র পৃথকী এখন লোকে তারা। আমরা সংখ্যার গ্রাম বোশটি। কলরব করে নানান কাজে দিন কাটে। বর্ষার মধ্যেই বহু ক্রমশে জীর্ণ ঘরটিকে জল কৌত্র থেকে বাচিয়ে ছাউনি নেওয়া হয়েছে। এ বেশীর ভাষায় বাপড়ার ছাউনি।

মহাবতী সময়ের ব্যাবহািক বর্ণনা করব না। বহু কিছু সময়ও নুতন পরিবেশের মধ্য দিয়ে দিন গেছে, বুটের লব লিগবার সময় কোপার—হিসাবই বা কে রেখেছে—আর বৈধ বরে গুনবেই বা কে। কমতার অসুপাতে শ্রম অধিক হওয়াতে অসুস্থ হয়ে পড়লাম। একমাস পারভির নুতন বেরামত করা অসম্পূর্ণ ঘরে কাটিয়ে স্মৃতিকিংসার জ্ঞত বেওঘরে কানান্তরিত হলাম। দীর্ঘ তিনমাস আমাকে বেতঘরে বাস করতে হ'ল। এই অসুস্থতায় সময় সৌরেনদা একাকী অবর্ণনীয় কঠোর পরিশ্রম করে এবং সংসে সংসে চরম অববৈজ্ঞ নিরে কাটিয়েছেন। শীতের তীব্রতার হ্রাণ তার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ফুটে উঠেছে। বেওঘর থেকেই জানলাম বোনদের সঙ্গে আরও বুদ্ধিলাভ করেছে। ভিসেবরের পথে আর একটি ভাই করী এসেছেন। অবশ্য তিনি পূর্বে করী ছিলেন না। জাহ্নবাঙ্গীর প্রাণর তারিখে আমি ফিরে এলাম আমার পূর্বতন আশ্রয়। তখন আর আমরা অগ্নের গৃহে নয়—হান পেরেছি আপনায় গৃহে। অবশ্য আমরা যে কখনও পয়ের ঘরে বাস করেছি এ বোধ ছিল না। এখন আমাদের রাজ্যের

হয়েছে, গোয়াল হয়েছে, গাইও এসেছে—লাল টু-টকে পুত্র সন্তান—নাহ তার লাগচান। ঢেঁকীশালায় ধান শিবাই করে বাড়তা হচ্ছে। সে ধান নিজেদের অবিচ্ছেদ্য হয়েছে। কিন্তু সেও বছর পূর্বে বীরনিয়ার বে গৃহে আমরা ১৪১৪টি লোক বাস করেছি—তার একখানি নারী ঘর আর তারই বারান্দার ছিল আমাদের রত্নইখান—সেই ঘরেই প্রার্থনা, বহু লোকের উঠানবা আবার রাজ্যে বিছানা ফেলে শোওয়া—আবার অস্তিথি এলে তাঁরও অত্যাধন। তারই মধ্যে। এতকাল আমাদের তাইদের, বারান্দার এবং প্রাণের বাইরের উঠানে হাড কাটাতে হয়েছে।

দিনকৃত অস্তিবাচিত হয়ে যায়। মনের গতি ভগ্নপেক্ষা কৃত কিছু বাড়বের গতিতো মনঃ। তবু আজ আমি যে বর্ণনা করছি তা আমাদের মত কর্তব্যকন্য পুত্র লোকের কাছে চমকপ্রদ। আজ আমাদের বিতীর্ণ গৃহ প্রবেশ হয়েছে। সংখ্যার আমরা এখন গ্রাম চৌকিপ্র জন। তার মধ্যে করে কটী শিশুও আজ আমাদের মধ্যে স্থান নিচ্ছে। দিনরাত তাহের কলতান ভেগে আসে—কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে দানসও করতে হয়। দুটা গাই শিশু ফ্রোডে ভায়ে বাইরে গাড়িরে জাবর কাটে। লাগচাদের হৃদয় প্রতাপ সফলকে বিস্তৃত করে। মনঃও বলবে উঠা—মজুর তাইরা গবেশ নিরে বাটে বার, আমরাও তার লহনারী হয়ে চাবে সংখ্যতা করি। দীর্ঘদিনের বগ্ন আজ বাড়বে রূপলাভ করল, নিজ হাতে চাব করেছি—আজ পুত্রাপুত্রি চাবী। এবেশের বগ্ন গৃহবের মত আমরাও ১৪১৯ বণ মনের বীজ ফেলছি। তবু তাই নয়, তাবলেও আশ্চর্য হুজি এখনও কর্মীদের বাড়ের ব্যবস্থা নাই।—কর্মীদের সংখ্যা হিসাবে স্থানাত্য। কিন্তু বাৎসর্য পতিশক্তি বোন এল, এখানে গ্রাম সং-পঠনের শিক্ষালাভ করবার জ্ঞত। এল নয় তাদের এক-রূপ জোর করেই আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাঠান হয়েছে। কারণ কোন দিক দিয়েই আমরা এখনও প্রস্তুত নই।

বোনদের ভিনমাস কাটলো এক কর্তব্য প্রবাহের মধ্য দিয়ে। তোর চারটা থেকে তাত লাড়ে দশটা পর্যন্ত গড়ি গেরে চলা। তার বহো ক্ষেতের কাজ, চরখার কাজ, চাষের রাস, ভূগোলের রাস—আবার মৃতশিমের রাস প্রভৃতি সব করতাই তাদের পালন করতে হবে। অপূর্ব নিয়ম-নিষ্ঠার মধ্যে তারা নিখেরের পরিচালিত করল। আরও অত্যাধিক করতে হয় যে, এই আর বাটজন লোকের আহারের ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করা হয়েছে। ভিনমাস কেটে গেল। তাদের বাবার দিন এলো। এক গভীর ভালবাসার বন্ধন ছিল হবার বন্ত তাদের জোর করে এখানের মারা কাটাতে হ'ল। তাদের আশ্রয় সংগে আমাদের যে পুণ্য যোগাযোগ হয়েছিল—তার সত্যকারের প্রমাণ হ'ল তাদের বিদায় ক্ষণে। তারা এখানের কাজ করেছে—আমাদের সেবা করেছে—এই সকল দরিদ্র নোংরা বস্ত্রের বরলা সাক করেছে—কল্যাণ রোগীর বসন্ত নির্বিকার চিহ্নে সাকাই করেছে। নিম্নহাতে কাটা মৃত্যুর কাপড় করতে দিয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় পৌরবের এবং আমাদের নিকট বিশেষ স্মরণীয় যে, ৬০ বিঘা ভূমির দান চাব তারা নিজ হাতে রোপণ কাজ শেষ করে গেছে। এটা তাদের কীকর এক নতুন ঘটনা হয়ে থাকবে। ঐশ্বর তাদের সহায় হোন—যেন কীমনে তারা কার্ণের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে। আমাদের বোনরা গ্রামে গ্রামে যায়—চরখা চালায়—সাকাই করে—শিল্পের ধুরে সাক করে। হরিজন এবং অদিবাসীর ভেলে বেরেদের ঘরে নিয়ে বিদ্যা দেওয়া হয়। এখন তোর পৌনে চারটার শ্রমাত্যাগ করা হয়। চারটের প্রার্থনা। প্রার্থনান্তে লাড়ে চারটা থেকে লাড়ে পাঁচটা অবধি দুঃখবন্ত। তারপর চলে সাকাই—গোয়াল সাকাই, বাড়ী সাকাই।

পারখানা সাকাই ও পিসাবখানা সাকাই। তারপর স্নাতঃশাশের পর কাজ শুরু হয়। মজুর তাইরা বাল নিয়ে জ্বিলতে চলে যায়—তাদের খাবার সেখানেই বোনেরা

মাখার করে পৌড়ে দিয়ে আসে। এগারটার কর্ম নিরতি হয়। পৌনে বার থেকে পৌনে একটা অবধি তোজন চলে। আবার সওয়া দুটোর কর্তব্য—আড়াইটার কর্তব্য শুরু হয়। গ্রামের কাজে নিযুক্ত বোনরা গ্রামে চলে যায়—হরিজন বস্ত্রীতে বস্ত্রীতে বেরেদের চরখা দেখাবার জন্য। মডেল রাস পুজার ছুটিতে বন্ধ। আমাদের শিক্ষক ৬৭জার অন্য ছুটি নিয়েছেন। অন্য তিন বেতন তোঙ্গি নন—একটা মদগুণী নির্বাসন গ্রামে চলে। বিকালে সববেত জাবে ক্ষেতের কাজে নেমে পড়া হয়। এক বছর পূর্বে যে স্থান বরজুদি ছিল—যে মাতী মধ্যে আমাদেরও বিবাস আগেনি যে, এখানে কোন প্রকার শক্ত বা সজ্জী সৃষ্টি করা যেতে পারে, আজ এক বছরের চেষ্টার ফল চালা এবং বিশেষ করে বোনদের আশ্রয় সেবার (অবশ্য তার মধ্যে কলকাতা থেকে আগত শিক্ষার্থীরাও আছেন) আজ সেখানে সমুদ্রের হাট বসেছে। একদিকে কঁকড়া কঁকড়া তুলোর গাছ, অপরদিকে বাংলার পাট মাথা চাড়া দিয়ে উঠে ঘন ভংগল করে কেলেছে—বেড়ার গারের গারের কত সত্য জড়িয়ে উঠেছে—বেতন গাছ বেশ শক্তি নিয়ে ঠাঁড়িয়েছে। চোপা চোপা বেগে গাছগুলো বেশ আনন্দের সংগে সার দিয়ে ঠাঁড়িয়ে পরম্পর যেন ঘর সংসারের কথা বলাবলি করছে। চ্যাঁড়োশ পাণ্ডা প্রভৃতি ফল দিয়ে বাড়ী ভরিয়ে দিচ্ছে—আজগাছ ফল করে অবনত হয়ে পড়েছে—কুমড়াগুলার আকৃতি বোটেই কুমড়ার মত হয়নি—গোমরা সাপের মত চিহ্ন। এ দেশের লোকের মনে বিশ্বাস আগাচ্ছে। অসহরের কপি পরীকার ক্ষমতা রয়েছে। কিছু ঘরে তুলোর ক্ষেত অসাধা অপূর্ণ বৈধ নিয়ে ঠাঁড়িয়ে আছে। কি হলে তাদের কলংক বৃদ্ধি পেতে পারে ও ভবিষ্যতে ফলদান করতে পারে তার পরীক্ষা ও ভাবনা চলছে।

আম, লিচু, পেয়ারার এক কলিত বাগানে আমাদের এই অর্ধ সাকটের মধ্যেও ১৪খানা কলম লাগানো হয়েছে। বছর কাছে এক নতুন অদিত্যে খানের ক্ষেতের

সবুজ আঙা এক শত শ্রাবণ মনোরম দৃশ্যের অবতারণা করেছে। তারা কৈশোরের আনন্দে হেলন ফুলে বিন কাটাচ্ছে। ঐ মনের ক্ষেত্রে পাশে একটি অধঃস্থতার গুহ্যের কাণ্ড কাণ্ড করে ওঠা জল এই শুভ মন্ডলে প্রাণের লক্ষ্য করেছে। এই অধঃস্থতার চমকিত জলধারের তীরে তীরে ছোট ছোট ভাঙ্গা গাছের সারি এক অপূর্ণ গুহ্য ফুটিয়ে তুলেছে। আঁখি আঁখি লোক কন, জমি বৈশি, সফল গাছের উপস্থিতি কান্না করতে লক্ষ্য হচ্ছে না। সন্ধ্যা চটায় কর্ম বিরতি হয়। সাতের চটায় প্রার্থনার প্রার্থনা। নোনে সাতটার শান্ত পরিবেশে প্রার্থনা সূচক হয়। মধ্যাহ্নের পর হিম্মি ও বাংলা দুটি ভজন ও রামকৃষ্ণের পর প্রার্থনার অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়। রামায়ণ পাঠ ও ভক্ত বাংলা: অর্থ আলোচনার পর দুটা কাটার প্রসঙ্গ হিম্মি নেওয়া হয়। প্রয়োজনীয় চর্চা শেষ করে পৌষে আটটা থেকে পৌষে নটার মধ্যে আহার সমাপ্ত হয়। নটা থেকে সন্ধ্যা মনটা ব্যক্তিগত অধ্যয়ন শেষে মনটা বিশ্রাম করা হয়। কিন্তু এক বছর আগে এমন দিনে আমাদের না ছিল মনটা জমি—না ছিল বহুইখান—না ছিল নিরম নৃশল। ছিল না প্রার্থনার শুভ পরিবেশ—শান্ত আবহাওয়া—ছিল না প্রার্থনার বসবার আসন। কিন্তু আজ বিনোবাজীর পবিত্র শুভ ভূমিদান বজ্র অভিযানকে সকলকাম করবার অস্ত্র খানা কংগ্রেস ও কর্মীদের মিলিত বৈঠক এই দরিদ্র ভূমিহীন হয়েছিল। শত দরিদ্রের মধ্যেও আজ চম্পক জন অভিযাত্রী অভিযাত্রী পালন করতে সক্ষম হয়েছিল। বানা ভূমিদান বজ্রের প্রধান হোতা হিসেবে আমাদেরই একজন দেবকের নাম সর্বাঙ্গকরণে সর্ব সমস্ত আবে দ্বিগ করা হয়েছে। কিন্তু আমরা সকলেই বালাসী—আর বঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের সকলেই বিহারী। ভূমিদান বজ্র আমাদের প্রধান ভূমিকা নিতে হবে কারণ অত্যন্তিকি যে সাংগঠনিক পরিকল্পনা এখনও করনা ভগন্তে পুরণাক থাকে ঠিক তেমনি ততখানি আগুনের আগুন রয়েছে বাইরের সমাজ সম্পর্কে। ঐ সকল নিরম,

গৃহহীন, আলো ব্যতীতহীন অন্ধকার পরিবেশের অশিক্ষিত পল্লীবাসীরা সর্বত্রকার উন্নতি বিধানই আজ আমাদের প্রধান কাজ এবং মূল উদ্দেশ্য। অন্ধকারী আমাদের অস্তরের কথা প্রকাশ করে আমাদের শক্তি প্রকাশ করুন।

বেড় বছর পূর্বে একাকী শুভ আশ্রয় যে বাবা সূচক হয়েছিল—আজ সেই বাজাপণ কত সহজাতীয় কলমে হয়ে উঠেছে—সূচক পালিত জীব জীবোত্তর শত এলেন তাঁর সঙ্গী হয়ে। তাঁরই শুভ বাজাপণের মাঝে রচিত হ'ল আমাদের এই পাতা নিবাস। বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন মনোভা, বিভিন্ন পরিবেশের—ভিন্ন ভিন্ন রঙের কণ্ডকগুলি মানুষ আমরা এখানে এসে মিলেছি। কেউ নিমন্ত্রণ করে আমাদেরি বৈজ্ঞানিক আশ্রয়ের এ আগমন—এ এক মহামিলন। কোন এক অজ্ঞেয়বাহী আমাদের একত্ব গুলি মানুষকে এক ত্রুত টেনে এনে একত্রিত করল যে বলতে পারে! কালের গতির সঙ্গে জীবন বাজাপণ আমাদের চলছে—দিন ত্রুত কেটে বাবে—মহানগরের আশ্রানে ছুটে বেড়ে হবে সেই মহানগরের সঙ্গে বিনীত হয়ে বাবার অস্ত্র। সে গতি ত্রুত—যোত তার বরষার অবিরাম। কিন্তু এই মহামিলনের অস্ত্র যে বাতরা সেত চুপি চুপি গেলে চলবে না—তীরস্থি ভাংগতে ভাংগতে গড়তে গড়তে গেলে তবেই না বাতরার মত বাতরা হবে—সূচকসূচী প্রাণ প্রাণের করে ছোটাতে হবে। সে অজ্ঞাত মহান শক্তির শুভ ইচ্ছার আজ আমরা করেকটা ভিন্ন আশ্রা সূচক সূচকের সমজাতী হয়েছি—সেই মহান ইচ্ছা কলবতী হলেই শু হবে আমাদের জীবনের সার্বকতা। যিনি এই বিশ্বের সর্ব-নিরম—খাঁর ইচ্ছিতে স্রষ্টার প্রভীতি অণু পরমাণু নিঃশ্রিত হচ্ছে—আজ আমাদের এই সূচক সূচী এতো মহান ইচ্ছারই সূচক বিকাশ মাত্র।

তবে আশ্রুত্মের মধ্যেই মানুষ আশ্রুত্মের ও প্রেরণা লাভ করে—কবে প্রাগতি যদি নিরমের প্রাণমুখ্য এনে দেয় তবে সেখানে ইঁদুর বিক্রম হন না। তাই আমরা

এই যে প্রকাশ এ আনন্দেরই বহিঃপ্রকাশ। কর্ম সফলতা বা শুদ্ধ যত্ন বশত শানিকট্য ব্যতীত ত্রুণলাভ করে—তখন বাস্তব আনন্ডিত না হইতে পারে না। আজ আমরা বিশ্বকর্মের কাছে এই আশীর্বাদই কামনা করি যে, আমরা যেন আমাদের ভাগ্য নিষ্ঠা বজায় রেখে বোধে গ্রহ না হয়ে—নির্লিপ্ত এবং নিবিচার থেকে সেই পরমেশ্বরের মহান শুভ ইচ্ছার সংগে আমাদের ইচ্ছা মিলিয়ে দক্ষিণকর্মের সেবা করে যেতে পারি এবং সর্বোপরি সমাজের আদর্শে এই মহত্ব-পরিভ্রান্ত জগৎকে একটি শুদ্ধ সেবার পথ শান্তির আবাসে রূপ দিয়ে যেতে পারি। 'বা কিনা কালের গতির লগ্নে তেজে যাবে না—বিলুপ্ত হবে না তার অস্তিত্ব—সে চিরকাল বেঁচে থেকে মানব সমাজের শুভ কামনা করবে ও জ্ঞান বিস্তরণ করবে। প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্যের নাকে পাড়াতা সত্যতার নদ আবহাওয়া হৃদয় এই শান্ত দ্বিগুণ পরিবেশে ভারতীয় সত্যতার এক নিদর্শন হয়ে সমগ্র ভারতীয়

সমাজকে আলোকিত করুক—সমগ্র বিশ্বে প্রেমের বাণী বহন করুক—আমরা সেই কামনাই শুধু করি। আমরা শান্তির সংগে সেই বন অন্ধকারে কালের গর্ভে ভূবে যাবো—মহা শান্তির নির্বান লাভ করব। আজ বিশ্বের আমাদের সহায় হোন আমাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে শুদ্ধতা দান করুন—আমাদের অন্ধকার দূর করে আলোয় রশ্মি প্রদান করুন। তাঁর করুণার আশীর্বাদে আমাদের চলার পথ সুগম হোক, আমাদের সর্বোপরের সাধনা জরাজীর্ণ হোক। অরতু রাম।

বিঃ দ্রঃ—কলিকাতার যে বাঙ্গালী সমগ্র বহুত্ব মনঃ মানে এই সংস্কার গোড়া পত্তন হইল—তাঁর লং ইচ্ছা ও কলবতী হয়েচে। সংস্কার নামে কমি দানপত্র কড়া হয়েচে এবং বিহারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে ও সংস্কার ভিনভিন সভা ও সভ্যা এবং দাত্য ঐক্যবদ্ধতার চৌধুরীকে নিয়ে একটি ট্রাস্ট বোর্ডে গঠন করা হয়েচে এবং তাঁর যেকোনো করার কাজও সম্পন্ন হয়েচে।

ভিখারিণী

অনিলেন্দ্র চৌধুরী

বয়স যে তার কত তা চোখে দেখেও ঠাছর করা য উপায় নেই। বোল থেকে ছত্রিশের মধ্যে যে কোন একটি হ'তে পারে। আবার তার বেশী হ'লেও যিহিত হবার কিছু নেই।

হাজিয়ার পুলের ঘুখে প্রতিদিন একই আরগার সে বসে, ছোট্ট একটা ছেলে সাহসে পড়ে পড়ে ঘুমায়ে। সব সময়েই হেলেটা যে কি ক'রে ঘুনিরে থাকে এ রহস্য তাদেরই শুধু জানা আছে।

কত লোক প্রত্যাহ আসে যায়, সব সময়েই বেন তাদের ভাড়া। আশার সময়ও যেমন ভাড়া, অফিসের

৬ লালকাপির দাগ বাঁজতে ছুটে আসে, বাবার সময়ও ট্রেন ধরতে উল্লাসে পৌড়ায়।

তাদের মধ্যে অনেকেই এই সব ভিখারীর দলকে ঘোটে নজরেই আনে না। পথের পাশে পড়ে পাকা অন্ধারের মতই পাশ কাটিয়ে চলে যায়। কেউ কেউ রোজই অসুযোগ আনার কিংবা তিরস্কার করে ফুটপাথে চলার বাধা সৃষ্টি করার জন্তে। যাকে মাকে একটা ক্ষুভের ঠোঙারও খেতে হয় তাদের। এসব তাদের সেরে গেছে।

এছাড়াও একদল আছে যারা প্রত্যাহই এই ভিখারিণীকে পরস। কিয়ৎবার একটি করে। যেরকম যাকে এ পরসটাও ঘুনিরে পাকা অন্ধার ছেলেটার ওপর করুণা করে নয় এ তার নারীত্বের সম্পদের পাওনা—তাই সে নিজের আঁচলেই সেটা বেঁধে রাখে।

নিশি সন্ধ্যাভিত্তে তারা আসে, আর লক্ষাটা কখনও ছুঁতে ফেলে দেয় না। সময় হলেই মেয়েটা হাত খাড়ার আর তারা তার হাতে ভাঁজে দেয় পরমা। একটুখানি লম্বা, ঐ শ্রীহীন। বিগলবোবনার কদম্ব হাতের একপলকের চোরা একটু এতে যে তারা কী তৃপ্তি পায় কে জানে। তবু এই টুকুতেই বুগী থাকে তারা, এর বেই চায় না।

আরও একটু কম বয়স যাদের তারা থাকে থাকে এরা তপাট, 'কিছু করে খেতে লক্ষা করে না, খেতে খেতে পার না?'

মেয়েটা মলিন হ'য়ে উত্তর দেয়, 'বাবু, খেতে খাওয়ার শক্তি থাকলে কি আর এগবে আসি!'

তবু তারা বলে, 'শক্তি নেই কেন? গভরটি ত খুব রগেছে দেখছি—আবার শক্তি নেই!' ছেঁড়া কাপড়ের কীক ফিরে মেয়েটার দেহের যে গোপন অংশটুক দেখা যায় তার দিকে ইঙ্গিত ক'রে নিজেদের মধ্যে খুব হাসাহাসি করে তারা। আবার বলে, 'এদিকে লম্বা খুব। কেউ ত নেই কোথাও, কিন্তু ছেলেটি এল কোথা থেকে বাপু? তখন বনে ছিল না? বা, বা ওর বাবার কাছে হাত পাতেগে বা।'

কেউ হয়ত মনব্য যোগ করে, 'আরে ওর বাবার কি কোন ঠিক আছে। কখন কে যে কোথায় হ'য়ে গেছে ও আর তার ঠিকানা জানবে কি ক'রে।'

তিথারী সে—আত্মনবীয়াহীন, গণের আবর্জনার মতই সে দূষিত, অবহেলিত,—তবু ত সে নারী, তবু ত তার বনে রয়েছে নারীত্বের সহজ অঙ্গভূতি। সত লহর অতাব অভিযোগের মধ্যেও তা একেবারে নিঃশেষ হ'য়ে যায়নি। তাই আজও তার এসব অঙ্গীল মনসে মাথাটা ছুরে আসে লক্ষ্য। সতভিন্ন কাপড়টা বুকের ওপর তাল করে টেনে তার নারীত্বের লক্ষা ঢাকবার একপ্রকার বার্ব চেষ্টা করে। কিন্তু অভিযোগ সে জানার না কোনদিন।

এক একদিন তার পাশে একটা বুড়ি থাকে, সে

তারী যুগুয়া। সে থাকলে ঠিক উত্তর দেয়, 'আপনারেই মতই কদম্ব নোকেয়া পরসার নোত দেখিয়ে সর্বনাশ ক'রে যার। কি ক'রে তাদের ঠিকানা পাবেন বহুন। তারা যে সব তদ্বর নোকে।'

হী হী কোরে ওঠে কেউ, 'কি এতদূর শব্দ?' একটা তিথারীর যে এতবড় কথা বলার সাহস পায়।' সতীরা তাকে বাবা দেয় কিই বা কথা যায় এর,—বুড়িটা কিছু ভয় পায় না একটুও, বলে চলে, 'বাবু বাবু আপনারেই মত অনেক তদ্বর দেখেছি, টা'কে ত পরসার বোলাই নেই একটাও, মেয়েদের সঙ্গে তামাসা করার লখ দেখ না। কি দেখছেন পাঁড়ির পাঁড়িরে আপনারা তনি, মেয়ে মাহু কি দেখেন নি কখনও?'

বেশ ভীড় অনেক বার একটুখানি, হেলের দল খুব লুকিয়ে কোন যতে পালিয়ে বাড়ে। খুব থেকে তখনও শোনে বুড়িটার মুখগিৎ চিৎকার আর কদম্ব গালি। তারা আর ছুটেই চলে; বুড়িটাকে তারা কীতমত ভয় করে, সে থাকলে বড় একটা তারা আর ঘেঁষে না।

সমাজের আবর্জনা এরা, পৃথিবীর নারীর জীবন যাত্রা এদের; সমাজের লম্বা কিছু মারিত্যকে এরা বরণ ক'রে নিয়েছে। সত্যতার আলোক তারা চায় না, তদ্বতার বুথোলে দিন কাটাতেও রাজী নয়, মানুস হয়ে বাচার দাবীও নেই তাদের। তারা চায় একটু স্বেচ্ছাভূতি, এক টুকরো বরণাব কথা—একেই তারা বুগী থাকে। নর্থবার মরলার মাকেই তাদের জন্ম। তারই মধ্যে তারা গড়ে তুলেছে যেরে।

সহরের যে প্রাণে—এদের বাস, সে দিকে তদ্ব-গোলের ব্যতীরাও একেবারেই কব।

বিনের আলোয় সত মতই, হাতের আঁধারে বরক ছ এক জনকে কঠিন দেখা যায় যা ঢাকা দিলে ঐ পল্লীর পথে পা বাড়াতো। সাধাৎ তদ্ব সমাজের লোক বড় হিসেসী, তারা বোকে ঐ লম্বা শ্রমীর তিথারীদের অর্ধেক প্রয়োজনও বেহন খুব বেশী, তেমনি তাদের

কুয়াটাও শুকম নয়। তারা যদি ওদের জন্তে একটু তাগ করিতে পারে, ওরাই বা কেন তাদের জন্তে পারবে না একটুখানি তার প্রতিদান দিতে? অর্থাৎ পরিবারে দেহ—এক অতি সাধারণ বিনিময়।

ভিখারীরা জানে ভক্তবান্ধুগা নর্য ক'রে আসে তাদের বাড়ীতে এতেই তারা কৃতার্থ। একটু এলই বা তারা, করল বা একটুখানি ভোগ, কী কতি তাদের? সমাজেব অসুশাসন তাদের নেই, সমাজের গতি ত তাদের জন্তে নয়! তারা যানে না জীবনের বীণাধরা রীতি, বাধানিবন্ধের বিভীর্ণ গভী,—তাদের কাছে সব চেয়ে বা বড় তা হ'ল পেট! একটুখানি পেটেরে বাওয়ার জন্তে তত্ব বেছে কেন, তার চেয়েও বেশী কিছু দান করতে পারে তারা। এই ক্লেশক আবিলাভের মধ্যে নীতির কথা বড় হাজির।

হাওড়ার পুলের ওপলর নিত্য-বন্দা সেই ভিখারিণীটা থাকে এমনি একটা হাওড়ার কর্ণব পল্লীর চির অধার গলির অরা-জীর্ণ একটা চালাঘরে। যে ছেলেটা রোজ তার সামনে পড়ে পড়ে বুকের সে তার নিজের ছেলে নয়। বাড়ীর পাশে থাকে কানাই মিস্ত্রী, হাওড়ারই একটা ছোট কারখানার টিকে কাজ করে, বজুরী বা পার তা অতি সামান্য—ছেলে বউ নিয়ে কোন মতেই চলে না। সর্বপ্রাণী তত্ত্বতার একটুখানি কিছু বৃত্তি আছে তার মনে; তাই সে প্রকান্তে ভিক্ষা চাইতেও পারে না, বা তার ছেলে বউকেও পাঠাতে পারে না যত্নার। নিত্য অভাব আর অনটনে দুর্ব্ব হ'য়ে উঠল সাগর, না খেতে পেয়ে ভুগে ভুগে বের দেল রুগুটো ছেলে, তখন মালতীই কানাইয়ের বউকে একদিন ছুপি ছুপি বলল, তার ছোট ছেলেটাকে দিতে। বা রোজগার হবে তার চার আনা তাগ তাকে বেবে। কানাইয়ের বউয়ের একটু বিলা ছিল মনে কিছু সন্তপ্ত রুগুটো ছেলের কৃতি চোখের সামনে ভেসে উঠতেই সে রাজী হয়ে যায়। কানাইও সব কথা জানে, কিছু পারে ও কথা উঠলে তার অর্ধহীন আতিকাত্যবোধ সাগা চাড়া দিয়ে

ওঠে এবং বারণ করে বলে পাগলানী ক'রে তাই সেও কোনদিন আর ওকথা ভুলে এমন মূলত রোজগারের পথটা বন্ধ করেনি। বউ লক্ষীও আর ও কথা ভোলেনি।

তবুও বাহ্যিক ছেলেটা মঞ্চ দেয় না। দশ আনা বারো আনা পরস্যত আছেই, কোন কোন দিন গোটা টাকাত্ত হয়। আবার তার ওপর আর চার আনাও কোন কোন দিন জুড়ে যায়। কানাইয়ের সংসারটা তবুও কিছু সঙ্কল হয়।

সেদিন লক্ষ্যার একটু সকাল সকালই ফেরে মালতী, শরীরটা আজ ভাল নেই; যোকগারটাও তেমন বিশেষ হয়নি। নিত্য দিনের মত সেদিন আর কানাইয়ের বউকে ছেলেটা কিম্বিরে দিতে গেল না; এলেই সে অন্ধকার ঘরের শতছিন্ন মহলা জীর্ণ বিছানার ওপর করে পড়ল। ছেলেটা রইল পাশে পড়ে।

খাদিক পরে কানাইয়ের বউ জল নিয়ে ফিরে আসার পথে বেঘল, মালতীর ঘরের দরজাটা খোলা। উঁকি দিয়ে অন্ধকারে কিছুই ঠাংর হল না। আস্তে একটুখানি ডাক দিল—মালতী এসেছিল নাকি?

ক্লান্ত উত্তর এল, 'হ্যাঁ তাই এল; তোমার ছেলে-টাকে নিয়ে যা, আমি আর পাচ্ছি না।'

জলের কলসীটা দাঙারায় বসিরে রেখে ঘরের মধ্যে উঠে এল লক্ষী। আস্তে শুখোল, 'কি হয়েছ রে, ভবু লক্ষ্যোবেলা এমন করে আড়িল কেন?'

শুয়ে শুয়েই উত্তর দেয় মালতী, 'শরীরটা বড় বারাপ লাগতে রে! কি জানি আবার হয়ত আর আসতে পারে। আজ আর বিশেষ কিছু হয়নি, ওই-ই সব নিয়ে যা।' বলে অঁচেল পুলে সাঝা যিনের মত সন্ধে সে ঢেলে দিল লক্ষীর হাতে।

লক্ষী প্রতিবাদ করে বলে, 'না, না, সব দিলে তুই-ই বা খাবি কি আজ? আজ বহুং তুই সবটাই বেবে দে, ওরু পত্তরের আবার ত দরকার হতে পারে।'

স্নান হালে মালতী, 'আমাদের আবার ওরু পত্তর।

চাতে আর কিছু খাব না আমি; বরং যদি এক পরসার বালি কাটকে দিবে আমিহে একটু ফুটিয়ে দিঙ্গু।’

লক্ষী ওর পানে ব’লে কপালে হাত দিয়ে দেখে। গাটা একটু গরম, তবে খুব বেশী জ্বর হয়নি,—এবের ঘরে অন্যখানে ভাত খাওয়া চলে। তাই সে বলে ‘এক কাজ করনা, চাটী ভাত বরং এনে দি, খেয়ে উঠে পড়!’

‘না, না, ভাত খেতে ইচ্ছে করছে না একটুও। ঐ বালিই যদি পারিস একটু ফুটিয়ে রাখিস, ভাল লাগে ভাব’খন। তুই বাড়ী যা, কানাইদাস আসার সময় হল, তাকে দেখতে না গেলে আবার হরত চোমোমিচি শুরু করবে।’

লক্ষী তবু ওঠে না, আঙে আঙে মাথার হাত হুলিয়ে দিতে দিতে বলে ‘কাল আর ভিকের বাস্‌নি, দু’দিন একটু জ্বিরো। শরীরের কি হয়েছে?’

এত ছুপেগে হাসি পায় মালতীর, বলে ‘আমরা কি আর সেই জ্বরের রে, দু’দিন বলে লাকলে চলবে? পেটটা চলবে কী করে?’

‘তুই আর থকিস্‌নি, একা মনিদ্রা, ভারী—তাবনা। দু’দিন আমিই তোকে খাওয়াবখন।’

গভীর কুপিতে মালতীর চোখের কোণে এক ফোঁটা জল জমল বেন। পুৰ্ব্বীকিতে এমন কেউও আছে যে তার ব্যথার ব্যথিত হয়। মেহ-কৌতিল্য ক’বা সে জানেই না, এত বড় জীবনটার সে কি লম্বাঘন্যতার ভাষা জ্বলেতে কোথাও? পরেছে কি এমনিতর আত্মীয়তার আত্মিক স্পর্শ? সমস্ত বুক তরে আজ আশ্বাস নেয় এই আত্মীয়তার।

কিন্তু এমন কথা মালতীর মনে একটুও উঁতি দিল না যে তার এই বিশ্রাম নেড়তার ওপরে লক্ষীও কিছু স্বার্থ আছে! সে যদি তবু সমাজের মধ্যস্থ হ’ত ও অন্যায়সেই ভাবতে পারত সে যদি এই অহের ওপরেই আবার কাল সারাদিন রোদে বসে আর চৌচর তা হ’লে

অটো ভবিতরে আসবে, লক্ষীর ডেলেক্টার রোজগাহত বেশ কিছু দিনের তত্ত্ব বহু হ’য়ে থাকে।

একটি অশিক্ষিত মিস্ত্রীর বউয়ের পক্ষে এতখানি তেবে কথা বলা সম্ভব নয়। মালতীকে নীরব দেখে তাই সে আবার বলে ‘কিরে বেজবি মাত!’

মালতীর মন শুধু এক সুরে বাঁধা—একটি অপরি-
লীন পূর্ণতার কুপিতে সমস্ত জ্বরর ভরপুর, বলে,
‘তাই ভাবছিরে লক্ষী, তোকে ভগবান এমন ঘরে জ্বর
দিলেন কেন। যদি বিছানা ছেড়ে আর না উঠি তবু
একটা গাফান রেখে মরব যে জীবনে আমি কিছু না
পেলেও তোকে পেরেছিঙ্গু।’

এবার লক্ষী বডনড়িয়ে উঠে পড়ে, বলে ‘খুব
হয়েছে, বাবু। কোথাও বেশলাই রেবেছিঙ্গু বল,
লগুনটা জ্বলে দিবে বাই।’

‘আলো আর আলিসনে, বেশ লাগছে অজকাকটা,
তুই বরং দরজাটা ভেজিয়ে দিবে বা। খুব-পোড়োটা
আবার জ্বালা না এসে আলোতন করে।’

খুপোড়োটা যে কে লক্ষী জানে। এই পাড়ারই
মোকানবার অজর ঘোষের বুড়ো বাবা নন্দ ঘোষ।
বুড়োর বহল আঁর পকাতের তাহাজাহি, কিন্তু সব
মেটেনি এখনও। যৌবনকালে কিশোর লোভে সে এই
কবর পল্লীর ধারে ছোট মোকানবানা করেছিল, এ তল
সকলেই আঁর জানে। ধারে সে জিনিষ বিত, কিন্তু
একটা মাত্র সন্তে’বে তার এভাবে রাজী হ’তে হবে।
নিরুপার ধরিত্রী ব্যাধা, একাত্তই কোন উপায় নেই তার
বাধ্য হ’ত এই ফাঁদে পা বিতে। এমন ঘটনাও বহু
ঘটেছে যে স্বামী তার স্ত্রীকে এই নন্দর স্থানার আঙনে
ইঙ্কন জোগাতে পাঠিয়েছে আর কোথাও কোন উপায়ে
কিছু সুবিধা না পেরে। সেবে এমন হ’ল নগ্নদ বিক্রী আঁর
উঠেই গেল, ধারে জিনিষ দিয়ে নাম লিখে লিখে বাস্তার
পর মোটা মোটা বাস্তা ততি হ’য়ে উঠল, সে সববে
আমায়ের কোন গুস্তাবনা নেই তা সে জানত; কিন্তু তবু
উপায় ছিল না কোনও। নন্দর বাবা তেজারিত করিবার

ক'রে বে বেশ মোটা রকম টাকা অমিরেছিল তা প্রায় নিঃশেষই হ'য়ে যেত যদি না বখাশবরে অস্তর এসে দোকানের ভার নিত। এই লক্ষীর গুপ্ত নম্বর বে কী অচণ্ড লোভ ছিল! কানাইকে সে বহুভাবে প্রলুব্ধ করেছে, বহুবার তাকে দোকানে ডেকে আগর বস্ত্র করে লোভ দেখিয়েছে, কিন্তু সত্ব অভাব অনাটনের যবোণ কানাইয়ের আভিজাত্যগণী মন টলেনি। না খেতে পেয়ে দুটো ছেলে তার পর পর মারা গেল, তবু সে একটা পরসার জিনিষও বার নেয়নি নম্বর দোকান থেকে।

এখন অস্তর দোকানের তার নিয়ে বেশ ভালভাবে চালানোর নম্ব একটু মূরিলে পড়েছে। তার প্রতিগতিও গেছে নষ্ট হয়ে আর অস্তর কাকেও একটা পরসার জিনিষ বার দেয় না। তাই সে জ্বিত কামনার কামালের মত এদের থেকে গুণোর বুকে থেড়ায়।

ঐ লোকটা লক্ষীর চুচকের বিব, বললে, 'এলে ঝাঁটা ঘেরে ভাড়িরে দিতে পারিল না ঐ নম্বার বুড়োটারে। বুকে আগুন লাগল। নাতি নাতনীতে বর ভ'রে গেল, আশুত শবের হৈলেলের হাঁড়ি চাটার অজোস গেল না।'

রাগে চোখ হুঁটো। জলে উঠল লক্ষীর—অন্ধকারেও তা নম্বর পড়ে মালতীর। লক্ষী কালো—বেশ কালো। তার ছেলের মা। তবু তার আস্থা এত স্নানর এমন অটুট যে দেখে সত্যিই হিংসা হয়। জাতভিখিরী মালতী করে করে তাবতে লাগল, আমার যদি এমন চেছারা থাকত তা'হলে কি আর রাজার হারে শ'ড়ে পড়ে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চেঁচিরে মরি। ইলেকট্রিক আলো-ওলা মোড়লা ঘরে চুচকে খাটের গুপ্তর নিস্তর শুভাব। কী বোকা লক্ষীটা। একটা মাতাল স্বামীর লাগি ঝাঁটা খেয়ে এই এঁদো পচা গণিতে পড়ে আছে। একটু ইচ্ছে করলেই ত সে মটরগাড়ীতে চড়তে পারে সেবার ত ও পাড়ার দোহার ব্যবসায়ার বানিক সামন্ত কতভাবে আনাল একথা। কিন্তু কি মেয়ের গৌ। দেখবা কানে তুললে? কি জানি বাপু, থাক দার হুখে-

যতলে থাকব এইত জানি; কুশে কষ্ট ক'রে পড়ে পড়ে মার খাওয়া যে কী হুখ, তাত বুকে উঠতে পারি না।

লক্ষী ছোঁড়া ছুরে শাড়ীর খাঁচেলটা বোমের অভিরে ছেলোটাকে কোলে তুলতে এল। মালতী আর একবার ঘুমন্ত ছেলোটাকে লগেহে বুকের গুপ্তর চেপে গভীর ভাবে একটা চুমু খেলে। তারপর তাকে ভুলে দিলে লক্ষীর হাতে।

এইখানেই মালতীর বস্ত্র দুর্বলতা। সে জিভারী বশের হয়ে, তার মা-বাবা সব তাকে ক'রে দিন কাটিরছে। তারও সেই পথ। বিয়ে বার বালাইও নেই, ছেলপুলেও নেই কিছু। ভালই ছিল। কিন্তু হঠাৎ কানাইয়ের এই ছেলোটো যে তাকে কী ভাবে আকর্ষিত করলে বলা যায় না। শুধুই কি এই ছেলোটো?—মালতী ভাবে, অম্বায়ে তার মনের প্রহুটি কোথার যেন ধাঁধা পড়েছে ঐ মনোবৈরাগী লগে। গুপ্তর কুশে, গুপ্তের অস্তর অনাটন কেন তার বুকে এত গভীর হ'য়ে থাকে। কেন সইতে পারে না গুপ্তের হাহাকারের আলা।

কানাইকে সে ছোট বেলো থেকে দেখে আসছে। তার চেয়ে অনেক বড়! একদিন কানাইয়েরও ছোটের আড্ডা ছিল এই ঘরে। বেটে সেঁটে মোটা বাহুবটা, বাবার গুপ্তর মস্ত টাক। একে তার খুব ভাল লাগত, কারণ সে কটিন ব'ক কিন্তু খুব সরল। কানাইয়ের বাবা যদি জোর ক'রে ওর লক্ষীর লগে বিয়ে না দিত, তাহ'লে হয়ত চিরদিনই ও মালতীর থাকত।

কিন্তু মালতী লক্ষীকে হিংলে করেনি কোন দিনও। বয়ং যখন সব খেয়ে কানাই বুকে ব'রে মারত, তখন সে কোনর বেঁধে কানাইকেও বেশ হুঁকখা তুলিয়ে দিয়ে আসত লক্ষীর হয়ে। বাবার ভাদের জুখের সংসারে যে যখন কিছু সাহায্য করতে চেরেছিল, তখন কানাই দৃঢ়ভাবে তা ফিরিয়ে দেয়। মালতী লুকিয়ে লক্ষীকে চুপি চুপি সাহায্য করার চেষ্টা করে, কিন্তু লক্ষীও কারমনেবাক্যে স্বামীর অনুগামী। স্তবৎ এ সাহায্যটুকু আর বেগুনা হয়নি। তারপর যখন

পর পর হুটো তেলে মগল, তখন আর মালতী ব্রিস থাকতে পারল না, কঁদে পড়ল লক্ষীর কাছে। লক্ষীও বেশের মুখ চেয়ে সেটুকু নিতে বাধ্য হ'ল, তবে অস্ত উপায়ে। যদিও কথা ছিল তারের তিকার অপনের চার খানা। তাগ লক্ষীকে দেবে, মালতী কিন্তু বেনীর ভাগটাই রোজ দিয়ে আসে। নিবেদন কর্তা মাত্র পামাঙ্গ হুঁচর আনা রাখে। আর তাতেই একটি পেট খেল চলে যায়।

এ ছাড়াও মালতীর রাস্তার বন্ধের যে দু'একজন আছে তারা পরস্পর-কতির ব্যাপারে খুবই হিসেসী, তার ওপর হুড়ো নক খোবের দোকানের পুরণো সেনাটা বোম্ব হয় আকণ্ড খোব হয় নি। তারই মিথো ভাগাদার সে নিভা চান দেব তার ঘরে। আসলের প্রতি তার বিলুপ্ত মোহ নেই। কতদিন মালতী তাকে সব শোষ করে নিতে চেয়েছে, কিন্তু তা সে কিছুতেই নেবে না। সে ঐ পাতলা চাকার জুটুকু পেলেই লস্কর! ঐ মূলধন-ইচ্ছা ক্রিয়ে নিয়ে এই হুড়ো বললে সে আর পরের ঘোরে ঘোরে ঘুরে বেড়াতে রাজী নয়,—তাই সে মালতীর কাছে—এখানেই তারী আজ্ঞা গেড়েছে।

“হাডালে না ভাঙে”—মালতী কটু কথা বলার কছর করে না। কিন্তু হুড়ো নাছোড়-বাল্লা। কিছু না পেয়ে দেবে কঁদে মালতীর পা হুঁটো ভড়িয়ে পড়ে। এর ওপর আর মালতী নির্ভর হ'তে পারে না। এর অজ্ঞে অনেক কতিও হয়—কিন্তু কোনও উপায় নেই, অতিথিরে কিরিয়ে নিতে বাধ্য হয় সে।

মালতীর ভাগ্যটা ভাল। সে রাতে আর নন্দ ঘোষ জালভন করলো না, বোম্ব হয় হুড়োর বাতের বাধ্য চাপিয়েছে, উঠতে পারে নি। বাই-হোক লক্ষীর বিশেষ অজুরোবে একবাটা সাবু খেয়েই সে রাতটা কাটানো সে।

পরের দিন সকালে উঠে মালতী দেখলে তার বুক নিটে অঙ্গ বাবা, সমস্ত শরীরটা বেন বিছানার মধ্যে এনিরে বেতে চাইছে। অভিকটে সে একটু উঠবার চেষ্টা করলো, কোণ থেকে মালতীর ভাড়টা নিয়ে

যদি সে ঘোড়ের দোকানটা থেকে এক ভাড় চা কিনে খেতে পারে, শরীরটা তবু কতকটা সুস্থ হতে পারে। বেলালে হাত দিয়ে একটু এগোলত, কিন্তু পা হুঁটো বেন তেড়ে আসছে তার—কোন মতেই বেন সে আর নোজা হ'য়ে থাকতে পারছে না।—সেইখানেই তেলে পড়ল রাত্রিতে।

পানিকটা বেল হ'তে লক্ষী এল হেলোটা কোলে নিয়ে। রোজকার অভ্যাস মত মালতী তাকে জিজ্ঞাসা করল ‘কানাইগা বাবে গেছে?’

লক্ষী উত্তর দেত ‘হাঁ, অনেককণ। অত কেমন আছিল কুই? ‘মরি’ বলে শোলা বুকটার ওপর হাত রেখে বললে ‘ইস, গা-টা যে পুড়ে যাচ্ছে তোব। মাটিতে পড়ে আছিল কেন, বিছানার এলে শো। কাঁধটা কোষার—সে গারে ভাল করে চাপিয়ে দি।’

অভিকটে লক্ষীকে ধরে তন্তে তন্তে মালতী বলে, ‘ঐ বাস্কটার উপর কাঁধটা আচে, গারে দিয়ে যে দিকিনি—অরটা বোম্ব হয় খুবই এল।’

লক্ষী হেলোটাকে নাড়িয়ে রেখে কাঁধটা ভাল করে গারে চাপিয়ে দিলে—মলিন শতভিঃ কাঁধটাও সবু দিয়ে বায়ু-চলাচলের একটুকুও বির হয় না। আলনা থেকে পরার একটা কাপড় এনে তারই ওপর আবার চাপালে লক্ষী।

মালতী বললে, ‘ঐ বাস্কটার তেতর পরমা আছে, দু'পরনার চা যদি কেলোর বোকান থেকে আদিয়ে বিতে পারিল—আবার আক আর মড়বার কমতা নেই। আর হেলোটাকে একটু আবার কাচে সে, একটু আদর করি।’

লক্ষী বাস্কটা ধুলে পরমা নিয়ে বললে, ‘না, না, থাক, ওকে রাখলে আবার তাকে বিরক্ত করবে, তার চেয়ে আমি নিরেই বাই।’

‘না রে না, কুই দিয়ে বা দিকিনি। করলেই বা একটু বিরক্ত। কি এখন হয়েছে আবার যে একটু বিরক্ত করা সইবে না? তারী ত একটু অর।’

লক্ষী হেলোটাকে বিছানার দিয়ে চা আনতে চলে

গেল, মালতী গভীর কুপ্তিতে ছেলোটাকে বুক চেপে আদর করতে লাগল।

কিন্তু অরটা বস্তু সম্বন্ধে যাবে ভেবেছিল তত সম্বন্ধে বাবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। সাতদিন হ'তে চলল, তবুও অরটা চড়ে না, দিন দিন যেন আরও বাড়ছে—সর্বাঙ্গে ব্যাণ্ড। সমস্ত শরীরটা যেন কীপরা ক'রে ফেলেছে এরই মধ্যে। নন্দ যোব মাঝে একবার এসেছিল, অমুখ দেখে বুঝে একটু সহানুভূতি জানালেও কেমন যেন আশাহতের মত ব্রূণ্ডে পড়েছিল। অর মেগার নাম করে সমস্ত শরীরটার বারকতক হাত বুলিয়ে পাণ্যবার ক'ক বুজছিল, মালতী একটু ঠাট্টা ক'রে বললে 'ঠাকুর এ যাত্রা যোব হয় আর বাঁচব না। তার জন্য কিছু দুঃখ নেই, ক'ক আমি ভাবতি তোমার কি গতি হবে?'

নন্দ মিস্ত্র হলে বলে উঠল, 'হু কি বা তা বলি, ঠিক সেবে উঠবি কিছু ভাবি নি। তোর এমন অমুখ জানলে সোফান থেকে কিছু মিষ্টি আর সাবু আনতুম,—কাল লকালে খরঃ দিরে বাবখন।'

এটা হ'ল অমুখ করার পরদিন। তারপর হ'টা দিন কেটে গেছে, মিষ্টি আর সাবু নিয়ে নন্দ যোব এলুখো হয় নি। অবশ্য মালতীও তার প্রত্যাশা করে না—তার বা আংগেকার পুঁজি আছে তা নিয়ে এখন একটা বছর সে গুরে গুরে কাটাতে পারে।

কিন্তু হুস্কিল হয়েচে লম্বীঘের। ছেলোটার ভিন্দে করা আরে ক'দিন বেশ চলছিল, তারপর ক'দিন মালতী আর না বেকনোর সংসারে আবার আগুন খরতে শুরু করেছে।

মালতী শোন, বুজতে পারে, কিন্তু করার কোনও উপায় পায় না। লম্বীর মুখের হাসি-খুসী তাইটা ক্রমে কেমন যেন পাতুর হয়ে আসছে, কথার কথার উজ্জ্বলিত সে হাসির রেঙারাক আর নেই। গুর শুকনো মুখে বিশ্বের ক্লান্তি এসে বাসা বেঁধেছে যেন।

এহনি করে একটা মাস কেটে গেল, রোজই মালতীর

অর হয় একটু একটু, বুক পিটে অল্পস্র বাথ। ভেবনি এবল। নড়া চড়ার সমস্ত শক্তিই গেছে শেষ হয়ে। তার সহজ নারীত্বের শেষ আভ্যটক পর্যন্ত অস্বহিত, রোগগ্রস্ত জীর্ণ জীর্ণ মালতী আজ একটা আতর্জনা শুণু।

লম্বী একদিন জোর করে পাভারই একটা ডাক্তারকে নিয়ে আসে। আগে সে কোথাকার কোন হাসপাতালের কম্পাউন্ডারী করত, (অন্তত সে ভাই বলে) সেই সজিত অভিজ্ঞতাস্ট্রু আজ তার ডাক্তার হওয়ার পথ সুগম করে দিয়েছে। সে বলে, 'বই দুখর করলেই কি সব জানা যায় নাকি? হাতে-কলমে অভিজ্ঞতা চাই সেইটেই সবচেয়ে কাজে লাগে।' পানকরা সব তা বরকে সে কুশার চোখে দেখে।

সেই ডাক্তার এসে বলে গেল, 'মালতীর ক্ষর-কাশ হ'য়েছে—এ রোগ সারবার নয়।

আজকাল কামনার সঙ্গে একটু একটু রুজুও দেখা যায়। নিমেষ সম্বন্ধেও একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছে—জীবনে আর তার স্মৃতি নেই।'

তবু এই রোগশয্যার পড়ে একটা বেননার তার বুক ত'রে ওঠে—সে ঐ লম্বীঘের অবহার ক'ক ভেবে। মাসের দিনকতক অজলতর সন্ধান পঃগরা কানাই যখন মালতীর আরের অংশটুকু আর পেল না, সমস্ত সংসারটা একেবারে অচল হ'রে এল, শেষ পর্যন্ত আর সামলাতে না পেরে আকিস্ থেকে একদিন চুরি করতে বাধ্য হ'ল।

ধরা অবশ্য পড়লই, কিন্তু যানোজাহের হাতে পায় ধরে সে-যাত্রীটা কোনরকমে জেল-খাটা থেকে রেহাই পেল; কিন্তু চাকরীটা গেল। তারপরে এল সংসারে সজিকারের অনটন। সে নিজে বউ আর ছোটো ছেলে কেমন ক'রে যে জালাবে ভেবে পায় না কানাই। সারাদিন চাকরীর চেষ্টার ঘোরে, বার্ষ বনোরথ হয়ে কিরে এসে সন্ধ্যাবেলা লম্বীর সঙ্গে কগড়া করে। কোন কোন দিন লম্বী রীতিমত যারের হাত থেকেও রেহাই পায় না। মালতীর অমুখ হঃগাতে

জেনের হোকগায়েব পথ যে বন্ধ হ'য়ে গেছে সেটা খুঁজতে কিছুতেই বগতে পারে না বলেই ভাবটা আরও বেশী।

তবে তবু বাগতী সবই শুনেতে পার, কিছু নিকশার হয়ে শুধু চোখের ভলে আসে। লক্ষী এলে জানার শুধু সমবেধনা, লক্ষীর বাগতী বুকে করে কাঁবে সে অনেকজন। নিজের সজ্জিত অর্ধ থেকে কিছু কিছু সে দেয়,—কিছু ভাত অল্পবড় নয়, একদিন ভাত হুঁরিয়ে এল।

লক্ষ্যাবেলা বাড়ী ফিরে কানাই বেদিন ভাত পার বেদিন আর কিছু বগে না, পেটখুঁবে খেয়ে সে তার বন্ধু ছুতোয় মিত্রী লক্ষ্যুয় কাছে যায় ডাকি খেতে। একবারও ভাবতে চায় না, আজকের এই ভাতগুলো কোথেকে এল, বা লক্ষীর খাবার মত আর ভাত হাড়িতে আছে কিনা। কিছু ভাত বেদিন পার না, সেদিন আর কিছুতেই ডাকে মাঝলানো যায় না, সমস্ত রাগটা ক্রমে ছাতে ভর করে, তার অব্যর্থ গতি লক্ষীর কত-বিকত দিষ্ট।

কিছু একদিন এ বার চরবে উঠল। সেদিন যোগ করি কানাইকে অনেকটা দূর অর্থি যেতে হয়েছিল চাকরীর বার্ষ বোঝে, সব জাওয়া থেকেই হরত সে ফিরেছিল বিকল আশায় বা অপমান স'রে। তাই বাড়ী ফিরে সমস্ত অক্লান্তটা পড়ল লক্ষীর ওপর। ভিনবিন উপবাসী লক্ষী আজ আর কোন মতেই একমুঠো আহারের সংস্থান করতে পারেনি, ঘরে ঘরে সে খুঁজি ফিরেছে অল্পভাত একপোরা চাল বার চেষ্টে, কিছু কোথাও একটা দানা পর্যন্ত সে পায়নি। পড়ীর লক্ষ্যার সে আসল বিশেষের কথা ভেবে চুপ ক'রে দাঁড়াটার ওপর বসেছিল।

কানাই উঠোনে গা দিয়েই হাঁকলে, 'ভাত দে।'

লক্ষী পড়ো বিল না। বজাপাতের পূর্বকার বিদ্বাং-চক্কর মত এ কথাটার সে একটা অঘটনের লক্ষ্যার অভিভূত হ'য়ে রইল।

কিছু সে সব বোঝার সময় নেই কানাইয়ের। হেঁড়া মহলা কাথাটা গা থেকে নামিয়ে, তামি বেতরা কেবিনের জুতোটা কোনমতে গা থেকে খুলে অবলম্বের মত ঝাওয়ার একটা জীর্ণ খুঁজিতে ঠেস দিয়ে বগে উঠল,— 'কৈ রে, ভাত দে।'

লীল অশ্রুধরে কোনমতে লক্ষী বললে, 'নেই।'

এবল ভূমিকম্পের মত এক মুহূর্তে কেটে পড়ল কানাই, 'কি ভাত নেই? সারাদিন ক'রছিলি কি, একমুঠো ভাতের জোগাড় করতে পারিলনি?' একথাটা কানাইয়ের একবারও মনে এল না যে সে দায়ীভ তার নিজেরই, লক্ষীর নয়।

বাগা হেঁট করে অপরিসীম ব্যথাঃ লক্ষী ভুঁ বগলে, কোথাও পেলুম না যে।

'কোথাও পেলুম না যে,' জেগী কেটে ঐ সরেই অল্পকরণে কানাই বললে, 'জাঃ মাগী, তামিঃ না লক্ষ্যাবেলা ভাত দিতে হবে? সারা দিন বাড়ীতে পড়ে পড়ে গুঁমিয়ে এখন কোথাও পেলুম না যে! আজ তোর কি ক'রি জাঃ।'

দাওয়ার পাশের কাঠের উল্লনের দ্বার থেকে একটা আধপোকা কাঠি নিয়ে কানাই প্রচণ্ড আক্রোশে স্বাপিরে পড়ল লক্ষীর ওপর। সারা দিনের বিবে, অপমান ও বার্ষতার সব হিগাব কড়ার গড়ার শোথ করতে সে বেন কেনে উঠেছে! সমস্ত বরীর দিয়ে রক্ত বরুতে লাগল লক্ষীর। কিছু শুধু সে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ জানালো না—ভিন দিনের উপবাসীর বোধ করি সে শক্তিও ছিল না, শুধু নীরবে নেবের ওপর পড়ে এই নির্ব অত্যাচার সহ্য অতোর করে বেঁচে।

শব্দ শুনে হাতড়ে, হাতড়ে কোন মতে বাইরের দরজার কাছে হাঁড়িরে বাগতী বগলে, 'কি করছো কানাইবা,—বোঁটা বে মরে বাবে। ও হরত বাঁচবে ভাতে, কিছু তোমারও বেঁকাগী হবে।

এতকণে, খেরাল হ'ল কানাইয়ের,—ভাইত! হাতের গতিও মন্ত্রবলে খেয়ে গেল, শুধু-আপন মনে

গজরাজে লাগল, 'বয়ে বাবে। বাক, বয়ে বাক, কোন দরকার নেই এমন বউয়ে! ও মরলেই আমার শান্তি! হাতাবলারী কোথাকার!'

কোন দিকে আর সেক্ষেপ করলো না। ছুঁতে কেলা আঘাতী কাঁখে কেল, তালি দেহভা জুতোটার নখে আঘাতনা পা চোকাতে চোকাতে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মালতীও কোন কথা কইল না। প্রতিবাদ করলে পীড়ন বাড়বে—তাই সে শুধু গাড়িয়ে বেঘল—ঐ অসত্য কানোয়ারটার পানে চেয়ে আজ হঠাৎ মালতীর সর্বস্বতীর শূণ্য বিবি ক'রে উঠল বেন। কেমন ক'রে একদিন ঐ শিলাচ' লোকটাকে তাল বাসন্ত একথা ভেবে তার মন করবঁতার তরে গেল।

কানাইয়ের চলে যাবার পর আছে আছে অতি কষ্টে সে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে বাড়ির কাছ এসে হাঁপাতে লাগল। তারপর একটু গাড়িয়ে সে লক্ষীর মাথার কাছে বসে জিজ্ঞাসা করল—কোথার বেবেছে রে।

সে কথাটা বোধ করি জিজ্ঞাসা করাও প্রোবজন ছিল না। দেখতে পেল তার হাত, পিঠ, বুক, হৃৎ, কোথাও অক্ষত নেই। বেশরোজা লাগি চালিয়েছে কানাই। সবুজ জারপাইই মাগুড়া মাগুড়া হয়ে কেটে রক্ত করছে। কী করবে ভেবে পেলো না মালতী। ভাবাহীন সমবেদনার সে তার পাশে বসে অক্ষ চোখে মাথার হাত গুলিয়ে দিতে লাগল।

কতক্ষণ আছেয়ের মত পড়ে রইল লক্ষী, উপবাস-জীর্ণ, ফ্রিট শরীরটার ওপর এই নির্বিঘ্ন অচ্যুত তার কথা বলার নক্তি পূর্ব হরণ ক'রে নিল অনেকক্ষণ। খানিক পরে কোলের জেলের কারা জনে লক্ষী উঠে ওকে ভোলাতে গেল ঘরে।

অনেক রাতে মালতীর ঘরে ঢুকে লক্ষী আছে আছে গুর বিছানার ওপর বসল। কানাই তখনও কোরে নি, সে রাতে আর কি হবে না অমন কথা—এক পেট তাড়ি

ঘেঁরে কোন মদ্যর পড়ে আছে হইত।

গভীর সহ্যহুতিতে তাকে কাছে টেনে নিল মালতী। কোন কথাই কিং বলল না—বলার যে কি আছে ভেবে পেলো না।

অনেকক্ষণ চুপচাপ থেকে একটু ইতস্ততঃ ক'রে লক্ষী আছে আছে বললে, 'একটা কথা কবতে পারিস মালতী?'

গুর ইতস্ততঃ তার দেখে ঘাপারটা একটু দহস্তময় ঠেকেছিলো মালতীর কাছে, গভীর কোঁড়হলে গুর বুকের দিকে চেয়ে বললে, 'কিরে—বলনা। চুপ ক'রে আছিস কেন?'

তবুও অনেকক্ষণ কথাটা বলতে পারল না লক্ষী, মালতীর কোঁড়হল উত্তরোত্তর বাড়ছিল। অবশেষে অতি কষ্টে লক্ষী বলে 'বল্ছিলাম খানিক সামগ্রীর কথা। তুই একবার বলে দেখনা—আমি রাজী।'

সামনে বন্ধপাত হ'লেও এত ঢমকে উঠত না মালতী, তবু কথাটা সম্পূর্ণ বিখাল করতে পারল না, বললে, 'তাই হু, তুই বাজে কথা বলছিল।'

এবার অনেকটা সামলে নিরুদ্বে লক্ষী, বেশ দৃঢ় ভাবেও বললে, 'কেন হয়না। এ ছাড়া আমার আর উপায় কি বল? মার খেয়েছি ব'লে আমার এতটুকু হুঃ হুঃ নেই, কিন্তু বিদেহ হুঃ আর দিতে না পারাটা যে কী জ্ববেদ, তা কেমন ক'রে ভোকে বোকাই! 'তুই ভাখনা একটু বলে করে। চাকরীও আমি কোথাও পাবে না, খাশী-পুলুর চোখের সামনে না খেতে গেলে মরবে একেমন ক'রে দেখবো। তুই ভেবে পাচ্ছা তাকে,—আতাই, লক্ষী।'

গভীর বিষয়ে মালতী চেয়ে রইল খানিকক্ষণ! খানিক আগে যে নির্দম শিলাচ তাকে নিষ্ঠুর প্রহার ক'রে গেল, তাইই বুকের অর যোগ্যেতে নারীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ 'আজ বিলর্জন হবে লক্ষী? এরই নাম কি জালবালা? মালতী ভেবে পেলো না, একদিন কত সে মায়া সাধনা করেছিল তাকে এই খানিক সামগ্রীর

জলে! ঐশ্বর, বাড়ী, গাড়ী কতই না লোভ দেখিয়ে-
ছিল। তবু সে রাজী হরনি, আর আজ যেতে সে যেতে
চাইতে। অস্বস্তি অবিস্মৃত। কিন্তু তবু আজ কিছুতেই
এতে সাহা মিতে পারল না মালতী। একদিন কত
সেবেছে, ওর খোকারীর সঙ্গে কত গাল দিয়েছে,
নিজের পাওনা দানালীর অংশটুকু পাওয়া গেল না বলে
কতদিন কপা পইন্ড বন্ধ রেখেছে,—কিন্তু সেই প্রজ্ঞাবে
রাজী হয়ে আপনা হতেই বন্ধ লম্বী বলল, কোথায়
যেন কি হ'ল মালতীর। এমন একটা ভালবাসাকে,
নারীত্বের এই গোপন স্বর্ণাদাকে কিছুতেই ভাবিমানি
করতে রাজী হলনা, বললে 'আজ থাক। কালকের
দিনটা ছাখ, পরকথা চর করা বাবে।'

'কিন্তু কালই বা চলবে কি ক'রে?'

'ভাবছি কাল একবার যেরুবে, কিছু অস্বস্তি:
বাবে ত!'

'না, না, এই শরীরে পারবি কেন,' উৎকণ্ঠিত হয়ে
উঠে লম্বী, তুই কিছু ভাবিসনি, সবাই যে পথটাকে
নিরুদ্ধে আনিও নিলে তা ঘোষের হবে না। তোর এক
পা ইটবার সম্ভাব্যই নেই, আবার গিরে রাজ্যের
বসবি।'

'আমাদের শরীর, কিছু ভাবিসনি। কিন্তু তোকে
এ পথে নামতে দেখনা কিছুতেই। আমি ভিখিরী
সেয়ে, হোটেলের থেকে যা দেখেছি তাই করছি, কিন্তু
তুই তও নল। তোর দায় এ কাজ হবে না। আমি
বরে পেলো তোকে এ কাজ করতে দেখনা।'

লম্বীও কম বিবিত হর না, মালতী আজ বলে
কি? এ সে আশাই করতে পারে না। বরং তেবেছিল
এ কথা শুনে কতই না আনন্দ করবে মালতী, কিন্তু ঠিক
তার উল্টো।

পরের দিন খুব ভোরে উঠে যেখানে পড়ল মালতী।
একটা রাত্রে যেতেও ত অনেকটা সময় লাগবে!
দেয়াল বন্ধ, বরে বাওয়া। তার উপর লম্বী যদি উঠে
পড়ে কিছুতেই যেতে দেবে না। সঙ্গে তাঁড়টাও নিলে

পেটকাপড়ে বেঁধে, কোন দোকান থেকে দু'পয়সা চা
কিনে নেবে।'

কিন্তু সারাদিন টেবিলে আজ দু'আনার বেশী হ'ল
না। এক দিন বে লাভে সব পরলা দিয়ে যেতে আজ
তার কোন ঠিকই নেই মালতীর দেখে, জায়া ওকে
দেখতেই গেল না। অথচ আজই তার পরসার সব
চেষ্টে ব্যর্থ।

অল্প দিনের চেষ্টে অনেক বেশী চেষ্টালা মালতী,
অল্প দিনের চেষ্টে অনেকবার এপার 'উপার করলো
পুলটায়, কিন্তু জনকতক সত্যিকারের দরদী দাড়া
চাড়া কালুর ছিটে কোটা করলোও পেলেনা সে।

কিন্তু সত্যাবেলাতেই সমস্ত শরীরটা ভিস্‌ ভিস্‌ করতে
লাগল, কানিটাও বাঙল একটু, বস্ত্রও পড়তে লাগল
খুব। কেমন করে বাড়ী ফিরবে তেবে মূল কিনারা
পেলো না সে। কেমন করেই বা এই পরলা ক'আনা
পাঠায়?

ঠাং সে দেখলো বুড়ো নম্র ঘোষের ছেলে।
দোকানী অস্তর বড়বাঝার থেকে গণনা ক'রে বিটাই
ঘোঁট নিয়ে ফিরছে। অতি কষ্টে তাকে ধাক্কা করিয়ে
কাতৃতি নিমতি করে মালতী বললে, 'এই দু'আনা পরলা
কানাই মিত্রের বই লম্বীকে দিস্‌ বাবা, আবার কাছে
পেত, আজ একেবারে শোধ দিয়ে দি। লম্বীটা
ভুলিস নি।'

সারাদিনের সমস্ত হোজগারটাই সে দিয়ে বের
অস্তরকে; একটি পরলা পূর্ণ্য রাখে না। বাড়ী না
পৌঁছতে পারলে বাবার কিনে খাবার বস্ত্র পরলা আর
একটিও উইল না তার।

অস্তর সিন্ধ্যা করল 'তুই বাড়ী বাবি না।'

'শরীরটা যেন তেজে পড়ছে, বোধ হয় আর বাসার
বাওয়া হ'ল না আজ। মনে ক'রে পরলা ক'আনা দিস্‌
বাবা, ভুলিস্‌ নি।' একটি গজীর স্বস্তির নিঃশ্বাস
ফেললে মালতী—তবু ত কিছু সাহায্য হবে লম্বীর,
অস্বস্তি: সেরটক চালও ত হবে।

কিন্তু মালতীরও কম খিদে পারনি। সমস্ত নাতীয়ে
যেন প্রচণ্ড পাক দারতে কে, ছুঁ'পরসার চা হ'লে হত
অন্ততঃ। কিন্তু সব পরসাই ত সে এটাবাত্র পারিয়ে
নিলে। ছুঁটো পরসাই অন্ততঃ—

না, না,—ঐ ছুঁ'পরসার চারটে খাদ্য অন্ততঃ কিনতে
পারবে লক্ষী—ঐ দোকানটা থেকে ছুঁ'পরসার চা সে
চেষ্টা নেবেখন। বাসি খাবারও ত খানেক খাবে, বিক্রি
হয়নি, কেউ খাবেও না—হুঁ একটা গাভগাভ বাবে হয়ত।
কিংবা—

কিন্তু দোকানটা যে অনেক দূরে, আর যে এতটুকু
শক্তি অবশিষ্ট নেই মালতীর—সমস্ত শরীরটার ওপর
কে যেন একটা বিরাট পাখর চাপিয়ে রেখেছে। মাথার
মধ্যে একটা কিসের কোলাহল চলছে অবিভ্রাম—লক্ষী,
কানাই, ছোট খোকা, বুড়ো নন্দা, বাসি মাঝি—সব
সব যেন একাকার হ'য়ে গেল। অমন অন্ধার মধ্যে
লক্ষী পেয়ে কি মানিকের গ্রোলে এল? দাবিত্যকে কি
ঠেতানো গেল না কোন বড়?—মালতী দেখলে ক্রমশঃ
এগিয়ে চলেছে লক্ষী—হুঁ হাত বাড়িয়ে তাকে মানিক
সামনে হ'য়ে নিলে। লক্ষী হাসছে, মানিককে সে ভড়িয়ে

হেরেছে—কড়কড়ে নোট ঘোটাঁকড়ত আঁচলে ঝংলে
লক্ষী—ওকি মানিক লক্ষীকে—

ঐ ঐ ঘের আসছে বুড়ো নন্দা, কি বিক্রি হাসছে
সে—লালা বরতে দাড়া হুঁ বেবে, বলছে, 'তোদের
লক্ষী-মানিকী লক্ষী ঠাকুরের কী শপা হ'ল রে, বলেছিলাম
না—'

আর দেহতে পাখে না মালতী, চোখের সামনেটা
ঘোঁরাঘর ঘোঁরাঝর হ'য়ে উঠেছে যেন; উঃ, দোকানটা যে
এখনও অনেক দূরে; আলোগুলো অত আপনা কেন!
কাল ঐ দোকানটার কাছেই সে তিকের মলবে—এতটা
দূর! ঐ তো তাড়া সব আসছে;—সেও বাবে—কিন্তু পা
যে চলছে না, টলমল করছে সাড়া শরীর, পড়ে বাবে
নাকি সে? ঐ তো আলো—ঐ, ঐ সূর্যাসা জরা, ঐ তো—

সকলে ঘায়া পুলাটা শায়াপার করল সবাই দেখলে
খাবারের বোকারের মানিকটা দূরে কতদিনের চেনা
ভিখারী মালতী বের পড়ে আরে—চোখ ছুটো তার
আকাশের পানে কি যেন খুঁজছে!

সাহিত্য পরিচয়

দুর্ভাগিনী—মহেন্দ্রনাথ বিদ্য, ইণ্ডিয়ান লিটরেটর,
১৭১ ব্রাহ্মচরণে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২; হুলা আড়াট
টাকা।

দুর্ভাগিনী, শক্তিমান কথা-সাহিত্যিক মহেন্দ্রনাথ
বিদ্যের সর্বশেষ প্রকাশিত উপভাস। কখনো যখন
সেল বছরের দায়বীর সংখ্যা গণবাতর্ষিক 'অকথিত্য' নামে
প্রকাশিত হয়েছিল, আদর্য বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে
পড়েছিলাম, এখন সেটা কিঞ্চিৎ পরিবর্তন পরিবর্তন
সহ প্রকাশ্যে সংশ্লিষ্ট হয়ে বেরোল। দুই মলাটের
ভিতর কাহিনীটিকে আবার নতুন করে পড়ে নতুন-নতুন
আনন্দ পাওয়া গেল।

দুর্ভাগিনী কলকাতা টেলিফোন এক্সচেঞ্জের একটি
ভদ্রা অফিসের কাহিনী। নাম বীণা শুধু ঠাকুরতা
—নিত্যরু হুং এক পূর্ববঙ্গীয় তত্ত্ব পরিবারের মেয়ে।
অভাবের দ্বারে টেলিফোনে চাকুরি নিতে হুংছে।
গায়ের বং কালো, সাধারণ চেহারা। ঘটনাক্রমে
সাংবাদিক মুদ্রের সঙ্গে বীণাযেব জীবনের আলাপ হয়,
সেই আলাপ কলকাতার এলে বসিষ্ঠতার জগৎবিরত
হয়। মুদ্রার আর বীণার মন আনাজানি অনেকদূর
অগ্রসর হয়ে তাদের মধ্যে বিবাহের কথাবার্তা হয়,
কিন্তু মুদ্রার শেষ পর্যন্ত পেছিয়ে যায়। মুদ্রের অভাবের
ভিতর আত্মকৃত-ভগ্নের দে অবিবাহিতা সভা ছিল সেটি

ছুইয়ের মিলনে বাবা হয়ে পড়ায়। সুপ্রভের আচরণে বীণা অত্যন্ত স্নেহীত হয়, কিন্তু নিজেকে সে বিচলিত হতে দেয় না। ভাগ্যবাসীর বার্ষিক চাকরার ক্ষেত্রে সে বিভ্রণ উৎসাহে অশার্টেরদের ইউনিয়নের কাজে মন দেয়, সেবার আত্মনিয়োগ করে। তার বসিষ্ট বন্ধু কমলা দুবারোগ্য যক্ষারোগে আক্রান্ত হয়ে কুতুর সন্নিবসিতিনী, বীণা প্রাণপণে তার গুরুত্বা করতে থাকে। কমলার অকরণ্য উপার্জন-অর্থম আটটি তাই বিমল সংসারের প্রতি উদাসীন, কমলার চূর্ণিতি সুপ্রভঃ সে দেখেও দেখে না। বিমলের এই আচরণে বীণা অত্যন্ত দুঃ, এবং একাই সে কমলাকে আগলায়। কিন্তু বীণার এত লেখাও বার্ষিক—কমলা মারা যায়। কমলার মৃত্যুতে তাইয়ের এক অপ্রত্যাশিত নুতন রূপ বীণার চক্ষে উদ্ঘাটিত হয়; এক অসুপ্রাণিত বৃহত্তে বীণা বিমলকেই স্বামীরূপে বরণ করে বলে। অব-অচেনন খেতালী শিল্পকে নিয়ে বীণা পরকরা পাতে।

সংক্ষেপে এই হল পুরতাবিন্যাস কাহিনী। কাহিনী বর্ণনার লেখক এক নুতন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এক গৌণ চরিত্ররূপে তিনি নিজেকে গল্পাংশের ভিতর নিক্ষেপ করে তত্ত্ববাহ্য কাহিনীর গতি আগাগোড়া অনুসরণ করে গেছেন। রচনা-পদ্ধতির এই বৈশিষ্ট্য পাঠকের চুটি আকর্ষণ করে। রচনাটি উপভোগ্যও বটে। সংকল্পনাও নিজের নিঃসঙ্গ লিখন-সুশলতার গুণে বইয়ের প্রতিটি পাতা সন্নিবস্তার মস্তিত হয়ে উঠেছে—কোথাও পড়তে আটকায় না বা মনোবোণ ব্যাহত হয় না। লেখকের পক্ষে এটা কম ভক্তিধর কথান নয়।

লেখক গল্পাংশের ভিতর টেলিকোন-অপারেটরদের অত্যন্ত-অভিব্যোমের প্রসঙ্গ বসে। পারেন অবতারণা করেছেন, সেটি উপক্ৰান্তিকে সার্থক উদ্দেশ্যবলকতার ভূমিত করেছে। অত্যন্তগুণ নিয়মবাহিত পরিবারের বর্ষান্তিক অগম্যতার রূপটিও বইতে কম নৈপুণ্যের সঙ্গে চিত্রিত হয়। সেবেজ্ঞে ক্ষেত্রে গ্রন্থকারের খ্যাতি প্রসারিত এবং বহির্বিদে। সেই খ্যাতি বর্তমান গ্রন্থে প্রকাশে বসিত হয়েচে বলে মনে করি।

পরিশেষে, গ্রন্থটির কর্ম নিয়ে চ এক কথা বলব। নরেন্দ্রনাথ মিত্র এ যাবৎ যে কয়টি উপক্ৰান্ত লিখেছেন তাদের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে উপক্ৰান্তের আবরণে তারা প্রসিদ্ধিত গম্য বাদ। কাহিনীর সৈধ্য আছে,

খ্যাতি নেই। ভূমিকার চরিত্রের সমস্তই একটি মূল ঘটনার বিস্তারিত ক্রমিক উল্লেখ। লেখকের যে পরিচয় ক্ষুদ্র, অনেকগুলি ঘটনাস্রোতকে একত্বীয় করে বহা-গংগনের অশব্দতার মধ্যে তাদের মিলাবার দিক্লে পরিচয় ক্ষুদ্রি তার নেই। ফলে নবী শুধু বীর্ণাঘিহই হতে থাকে, সাগর আর হই না। আলোচ্য গ্রন্থটিও এই ক্রটিবিশুক্ত নয় বলে মনে করি।

নারায়ণ চৌধুরী

কলে দেখা আলো—মনোতোষ সহকার।
কালকাতা। বুক ক্লাব, ৬২, হারিসন রোড, কলিকাতা।
মাস দু' টাকা।

কয়েকটি চোট গল্পের সংকলন। আশে পাশের চেনা জানা পরিবেশ থেকে মনোতোষবাবু তাঁর পাত্রী পাত্রী থেকে নিয়েছেন। অসম অর্থব্যবহার পীড়নে নিরম্যাবিষ্টের জীবন-স্রোত খাঙ নানা বাক্য বাক্য, বাধাপ্রাপ্ত। সেই সব বাক্য বাক্যে মনোতোষবাবুর সজ্জানী চুটি চলেছে। চরিত্রগুলি শুধু যে লেখকের একান্ত পরিচিত তাই নয়, তাদের প্রতি তাঁর অক্লান্ত বহন-বোধের প্রাণ সর্বত্র স্পষ্ট। কুমিলার লেখকের সৌকৃতি আছে, সামাজিক দাপ্তরের বৃহত্তর কল্যাণের পল স্পর্শ করার দক্ষিণবাহী তাঁর প্রেরণা, সৃষ্টির উৎস; কলে লেখকের বাচনভঙ্গি, বক্তব্য কোথাক স্পষ্টতার ঘোরার আশ্রয় নয়, কিন্তু কোন একটি দায়িত্ব সফল অতি সচেতনতা অনেককালে শিল্প সৃষ্টির বাধা হয়ে ঈড়িরেহে এমন নভিদের খডাব নেই। 'কলে দেখা আলো'কে তার ব্যতিক্রম বলতে পারি না। সব ক'টি গল্পই একটি বিশেষ স্তরে বাধা থাকার বৈচিত্র্যে অত্যন্ত সহজেই চোখে পড়ে। কোন কোন গল্পে লেখক তুঙ্গ গন্তিতে গিয়ে বক্তব্য পৌঁচেছেন। সে সব ক্ষেত্রে চরিত্র বা পরি-বেশ কোনটির উপরই স্রবিতার করা হয়নি। অবস্ত্র এল ক্রটি বিহীন কয়েকটি গল্প প্রথম শ্রেণীর গথীরে গিয়ে পৌঁচেছে। বেরন, প্রাণ-স্বাধা বাক, যুগ, লাগ।

চোট গল্পের কারবারী হিগাবে মনোতোষ বাবুর মূলধন নগণ্য নয়। পরিবেশ রচনার 'তাঁর হাত পাকা। আদিক লক্ষ্যেও তিনি সচেতন। বুক শেখের মাপদোকে তিনি তারই করেছেন। বিষয়বস্তুর নিম্নতত্তর ক্ষেত্রে তিনি যে সার্থকতার চোটগল্প সৃষ্টি করতে পারবেন একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে।

দীর্ঘেন্দ্রনাথ মিত্র



বাট্টি বাজেট

এবারকার কেন্দ্রীয় বাজেট মোটামুটি বিশেষত্ব বহির্ভূত। সাধারণত কেন্দ্রীয় বাজেটে সেই বছরের সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা ও নীতির কথা বলা হয়। কিন্তু এবার বাজেটে তা বলা হয়নি, সে বিশেষ দাবি নিয়েছে—পরিকল্পনা কমিশন (Planning Commission)। পরিকল্পনা কমিশনের রিপোর্ট আগামী তিন বৎসরের আর্থিক নীতি ও ব্যবস্থা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। অর্থমন্ত্রী নিজের দাবি করেছেন সে উন্নয়নের ক্ষমতা পরিকল্পনা কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী করা হয়েছে। কি পরিমাণ টাকা কোন কার্যে ব্যয় করা হবে—এবং সরকারী তহবিলে বাড়তি বা বাট্টি নির্ধারণ করার বিষয়ে—পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশই মান্য করা হয়েছে। তাই আমরা প্রথমেই বলেছি যে এবারকার বাজেট মোটামুটি বিশেষত্ব বহির্ভূত।

চলুতি (Revenue) এবং মজুত (Capital) হিসাবে আর ও ব্যয় হিসেবে আগামী বৎসরের শেষে অর্থাৎ ১৯৬৪ সালের ৩১শে মার্চ ভারতীয় সরকারের হোন্ডার উপর এক মত চলুতি কোটি টাকা বাট্টি থাকবে। চলুতি হিসাবে (Revenue accounts) ৪৫ লক্ষ টাকা বাড়তি দেখান হয়েছে। ৪০৯ কোটি আর; ৪৫ লক্ষ ব্যক্তি মত টাকাই ব্যয় হবে। এই হিসাবের মধ্যে একটু টাকা আছে—জমার অধিক পাকিস্তান থেকে প্রাপ্য ১৮ কোটি টাকাও রয়েছে; এ টাকা পাওয়ার বিশেষ কোন সম্ভাবনা নেই। কাজেই এই ১৮ কোটি টাকা বাট্টি হিসাবে ধরা গেল। বিশেষ থেকে আবাদনী ব্যক্তি শুল্কের মূল্য এত বেশী যে জন সাধারণের

পক্ষে ঐ মূল্যে ব্যক্তি আবাদনী করা চলে না। তাই প্রতি বছরেই কেন্দ্রীয় সরকার বিস্তারিত কতি দাবি করে কম করে ঐ ব্যক্তি শুল্ক বিস্তারিত করত। ১৯৬২-৬৩ সালের বাজেটে, মজুতের অর্থমন্ত্রী বলেছিলেন যে ব্যক্তি শুল্ক অর্থ সাহায্য আর করা হবে না; কিন্তু তাহা শেষে ১৯৬২-৬৩ সালে ১১ কোটি টাকা ব্যক্তি-সাহায্যে ব্যয় করা হয়েছে।

আগামী বৎসরের ব্যয়ের হিসাবে ব্যক্তি সাহায্য ব্যয় এক পয়সাও বর্ধা হয় নি। হয় সরকারকে এই বছরের মত আগামী বছরেও ব্যক্তি সাহায্য (food subsidy) ব্যয় বিস্তারিত টাকা খরচ করতে হবে; অথবা এই খরচটা প্রাদেশিক সরকারের ব্যয় চাপান হবে; অথবা জনসাধারণকে ব্যক্তি করা হবে অতিরিক্ত মূল্যে ব্যক্তি শুল্ক কর্তৃক কর্তৃত্ব। প্রাদেশিক সরকার সমুদ্র অর্থ-কায়েই বাট্টি বাজেট দেখিয়েছে; কাজেই তাহা যে অতিরিক্ত ব্যয় তার বহন করবে—তার কোন সম্ভাবনা নেই। আর জনসাধারণ যে ৩০—৩৫ টাকা মূল্য চাল বা ২৫—২৬ টাকা মূল্য গম কিনে থাকে—সে ক্ষমতাও তাদের নেই। কাজেই এটা কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বই পড়ে থাকবে এবং প্রকৃত বাট্টির হিসাবে এটাও রাখান উচিত। তাতে আর আরও ৪০ কোটি টাকা বাট্টি বেড়ে যায়। আর মজুত তহবিলের বাট্টির সঙ্গে এই ৪০ কোটি টাকা যোগ করলে আর ১৮০ কোটি টাকার মত বাট্টি পাড়ায়।

তাই এই বছরের বাজেটকে বাট্টি বাজেট বলা হতে পারে। সাধারণত বাট্টি বাজেটের নামে

লোক পক্ষিত হয়। কারণ গত দুই বছর সময় দেখা গিয়েছে যাট্টি বাজেটের ফলে প্রবোধ মূল্য অত্যন্ত বেড়ে যায়। সাধারণ সংসার চালাবার মত অর্থ সঞ্চয় বহু লোকেরই থাকে না, যদিও অর্থের পরিমাণ তাদের হাতে কিছু বেশী থাকে। যাট্টি বাজেট অর্থকিণ্ড যে টাকা সম্ভার সরকারের হাতে নেই, মূলত তৈরী টাকা। বাজারের ছেড়ে, সেই টাকার সৃষ্টি করাকেই আমরা প্রবাস্তঃ যাট্টি বাজেট বলি। সরকারী মজুত তহবিলে (Cash balance) যে টাকা জমা থাকে, তাও কিছু সরকারের টাকা নয়—সেটা প্রবাস্তঃ রূপে প্রাপ্ত সরকারের কাছে পক্ষিত টাকা। সেভিংস ব্যাংক, জাতীয় সেভিংস সার্টিফিকেট (National Saving Certificates), প্রভিডেন্ট ফান্ড Provident Fund) প্রভৃতি বাণ্য সরকারের কাছে বহু টাকা পক্ষিত থাকে।

সরকার বেশের জন-সাধারণের কাছে থেকে বহু বণ্য তোলে। এমনি নিরে সরকারের মজুত তহবিল গঠিত হয়। এ টাকা তেলে খরচ করলে তৈরী টাকা খরচ করার সুকল হয় না; অস্তিত্বঃ যে পরিমাণে হয় না। কারণ ঐ টাকা জাতির ছিল। কয় বা ট্যাক্স হিসাবে না নিয়ে—তা বণ্য হিসাবে নেওয়া হয়েছে।

তাহাঃ বিদেশে আমদানির কিছু টাকা জমা আছে, থাকে বলে স্টার্লিং তহবিল (Sterling balance)। ২০ কোটি টাকা। এ বাবদ জমা আছে এবং খরচ ৫০ কোটি টাকা করে শুধান থেকে আমদানির ব্যয় করা আছে। এ টাকা এনে খরচ করাকেও এক হিসাবে যাট্টি বাজেট বলা চলে; কিন্তু বস্তানানে তাকে টিক্ যাট্টি বাজেট বলা হয় না। এ ছাড়া আমরা বিদেশ থেকে কিছু অর্থ সাহায্য—প্রবাস্তঃ বণ্য হিসাবে—পাচ্ছি। যদিও এটাও ফাট টাকা অর্থায় সরকারের উপার্জিত টাকা নয়, তবুও এটাকেও টিক্ যাট্টি বাজেটের মধ্যে বরা হয় না। কিন্তু সরকার বহন রিজার্ভ ব্যাংক থেকে বার করে অর্থায় কাগজের নোট

ছেলে টাকার অভাব মিটার, সে অবস্থাকে বস্তানানে প্রকৃত পক্ষে যাট্টি বাজেট বলা হয়।

যাট্টি বাজেটের ফলে বাজারের অতিরিক্ত টাকা জাড়া হয়; এবং তার ফলে টাকার ক্রয় ক্ষমতা কমে যায় অর্থায় প্রবোধ মূল্য বেড়ে যায়—। জন-সাধারণের হাতে যে পরিমাণ টাকা বার, প্রবোধ মূল্য তার চেয়ে অনেক বেশী বেড়ে যায়—এটা গত দুই বছর সময় বিশেষভাবে দেখা গিয়েছে। ১৯৩৪ সাল থেকে বস্তানানে টাকার মূল্য আর এক সিকিতে পড়িয়েছে। অমত সাধারণ লোকের আর সেই হিসাবে থাকেনি। কাজেই যাট্টি বাজেট সবচেয়ে প্রবাস্তঃ আপত্তি হলো জন-সাধারণের জীবন ব্যাংক দুর্বল হয়ে ওঠে বলে। অমত দেশের উন্নয়ন কার্য ব্যাপক ও ক্রয়ভাবে কয়েত হলে, যাট্টি বাজেট তির্যক কোন উপায়ক নেই। তাই দেখতে হবে যে এই মূল্যনীতির ব্যাংক—প্রবোধ মূল্য অতিরিক্ত রকমে বেড়ে না যায়। এর প্রতিকার কী তাঃ আমদানির দেখতে হবে।

এই ক্রিয় মূল্য সৃষ্টি দুই উদ্দেশ্যে হতে পারে;— উৎপাদক ও অগ্রপাদক। দুই বছর সময় ক্রিয় মূল্য সৃষ্টি করা হয় অগ্রপাদক উদ্দেশ্যে। দুই বছর প্রবোধমূল্য টাকা দিয়ে বা করা হয়, তা জন-সাধারণের ব্যবহার প্রবাস্তঃ বণ্য বস্তাবস্তঃ যে পরিমাণ জিনিষ বাজারের (Commodities) আসত, তার উৎপাদনও ক্রিয়ের দুই বছর প্রবোধমূল্য প্রবাস্তঃ তৈরী করা হয়। এক দিকে টাকার পরিমাণ বার বেড়ে অপর দিকে প্রবোধমূল্য প্রবোধ পরিমাণ বার কমে। প্রবোধ চাহিদা বাড়বে এবং টাকা হয় উৎকৃষ্ট। তাই অর্থনীতির সাধারণ মূল্য অগ্রপাদে প্রবোধ মূল্য বেড়ে যায় এবং মূল্য ক্রয় ক্ষমতা কমে যায়।

কিন্তু বেশের পরিবর্তন-মূল্য উন্নয়ন কাজে যাট্টি বাজেটের টাকা উৎপাদন-মূল্য কাজে ব্যয় করা হবে; তাই টাকার পরিমাণ বেশ বাড়বে প্রবোধমূল্য-প্রবোধ আমদানীও তেমন বেড়ে যাবে। পরিবর্তন অগ্রপাদে

যে সব কাজে অভিরিক্ত টাকা ব্যয় হবে, তার অধিকটা
প্রয়োজন প্রযোজ্য উৎপাদন বাড়ানোর জন্য; এবং
প্রধানতঃ এই টাকা ব্যয় হবে কৃষির উন্নতির জন্য।
২৬৯ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় ১০০ লক্ষ কোটি টাকা
সেচ (irrigation) কৃষি ও গ্রাম্যের উৎপাদন শক্তি
বৃদ্ধির জন্য।

এপ্র উঠতে পারে টাকা বরন ব্যয় করা হবে, সেই
গত্রে সচেষ্ট দেশের উৎপাদন শক্তি বাড়বে না।
কাজেই কিছুদিন অন্ততঃ টাকার পরিমাণ বাড়তে হবে।
এরও জগাব আছে যতদিন পর্যন্ত নিজেদের দেশের
প্রয়োজন-প্রযোজ্য উৎপাদন না বাড়বে, ততদিন পর্যন্ত
বাড়তি টাকা দিয়ে কেনবার মতো বাড়তি ত্রুণা বিদেশ
থেকে আনানী করা চলে। বিশেষ করে যন্ত্রবিশেষ
নিজা ব্যবহার্য বাস্তব শক্তি যথি সংগত রাখে প্রয়োজন
পরিমাণে বিদেশ থেকে আনানী করে বাজারে দেওয়া
যায় তাহলে মুদ্রাস্ফীতি হওয়ার আশঙ্কা অনেকটা কমে
যায়। গত কয় বছর ব্যত এক দিকে যেমন বাড়তি
বাড়তি চলছিল, অন্য দিকে চলছিল বৈদেশিক লেন-
দেনে বাড়তি; অর্থাৎ যে পরিমাণ মাল আমদা রপ্তানি
করতাম, তার চেয়ে অনেক বেশী পরিমাণ মাল আমদা
আনানী করতাম। তাতে বাজেটজনিত মুদ্রাস্ফীতি
সে পরিমাণে হয় নি। তাছাড়া গত কয় বছরে কৃষি ও
সেচের জন্য যে টাকা ব্যয় করা হয়েছে, তা থেকে কিছু
অভিরিক্ত বাস্তব আয় আবাদী বছর থেকে পেতে
শুরু করব।

মুদ্রাকী বীধ থেকে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা অধিক
ইতিমধ্যে সেচের ব্যবস্থা হয়েছে এবং তা থেকে আসছে
বছর প্রায় ১০ লক্ষ মণ ধান পাওয়া যাবে, বলে আশা
করা যায়। দামোদরের বীধ থেকে, বিশেষ করে
টিলার বীধ থেকে আগামী এক বছর হয়ত কিছু অধিক
সেচের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। এবং ১৯৫৫ সালের
মধ্যে হীরাবুদ, দামোদর, বোকারা ও অজ্ঞাত ছোট
ছোট বীধ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা অধিক সেচের ব্যবস্থা

হবে। কাজেই এবছর বাড়তি বাজেটে যে বাড়তি
টাকার শক্তি করা হ'ল, তার ক্রয় শক্তি বজায় রাখার
জন্য বাড়তি মাল বিদেশ থেকে আনানী করে ও নিজ
দেশে উৎপাদন করে মুদ্রাস্ফীতি দোধ করা যাবে এ
আশা অনায়াসে করা যায়।

বাড়তি বা কৃত্রিম মুদ্রা হল এক প্রকার টাকামূল্য
ব্যয়। তিন ভাবে সরকার লোকের কাছ থেকে টাকা
আদায় করে;—প্রকৃতভাবে এ সব কাটাই কর আদায়ের
বিভিন্ন ক্রম! খোলাপুলি কর বসেই কতক টাকা
তোলা হয়; বনী ও দরিদ্র বিশেষে বিচার করে তা
নিয়ন্ত্রণ করা চলে। টাকা তোলায় দ্বিতীয় পন্থা হলো
বিভিন্ন প্রকারের ঋণ তোলা। এটা লোকের থেকে
প্রাপ্য। কোন বাধ্যবাধকতা এতে নেই। বনীর
বয়ের উৎস টাকা থাকে; তা ব্যাঙ্কে ফেলনা যেনে
সরকারকে ঋণ দেওয়া হয় এবং তার জন্য সুদ পায়।
টাকা তোলায় তৃতীয় ক্রম হ'ল বাড়তি বাজেট; এটা
কতকটা শাস্তি মূলক পাইকারী করিমান। দেশের
জন সাধারণ নতুন কং সুনলেই চকল হয়ে উঠবে;
বনীর সরকারকে ঋণ দিতে রাজী হচ্ছে না;—অতএব
বাড়তি বাজেট করা হউক। কলে গাড়ার এই বনী
দরিদ্র নিবিশেষে সবাই নিজের অজান্তেই কিছুটা
পরিমাণে দরিদ্র হয়। অর্থাৎ শ্রমিকের টাকা পরিমাণে
সমান থাকলেও বাস্তব আয় (real income) প্রত্যেক
করেই কিছু পরিমাণে কমে যায়। প্রথম দুই বছর পর
কার্ভানীতে এমন মুদ্রাস্ফীতি দেখা গিয়েছে যে বাড়ী দিবার
করে লক্ষ টাকা (Mark) ব্যাঙ্কে রেখেছে; কয়মাস
পরে তা দিয়ে একবেলার আহার্য ক্রয় করাও চলে নি।
কমিউনিষ্টের আদর্শবাদের পূর্বে টীনের অবস্থা আর
দেইকরই ছিল। কার্ভানীতে হিটলার ঐ মুদ্রাস্ফীতি
এক করেছিল, টীনে কমিউনিষ্টরা তা করেছে।

অবশ্য এটা হ'ল বাড়তি বাজেট ও মুদ্রাস্ফীতির চরম
অবস্থা। আমাদের দেশে এরকমের মুদ্রাস্ফীতির কোন
আশঙ্কা নেই, শুধু বাড়তি বাজেট সম্পর্কে সতর্ক হওয়া

মতঃ। পঞ্চাবাদী পরিচালনা ২২০ কোটি টাকা ব্যয়িত ব্যাঙ্কট করা হয়েছিল। এটা কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের সমবেত ব্যাঙ্কটের হিসাবেই আমরা ধরেছি। এই বছরে কেন্দ্রীয় সরকারের বেড় শত কোটি টাকা ব্যয়িত হাফা বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের বহু ব্যয়িত হয়েছে। এসব হিসাব করলে সম্ভবত আশঙ্কা আছে যে পঞ্চাবাদী পরিচালনা পূরণ করতে ২২০ কোটি টাকার চেয়ে অনেক বেশী ব্যয়িত হবে। তবু সেরম আশঙ্কার কোন কারণ আমরা এখনও দেখি না। এক দিকে যেমন প্রয়োজন-প্রত্যয় আমরা ব্যয়িত করেছি, অন্য দিকে ব্যবস্থা বাণিজ্যের বর্তমান অবস্থা হুঁ করে প্রয়োজনীয়তাও আছে। বর্তমানে ব্যবসায় বাজার অত্যন্ত সঙ্কটিত হয়েছে; ফলে বেকার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠছে। সরকারের এই সমস্যা হুঁ করে দরকার এবং তার প্রাধান্য গৃহীত ব্যয়িত ব্যাঙ্কট বা কৃত্রিম মুদ্রার প্রসার।

কৃষিক্ষণ

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৩৪ সালে বন্য দ্বাপিত হই তখন তার অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল, কৃষিক্ষণের ক্ষয় ক্ষয় দিবে সহায়তা করা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনের ১৭ ধারার ৪ উপধারার (ঘ) অধে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অন্ততম কার্য হিসাবে বলা হইয়াছে "for the purpose of financing seasonal agricultural operations or the marketing of crops"—অর্থাৎ ঋতুসী কৃষিক্ষণের অর্থ যোগান অথবা উৎপাদিত পণ্যের বিক্রয় ব্যবস্থা করা। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইন বন্য প্রণীত হই তখন সাড়বের বলা হয়েছিল কৃষকদের সাহায্য করা এই ব্যাঙ্কের একটি প্রধান কার্য হবে; কিন্তু বহুদিন পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই বিষয়ে কিছুই করতে পারেনি—গত কয়েক বছর ব্যবহৃত এই বিষয়ে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিছুটা অগ্রগতি হবার চেষ্টা করছিল।

এই উদ্দেশ্যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই পর্যন্ত খাতা কোটি টাকার মত বিভিন্ন প্রদেশে কেন্দ্রীয় সামবায়িক ব্যাঙ্ককে

(Central State Co-operative Banks) খণ দিয়েছে। সামবায়িক ব্যাঙ্কের স্থানের দ্বার হলো— শতকরা ৩০ টাকা; কিন্তু কৃষিক্ষণের ক্ষয় এই স্থানের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক মাত্র ১০ টাকা হারে সুদ দিচ্ছে। এই কতি বীকার করার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন হইয়াছে। বৎসর মতো খণ পাও। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই উদ্দেশ্য যে সফল হই নি তা পার্লামেন্টে—শ্রীঅরুণ চন্দ্র সেনের এক প্রশ্নের উত্তরে প্রকাশ পেয়েছে। অরুণ বাবু প্রশ্ন করেছিলেন কৃষিক্ষণের ক্ষয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কত স্থানে কত টাকা খণ দিয়েছে এবং কৃষকদের নিকট সেই টাকা কত স্থানে লই করা হচ্ছে। তার জবাবে প্রকাশ পাই যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১০ টাকা স্থানে যে টাকা দিচ্ছে তা কৃষকদের হাতে পৌঁছানো সামবায়িক শতকরা ১০-১২ টাকা স্থানে; এবং কোন কোন প্রদেশে ২০-২৪ টাকা হারেও কৃষকদের নিকট সুদ আদায় করা হয়। বাংলাদেশে শতকরা ১২।০ টাকা সুদ কৃষকদের নিকট হতে নেওয়া হয়।

এই তথ্য প্রকাশ পাওয়াতে পার্লামেন্টে নিম্নোক্তক প্রশ্ন ওঠে। সরকার পক্ষ থেকে জবাব দেওয়া হয় যে সামবায়িক ব্যাঙ্কসমূহ প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বাধীন; কেন্দ্রীয় সরকারের এবিষয়ে কোন অধিকার নেই। এর উপর অরুণ বাবু জিজ্ঞাসা করেন, কার উপকারের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই কতি বীকার করছে এবং এই কতি উচ্চহারে কৃষকদের থেকে সুদ আদায় করা হইয়াছে অথবা বলা সরকার মনে করেন কিনা। এরপর অর্থমন্ত্রী শ্রীদেবদুর্গ বীকার করেন যে এইরূপ উচ্চহারে কৃষকদের নিকট হতে সুদ গ্রহণ করা হচ্ছে, তা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক বা কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিতে এক দিন আসেনি; রিজার্ভ ব্যাঙ্কের হাতে অবশ্য এমন কিছু কনভা আছে বা প্রয়োগ করে এর প্রতিষ্ঠার করা চলে।

জনসাধারণের দাবীতে সরকার এক একটা প্রথা প্রবর্তন করে এবং তাকে কাজে পরিণত করার দায়িত্ব

কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা এককল-কর্মচারীর হাতে চেষ্টা দিয়ে নির্দিষ্ট থাকে—যে উদ্দেশ্যে সে ব্যক্তি গ্রহণ করা হয়েছিল তা কতদূর সাধিত হইল, তার বোঝা নেওয়া অসম্ভব সরকারের প্রায়ই থাকে না। কুবকদের সুবিধার জন্য কতকটা কতি স্বীকার করেও রিজার্ভ ব্যাক কুবকদের সুবিধার জন্য টাকা বিচ্ছিন্ন; আর যখন থেকে বিভিন্ন সামরিক ব্যাক তাদের অধীকার ও তাদের কর্মচারীকে দুলাল মূর্তিহীন। অগচ্চ রিজার্ভ ব্যাক বা কেন্দ্রীয় সরকার তা আনতেও পারেনি। আশাকরি অবিলম্বে রিজার্ভ ব্যাক যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করবে—যাতে করে কুবকপণ খুব কবচারে এই টাকা গণতে পারে। বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের কাছ থেকেও কৈফিয়ৎ চাওয়া উচিত কেন এত উচ্চহারে এতদিন কুবকদের থেকে সুবিধা আদায় করা হয়েছে। যে সব বণ এই প্রকার উচ্চহারে বেওয়া হয়েছে, তারও বাস্তব সুবিধা হার করা হয়—তার ব্যবস্থাও রিজার্ভ ব্যাকের বা কেন্দ্রীয় সরকারের করা উচিত; কেবল ভবিষ্যতের জন্য সর্বোচ্চই যথাযোগ্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে চলতি কণকে এই উচ্চহারে থাকতে দিলে অগ্রসর করা হবে।

আফ্রিকার চাকলা

বিশ্বের আর অল্প সময় মহাদেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদ গোপ পেরেছে কিন্তু আফ্রিকার এখনও তা আর পুরো-দুপুরই চলছে। গত বিশ্ব-যুদ্ধের পর প্রধানতঃ গাজাখির অহিংসা আন্দোলনের কালে এবং কতকটা বিখ্যাত-নৈতিক পরিস্থিতির চাপে, ইংরেজরা তাদের বিরাট ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করতে রাজী হ'ল। ভারতবর্ষ ত্যাগ করে সিংহল ও ব্রহ্মদেশে আধিপত্য বজায় রাখা সম্ভব নয়, সম্ভবও নয়; তাই এই দুই দেশ থেকেও ইংরেজ সরে পড়ল। কিন্তু ভারতের পূর্বদিকে এডেন এবং পশ্চিম দিকে সোমালিল্যান্ডে তার ঠাঁটি সে বজায় রাখল। সোমালিল্যান্ডে প্রোগ্রেসিভ আন্দোলন এখনও চলছে। অপর দুটি আভিগত এনিয়ার কিছু সাম্রাজ্যিক অবিকার

ছিল; ডাচদের (Dutch) সাম্রাজ্য ছিল ভারতীয়-বিশ্বপুত্র এবং করাচীদেব সাম্রাজ্য ছিল ইন্দোচীনে। ডাচদের তাদের সাম্রাজ্য বেড়ে ছিল; কিন্তু করাচীরা এই ব্যাপারে অত্যন্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতাসীল মনোভাবের পরিচয় দিল। তাদের বিরোধী ঐতিহ্য হুঁলে দিয়ে, তারা ইন্দো-চীনের সাম্রাজ্য আকৃষ্ট হইল; তাই পোল্যান্ডক অবলম্বিত সেখানে চলতে লাগল।

কিন্তু আফ্রিকার সাম্রাজ্য ইংরেজ, করাচী ও বেলজিয়ান কেউ ছাড়েনি। উত্তর দিকে মরোক্কো (Morocco) ও টিউনিসিয়াতে (Tunisia) করাচীর সাম্রাজ্যিক অবিকারের বিরুদ্ধে তীব্র গোপনাল চলছে। দক্ষিণদিকে ইংরেজের বিরাট সাম্রাজ্য আছে এবং তা বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত এবং বিভিন্ন শাসন ব্যবস্থার শাসিত। দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa) নামে যে যে অংশ পরিচিত তা ঐক্য ইংরেজের প্রত্যক্ষ সাম্রাজ্য নয়; এটা হলো প্রধানতঃ বুয়োরদের (Boer) এবং অংশত ইংরেজ ঔপনিবেশিকদের সহযোগিতার শাসিত। মোট অবিকারী শতকরা ১৫:২০ জনের বেশী খেতকার ঔপনিবেশিকদের সংখ্যা হবে না; তবুও শুধানকার স্থানীয় কৃষকার নিজে অবিকারী ও অসংখ্য ভারতীয় বাসিন্দাদের উপর বেসতকার শাসনকর্তার বর্বরোচিত আচরণ করছে। এর বিরুদ্ধে ভারতীয় ও নিজে অবিকারীরা দিলে অহিংস সত্যপ্রার্থ চালাচ্ছে। এখানে একথা উল্লেখ করা উচিত যে ৪০ বছর পূর্বে যথাক্রমে গাজী ওখানে সত্যপ্রার্থ আন্দোলন চালান, বেসতকারদের ঠিক এখনই আচরণের বিরুদ্ধে। আজও যথাক্রমে গাজী পুত্র প্রিন্সিপাল গাজী এই আন্দোলনের নেতা এবং ভারতীয়দের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা যে চাকলায় বসে বসেছে তার প্রধান আফ্রিকার অগ্রাঙ্গ অংশেও ছড়িয়ে পড়েছে।

ট্যাংগানিকা (Tanganyika) অঞ্চলে নিজে অবিকারীরা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করেছে। ভারতীয় অহিংস নীতি বজায় রেখে চলছে না মাউ-মাউ (Mau Mau) স্বাধীনতা দল সেখানে

ভগ্ন বিস্ত্রোদ্ধক সমিতি হিলাবে কাজ চালাচ্ছে; কিন্তু দেশের জনসাধারণের ব্যাপক সমর্থন ভাঙের কাজের পিছনে আছে, একথা সহজেই বলা চলে। ইংরেজ সরকার ভাগের পুলিশ ও সামরিক জুঁপের দ্বারা আন্দোলনকে দাখাবার চেষ্টা করছে কিন্তু ব্যাপক বিদ্রোহ এতে হমিত বা শাস্ত হবে এ প্রশ্ন করা তাদের পক্ষে নিতাইই সুল।

উত্তর ও দক্ষিণ রোডেসিয়া ও নাইসাল্যান্ড (North and South Rhodesia and Nyasaland) নিয়ে মহা আফ্রিকা নাম দিয়ে একটা নতুন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র গড়বার চেষ্টা ইংরেজরা করছে। এখানকার বৃটিশদের ইংরেজদের হাতে এই বিরাট জুঁপের শাসনভার তুলে দেওয়ার এটা হ'ল একটা কলি। এখানকার সমস্ত নিগ্রো অধিবাসীরা এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন শুরু করেছে। বাস্তব এখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের দ্বারা অধিকার বজায় থাকে তত্বন ব্যবস্থা করা না হলে এখানকার সোশ্যাল মিউচার কোন সম্ভাবনা নেই। সেখানেও এই জাতীয় আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের জুঁপ চলছে। সর্বত্র যেমন, এখানেও তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কাগজুর পাখার নেতৃত্বে মিশর রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু ইংরেজ সৈন্যবাহিনী তখনও মিশরে রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশেষ করে সuez কালকে Suez Canal) সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব ইংরেজ নিজের হাতেই রেখেছিল। তা ছাড়া মিশরের উত্তরে অবস্থিত সুদানে (Sudan) ইংরেজের প্রভাব আর পুরোই রইল। সুদান হ'ল মীলনদের প্রবাহ-ক্ষেত্র এবং আফ্রিকার মিশরের স্তম্ভেরও বেশী হবে। সুদান বার হাতে থাকবে, মীলনদের জল সে ইচ্ছাবশত নিয়ন্ত্রিত করতে পারবে এবং তার অর্থ হ'ল, মিশরের কৃষির মরুভূমিতে পরিণত করতে পারবে। নামন্তঃ সুদান হ'ল—মিশর ও ইংরেজের যুগ্ম-শাসনের অধীন; কিন্তু কার্যত তা ইংরেজেরই অধীন। সুরেজ খালের ও সুদানের উপর কতৃৎ নিয়ে মিশরে ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র অসন্তোষ প্রচারিত হচ্ছিল।

মিশরের ভূতপূর্ব রাজা ফারুক ইংরেজের গোপন

বন্ধ বলে লোকে সন্দেহ করত। এই রাজবংশ কতকটা ইংরেজের সখী : এক বছর পূর্বে ইউরোপের অন্তর্গত অলবেনিয়ার (Albania) অধিবাসী মহম্মদ আলি কতকটা দস্যুরাজির কাজে মিশরে গিয়ে নিজের প্রভাব বিস্তার করে এবং তখন মিশর ছিল তুরস্কের সুলতানের অধীন। ঐ সুলতানের বিরুদ্ধে একজন মহারাজ হিলাবে ইংরেজ মহম্মদ আলিকে খেদিভ (Khediv) বলে স্বীকার করে। ফরাসীদের প্রভাব ওখান থেকে তাড়ানোর জন্য ইংরেজের এটা হল চাল। আরো আরো ইংরেজ সুরেজ খালের ফরাসী কোম্পানীর অনেক অংশ কিনে নেয়। এই রাজবংশ মিশরের বাসিন্দা বা অধিবাসী নয় এবং এর এতখিনের চাল-চলতিও জনসাধারণের পক্ষে খুব মরণজনক ছিল না। গত বছর জেনারেল নেগিভ রাজা ফারুককে বেশ পেকে নির্বাসিত করে এবং এখন শুধানে রাজতন্ত্র নামের বজার আছে এবং হরত শীঘ্র সেই নামেরই অস্তিত্ব লোপ পাবে।

এখন মিশরের সঙ্গে ইংরেজের সংঘর্ষ চলছে সুদান ও সুরেজ খাল নিয়ে। সুদানের লোকেরা মিশরের নয়; —একমাত্র চৌধুরী ঐক্য চাড়া সুদান ও মিশরের অধিবাসীদের মধ্যে অন্য কোন ঐক্য নেই। সে হিলাবে সুদানকে মিশরের সঙ্গে জুড়ে রাখাও হরত সম্ভব নয়। ইংরেজরা এই বাস্তব অবস্থার সুযোগ নিয়ে ভট্টাকে আলাদা করে নিজেদের ভাবে রাখার চেষ্টা করছে। সম্ভ্রুতি ইংল্যান্ড ও মিশরের মধ্যে সুদান সম্বন্ধে এক চুক্তি হয়েছে।—নতুন নির্বাচন হবে এবং ঐ নির্বাচন সংবিধান সংসদ নির্ধারণ করবে সুদানের ভবিষ্যত। সুদান যদি মিশর থেকে আলাদাও হতে চায়, তবুও সেখানে ইংরেজের বর্তমান অধিপত্য চলতে পারবে বলে মনে হয় না।

আজ ব্রিটেনের সাম্রাজ্য বলতে প্রধানতঃ আফ্রিকার এই সব অঞ্চল। এই সাম্রাজ্যও তার পক্ষে বেশী দিন বজায় রাখা সম্ভব হবে না। আফ্রিকার এই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত ও ভারতবাসীরা সর্বপ্রকারে সহায়ত্ব দিচ্ছে এবং সাহায্য করছে। আফ্রিকার অধিবাসীরা তা স্বতন্ত্রতার পক্ষে স্বীকার করে এবং আমাদেরও এর জন্য পৌরষ ঘোষ করার কারণ আছে।

শ্রীমদ্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ নং আপার সাকুলার রোড হাইতে শ্রীমদ্বনাথ চক্রবর্তী কতৃক মুদ্রিত

এবং 'মঙ্গিরা' কাগালের ৩২ নং আপার সাকুলার রোড, কলিকাতা হাইতে তৎকর্তৃক প্রকাশিত।

শ্রী টাইপ ফাউণ্ডরী

আধুনিকতম ডিজাইনের হেডিং ও বডি টাইপ

এবং

বড়ার প্রভৃতি স্টক হইতে সর্বদা পাওয়া যায়।

সহাধিকারী

জে, সি, ছই অ্যাণ্ড কোং

৮ বি, লালবাজার ষ্ট্রট

বিকারীর বিল্ডিংস্

ফোন : বাত—৩৬১৩

দি বঙ্গলক্ষ্মী ইন্সিওরেন্স লিঃ

৩৩ নং নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা—১

ছ’লক্ষেরও অধিক টাকার দাবী মিটানো হইয়াছে

ভারতের সর্বত্র শাখা, চীফ এজেন্সী ও সংগঠন অফিস আছে

মাস্ত্রাজ অফিস—

৪০বি, সেকেন্ড লাইন বিচ্

যুক্তপ্রদেশ অফিস—

১৭৪, যুগিগঞ্জ এলাহাবাদ

আসাম অফিস—

নগাঁ আশাম

ছোটনাগপুর অফিস—

বেন রোড, রাতি

চীফ এজেন্ট :—জিবাঙ্কর

মিঃ এম, ডি, অর্জ

চীফ এজেন্ট :—মালাবার

এন, এ, মহম্মদ

চীফ এজেন্ট :—পূর্বপাঞ্জাব

জুনার এণ্ড কোং, লিমিঃ

কয়েকখানি পড়িবার মত বই

—মনোমোহন চক্রবর্তী—

হেলেনেরেইসের শ্রেষ্ঠ বই

রাশিয়ার রাজদূত ২৥০

ডাক্তারের দিখিজয় ২৥০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

১। জীবনের বসন্ত ২৬০

ভাষায়, কল্পনার ও শৌন্দর্য-বস্তিতে উজ্জ্বল গল্প সাহিত্যের আসরে স্থান পাইবার যোগ্য।

—আনন্দবাজার

২। রূপকথা ২১

রাবিলোনির উপকথার দেব দেবীদের নিয়ে রচিত কয়েকটি লরস গল্প। কল্পনার অভিনবত্ব ও মৌলিকত্বের প্রতিটি গল্প অতুলনীয়। লাইনো টাইপে ছাপা এই সুদৃশ্য বইখানি আনন্দোৎসবে প্রিয়জনকে দেবার পক্ষে একখানি আদর্শ উপহার। সুবিশিষ্ট এই পুস্তকের সমাহার ‘অন্তঃসারী’—বজ্রবর্তী।

—গোপাল ভৌমিক—

কয়েকটি বিদেশী গল্প ২৬০

গল্প হিসাবে সব কয়টিই উৎকর্ষতা দাবী করতে পারে।

—বরাদ

—ভার্যাপল রাহা—

রাশিয়ার সেরা গল্প ৩১

কব কথাসাহিত্যের আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ক্লাসিক পণ্যসমূহের শ্রেষ্ঠ গল্পগুলির বঙ্গানুবাদ একত্রে প্রকাশ করিয়া লেখক একটি স্বাধীন অভাব পূরণ করিলেন।

—আনন্দবাজার

আমাদের নূতন বই :

This Europe

Girija Mookerjee Rs. 7/-

বিত্তীয় মহানুভব কালে ইউরোপে নেতাজীর কাণ্ডাবলীর প্রথম প্রামাণ্য ইতিহাস। সত্য ঘটনা উপভোগ্যের চেহেড়া উপভোগ্য করে লেখক বলেছেন এই বইটিতে।

—অধ্যাপক দিলীপকুমার বিশ্বাস—

ভারতবর্ষীয় সভ্যতা ও

সাংস্কৃতিক সমস্যা ১৥০

অমৃতবাজার, আনন্দবাজার প্রকৃতি পত্রিকার উচ্চ প্রশংসিত।

বিশাল বাঙ্গলা ১১

—ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়—

বহুদিন বাদে ছুরিরে বাঙলা একখানি ছাপা বই আবার পাওয়া যাচ্ছে।

বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস

—স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী—

(তিন খণ্ড একত্রে বাঁধাই)

মূল্য—১০/-

—মগেন দত্ত—

সাম্রাজ্যবাদ ও

ঔপনিবেশিক নীতি ২১

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ২১

—নরেন্দ্র রায়—

বাঙলায় ভুলে যাওয়া যুগের এক অগ্রিমের কাহিনী পাবেন এই উপভাগটিতে। বহুবিধে বর্ণিত আনন্দমঠের প্রধান দৈনন্দিনের সত্যকার ইতিহাস।

সৃষ্টি ও সভ্যতা ২৥০

—অরুণচন্দ্র গুহ—

[শোভন দ্বিতীয় সংস্করণ]

সামান্য চট্টোপাধ্যায় মহাপুত্রের জন্মিকাল। পৃষ্ঠার আঁধা হইতে সভ্যতার উদ্বেগ, বিকাশ ও পত্নিগতির প্রকাশ ইতিহাস। সর্বত্র উচ্চপ্রশংসিত। যদিও ছোটদের অল্প লিখিত, তবুও বড়দের জ্ঞাতব্য কথাও অনেক আছে। বিশ্ববন্দুতে, ভাষার সম-সত্য, চরিত্র ও প্রজন্মপটের পরিচিত। পুস্তকখানি অপূর্ণ ও মনোজ্ঞ। বাংলা ভাষার ইহার সমতুল্য কোন পুস্তক নাই।

মূল্য—২৫/-

সরস্বতী লাইব্রেরী ৪ ৬নং বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট, কলিকাতা—১২



—স্মৃতিস্মৃতি—

পঞ্চদশ বর্ষ

চৈত্র-১৩৫৯

ষাদশ সংখ্যা

কাল-পরিচয়

(দেশবন্ধুর শেষ চিঠি)

শ্রীশাশ্বতমোহন চৌধুরী

করগার্ড কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং হয়েছিলেন তার সাংগঠিক; তাঁকে অসু-স্বস্তি করেছিলেন তাঁর পক্ষ নিয়ে বাংলার পক্ষপাতব। দেশবন্ধুর মৃত্যুর আট মাসের পরে এই কোম্পানীর পক্ষ-প্রাপ্তি ঘটলে।

এই কয়েক বৎসরে সংবাদপত্র সম্পাদনার চেষ্টা যে নবতর নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল তা নয়; সংগঠন ক্ষেত্রেও দেখা গিয়েছিল একটা ব্যাপকতার সংযোগ। এই সংযোগ সাধনের প্রায় বোল আনা কৃতিত্বই ছিল সুভাষ-চন্দ্রের। সুভাষচন্দ্রই করগার্ড প্রতিষ্ঠানকে পূর্ব মহাদেশে ছাড়িয়ে পশ্চিম মহাদেশে পরিচিত করে-ছিলেন। তাঁর সংগঠন-সৌভাগ্যের বাস্তবিক ছিল সত্যই অনস্বীকার্য।

আমাদের সাংবাদিক জীবনে পক্ষপাতবের এক প্রকার তত্ত্ব ছবি দেখেছি, চাক্ষুষ দেখার সৌভাগ্য খুব কমই হয়েছিল। তিনি নির্মলচন্দ্র চন্দ্র। তাকিয়ার ঠৈম নিয়ে আলোবোলায় নল মুখে পুরে ধূমান করছেন তিনি —এ ছবি ছিল জীবনকালের দিনে সকলের পরিচিত।
১) ধূমান করবার তিনি যে রাস্তায় বিলাপ-ভ্রমণে যেতেন সে রাস্তা থেকে কোলাহলমুখর রাস্তা দিয়ে আসতেন

বোধ করি তিনি নীতিত হতেন।
ছিলেন আমাদের কাছে মূলভ।
বলতেন আলোবোলা-রাস্তা।

বাকী চারজনকে দেখবার সৌভাগ্য আমাদের কিছু কিছু হয়েছিল। এঁদের মধ্যে পথে বোল ছিলেন প্রতিভাশালী ব্যারিষ্টার। অতি হৃদয় আইনের মধ্যে হৃদয়তার আইনের তাঁকে আশ্রয় নিয়ে প্রথম বুদ্ধি ও প্রচণ্ড ব্যস্ততার জোরে তিনি প্রতিপক্ষকে ধারাল করে তুলতেন। কিন্তু সাধারণ কথাবাতার তাঁর এত অসাধারণত্ব বরা পড়তো না। বরং মনে করা স্বাভাবিক ছিল যে, লোকটি দাম্পত্য এবং তাঁর ভারী চোখের মধ্যে বুদ্ধিও স্বর্ষ বা ভারী। একটা বিগের আয়-প্রত্যয় হ'লে তার অল্প দেখবার প্রবৃত্তি তাঁর হতো ঐক্য। এক্ষেত্রে থাকে বলে এক বসগা তিনি ছিলেন তাই। খাঁটা বিলাপী ধরনের পোষাকে বিলাপী ঢালে চলনের আড়ালে বলে থাকতো একটি বেশী হন বা ছিল 'বা তবানী'র উপাসক, বা পাক্সা মোটর-বিলাপী ব্যারি-ষ্টারকে টেনে নিয়ে যেতো নেবুতলাবাসী উড়িয়া স্যোতিবীর কাছে ভাষাগণনা।

নামা বি. এন. ডাকের নামে ভাগ্যে পরে বোলকে

বেশিন অবনীলাস, অলঙ্কারে বর্ষা চুড়চের ঘোঁচা ছাড়তে দেখলাম সেদিন গ্রাম্য, অনভ্যস্ত মনে বিশ্বর জেপেছিল। বিলাত-কোরভা সমাজে এই চালেম যে চলন ছিল তা তখন জানতাম না। সেদিন পরং বোলের ছিল দিলপুণ। সেই দিনই তিনি বামনকে দিগেছিলেন 'বি-এন-কি-এস'রূপী অভিনব উপাধিটি। ভারী লোকটিও নাকে নাখে হালকা হ'তে পারতেন।

মনে আছে একবার আমার ছেলের অস্থখ হ'লে ছুটির দরখাস্ত করেছিলেন। ম্যানেজিং ডিরেক্টর পরং বোল সেই দরখাস্তখানি না মঞ্জুর করেছিলেন এই মন্তব্য ক'রে—"Son's illness is not the just cause for which leave should be granted." পোড়া কপাল! তখন কি ভাই জানতাম যে, একমাত্র সহধর্মিণী ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন আত্মীয় থাকতে নেই! এ-হেন সাহেবী বেজাঙ্গের লোকেরও যে ক্ষম ছিল তার বহু প্রমাণ পেয়েছিলাম। বহু ছুঁবে লোকের চুপে তাঁর ক্ষম বিগলিত হ'তে দেখেছি। গোপনে তিনি মানিক সাহায্য করতেন অনেককে।

পরং বোলের মতন এমন তাত্ত্ববৎসল পুত্রই বিরল। অনেক সময় মনে হ'রেছে বেজা না থাকলে সুভাষ বোল বধ্যবধ সুভাষ বোল হতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তারার বহুবিধ আদ্যার ও বেবালপুণী চরিতার্থ করতে পরং বোলকে স্বীকার করতে হয়েছিল অসীম ভ্যাগ। কথানি নাকি ঘুরিয়ে উন্টা করে দেখাও চলতে পারতো কিন্তু উন্টা করে ধরবার প্রকৃতি আমার হয়নি কখনো। বহু বিপ্লবীর বন্ধু ও পোষক ছিলেন পরং বোল সুভাষ বোলেরই বাতিরে।

রাণ-ভারী, গুরু-গভীর লোক বিধান রায়। ঘরে এসে চুকলে মনে হ'তো বেন কড় ব'রে গেলে। অনেক সময় আসতেন নলিনী রক্তনকে সঙ্গে করে।

নলিনীরঞ্জন হরতো সম্প্রদায়কদের ঘরে। বিধান রায়ের ইচ্ছা নীচে একবার চাপাখান্য পরিদর্শন করবেন। সিঁড়ির মুখটার এসে বন্ধ দাম ছাড়লেন—

"নলিনী! নলিনী!" লম্বক-শিশুর মতো নলিনী চমকে উঠলেন।

দীর্ঘাঙ্কিত লোকটির টোটে একটা কার্তিক বহির যেখার চুড়তা ব'রে রাখতো, তা সহজে নমনীয় হ'তে দেখা যেতো না।

বিধান রায়ের মুখে 'আপনি' লগেবন স্তনেন্দি ব'লে মনে পড়ে না। লোকটি বেন অঙ্গোঙ্গেন আদেশ করতে, আদেশ পালন করতে নর।

একই সময়ে পাঁচটি লোকের সঙ্গে পাঁচ বকম প্রসঙ্গ তুলে অসাধারণ লক্ষ্য বক্য করে চলতে দেখেছি বিধান রায়কে! প্রবল প্রতি-শক্তির সঙ্গে বুদ্ধির প্রাণবর্ধ নিলে তাঁকে সহজেই বস্তুর ক'রে ধরতো আর দশ জনের কাছ থেকে। বরেনের তুলনার উত্তম ছাড়িয়ে যেতো অনেক সময়। ১৯২৮ সালের কংগ্রেস অধিবেশনে বঁাধা তাঁকে জেনারেল সেক্রেটারীরাপে দেখেছেন তাঁদের কাছে মনে হ'রেছে বিধান রায় বুদ্ধিবা সাগর সঁাতরে পার হ'তে পারেন।

মুচুতুত, অধ্যবসায়ী, উচ্চাভিলাষী নলিনীরঞ্জন প্রক্কর হ'লেও হয়েছিলেন প্রখ্যাত। অর্থশালী হবার আধুনিক অর্থনীতিতে তিনি পরিপক হয়েছিলেন নিজের জীবনে সক্রিয় অভিজ্ঞতা দ্বারা।

আলাপে, আলোচনার বা সংলাপে তাঁর বুদ্ধির ঔজ্জ্বল্য ধরা পড়তো না তেমন অথচ তিনি যে বুদ্ধিবান তার প্রমাণ দিয়েছেন ভূরি ভূরি।

জীবনের প্রায় সবটাই কাটালেন এই বাথ-কলকাতা শহরে শুধাপি তাঁর আকস্মিক ভাবকে ভ্যাগ করেন নি কোনদিন—লজ্জার খাতিরেও নয়। পূর্বাঞ্চলের কোন যুগ চাকরির উদেহাতি করছিলেন তাঁর সাহায্যে। বধ্যস্থানে বারবার হাটাইটি ক'রে ব্যর্থ হয়ে যুবকটি আবার ধরলেন নলিনীরঞ্জনকে—"আপনি যদি একটা ভালো কইরা কইরা ডান্ ত্যার জাব্—" (অর্থাৎ আপনি যদি একটু ভালো করে বলে দেন তবে না।)

নলিনীরঞ্জনের জবাব হলো—"হঃ! জামনে একটা

কড়া কইয়া টেলিকোমোৎ—(অর্থাৎ আচ্ছা টেলিফোনে একটু জোর ক'রে বলে দেবো'ধন।)

পশ্চিমবঙ্গের কোন বুৎকের কোনল ভাষার অল্পবোধেও তিনি অল্পতপ ভাষাই ব্যবহার করতেন, এটা নিঃসন্দেহ। ভাষার লালিত্যের প্রতি বোধবশতঃ স্বর্ধ ভ্যাগ করতে তিনি নাহাজ।

বুটিলের আনলে কংগ্রেসের একজন বড় সেবক হ'য়েও সরকারী কতৃপক্ষে তিনি ঘুরে ঠেলে ঘেঁষনি কখনো। শত্রু-বিরোধে যথোপায় ছিল সম্ভাব্য অর্থাৎ তাঁকে ভ্যাগ করতে পারতো না কেউ। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয় ব'লে লর্ড উইলিংডন তাঁকে কোলেতে পারতেন না। এই যে শত্রু-বিরোধে কাজে সমান প্রিয় হওয়া তার করমূল্য ছিল তাঁর নিজস্ব।

কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত হ'য়েও সেই কংগ্রেসের ক্রোড়ে আশ্রয় পেয়েছিলেন আবার সুকৌশলে।

স্বাধীনতাি ক্ষেত্রে এ্যাচা ও লাভাত্য বীতির বখায়ণ প্রয়োগ তিনি করতেও জানতেন।

যেমন—দেশবন্ধুর আনলে স্বরাষ্ট্রা মলের প্রথম নির্বাচন প্রতিযোগিতার কথা ধরা থাক। বাংলার ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচন সেবার। দেশবন্ধুর এক প্রিয় লাগুব ঠাঙালেন এল, আর, বাসের প্রতিদ্বন্দী হ'য়ে তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র থেকে। সত্য-সমিতি ক'রে বড় বড় বক্তৃতা দিয়ে ভোট আহরণের ব্যবস্থা তিনি করেন নি।

ভটি করেও ষাটী তিনি বেছে নিয়ে ষাটী ঠাঙরাই প্রচেষ্টা করে চমৎকার ফল পেয়েছিলেন। গেলেন এক প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ বোম্বারের বাড়ীতে, এইখানে ছিল তাঁর আশ্রয়। কারণ, অনেকগুলি ভোট ছিল এই ব্যক্তির হাতে। কলকাতা থেকে এক দেশবাস্ত্র ব্যক্তি গেছেন বকংবলে। এসব ক্ষেত্রে যেমন হয়—বাড়ীর

৫. ভিতর প'ড়ে গেলো-লাড়। ছোট ছোট ছেলে-মেয়ের দল ছুটে বাইরে বেরিয়ে এলো। এমন কি বাড়ীর মেয়েরাও বেথলে লাগলেন ধুলুধুলি দিয়ে এই বনী নবগতকে। সকলেই ঐৎজুক সমান।

বৈঠকগনার আগন্তুকে অভ্যর্থনার ভজ্ঞে বাড়ীর মালিক উপস্থিত ছিলেন। আগন্তুক নরপদে ঘুরে প্রবেশ ক'রে একটু হুঁল টেনে নিয়ে ব'লে পড়লেন ভারই উপর।

আগন্তুকের কাণ্ড বেধে বাড়ীর কর্তা লক্ষিত ও সতুচিত হ'য়ে গেলেন। তিনি বায়বার আগন্তুকে চেয়ারে আসন গ্রহণ করতে অতুরোধ করলেন।

বাড়ীর কর্তার লাম্বে তিনি বসবেন চেয়ারে? আগন্তুক একথা ভাবতেও পারেন না—এমনি নিম্মর প্রকাশ করলেন।

“হ্যাঁ কি কর্তা, আপনি ব্রাহ্মণ, বর্ণভেদ; আমি তো আপনার চরণের ধূলা; আপনি পাকতে—”আগন্তুক কর্তার চরণের ধূলি আগেই নিয়ে প্রথমে ঘিষায়ে ও পরে শিরোপরি গ্রহণ করেছিলেন। কর্তা থাকতে তিনি বসবেন চেয়ারে, একি হয়?

শিক্ষিতা বারা আগন্তুকের দিকে উৎসুক নরেন চেয়ে-ছিল তাদের পরিচয় নিয়ে আগন্তুক জানতে পারলেন কেউ বা কর্তার নাতি, কেউ বা কর্তার ভাইপো আর কেউ বা কর্তার আর কেউ। আগন্তুক এক এক জনের পরিচয় জেনে অমনি তাঁর পায়ে ধূলো নিয়ে মাগার বিলেপন করেন।

কর্তা হ্যাঁ হ্যাঁ ক'রে চীৎকার করে ওঠেন। ঐ পোলাপানদের পায়ের ধূলো! আগন্তুকের কি মাথা খারাপ হ'য়েছে নাকি? না তাঁর মাথা খারাপ আলো হয়নি। তিনি পরিচয় মাগাই এই সব অভিনয় ক'রে বাচ্ছিলেন।

কর্তার বুকের দিকে চেয়ে বসলেন—“হেইভা কি ক'ন কর্তা! ছুটো হাঙ্গ ও হাঙ্গ!”—(অর্থাৎ লাগের বাচ্চা লাগই) আগন্তুক যা বললেন তার চূড়ান্ত অর্থ হলো এই যে, বর্ণভেদ ব্রাহ্মণের সমান ব্রাহ্মণই হুতরাং বস্ত ক্ষুদ্রই হোক সে নম্র।

তৃপাদনি স্মনীচেন এ-হেন ব্যক্তির সেবার যে নির্বাচনে অরলাভ হ'য়েছিল একথা বলাই বাহ্যিক।

নিবাসনের এ কাহিনী শুনে বাঁরা নলিনীরঞ্জনকে
কাছে বিষয় প্রকাশ করিতে গিয়েছিলেন তাঁরা
নলিনীরঞ্জনকে বুঝে পরম পরিতোষের হাসি দেখে
এদেছিলেন।

স্বাভাৱ দলের চীক হুইপ নলিনীরঞ্জন কেত্র বিশেষে
ডোট যথেষ্ট উপায়ে হুইপ করে নিয়ে বেতেন তাঁও
অনেক সময় কানে আগতো। ষাঁটি পান্ড্যাত) রীতির
নমুনা মিলতো। এখানে। তিনি ক্রন্দামানী ছিলেন,
এইটাই বগেট; এতেই অনেকের চিত্তে ভাগতো পুলক।
কানাকড়িরও বায়ের হয়তো প্রয়োজন হতো না অনেক
সময়।

লক্ষ্য, শিক্ষা, ভয়, নলিনী বাবু কোন দিন গারে
নাখেন নি। উত্তম ব্যাখ্যে কৃত্তক'র'ে তিনি ঈড়াত্তে
জানতেন জন-সাদারদের কাছে অকুতোভয়ে।

আর একটি গুণ দেখেছি নলিনী সরকারের। বহু
জন ব্যক্তিকে তিনি পোষণ করতেন নিজের প্রয়োজনে।
জনী ব্যক্তি লক্ষ হ'লে তাঁকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা
হ'তো তাঁর প্রবল।

নলিনী সরকারের মূল্যবান বস্তু ব'লে ব্যাভারে বা
প্রচলিত হতো। তাঁর বাহুরঙ্গ অঙ্গেরব হাতে হুটলেও
তাঁর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা যে তাঁরই ব্যাৱ হ'তো এটা
নিঃসন্দেহ।

তুলসী গোসাঁইয়ের আগম-নিগম হতো নিঃশব্দে
আর বোধ হয় খুবই বিরল। যুদ্ধ মিষ্টভাবী হলেও তিনি
ছিলেন স্বল্পভাবী। তখনকার দিনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা
পরিবহে স্বভাৱ দলের সভ্যরূপে পণ্ডিত রত্নলাল ও
তিনি যে বিতর্কের উত্তরে তুলুল আলোড়ন সৃষ্টি করতেন
তা হ'তো পরম উপভোগ্য। একান্ত সারিধো এই নিরীহ
ব্যক্তিটির যে রূপ দেখেছি তাতে তাঁর বোদ্ধরূপ কল্পনা
করতে পারিনি।

আমাদের টেবিল উটে বাবার আগে বিলাতে
বাতবায় তিনবার গোল টেবিলের বৈঠক ব'সেছিল।
গাঙ্গীজী গেলেন যোবার সেবার সারা ছুনিয়ার সাত

পড়েছে। কত বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন হিপোটায়ে তাঁর
সহযাত্রী হলো জাহাজে তাঁর নিত্যকর্ম-পদ্ধতির স্বাধাধ
বিবরণ দিতে। বিরল-পরিচ্ছদ, জুইন-নীতল দেশের
এই ব্যক্তির ক্রিয়া-কলাপ আনবার কৌতুহল কার না
হয়? বেশী-বিবেচনী, ধনী-বহিষ্ট, ছোট-বড়, সবাই
কৌতুহল ছিল সমান ছুনিবার। তুলসী গোসাঁইকে এই
সময় আসতে দেখেছি প্রায় নিত্য।

সেদিন ছিল রবিবার। আমাদের ইংরাজী
দৈনিকের সহকারীকে ছুটি সেদিন। আমাদের বাংলা
বিতরণে সেদিন বিলাতী রয়টারের ভারভালি ছিল আমায়
হাতে। গভীর মনোযোগের সঙ্গে সেগুলির সন্ধ্যাব্যবহার
করছিলাম। ইতিমধ্যে প্রধান স্বামী ব্যাকডোনাষ্ট
সাহেবের বিপক দলের সভা মিঃ চাটিল গাঙ্গীজীকে নব
বিশেষণে বিশেষিত করেছিলেন—"Half naked sedi-
tious Fakir"—(অর্ধনগ্ন রক্তপ্রোহী ককির) এবং
গোষণ করি এই মেটা ককিরের লগুনে অন্ততগমনের
পূর্বেই তিনি লগুনে চেড়ে পালিয়েছিলেন অস্ত্রত। অন্যট
বেশ জবে উঠেছিল, তাহেই ঘটনার পারস্পর্শের বিবেক
উৎস্রব্য হওয়া স্বাভাবিক। তুলসী গোসাঁই তখন এসে
ম্যানেজিং ডিরেক্টরের ঘরে বসেছিলেন তা লক্ষ্য করিনি।
তিনি লক্ষ্য নরনে আমায় হাতে টেলিগ্রামের বিবেক
চেষ্টেছিলেন। এক গোছা পেঘ হ'তেই সেগুলি
টেবিলের উপর রেখে আমি অপর গোছার হাত দিয়েছি
এমন সময় তিনি গুঘর থেকে উঠে এসে আমায় কাছে
গাড়িয়ে অতি বিনীত ভাবে বললেন—"আমি এগুলি
দেখতে পারি কি? আপনায় হ'লে আমি বাকীগুলো
নির্থে বাবো, কেমন?"

আমিও বিনীত ভাবে লক্ষ্য আনলাম। আমা-
দেরই একজন ককির এই স্বকর্ম নমনীয় ভাবে দেখে
সম্মতি হ'লেও খুশী হয়েছিল। অন্যর দুলাল বিলাতী
বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সর্বোচ্চ ডিগ্রীধারী' এইরূপ বিনয়
অন্ততঃ আমায় কাছে তখন অসাধারণ বলে বোধ
হয়েছিল।

ইংরাজী প্রবন্ধে তাঁর চিত্তাশীল মনের স্বল্প ভাব-
লক্ষণের পরিচয় মিলতো। যাকে যাকে তিনি জানা-
দের ইংরাজী দৈনিক বনামে প্রবন্ধ লিখতেন। এ-হেন
বিনয়ী, শিক্ষিত, চিত্তাশীল ব্যক্তির “বোলসুইস্” কেন
যে দোষ। লব্ধ হেতে উদ্যম গতিতে বিলম্বগামী হ’য়ে
যেতো তা বৃষ্ণতে পারতাম না।

আবার ভেসে চলেছি। কোথাও কুল-কিনারা
নেই। বৌবনের আশ্রয় বস্তুভায় একটি কুল আশ্রয় করে-
ছিলাম পরম নিশ্চিত মনে। পিছুনে সাতাবার অবসর
ছিল না; লাবনে গ্রহর এসারী সন্তানবীর বিভিন্ন ছবির
বসন্তার বিভোর হ’য়ে ছিলাম। একটা প্রচণ্ড কড়
ক্রমে কুলে আঘাত করে তাসিয়ে নিরে গেলাম লব
কলে!

এই বিশবয়ের তাত্ত্বিক অকুলে পড়েও ভেবেছি
অতীত দিনের কথা। চিত্তাচিরের ছবির স্মৃতিসংকে
এসেছে আমারও মনের পর্দার কত ছবি। কেন এমন
হলো? স্মৃতি-স্বপ্নের কার্য-কারণ সম্পর্কের কথা চিন্তা
করেছি। কিন্তু আলোড়িত মনের শক্তি ছিল না সে
সম্পর্ক-তত্ত্ব আবিষ্কার করা।

তারপর শান্ত, নিশ্চল বৃষ্ণতে একদিন পেয়েছি এই
বিশবয়ের হেতু। হঠাৎ এইটাই একমাত্র হেতু নয়
তবু এটা যে প্রধান সে বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

হেতুটির সূত্র ব’য়ে পেয়েছিলাম একখানি বুলাবান
চিত্রিতে যা তখনকার দিনে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতার
রাজনৈতিক মত স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে বহরেছে।
চিত্রিখানি লিখেছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন তাঁর মেহতাজেন
বাংলার পঞ্চাশতাবের এক শাস্ত্রের কাছে তাঁর বৃত্তার
টিক পাঁচ দিন আগে। চিত্রিখানি এই—

Step Aside Darjeeling 11. 6. 25.

Dear—

I was thinking of sending for you for giving
you some suggestions about our work—you
have probably heard from Protap. But you
need not come here just now as I see from the

papers that Satkari has called a meeting of
B. P. C. C. to consider the Faridpur resolu-
tion. This is most important and you must
strain every nerve to have the Faridpur resolu-
tion passed in the B. P. C. C. I want you
Satkari, Kiron and everybody to see that we
get an overwhelming majority. This you
can easily do if you work from beforehand.
Necessary expenses must be met. I offer the
following suggestions:—

(1) Send for Satish Chakravorty from
Mymensingh or wherever he may be and work
thru Mymensingh group through him. He is
a clever man and probably he will succeed in
influencing the others.

(2) Work Sarat Chatterjee of Howrah
through Nirmal and you will most probably get
the Howrah members to side with us.

(3) If necessary, work through Mono-
ranjan of Dacca and you will get Mohini and
others of Dacca. Kiron can manage this if
he exerts himself. The rest of the Dacca
members Srish may influence. If you try
you can get Srish to do this.

(4) Find out some way of getting Dinaj-
pur and Rajshahi—my idea is they are against
us. But if steps are taken at once you may
succeed.

Show this letter to Satkari, Kiron and
Protap and no one else. You must sit toge-
ther and manage the whole thing.

Possibly you don't realise the importance
of this but trust to me. Every attempt should

be made to keep Gandhi with us—any breach between Mahatma and ourselves will be fatal to the programme of both parties.

I have read the article in the London times on my Faridpur speech. The short summary which was published in Indian News papers was misleading. I take the Times article to be very helpful. My reading of the whole situation is :—

(1) They are willing to let off the political prisoners,

(2) They cannot afford to say that they will alter the Act before 1929, but they are willing to extend the reforms by exercising the powers without the Act. If we know how to play our cards well we can get practically provincial autonomy without altering the Act.

(3) Reading will send for some of us in England and if my workable plan can be carried out some of us may be sent for to discuss the whole situation in England.

(4) If the above course is not adopted they will order a dissolution of the legislative bodies and if some of this country back up the Swaraj Party and if the result is favourable to us then the above course will be adopted.

The situation is big with fate. Our position is that we have said our last word. The onus is on the Government now.

I will offer no further statement or explanation, you people should watch the press and

only correct misstatements if serious.

Our defeat in the B. P. C. C. will ruin the whole thing.

I expect money to-morrow as you say in your wire. That will do, I hope you are keeping all right. With love to you.

Yours affly,

C. R. Das.

পাক্ষিকী নীতি ছিল বিদেশী শাসকদের সঙ্গে সর্বতোভাবে অসহযোগ করা। এই অসহযোগ আন্দোলন বহর তিনেক বহর দেবার পর জন-সাধারণের মনে এখন এসেছে নৈরাশ্র সেই সময় বেশবদ্ধ পণ্ডিত মতিলালের লহরিতার অসহযোগের আন্দোলন এক বৈচিত্র্য—তাদের আশা ছিল তাদের অসহযোগ পন্থার শোকে মনে আবার কিংবা আসবে উদ্ভাটন। ব্যবস্থাপক সভার চুকে ব্যবস্থাপনার ক্রমাগত বাধা দেওয়াই হ'লো তাদের নীতি। এখন নিমন্ত্রণ বাড়তে চুকে নিমন্ত্রণ পত্ত করা। এই নীতির ফলে আমাদের শাসকবর্গ খুবই বিরক্ত হলেন বটে কিন্তু তাদের লক্ষ্যে কিছুটা আঁকড় হলো না। পণ্ডিতদের সঙ্গে দুইশকে দাবিরে রাখা অনন্তব নয় তবু দুইশকের তরফ থেকে যদি নিরন্তর জালাতন সঙ্কল্পে হর তবের সেটা আদৌ অসম্ভব নয়। আমাদের শাসকবর্গের মনে প্ররামা দলের নবনীতির ফলে এখন বিরক্তির তাব চূড়ান্ত তাবে প্রকাশ পেয়েছে সেই সময় বেশবদ্ধ সেই বনোজাধিক অসহযোগ গ্রহণ করতে চেষ্টাছিলেন। ফরিদপুর প্রাথমিক সশেলনের সভাপতি রূপে তিনি যে অভিভাবধা দিলেন তাতে তাঁর চিন্তার গতি কোন্ দিকে তা পষ্ট বুঝা গেলো। ইংরেজ ভাষ্যে তবু মত প্রকাশ না, কাজেই নবনীতির তাব প্রকাশে যদি প্রজন্মের করণার উত্তর করা যায় মত কি ? বলা বাহুল্য এটা সংগ্রামশীল মনের পরিচয় নয়, সংগ্রাম-রীতি মনের প্রতিপক্ষের কাছে দাক্ষিণ্য লাভের আশুলতা—পূর্বস্তন সভাচ্যে নীতিরই নামান্তর।

দেশবন্ধু ইংরেজের কাছে কী আশা করেন এবং তার ক্ষেত্রে তাঁর দলের প্রত্যাশিত কী স্বরূপের হওয়া স্বরূপের সে বিষয়েও তাঁর মনে নির্দেশ চিহ্নিত্বানিতে প্রকাশ পেয়েছে।

সুভাষচন্দ্র এই সময় বর্ষা মূল্যে বন্দীশালায় আবদ্ধ। তিনি যদি এদেশে পাঙ্কতেন আর দেশবন্ধুও পরলোক না যেতেন তবে গুরু-শিষ্যের মধ্যে এক আশোভন কলহ যে বাংলা দেশের আবহাওয়া কলুষিত করে তুলতো সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। সুভাষ রাষ্ট্রনীতিতে দেশবন্ধুকে গুরু বলে নেন নিলেও গুরু বিরাগিতা করতে বিধা বোধ করতেন না, তাঁর এ মনোভাব-পূর্ব্বাচ্ছেই প্রকাশ পেয়েছিল কোন কোন ক্ষেত্রে। ইংরেজের সঙ্গে আপো-
ষের বিরোধী ছিলেন তিনি গোড়া থেকেই এবং এই মনোভাবের দরুণই তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন সুভাষের দলের প্রতি। রাজনীতি ক্ষেত্রে সুভাষের অনমনীয় মনোভাবই দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সেনগুপ্ত-সুভাষ কলহে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং তারই ফলে বাংলা দেশ কতদূর নীচে নেমেছিল তার আমরা দেখেছি।

এ চিহ্নিত্বানি থেকে এটাও বুঝা যায় যে লক্ষ-পাণ্ডবদের মধ্যে কারো কারো প্রতি দেশবন্ধুর ছিল

অগাধ বিশ্বাস ও অপার রেক। গুরু মৃত্যুর পর তাঁরই যে গুরুর আদর্শকে অনুসরণ করবার ক্ষেত্রে আশ্রয় চেষ্টা করতেন, সেটা ঘরে নেওয়া যায় অনায়াসে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংবাদ পত্রের প্রধান কর্ণধার ছিলেন শব্দ বোসই সুভাষের মতবাদের প্রাধিকৃত্য তাতে হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সুভাষ মৃত্যু হলে আপোষ-নিষ্পত্তির মনোবৃত্তিকে হিঁদেন দূরে ঠেলে কাজেই দেখা গেল এক কালে যাঁরা ছিলেন তাঁর মনীয় সহযোগী তাঁরা যোগদানে তাঁর সঙ্গে অধিক থাকলেও প্রাণ ঢেলে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করতে পারেন নি। মতান্তর ক্রমে মনান্তরে পরিণত হলে এক বড় একটি প্রতিষ্ঠানের প্রাণাত্য ঘটিয়েছে তাই অকালে।

প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক বাহুতঃ যাঁরাই থাকুন-
কেন, মূলতঃ এটি ছিল শব্দ-সুভাষের আশ্রয়ে, আর সুভাষেরই নলীর যোগে এটিকে করে তুলেছিল তাঁর চাইর আদর্শের বাহন। আদর্শের প্রতি অত্যধিক নিষ্ঠাই এর অর্থকরী দিকটার প্রতি উত্তর দ্রষ্টব্য করেছিল উদাসীন। কাজেই এই শোচনীয় অনর্থ ঘটে গেলো একদিন।



আব্রাহাম

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

[পূর্বস্বরূপি]

লুন পে বেড়ুনে ভিরে বিনকড়ক আর নিঃশ্বাস
কেলাও গুবর পেলাও না। হোটেল ততি ছেলের দল।
চৈ চৈ চৈ কানে কান পাভার উপার নেই।

আরো আশ্চর্যের ব্যাপার। উটান চিনের এত
চিনের মধ্যে একটা চিঠিও আসে নি। এমন তো হবার
কথানয়। লুন পে সত্যিই চিত্তিত হ'য়ে পড়লো।
সত্তাহে একখানা ক'রে চিঠি দেন বিনি, এতদিন ধরে
তিনি একবারে চূপচাপ। হোটেল শৌছেই লুন পে
একখানা চিঠি লিখে ফেললো। নিজের হাতে চিঠিটা
পোষ্ট ক'রে এসে তবে বেন কতকটা নিশ্বাস হ'লো।
পড়ার বইগুলো ধুলা বেড়ে টেবিলের ওপর সাজালো।
পুস্তানো নোটের গোষ্ঠা গুঁটালো ব'লে ব'লে। পড়ার
বইয়ের সংগে অনেকখানি হুহু গড়ে উঠেছে। মন
টিক করে বসতে অনেকখানি সময় নেবে।

মা শিনের কোন চিঠি নেই। বা শিনকে চিঠি
লেখার কথা একবার লুন পের মনে হ'য়েছিলো কিন্তু
তাব পড়েই সে বুজেছিলো নিজেকে, না শিন ছরত নেই
সোহেবিন পায়ে। নদীর ওপারে মাসীর বাড়ীই চলে
গিয়েছে। বা টিনের জাগরা বাড়ীতে মা শিন বাত
কাটায়ে একবাটা আকতের লুন পের কই হ'লো। কিন্তু
নদীর ওপর থেকেও হু এক ছড়িত তো বা শিন লিখতে
পারতো। শুধু লুন পে চণে আসার পরে ওর ভালো
লাগছে না এ স্বরূপী।

কলেজ খোলায় বিন সকালে লুন পে উটান চিনের
চিঠি পেলো। পোটা গোটা অক্ষরে, আঁকা বাঁকা
লাইনে ছুঁল হাতের জার্প। সেই ক্লিষ্ট তেজার পর
থেকে সদি জরে তিনি বিচানা নিয়েছিলেন। বাড়ীর
সবাই হুঁকৈছিলো লুন পেকে চিঠি লিখে সোহেবিন
পাশে নিজে বাওরার ওজ, কিন্তু লুন পের পড়ার কতি

হবে ব'লে তিনি সকলকে বাহন ক'রে নিয়েছিলেন।
ওর অসুখের খবরও লুন পেকে দেওয়া হয় নি। কিন্তু
লুন পের ওরকম থেকেও তো একটা চিঠি যাওয়া উচিত
ছিলো। উটান চিন অভিযোগ করেছেন। লুন পে
এমনিই কি ব্যস্ত যে এক লাইন চিঠি লেখারও সময়
পায় না?

চিঠিটা খামের মধ্যে মুড়ে রেখে লুন পে চূপ ক'রে
কিছুক্ষণ ব'লে রইলো। আরো কিছুদিন থাকলেই
হ'তো সোহেবিন পায়ে। উপযুক্ত ছেলে, বাপের প্রতি
একটা কতবাও কি নেই? অসুখ বিষয়েও যদি বুক
দিয়ে না পড়বে তো কিসের সন্ধান? বিকেলে কলেজ
থেকে ফিরে এসে উটান চিনকে একটা ভালো ক'রে
চিঠি লিখতে হবে। সত্যি মিথ্যার বশানো কৈফিয়ৎ
একটা খাড়া করতে হবে।

প্রথম বিন থেকেই রীতিমত ক্রাস শুরু হ'য়ে গেলো।
একটানা দৌড়, বাইসরিক পরীক্ষা শেষ না হওয়া পর্যন্ত
বাক ফেলবার সময় নেই।

উজিনের সময় কখন কবে ছেলেদের তীড় মেখে
লুন পে ঊঁকি দিয়ে দেখলো—ভারিত্ব ধরনের দ্বী ছেলে
ব্যাগাজিন বিলি করছে। একজন ব'লে লিট মিলিয়ে
লাল পেন্সিলের দাগ মিছে। তীড় ঠেলে লুন পে
এগিয়ে গেলো। ক্রাসের ওকটি পরিচিত ছেলের হাত
থেকে ব্যাগাজিনটা টেনে নিয়ে থেকে বসে পড়ে পাতা
ওলটতে লাগলো।

প্রথমে দ্বীপজ তরপর একখানা একখানা ক'রে
পাতা উল্টে দেখলো। কিন্তু কই ওর প্রবন্ধটা কোথাও
তো জাপা হয় নি। তেজিগ নবর পাতার ধরগোল
প্যাটার্নের ছেলেটির স্রেবের কবিতাটা রয়েছে, কিন্তু ওর
প্রবন্ধ কোথাও নেই। তর ওর করে বুঁজে লুন পে

হেলেনীর হাতে ম্যাগাজিনটা ফেরৎ দিয়ে দিলো। ম্যাগাজিন নেবার সমস্ত উৎসাহ উবে গেলো। মনকে বোকাগেলো, হরত এর পরের ব্যাংক প্রকাশিত হ'বে, কিন্তু ভীষণ ভো অনেক দেরী।

ইংরাজী ক্লাসে কমল বোস খবরটা দিলো। পুন পের দিকে ঝুঁকে পড়ে বললো, 'কি বললে?'

'কে?'

'কেন? ক্যামেরা সাহেব?'

পুন পের মুখ চোখের চেহারা দেখেই কমল বোস বুঝতে পারলো যে ব্যাপারের আগাগোড়া কিছুই খোঁজে নি।

'আপনি কি খ্রিস্টিয়ানের সঙ্গে দেখা করেন নি?'

'না, দেখা করার কথা ছিলো নাকি?'

'হ্যাঁ, নোটিশ বোর্ডে তো টাঙিয়ে দেওয়া হ'য়েছে।

খ্রিস্টিয়ান আপনার সঙ্গে আজকের মধ্যে বিশেষ অন্তরী একটা কাজে দেখা করতে চান।'

'তাই নাকি? আমি সকাল থেকে নোটিশ বোর্ডের ঘায়েও বাই নি। কিন্তু কেন দেখা করতে চান খসু তো?'

কমল বোস তুচ্ছ হুঁটো ঝুঁকে চিন্তা করার ভান করলো, তারপর বললো, 'স্টিক বলতে পারছি না। পড়ানোর ব্যাপারেও হ'তে পারে। হরত পরীক্ষা সামনে, উপবেশ দেবার চেষ্টা করবেন।'

'তাই কি? পুন পে অফিসের হাসি হাসলো।

'তা হ'লে আপনারাই বা বাব বাবেন কেন? তা ছাড়া, কার্ট ইয়ারের পরীক্ষার আর বেকালি ভালো করার কি প্রর থাকতে পারে। আমার মনে হয়, ব্যাপারটা হরত অন্ত লক্ষ্য নয়।

কমল বোসের মুখ চোখের ভাব বেখেও মনে হ'লো, নিছক পরীক্ষার ব্যাপারে যে পুন পেকে ডেকেছে, এটা গুরুত্ব মনের কথা নয়।

পুন পে কিন্তু 'কিস' বললো, 'আমার মনে হয়, বোধ হয় মৌলবিনের ব্যাপারটা কেউ গুরুত্ব কানে ভুলে থাকবে।'

কমল বোসের ধারণাও তাই। কিন্তু তবু সে লক্ষ্যই প্রকাশ করলো, 'কিন্তু ওখানকার গবর কে ডেকে বলবে? আর বলবার মতন কিই বা গবর আছে?'

পুন পে হেসে কপালের কত চিহ্নটা দেখালো, 'এই তো এক নব্বরের সাক্ষী।'

ক্লাসের পরেই পুন পে আর কমল বোস নোটিশ বোর্ডের সামনে এসে দাঁড়ালো। একেবারে অপারেশন বোর্ডে নোটিশ টাঙানো। কার্ট ইয়ারের রোল নম্বর সাত্যাপ কো পুন পে অবিলম্বে যেন ইউনিভার্সিটি কলেজের খ্রিস্টিয়ান অ্যালান ক্যামেরার নংয়ে দেখা করেন।

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পুন পে বললো, 'তা হ'লে, বাই একবার দেখা করে আসি।'

কমল বোস এগিয়ে এসে পুন পের একটা হাত চেপে ধরলো, 'একটা কথা। বাই কিছু বলুক, আপনি চুপচাপ শুনে বাবেন তবু। গরম হ'বে, বা রেগে উঠে কোন প্রত্যুত্তর দেবেন না। আমের তো, আমাদের কাজ ঠেই চেষ্টার কাজ নয়। অনেক বাবা আসবে এ পথে, অনেক আঘাত আসবে, সব চুপ ক'রে লক্ষ্য করতে হবে। নরত যোগদান করলে ওদের উদ্দেশ্যই লাভিত হবে, বুঝলেন?'

কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে পুন পে কি ভাবলো তারপর বললো 'বেশ, তাই হবে।'

রাত্তার পাশে প্রথম ঘরটাই ক্যামেরা সাহেবের। যেহেতু রাত্তার মিল দিয়ে পুন পে অপেক্ষা করতে লাগলো। যেহেতু পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলো, গুকে ডাকলো না। একটু পরে ঘোটাঘোটা। একটি হেলেন ভিতরে ঢুকলো। হেলেনটিকে এর আগে পুন পে কলেজের অনেকবার দেখেছে। যোগ হয়, এম-এ কিংবা বি-এ অনার্স ক্লাসের ছাত্র। একটু ভারি বয়সের। মাঝে মাঝে লাইব্রেরীতে ব'লে চুপচাপ বসে গল্পের ভাবে ঘোটা ঘোটা বইয়ের পাতা উন্টায়। হরত ভালো ছাত্র

কিংবা সলোমন সাহেবের টাইপ।

মিনিট পাঁচ ছয়। তার পরেই বেথারা এসে সেলাম দিলো। লুন পে পাগোবে জুতো মুছে ভিতরে গিয়ে ঢুকলো।

গরাকাত কাঁচ ঢাকা টেবিল। অনেকগুলো চেয়ার সাজানো। পিছনের দেওয়ালে ইউনিভার্সিটি কলেজের বিরাট সাইন্সের একটি ফটো। মাথার ওপরে চলমান পাখার এনামেলের ব্রেডভালো চক চক করছে। টেবিলের ওপরে জুপাকার কাঁইলে ক্যামেরা সাহেব ব'লে ব'লে কি লিখছিলেন, লুন পে ঘরে ঢুকতেই মুখ তুলে চাইলেন। মোটা মস্তন ছেলেটি ক্যামেরা সাহেবের বা দিকে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে ছিলো।

ক্যামেরা সাহেবের চোখে পুরু কাঁচের চশমা। অল্প সময় তিনি চশমা ব্যবহার করেন না, কেবল লেখাপড়া করবার সময় লসকার হয়। বয়সের চশমা।

'কে লুন পে?' ক্যামেরা সাহেবের গলায় আন্তরিক পাথার লম্বকে ছাড়িয়ে উঠলো।

লুন পে ঘাড় নাড়লো।

ক্যামেরা সাহেব পাশে বসা ছেলেটির দিকে হাত বাড়িয়েই ভেঙেটা কতকগুলো কাগজ এগিয়ে দিলো। আড়চোখে চেয়েই লুন পে বুঝতে পারলো, ওর অনেক কষ্টের লেখা গ্রন্থটি। ব্যাগাজিনে প্রকাশ করার জন্য সেটা পাক্ষিরছিলো।

'এটা তোমার লেখা?'

ক্যামেরা সাহেবের প্রসারিত হাত থেকে রচনা নিয়ে লুন পে একবার চোখ বুজিয়ে নিলো স্তারপত্র বললো 'আজ্ঞে হ্যাঁ, এটা আমার লেখা।'

লুন পের কথা শেব হবার সংগে সংগে ক্যামেরা সাহেব ফেটে পড়লেন, 'এটা শিক্ষারতন—রাজনৈতিক বক্তৃতা দেবার প্ল্যাটফর্ম এটা নয়। আমাদের ব্যাখ্যাধিনে সংস্কৃতিবুদ্ধ, সনজাবুদ্ধ লেখাই আমরা চাই, রাজনীতির কচকচানি চাই না। কোথা থেকে জোগাড় করলে রাজাবুদ্বী সব গল্প? বর্ষা বিজয়ের অব্যক্ত

কাঁছিনী?—ইতিহাস ক্লাসে একেবারেই বক্তৃতা কি কোনদিনই শোনোনি। 'দ্বিষ্ট অক বর্ষা' মলাটটাও গুলে দেখোনি একদিনের জন্য?'

লুন পে মাথা তুললো। সোজা চাইলো ক্যামেরা সাহেবের দিকে। সাহেবের কল্প স্মৃতি আর রক্তচক্ষু উপেক্ষা করার বীজান্ত তার জানা আছে। চেয়ারের হাতল ধরে স্পষ্ট গলায় বললো, 'মাগ করবেন। নিজের বাড়ীর ঘটনাগুলো সব মিথ্যে আর পরের তৈরী ইতিহাসের কথাগুলোই সব প্রব সত্যি, এই কি আপনি বোঝাতে চান। আমার প্রবন্ধের একটি কথাও মিথ্যে নয়। আপনাদের চাপুনীতে ছাঁকলে হয়ত এতে একটি সত্যের দানাত বের হবে না, কিন্তু আমি প্রমাণ ক'রে দিতে পারি যে, যে ইতিহাস আমাদের পড়ানো হয়েছে, তাতে সাজানো কথাই বেশী, যেটুকু সত্য আছে, তা খুঁজে বের করাই মুখিল।'

কথাসমূহে একটানা বলে লুন পে হাঁপাতে লাগলো। ক্যামেরা সাহেব চশমাটা আঁচড়ে টেবিলের ওপর ফেলে বস্ত্রগতীর গলায় বললেন, 'তুমি ভালো ছাত্র। তোমার কাছে আমরা অনেক আশা করি। কিন্তু বুঝতে পেরেছি তুমি বাজে দলের পাল্লায় পড়েছো। এই সব দলের উদ্দেশ্যই হচ্ছে তোমার মস্তন কাঁচা ছেলের মাথা বিগড়ে দেওয়া। এখনও তুমি সময়ে চলার চেষ্টা করো। নরত এমন টেন স্ আমি নিজে ব্যাধ হবে। বাস্তব সারা জীবন তোমার আফগোব করে বেড়াতে হবে। ছেলে বাস্তবনও, আশা করি নিজের আশের তুমি এমনভাবেই নষ্ট করবে না।' কথা শেষ করার সংগে সংগেই ক্যামেরা সাহেব হাতের গ্রন্থটি ভাঁজে কুচি কুচি ক'রে পেপার বাথটে ফেলে দিলেন।

অপমানে আর লজ্জায় লুন পের সমস্ত শরীর জ্বালা করে উঠলো। ওর মনে হ'লো, ক্যামেরা সাহেব ভর গ্রন্থটি নিয়ে, ওর সম্মান, আভিভা, মাথা তুলে পাড়ানোর ভঙ্গী সব কিছু খণ্ড বিখণ্ড ক'রে ফেললেন।

‘আর কিছু বলবেন?’ লুন পে কথাতুল্যে অনেক কঠোর উচ্চারণে কহলো।

‘না, আর কিছু বলবার নেই। কিন্তু আমি খুবই আশা রাখি, এমন হুজুং ভূমি কাটিয়ে উঠতে পারবে। তাগো ক’রে পাশ ক’রে বেগোতে পারলে, উচ্চল ভবিষ্যৎ ভোনার’ সামনে রয়েছে। যেন হেবো!’ ক্যামেরন সারের চশমাটা কুড়িয়ে নিজে নাকের ওপর লাগালেন তারপর লুন পের আপাদমস্তক একবার নিরীক্ষণ ক’রে বললেন, ‘আচ্ছা, যেতে পার।’

লুন পে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। করিডর বিস্তৃত থাকে তেই কমল বোসের সংগে দেখা হয়ে গেলো।

‘কি ব্যাপার? এককণ হ’রে কি কথা হচ্ছিলো? আমি পায়চারি ক’রে ক’রে প্রায় হারিয়ে গিয়েছি।’

লুন পে গভীর গলায় বললো, ‘চলুন মাঠে যাই। সব বলবো।’

‘কিন্তু এ পিরিয়ডে আপনাতন্ত্রাস নেই।’

‘আছে, বাবো না। আত্মন, লুন পে মাঠে মেনে পড়লো।’

একবারে বেলিংহের ঘরে গিয়ে চুপে বসলো। শিরিষ গাছের ছায়া। রাত্তির একটা লোক চীৎকার করে কি বিক্রি করছে। একপাল ছোট ছোট ছেলে ছুটেছে তাকে ঘিরে।

লুন পে আত্মে আত্মে লম্বা কথা কমল বোসকে বললো। ‘তা হলে মৌলভিনের ব্যাপার কিছু নয়?’

‘এবারে তো নয়। কিন্তু আমার ওপর ক্যামেরন লাহেবের নম্র তো রইলো, একটু কিছু হলেই ডেকে পাঠাবেন হুজুং।’

‘এই ভাবে কতদিন আর চলবে? লাল চোখ আর দমকের ভয়ে কতদিন এমনি করে কুঁকড়ে থাকবে? বজুনতো?’

লুন পে উত্তেজিত হ’রে উঠলো, ‘আমার বুকের ভেতরটা কি হচ্ছে, তা আপনাকে বোঝাতে পারবো

না। ওই গ্রন্থটো টুকরো টুকরো ক’রে ছিঁড়ে ক্যামেরন লাহেব আমার নয়, আমার শেখাচারি অংশমান করেছেন। প্রবন্ধের প্রত্যেকটি লাইন তার কাছে ব’লে দেখা। প্রবন্ধ ছিঁড়ে ফেলতে ভরা পারে, কিন্তু শেখাচারি কথাতুল্যে মন থেকে মুক্ত ফেলবে কি ক’রে?’

‘আমি বলছি আপনাকে, এ সমস্ত লম্বা রইলো। হিসাব নিকাশের দিনে চুলচেরা বিচার হবে সব কিছুর।’ কমল বোস বৃহৎ গলায় বললো।

‘ইচ্ছা করলে কলেক্টর গভীর গায় হ’রে, চীৎকার ক’রে প্যাগোডার চাতালে আর মাঠে মাঠে হাঁড়িয়ে বলি, ‘প্রত্যেক আমার নয়, প্রত্যেক ওরা।’ আবার দেব সব কিছু মিলে, আর ওদের কথাতুল্যেই সত্যি, আমাদের দেশের বুকে ব’লে এ কথা বলবার লাহস ওরা কোথা থেকে অর্জন করলো। যেমন ক’রে আমার প্রবন্ধটা টুকরো টুকরো ক’রে ফেলতে, তেমনি করে লম্বা দেশের লোক জড়ো ক’রে ওদের লেখা ইতিহাসের নই কুচি কুচি ক’রে ছিঁড়তে ইচ্ছা করছে।’

ছুটি ছেলে ওদের বিকে এগিয়ে আসতেই কমল বোসের ইঙ্গিতে লুন পে চুপ ক’রে গেলো। সিনিয়র ক্লাসের ছেলে। শিরিষ গাছতলায় হাঁড়িয়ে ছুজনে সিগারেট বরাংলো তারপর গোট পার হ’রে রাত্তিরে চলে গেলো।

ছুজনে অনেককণ চুপচাপ। এক সময়ে কমল বোস বললো, ‘বাবাকে কথাতুল্যে বলতে হবে আজ। এ অবস্থা জানি কথা। শেরা বাজানকে বরাং লম্বা করতে পারে নি তারো আপনাকে কি ক’রে লম্বা করবে। কিন্তু একটা মজা দেখুন। কার্ট ইয়ারের একটি ডেলের নামাত্র একটি প্রবন্ধ। পৃথক না হ’রে থাকে, ছাপাখানা, বাস, এই তো ব্যাপার। কিন্তু ওরা ভয় পেরেছে। দেশের লোকের বিবেকের ওপর ওদের ভাতি সিংহাসনটা চাপিয়েছে কিনা, তাই প্রতি যুদ্ধে’ ভয় পায়, এই বুঝি সিংহাসনের ভিত্তি কেঁপে উঠলো। মাহুগলো বুঝি নড়ে চড়ে উঠে বসবার চেষ্টা করলো। কোন লোক বুঝি তাদের কানে কানে আসল কথাটা বলে ফেললো।’

‘চলুন উঠি’ লুন পে উঠে পড়লো, ‘হোটেলে গিয়ে
কান না করলে যেন খুঁজি পাচ্ছি না।’

দুজনে হাঁড়িয়ে উঠলো।

দিন তিন চার পরে একদিন বিকেলে লুন পে
হোটেলের বাগান্বার পা দিয়েই অঝা হ’য়ে গেলো।
টিক ওর কক্ষের সামনে একটি সুশী চেয়ারার চেলে বসে
আছে। লুন পেকে দেখেই ছেলেটি হাঁড়িয়ে উঠলো।
একটু এগিয়ে এসে বললো, বাপ করছেন। আপনিই
কি কোলুন পে?’

লুন পে খবকে হাঁড়ালো। বললো, ‘আজ্ঞে হ্যাঁ,
কিছু আপনাকে তো টিক চিনে উঠতে পারলাম না।’

‘আবার নাম স টেইক। কলেজ ম্যাগাজিনের
আমি সহ-সম্পাদক।’ লুন পে ভুক কুঁচকে হাঁড়ালো।
সেদিন ক্যামেরা সাহেবের পাশে যে ছেলেটি বসেছিলো,
সে কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদক, এ খবর লুন পে
জোগাড় করেছে। অঝ আবার সহ-সম্পাদক হোটেলে
ব’য়ে কি শোনাতে এসেছে। সেদিন অপহানের কি
কিছু ব্যক্তি হয়ে গেছে নাকি?

‘কি ব্যাপার?’ লুন পে দেওয়ালের দিকে নিষ্ঠা বিবে
লো।

‘আপনার কক্ষে প্রবেশ নিষেধ নাকি?’ ছেলেটি
বুড়কী চানলো। লুন পে অপ্রস্তুত হ’লো। ভাড়াভাড়ি
চাবি খুলে ছেলেটিকে কক্ষের মধ্যে আহ্বান করলো।

ছেলেটিকে বসিয়ে লুন পে বললো, ‘একটু অপেক্ষা
করুন। আমি হাত মুখ ধুয়ে এখনি আসছি।’

নিমিত্ত করেকের মধ্যেই লুন পে তোরাগে দিয়ে মুখ
মুড়তে মুড়তে ওপরে উঠে এলো। ছেলেটি জানলার
পরাব ব’য়ে বাইরের দিকে চেয়ে ছিলো, লুন পের
পায়ের আওয়াজে মুখ কিরিয়ে হাঁড়ালো।

ছেলেটি হেসে বললো, ‘আপনার এককন্ট আমি
পড়েছি।’ চেয়ারের হাতলটা শক্ত হাতে ব’য়ে লুন পে
উত্তর দিলো, ‘আপনার মতামত তো ক্যামেরা
সাহেবের বারকৎ জানতে পেরেছি। আপনার আর
আসবার প্রয়োজন ছিলো না।’

ছেলেটি হাসি খানালো না, ‘হ্যাঁ, আসবার প্রয়ো-
জন ছিলো। এই অল্প প্রয়োজন ছিলো, কারণ
ক্যামেরা সাহেবের মত আর আমার মত এক নয়?’

‘তার মানে?’ লুন পে কোতুল লুকাতে পারলো
না। ‘মানে, আমার বহি নিষেধ কারণ থাকতো,
তবে আপনার প্রবন্ধ এখনে দিয়ে কারণ তত
করতাম।’

লুন পে চোখ দুটো কুঁচকে চেয়ে চেয়ে দেখতে
লাগলো। এ আবার নতুন কোন চাল নয় তো। ওর
কাছ থেকে কথা বের করার সবতম কোন কন্ট?

ছেলেটি ব’লে চললো, ‘আবার নাম তুনেই তো
বুড়তে পেরেছেন, আমি আতে ক্যামেরা। শোনা কথা
সোজা ভাবেই বলতে আমরা ভালো বাসি। ইনিরে
বিনিরে কারণ করে ক’খা বলা আবারের বাতে সর না।
আপনার প্রবন্ধটি সত্যিই ভালো হ’য়েছে, তবে এ
প্রবন্ধ কলেজ ম্যাগাজিনে পাঠানোই আপনার অন্তর
হ’য়েছে।’

‘সত্যিই অন্তর হ’য়েছে। আশা করেছিলাম, যেটা
সত্যি অন্তর: কলেজের ছেলেরের সেটা বেনে নেওয়ার
পক্ষে কোন বাধা থাকবে না।’

‘বাধা থাকতো না, ‘ছেলেটি বলে উঠলো, ‘আজ
বহি আমার ক্রাশনাল কমেডের ছাত্র হ’তাম’ এ দেশ
বহি আধীন হ’তো আর শেয়া বাজানের মতন লোক
প্রিন্সিপাল হতেন।’

‘শেয়া বাজান?’

‘হ্যাঁ, তাঁকে আপনার বেধেন নি। আপনারা
কলেজে আসবার আগেই তাঁকে বিদায় করে দেওয়া
হ’য়েছিলো।

‘তাঁকে দেখিনি বটে, কিন্তু তাঁর লম্বা ডক্টর বোলের
কাছে সবই শুনেছি।’

‘কোন ডক্টর বোল, কেহুজী?’

লুন পে মাড় নাড়লো।

‘তাঁর সংগে আপনার আলাপ আর্ছে?’

‘হ্যাঁ, তাঁর ছেলে কল বোল আবার সংগে পড়ে।
সেই ‘হুয়েই পরিচর হ’রেছিলো।’

‘শেয়া বাজান আপনার প্রবন্ধ পড়েছেন’ ছেলেটি
প্রত্যেকটি কথা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করলো।

‘শেয়া বাজান?’

‘হ্যাঁ, আমি এক সময় তাঁর সব চেয়ে বড় ছাত্র
ছিলাম। আমি ইতিহাসে এম এ পরীক্ষার স্তম্ভ তৈরী
হচ্ছি। অবশ্য এদের শেখানো ইতিহাস পড়ে জিজ্ঞা
নেবো, তারপর রিসার্চ করে সত্যি কপাটা বলবো।
দরকার হয় তো স্বাধীন কোন বর্ণে’ পালিয়ে গিয়ে সেই
রিসার্চ পেপার আমি চাপাবো। আমাদের ইতিহাসের
পাতায় এদের ছিটিয়ে দেওয়া কালি আমি যথেষ্ট
তুলবো।’

‘জুন পে একদুটে ছেলেটির দিকে চেয়ে রইলো।
ছেলেটির চাউনি, কথা বলার দৃঢ় বলিষ্ঠ ভঙ্গী সব কিছু
যেন আশ্রয় করছে, যে যার নেই, ভেজাল নেই, এর
প্রত্যেকটি কথা ঠাট্টা, শব্দোচ্ছিন্ন সামান্যতম অবকাশও
নেই।’

‘কি বললেন শেয়া বাজান?’ জুন পের গলা কেঁপে
উঠলো। ‘আপনার সংগে দেখা করতে বললেন।
অনেকের শুধু কলনের ভোর পাকে, সেই অস্থপাতে
বুকের ঘোর থাকে না। গরম গরম কথা লিখতে পারে
কিন্তু কালের কথা বললেই তবে ঠুকে যায়।’

‘আমাকে যেনে কি ঠুকেলেন?’ জুন পে হুচকি
হাসলো।

‘যেতাবুধির তার আবার ওপরে নহ। শেয়া বা-
জান শুধু আবার দেখা করে বলতে বলছেন যে, আপনি
একবার সময় করে দেখা করতে পারবেন তাঁর সংগে,
অবশ্য যদি আপনার কোন অসুবিধা না থাকে।’

জুন পে উজ্জলিত হ’য়ে উঠলো, ‘শেয়া বাজানের
সংগে দেখা করার পথ থাকলেই বা হাজার অসুবিধা,
সেই সব বাধা অসুবিধা আমাদের ভিগিয়ে যেতে হবে।
এখন বাবো আপনার সংগে?’

ছেলেটি হাসলো, ‘না, এখন নহ। আমি শনিবার
বিকালে আপনার কাছে আসবো।’ ‘তৈরী থাকবেন।’
ছেলেটি উঠে চৌকঠ পার হ’রে গিয়ে আবার ফিরে
দাঁড়ালো, ‘একটা কথা।’

‘কি বলুন?’

‘আমাদের আফকের তথ্যগুলো এমন কি আফকের
পরিচরটুকু গোপন থাকবে। আমার সংগে কভিডের
আপনার সংগে যুগ্মযুগ্ম দেখা হলেও, তেনার জান
করবেন না। তাতে অসুবিধাই বাড়বে। চলি।
‘ছেলেটি অন্ধকার বারান্দা পার হ’রে মিডি বেরে নিচে
নৈম গেলো।’

হাতে অনেকজন জুন পে বিজ্ঞানার গুরে চটকট
করলো। কিছুতেই বুঝ আসছে না। বাস্তবতে একটু
তত্ত্বার মতন আসতেই যন্ত্র দেখলো—এক দীর্ঘ পুরুষ,
পরগে পেরুয়া, মাথার চাঁদপাশ বিরে আলোর ভোয়াতি,
নিচু হরে একটি একটি করে গুরেই পেপার বাস্তবতে ফেলে
দেওয়ার গুরে প্রবন্ধের টুকরোগুলো তুলে নিজের পেরুয়া
সংগের সুলিতে গুরে। আন্দর, কটাই বা কাগজের
টুকরো, কিন্তু মনে হ’লো সুলি বোকাট চ’রে গেছে।
এত ভাবি হ’রেচে যে সুলি বসতে লোকটির যেন কইই
হচ্ছে। হাতের দীর্ঘ লাঠিটা চুকে চুকে লোকটি এগিয়ে
গেলো। কলেজের প্রাঙ্গণ পার হ’রে, পিচোলা
সাতা দিহে অন্ধকারে মিশিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ পরে
লোকটাকে আর দেখাই গেলো না, কিন্তু তার হাতের
লাঠির শব্দ স্পষ্ট শোকে স্পষ্টতর হ’য়ে উঠলো। ঠক, ঠক,
ঠক। জুন পের মনে হ’লো আশ্চর্য্যকট। এগিয়ে
এসে যেন গুরে বাটের পাশে এসে পামলো। ঠক,
ঠক, ঠক।

তত্ত্বা ভেঙে বেতেও লাঠির আঙুরাক মিশিয়ে গেলো
না। বিজ্ঞানার ওপর জুন পে উঠে বসলো। দরজার
ঠক ঠক শব্দ। বাইরে অনেকগুলো লোকের দলিলিত
কঠোর।

লুন পে হুইট্টা টীপে আলো মেলে দরজার কাছে গিয়ে ঠাঁড়ানো, 'কে?'

'আমরা।' বাইরে ছুঁতিনজনের গলার আওয়াজ।

লুন পে বরফা বুনে দিলে, 'কি ব্যাপার, এত রাতে?'

'কিশদ হ'রে গেছে।' একজন ঢেলে খরাগলার বললো, 'শোরে মত নাচা দেহে, আত্মহত্যা করেছে।'

বারমকা কথাতুলো হুতে লুন পের একটু সময় লাগলো। 'শোরে মত!' ছোট্টেলে আসার বুথে ঘে-ছেলেটির লকে প্রথম আগলণ হ'রেছিলো সেই ছেলেটিই শোরে মত। কৌকড়ানো চুল, হুঁদীশু চেহারা। আত্মহত্যা করেছে সেই ছেলেটি?

যের ভালো দিবে লুন পে ছেলের মলের সংগে এসিরে গেলো।

একতলার শোরে মতের অরের লাননে খুব ভীড়। ছোট্টেলের প্রায় প্রত্যেকটি ঢেলে জড়ে হেরেছে। ওয়ার্ডেন দরজার কাঁচের শাশী ভেঙে দরজাখোণার বখোবত করেছে। দিলিরের পাখার হুডের সংগে 'কিশিং' রোপ বেঁধে গলার লাগিরে শোরে মত হুনে পড়োকলো। যেরের বখো আলো জ্বালা ছিলো। পানের কনের ছেলেটি রাতে বাবতনে যাবার সময় দেখেই চমকে উঠেছিলো। কাঁচের শাশীর ওপর শোরে মতের কোলা অবস্থার ছাড়া এসে পড়েছিলো। তার চাঁকারেই আপে পানের ছেলেরা ভেগে উঠেছিলো।

লুন পে গিরে শোঁহাযার আগেই দরজার কাঁচ ভেঙে বুতবেহুট নাঘিরে নেবের শোঁহানো হয়েছিলো। পুলিশেও বখর পাঠানো হয়েছিলো।

লুন পে একবার উঁকি মেয়ে দেখেই বারান্দার রেলিরের ওপর পা শুটির চুপ করে বসে রইলো। আপে পানে ছেলেরের কিশকাল লকে কাণে সেলো।

'কি ব্যাপার, আজ বিকেলেও তো মাঠে বসে গর করতে দেখেছি।'

'কি জানি, তবে কদিন গেছে দুখটা একটু ভাঙ ভাঙ কাকুর সংগে বিশেষ কথাবাতা বলতে চায় না।'

'মাঝার কি, এ বরসের ব্যাপার।' গলার আওয়াজে লুন পে মুখ কিরিবে দেখলো হুক লিন হাত নেড়ে কণা বলছে, 'শ্রম, শ্রম, তাকড়া আর কিছুই নয়।'

লুন পে আন্তে জিজ্ঞাসা করলো, 'কিছু লিখে দাখনি?'

'ইয়া', কে একটি ছেলে উত্তর দিলো, 'টেবিলের ওপর নিবের হাতের লেখা কাগজ লাগুয়া সেজে একটা। তাতে শুধু লেখা যে ওর যুক্তার লজ কেউ দারী নয়।'

অনেকচ চুপচাপ। লুন পের ননে পড়লো, সত্যিই শোরে মত ঈমানীং আর যেন ভেমন মিথতো না। দেখা হ'লে বুচকি হাসতো কিংবা হাত তুলে অভিবাদন ক'রে শাপ কাটির বেতো। 'যোরে মতকে ওর ভালো লাগতো।' ভালো লাগতো প্রাণের প্রাচুর্যের লজ। 'কি এমন ঘটলো ওর জীবনে বার লজ এমনি ক'রে নিজেকে আচমকা নিঃশেষ করে দেবার প্রয়োজন হ'লো? শ্রম? তাই কি?'

জুতো বসবসু ক'রে পুলিশের লোক এসে হাজির হলো। প্রবের পর প্রব। আপে পানের কনেরের ব্যক্তিব্যক্ত ক'রে তুললো। আঠো পরে হাঁদপাতালের গাড়ী এসে ঠাঁড়ানো। ছেলেরা বরাবরি ক'রে বুতবেহু গাড়ীতে তুলে বিয়ে আসলো। ওয়ার্ডেন শোরে মতের বখার ভালো লাগিরে দিলেন।

লুন পে ঠাঁড়িরে ঠাঁড়িরে দেখলো। আবার এই কবে নতুন কোন ঢেলে এসে নতুন ক'রে জীবন শুরু করবে। পুরানো পড়া বইয়ের বতন শোরে মতের কণা আর কেউ ভাববে না।

নিবের কবে লুন পে বখল কিরে আসলো ওখন বাড়িতে লাড়ে চারটে বেজে গেছে। হুকো গেছে জল গড়িরে নিবের বুথে চোখে বিয়ে লুন পে বিহানায় ওরে পড়লো। 'কিছু ভই পর্যন্তই। চোখ বজ কলেই বিদ্রী সব চিন্তা বনের মধ্যে ভীড় করে। ভালোবাসার লজ এমনি ক'রে মাহব শেখ করতে পারে নিজেকে। নাশিনের লজ লুন পে পাবে ভই পাখার রতে হুঁকি বেঁধে

অপর আরে কীল লাগিয়ে নিজের পলার দিয়ে ফুলে
পড়তে? যদি মাশিনের সঙ্গে অস্ত্র কারুর জীবন
জড়িয়ে যায়, তিরদিনের মতন লুন পের জীবন থেকে
গরে যায় মাশিন, তাহলে পাঁচের লুন পে এমন ক'রে
আত্মহত্যা করতে? একটা মাহুকের জীবন। আশা
আশা, অথচ ছুঁবে অভ্যাসে নিটোল জীবনকে পায়।

[ক্রমঃ]

প্রান্তিক

মিহির সেন

অবশেষে গড়া এল। আশা, অধিনাশ আর মাল
করেকের চেলেটা। এক ঠেলা-গাড়ীতে এটে-যাওয়া
সংসারটা নিয়ে এলে বামলো বতীর মুখে। একদাপ
কৌতূহলের বুঝোমুখী।

সাড়ে নটার ভেতর অস্ত্র ডাল ভাতটা নাহিরে
দেবার গ্রানাত গ্রেটোরড কোতুহলী মুখভলো যায় যাব
এলাকা থেকে একটু উকিতুকি বেয়েই বতরানের মত
নিরন্তর রইল। বিস্ত ব্যতিক্রম ভবু যখন। প্রায় পশু
হাযীর সৌলতে সকালেও গুর দিকায় অবসর। বতীতে
চুকবার অপরিহার্য বৃথটোতে এলে তাই সশরীরে ঝাড়িয়ে
পড়লো যখন। খুটীর খুটীর বেথতে লাগলো নতুন
আশা পরিবারটাকে।

ঠেলা গাড়োয়ানটাকেই আরো চার আনা কবলিয়ে
আশা ভখন তাকে দিয়ে মালপত্রগুলো খরে তুলছিল।
অধিনাশ কেমন যেন আনমনে ঝাড়িয়ে ছিল এক পাশে।
নতুন বোডিংএ আশা ছেলের বতরান মুখে। হাড়
জিরকিরে ছেলেটাকে কোলে নিয়ে।

ঠেলাগাড়ী থেকে ক্রমাগতই নেবে আশা মালগুলো
বেখে একটু অবাক হল যখন। ঘরটার পক্ষে কেমন
একটু বেমানান। বোখা। আরনা লাগানো একটা

যার বগু গুও করতে। মাশিন বরে গেলে লুন পের
খুবই কষ্ট হবে, যেন হবে মুকের একটা। পাঁচেরের টুকরো
বুঝি সরিয়ে নেওয়া হ'রেচে, কিন্তু সম্বোধ হয় লুন পের,
নিজেকে পুণিবীচ থেকে হরত অমন ক'রে সে সরিয়ে
দিতে পারবে না।

টেবিলগু। কীচা ঘরের এঘরে-বেঘরো মেঝেতে
মাথবে কোথায়? দেওয়ালে টানাযার মেলক, ফুলাবে
তোষায় এ বেড়ার দেওয়ালে?

বাইরের বামলো মিটরে অধিনাশকে নিয়ে এবার
ঘরে গেল আশা। যাবার সময় এই প্রথম একবার
কিরে তাকাল যখন দিকে গঃ অশোভন কৌতূহলে
বিরক্তির বিকল্প চাকুনিতে।

এল কিন্তু ঠিক বাপবাগমাতে পারলোনা নতুন
পরিবারটা এ পরিবেশের সাথে। জলের পায়ে এক
কোঁটা ভেলের স্বাতন্ত্র্যে না-মিশ বেহেই দইলো। তাই
অর কদিনেই কৌতূহলটা মিটে এলেও, বেড়ে চললো
এক অমানিত অস্বস্তি। অহেতুক দিবা

ঘোষ অস্ত্র ঠিক এঘরগ নর। আশারের টেনে
এনে লবার সাপে'মিশিয়ে দেবার চেষ্টায় এঘর কোম
জটিলি ছিল না। কিন্তু আশাই যেন কেমন এড়িয়ে
যায়। কাটকে যেন স্তম্ভন আমল দিতে চায়না। একই
বতীর বাসিন্দা হরেরও অন্তা সে। নিজেকে আতর্ক
নিশিগ্ধভাবে আলগা করে রাখে লবার থেকে। কারো
সান্তেও নেই, পাচও নেই। বামী স্ত্রী উভয়েই।

জলবল নিয়ে যখন অশ্লীলতম ভঙ্গীতে মুখবিত্ত হয়ে

ওয়ে কলতলাটা, এককোণে অনিশ্চিত সুযোগের অপার অপেক্ষা করে আশা বাঁড়িয়ে বাঁড়িয়ে। চল চলে গেলেও এগিয়ে এলে লাবী আনার না। নিঃশব্দে চলে বার ভেতরে। একই পুরেই অন্ধিশূণ্যকে দেখা যায় খালতি হাতে বেরিয়ে বেড়ে; দুবের বড় হাতার কলটা থেকে চল নিয়ে আসতে।

সামাজিক কারণে বধন হাতাভট্টের কাপড় কাছিরে তত্ত্বাবধে হস্ততম অবস্থান পর্যন্ত ছিঁড়ে ফেলে ব্যায়ো-রাষ্ট্রী উঠানো কপিগিরে লড়ে বড়ীর পুরুষেরা, লাফিরে ধুঁড়ে ব্যক্তিরে ভোগে গোটা গল্পী, একবার উকি পর্যন্ত নেয় দেখেনা অধিনাশ। একমনে হরতো ফেলটাকে আদর করে চলেছে তখন ভেতরে।

এ নিশিথিতক দৃষ্ট বলেই ধরে নেয় সবাই। আগে ভাঙ আভাল আভাল খুঁজতো, এখন আর সামনেই লম্বাচোনার ছাতি বলিরে দেয় নেয়েরা। অত দেখাক ভাল নয়। কোন্ এমন রাজ্যরাণী এসেছেন কে জানে, কথায় বলেন না। সেই এঁটোসালেই বধন এসেছিল বাবা, কদিন আর গা বাঁড়িয়ে থাকবি।

পোনে, তবু কথার জবাব দেয়না আশা। এ যৌমত্যা যেন আরো বেশী বেশিরে ভোলে ওদের। আলোচনার গতি আরো একরূপ এগিয়ে বার শালীনতার সীমা ভেঙ্গে : কি জানি বাবা কি করে চলে। নরনটাতো যেখি আর সবর বাড়ীই বলে থাকে। আর বধন বাড়ী থাকেনা তখনই যত বন্ধুদের খোঁজ করার পালা পড়ে, অধুকা বাড়ী আছে; অধুকা বাবু আছেন না কি ?

নানান অক্ষতমী সহযোগে বর্ণিত এ অভিযোগের কোন জবাব দেয়না আশা। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে জবাব দেয় বহুনা, তা পরের কথার ভোম্বাদের এত আঁকুপাকু কেন বাবা। বিঘো কেন কেঁচো খুঁড়তে বাঙ বেলা।

অবদমিত প্রতিহিংসার যেন ছেঁকে ধরে এখার সবাই বহুনা কে। যেন লক্ষণকরে কোন গুপ্তচরকে হঠাৎ ধরে ফেলেছে : তা তোর এত বরস কেনরে বাগী।

বড় হুন্সর দেখতে চরলোক না ?

কিছুক্ষণ ব'য়েবে থেকে উঠে বার বহুনা। শহরে জিত, একবারের লান দেওয়া।

কিন্তু এ হেনেন্তাপ হরতো লু হতো বহুনা, যদি আশা একদিনও গুকে লাফনা মিত। যদি কলট তৎসনাও করতো, জুনি কেন আবারের জন্ত কথা ভনতে বাঙ, বহুনা; কেন ওদের বা খুঁনী। আবারের তো আর গারে ফোসকা পড়ছে না।

কিন্তু আশ্বর্ষ রকম জন্ত আশা। তেমন সবাক লাগে যেন ওদের বহুনা। ঠিক বুঝে উঠতে পারেনা যেন !

তবু কৌতূহলও কখনো। সবর অপবয়ে ওদের ঘরের পাশ দিরে বাবার সবর উৎকর্ষ হয়ে থাকে সে। বড়টুকু পায়ে ছুড়িরে নিয়ে বার সংবাদ। তারপর অবসরে সেই টুকরো ছবিগুলো মাঝিরে তুলে চিনতে চেষ্টা করে ওদের পূর্ণাঙ্গ পরিচয়টা। কিন্তু তবু হুৎহুটে ওদের জিজ্ঞেস করতে পারেনা। কি বলে শুরু করবে তেবে পারেনা। উর যায়। সরল মনে জিজ্ঞেস করা কোন কথার কি জানে হয়ে বার শেব পর্যন্ত, কে জানে। কলকাতার এসে একটা জিনিষ বেশ বুকেছে বহুনা, কথা এখানে আঁবের গানের বড় অপচর করা চলেনা। দুজনের চালের বড় বুটে বুটে শুনে খরচ করতে হয়। না হলেই ঠেকতে হয়। ঠকতে হয়।

অবশ্য তবু কৌতূহলেই নয়, নতুন পরিবারটার উপর কেমন যেন একটা দুর্বল সন্নিবন্ধ আছে বহুনার। ওনেছে সে, আশাও ঠিক এ বড়ীর উপযোগী নয়। স্বামী ওর ব্যাটিক পাশ। কোন অফিসে যেন কাজ করতো। ছাটাই হয়ে গিয়েছে। আশাও পড়েছে উঁচু রূপ পর্যন্ত। যদিও পাশ দিতে পারেনি।

ভাই, ওদের ঘরের পাশ দিরে বাবার সবর ইচ্ছে করেই একটু নহর করে গতি বহুনা। যে ছোটো ঘরের দাক দিরে কলতলার বেতে হয়, লামনা লামনি দুজন পার হওয়া বাহনা সে পথে; একজন বাঁড়িয়ে পাশ

না নিলে। ইচ্ছে করাই লে সময় ধাঁড়িয়ে পাশ দেয় বহুনা। বিশদিত করে প্রবেশটাকে আশার ঘরের সুখোবুধী ধাঁড়িয়ে। বিভিন্ন শাখা থেকে কেটে কেটে মেওয়া ছবি টুকরো শরপর লাগিয়ে তুলবার চেষ্টা-বাহুই এচেরার রক্ত, আশার সংসারের টুকরো ছবিগুলো মনে গেঁথে নিয়ে যায় বহুনা। তারপর নির্জন অবসরে বসে বসে জোড়া লাগিয়ে দেখবার চেষ্টা করে ওদের খাপছাড়া গোটা সংসারটাকে।

বন্ধ লাগেনা। ওর আত্মকার ভাবা-ভাবা সংসারটাকেও বেন একটু অন্তর্ভুক্ত করে পায় বহুনা, আড়ালে আবডালে শোনা ওদের টুকরো আলাপে, লুকিয়ে দেখা দৃশ্য-ভাষাংশে।

সবার ঠাট্টা-বিজ্ঞপ উপেক্ষা করেও তাই ওদের সামান্যতম নৈকট্যের সুযোগও ছাড়েনা বহুনা। ওদের কুস্তম্ব কোন উপকারের প্রয়োগ।

হঠত যেতে যেতে স্তন্যে পেল বহুনা আশাদের কোন একটা শরোরা আলাপ :

—কৈ চা খাবে বললে যে, ওঠ চা নিয়ে এস।

—আবার উঠতে হবে ? তবে থাক।

—সেকি থাকবে কেন ? এত আশলে বাবা জীবনে

সেবিনি। তবে কি আবারের বাজারও করতে বল রাগাবর কেসে।

—করতে পারবে তো তাসিই হতো। তা ছেলেনা বখন আশাততঃ, চাঁটানা হয় মূলতুবিই থাক। আর তাত খাবারও তো সময় হয়ে এল। রাত কন হহনি খোদ হয়।

কথা শেষ হবার আগেই আসতো পারে সিরে ছাফির হয় বহুনা। 'যেন অপর্যায়ের পীড়িত আনাচ্ছে, এমন মিনমিনে করে বলে, দিদিমনি, আদি তো বাইরেই থাক্খিলাসি। দিন না যদি কিছু আনতে দিতে হয়।

কোনদিন সেয় আশা, কোনদিন দেয় না। কোন-দিন বিরত বোর করে, কোনদিন হয় বিরক্ত। কিন্তু

বুকেও বুকে চায়না সেকথা বহুনা। চোটে একটা পাখীর নীড় যেন। এদের দেখে কেলে আশা পদ্মা-পারের পল্লভাতের স্বপ্নের মত আবছা হয়ে আসা জীবনটার কথা মনে পড়ে থেকে থেকে। পাক বকথকে ড্রেনের পাশের এই ক'টাকা ভাড়ার ছাউনি শুণো আত্মনাট্যনা, তাক্য হলেও নিকানো গোছানো নিম্নশ চালাবরে জীবনের বখন অস্ত্র মানে ছিল। এ পরিবারটাকে বড় ভাল লাগে তাই। যেন হুড়ো বরলে বসে তবুই বরণের কোন কটো দেখা।

কিন্তু মিনকে বিন বহুনার চোখের সামনে দিয়েই ছবিটা বেন কেনন হং বদলাতে শুরু করল। বিশেষ একটা বৃহত্তের আকস্মিকতার নহ, তিল তিল করে। বাতাস্রাতের পথে এখনও উৎকর্ণ বহুনা, কিন্তু বেডার ওপাশের হাসিটাই বেন স্তম্ভন উচ্ছল নেই। জীবন্ত নেই। রাতদিন চোলেটাকে কেন্দ্র করেই বরে চলতো ওদের ইন্দ্রদিশ স্রোত। মাঝে মাঝে হীতিমত আদি-ব্যোভা বলে মনে হতো থাকে বহুনার। কিন্তু এখন বেন দুঃখের ভেতরই কেনন একটা বিচ্ছিন্নতা এসেছে। বার বার নিম্নশ গভীর ভেতর চাটরে আসছে জবে।

আতে আতে সুখচোরা অবিনাশও কেনন বেন অসহিষ্ণু হয়ে এল। সংসারণ কথা নিয়েই হুঙ্কার কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে যায় বখন ওখন। অবিনাশের বাড়ীর উপস্থিতিটুকুও ক্রমেই পরতর হয়ে আসতে শুরু করলো। বখন বাড়ী ফেরে, ক্লান্তিতে যেন তেঁকে পড়ছে। দেখে যায় হয়।

কেন বোঝেনা, কিন্তু কেনন বেন বিজ্ঞি লাগে বহুনার। ওদের সবটুকু জীবন দেখতে পারনা বহুনা বহনিকার এপারে ধাঁড়িয়ে, কিন্তু অসুভব করতে পারে নষ্ট, এ পরিবেশের সাগর সন্মমে এসে মিশবার শটভূমি বেন তৈরী হচ্ছে। এতদিন ওদের হারিত ছিল দিকই, কিন্তু তার কোন মানি ছিলনা ওদের। দাঁড়িয়ে ককালের সুখোবুধী বাস করেও তার কলঙ্কটুকু পরিহার

করেই চলিল এতদিন। কিন্তু পরাজয়ের একটা চাপা স্তর বেন গলাটেপা কান্নার মত চুইয়ে চুইয়ে বেড়ার এ পাশেও আসতে শুরু করেছে আজকাল।

সেদিন শাই শুনলো যমুনা, আশা অসুযোগ করছে, আর কতদিন মিথ্যে আশ্বাসে ভুলিয়ে রাখবে। এদিকে গা বে নাশি হয়ে গেল। শুধু আমার হলেনা হয় কথা ছিল, বোকার টিকিটিঙ খোয়ালে তো!

যমনাকে অবাক করে দিয়ে, আর খেঁকিয়ে উঠলো অবিনাশ, সে কি আমার জন্তু? তোমাদের গেলার আর জন্তুই তো। আর, আমি কি বলেছি হাত পা গুট্টের। আগ্রাণ চেষ্টা তো করছিই।

ক্রত পায়ে পালিয়ে এল যমুনা। ওদের সংসারের টুকরো ভবিষ্যৎ উৎকর্ষিত শু মনেই নেই, কিন্তু সে এ ছাড়া নয়। এ সংসার নয়। এ সংসার বেন ভব শেষ সান্ত্বনাকেও হত্যা করে দেয়।

কিন্তু কৌতুহল রমন করে খুব বেনীকণ থাকতে পারলো না যমুনা। কিছুকণ নিজেদের মধ্যে উলটুল করে ভটি ভটি পায় করে এল আবার। কান পাড়লো, শব্দ-সঙ্গীত ইচ্ছার মত। নিঃশব্দ। শূন্যের পড়লো নাকি দুঃখই! আরো একটি সত্রে গেল যমুনা বেড়ার দিকে। প্রথমে বিশ্বর তারপর তৃপ্তিতে ক্রমে ক্রমে এলো সুখশাসা। আশো আশো যে দুঃস্বপ্নটা কথা ও স্বনি শুনতে পেরেছে, তাই সজ্জিত শাস্ত্রিসূচক, বেশ বুকলো যমুনা। আমি তো আর চিরদিনই পঙ্ক নয়। ভরা যৌবন ওদেরও ছিল। বিরাট একটা পাখর বেন বুক থেকে নামিয়ে বেছে কিয়ে এল যমুনা।

কিন্তু তবু দিনে দিনে যে প্রতিরোধের শেষ সীমাকে এসে পৌঁছানো গুণ্য, বেশ বুকতে পারলো যমুনা। সজ্জিত সর্বলের শেষ প্রান্তে।

সাদারিন কোথায় কোথায় গুর বেড়ার অবিনাশ কে চান, রাজ্য বাড়ী করে উঠে গুণ্য চলে। লাল চোখে। যন্ত্রের মত ভাবসম্পন্ন কাজ করে চলে আশা। বুটিনাটি, নিয়ে কখনও বা কথা কাটাকাটি শুরু করে দায়।

কদিন নিঃশব্দে নিয়ে একটি ব্যস্ত ছিল যমুনা। সমস্ত পারিবারিক ওদের দিকে নজর দিতে। কিন্তু হঠাৎ একদিন যবের পাশ দিয়ে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো যমুনা। অসহিষ্ণু অভিমাত্রী হর কানে এল আশার, আর কতদিন এভাবে মিথ্যে আশা দিয়ে বাপ্পা বেবে। আগে প্রাণটা তারপর বান। যা হবার হয়েছে, খোঁকাকে নিয়ে এখনো বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালে নিশ্চয়ই ফেলতে পারবেন না। আর কদিন বেবে আমি তাই চলে যাবো।

ক্রত অবাক শোনা গেল অবিনাশের, এভাবে আশ্ব-সম্মান বিসর্জন দিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গলায় বড়ি দেওয়াটা অনেক সহজ।

যেবে যেবে উত্তর দিল আশা এবার, নিজে হলো স্বরতো-তাই দিতাম, তোমার বলে দিতে হতো না। কিন্তু ফেলোটা কে বাচাতে হবে তো।

ক্রতের হয়ে আসে অবিনাশের বর, হেলে শুধু তোমার, আমার নয়? কি ভাব বলতো ভূমি। কোন চেষ্টাই করছি না, শুধু গুরে আজ্ঞা মেরে বেড়াচ্ছি। বেবতো, বাওনা সবার কাছে। আমার যেমন করে হোক চলে যাবেই। বহি নাই চলে আরো দশভনের মত না হয় না খেয়েই বের যাবো। এ দেশেতে সেটা নতুন কিছু নয়। তবু খোঁকাকে নিয়ে ভূমি বেঁচে থাকবেতো।

অবিনাশের কথাটা হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। মনে হোল বোঝ হয় আশা চেপে ধরেছে ওর মুখ, কি বলতো বাস্তব? তারপর একটি ঘেমে ভিজে গলায় বললো, আমি কি শুধু আমার জন্তুই বলছি। কত দূরে যে বলি বলি জানতে। খোঁকার শেষ বাসিন্দা পর্বত সুরিয়ে গেছে কাল। আরো না হয় আশ্বও না খেয়ে থাকলাম, কিন্তু ও? ওকেতো বাচাতে হবে।

আগেই শুটে যমুনা বেড়ার ওপাশ থেকে। না খেয়ে আছে? লেপাণ্ডা ভানা একটা তত্ত্বলোকের পরিবার না খেয়ে থাকবে আশা? ক্রতপারে চলে বার ও। কিছু-

কণ পর কিরে আসে। এলে গাড়ার আশার ঘরের
সামনে, বিধিবিধি, একটা কথা বলবো ?

ভুল কিছুকি তাকায় আশা, বলনা কেন!

আমততা আনত। করে বলে বহুনা, এই আধুনিটা
রেখে দেবে ? আমার হাতে থাকলেই বিড়ি কেনার
জন্ত উত্তাক্ত করে মারে মিলে। দু'চায় পরনা যদি
দুহিনের জন্ত না থাকে দিবি। তা রেখে দাও, দিন
পনেদো পরে আসি কেবল নেব।

চালাক গেরে আশা। ওর আসল উদ্দেশ্য চাপা
থাকেনা ওর কাছে। বহুনা, বহুনাত আজ সাহস পাও
ওকে স্তম্ভাধি দেখবার। জুট করে জবাব দিল আশা,
কেন, আমি ছাড়া লোক নেই এ বতীতে ? পারবো না
আমি। আর কোনদিন এ সব প্রস্তাব নিয়ে এসোনা
বেন বহুনা।

শতমত ঘেরে বেগিছে আসে বহুনা। গাড়িরে
থাকতে পারেনা আশার সামনে। যদিও কর্মহল ওর
এ তরাট ছাড়িয়ে অনেক দূরে, অবশেষে অন্তরালে,
তবু অহেতুক একটা লগ্নোচ, অপরায়ণ্যে সবসময়
ছোঁয়ে থাকে ওর বেধ, মন। কারো মুখোমুখি নিষেকে
তুলে বর গাড়িতে পারেনা। তবু ক্ষুদ্র হয় বহুনা।
অন্ত ভক্তগোষ্ঠী দেখাক ভাল নয়। ওদের চেয়ে কোন
অংশে খাটো আজ বহুনা। পথটা বাই হোক, বহুনা
কাছ বেঁচে থাকলে আজো বাগি জুটতো তার। আজো
রাজে বহুনাতা কটা পায়। দেখাই থাক, কতদিন থাকে
এ দেখাক।

খুব বেশী দিন লাগলো না। জায়গতে হলো
আশাকেও। কদিন গেছেই ওদের কথাবার্তা থেকে
জীত করছে পারছিগো বহুনা, পারে পারে লংকার এসে
জড়িয়ে ধরলেও, অত কোন পথে না বাড়তে থাকে
সংসারটা। অবিনাশ ব্যর্থ হয়ে সরে এসেছে, এখার
আশার পাশা। হেলেনের চেয়ে মেরেনের চাকরী
পাওয়া নাকি আজকাল সহজ। আর প্রায় যোগাড়ও
হয়ে গেছে নাকি কি একটা কাজ। আশার লম্ভিত
পেলেই হয়।

বহু বিধা, বহু বশের বিভিন্ন দু'তিন রাত পেরিয়ে
অবশেষে সিদ্ধান্তে এল আশা, বেঁচে থাকটাই আজ
সবচেয়ে বড় কথা। মান নয়, প্রাণ নিয়ে। মত
দিল তাই।

কিছু সময় হল হেলেনটা। থাকে বাগাবার জন্ত
এই চরম সিদ্ধান্ত, সেই। সকালে উঠেই কাজের বান্দার
বেগিছে বাছ অবিনাশ। কেরে হরতো রাজে। দুপুরে
ছুটা তিনটে থেকে রাত সাতটা আটটা পর্যন্ত
চাকরীতে আটকা থাকবে আশা বাইরে। হেলেনটাকে
রাখবে কে ?

অবশেষে বাধা হুইয়ে বহুনাই ডাক পড়লো : এ
বতীতে অন্ততঃ এতটুকু বিশ্বাস করা যায় থাকে। আর
নিকটবর্তী, দুটা হাত পা ওই একমাত্র।

সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে বহুনা এল। কিছুটা
আমততা আমত। করে কি ভাবে পাড়বে কথাটা ভেবে
নিয়ে ছুক করলো আশা। একটা বিশেষ কক্ষেও জন্ত
জোমাকে ডেকেছি বহুনা।

ভাবলেনশহীন মুখেই জবাব দিল বহুনা, বেশ তো,
বহুনা।

জানালো আশা, একটা কাজ পেয়েছে সে। দেখা-
পড়া জানা একটু ভ্রম পরিবারের ঘেরে চাচ্ছিলেন
তার। 'দেখাপড়া জানা' আর 'ভ্রম-পরিবারটার'
উপর ইচ্ছে করেই তোর মিল একটু আশা। লক্ষ্য
করলো লগ্নোচ দৃষ্টিতে বহুনার মুখের উপর তার প্রতি-
জ্ঞিয়া। তারপর বীরে বীরে বললো, কিছু সময়
পড়েছি হেলেনটাকে নিয়ে। আজ দুপুর বেলা তুমি
যাও কোথায় ? কোন কাজে ?

একটু বেন চমকে উঠলো বহুনা। কাজে ! হ্যাঁ,
কাজেই যায় বহুনা। কিছু আশার মত লগ্নোরবে
যোবনা করার মত কোন কাজ নয় যে। কি করে বলে
সে, কী সে কাজ ! একটু ভাবলো বহুনা, তারপর
বুহু মাথা নাড়লো, না, না কাজ আর কি ? কাজ
কিছু নেই। কিছু একটা কাজে যে নিশ্চয়ই যায়, বেশ

আনে তা' আশা। তবু সে কাজ বে অল্প কোন মোতমী কাকের বিনিময়ে এড়ান যায়, তাহও আভাস পেল।

বলো, শু, বিশেষ কোন কাজ নয়তো? তবে একটা উপকার করা না যখন। হুপরে আমার ছেলেটাকে একটু চোখে চোখে রাখ না। এই গোটা হুইক বেকে পাঁচটা ছটা। এর ভেতর আমি যদি কিংবদন্তি নাও পাতি উনি ফিরে আসবেনই। তোমাকে মাসে মাসে কিছু দেওয়া যাবে।

দোৎসাহে রাজী হয়ে যায় যখন। আর চাকরিতে বহাল হয় আশা।

আশার চাকরিটা যেন কেমন একটু বেখানো ধরনের। সবায় বসে রপটায় গিরে পাঁচটার ফেরা নয়। তবে পূর্ব বেশী ভাবে না এ-নিম্নে যখন। কলকাতার সব কিছুই তাক্ষণ গুর কাছে। কিন্তু আশা যখন বাড়ী ফিরে, যেনে কেনন নাহা হয় যখন। তেহ না হলেও রম্ভা যে ভূমি স্ত্রীস্বত্তে ভেত্রে আসছে, তখনে পাত্তর চাকরি যে কেউ যেন পড়তে পারে সে সংবাদ।

তবে যখন, তবে কি পূর্ব যুগী নয় আশাদি এ চাকরিতে। এখনো ঠিক বাপ বাইরে নিতে পারছে না কঠির সাধে। নাকি সংস্কার-অবশেষটুকু এখনো কাঠের বসে বিধে ভাবে।

গুরু দুখ হুটে কিছু জিজ্ঞেস করতে ভয় পায়। ক্রান্ত আশার পাশে এনে বসিয়ে দেয় ছেলেটাকে। কেমন অস্ত্রনয় আসতো হাতে চুলগুলো বা ট্রোট্টা নিয়ে নাতাচাড়া করে ছেলেটার আশা। কোন কোনদিন বা হুইকে হুকে চেপে ধরে কাঁদিয়ে দেয় ছেলেটাকে চুমোর চুমোর।

কিন্তু পূর্ব বেশী দিন এ বাধা কটিন ভাল লাগলো না যখন। টাকা হুইকো হুইকের গিরে সেই আগের উপায়েই সন্ধানই পড়ে, কিন্তু এভাবে অল্প হুপদ যখনটা যেন বড় সময় অপর্য যেনে যেন হয় গুর।

তারপর হুইকোই একদিন একটা উপায় আবিষ্কার করে ফেলে সে। বাতে ছেলেটাকে রাখা হয়, হুপটোয় অল্প অপর্যে না কাটে, অথচ আরও গুরুত্ব হয় উপায়েই পড়টা।

আর পরদিন থেকেই শুরু করে দেয় সে কাজ যখন। আশা বেহিরে গেলেই, ছেলেটাকে নিয়ে বেহিরে পড়ে যখন। তারপর বেশ কিছুটা গিরে একটা নির্জন পার্কে চুকে সন্ধ্যাবে ছেলেটার ইচ্ছা আর ভাষাটা খুলে অচেনার ভেতর লুকিয়ে রাখে। হুপটা উৎসাহিত করে দেয়। তারপর বেহিরে পড়ে দেখান থেকে। হুইকে হুইকে গিরে উপস্থিত হয় নিজের কর্মস্থলে। তারপর বাড়ী ফিরে আসে আশা ফিরবার বেশ কিছুক্ষণ আগেই। ছেলেটাকে সাঝিরে গুটিয়ে তুলে ধরে সামনে। টেবিলে পায় না কিছু আশা। যেন যেন হাসে যখন। এখনই ছিড়ি ছেলেটার যে রোদ তল তল এতটুকু হাওয়া হেবে যেতে পারে না।

আশা যখন, হুইকোই চাকরিই বেশ যত্নে একটা সহল রেখার এগিরে চলছিলো। কিন্তু পূর্ব বেশীদিন চললো না। কক্ষস্থায় হয়ে চিটকে চাকার নেবে আসতে হল একদিন আশাকে অস্বীকৃতির একটা ঘটনার ফাকার।

পরিষিষ্টিতা যখন ক্রমেই অশোভন হয়ে উঠছে, তখন তীক্ষ্ণ থেকে আর হস্তচেনে আশাকে উদ্ধার করে আনলো তারই এক বন্ধু। যেতে যেতে কোঁকলো সে হুইক গিরে পড়েছিল দেখানে। তারপর আশাকে টেনে নিয়ে এসে হাউল অল্পে দুইয়ের একটা সিনেমা হাউসের সামনে, হাউসের চাকার।

একটু বস নিয়ে বন্ধু জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কি হয়েছিলো বলতো? -

একবার এদিক ওদিক তাকিয়ে নিল আশা। এক-পাশে একটা চান্দাচুড়ভালা, আর একপাশে বিরাট এক অবশেষের আভাল থেকে সামনে ছেলে ভইরে ভিকার ভকীতে এগারিত হাতে বলে একটা ভিখারী। চেনা পরি-

ভিত কেউ নেই। শুধু চাপা গলায় বলে চললো আশা, কি বলবে বল, আমারই ভুল হয়েছিলো। আত্মদমনা বাঁচিয়ে বে চেইয়েচেটে কাজ করা বাবে না, তা তেবেও ছিলো, কিন্তু বেগালার দুটোরটা চেইয়েচেটে এখন নিয়মটা চালু করেও, তখন দেখতে দেখতে নিয়মটা হয়তো শারা কলকাতার হুট্টিয়ে বাবে। কিন্তু তখন হয়তো মেয়েদের জীড়ে আর কাজই পাবে না। ভাবশায়, নিয়ে তো নেই, সুদিন যদি আসে, ওর একটা কাজ হয়, না হয় চেড়েই দেখ। আর বিশেষ করে ছেলেরটার সুখের দিকে তাকিয়েই নিরোহিতাম। কিন্তু পারলাম না তাই। বহুদিন সজ করেছিলো মালিক আর বহুদিনের অসীল উজ্জী-ইতিহাসপো। কিন্তু আশা অসম্ভব হস্তান একটা কাপ ছুড়ে মেয়েছিলো একটা বখাটে ছোকরাকে। তাই নিরোই গোলমাল। কাজটা গেল তাই। কিন্তু এখন ? হঠাৎ বন্ধুর ছুটো হাত চেপে ধরলো আশা যা দেখছি তাই, শেষ পর্বত হয়তো আত্মহত্যাই করতে হবে।

আশাদের চোখের আড়ালে এদিকে তিথারী মেয়েটা ছেলটিকে সতর্কপে প্রায় জড়িয়ে ধরেছে। খাঁচলটা দ্বিধে সম্পূর্ণ ঢেকে উঠে গাভালো এবার। কিন্তু পা বাড়ানো বাবে, হয়তো চাপে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে বাড়ানোই চীৎকার করে কেঁদে উঠলো ছেলেটা।

চমকে পিছুন ফিরে তাকাল আশা। হাঁসের ছান্য নিয়ে সরে পড়া শিড়ালের মত সতর্কপার সরে পড়ছে তখন তিথারী মেয়েটা। চীৎকার করে উঠলো আশা, বহুনা।

হয়তো বুঝলো পালাবার চেষ্টা বুঝা, গাড়িধে পড়লো বেরিয়ে। দ্রুত পারে এগিয়ে এল আশা। একটানে খুলে ফেলল মেয়েটার অবজর্জন। বহুনা! তুই! টেনে হিঁচড়ে মিল ভেগেছে আশা ওর কোল থেকে। লোক ক্রমতে সজ করেও তখন ওদের বন্ধন করে। ছুটে গিয়ে সামনের ট্রামটার উঠে পড়লো আশা।

আর নজীর রাতে চোরের মতো চুপি পায়ে বাড়ী ফিরলো বহুনা। অসম্ভব একটা অনিশ্চিত আগন্তুক ছেলে ধরা মনে। কিন্তু পরবার সুখেই ডাক পড়লো তার, বহুনা।

বনকে গাড়িরে গেলো বহুনা। ডাকলো আবার আশা, এদিকে আর।

এগিয়ে এলো বহুনা ঘরের ভেতর। মিল তুলে মিল পেছন থেকে আশা। তারপর কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে তীব্রদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাস করলো, কতদিন হয় চলছে এভাবে ?

খীকার করলো বহুনা, হাসখানেক।

—আশ্চর্য্যন্দর্বা।

চুপ করে মাটির দিকে তাকিয়ে গাড়িরে রইলো বহুনা।

—বোঝ কত করে পাস ?

—বড় জোর টাকাখানেক। চোখ না তুলেই জবাব দেয় বহুনা।

—গাড়া। শুকে রেখে কাপড় খুলিয়ে তৈরী করা দ্বিতীয় ঘরে গিয়ে ঢোকে আশা। স্বর শুনে বুঝলো বহুনা, বাবীর সাধে কি যেন আলোচনা করছে। ওরে বাত-পা যেন পেটের ভেতর জড়িয়ে এল বহুনা। ভুল করেছে, ভুল করেছে বহুনা অতটা সাহস দেখিয়ে। অতি লোভের বলে ভ্রমালোকের ছেলে নিয়ে বাবসা করে। তারপর ভাবতে শুরু করলো, কি হলে পারবে সম্ভাব্য শান্তিটা। ঘরে যাবেন নাভো ? যদি পুলিশে যায়।

কাপড় সরিয়ে এখবে এসে ঢুকলো আশা। বীর পায়ে এগিয়ে এল সামনে। সুখের সমস্ত বস্তু যেন ওবে নিরোছে কেউ। বড়বস্ত্রের তলোতে খরটা নামিয়ে এনে বললো, একমাস হয় করছি স ? সত্যিভো ? তবে পনেরটা টাকা দিতে দ্বিধা কাশ। মনে থাকে যেন।

একটু থেবে থেকে আরো চাপা ঘরে বললো, প্রত্যেক মাগেই দিবি, বুজিল।

হরজাটা খুলে ধরলো আশা, বাত। কিন্তু চলার কথটা যেন হারিয়ে কেলেটে বহুনা। পেরেক দিচ্ছে পা ছুটো যেন বেকের সাধে বেঁধে দিয়েছে কেউ, এমন নিমলভাবে গাড়িরে রইল ও।

পাদদেশ বহু

(পূর্বাহরতি)

কণকতা ভাঙ্গু

সেতুর প্রশস্ত চত্বরে আনয়। নিশ্চিত মনে উপবেশন
করুন। সেপথে তখন একটীও লোক ছিল না। অত
শীতের মধ্যে লঙ্কার পরে, গঙ্গার ধারে কেইবা আসবে?
আমাদের অনতিদূরে, দুইজন সাধুবা বা বলে আগামী
কৃত্রিমতার সম্বন্ধে অগোচর করছিলেন। শুধুমাত্র গোটা
আর কখন বাঁদের নহল এইস্থান তাঁদেরই যথোপযুক্ত।
আমাদের যদিও বেশ শীত করছিলো। তবু বলে থাকতে
বেশ ভালো লাগছিল। ঈদ তখন আমাদের মাঝার
উপর এসে গেছে। গঙ্গাতীরের বনমর স্থানগুলি,
অ্যোৎসার বাহার এক বহুতর পরিবেশের সৃষ্টি
করেছিল। দূরে কোথাও কোন সাধুবা বা বঁসে তখন
গাইছিলেন; তার মধুর স্বরের সঙ্গে গঙ্গার বৃহৎ কলনার
বিশে এক বিচিত্র সুরম্যলোকের সৃষ্টি করেছিল সেখানে।
মুক্ত প্রকৃতির অন্তরাত্ম্যের কোন্ এক চরমছাড়া বাউল,
সারামিন নেচে নেচে গান গেতে যেত; পখিক
সেখানেই তাকে হাতছানি দিয়ে ডেকে বলে, “ওরে আর,
তোরা আমার কাছে চলে আর! আমি তোদের গান
শোনাবো। ক্যাপায়া সব চলে আর”—আমরা প্রাণে
প্রাণে অতুল্য করছিলাম অল্প বাউলের সেই মর্ম্মশর্শী
আজ্ঞান।

এমন সময় চন্না পাগড়ী একসঙ্গে অদ্ভুত স্বরে
চিৎকার করে উঠল। চব্বকে উঠে তাদেব শুধাই,
“বাাপার কি?” তারা সম্মুখ পানে অসুখী ইঙ্গিত করে
করে আমাদের দৃষ্টিরে ধরে। সেদিকে তাকিয়ে দেখি
গঙ্গার পশ্চিমপাশের জঙ্গলের মধ্যে থেকে একটি দ্বিরাট-
কার জন্তু বাহির হয়ে আসছে। সে দ্রুত বেগে তরে
আমাদের বুক তাকিয়ে গেল। মেয়েদের নিয়ে ভাঙ্গু
অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। এ-সময় কোন্ দিকে
যাবে? আনয়? সেতুর উত্তর-পশ্চিম ভাগে জৈ

জয়; আর পূর্বদিকে জঙ্গল, পশ্চিমে অবশ্য জনপদ
আছে—তথাপি পশ্চিমদিকেই পাবস্থিত জঙ্গল থেকে
তরঙ্গর জন্তু বাহির হয়েছে, অতএব আমাদের এখন
উপায়? সেতুর ধার নক্ত করে ধরে জড়সেরা হয়ে
আমরা একত্রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে বইলুম—মনে মনে
সকলেই অরল করছি নিঃশব্দে, যদি কোনও ভাবে
বিপদটা কেটে যায়? জন্তু যদি আমাদের দেখতে না
গেয়ে চলে যায়; ইত্যাদি ভাবছি—এমন সময় ভাঙ্গু
বললেন, “ওটা হাতী; তবে বুঝে বা ক্যাপা হাতী হলে
আমাদের আত্ম আর বক্ষা নেই”—হাতীটা তখন
অনেকটা এগিয়ে এসেছে, তবে তার শির গতিভঙ্গী
দেখে তাকে পাগল বলে মনে হোল না—আরোহে,
আম্বক কিছু উৎসাহের রূপার আমাদের দেখতে না
গেলেই হোল। আত্ম আমাদের বাজা রীতিমত অগত
হয়েছিল কানেই পথে বাহা বিপদের আর শেষ নেই।
মেয়েদ্বী তখন ছুঁপিরে কীরতে হুক করে দিচ্ছে।
কাঁপেই বা আমরা কি আর কততে পারি। এমন সময়
দেখা গেল হাতীর পিঠে বাহত রয়েছে; এবং তারা
আমাদের দান দিবে গঙ্গার নেমে গেল। বোকা গেল,
হাতীকে জল খাওয়াতে এনেছে। বাকু তখন সকলের
দেহপ্রাণ সকার হোল। কঠে স্বর হুটল, পায়ে গতি এল;
না আর নয়, এবার কিংবদন্তি হবে। ভাঙ্গু সাহসের
সঙ্গে আলাপ করে জেনে নিলেন, ক্যানাল ভিত্তিসমের
ইলিনিয়ার স্যাহেবের এটা হোল পোবা হাতী।
সাহেবের বাতায়নের অজ হাতী আছে, খোড়া আছে,
বোট আছে, বোটর আছে—বাকী কিছুই নেই। পায়ে
হাঁটতে যোব হয় তাঁকে হয় না—একেই বলে পদমর্যাদা।
আবার আমবা ধরে পানে বাজা হুক করলুম। হাতী
চলে গেল জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তার প্রকৃত বাসোচ্চ

দিকে—আমরা গলা ও জল পক্ষান্তে রেখে গেলাম। এসে পড়ল কনকল রোডে। এখান থেকে বড় রাস্তা ধরে থানিকটা হাঁটলেই বিভূষণ রোড। সেই আশ্রয়ের গন্তব্যস্থল।

কনকল

হরিবার থেকে তিন মাইল দূরে গঙ্গার দক্ষিণ তীরে কনকল। হিমি ভাষার কনকল শব্দের অর্থ হচ্ছে, “কেন ব্যক্তি এমন থল আছে, যার এইখানে এসে স্থিতি হয় না?” কনকল থেকে হেরে “কনকল”। কনকল হরিবারের একটা অতি পুরাতন সহর। হরিবারের চেয়ে কনকলের পথ, ঘাট, দোকান, বাজার, ইত্যাদি বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ বৃত্ত এবং প্রশস্ত ও পরিচ্ছন্ন। নানারূপ দৃশ্য কাক্যাবিধিষ্ট নানাপ্রকার সৌন্দর্য্য ও বেলালভলি প্রাচীন ঐতিহ্যের সাক্ষ্যস্বরূপ অদ্বিতীয় দাঁড়িয়ে আছে। হরিবারের থেকে লোকের বসতিও এখানে বেশী। সহর পুরাতন হলেও বিজ্ঞ নয়। এখানের বায়ু বোম্বাইয়ের পক্ষে খুবই ভালো। এইখানেই সহরের বহিরাগে বিতৃত স্থান সংগ্রহ করে উত্তর প্রদেশ সরকার বায়ুহারা-দের ক্ষত্র বিরাট নগরীর পত্তন করছেন। পথের ধারে বেগুন, রামকৃষ্ণ মিশনের আশ্রম ও চিকিৎসালয়। দুঃখ ও অসহায়দের ক্ষত্র এঁদের দ্বারা লব্ধ। উদ্ভূত। বাড়ীতীর চতুর্দিকে বেটন করে বয়েছে চন্দকায় ফুলের বাগান। শ্রান্তি বিনোদনের উপযুক্ত স্থান বটে।

এখানে দক্ষেশ্বর শিবের মন্দির হোল প্রধান ঐষ্ট্যস্থান। দক্ষেশ্বর শিব অর্ধে ব্রহ্মদেহ, ত্রিভুবনের অধীশ্বর ব্রহ্ম প্রজাপতি। উপবাস বলে তাঁর শিবপ্রাপ্তি ঘটেছে। রাজপথের একবারে প্রজাপতি দক্ষের বিরাট প্রাসাদ। অপরদ্বারে গঙ্গাতীরে শিবমন্দির ও রাজবাট। কবে সে কোম স্তম্ভের আবিষ্কারের কাহিনী, বহুকালের পূর্বাভর্ত্তর ভাঙে আশ্রয় তার কিছু পুস্তকান বস্তু অবশিষ্ট থাকে কি সত্ত্ব ? বা থাকে সে শুষ্ক দুগ্ধ দুগ্ধাঙ্কুরের পথ বাহিত লোকদুঃখ প্রচলিত প্রবাদবাক্য ও উল্লিখিত ইতিহাস ও স্থানবাহ্য। কাজেই রাজবাড়ী বলতে আমরা শুধু

দেখলুম, ইটক প্রাচীর বেষ্টিত বিরাট এক উদ্ভূত প্রাঙ্গণ। তার অধ্যস্থল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রয়েছে অতীতের ভগ্নরূপ। আর চারদিকে স্তম্ভ প্রাঙ্গণের বত দাঁড়িয়ে রয়েছে বিশাল বিশাল বনশ্রুতি সকল। রাজবাড়ী এখন সম্মানসীল ও আশ্রম। মন্দির-বাড়ীর দৃশ্য ও রাজ-বাড়ীরই অনুরূপ। সেইরকমই প্রাচীন, সেইরকমই অধ্যবস্থা। চতুর্দিকে মহাধরীকঙ্কর সমাধেয়।

মন্দিরের মধ্যে শিব, পার্বতী, ও গঙ্গার বিগ্রহস্থিতি আছে। এবং ঘাটে, এক বোড়া খেতপ্রভের নিমিত্ত বিরাটাকার পাছকা আছে। সকলে বলে সেটা দক্ষরাজের পাছকা। গঙ্গাতীরে উক্ত পাছকার মন্দির আছে; এবং নিরমিত ভাবে তার পূজার্তন হয়ে থাকে। সমস্ত দিনমান পাছকানী গঙ্গাতীরে শোভিত থাকে; হুর্ষ অস্ত্র খেলো পর, সেটা মন্দিরে স্থাপন করা হয়।

এখানে গঙ্গার প্রস্থের আদিক) এত বেশী, যে তার এগার ওপার দৃষ্টি গোচর হয়না। সমস্ত হরিবারের ঘূষে গঙ্গার প্রস্থের বিস্তৃতি এইখানেই লব্ধিক। গলা এখানে এত বিশাল ও গভীর বলেই বোধ হয় তার প্তরঙ্গ-স্থর দৃষ্টিবেগে একল উদ্যমতা নেই। তার বিশাল বিস্তৃতি ও গভীর কলনারেই মধ্যে একটা রামোচিত গ্যাতীরের ভাব স্পষ্ট বিস্তমান। দক্ষরাজের ঘাট বলেই বোধ হয় এইখানে গঙ্গার ব্রহ্ম সম্রাজীর বসত। এবং প্রকৃতি দেবী গঙ্গাকে এই বিশেষত্ব দান করেছেন নিশ্চই সঙ্গার অবিপত্তি, প্রজাপতি দক্ষকে রামোচিত সম্মান প্রদর্শনের নিমিত্ত।

এর অনতিদূরে সতীঘাট, অথবা সতীস্থূত। এই স্থানে একলা শিবের শিবানী, ও দক্ষ দুহিতা, সতী পিতৃকটে পতিনিলা প্রবেশে অসমর্থ হয়ে দেহত্যাগ করেন। এখানের কোনও বস্তুতে কোনও রাজনৈতিকতা চিহ্ন বিস্তমান নেই। এই মহাদেশবাসের পটভূমিকার, অলঙ্কারে বিরাটমান ভারতবর্ষের অতীত ঐতিহ্যের একটা পৌরবহর অধ্যায়। তাই এ আশ্রমগামী সব মানবের

কাছে মহামিলন ভীর্ণরূপে পরিগণিত হয়েছে। দুই দুইদিক হতে অসংখ্য বাতী। বর্ষভের নিবিশেষে পাশাপাশি এসে অব্যাহত হচ্ছে এই মহাভীর্ণের চরণ প্রান্তে। বৃষ্টির স্রোত হয়েছে, পূর্ণা বৃষ্টি বাসর।

সত্যিকৃতক একটা প্রাচীন উপবনের সঙ্গে তুলনা করা চলে। চতুর্দিকে নিবিড় বনজঙ্গল। তাইতে কপোতগণের নানা জাতীয় মূল ও ফল। কত রকমের বৈষ্ণব মন্দির পাখী এখানে আছে, কে তার হিসাব রাখে? পাচের ভালে ভালে তারা রংএর বাহার মূলে বেড়ে বেড়াচ্ছে। কেউ বা পাতার আড়ালে, লুকিয়ে থেকে মধুর স্বরে শিখ দিচ্ছে, অথবা কুমন করছে। কেউ বা কলহর করতে করতে দল বেঁধে আকাশ পথে উড়ে যাচ্ছে—এটা বেন পাখীদের স্বাধীন রাজ্য। সেই পাখীর গানে আর তরঙ্গায়িত যেহে শান্ত উপবনটির মহাপ্রাণ, একটা মন্দির আছে, এবং তৎসংলগ্ন সন্ন্যাসী ও পুণ্ডরীকের অবস্থানের স্বত্ব কুটীরাদি আছে। মন্দির অর্বেতু একধারি পাক। তার অভ্যন্তরে শিল্প চর্চিতা রক্তবসনা, আডম্বর বঙ্কিতা সভ্যতার মূর্তি। একবা এইখানে সৃষ্টির কোন্ আদি কালে, এক মহা-মানবী, অশ্রু আশ্রয়ভাগ, ও আদর্শ স্থানের মধ্যে দিয়ে মহাকালের অশ্রু পটভূমিকার রূপায়িত হলেন, মহাশেখী রূপে। ভারতবর্ষের দেহের প্রতি অশ্রুসংস্পৃহিত সেই পুত্ৰ বোধিত-বারা আশ্রিত এবং প্রতিষ্ঠা।

আনন্দের মন্দিরে প্রাণন করে ফিরে এলুম।

সত্যিবাট থেকে কিছুদূর গিয়ে কালকী নামক স্থানে আর্গ-নাকীঘের শুকনুল বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থিত। এর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন প্রচেষ্টার স্বামী প্রদ্যোমন্। এবং প্রাণ-প্রবেশ ঘরের নাম স্বামী প্রদ্যোমন্ প্রবেশ ঘর। ১৫ পনের নীর্বদেমে উক্ত সন্ন্যাসীর স্মরণে তৈলচিত্র স্থাপিত আছে। এই প্রতিষ্ঠানটি দেখে, আবার কানীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ে গেল। এটা ঠিক তারই অনুরূপ পরিচালনার গঠিত হয়েছে। কিছু

কানীতে আধুনিক প্রচার শিক্ষা দানের রীতি প্রচলিত। আর এখানে সেই প্রাচীন আর্গ-নাকীঘের সাংস্কৃতিক দ্বারা বাহক ভাবে, শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রচলিত। ইহা তির এই দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে বিশেষ কোনও ভারতম্য নেই বলে মনে হয়। তবে কানী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রচারব্যবস্থা ও ছাত্রের সংখ্যা শুকনুলের অপেক্ষা দ্বিগুণ অধিক। এবং মূল ভবনের আরও অনেক বোম্ব হর কিছু বড়।

শুকনুল বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দী, সংস্কৃত ও ইংরেজী, এই তিনটি ভাষায় মাধ্যমে ছাত্রদিগকে শিক্ষা দান করা হয়। শিক্ষার তিনটি বিভাগ আছে, যথা—বেদ, বিজ্ঞা, (কলা) ও শাস্ত্রবেদ। এই বিভাগতৎসংলগ্ন প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র, সুবৃহৎ ও সুচারু পরিচালনার গঠিত হয়েছে। বিজ্ঞা মন্দিরে ছাত্রেরা বসন্তবে, বিশ্ববিদ্যালয় অধুনাবিত অর্থকরী বিজ্ঞা অর্থন করে থাকে। বেদ মন্দিরে, মূল কলেজের ছাত্রগণের ক্ষত্র স্বতন্ত্র কালের ব্যবস্থা আছে।

বেদ মহাবিদ্যালয়, অর্থাৎ কলা ভবনে ছাত্রদিগকে, বেদ ভারতীয় দর্শন, সংস্কৃতগ্রন্থভাষা এবং তার সঙ্গে ইংরেজী, ইতিহাস, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, সাম্রাজ্য দর্শন প্রভৃতি শিক্ষা দান করা হয়ে থাকে। এইভাবে শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্য হোল এই যে, একসঙ্গে উহার পুষ্টিভাষী দ্বারা ধর্মের তুলনামূলক অধ্যয়ন করা, ও হিন্দী সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হওয়া। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাক্ষাত্যের উভয় প্রভাব, মনের ক্ষেত্রে উন্নয়ন করে তোলা। প্রত্যেক ছাত্রকে নিজ নিজ বাস্তবতার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। এই কলা ভবন, অর্থাৎ Art College এর পাঠ শাখা করতে দীর্ঘ ৬০টি বৎসরকাল পর লাগে। এবং পাঠ্যার্থী ছাত্রদের বিদ্যালয়কার উপস্থিত জীবিত করা হয়ে থাকে।

শুকনুল বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বত্র ভবন প্রাকার গুলির মধ্যে, এই বিভাগতৎসংলগ্নই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। এর গগন মুখী সৌবহুতার গানে পুষ্পিত করলে, মনে অস্ত্র উদিত হয়,

এর প্রতিষ্ঠাতার উক্ত ভ্রমর ও মহামূল্যবতার কথা। শিক্ষাই হল জাতির বেরনকু; (দেশকে সমৃদ্ধশালী) করতে হলে, জাতীয় চরিত্র গঠন সর্বাত্মে প্রয়োজন। শিক্ষা এবং জ্ঞান ব্যতীত, কোনও জাতির গৌরবময় জীবনের অধ্যায় স্থচিত হতে পারে না। সেই শিক্ষা প্রাণালী, কোনও জাতি বা ধর্ম বিশেষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হলে দুকূলেই তা বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা অধিক। শিক্ষা যাদুঘরের দৃষ্টিভঙ্গীকে উদ্বার করে, তাহাতে অন্ধৃত জ্ঞান, যাদুঘরের অন্তর্ভুক্তি ও আত্মার উন্নতি বিধান করে। কাজেই যে শিক্ষা, সর্বকালের, সর্বদেশের, সর্বজাতির, জীবন ধারার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিতরিত হয় : সেই হোল আদর্শ শিক্ষা। • সেই শিক্ষার ধারাই উন্নত জাতীয় চরিত্র গঠনের একমাত্র সাহায্যক। স্বামী প্রভানন্দ পরাবীন জাতির শিক্ষাবিহীন, এই নিরাক্রম অন্তর্বেদনার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই, বহুদেশবাসীরা শিক্ষারীণতা বিদ্রূণ করে এবং প্রাচীন ভারতবর্ষের বিরাট, ঐতিহ্যের ধারার জাতিতে সজীবিত করার উদ্দেশ্যে হিমালয়ের পাদদেশে, গজার তীরে এই গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা করেন।

এই সুপ্রশস্ত ভবনটির অভ্যন্তরে ছাত্রদের অধ্যয়নের নিমিত্ত বহু কক্ষ আছে, এবং একটি সুবৃহৎ বিশ্ব সাহিত্য সংগ্রহ-শালা আছে।

মধ্যরাত্রে বিরাট হলঘরটির নীর্ঘদেশে, অর্ধ সফটিক পুনঃ প্রবেশক, স্বর্ষি ধরানন্দ সরস্বতী, স্বামী প্রভানন্দ ও মহাত্মা গান্ধীর তৈলচিত্র সজ্জিত আছে। এই তৈলচিত্রের পানে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয়, অপা-ধিস অগস্তে অবস্থান করণ এই মহাপুরুষের আত্মরিক নির্ভা, পবিত্রতা, শুভ প্রেরণা, ও অগাধ প্রেম দ্বারা ভারতীয় আধুনিকতাকে রক্ষা করছেন। অলক্ষ্য আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে তার আত্ম বুদ্ধি করছেন।

এর পর আমরা দেখলুম, আবুর্বেদ মহাবিদ্যালয়। এই কলেজে প্রবেশ কালে ছাত্রদের মূদ্র পক্ষে ব্যাটিক পান, হওয়া চাই; এবং কিছু সংরক্ত জ্ঞান থাকে চাই।

চরক শুল্কভাদি প্রাচীন শাস্ত্রের সঙ্গে নবীন পদ্ধতি অঙ্গুলারে সংলগ্ন, রক্ত বুজাদি পরীক্ষা, শল্য ক্রিয়া বা Surgery বিজ্ঞান ছাত্রদের ওখানে অভ্যাস করানো হয়। আবুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে শল্যক্রিয়া ভবনে ছাত্ররা প্রতিদিন নিরনিতভাবে বিচারচর্চা করে থাকে। সেবাশ্রম এই বিভাগেরই একটি বৃহৎ শাখা। এখানে বিশ জন রোগীর শল্য আছে। কানপুরের প্রসিদ্ধ দানবীর শেঠ ভ্রাতৃ, পদমণ্ডল সিংহানিরা একটি উত্তম এক্সরে যন্ত্র এই প্রতিষ্ঠানকে দান করেছেন। তাহাতে উক্ত কঠোরকর রোগ নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হয়েছে। আবুর্বেদ মহাবিদ্যালয়ের পরীক্ষা উত্তীর্ণ ছাত্রদের আবুর্বেদশাস্ত্রের উপাধি দানে ভূষিত করা হয়।

এবার দেখলুম বেদ ভবন।—

এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের শাখাটিকেই আমার সব চেয়ে বেশী ভালো লাগল। ভারতের প্রসিদ্ধ দানবীর, শেঠ হুগোল কিশোর বিজলার দানে এই ভবনটি নির্মিত হয়েছে। এবং তাঁর ইচ্ছামুতাবে, শুদ্ধ ভারতীয় আদর্শে প্রাচীন বেদ শাস্ত্র, ও সাহিত্যের অমূল্যপন ও অমূল্যভানের স্মৃতি, মানব সমাজে বহুল প্রচারের জন্য এই বিভাগটি খোলা হয়েছে।

এই বেদ ভবনের মধ্যস্থলে একটি ৫০ × ৭৫ বর্গ ফুট সুবৃহৎ হলঘর আছে। তার সমুদ্র ভাগে অধ্যাপকের উপবেশনের অত্র একটি সুদৃষ্ট বৌদ্ধি নির্মিত আছে। এবং মুক্তিকার ছাত্রদের উপবেশনের অত্র সুন্দর সুন্দর গ্যালাচি বিভাগে আছে। এই কক্ষের চতুর্দিকে এবং ছিদলের বাহ্যিক চতুর্দিকে বিশিষ্ট অতিথি বর্ণের অত্র, প্রস্তরাসন নির্মিত আছে।

অধ্যাপকের সারনের ঠিক নীর্ঘদেশে, ভারতের তিন মহাপুরুষের সুন্দর তৈলচিত্র অঙ্কিত আছে। একধারে মহর্ষি বাজ্যবল্ড তাঁর অনন্ত জ্ঞান ভাণ্ডার হতে অগণিত নিদ্রাক্ষকে উপবেশ বিতরণ করেছেন; মহাবল্লভ স্বামী প্রভানন্দ শুদ্ধি মহাবল্লভে তত্তী প্রাচীন। অপর ধারে

বহান্নি নহু, তিনিও মহৎ উপদেশ দানে শিক্বে
অন্তরেব জানের পিপাসা নিবারণ করেছেন।

তবনের সনত্ত প্রাচীনগণকে বোধিত আছে, প্রাচীন
যুগের বহান্নি অধিবেশ তৈলচিত্র। যথা—বেদব্যাস,
জনক, কপিল মুনি, ভরদ্বাজ ব্রাহ্মণিক, প্রকৃতি। উক্ত
চিত্রে নীচে দেবনাগরী হরকে স্মৃতিত আছে, ব্রহ্মাচর্যাক
বৈশিষ্ট্য, উপনিষদ, কঠোপনিষদ, কেন উপনিষদ
প্রকৃতি প্রাচীন মহাপ্রজ্ঞ হতে উদ্ভূত, প্রধান প্রধান
মোকের ক্রিয়াদেশ। যিত্তসের ব্যাক্যার চতুর্দিকে, বড়
বড় আলনারীতে সঙ্ঘিত আছে, বহু প্রাচীন গ্রন্থমালা
ও প্রাচীন ভারতীয় ভাষাবৈজ্ঞানিক। অধুনা ছাত্রদের হস্ত অধিত
তৈলচিত্র ও স্মারক স্মৃতি। এর মধ্যে বৃহৎ, বিষ্ণু, নটরাজ,
বাল্মীকী, বহাদ্রা গাভী, ও ভাষ্করমূল, প্রকৃতি ভাষ্কর
ও চিত্রশিল্পের মধ্যে দ্বিগুণ, ভারতীয় চাকর্যার স্বকীয়
বৈশিষ্ট্য স্মরণরূপে পরিদ্রুত করেছে। কয়েকটি প্রাচীন
নৃত্যের ক্ষেত্রাভ্যন্তরেও সন্নিবেশিত হয়েছে। এক কথার
এটিকে একটি ভারতীয় উত্তম, প্রজ্ঞ ও চিত্রশালা দানে
অতিহিত করা যায়।—

এই তবনে ভারতীয় প্রাচীন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত
ছাত্রদের কাছে, স্তম্ভ বেদ, ও পবিত্র অধিবেশের ব্যাখ্যান
ও বিশ্লেষণ করা হয়। শাস্ত্রাত্মক সত্যতার উচ্চাশ্রোতে
আর্থ সত্যতার কীর্ণ দ্বারা বেখানে অপর্যায়মান, সেখানে
সেই আর্থাবেশে, অপর্যায়মান আর্থ সত্যতার পুনরুচ্চারণের
সম্ভাবনা, যে ভেদোন্নতির পুনরুচ্চারণের অধরে আগ্রহিত
হয়েছিল, সেই পুণ্যপ্রাণ, স্বাধীনতা সত্ত্ববতী ও স্বাধীন প্রজ্ঞা-
নন্দের উদ্দেশ্য, মন আপন হতে প্রকাশ আনুত হয়ে
উঠল। অতি সত্য কথা, যে, জাতির নিজ ইতিহাস
সম্বন্ধে কোনও দায়িত্ব নেই, উপরন্তু বিদেশী বসিত
ইতিহাসে, তাদের জ্ঞানোন্মেষ হয়, তাদের মধ্যে ভারতীয়
বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে আগ্রহ চৈতন্য। বোধ অমাবে কোন
উপারে? আপন দেশ সম্বন্ধে উচ্চ দায়িত্ব মনে গোষণ
করার প্রেরণা পাবে সে কোথা হতে? কাজেই সহজেই
সে আকর্ষিত হয়, বিদেশী সত্যতার আকর্ষণে। সৎ অসৎ

বিচারের সমতা, বিস্মৃত হয়ে, অন্ধ অনুকরণের বশবতী
হয়ে অত্যন্তের দ্বারা পরিপূর্ণ হয়, এক অন্ধৃত চরিত্রের
স্বীকারী রূপে। ভারতীয়দের মনে এই বিস্মৃত কৃতি
বোধের বিচার সম্ভব হয়েছে একমাত্র তার স্বীয়ভাষা
পর্যায়সমতার বহু বিস্মৃত পথের সাধাযো। অন্ধকরণ
সে সকল ক্ষেত্রে নিশ্চালী এমন নয়। তবে, স্বকীয়
বৈশিষ্ট্য বর্জন ও বিস্মৃত হওয়া, ভারতীয় জীবনে কখনও
স্বতন্ত্র প্রদর্শন করে না।

— আর্থাবেশ হতে আমাদের উৎপত্তি, কাজেই
আর্থ-সত্যতা রক্ষা ও পালন করা; আমাদের একান্ত
উচিত।

বেদতবনে মধ্য ঈড়িয়ে, প্রাচীন ভারতবর্ষের এক
চিত্র নৃত্য রূপ চোখের সম্মুখে উন্মলিত হয়ে ফুটে
উঠলো। মনে হোল আমাদের ঈড়িয়ে আছি প্রাচীন
কোনও অধি আশ্রমে। কিসের পেছি যেন সেই যুগে, যে
যুগে নারী পুরুষের মধ্যে কোনও ভেদ বৈষম্য ছিল না।
পুরুষের পাশে বসে, নারীও আপন প্রতিভার প্রদীপ্ত,
যেদের স্বত্ব রচনা করেছেন। যে যুগে পুরুষের সম-
অধিকার লাভের জন্য নারীকে উচ্চতর কোলাহল করতে
হয়নি; যে যুগে বড় বড় পণ্ডিত সত্য, নারীও লাভ
করতো, পুরুষের পাশে বীর আসন; এবং বড়
পণ্ডিতদের ও তরুণ পরাক্রম করার বড় তীক্ষ্ণ বেদা, ও
বুদ্ধি বানের ছিল, অপরিসের। যে যুগে নারী পুরুষের
এই সমঅধিকারকে স্মরণরূপে রাখার জন্য প্রেরণিত
হয়নি অস্মরণরূপের। প্রকৃতবে অধ্যাপকের মধ্যে
দ্বিগুণ, দ্বারা রক্ষা করতে সমর্থের সমতা। অন্তরের
আন্তরিক শক্তিতে তাদের স্বয়ং বুদ্ধি থাকতো সর্বদা
সংযত ও সুপবিত্র। কিংবা শতাব্দীর সান্নিধ্য সমনী
আদি; আমরা রক্তে শিহরণ আগিরে তুললো
সেই বৈদিক যুগের অসামান্য নারী সমাজের অন্ধৃত
হাতছানি।

বেদ-তবনে থেকে প্রসঙ্গ হয়ে আমরা গঙ্গাতীরে
গেলুম। গঙ্গার দ্বারা এখানে অত্যন্ত সীর্ণ। বাহানে

যাটী ভাৱী হুম্বৰ। এখানেও প্রত্যহ ছাত্রেরা পথার
প্র্যাক্শান করে। আয়ুৰ্বেদ মহাবিদ্যালয়ের সেখান্নমেদ
(Hospital) প্রাঙ্গণে ভাৱী হুম্বৰ ফুলের সমারোহ।
বড় বড় ডালিমা, চম্ভন্নলিকা, নানাবর্ণের গোলাপ, আরও
কত বে ফুল, কত রং, কত বকবের পাতা খিট্ট গছ,
একত্রে বনকে চকল করে তুলতে লাগল, তার দেখে নেই।
ঐহুজ ডাড়ুডী করেকটি হুম্বৰ গোলাপ ফুলে এনে
আমাদের ধিলেন। যদিও সেখানে ফুল তোলা নিয়ম
নিষিদ্ধ ছিল। এমন সময়ে করেকটি কিশোর ছাত্র
কোথা থেকে এসে আমাদের অনেক ফুল ফুলে দিল।
কিশোরকটীর মুখপানে চেয়ে আমার মনে হোল, তারের
মনগুলিও এই ফুলেরই বড় পথিক, হুম্বৰ ও গছনয়।
ভানা হলে তারা এমন অসহনভাবে আমাদের এত
ফুল এনে দেবে কেন? আরও তারের সঙ্গে অনেক
গল্প করলুম। বাবার সময় বন্ধু হেসে যুক্তকর লগাট-
শ্পর্শ করে নমস্কে বলে তারা চলে গেল। আমার এবার
আবাস ভবনগুলির প্রান্তে গেলুম। এখানে একটি বিষয়
লক্ষ্য করার মত, সেটা হচ্ছে এই যে, বিদেশী দেশে
এরা অন্যতর আগ্রহের সঙ্গে তারের দলল প্রেণের উত্তর-
দান করে ও অন্তরের কোঁফুল নিষাক্ষণে ভক্ত সর্বকমে
সহযোগিতা করে।

এই প্রান্তে এসে প্রথমে দেখলুম গুৰুফুল বিশ্ববিদ্যা-
লয়ের বিরাট কাথালয়। তার অনতিদূরে স্তম্ভর প্রাঙ্গণ
অধিকার করে পর পর রয়েছে অধ্যাপকদের, ছাত্রদের,
কর্মচারীদের নানারকবের বস্ত্র মস্ত আবাস ভবন। এই
বিশ্রামাগারের বহু দূরে আছে আশ্রমের গোশালা।
গোশালার নিকট পাদিভাণ্ডার। সেখানে গুৰুফুলের নিজস্ব
বাধি প্রকৃত হয়। তার অপর প্রান্তে ব্যারামাগার।
চতুর্দিকে খেলার মাঠ অনেক আছে। ছাত্রেরা সেখানে
ব্যাডমিন্টন, টেনিস, ফুটবল প্রকৃতি খেলছে। ব্যারামা-
গারে কিছুসংখ্যক ছাত্র শরীর চর্চা করছে। গুৰুফুলের
আদর্শ শুধু বিভাশিকা নয়। শরীর, মন ও আত্মার
বিকাশ সাধন এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই ভক্ত খেলা,

ব্যায়াম, স্রবণ, পাঠে হেঁটে পর্বত অভিযাত্র প্রকৃতি
ছাত্রদের নিরবিচ্ছিন্ন অধ্যয়ন করতে হয়। এদের নিজস্ব
ফুটবল ও হকীর টিম আছে। বারা দেশ দেশান্তরে
গিয়ে বড় বড় দলের সঙ্গে খেলে বিজয়ী হয়ে ফিরে
আসে।

বিশ্রাম-ভবন এলাকার পশ্চাৎভাগের উজ্জ্বল
প্রাঙ্গণটি ভাৱী মনোরম। এর চতুর্দিকের ইউক্যালিপ-
টালের বন মন। স্মৃতির্ষ, লবল, সন্তোজ বৃক্ষগুলি উন্নত-
শিখের বন সন্নিবদ্ধ হয়ে বস্তায়মান। দুইবেল যেত বৃক্ষ-
বন্ধনের গায়ে লুইজ, চিকণ পত্র-পত্রবের ঝাপর কটি
হোলন ভাৱী হুম্বৰ। কিছুকণের মধ্যেই ইউক্যালিপ-
টাল বনের মাথার উঠল ঠাণ্ড। ভবন ছিল মেনী দক্ষ।
পাথরীয়া জ্যোৎস্নার মায়কতা বেকি বস্ত্র তা ভাষার
প্রকাশ করার ক্ষমতা কোনও মানুষের নেই, কোনও কবির
নেই, কোন শিল্পীরও নেই। একমাত্র ছব্বরের পতীর
জ্বরের অমূল্যুতির মধ্যেই এর উপলব্ধির সার্থকতা ও
ম্যাপকতা সন্নিহিত রয়েছে। সেই স্বর্গীয় জ্যোৎস্না-
ভাষার রূপালী ভরজে ইউক্যালিপটালের চিকণ পাতা-
গুলি বনন বৃক্ষ আঁকোশিত হতে লাগল পরন্তর বেলা-
শেখের মধুর বাতাসে আর তাইতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে
পড়ল ইউক্যালিপটালের তীক্ষ্ণ মধুর গন্ধ তখন মনে হোল
আমরা যেন কোনও স্বপ্নমাত্রা এসে উপস্থিত হয়েছি।
আশ্চর্য এ সৌন্দর্যের তুলনা সেলা করিন। এই সৌন্দর্যকে
স্বপ্নম-মণ্ডিত করেছে হিমালয়ের অপার পাশ্চীর্ষ। যেন
হিমালয় পদম স্নেহে বকে ধরে আছেন তাঁর প্রিয়ভবা
প্রকৃতিরাষ্ট্রির অকণের একটি প্রাণ। তাই এই জ্যোৎস্না
অবগাহিত ইউক্যালিপটাল কূলে বহিভাগে রূপের উজ্জল
মায়কতা পরিণমিত হলেও, এর অভ্যন্তরভাগে প্রচ্ছন্ন
রয়েছে এক মহান গাষ্ঠীর্ষ। এই কূলের শাখা-পত্র
মুগ্ধরূপে ধ্বনিত হয়ে ওঠে যেন অধি-বালকদের কর্তৃ-
নিষ্পত্ত শাস্ত্র মধুর বেদ ময়। এই অপাধি শাস্ত্র-মধুর
গাষ্ঠীর্ষ পর্বতগুহ হিমালয়ের অকণ বান।

যদি এমনিভাবেই ভেদে বার অকণ্য। ভেদে

বার মাহুদের হরিণিয়ানী মাঝার বেয়া মনের অবোধ
 ত্যাগিনী। আর অবসর নেই বাড়ী ফিরতে হবে।
 তারী ইচ্ছে হোল, আর একটু এখানে থেকে এই ইউ-
 ক্যালিণটাস বনের কাছ থেকে এমন কিছু পাঠ নিয়ে
 যাই, বার সন্ধ্যা আমার মনের বণিকোঠার অক্ষর হয়ে
 থাকবে। কিন্তু তা হবার নয়; আরও অনেক পথ বেতে
 হবে কালেই।—“সময় হেরতে নিকটে এবার বাঘন
 ছিঁড়িতে হবে।” ঐহুজ তাহুড়ী আমাদের অনেক
 ইউক্যালিণটাসের পাখা পেড়ে গিলেন। গাইডও
 পেড়ে দিল কিছু। সন্ধ্যার নেশার মত হয়ে গাড়ীতে
 উঠে বসলুম।

শুককুল বিশ্ববিদ্যালয় দেখা আমাদের শেষ হোল।
 গত ১৯২৬ গুটাকে দয়ানন্দ সরস্বতীর ভাবধারার
 অগ্রপ্রাণিত, স্বামী প্রদ্বানন্দের অক্লান্ত চেষ্টায়, অদ্বৈত
 অব্যবসারে, অনন্তকরীর পরিকল্পনার, দানবীর বৃদ্ধী চমন
 সিংহীর অক্লপন হতে প্রচুর অর্থ ও ভূমি দানের সাহায্যে
 এবং অসাধারণ বিদ্যান আচার্য রাহেমতীর অক্লপ
 সচাযোগ্যতার যতন শুককুল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা
 হোল কাংরী গ্রামে তখন থেকে তাহুড়ীর মনে দুনিবার
 পূজা লাগত ছিল, এই প্রতিষ্ঠানটি দেখার ক্ষমতা। একটা
 বচ পুস্তান বাসনার অবলান হোল ভেবে মনে মনে
 বেশ আনন্দ হোল।

কোর সময় প্রদ্বানন্দ হারে নেমে ভিক্টোরিয়ান বৃকে
 তাহুড়ী আমাদের নাম ধান পিঁবে দিয়ে এলেন। উক্ত হার
 পথের নিকটেই ছিল, আহুর্বেদী ল্যাবোরেটরী। লেখান
 থেকে কিছু ওষু ও চষি কিনে নিয়ে আমরা প্রদ্বান সরে
 স্বামী প্রদ্বানন্দকে শরণ করে শুককুলের কাছ থেকে
 বিদায় নিলুম। পথে নেমে আমার মনে হোল, এই
 রম্য দৌরধারের অন্তরালে রয়ে গেল, কয়েকটা জ্বল
 চাপিতব্য বৃণ কিশোর বালক; বারা আমাদের এনে
 দিয়েছিল শুষ্ক শুষ্ক গোলাপ ফুল। মেহের দানের
 একটা নিজস্ব বৃণ আছে বলে আমি মনে করি। এই
 যে দানবরূপ পুষ্পশুষ্কর্তি, এর আহু অতি অর; কিন্তু

যে অপাপিণি ঘেহ এই পুষ্পের মধ্যে বিহের আমাদের
 মনকে স্পর্শ করেছে, স্বর কোমল দিন সেই মধুর স্নেহ-
 স্মৃতি বিস্তৃত হবে না। আরও মনে হোল, এইরকম
 শুককুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মত যদি একটা অন্তরূপ আদর্শ
 নারী প্রতিষ্ঠান থাকতো এমনে তাহলে হয়তো ভারতীয়
 মেয়েদের অল্প কিছুকাল বিল আটন প্রায়নের কোনও
 প্রয়োজনই হোত না। পরে তখনেইলুম যেহাযুনে একটা
 কল্যাণ মহাবিদ্যালয় নামে নারী শিক্ষা মন্দির আছে।
 যদিও সেহাযুনে আমরা গিয়েছি, শুধাণি স্থান নির্দিষ্ট
 না থাকার বদল উক্ত প্রতিষ্ঠান দেখবার যৌতোগ্য
 আমাদের হয়নি।

কবিকুল আশ্রম দেখবার অল্প এবার আমরা নারী
 পুরীর দিকে অগ্রসর হলুম। এই মাহাপুরী, হরিধারের
 প্রাচীন বাসভূমি ও লহর। প্রাচীন হরিধারের নামও
 ছিল মাহাপুরী। মাহাপুরী রোড নামে রাজ্যাতী মন্দির
 দোকা মাহাপুরপুর হয়ে দিল্লী চলে গেছে। আর উত্তরে
 হরিধার ও কবিকুল অতিক্রম করে লভন কোলার
 প্রান্তে গিয়ে গলা পাহাড় ও বনাতের সীমার শেষ হয়ে
 গেছে। এই রাজ্যাতী বৈধ, প্র ও পরিষ্কৃত্যর অতি
 রমণীয়। পশের ছই প্রান্তে সারি সারি দাড়িয়ে আছে
 চাচাঙ্গিত, অগণিত বড় বড় পাহাড়পাথর। মাঝার উপর
 আকান-আলোর বৃক্ষশায়া, তার নীচে বৃক্ষশবের হারা-
 ক্ষত; আর পারের নীচে পীচালা, কৃষ্ণবর্ণ মৃৎ পথ।
 এই পথে অনন্তকাল ধরে পদক্ষেপ করলেও বোধ হয়
 গেহে অবধা মনে কোনও ক্লান্তি ও ক্লেশের উদ্ভব
 হয় না।

এখানে রাজ্যার উপর মাইল ব্যাপী স্থান অধিকার
 করে, সনাতন পন্থীদের স্বামী প্রতিষ্ঠিত ও পরিশ্রুতি
 কবিকুল আশ্রম ও মহাবিদ্যালয় অবস্থিত। এই বিভাগের
 সনাতন ধর্মের পূর্ব প্রচলিত দারা অহুধারী ছাত্রদের খেদ
 বেদান্ত প্রাচীন শাস্ত্র শিক্ষা এবং সন্তত ও হিন্দী ভাষার
 মাধ্যমে তাদের প্রাণমিক ও মাধ্যমিক বিজ্ঞা শিক্ষা দান
 করা হয়। কবিকুল মহাবিদ্যালয়ের সর্বশেষ পত্রীকার

উত্তীর্ণ হইয়াছেন মতো অবিকাংশই এই প্রতিষ্ঠানের আত্মবৈবিক্যে সনাতন প্রার্থার চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে প্রবেশ করে। এই প্রতিষ্ঠানটীও আরও অনেক ব্রহ্ম এবং মনস্কলিকারী দ্বন্দ্ব মধুর। তবে এর অভ্যন্তরীণে এমন কোনও উচ্চারণ নেই, যা জগৎকে স্পর্শ করতে পারে। আমরা যখন সেখানে উপস্থিত হই, তখন সত্য। উত্তীর্ণ হওয়ার দক্ষ প্রবেশ-পথের লৌহদ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আমাদের মধ্যে দ্বারী সন্তোষে প্রবেশ পথ মুক্ত করে দিল। এবং আমাদের আশ্বাস করে তিতরে নিয়ে গেল। সুরকীচাল্য, স্পষ্ট প্রাণ অতিক্রম করে আমরা পাত্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করি। এই প্রাণের দুইপার্শ্বে ক্রম বীজিকা, কুল কলের ও স্তম্ভী প্রাণত ক্ষেত্র এবং গোশালা প্রকৃতি আছে। পাত্রের পশ্চাত্তাপে গঙ্গাতীরে চাত্রের সুরব্রহ্ম বেগাদ্বার প্রাণ আছে। এখানেও চাত্রের প্রত্যহ দুই উত্তরের পূর্বে গঙ্গারান ও গঙ্গারী ভাষা করে।

আমাদের প্রাণ বাত্রার অবসান হোল, পাত্রের পবিত্র বজ্রশালায় সন্নিবেশ। বজ্রকূবির অধিকৃত, তখন সত্য বন্ধনা, ও আহুতি পর্ব শেষ হয়েছে। উপাসনায় বড় চাত্রের কুশাসন হতে ভোজনশালায় দিকে থাকে। ছোট চাত্রের তখন পূর্ণাঙ্গারে প্রবেশ করেছে। আমাদের মধ্যে চাত্রবাসের অধ্যক্ষ মহাশয় সহজে অভ্যর্থনা করে চুষের সঙ্গে আনিলেন যে, সত্য। উত্তীর্ণ হওয়ার দক্ষ এখন পাত্রের সনত শাখা বন্ধ হয়ে গেছে। কাজেই তিনি আমাদের কিছুই দেখাতে পারেন না। তথাপি তাঁর অতি গর্বের বিশ্রামত বালক চাত্রের একবার দেখে বাবার অস্ত্র তিনি অহরোধ করলেন। আমরা তাঁর সঙ্গে বালকদের বিশ্রাম ভবনে উপনীত হয়ে দেখি, একেবারে সব বাজা বাজা। সেখানে নিজ নিজ শস্যের সনত করে বই দেখে গঙ্গার স্তোত্র ব্রহ্ম করছে। শুভ্রীরা আসেয়ে তারা, সনতাত উঠে দাঁড়িয়ে, আমাদের অতিবাসন জানিয়ে, উচ্চকণ্ঠে সনতয়ে গঙ্গা স্তোত্র আবৃত্তি করতে লাগল। চতুর্দিকে

শিউল পড়ল। কোথাও কোনও কাগজ জীবনের কলরব শোনা যায় না। শুধু শোনা যায়, পাত্রের শ্রীমন্ত্র ধৌতকারী গঙ্গার কলকল হুগুগু উচ্চল কলতান।

তার সঙ্গে শিউলকণ্ঠের আবগম্য কর্তব্য বিশেষ চতুর্দিকে ভেসে বেড়াচ্ছিল এক অকৃত সন্তোষ বুদ্ধি। আমাদের বেশ ভালো লাগল আবৃত্তি-শেষে বালকদের অনেক বকন উৎসাহ দিয়ে আমরা সে ভবন হতে নিষ্কাশ হয়ে এলাম। বিদায় কালে, অধ্যক্ষ মহাশয় অনেক গল্প করলেন; তার মধ্যেও লেখক, বাগানীর নাম তিনি বেশ গর্বের সঙ্গে উচ্চারণ করলেন। বধ্য ভাঁদের এই বিভ্রান্তি থেকে কবে কোন্ বাগানী চাত্র সন্ধান পত্রীকার উত্তীর্ণ হয়ে বেড়িয়ে গেছে, তাদের নাম মুখস্থ বলে গেলেন। সনাতন পত্রীকা যে আর্থ সন্ধানীদের অলঙ্কার সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণে চাত্রের শিক্ষা দান ও চরিত্র গঠন কার্যে ব্রতী ও উত্তমগী এই সত্যটী তিনি অতি উত্তমরূপে আমাদের বুঝিয়ে দিলেন। এখানে সবই ভালো, তবে সেখানে ধর্ম পাশের নামে শুধু সংস্কারকে সন্ধান করতে শিক্ষা দেওয়া হয়, এবং পবিত্র চরিত্র গঠনের নামে অসংখ্য বিধি নিষেধের সীমাবদ্ধতার আত্মা ও চিত্তের সহজ বিকাশের পথকে অবরুদ্ধ করা হয়; সে ধর্মচারণের মধ্যে বাহ্যিক নিয়মনিষ্ঠা বড়ই থাকে, অন্তরের উৎকর্ষ সাধন তাতে কিছুমাত্র হয় না। ধর্ম যে অবস্থার বন্ধ সে সঙ্কটের চাত্রের মনে কোনও স্রষ্টার গাণ্ডা অস্বাভাবিক স্বেচ্ছা পানো। অন্তরনক তাই প্রত্যক্ষ মহাশয়ের কাছে বিদায় নিয়ে আমরা গঙ্গাতীরে গেলুম। এখানেও গঙ্গা অত্যন্ত কীর্ণাঙ্গী। তার ওপারে বন অরণ্যময়ী, এপারে পাত্রের কদমী ও পাত্রকুল। বাড়ী স্নান করে বাগানো। বিশ্রামের অন্তর আমরা সেখানে একটু দাঁড়ালাম। এমন সময় সেখানে এল পাত্রের একজন ভাঁড়ার দক্ষক। চাত্রের দলে সে গল্প মুক্ত করে দিল। এখানেও সেই সনাতন ধর্মের ঘোরতর গোড়ামীর অকৃত সর্ববোধ। আর্থ সন্ধানীদের এরা নিষ্কটময় জীব বলে মনে করে। ভাঁড়ার দক্ষক এক-

করে দেয় তাহলে, তখন আশ্বাসের অবস্থা কি হবে? গাড়ী থেকে যে মেয়ে পড়বে। তারও কোনও উপায় নেই। কেননা, ঘোড়াটা একটি দুর্ভৃত্ত্বি হির থাকতেন। পনের ধারে নর্দমা; গাড়ী উল্টে গেলে সর্ব সম্বন্ধ আশ্বাসের সেই দুর্ভৃত্ত্বি নালির মধ্যে পতিত হতে হবে? এখন উপায়? মনে মনে সকলে ভাগবানকে অরণ্য করছি। এমন সময় ঘোড়ার বাবা ঠাঙা হোল। কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে, পুনরায় সে চলতে শুরু করল। তখন আশ্বাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললুম।

বিনীত স্বরে চালক বললে, "জ্ঞান ভর বাটনি বড় বেশী হয়েছে বাবু, তাই এই বকম পাগলামী করছিল।"

ভাঙড়ী বললেন, "আজ্ঞা তার নজরী আমি তোমায় পূরণ করে দোব; তুমি তার জন্য কোনও ভাবনা কোরনা। তবে, ওকে আর প্রেয়ার কোরনা। ও যেমন ধীরে ধীরে চলছে তেমন চমুক।"

টাকাওয়ালা-খুদী মনে নিজের প্রেমের (কনখলের নিকটবর্তী ছোয়ালাপুর) গল্প করতে লাগল। তার মধ্যে একটি কথা আমার মনে আছে যে, এ দেশে আমার কলন এত বেশী হয় যে, বৈশাখ তৈজসী মাসে চার পরস। ওই আনা দেয় মরে আম বিক্রয় হয়। সম্বন্ধে প্রেম, মনে পাখাড়ের সাহুবেশে আমবাগানের প্রাচুর্য দেখে, এ কথা অবিশ্বাস করা যায় না। তবে আমার জ্ঞাত বিশেষ ভালো কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

টাকা চলতে অবিরে। প্রাচীন হরিদ্বার সম্বন্ধে হুপ্রাচীন ধ্বংস স্থূপ বড় বড় অট্টালিকা দেবালয় নীলিকা, প্রভৃতি পল্লভে এলে, রহস্যময় ভোৎস্না তরঙ্গের মধ্যে দিয়ে আমবা ভেলে চলেছি। তেলে চলছি, কোনও বস্তুগোলের অক্ষানা পনের উদ্দেশ্যে নয়। কেলে চলেছি নিঃশেষের অতি পরিচিত বাস্তবতার পথে।—

হাসির গান

ঐক্যবোধ রায়

সাহিত্যের সব কয়টি রসকে সঙ্গীতেও প্রয়োগ করা হইয়াছে। চান্দ্রসঙ্গ সঙ্গীতের বাধাবে বিতরণ করা হয়। তবে বাংলা দেশে হাসির গান রচনার কয়েকটি বিশেষ প্রস্তিষটক আছে। বাংলা দেশ করুণা প্রাবৃত; কর্তনের বাড়লের করুণ সুরই আশ্বাসের প্রধান নীতি-পথ। যৈজ্ঞবর্ধনের সঙ্গে বাঙ্গালীর মন এমন ভাবে জড়াইয়া গিয়াছিল যে একমাত্র ব্রজলীলা এবং গৌর-লীলার গান ছাড়া আর কোনো গানই ভালো লাগিত না। উত্তর অঙ্গের গানই কারুণ্যের; মলকায়-স্তম্ভিতে একধেরমী (monotony) ভাদিবার অত

হলে হলে হাস্যরস আছে। শিব এবং নারদ হইলেন যে সমস্ত কৌতুক্যের পাত্র। নারদের কলহপরায়ণতা এবং শিবের দেশা প্রাচীন সাহিত্যে হাস্যরস জুগাইয়া আসিয়াছে।

বাংলা সাহিত্যে এবং সঙ্গীতে হাস্যরসের সঙ্গে সুরচিত্র ঐক্য রাখা চিরকালই বেশ দুর্লভ কর্ম ছিল। অলীল ইজিতকে জনসাধারণ মত্ত বড়ো কৌতুক মনে করিত। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

"বহু সাহিত্যে হাস্যরসকে অস্তরঙ্গের সহিত এক পংক্তিতে বসিতে দেওয়া হইত না। সে নিরাশ্রমে

বসিরা শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষার ভাণ্ডারি করিয়া সভ্যজনের নমোজ্ঞন করিত। আমি বসেই সহিত যেন তাহার কোনো একটি সব উপগ্রহ সহ বিশেষ কুটুখিতার সম্পর্ক ছিল এবং ঐ রসটাকেই সর্ব প্রকারে পীড়ন ও আন্দোলন করিয়া তাহার অধিকাংশ পরিহাস-বিজ্ঞপ্ত প্রকাশ পাইত। এই প্রগল্ভ বিদ্যুকটি যতই গ্রিহপাশ থাকে কখনো সন্ধানের অধিকারী ছিল না। যেখানে গভীর ভাবে কোনো বিষয়ের আলোচনা হইত সেখানে হাতের চপলতা সব প্রসঙ্গে পরিহার করা হইত।

বয়স্রান্ধের নিম্নের হস্তরস বিয়ল, কিন্তু আয়তন সাধা। তাঁহার রচিত হাশির সানগুলি বাস্তব্য অর্জন করিতে পারে নাই, কিন্তু আদর্শ স্থাপন করিয়াছে।

আমি পাতি, যেহেলি গান, ছড়া প্রভৃতিতে হস্ত-কৌতুক চিরকালই ছিল। সামান্য ক্রুদ্ধ বিষয়ে বহা আভরণে বর্ণনা করাইতো এক স্রোতী কৌতুকের উপকরণ। চিরাচরিত জীবন যাত্রার মধ্যে নৃতনত্বের স্কার ও হাশির খোতাক জুটাইয়া দেয়। তাই রেলপাড়ী, বিলিতি গোবাক, ডাকঘর ইংরাজী ভাষা প্রভৃতি লষ্টয়। তরল আনন্দ সৃষ্টি করা হইয়াছে নান্য গানে।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বর স্ত্রী শুণ্ড সব বিষয়েই শুক্লানীয়। ব্যঙ্গরচনা তাঁহার কুপল লেখনিই প্রথম প্রকৃত করে, তাঁহার হস্তরস সব সময়ে অবশ্য স্মৃতি সজত হইত না। সেটা তাঁহার একান্ত দোষ নয়, সে সময়ে জনসাধারণের চিহ্নই লেখক পছন্দ করিত। তাঁহার হাশির গান :-

লোভ নাহি বেবে থাকে, খাই তাই চোটে।

লিটেপুলি পেটে যেন ছিটেগুলি কোটে ॥

বস্ত্র ধস্ত পরাগ্রাস, বস্ত্র সব লোক।

কাহনের হিসাবেতে আহাতির কৌক ॥

কর্তব্যের গালগল শুক্ল টানিয়া।

কাঠালের ভাঁড়ি আর ভাঁড়ি এলাইয়া ॥

দুইপার্শ্বে পরিজন মধ্যে যুড়া বসে।

চিটে গুড় চিটে দিয়ে পিটে খান কসে ॥

কবির গানের রস স্নিকতা প্রায় সময়েই অস্বীকৃত্যের পথার পড়িত। শ্রোতাগণ অস্বীকৃত্য ইঙ্গিত এবং গাল-মন্দে বীতিযতো আনন্দ প্রস্তুত করিত। গালাগালি করিবার অল্প কবির গানে 'খেউড' নামে এইটি বিশেষ অঙ্কই নির্দিষ্ট হইয়াছিল।

প্রতিষন্দ্য কথিকে, আক্রমণ করিয়া ইচ্ছাযতো বিস্ত্রী-গালাগালি দেওয়া ছিল বীতি; যে বেনী আক্রমণ করিতে শাস্তিত পরিণামে তাহার গর হইত। তোলা ময়রা এবং একটুনি কিরিদির 'খেউড' ছিল দুপ্রসিদ্ধ; এ-বরণের কারো গালাগালি আগরের মধ্যে নির্ভীক ভাবে দেওয়াতে তোলা ময়রার জুড়িবার কেহই ছিল না।

একটুনি সাহেবকে গালাগালি দিয়া তোলা ময়রা-যে সব গান গাহিয়াছিলেন সেগুলি সে সময়ের বল্লরসের প্রকৃষ্ট নিদর্শন। এ সমস্ত কটুজি Mock Fight মাত্র; প্রতিপক্ষ ক্রুদ্ধ হইত না—কিন্তু শ্রোতাগণ প্রচুর আনন্দ পাইত। এ বরণের গান :-

আটনি কিরিদ কক্ণ চোর।

ভালে বাত হলে সব মোত গোর ॥

টটিকা গোরে দুটিকা ভুতের বব, একি অসম্ভব,

এ হুকী দিয়ে বস্ত্র গোটে সব,

এর ঠার টিকানা গেল জানা;

বা মূত্র হলো তিন ময়র ॥

একটুনি সাহেবের রসরস বেশ ছিল; ইংরাজ-আইনের বিচারকে বিজ্ঞ করিয়া তিনি রচনা করেন—

তুমি য়া: বিলাতেবরা কুইন ভিক্টোরিয়া।

প্রমাণ সব কেউ তোমার

চোখেতে না দেখতে পার

ও বার তক্ষিল তারি

সেই তোবারি

বরুয়া দিয়ে আপীল করে—

খোর নষ্টে পড়ে ডাকি যা তোবারে ॥ -

এবার ডিকি আরি হলো তার

যম রাজার দরবারে।
 ছিল নিখিল সার্কেট বাতা,
 দেখতার পকে বাত্ তাহা,
 তোর কাছে পেরেছে ভায়া
 কুল পাণ্ডার পরগুহানা ॥
 করে ব্যক্তি বিবেচনা
 প্রস্তুতকৈ ব্রজা হরি
 সংহারকর্তা জিহুতারি
 যম পেরেছে মেঘেটারি
 ফৌজদারী পরগুহানা ॥

আবেধনটী বা দুর্বার কাছে হইলেও কৌকুটি সে
 সমরের শাসন ব্যবস্থাকেই।

কবির গান, পট্টালী গানে রাগের গুলে কুজাকে
 বলাইয়া নানা প্রকার রস-ভাষা কবা হইত।

প্রাচীন বাংলার প্যারডি রচনা করারও প্রথা ছিল।
 প্যারডি বা 'লালিকা' বুল কবিতার বিকল্প নয়, তাহা
 এক শ্রেণীর প্রশংসাই। রামপ্রসাদের সুপ্রসিদ্ধ গান
 কবির প্যারডি সে সময়ে আসরে আরাই গাওয়া হইত—
 তাহার নাম ছিল 'পালটা গান'। আজু গোসাইয়ের
 রচিত প্যারডি সুবিখ্যাত। রামপ্রসাদের বিখ্যাত
 গান—

এই সংসার ঘোরাক টাটী।

ও তাই আনন্দ বাজারে সুটী ॥

ওরে, কিস্তিজন বন্ধি বাবু, বুজ পাচে পরিপাটী

তাহার প্যারডি আজু গোসাই রচনা করলেন—

এই সংসার রসের হুটী।

ওরে তাই, বাই দাখ আর বজা গুটি ॥

যার যেমন মন, তার তেমনি মন করবে পরিপাটী ॥

ওহে সেন, অন্নজান, বুকেবল মোটাবুটি ॥

ওরে শিবের ভাণে ভাবনা কেন,

ত্যাগা বারের চরণ ছুটি।

ওরে তাই দায়া বন্ধু মৃত—

পিড়ি পেতে ঘের কুহের বাটী ॥

পট্টালী গানের আসরে লাভ রাগের রস-রসিকতাও
 অল্প ছিল না। পশ্চিম বঙ্গের জনগণ সাধারণতঃ একটু
 কৌতুক প্রিয়ই হইয়া থাকে—তার উপর লাভ রাস ভিলেন
 রসিক কবি। সমসাময়িক ঘটনা লইয়া ব্যঙ্গ করিয়া
 তিনি যে সব গান বাধেন, তাহার মধ্যে মধ্যেই হাস্যরস
 আছে।

ব্যঙ্গভক্তি অলঙ্কার বহুল একটি গান এখানে উল্লেখ
 করি। বিখ্যাতবিদ্যাহকে বিদ্বদ্ব করিয়া গানটী রচিত—

আমাবিগে নিতে নাগর, এসেন শুণের বিভাগাগর,

বিভাগাগর বিধবা পার করতে

তরীর গুণ বহুতেন গুণনিধি।

আমাবিগে ঈশ্বরগুণ অলঙ্কারে

নারীর যোগ বুকে না বৈত হরে,

হাতুড়ে বৈততে যেমন বিধ দিগে দেখ আপে বধি।

ঈশ্বরগুণ বিভাগাগর বঙ্গদেশের সমগ্র লক্ষ্যবশত সে
 সময়ের অনেকেরই প্রচার লগ্নে গ্রহণ করতে পারেন নাই ;
 দাক্ততার উপরের গানের প্রথম অংশে তাঁহার প্রচেষ্টাকে
 প্রশংসা হলে নিম্না করিয়াছেন। ঈশ্বর গুণ আন্দো-
 লনের বিক্ষেপে লিখিতেন—তাঁহাকে নিম্নার ফলে সমর্থন
 করিয়াছেন।

প্রোভাগ্য যে কোনো কতিবিকারে উল্লাস অশ্রুতব
 করিত। ঠিক এই কারণে এক শতাব্দী যিয়া বিজ্ঞানম্বর
 কেন্দ্র। তাহাদের বাতাইয়া রাখিয়াছিল। একা রাস
 গুণাকরে রক্ষা নাই, তাহার উপর গোপাল উড়ের
 রসাল গান ! প্রোভাগ্য পরম আরাগে উপভোগ করিত
 সে লব অলীল গান—নিহের গানটিতে বাসিনী বাদী
 নিহের গুণপনা বর্ণনা করিতেছে—

যাদু, চিত্রে তো পার নাই,

আমি গুরু ভাষার পাখী চালাই।

এ নররে তোব তেমন বাদী,

সর্বনাশী, নিমেষে কানী বজা দেবাই।

আমি যদি যেনে কবি, ঈদ পেতে চাঁদ ধরতে পারি,

কুহক দিয়ে কুলের নারী, বাহির করি,

বাহির ক'রে, ভেড়ী লাগাই ॥

গোপান উড়ে ছাড়া আরো একজন উড়িয়া কবি
বাংলা গানে রূপ-ভাষালা করিয়া গিয়াছেন—তিনি রূপ-
চাঁদ পক্ষী। তখনকার ইংরাজী নবীণ বাবুদের অত্যন্ত
ইংরাজী নিশান তাহা। রূপচাঁদ বাবুজীকে ব্যবহার করিয়া-
ছেন যেমন—

আমারে ফ্রড্ ক'রে

কালিয়া ড্যান কুই কোথা গেলি।

আই হ্যান্ কর ইউ ডেরি স্তরি,

গোল্ডেন বডি হ'ল কাল ॥

হে! বাইডির ডিরেটে, মধুপুর কুই গেলি রুক,

ও বাইডির হাউট্টে চেরে,

চিয়ার ডিরক বনবানী।

(তখনে স্ত্রীম ভোরে বলি)

পুণ্ড কিরিচার বিক্ গেরেল,

তাদের ব্রেটে মারিলি শেল,

নন্সেল ভোর নাইকে। আকেল,

ব্রিচ্ পব্ কন্ট্রাষ্ট করলি।

(ফিবেল গণে ফেল কবুলি)

লপট শব্দের কচুচু বুললো,

মধুরাতে কিং হলো, আকেলের প্রাণ নাপিল,

হুতুকার কুঁজ, পেলে ডালি।

(নীলে দাসীবে রহিষী বলি)

স্রীনবের বর ইংল্যান্ড, ফুকেড্ বাইও হার্ড;

কহে আর, সি, ডি বার্ড, এ

পেলাকার্ড ফুকেলি।

(হাপ্ ইংলিস্ হাপ বানানী ॥)

রুকসীলার চব্বকের আধুনিক বাংলায় রূপ! সবার

উপর তনিতার রক্তটি দেখুন—“কহে আর, সি, ডি, বার্ড”
অর্থাৎ রূপচাঁদ নাম পক্ষী (R. C. D. Bird)!

প্যারীমোহন কবিরাজ মহাপ্রভুর পানভলি রূপচাঁদের
সমস্ত্রীক। তাঁহার্য উত্তরেই তৎকালীন শিক্ষা, সভ্যতা,
ঐচ্ছিক লইয়া ব্যঙ্গ করিয়াছেন। প্যারীমোহনের সে
শ্রেণীর একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি—

বর পরলা নাই, ওরে ভাই

সংসারে তার মরণ ভালো।

পরলা ভিন্ন হয়না পুণ্য, বাজ গণ্য কে করে বল ॥

পরলা হীন হলে পরে, লোকে তারে নিষ্যা করে,

প্রাণের সছোদরে, সমাহরে আলাপ করে না।

বহুগণে তার নাগণে, স্তম্ভাজুতে বল থাকে ন'।

পিতা মাতা, কন না কথা,

মর্মে ব্যথা দেন তার প্রবল ॥ (বিভাস)

গিরিশচন্দ্র বোম, বহিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মীনবহু
মিষ্ট ঐচ্ছিক সাহিত্য মহারণীগণের হাসির গান অনেক
আছে। তাঁহাদের এ একের গানে স্ফুটিল যাত্রা
স্বভাবতই অনেক উজ্জ্বল।

রাধাকৃষ্ণ লইয়া বৌতুক তাঁহার্য করিয়াছেন।

গিরিশচন্দ্র উজ্জ্বলের কীর্তনের সুরে (লোকা) হাসির
গান রচনা করেন—

রাধা—বিনি কেটে তিনি তা,

কুই পারের অপর দেনা পা।

রুক—মানময়ী রাধে,

কুই গেলাস কুই আর হইলি থা।

রাধা—চাঁট্টে বৃষ্টি আনুজ্ঞে কখনে নই,

কালচাঁদ, হইলি তোমার কই?

তাঁদের সবাইকে ছাড়াইয়া উড়িয়াছেন বিবেকপ্রসাদ
রায়। বিলাতী সঙ্গীতে যথিত ভাবভাষার উজ্জ্বলের
সুরে অপরূপ সব গান বাঁধিয়া তিনি হাসির গানের রাজার
আসন শাইয়াছেন। ভীষণ ব্যঙ্গ, হুতুহু বিদ্রুপ, শাবিত
ইহিতে তাঁহার হাসির গান পূর্ণ। তাঁহার সঙ্গে আছে ভাব
উপযোগী কৌশলান্বিত সুর ও ছন্দ এবং অতিনয়-মূলক
গীতি রীতি। বিবেকপ্রসাদের রচিত প্যারিডি গানগুলিও
বর্তমানের সুর-লোকের অর্জন করিয়াছে। ব্যঙ্গ্যার
শুকশারী সংবাদের অমূল্যরূপে প্যারিডি তাঁহার রাধাকৃষ্ণ
সংবাদ—

রুক বলে, “আবার রাধে বদন কুলে চাঁদ”

আর রাধা বলে, “কেন মিছে আবারে আসাও,
যদি নিজের জালায়।”

কুঙ্ক বলে, “রাখে, দুটো প্রাণের কথা কই”

আর রাধা বলে, “এখন তাতে মোটেই রাজি নই,
সবো—বোঁসার বরি।”

উড়িয়াবের লইয়া ব্যাক-বিত্তপ আশাদের তিরকালই
প্রচুর আনন্দ বিস্তরণ করিয়া আসিতেছে। সে বেচারার
এমন তাণ্ডে হাসির পাত্র হইয়া আছে যে তাহাদের নাম
করার সঙ্গে সঙ্গে আশাদের ঠোঁটে হাসি ফুটিয়া উঠে।
অনুভূতলাল বহু তাহাদের জাত বাঙরার ধুং করিয়াছেন
তাহাদেরই তাণ্ডায়—

ভাগড় ভাগড় হো ধাক্কুড় কুড় কুড় কুড় পড়াই পড়াই।
বগাড়া ডালড গোড়কু গড় কবছু ভাই ॥

কড় বরড পড়ি কিড়ি, পন্কি ছোড়ে চড়ু গাড়া
বগাড়ি নাই কিনিয়া কই;

কলকতা পকাড় ভাত পড়িগিলা হাই।

মাইপো করম বাবা মতে ধরাইব রণ।

উড়িয়া বলব গুণা, উড়েনি সিপাই।

কোউটি প্রভু জগদনাথ বগাড়ি কাড়ি নিল ভাত,
টান দেহ তুরি বরি ভাণ চলি বাই।

উড়িয়া ভাড়া ‘বাঙ্গাল’দের নিরে ব্যক্ত করার প্রণীত
আছে। পূর্ববঙ্গবাসী কবিরা নিজেসাই এসব গানের
অধিকাংশ লিখিয়াছেন।

বাছার হুকা কিয়া আইয়া চাইল্যা দিচি পার।

তোবার লগে কোতে পাকম, হইয়া উঠে দায়।

আসি দিচি, কান্ধই দিচি।

গাও মাঝনে হাসনে দিচি,

চুল বান্ধনের কিত্যা দিচি, আর কি জাওন বায়।

বিজ্ঞানজ্ঞানের সুবের অঙ্গরূপ রজনী সেনের হাসির
গানের অধিকাংশ লক্ষিত হয়। সত্যীন্দ্রের ঘটক রচিত
রবীন্দ্রনাথের সুপ্রসিদ্ধ গানের প্যারডি করেকটি
অনাবিল হাতরনের উৎস হইয়া রহিয়াছে।

ব্যর্থ আশা

শ্রীমুখারামী মোসাম্বী

সব পুরুষেরই স্ত্রী-ভাগা থাকে কি? অন্ততঃ ডেপুটী
ম্যাজিষ্ট্রেট বিজয়কান্ত সেনের মত স্ত্রী-ভাগা যে সকলের
হয় না—একথা তাঁর আত্মীয় অনাত্মীয় সকলেই জোর
গলায় বলেন। তাঁরা বলেন, একটা খট হলেই হয় না।
স্ত্রীর মত স্ত্রী লাভ করা চাই। এই যেমন বিজয়কান্ত
সেন—এখনই না হয় তিনি ডেপুটী হয়েছেন, কিন্তু বছর
কয়েক আগে তিনি কি ছিলেন! নগণ্য একজন সার্কল
অফিসার। কি তাঁর যোগ্যতা ছিল অমিত্রির মত
স্বপনসী, বিদূষী এবং গুণবতী ধনীকন্ডাকে বিয়ে
করবার? থাকবার মধ্যে ছিল চাকরীটি আর অশুদ্ধ

চুটি চোখ। অস্বীকার করা যায় না—সত্যি স্বন্দর,
আন্দব স্বন্দর তাঁর চোখ। যারা পরস্পরভীর তাঁরা
বলেন—চোখ আর চাকরী থাকলেই অমন স্ত্রী পাওয়া
বায় নাকি হে?

—কি জামি দালা, লামান্ত একজন সার্কল অফিসার,
তাকে জামাই করে বললেন বিরাজ মোহন রায়
চৌধুরী! বোধ হয় চোখ দেখেই বিরাজ মোহন ভুলে
গিয়েছিলেন!

—আরে না না, ভুলে গিয়েছিল বিরাজ মোহনের
মেয়ে। —ও হরি, ব্যাপারটা তা হলে প্রেমজ?

—নিশ্চয়ই। আবারেও ত বাপু তাই মনে হয়।
হা হা করে হেসে ওঠেন—একটা কৃৎসিং ইচ্ছিত
করে।

মকঃলের নাইট-ক্লাবে চাকুরীকীবিনের মধ্যে
বিভিন্নকেতু সেনকে নিয়ে আলোচনা চলে। অবশ্য
সাধাৰণ সহকারে, হাজার হোক তিনিই বড়
চাকিম ত!

সাব্-ভেপুটী বাবু বলেন,—“আরে তাই, স্ত্রীর
ভৌতিক আর কোর্টের কাজ করতে করতেই যদি কার্ফ
সনর কেটে যায় তাহলে ক্লাবে তিনি পদখলি দেবেন
কখন?”

“সে ত ঠিক কথাই জার!”—বিনয়বিপ্লবিত হাসি
হাসতে থাকেন শেখাল অফিসার।

“পুরুষ যদি পুরুষের মত না হবে তাহলে তার জগতই
বৃথা। কথার বলে, “পুরুষ-সিংহ।”—যাথা জুগিয়ে বৃহ
হেসে বলেন প্রৌঢ় প্রথম মুশেক্।

“চিন্নার ইউ আর”—সমর্থন করেন দ্বিতীয় মুশেক্।
গৌক জোড়া বোচক দিতে দিতে টেবিল চাপড়াতে
থাকেন। মনে মনে হরত ভাবেন, বাড়ীতে স্ত্রী
জানেন তিনি কেমন পুরুষ-সিংহ।

সরকারী ডাক্তার বাবু তাঁর কাঁচা-পাকা চুল হাত
ফিরে সর্বাঙ্গ করতে করতে প্রথম মুশেক্ বাবুকে সমর্থন
করে বলেন,—“মনের কথাটি টেনে বার করেছেন,
ব্রাহ্মণ! আরে আমি হচ্ছি ডাক্তার, সর্বত্র আবার
ব্যতীত। কান্দেই সব ব্যাটার হরের ঘবর আবার
জানি আছে। কোন ব্যাটা বউকে বাধার করে রাখে
আর কোন ব্যাটা বউকে পায়ে ঘেঁষলার কিছুই আমার
অজানি নেই।”

সময়ের সবাই হেঁকে ধরেন ডাক্তার বাবুকে,
সব কথা বলবার ক্ষমতা।

আবা-বাকালী উকীল বাবু বুকটা একবার কঁপে
ওঠে। তিনি যে প্রায়ই তাঁর স্ত্রীর—প্রাণবোধ বনজরের
ব্যবস্থা করেন, ডাক্তার ব্যাটা সে সব কীল করে দেবে

না ত! তিনি নিরুৎসাহ হয়ে বলেন,—“বেশে দিন
ডাক্তার বাবু ভগব। এখন বলুন আপনি হায়েনা
বড় সাহেবের কুঠিতে বান কেনো? কি জেতা অল্প
মেমসাহেবের? খালিরে ঘেন না, দালা।”

বহুতমর হাসি ছুটে ওঠে ডাক্তার বাবুর কাণো পুরু
ঠোটে,—বাংলাব আর কি দালা, একে বড়লোক তার
স্ত্রী-অশ্রোণ। একটু মাথা ঘরছে কি চোখের পাতা
কৈপে উঠলো—ডাক ডাক্তার বাবুকে। গিরে হরত
মেমলাব, স্ত্রীর এক মাথা কাণো মেমের মত শ্রমের চুলে
হাত জুগিয়ে বিচ্ছেন। গলা বেড়ে চাহরের সাথে ঘরে
গিরে চুকতেই জনলাব বিহিত্তরে মেমসাহেব বলছেন,
“কেন আবার ডাক্তার বাবুকে কই বেত্তা;—মাথার
বস্ত্রা আর আবার নেই।” সাহেব একটু হেঁতো হাসি
হেসে হরত বললেন, “হেঁ হেঁ তা’হলে...” অমিত্ত ভবন
কালবিলক না করে চলে আসি। চুকতেই ত পারছেন
এরকম জন্তভাবে চলে বেতে বলাব পর কি আর
থাকি বাবু!”

এ হেন বিভিন্নকেতু সেন যদি স্ত্রী-বিরোধের নাম-
থানেক পরেই (মোটা, কাণো কুচুচে বাচাল সেতী
ডাক্তার অলকনকা রাগকে বিরে করেন আর আদরের
মেমকে সাতস্তাড়াভাতি কলকাতার বোড়িং-এ পাঠিয়ে
ঘেন তাহলে সকলে অবাক হয়ে যাবেন নাকি?
সকলেরই মনে শু বুধে এক প্রশ্ন—কি করে এটা
সম্ভব হ’ল?

.....বার বছর পরে এক বৃহত সম্মানের অঙ্গ গিরে
অমিত্তির অবেশ অঙ্গ অবশ হয়ে বাগরাজে তিনি
সাংঘাতিক বকম অল্প হরে পড়েন। অবশ্য ডাক্তার
বাবুর কাছ থেকে তাই জানা গেল। যাই হোক, এত
তাড়াতাতি বোধ হয় বিহার নিতে হতো না—যদি না
তাকে বেথতে হতো সেতী ডাক্তারের সাথে বিভিন্নকেতু
সেনের অপোজন অন্তরলতা। যিনি ঘরে বাইরে স্ত্রৈণ
আখ্যা পেরে এসেছেন এতদিন, কি করে এমন বথলে
গেলেন তিনি, কিছুতেই ভেবে পান না অদিত্তি।

প্রয়োজন বুঝি শেষ হয়েছে তাই এত অবহেলা! হারিয়ে আনা আকাঙ্ক্ষা! একজন সার্কল অফিসারকে ডেপুটী গিরিজে টেনে তুলতে কত পরিশ্রম, কত চাকুরী করেছেন অমিতি। বড় বড় অফিসারদের বাবে বাবে পাট দিয়ে হাত করতে হয়েছিল আর তাঁদের সাথে মিথ্যা অভিনয়ও করতে হয়েছে বৈকি। তবে হ্যাঁ! বিজয়কেতু সেনের জ্ঞান ও বিচক্ষণতা উন্নতির পথ লুপন করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল। তবু.....

.....চলে-বাঙা বিনম্রতার কথা মনে পড়ে যায়। বুক ঠেলে বীর্ধ-নিঃশ্বাস বেরিয়ে আসে, আর অবস্থা চোখের অল কিছুতেই ধাবতে চায় নাকেন? যার বছরের মত বন-জ্যোৎস্নার তবিশ্রুত চিত্তার তাঁর যোগ-পাতুর কণ বের ও মন কেঁপে ওঠে।

“মিসেস্ সেন, আজ কেমন আছেন?” খাটের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করেন লেডী ডাক্তার। নির্মূল পরিপাটি তাঁর সাজসজ্জা। ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে সন্মত্ত স্বর ভাবসিঁত।

বিরক্ত হয়ে ওঠেন অমিতি সেন। কিন্তু কিছু কথা বলা তাঁর স্বভাব-বিকৃত। দুহু হলে বলেন,—“সন্ধ্যানে দাবার অস্ত্র গ্রস্ত হইবেই আছি। বমরাঙ্ক কেন বে দূত পাঠাচ্ছেন না যুক্তিতে পারছি না। তাঁর বোকা উচিত যে নতুন কিছু শোনবার বা দেখবার ইচ্ছে আমার আদৌ নেই।”

গোডালি-উঁচু মূর্তা পারে ঝট ঝট করে চলে যেতে যেতে গভীর ভাবে বলেন লেডী ডাক্তার,—“ওকি কথা বলছেন! আগের চেয়ে আপনার শরীর অনেক ইম্প্রুভ করেছে কিংবা।”

মদে মদে অমিতি বলেন, সত্যিকারের ইম্প্রুভ করেছে তুমি। লেডী ডাক্তার চলে গেলেন তাই আর কিছু বলা হলো না। তারপর যেরকম ডেকে পাঠালেন।

“মা-মনি আমার ডেকেছ কেন?”—উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল বন-জ্যোৎস্না।

“তোমার সাথে কথা আছে। কাছে এস। শোন, আমি মরে গেলে আমার সন্মত্ত কিনিবপত্র এবং গরম! মানে আমার ব্যবসায়ী সব কিছু তুমি নিও। অস্ত্র কেউ যেন হাত না দেয়। একখানা চিঠি লিখে দেবেছি, তোমার বাবার নামে—আমি মরে গেলে যেন তিনি পেটো দেখেন—আমার বালিশের নীচে আছে।”

বন-জ্যোৎস্না নিজেই আর তির রাখতে পারল না। বাঁধভালা নদীর মত তেলে পড়ল মায়ের বুকের ওপর। হুঁহাতে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে কুঁপিয়ে কান্ডে কান্ডে বলল—“ওগর কথা কেন বলছ তুমি। আর বলবে না ত! তুমি না বাঁচলে আমিও বাঁচব না। চল আমরা কলকাতার বাই। এখানে ‘তুমি ভাল হচ্ছ না আর আমারও এখানে মোটেই ভাল লাগে না থাকতে! ঐ বিশ্রী লেডী ডাক্তারকে দেখলেই আমার রাগ হয়। ও আর কি করতে আসে এখানে? তুমি তাড়িয়ে দিতে পারনা ওকে, মা-মনি! কি যেন হয়েছে আমার, কিছুই ভাল লাগে না।”

বন-জ্যোৎস্নার মাথার হাত বুনিয়ে দিতে দিতে অমিতি বলেন,—“দেখ বনী, তুমি এখনও ছেলেমানুষ বাক্যেই কোন বড় বড় কথা বা গুটিল বিষয় নিয়ে মাথা ঘামাতে বাঙা তোমার পক্ষে অনুচিত এবং কৃতিকর। এতে শুধু তোমার মাথা আরও গরম হবে যাবে। আচ্ছা, এখন তুমি জামা বদলে পরিষ্কার হয়ে বিনে সন্মত্ত নিয়ে বেড়িয়ে এস।”

অনিচ্ছাস্বপ্নেও বন-জ্যোৎস্নাকে চলে যেতে হয় বেড়াবার জন্য। যদি না আর না বাঁচেন! আঃ, চোখ জুটো যে আবার অলো ভরে আসে! না, মনকে লজ্জা করতেই হবে। যোগ কি আর কারো হয় না—মনকে সাধনা বের বনজ্যোৎস্না।

.....রাত সাড়ে আটটা বাজতেই বিজয়কেতু সেন ব্যস্ত হয়ে চুকলেন অমিতির ঘরে। টেবিলের ওপর থেকে একটা শিশি তুলে নিয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—“একি গুণ্ড খাওিস যে? এ তোমার জারী অন্যায়।

একম করণে ভাল হবে কি করে, অদিতি? আর বনীর কাছে শুনলাম আজ নাকি পূব কারাগারটি করেছে! কি, উত্তর দিচ্ছ না কেন? কি যে আরম্ভ করেছে! আগে ত তুমি এমন ছিলে না!”

রান হেসে অদিতি জবাব দিলেন,—“ওষুধ খেয়ে ভাল হবার দিন আর নেই আমার। কালেক্টে জব্বা ওষুধ গিলে কি করব! তবে হ্যাঁ, মনকে সাধনা দেওয়া হয়। কিন্তু কার মনকে সাধনা দেব, কে তার সাধনা!

“বনীকে” জেরা করেছে বুঝি? হাকিম কিনা—তাই জেরা করা তোমার রক্ষাগত হয়ে গেছে। জেরা করেই ক্ষান্ত হওনি আমার বিচার করতে এসেছে এখানে। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, তোমার নিভেজ মস্তকে যে বিচার করেছে তা ঠিক নয়—এতে তুমি শাস্তি পাবে না। আমি আগে এমন ছিলাম না? ববি বলি তুমিও ত আগে এমন ছিলে না! বাক, তোমার প্রশ্নের বশাসাধ্য উত্তর দিতে চেষ্টা করেছে। এখন আমি একটু একলা থাকতে চাই, তুমি তোমার কাজে বাও।” এতগুলো কথা একসঙ্গে বলে অত্যন্ত ক্রান্ত হয়ে অদিতি গাম্ব ফিরে গেলেন। অগত্যা বিজয়কেজু সেন উঠে এলেন। নানা চিন্তা মাথায় আসে। অদিতিকে কলকাতার নিয়ে যাবেন? কিন্তু, অদিতির বা মেঝাল হয়েছে—রাজী করান যায়ে বলে বনে হর না। “A sick body breeds a sick mind”—মনে মনে বলেন বিজয়কেজু সেন।

তিন বাসু পরের কথা.....

বিজয়কেজু সেন বিকেলে কোর্ট থেকে ফিরে এলেই তাঁর ডাইরী নিয়ে লিপিতে বসলেন। কি-চাকরদের বারণ করে দিলেন তাঁকে যেন বিরক্ত করা না হয়। অলকানন্দা, ব্যাকীতে নেই? বাত দশটার ফিরবে? আজ বাতা গেল। বেশ নিশ্চিত মনে কাজ করা যাবে। এসব মনে তিনি ডাইরীর পাতায় লিপিতে লিপ্সে গেলেন,—

...“হ্যাঁ, অদিতি তোমার দেখা সেই চিঠিখানা

অনুযায়ী সমস্ত কাজ বা কর্তব্য, বা বল, সব করেছে। তুমি ‘অনুসন্ধান’ কথাটা লিখে আমাকে বাখা দিলে কেন? না না, ‘অনুসন্ধান’ নয়,—ওটা পথ নির্দেশ। তারপর, আমার বাল্যবন্ধু ব্যারিষ্টার মিথিলেশ শুক্লের কাছে আমার ‘উইল’-এর এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছি। আমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি এবং তোমার নিজস্ব জিনিবপত্র গরনা ইত্যাদি সব কিছুই আমারদের একমাত্র মেয়ে বনজোৎস্নার নামে উইল করেছে। মিথিলেশের ছেলে জ্যোৎস্না কান্তির সাথে বনজোৎস্নার বিয়ের চুক্তি পাকা করে এসেছি। আমার বন্ধুটি মনেও দুঃখ এক। কালেক্টে বনীর ভবিষ্যতের চিন্তা আর আমি করেন। তাহাড়া তার স্ত্রী? তিনি মানবী নন, দেবী! আমি ভাল করেই জানি তিনি আমাদের বনীকে ‘পাহাড়ের মত আড়াল করে রাখবেন—কোন বড় কাপটা গর পাত্রে লাগতে পারবে না।

আর আসল ‘উইল’ খানা রেখেছি আমার উকিল কনসেলের কাছে। তোমার নির্দেশ মত কত বাঙালো করেছে—খুসী হয়েছ ত?

বনীকে অনেক বুঝিয়ে অনেক উপদেশ দিয়ে এক চিঠি লিখেছি। বুধা কেনেও তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে যে বা বাবা কেউই চিরকাল বাচে না। মৃত্যু একদিন আসবেই ইত্যাদি—কিন্তু আমার বুড়া এত ভাড়াভাড়ি আসবে যে ভাড়ে বনীর খুবই আশা লাগবে।

না, আমার বেঁচে থাকবার আর উপায় নেই। এই দশ ঘণ্টা নিয়ে জীবমুত অবস্থার বেঁচে থেকে কোন লাভও নেই। তোমার চোখের জল, তোমার দীর্ঘ-নিঃশ্বাস, দিনরাত আমাকে লভলভ লাগের ছোঁয়া দারছে।

.....যেদিন জানা গেল তোমার অর্ধেক শরীর অবশ হয়ে গেছে—ভাল হবার আশা বিশেষ নেই, সেদিন তুমি ছুঃখ করে বলেছিলে, তুমি যেরে গেল—

তোমার কাছ থেকে আর কিছুই পাবার নেই। কিন্তু সব ভেবেও আমি তোমার দুঃখ হৃদয়ের দিনটিন অস্ত্র অপেক্ষা করে থাকতাম—আশা করে থাকতাম।
আশা ছাড়া কি মানুষ বাঁচে? কখনো না।

প্রেম?...জানি অলকনন্দাকে নিয়ে আমার সবচেয়ে ঘরে বাইরে একটা কুৎসিৎ সন্দেহ এবং ভয় রটেছিল। অলকনন্দার তেজালম্বর সহায়ত্ব আনাকে আকৃষ্ট করেছিল।

তাই মনে করেছিলাম সে যদি আমার অলস সংসারের হালটা তার বলিষ্ঠ হাতে ধরে তাহলে আমার অনেক উপকার হয়; যতদিন না মালীমাকে এখানে থাকবার অস্ত্র যাকী করান যায়। কাম্বীর লোভ ছেড়ে মালীমা এখানে এসে পাকবেন কিনা সে বিষয়ে আমার কখনো সন্দেহ ছিল বৈকি।

একথা সত্যি, অলকনন্দা একটু গায়ে পড়াগোচের—যা পাঁচজনের চোখে দৃষ্টিকটু লাগবেই। কাজেই পাঁচজনকে আমি দোষ দিছি না।

তুমিও জান বাড়ীতে, মানে সাংসারিক ঘাবড়ার ব্যাপারে, আমি লতার মত কাউকে আশ্রয় করে বাঁচতে পারি অর্থাৎ পরাশ্রয়ী। তাই আমি...বাইরোক আমার বুকতে পারা উচিত ছিল যে এ দেশটা বিপ্লবের নয়। যা লোকজনের মনও বিলম্বী নয়।

...অলকনন্দা খুব চালাক—সে লুপ্তবোণের অপব্যবহার করেনি। আমাকে সে বিয়ে করেছে আমার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নয়—আমার স্ত্রী হিসাবে সামাজিক প্রতিষ্ঠার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে। তাকে বিয়ে করে তার সুবিধা করে দিয়েছি যখনো কিন্তু আমার কোন লাভ হয়নি। বেশ বুকতে পারছি, “বাঁধিছ মিছে ঘর ভুলের বাজুয়ে—
উজান ধারা আসি ভাসিল চিরন্তরে।”
তবে তাকে একেবারে বঞ্চিত করতে ইচ্ছে নেই।

উইলের সন্তর্ভরণে সে কিছু টাকা পাবে।

তোমার মনেও একটা ছোট সন্দেহ জেগেছিল, আমি বুকতে পেরেছিলাম। কিন্তু যতবারই তোমাকে সত্য কথা বোঝাতে গিয়েছি ততবারই তুমি অতিমান করে কথা চাপা দিতে চেষ্টা কর। হৃদয় আমার মধ্যে কিছু পরিবর্তন তোমার নজরে পড়েছিল। আমি নিজেও ঠিক বুকতে পারিনি—প্রথমত বুকতে পারছি না, বর্তমান বাঁচি ছিলাম। যোধ হর কোন দৃষ্টগ্রহ আমাকে জটিলতার মধ্যে ফেল হতবুদ্ধিগ্রাস করে মজা দেখছিল।

...তোমার আমার বিয়ের ফটোটা এখনও আমার চোখের সামনে টাঙ্গান আছে। মাস কয়েক আগে যে বিবাহ-অরতী করেছিলাম, মনে আছে? সেদিনকার বকুলবুলের মালাগাছি আঁক গুঁকির গেছে তবু তার মন উদাস করা খন্ডের ট্রেসটুকু মরা অতীতকে বাঁচিয়ে তুলতে চাইছে, কিন্তু বাতাসের গোলা—থড়থড় শব্দ করে নিঃসৃতভাবে জানিয়ে দিচ্ছে, ‘সে নেই, সে নেই’।

নিজের মনকে কিজাগা করি, পাগল করেছিলাম কিনা। কিন্তু সমস্তই পাইনি। বাইরোক প্রারম্ভিত আও করব। অস্তিত্ব যদি না প্রারম্ভিত কথাটা অর্থহীন হয়ে থাকে। তোমার লাগে মাত্র কয়েক বক্টা পরেই দেখা হবে। তাবতেও বড় আনন্দ হচ্ছে? কোথায়? কবির ভাষা একটু বদলে—

“যাত্রি এসে যেনো বেশ দিনের পরাব্যায়ে—

তোমার আমার দেখা হবে সেই মোহনার ধারে।”

তুমি অপেক্ষা কর আমার জন্য।

তারপর...

বিভলবারের শ্রীমন্ত লক্ষণ তাঁকে কয়েকের ভক্ত মনোভব করলেও বিচলিত করতে পারেনি। আত্মহত্যা? হ্যাঁ, আত্মহত্যা ই কলেন ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট বিক্রমকান্ত সেন।



ছাদ

অনিম্ম বাগচী ।

আমাদের ছাদছুটি নিভাওই নিভিযিল, লক্ষ্যাতাপে
বিলিযিল নীড়ের স্বতন
পাশাপাশি অনায়াসে । ঘুরে কাছে সমান্তরাল
সম্মুখ উজ্জিত। বেবে আর কোন ছাদ নেই,

আর সেই আঁহা অন্ধকণ
আমাদের সমর ত বিবচন স্বপ্ন-স্বপ্ন। উড়ে-বাগুড়া
খোঁজ করুতর

ছুরঙ্গ ডানায় তার ঘূর্ণ নীল-লবঙ্গের কৈশে ওঠা

আকাশ-পাতাল
এখানে দাঁড়াতে এসে, একাধিক একদা প্রত্যন্তে কুঁচি,
নাম ছিল সংঘমিত্রা বার ।
আজো নদে পড়ে সেই লগিল-আলক-লক্ষ্য।

তোমাদের ছাদ-বেলা-প্রাচীরের গার ।
অন্তর্যগ গড়ে হয়ে প্রেম হয়ে, ডেউ হয়ে, নাম হয়ে,
কেউ হয়ে ডেকে ডেকে বার—
তোমার বিহ্বলি খুঁজে, খোঁপা ভেঙে, রাগুয়েল,
বাতালেয়া বার !

এই ছাদ আর তার ব্যবধান ছুটি হাত
নদে পড়ে যুগ্মবল এলে ;
নদে পড়ে কুঁচি ছিলে, হরতো বা চেয়েছিলে
মৌখিক কোন কিছু কবে,
সুখের বোহন। দিগে যে-মৌখিক ইষ্টাদের
ইতস্তত আলগোছে কলে
মৌহবী-বন্দন-ছাপ, তিবেজুখ-মিহিলের বত ;
তারি আবেদন নেকি করত তোমার ওই
নীহারিকা নেতুলার তবে কু

বুল বার বুল আসে বুকের চিবনির বোঁরা
বিশে বার আকাশের পটে,
এখানে প্রাণাব ওঠে, ওখানে সিনেমা-হল,
কোলাহল রাকগণই বটে !
কেবল 'বুকের' মত আমাদের স্বপনের পিরামিড ছাদছুটো
আর লব ছাদের আড়ালে
আজকে পারনা দেখা লগিল লক্ষ্যের মুখ,
উবার এঁরোড়ি ছিল আকাশে-হুড়ালে !



এখানে চাঁদিনী রাত

অবোধবন্ধু অধিকারী :

এখানে চাঁদিনী রাত

তার। তার। রাত আর আলোভরা রাত ।

এখানে রাতের বুকে জেগে নেই কেউ

রাতজাগা। এখানেই বিমিত্র নহন

রাতের সহজে নেই স্থগিত ডেউ।

এখানে শুধুই আছে রাত আর রাত

তবু, তারাতরা, আলোভরা রাত ।

এখানে রাতের ঘুম : রাত নিশ্চুপ

আহা ! রাত নিশ্চুপ ।

এখানে রাতের ভলে জ্যোৎস্নার ডেউ

বাইরে গভীর রাত : চোখে নেই ঘুম

আমি জেগে এইরাত জেগে নেই কেউ ।

বাইরে এখনো রাত : দেখে নেই আগ

আহা ! রাত নিশ্চুপ ।

এখানে রাতের মাঠ : গাছের ছায়া

মাঠে গাছের ছায়া

রাতের গ্রহর কটে : আনন্দ নন

এখনো রয়েছে জপে বলজলে রাত

নিদ্রার চোখে সেই অশ্রু বপন ।

ঝড়ের পরে

ঐগোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায় ।

নির্জন লব্ধ বেলা—বালিরাড়ি আর বনঝাউ ।

পড়ন্ত বোনের রঙে আদিগন্ত যে-মন উধাও—

সে-যদি লহা শোনে পিছু থেকে শাড়ীর আওরাজ

খন্ খন্, শুন্ শুন্ কোনো সুর ? হালকা মেঘাজ

নিমেষে সুসির হাতে ধরা দেয় ; উজান হাওড়ার

রজনীগন্ধার গন্ধ ভেসে আসে, মন কিরে চায়—

পড়ন্ত বোনের রঙ ছুটন্ত কর্ণার-বুকে খেলে ।

কতটুকু প্রথম দেখি অধিকল এমনি,—বিকলে ।

আর একদিন দেখি,—খুব ভোরে, আলো ও ছায়া

যখন স্থগারী-বনে গ্রাহ-পথ নিঃসাড় ঘুমায়ে,—

আলতো আঁচল টেনে লগেবর খিল খুলে নিরে

কৌতুক-নয়ন দিষ্টি ঘরা-ঘাটে মিহেজ হলিরে ।

যনে পড়ে, ছবিনের ছুইরুপ অস্তির জয়—

এল্লানেন্ড বাস-এ দেখি ক্রান্ত-পাখা সে তুমি ভো নয়,

কড়ের কম্পাতী ঘন, উড়ে এসে জুগোণ গ্রহের

কখন আশ্রয় নিলে অলহাৰ অকিস-কোটে !

কাকলী সেন

শ্রীভাষ্যর জন্মবর্তী

চৌমাথার গোলাপী রংয়ের আলোপী বাড়ীটার—
চোত বখন বাধা থেকে নাহতে নহতে বুক অসি এসে
দাঁড়ায় টিক সেই সবহটা জ্বায়েন্তের হিড়িক পড়ে।
জাবখানি বেধে বৃত্তে হবে বেলা নটা—কি বড় জোর
দশটা না হতে বার না। যে বার প্রবেশ প্রবিধে যতো
বাড়িই আয়গার আন্তর করে বসেছে—যেন বাইরেও ঘরে
বলে বাঁধাই এ্যালবানের স্তম্ভর ছবি দেখবে। ওরা
অলপতাকে ভাবে সধিনা জ্বর বাচালতাকে বলে
নেলা।

কাকলী রোজকারের মতো আজও পা চাঙ্গিরে
আসে। ওর কাঁধের সাভের বস্ত্র না গমক তার চোরে
বোর করি চের চের বেনী জকরী সামনের পথটুকু
নাড়িরে বাঙরা। উচ্চা মতো অগোচাল বলেভের
বইভলো হাত থেকে উপড়ে পড়ছে।

কাকলী রোজই ভাবে আর এ পথ মাতাবে না।
আজ গেকেই আভি, তিন সত্যি। তবুও কেন, আনি
কথানতো কাক হরে লেট না কোনদিন—হবেও না বুঝি।
পারে পাতে টিক আয়গার পৌঁছে বহরের বাধা গেছে
তাকানই তাকাবে। বাপাগটা গা-সত্ত্বা হরে গেছে
সকলের। কিছ বার জন্তে এত আশিখেত্যা গারে পড়া
তার একহতি জ্ঞানগিয়া নেই,—পাড়া পড়নীর ঘুর নেই।
কোনরকম রা নেই, গা নেই। পাঁচজনের সে একজন
নর বেন। তবু চেরে চেরে লেগে আর দেখে দেখে কি
ভাবে বেন। হবেও বা না চাইতেই বোঝ করি জীবনে
জননে এত বেনী পেরেছে চেখেছে যে দুবের স্বাদ ঘোলে
নিট্যেত আপত্তি হবে না তার।

গা শিঙি জলে বার কাকলীর। রাগে চুর্থে চোখে
ভল আসে। বইভলো হাত বদল করে নিজেকে
সামলে নেয়। বেরবাহুব দেখলেই পবের দিকে তাকিরে
জ্রাফা সাজা—যেন বা বোন ছাড়া আর গোখে দেখেনি
কোন খেরবাহুব। ন-বোন জ্ঞান, না বোন ধান।

জানা আছে বড় রাজ্যের বান বাঁচিরে রাখার মতো
চরিত্রির কোচ্চা। সব বহরের এক লম্বা, এক কথা।
দিনের বেলা ভাই বোন, কিছু সম্পর্ক অস্বয়কর। হাতে
ওরা হুঁলতাকে বলে প্রতিভা আর ভুলকে জানে প্রগতি।

কাকলীর চোখে বহতো না—পাড়া দিত না যদি
সে আর পাঁচজন ছেলের মতো দেখতো। হুঁ
বাঁধা করলে কোন কথাই উঠতো না। আঁচল ধরে
না টানুক নিধেন পিছু নিলেও সাধনা ছিল বৈকি। কমা
করা যেতো এ ভেবে বজ্রবাহুরে হাছুর তো—বহরের
ঘোষ।

অসতোব জন্ম দিন দিন কাকলীর ঘনে। বিবর্তিত
ভাংতে হবে ওর। চোখের জলে নাড়েরজলে কীধবে
ভাসবে—থৈ থৈ করবে সারা দেহ মন—পাঠে হরে
সাবধে শুধে না ওর নাম কাকলী সেন—ভেমন কাপের
বেরে। এক ডাকে পাঁচশো লোক জানে। ও নেই-
নাছবের কতটুকু জানে, কতটুকু পেরেছে। এখনও নাক
টিপলে দুখ জেরোবে তার আবার এত বারনাকা।
মাহের কাঁটা বেড়ে খেতে জানে—মন্তানানো
কুঁড়ে চোট পেরেছে এমন কোন বহরের
ধীর্ধ্বাণ ওনেচে। বরষে অভিজ্ঞতার হাঁটুর
বরনী। সব চেরে ভালো বাড়ী গিরে বাপকে
পাঠিরে দিক পাড়া লভতে না হর তার সংগে
লভবে এক ছাত। টিক বরষে বিরে ধা করলে ওর
নাথার জেলে গাকতো—সৎসার বরনী। বাপ যদি
আবার বিরে করে কোনদিন তবে ওর মতো মেয়েকেই
বাইরে দরকারে চাইবে খুঁজবে। বুঝ দেখেছো কীধ
দেখোনি, টি-বি, দেখেছো ই-বি দেখোনি। স্যারামিন
একনাসায়ে পাখারা দিরে হুঁধেব উত্তেজনার দুখ
লাল করে প্রান্ত দেখে ক্রান্ত পাঠে পশ্চিম দিগন্তে হোলান
দিরে বলে পড়লেন; সন্তো পড় পড়। বাছুর লেছে
মরদানজুড়ে বাবারের সন্ধানে। আঁরা প্যারাম্যাস্টার

ঠেলতে ঠেলতে বাড়ী ফেরার ভাগিনে শেষ পাকটা গুণতি করছে। বাজারা খেলছে, বরগীরা মেয়ে দেখছে ফিরপোর নিজনের সারি জলে উঠল। বাসের সনুকের পটভূমিকার—ছুটা ছায়া আড়াআড়ি উঠল। ছাড়া-ছাড়ি হল অমর চুমোর ছোড়া। চোখ আর একজোড়া হারিয়ে।

কৌশিক ট্রাম থেকে নেমেই পড়ি কি মরি করে ক্রান্ত পা চালায়। ডান বাঁকলে উড়ে চলতো বৈকি—
যেয়েমাহুৎ বলে অনেক দিন সময় দিয়েছে—নইয়ে নইয়ে পোষ মানিয়েছে শেবন্তকু বিলা হুঁরে না যায় ব্যাপারটা। আয়া কখনের নজর পড়েছে এদিকে—
বিষাদ নেই কারোকে এ বাজারে। হিতা চাইবে। সুখোমুখি বলেছে ভুজনে প্যাবেড গ্রাউণ্ডে। কৌশিক কাকলীর একমুঠো আগুণ নিয়ে খেলা করে—জড়িয়ে লতিয়ে পত্ত করে ছেড়ে বের—সব্বরে বটকার—ভারগা বিশেষ—চাপ দেয়। দেখ না দেখ ফল করে নাথার কাপড় টেনে বের কাকলীর। ধরা গলার বৌ বলে ডাকে। বুঝি এ প্রজাবনা।

কিছুমূহে তাঁহুগলো থেকে গোল পাকিরে হোঁতা ওঠে। ফিরপোর নিজনের মাঝেরটা নিতে গেছে। বকটার ওপর থেকে বাঁশীতে কে বেন হুঁ দেয়। আকাশ থেকে একটা তারা খসে পড়ল।

এতটা আশা করেনি কাকলী। বৌ ডাকে ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। হলহল করে চোখের তারা। জীবনে এতটুকু পেরে, এতটুকু ডাকে আর সোহাগে আদরে শরৎ করে কাঁপছে—বহুরকের ছিলার মতো ভরাবো বোঝা বোঝা আনন্দে আর চাপা

উত্তেজনার। আর শাসন শোষণ নানে না মন্তব্য। অতিমানের অভিনয়ে আকুল হয়ে কারার ভেগে গড়ে নিজেকে সঁপে দেয়। ওর কোলে মাথা রেখে কুলে কুলে কাঁদে—কমা চাইবার সে কি আকৃতি—প্রান্তিকের সে কী ব্যাকুলতা। দেশ কাল আর মনের অধিকারে কতশতভঙ্গ এমনি পরিবেশে, এমনি শান্ততার স্রুত নের নতুনের বিলম্বের, নিটা বাথে বসিষ্ট বাহু, রক্তককে তকতকে বোঝা বোঝা এককালি আগুনি আর শিশুর কলসজনের স্বপ্ন দেখে, সজো নাগার মনের নাহুবা অফিস থেকে বাড়ী ফিরলে শাস্ত্র খাবারটুকু লম্বা লাগিরে শুষ্কিরে সামনে বেড়ে বাতাস দিচ্ছে তালপাতার ডানার—ছোট চাইটা বড় হবার, বাহু হবার ভাগিনে আশ্বাসে আগাবীকালের পড়া জালিম দিচ্ছে মটোরের সামনে—মা যোঁককার মতো খুঁ খুঁনে দিয়ে পুতো আঁকি সেরে বাইকোকাল লেনের চন্দা চড়িয়ে কাপড় গুড়ছে—বাবা জামার বুকে বোতাম সেলাই করতে দিয়ে বাইরের ঘরে গেছে এক হাত পাং খেলতে আর একমাত্র কোলের চেলটা ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ বিলবিলিরে ওঠে—হাতে টার পেয়েছে বেন।

পায়ের পায়ের এগিরে আসে কাকলী। পৌঁছে দেখে আশপাশের আর সবই ঠিক রয়েছে শুধু ঠিকে জারগাটা ঠা ঠা করছে—খুঁ করছে চিত্তার মতো। দুনিয়া বেন মুছাঁগেল। মনের অগোচরে ওপরে উঠে আসে হাতবান—নুকটাত একবারে খালি—মই সোনার লকেটের হারটি। ঠাঁ করা আরগাটা চেয়ে চেয়ে দেখে আর দেখে বেথে কী বেন ভাবে কাকলী—আজকে বুঝি এর পরিষ্কার অর্থ জানে একমাত্র এ মেয়ে আর সেই ছেলের।

ইথার

ঐক্যবোধী চলন দাল

গাণিতিক কাঙ্ক্ষ-রূপে ইথার আছে বলে ধরে নেওয়া হয়। Maxwell এবং Faraday র মনে ইথারের বাস্তব অস্তিত্ব সন্দেহ কোন সন্দেহ ছিল না। বললেই চলে। কিন্তু এ আছে, এ শুধু আমরা মনে মনেই স্বীকার করে নিই; এখন পর্যন্ত আমাদের মনের বাইরে কোন পরীক্ষা দিয়ে এর প্রত্যাক অস্তিত্বকে প্রমাণ করতে পারিনি। সুতরাং একে ধরে নিয়ে অত কয়েক বাঙালাই ভাল; যদি কোন বিজ্ঞান কিংবা অসম্ভব কালে উপনীত হয়, তা হলে একে স্বীকার করব, আর যদি প্রয়োজনীয় সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলে পৌঁছাই তা হলে স্বীকার করব।

ইথারের বাস্তব অস্তিত্ব সন্দেহে যে সমস্ত বুদ্ধি দেওয়া চলে, তা এই:—

(১) আলো এবং অন্যান্য বিদ্যুৎচুম্বক সঞ্চায়ী প্রক্রিয়া এক স্থিরগতিতে প্রসারিত হয় (propagated) একে অন্তর্ভুক্তই কোন এক প্রকারের মাধ্যমের মধ্য দিয়ে প্রসারণের এক স্থিরগতি বলে ব্যাখ্যা করা চলে।

(২) ইথারের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিলে ইথারের চাপের দ্বারা উদ্ভূত বৈদ্যুতিক শক্তিস্থলকে সহজে বুঝতে পারা যায়।

(৩) বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তি চাপ এবং পেষণ (stress & strain) এর অবস্থার দ্বিত কোন মাধ্যমের শক্তি, ইথারের অস্তিত্ব এই সত্যের এক সহজ নিদর্শন।

Michelson Morley র পরীক্ষা প্রথম চুক্তির প্রাথমিক ব্যাহত করে দিতেছে। তাঁরা দেখলেন, যে ইথারকে অনুমান করে নেওয়া হয়েছে, তার মধ্য দিয়ে প্রসারণের গতি ইথারের মধ্য দিয়ে চলমান এবং স্থির কোন দুই ব্যক্তির পক্ষে একই। ইথার আছে, একথা আমরা ধরে নিই কিংবা না মিউ, উপরোক্ত পরীক্ষার সত্য আনাদিগকে বিগতগতি বিজ্ঞান এবং বল বিজ্ঞান

(Kinematics & Dynamics) এর এমন সব প্রক্রিয়াকে যেনে নিতে বাধ্য করে, যেগুলো প্রাচীন গ্রীক এবং ল্যাটিন শাস্ত্রীয় প্রক্রিয়া থেকে আসা। বিজ্ঞান গতি বিজ্ঞান এবং বল বিজ্ঞানের এই সব নতুন প্রক্রিয়াগুলো আবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলে স্বীকৃত। যদি তা না হতো, তা হলে আমরা একটা impasse এ পৌঁছাতাম। এই প্রক্রিয়াগুলোর সত্যতা ইথারের অস্তিত্ব সন্দেহে কোন গঠিক ধরার আমাদের দিতে পারে না। কিন্তু ইথারের অনুমান এই পুরিস্থানে শিথিল হয় যে বিগতী অব সিনেটিভিটি দেখিয়েছে (ইথার দিয়ে বার ব্যাখ্যা দেওয়া চলে) সকল দর্শকের পক্ষে পর্যবেক্ষণ একই, যে কোন গতিবেগেই তারা সম্পাদিত, হোক না কেন। সকল দর্শকের পক্ষে পর্যবেক্ষণ একই, এর ফল এই যে আমরা ইথার নেই। সব চলমান দর্শকেরা স্বভাবত একই অবস্থানের উপর ঠাঁড়িয়ে, কারণ এমন কোন স্থির কাঠামো নেই তার দ্বারা তাদের গতি নিরূপণ করা চলে। ইথার আছে এ অনুমান এই সত্যের যেমন একটা সম্ভাব্য ব্যাখ্যা দিতে পারে, ইথার নেই এ অনুমানও যেমন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এবং অধিকন্তর সহজ ব্যাখ্যা দিতে পারে।

যদি তবু আমরা ইথারের অস্তিত্বের অনুমানকে ধরে রাখতে চাই তার মধ্য দিয়ে আলো এবং বিদ্যুৎচুম্বক সঞ্চায়ী প্রক্রিয়া সম্পাদিত হয়, তা হলে আমাদের এই ইথারের ভগ্নাবলীকে প্রকৃত পরীক্ষার কলাকলার সঙ্গে মিলিয়ে নিতে হবে। এক্ষেপে, আমরা দেখেছি যে একজন দর্শক এবং একটি আলোর উৎস যে ভাবেই নড়ুকনা, কোন মুহূর্তে আলোর উৎসটির দ্বারা বিচ্ছিন্নিত তরঙ্গ-বলয় এমন একটি গোলক হবে যে দর্শকটি ঠিক তার কেন্দ্রবলে থাকবে। যদি আলোর দ্রুতমান স্থিরগতি কেবলমাত্র এক ইথারীয় মাধ্যমের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণের স্থিরগতি ধরে থাকে, তা হলে এই সিদ্ধান্ত

উপনীত হওয়া চলে যে প্রত্যেক দর্শক তার নিজের চামপানে এক সম্পূর্ণ ইথারীয় বস্তু বহন করে। ইহা অল্পতপকে ইথারের অস্তিত্বকে অনেকাংশে সম্বলিত করে তুলে। আমরা সম্পূর্ণভাবে এতদূর পর্যন্ত যেতে পারি না যে নিশ্চয় করে বলে বলব, ইথার একটি দৃশ্যীয় অদৃশ্যবস্তু কল্পনার বস্তুতে পরিণত হলো। একটি সহজ উপমা এ দেখাবে। কতিপয় পর্বেটকের চোখে সাধারণতঃ বলতে গেলে একই রাসবস্তু দৃষ্টিগোচর হতে পারে। রাসবস্তুর কোণ প্রত্যেক পর্বেটকের পক্ষে এক হবে; এবং রাসবস্তুর দিকে বস্তু পরিমাণই এগিয়ে যাওয়া থাকে। কেন, সে কোণের কোন বৃত্তি ছাড়া না। যদি পর্বেটকেরা পর্বেৎকপের তুলনা করেন, তাহলে তাদের মনেতে হবে যে প্রত্যেক পর্বেটক তার নিজ নিজ রাসবস্তুকে তার চোখের সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। বা হোক, এ কিন্তু রাসবস্তু জিনিষটিকে কোন দৃশ্যীয় অদৃশ্যবস্তু সিদ্ধ বোধে ধার্য বলে গ্রহণ করবে না। বহন কোন একজন পর্বেটকের পক্ষে রাসবস্তু আর দেখা যাবে না, তখন কারো পক্ষেই আর সেটা দেখা যাবে না। যে সব আলোচনা আমরা করলাম, তা নিম্নলিখিতভাবে গ্রহণ করবো যে আলো কোন ইথারের মধ্যে দিয়ে প্রসারিত হতে পারে না; বা গ্রহণ করে তা হচ্ছে এই যে যদি ইথার বলে কিছু থেকে থাকে, তা হলে তা Maxwell এবং Faraday র কল্পিত বস্তুগত ইথার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।

এ

ইথারের অদৃশ্য দিগে স্থির অবস্থার স্থিত প্রণালীর বৈজ্ঞানিক অথবা চুম্বকীয় বেগগুলো বুঝার খুব তৎপরতা দেখা গিয়েছিল। চাপ এবং টান (pressure and tension) এর কোন এক সহজ প্রণালীকে দৃষ্ট বেগ গুলোর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করতে দেখা গিয়েছে। বিপরীতক্রমে ঐ ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক এবং চুম্বকীয় বেগ-গুলোকে একই সঙ্গে বুঝাতে পারেনা। যদি, যেমন সাধারণতঃ ঘরে নেওয়া হয়, বৈজ্ঞানিক বেগগুলো শুধু চাপ এবং টানের ব্যাখ্যা দিয়ে বুঝান চলে, তা হলে

চুম্বকীয় বেগগুলোর ক্ষেত্রে ভিন্ন এক ব্যাখ্যার সম্ভাবন করতে হয়, এবং ইথার চাপের অদৃশ্য তার প্রণালী স্থিতিস্থাপক হইতে কেসে। আরও দেখা গিয়েছে যে স্থির অবস্থার স্থিত প্রণালীতে ইথারের অদৃশ্য চরমান প্রণালীর বেগগুলোকে বুঝতে সম্পূর্ণভাবে অক্ষম। এইসব বেগগুলোর ব্যাখ্যা দিতে গেলে মনে হয় যে ইথারকে বেগপরিমাণ (momentum) স্তরীল বস্তু বলে ধরে নিতে হবে। রিপোর্টিভিটি বিপরীতে দেখা গিয়েছে যে বেগগুলোকে বেগপরিমাণের গতি (flow of momentum) দিয়ে ব্যাখ্যা করা চলে। তা হলে রিপোর্টিভিটি বিপরীত দেখিয়েছে যে ইথারীয় ব্যাখ্যার পক্ষে বা প্রয়োজন তা হচ্ছে ঐ বেগপরিমাণ। বহন করার ক্ষেত্রে কোন ইথার বার দিলেও ঐ বেগপরিমাণ গতির কল্পনা করা খুব সহজ, এবং বেগপরিমাণ গতি থেকে উদ্ভূত বেগ ও চাপের ধারণা দিক এমনি বার সঙ্গে আমরা পার্থক্য বিচার অস্ত্র সাধারণ (যথা :—Kinetic Theory of Gases) স্থাপিত।

বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তির ব্যাখ্যা সাধনেও প্রায় একই যত্ন ব্যাটে। ইথারের মধ্যে চাপ হয় বৈজ্ঞানিক নয় চুম্বকীয় শক্তি এ দুইয়ের এককে বেশ সহজ ভাবে বুঝতে পারবে, কিন্তু উভয়কে নয়। সাধারণতঃ ইথারীয় চাপের শক্তিকে অচল-তড়িৎ-বিজ্ঞান শব্দীয় (Electrostatic) শক্তি বলে ধরে নেওয়া হয়, তাতে করে চুম্বকীয় শক্তিকে বুঝার ক্ষেত্রে ইথারের গতিশক্তি (Kinetic energy)র সাহায্যকে টেনে আনবার প্রয়োজন পড়বে। আবার ইথারকে বেগবান বলে ধরে নিতে হবে; কিন্তু চুম্বকীয় শক্তির ব্যাখ্যা সাধনে যে পরিমাণ বেগের প্রয়োজন, তা বিদ্যুৎচুম্বক শব্দীয় শক্তিগুলোকে বুঝার পক্ষে প্রয়োজনীয় বেগপরিমাণ (momentum) থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তা হলে দেখা যাবে, সমস্ত রকমের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সহজ ব্যাখ্যা দিতে গেলে ইথারকে অতিপূর্ণ অটল ধর্মী হতে হবে, বা একই সঙ্গে বৈজ্ঞানিক এবং চুম্বকীয় শব্দীয় ব্যাখ্যা দিতে পারবে।

ইথাবে যদি থাকত, তা হলে এক সেট্‌ ব্লিও অকরেখাও থাকত যার সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সমস্ত অবস্থান এবং গতির পরিমাণ করা চলত। (Michelson-Morley) র পরীক্ষার ফলের ব্যাখ্যা দিতে গেলে ইথারের মধ্য দিয়ে চলমান প্রত্যেক বস্তুর এক লম্বোচন রীতির তথ্য তৈরী করতে হবে। এই লম্বোচন যান্ত্রিক উপারের দ্বারা নির্ধারণ করা বাবেনা, কারণ কোন পরিমাপক দণ্ড ও মাপবার বস্তুটির সমান্তরালে লম্বোচিত হবে; কিন্তু এতে মাধ্যাকর্ষণের উপার দ্বারা নির্ধারণ করা চলত যদি না প্রত্যেক মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ক্ষেত্র বস্তুর লম্বোচনকে বৃত্তে না পাবার মত সঙ্কচিত হত। কারণ যদি মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্র সঙ্কচিত না হত, পৃথিবীর বড় সমুদ্র স্কেল (main sealevel) পৃষ্ঠদেশ (surface) ইথারের মধ্য দিয়ে কোন গতির এক মাধ্যাকর্ষণ সমকোণী সমন্বয় (equipotential) হতো; কিন্তু এ সমন্বয় হয়ে থাকতে পারত না, যেহেতু ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতি এর কক্ষপথের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম হতো। এইভাবে ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতির ফলে আমরা অনুভব করতুম

দৈনন্দিন জোয়ার-ভাটা বিশিষ্ট ভরস্ব নিক্ষেপ দেখতে পারতাম। এরকম কোন ঘটনা দেখা যায়না। এ কথা সত্য; এগুলো যদি ঘটত, ইথারের মধ্য দিয়ে পৃথিবীর গতি এগুলো দৃষ্টিগোচর হবার পক্ষে যুক্ত হতোনা। কিন্তু রিলেটিভিটির তেনায়েলাইস্‌ড পিওরী স্পষ্ট ভাবেই দেখিয়েছে যে পৃথিবীর গতি বাই কোন হোকনা, এগুলো কখনও দেখা যাবার নয়। মাধ্যাকর্ষণের প্রক্রিয়া রিলেটিভিটির সর্ভাবলীর সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এ সম্বন্ধে সংশয়ের আর কোন অবকাশ নেই।

তা হলে, যদি আমরা ইথারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস করতে চাই, আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হই যে সমস্ত বিদ্যুৎচুম্বকীয় প্রক্রিয়া ইথারের মধ্য দিয়ে আমাদের গতিকে লুকানোর অন্তে বড়বস্তুর মধ্যে; শুধু তাই নয়, মাধ্যাকর্ষণের প্রক্রিয়াগুলো (যা এ পর্যন্ত ইথারের সঙ্গে কোন ব্যাপারেই সংশ্লিষ্ট নয় বলে জানা গেছে) ঐ একই বড়বস্তুর অংশীদার। এ থেকে এই সহজ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে যে ইথার নেই। যদি এই মত মেনে নিই, তা হলে লুকানোর আর কোন বড়বস্তুর হইল না, কারণ লুকানোর আর কিছু নেই।

শিশুসাহিত্যে সরসতা

অধ্যাপক—ঔষধনমোহন গোস্বামী

বাঁদের বিজ্ঞাপন দেখার ব্যতিক্রম আছে, তাঁদের চোখে এই বড়-গোচের বিজ্ঞাপনটা নিশ্চয় পড়েচে ইন্টিমেনে কিংবা অল্প কোথাও—

“Don't look bored. Remember,—A smile wins a smile and disarms grumbles. Smile aids efficiency. Smile is contagious. It always wins friends, inspires confidence in the customer. Let courtesy be your watchword.”

অর্থ—“উজ্জ্বল হবেন না। মনে রাখবেন—একটি হাসি আরেকটি হাসিকে ডেকে আনে ও বিরক্তিকে নষ্ট করে। হাসিতে কর্তৃপক্ষি বাড়ে। হাসি সফরশীল। হাসিতে বন্ধুত্ব জন্মে, বন্ধুত্বের মনে বিশ্বাস আনে। সৌভাগ্যই আপনার নীতি হোক।” অতএব, হাসুন। হাসিতে খরচা কম কিন্তু মুনাফা বেশী। হাসিতে কাজ হাসিল করা যায় সহজেই। শাস্ত্রীয়ভাববিদগণ বলেন যে, চট্টে গেলেন আরুণ্ডলের বে-পরিয়াণ নকি খরচা হয়, হাসতে গেলেন খরচা পড়ে তার চেয়ে ঢের কম। অথচ, কলগু হর চন্দকার—রূপ চট্টোচরী বলে বিলখোলা হাসি। যেব্যক, বেকরনা গজা দিরে লাভ কি বলুন? সুতরাং অধিক হাস কলান, হাসির চাপ বাড়ান। এই ডাফাডোলের বাজারে জুখের ‘বন্ধুত্বের ক্রে দেখ’ কুহুপবোহ না করে ‘হাসকুহু অট্টেই’ দীপার দিল্লী কবে চলে যান। কীচা বরলে কানী বাবার উচ্ছে হলে (অবশ্য পুণের ভালা ভরতে নয়, হাওরা বদলাতে), আত্মীয়দের আসর খিচ্ছেন বাস্তবায়ন নগ্নগুণে ধারের উপর হাসির আদি এবং অকৃত্রিম আশ্চর্য মলম লেপে দিরে চলে যান, ‘কারো কোন কতি নাহি তাহে’।

যদি কানী বদলে ফাঁসীই যেতে হয়, হাসতে হাসতে বকেভে ‘জীবনের জয়গান’ গাইতে গাইতে

বেহেতে চম্পট দিন, আনবেন নির্বাণ একটা যেহো বকবের নহী বনে গেছেন। অতএব হাসি ভিক্ষাবাদ—হাসিল দেবের পাচালীর ভর-অরকার হোক। ‘তুহু অকারণ পুণকে’ যদি হাসতে চান, হাসুন কিংবা শুধু সকারণ লজিক বহি—কাউকে হাসাতে ভগা ফাঁসাতে চান তো তাই করুন। শোহাই! অনঙ্গদেবের ‘একযেরাধিতীয়’ অষ্টটি অর্থ্যব্রতটিকে বস্ত্র কম পায়ের, কৌচকাবন; বখশের গমক কিংবা টিটকিরী দিটকিরী কালতু কালতু ছাড়বেন না। লকলের ভালর গুজ্জই বলছি। এতে খাঁদের আবার মত ‘লডবক্তিয়া নরীল’, ‘পিতবাডু চোহাবা, তাঁদের অশান্তি ত হবেই, তা ছাড়া মেঘনাদ বহের সেই বমকে-খেয়ে-বাওরা কলিটা—‘চলি হবে (বাবে) বদপুত্র অকালে’—কলগু ত বেতে পারে! কি করণ আছে, বশাই, টেঁসে বাবার—গণ্ডাকতক জুজুটার লাহন লগাটে স্টেটে! সুতরাং তাঁত বোনাই ভাল, গরু কেনবার বহকার নেই। এই সঙ্গে বলে রাখা ভাল যে, হাসারও একটা মাত্রা আছে। হাস্যকোহিরাও যেমন খারাপ, হাইপার চাসিও ব্রিক্ ডেমনি। ইয়ারবকীদেব প্রোগান ‘হেসে নাও ছুদিন বইভো নয়’ কিংবা চাবাকী সাইয়েন ‘বাও দাও বখা মায়ো’—যেনে চললে জীবনটা ছুদিনের হলেও ফেঁসে যেতে হবে এবং মজা মারার বদলে পড়ে পড়ে মারই যেতে হবে। চাপকা পণ্ডিত বলে গেছেন না— ‘লব্বভাত্তগহিতদ্’! কাজ কি ও-লব কামেলায়!

আমাদের সাহিত্যে (চৌঙ ও বড় ছজনদেরই) হাসি কিনিগটা হায়েশ নজর পড়ে না। যে লেখকের ভিখারীরা পবিত্র ফিলফজী আওড়ার, শহর-চৈতন্তের বয়ে, কাড়ে, তারা তো এইবিষটিকে সেরেক সুৎকারে নজর মত উড়িয়ে দিরে পরের ভগবতটার (আভে কিনা, কে জানে!) নাগাল পাবার জন্য লগা বাড়িয়ে পণ্ডিতী সাহিত্যে হাসিটা ছিল লগা-লবী ও বিব্বকদের

বস্ত্রে। সখাসমীহা যাকে যাকে অত্যন্ত সাবধানে ফিট-নষ্ট; ঠাট্টা-বোটেকো, ভাকরা-ক্যাকরা করত অড়ালে আবডালে। বিদূষকঃ লম্ব করে হসন্ত বা হাসাত না। তাদেব সতকরী পেশাই ছিল—হাসানো। পরে অবশ্য এই বিদূষকেরা হয়েছিল অধেঁক ফলটাক্, আর অধেঁক গোপালকাঁড়।

নিম্ন (বিশেষত লাল) রাসের নাটকগুলোর দিলদারী তাবটার সংরত বিদূষক-খাজুর উক্তরাবিহার আছে। নাটকগুলোতে হাসির পাঁচকোড়ন বরাবরই ছিল—সে 'নাট্যিক রমনারাগ' থেকে আরম্ভ করে সিঁচিৎ চম্প-অমৃতপাল-কীরোথ প্রসাদ দিগবেরে যথো। কাব্য বা গজ সাহিত্যে হাসি কতু দেখা যায়, কতু দেখা যায় না। আদি বুগের কাব্যে হাসি নেই, আভে, কাত্যাকর পাঁচটি ভালের সমস্তা নিয়ে মাঝার বাম পায়ে ফেলা। যথ বুগের কাব্যে কয়েকটা বাবাবরা রসিকতার চাহা বেরোল তাবও গোড়ার দিকটা অলীলতার কাটার ভিত্তি। এই নিয়ে নাগাড় স্তম্ভচম্প পণ্ডিত বোড়-বড়ি-খাড়া করলেন। ইংরেজ আমল পতনের দিককার কবি টেবরগুপ্ত খানিকটা ইহাকী করে হাসিয়ে গেলেন, বেশ লাগলো। গল্পের দিকটার হাসি আরও কম। বিজ্ঞানগর বখার লেখার বড় রাসভারী লোক। বক্তিব-চম্পে হাসি চাপা চৌটের কীকেই মিলিয়ে গেল। তাঁর খাডার বড় নাকটি সাহিত্যে সর্বদাই উঠিয়ে রইল।

• নীতি সাহিত্যে হাসিকে ইতি করে দিলে।

পরে স্ববীজ্ঞনাধ-অবনীজ্ঞনাধ-প্রদম নাথ এলেন। সাহিত্যে হস্ত-সনাথ হল, গমে-গমে, আলাপ-আলোচনার, রেবার-লেখার। এঁরা হাসতে ও হাসাতে চুই-ই আনন্তেন বেটা বৈবাৎ নজরে পড়ে। শব্দচম্পের পরদ কিছু বেনদার 'বুড় রান বৃক্ষ বৃক্ষগুলোতে ভাষা দিতে দিতেই শেষ হয়ে গেল, তত্বলোকের আর হাসা হয়ে উঠল না। এই তো গেল বড়দের মহলের কথা। ছোটদের কথা বলি।

আমাদের মনে যদি কাঁচকলা কাকরের ভাগ্যে

পড়ে থাকে সেটা এই ছোটরাই। বুধে বড় বড় বড় হুগি-ই বলি না কেন, আমরা মনে মনে বেশ জানি যে এদের কল্প প্রেরাজনীত সুখ-সুবিধে আমরা নেহাৎ লাগে না। পড়লে কবি না, 'নগবনরাহণ' খরচা না করে 'সুখবনে' যদি মেলে এই আশার। অথচ বড় হলে যদি এদের কাছ থেকে বোল আনার কথা থাকেনক কম পাই, তবে বুধ গোমড়া করে থাকি।

শিতদের হাসি জিনিষটা বুধে লেগেই থাকে। বা হোক, তা হোক নিয়ে শিতরা মাতামাতি করে। ওরা সবাই হাস্তানেশের ঢেলা। কচিদের জগতই আলাদা, আমাদের কাছে যা একবারে অসম্ভব। কিছু নমুনা দিচ্ছি। ওদের মেনে আছে নানা আভের জীব—ব্যাঙ-প্যাঙ-পাকু-মুহ (এরা ব্যাঙের দুই সম্পর্কে বড়-ছোট মাথা এবং দিল্পাজীর পিসতুতো ভাই), লিঙচু-পিঙচু-টিঙচু (চীনদেশের ইঁদুর), টিকী-পোকানা-আশোজা (টিকিটী, নাকডসা, আরসোশার আভের), ভ্যাংহাড-ব্যাংহাড-পাশোঠ (ভোঁড় ও প্যাঁচার পাড়াবুতো ভাই)। এরা আর পানভুজা-গবাদি-কুলদিলালী (পানভুজা, গবাদি, জিলিপী আভের)। ইন্টি-বিন্টি-সিন্টিকে নিয়ে ওদের গান আছে—

ইন্টি, বিন্টি সিন্টি, খেলা করে গাছের আড়াল দিয়ে,
শনিবারে একদিন নাকিগুরে গেরেছিল গান,
তাই শুনে ইন্টি বিন্টির উড়ে গেল ঝোণ।
ইন্টির বিধে পেল, গাছ থেকে নেবে এল
বিড়ুটা খাব বলে কাঁদিল রে।

বা এসে হুবা দিল, বাওরা বাওরা হুতে গেল,
ইন্টি বিন্টি-রাগ করে শুতে গেল রে॥

এবং

আমি একটা হাথায়েলে আমি এক একটা,
আমি আমার হুড়িয়ে পেছন মানিবাগটা।
চাদের আলোতে দেখি আরে হি হি,
এবে ট্রামগাড়ী চাপা পড়া ব্যাঙ চাপটা॥
এই ছড়াগুলো হল ক্রীকচরী ইঁদুরের দিদিমসিন্দেব

ছেলে ভুলনো। গান। তখন কচিরা ধরে ধরে হাঁটা ছেড়েছে, মাঘেরা—'ইট-খোটিয়ার খাটে যে, টাংড়ুকা সোনা হাঁটে রে'—বলে সোনাদের আর হাঁটান না। ছোটরা তখন নিজেরাই গড়গড়িয়ে হাঁটছে, হয়তো বা আপন মনে হুড়ু বাঁধছে—

হাঙড়ার পুল বেন কানের দুল।

পেঁচোর ঠ্যাঙটা নারকুলে কুল ॥

কিংবা

বুলবুলিতে ছাকু বাধতেছে ভাই।

তুহুনিরা নিয়ে খাচ্ছে বে ভাই ॥

এমন আরো কত কী। এই চক্কাগুলো সাহিত্য বাগিচার বেড়ার বাইরের আপাছা—জমার অব্যবহৃত, বাড়ে অব্যবহৃত আর ঘরে কিংবা নাগাও বার অজান্তে।

শিশুদের হাসি সাহিত্যে ধরে রেখেছেন বঁারা, তাঁরা আমাদের দেশে মুষ্টিমেয়। এই মুষ্টি যে কবে পৃথিবীতে করবে তাও জানা নাই। শিশুরা এখন কিশোর পরিশ্রুত হয়, তখন হাসির বিষয়বস্তুটা স্বাভাবিক ভাবেই বার বদলে। শিশুর চরিত্রবস্তুদ্বী (শিবরাম চক্রবর্তীর) কথা বলাতে, পরন্তুরামের (হাতশেখর বসুর) গল্পে তখন এরা রল পায়। শিশুরা সাহিত্যে কথার কাকতালিক, মজার জিনিসগুলি আছে, বার ঠাকুরাকে খুঁজে পাওয়া যায় গুপ্ত কবির ভাষাতে। পরন্তুরামী সাহিত্যে বঁারা 'ভুড়ু' খার আর বঁারা 'টোমাক' বান, 'দুজনবেই। এতে যে রস আছে, ইংরেজীতে তাকে বলে 'হামর' (humour)—সে রস আখের মত, বস্তু চিগানো ব্যঙ্গ, শুভই বোঁরার। 'হহবানের বস', 'কচ্ছনৌ', গজাণিকা' বঁারা পড়েছেন, তাঁরা এ কথার মর্ম বুঝবেন। হাতশেখরের তুলসি বুড়ো 'বিভালাকী বিধুবুহী'-কে আশীর্বাদ করছেন—'বা তোমার ঠোঁটের সিন্দুর অক্ষর হোক'। 'কচি' লালিমা পাল নামের পাশে অ্যাক্টে একটা বড় গোছের 'পুং' যোগ করছে, পাছে শোকে তাকে নাব দেখে জ্বালোক রলে ভুল করে। সিঁদেখরী

গিমিটেডের কান্ধ-বুড়ু, পাড়-বাবদারী, খোঁটা-পাটনার-রশিম্বর নাম আওড়ায়—'ঐবগা-সংস্কৃত হুজি সো হামার নহি' (ঐবগা সংস্কৃত হুজি সে আমার নয়!) তাখের সাহায্য পরন্তুরামের ভেঙে রলের করণাকে বইয়ে দিচ্ছেন সাহিত্যে পরন্তুরাম।

শিশুসাহিত্যে হাসির পরিবেশন আর একজন করেছিলেন—তিনি লুকুমার রায়। 'একটি দিনের কমলের মত' (lily of a day) তাঁর জীবৎকাল সামাজ্য [১৮৮৭-১৯২০ খ্রি:] কিছ্র কৃতিত্ব অসামান্য। পূর্ব-পাকিস্তান মহানসিংহের [মজরা গ্রাম] এই রায়বংশটির উপর বাগদেবীর আশীর্বাদ বসিত হয়েছে অল্পপণ তাবে। শিশু উপেক্ষিকেশ্বর, বৃগল ভাট্টামানার নারদারঞ্জন ও মুক্তিবারঞ্জন, বৃগল গুরুভাত কুলদা ও প্রবোধারঞ্জন এবং নিজের বৃগল অল্পপণ জীবিত ও জীবিত সাহিত্যে অগণ্ডে গুপ্তিচিত। লুকুমার রায় তাঁর ৩৬ বৎসর জীবৎকালের মধ্যেই লুকুমার 'মনসেঙ্গ'-ক্রাং, বের করেছিলেন হাতে-লেখা-কাগজ —'সাজে ব্রজি ভাঙ্গা', বিলেত থেকে কটো ও রক লম্বা খেতাব (F. R. P. S.) পেয়েছিলেন এবং এদেশে প্রথম হাতটোন রক চাপু করেছিলেন। তাঁর চকি-জাকার হাতটি পেয়েছেন তাঁর ছেলে, সন্তানিত রায়। লুকুমার রায়ের 'আবোল-ভাবোল', 'হ-অ-ব-র-ল' 'পাগলা-মত', 'বহুজনী', 'জালাপালা', 'জবাক জলপান' 'লম্বাঘের মজিমেলা', 'চলচিত্তকরী', শিশু মহলের চির আদরের বই। এই 'আজগুবি চালা বেটিক খেতাল' সাহিত্যের ইংরেজী নাম হল 'মনসেঙ্গ'—বাঙালির জীবিত আবাজবের লুকুমারি। বিলাতী লেখক লাইন্স ক্যারলের 'আজব ঘেনে আলিস' (Alice the Wonderland), 'খেত বীর' [White Knight]—এর মত—।

লুকুমার রায়ের লেখা পড়তে মজা লাগে। ইংরেজীতে 'হামর' শব্দের ব্যাখ্যা হচ্ছে—জীবনের দুর্ভাগ্যবশত উপর পরস্পর [Sympathy with the

seamy side of life]। সুকুমার রায়ের লেখাও ছিল এই ধরন। তাঁর লেখার হাসি হাসিতেই শেষ হয়ে গেছে—কোন কান্নার দান দিয়ে উঠে সেই হাসি কিনতে হয় নি। তাঁর ভাব শুভাবার মধ্যে 'বাং-হাত কাঁকড়া' ব্যাপার ছিল না, ছিল চমৎকার মিতালী। মিলগুয়ালা কৌকদার কনি প্রবান চট্টল চন্দ্র। অত্যন্ত গোপী নিষ্ঠা ভাবার বোকা চড়ে 'বেহাল হলের' আশ্বব দেখে চলেছে টগবগিয়ে। বিদেশী মন [আরবী, ফারসী, ইংরেজী] লাগাবার কাঁচকাটা। সুন্দর। ছোটখের নাটকগুলোও গতিরলে ভুলপুর! পাক। সুশিক্ষিতার আশ্রয় তাঁর লেখার পাতার পাতার মজার পড়ে। ছোটখের বই লিখতে গিয়ে তিনি ছবি ও ছড়াতে আপন সব্যসাচি প্রমাণ করেছেন। শিক-বনের দরজার কড়াঘটিতে তিনি টিকমত আওরাজ গিরেছিলেন এবং তাই কলকর্তার লাড়ও পেয়েছিলেন অপরিমিত। তাঁর আঁকা ছবিগুলো কাটুন নয় অথচ অসম্ভব রকমের অসম্ভব। এগুলো শুধু উপভোগ্যই নয়, অস্বস্তি বোধ্যও বটে। পাছে 'অসম্মিতকু রসনিবেদন' হতে যায়, এই উৎকর্ষাও যে তাঁর মনে একেবারেই ছিল না এমন নয়। তাঁর নিজেই এ সাহিত্য অঙ্গনের অগ্রদূতের কিছু অভিমত এই সঙ্গে দেওয়া হল—

“বাংলা আভ্যন্তরীণ, বাংলা উদ্ভট, বাংলা অসম্ভব, তাহাদের লইকই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খোলাসারের বই, সুস্বাদু সে রস বাহারা উপভোগ করিতে-পারেন না, এ পুস্তক তাহাদের জন্য নহে।” (কৈফিয়ৎ—আবোল-তাবোল]

“সুকুমারের লেখনী থেকে যে অসম্মিত হাতবদের উৎসাহ্যতা বাঙ্গালী সাহিত্যকে অতিবিক্ত করেছে তা অতুলনীয়। তাঁর সুশিক্ষিত হৃদয়ের বিভিন্ন ও বহুস্তর গতি, তাঁর ভাবসমাবেশের অতাবলী অসংলগ্নতা পড়ে পড়ে চমৎকতিত আসে। তাঁর স্বভাবের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সংস্কৃতির পাণ্ডীর্থ ছিল সেই অজই তিনি

তাঁর বৈপরীত্য এমন বেলোজলে দেখাতে পেরেছিলেন। বহু সাহিত্যে ব্যাঘ্র হসিকতার উৎকর্ষী দৃষ্টান্ত আছে। কবেকটি দেখা গিয়েছে কিন্তু সুকুমারের অজল ছাড়া-ছড়ালের বিশেষত্ব তাঁর প্রতিভার যে স্বকীর্তির পরিচয় দিয়েছে তাঁর ঠিক সমপ্রেশীর রচনা দেখা যায় না। তাঁর এ বিস্তৃত হাসির কানের সঙ্গে সবেই তাঁর অকাল মৃত্যুর সঙ্কটপতা পাঠকদের মনে চিরকালের অঙ্ক অঙ্কিত হয়ে রইল।” [স্বীকৃতি—‘আবোল-তাবোল’ থেকে উদ্ধৃত]

“নিজেকে হাসাবার জন্যে সুকুমার তার পরকে কাঁধাতেন না। দুর্ব্যগ্রস্ত মানবের কাহিনীকে সৌন্দর্য-ভাবে সাহিত্যও নাটকে এনে চোখের জল ফেলাবার যে চেষ্টা তিনি বেধে এসেছেন, সেটা তিনি পছন্দ করতেন না। পত্নীকারের ধরন দিয়ে তিনি তাদের দুঃখ অস্বস্তি করতেন। হাসির ভিতর দিয়ে হুটে বেগত তাহদের অঙ্ক তাঁর কল্পনা। বাংলা লবার নিচে পড়ে গয়েছে, তাঁদের বেদনা তাঁর মনে জেগেছিল। সমবেদনা দিয়ে তিনি সকলকে কাঁতে টানতেন। এই সমবেদনা শুধু ব্যক্তিগত মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, সমস্ত জাতির মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল।” [কমলিনাগ নাগ—‘আবোল-তাবোল’ থেকে উদ্ধৃত]

ছোটখের অঙ্ক সুকুমার রাই যে-অঙ্গণে স্থিতি করে গেছেন, তার কিছু নবুনা দিচ্ছি। এই অঙ্গণের রাজা খ্রীষ্ট ১০৮ অব্দকল্পে অরুণ, ‘বহারাঙ্গা অব্ পাদাভপূর’ নন, তিনি ‘বোলাগড়ের রাজা’, বিনি চবির জেসে বাঁধিয়ে রাখেন আমলগু তাঙ্গা। বস্তীর জাঘাতে আভ্যের গড় শুঁকে বুড়ো-হাবড়া উজীর বৃশসি-বাঁধা পাথ কাগন গড় শোঁকা কি সহজ কথা—‘বাগের কি স্তেজ বুড়োর পাথ না সে যে অঙ্কা’। রাজার সমস্তা আগণে—নেড়া বেলভলাতে কথার টার ৭’ ডিক্তী সমাধান করে—তাদের পাড়ার নেড়া বেলভলাতে আসে ‘হরে হরে হরতো মাসে নিমেন পক্ষে পটিনবাহ’। টুলো পতিতরা ‘ঠাল ঠাল জ্ব জ্ব জ্ব বরে ‘গড়া’র জ্বি অরীপ করেন আর ‘টাকের উপর ডাকের টিকিট’ মায়েন।

‘গণকমর বিশ্বকর শিকড়ে’ কি-যে ছাইতাম হজে, তা
এঁদের কিছুতেই ‘বুঝিয়ে বসা’ হয়ে উঠে না। ওস্তাদ
খাঁ সাহেবেরা ‘স্ববহ-সান্নে’ ধাঁড়ে ধাঁড়ে ক্রম্ দেড়ে বেড়ে’
করে কোলে মেঘরাজ করেন। জল্পশোকেরা বিখ্যেব
নোটবই পেলিল মিরে গণ হাঁটেন। দৈবাৎ ধাঁড়ে
ত্যাগ করলে বিশ্বকোবে তার প্রতিবিধান লেখা নাই—
দেখে বুঝে পড়েন। ধাঁড়ে শুভোয় শুভুক্, কি আর
করা যাবে! [এই বেবে মনে পড়ে উইল্‌সনের সচিব
বিজ্ঞাপন—‘আপনি কি ছাবাইতেছেন জানেন না’!]
গণকবরের দশচক্রে পড়ে পাড়ার নন্দধুড়ো চক্ষু শিকের
তুলে আন্তে ভূত হয়ে বসে থাকেন। বিজ্ঞানীরা ‘হুগুতে
ম্যাগনেট’ ফেলে, বাধা বিরে রিস্ক্রেট্ করে, ইঁট মিরে
ভেগসিটি করে, হুগু খোরাতে চোটা করেন। পালোহান
বটীচরণ ‘খেলার চলে হস্তী লোকেন বখন তখন’। আবার
পেঁকাটি-মার্কী প্যলোরানঅক্স জোড়া কড়িঙ্ক গির ‘ভোন্ট-
পরোয়া’ অল্‌ রাইট্, হাউ ডু ইউ ডু ওল্‌ নাইট্’ বলে
আপন আপন ‘হাল-জান্’ বাঁচায়। নইলে যে রাঙা-
পাগড়ী ‘একুশে আইনের’ প্যাচে ফেলে এক নম্বর হুক
মেবে। আক্সাদী বেরে হালে, ছিট-কাঁহনী যেরে কাঁদে,
ডানপিটে ছেলে যোনবাতি চোখে, ‘ঘরমর নীল কালি
জলে কপ্‌ কপ্‌ মাছি যেরে বুথে দেয় তুলে’, কাগা-বগা-
করে চুল ছাটা কাগ-ভাডানো ব্যাডা ছেলে অক কবে—
সাত ছুগুণে চোঁদর চার নাথলে হাতে বাকী থাকে
পেন্সিল। বাবুরাম সাপুড়ে ‘গমিতনখমত’ বোঠুর
সাপ মিরে পাড়ার পাড়ার খেলা দেখায়। কত রঙ-
বেরঙের জীবজন্তুই না আছে এখানে—ডবল-ল্যাক
জঁকো-বুখো জাংলা, বহরগী কুমড়ো-পটোল, আকিসী

ট্যালগক, গোমড়াবুখো রামগকড়ের ডানা, হাঁসআক
[হাঁস+সজাক], বকজল [বক+কজল], হাতিমি
[হাতী+তিমি] আরও কত কি! তা চাড়া রাত-
বিরেতে ‘নোংরাবুখো হুটকো’, পাড়ভুন্তের আক
জানাকে’ খেলা করতে দেখা যায়, একেবারে স্পষ্ট বিনা
চন্দ্রমাসে।

শিল্পের অঙ্গ চাই এমনি অগৎ. এমনি আবহাওয়া,
যেখানে গুরুগঙ্গীরা গার্জেনী হুমকায় নেই, পণ্ডিতী
বেতের সলাং সলাং নেই, আছে শুধু প্রাণভরা হাসি।
আজ ‘পুত্র পুত্র কেতাবেব পর্বতে’ শিল্পসাহিত্যে অগৎ
একেবারে ছেয়ে গেছে, এ কথা সত্য। কিন্তু এই
পর্বতের চাপে শিল্পচিত্ত ও নিষ্করণ ভাবে পিষ্ট হচ্ছে!
কোথায় সেই হাসির ‘বৈশাখের নিষ্কন্দেপ মেঘ’? ‘যে
আত্মাকর পরিবেশে ওরা ঠিকমত চলাফেরা, হাসিবেলা
করতে পারে, নানা পরিস্থিতিতে আজ তা আনন্দের
অতীত বলশেই হয়। দেখে বুঝে হয় যে, এদের পড়বার
ও পড়াবার মত সত্যিকার বইয়ের সংখ্যা নিতান্ত অল্প—
শুধু কতকগুলো বস্তীন্ বাহার দুর্বল ভাবার কাঁদে চড়ে
কাতারে কাতারে বছরে বছরে ছাপাখানা থেকে
বেরিরে আসছে। শিল্প-দরদী মরমিরা সাহিত্যিকেরা
থাকা শিল্পরনের অন্ধরমহলের নিতান্ত কাডাকাডি আছেন
থাকা তাগের বেশের খুঁটিনাটি খবরাখবর রাখেন, তাঁদের
তত অভ্যাস কামনা করছি উৎকণ্ঠিত চিত্তে। আজ
আনন্দ উত্তা, সমস্ত অবহিত আবর্জনা শাক্ করে গথ-
বোঁকা ছেলেরদের পথনির্দেশ দিন, বসিষ্ঠ হাতে তাগের
বিকা ও আনন্দের ভিত্তি স্থাপন করে ইমারত গড়ে
তুলুন, ভবিষ্যের জাতীয় সম্পদের সর্বাঙ্গীন কৃশল যোক্ত।



আলোচনা

শ্রীঅমিনী কুমার গঙ্গোপাধ্যায়

সম্পাদক মহাশয় সন্থীপেত্রে আপনাতঃ বহিঃ পত্রিকার ১০৪২ সালের কানুন সংস্কার 'কাল পরিক্রম' গ্রন্থে শ্রীযুক্ত শশাঙ্ক মোহন চৌধুরী মহাশয়ের লিখিতাছেন, 'প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি রূপে স্তম্ভাঘটন লবণ সত্যাগ্রহ আন্দোলনে কাঁপিরে পড়বার আগেই কিং সরকারী কর্তৃপক্ষ তাঁকে সহিরে দিলেন বর্মা অকলে'।

শশাঙ্ক বাবু এখানে একটী বিশেষ ভুল করিয়াছেন। লবণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই সরকারী কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ কলিকাতার এক সভা ও শোভাযাত্রার ব্যাপার লইয়া শ্রীযুক্ত স্তম্ভাঘটন বহু, শ্রীযুক্ত তিরুপ শঙ্কর রাই, ডাঃ কে. এম. দাসগুপ্ত, শ্রীমতী গুপ্ত, শ্রীদেবেন দাস, শ্রীমণীল বানার্জী, শ্রীবীরেন মুখার্জী প্রভৃতিকে অতিবৃত্ত করেন। আলিপুরের প্রাডিপকাল ব্যাড্রিষ্টে মিঃ কে. এম. মুখার্জী অতিবৃত্ত প্রত্যেককে হয় বাস সন্ত্রম কারাগারে গণ্ডিত করেন। হাইকোর্টে আপিল করার তত্ত্ব চন্দ্রভূজার চট্টোপাধ্যায়, মিঃ কে. সি. গুপ্ত, শ্রীযুক্ত রঞ্জনবাবু চক্রবর্তী প্রভৃতি সেখানে প্রেরিত ছিলেন। দণ্ডদেশের পরই ভুলভিত্তি হাইকোর্টে বাইরা আপিলের ব্যবস্থা করিয়া জারিনের দরবার করান। হাইকোর্টে যে সর্ভে জারিন মঞ্জুর করিলেন, সে সর্ভ প্রথম বোয়্যা নব বিবেচনা করিয়া, স্তম্ভাঘটন আলিপুর কোর্টে হইতেই লস্কীনের লইয়া কারাগারে গমন করেন।

লবণ সত্যাগ্রহ যখন পূর্ণাঙ্গতবে চলিতেছিল তখনই আলিপুর জেলে জবরদস্ত গুপ্তার সোমনস্ক এবং তার অন্তরত্ব বর্ণের ভাণ্ডব নৃত্যের সঙ্গে অস্বাভাবিক অত্যাচার চলে। এই অত্যাচারের ফলে বাঙ্গালীর প্রাণের দন স্তম্ভাঘটনকে দুহা প্রাণ কোলে টানিয়া লইয়া

চলিয়াছিল। শ্রীযুক্ত স্তম্ভাঘটন বঙ্গীয় সেবা এবং এক অপরিচিত পথচারীর বয়স্ক দানবই সে দিন স্তম্ভাঘটনের জীবন রক্ষা পাইয়াছিল।

শশাঙ্ক বাবু বোম্ব হর এ কথাটা ভুলিয়া গিয়া বর্মা অকলের কথা অসময়ে আনিয়া ফেলিয়াছেন।

শশাঙ্ক বাবু আরও একটী ভুল করিয়াছেন। প্রথমদা (চট্টোপাধ্যায়) যখন লবণ সত্যাগ্রহে যোগদান করেন তখন তিনি কার্ণী সঙ্ঘের সভাপতি নন। কার্ণী-সঙ্ঘ লবণ-সত্যাগ্রহের বহু পূর্বেই লোপ পাইয়াছিল। লবণ সত্যাগ্রহের সময় অমরদা সভাপতি ছিলেন কার্ণ পরিষদের। লবণ-সত্যাগ্রহের সময় সেনগুপ্ত এবং তাঁদের সমর্থনকারী গোড়া কার্ণীপন্থী মল স্তম্ভাঘটনের মল পরিচালিত প্রাথমিক কংগ্রেসের সংগে যোগ দিয়া সত্যাগ্রহে যোগ দিতে নারাজ অথচ লবণ-সত্যাগ্রহ আন্দোলন লাফল) মণ্ডিত ক্রিতে হইবেই! কাজেই সেনগুপ্তের মল কার্ণ-পরিষদ নাম দিয়া লবণ-সত্যাগ্রহ পরিচালনার জন্ত এক প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাইয়া কাজ আরম্ভ করিলেন। অমরদা এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে লবণ-সত্যাগ্রহে যোগ দিয়া কারাবরণ করেন।

১৯৩০ সালে, কিরণ বাবু জেলে বাগদার পর হরিদা (চক্রবর্তী) প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদকের ডার প্রথম করেন। অল্প দিন মধ্যেই তাঁহাকে প্রেষার কড়া হয়। হরিদা জেলে বাগদার সময় সম্পাদকের দায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করেন; কিন্তু জাতীয় সংগ্রাহে দ্বাংগা পার্কের এক বক্তৃতার দ্বারা আমাকেও জেলে বাইরা আলিপুরে স্তম্ভাঘটন যে সেল-ওয়ার্ডে ছিলেন সেখানে আগ্রহ নিতে হয়।

সাহিত্য পরিচয়

এককালি বারান্দা—শ্রীমতী অন্নপূর্ণা গোবামী
এশিত। ইষ্টার্ন পাবলিশিং, কলিকাতা। মূল্য ২৮
টাকা মাত্র।

আলোচ্য পুস্তকখানি লেখিকার দশটি গল্পের
সংকলন। গল্পগুলি নিঃসন্দেহে সুখপাঠ্য। রচনার
উৎকর্ষের দিক থেকে বিচার করলে উল্লেখযোগ্য গল্প
হচ্ছে ‘এককালি বারান্দা’, ‘রূপান্তর’, ‘জৈক’, ‘নারী’,
‘লর বদি হর অহুতুল’ ও ‘জম্মদিন’। এর মধ্যে ‘এক-
কালি বারান্দা’ স্বীৰ্ঘক গল্পটিতে লেখিকা যুগ্মক বাক্যকে
কেন্দ্র করে বুদ্ধশরবতী যুগের যে ভীতনের ছবি
এঁকেছেন তা অসূর্য, বিশেষ করে এই গল্পের ভিতরে
তার সাহসের বিশিষ্ট পরিচয় আছে।

‘রূপান্তর’ গল্পটির মধ্যে একটি দরিদ্র দম্পতির আশা
আকাঙ্ক্ষার কাহিনীকে অতি সুন্দর করে লেখিকা
ভূষিত করেছেন। প্রাপ্য ডাক্তারের সহায়তহীন
চিরন্তিন পাঠক পাঠিকার মনে গভীর ভাবে রেখাপাত
করবে। তবু মনে হর গল্পটি আরো সংক্ষেপে বিবৃত
করা যেত এবং গল্পটি যে শেষপর্বে রেল কাটা পড়বেই
এরকম একটা আভাষ আগের থেকে বাড়ে পাঠক-
পাঠিকা না বুঝতে পারেন—এ গল্পে তার সচেতন
হওয়ার উদ্ভিষ্ট ছিলো।

‘জৈক’ গল্পটি সুলিখিত। আমাদের কৃতীর শির
কি ভাবে বিশেষী জিনিষের কাছে নিঃস্রুত হয়ে যাচ্ছে—
বিশেষী পণ্য কি ভাবে আমাদের গ্রাস করছে, তার
একটি সুন্দর চিত্র আঁকা হয়েছে এই গল্পে। লেখিকার
সাহাজ্জ্বল্যবিশীল মনটিকে এই গল্পে চমৎকার অঙ্কন করা
যায়। গল্পের মধ্যে ‘জৈক’ কথাটি লেখিকা বড়ো
বেশী ব্যবহার করেছেন।

সমস্ত বইটির মধ্যে আবার মনে হর, ‘নারী’ গল্পটি
সর্বশ্রেষ্ঠ। কয়েকটি সুখা মৈত্রের কর্তব্যভার জীবনের
মধ্যে যে অহুতুলীকে লেখিকা এখানে রূপায়িত
করেছেন তা একটি পরিচয় কবিতার মত অনবদ্য।

সব থেকে ভালো লাগলো, যেখানে কয়েকটি সুখা
মৈত্রের সিন্ধিতে সিন্ধুর দেওয়া হৃদয়সো—অত্যন্ত
নিপুণ হাতে লেখিকা এই চিত্রটিকে অঁকিতে পেরেছেন
বলে তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

‘লর বদি হর অহুতুল’ অত্যন্ত সাধারণ গ্রন্থের
কাহিনী। যদিও এটি লেখিকার বার বছর আগের রচনা,
তবু এই একমুগ পঠেও রস গ্রহণে আমাদের কোথাও
বিন্দুযাত্র বাধা ঘটেনা; বরং পড়তে পড়তে আশ্চর্যের
এই কর্তব্যভার এবং বিবৃত জীবনের মধ্যে চমৎকার একটি
রোমাঞ্চের আবহাওয়ার অতি সহজে চলে যেতে পারে।
যায় বলে পাঠক পাঠিকার অঙ্কুরিত সাধুবাদই তিনি
পাবেন।

এছের শেষতম গল্প ‘জম্মদিন’ও অত্যন্ত সুলিখিত এবং
সুশাসিত লোকে। সুপারিটেন্টেট্ট মইয় তাগুন্দারের
জম্মদিনকে কেন্দ্র করে লেখিকা সামান্যদের যে চরিত্র
চিত্রটিকে গল্পের উপজীব্য করে একটি মনোজ্ঞ এবং
সম্পূর্ণ চিত্র পরিবেশন করেছেন তার জন্তে তিনি
নিঃসন্দেহে ধন্যবাদার্থী।

‘কালো মেয়ে’ গল্পটি অবশ্য দীর্ঘ হতে গেছে এবং
শেষপর্বে গল্পটির পরিণতি অত্যন্ত দুর্বল হওয়ার পাঠক-
পাঠিকার মনে কোন রেখাপাত করে না।

‘শিল্পী’র বিষয়বস্তু বসন্ত চমৎকার পেয়েছিলেন
লেখিকা, তবুও সেটি যথাযথভাবে চিত্রিত না হওয়ার
জন্তে গল্পটি একেবারেই দান্য বোধেনি।

‘পথিতর’ সন্দেহও নেই কথা। ‘আহুতি’র মধ্যে
কল্প-রস-সকালের বিশেষ চৌকি আছে, কিন্তু তাও
সার্থক হয়ে ওঠেনি।

লেখিকার ভাষা সরল এবং কোনো কোনো অসঙ্গত
প্রকাশভঙ্গী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তার সংস্কারমুক্ত
এবং চুংলাহলিক মনকে আমরা প্রশংসা করি এবং
আগামী দিনে তার কাছ থেকে সার্থকতম রচনা পাবার
আশা রাখি।

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়



টালিন

গত এই মার্চ ৭৩ বৎসর বয়সে কণ-নাটক ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের পরিচালক টালিনের দেহাবসান ঘটেছে। তিন দিন পূর্বে তিনি বক্তৃতার কঠিন রোগে (cerebral thrombosis) অকস্মাৎ সংজ্ঞা হারিয়ে কেলেন। সংবাদটি প্রচারিত হওয়া ব্যক্তি দেশবিশেষের বহুলোক বিধাদে স্তিরমান হয়ে পড়েন। টালিনের নতানত, তাঁর চরিত্র, তাঁর জীবনের কার্যকলাপ বিভিন্ন লোক বিভিন্ন চোখে দেখে। এবং আজকের ছুনিয়ার বখান নানা আদর্শের সংঘাত ভীত হয়ে দেখা দিয়েছে, তখন তাই বাতাবিক। তবু যে-মাছুষ আজ তিনটি-দশক ধরে ছুনিয়ার এক বিশাল ভূখণ্ডের সর্বজনমাত্র—এবং বতঙ্গ অল্পমান করা যায় সর্বজনপ্রিয় নেতাও হয়েছিলেন, এবং ঐ বিরাট, বিচিত্র যেনে ক্রান্ত এক নতুন বিশ্ব সৃষ্টি করে তুলছিলেন, আর, তাইই সবে সবে সাত বৎসর ব্যাপী বিশ্বসংগ্রামে এক দানবীর শক্তির বিরুদ্ধে স্রেষ্ঠতম স্রোতার আসনে বসে অসাধারণ সাফল্য ও কৃত্তিক অর্জন করেছেন, সে-মাছুষের মৃত্যুতে কোনো মননশীল লোকই বিচলিত না হয়ে পারবে না। শুধু তাই নয়, সারা বিশ্বই অন্ধ ক্রম হয়ে ভবিষ্যতের দিকে চোরে ডাবছে, টালিনের স্থানে একজন বসলেন, কিন্তু তিনি কতোটা তাঁর স্থান পূর্ণ করতে পারবেন; টালিন জীবিত থাকতে সোভিয়েট রাষ্ট্রের এবং সমগ্র বিশ্বের ঐতিহাসিক একভাবে পরিগণিত লাভ করছিল, তাঁর অতাবেই বা কোন্ পরিগণিত লাভ করবে।

জতিয়ার এক দরিদ্র ছুটির ঘরে টালিনের জন্ম।

তাঁর মা চেহেছিলেন তাঁকে ধর্মবাহক করে গড়ে তুলতে।

তিনি পিতার ব্যবসায় ধরলেন না, মাতের অতিলাবও পূর্ণ করলেন না—বিপ্লবের আদর্শে অগ্রগণিত হয়ে উঠলেন এবং তার-শাসিত কুনিয়ার তার বা কল, অর্থাৎ, নির্বাসিতের নির্বাসিতের জীবন—তা-ই তিনি বরণ করে নিলেন। কিন্তু নির্বাসনে নিচ্ছেট বলে থাক। তাঁর অতাব-ধর্মের বিরোধী—নির্বাসন থেকে অন্ততঃ ছয়বার তিনি পালিয়ে যান এবং বিপ্লবের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই অতাব-ধর্ম যে কর্মপ্রবণতার পরিচয়, বিপ্লবোত্তর যুগে তাইই পূর্ণতার বিকাশ। বিপ্লবের প্রচারকার্যের লকে লকে মার্ক্সীয় বিপ্লবের নীতি সম্পর্কে তিনি অনলস পড়াশুনো এবং গভীর গবেষণা করেন। তাইই অন্ততম কল আত্মীয়তাবাদ সম্পর্কে সোভিয়েট নীতি। ভৌগোলিক সীমা, বৃত্তের দিক থেকে মানবগোষ্ঠীর পার্থক্য, ভাষা, ধর্ম ইত্যাদির ভিত্তিতে জাতীয় বৈচিত্র্য বা মাছুষের ইতিহাসে দেখা দিয়েছে, তাঁর বহুমুখী সমস্ত সমাধানের যুজ লেনিন দেন মার্ক্সীয় ধর্মের ভিত্তিতে। সেই যুজকেই বিন্দু করে সোভিয়েটের জাতীয় জীবনে এবং সাধারণভাবে সাম্যবাদী সমাজে প্রয়োগের নীতি বিচারের দায়িত্ব তিনি বিশেষভাবে টালিনের উপর স্তত করেন। এই যুজ ও এই নীতির অহুদ্রশেই লেনিন কণবিপ্লবের ঠিক পথেই পুরোনো কণসাম্রাজ্যের স্থলমান অধিবাসীদের কাছে এক যোবনা প্রচার করেন, তাতে মূলমান অধ্যুষিত অংশগুলিকে সোভিয়েট ইউনিয়ন থেকে পৃথক হয়ে স্ব-শাসিত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গুর অধিকার দেওয়া

হয়। আত্মনিয়ন্ত্রণের এই অধিকার অকৃত্রিমভাবে স্বীকার করে নেবার ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের ঐক্য সংহত হয়ে পড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ঐ একই নীতির অগ্রসরণে সোভিয়েটের শাসনতন্ত্রে সোভিয়েট ইউনিয়নের অন্তর্গত সমস্ত ট্রেটেরই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, এমন কি, সামরিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পর্যন্ত আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বাধীনতা স্বীকৃতি পেয়েছে।

কৃষিশিল্প সকল-ই একমিকে পেনিনের অসাধারণ বৈপ্লবিক প্রজ্ঞা ও ব্যক্তিত্ব এবং অপর দিকে ট্রুটস্কির অকৌশল কর্মদক্ষতার সনাতন। সাত বৎসর পর পেনিনের যখন মৃত্যু হয়, ট্রুটস্কি তখন সোভিয়েটের বিশাল মহাবিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতি-বিপ্লবী শক্তিকে পরাজিত করার কাজে ব্যস্ত। টালিন এই সময় সোভিয়েটের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। নেতৃত্ব কার আশা ছিল এবং কিভাবে এই প্রসঙ্গের যীবাংসা হয়, তা নিয়ে ট্রুটস্কি ও টালিনদ্বয়দের ততকাল থেকে বিতর্ক হুজু ও ইতিহাস রচিত হয়েছে। সে-যুক্তি ও ইতিহাসের সত্যাসত্য বিচারের স্থান এ নয়। এ কথা কিন্তু বললে অত্যাুক্তি হবে না যে, পেনিনের মৃত্যুর পর থেকে বিপ্লবী কৃষিকার ইতিহাস ও টালিনের জীবন এক ও অভিন্ন। সেই দিন থেকে এই জিন বৎসরে কৃষিকার এবং কৃষিকার জনগণের জীবনে যে বিপুল পরিবর্তন ও ঐক্যবোধ দেখা দিয়েছে, পৃথিবীর আর কোনো দেশে কখনও জিন বৎসরের ইতিহাসে ভেদনটি দেখা যায় নাই। এই কথা বলার সঙ্গে ছুটি কথা স্বীকার করি—প্রথমতঃ যে-সাম্যবাদী নীতির প্রযুক্তির ফলে এই বিপুল উন্নতি সম্ভব হয়েছে, সেই নীতির এমন অবিদ্যুত ক্ষেত্রে পরীক্ষা কৃষিকার ইতিহাসে এই প্রথম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বলি, প্রথম বলই যে-নেতার হাতে এই পরীক্ষা হয়েছে, এ-পরীক্ষার সাক্ষ্য তাঁর বিচক্ষণতার, কর্মকুশলতার ও এ নেতৃত্বশক্তির স্রোতের পরিচয়। বিতরিতঃ, এ-অভিযোগ অস্বীকার করা যায় না যে, এই উন্নতি সাধন করতে গিয়ে কৃষিকার জোতদার শ্রমীর লোভের

(Kulaks) উপর এবং অগণের সোভিয়েট নীতি-বিরোধীদের উপর নিষেধন হয়েছে। কিন্তু একথাও বলা বাহুল্য হবে, বর্তমানের এবং ভবিষ্যতের অগণিত মানুষের জীবনের হাস্য ও দুঃখবোচনের পৃথাকে যদি নিকটকর্তব্যে পারা যায়, তা হ'লে তার ক্ষয় নিষেধের ক্ষমতা ও স্বার্থকেই যারা একান্ত ক'রে দেখে, এমন কিছু লোকের নির্ঘাতনকে দুনিয়ার প্রাক-গাঙ্গী ইতিহাসের রাষ্ট্রনৈতিক নেতৃত্ব চিরদিন সমর্থনযোগ্যই মনে করে এসেছেন। গাঙ্গী নীতির কথা স্বতন্ত্র। মার্কস, লেনিন, ইলিন প্রভৃতি সাম্যবাদী নেতারাও গাঙ্গীজির মতো বিশ্বাস করতেন, রাষ্ট্রের একদিন কোনো প্রয়োজন থাকবে না। কিন্তু সাম্যবাদী চিন্তামারকদের বিশ্বাস, নৈরাশ্রী আসবে, শ্রমিক ক্রবকের একচ্ছত্র রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠার পর বা Dictatorship of the Proletariat-এর যারকত। সেই Dictatorship প্রতিষ্ঠার পন্থা হিংসা বা নিষ্ঠুরতা বঞ্চিত হবে, এমন কোনো কথা নেই। আর, যে-যুগে মানবজাতির হাতে উৎপাদনশক্তি এমন প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, উৎপাদকের চেয়ে বেকারের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে পড়ার সম্ভাবনাই বেশী, সে-যুগের প্রত্যেক গাঙ্গীজি বিশ্বাস করতে সক্ষম করেন যে, কোনো রকম একচ্ছত্র রাষ্ট্রই নৈরাশ্রী প্রতিষ্ঠার পন্থাকে সূচন করবে না—একচ্ছত্র রাষ্ট্র বরং সর্বাঙ্গিক রাষ্ট্র (totalitarian state) পরিণত হ'তে বাধ্য। নৈরাশ্রী প্রতিষ্ঠার পন্থা অহিংস গণতন্ত্রের পন্থা। কিন্তু কোনো সাম্যবাদী নেতার বিচার গাঙ্গী-নীতির বা গাঙ্গীযুগের বাণ্যক্রান্তে ক'রে লাভ নেই। টালিন ও টালিন-পদ্ধতি যদিও গাঙ্গী-যুগেরও বহু দূর পর্যন্ত ক্ষুদ্র রয়েছে, তবু টালিন সাম্যবাদী। সাম্যবাদী নীতিকে তিনি স্বতন্ত্র এগিয়ে নিতে পেরেছেন, টালিনের জীবনইতিহাস পরীক্ষাচেনার তাই হওয়া উচিত বাণ্যক্রান্ত।

সেদিক থেকে দেখতে গেলে প্রথমই আমাদের চোখে পড়ে টালিন ও ট্রুটস্কির ভিত্তর প্রথম ও প্রধান যে-নীতির বন্ধ, সেই নীতির দিকে। মার্কস, এঙ্গেলস,

লেনিন এবং সমস্ত সাম্যবাদী চিন্তানায়করাই যত্নে সাম্যবাদ এক আন্তর্জাতিক নীতি, সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম এক আন্তর্জাতিক সংগ্রাম, সাম্যবাদের ভিত্তিতে এক আন্তর্জাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হ'লে সাম্যবাদী সমাজের কোনো ভবিষ্যৎ নেই। এর অর্থ পাড়ার এই যে, সাম্যবাদী বিপ্লবকে সফল করতে গেলে বিশ্ববিপ্লব না ঘটবে উপায় নেই। টুর্কি ছিলেন এই যত্নের পোড়া সমর্থক। এবং যে-অরসিন তিনি নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, লেনিনের উপদেশেই ততদিন তিনি বিশ্ববিপ্লবের নীতি অগ্রগণ্য করতে চেষ্টা করেন। টালিন কিছু পোড়াতেই বিশ্বের সমস্ত পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের সম্মিলিত বিরুদ্ধতা এড়িয়ে যেতে চাইলেন এবং তিনি যে নতুন নীতি গড়ে তুললেন, তার নাম বিপ্লব Socialism in one country. তিনি দেখাতে চাইলেন যে, কোনো একটা দেশই সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। এবং তেমন ক'রে যদি সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ার কাছে সফলতা অর্জন করা যায়, তা হ'লে জনগণ যে চিরমাসমুজ্ঞ ও সঙ্কল জীবন বাপন করবে, তা-ই বিশ্ববিপ্লবের সহায়ক হবে, এই সফলতাই অস্ত্র যেন জনগণের কাছে একটা বুটাজ হয়ে থাকিবে বিপ্লবপ্রচারের কাজ করবে। বিরাট রূপ যেনের প্রাকৃতিক সম্পদের বৈচিত্র্যে ও বিশালতার টালিনের এই যত্ন ও নীতি আজ দ্রুত সফলতার দিকে চলেছে। তাঁর ব্যক্তিগত ও নেতৃত্ব গন্ত তিন দশক ধরে যেভাবে সমগ্র সোভিয়েট ইউনিয়নের জনগণকে অগ্রগণ্য দিচ্ছে, তাতে তারা বিপুল উৎসাহ উদ্দীপন-নিরে অস্ত্র পরিগ্রহ করেছে, হাসিমুখে অগাধ সৈন্ত, হুং-কট সাজেছে, বকুনিতে উর্বর করেছে, বরফে ঢাকা দেশকে বাহুবীর বাসের যোগ্য ক'রে তুলেছে, পরিকল্পনার পরে পরিকল্পনা বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে, পঞ্চাষিকী পরিকল্পনা বহু ক্ষেত্রে বহু দিকে চার, এমন কি তিন বৎসরেও সম্পন্ন হয়েছে। নলে, জার আমলের সেই বধ্যযুগীয় রুশিয়া তিন দশকের তিতরেই আজ সমৃদ্ধিতে, শিকার অগণকান্ত শিল্প-

বিজ্ঞানে উন্নত বৈশ্বজালিক সম্বন্ধ হ'তে চলেছে। ওদেশে আজ, যেসব দেশে, শিকার-বীকার কোনো মানুষই বঞ্চিত নয়, দরিদ্রতম বাহুবীর জীবনযাত্রার মান যত্নপূর্ণ উন্নীত হয়েছে, স্বাধীনতা, অকাল-মৃত্যুর হার বেতাবে কমেছে, তাতে সব দেশের লোকই বিদ্বিত হয়। অবিকল অস্ত্র যেন জীবিকার জন্য যে দাশন্য, পর-স্বার্থপেক্ষতা পৃথিবীর ইতিহাসের আদিম যুগ থেকেই বাতাবিক হয়ে রয়েছে, রুশিয়ার জনগণ আজ সমগ্র-তাবেই জানে যে, ও-দাশন্য অনিবার্য নয় এবং ওদের নিজেদের চেষ্টাতেই ও স্বার্থপেক্ষতা চিরদিনের যতো বিপুল হয়ে যাবে।

এইভাবে ওদেশে প্রতি মানুষই যখন তার জীবিকার মালিক হয়ে উঠতে চলেছে, টালিন জানতেন, 'অপর দেশে বিপ্লবের প্রচার তা'তেই অনেকখানি হয়ে যাবে। তাই টালিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রী সমাজ গড়ে তোলার কাজে সোভিয়েট রুশিয়া একান্তভাবে আশ্রয়িত্য করে। এই প'ড়ে তোলার কাজে প্রথম ও প্রধান প্রয়োজন শান্তি। টালিনের নেতৃত্বে তাই সোভিয়েট রুশিয়া প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত শান্তিই চেয়েছে, যুদ্ধবিগ্রহ চার নাই। এইভাবে যুদ্ধ থেকে বেশকিছু বাঁচাবার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধবাদী হিটলারের জার্মানীর সঙ্গে পর্যন্ত টালিনের রুশিয়া পারস্পরিক শান্তির ভিত্তিতে সন্ধি করেছিল। কিন্তু টালিন জানতেন, রুশিয়া যতোই শান্তিপ্রিয় হোক, শান্তিতে রুশিয়ার জনগণের যতোই প্রয়োজন থাক, হিটলারের জার্মানী বা অস্ত্র পুঁজিবাদী বেশ কখনও রুশিয়াকে শান্তিতে গড়ে উঠতে দেবে না। তাই সোভিয়েট রুশিয়ার সমৃদ্ধি প'ড়ে তোলার সঙ্গে সঙ্গে টালিন যুদ্ধের আয়োজনও কতোটা রেখেছিলেন, তার পরিচর আমবা পেরেছি গন্ত বিশ্ববৃহৎ। নিরস্ত্রশক্তির ক্ষেত্রে আবেহিকার বা বুটেনের বা দান, সোভিয়েটের দান তুলনার তার চেয়ে অনেক বেশী—একথা আজ বহু দোকেই স্বীকার করে। ও-যুদ্ধের দারুণ ফলাফলও কতজটিল না। টালিন বা চাউলির চেয়ে অনেককিছু টালিনকে স্রেষ্ঠ আশ্রয় দেন।

গোভিয়েট কনিষ্ঠার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে মিত্র-শক্তি অরলভ করে। কিন্তু দু'জিবার তার স্বর্ঘ থেকে নিষ্কৃতি পাবে কি করে? সামান্যদের ধ্বংস কাননা থেকে রেহাই পাবে কি করে? যুদ্ধ অরলভের অর দিনের মধ্যেই তাই মিত্রশক্তির মিত্রতা জেতে গেল, গোভিয়েট কনিষ্ঠাকে ধ্বংস করার অস্ত্র নিত্য নতুন বড়বড় চলগো, যুদ্ধের লজ্জার তৈরীই যে-সব দেশের সব চেয়ে বিরাট ও লাভজনক শিল্প হয়ে গাড়িয়েছে, সেই-সব দেশের, শাস্তিভঙ্গ হ'লে যে দেশের সবুজ কতি সেই দেশের সঙ্গে বিরোধ দিন দিন বনৌত্থত হয়ে উঠতে লাগলো। নিজেদের দেশে সামান্যতরী সমাজ গ'ড়ে কুলবার অস্ত্র একান্তভাবে আত্মনিরোগ করেও টালিন একথা ভুলে যাননি যে, দু'জিবারী রাষ্ট্র সামান্যতরী আনর্ষের রাষ্ট্রকে কখনও ক্ষমা করতে পারে না। তাই তাঁর সাবধানতার আর অস্ত্র ছিল না। এই সাবধানতার জ্যেষ্ঠ অনেক সময় সীমা ছাড়িয়ে গেলে আন্তর্ঘ হবার কিছু নেই, কারণ, শক্তি অংশল, ক্ষুর এবং সর্বব্যাপী। হয়তো তার ফলে অনেক নিরপরাধ ব্যক্তিব্যক্ত হুঃখ নির্ধাভন ভোগ করেছে। এটা আরও স্পষ্ট হয়েছে টালিনের সুস্থ্যর পর, যখন দেখা গেল, এই রকম লক্ষ্যেবর বশে টালিন ব'াদের কারাগারে বন্দী করেছিলেন, তাঁদের অনেককে টালিনেরই একান্ত অহুগত ও তাঁর স্থলাভিষিক্ত সাপেনকভ হুক্তি মিলেন এবং ব'াদের বেত্তরা বধের উপর এ'র্য অ'ভবুত হয়েছিলেন তাঁদের অনেককে একাধারের শাস্তি মিলেন। টালিন গোভিয়েট কনিষ্ঠাকে যে শক্তি গ'ড়ে গেছেন এবং গগ-সমর্ঘনের যে বৃহৎ ভিত্তির উপর সেই শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন, তার পক্ষে হয়তো পূর্বের তার অতঃত: সার্বভাষ্তার আশ্ব আর এরোজন নেই। এই সাবধানতার ফল্গে-লেনিন প্রতিষ্ঠিত একটা সত্যিকার গণতন্ত্র তার গণতান্ত্রিকতার অতঃত: বাহ্যিক রূপ অনেকখানি হারিয়েছিল। তারও হয়তো এর পর আর এরোজন থাকবে না। বিশ্বশাস্ত্রী প্রতিষ্ঠাও হয়তো

অনুর ভবিষ্যতে সহজ হয়ে আসবে এবং সর্বব্যাপী শাস্তির ভিত্তরই হয়তো। সনাকের প্রাচীন সতীর্থ ভিত্তি, এমন কি, সামান্যদেরও বিশাল ভিত্তি অচিন্তে পন্থার, অসুখ্যাত্ত গগ-শিকার বলে বিশালতর হয়ে উঠবে। ক্রমভিষিক্তির বৃষ্টিতে দেখলে ইতিহাসের গতি ভবিষ্যতের এই ই'মিতই স্থচিত করে।

ভারত-ব্রহ্ম সীমান্ত অশ্রম

ভারতবর্ষের প্রধান স্ত্রী পণ্ডিত অওহরগাল দেহেক এবং ব্রহ্ম দেশের প্রধান স্ত্রী উ-নু একযোগে ভারত ও ব্রহ্ম সীমান্ত পরিভ্রমণ করছেন। স্বাধীনতা লাভের আর পর হতেই ওই অঞ্চল ভারতের প্রতি খুব অহুতুল ছিল না। গত নির্বাচনের সময় ওই অঞ্চলে কোন কোন অংশে কোন নির্বাচনই হ'তে পারে নি; কারণ নির্বাচন প্রার্থী হয়ে কেউ গাড়ার নি। ওই সীমান্তের দুইদিকের অধিবাসীগণ অনেকটা একই উপজাতির অন্তর্গত এবং ভাষা ও আচার ব্যবহারে এদিকের ও ওদিকের অধিবাসীদের অনেক সময়ই বিশেষ কোন পার্থক্য দেখা যায় না। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সীমান্তরখণ্ড খুব সুনির্দিষ্ট ছিল না। ওই সব অধিবাসীরা ভারত বা ব্রহ্ম কোন রাষ্ট্রের প্রতিই বিশেষ অহুগত নহ। ভারতের অন্তর্গত মনিপুরী ও নাপাংগ প্রচাপ্ত্রেই ভারত রাষ্ট্রের বাইরে স্বাধীন রাষ্ট্র দাবী করেছে। অহুমান করা যায়, ব্রহ্মের অন্তর্গত উপজাতির লোক সবুহও এমনি স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী ক'রে থাকবে। ইংরেজ শাসকগণ এই অঞ্চলে কোন দিনই কোন বিধিলগত শাসন ব্যবস্থা চালু করে নি। Unsettled area, অর্থাৎ অব্যবস্থিত অঞ্চল বলেই ওই অঞ্চল বরাবর পরিচিত ছিল। ইংরেজ অধিকারের পূর্বে ওই সময় অঞ্চল স্বাধীন ব্রহ্ম দেশের রাষ্ট্রের অধীন ছিল। আসাম অধিকার করার পর ইংরেজরা ওই অঞ্চলের দিকে অগ্রসর হতে পার্কে, কতকটা সীমান্ত নির্ধারণের ভিত্ত এবং কতকটা ওখানে উৎপন্ন চা-এর অস্ত্র। ব্রহ্মদেশ অধিকার করার পর সীমান্তের সমস্ত বিটে গেল, কাজেই কোন দিনই ওই

কৃতবিদ্যা ব্রহ্ম ও আশাশ্রম সীমানা সন্নিবিষ্ট করা হয় নি। ব্রহ্মদেশ ভারত থেকে আলাদা হওয়ার পরও তাই অঞ্চল নিয়ে ইংরেজকে বেনী ভাবতে হয় নি।

তাবনার বিঘ্ন এল ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ স্বাধীন হওয়ার পর, অথবা এই তাবনার সূতনা হয় পত্ত বিঘ্ন-বৃদ্ধির সبব। ব্রহ্মদেশ যখন ভাপানের আশ্রয়ে গেল এবং চীনের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষত্র আশাশ্রমের তিতর দ্বিধে যখন রাজ্য তৈরী হতে লাগলো, তখন ওই অঞ্চলের প্রতি ইংরেজ শাসকগণের নজর দিচ্ছেই হ'ল।

অনেকেরই মনে থাকতে পারে, নেতাজী সুভাষচন্দ্র ব্রহ্ম-দেশ থেকে ভারতের ওই অঞ্চলে, বিশেষ ক'রে কোহিমাতে এসে স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং পরে ঐ সব সমস্যা তুলে দাবি, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর ভারতকে আবার ওই অঞ্চল লব্ধে সম্মত হতে হয়। ব্রহ্মদেশ সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র এবং কয়েক বছর পর্যন্ত এর আশ্রয়প্রাপ্ত শাসন যুব সুশ্রুতিপ্ৰিয় ছিল না। কমিউনিষ্ট ও কারেন (Karen) উপদ্রবের কথা অনেকেরই জানেন। উত্তরে চীনে কমিউনিষ্ট রাষ্ট্র সুশ্রুতিপ্ৰিয় হইতে এবং সেখান থেকেই ওই অঞ্চল দ্বিধে কমিউনিষ্ট-গুপ্তচরের অনুপ্রবেশ যুব অসম্ভব নয়। তাই ~~ওই অঞ্চল~~ লব্ধে আজ ভারত উদ্যোগী থাকতে পারে না। তা হাফা, পত্ত বৃদ্ধির সবব হুইদিক থেকেই যে পণ্ডিতাবলীভারত স্বাধীন আওতান হইতে চাড়ে ভগ্নানকার সমস্তা আইনও অটল হইতে উঠেছে। কারণ ভারতের মধ্যে বেশ একটা অংশ আজ স্বাধীন রাষ্ট্রের দাবী করছে। এমন ভাড়া সাধারণ কত'বা হিসাবেও ভারতীয় রাষ্ট্র উপভোগ্য লোকদের মধ্যে উদ্যোগী থাকতে পারে না।

আশাশ্রমের সংবিধানেরও এরকম লব্ধে একটা বিশেষ দাবিরোধ করা উল্লেখ করা আছে। তাই ভারতের প্রকানসমী বার হাত ওই অঞ্চলে কয়েকজন। অল্প একটা প্রধান উল্লেখ করা উচিত যে, পণ্ডিত অওহরলাল নেহরুর মধ্যে প্রাকৃতগত এমন একটা কিছু আছে যা তাঁকে ওই সব পার্বত্য অঞ্চল ও উপজাতি সমূহ বিশেষভাবে আকর্ষণ করে।

তাই নানাবিক থেকেই পণ্ডিতাবলী ভ্রমানে বাওয়াটা যুব অস্বাভাবিক নয়; কিন্তু অস্বাভাবিক হ'ল হুই যেসের হুই প্রধান মন্ত্রী একসঙ্গে ওই অঞ্চল পরিভ্রমণ। পণ্ডিতাবলী এই কাজে আশ্রয় বিশেষ স্তম্ভ আয়োজন করি।

ভারত ও ব্রহ্মদেশ মধ্যে একটা ঐতিহাসিক সম্পর্ক আছে; উত্তরের সংরতি ও সূত্রতা অনেকটা একই উৎস হ'তে উপাদান আহরণ করেছে। আধুনিক কালেও ইংরেজ শাসনের অধীনে উত্তর দেশ দ্বিধে সম্পর্ক এসেছিল। ব্রহ্মের কিছু উত্তরা, ব্রহ্ম ও ভারতে প্রায় সমভাবে সম্মান ও সন্না অর্জন করেছিলেন। এসব লব্ধেও ব্রহ্মদেশে ভারত ও ভারতীয়দের প্রতি এক বিশেষের ভাব প্রবল হইতে উঠেছিল। এর ক্ষত্র ইংরেজ শাসকগণ অনেকটা দারী। কিন্তু এর দোষ প্রধানত পড়বে ব্রহ্মদেশে অস্বাভাবিক ভারতীয়দের উপর। ইংরেজের গোলাম ও গুপ্তচর হিসাবে তারা ব্রহ্মদেশে গিয়ে একটা প্রভু-মনোভাবের সঙ্গে ব্রহ্মদেশীরা প্রতি অস্তিত্ব অসম্মানপূর্ণক আচরণ করত। ভারতের মনোভাব ছিল—"We have come here as conquerors and we are entitled to have the rights and privileges of conquerors." বিজিত্য হিসাবে আশ্রয় ব্রহ্মে এসেছি এবং বিজিত্যের সমস্ত সুবিধা ও অধিকার আমাদের প্রাপ্য। এর ফলে গত ৩০-৩২ বছর ধাবৎ ব্রহ্মে বেশ একটা ভারত বিদ্বেষী মনোভাব ছিল। পত্ত বৃদ্ধির সবব সূত্রাবলী নিজে-আচরণ ও কাজ করি দিয়ে এই বিদ্বেষতাক কতকটা দূর করেছিলেন। তবুও এইভাবে এখনও বেশ একটা আশ্রয় জানি, ১৯০১ বছর পূর্বেও ব্রহ্মের অধিবাসীরা ভারতীয়দের "কাত" (অর্থাৎ গণহত্যা—ব্রহ্মদেশের দেশের লোক বলিয়া) পক্ষে ঘাটে পর্যন্ত "দিকো" কনত (লব্ধ নাটিকে লাগিয়ে হাঁটু গেড়ে সম্মান দেওয়া)। আর গত ২০-২২ বছর ধাবৎ এই সম্মানের ভাব দূর হইতে গিয়ে যুগান্ত তাৎ-এক-প্রবল হইতেছিল যে, ভারতীয়দের

দেশে অনেক সময় “কালী” (কিরী) বলে
আজ্ঞা দেখাত।

অথচ উত্তর রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সংলগ্ন ও বর্তমান
রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন যে, উত্তর দেশের মধ্যে
গৌহাটী ও বঙ্গবন্ধু সম্পর্ক না থাকলে উত্তর দেশেরই
অন্যিষ্ট ও বিপদের আশঙ্কা আছে। ইংরেজ আমলের
কিছু সেনা বাহর ব্রহ্মদেশ ভারতের নিকট কলী আছে।
সে সেনা ব্রহ্মদেশ পরিশোধ করছে নহে। তা সত্ত্বেও
ভারতবর্ষ ছুই তিন বছর পূর্বে ব্রহ্মদেশকে কিছু অর্থ
সাহায্য করেছিল। এটি বছর ভারতবর্ষ ব্রহ্মদেশ
থেকে কয়েক কোটি টাকা চাউল কেনে। ব্রহ্মের
বাজারের দরের আর ডবল মূল্য দিয়ে ভারতবর্ষকে
চাউল কিনতে হয়। পুরানো সেনা বাহর ওই মূল্য
কেটে নেওয়া হয় নাই, নগর টাকা দিতে হয়। এদম
সত্ত্বেও আমরা মনে করি ভারতেরই উচিত ব্রহ্মদেশকে
বঙ্গবন্ধু দিকে টেনে আনা। অর্থে, সামর্যে, সর্ববিধের
ভারত ব্রহ্মদেশের চেয়ে অনেক বড়, কাজেই ছোটের
দারিদ্র ভারতবর্ষকেই গ্রহণ করতে হবে। এটা অস্বস্তিক
পরোপকার নয়। এটা বিশ্বের ও নিজের স্বার্থসাধন।
তাই ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ-সুকে নিয়ে পণ্ডিতজীর ওই
ভুক্তলে স্রবণ একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাম।

মনিপুর নাগা প্রভৃতি অঞ্চলে একটা ভারত বিরোধী
ভাব গড় করছে বহুর ব্যক্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। এটা
সম্বন্ধে একটু ব্যাপক ও গভীর অধ্যয়ন প্রয়োজন। অথচ
সত্যতঃ ছুই তিন হাজার বছর যাবত মনিপুর ভারত

সত্যতা ও সংরক্ষিত প্রভাবে আছে। এই প্রভাব ওই
অঞ্চলে বিস্তার করেছিল বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম। মনিপুর
রাজ্যের রাষ্ট্রতান্ত্রিক ছিল বাংলা এবং লিখিত মাজিই
লেখানে বাংলা ভাষা ও ব্রহ্মদেশে পাকত, কারণ
বাংলাভাষার লিখিত প্রমাণ ছিল ভারতের প্রধান
ধর্মগ্রন্থ। এই প্রভাব ক্রমে ক্রমে নাগা ও মিজাই
অঞ্চলে বিস্তার লাভ করতে থাকে। বৃটান মিশনারীগণ
প্রথম এসে এতে বাধা দেয়। বর্তমানে এই সমস্ত
অঞ্চলে এবং বিশেষ করে মনিপুরে বাঙালী বিরোধী
প্রচার চলছে। বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে একটা মনোভাব
গড়ে তুলবার চেষ্টা চলছে এবং এর প্রতিজ্ঞা হিসাবে
ভারত বিরোধী মনোভাবই গড়ে উঠছে। মনিপুর,
নাগা প্রভৃতি অঞ্চলকে যদি ভারতীয় সংরক্ষিত গভীর
ভিতর আনতে হয়, তাহলে বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর দিয়েই
প্রচার কার্য চালান দরকার। বৈষ্ণব ধর্মের ভিতর
এমন একটা উদার মনোভাব আছে, যাতে বৈষ্ণব ধর্মকে
আধুনিকতার বিরোধী বলা চলে না। অন্য যে-কোন
ধর্মের তুলনায় বৈষ্ণব ধর্মকে বরং শ্রেষ্ঠ স্থান দেওয়া
হয়ছে। ভারতীয় রাষ্ট্র বর্তমানে Secular State হোক,
হানীর অবস্থা অসুখ্যারী কোন ধর্মভেদে প্রভাব ও প্রসার
তাকে স্বীকার করে নিতেই হবে। আমরা মনে করি
মনিপুর, নাগা প্রভৃতি অঞ্চলে আজ যে ভারত বিরোধী
মনোভাব চলছে, তার মূলে আছে বাংলা-বিরোধী
মনোভাবের প্রচার এবং এই ভারত বিরোধী মনোভাব
দমন করতে হ'লে বৈষ্ণব ধর্মের সহায়তা নেওয়া ওই
অঞ্চলে সব চেয়ে বেশী ফলপ্রসূ হবে।



শ্রীমহাশয়ী এসে লিবিটেড, এবং আপার সাহু'লার রোড হইতে শ্রীমহাশয়ী কর্তৃক স্মৃতি

এক 'বিদ্যা' কার্যাবলী এবং আপার সাহু'লার রোড, কলিকাতা হইতে জগদীশ প্রকাশিত।

মন্মথ রায়, এম, এ, প্রণীত
নবমুগের নাট্যসাহিত্য

কৃষাণ	২১	সতী	১০
বাহির উপজ্ঞা (নৃতন নাটক)	২১	ধনা	১০
দীরকাদিম	২১	অশোক	২১
চাঁদসদাগর	১১	মহুয়া	১১
কাঁদাগার	২১০	জীবৎস	১১
একাত্তিকা	১১০	দেবানুর	১১
শাবিকী	১১০	মুক্তির ডাক	১০০
বিহ্বলপা	১০	কাতল রেবা	

শুভরূপাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,

২০৩/১১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রট,

কলিকাতা—৬

—বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের দুইখানি কাব্যগ্রন্থ—

কুতীরের গান—মূল্য ১১০

এই বইয়েরই কবিতা 'রাতভিখারী' বীরেন্দ্রনাথ কৃত 'বাংলা কাব্য-পরিচয়ে স্থান পেয়েছে।

মোহিতলাল—“এই 'কয়টি কবিতা আমার ভাল লেগেছে—‘মহাকাল’, ‘বেহুলা’

‘আজ শরতে’ পাঁচের স্বপনে ভুলি।...‘আজ শরতে’ কবিতাটি সবচেয়ে

ভাল লাগল।...‘মহাকাল’ কবিতাটাকে ভাষা ও ছন্দের সংযম,

শালীনতা এবং গাঢ় গান্ধীর্থ ফুটেছে।

নিশান নাও—মূল্য ১৫০

“গৃহে গৃহে আজ দীপমালা জ্বলো

নিশান উড়াও,

হাঁক দিয়ে বলো

মুক্তি চাই, মুক্তি চাই

মুক্তি ভিন্ন লক্ষ্য নাই।”

যে কবিতাগুলি একদিন জাতীয় আন্দোলনে প্রেরণা জুগিয়েছে সেইগুলির সমষ্টি।

প্রাপ্তিস্থান : ভবানীপুর বুক ব্যারো, ১বি রসা রোড, ভবানীপুর।